শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা
(শ্রীমদ্ভগবতগীতার যৌগিক ভাষ্য)

শ্রী নীতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক :
শ্রী মনোজ কুমার ঘোষ

ISBN- 978-81 7525-897-6

প্রথম প্রকাশ :-
মহালয়া ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।
ইংরাজী – ১০ই অক্টোবর ২০০৭.

যোগাযোগ : গ্রাম - চাক্‌লা, পোঃ - চাঁদুয়া, কাঁচরাপাড়া,
জেলা : ২৪ পরগণা (উ)।
সম্পাদনা ও অলংকরণ :- শ্রী মনোজ কুমার ঘোষ।
প্রকাশক :- শ্রী মনোজ কুমার ঘোষ।

মুদ্রণে :............

সূচীপত্র

" ন তদস্তি ন যত্রাহং তন্নেহাস্তি ন যন্ময়ি।
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্বং সংবিন্ময়ং ততম্॥"
বিদ্যারত্ন মুনীশ্বর।

" Where do I not exist ?
What is not in me ?
What more to yearn for ?
as I am the INFINITY in the UNIVERSE."

"যেথা আমি নাই – হেন কিছু নাই,
হেন কিছু নাই – আমাতে যা নাই,
অন্য কিছু কিবা আছে কামনার ?
মোর জ্ঞানে ব্যাপ্ত অখিল সংসার।"

" Love thyself, know thyself
and get thyself."

"ইদং যোগরহস্যঞ্চ ন বাচ্যং মূর্খসন্নিধৌ।"

সমর্পণ -

"তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।"



পরমপুরুষ পূর্ণ ব্রহ্মাবতার জগৎগুরু ঁ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
যাঁর পদতলে বসে আত্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্য শ্রবণ করেছি –

কর্ম্মে, জ্ঞানে ও ভক্তিতে যতকিছু উপার্জন।
তা সকলই হয় যেন ঁবিষ্ণুপদে সমর্পণ ॥

কৈশোরে অধ্যাত্মের প্রেরণা



পুণ্যশ্লোক ঁদীনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ঁসুনীতি দেবী।

" দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

(শ্বেতাঃ ঔঃ ৪/৬)

" একবৃক্ষে দুটি পাখী নিবসয়ে সুখে,
একে ফল ভোগ করে, অন্যে মাত্র দেখে ॥"

তিনি দেখছেন, সততই দেখছেন আমাদের। দেখছেন আমরা কিভাবে মোহ মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। কিন্তু দ্রষ্টার প্রতি দৃষ্টি পড়লে, তাঁর জ্যোতিষ্মান্ দৃষ্টি অহরহ জাগ্রত আছে, এই বোধ দৃঢ় হলেই কর্ম্মের বিপাক কেটে যায়। সেই দৃষ্টিই পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার দৃষ্টি।

সম্পাদকের কথা

শ্রীযুক্ত নীতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক শ্রীমদ্ভগবদগীতার যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যখ্যা মূলত: প্রকাশনার উদ্দেশ্যে রচিত কোনও গীতাভাষ্য নয়। বিভিন্ন সময়ে অনুরাগী শ্রোতাবৃন্দের নিকট তাঁরই ব্যাখ্যাত ভাষ্যসমূহের সংক্ষিপ্ততম সংকলন মাত্র, বর্তমান সামাজিক বিবর্তন ও পরিস্থিতির বিবেচনায় যার অনেকাংশই অপ্রকাশিত থেকে গেল। আলোচ্য অংশে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাভারতের কাহিনী অংশ ছেড়ে সরাসরি শ্রীমদ্ভগবদগীতার যৌগিক ব্যাখ্যা মাত্রে প্রবৃত্ত হয়েছেন যেটুকু হল মূলত: জ্ঞানকর্ম্মসমূচ্চয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। এখানে যোগমার্গ অবলম্বনে আত্মবোধে উন্নীত হবার রহস্য প্রকাশ করা হয়েছে। জীবের ক্রমমুক্তির পথে আত্মজ্ঞান লাভ ও তৎপরে ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা প্রক্রিয়াদি তত্ত্বগতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই সংকলন সংসারী জীবের ইহজীবনের উত্তরণ ও পরজীবনের গতাগতির বিজ্ঞানকে সুন্দর, স্বচ্ছ, সাবলীল ও সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা মাত্র। পরম বৈদান্তিক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় জীবনের মধ্যভাগে কিছুসময় টেহরী গাড়োয়ালে উত্তরকাশীর গঙ্গোত্রীতে যোগীসঙ্গে অতিবাহিত করেন। একজন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হয়ে কার্য্যব্যপদেশে আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করেছেন ও লৌকিক জীবনধারাকে যথোচিত পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহ, যোগপ্রসঙ্গ, দীক্ষাপ্রসঙ্গ, পঞ্চ্ঙ্ম কার প্রসঙ্গ ইত্যাদিতে এ সকলই যথার্থ প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের শত ব্যস্ততা ও দায়বদ্ধতার মধ্যেও শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁর অনুরাগীবৃন্দকে বিমুখ করেন নাই বরং শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকার এই সংকলন প্রণয়ন করেছেন যার সম্পাদনা তথা প্রকাশনার দায়িত্ব পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাতে অর্পণ করেছেন। এখন যত্ন ও চেষ্টামাত্র মনুষ্যসাধ্য, সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।"

এই গ্রন্থের মুদ্রণে নিজ অভিজ্ঞতা ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করেছেন শ্রীযুক্ত রতন মিত্র । এখন গ্রন্থপাঠে সুধী পাঠক সমাজের অধ্যাত্মপিপাসা নিবারণ হলে, আত্মবোধ জাগরণে ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়তা হলেই সকলের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হবে ॥

গরিফা ১৫ই আগষ্ট '০৭

শ্রী মনোজ কুমার ঘোষ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা

(শ্রীমদ্ভগবদগীতার যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)

অবতরণিকা

শ্রীমদ্ভগবদগীতা শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী। এই বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তা আমি জানি না। তাই ভাষায় গীতার তাৎপর্য্য সম্পূর্ন ব্যাখ্যা করতে আমি অক্ষম। গুরুপ্রদত্ত যেটুকু শক্তি পেয়েছি, উপদেশ পেয়েছি, তারই সাহায্যে তাঁরই ভাষ্যে, সময় পেলে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি মাত্র। কতিপয় শ্রোতার আগ্রহাতিশয্যে এমনতর মৌখিকভাবে ব্যাখ্যাত অংশের যে সমস্ত শ্রুতিলিখন ও অনুলিখনাদি হয়েছিল তারই সংগৃহীত সংকলন হল এই শ্রীমদ্ভগবদগীতার যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

এই ব্যাখ্যার লিপিরূপ দানের মূল প্রেরণা ঁমনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবকালী মজুমদার ও শ্রীযুক্ত স্বপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উচ্চকোটির সাধকগণ। বর্ত্তমানে মুদ্রণ ও প্রকাশনার মূল প্রেরণা শ্রীযুক্ত মনোজ কুমার ঘোষ মহাশয়। বাস্তবে তাঁরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচুর পরিশ্রমের ফসল হল গীতার এই যৌগিক ব্যাখ্যার সংকলন। এর শ্রুতিলিখন ও অনুলিখনের যাবতীয় কাজ করেছেন শ্রীযুক্ত মলয় রায়, শ্রীমতি দেবাশ্রিতা রায়, শ্রী প্রশান্ত সরকার, শ্রী অনাদি বৈদ্য, কুমারী শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী সুব্রত চক্রবর্ত্তী ও শ্রী শিবশঙ্কর নিয়োগী। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের বোধ প্রদানে সহায়তা করেছেন কুমারী নীতা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মলয় রায় ও শ্রীমতি দেবাশ্রিতা রায়। সর্ব্বোপরি অন্তরালে থেকে আমার যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে এই ভাষ্য রচনায় সুযোগ করে দিয়েছেন শ্রীমান বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য। রচনার সকল প্রকার উপাদান প্রকরণ, দুস্প্রাপ্য পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও গ্রন্থাদিসকল সময়মত সরবরাহ করে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করেছেন ঁমনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তপন মাইতি, শ্রীযুক্ত স্বপন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুব্রত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মনোজ কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ বসু, শ্রীযুক্ত নির্মল রায় ও শ্রী অসীম চট্টোপাধ্যায়। শারীর বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি সরবরাহ করেছেন কুমারী নীতা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মলয় রায় ও শ্রীমতি দেবাশ্রিতা রায়।

কর্ম্মব্যপদেশে সুদীর্ঘ আড়াই তিন বৎসরব্যাপী কলকাতার বি আর সিং হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের সকল বিভাগে অহোরাত্রি অবাধগতি ও সেই সাথে বিভিন্ন ধরণের অসুস্থ, মৃতকল্প ও মুমূর্ষুগণকে সর্বতোভাবে যথেচ্ছ পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণকালীন প্রশ্নসকলের উত্তর দিয়ে সহায়তা করেছেন একাধিক রোগী, রোগিণী, কর্ম্মরত চিকিৎসক, মেট্রন, নার্সিং সিস্টার, তাঁদের সহকারী ও সহকারিণীগণ।

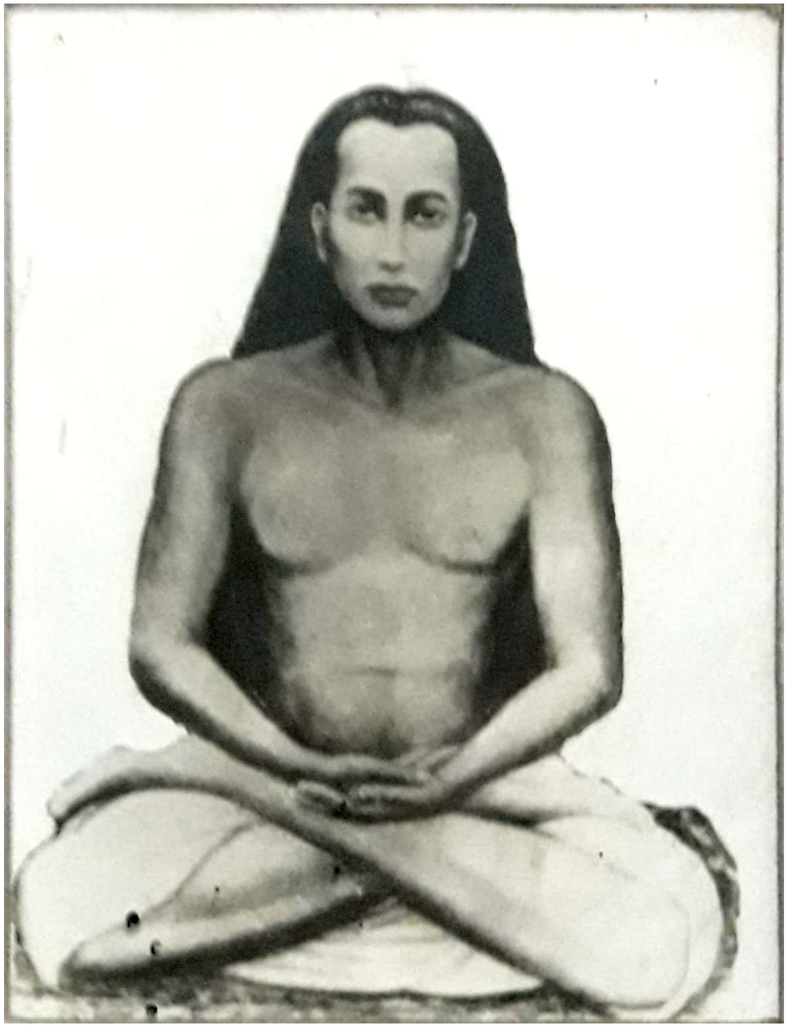
ক্রিয়াযোগ বিধি ও তার বিভিন্ন স্তরীয় অনুভব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ঁমনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কিন্তু নিজের অক্ষমতার জন্য বিষয়গুলো বুঝতে পারিনি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনেক উচ্চ ক্রিয়ান্বিত ও ক্রিয়ান্বিতাগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে সাহায্য করেছেন যাঁদের অনুভব সকল এখানে বিবৃত করা হয়েছে। সন্ন্যাস জীবনের বিবিধ রহস্য উন্মোচন ও তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে সহায়তা করেছেন ঁআত্মানন্দ সরস্বতী, ঁঅরবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রী যোগেশ্বর ব্রহ্মচারী, ঁশিবানন্দ সরস্বতী, স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী (গঙ্গোত্রী) ও যোগিণী ঁসিদ্ধাভৈরবী মাতাজী। মহাকালজয়ী চিরন্তন সদ্‌গুরুসত্তায় নমিত হয়ে আমার এবং এঁদের প্রত্যেকের জন্য আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করি। পরিশেষে আবারও বলি অব্যক্ত ব্রহ্মকে যেমন ব্যক্ত করা যায় না তেমনই শ্রীভগবানকথিত গীতার্থও ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব গুণীজনের নিকট আবেদন আলোচ্য ব্যাখ্যায় যদি কোনওরূপ সন্দেহ, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অসঙ্গতি বা ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, অনুগ্রহ করে তার নিরসনে যথাযথ সাহায্য করুন, আমি বাধিত ও অনুগৃহীত হব, শ্রীভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন।

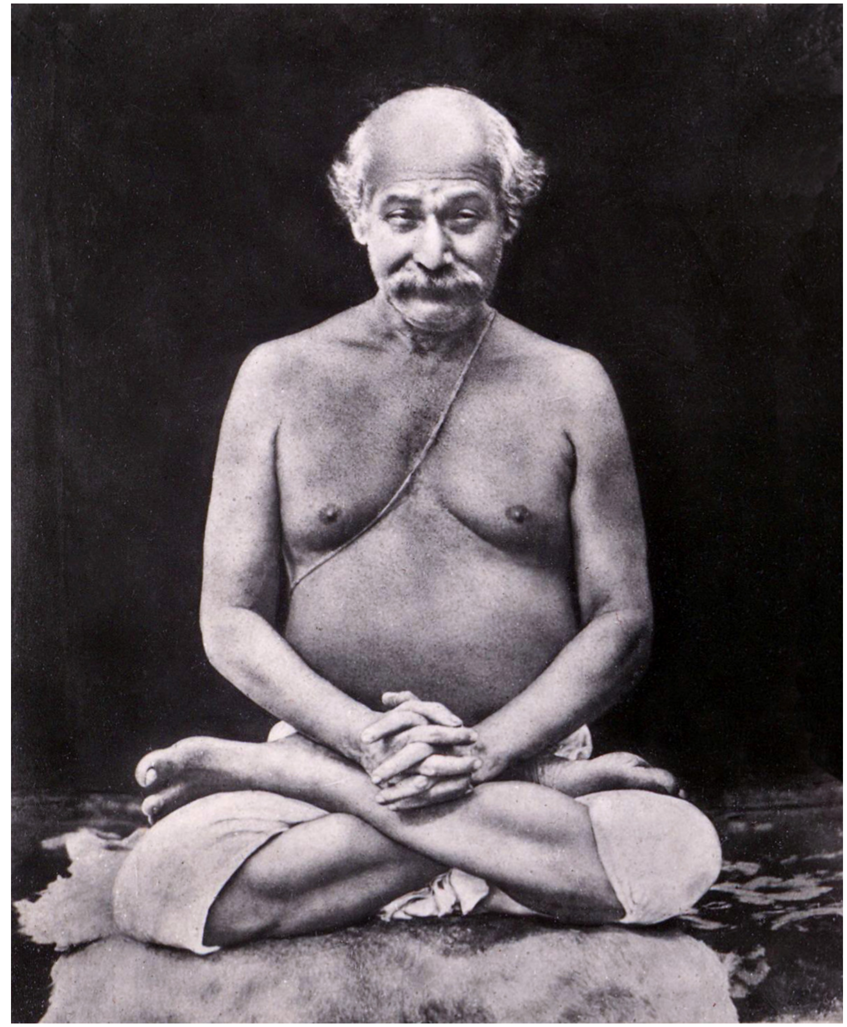
এই গীতাভাষ্যের মূল অবলম্বন মহাযোগী যোগাচার্য্য ঁপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টীকা সমন্বিত আর্য্যমিশন ইনিস্টিটিউশনের শ্রীমদ্ভগবদগীতা। অপরাপর যে সমস্ত পঠিত বই পুস্তক ও পুঁথিপত্রাদির প্রভাব এই গ্রন্থে পড়ে থাকতে পারে তারও একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা সংযোজিত হল। এ ছাড়াও আরও যে সকল মহাত্মাগণের কোনও কোনও রচনার সামান্যতম কিছু অংশ বা তার ছায়াও এই গ্রন্থে এসেছে তাঁদের প্রতিও আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

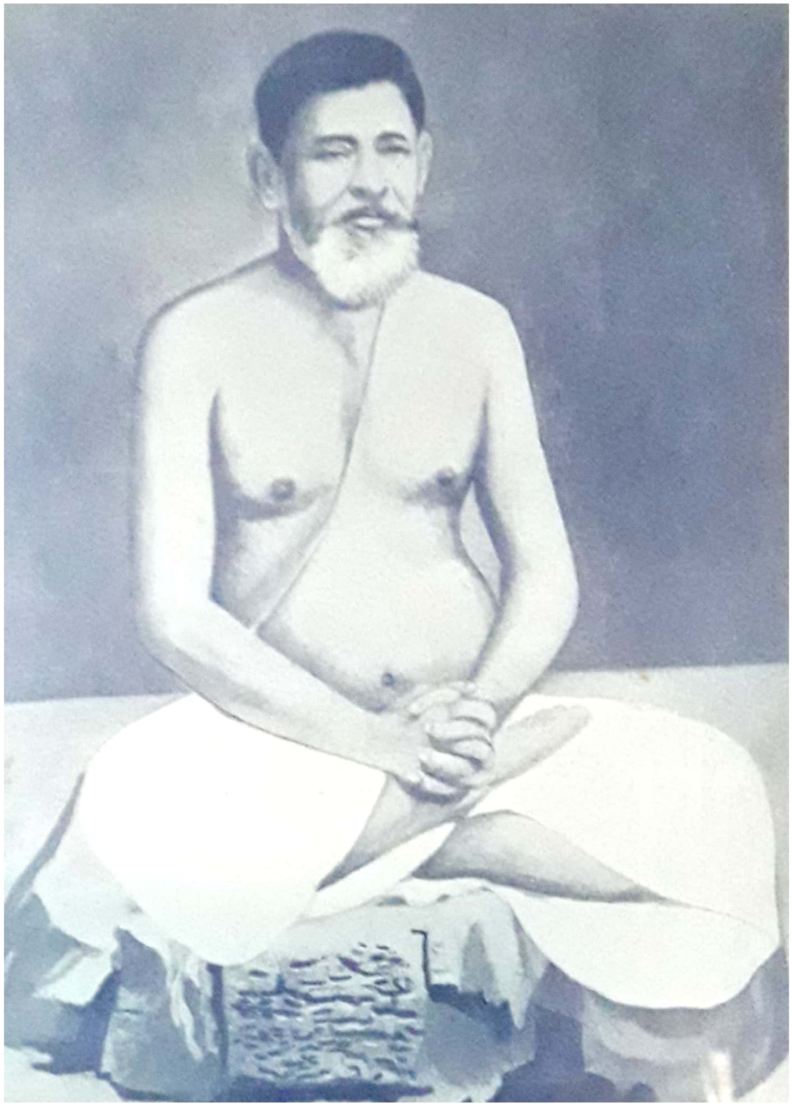
শ্রীমদ্ভগবদগীতার এই আধ্যাত্মিক ও যৌগিক ব্যাখ্যার লিখনকালে পূর্ণব্রহ্ম, পরম পুরুষ সিদ্ধ সদ্‌গুরু ভগবান ঁবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য নানারূপে আমার সামনে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে কৃপা করেছেন। আমি তাঁর ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পরম পুরুষগণ ঁআদ্যনাথ রায়, ঁশ্রীশচন্দ্র মুখোপধ্যায়, ঁপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ঁশ্যামাচরণ লাহিড়ী ও ঁরামস্বামী এই ষড়মূর্ত্তির ধ্যান করি ও ভূয়ো ভূয়ো তাঁকে প্রণাম করি। তাঁর এই অহৈতুকী, অজস্র কৃপা বারিধির বিন্দুমাত্রের নাম “শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা”। ওঁ তৎ সৎ, শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

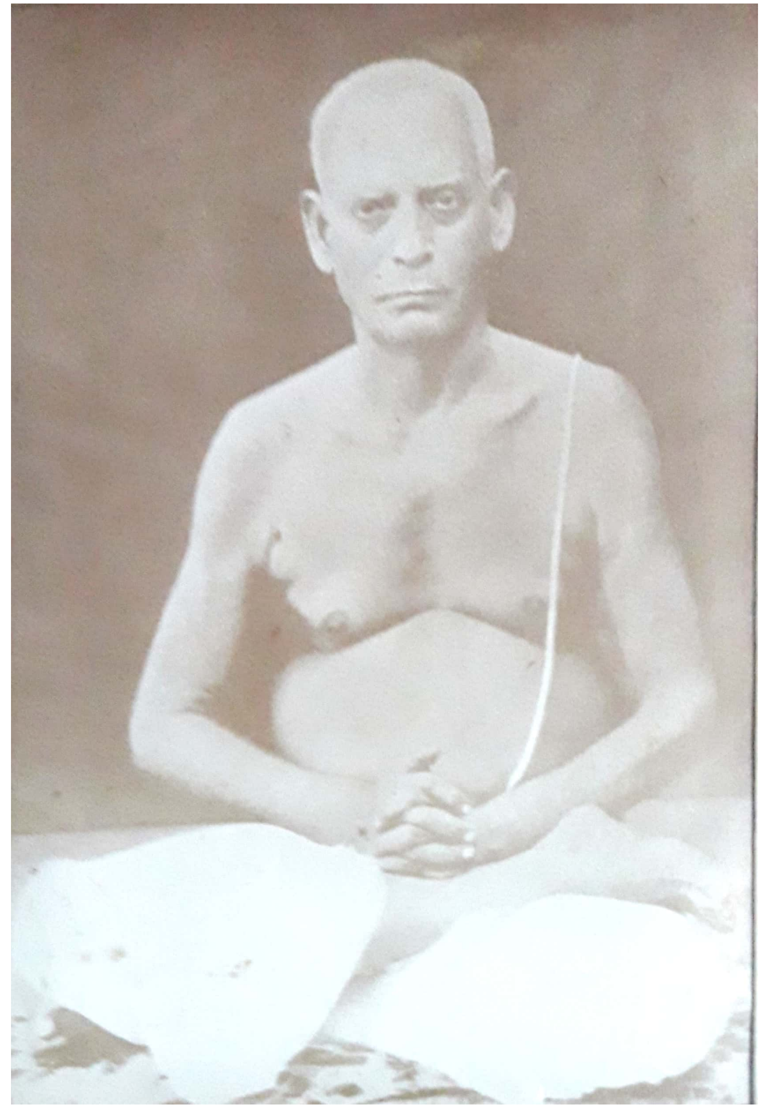
কাঁচড়াপাড়া
ইং ৩০-৪-২০০৬
(মধ্যরাত্রি)

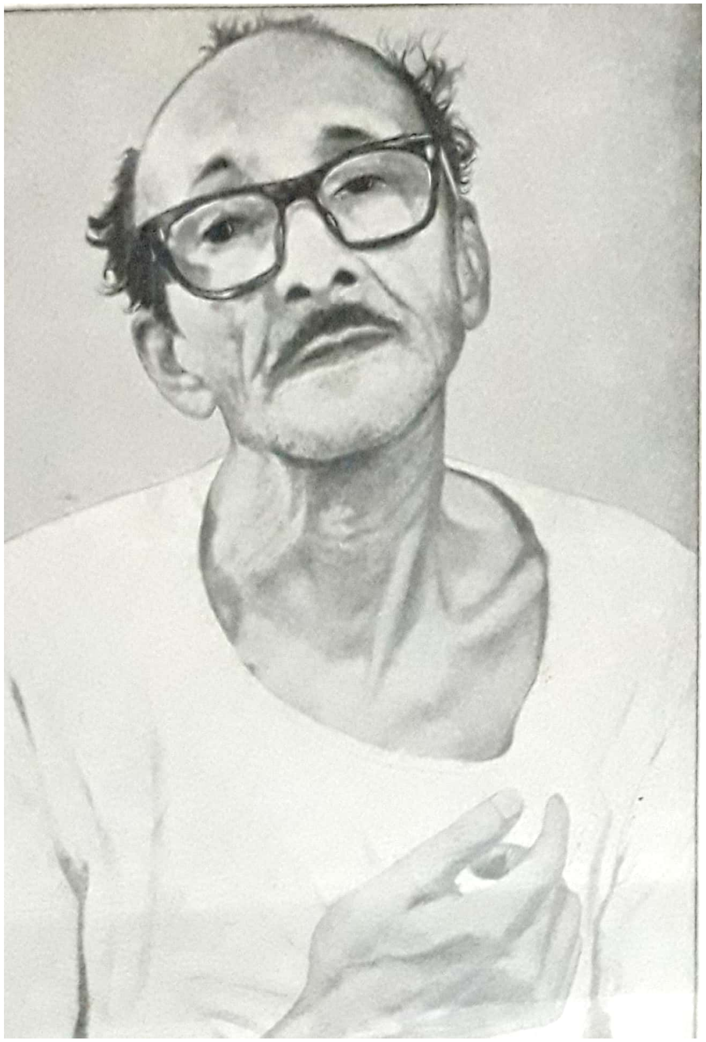
শ্রী নীতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

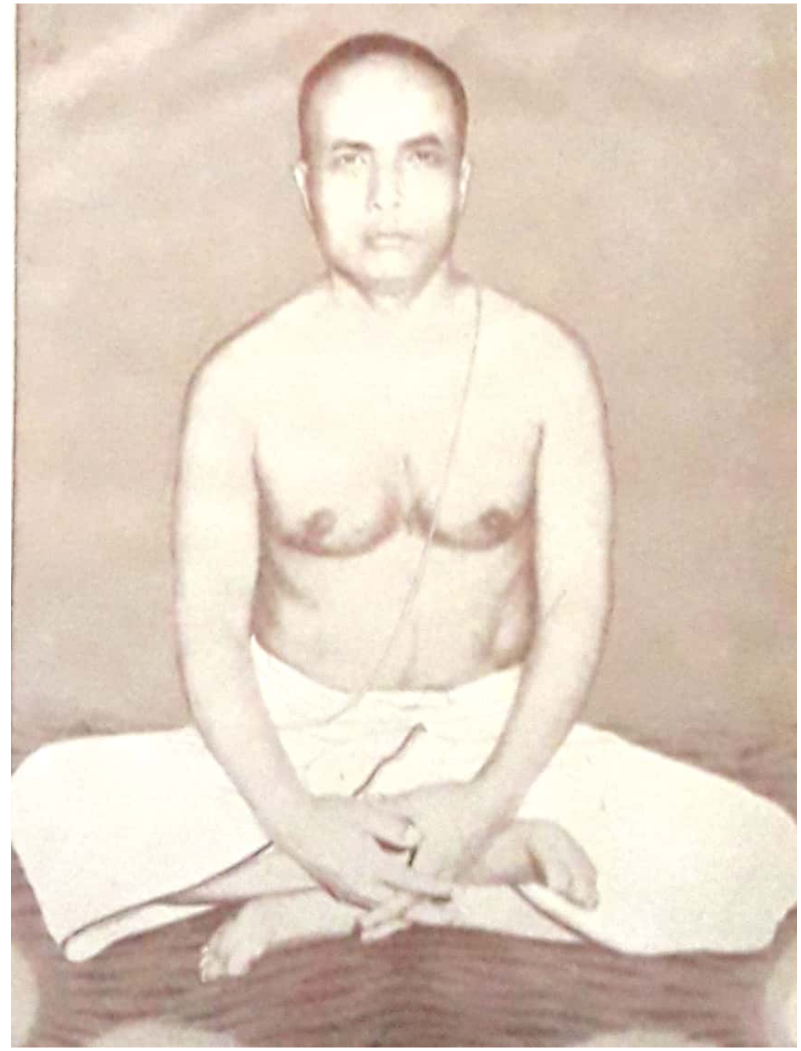












গুরু বন্দনা

ভবসাগর তারণ কারণ হে ।
রবিনন্দন বন্ধন খন্ডন হে ॥
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
হৃদিকন্দর তামস ভাস্কর হে।
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শংকর হে ॥
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
মন বারণ–শাসন– অঙ্কুশ হে।
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে ॥
গুণগান পরায়ণ দেবগণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে।
হৃদিগ্রন্থি বিদারণ কারক হে ॥
মন মানস চঞ্চল রাত্রিদিনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে।
সুখশান্তি বরাভয় দায়ক হে ॥
ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
অভিমান প্রভাব বিমর্দ্দক হে।
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে ॥
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
তব নাম সদা শুভ সাধক হে।
পতিতাধম মানব পাবক হে ॥
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে।
ভবরোগ বিকার বিনাশক হে ॥
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

--o-o--

ভূমিকা

দ্বাপরযুগে স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখে গীতা বর্ণিত হয়েছিল। তারপর থেকে কলিযুগে এ পর্য্যন্ত এই গীতাগ্রন্থ বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। পৃথিবীর সবকটি আর্যভাষাতেই এই গীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ হয়েছে। এমতাবস্থায় নতুন করে আবার এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন হল ?

আজকের গীতার এই ব্যাখ্যা সকলের জন্য নয়, কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের জন্য, যাঁরা জড়বাদী বা ভোগবাদী নন বরং আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ও আত্মজ্ঞানলাভে বিশেষভাবে উৎসুক।

আর্যঋষিগণের মতে কলিতে সমাজ বিকৃত হবে যেখানে থাকবে কেবলমাত্র ভোগবাদেরই প্রাধান্য। প্রাচীনকালের জড়বাদী মনিষী চার্ব্বাক থেকে বর্তমানের জড়বাদের প্রবক্তাগণ এপর্যন্ত জড়বাদ বা ভোগবাদের ধারাটিকে যেভাবে পরিপুষ্ট করেছেন তাতে আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞানের ধারাটি বিলুপ্ত, কোনওমতে সুত্রবৎ ফল্গুধারার ন্যায় গোপনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আত্মতত্ত্বের এই অবলুপ্ত ধারাটিকে যদি কোনওভাবে টিকিয়ে রাখা যায়, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হলেও, যতক্ষণ না উপযুক্ত কোনও তত্ত্বদর্শী পুরুষোত্তমের আবির্ভাবে আত্মজ্ঞানরূপ এই বিজ্ঞান নূতন ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সূচনা করবে আত্মকর্ম্মচর্চার নবযুগ। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের এই অভিলাষের দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান গীতাভাষ্যের অবতারণা। আত্মজ্ঞানাভিলাষী ব্যতীত ভোগবাদী বা জড়বাদীগণের পক্ষে গীতাপাঠ অথবা গীতাশ্রবণ উভয়ই বিড়ম্বনা মাত্র। একারণ কতিপয় মুমুক্ষু ব্যক্তির আত্মজ্ঞানাভিলাষ চরিতার্থ করাই বর্তমান গীতাভাষ্যের লক্ষ্য।

আত্মতত্ত্ব

এ বিশ্বরচনার মূল অনুসন্ধানে নেমে বিজ্ঞান বলতে শুরু করেছিল, " Matter and energy are sufficient in themselves to explain all the phenomena of the visible universe" অর্থাৎ ভূত (Physical Matter) ও ভৌতিক শক্তি (Physical energy) বিশ্বরচনার পক্ষে যথেষ্ট। যার প্রকৃত তাৎপর্য্য দাঁড়ায় অদৃশ্য জগৎ বলে কিছু নেই, মানে পরলোক নেই, আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, কোনও অদৃশ্য দিব্যশক্তিরও কোনও ভুমিকা নেই, আছে শুধুই জড় পরমাণুর যদৃচ্ছাজাত সংঘাত "Fortuitous concourse of Atoms! Only Almighty Atom energized by blind force !" যদি প্রশ্ন কর, প্রাণ ? প্রাণশক্তি কোথা থেকে এল ? জড় বিজ্ঞানের উত্তর ছিল – "Why ? Protoplasm, the very seat of life, would someday be synthesized in the laboratory from its consitituents – Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Oxygen." কিন্তু চেতনা ? Consciousness ? Mind ? জড়বিজ্ঞানের সদম্ভ উত্তর ছিল – "Why ? That is mere

vibrations in the brain cells, as the liver secretes bile so the brain exudes thought." অতএব জড় ও জড়শক্তিই all in all. কিন্তু বিজ্ঞানের সেই অজ্ঞান অবস্থাটা আজ আর নেই। সবরকম উন্নতির সাথে সাথে বিজ্ঞানও আজ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। তাই আজ বিজ্ঞানে জড়বাদের স্থলে আধ্যাত্মিকতার উদয় হয়েছে। Sir Oliver Lodge Ges Sir William Crooks এর মত জগৎশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীগণ বলছেন, "Modern Science seems to be rediscovering some of the thoughts of ancient science which had been lost sight of and forgotten. In life, now we see the promise and potency of all forms of matter and consciousness is the absolute world – enigma" (সম্বিৎ, চৈতন্য, যা হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম প্রহেলিকা) "We are, each of us, larger than we know." কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়টা হল যে বিজ্ঞানের এহেন উন্নতিতেও জড়বাদীগণ কিন্তু সেই আঁধার যুগের অন্ধ জড়তত্ত্বেই পড়ে রইলেন; শুধু তাই নয়, বরং জড়বাদ ও জড়ত্বই হয়ে উঠল তাঁদের অবলম্বন। তাই ভোগের বৃত্তের বাইরে তাঁরা আর আসতে পারলেন না। কিন্তু কালের গতিকে তো আর রোধ করা যায় না। সুতরাং গবেষণা চলতেই থাকল এবং আত্মা, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতবাদ ও দর্শন প্রচারিত হল।

আত্মা, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান, দর্শন ও অনান্য শাস্ত্রে বহুবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। ষড়দর্শনকারগণের সকলেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করেন। কেবল বেদান্ত আত্মার একত্ব স্বীকার করে।

প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুয়ে মিলে জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হয়েছে। গীতাতে এর বিশদ আলোচনা আছে। যাঁরা দেহকেই যথাসর্বস্ব মনে করেন তাঁরা জড়বাদী,ইন্দ্রিয়ারাম। কেবলমাত্র ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ও বন্টন তাঁদের জীবন দর্শন। একারণ তাঁরা মনোবিলাসের বস্তু ব্যতীত অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু যে আছে তা ধারণা করতে পারে না। সেজন্যই তাঁরা আত্মা বলে কোনও কিছু স্বীকার করে না। অপরপক্ষে, ষড়দর্শনের ঋষিগণ শিষ্যগণের যোগ্যতানুযায়ী বুঝাবার জন্য আত্মার বিভিন্ন ভাবের কথা বলেছেন মাত্র।

প্রকৃতি জড়, দেহ এবং ইন্দ্রিয়সকল প্রকৃতিরই পরিনাম। পুরুষ ভোক্তারূপে প্রকৃতির সাথে দেহাকারে ও দেহভাবে মিশে আছে। আত্মা দেহাতিরিক্ত। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বিকার আছে কিন্তু আত্মা ষড়বিকার বর্জিত। জন্ম, মৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি,অবক্ষয়, রূপান্তর প্রভৃতি ষড়বিকার নেই। ইনি জন্মমৃত্যুহীন, সদা একরূপ, শ্বাশ্বত ও পরিনামবিহীন। শরীরের বিনাশে এঁর বিনাশ হয় না। ইনি কর্তাও নন, ভোক্তাও নন। অতএব সংসারাবস্থায় দেহসম্বন্ধ হেতু কর্মজনিত সুখদুঃখাদিও আত্মার হয় না। যদি কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নাই থাকে, তবে আর সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় কার ?

একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে এতই যদি নির্বিকারী হয় পুরুষ যিনি কেবল সাক্ষীমাত্র ও অনুমন্তা, তবে এই সুখ দুঃখ এর অস্তিত্বকে, উপলব্ধি ও অনুভবকে কি বলপূর্বক অস্বীকার করা ?

উত্তরে বলি, পুরুষের সংসারই নেই। প্রকৃতির অবিবেকবশতঃই পুরুষের সংসার। প্রকৃতির কার্যরূপ এইদেহে থেকেও পুরুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক। প্রকৃতির কাজে তাঁর যোগ নেই। তিনি কেবল সাক্ষীমাত্র, অনুমন্তা, সন্নিধিমাত্রেই অনুগ্রাহক অর্থাৎ কাজে প্রবৃত্ত না হয়েও অত্যন্ত সমীপবর্তী বলেই অনুমন্তা। যেহেতু তাঁর অস্তিত্ব ব্যতীত, সত্তা ব্যতীত, দেহ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্ফুর্তি বা পুষ্টি হতে পারে না এজন্য তিনি ভর্ত্তা, যেহেতু বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত সুখদুঃখাদির উপলব্ধা এই অর্থে ভোক্তা। আসলে আত্মার সুখদুঃখাদি দেহধর্ম নাই, এই প্রকৃতিসঙ্গ হেতু আত্মার কর্ত্তত্ব ও সুখদুঃখভোগ প্রতীতি হয় মাত্র। এটাই বিভ্রম ও চরম ভ্রান্তি ও মায়া (illusion) একেই অধ্যাস বলে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের জন্যই এরূপ বোধ হয়ে থাকে। "ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগদ্ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ"।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে জন্ম রহিত ও অবিকারী পুরুষের ভোক্তৃত্ব হয় কিভাবে ? আবার জন্মই বা হয় কিভাবে ?

আবারও বলি, যেহেতু পুরুষ প্রকৃতির কার্যরূপ দেহে অবস্থিত, এইজন্য প্রকৃতিজাত গুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ আদি ভোগ করে থাকেন। এতো গেল ভোর্ক্তৃত্ব। জন্মের কথায় বলি পুরুষের সদ্‌সৎ যোনিতে যে জন্ম হয়, শুভাশুভ কর্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সাথে সঙ্গ অর্থাৎ তাদের সাথে তদাত্ম্য সম্বন্ধের কারণেই হয়ে থাকে। অতএব বলা যায় যে প্রকৃতির গুণসঙ্গ হেতুই সংসার প্রপঞ্চ হয়। সংসার প্রপঞ্চের পরিণতিই দেহাত্মবুদ্ধি। জীবের দেহাত্মবুদ্ধিই তার বন্ধনরজ্জু। এই দেহাত্মবুদ্ধির জন্যই জীব চিদ্‌বিমুখ হয়ে অনন্ত দুঃখকে বরণ করে নেয়।

গীতার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতা

আগেই বলা হয়েছে মানুষের দেহাত্মবুদ্ধিই তার বন্ধনরজ্জু ও সর্বদুঃখের কারণ। অজ্ঞতানিবন্ধন এই দুঃখ হতে মুক্তিলাভের জন্যই মন্ত্রের সাধনা। মন্ত্রশক্তির সম্যক জ্ঞানই ঋষিগণের আবিষ্কারের ফল। যে মহানুভব পুরুষ ধ্যানস্থ হয়ে মনের মননত্বকে নাশ করতে পেরেছেন এবং বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাঁদের ধ্যানমগ্নতার কাছে এক একটা করে মন্ত্র ধরা দিয়েছে। যাঁর কাছে যে মন্ত্রশক্তি সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হয় তিনি সেই মন্ত্রে সিদ্ধ। অর্থাৎ সেই মন্ত্রশক্তির প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষ।ঋষি অর্থে অবশ্য আমরা তাঁদের সকলকেই বুঝি যাঁরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সমস্ত ভোগবাসনাকে উপেক্ষা করে জ্ঞানপথে গমন করেন। কিন্তু শ্রুতিসিদ্ধ ঋষি তাঁরাই হন যাঁরা সিদ্ধিলাভ করে আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন। এমন এক একজন সিদ্ধ ঋষিই বেদমন্ত্রের স্রষ্টা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলিও এরূপ কৈবল্যদায়িনী মন্ত্রশক্তির দ্বারা পূর্ণ। এগুলোর একটা অন্তর্মুখী শক্তিও আছে যার দ্বারা আমরা বাঁধা পড়িনা বরং আমাদের বন্ধন মোচন হয়, যে বাক্যের মধ্যে বন্ধনমোচনকারী শক্তি আছে তাই হল মন্ত্র অর্থাৎ যা কিছু মনকে ত্রাণ করে। সেই সকল মন্ত্রের দীক্ষা আছে, সাধনা আছে, উপযুক্ত গুরুর নিকট হতে সে সকল মন্ত্রের সাধন কৌশল জেনে বুঝে নিয়ে সাধনা করতে পারলেই জীবন কৃতকৃত্য হয়ে যায়। সারমর্ম এই যে দেহাত্মবুদ্ধির কারণে নিজের সম্যক পরিচয় অজানাই থেকে যায়। চিন্তা ভাবনা সকলই বিপরীতমুখী হয়। ফলতঃ আত্মজ্ঞানলাভে চরম অনীহা তৎসহ বস্তুবাদ/জড়বাদ বা ভোগবাদের দ্রুত প্রসারলাভ আত্মতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানচর্চার প্রবণতাকেও দ্রুত ধংস করে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় জীবন ও মৃত্যু চক্রের এই যে যন্ত্রাণার গোলকধাঁধা এ থেকে মুক্তির প্রেরণা তথা স্পৃহার সঞ্চার করতে পারে একমাত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। পাশ্চাত্য দার্শনিক রমা রল্যাঁর (Roma Roland) মতে আমরা যাকে বা যে জিনিষটাকে ভালবাসি সেদিকেই আমাদের মন পড়ে থাকে, আমাদের মন যখন সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাবার জন্য ইচ্ছুক হবে, একান্ত উন্মুখ হবে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করবে তখনই তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ় হবে। শাস্ত্রপাঠে যে সামান্য জ্ঞান লাভ হয় ও সেই সামান্য জ্ঞানের দ্বারা যা কিছু বুঝি তা কিছুই নয়। অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত সকল জ্ঞানই অজ্ঞানমাত্র।

একমাত্র রাজনৈতিক সংস্রবমুক্ত অন্য সকল জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণের সকলেই এই অপরোক্ষানুভুতির অধিকারী ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নিবাসী বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু এবং খুলনা নিবাসী প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই আচার্য্যগণের উভয়েই পারিবারিক সুত্রে গীতানুরাগী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহাও প্রভূত পরিমাণে গীতানুরাগী ছিলেন। বিশেষভাবে গীতাগ্রন্থের বিশারদ না হয়েও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণও অনুরূপ অপরোক্ষানুভুতির অধিকারী ছিলেন। গীতাপাঠ ও গীতার তত্ত্বসমুহের অনুধ্যান ও মনন যে মানুষের এই অপরোক্ষানুভুতিলাভের সহায়ক এতে কোনও সন্দেহ নাই। নিয়মিত গীতাপাঠ মানুষের অশান্ত চিত্তকে যৎপরোনাস্তি শান্ত করে এটা অতি বাস্তব সত্য।

সর্বোপরি গীতাগ্রন্থখানি হল আত্মজ্ঞানের তাত্ত্বিক (Theoritical) আলোচনা অর্থাৎ যোগশাস্ত্র। এর ব্যবহারিক প্রয়োগ হয় প্রশিক্ষকের মাধ্যমে। প্রয়োগ (Practical) করার জন্য প্রয়োজন এক সুদক্ষ প্রশিক্ষক। শ্রী গুরুদেব হলেন এই প্রশিক্ষক যিনি নিজ আত্মশক্তির প্রয়োগদ্বারা শিষ্যের মধ্যে স্ফূরণ

করেন এক বিশেষ শক্তির যার নাম অধ্যাত্মশক্তি। গুরু প্রদর্শিত পথে অভ্যাসযোগ অবলম্বনে সাধন করে শিষ্য সাধনায় উন্নতি লাভ করে ত্রিতাপজ্বালামুক্ত হয়ে কৃতকৃত্য হন। গীতাগ্রন্থ আত্মজ্ঞানলাভের তত্ত্ব।

গীতার ধারণা, গীতা কি ?

আগেই বলেছি যে গীতা একখানি সম্পূর্ন যোগশাস্ত্র, সকল উপনিষদের সার ব্রহ্মবিদ্যা। এর প্রমাণ প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে। "... ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" ইত্যাদি।

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন,

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবিৎ।।"

অর্থাৎ এই 'যোগ' (যোগবিদ্যা) ভগবান সূর্য্যকে বলেছেন, সূর্য্য মনুকে বলেছেন ইত্যাদি।

অর্থাৎ গীতা পরম্পরাপ্রাপ্ত যোগশাস্ত্র যা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখনিঃসৃত।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যাকিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ-বিনিঃসৃতা।।

এটা অবশ্যই ভগবদ্বাক্য এবং ভগবানকে মানুষ মনে করা মূঢ়তা। ৯ম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্"

মহাভারতের সমগ্র মূলগ্রন্থ নেই কারণ বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের সকল ধর্মগ্রন্থই বিনষ্ট হয়। অবশিষ্ট যেটুকু ছিল মুসলমান আমলে সেটুকুও বিলুপ্ত হয়। কেবলমাত্র যেটুকু শ্রুতিমাত্র সেইটুকুই ছিল। শ্রুতি অর্থাৎ যেটুকু মুখে মুখে ছিল শুধুমাত্র সেটুকুই নষ্ট হতে পারে নাই। পরবর্তীকালে কথক ঠাকুরদের পুঁথি হতেই মহাভারত সংগৃহীত হয়েছিল।

গীতায় ভগবান আরও বললেন পরম্পরালব্ধ এই যোগবিদ্যা পরম্পরাপ্রাপ্ত এবং কালের প্রভাবে এই যোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

"এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।"

নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জেনেছিলেন, হে পরন্তপ, ইহলোকে আমাকর্তৃক উপদিষ্ট সেই যোগ কালবশে বিচ্ছিন্ন (নষ্ট) হয়েছে কেননা এই মহামূল্যবান যোগবিদ্যা গুরুমুখী বিদ্যা, পড়ে বা শুনে হয়না, একজনের নিকট পেতে হয়। লিপিবদ্ধ করাও যায় না, কারণ যা মুখে বলবার নয় তা লেখাই বা যাবে কি করে ? নিজে করে জানতে হয়, এটাই হল গীতার ব্যবহারিক (Practical) অংশ, গুরুমুখীবিদ্যা, যা একজনের নিকট পেতে হয়, এটাই হল যোগচক্ষু। যোগচক্ষুস্মান্ ব্যক্তি আপনার শরীরের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মান্ডের প্রতিবিম্ব দেখতে পান। মনুষ্যদেহকে বিরাট ব্রহ্মান্ডের একটি ক্ষুদ্র আদর্শ বলে চিনতে পারেন।

বস্তুতঃ বিরাটে ও দেহব্রহ্মান্ডে যেমন পরিমাণগত তারতম্য ছাড়া অন্য কোন প্রভেদ নেই, তেমনই গীতা সম্বলিত কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের ঘটনা এবং বিরাট ব্রহ্মান্ডের মুক্তির দিকে বিরাট গতি ও জীবমাত্রের ব্যক্তিগত মুক্তিপথে সঞ্চারণ - এ তিনেও কোনও প্রভেদ নেই।

বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ধরণীতে অবতীর্ণ হ'য়ে দেহরূপ এই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে এমন একটি অপুর্ব লীলা দেখিয়ে গেছেন যা প্রত্যেক পরমাণুতে ব্যষ্টিভাবে এবং সমগ্র ব্রহ্মান্ডে সমষ্টিভাবে অভিনীত হ'য়ে চলেছে। জীব ধীরে ধীরে যেভাবে মুক্তির দিকে এগিয়ে চলে, সমগ্র ব্রহ্মান্ড যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, সাধকপ্রবর অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্ররূপ আদর্শ রণাঙ্গনে, আদর্শ পুরুষ, তারই একখানি আদর্শ ছবি দেখিয়ে গিয়েছেন মাত্র। আর এটাই হ'ল গীতা।

বেদের সার উপনিষদ, উপনিষদের সার গীতা। গীতা নিত্য ও অপৌরুষেয়। অনাদিকাল ধ'রে অনাদি হৃদয়ে উচ্ছসিত। যেখানে জীব, যেখানে মুক্তিবন্ধনরূপ জীবন মরণ সংগ্রাম, সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব, সেখানেই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি। সেখানেই গীতা ভগবৎকণ্ঠে ধ্বনিত শ্রীভগবানের মুখের আশ্বাসবাণী। প্রত্যেক জীবাত্মার হৃদয়ে থেকে সেই বিরাট বিশ্বসারথী, বিশ্বকল্পনা বা মায়ার ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে বিরাট করে তুলেছেন। জীবকে নিজের এই স্বরূপ বোঝাবার জন্যই সৃষ্টিচক্র কল্পিত। এরই নাম বিশ্বরচনা।

ভগবৎলাভের জন্য প্রকৃত ব্যাকুল হলে ভগবান তাকে তারই হৃদয়াভ্যন্তরে থেকে যে যে প্রকার কর্মস্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে আপন সত্ত্বায় মিলিয়ে নেন সে কথাই বলেছেন। বাস্তবিক গীতার মত অপুর্ব গ্রন্থ আর নেই, সমস্ত শাস্ত্রের সার ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আত্মা যতক্ষন নিজের নিত্যত্ব, বিশালত্ব, অপরিণামত্ব, ও একত্ব (Unity) না বুঝতে পারে ততক্ষণই তার জীবভাব। এরই সাধারণ নাম মায়া বা ভ্রান্তি। বুঝতে পারলেই জীব শিবত্ব লাভ করে। এরই নাম মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে বন্ধন বা মুক্তি বলে কিছুই নেই। এই অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞানময় অবস্থায় যেতে হলে যে যে স্তর দিয়ে যেমন যেমন করে যেতে হয় সে সকল পথ, পদ্ধতি তথা প্রয়োগ কৌশলের নামই যোগসাধনা। আর এই যোগকৌশল সংক্রান্ত কর্মকান্ডেরই বর্ননা করা হয়েছে এই গীতাগ্রন্থে।

" তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগকর্ম্মসুকৌশলম্ ।"

গীতার শব্দার্থ বা শ্লোকগুলো কণ্ঠস্থ করে রাখলে গীতা সমন্ধে সামান্য বাহ্য জ্ঞান হয় মাত্র। আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে আত্মকর্মরত সাধক সাধনায় যেমন যেমন অগ্রগতিলাভ করেন, গীতার অভ্যন্তরীণ অর্থও তিনি ততটুকু বুঝতে পারেন। এ হল আসলে কৃষ্ণ ও অর্জুন, গুরুশিষ্য কল্পনাক্রমে আত্মবিদ্যার উপদেশ। মহাজ্ঞানী পন্ডিত ও উচ্চকোটীর সাধক সাধিকাগণ এর কিছু কিছু বুঝতে পারেন। গীতাতেই বলা হয়েছে,

কৃষ্ণঃ জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তিসুতঃ ফলম।
ব্যাসো বা ব্যাসোপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহর্থ মৈথিলঃ।।

অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই এর মর্ম সম্যক জ্ঞাত আছেন। এছাড়া ব্যাসদেব, তাঁর পুত্র শুকদেব, অর্জ্জুন, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক গীতার মর্ম কিছু কিছু জানেন। অর্থাৎ গীতায় বর্নিত এই যোগরহস্য যোগী ব্যতীত সাধারণ মানুষ কখনই জানতে পারেন না। সুতরাং যোগপথ অবলম্বন না করে অন্তর্লক্ষ্যের কথা অগ্রাহ্য করা অথবা তাতে অনাস্থা প্রকাশ করা নিতান্ত ধৃষ্টতা ও নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। জড়বাদী ও ভোগবাদীগণ যদৃচ্ছা বস্তুবাদের প্রচার এবং আত্মতত্ত্বের বিরোধিতা করুন, দুঃখ নাই। কারণ কলিতে ভোগবাদ বা বস্তুবাদ প্রাধান্য লাভ করবে এতে সন্দেহ নাই এবং জনমানসে আধিপত্য করবে ভোগবাদ অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন, বন্টন ও বিপণন ইত্যাদি অপরাবিদ্যা, আর এই ভ্রান্তিমোচনের চেষ্টামাত্রও করা উচিত নয় কারণ তাতে নেমে আসবে বিপর্যয়। কলিতে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে ভোগবাদে। ভোগেই তাদের শান্তি, তাদের আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রে থাকে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ও বন্টন। আধুনিক পন্ডিত লেখক Victor Hugo বলেছেন, " An

invansion of an army can be resisted, but not an opinion whose time has come." সুতরাং কালের এই প্রবাহকে রুদ্ধ করা যাবেনা এবং মানুষের অবক্ষয় বহুগুণিত হয়ে মানুষকে শোচনীয় ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত করবে। সম্পুর্ণ নাস্তিক তবুও ভাল, কারণ তাঁরা মানুষের ক্ষতি সাধন করেন না। প্রকৃত নাস্তিক বরং কিছুটা শ্রদ্ধার পাত্র, কারণ তাঁরা একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকেন যা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মাত্র। অপরপক্ষে বিশ্বাসীও নই আবার অবিশ্বাসীও নই এমন গোছের কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেরাও ঠকেন এবং অপরকেও ঠকিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। এঁরা সুস্থ ও স্বাভাবিক সময়ে প্রচন্ড বস্তুবাদী আবার একটু চাপে বা প্রতিকূল অবস্থায় পড়লেই রীতিমত ভক্ত ও ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এরা মুখে সর্বধর্ম সম্বন্বয়ের কথা বলেন। যেন তেন প্রকারেণ নিজেকে প্রগতিশীল প্রতিপন্ন করতে মরিয়া হয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা নিজের সুখ সুবিধার অথবা ভোগের বৃত্তের বাইরে কিছুতেই নেই। এঁরাই বিপজ্জনক নিজের পক্ষে, পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে, এককথায় বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের ক্ষেত্রে। এঁরা চুড়ান্ত ভোগবাদী ও ভোগবাদের বিকৃত প্রচারক। কিন্তু সে অন্য কথা। আমরা প্রকৃত বিষয় হতে অন্যত্র, অনেক দূর চলে এসেছি, মূলকথা ছিল ভোগবাদ বা জড়বাদ চৈতন্যের সম্পূর্ন বিপরীত ও আত্মবাদের পরিপন্থী, অতএব পরিত্যজ্য। রহস্যে ভরা এই সৃষ্টি যোগমন্দির ব্যাতীত অন্য কিছু নয়। প্রতিটি অণু পরমাণু এর সাধক, বিরাট বিজ্ঞানময় পুরুষ এর দেবতা। যোগের অর্থ-বিরাট জ্ঞানময় পুরুষে যুক্ত হওয়া বা নিত্যযুক্ততার উপলব্ধি হওয়া। তাই ক্ষুদ্র কীটাণু থেকে শুরু করে সিদ্ধর্ষি পর্য্যন্ত সকলেই এক চিদঘন, বিজ্ঞানময় যোগেশ্বরের সাথে সংযুক্ত হবার জন্য, একত্বলাভ করার জন্য, তাঁরই শক্তির মঙ্গলময় আবর্ত্তনের তালে তালে ঘুরে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁরই সাথে সংযুক্ত হবার জন্য, একত্বলাভ করার জন্য, তাঁরই ঈঙ্গিতে, তাঁরই শক্তির আকর্ষণে, স্রোতে তৃণের মত তাঁরই দিকে চলেছে। উঠছে, পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ফুটে উঠছে। হর্ষে, বিষাদে, স্মরণে, বিস্মরণে, জ্ঞানে, বিকাশে, জাগরণে, সুষুপ্তিতে, স্হিতিতে, লয় এ, এইভাবে জীবমন্ডলী যুক্ত হতে চলেছে। বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, বিশ্রান্তি নেই বুঝিবা এই মহাযোগের অবসানও নেই। এই যে গতি এরই নাম যোগ সাধনা। মনুষ্য জন্মই এ অবস্থার শেষ সীমা। যখন মানুষ হই তখন সেই বিরাট যোগেশ্বরের আকর্ষণ অনুভব করি। আর অপেক্ষা করতে না পেরে ভগবদালিঙ্গনে বদ্ধ হবার জন্য কেঁদে উঠি, সাধারণ কথায় এটাই যোগের প্রথম সূচনা বা যোগজ্ঞানের প্রথম বিকাশ। এই স্থুল অবস্থা

থেকে যে যে ভাবান্তরের ভিতর দিয়ে ভগবান জীবকে আকর্ষণ করেন সাধারণ কথায় এটাই "যোগ" বলে উল্লিখিত হয়। শুধুমাত্র অনন্য চিত্ত হয়ে তাঁর শরণ নিতে পারলেই এইখান থেকে তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে তীর্থ প্রদর্শকের মত অনন্ত ঐশ্বর্যভান্ডার দেখাতে দেখাতে এবং মধুর স্বরে বলতে বলতে নিয়ে যান –

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ।।"

এখান থেকে তিনি যা কিছু বলে থাকেন, করে বা করিয়ে থাকেন তাই গীতা।

গীতার গূঢ় অর্থ একমাত্র তিনিই অবগত হতে পারেন যিনি বহু ভাগ্যবলে সদ্‌গুরু ও সৎপথ পেয়েছেন। কেবলমাত্র তিনিই অধ্যবসায় ও পুরুষকার দ্বারা সাধনমার্গে উন্নতির সাথে সাথে সেই গূঢ় মর্ম নিজে নিজেই অবগত হতে পারেন।

"সদ্ গুরু সেবা করি জানিবে সে সব।
গ্রন্থ পাঠে সেই তত্ত্ব জানা অসম্ভব ।।"

সাধনার প্রথমাবস্থায় যত্নপূর্বক সাধনা করলেও মনের মধ্যে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নের উদয় হতে থাকে কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ ভাবে সাধনা করতে করতে যখন তাঁর আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখন আপনা আপনিই ঐ সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের মীমাংসা নিজের মধ্যেই হয়ে থাকে। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে --

যোগী তাহি জানিয়ে যো গীতাহি জানিয়ে।
যো গীতাহি জানিয়ে যোগী তাহি জানিয়ে।।

গীতার শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান নিজমুখে ব্যক্ত করেছেন –

" গীতা মে হৃদয়ং পার্থ
গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমুত্যুগ্রং
গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম ।।
গীতা মে চোত্তমস্থানম্
গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং।
গীতা মে পরমোগুরুঃ।।"

গীতার (সাধারণ) সূচনা

ভগবৎলাভের জন্য প্রাণের বিষাদময় ভাব থেকে শুরু করে সংযুক্তভাব অবধি গীতা। এই বিষাদ থেকে সূচনা করে মুক্তি পর্য্যন্ত যে যে ভাব পরম্পরা দ্বারা জীব পরিচালিত হয়, গীতায় তাইই এক একটি যোগ নামে অভিহিত হয়েছে। জেনে ও বুঝে রাখো যে এই মহাভাবরূপ আকর্ষণশ্রেণী বাঙ্ময় হয়ে মানুষের হৃদয়ে পর পর প্রতিধ্বনিত হয়। যখন জীব শুনতে পায় তখনই সে বুঝতে পারে যে তার আর দেরী নেই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ

প্রারম্ভ ঃ

অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।
গুরু-র্বিশেশ্বর সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্।।
শ্রী হয়গ্রীবায় নম ঃ
শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্ ।
প্রসন্নবদনং ধায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।।
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্ ।
পরাশরাত্মজষ্টেং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ।।
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বশিষ্ঠায় নমে নমঃ।।
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরি ঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।।
ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ
হরিঃ ওঁ

(গীতার ধ্যান)

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবার্ষিণীং ভগবতীমষ্ঠাদশাধ্যায়িনীম্ ।
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদগীতে ভবদ্বেষিণীম্ ।।১
নমোহস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।।২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।।৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম্ ।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।।৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামা - বিকর্ণ - ঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পান্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ।।৬
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক কেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে।।৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়েতে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ।। ৮
যং ব্রহ্মা বরুনেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিবৈঃস্তবৈর্বেদৈঃ
সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।। ৯
(ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতা মঙ্গলধ্যানং সমাপ্তম্)

গীতা প্রশস্তি

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈ ঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ- পদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।
যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমানপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ।।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলক্যনাথো।।

গীতার রূপক

মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছেন,

" বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।"

শুধু মহাভারতের কথাই বা বলি কেন ধর্ম্মজগতের সকল শাস্ত্রগ্রন্থই দ্ব্যর্থবোধক, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলেই মনে হয়। এই দ্ব্যর্থব্যঞ্জনার একটি হল বহির্লক্ষ্য অপরটি অন্তর্লক্ষ্য। অর্থাৎ স্বল্পবুদ্ধি মানবের জন্য বহির্লক্ষ্যের অর্থবিশিষ্ট এবং সাধন পথের পথিকের জন্য অন্তর্লক্ষ্যবিশিষ্ট যোগের গূঢ়মর্ম্মবিশিষ্ট। এই গূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়ার উপায়ও শ্রীভগবান এই গীতাতেই নির্দ্দশ করেছেন,

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। অপর গ্রন্থেও পাই, "সেবা, বন্দনা, দীনতা তিনসে সহজে মিলায়ে গোঁসাই।"

একমাত্র সদ্গুরুর উপদেশেই সাধনমার্গে উন্নতিশীল সাধক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অর্থসকল উপলব্ধি করতে পারেন।

স্বয়ং ব্যাসদেবও বলেছেন,

'রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরার্দুরীকৃতা যন্ময়া।'

ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ ! তদবিকলতাদোষোত্রয়ং মৎকৃতং।।"

অর্থাৎ "তুমি রূপবিবর্জিত, আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, সেই তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত । অমি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি, হে জগদীশ ! মৃৎকৃত এই তিনটি বিকলতা দোষ ক্ষমা কর।" এখানে ব্যাস নিজেই স্বীকার করেছেন যে যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে তিনি বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে কল্পনার দ্বারা হাত পা ওয়ালা মানুষরূপী বর্ণনা করে দোষ করেছেন । এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে আমাদের সকল শাস্ত্রই রূপকে আবৃত, সুতরাং সেই রূপক না ভাঙলে, না বুঝলে তার প্রকৃত তাৎপর্য্য জানা যায় না, বোঝাতো যায়ই না। আর একারণেই মানুষের মনে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি এত অবহেলা অবিশ্বাস। বলে, ' রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম আর শাস্ত্র, কৃষ্ণ ষোল হাজার গোপীর সাথে লীলা করলেন তাতে তাঁর পাপ হল না আর যত দোষ আমাদের বেলায় ।'

ভবিষ্যৎপুরাণে আছে --

"শাস্ত্রার্থ তত্ত্বহীনাশ্চ স্বয়ং পন্ডিত মানিন
তত্ত্বার্থ বিপরীতেন শাস্ত্র ব্যাখা সতেচতৈঃ।
তেনলোকে ক্রিয়ালোপ শাস্ত্রলোপ ভবিষ্যতি
কল্পিতানি শাস্ত্রানি ভবিষ্যন্তি ততোভুবি।।
ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানহীনা সদাতে ব্রহ্মবাদিনঃ.... ....."

অর্থাৎ শাস্ত্রের তত্ত্ব ও মর্ম্ম না জেনে না ঝুঝে বিপরীত ব্যাখ্যা করবে, নিজেই নিজেকে পন্ডিত বলবে ফলে শাস্ত্র ও ক্রিয়াকর্ম লোপ পাবে আর কেবল মনের কল্পিত শাস্ত্র চালু হবে। ব্রহ্মতত্ত্ব না জেনে শুধু মুখে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলবে।

এমনকি এই গীতাতেই কেবল বহির্লক্ষ্যের অর্থে কিছু কিছু জায়গায় ভগবদবাক্যের বৈলক্ষণ্য ও বিরোধ দেখা যায়। অতএব গীতাপাঠের আগে এই রূপকার্থ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটা ধারণার চেষ্টা করি। শুরু থেকেই সাধকের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হতে থাকে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের সাথে সাথে নিজে থেকেই ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান যেভাবে হয়ে থাকে গীতায় রূপকচ্ছলে সে কথাই বলা হয়েছে। সাধনার শুরুতে প্রবৃত্তিপক্ষ, দশ ইন্দ্রিয় এবং তাদের প্রত্যেকের দশ প্রকার প্রবৃত্তি, (১০×১০) মনের (ধৃতরাষ্ট্রের) একশত ছেলে (দুর্যোধনেরা), সকলে মিলে সাধককে সাধনপথ থেকে নিরস্ত করার জন্য নিবৃত্তিপক্ষীয় পঞ্চতত্ত্বের (পঞ্চপান্ডবের) বিরুদ্ধে দেহরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্র) এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মন (ধৃতরাষ্ট্র) অন্ধ, সুতরাং তিনি দিব্যদৃষ্টি (সঞ্জয়কে) অর্থাৎ যিনি সম্যক রূপে জানেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছেন । শরীরের ভিতরের পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে নাভিপদ্মস্থিত তেজতত্ত্ব (অর্জ্জুন) জিজ্ঞাসা করছেন আজ্ঞাচক্রস্থ কুটস্থ চৈতন্য (শ্রীভগবান)কে যিনি সেই সমস্ত প্রশ্নেরই একে একে সমাধান করে চলেছেন। সংক্ষেপে এটাই হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য।

ধৃতরাষ্ট্র = মন, সঞ্জয় = মনের সম্যক গতি, অর্জ্জুন = তেজস্তত্ত্ব, শ্রীভগবান = কূটস্থ চৈতন্য,
যুধিষ্ঠির = স্থিরত্ব, ভীম = বায়ু তত্ত্ব, নকুল = অপতত্ত্ব (জলতত্ত্ব), সহদেব = ক্ষিতিতত্ত্ব,
দ্রৌপদী = শীগ্রগতি (অহং এ আবর্ত্তিত গতি সম্পন্ন ঊর্দ্ধ বা অর্ন্তমুখী ইচ্ছাশক্তি) দ্রুপদ = অন্তর্যামিত্ব শক্তি সম্পন্ন শীঘ্রগতি (ALU of Computer) ভীষ্ম = ভয়, দ্রোণাচার্য্য = জেদ ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড, কুন্তী = ইচ্ছাশক্তি, দুর্যোধন = কামরিপু, দুঃশাসন = কামশক্তি, গাণ্ডীব = মেরুদণ্ড, বাণ = 'ওঁ' কার।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রী পরমাত্মনে নম ঃ

হরিঃ ওঁ

প্রথমোহধ্যায় ঃ (১)

অর্জুন বিষাদযোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ -

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পান্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।১

বঙ্গানুবাদ - ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মৎপক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন ? ১/১

ব্যাখা - ধৃতরাষ্ট্র: যার দ্বারা রাষ্ট্র অধিকৃত সেই ধৃতরাষ্ট্র। বিশাল জগতে দুটো শক্তির ক্রিয়া চলছে। একটি আকর্ষণী শক্তি যা গীতারূপে হৃদয়ে মধুর ঝঙ্কার তোলে। অপরটি বিকর্ষণী, জীবাত্মাকে কিছুদিনের জন্য দূরে প্রক্ষিপ্ত করে, যা দেহরূপ রাষ্ট্রকে অধিকার করে থাকে এবং এর প্রত্যেক অণুতে অণুতে অহংজ্ঞান ফুটিয়ে তোলে। অতএব এখানে ধৃতরাষ্ট্র হলেন আমাদের ভিতরের " অহং "

ইত্যাকার মন এবং এই মন হল অন্ধ। কারণ বয়সবৃদ্ধি ও দেহবৃদ্ধির সাথে সাথে দেহ মধ্যে সঞ্জাত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মায়া, মোহ, কামনা, বাসনা, ক্রোধ, লোভ, শোক, তাপ ইত্যাদি দিয়ে গঠিত ও পরিপুষ্ট হয় এই মন। ক্রমে যখন মনোময় কোষ পূর্ণতা পায় সেখানে তার আমিত্ব ঘনীভূত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে এবং মনের মননকার্য্য শুরু হয়, তখনই বিরাট চৈতন্যময়ী আকর্ষণী শক্তির সাথে প্রতিঘাত শুরু হয়। এই মনের পূর্ণতা পেতে দীর্ঘ সময় লাগে, অপরিণত মনই শত্রু, আসল শত্রু। শিশুকালে শিশু পিতামাতার কথা শোনে তাই তার মঙ্গল হয়, একটু বড় হয়ে তার যখন “মন ” নামক Abstract এর অস্তিত্ব আসে সে তখন আক্ষরিক অর্থেই বিপথগামী হয়। যে বাপ মায়ের কথা এতদিন বেদবাক্যস্বরূপ সর্ব্বহিতকারী ছিল, তার প্রতি উদাসীন হতে শুরু করে। তার মনে বিভিন্ন বাক্য, মত, পথ ইত্যাদি প্রাধান্য পেতে শুরু করে ও তার শুদ্ধ চৈতন্য পার্থিব মালিন্যে আবৃত হতে শুরু করে। কামরূপী দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্ররূপী মনকে প্রভাবিত করে নিজের দুস্পরিণতি ডেকে আনে। এ একেবারে পরীক্ষিত সত্য। যাঁরা একটু ব্যতিক্রমী তাঁরাই জন্মার্জ্জিত সুকৃতি ভোগ করেন, অপরে নিয়তির ক্রীড়নক হয়ে পড়েন।

সঞ্জয় : সঞ্জয় কথার অর্থ যিনি সম্যক রূপে জানেন অর্থাৎ আমাদের সৎ চিন্তাশক্তি সঞ্চিত জ্ঞান ও স্মৃতি। বহু প্রচেষ্টা দ্বারা সঠিক মনোনিবেশের মধ্য দিয়ে সঠিক ভাবে প্রাণকর্ম করে মনকে আজ্ঞাচক্রে প্রথমে স্থির করে ধীরে ধীরে লয় করতে পারলে যে এক পরা চিৎশক্তির প্রকাশ ঘটে, সেই শক্তিই দিব্যদৃষ্টি। অর্থাৎ সম্যকভাবে ইন্দ্রিয়ের জয় হলে যাঁর প্রকাশ ঘটে (দিব্যদৃষ্টি) অথবা এভাবেও বলা চলে যে সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হতে মনের স্বতঃ রোধ হলে আকাশতত্ত্বে স্থিতির দ্বারা সমস্ত প্রশ্নের / সমস্যার মীমাংসা / সমাধান (Solution) আপনা আপনিই হয়ে থাকে। এই দিব্যদৃষ্টি বা সৎ চিৎশক্তি নামক অদ্ভুত শুদ্ধচেতনাই (Supersense) সঞ্জয়।

ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র : ক্ষেত্র শব্দের অর্থ ভূমি বা স্থান। ধর্ম্মক্ষেত্র হল ধর্ম্মসাধনা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান অথবা ধর্ম্মাচরণ করার জায়গা। এখন প্রশ্ন সেই জায়গাটা কোথায় ? সেই জায়গাটা এখানে বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্র। ‘ধৃ’ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যে চৈতন্যময়ী শক্তি সৃষ্টিরূপ, অনন্তকোটী ব্রহ্মমন্ডলকে সৃজন ও ধারণ করে আছেন তিনিই ধর্ম্ম। ধর্ম্মপালনের অর্থ কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা জীব হৃদয়ে ঐ চৈতন্যময়ী শক্তির পুষ্টি ও বিবর্ধন তৎসহ তদ্বিরোধী শক্তিসমূহের বিনাশ করা‘কৃ’ ধাতুর অর্থ করা। যে ক্ষেত্রে‘কুরু’ অর্থাৎ “কর, কর” রব প্রতিধ্বনিত তাই কুরুক্ষেত্র। মানুষের প্রবৃত্তি অহর্নিশ মানুষকে কুরু, কুরু বলে কর্মে নিযুক্ত করছে। কুরুপক্ষের দ্বারা বা প্রবৃত্তির দ্বারা জীবহৃদয় অধিকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রের উপর প্রবৃত্তির পূর্ণ অধিকার। ‘কুরুক্ষেত্র’ শব্দের অর্থ যেখানে কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয় অর্থাৎ কাজের জায়গা। তাহলে ধর্ম্মক্ষেত্রই হ’ল কর্ম্মক্ষেত্র। প্রশ্নটা থেকে গেল যে ধর্ম্মক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র বটে কিন্তু জায়গাটা কোথায়? প্রশ্নের মীমাংসা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিজেই করে দিয়েছেন। বলেছেন “ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।” অর্থাৎ এই

শরীরই হ’ল একাধারে ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র। যদিও জীব মাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্র অহর্নিশ উত্তেজিত হয় কিন্তু মনুষ্য হৃদয়েই তার পূর্ণ বিকাশ। অন্যান্য জীবদেহে ইন্দ্রিয়সকল পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত নয় বলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাও পূর্ণভাবে হতে পারে না। মনুষ্যহৃদয়ই জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ণ মিলনের লীলাভূমি। শরীরই হ’ল একাধারে ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র। এই শরীরের মধ্যেকার দুইপক্ষ অর্থাৎ অন্ধমনের অনুসারী কামান্ধ ও রাগান্ধ বিষয়সকল, কৌরবপক্ষ অর্থাৎ ভোগাসক্তি, কাম বা আসক্তিজনিত কর্ম্মের কারক/কর্তাগণ এবং এদের বিরুদ্ধে স্থিত পাণ্ডবপক্ষ, কুন্তীর পঞ্চপুত্র যথাক্রমে যুধিষ্ঠির: বিশুদ্ধাক্ষ (ব্যোমতত্ত্ব), ভীম: অনাহত (মরুৎতত্ত্ব), অর্জ্জুন: মনিপুর (তেজস্তত্ত্ব), নকুল: স্বাধিষ্ঠান (অপ/জলতত্ত্ব), সহদেব : মূলাধার (ক্ষিতিতত্ত্ব)। এঁরা সকলেই হলেন কুন্তির পুত্র, যে কুন্তি হলেন সাধনের প্রবল ইচ্ছা বা সাধনের ইচ্ছাশক্তি। এক কথায় বলা যায় যে অন্ধ মোহগ্রস্থ মানবের মন, অহং ইত্যাকার মন সৎচিৎশক্তির (দিব্যদৃষ্টি) কাছে ভোগাসক্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষ এবং নিরাসক্তি অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে চাইছে। এই অবস্থা সাধকের সাধনার শুরুর প্ররম্ভেই ঘটে থাকে। সাধনার শুরুতে যা ঘটে। আকাশে তড়িৎ শক্তি যেমন বিদ্যুতাকারে ঝলসে উঠে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় তেমনই আকর্ষণী বিকর্ষণী শক্তি গুরুপ্রদত্ত শক্তির ঘর্ষণে ক্ষণপ্রভা হলেও কিঞ্চিদধিক এই শরীরেই স্থায়ী হয়। এটাই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গুরুশক্তির লাবণ্যময় রূপতরঙ্গ। সাধক যদি এই কুরুক্ষেত্র বুঝতে চাও, একবার স্থির চিত্তে নয়নমুদে উপবিষ্ট হও, ভাব এক বিশাল আকাশ ব্যাতীত আর কিছুই নাই - এই ভেবে সবকিছু ইষ্টকে সমর্পণ করে দাও। কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে।

সমবেতা যুযুৎসব : যুদ্ধেচ্ছু হয়ে সমাগত। মামকাঃ প্রবৃত্তিপক্ষ বিকর্ষণী শক্তি। আগেই বলেছি পাণ্ডব : নিবৃত্তিপক্ষ, আকর্ষনীশক্তি, প্রণব, নিবৃত্তি এসব একই কথা। আত্মশক্তি শরীরস্থ পাঁচকোষে বিভক্ত। সাধারণ কথায় পঞ্চপ্রাণ, তার মধ্যে যে অংশটুকুর নাম প্রাণ, জীবের আত্মশক্তি তাতেই পূর্ণভাবে বিরাজিত। এজন্য জীবাত্মাকেই অর্জ্জুন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় : কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ মানে মন ও প্রাণের সংগ্রাম। মন আর প্রাণ খুব একটা বেশী আলাদা না হলেও আসলে প্রাণের বর্হিমুখী অবিদ্যারূপ সংস্কার উদ্ভূত সংকল্প - বিকল্পের কর্মময় গতিই মন। প্রাণশক্তি সংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রতিরোধ পেয়ে যে বহির্মুখী গতি পায় সেই বিকর্ষণী শক্তি থেকে যে সব সংকল্প বিকল্পরূপ বৃত্তি জন্মে সেটাই‘মন ’। মনের পেশা বা বৃত্তিই হল প্রবৃত্তি। যোগস্থ হয়ে ভগবানে যুক্ত হতে চাওয়া মানে চৈতন্য রাজ্যে ঐ প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা করা, যাকে বলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে গেলেই মনের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে মনের নাশ বা উচ্ছেদ হলেই পাণ্ডবের রাজ্যলাভ হয়, জীবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। নির্ব্বাসিত পাণ্ডবের মত প্রবৃত্তির ছলনায় জীব আত্মরাজ্য থেকে বঞ্চিত । কারণ ইন্দ্রিয়রাশি নিয়ে মন চৈতন্যরাজ্যের দখল নিয়ে বসে আছে, তোমাকে সূচাগ্রও দিচ্ছে না। ঐ মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেই তোমার অন্ধমন অন্ধপ্রবৃত্তি তোমার

সঞ্জয়, মানে সঞ্চয় অর্থাৎ সঞ্চিত কোষ ও স্মৃতিকে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, সেখানে পঞ্চপ্রাণ এবং মনরূপী পাণ্ডব এবং মনরূপী দুর্যোধনের কুরুপক্ষ কি করল ? ভগবান প্রত্যেক জীবকে মুক্তির পথে নেওয়ার জন্য জীবাত্মার সারথি হয়ে তাকে নিয়ে যান। এই যে নিয়মে জীব মুক্ত হয়, জ্ঞানী চোখ তার ভিতরে যে নিয়ম প্রত্যক্ষ করে, সেটাই কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলী। আর প্রাণ হচ্ছে সেই আকর্ষণী শক্তি বা প্রণব বা প্রাণশক্তি। ১/১

সঞ্জয় উবাচ -

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আর্চায্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।। ২

অনুবাদ : সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবসৈন্য ব্যুহিত দেখিয়া তখন রাজা দুর্য্যোধন আর্চায্য সমীপে গমন করিয়া কহিলেন।। ১/২

ব্যাখা : দিব্যদৃষ্টি বা দিব্যজ্ঞান অন্ধমনের উদ্দেশ্যে বললেন যে দুর্মতিরূপ কামনা বাসনা (দুর্যোধন) পঞ্চতত্ত্বের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) আত্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যুদ্ধে অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মে লিপ্ত বা যুক্ত হওয়া দেখে জেদের বশবর্তী (দ্রোণাচার্য্য,যা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই পক্ষেই থাকে কিন্তু নিবৃত্তিপক্ষে থাকতে পারলেই অধিকতর হিতকারী হয়) হলেন এবং বললেন– “দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং” : পাণ্ডবদের কিভাবে ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে দেখে অর্থাৎ ব্যূহ রচনা দেখে বা ব্যুহিত দেখে মানে পাণ্ডবপক্ষ কিভাবে ব্যুহিত হয় ? প্রাণশক্তির পঞ্চপ্রাণই পঞ্চপাণ্ডব। মানুষের শরীরের পাঁচরকমের স্নায়ু প্রবাহকেই পঞ্চ প্রাণ বলা হয়। সাধারণ অবস্থায় মানুষের প্রাণশক্তি নির্বাসিত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ যোগস্থ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ স্নায়ুপ্রবাহ রূপে থাকে। এইজন্যই “কলির জীব অন্নগত প্রাণ।” কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হলে প্রাণশক্তি গুলো কেন্দ্রে পুনরাধিকার লাভ করে। যেমন বায়ু সাধারণ অবস্থায় সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকে কিন্তু যোগস্থ হলেই ললাটে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু যোগস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত পঞ্চতন্মাত্রা (Five elements) রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ নিয়ে মন ললাটস্থ চক্রে বসে থেকে যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য সিংহাসন ভোগ করে। শুধু তাই নয় এই মন একমাত্র মূলাধার বাদে আর পাঁচটা চক্র থেকে পঞ্চপ্রাণ কে নির্ব্বাসিত করে নিজে চক্রগুলোকে ভোগদখল করছে । শুধুমাত্র মূলাধারে প্রাণশক্তির একটা অংশ স্বতঃক্রিয়াশীল যার নাম কর্ণ, পঞ্চপাণ্ডবের সহোদর প্রাণশক্তিরই অংশ কিন্তু দুর্যোধনরূপী মনের পক্ষে কাজ করে। তাই কর্ণের অঙ্গরাজ্য মূলাধার। অঙ্গরাজ্যের একটা অর্থ অন্যান্য অঙ্গের উপর মূলাধার অঙ্গ সমধিক কার্য্যকরী। পঞ্চপ্রাণশক্তি পঞ্চপাণ্ডব, একমাত্র দ্রৌপদী বা জীবের অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তির প্ররোচনাতেই আত্মরাজ্য ফিরে পান। উর্দ্ধমুখী গতির নামই দ্রুপদ। তার কন্যা বা অর্ন্তমুখী ইচ্ছাশক্তি দ্রৌপদী, তাই জীবকে উন্নতিলাভ করতে হলে দ্রুপদ রাজার লক্ষ্যভেদ করতে হয়। কেননা উন্নতির প্রধান উপাদান উচ্চলক্ষ্য। লক্ষ্যহীন জীবন পশুজীবন। এই অন্তর্গতি লক্ষ্যকরে ইচ্ছাশক্তি (দ্রৌপদী) কে সহধর্ম্মিনী রূপে গ্রহণ করতে হয়। উর্দ্ধলক্ষ্য স্থির হলে তবেই অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি লাভ হয়। দ্রৌপদী এসে গলায় বরমাল্য দেয়। এই ইচ্ছাশক্তিকে সমস্ত প্রাণের একান্ত প্রিয় করতে হয়। তাই পাঁচভাই মিলেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছিলেন এটাই সেই রহস্য, পঞ্চপ্রাণের সাথে অন্ত র্মুখী ইচ্ছাশক্তির মিলন। তাই যদি এই জীবনে উন্নতি করতে চাও তবে মীনরূপ ভগবানের দিকে তাকাও। উদ্যমরূপ ধনুকে কর্ম্মের শর যুক্ত করে তাঁর দৃষ্টির দিকে তোমার প্রাণের লক্ষ্য স্থির কর । কেননা তাঁর ঠিক নিচেই মায়া চক্র ঘুরছে। তিনি মায়াচক্রের উপরে আছেন। নিচে এই সংসার রূপ মায়া জলাধারে তাঁর মায়াচক্রেরই প্রতিবিম্ব পড়েছে। আর সেই মায়াচক্রের কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে তাঁর চক্ষু তোমার দিকে একভাবে চেয়ে আছে। সংসারাধারে প্রতিবিম্বিত সেই দৃষ্টিতে লক্ষ্য স্থির রেখে তোমার প্রার্থনা জানাও এই মায়াচক্রের আবর্ত্তনে তোমার কর্ম্মশর যেন ঠেকে না যায়, দেখবে সেই মৎস্যের উপরে ব্রহ্মরূপী গোপাল বা গোপালরূপী ব্রহ্ম আর্বিভূত। আর তখনই তোমার উদ্যম ধনুক থেকে কর্ম্মের তীর ছুটে মায়ারূপ সুদর্শন কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে মীনরূপী আত্মার দৃষ্টিতে যুক্ত হবে। তখনই সব কাজ ঈশ্বরের দৃষ্টির মধ্যেই হচ্ছে বলে বোধ হবে। আমাদের প্রাণপ্রবাহে আত্মারূপ ভগবান মীনরূপে বিচরণ করছেন। প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁর দিকে লক্ষ্য স্থির হয়। এই প্রাণায়াম বলতে আজকাল TV তে যেসব হঠযোগের প্রাণায়াম দেখায় সেরকম নয়। সেসব পরে বলার ইচ্ছে রইল। এভাবে বহু প্রার্থনা সাধনায় সেই দুর্ব্বার উর্দ্ধ বা অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি সাধনপথের সহধর্ম্মিনীকে পেয়েও সংস্কারাচ্ছন্ন মন আমাদের দিয়ে কিছু অঘটন ঘটিয়ে দেয়। এটাই দুর্য্যোধনরূপ দুর্মতিতে পাশাখেলা বা প্রাণকে ছলনায় ভূলিয়ে অকর্তব্য কাজে প্ররোচিত করা এবং দেহাভিমানরূপ দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও অপমান এবং সেকারণ ভীষণ প্রতিজ্ঞাই আত্মরাজ্য লাভের প্রধান কারণ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ (দ্রোণাচার্য্য): - ইনি শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড ও জেদ, মন, প্রাণ, কৌরব এবং পাণ্ডব উভয়েরই শিক্ষাগুরু। শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই কিন্তু সেই কর্ম্মসকল মনের ইচ্ছাতেই হয়। তাই মনের দাসত্বই তার স্বভাব। তাই দেখি উভয় পক্ষের গুরু হলেও তিনি দুর্য্যোধন অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষের সেনাপতি। সেই দুর্যোধনরূপী মন যেন জেদ ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড নামক মায়াবৃত্তির কাছে অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির বিশ্লেষণ করছে।

প্রবৃত্তি (দুর্য্যোধন) : প্রবৃত্তিকে জয় করাই দুঃসাধ্য তাই সে দুর্য্যোধন। মনোজয় সবচেয়ে দুরূহ। মনের শরীর লৌহময়। তাই জীবের হৃদয়ে দুস্প্রবৃত্তির একাধিপত্য। চঞ্চলতম মনের চলচ্ছক্তি রহিত করার কৌশলই ঊরুভঙ্গ করা, পা ভেঙ্গে দেওয়া। লৌহমনের মৃত্যুই চরণে, চঞ্চলতাকে বন্ধ করতে না পারা

পর্যন্ত সংগ্রাম। তাই ভীমরূপী কণ্ঠস্থ উর্দ্ধাভিমুখী উদানবায়ুর গদারূপ প্রাণ শক্তির সাহায্য চাই। গতিরূপী অহং এ আবর্তিত ইচ্ছাশক্তির উত্তেজনায় ভীমের গদাঘাতে উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধ শুরু কর। এবার আবার ফিরে আসি শ্লোকের ব্যাখ্যায়। এর পরবর্ত্তী শ্লোক দেখুন। ১/২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রানামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।। ৩

অনুবাদ : হে গুরো, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র কর্তৃক ব্যুহিত পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা অবলোকন করুন। ১/৩

ব্যাখা : হে গুরুদেব, পঞ্চতত্ত্বের সুবিশাল দল দেখুন। দেহস্থিত পঞ্চতত্ত্বকে জেনে সঠিক পথে সাধনার দ্বারা অনুকূল বৃত্তিসমূহ রক্ষিত হয়। ধীমান দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সংকল্প এবং কূটস্থের মধ্যে চিত্রবিচিত্র রূপ। দৃঢ়ঃসংকল্পেই পঞ্চতত্ত্বের সাধন হয়, এই সাধন দ্বারা কূটস্থ মণ্ডলের মধ্যে বিচিত্র জ্যোতির প্রকাশ ঘটে। এই জ্যোতিতে মন রেখে অনুসন্ধান করলে অনেক ঘটনার কথাই জানা যায়। দ্রুপদ হলেন অর্ন্তযামিত্বরূপ মনের দ্রুতগতি যার দ্বারা অনেক ঘটনাই অল্পক্ষণের মধ্যেই জানা যায়। কিন্তু সেটা দিব্যদৃষ্টি নয়। এটা একটা আধ্যাত্মিক শক্তি বটে। পঞ্চতত্ত্ব এই তেজের দ্বারাই সুরক্ষিত থাকে। এজন্যই দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সংকল্প-রূপ এই পঞ্চতত্ত্বদলের সেনাপতি। আর এই পঞ্চতত্ত্বের অবস্থান হল পূর্ববর্ণিত পঞ্চচক্রের মধ্যে। শাস্ত্রীয় সংকল্প প্রণালীর ভিতর আত্মশক্তি চালনার কৌশল আছে। এখনও পূজা, ব্রত এসব অনুষ্ঠানের আগে সংকল্প পাঠ করা হয়। কিন্তু সবই হয় প্রাণহীন মৃতদেহের মত। তাই এর দ্বারা দেবতার প্রকাশও হয় না, তিনি যজ্ঞভাগও গ্রহণ করেন না। শুধু বাক্যবিন্যাসই সার হয়। আমরা পাখী ছেড়ে শুধু খাঁচা ধরে বসে আছি। যাক্ সে কথা। জীবের অন্তর্মুখী গতি থেকেই কর্ম্মমার্গের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার ঐ অন্তর্মুখী গতিজাত দৃঢ় সংকল্পের দ্বারাই নৈষ্কর্ম্য লাভ হয়। নতুবা, শাস্ত্রীয় কর্মকান্ড প্রথমে প্রয়োজন হলেও তার মধ্যস্থিত জ্ঞানাংশ বুঝে নেবার পর আর দরকার হয় না, কারণ ক্রিয়াকান্ডের মায়া জীবকে কঠোর ভাবে আবদ্ধ করে, তাই সাধক সাধনা ভুলে পুরোহিতগিরি করে বেড়ায়। সেজন্যই দ্রোণাচার্য্য ও দ্রুপদরাজ প্রথমে বন্ধু হলেও পরে শত্রু হয়ে গেলেন। ১/৩

অত্র শূরা মহেস্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।। ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।।৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ।।৬

অনুবাদ : এই সেনাদলে মহাশক্তিশালী, মহাধনুর্ধর, যুদ্ধে ভীম অর্জ্জুনের সমতুল্য, যুযুধান (সাত্যকি) বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীপুত্রগণ – ইঁহারা সকলেই মহারথ (একজন দশ হাজার ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধে সমর্থ)। ১/৪-৬

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথমেই পাণ্ডবসেনাদের নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এরা সবাই সাধনায় সাহায্যকারী। সাধনার শুরুতে এঁদের সকলকেই প্রয়োজন। যেমন যুযুধান মানে সাত্যকি বা সত্যান্বেষণ, সুমতি, দুর্মতির প্রধান প্রতিপক্ষ। সুমতি না হলে সত্যান্বেষণে বা সাধনে ইচ্ছা হবে কেন ? বিরাট -- বর্হিজগৎ, অর্থাৎ যা কিছু অভিপ্রায় হয় সবই জানা যায়। দ্রুপদ - অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি, ধৃষ্টকেতু - স্বপ্রকাশ অনুভব যদ্দারা বিষয়াসক্তি দুর হয়। চেকিতান - তীক্ষ্ণজ্ঞান প্রণব ধ্বনি যা প্রথমাবস্থায় অস্পষ্ট ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায়। কাশীরাজ - সমূহ প্রকাশিকাশক্তি (কাশ্যতে প্রকাশ্যতে) সর্বপ্রকাশিকা জ্ঞানদীপ্তি বা মহৎজ্যোতি, পুরুজিৎ - (ইন্দ্রিয়াদি দেহ অন্তপুরচারীগণের) নিরোধভাব অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ, পৌরান জয়তি ইতি পুরুজিৎ, প্রাণের স্থিরাবস্থায় চিত্তবৃত্তি স্বতই নিরুদ্ধ হয়। কুন্তিভোজ - আনন্দ, যা দিয়ে সাধনশক্তি স্ফূরিত হয়। শৈব্য – ব্রহ্মজ্ঞান (শিব হতে শৈব্য যা কিছু পরমমঙ্গল), এই সকল শক্তি একত্রিত হলেই সাধক নরশ্রেষ্ঠ হতে পারেন। যুধামন্যু - ভ্রান্তি, যে সকল প্রাথমিক ভ্রন্তি ও বাধা পরবর্তী সাফল্যের সূচক। যুদ্ধে মন্যু অর্থাৎ দৈন্য অর্থাৎ সাধনশুরুতে যে ভ্রান্তি ও বাধা, সে সব বীরত্ব সহকারে অতিক্রম করতে হয়। বিক্রান্ত - বাধা ও বিঘ্নকারী শক্তি, আবার উদ্যম ও প্রচেষ্টায় ফাঁকি না থাকলে এই শক্তিই মঙ্গলকারী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন বিক্রমশালী শক্তি হয়। উত্তমৌজা - আদ্যাশক্তি। উত্তম ওজঃ (বীর্য্য) যাহার। কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করায় যিনি সচেষ্ট। সৌভদ্র - অভিমন্যু (সংকল্পসিদ্ধি)। দ্রৌপদেয় - দ্রৌপদীর পুত্রগণ (দ্রৌপদী --এমন সাধনা যা খুব শীঘ্র স্বস্থানে নিয়ে আসে, তাঁর পুত্রগণ অর্থাৎ সেই সাধনালব্ধ বিভিন্ন শক্তি সকল।)

প্রকৃতপক্ষে কুন্ডলিনী শক্তিই পঞ্চতত্ত্বে মিশে পাঁচ বিন্দুকে উৎপন্ন করে আর এই বিন্দু হতেই চিত্তের লয় হয়। এবং অবশেষে এই লয়ের মাত্রানুযায়ী সমাধি হয়। অতএব নিবৃত্তিপক্ষীয় এ সমস্ত সাধনশক্তিগুলো সত্যিই ভীষণ শক্তিমান তাই এঁদের সরিয়ে সাধককে বিচ্যুত করাও বিষয়াসক্তির পক্ষে খুবই কঠিন। আসলে সাধনকালীন বিভূতিই এগুলো যা নিজ নিজ উদ্যম, পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি, সংস্কার ও তদনুরূপ শক্তি অনুযায়ী প্রকাশ পায়।

আরও সহজ করে বলা যায় সত্যস্বরূপ ভগবানকে আনে তাই সত্যান্বেষণের নাম সাত্যকি। আর এই বর্হির্জগৎই বিরাট নামে অভিহিত। এই বিরাটের গৃহেই হয় অজ্ঞাতবাস। মনের ছলনায় প্রবঞ্চিত হয়ে যতদিন আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিনই আমাদের নির্ব্বাসন। অর্থাৎ বিরাটের বৈচিত্রে মুগ্ধ হয়ে সাধক আত্মহারা হয়। তাঁর উদ্যম ধনু, কর্ম্মশর সবকিছু প্রচ্ছন্ন রেখে সে কিছুদিন এই বিরাটের চিন্তায় বিভোর থাকে। এটাই অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে বিরাটের গৃহে অজ্ঞাতবাস। যার প্রকৃত তাৎপর্য্য হল জীবের স্থুল জগতের বিরাট বিশাল ভাবে মুগ্ধ হওয়া। এমন অজ্ঞাতবাস কালেই অনেক মনীষি, অনেক সাধক হারিয়ে গেছেন, মানে পথভ্রষ্ট হয়ে নাস্তিক হয়েছেন, অত্মোপলব্ধির থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি যখন কীচকরূপ নাস্তিকতার দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তখন কণ্ঠস্থ উদান নামক প্রাণশক্তি ক্রিয়াঙ্গ জপে সেই নাস্তিকতাকে সমূলে ধ্বংস করলে বিরাটগৃহে ভীম কর্তৃক কীচক বধ সম্পন্ন হয়। কণ্ঠস্থ প্রাণশক্তির ক্রিয়াই নাস্তিকতাকে ধ্বংস করে, অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তিকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করে। বুঝতে হবে জড়শক্তি জড়শক্তি নয়, সেই চৈতন্যময় পুরুষের শক্তিপ্রবাহ, আমি যাঁর অংশ। তাহলে আমরা প্রাণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এ দুটো জিনিষ পেলাম। চেকিতান অর্থ তীক্ষ্ণজ্ঞান, শাস্ত্রীয় জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান মহামূর্খ হলেও ভগবান প্রাণের ভিতর উন্মোচিত করে দেন। ঐ জ্ঞানজ্যোতি বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের অঙ্গজ্যোতি বলে মহাদেবকেও চেকিতান বলা হয়। সৌভদ্র : সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু অর্থ মরণে নির্ভিকতা ও সেকারণ অহংকার। এটা সাধনার সহায়, প্রাণশক্তি এর জনক। দ্রৌপদেয়াশ্চ : দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। ইচ্ছাশক্তির গর্ভে এবং পঞ্চপ্রাণের প্রত্যেকের ঔরসে একটি করে পাঁচরকম আত্মচরিতার্থরূপ পুত্রগণের নিধন অভিমন্যু বধের চাইতেও বিস্ময়কর। অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ পাঁচছেলের শিরচ্ছেদ করেছিলেন এবং সেই গুপ্তহানায় ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অনেক বীর নিহত হয়েছিলেন। মহাবীর ভীম অশ্বত্থামাকে বন্দী করেন এবং অর্জ্জুন তার মাথার মণি কেটে নিয়ে দ্রৌপদীকে দিয়ে পুত্রশোক লাঘবের চেষ্টা করেন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা জন্মের পর অশ্বের হ্রেষায় উচ্চচিৎকার করেছিলেন তাই নাম অশ্বত্থামা। যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড দ্রোণ তৎপুত্র তজ্জনিত কীর্তিঘোষণা যা যশোরূপ মণি ধারণ করে সাধককে পথভ্রষ্ট করে। তাই এই কর্ম্মকাণ্ডের মায়া থেকে রেহাই পেতেই "অশ্বত্থামা হত" অর্থাৎ "ঘোষণা চাই না" বা "যশঃ কীর্তিঘোষণা মরুক বা মরেছে বা মরল" এমন ভাব দৃঢ় করতে হয়। রাত্রির ঘুম অর্থ প্রাণশক্তি। ইচ্ছাশক্তি, সংকল্প এসব নিশ্চেষ্ট হলেই খ্যাতি যশঃরূপ অশ্বত্থামা এসে প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে আত্মতৃপ্তিরূপ পুত্রগণকে কেটে ফেলে তখন প্রাণশক্তি জেগে উঠে খ্যাতিঘোষণার মাথার উপরে যশরূপ মুকুটমণিটা কেটে বের করে দিলে কীর্তিঘোষণা আর সাধককে বিচ্যুত করতে পারে না। তাই বলা হয় যশের মায়ায় ভুলোনা, এভাবে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে, জেদ ও ক্রিয়াকাণ্ডের মাত্রাকে, বিপক্ষের সমালোচনা সেরে নিজের পক্ষের সৈন্যসমাবেশ বিষয়ে বলছেন - ১/৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ।। ৭

অনুবাদ : হে দ্বিজোত্তম, আমাদের দলে যঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যগণের নায়ক তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার সম্যক অবগতির জন্য তাঁহাদের পরিচয় বলিতেছি। ১/৭

ব্যাখ্যা : আসক্তি ও কামনারূপ দুর্মতি অহং ইত্যাকার দেহাধীশ বুদ্ধির কবলে পড়েছে এবং জেদের বশবর্ত্তী সাধককে নিবৃত্তিমার্গীয় সাধনপথ থেকে বিচ্যুত করার সংগ্রামে ধৃষ্টতার উল্লাসে আহ্বান করছে। রীতিমতো দ্বৈরথ সমরে আহ্বান জানাচ্ছে সাধনপ্রবৃত্তিকে যাতে সাধক সাধনায় অবতীর্ণ না হন এবং কর্ম্মসঙ্গী হয়েই জীবনকাল বিষয়ভোগেই অতিবাহিত করেন। ১/৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ।। ৮

অনুবাদঃ আপনি ভীষ্ম, কর্ণ, সমরজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তপুত্র (ভূরিশ্রবা)। ১/৮

ব্যাখ্যা : সাধন সমরে নিবৃত্তিপক্ষের বিরুদ্ধে থাকে দেহমধ্যস্থ রিপুগুলি যথা - ভয়, (ভীষ্ম) ও তজ্জনিত ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যে না থাকলেই পতন এমন ভীতি, কানে শুনেই মীমাংসা ব্যতিরেকেই প্রবৃত্তিতে সম্মতি অর্থাৎ দুর্বুদ্ধিতে মনোযোগ (কর্ণ)। কর্ণ, আগে ২নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় কর্ণ সম্বন্ধে বলেছি। কর্ণ সুর্য্যের পুত্র। সুর্য্য জীবনী শক্তির আধার, প্রাণশক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ যা জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখে। দৈনন্দিন যে জীবনীশক্তি খরচ হয় এই প্রবাহ সেই ক্ষয় পূরণ করে। যতটা প্রাণশক্তি দেহেপ্রবেশ করে তার চেয়ে কম ব্যয় হলে আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারি। কৌশল জানা থাকলে নিজের সঞ্চিত জীবনীশক্তি অপরের উপরে প্রয়োগ করে তাকে রোগমুক্ত করতে পারি এমনকি মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার করা যায়। এরকম বেশী পরিমাণে জীবনীশক্তি আকর্ষণের খুব সুন্দর উপায় আছে কিন্তু তা প্রকাশ করা নিষেধ। এতে বিপদ হতে পারে। কারণ রশ্মিতরঙ্গপথে ঐ প্রাণশক্তির সহসা এতবেশী প্রবাহ, এত প্রবল বেগে, দেহে চলে আসবে যে মূলাধার ও অন্যান্য চক্রসকল সে শক্তির বেগকে কেন্দ্রীভূত করতে না পারায় বিদ্যুৎ ছটার মত আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বা চক্ষুকর্ণ পথে বেরিয়ে এসে মুহূর্তে মৃত্যু ঘটাতে পারে। অথবা প্রাণে বেঁচে গেলেও Nervous system কে ক্ষতিগ্রস্থ করে মানুষকে পাগল অথবা জড়বুদ্ধিতে পরিণত করতে পারে। কাজী নজরুল ইসলামের এমনতর সাধন বিভ্রাটের বিষয়ে জনশ্রুতি আছে। সব কথা প্রকাশ করা চলে না, তবু সংক্ষেপে বিরাট প্রাণপ্রবাহের কথা বললাম। এজন্যই কর্ণকে সুর্য্যপুত্র বলা হয়েছে, মূলাধারে যার অবস্থিতি। এই শক্তি জীবদেহে প্রবেশকালে একটা জ্যোতির্ম্ময় সুতোর আকারে ধারা প্রবাহে প্রবেশ করে আবার মৃত্যুর সময় ঐরকম ধারা অবলম্বনে বেরিয়ে পঞ্চপ্রাণশক্তিবিশিষ্ট আত্মার দেহ থেকে বের হবার পথ ও আধার

প্রস্তুত করে। এজন্যই কর্ণকে সুত্রধর বা সুতপুত্র বলা হয়েছে। প্রাণশক্তির, মৃত্যুভয় ও জগদভোগের মায়ারূপ কবচকুণ্ডল অপহৃত হলে তবে কর্ণ মরে । মানে সাধকের হৃদয় হতে মৃত্যুভয় ও জগদ্‌ভোগের মায়া দূর হলে ঐ প্রাণশক্তি বিরাট প্রাণশক্তিতে মিলে যায়। তখন মন আর তা দিয়ে জগৎভোগে জীবকে মুগ্ধ করতে পারেনা ।

আবার সুবুদ্ধিবাক্যে অবিশ্বাস, বারংবার বলা সত্ত্বেও সুযুক্তি সুবুদ্ধি গ্রহণে অনীহা, শুনেও না শোনা ইচ্ছাপূর্ব্বক (বিকর্ণ) । কৃপা (কৃপাচার্য্য) এই কৃপা প্রবৃত্তিপক্ষীয় কৃপা যা আসক্তি বৃদ্ধির অনুকূল, ভোগের প্রতি উস্কানিমূলক কৃপা। অন্তহীন বাসনা (অশ্বত্থামা), বাসনার শেষ হয় না তাই অশ্বত্থামাও অমর। ভূরিভূরি শ্রবণ হেতু অবিরত সংশয় (সোমদত্তি) সোমদেবের পুত্রের নাম ভূরিশ্রবা যে বহু লোকের কাছ থেকে বহু কথা শোনে এবং অবিরত সংশয় ও ভ্রমে পড়ে থাকে ও সাধন সময় পার হয়ে যায়। ভূরিশ্রবার চাই খ্যাতিলাভ - সবচেয়ে বড় রিপু, তাই হঠযোগকে ভূরিশ্রবা বলে। সাধক ভগবান বাদে শুধু হঠযোগের কৌশল শিখতে ব্যস্ত হয়। আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়, ফলে সত্যান্বেষণের উদ্যম বিধ্বস্ত হয়। বহু সাধকই ভগবান খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বাজীকর হয়ে গেছেন। এজন্যই ভূরিশ্রবার হাতে সাত্যকির লাঞ্ছনা দেখা যায়। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে খুব সুন্দর ভাবে দেখান আছে, হঠসমাধিতে ভগবান লাভ হয় না। রামচন্দ্রের শিক্ষার জন্য বশিষ্টদেব একটা জায়গা খুঁড়তে বলেন। খোঁড়া হলে সেখানে একটা মানুষের দেহ পাওয়া গেল। বশিষ্ট সেই দেহে প্রাণসঞ্চার করলেন। প্রাণ পাওয়ামাত্র লোকটা উঠে সকলকে অভিবাদন করে পুরস্কার চাইল। সকলে বুঝতে না পেরে বশিষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে বশিষ্ট বললেন, লোকটা যাদুকর। রাজসভায় ভোজবাজি দেখাতে গিয়ে সহসা সমাধি ঘটে। এর সহকারীরা মারা গেছে ভেবে পুঁতে রেখে চলে গেছে। রাজার কাছ থেকে অনেক পুরস্কার পাব এমন আশা করে সমাধিস্ত হয়েছিল তাই এখন সমাধি ভেঙ্গেই পুরস্কার চাইছে। তাই বলছি ওসব হঠসমাধিতে শুধুই ভোজবাজি ছাড়া আর কিছু হয় না। তবে হ্যাঁ, চিত্তকে স্থির করতে অনেকটা সাহায্য করে। যথার্থ সমাধি কিন্তু অন্যভাবে হয়, আপনা থেকেই আসে। আসলে সমাধি হলে ঈশ্বরলাভ হয়না, ঈশ্বরলাভ থেকেই সমাধি আসে। এভাবেই আমাদের সত্যান্বেষণ ভূরিশ্রবার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। দু একটা সাধারণ বিভূতি দেখেও লোকে মুগ্ধ হয়। কখনই এমনটা দেখাতে নেই বা করতে নেই। কপালে একটু জ্যোতির্গোলক দেখেই লোকে মুগ্ধ হয়। জানেনা এমন জ্যোতি পায়ের নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঘন ভাবে বিস্তৃত। তবে কপালে চট করে দেখা যায়। প্রকৃত সাধনার ইচ্ছা প্রাণে থাকলে ভগবান সাধককে সাবধান করে দেন, "সাধু সাবধান ", তোমার সত্যান্বেষণ বিভূতির মায়ায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তুমি ওকে রক্ষা কর। কুরুক্ষেত্রে সাত্যকি যখন

ভূরিশ্রবার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "অর্জুন সাবধান ! সাত্যকিকে রক্ষা কর। ভূরিশ্রবার হাত কেটে সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর।" অর্জুন ভূরিশ্রবার হাত কেটে সাত্যকিকে মুক্তি দিলে ভূবিশ্রবা সূর্য্যে চক্ষু ও চন্দ্রে মন সংযোগ করে যোগপথে দেহত্যাগ করতে চাইলে সাত্যকি খড়্গ দিয়ে মাথা কেটে ফেলেছিলেন। যাই হোক আর বেশি বলব না। প্রত্যেক চরিত্রের আলোচনায় জটিলতাও বাড়ে। শুধু বই পড়ে সব হয় না। তবে বই পড়ে সাধনার ইচ্ছা প্রবল হলে প্রাণের ভিতর এ সমস্ত তত্ত্ব ফুটে ওঠে। সদ্‌গুরু আবির্ভূত হয়ে এসব তত্ত্ব ফুটিয়ে দেবেন। তত্ত্ব বুঝতে ব্যস্ত হয়ো না। ঈশ্বরলাভে ব্যস্ত হও। গুরু খুঁজতে হবে না, ভাল শিষ্য হও। গুরু আপনি আসবেন। শক্তিকে খুঁজো না, আসক্তি ঢেলে দাও, শক্তি আপনিই আসবে। মন এভাবে উভয়দিক দেখতে দেখতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। প্রাণের সাধনার এতসব আয়োজন দেখে সে সঙ্কুচিত হয়। ভাবে বুঝি এবার সংসারের স্বাভাবিক গতি নষ্ট হয়ে গেল। মন তো তা চায় না। মন চায় শক্তি, খ্যাতি, সংসার, ভোগ, এটাই স্বর্গ। মন তাই প্রাণের এই একমুখী গতি দেখে চিন্তাকুল হয়। দুঃসাহস (জয়দ্রথ), সমস্ত কুকর্ম্মে অতিরিক্ত সাহস, এটাই প্রবৃত্তিপক্ষের জয়রথ। যা সাধন শক্তি (দ্রৌপদী) কে হরণের চেষ্টায় থাকে। এরা সবাই দুর্ম্মতির সেনাপতি। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, " কে শত্রবঃ সন্তি ? - নিজেন্দ্রিয়াণি ।" অর্থাৎ প্রকৃত শত্রু কারা ? আমাদের অর্জ্জিত ইন্দ্রিয় সকলই আমাদের প্রধান শত্রু। এদের ইচ্ছা মত চলতে গেলে সাধন পথ ত্যাগ করতে হবে। ভীষ্মদেব যুদ্ধে পাণ্ডবদের সমধিক বিপর্য্যস্ত করেছিলেন। সাধনপথ পাওয়ার জন্য আর্ত জীবের প্রাণ যখন কাঁদে তখন সাধু, যোগী, মহাত্মাগণ " ইন্দ্রিয় দমন কর, আত্মসংযম কর " ইত্যাদি শুকনো উপদেশ দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। সাধকও ভাবে, বোধ করে বুঝিবা ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ইন্দ্রিয় দমনেই ঈশ্বর লাভ হয়। হায়রে জগৎ, একবারও ভাবে না ব্রহ্মচর্য্যের সাথে ঈশ্বরলাভের সম্পর্ক কি? একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়দমনেই ভগবান লাভ হলে, সর্বাগ্রে হিজড়ে এবং খাসি - ভেড়াদের ঈশ্বর লাভ হত। ভগবৎকৃপা না হলে যে ইন্দ্রিয়দমন হয় না একথা কেউই তাদের বোঝায় না। ভগবৎকৃপার স্বাদ দিয়ে কেউই তাদের প্রাণকে স্থির করে দেয় না। তাই বলি ভীষ্মচরিত বড় অপূর্ব। জেনে রাখ, ব্রহ্মস্পৃহাই ব্রহ্মচর্য্য, কামদমনরূপ বিকৃতির নাম ব্রহ্মচর্য্য নয়। ফাঁদ পেতে ভগবানকে ধরা যায়না। আর হ্যাঁ, মানুষকে আগে মানুষ বলে ভাব, তারপর স্ত্রী - পুরুষ বিচার। মানুষকে, স্ত্রীপুরুষের বিচারে না গিয়ে, মানুষ ভাবলে, স্ত্রীপুরুষে অভেদভাব জন্মালে কামনা, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদির মায়া তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনা। স্ত্রীপুরুষে অভেদ জ্ঞানই অর্জ্জুনের রথে শিখণ্ডীর আবির্ভাব । শিখণ্ডী অর্থ স্ত্রীপুরুষে অভেদজ্ঞান। এই অভেদজ্ঞানের সাধনা কর, ব্রহ্মচর্য্য আপনিই হবে। তখন বুঝবে স্ত্রী - পুরুষ শুধুই আকৃতির ধান্ধা, প্রকৃতির মোহিনীমায়া মাত্র। স্ত্রীপুরুষ শুধু পোষাকের বিভিন্নতা মাত্র। পোষাকের মোহ ভুলতে চেষ্টা কর, স্ত্রীপুরুষ আকৃতিগত ভেদজ্ঞান মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। লিঙ্গজ্ঞান কি তখন বুঝতে পারবে। ভীষ্ম পিতামহ উভয়পক্ষের মঙ্গল

কামনা করেন তাই সাধনপথে মৃত্যুভয় প্রবল শত্রু আবার প্রবল সহায়। যাইহোক স্ত্রীপুরুষ রূপী শিখন্ডীকে সামনে রেখে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে জয় করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ চিত্তে শরসজ্জায় শায়িত থেকেও অপূর্ব ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে পাণ্ডবদের জ্ঞানজ্যোতিঃ ফুটিয়েছিলেন।১/৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ।। ৯

অনুবাদ : আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প নানা শস্ত্রধারী আরও অনেক বীর আছেন তাঁহারা সকলেই রণপন্ডিত। ১/৯

ব্যাখ্যা : আরও অন্যান্য অনেক বীর আছেন যাঁরা অজ্ঞতাবশতঃ ক্রিয়াতে অনিচ্ছুক। কেবলমাত্র কানে শুনেই প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে চান। কয়েক প্রকার রিপু শরীর মধ্যে অবস্থান করে মনের দুর্ম্মতিতে ইন্ধন যুগিয়ে যায়, ফলে ইন্দ্রিয়গণের একটানা ভোগের ফলে ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়, তবুও বিষয়াসক্তি অবিরাম থাকে। এর চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। আর কয়জনেই বা আমরা শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বুঝতে পারি ? শুধু আমোদ প্রমোদে সময় কাটালে কেউই সাধনার ধনকে লাভ করতে পারে না। মহাত্মা কবীরদাসজী বলেছেন “হাঁসি খেলে যো পিয়া মিলে তো কৌন দুহাগিনী হোয় ?” হাসি খেলা চপলতায়ই যদি আনন্দ পাওয়া যায় তবে শুধু শুধু দুঃখ বা কষ্ট স্বীকার করার কি প্রয়োজন ? কিন্তু দুঃখ না করলে কি সুখের মুখ দেখা যায় ? যোগদর্শনে আছে “ তপস্যার ক্লেশে আবরণ ক্ষীণ হইলেই আত্মদর্শন সুলভ হয় ।” ব্যাসদেবও বলেছেন, “ ন তপঃ পরং প্রাণামায়াৎ ” - প্রাণায়াম অপেক্ষা পরম তপস্যা আর নাই।

অতএব এতবড় সাধনপথকে এরূপ অবজ্ঞার চোখে দেখা দুর্ম্মতির (দুর্য্যোধন) পক্ষেই সম্ভব। চরম নির্ব্বুদ্ধিতা দুর্ম্মতিরই কাজ। ১/৯

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম ॥১০

অনুবাদ : তাদৃশ, বীরযুক্ত হইলেও ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত আমাদের এই সৈন্যগণ অপর্য্যাপ্ত এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ভীম কর্তৃক রক্ষিত ইহাদের (পাণ্ডবদিগের) এই সৈন্যগণ সমর্থ বোধ হইতেছে।১/১০

ব্যাখ্যা : দুর্ম্মতি (দুর্য্যোধন) নিজের বিশ্বাস / সংস্কারকে (গুরু, যার কথায় সব কাজ হয়) জানাচ্ছে যে সাধনার প্রধান বিরুদ্ধ শক্তিই হল ভয় (ভীষ্ম), আশঙ্কাজনক ধারণাসকল হল, সাধনায় সময় দিলে অর্থোপার্জন ব্যাহত হয়, বিষয়কর্ম্মের সময় পাওয়া পায় না। পারিবারিক মেলামেশা, সমাজ সামাজিকতা ইত্যাদি সবই নষ্ট হয়, সুখের হানি, শরীরের হানি ইত্যাদি। এই সমস্ত ভয় সাধককে সাধনা থেকে বিচ্যুত করে। অতএব ভোগাসক্তির বল ভরসা এই ভয়ের দ্বারাই রক্ষিত। অপরদিকে বিপক্ষদল (নিবৃত্তিপক্ষ/অনাসক্তিসকল) আকারে ছোট, প্রাণবায়ু দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে। এজন্যই দুর্ম্মতির আশঙ্কা পাছে প্রাণের সাধন করে মতিগতি পাল্টে যায়, কারণ কামক্রোধাদি রিপুসকল যত ভীষণই হোক, মন দিয়ে প্রাণায়াম করলে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল সবই শান্ত হয়ে থাকে। তাই বুঝি ভীষ্ম ভয় দেখিয়ে সাধককে প্রাণসাধনার পরিবর্তে ব্রহ্মচর্য্য পালন, ইন্দ্রিয়দমনাদি কাজে নিযুক্ত রেখে বসিয়ে দিতে চায়। পাণ্ডবপক্ষকে ভীমাভিরক্ষিত বলার কারণ কণ্ঠস্থ উদানবায়ুতে জপ শক্তির স্ফুরণ ঘটে আবার ভগবদবিরহও কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়, প্রথম তো জপশক্তি ক্রিয়াশীল হয় । শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন, “যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহস্মি।” জপরহস্য ও জপের প্রণালী পরে আলোচনা হতে পারে। আসলে মন সকল মায়াকে কেন্দ্রীভূত করে প্রাণক্রিয়া থেকে সরিয়ে ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়দমন, গেরুয়াধারণ, শিখাবন্ধন, উপবীত ধারণ ইত্যাদিতে নিযুক্ত করে পথভ্রষ্ট করতে আগ্রহী থাকে। তাই পরের শ্লোকে বলছেন -- ১/১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ।। ১১

অনুবাদ : ব্যূহ প্রবেশদ্বারে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে অবস্থান করিয়া ভীষ্মকেই রক্ষা করুন । ১/১১

ব্যাখ্যা : কামরূপী দুর্য্যোধন বা কুমতি দেহস্থ রিপুসকলকে (অহঙ্কার, ভ্রম, সংস্কার প্রভৃতি) ভোগাসক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরপক্ষে নিয়ত যোগাভ্যাস সাধকের ভোগাসক্তিকে ধ্বংস করে। প্রবৃত্তিপক্ষ সাধককে সাধনায় ভীত করতে পারলেই সে সাধনপথ ত্যাগ করবে। অতএব আগমরূপী দ্বারেই ভয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সাধকের সাধনপথ পরিত্যাগ করানো সম্ভব। সেইজন্য দুর্ম্মতি ভয় (ভীষ্ম) কে রক্ষা করতে এত উৎসুক। যেহেতু, অস্মিতার (vanity, pride) কাজই ভয় পাওয়া। তাই বুঝি প্রাণে ভগবানের তৃষ্ণা উদয় হলেই মন তাড়াতাড়ি ব্রহ্মচর্য্যকেই ধরে বসে। ১/১১

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান ॥১২

অনুবাদ : প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) তাঁহার (দুর্য্যোধনের) আনন্দ জন্মাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন। ১/১২

ব্যাখ্যা : ভয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় অবস্থায়ই কার্যকরী একারণ উভয়পক্ষেরই পিতামহ। পঞ্চতত্ত্বের (পাণ্ডবপক্ষের) মধ্যে যে ভয় আছে সাধনায় বিঘ্নকারী রিপুসকলের মধ্যেও সেই ভয় আছে। ভয় যদি পিছনে লেগে থাকে তবে সাধকের সাধনা হয় না। এজন্য দুর্ম্মতিকে সাহস যোগাবার জন্যই ভয় (ভীষ্ম) নিজের বিজয় ঘোষনা করলেন। মনে ভয় সঞ্চারিত হলে সাধকের সাধনা হয় না তখন যে দীর্ঘশ্বাস জনিত শব্দ হয় সেটাই ভয়ের সিংহনাদরূপী শঙ্খ, এতে কুমতির সন্তোষ ও আনন্দলাভ হয়। এখানে শঙ্খ ও ধ্বনি সম্বন্ধে একটু বলব। অমাদের মন ও প্রাণশক্তির প্রত্যেক বৃত্তির বিশেষ বিশেষ ধ্বনি আছে। আগেই বলেছি মন ও প্রাণ আসলে একই শক্তির দুরকম গতি মাত্র। আদি শক্তি হল প্রণব। এটাও আগে বলেছি ঐ আদি শক্তি যত বিভিন্ন ভাবে দেহের ভিতর বিশ্লেষিত হয় ততই বিভিন্নভাবে শোনা যায়। সাধকমাত্রেই জানেন যে প্রাণ ও মনের বৃত্তিগুলো উত্তেজিত হওয়া মাত্রই বিশেষ বিশেষ রকম ধ্বনি শোনা যায়। রেগে গেলে একরকম, কামার্ত হলে একরকম, লোভে, ভক্তিতে ও করুণায় এক একরকম । জ্ঞানলাভেচ্ছু হলে আবার আর একরকম ধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু সবই ওঁকারেরই রূপান্তরিত তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। তাই বলি ওঁকার শ্রবণের পরিবর্ত্তে লিখিতরূপে ঘরে সাজিয়ে রাখার মত ফক্কুড়ি আর নেই। প্রকৃত শঙ্খধ্বনিও আর নেই। তাই সমুদ্রশামুকে ফুৎকার দিয়ে কৃত্রিম ধ্বনির সৃষ্টি। হিন্দু পল্লীতে গৃহীর নাদ সাধনার মত, সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি প্রবাহের মত প্রাণকে আলোড়িত করে বলে ঐ ধ্বনিগুলোকে শঙ্খনাদ বলা হয়েছে। ১/১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ।। ১৩

অনুবাদ : অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (পটহ), গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি, শিঙ্গা) রণবাদ্যসকল সহসা বাজিয়া উঠিল : সেই শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১/১৩

ব্যাখ্যা : দুর্ম্মতির প্রভাবে ও রিপুসকলের উত্তেজনায় মন চঞ্চল হয়ে পড়ায় শরীরস্থ বায়ুও চঞ্চল হল এবং কম্পন দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি শুরু হয়ে শরীরে একটা বিষম গোলমাল তৈরি করল অর্থাৎ সাধনায় প্রচণ্ড ব্যাঘাত এলো। দেহস্থিত রিপুসকলের মধ্যেকার নভশ্চর বায়ুর প্রভাবে সাধন সময়ে নানা রূপ শব্দ হওয়ায় যে ভয় হয় সেই থেকে নানারূপ দুশ্চিন্তা সেই ভয়কে ভীষণ ভাবে বাড়িয়ে দেয়। সাধক সাধনা ছেড়ে সেই ভয়জনিত দুশ্চিন্তার কবলে পড়ে যায়। কারণ যখনই কোন বৃত্তি প্রাণে উজ্জীবিত হয় তখন সেই বৃত্তির বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ অন্যান্য শব্দতরঙ্গে প্রতিহত হয়ে নানারূপ মিশ্রিত কোলাহল তৈরী করে। সেইজন্যই এখানে পণবানক ইত্যাদি শব্দসকলের কথা বলা হয়েছে। প্রাণের ভিতর বৃত্তিবিশেষ প্রবলতর হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচলিত শব্দতরঙ্গগুলো প্রতিহত হয়ে এমনতর নানারকম শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে । এগুলোই বিবিধ বৃত্তিসঞ্জাত বিবিধ রণবাদ্য। ১/১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পান্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪

অনুবাদ : অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য দুইটি শঙ্খ বাজাইলেন। ১/১৪

ব্যাখ্যা : ভীত ও বিচলিত চিত্তে সাধন হয় না। তখন একটানা শ্রীগুরুর স্মরণ মননের ফলে প্রাণায়ামের যে জোরালো ধ্বনি শোনা যায় তারই ফলে সাধকমন ভয়মুক্ত হয়ে যোগে মনোনিবেশ করে এবং পঞ্চতত্ত্বের ধ্বনি শুনতে পায়। এটাই আকাশের ধ্বনি এবং এটাই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খবাজানো, এককথায় নিবৃত্তিপক্ষের শঙ্খ ধ্বনি। এতে চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত হয়। শম অর্থ শান্ত হওয়া। ভিতরে যখন সেই শঙ্খ বাজে তখন চিত্তবেগ শান্ত হয়, সেই আওয়াজ শোনা যায়। শ্বেত অশ্বযুক্ত রথ অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ জ্যোতি আগে দেখা যায়। তারপরই শালগ্রাম শিলার মত কালো মণ্ডলাকার মাধব। মা শব্দে প্রকৃতি বা লক্ষী, সেই জ্যোতির বুকে বসে জগতের পতি কৃষ্ণ প্রকাশিত হন। সেই জ্যোতির্ম্ময় মন্ডল ও তন্মধ্যস্থ শ্যামসুন্দরকে দেখলে প্রাণ আনন্দে ভরে যায়। সেই শান্ত অবস্থার অভ্যন্তরস্থ ধ্বনির কথাই পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আছে। এই শ্লোকে ঐ শুভ্রজ্যোতিকেই শ্বেতাশ্ব বলা হয়েছে। হৃৎকোষ দর্শন হলে এ জ্যোতি প্রত্যক্ষগোচর হয়। হৃদয়ে শুভ্রজ্যোতির একান্ত প্রয়োজন। যাঁরা একটু জানেন তাঁরাই জানেন কিভাবে শুভ্রজ্যোতিতরঙ্গ অন্যান্য জ্যোতিতরঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ ঢুকতে দেয় না। আর অগেই বলেছি মনের প্রতিটি বৃত্তিরই বর্ণ আছে। হৃদয়ের উপর এই শুভ্রজ্যোতিঃ মন্ডিত থাকায় মানসিক বৃত্তিগুলোর নানা রং এর তরঙ্গ হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। শুভ্রজ্যোতি অপর জ্যোতিকে প্রত্যাখ্যান করে। এজন্যই আমাদের হৃদয়রথ শুভ্রজ্যোতি বা শ্বেতাশ্ববিশিষ্ট। আর প্রাণশক্তির প্রাণ নামক অংশ জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন। ইনিই অর্জ্জুন। ভগবান সর্বব্যাপী হলেও জীবাত্মাতেই অধিষ্ঠিত তাই জীবহৃদয়েই বিশেষভাবে প্রতিফলিত। তাই বল

-

ঞ্জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেণ যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥" – ১/১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।।১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তিপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমনিপুষ্পকৌ ।। ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেস্বাসঃ শিখন্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ।। ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক পৃথক।।১৮

অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ এবং ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌন্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মনিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন আর মহাধনুর্ধর কাশিরাজ , মহারথ শিখন্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয় ---হে পৃথিবীপতে ইঁহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন। ১/১৫-১৮

ব্যাখ্যা : হৃষিক মানে ইন্দ্রিয়, ঈশ মানে ঈশ্বর, ভগবান, নিয়োগকর্তা অর্থাৎ যাঁহার বলে ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত তিনিই হৃষিকেশ অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য - শ্রীকৃষ্ণ।

পাঞ্চজন্য : ভগবানের শঙ্খ। প্রণবই ভগবানের শঙ্খধ্বনি। পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেক পদার্থের ভিতর এই শব্দ প্রবাহিত বলে পঞ্চীকরণে এর নাম পাঞ্চজন্য। ভগবানের এই শঙ্খধ্বনি প্রত্যেক হৃদয়ে শোনা যায়। পঞ্চজন হতে জাত বা উৎপন্ন । পঞ্চজন - পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবায়ু স্থির হয়ে প্রাণবায়ুতে মিশে গেলে এইসব অদ্ভূত ধ্বনি, বাঁশি, ভৃঙ্গ, বীণা, ঘন্টা মেঘগর্জ্জনের মত শব্দ শোনায়।

দেবদত্ত: মুখ্য প্রাণযুক্ত জীবাত্মার শঙ্খ, গুরুদত্ত বীজকে দেবদত্ত শঙ্খ বলে। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি বা প্রণবের সাথে গুরুদত্ত বীজ বা দেবদত্ত শঙ্খদ্বনি মিলিয়ে শুনতে হয় তখন মনিপুর চক্র হতে যে ধ্বনি ওঠে, ঠিক বীণার মত ঝংকার তাই দেবদত্ত শব্দ।

ধনঞ্জয় : ধনকে যে জয় করে। ধন অর্থে যোগবিভূতি। এর দ্বারাই সকলে মুগ্ধ হয়। একে জয় করতে পারলেই সাধনায় অগ্রগতি ঘটে। ইনিই মনিপুর চক্রস্থিত তেজস্তত্ত্ব।

বৃকোদর : বৃক মানে অগ্নি, যার উদরে অগ্নি আছে তিনিই বৃকোদর। অগ্নির উৎপত্তি বায়ু হতে আবার অগ্নির লয়ও বায়ুর মধ্যেই। এজন্যই বায়ুতত্ত্বকে বৃকোদর বলা হয়। অনাহত চক্রেই বায়ুতত্ত্বের স্থান। এই স্থান থেকে দীর্ঘ ঘন্টানিনাদের মতই শঙ্খধ্বনি হয়। পুন্ড্র শব্দের অর্থ শ্বেতপদ্ম। প্রণব ও গুরুদত্ত বীজ মিলে গিয়ে যে তরঙ্গ ওঠে কণ্ঠে তার অভিঘাতে যে শ্বেতপদ্মাকারের আকৃতি পায় সেই আবর্ত্তন কণ্ঠস্থ বায়ুর সাথে মিলে গিয়ে যদি মুখে উচ্চারিত বা নির্গত না হয়ে পড়ে তবে বহুক্ষণ অমন প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে স্থির থাকে তখনই প্রকৃত জপ হয় এবং সমস্ত চক্রে চক্রে সেই বীজ প্রসূন আকারে ফুটে ওঠে। পরে জপতত্ত্ব বিষয়ে আরও একটু রহস্য বলার ইচ্ছা রইল। আবার পুন্ড্র শব্দের অর্থ পীড়ন করা। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে পীড়ন করা হয় ফলে এই মহাশঙ্খনাদ সাধক শুনতে পান। এই পুন্ড্র শব্দ হতেই ভীমের শঙ্খের নাম হয়েছে'পৌন্ড্র'।

যুধিষ্ঠির : আগেই বলা হয়েছে ইনি স্থিরতারূপ আকাশতত্ত্ব । স্থান বিশুদ্ধচক্রে।

অনন্তবিজয় : প্রাণবায়ু স্থির হলেই মেঘের ডাকের মত একপ্রকার গভীর নাদ শোনা যায়। সিংহনাদী এই শব্দকে অনন্তবিজয় শঙ্খের নাদ বলা হয়েছে। আকাশতত্ত্ব বা যুধিষ্ঠির এর শঙ্খের নাম অনন্ত বিজয়।

নকুল : জলতত্ত্ব / অপতত্ত্ব। অবস্থান স্বাধিষ্ঠান চক্রে, লিঙ্গমূলে।

সুঘোষ : নকুলের শঙ্খের নাম সুঘোষ। এই শব্দ মিষ্টি বাঁশির মত। যেহেতু স্বাধিষ্ঠান আবার নারায়ণের স্থান তাই বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজান।

সহদেব : ক্ষিতিতত্ত্ব / পৃথ্বীতত্ত্ব। স্থান মূলাধার চক্রে। যোগের শুরু এই ভূমি থেকেই হয় । যাকে আমরা পূজার বোধন বলি।

মনিপুষ্পক : সহদেবের শঙ্খের নাম মনিপুষ্পক। স্থিরবায়ুর ক্রিয়াকালীন যে মত্তভৃঙ্গের মত ধ্বনি হয়, ভোঁ ভোঁ শব্দের মত বেশ দ্রুতলয়ে জোরে হতে থাকে একেই মনিপুষ্পক বলা হয়েছে।

দেহমধ্যস্থ পঞ্চপ্রাণই পঞ্চশঙ্খ। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুর সমতা হলেই এইসব শব্দ শোনা যায়। চঞ্চল মনে কিছুই অনুভূত হয়না। সুরত শব্দযোগাভ্যাসে এই শ্রবণ অধিকতর প্রকট হয়, যদি সাধনের অপরাপর উপাদান তথা অনুপানাদি এবং নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়। এই ভাবে শঙ্খ বাজাতে হয়। শঙ্খ বাজিয়ে মনঃ পক্ষের হৃদয় ভেদ করতে হয়।

কাশিরাজ, শিখন্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রগণ, অভিমন্যু এঁদের পৃথক পৃথক শঙ্খ অর্থাৎ মূলাধারে দশ প্রকার অনাহত শব্দ। এই শব্দ পৃথক পৃথক ভাবে শোনা গেলেও মৃদু। কারণ

এখানে দর্শনের প্রভাবে ধ্বনি পার্থক্য স্পষ্ট হয়। কূটস্থ অন্তর্যামী ও মধ্যে নির্মল অন্তঃকরণ সকল এঁরা মূলাধারে ধারণ করে আছেন এবং শ্বাসবায়ু মস্তকে ধারণ করার ফলে পৃথক পৃথক দশ প্রকার অনাহত শব্দ শোনা যায়। যুগপৎ দর্শনের ফলে স্পষ্ট হয় যে মহাজ্যোতির মধ্যে, অনেক ভিতরে, জ্যোতিঃশক্তির কর্তৃত্বস্বরূপ মহারথ, কূটস্থ মধ্যেকার চিত্রবিচিত্র, সমুদায় দেখা ও সুমতি সকলেই অপরাজিত। জ্যোতির মধ্যে শক্তির কর্তৃত্বজ্ঞানের পরিচয় পেলেই বোঝা যায় যে এ অবস্থা সহজে শেষ হওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার নয়। কিন্তু সাবধান, মনে থাকে যেন এ শক্তি সেই অন্তর্যামী প্রভুর, আত্মার বা শ্রীগুরুদেবের। ভুলেও কখনও যেন সে শক্তিতে নিজের অভিমানযুক্ত কর্তৃত্বজ্ঞান না হয়, তাহলেই সব শেষ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল" আমিত্বেই সব শেষ। এই অবস্থায় অভিমান এবং কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অপরকেও কিঞ্চিৎ শক্তি প্রদান করে দর্শন করানোও যায় অবশ্যই উপযুক্ত আধার বিবেচনায়। কারণ এইসব শক্তিই মূলাধারে জমা হয়ে আছে। নিয়মিত কাজ করতে করতে এই শক্তি চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়ে সহস্রারে উঠে বসে ও স্থায়ীভাবে চৈতন্যযুক্ত হয় (Matured perpetual sense)। এইভাবে শ্বাসবায়ুকে মস্তকে ধারণকালে অনাহতস্থ দশরকম শব্দ পৃথক পৃথক ভাবেই শোনা যায়। "কাশী সর্বপ্রকাশিকা" দেহের মধ্যকার কূটস্থই কাশীক্ষেত্র। সেখানে মন রাখলে সবজ্ঞান আপনিই হয়। শিখন্ডীই সেই মহৎজ্যোতি, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারাই তেজ(অর্জ্জুন) ভয়(ভীষ্ম)কে জয় করেন। অর্থাৎ পরাজ্ঞানের দ্বারাই ভয় দূর হয়। ১/ ১৫-১৮

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ।। ১৯

অনুবাদ : আকাশ এবং পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই তুমুল শব্দ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ১/১৯

ব্যাখ্যা : মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যস্থ বায়ু চলাচলের যে সূক্ষ্ম পথ তার মাঝখানেই অবস্থিত হৃদয়। সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথে প্রাণের সাধনা শুরু হলেই রিপুদমনের কাজও শুরু হয়ে যায়। মূলধার হল পৃথিবী আর আজ্ঞাচক্র হল আকাশ। সুরতের ধার যখন চলাচলের জন্য এই পথ প্রস্তুত করতে থাকে (Radical change in libido) তখন প্রবৃত্তিপক্ষীয় কামক্রোধাদি অত্যন্ত ভয় পায় ও দমিত হয় এই সুরত শব্দযোগে বিবশ হয়ে চিত্ত যেন নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে, বোধহয় হৃদয় গ্রন্থি বুঝি ভেদ হয়ে গেল। কিন্তু আসলে তা হয় না। এই অবস্থা থেকেও সাধক যোগভ্রষ্ট হতে পারেন। যা হোক, তাহলে আমরা বুঝলাম যে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ বা প্রণবধ্বনি দেহাভ্যন্তরে শুনে সেই শব্দে নিজের গুরুপ্রদত্ত বীজ বা জীবের নিজস্ব শব্দ ঐ বিরাট শব্দে মেশামাত্রই একটা আবর্তন উঠে শ্বেতপদ্মাকারে প্রতি চক্রে ফুটে ওঠে, সারা দেহকেই ফুলময় করে। তখনই মনের বৃত্তিগুলো সঙ্কুচিত হয়। এই নিজস্ব বীজ পাওয়া দুর্লভ। সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হলে পাওয়া যায়। ভগবানই সদগুরু রূপে হৃদয়ভ্যন্তরে শিবস্বরূপে প্রকটিত হয়ে দীক্ষা দেন। তাই আসল দীক্ষা হল প্রাণের ভিতরে। কারও কারও ভাগ্যে মনুষ্যরূপে সদ্‌গুরুকে লাভ হয়। তাঁকে কর্ণমূলে দীক্ষা দিতে হয় না। মানুষরূপী সদ্‌গুরুর নিকট সমাহিত চিত্তে বসলে, সেই পুরুষ যথার্থ ইচ্ছুক হলে, তবেই তার প্রাণের ভিতর দীক্ষা দেন। নিজের শক্তিতে শিষ্যের প্রাণশক্তির পর্য্যালোচনা করে দেখেন এবং সেই প্রাণশক্তি তখনই নিস্তরঙ্গ, শান্ত ও সুপ্ত হয়ে পড়ে। সাধক প্রাণের ভিতর বীজের সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ হয়। অবশ্য সৎশিষ্য না হলে এতটা আশা করা যায় না। প্রথম স্তরের শিষ্য না পেলে তাকে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তবে যেভাবে প্রকৃত সৎশিষ্য হওয়া যায় সে পথ, পন্থা দেখান যায় কিন্তু সেটাতো আর প্রকৃত দীক্ষা নয়। যথার্থ দীক্ষা পেলে আর পতনের ভয় নেই। যত পরিশ্রম সব দীক্ষালাভের আগে, দীক্ষা পাওয়ার জন্যই খাটতে হয়। দীক্ষা পেলে সে পরিশ্রমের চরিতার্থতা বা সম্ভোগ হয়। এইভাবে শঙ্খ বাজিয়ে মনঃপক্ষের হৃদয় বিদীর্ণ করতে হয়। কণ্ঠের ঐ শ্বেতপদ্মের সাহায্যেই প্রাণে ভাব শব্দাকারে ফুটে ওঠে। ১/১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পান্ডবঃ ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অনুবাদ : হে রাজন শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ হইলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন তখন ধার্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধোদযোগে ব্যবস্থিত দেখিয়া ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ১/২০

ব্যাখ্যা : এখানে সাধন কর্ম্মের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে অর্জ্জুন তেজস্তত্ত্বঃ, ধনু মেরুদন্ড আর এই শরীর ওঁ কার রূপ । গাণ্ডী, গণ্ড হতে উৎপত্তি, গাণ্ডী অর্থ গাল। গালের সমান্ত রালে ভ্রূদ্বয়ের পিছন পর্য্যন্ত সুষুম্না অর্থাৎ এই ধনুকের ছিলা অবস্থিত। মেরুদণ্ডই শরীরের অবলম্বন। আর অভ্যন্তরস্থ সুষুম্নাই এর শক্তি। উপনিষদেও আছে - "প্রণবো ধনুঃ শরহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।" মেরুদণ্ড সোজা করে বসে সাধনা করলে প্রাণবায়ু সহজে সুষুম্নায় প্রবেশ করতে পারে। সাধনকর্ম্মের উদ্যোগে আসনে বসে মেরুদণ্ড সোজা করলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়েই শান্ত থাকে তখনই উভয়ের নিজ নিজ দিকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিষয়ের দিকে আর নিবৃত্তি আত্মমুখে, ছুটবে এটাই স্বাভাবিক। আর এটাকেই বলা হয়েছে শস্ত্রসম্পাতে উদ্যোগ। এই সময়েই গাণ্ডীব সোজা করে শরচালনার অর্থাৎ রিপুদমনের উদ্যোগ, কিন্তু কিছু সন্দেহরাশির আক্রমণ তো থাকেই, সেই সাথে মনের নানা বৃত্তির, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নানা দিক, তার সাধনাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে দেয় না। তাই কোন উপায়ে

কিভাবে সাধনায় অবিচল হয়ে লেগে থাকা যায় সেই চিন্তাই প্রাণে আসে। এ অবস্থায় হৃদয়স্থ সারথিরূপ ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে বলতে হয় – ১/২০

অর্জ্জুন উবাচ -

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।। ২১

অনুবাদ : হে অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ১/২১

ব্যাখ্যা : অচ্যুত অর্থ যিনি নিজ ভাব হতে চ্যুত বা স্খলিত হন না। যেখান থেকে জীবের আর পুনরাবর্তন হয় না। সেই অচ্যুতই কূটস্থ এই দেহ রথের সারথি। সব কিছুই তাঁর শক্তিতেই হয় অথচ তিনি নির্ব্বিকার ৬অর্জ্জুন উবাচ' অর্থাৎ তেজের দ্বারা মনের প্রকাশ হচ্ছে দুই দলের মধ্যে, ক্রিয়া রহিত করে দেখা যাক । জীবের এতই সন্দিগ্ধ মন, যখনই বেশ একটু অনুভব হচ্ছে তখনই সন্দেহ হল এসমস্ত কি সাধনার ফল নাকি সকলেরই মাঝে মাঝে এমন হয় ? তখনই পরমাত্মাকে নিবেদন করে ক্রিয়া রহিত হয়ে কেমন থাকা যায় দেখার ইচ্ছে হল। এ অবস্থার বাইরে আসতে এ দেহ রথের সারথিকে অচ্যুত বলে চিনতে হয়। তাঁর অবস্থার ধ্যান করতে হয় । আমি কুপথ, সুপথ, পাপ, পুণ্য যেদিকেই চাই সারথিরূপে তিনিই আমাকে সেখানে নিয়ে যান। কখনও ত্যাগ করেন না। আমাকে ফেলে যান না। তিনি অচ্যুত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পক্ষের মধ্যস্থলে অর্থাৎ অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তিরূপ উভয় পক্ষ থেকে দূরে অথচ উভয় দিক দেখা যায় এমন জায়গায় হৃদয়রথকে নিয়ে চল। প্রতিদিন ভোরে বৃত্তি সকলের কাজ শুরু করার আগে বা যুদ্ধ শুরুর আগে স্থির হয়ে বসে উভয় পক্ষ থেকে দূরে অথচ ঠিক মাঝখানে হৃদয়রথে থাকার অভ্যাস করতে হয়। আমাদের ক্রিয়ার এটাও একটা উদ্দেশ্য। রোজ আত্মস্থৈর্য্যের অভ্যাস করতে হয় । এভাবে স্থিরতার অভ্যাস হলেই ক্রিয়া ফলবতী হবে। ১/২১

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ।। ২২

অনুবাদ : যাবৎ আমি যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত বীরগণকে দর্শন করি, যুদ্ধারম্ভে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে সেইজন্য আমি একবার সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র ও যোদ্ধাগণকে দেখিয়া লইতে চাই। ১/২২

ব্যাখ্যা : ক্রিয়ারহিত অবস্থায় সাধকের আত্মসমীক্ষণ ও তদনুসারী চিন্তন। কিন্তু সমস্যা এই যে এসব দেখতে গেলে মনের উল্টো গতিতে প্রবৃত্তিগুলো আবার এসে চেপে বসে। তখন আর রক্ষা থাকে না। আগে যে এতখানি সাধন করে তার সুফলও পাওয়া গেল সেকথা আর মনেও থাকে না। সাধনা মাটি

হয়ে যায়। একবার সাধনা বন্ধ হলেই আবার সাধনে ভয় হয়। এটা জীবের খুবই দুর্ভাগ্য। তাই স্থৈর্য্য অভ্যাস করতে হয়। স্থৈর্য্য অভ্যাসের সূচনাতেই জগৎকে এক বিরাট পূজামন্দির বলে চেনা যায়। তখনই ভগবান তাকে এই মহাবিনাশ থেকে টেনে আনেন বলেই তিনি অচ্যুত। তখনই এই স্থৈর্য্য অভ্যাস থেকেই এক সময় বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এটাই আদি সাধনা। ১/২২

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়াচিকীর্ষবঃ ।। ২৩

অনুবাদ : দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিত কামনায় যেসকল যুদ্ধার্থী এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে আমি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ১/২৩

ব্যাখ্যা : ক্রিয়ারহিত অবস্থায় আত্মসমীক্ষাকালে সাধকের চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ এই যে কোন প্রবৃত্তিটা আমার প্রবল এবং কি উপায়েই বা তাদের নিরস্ত করা যায় - এই ভাবনা। কারণ মন চঞ্চলহেতু কেউই স্থির নয়। আর স্থির না হলে বিষয় কামনা তো করবেই, সুতরাং যুদ্ধ করতেই হবে। তাই যতদিন না উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করা যায় যে কোন কোন বৃত্তি সপক্ষে এবং কোন কোন বৃত্তি বিপক্ষে ততদিন স্থৈর্য্যলাভ বিশেষ দরকার। স্থিরতা লাভ থেকেই সব আশা মেটে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্যক বিন্যাস হয়। ১/২৩

সঞ্জয় উবাচ -

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ।।২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।।২৫

অনুবাদ : সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র)! জিতনিদ্র অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, ভগবান হৃষিকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমবেত নৃপতিগণের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ রথখানিকে স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ ! সমবেত এই কুরুগণকে দেখ। ১/২৪-২৫

ব্যাখ্যা : সাধনক্লিষ্ট দিব্য শরীরের তেজের দ্বারা কূটস্থ প্রকাশিত উত্তম ক্রিয়া স্থগিতকালীন অবলোকন দ্বারা যে অনুভব তাই ব্যক্ত হয়েছে যেখানে জেদ (দ্রোণ) ও ভয় (ভীষ্ম) উভয়েই আছেন। আপনি গোঁ ধরে সাধনক্রিয়া স্থগিত করেছেন এখন দুই দলের মধ্যে টান পাড়াপাড়ি হলে কখনও প্রবৃত্তিপক্ষে

আবার কখনও নিবৃত্তিপক্ষে মন গিয়ে বসে। ফলে সাধনা মাথায় ওঠে এবং হতবুদ্ধি অবস্থায় পৌছায়। আর জেদ ও ভয় এরা তো এই অবস্থাই চায়। এই অবস্থায় স্বতঃই মনের নিজস্ব বৃত্তি প্রবল হয় এবং সাধনার প্রতিকূলে চলে। এজন্যই আগে বলেছি স্থৈর্য্য সাধনাই প্রথম পন্থা। এই অভ্যাস করতে করতে জীব জিতনিদ্র হয়। নিদ্রা বা তমঃ ধ্বংস হয়। তখন জীব গুড়াকেশ বা জিতনিদ্র হয়। তখনই হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করেন। চিত্তকে অভিনিবিষ্ট বা কেন্দ্রস্থ করতে গেলে চিত্ত একটু স্থির ভাবাপন্ন হলেই তমসাচ্ছন্ন জীব ঘুমিয়ে পড়ে। এটা সাধারণ মানুষের তমোগুণ। এজন্য জিতনিদ্র না হলে হৃদয়রথকে ঠিক কেন্দ্রগত করা যায় না। বিজিতনিদ্র হয়ে রথ কেন্দ্রস্থ করার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলে তবে রথ কেন্দ্রস্থ হয় এবং কেন্দ্রগত হয়ে জীব উভয়পক্ষ বিশ্লেষণ করতে, কর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে ও সারথি বা হৃষীকেশ দর্শনে কৃতকৃতার্থ হতে পারে। ১/২৪-২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ।। ২৬

অনুবাদ : অনন্তর অর্জ্জুন তথায় (সেই যুদ্ধক্ষেত্রে) উভয়পক্ষের সেনার মধ্যেই পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, মিত্রগণ, শ্বশুর এবং সুহৃদগণকে অবলোকন করিলেন। ১ / ২৬

ব্যাখ্যা : মনকে আগে যেমন বলা হয়েছে ঐভাবে স্থির করতে পারলে উভয়দিক সুন্দর ভাবে দেখা যায়। একদিকে মায়ারাশি ও ইন্দ্রিয়গণ, যশঃখ্যাতি, ব্রহ্মচর্য্য সবকিছুর মায়া সঙ্গে নিয়ে প্রাণশক্তিকে গন্ডির ভেতরে রেখে দিতে সচেষ্ট। অন্যদিকে বিরাট চিন্তা সত্যান্বেষণ, উর্দ্ধগতি ও দৃঢ়সংকল্প আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে কৃতসংকল্প। প্রাণ বা অন্তর্মুখী শক্তি জগদভোগকে পদদলিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এরাও তো আত্মীয়! কেন সেটা বলছি। প্রথম উন্নতি তো ইন্দ্রিয় সাহায্যেই হয়। ইন্দ্রিয়ই আমাদের চৈতন্য অভিব্যক্তির প্রথম প্রকাশ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমিত্বের উপলব্ধি হয় এবং বিকশিত হয়। তাই প্রথমে ইন্দ্রিয়সকল আমাদের জ্ঞানলাভে সহায়ক। যতদিন সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্মইন্দ্রিয়যুক্ত না হয়, সূক্ষ্মদেহ এই স্থূলদেহের মত কার্য্যকারী শক্তিলাভ করতে না পারে ততদিন ইন্দ্রিয়াদির অবশ্যই প্রয়োজন। তারপর পরিপক্ক হলে ধান থেকে যেমন খোসা বা তূষ ছাড়িয়ে ফেলতে হয় তেমনই পরিত্যজ্য। আমাদের পাঁচটি ছাড়া আরও দুটো ইন্দ্রিয় আছে যার সন্ধান রাখি না। সাধকরা তার সন্ধান পান, এবং তা দিয়ে অলৌকিক কাজ করে থাকেন । আমরাও যোগীদের কাজকর্ম্মে বিস্মিত হই কিন্তু যোগীদের কাছে দর্শন ইত্যাদির মতই সেসব কাজ সহজসাধ্য। এতো গেল ইন্দ্রিয়ের গুরুত্ব তথা প্রয়োজনের কথা। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ আত্মীয় পরে ধানের পলালের (তূষের) মত পরিত্যাজ্য। প্রথম অবস্থায় সব ত্যাগের জন্য যখন সচেষ্ট, তখন এসব তত্ত্ব ফুটে ওঠে, তাই সেই সাধক নিজের ইন্দ্রিয়শূন্য অবস্থার কথা কল্পনা করতে পারে না। এরকম একটা অবস্থার কথা কল্পনা করতে গিয়ে এমনই অবস্থায় পড়ে। সাধনার সূচনায় যাদের ধ্বংসের চেষ্টা করছিল, সাধনা শুরুর পরে তাদের স্বরূপ ও কাজকর্ম্ম দেখে বুঝে তাদেরই নিজ অস্তিত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্র অর্থাৎ আত্মীয় বলে বুঝছে। তবে কি সে মাঝপথে সাধনে বিরত হয়ে থাকবে ? সাধনকালে সাধনারহিত অবস্থা ভাল নয়, এতে কিছু বিপরীত ভাব দেখা যায়। ফলে পরম্পরায় চলিত রীতিই প্রাধান্য পায় এবং অপার্থিব ভয়, সকলেতে ইচ্ছা, অপরের প্রতি দ্বেষ, সব বিষয়েই আগে ভেবে নেওয়া, সংকল্পের সাথে মায়াতে অভিভূত থাকা, কুপ্রবৃত্তি, পরিহাসাদি, মিথ্যার উপর মিথ্যা, ইত্যাদি এসে মনের দখল নেয়। আবার এর বিপরীতেও ঝোঁকে। মনের অস্তিত্ব প্রবল হলে এই অবস্থাই হয় যেহেতু ইনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পক্ষেরই আত্মীয়। ইন্দ্রিয়ও তাদেরই কাজ করে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সমস্তই দেহের সাথে সম্পর্কিত। পঞ্চতত্ত্বরাও তাই। সুতরাং যতক্ষণ দেহবোধ থাকে, উভয় পক্ষই থাকে, এসব শক্তি দুদিকেই খেলা করে, তবে বিপরীত ভাবে। যেমন ভয়। ধর্ম্মকাজেও ভয়, অধর্ম্মকাজেও ভয়। জেদ - সুবিষয়ে জেদ, কুবিষয়ে জেদ। ইচ্ছা - বিষয়গ্রহণে ইচ্ছা, বিষয়ত্যাগে ইচ্ছা। কল্পনা - সদবিষয়ে কল্পনা, অসদবিষয়ে কল্পনা। অতএব এদের অস্তিত্বকেই নাশ করতে হবে বা মুছে ফেলতে হবে । কারণ আপাত বিচারে নিবৃত্তিপক্ষীয় ভাবগুলো ভাল বোধ হলেও সেগুলোও ছাড়তে হবে। দ্বন্দ্বাতীত হতে হবে, গুণাতীত হতে হবে। নচেৎ সুখে দুঃখে সমভাব হবে কি করে ? তবে যতক্ষণ গুণের মধ্যে পড়ে আছি, ততক্ষণ সত্ত্বগুণ বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। ১/২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ।। ২৭

অনুবাদ : উভয় সেনার মধ্যে অর্জুন সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট ও বিষাদযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলেন (বলিতে লাগিলেন)।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকের সূত্র ধরেই বলি, যে ইন্দ্রিয়গণকেই আত্মীয় বলে চিনতে পেরে সাধক বিষাদগ্রস্থ হয়, ভাবে এরা তো আমারই অথচ সাধনপথের অন্তরায় কেন? দুই বিরুদ্ধভাব একসঙ্গে এসে সাধককে চঞ্চল করে তোলে। একদিকে ইন্দ্রিয় দ্বারাই অহং প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যদিকে তারাই আত্মার আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান। তাই সাধক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে কৃপায় ও বিষাদে চঞ্চল হয়ে ওঠে। শ্রুতি এরূপ, সত্যযুগে জীবনই ছিল সাধনশীল। শৈশবেই সাধনসংস্কার প্রবিষ্ট হতো। ত্রেতাকালে কৈশোরেই গুরুকরণ ও সাধনা শুরু হতো। কুলগুরুর কথাও এখানেই পাই। দ্বাপরে

মানুষ সাধনবিমুখ হওয়ায় গীতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং স্বয়ং ভগবান্মুখে গীতা কথিত হয়। সেইযুগে যৌবনে সাধনা শুরু হতো। বর্তমানে সাধনা বিলুপ্ত। যদি কখনও কেউ কোনও কারণে ভীত বা প্রলুব্ধ অথবা কোনও পার্থিব লাভের আশায় সাধনার ইচ্ছা করেন সেও একেবারে বার্ধক্যে যখন সাধন সামর্থ্য বিন্দুমাত্রও থাকেনা। আবার কিছু সংখ্যক লোক প্রথমে হুজুগে পড়ে সাধনা করতে আসে তারপর যখন দেখে জীবনের চিরভ্যস্ত অনেক সুখের কাটছাঁট করতে হবে, তখন বিস্মিত ও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে যে ভাব হয় সেকথাই এখানে বলা হয়েছে।

সাধনায় একটু এগিয়েও সন্দেহ মেটে না। মনে করে যা দেখছি এসব ঠিক তো? এইসব উৎপাত আরম্ভ হয়। এটুকু বোঝে সব ভোগটোগ ছেড়ে মন দিয়ে ক্রিয়া করলে মন, ইন্দ্রিয় সব স্তব্ধ হয়ে যাবে। অথচ পূর্বসংস্কার বশত: ইন্দ্রিয় ও তার ভোগ্য বিষয়ের জন্য মন ছোঁক ছোঁক করে। এতটা সাধন করেও জীবনটা অকৃতার্থ ও ব্যর্থ বলে মনে হয়। এটাই বিষাদযোগ। অবশ্য সাধকের একবার বিষাদযোগ না এলে সাধনায় পাকা হয়ে দৃঢ়ভাবে জমে যাওয়াও হয় না। এইজন্যই বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই বিষাদ আসে। সাধক একবার জানতেও পারেনা যে সে ইতিমধ্যেই সাধনায় বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। এইজন্যই অনেকটা এগিয়ে যাবার পরই বিষাদ আসে। শুরুতেই আসে না। সাধনা ফলবতী হলেই বিষাদ আসে। গুরুর দোষান্বেষন করে । নেতিবাচক বিচার (Negative sense) করতে থাকে। সবশেষে সাধন পথ পরিত্যাগ করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে। পূর্বার্জিত সুকৃতির বশে কিছু ব্যতিক্রমী সাধক গুরুপদে নিজেকে সমর্পণ করে বলতে পারে –

“যচ্ছ্রেয় স্যানিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে।
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম ॥”

“আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত। তুমি আমাকে উপদেশ দাও। আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহাই ঠিক করিয়া বল।”

একমাত্র তখনই জ্ঞানস্বরূপ আত্মারূপী গুরু যা কিছু উপদেশ করেন বা মনের মধ্যে জ্ঞান দিয়ে যা কিছু ব্যক্ত করেন তাই গীতা। এই গীতার উপদেশ সাধক অন্তরে যতক্ষণ অনুভব করতে না পারেন ততক্ষণ তাঁর সাধন ঠিকপথে চলছে কিনা, ঠিকমত হচ্ছে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আসে।

আবারও একটু বলি গীতাজ্ঞান হৃদয়ে স্থাপিত হলে গুরুশক্তি তাঁর সহায় হন এবং সাধনায় গতি সঞ্চারিত হয়। গুরু জ্ঞানী না অজ্ঞানী, সক্ষম না অক্ষম এসব কোন কাজের কথাই নয়। ১/২৭

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেব্মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ।। ২৮

অনুবাদ : অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধাভিলাষী এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার হস্ত পদাদি অঙ্গসকল অবসন্ন এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ১/২৮

ব্যাখ্যা : গুরু থেকে এ যাবৎ অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে অচ্যুত, হৃষীকেশ ইত্যাদি সম্বোধন করছিলেন কিন্তু এখন কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করলেন। কারণ, বিষাদে হৃদয় অভিভূত হলে জীব চারদিক অন্ধকার দেখে। জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সব আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে। সেই সঙ্কট মূহূর্তে যদি ভগবৎ শক্তির সাহায্য খুঁজতে হয় তবে ভগবানকে কোন রূপে ডাকবে? কোনও রূপই তখনকার কালিমামগ্ন প্রাণে প্রতিফলিত হবে না। কালিমায় যে চারধার ভরে গেছে। তখনই বিপন্নের আশাভরসা ভগবানকে কালো দেখে কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করবে। তুমি কালো হয়েছ তাই তোমার সারথিও কালো। তোমার বিষাদই তাঁর বিষাদ। তাই সে সময় আর্তের পক্ষে, বিপন্নের পক্ষে, বিপদাপন্নের পক্ষে তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণজ্যোতিঃ প্রাণের সকল অবসাদ মুছিয়ে দেয়। তাই অর্জ্জুন এই দারুণ বিপদের সময় প্রথম “কৃষ্ণ” বলে সম্বোধন করলেন। এবার দেখা যাক বিপরীত ভাব কিভাবে আসে। সাধনার শুরুতে মন বেশ উৎসাহিত হচ্ছিল। চিত্তবেগ একটু শমিতও হল কিন্তু ইন্দ্রিয় দমিত হতে গেলেই চিত্তের বিক্ষেপ শুরু হল। তখনই মনের মননত্ব ক্রিয়াশীল হল। শুরু হল কুরুপাণ্ডবের খেলা। খেলা ছাড়া আর কি ? এই খেলা মায়ার খেলা; মানবদেহের সম্মুখভাগই মায়াপূর্ণ (illusive), মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পরিদৃশ্যমান সম্মুখভাগই মানব মনকে প্রভাবিত করে ও প্রভাবিত হয় এটাই কুরুপক্ষ। সেখানেই আছে লিঙ্গবৈষম্য, পুরুষ ও নারীর ভেদ, অপরপক্ষে দেহের পশ্চাদভাগ হল পাণ্ডবপক্ষ। এদিকে লিঙ্গবৈষম্য নেই; পার্থক্যও নেই। একারণ সাধনকালে পশ্চৎপটেই চক্রসমূহ বিধৃত হয়। সাধন শুরুর পূর্ব পর্য্যন্ত মন ক্রিয়াশীল ছিল সম্মুখভাগে। ধরা যাক, যদি কারও ফটো তুলতে হয় সেও সম্মুখ ভাগেরই ছবি। কারও কথা ভাবতে, মনে করতেও আমরা সামনেরটাই ভাবি, মুখখানাই মনে পড়ে। কিন্তু সাধনকালে বিপরীত ভাবনা। সেখানে এই মায়ার ঠাই নেই, অতএব ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয়। এই বিপরীত ভাব সাধকের সহ্য হয় না। মনে দুশ্চিন্তা আসে আমি এসব কি করছি ? মায়াবাদী মন আলোড়িত হতে থাকে ফলে স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবিত হয়ে শরীর অবসন্ন হয়, মুখ শুকিয়ে যায়। ১/২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।। ২৯

অনুবাদ : আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে; হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে। চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে। ১/২৯

ব্যাখ্যা : মানুয়ের মনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ শরীরকে কাহিল করে দেয় । তখন শরীর এলিয়ে পড়ে। গাণ্ডীব অর্থাৎ মেরুদণ্ডও আর শক্ত হয়ে সোজাভাবে থাকে না। শিথিল হয়ে যায় ও শরীর সঙ্কুচিত হয়, গুটিয়ে যায়। এ অবস্থায় কখনও যোগাভ্যাস হয় না। বরং ইন্দ্রিয়রূপী ভাবগুলো এতে পরিপুষ্ট হয়ে সাধনার পাকাপাকিভাবে ক্ষতি করে। সে কথাই পরের শ্লোকেও বলা হয়েছে। ১/২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।। ৩০

অনুবাদ : হে কেশব, আমি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার মন যেন ঘুরিতেছে। আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতেছি। ১/৩০

ব্যাখ্যা : মনের তেজ নষ্ট হয়ে গেলেই চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। উদ্যম, অধ্যাবসায় সবই তিরোহিত হয়। সাধনে দৃঢ় ভাব আর থাকে না, সাধনায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব মনে হয়। চিত্ত ভয়যুক্ত হলে কি আর স্থির হয়ে বসা যায় ? তখন মন ও মাথা দুইই ঘুরতে থাকে। যে সাধনার দ্বারা ঋষিগণ কত উচ্চাবস্থা পেয়েছেন, মহানন্দে মগ্ন থেকেছেন এবং পরাশান্তি লাভ করেছেন, সেই সাধনার প্রতি কামদূষিত চিত্তে এত ভয় উৎপন্ন হয় যে মনে হয় যেন সাধনা ছেড়ে দিলেই বাঁচি। এ এমনই দুর্দৈব যে এসকল তত্ত্ব যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের থেকে অনেক দূরে থাকাই শ্রেয় বোধ হয়। কারণ পঞ্চতত্ত্ব ছেড়ে কেমন করে থাকব এই চিন্তায় প্রাণের ভেতর জ্বলতে থাকে। আবার যোগস্থ হতে গেলে প্রাণের ভেতর যে শুন্য হয়ে যায়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এসব কিছুই আর থাকে না। আর এগোতে সাহস হয় না। যেন নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে এমন বোধ হয়। এ সময় আর একটু এগোলে, আর একটু কেন্দ্রস্থ হতে পারলেই সমাধি এসে যায়, কিন্তু সাধক আর পারেনা। চিরদিন পঞ্চত্মমাত্রার সাথে, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির সাথে থেকে, অভ্যস্ত হয়ে, নিজেকে ঐ সব দিয়েই তৈরি মনে করে। তাই সেইসব অমূলক ভাব নষ্ট হবার সময় তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। তখন সবকিছুই বিপরীত ভাবে দর্শন করে আর না এগিয়ে এভাবেই প্রতিনিবৃত্ত হয় । তখন যেগুলো নিমিত্ত স্বরূপ হয়ে সাধককে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট করেছিল, সেগুলোই বিপরীত ভাবে দেখা যায়, কিভাবে হয় সেটাই পরে বলা হচ্ছে। ১/৩০

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামিহত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।। ৩১

অনুবাদ : যুদ্ধে স্বজনগণকে বধ করিয়া মঙ্গল দেখিতেছিনা ; হে কৃষ্ণ, আমি জয় চাহি না, জয় চাহি না, সুখও চাহি না। ১/৩১

ব্যাখ্যা : মানুষ চিরদিনই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ভোগ চায়। কিন্তু সাধন করতে গেলে তো শুরুতে নিজের মন ও বুদ্ধি দিয়েই ভোগাসক্তি ও সুখস্পৃহাকে কিছুটা কমিয়ে ফেলতে হয়। আর তখনই আশঙ্কা আর দুর্বুদ্ধি পিছনে লেগে যায়। মনের অভ্যন্তরে একটা "গেল গেল" রব উঠতে থাকে। এর থেকে এসে যায় সংশয়, যার বিচিত্রগতি। মনে হয় এই গুরুর শিক্ষাতেই আমার স্ত্রী, পুত্র, ধনজন সবই পর হয়ে গেল । কিন্তু আদতেই যে এরা কোন কালেই আমার ছিল না, বর্ত্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও নয়, এবুদ্ধি আসে না। আর একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে এদের অতিরিক্ত মমত্ব দিলে একদিন এরাই আমাকে ত্যাগ করবে। সুতরাং অধিক সংসারাসক্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্পৃহা নিজেরই অশান্তির কারণ। "বিজয়" অর্থে ইন্দ্রিয়জয়, আর "রাজ্যসুখ" অর্থে সিদ্ধি। মনে হয় এসব সাধনার দ্বারা হতে পারে ঠিকই কিন্তু সেটা তো অনিশ্চিত। আর অনিশ্চিত সুখের জন্য বর্তমানের বিষয় ভোগ ত্যাগ করায় কোনও মঙ্গল বা শান্তি লাভ হয় তেমন মনে হয় না। ইন্দ্রিয়ই যদি উচ্ছেদ হয়ে গেল তবে ভোগ কিভাবে সম্ভব ? ইন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্যই তো সব। যদি সেগুলো ছেড়ে দিয়ে যুক্ত হতে হয়, তবে সে আবার কি শুন্যবৎ অবস্থা! সাধক ভীত হয়। ১/৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।। ৩২

অনুবাদ : হে গোবিন্দ! আর আমাদের রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি ? ভোগেই বা প্রয়োজন কি এবং জীবন ধারণেই বা কি প্রয়োজন ? যাহাদের জন্য রাজ্য ভোগ সুখাদি আকাঙ্খা করা যায় ১/৩২

ব্যাখ্যা : ভোগাসক্তি থেকেই জীবের জন্ম হয়। সুতরাং সুখভোগের জন্যই তো জীবনধারণ। তবে আর সাধনা করে বাসনা জয় এবং ইন্দ্রিয়জয় করে কি ফল হবে ? আবার সাধারণ অর্থে লোক ইন্দ্রিয়জয় বলতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিনাশ মনে করে। ভাবে যে কালা, অন্ধ, বোবা এমনটিই বুঝিবা হতে হবে। এতো ব্যর্থ জীবন। প্রকৃত অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিনাশ হয়ে যায়, ফল অষ্টসিদ্ধি। আবার, এরূপ ফলের আশা করলে, সবটাই নষ্ট হয়। ১/৩২

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।। ৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন ।। ৩৪

অনুবাদ: যাহাদের জন্য রাজ্যভোগসুখাদির আকাঙ্খা করা যায়, সেই সব আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ প্রাণ ও ধনত্যাগ অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত, অতএব আমাদের আর রাজ্যাদিতে প্রয়োজন কি ? হে মধুসূদন, ইহারা আমাদিগকে মারিলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ১/৩৩-৩৪

ব্যাখ্যা : অনভিজ্ঞ কর্মসঙ্গী মানুষ যখন অলৌকিক যোগবিভূতি লাভের আশায় সাধন করতে এসে বুঝতে পারে যে কোনও শক্তিলাভ যোগসাধনার উদ্দেশ্য নয়। চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধই যোগসাধন, তখনই সব আশা নষ্ট হয়ে যায় এবং হতাশা আসে। ভাবে ইন্দ্রিয়গণ ও মনের যদি নিরোধ হয় তবে আর রইল কী ? আমার সাধনের সিদ্ধিলাভ, ষড়ৈশ্বর্য্য বিভূতি ভোগ করবে কে ? অনুভব করবে কে ? সেই মনই তো থাকবে না। ইন্দ্রিয়গণ ছাড়া ভোগের অনুভূতির যোগান দেবে কে ? অতএব মনের ইচ্ছার কাছেই নিজেকে ছেড়ে দিই, ইন্দ্রিয়গণের কাছেই আত্মসমর্পণ করি, কঠিন সাধন সমরের কোনও প্রয়োজন নেই। তাতে যদি ইন্দ্রিয়গণ ও মনের দুর্মদ কু - ইচ্ছাসকল আমাকে গ্রাস করে, ক্ষতি নেই । যে কদিন আছি বৌ এর মন মজিয়েই থাকতে চাই। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করলে তারা মেরে ফেলবেই। কারণ ভোগের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে আর আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয়না। সে না হোক, ভোঁ হয়ে মনকে নিরালম্বে শুন্য করে দিয়ে বসে থাকা, ইন্দ্রিয়সকলকে বঞ্চিত করা অপেক্ষা, ভোগের মধ্যে ডুবে গিয়ে মরাও ভাল। এমনটিই মনে হয়, কিন্ত এটা সত্যি নয়। বিষম ভুল। একমাত্র নিজ নিজ সদ্‌গুরুই এসময় সাধককে এই বিষমভুলের হাত থেকে ত্রাণ করেন। সাধনকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তির হ্রাস হলেও তেজ বৃদ্ধি পায় তবে বিষ্ঠার কৃমি কীটের মত ভোগের মধ্যে ইন্দ্রিয় মন আত্মহারা হয় না। প্রতিকূল পৃথিবীতে, জটীল সংসারাবর্ত্তের মধ্যেও সংযত সাধক সুপথে থাকেন। শরীর নাশেও তাঁর কোন হানি হয়না। সে অবস্থা "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতম্ অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।" এই যে "কিছু নাই, অথচ সব আছে" অবস্থার উপলব্ধি না হলে সাধকের শুন্যবৎ অবস্থায় যেতে প্রাণ কাঁপে। ১/৩৩-৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতাঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রন্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।। ৩৫

অনুবাদ : ত্রৈলক্যরাজ্য প্রাপ্তির জন্যও আমি যখন ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না, তখন সামান্য এই পৃথিবীর রাজত্বের জন্য কি ইহাদিগকে বিনাশ করিব? হে জনার্দ্দন ! ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিয়াই বা আমাদের কি সুখ হইবে ? ১/৩৫

ব্যাখ্যা : ত্রিলোকের রাজত্ব বলতে বুঝায় স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই তিন লোকের অধিকার। প্রকৃত অর্থে তিন আত্মশত্রু মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ নামক দৈত্যকে বধ করেই হয় আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা বা আত্মাকে রক্ষা করা ও তার শক্তিবৃদ্ধি করা। ত্রিলোক এই শরীর মধ্যেই আছে যার অধিকার আমাদের হাতে থাকেনা। সাধন সমরে বিজয়ী হলে তবেই আসে। মনে প্রশ্ন জাগে এই আত্মকর্ম্মলাভ কী ইন্দ্রিয়ের আরামজনিত সুখের চেয়েও বেশী ? আসলে প্রকৃত সুখের সংজ্ঞা আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের এত ভয়। ইন্দ্রিয়ভোগযুক্ত অবস্থাথেকে শুন্যবৎএ যেতেই প্রাণ কাঁপে। আসলে পূর্ণতাই শুন্যানুভূতি। শুন্যবাদ পূর্ণবাদেরই নামান্তর। শুন্য বলে কিছু নেই।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"

শূন্যকে যাঁরা পূর্ণ বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না তাঁরা শূন্যের প্রকৃত রহস্য পান না। সাধক প্রথমাবস্থায় এই পূর্ণতাকেই শুন্যতা ভেবে নিয়ে ব্যাকুল হয়। ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানকর্ম্মাদির শক্তি সঞ্চয়ে লক্ষ লক্ষ জন্ম পার হয়েছে, আজ যদি সহসা কেউ বলে ওতে কাজ হবেনা, ভেঙ্গে ফেল, তবে কি প্রাণ ব্যাকুল হয়না ? আসলে ঐ মন্ত্র দিয়েই যে সফলতা আসবে সাধক সেটা প্রথমে বুঝতে পারেনা। ১/৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।। ৩৬

অনুবাদ : এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। অতএব আমরা সবান্ধবে ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে পারিনা। সেহেতু হে মাধব ! স্বজনবধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব ? ১/৩৬

ব্যাখ্যা : চিত্তের বৃত্তিসকল ভোগ হয় ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা । ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বৃত্তিতে বিষয় ভোগের অনুভব যোগান দেয় মনকে। অতএব মনের আত্মীয়স্বজন হল ইন্দ্রিয়গুলি, যারা মনকে বিষয় ভোগ করায়। এরা সবাই ধর্ম্ম ও সাধনার বিরোধী বটে কিন্তু এদের বিনাশেই কি ধর্ম্ম রক্ষা হবে ? আমি দেখছি চিত্তের বৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, নিরুদ্ধ হলে বরং অধর্ম্ম হবে এবং আমরাও সুখী হতে পারব না। কারণ, যোগভ্যাসে যে সকল অলৌকিক দর্শন ও শ্রবণ হয়, মন ও ইন্দ্রিয়সকল নিরুদ্ধ হলে সেসব অনুভবজনিত সুখভোগ হবে কিভাবে ? সুতরাং এদের নিরোধ করে কোনও সুখ হবে এ আশা করিনা ।

প্রকৃত অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই সাধনার উদ্দেশ্য, এদের বিনাশ নয়। কিন্তু জীবভাব সেটা জানেনা বলেই তার এই অমূলক আশঙ্কা (২য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। সাধক প্রথম অবস্থায় পাপপুণ্যের গণ্ডীর মধ্যে থাকে তাই সে ইন্দ্রিয় উচ্ছেদে পাপ বোধ করে। আসলে পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই। আত্মোন্নতির বিরোধী কাজই পাপ। কোনও কাজ পাপের বা পুণ্যের সূক্ষদেহের প্রাণময় কোষের অবস্থা দেখেই সেটা বোঝা যায়। যোগীরা প্রাণময় কোষের অবস্থা দেখেই বলে দিতে পারেন। তাই যতদিন না যোগচক্ষুর উন্মেষ ঘটে ততদিন শাস্ত্রের পথেই চলতে হয় । পাপ পুণ্যের বিচার যে কত সূক্ষ্ম এ গল্পটা থেকে বোঝা যাবে। এক পুণ্যাত্মা গৃহস্থের পরমা সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন। দূর্লভ ছিল সেই সতী সাধ্বীর সতীত্ব ব্রত। নিত্য প্রার্থনা করতেন, হে প্রভু নারায়ণ, মৃত্যুর পর তোমায় যেন স্বামীরূপে পাই। অবশেষে একদিন সেই পরমা পতিব্রতা দেহত্যগ করলেন। তখন বৈকুণ্ঠে তাঁর স্থান হল। যথাসময়ে প্রার্থনা পূরণ করতে নারায়ণ এসে তাঁর মনস্কামনা পূরণ করতে চাইলেন। সতীসাধ্বী বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পা ধুইয়ে দেবার পর নানাবিধ খাদ্য ও পানীয় এনে গ্রহণের জন্য নারায়ণকে প্রার্থনা জানালেন। গোপীবল্লভ নারায়ণ তাঁকে বললেন, ঃভদ্রে, তুমি স্ত্রীরূপে আমার সহবাস প্রার্থনা করেছিলে, আমি তোমার সেই আশা পূর্ণ করতে এসেছি কিন্তু তোমার জলগ্রহণ করব না, কারণ তুমি অসতী।” সেই নারীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। সতীত্বের সকল গরিমা খান খান হয়ে গেল। নারায়ণের পায়ে আছড়ে পড়ে বললেন সারা জীবন প্রাণপণে স্বামীসেবার এই পুরষ্কার। আমি কিভাবে অসতী হলাম ? ভগবান বললেন; হে কামিনি ! স্বামীসেবা তুমি করেছ সত্য, কিন্তু একমনে করনি। তোমার অসাধারণ স্বামীসেবা সত্বেও আমাকে স্বামীরূপে চেয়েছ। এতে তোমার পরপুরুষ আকাঙ্খা করা হয়েছে। তুমি যদি সেই স্বামীকেই আমার মুর্তিমান অবতার ভেবে বা নারায়ণজ্ঞানে তাঁরই কাছে তোমার প্রাণের বাসনা জানাতে তবে আজ তোমাকে আমার সহধর্ম্মিনী বলে তোমার জল গ্রহণ করতাম। কিন্তু তুমি স্বামী আর নারায়ণ ভিন্ন জ্ঞান করায় সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট হয়েছে। যদিও আমার আরাধনায় বৈকুণ্ঠে জায়গা হয়েছে এবং এখানে থাকতে হলে বৈকুণ্ঠের বেশ্যারূপে থকতে হবে। আর যদি সতীত্বের সত্যিকার গুণ পেতে চাও আবার মর্ত্তে গিয়ে স্বামীসেবা করতে হবে অনন্যচিত্তে। তোমার ভক্তি আমাকে খুশী করলেও তোমার স্বামীর ধর্ম্মে বিঘ্ন ঘটেছে। এই দেখ তোমার তপস্যাতে স্বামীর বাঁদিকের অংশ কেমন জ্যোতিহীন, মসীবর্ণ, স্বামীর এই দৃশ্য দেখে দুঃখিত রমণী নারায়ণের পদে পুনরায় মর্তে গিয়ে সতীত্বধর্ম্মে সাফল্যলাভের প্রার্থনা জানালেন। তাহলে দেখুন কত সূক্ষ্মবিচার করে পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণ করা হয়। অর্জ্জুনও খুবই সূক্ষ্মভাবে পাপের বিশ্লেষণ করছেন। যাইহোক, কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ব্যাখ্যার সময়ে আরও বলব। ১/৩৬

> যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
> কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭
> কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম।
> কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।। ৩৮

অনুবাদ : যদিও লোভে হতজ্ঞান হইয়া ইহারা কূলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছে না। কিন্তু হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে ? ১/৩৭ - ৩৮

ব্যাখ্যা : প্রথম অবস্থায় আত্মিক আমিত্বের পরিস্ফুটনের জন্য প্রকৃতির ইন্দ্রিয়ের একান্ত প্রয়োজন। সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ পাপ বলেই মনে হবে। আমিত্ব পাকা হবার পরে বাসনা মাত্রই বাসনা, শুদ্ধই হোক আর অশুদ্ধই হোক, একই কুলসম্ভূত, মন ও বুদ্ধি থেকেই উৎপন্ন । এদের একদল সংসার পেতে বসে, আবার অপরদল সংসার থেকে মুক্তি চায়।

বাসনাই মনের বেগ। মনের বেগে যা কিছুই করিনা কেন তাতে শ্বাসের ক্ষয় অর্থাৎ আয়ুক্ষয়, ইন্দ্রিয়ক্ষয়, ও শরীরক্ষয় হবেই তা যেভাবেই বলি না কেন।

দূর্ম্মতি বিষয়লোভে মত্ত প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির বশে আয়ুক্ষয় হলেও সেটা এরা মোটেও লক্ষ্য করতে পারছে না, এটা কি কম পরিতাপের বিষয় ! ১/৩৭

ব্যাখ্যা : এখানে কুলক্ষয় কৃত দোষের কথা বলা হয়েছে। এখানে কুল বলতে পরম্পরা প্রসূত যে গোষ্ঠী বা বংশে যে মানুষ জাত হয় সেই কুল নয়। কুল অর্থে কু - পৃথিবী, ল - যিনি ধারণ করে আছেন

। মূলাধার থেকে বিশুদ্ধাক্ষ্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ লিঙ্গমূলের থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত রিপু সকল হল পৃথিবী, একে ধারণ করে আছেন তেজস্তত্ত্ব বা মণিপুরচক্র। সহজ করে বলি তেজের দ্বারাই শরীরের জীবনী শক্তি (vitality / potency) থাকে। দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে সেই জীবনীশক্তি কমে যায়। অপর পক্ষে যোগাভ্যাসে যদি শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তবে তো দোষের কথাই বলতে হবে। আসলে তা নয়। সাধনার দ্বারা শরীর দেখতে কৃশ হয় সত্যিই কিন্তু ইন্দ্রিয় বা দেহও খুব একটা দুর্বল হয় না, বরং ভোগেই ক্ষয় হয়। শরীর কৃশ হলেও তেজ হ্রাস হয় না। তাই সাধনসমরে শরীরের এত প্রয়োজন। "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষণাং শরীরং সাধনাং যতঃ।" এই জন্যই আহার শুদ্ধির প্রয়োজন, যাতে মনের মধ্যে নানারূপ সংকল্প বিকল্প স্থান না পায়। ছন্দোগ্য উপনিষদে আছে ––

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি।
স্মৃতিলাভে সর্ব্বগ্রন্থীণাং বিপ্রমোক্ষঃ ।।"

কুল অর্থ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বা প্রকৃতি। আত্মা প্রকৃতি অবলম্বন করে অবস্থান করে বলে প্রকৃতিকে কুল বলে। ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ ও কুলক্ষয় একই কথা। প্রথমে নিজের আমিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য প্রকৃতি বা ইন্দ্রিয়সকলের প্রয়োজন। তাই সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ পাপের কাজ বলেই মনে হয়। ১/৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভবত্যুত।। ৩৯

অনুবাদ : কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম (অবশিষ্ট) সমুদায় কুলকে অভিভূত করে। ১/৩৯

ব্যাখ্যা : আবার সেই 'কুল'। 'কুলক্ষয়' এবং 'কুলধর্ম্মের' কথা । কুলধর্ম্ম জীবের স্বভাবিক ধর্ম্ম। কুল কথাটি বিবিধার্থব্যঞ্জক। কুল : বংশ, কুল : প্রাণ, কুল : কুণ্ডলিনী শক্তি। এককথায় কুল এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু এই কুলধর্ম্মই বা কি এবং সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই বা কিভাবে করতে হয় তাও তো আদৌ জানিনা। পরম্পরা প্রাপ্ত আচার আমরা সকলেই মেনে থাকি কিন্তু সে সমস্তর অর্থ ও উদ্দেশ্য কিছুই জানি না। সেইসব কাজগুলো যে ঠিক মত করা হয় তাও নয় অথচ এমনই অন্ধবিশ্বাস ও বদ্ধমূল ধারণা যে এসবের অনুষ্ঠান না করলেই কুলধর্ম্ম নষ্ট হবে বলে ভয় করে থাকি। তাই জীবভাবাপন্ন অর্জ্জুনের মনে হচ্ছে যে ইন্দ্রিয়াদিগকে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক। কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে দেহ বিকার প্রাপ্ত হবেনা কে বলল ? নিজে নিজে কিছু একটা ভেবে নিলেই যত গোলমাল। আমরা সাধনাই করি বা বিষয়ভোগই করি, দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি না থাকলে কিছুই হয় না। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ভোগই যদি সাধনাসিদ্ধির বাধা হত তবে হিজড়া (নপুংসক) ও খাসি ইত্যাদির সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিলাভ হত। যাই হোক সপ্তদশ অবয়বাত্মক সুক্ষ্মদেহস্থ সমূহ শক্তিকেই 'কুল' বলে। এই শক্তি মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সন্নিবেশিত করা থাকে। সৃষ্টি বড় বিচিত্র। মেরুদণ্ডকেই তন্ত্রশাস্ত্রে কুলবৃক্ষ বলা হয়েছে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই এর তান্ত্রিক নাম। আজ্ঞাচক্রই উপকূল, সহস্রার কুল। সাধক যখন আজ্ঞাচক্রের সন্ধান পায়, সেখানে স্থিতি হয়, তাকে ঊর্দ্ধস্রোত বা জোয়ারের অপেক্ষা করতে হয়। ঊর্দ্ধস্রোত বা জোয়ারের টানে কুলে পৌঁছায় বা সহস্রারে যায়। অন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের কদমগাছও এই মেরুদণ্ড। কুলশক্তি নষ্ট হলে জীবের প্রাণ মন সবই অধর্ম্মে পতিত হয়, অর্থাৎ দুর্ব্বল ও কর্ম্মশক্তিহীন হয়। তখন আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হয়না। যেকোনও কাজ করতে হলে মনোময় ক্ষেত্রে সেই কাজ সম্বন্ধে ঈষৎ সমাধির প্রয়োজন। তাতে সেই কাজ সম্বন্ধে একটু জ্ঞানের আভাস পেয়ে তবেই কাজে হাত দিতে হয়। তাই কাজ মাত্রেই ষড়ঙ্গ যোগ। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যন, ধারনা ও সমাধি আছে। আমাদের ভিতরে যেসব সুক্ষ্মগুণ প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে স্বধর্ম্ম পালনে সেগুলো স্ফূরিত হয়, না করলে হয়না। সেই শক্তিগুলো অবরুদ্ধ থেকে জড়ত্ব পায় সেই আশঙ্কায় অর্জ্জুন বলেছেন--

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।। ৪০

অনুবাদ : হে কৃষ্ণ, অধর্ম্ম অভিভূত হইলে, কুলস্ত্রীগণ দুষ্ট হয় , হে বার্ষ্ণেয়, (বৃষ্ণি বংশোদ্ভব) স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ১/৪০

ব্যাখ্যা: কুলস্ত্রী অর্থ কুলশক্তি বা জগৎ সম্বন্ধে আবদ্ধ থেকে যে সমস্ত শক্তি আমাদের ভিতর সঞ্চারিত হয় । ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদে এ শক্তিগুলোর স্ফূরণ হয়না। প্রাচীনকালে বর্ণসঙ্কর (জারজ) নিন্দনীয় ও অস্বীকৃত হত এবং মনুষ্য সমাজে গৃহীত হয় নাই। বর্তমানে জড়বাদী ও ভোগবাদী যুগে বর্ণসঙ্কর স্বীকৃত। সবকিছুই স্বীকৃত ও গৃহীত কেবলমাত্র অর্থবান ও ক্ষমতাবান হলেই হল। নচেৎ কলিযুগ পূর্ণ হবে কিভাবে ? আজকাল এমন মিশ্রণ দ্রুত ছড়াচ্ছে, সর্ব্বক্ষেত্রে। সবরকম খাদ্যবস্তু যথা তেল, ঘী, দুধ, মশলা, ইত্যাদি সব কিছুতেই অপবিত্র বস্তু মিশিয়ে খাদ্যকে অখাদ্য তৈরী করা হচ্ছে। ফলে শরীরের ধাতু সমূহ অনুপাত হারাচ্ছে এবং দুরারোগ্য নতুন নতুন ধরনের রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি মৃত্যুর সবকটা লক্ষণ প্রকটিত হওয়ার আগেই মানুষ মারা যাচ্ছে। দ্রব্যের সঙ্করত্বই যখন এতটা দূষণীয় তখন শরীরাদি ধাতুর মধ্যে এই

সঙ্করভাব যে মহা অনিষ্ট উৎপন্ন করছে তা বর্তমান মনুষ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। অল্পবিস্তর সকলেই উৎকট, উদ্ভট চিন্তাভাবনার শিকার। কোনও ভাল মন্দ জ্ঞান নেই, বাছবিচার নেই, অর্থলোভে সবকিছুই করতে পারে। শিক্ষার ব্যাভিচারে পুরুষেরা স্ত্রীভাবাপন্ন ও স্ত্রীলোকেরা পুরুষভাবাপন্ন হয়েছে। আজকাল সাধনে, বৈরাগ্যে, ভক্তিতে, ভাবেতে, জ্ঞানেতে সর্বত্রই এই সঙ্করভাবের প্রাদুর্ভাব দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। স্ব স্ব সাধনেও কতখানি ভ্রান্তি ! বেদ বিধানের বিপরীতাচরণ পদে পদে। গৃহী - সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করছে । আবার কারণে অকারণে সাধুও এসে গৃহীর নিকট হতে দীক্ষা চাইছে। সর্ব্বোপরি একটা নতুন জিনিষ চালু হয়েছে সেটা হল প্রাতিষ্ঠানিক দীক্ষা (Institutional initiation), সেখানে সঙ্ঘই প্রধান, ব্যক্তিগুরু গৌণ। আর কুলগুরু প্রথাতো লুপ্তই হয়ে গেছে। সত্যিকার গুরুগণ (কুলগুরু) প্রকৃত আধারের অভাব বিবেচনায় নিঃশব্দে, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ, দীক্ষাদান পেশা ছেড়ে গিয়ে অতি সঙ্গোপনে সাধনকর্ম্ম করে থাকেন। তাই তাঁরা সচরাচর প্রকাশ হন না, ধরা দেন না। অপরদিকে খেয়ালখুশি মত দীক্ষা গ্রহণের ফলে কিছু ধর্ম্মসঙ্করের রমরমা বৃদ্ধি হলেও প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা বলে কিছু থাকে না, থাকে শুধু মাত্র সঙ্করভাবেরই উপস্থিতি। ফলে ধর্ম্মের ভান যথেষ্ট আছে কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মাচরণের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। মঠ-মিশন এবং ক্লাব সঙ্ঘেরই বিবৃদ্ধি ঘটেছে। দেহ প্রকৃতিতেও সাধকগণ শক্তি সঞ্চার করতে পারছেন না । যদিও সঠিক সাধনা গুপ্তভাবে ফল্গুধারার ন্যায় চলছে। সেখানেও সাধকগণের শরীরস্থ রিপুগণের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাণের ক্ষয় হচ্ছে। সাধনা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হচ্ছে না। যাদের সাধনে অনুরাগ আছে, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। সঠিক সাধনের ফলে তাদের দেহস্থ রিপুগুলি চঞ্চল হলেও সাধনাভ্যাসে সেই চঞ্চলা প্রকৃতি পরাপ্রকৃতিতে লয় হয়ে জ্ঞানরূপী পুত্রের জন্ম হয়। সেইপুত্র, সাধককে নরক থেকে উদ্ধার করে। শিবলিঙ্গ এই যোগের প্রতীক। এইজন্য শিব যোগেশ্বর। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহারেই প্রথমদিকে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটে, আর ইন্দ্রিয় একেবারে উচ্ছেদ করে দিলেই, যেটাকে অর্জ্জুন অধর্ম্ম বলেছেন, সে শক্তিগুলো নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ আমাদের কুলস্ত্রী বা কুলশক্তিসকল দুষিত হয়। আর কুলশক্তি দুষিত হলে বর্ণসঙ্কর হয়। প্রত্যেক জীবের বর্ণ বা জ্যোতি আছে। শ্রীভগবান নিজেও "বার্ষ্ণেয়" অর্থাৎ বৃষ্ণিবংশ প্রচণ্ড জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ থেকে উদ্ভূত গোলাকার কৃষ্ণই বার্ষ্ণেয়। সকলের মধ্যেই কিছু পরিমাণে এই বর্ণ বা জ্যোঃতি থাকে। যে যেমন গুণান্বিত তার জ্যোতি সেই বর্ণের। যোগচক্ষুতে সেই জ্যোতি দেখা যায়। সত্ত্ব = শুভ্র, রজঃ = রক্তবর্ণ, রজ + তম মিশ্রিত = পীত, তমঃ = ধুম্রবর্ণ। আধ্যাত্মিকদেহের এই বর্ণবিভিন্নতাই হিন্দুর জাতিভেদের মূল কারণ। যেজন্য জাতিবিচারের প্রশস্ত নাম বর্ণবিচার। কুলশক্তি স্ফূরিত না হলে বৃত্তিসকলকে পরিচালনা করে স্ব স্ব বর্ণে আমাদের আধ্যাত্মিক দেহকে রঞ্জিত করতে পারে না ও অন্যবর্ণে দুষিত হয়। মনে কর তুমি সাত্ত্বিক অর্থাৎ শুভ্রবর্ণের । সাত্ত্বিকবর্ণের শুভ্রজ্যোতিতে থাক। যদি কোনও কারণে তৎপরিবর্তে রাজসিক ভাবই প্রবল থাকে তবে তোমার সে শুভ্রবর্ণের সাথে রক্তবর্ণ মিশে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। এটা অত্যন্ত দোষের এবং নরকের দ্বার স্বরূপ। ভাবসঞ্জাত প্রাণময় কোষের ঐ বর্ণরঞ্জনা আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষণের জন্যই আমাদের প্রাণময় কোষের উপর বর্ণবিন্যাস রচিত এবং এইজন্যই হিন্দুরা বর্ণ বিচারের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করে থাকতেন। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে যেতে না পারলে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। উন্নতির পথে চারটি ধাপ বা স্তর যথা ব্রাহ্মণত্ব বা শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়ত্ব বা লোহিতবর্ণ, বৈশ্যত্ব বা পীতবর্ণ এবং শূদ্রত্ব বা ধুম্রবর্ণ। আমাদের শাস্ত্রসকল এই সব স্তর থেকে স্তরান্তরে যাবার জন্য সঠিক পন্থাসকলকেই জাতিধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করেছেন। মানব প্রকৃতির ক্রমোন্মেষের গতি লক্ষ্য করেই সেই গতির অনুসরণে ও তারই সাহায্যার্থে সমস্ত বিধিনিষেধের কথা লিখেছেন, আর আমরা এসব না বুঝে শাস্ত্রের সমালোচনা ও দোষ গুণ বলতে থাকি, কিন্তু যোগচক্ষু না পেলে এসব আলোচনা করা যায় না, এ বুদ্ধি মাথায় আসেনা। তাই আমরা স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ও বন্ধনময় স্তরপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সঙ্করদোষ পেয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াই। ১/৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।। ৪১

অনুবাদ : বর্ণসঙ্কর কুলঘ্নদিগের এবং সমগ্র কুলের নরকের নিমিত্তই হইয়া থাকে। ইহাদের লুপ্ত পিণ্ডোদক পিতৃগণ নিশ্চয়ই পতিত (নিরয়গামী) হইয়া থাকে। ১/৪১

ব্যাখ্যা : বর্ণসঙ্কর নিম্নগতির কারণ। একবার মিশ্রবর্ণ পেলে কিছুদিনের জন্য পথবিচ্যুত হয়। যদি আমাদের সূক্ষ্মদেহ বা পিণ্ডদেহ সঙ্করদোষে দূষিত হয় তবে তর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকে সূক্ষ্মশক্তি চালনা করে তাঁদের সাহায্য করতে পারিনা। বর্ণসঙ্কর হলে সে শক্তি পিতৃগণের সাথে সমবর্ণের না হওয়ায় প্রত্যাহত (repulsion) হয়। আমাদের স্থুল শরীরটি দুই প্রকারের। একটি মাতৃজ বা ভাণ্ডদেহ আর একটি পিতৃজ বা পিণ্ডদেহ। মৃত্যুর সময় এই মাতৃজদেহ নষ্ট হয় কিন্তু পিতৃজদেহ আরও কিছুকাল বর্তমান থাকে। এই দেহ স্থুল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম হলেও একেবারে অতিসূক্ষ্ম নয়, কারণ এই চোখেও সেটা সময় সময় দেখা যায়। ভাণ্ডদেহ ব্যাতিরেকে শুধু পিণ্ডদেহে থাকা জীবের পক্ষে কষ্টকর। কারণ মরণমূর্চ্ছা (Brain death) এর পরই চেতনা স্থুল শরীর ছেড়ে দিয়ে আবার পূর্ণসচেতনতা প্রাপ্ত হয়। শুধুমাত্র শরীর ত্যাগ করার যে exercise বা কাজ সেটাই চেতনার পক্ষে কষ্টকর পদ্ধতি কারণ Brain death বা মরণমূর্চ্ছা অপগত হবার পরই প্রেতের (স্থুল দেহহীন সত্ত্বার) পূর্বসংস্কারবশতঃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা অনুভব হয়। আত্মীয়স্বজনদের দেখতে ইচ্ছা হয়। তাদের এই কান্নাকাটি দেখে তারও যথেষ্ট দুঃখ **সন্তাপ** হয়ে থাকে। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এই দেহও নানারূপ কষ্টভোগ করে থাকে। তাই এই দেহটাকে নষ্ট করে দেবার জন্যও শাস্ত্রে নানাবিধ উপায় আছে। এই দেহ প্রায় একবৎসর কাল থাকে,

কখনও কখনও প্রেতকে এইদেহে বহুকাল পর্য্যন্ত থাকতে হয়। পিণ্ডোদক ব্যাতীত এই দেহ নষ্ট হয়না। পুত্রই পিতামাতার সর্ব্বাধিক প্রিয় এবং পুত্রের সাথেই দেহ মনের নিকট সম্বন্ধ থাকে, সেকারণ পুত্রের পিণ্ডোদকই প্রেতের বিশেষ উপকারী। পিতৃগণ তোমার বর্ণনিম্নতাবশতঃ তেমার দ্বারা আর উপকৃত হতে পারেন না। সুতরাং পিণ্ডোদক লুপ্ত হয়ে পতিত হতে পারেন। যাই হোক পরে দেবযান পিতৃযান আলোচনার সময় বিশদভাবে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

যদি মৃতের আত্মা (প্রেতাত্মা) এই পিণ্ডোদক না পান তবে তাঁকে কত দীর্ঘ সময় এই প্রেতদেহে থাকতে হয় তার ঠিক নেই। আর কেউই পিণ্ড দেওয়ার না থাকলে মৃতাত্মা বহুকাল পরে স্বভাবের নিয়ম অনুযায়ী প্রেতদেহ থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু পুত্রবানদের এরূপ ঘোর নরকে বেশিদিন থাকতে হয়না। যাঁরা সাধনায় একটু এগিয়েছেন এবং যাঁরা শাস্ত্র জানেন ও মানেন তাঁরা সকলেই এ রহস্য অবগত আছেন। সে যাই হোক, এই পিণ্ডদেহ নষ্ট হলে আবার স্ব স্ব কর্মানুযায়ী ভোগদেহ লাভ হয়। এরও সবিশেষ নিয়ম আছে। অলমতি বিস্তরেণ। যাঁরা ব্রহ্মবিচারশীল, সাধনশীল ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাঁদের দীর্ঘ নরক দর্শন হয় না। আর একটা কথাও বলি, যাঁরা সাধনশীল তাঁরা নিজের পিণ্ড নিজেই দিতে পারেন। এজন্য পুত্র পৌত্রাদির বা অন্যকারো সাহায্য দরকার হয়না। এই পিণ্ড সাধনার দ্বারাই দিতে হয়। গুরুগীতায় বলা আছে, "পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ", - কুণ্ডলিনী শক্তির নামই পিণ্ড। ইনি মূলাধারস্থিত চৈতন্যশক্তি। যোগাভ্যাস দ্বারা এই শক্তিকে চৈতন্যযুক্ত করতে হয়। চৈতন্যযুক্ত হলেই শক্তি আর নীচে অবস্থান করেন না তখন সুষুম্নাপথে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে অবস্থান করেন। আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থই বিষ্ণুপদ, এখানে কুণ্ডলিনীর স্থিতি হলেই পিণ্ডদানক্রিয়া হয়ে থাকে। তখনই জীবের পরমজ্ঞান লাভ হয়। এবং এই জ্ঞানের দ্বারা সাধক জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করেন। বাস্তবিক এই আত্মকর্ম্ম দ্বারাই প্রকৃত পিণ্ডদানক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং এই জন্যই ভগবান -- এরপর ২য় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে থাকতে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হতে উপদেশ দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ৫৪ নং শ্লোকে অর্জ্জুন নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন " স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা "? আমাদের ভাষার অক্ষর সকলও বর্ণ বলে পরিচিত। শব্দ ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। ভাবশূন্য শব্দ হতে পারে না। এই ভাবই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মূল। অরূপভাব উদ্দীপ্ত হয়ে বর্ণময়, রূপময় হয়ে ওঠে ও রূপজগৎ রচনা করে। আমাদের স্থূলদেহও ভাবসকল ঘনীভূত হয়েই রচিত হয় একথাও আগেই বলেছি। তাই ভাবসংযমের জন্যই কর্ম্মবিচার, জাতিবিচার ও সমাজ গঠিত হত। ভাব হতে বর্ণ, বর্ণ হতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হতে শরীর, আবার শরীর হতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হতে বর্ণ, বর্ণ হতে ভাব। শক্তির এই উভয়মুখী গতি যে পুরোটা বুঝতে পারে সেই প্রকৃত বিদ্বান। একটা গল্প বলি --

প্রাচীনকালে এক রাজা পশুপাখীর ভাষা বুঝতে পারতেন। তাই পশুপক্ষী তাঁর কাছে এসে সুবিচার চাইত। একদিন সকালে এক কুকুর এল। সে বলল এক ব্রাহ্মণ তাকে অন্যায় ভাবে খুব মেরেছে। এবার রাজার লোক সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে আনল। রাজা তাঁকে বললেন আপনি অন্যায়ভাবে বিনাদোষে এই কুকুরটাকে মেরেছেন কেন ? ব্রাহ্মণ বললেন, গুরুদেবের পূজার ফুল আনছিলাম কুকুর মাঝে পথজুড়ে শুয়েছিল। কুকুরের ছোঁয়া লাগার ভয়ে পথ ছাড়তে বলায় ও শোনেনি তাই ওকে তাড়াতে গেলাম, কিন্তু ও আমায় ছুঁয়ে দিল, আমার পূজোর জিনিসও নষ্ট হল, তাই ওকে মেরেছি। কুকুর বলল, আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম, সরে যেতে গিয়ে ছোঁয়া লেগেছে, কিন্ত্র অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যাপারটা না বুঝেই আমাকে রীতিমতো প্রহার করেছে। সুতরাং উনি দোষী। রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনারই দোষ। কুকুর বলল, আপনার বিচারে উনি যদি সত্যই দোষী হন, তবে শাস্তিটা আমার ইচ্ছামত দিন। ওনাকে আপনার কুলপতি রূপে বরণ করুন। ব্রাহ্মণ খুবই আশ্চর্য্য হলেন। রাজাও হেসে বললেন, ব্রাহ্মণ, এতো দেখছি আপনার শাপে বর হল। দেখুন আপনি ইচ্ছুক হলে এবং রাজি থাকলে আমি এখনই আপনাকে কুলপতি পদে বরণ করি। ব্রাহ্মণ এটাকে খুবই লাভজনক ভেবে বলল, আমি তো এক কথায়ই রাজি কিন্তু আমার গুরুর অনুমতি ছাড়া কিছুই হবেনা। আমি একটু সেই অনুমতিটা নিয়ে আসি বলে সানন্দে গুরু সমীপে গেলেন এবং বললেন। কুকুরটাও সাথে সাথে গেল। সব শুনে গুরুদেব বললেন, বৎস এতে তোমার এত খুশীর কিছুই নেই। তুমিতো প্রাপ্তির আশায় খুশী হয়েছ। এ কুকুরটাও আগে কুলপতি ছিল, ঐপদই ওর আজকে কুকুর হওয়ার কারণ। প্রভূর তোষামোদ, মনসন্তুষ্টি ইত্যাদি করে করে ওদের সুক্ষ্মদেহ এই সংস্কারেই আচ্ছন্ন হয় ও শেষে কুকুরে পরিণত হয়। কুলপতিত্ব কুকুরবৃত্তি বলেই জানবে। তোমার দারিদ্র্য অনেক মঙ্গলের। একুকুরটা সেজন্যই তোমাকে কুলপতি করতে চাইছে। যদি কুকুরত্ব চাও, তবে ঐ পদে নিযুক্ত হও। সব শুনে ব্রাহ্মণ বরং কুকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে নিরস্ত করলেন। তাই বলছি যে সংস্কার তৈরী হয় কিভাবে ? কর্ম্ম থেকে ভাব, ভাব থেকে আবার বর্ণ। আবার বর্ণ থেকে কিভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠান হয় এই গল্প থেকে বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। ১/৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।। ৪২

অনুবাদ : কুলঘ্নদিগের এইসকল বর্ণসঙ্করকারক দোষে সনাতন বর্ণ, ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মসকল (আশ্রমধর্ম্মও) উৎসন্ন হইয়া যায়। ১/৪২

ব্যাখ্যা : সঙ্করভাব সত্যিই অনিষ্টকারক এবং এই সঙ্করভাব থেকে জাতীয়তাই নষ্ট হয়। যেমন ঘোড়া ও গাধার মিশ্রনে অশ্বতর (খচ্চর) জাতির উৎপত্তি । আধুনিক পশুশালায় বাঘ ও সিংহীর মিশ্রনে

উৎপন্ন বাংহ (Tigon)অপরপক্ষে সিংহ ও বাঘিনীর মিশ্রনে সিংঘ্র (Litigon) ইত্যাদি দেখা যায়। এগুলো প্রকৃতি ও সমাজের ধ্বংসাত্মক বিবর্তনের নমুনা। কিন্তু অশ্বতর (খচ্চর) অশ্বও নয় আবার গাধা (গর্দভ) ও নয়। সংকরভাব জাতির বিশেষত্বটিকেই নষ্ট কওে। এটা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। উচ্চ বংশ ও উচ্চ বর্ণ এইভাবেই স্ব স্ব বিশেষত্ব হারিয়ে অধম হয়ে যায়। উচ্চ নীচের সাথে সম্মিলিত হলে জীবনের উচ্চভাব ও লক্ষ্য হতে জীব পরিভ্রষ্ট হয়ে যায়। যদিও একথা এখন আর কেউ বিশ্বাস করতে চায়না কিন্তু কর্ম্মসকল যথা সময়েই তার ফল প্রসব করে (as a corollary) আর তা হয় বিষময় কারণ বর্ণসঙ্কর তো জারজ ব্যাতীত কিছুই নয়। আসলে মলিন, বিষম আহারের ফলে ও স্বধর্ম্মের অননুষ্ঠানে আজ এই সঙ্করভাব পরিব্যপ্ত হয়ে পড়েছে ও আত্মঘাতী ভোগবাদ প্রসারিত হচ্ছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিশাহারা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং অন্ত র্লক্ষ্যের কথা বাদ দিলেও বেশ বোঝা যায় সমাজের কল্যাণেচ্ছু স্থিরমতি চিন্তাশীল অর্জ্জুনের মনে কেন এরূপ বিচার উৎপন্ন হয়েছিল।

সাধনার রাজ্যেও সঙ্করভাব বিশেষ ক্ষতিকর। কিছুটা এগিয়ে সামান্য বিভূতি লাভ হয়েই আসল লক্ষ্য ভুল করে বসে। ভাবের বিকৃতি ঘটে যায়। এরপরই সব বিরোধী ভাবসকল উৎপন্ন হতে থাকে তখন সারা জীবন সেই কুক্রিয়ার ফল ভোগ করতে হয়। ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত হলেই এমনটা হয়ে থাকে। কারণ প্রকৃত ধর্ম্ম এক বৈ দুই নয়। তবে জীব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে থাকে ততক্ষণ সঙ্করভাবকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রগতিশীলতার আশ্রয় খোঁজে যেটা আসলে অত্যাধিক ইন্দ্রিয়াসক্তি ও মোহেরই (Infatuation) অপরিহার্য্য পরিণাম। কিন্তু সাধনার প্রমাবস্থায়ই তো বুদ্ধি পরিণত হয় না তাই কিছু যুক্তি তর্ক এসে প্রথম অবস্থায়ই খুব চঞ্চল করে তোলে, একটা উল্টোভাবের চিন্তা আসে। কুলঘ্ন হলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের উচ্ছেদ হলে বর্ণসঙ্কর প্রাপ্ত হওয়ার অশঙ্কা হয়। তাই সাধকের কোমল প্রাণ বিপর্য্যস্ত হয়, যতক্ষণ না সাংখ্যজ্ঞানে সাধকের হৃদয় আলোকিত হয়। তারপর শক্তিজ্ঞানের বিমল আভাস ফুটে উঠলে সে অজ্ঞান দূর হয়, শান্ত হয়। আর মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবানের সঙ্গছাড়া হয়না। একজন সাধককে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি ভগবানকে দেখেছেন ? সাধক উত্তর দিয়েছিলেন, " ভগবানকে কে না দেখেছে ? তুমিও ভগবানকে দেখেছ ও দেখছ। আমিও ভগবানকে দেখেছি ও সবসময়ই দেখছি। তবে তুমি দেখে তাঁকে চিনতে পারনি, আর আমি চিনতে পেরেছি, তফাৎ এটুকুই।" তাই সাংখ্যজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের চিন্তাভাবনাই সঠিক থাকেনা। মনে করে ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম ছেড়ে ভাবের আবেশে সব ভাসিয়ে দিলে আধোগতি হবে। এই আশঙ্কায় সাধনার পন্থা নির্দ্ধারণ করতে না পেরে নানারকম জটাজুট, বিভূতি তিলক, মঠ মিশনকেই শ্রেয় মনে করে নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে বসে। ১/৪২

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম্।। ৪৩

অনুবাদ : হে জনার্দন, যাহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয় সেই সকল লোকের নিয়ত নরকে বাস হয়, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ১/৪৩

ব্যাখ্যা : প্রকৃত কুলধর্ম্ম কি সেটা না জানার ফলে জীবের আশঙ্কা হয় যে কুলধর্ম্মের নাশে নিয়ত নরকবাস হবে কিন্তু জীবের এ আশঙ্কা অমূলক, কারণ যোগীর শুধুমাত্র আত্মাতেই স্থির অবস্থিতি ব্যতীত অপর কোনও ধর্ম্ম নাই । আমরা যেসব বাহ্যিক আচরণকে কুলধর্ম্ম বলে জানি, যোগীর দ্বারা সেসব অনুষ্ঠিত হওয়া কঠিন। সাধন করে নেশায় মশগুল থাকলে সংসার ধর্ম্ম, লোকাচার, সামাজিকতা কিছুই ঠিকমত পালন করা যায় না। তিনি যে স্বেচ্ছায় এমত অবহেলা করেন তা নয়,তাঁর ঐরূপ অবস্থায় এসব সম্ভবও হয়না, সেজন্য তঁদের কোনওরকম দোষও হয়না। "নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।" কর্ম্মের অনুষ্ঠান করলে বা না করলে জ্ঞানী ব্যক্তির পূণ্য বা প্রত্যবায় কিছুই হয়না। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভাবে যে ইন্দ্রিয়াদি দমন অথবা গৌণ হয়ে গেলে, যোগে ভোঁ হয়ে বসে থাকলে চলবে কেন ? বরং ওতেই অধর্ম্ম আশ্রয় করে। তাই ওসবে কাজ কি বাপু ? ওতে চিরাচরিত সংসার সমাজ প্রথা নষ্ট হয়। ব্যাপারটা বাইরের দিক থেকে ভাবলে কিছুটা এরকমই বটে কিন্তু প্রকৃত কুলধর্ম্ম অন্যরকম যেটা যোগীদের কুলধর্ম্ম। আগেই বলা আছে যোগীরা মেরুদণ্ডস্থিত সুষুম্নাকেই কুলবৃক্ষ বলেন। কুলশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে সুষুম্নামুখ রুদ্ধ করে নিদ্রিত (জড়বৎ নিশ্চেষ্ট)থাকেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা নাড়ীচক্র বিশুদ্ধ হলেই, সুষুম্নাপথে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হলেই মনস্থির হয়। এই অবস্থাকেই যোগীরা "উন্মনী" বলেন। লক্ষ্যে স্থির রেখে এই সকল যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠানকেই কুলধর্ম্ম বলা হয়। ঊর্দ্ধগতি হারালেই লোকসকলের গতিচ্যুতি হয়। সেইজন্যই নরক বলা হয়েছে। তাই কুলধর্ম্ম উচ্ছেদ হলে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির পথ থেকে বঞ্চিত হলে গতিচ্যুতি বা নরক গমন। আসলে প্রতি মূহূর্ত্তে আমরা মরছি আবার জন্মাচ্ছি। প্রতিবার শ্বাস গ্রহণ করে আমাদের প্রাণশক্তি উদ্দীপিত ও নতুন বর্ণরঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়ে দেহকে সেই মত গঠন করছে। তাই অর্জ্জুন ভগবানকে জনার্দ্দন বলে সম্বোধন করেছিন। জনার্দ্দন শব্দর অর্থ স্রষ্টা ও প্রলয়ের কর্ত্তা। জন অর্থ জন্মান বা সৃজন করা। "অর্দ্দন" অর্থে সংহার বা নাশ। তাই যিনি সৃজন ও প্রলয়ের কর্ত্তা তিনিই জনার্দ্দন।

আসলে সাধকের প্রাণ যা খুঁজছে তাতো ওতঃপ্রত ভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই পরিব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয় যা বহন করে আনে তাও ভগবান। কিন্তু ইন্দ্রিয় সেগুলোকে ভোগ্য বিষয় বলে গ্রহণ করে ও তার অনুগত হয়ে পড়ে, তাই আর ভগবানকে ভগবান বলে চেনা যায়না ও প্রাণকেও চিনতে দেয়না। সেইজন্যই ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের পরিত্যাগ দরকার হয়। বেদে আছে "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু। তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি

নান্তরাত্মন্।" যার অর্থ হল "ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভু তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। অথবা স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া অন্তরাত্মাকে তাহারা দেখিতে পায়না।" ১/৪৩

অহোবৎ মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।। ৪৪

অনুবাদ : হায়, অমরা মহৎ পাপ করিতে অধ্যাবসায় করিয়াছি। সেহেতু রাজ্যসুখ লোভে স্বজন বধে উদ্যত হইয়াছি । ১/৪৪

ব্যাখ্যা : জীবগণ ভোগীর চিত্ত দিয়ে দেহসুখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। আন্তর রাজ্য লাভের আকাঙ্খায় ইন্দ্রিয় দমন করায় ভোগদেহের ভীষণ আপত্তি। ইন্দ্রিয়ই জীবদেহের স্বজন ও বান্ধব। তাই মনে করে আত্মরাজ্যসুখলাভ করতে গিয়ে স্বজন বান্ধবদের হনন করা হবে। জীবভাব থেকেই একথা মনে হয়। আন্তররাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ সহ বিবিধ যোগৈশ্বর্য্য তথা স্থিরত্ব লাভ হবে সত্য কিন্তু এইসব ইন্দ্রিয়, এত দেহের ভোগ, সবই মাঠে মারা যাবে। যোগের কুহকে পড়ে যোগক্রিয়াদি শুরু করলে আমাদের এইসব স্বজন বান্ধব দেহ ইন্দ্রিয়াদি যাদের নিয়েই আমাদের সংসার সুখ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। সাধু সদ্গুরু প্রদর্শিত পথে গেলে সংসার, সুখ, ভোগজীবন সব শেষ। অতএব গুরুদেবকে প্রণাম করে, বিদায় জানাও। এই হল বিমুগ্ধ চিত্তের কথা। স্বার্থান্ধ হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে আশ্রম ধর্ম্মকে অবহেলা করতে উদ্যত হয়ে নিশ্চয় মহাপাপের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। এটাই হল জীবাত্মার ভ্রম, তথা সাধকেরও ভ্রম। ১/৪৪

যদি মামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। ৪৫

অনুবাদ : যদি সশস্ত্র ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রতিহিংসা বিমুখ ও অশস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বধ করে তাহাও আমার পরম হিতকর। ১/৪৫

ব্যাখ্যা : ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত হলে জীবের এরূপ ভাবই হয়ে থাকে । মনের বিবিধ বাসনার দাসত্ব করতে এতটাই ভাল লাগে, এটাই চরম ভাললাগা। প্রবৃত্তির বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র যথা নানা প্রকার লোভ, কত কামভাবের কথা, মন যখন এই সব ভাবে মশগুল হয়ে থাকে, বেশ মজে যায়, তখন নিজেকে এদের হাতেই ছেড়ে দেয়, আত্মসমর্পণ করে। প্রকৃতি আমাকে কুলে কুলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব্বজন্ম গুলোর মত বিনা প্রতিরোধ বিনা প্রতিকারে তেমনই ভেসে যাব। শাস্ত্রের অপমান করে ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করব না। এত জন্ম ধরে যেসব ইন্দ্রিয়জ্ঞান ফুটিয়ে তুললাম আজ হঠাৎ সেসব

নষ্ট করতে যাব কেন ? তাতে আমার যা কিছু অমঙ্গল হয় হোক। যাক্ অধ্যাত্মজীবন চুলোয় যাক্ । সাধনা করে একটু আধটু যা হয়েছে যাক সব শেষ হয়ে। ইন্দ্রিয়সুখই আমার সব । এসব ছাড়া যাবে না। এটাই পরম হিতকর মনে হয়। গুরুদেবের পাল্লায় পড়ে ও বিভিন্ন সৎসঙ্গে মিশে সৎপথে যাবার জন্য যাও বা একটু চেষ্টা চরিত্র করা যাচ্ছিল তাও ছেড়ে দিতে চায়। মুগ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়াসক্তির কি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি (Infatuation) । ১/৪৫

সঞ্জয় উবাচ -

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।। ৪৬

অনুবাদ : সঞ্জয় কহিলেন। অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া রণস্থলে সশর ধনুঃ ত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্তে রথোপরি বসিয়া পড়িলেন। ১/৪৬

ব্যাখ্যা : মায়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়সকল তথা কামনা বাসনার প্রতি অতি আসক্তিবশতঃ তাদের প্রতি মোহান্ধ ভাবনায় আবিষ্ট হলে আর সাধনা করা হয় না। তখন শরীর ঢিলে হয়ে আসে। মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে থাকেনা। মন বিক্ষিপ্ত হলে শরচালনা অর্থাৎ প্রাণায়াম আর ঠিক ঠিক হয়না। ক্রিয়াতে অনিচ্ছা আসে ফলে প্রাণায়াম ক্রিয়া বন্ধ করে আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি রেখে চুপচাপ বসে তমোগুণের আশ্রয়ে যায়। তমোভাব এসে চিত্তকে ঘিরে ধরে। চক্রে মনোনিবেশ বন্ধ হয়ে যায়।আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, প্রমাদ, শোক প্রভৃতিতে ঘিরে ধরে। যার পরিণাম ক্রিয়াতে'অনিচ্ছারূপ' ঘোর সঙ্কট ও বড় ব্যাধি। এটাই সশর ধনুত্যাগ। এভাবে সাধন পথ পরিত্যাগ হলেই সাধক অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকেন যদি না গুরুশক্তি কোনও না কোনও ভাবে এসে আবার আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করে।

জীব জগতে জীবগণের দেহাধীশ বুদ্ধিই অহরহ তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। দেহাধীশ বুদ্ধিসকল অবার বিপরীত লিঙ্গানুসারী। অর্থাৎ পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত আবার ক্বচিৎ স্ত্রীজাতিও পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, কিন্তু সৎ চিৎ শক্তিদ্বারা কদাচ প্রভাবিত হয়না। এটাই চরম তমোগুণ। যদিও সৎচিৎশক্তি উভয়ের মধ্যই প্রভূত বিদ্যমান। তবুও তার সন্ধান কেউই রাখেন না। ফলে কোনও ভাবে দৈবচক্রে কিছু পূর্বসুকৃতির ফলে এই সৎচিৎশক্তির সন্ধান যদি বা একটু পাওয়া গেলে, সেটুকু আবার পারিপার্শ্বিক বিপরীত লিঙ্গআবেশ এসে নষ্ট করে দ্বিগুণ বেগে তমোভাবকে ডেকে আনে এবং নিজ নিজ আত্মশক্তির বিনাশ ঘটায়। তাই বলছিলাম মায়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। বহুদিন ধরে বৈরাগ্যে কৃতনিশ্চয় হয়ে আজ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ অতি

অদ্ভুত, অতি বিচিত্র। কতদিনের আশা আকাঙ্খাকে মুহূর্ত্তের মোহ এভাবেই হৃদয় থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভাবে কেন আমি ইন্দ্রিয় ছাড়ব ? ইন্দ্রিয় দিয়েই জগৎকে প্রত্যক্ষ করি তবে তোমাকে কেন প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় সাহায্যে ভোগ করা যাবেনা ? আমায় যেমন ইন্দ্রিয়ময় করে তুলেছ, তুমিও তেমনই ইন্দ্রিয়ময় হয়ে কেন আমার সামনে আসবেনা ? তা যদি না আসবে, তবে কেন আমায় ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অভ্যস্ত করে তুললে ? আজ সহসা আবেগে পড়ে সমস্ত কেমন করে পরিত্যাগ করব ? সহসা সবই স্বপ্ন ভেবে কেমন করে সব মুছে ফেলব ? সত্যি সত্যি যদি সব স্বপ্নই হয়, তবে সেই স্বপ্নেই তোমায় পেতে চাই। যদি সব মিথ্যাই হয়, তবে সে মিথ্যারই মাঝে তোমায় দেখতে চাই। ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম ত্যাগে কৃতসংকল্প হলে এমনটাই হয়। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ভালমত জানা না থাকায়, আশঙ্কায় সাধকের প্রাণ কাঁপে ও বিষাদমণ্ডিত হয়। অত্মপ্রতিষ্ঠায় ইন্দ্রিয়ের অবয়ব মাত্র উচ্ছেদ হয়, কার্য্যকারিতা অটুট থাকে । স্থুল ও জড়ভাব হারিয়ে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী হয়। ক্রমশঃ একসময় স্থুলের সাহায্য বিনাই কাজ করা যায়। ঐ অবস্থাই নিরাকার অথচ সম্পূর্ণ বিকাশময়। নিরাকার অথচ সুপ্রকাশ, সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত অথচ সর্ব্বগুণাভাষ যুক্ত অবস্থায় পৌঁছে দেয়। উর্দ্ধগতি অর্থ স্থুলের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যকারিতার অভিব্যক্তি। যে যত দেহের সাহায্য ছাড়াই ইন্দ্রিয়কর্ম্ম করতে পারে তার তত ঊর্দ্ধগতি হচ্ছে বুঝতে হবে। এরকম কার্য্যকারিতা অনুসারে লোক হতে লোকান্তরে জন্মগ্রহণ ও বসবাস হয়। মনে কর, তুমি যোগাভ্যাস করছ। যোগাভ্যাসে শরীর হালকা হয়, তখন খুব দুর্ব্বল লোকও তোমাকে তুলতে পারে। তোমার প্রাণও তীক্ষ্ণ হয়। অল্প বাতাসে শ্বাস নিতে পার, ঘ্রাণশক্তি বাড়ে। খাদ্য দেখেই স্বাদ গ্রহণ হয়। এখন এই অবস্থায় যদি দেহত্যাগ কর, তবে পূর্ব পূর্ব কর্ম্ম অনুকুল থাকলে সূর্য্যলোকে জন্ম হতে পারে যদি সঞ্চারিনী শক্তি সূর্য্যালোকে বসবাসের উপযুক্ত হয়ে থাকে। যোগচর্চ্চায় শ্বাসপ্রশ্বাস নাসাভ্যন্তরচারী হওয়ায় অল্পবায়ুতেও প্রাণকর্ম্ম করতে পার। প্রাণকর্ম্মে প্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হওয়ায় বায়ুর সাহায্য ছাড়াই শুনতে পাও। তীক্ষ্ণজ্যোতির সন্নিধানে দর্শন হওয়ায় সূর্য্যলোকেও সেটা কার্য্যকরী। অতএব তোমার সূর্য্যলোক প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। তোমার ঐ সংস্কার নিজ শক্তির উপযুক্ত কার্য্যকরী ক্ষেত্রে সূর্য্যলোকের মত কোনও লোকে তোমাকে নিয়ে যাবে। এভাবেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ে বুঝতে হবে। সংস্কার হতেই ইন্দ্রিয় জন্মে। প্রশ্ন হয় পরজন্মে তো এ দেহ থাকবে না। তবে এ দেহের শক্তি পরজন্মে কার্য্যকরী হবে কিভাবে ? এমন আশাঙ্কাই নেই, কারণ কার্য্য দেহ করেনা। কার্য্য সংস্কার করে। সংস্কার কার্য্যোপযুক্ত দেহ নির্মাণ করে নেয়।

এই আলোচনা থেকে এটা বেশ স্পষ্ট হল যে ইন্দ্রিয়কার্য্য সুকৌশলে করা হলে কিভাবে সেটা সূক্ষ্মতা অথবা প্রবল কার্য্যকরী শক্তি লাভ করে ও আমাদের ঊর্দ্ধগতিতে সাহায্য করে এবং ঊর্দ্ধগতিই এনে দেয়। এটাও বোঝা গেল যে ইন্দ্রিয় নিরাবয়বত্ব পেলেও তার কার্য্যকরী শক্তির আভাস এবং প্রভাব দুইই চিরবর্তমান থাকে। কিন্তু সাধক প্রথমাবস্থায় এ তত্ত্বটা ঠিক বুঝতে পারেনা বলেই ঈন্দ্রিয় হারাবার ভয় করে বা ভাবে ইন্দ্রিয়শক্তি ও শরীরটাই বুঝি নষ্ট হল। অতএব সংসার ধর্ম্ম সব গেল মনে করেই ঘাবড়ে যায়। বৈরাগ্যকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ বলেই ধরে নিলে বিষাদে এইভাবে মর্ম্মপীড়া হবে। এটাই সাধকের প্রথম অবস্থা, প্রথমযোগ বা বিষাদযোগ ॥ ১/৪৬

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষদসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অর্জ্জুন বিষাদযোগ নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার প্রথম অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

প্রথম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ: জীবের জীবনচক্রে একটি বিরাট শূন্যতা আছে। শৈশবে মা, বাবার অভাব, অনুপস্থিতি জনিত শূন্যতাকে দিদিমা, ঠাকুমা দিয়ে ভরাতে চায়, যৌবনাগমে যে শূন্যতা তা হৃদয়ঘটিত প্রেমভালবাসা দ্বারা পূর্ণ করতে জীব সচেষ্ট হয়। পরবর্ত্তীকালে সেটাকে টাকা পয়সা ধনদৌলত দ্বারা পূর্ণ করতে চায়, তারপর ভাবে ছেলে দিয়ে সেই ফাঁক ভরে উঠবে। কিন্তু হায়, যখন বুঝতে পারে এসমস্ত কোনও কিছুতেই কিছু হবার নয়, তখনই প্রাণে সঞ্চারিত হয় প্রকৃত অভাব, প্রকৃত বিরহ। এই ভাবে কোনও এক অজ্ঞাত, অব্যক্ত অভাবের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, জীব তখনই সর্বপ্রথম ভগবদ্ বিরহ উপলব্ধি করে এবং বৃথা জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে ভেবে যখন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, সেটাই হল জীবের জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে আর্ত্তপ্রাণ একটা অবলম্বন অনুসন্ধান করে ফেরে।

সেইসময় কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের মত তার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে একদিকে সংসার - সংস্কারশ্রেণী - স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, অত্মীয়স্বজন, দেশ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়সঞ্চিত ও সঞ্জাতভাব যা মায়ার মুর্তিধারী এবং অন্যদিকে হৃতসর্ব্বস্ব রাজ্যচ্যুত আত্মশক্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করে। ধীর, বিবেচক, বীর সাধক সেইসময় নিজের অবস্থা পুরোপুরি ভাবতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। একদিকে প্রাণাকুল পিপাসা, অন্যদিকে মায়ার বন্ধন, একদিকে আত্মলাভের আশার উজ্জ্বল আলোক, অন্যদিকে পরার্থে আত্মত্যগের কমনীয় ক্ষীন আলোকরেখা - জ্যোতিরেখা - একদিকে প্রভাত অন্যদিকে সন্ধ্যা, সাধক এই দুইদিক দেখতে দেখতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাঁর উদ্যমের ধনু খসে পড়ে, শরীর অবসন্ন হয়ে আসে, কণ্ঠ শুকিয়ে যায়, সে মায়ার ফাঁসে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে পড়ে, অনন্ত জীবনের মায়ার বাঁধন ছিড়তে গিয়ে, এভাবে মায়ার ফাঁস যখন শেষ বারের মত তাঁকে জড়িয়ে ধরে, তাঁর সেই দুর্ব্বলতাই তখন বিজ্ঞতার ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের মত ভগবানকে বলে -

আমার ভালবাসার চির অধিকারী এই সমস্ত আত্মীয়গণকে হৃদয় থেকে উচ্ছেদ করতে হবে বুঝে আমি স্থির থাকতে পারছি না। আমি সমস্তই বিপরীত দেখছি। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী,

পুত্র, অত্মীয় ও স্বজনদের হৃদয় থেকে উচ্ছেদ সাধন করলে আমার কি মহাপাপ হবে না ? না, না, আমি পারবো না। আত্মলাভরূপ স্বার্থসাধনের জন্য স্বার্থত্যাগরূপ মহাধর্ম্মকে উপেক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিলাম, আমি মহাপাপ করতে যচ্ছিলাম, মহাপাপে লিপ্ত হতে চলেছিলাম! সংসারে ডুবে থেকে যদি আমার জীবনান্তও হয় তাও শ্রেয় , তাও আমার পক্ষে হিতকর। এখানে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, অত্মীয়, স্বজন, দেশ ইত্যাদির প্রকৃত অর্থ হল ইন্দ্রিয়গণ ও তৎপ্রবৃত্তিসকল পঞ্চতত্ত্বের আপনার জন। জীবের ভোগ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সেই ইন্দ্রিয়গণকে যদি বধ করতে হয় তবে আর দেহ ধারণের ফল কি? ইন্দ্রিয়গণই যদি না থাকল তবে সুখাদি ভোগ করবে কে ? এই আশঙ্কাই জীবভাবের সাধনায় প্রথম অপ্রবৃত্তি যা অর্জ্জুনের কথা দিয়েই শুরু হয়েছে। বিষাদে, সন্দেহে, আশঙ্কায় যথার্থই যখন সাধকের প্রাণ এমন দিশেহারা হয় তখন বিষাদভরা ক্লান্ত হৃদয়টুকু নিয়ে সে ভগবানের দারস্থ হয়, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে ভগবানের উপর সব ভার অর্পণ করে দিয়ে বলে -

" যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

বাস্তবিক, ইন্দ্রিয়দমনই সাধনার উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয় সকলের বিনাশ কিন্তু সাধনার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু জীবভাব সেটা জানে না, তাই অমুলক আশঙ্কায় পড়ে ভোগে। এই ভীষণ মায়াবর্ত্তের তরঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ ভেবে তুমিও কি নিরাশ হয়েছ ? মায়ার সমর প্রাঙ্গনে মায়া হননে উদ্যোগী হয়েও তুমি কি মায়ার ছলনায় আবার ভুল করছ? তবে দাও তোমার ইন্দ্রিয়অশ্বযোজিত হৃদয়রথের দড়ি হাতে তুলে দাও, একবার রণক্ষেত্রের মাঝে স্তব্ধহৃদয়ে দাড়িয়ে নিজের কর্তব্যরূপ ধনু পরিত্যাগ করে করজোড়ে জ্যোতির্ময় সারথির কাছে কেঁদে বল, - "প্রভূ, সখা! আমি বিপন্ন, আমি মায়ামূঢ়, সংসার মায়া হনন করতে ইচ্ছুক হয়েও পারছি না, আমি স্ত্রী পুত্রের মোহের বাঁধন কাটতে অসমর্থ, আমায় রক্ষা কর, আমায় পথ দেখাও, আমার কর্তব্য স্থির করে দাও।" দেখবে তিনি নিজ স্বরূপে প্রকাশ হয়ে তোমার বিষাদ মোচন করে দেবেন। গম্ভীর মন্ত্রনিনাদে তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই অনাথের নাথ বলে উঠবেন, "ভয় পেও না, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর, আমি তোমার সহায়।"

এটাই বিষাদযোগ। ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত হলে এমনটিই হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অর্জ্জুনের প্রাণে সর্বপ্রথম এই ভাব হয়েছিল। তবে অর্জ্জুন ও অন্যান্য সাধকে প্রভেদ আছে। মহাসাধক অর্জ্জুন সাধকের আদর্শ, তাই অর্জ্জুন ভগবানকে অন্নময় কোষে বা স্থূলকোষে বা জড়দেহেই উপভোগ করেছিলেন। আর অন্যান্য সাধক - সাধকমাত্র, তাঁরা শুদ্ধ মনোময় কোষে ভগবানকে এই ভাবে সম্ভোগ করতে পায়। ভগবানের গীতা মনোময় ক্ষেত্রে মাত্র শুনতে পায়। আদর্শ সাধক না হ'লে স্থূলকোষে ভগবৎসম্ভোগ সচরাচর ঘটে না। কারণ, প্রকৃত ধর্ম্ম এক বৈ দুই নয়। তবে জীব ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে থাকায় ধর্ম্মকে নানা প্রকার মনে করে এবং ধর্ম্মলোপের এমনই সব অমূলক আশঙ্কা করে থাকে।

--**--

ওঁ

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ (২)

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ -

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ।। ১

অনুবাদ : সঞ্জয় কহিলেন। মধুসূদন তাদৃশ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুল লোচন বিষাদযুক্ত তাঁহাকে (অর্জ্জুনকে) এই কথা বলিলেন। ২/১

ব্যাখ্যা : বিষাদের গভীর অন্ধকারে হৃদয় পূর্ণ হলে মায়ায় মায়ায় প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন হলে সাধক এসময় তাঁর সাধনলব্ধ দিব্যদৃষ্টিতে যখন অনুভব করতে লাগলেন -- তখনই আবার শরীরস্থ তেজও স্থির মনকে একই সেই অনুভবে আটকে দিয়েছে যে অনেক কালের সুখভোগের মাধ্যম এই সকল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনেক ভোগ করেছি আজ তাদেরই দমন করব এই ভেবে চোখ জলে ভরে যায়, আর দুঃখিত হয়ে কুটস্থ চৈতন্যকে আপন ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে সাধনক্ষেত্রে গেলেই জীব বুঝতে পারে যে সাংসারিক জীবনের পারিবারিক মায়া মমতা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তি গুলো কত জোরালো সাধককে পিছনে ধরে রাখার পক্ষে। তাই কুটস্থচৈতন্যের (শ্রীকৃষ্ণের) নিকট অবিরত প্রার্থনা করতে থাকে এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। সেই সময়ই ভগবদুপদেশ শুনতে পাওয়া যায়। ভগবৎ চিন্তা করতে বসে ক্রমশঃ মন চারিদিক থেকে সরিয়ে এনে প্রাণশক্তিতে কেন্দ্রীভূত হলে সেই মহামুহূর্ত্তে সাধকের হৃদয়ে এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটে। অন্ধকার ইন্দ্রিয়পথে থেকে প্রাণ এতদিনে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন সহসা চিৎরাজ্যের আলোর বিশাল বিস্তারে প্রবেশ করতে এসে ভীত, সংকুচিত ও বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাই যোগের পথে আর এগোতে পারেনা। তখনই সংকটাপন্ন সাধকের প্রাণে সর্বপ্রথম ভগবান যে ভাবরাশি ফুটিয়ে তোলেন, যে ভাবের ও জ্ঞানের দ্বারা প্রাণকে উৎসাহিত করেন ও এগিয়ে দেন এবং এইভাবে প্রথম যে ভাবের দ্বারা প্রাণশক্তি জেগে ওঠে ও সাহায্য পায় তাকেই সাংখ্যযোগ বলে। কিন্তু আগে বিষাদ না হলে এই সাংখ্য অবস্থার অনুভব হয় না। আজকাল অনেকেই যোগ শিখতে আগ্রহ দেখায় এবং সদগুরুর অভাবে কিছু হল না বলে আক্ষেপ

করেন। কিন্তু যে জিনিষ হলে সদ্‌গুরুর লাভ হয়, যোগের যা মূল উপাদান তা কিন্তু তাদের ভিতর খুঁজে পাবে না। তাই বললাম, প্রাণে বিচ্ছেদের উপলব্ধি, আকুল পিপাসা, এসমস্তই বিষাদ, এসব না থাকলে সাধনার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র । যার পা দুটোই নেই, চলার শক্তি নেই, তাকে পথের সন্ধান দিয়ে কি হবে ? বরং কিছু টাকা আয়ের সন্ধান দাও, প্রাণে আনন্দ হবে, মনে শান্তি হবে। জলস্রোত আপনি আপনার পথ বের করে নেয়। প্রণালী (Channel) কেটে দিলে পথ সুগম হয় বটে কিন্তু স্রোত না হলে শুকনো প্রণালী পড়ে থাকে মাত্র। টাকা পয়সা বা ইন্দ্রিয়ভোগের কথা বলে বা শিখিয়ে দিতে হয়না, আপনিই হয় ॥ ২/১

শ্রীভগবান উবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ।। ২

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন ‘হে অর্জ্জুন, (এতাদৃশ) সঙ্কটে কোথা হইতে এই অনার্য্য-সেবিত, অধর্ম্মজনক ও অকীর্তিকর মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল’? ২/২

ব্যাখ্যা : কিছুদিন যাবৎ এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকার পর সহসা প্রাণের ভিতর এক ভিন্ন অনুভব হতে নিয়মিত ক্রিয়া চলতে থাকে। যোগাভ্যাসের সময় প্রণায়াম কালে যখন সাধকের শ্বাস ষটচক্র পথে চলাচল করে সেসময় মন কূটস্থে আবদ্ধ হলেই এক বিশেষ অনুভব আসে ও সাধক বিশেষ ভাবে সব জানতে ও বুঝতে পারেন। এটাই প্রকৃতপক্ষে কূটস্থের প্রকাশ। এই অবস্থা দ্বারাই সাধক অনুভব করতে থাকেন যে আসক্তি পূর্বক চিন্তা করাই যোগবিঘ্নকারক আর সাধক সেটাই করছে। ব্রহ্মতে যাঁরা থাকেন সেটা তাঁদের কাজ নয়, এটা তাঁদের পক্ষে অসামান্য ক্ষতিকারক। এতে কোনও সুখ নেই। বরং কূটস্থ থেকে বিচ্যুতির কারণ। এই যে সাধন সময়ে মন বিষয়ের দিকে ছোটে, এর ফলেই মন কূটস্থ থেকে সরে যায়, আসল পাপই এই। নতুবা সংসারে সাধকের পক্ষে পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। কূটস্থে মন রাখলে পাপ নেই, কূটস্থে মন না রাখলেই পাপ। এতে মন সমতা হারায়। যে সমতাই অভয়পদ, “সমত্বং যোগ উচ্যতে” । বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে সেই সমতা হারালেই পথভ্রষ্ট / যোগভ্রষ্ট হতে হয়। ফলে সেই ‘আমি আমার’ বোধ আবার ফিরে আসে ও মন মোহগ্রস্থ হয় অর্থাৎ আবার সেই ত্রিতাপযুক্ত হেয় পরিণতি। কিন্তু প্রাণের ভিতর কে যেন বলে ওঠে কেন এমন মোহগ্রস্থ হচ্ছ ? ইন্দ্রিয়ের মায়া এত ? এই বিষম আবস্থা কাটিয়ে উঠলে তোমার প্রাণ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। এসময় কেন এত মুহ্যমান ? ২/২

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।। ৩

অনুবাদ : হে পার্থ, কাতরতা (অবসাদ) প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমার যোগ্য নহে। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। ২/৩

ব্যাখ্যা: "ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য"-এর কথা এখানে বলা হয়েছে। খুবই সত্যি কথা যে মানসিক শক্তির অভাবেই আমরা একবার এদিক একবার ওদিক করে বেড়াই । ঠিক মত বিষয়ভোগও করতে পারি না আবার বিষয়ত্যাগও করতে পারি না। সম্পূর্ণরূপে বিষয়ভোগ করেও ঁগিরিশ চন্দ্র ঘোষ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহৈতুকী কৃপা পেয়েছেন, তাঁর সর্ববিষয়েই মৌলক পরিবর্তনের কথাও সকলেই জানেন। সেজন্য আগে ভাগে ভাল করে ভেবেচিন্তে যে পথটা ভাল মনে হয় সেটা ধরে থাকাই ভাল । বিষয় ভোগের পরে যে ক্লেশ অনুভব হয় সেটা উপলব্ধি করে মনকে সরিয়ে ঐশীপথে আনাই দরকার। অবশ্য প্রথম প্রথম তেতো ওষুধের মতই জোর করেই মনকে ভগবৎ সাধনে নিয়ে আসতে হয়। সাধনায় জোর করে অভ্যাস করলেই প্রাণবায়ু স্থির হয়ে মাথায় উঠে গেলে এর চেয়ে ভাল কিছুই মনে হবে না। তাই মনের এই দোদুল্যমান অবস্থায় সাধকের কূটস্থের দ্বারায় অনুভব হচ্ছে যে হে পরন্ত প, কামনা বাসনাসক্ত মনকে কিভাবে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে হয় তা তো তুমি ভালই জান। তবে আর এসব বিলাপ করে বৃথা সময় নষ্ট করে কি লাভ ? ভগবান সাধককে (অর্জ্জুন) এখানে পরন্তপ বলে সম্বোধন করলেন। অর্থাৎ তুমি পরম তেজশালী, দৌর্ব্বল্য তোমার ধর্ম্ম নয়। এই দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হলে তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হবে। আসলে মায়া জ্ঞানের ছদ্মবেশে জীবকে বন্ধনে রাখার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় নিজেকে পরন্তপ, পরমতেজশালী পুরুষ, বলে ভাবতে হয় আর অন্তর্মুখে এগিয়ে যেতে হয়। সাধনকালে চক্রস্মরণ না করে বিষয়চিন্তা বা ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তা করা বা ইন্দ্রিয়দের উদ্দেশ্যে কাতরতা বোধ করা সাধকের শোভা পায়না। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে প্রতি চক্রে চক্রে শ্বাসক্রিয়া দ্বারা আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভই কাজের কথা। এটাই একান্ত দরকার। নিম্নাধিকারী সাধককে না পারলেও লেগে থাকতে হয়। আগে যে পিতৃ ও মাতৃশক্তির কথা বলেছি এ দুটোর একটা শক্তিও যখন কাজ না করে, তখনই ক্লীব অবস্থা। ঐ অবস্থাকেই ক্লৈব্য বলে। এভাবে কর্তব্যকর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়াই ক্লীবত্বের লক্ষণ। ২/৩

অর্জুন উবাচ –

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অনুবাদ : অর্জ্জুন কহিলেন। হে শত্রু বিমর্দ্দন মধুসূদন, আমি বাণসমূহ দ্বারা এই রণক্ষেত্রে (পিতামহ) পূজনীয় ভীষ্ম ও (আচার্য্য) দ্রোণের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব ? ২/৪

ব্যাখ্যা : শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই আমাদের গুরু। বাপ ঠাকুর্দ্দা যা করে এসেছেন সেই রাস্তা ছেড়ে কিভাবে থাকি ? চিরাচরিত পথে চলাই তো জীবের স্বভাবিক নিয়ম। এখন এই যোগাভ্যাস করতে গেলে যেসব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে সেটা তো কেউ মেনে নিতে চায় না। তাই শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব বলেছেন যে যোগভ্যাসে প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ হতে পারে, গুরুজনেরা সে কথাই বলে এসেছেন, তাঁদের আমরা চিরকাল মান্য করি। সেই পথ ছাড়ি কি করে ? কুটস্থ চৈতন্য তুমি বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়াদি শত্রুদিগের নাশক। তাই কুটস্থ দর্শনে অন্তঃশত্রুর পরাজয় হয়। অর্থাৎ সে সময় আর কাম ক্রোধের শক্তি থাকে না। আদর্শ সাধক অর্জ্জুনের পরন্তপ নামের এখানে সার্থকতা। প্রথমে শিশু অপরের হাত ধরে চলতে শেখে। পরে হাঁটা শিখলে সে তখন তার নিজের ছন্দে চলতে পারে, সে ছন্দ পূর্ব্বপুরুষের চলার বিপরীতে নয়। কিন্তু প্রথমে মনে হয় বুঝি বিপরীত পথে চলতে হবে। তাই পরের শ্লোকে বলেছেন ------- ২/৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ।। ৫

অনুবাদ : মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া, ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও নিশ্চয় শ্রেয়ঃ। কিন্তু গুরুদিগকে বধ করিলে ইহলোকে (তাঁহাদের) রুধিরলিপ্ত অর্থকামাত্মক ভোগসকল উপভোগ করিতে হইবে। ২/৫

ব্যাখ্যা : চিন্তাই আমাদের মনোময় দেহের আহার আর গুরুবর্গ থেকেই চিন্তারূপীয় ভাবধারা মনোময় কোষের জন্য সংগ্রহ করে থাকি। চিন্তারূপীয় ভাবসকল আবার চিত্তবৃত্তির পরিপোষক। এই চিত্তবৃত্তিই ইন্দ্রিয়ের বল। আজন্মলালিত এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে যেতে লজ্জা, মান, ভয় ইত্যাদি স্বাভাবিক। কিন্তু "লজ্জা, মান, ভয় তিন থাকতে নয়" অর্থাৎ এসব থাকলে তো সাধনা হয় না। ফলে ক্রিয়া করতে গেলে এসব একপেশে গুরুগণ (ভয় ও জেদ) কে উচ্ছেদ তো করতেই হবে এবং জড়শিক্ষার ভ্রান্তিকে নাশ করতে হবে। অর্থাৎ সদ্গুরু প্রদর্শিত পথে যোগাভ্যাস করে চিরাচরিত ভ্রান্তির বিনাশ করতে হবে। তাতে ক্রিয়াজনিত ফল যতই অনিশ্চিত হোক।

আর রুধিরপ্রদিগ্ধ বলার কারণ কি ? স্থূলদেহ যেমন সাতরকম কোষ অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ুতে তৈরি তেমন মনোময় দেহও সাতটা জিনিষে তৈরী যার নিষ্ঠা হল হাড় বা অস্থি, চিন্তা হল রস, ভাব হচ্ছে রক্ত, কর্ম্ম হচ্ছে মাংস, জ্ঞান হচ্ছে মেদ, বুদ্ধি হচ্ছে মজ্জা, এবং ব্রহ্মান্বেষণ হল এর প্রাণ। স্থূল কর্ম্ম থেকে ভাবরূপ রক্ত তৈরি হয়ে আমাদের মনোময় দেহকে বাঁচিয়ে রাখে। স্থূল দেহের কোনও অংশ কেটে গেলে যেমন রক্ত বের হয় তেমনই স্থূল কর্ম্মত্যাগ করলে মনোময় দেহ কেটে যায় ও ভাব সকল বের হয়ে যায়। ওটাই মনোময় দেহের রক্তস্রাব । সুতরাং ক্রিয়া না করে অন্য কোনও ভাবে মনোময় দেহকে খাওয়ানো যায়না। অন্যভাবে খাওয়া দিলেও তা বেরিয়ে যায়। ওতে কোনও কাজ হয় না। মনের পুষ্টিও মোটেই হয়না। এজন্যই শাস্ত্রেও এত করে মন্ত্রগুপ্তির কথা বলা আছে। মন্ত্র প্রকট হলেই নষ্ট হয়ে যায়। ভাবও তাই প্রকাশ হলেই রক্তস্রাব হয়। সাধন ব্যাপার গুপ্ত রাখলেই মনোময় দেহের বল বাড়ে। যে যত প্রকাশ করে ফেলে তার সাধনা ততই অকৃতকার্য্য হয়। মন্ত্রগুপ্তিই সিদ্ধির উপায়, প্রকটেই বিনাশ। এটা যেন মনে থাকে। ভাব কথায় প্রকাশ হয়ে গেলেই ব্রহ্মান্বেষণ শক্তির পুরো ক্ষয় হয়। এজন্যই স্থান কাল পাত্র ভেদে নানা প্রকার কর্ম্মের আবরণে উপদেশ দিয়েছেন। কর্ম্মযোগ আলোচনার সময় ভালমত বলব। ২/৫

> ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
> যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ।।৬

অনুবাদ : আমরা জয়ী হই কিংবা (ইহারা) আমাদিগকে জয় করুক -- এই দুয়ের মধ্যে কোনটা গুরুতর (প্রার্থনীয়), ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে।২/৬

ব্যাখ্যা : ইন্দ্রিয়গণকে বধ করবে বা ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিজিত হবে, এই দুয়ের মধ্যে কোনটা গুরুতর, কোনটা অভিপ্সীত, সাধক এই উভয়সঙ্কট অবস্থায় যেটা ঠিক বুঝতে পারছে না। তার তেজস্তত্ত্ব প্রাণ যেন বলছে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনাশ করে আমি বাঁচতে চাই না। অথচ সেই সব ধার্তরাষ্ট্রাঃ অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় × দশদিকে ধাবমান = ১০০ পুত্ররূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল বধ্যরূপে আমার সামনে উপস্থিত আছে। আগে অর্জ্জুন বলেছেন জয়ে কল্যাণ নেই, এখন বলছেন পরাজয়েও কল্যাণ নেই, মানে নিবৃত্তিপক্ষকেও ছেড়ে দিতে চান না। এটা কিছুটা ভাল লক্ষণ। অর্থাৎ মনোবৃত্তিগুলোকে মোটেই ত্যাগ করতে চাইনা। তার কারণ মনের বিবিধ বৃত্তির মধ্যেই নিজেকে বর্ত্তমান দেখা যায়। ফলে মনে হয় বুঝি বিষয় না থাকলে মনের সাথে আত্মাও থাকবেনা। কতবড় ভুল ধারণা! বিষয়েন্দ্র বিলাসী মন ভাবতেও পারছেনা যে মনোবৃত্তি রোধ হলেও আমিরূপ অহং বা আত্মা স্বচ্ছন্দেই বেঁচে থাকে। সমাধিসিদ্ধ সাধক সেটা বেশ ভালই বোঝে।২/৬

> কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ।। ৭

অনুবাদ: চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয় দোষে অভিভূত স্বভাব এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যাহা আমার শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও।। ২/৭

ব্যাখ্যা: বিষাদ না হলে নির্ভরতা আসেনা, সাধনাভ্যাসের শুরুতে নানা রকম সন্দেহ মনকে বিবশ করে, ইন্দ্রিয়াধীশ বুদ্ধি ফলাকাঙ্খায় অভ্যস্ত তাই আত্মাতে ভাব অর্থাৎ স্থিতি নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ধর্ম্ম কি তাই জানতে পারেনা অথচ মুর্খের ন্যায় অধিক বিচার শুরু করে, কতরকম স্পর্ধা প্রকাশ করে কিন্তু তাতে কোনও কুলকিনারা যখন দেখতে পাওয়া যায় না তখনই অনন্যোপায় হয়ে গুরুর শরণ নেয়, শরণাগত হয়। স্বীকার করে আমি বড়ই কৃপণ, কারণ সকল কর্ম্মেই ফলাকাঙ্খা করি। এজন্য চিত্ততেও স্থির থাকতে পারিনা। যেটি ভাল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তে থাকা অথবা দমন করা, সেটা বলুন, অনুভব করিয়ে দিন। সুদীর্ঘ বিচার বিবেচনার দ্বারাও খেই হারিয়ে, অবশেষে নিজের শক্তিতে পরিত্রাণের উপায় নেই বুঝতে পেরে বিরাট শক্তির নিকটে সাহায্য প্রার্থী হতে হয়। আমিত্বের অভিমান (egotism), পদের অভিমান (designation complex), সম্পদের অভিমান, সুন্দরী স্ত্রী, গুণবান পুত্র প্রভৃতির অভিমান সকলই বিষ বুঝতে হয়। তবেই বিষাদ আসে। বিষ থেকেই যেমন হয় বিষাদ তেমনই এই বিষাদ থেকেই আসে শরণাগতি। কেউ কেউ বলে থাকেন আগে ভোগ পরে ত্যাগ। ঠিকইতো, ভিক্ষুকের তো কিছুই নেইই তাই তার ত্যাগের প্রশ্নই নেই। সে ভিক্ষাই করে বেড়ায়, তার আরও চাই, আরও চাই। অপরদিকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতম রাজ্যে অভিষেকের পরেই, সুন্দরী স্ত্রী লাভের পরেই, সদ্যজাত শিশুপুত্র রাহুলের মুখদর্শনের পরই সবকিছুই ছাড়তে পেরেছিলেন। কিন্তু থাক সে অন্য কথা। এখানে গুরুতে আত্মসমর্পণ করতে না পারলে কিচ্ছুই হয়না। সাধনার এই স্তরে এসে "যথা দেবৌ তথা গুরৌ"। গুরুকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করতে না পারলে কিছুই হয়না। শিষ্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে হবে তিনি "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ" নতুবা এই শরণাগতি আসেনা। বলতে হয়, দৃঢ়তার সাথে ভাবতে হয়, "আর আমি নিজ ইচ্ছা মত কিছু করব না, এবার তুমি যা বলবে তাই করব, তোমার দ্বারাই শাসিত হব।" এইভাবেই গুরুর শাসন বরণ করে নিতে হয়। গুরুপ্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্রস্থ হওয়া একই কথা। তোমার ছোট্ট মুখের ছোট্ট ফুৎকার যেমন শঙ্খের মধ্যে গিয়ে উচ্চশঙ্খনাদ ধ্বনি তৈরী করে, তেমনই তোমার

ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু, ক্ষুদ্র শক্তিটুকু যদি গুরুকে অর্পণ করতে পার, তবে সেটা শতগুণে শক্তিসম্পন্ন হয়ে তোমাকে শক্তিমান করে তুলবে। এটাই দ্বিতীয় ক্রিয়া প্রাপ্তির রহস্য বা চাবিকাঠি। যখন গুরু ---

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ ত্বাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্"।

"সেই বিদ্বান ব্রহ্মবিদ্ গুরুসমীপে আগত (শরণাগত) সম্যক প্রশান্ত চিত্ত (বিষয় ব্যাকুল নয়) গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ মনঃ সংযমী ও বাহিরিন্দ্রিয় দমনে সমর্থ সেই মুমুক্ষু শিষ্যকে যে ব্রহ্মবিদ্যা, অন্তর্মুখী সাধনা, দ্বারা (সত্যং অক্ষরং পুরুষং) নিত্য, অবিনাশী ও হৃদয়পুরে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত পরমাত্মাকে জানা যায় যে যে সাধনকৌশলাদি উপায়সহ, সেই ব্রহ্মবিদ্যা শরণাগত শিষ্যকে বলবেন।" অর্থাৎ অর্জ্জুন যে জ্ঞান লাভ করবেন তারই গোড়াপত্তন হল। নিজ নিজ ব্রহ্মসত্তায় গুরুবোধ যতদিন না আসে, ততদিন সাধনার দ্বিতীয় বা সাংখ্যস্তরে প্রবেশ বা আরোহণ কিছুই করা যায়না। যতদিন না জীবভাবকে নিজের ব্রহ্মভাবের শিষ্যত্বে নমিত করা যায়, ততদিন সাধনার পথটিই রুদ্ধ থাকে এবং সংশয়, বিচার ও সন্দেহের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষের হৃদয়ে গুরুপ্রতিষ্ঠার মত আধারও অবশ্য জীবের সাধারণতঃ থাকে না। চোখের পার্শ্বদৃষ্টি ফিরিয়ে এনে মধ্যস্থলে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। ভাল করে দেখ সারথিরূপে, বন্ধুরূপে, ভ্রাতারূপে, কখনও নিজ, কখনওবা অপরের প্রণয়ী বা প্রণয়িণীরূপে কে তোমার আশেপাশে রয়েছে, তার মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকাও। তার চরণে লুটিয়ে পড়। দিন ও রাত্রির সঙ্গমস্থলে ঊষা যেমন সূর্যচরণে নতশির হয়, তেমনই ভাবে তোমার হৃদয়ের আলোক-অন্ধকারের সঙ্গমস্থলে তাঁর চরণে শরণাগত হও, চরণ জড়িয়ে ধরে বল - "শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম," বিষাদ যদি সত্যই এসে থাকে, মহাস্রোতের আকর্ষণ যদি সত্যই অনুভব করে থাক, তবে আর কিসের ভাবনা ? শুধু সংশয়কে তাড়াও, ঐ একটাই শত্রু, মহাশত্রু। তোমার সব বিচার, আশঙ্কার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখ, তোমার সব আলো-অন্ধকারের মধ্যে থেকে তাঁকে দেখ, তোমার সমস্ত আগ্রহ অসুবিধার মধ্যে থেকে তাঁকে দেখ, যদি পার জীবন দিয়ে তাঁর চরণযুগল জড়িয়ে ধরে কাঁদো। হায়রে মূর্খ! তোমার তৃষ্ণা তিল মাত্র জাগলেই গুরু এসে উপস্থিত হন। কিন্তু হায়! সন্দেহ, সংশয়, তোমার সে তৃষ্ণাকে হৃদয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে দেয়না, গুরু পেয়েও তোমার গুরুলাভ হয়না। কারণ তুমি স্বার্থান্ধ জগতের জীব, তাই গেরুয়া বসন, সাজ গোজ, মঠ মিশন, লোক জমায়েত, জাঁক জমক, আয়করে ছাড় ইত্যাদির ভিতর আধ্যাত্মিকতার খোঁজ করছ, আর খড়ের গাদায় সূচ খুঁজে ঘুরে মরছ। যদি যথার্থ শিষ্য হতে চাও, তবে সুক্ষ্মজগতের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করবে। স্থূল জগতের গোটা কয়েক চক্ষুর দিকে চেয়ে ভুলে থেকো না।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গুরুপ্রসঙ্গে কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় আলোচনা আবশ্যক যা সময়ান্তরে পরিশিষ্টাকারে আলোচনার ইচ্ছা রইল । ২/৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ।। ৮

অনুবাদ: পৃথিবীতে নিষ্কন্টক সমৃদ্ধ রাজ্য, এমনকি সুরগণেরও আধিপত্য পাইলেও যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনয়ন করিতে পারে, এতাদৃশ কিছুই দেখিতেছি না। ২/৮

ব্যাখ্যা : প্রকৃত অবস্থাপ্রাপ্তি না হলে শুধুমাত্র কল্পনার দ্বারা কোনও কিছুই বোঝা যায়না। সেই জন্যই জীবভাবের কল্পনাপ্রসূত চিন্তা যে সমুদায় বিষয়ের আসক্তি রহিত হয়েও কিছু কল্যাণ অনুভব হচ্ছেনা। ইন্দ্রিয়ের মায়া মুখে বা কথায় যেভাবে উপেক্ষা করা যায় কার্যতঃ সেভাবে পারা যায় না। এটা সাধক মাত্রেই জানেন। তাই জীবভাবের কথা হে গুরো ! আমি আত্মরাজ্য স্থাপনে ইন্দ্রিয়ের শোষণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। সেই হননের আশঙ্কায় আমি শোকাভিভূত। এমন কিছুই আছে বলে মনে হয়না যা কিছু ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আমার প্রিয় হতে পারে। সাধক অর্জ্জুনতুল্য তেজশালী হলেও তাকে ইন্দ্রিয়ের মায়ায় পড়তে হয়। এখানেও ইন্দ্রিয়মায়ায় আবদ্ধ জীবেরও সেই ভ্রান্তি। ক্রিয়ায় যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হলেও বা মূলাধার গ্রন্থি জয় করে আসক্তিরহিত অবস্থাও পেতে পারি বটে, কিন্তু তাতে তো ইন্দ্রিয়ের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সুতরাং সুখ আর কোথায় রইল ? এটাই জীবের বিষম ভ্রান্তি। শুধু কল্পনায় জলতৃষ্ণা মেটে না। তৃষ্ণা মেটাতে পানীয় আবশ্যক । রমণ ব্যতীত সন্তান জন্মে না। যোগাভ্যাস ব্যতীত চিত্ত শমিত হয় না। আর চিত্ত শমিত না হলে ইন্দ্রিয়ও দমিত হয় না। মনোরাজ্য ধ্বংস না হলে আত্মরাজ্যও প্রতিষ্ঠা হয় না। আর এই মনোরাজ্য বিনাশের কথা ভেবেই জীবের মোহজনিত এত শোকসমুদ্র। ২/৮

সঞ্জয় উবাচ –

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ।। ৯

অনুবাদ : সঞ্জয় কহিলেন। শত্রু বিজয়ী গুড়াকেশ (অর্জ্জুন) হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া "আমি যুদ্ধ করিব না" কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইলেন।। ২/৯

ব্যাখ্যা : সাধক বিষাদ পীড়িত হবার পর যখন উভয় দিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়, আত্মরাজ্য অথবা মনোরাজ্য কোনটি শ্রেয়, এবং এই বিচারের ভার নিজের উপর গ্রহণ করে তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখে, আর কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য নির্ণয় করতে পারে না। এটা সাধনার দ্বিতীয় অবস্থার উন্মেষণ। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সাধকের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে, অথচ সহজ যুক্তি ও জ্ঞান মায়াবিজড়িত হয়ে তার হৃদয়কে আত্মজ্ঞান ইচ্ছার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। এরূপ সঙ্কটে পড়েই সাধক ভগবানে আত্মসমর্পণ করার সংকল্প করছে। কিন্তু এইরকম স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াকে যথার্থ নির্ভরতা বলে না। প্রাণে অন্য কোনও চিন্তা বা ইচ্ছা বলবতী থাকতে, অন্য বস্তুর উপর পূর্ণ আসক্তি থাকতে আত্মসমর্পণ আসে না। আমি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করব এই উদ্দেশ্য অভ্যন্তরে নিহিত থাকায় আত্মকর্তৃত্ব এসে পড়ে। প্রাণ উদ্দেশ্যশূন্য হয়ে যখন ভগবানে নির্ভর করে তখনই যথার্থ ভগবানে আত্মসমর্পণ করা হয়। এটাই শুদ্ধাভক্তি । সাধকের এ অবস্থা হতে অনেক দেরী হয়। বিষাদের পর দ্বিতীয় অবস্থায় আমিত্ব শক্তির দুর্বলতা বুঝে, ভগবৎ শক্তির প্রবল স্রোতের মুখে দাঁড়াতে অক্ষম জেনে, সাধক যেন ক্ষুন্নভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে। এটা অক্ষম বুঝে আত্মত্যাগ বা সমর্পণ। যাই হোক, এটুকু আত্মত্যাগেরও মহাফল আছে। জীবন সঙ্কটে না পড়লে ভগবৎ অনুভূতি হয়না। যখনই কোনও মঙ্গলশক্তি জগতে কাজের সূচনা করে সাথে সাথে তার বিরুদ্ধ শক্তিও উজ্জীবিত হয়ে তাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে থাকে। দৈবী শক্তির অবতারণা হলেই আসুরিক শক্তি চারিদিক থেকে এসে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। কি ব্যাষ্টিভাবে, কী সমষ্টিভাবে, এই শক্তিরহস্য সর্বত্র দেখা যায়। এ জন্যই আমরা জ্ঞানের পাশে সন্দেহ, দয়ার পাশে কৃপণতা, ভক্তির পাশে দ্বেষ, সহানুভূতির পাশে হিংসা, সাধকের পাশাপাশি ভণ্ড ইত্যাদি দেখতে পাই। যাক সে অন্যকথা, যা বলছিলাম যে, সব শিষ্যেরই এ অবস্থায় একই দুর্দ্দশা, হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা। - “ন যোৎস্যে” তো বলা গেল কিন্তু গুরু যে হাল ছাড়েন না, তিনি যে অর্ন্তর্য্যামী গোবিন্দ। যদিও মূঢ়চেতা আমার স্পর্ধিত চিত্ত শ্রীগুরুদেবের এই স্বাধিকারকে প্রথম দিকে মোটেই মানতে চায় না আর তা থেকেই এত বিপত্তি। আমাকে কী করতে হবে সেটা যে তাঁরই ইচ্ছার অধীন।। ২/৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ।। ১০

অনুবাদ : হে ভারত, হৃষীকেশ যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে, উভয় সৈন্যর মধ্যে বিষন্ন অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলেন। ২/১০

ব্যাখ্যা : সাধকরূপী জীব যখন নিজের চেষ্টাশক্তির পরাধীনতা ও বিরাট শক্তির অক্ষুন্নতা বুঝতে আরম্ভ করে তখন তার পুরুষকার শ্লথ হয়ে পড়ে। কর্তব্য বুঝতে পারলেও তা করার প্রবৃত্তি হয় না। তখন চির জাগ্রত সর্বেশ্বর এই আত্মা কূটস্থচৈতন্য, যিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে সর্বদাই জীবের দিকে চেয়ে আছেন, তিনি জীবের এই ভাব দেখে একটু বুঝি উপভোগ করছেন। তিনি জীবের অন্তরবাসী কি না, তাই জীবের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করছেন। ক্রিয়া করব না যে বলে সেও জীব। শরীরের তেজই একথা বলায়। তেজ না থাকলে কোনওটাই বলা চলে না। অতএব, এই হ্যাঁ বোধক (positive attitude) এবং না বোধক (negative attitude) স্থিতির মধ্যে অবস্থিত দুজনেই ছিলেন জীবভাব (তেজস্তত্ত্ব) অর্জ্জুন ও তাঁর সখা শ্রীগুরুদেব স্বয়ং শ্রীভগবান (কূটস্থ চৈতন্য) যিনি জীবের প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি স্থাপন করে তার অন্তঃকরণ কে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। নচেৎ এ ভববন্ধন কি কোনও দিনও কাটত ? তাঁর এতই দয়া। এজন্যই ভক্ত তাঁকে করুণাসিন্ধু বলে থাকে। যখনই মানব প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টার মধ্যে বিবাদ দেখা যায়, কোনও সৎকার্য্য করতে গেলে হয়ত প্রবৃত্তি আমাদের সেইদিকে সাহায্য না করে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়, তখনই এক মহাশক্তি সাধককে বুঝিয়ে দেয় যে বিপরীত শক্তিটি আর কিছুই নয় ঐ একই শক্তির আবর্ত্তন মাত্র। কিন্তু তখনও সেই সাধক উভয় শক্তির একত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না তাই সেই মহাজ্ঞানী (গুরু) উঠে পড়ে লাগেন এই আমিত্ব ও বিরাটরূপী দ্বৈতভাবের বন্ধন থেকে ভ্রান্ত বিচারের নাশ করে অদ্বৈতে নিয়ে যেতে। পরবর্ত্তী শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২/১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পন্ডিতাঃ ।। ১১

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন, যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, অথচ বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ। পণ্ডিতরা কিন্তু মৃত বা জীবিতদিগের জন্য শোক করেন না। ২/১১

ব্যাখ্যা : যাঁরা সমদর্শী তাঁরাই পণ্ডিত ‘পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ’।। যা গত হয়েছে তার বিষয়ে অনুশোচনা পণ্ডিতেরা করেন না। সমদর্শীরা করেন না। কেবলমাত্র শাস্ত্রাদি পাঠে ঐ সমদর্শিতা জন্মে না, পণ্ডিতও হওয়া যায় না। দেবর্ষি নারদ পুরাণের সাথে সাথে পঞ্চবেদ ও বিবিধ শাস্ত্র জেনেও আত্মতত্ত্ববিৎ হতে না পারায় শোকাকুল হয়েছিলেন, বেদাধ্যয়নের পরও কিন্তু অভ্যাসবিস্মরণ, অবমাননা, ও গর্ব্বহেতু তাঁর মনের আরও বেশি অশান্তি হয়েছিল।

বর্ত্তমান শ্লোকে অর্জুনরূপী সাধকের অবস্থাও সেইরকম। এ অবস্থায় মানুষ প্রাজ্ঞের মত কথা বলে কিন্তু সেই রকম কাজ করতে পারে না। তাই ভগবান এই সময়ে এই ভাববৈষম্যময় অবস্থার প্রতি সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । যাতে কথায় ও কাজে সমতা আসে। এই অবস্থায় সাধকের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এই অবস্থা লক্ষ্য করে বলেছেন; জীব ! তুমি বিজ্ঞের মত কথা বলছ, কিন্তু অজ্ঞের মত কাজ করে চলেছ। আসলে সমদর্শী না হলে কেউ পণ্ডিত হতে পারে না। সেটা আবার বড়ই কঠিন। সমদর্শী কে হতে পারে ? সদ্‌গুরু প্রদর্শিত সাধন দ্বারা যাঁর উপযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। ইড়া, পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাস প্রবাহিত হয় ততক্ষণ প্রকৃত জ্ঞান শুধু মুখের কথা মাত্র। সাধন সমরে শ্বাসজয় হলে অর্থাৎ সুষুম্না অন্তর্গত হলেই শুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদয় হয় ও প্রজ্ঞান জন্মে। এছাড়া আমরা যেসব জ্ঞানীর মত কথা বলি সে সবই কপটাচার মাত্র। কারণ কার্য্যকালে তার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। সুতরাং‘অসদ্বৃত্তি’। জ্ঞানদৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। শুধু মনে মনে‘সবই এক, এসব কিছু নয়’ এমন কল্পনা শুধু নিজেকে বঞ্চনা করা মাত্র। অপরকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। সেটাও লোক ঠকানো কাজ বা ভণ্ডামি।

“যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্মারুতো মধ্যমার্গে
যাবদ্‌বিন্দুর্ন ভবিত দৃঢ় প্রাণবাৎ প্রবন্ধাৎ।
যাবদ্ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবজজ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ।।
রাজযোগস্য মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধির্গুরুবাক্যেন লভ্যতে।।”

ইতি হঠযোগপ্রদীপিকা

সাধনালব্ধ জ্ঞানের চোখে জন্ম মৃত্যু নাই; তবে আমরা অজ্ঞতাহেতু যা দেখি সেসব বিকার মাত্র। যেমন বায়ু হতে জলবিম্বের উৎপত্তি আবার বায়ুটা বেরিয়ে গেলেই বিম্বের আকার নষ্ট হয় এবং যে জলে এর উৎপত্তি হয়েছিল সেই জলেই মিশে যায়। তেমনই কালরূপে ঘটস্থ হয়ে চঞ্চল হলে‘আমি’‘তুমি’ ইত্যাকার জ্ঞান হয়। এই‘আমি’‘তুমি’ গেলেই সবই আত্মা, সবই ব্রহ্ম। তখন কোনও বিন্দুরই উৎপত্তি ও নাশ নেই। সাধন দ্বারা এই জ্ঞান স্থায়ী হলেই কাজে ও কথায় বিরোধ থাকে না। প্রকৃত জ্ঞান উন্মেষের সাথে সাথে ভাব ও বাক্য সকল যেমন উন্নত হয় সেই দিক লক্ষ্য রেখে নিজের কাজকেও সেই অনুপাতে যে উন্নত করতে পারে সেই যথার্থ সাধক। ২/১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ।। ১২

অনুবাদ: আমি যে কখনও ছিলাম না, এমনও নয়, সেইরূপ তুমি ছিলে না, এমন নয়, এই রাজাগণ ছিল না, এমন নয়, ইহার পরে আমরা সকলে থাকিব না, এমনও নয়। ২/১২

ব্যাখ্যা : সত্যিকথা জীবের পক্ষে এমন আশ্বাসের বাণী বুঝি আর নেই। সারা পৃথিবীর অপর কোনও গ্রন্থে এত স্পষ্ট করে প্রাণকে চির অস্তিত্বের আলোকে আলোকিত করতে আর কেউই পারেই নি। তোমার অস্তিত্বের কখনও লোপ হয়নি, হবেও না, হতে পারে না। আমি চিরবর্ত্তমান, তুমিও চিরবর্ত্তমান। এই ইন্দ্রিয়ভাবাদি (রাজগণ) যাদের হননে তুমি কাতর হচ্ছিলে, যারা বিনষ্ট হবে ভেবে শোকাচ্ছন্ন হচ্ছিলে, এরাও চিরবর্ত্তমান; এবং ঐ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত যে সকল পদার্থের জন্য তুমি মায়াক্রান্ত সে সকলও চিরবর্ত্তমান। তুমি ইন্দ্রিয়নিরোধ করে যোগস্থ হতে গেলে প্রাণ যে ইন্দ্রিয়গ্রামে বার বার প্রত্যাবর্ত্তন করে, নিজের অস্তিত্ব হারাবার ভয়ে আবার মায়ার ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য ফেরায় কুলধর্ম আদি বিনষ্ট হবার আশঙ্কা করে, এই উভয় পক্ষেই তোমার বোঝা উচিত আশঙ্কার কোনও কারণই নেই যেহেতু কূটস্থ যেমন তেমনই আছেন। কারণ, তিনি নিত্য। কূটস্থের কোনও পরিবর্ত্তন নেই। প্রকৃতই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, জন্ম মৃত্যু নেই। জল যদি ব্রহ্ম হয়, জলের বুদ্বুদও সেই জলেরই এক ভিন্ন বিকার যা বায়ুর গুণেতে হয়েছে। বুদবুদরূপী মানুষের ক্ষেত্রেও নামরূপই অনিত্য। এই নামরূপ বাদ দিলে যে সত্তামাত্র অবশিষ্ট থাকে তাই অবিনশ্বর। আত্মা এই দেহ ধারণের পূর্ব্বে কূটস্থরূপে অন্যদেহে ছিলেন। এখন এইদেহে আছেন এবং ভবিষ্যতেও ঠিকই থাকবেন, তখন সেই দেহের নামরূপ যাই হোক না কেন। সুতরাং ত্রিকালেই যিনি বিদ্যমান তার জন্য চিন্তা কি ? অতএব মরণ বলে যা মনে হচ্ছে সে তো দেহটার পরিবর্ত্তন মাত্র। সে তো এই দেহতেই কতবার ঘটে গিয়েছে। যেমন বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, তারপর বার্ধক্য ও জরা - এ যেমন দেহের পরিবর্ত্তন, মৃত্যুও তেমনই পরিবর্ত্তন মাত্র। দেহের পরিবর্ত্তনকালে কষ্ট একটা আছে ঠিকই সত্যিকথা। কিন্তু সে কষ্ট কেন হয় জান ? পরে শ্রীভগবান নিজেই বলবেন। ২/১২

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ।। ১৩

অনুবাদ: দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ (অবস্থাভেদ মাত্র) অতএব জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হন না। ২/১৩

ব্যাখ্যা : দেহ কাকে বলে ? আধারের নাম দেহ। আধারের চার প্রকার অবস্থা - কৌমার, যৌবন, জরা ও দেহান্তর প্রাপ্তি। শক্তির উন্মেষের ক্রম হিসাবে এই চারটি অবস্থা জীবমাত্রেরই দেহে ফুটে ওঠে। দেহান্তর প্রাপ্তিটা অন্তর্মুখী শক্তির শায়িত অবস্থার নাম, শক্তির বিনাশ নয়। জীবশক্তি যৌবনের প্রারম্ভ অবধি অধিক পরিমাণে অন্তর্মুখী ও অল্প পরিমাণে বহির্মুখী থাকে সেকারণ বহির্মুখী চঞ্চলতা বৃদ্ধি ও কর্মেন্দ্রিয়াদির পুষ্টি অধিক মাত্রায় হতে থাকে। যখন শক্তি অন্তর্মুখে ও বহির্মুখে সমান সমান পরিমাণে ক্রিয়া করে তখন জীবের যৌবন এবং যখন শক্তি অন্তর্মুখ অপেক্ষা বহির্মুখে অধিক কাজ করে, তখন প্রৌঢ়, জরা ও অবশেষে দেহান্তর প্রাপ্তি আদি পরিবর্ত্তন ঘটে। এই যে অর্ন্তমুখ বা বহির্মুখে ক্রিয়াশীলতা, এটা জীব নিজের সংস্কার অনুযায়ী করে থাকে। সাধারণতঃ বহির্মুখে বিষয়াদি ভোগের জন্য যত ব্যস্ততা প্রদর্শন করে এবং অন্তর্মুখের দিক হতে লক্ষ্য ফিরিয়ে নিয়ে বহির্মুখের দিকে লক্ষ্য স্থাপিত করে, ততই সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়।

এরকম অন্তর্মুখ থেকে বহির্মুখে অধিক ক্রিয়া হলে তার সাথে সাথে আর একটা আভ্যন্তরিক ঘটনা ঘটতে থাকে। এই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী গতির ক্রিয়ার বেশী পরিমাণে মাত্রাবৈষম্য হলে, উভয় দিকেরই সাধারণ কার্য্যকরী শক্তি কমে যায়, যখন শক্তির এই একদিকের গতি অন্যদিকের গতি অপেক্ষা অনেকই বেশি হয়ে পড়ে, তখন এ দুর্ব্বল শক্তি প্রবলতর শক্তিটাকে প্রয়োজন মত প্রতিরোধ (resistance) দিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তার কাজও রুদ্ধ / বদ্ধ হয়ে আসতে থাকে। এই অবস্থাকেই দেহান্তর প্রাপ্তি বলে। দেহান্তর প্রাপ্তি বা মৃত্যু আসলে অন্তর্মুখী শক্তির অতিরিক্ত কমে যাওয়া ও সেকারণ বহির্মুখী গতির প্রায় রুদ্ধ অবস্থা। মৃত্যু জীবের ক্রিয়াশীলতার এই তারতম্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইতো গেল দেহের অবস্থান্তর থেকে শুরু করে দেহান্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত। কিন্তু দেহী কে ? দেহের মধ্যে যিনি আছেন তিনিই দেহী। এই দেহীই কূটস্থ। দেহের পরিবর্তনে এঁর কোনও পরিবর্তন নেই, ইনি যা তাইই আছেন। যাঁরা সেই কূটস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে স্থির হয়ে আছেন তাঁরা এ বিকারকে দেখে মোহিত হন না। ধীরত্ব, স্থিরত্ব লাভ হলে আর এই দেহান্তর প্রাপ্তি বিভীষিকা আকারে প্রাণকে ভীত করতে পারে না । কারণ তাঁরাও কূটস্থই হয়ে গিয়েছেন। দেহাত্মবোধই যখন আর নেই তখন দেহের বিকার তাঁদের মুগ্ধ করবে কি করে ? জন্ম মরণে ভয় স্থূল দেহে আসক্তি থেকেই হয়। এই মূঢ়তা মুখের কথায় যায় না। স্থির প্রাণে আত্মজ্ঞান প্রকাশ হয়ে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই হবে। তখন আত্মাকে আর জাত বা মৃত বোধ হবে না। সুতরাং (ধীর) আত্মজ্ঞানীদের শোক নেই। ধীরত্ব প্রাপ্তি হলে আর কৌমার, যৌবন, জরা, দেহান্তরপ্রাপ্তি ইত্যাদিতে মুগ্ধ হতে হবে না। জগৎ উপলব্ধির প্রণালী কেমন ? সাংখ্যস্তরে সেটাই জানার । পরের শ্লোকগুলিতে শ্রীভগবান তাই বলেছেন। এক অপরিণামী আত্মায় কেন এত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় ? তারই উত্তর--২/১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ।। ১৪

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের সংযোগই শীতোষ্ণাদিজনিত সুখ দুঃখ প্রদান করে থাকে । সে সকল আগমপায়ী (উৎপত্তি নাশ বিশিষ্ট), অতএব অনিত্য (অস্থায়ী); হে ভারত, সে সকল সহ্য কর অর্থাৎ হর্ষ বিষাদাদির বশীভূত হইও না। ২/১৪

ব্যাখ্যা: মাত্রাস্পর্শ কি ? মাত্রাস্পর্শই শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখাদির কারণ। মাত্রাস্পর্শের‘মাত্রা’ শব্দটিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্পন্দনতত্ত্ব (vibration) বোঝান হয়েছে। আমাদের দেহের প্রত্যেক পরমাণুই পঞ্চতন্মাত্র শরীরের তালে তালে স্পন্দিত হচ্ছে। পঞ্চতন্মাত্র (five elements) শরীর অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য; অ-কার, উ-কার, ম-কার, নাদ, বিন্দু। স্পর্শ অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা এদের অনুভব ও স্থিতি এবং প্রলয়। এছাড়াও আছে আজ্ঞাচক্র - কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য, সেখানে বায়ুস্থির হলেই মাত্রাস্পর্শ বর্জ্জিত হয়। মাত্রাস্পর্শাদি বর্জ্জিত হলেই স্পন্দনরহিত হয়ে সুখ, দুঃখ বর্জ্জিত হয়। মাত্রাস্পর্শাদি থাকলেই সুখ, দুঃখের অনুভব হয়। সকল কম্পন, স্পন্দনের উৎসই মন - কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান, ভয় এসমস্তই মন। মনেই এসব থাকে। সেই মন অ-মন হলেই আর সুখ দুঃখাদির স্পর্শ থাকে না। অতএব, স্পর্শ না থাকলে আর বোধ থাকবে কি করে ? পঞ্চতমাত্রের (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) দ্বারা এই শরীরের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের অনুভব হয়। স্পন্দন হতে অনুভব কি ভাবে হয় সেটা আমি সংক্ষিপ্তসারে বলেছি, আবারও বলব। কিন্তু সেটার উপলব্ধি করতে হলে তুমি সাধনার সাংখ্যস্তরে এসেছ কিনা সেটা আগে বুঝতে হয়। সেটা উপলব্ধি করারও একটা সুন্দর উপায় আছে। অবশ্য প্রত্যেকে স্ব স্ব জ্ঞানের বিচার করে অনায়াসে নিজের অবস্থা বুঝতে পারবেন।

প্রাণময় কোষের স্পন্দন অনুভব যখন কারও অনুভূতিতে আসে তখন বুঝতে হবে তিনি সাংখ্যস্তরের সাধনার উপযোগী। ভগবৎ চিন্তা করতে বসে এ স্পন্দন অনুভবে আসে।

প্রণালী অনুযায়ী ক্রিয়া সূচনা করলে বুঝতে পারা যায়, শরীরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, মনিপুর বা নাভিদেশে অথবা অনাহত চক্র (Cardiac plexus) বা হৃদয়ে যেখানে শক্তি গুটিয়ে নেওয়া যায়, সেই স্থান (point) থেকে রশ্মি যেমন আলোক হতে চারধারে স্ফূরিত হয় তেমনি ভাবে চারধারে স্ফুরিত হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি স্থির আছি এবং শরীর হতে আমার সত্তা ভিন্ন। এমনটি অনুভব হলে বুঝবে

তুমি সাংখ্যস্তরীয় সাধনার অধিকারী, এবং তুমিই এই স্পন্দন জনিত সুখ দুঃখাদির তত্ত্ব বুঝতে পারবে।

এবার স্পন্দন হতে কিভাবে সুখদুঃখানুভূতি হয় সে কথাই বলব। আগেই বলেছি স্পন্দনের ক্রমহিসাবে পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চভূত, ও একাদশ ইন্দ্রিয় রচিত হয়। পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকের দ্বিমুখী গতি হতে দুটো করে ইন্দ্রিয় রচিত হয়। অন্তর্মুখী গতি বা আকুঞ্চন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বর্হিমুখী গতি বা প্রসারণ দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় রচিত।

ব্যোমতত্ত্ব শব্দগুণাত্মক অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রিক স্পন্দন ব্যোমাকারে বিকশিত। ব্যোমতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা আকুঞ্চন হল শ্রবণ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বা প্রসারণ হল কণ্ঠ। শব্দ সকল কানের ভিতর গ্রহণ করি ও কণ্ঠে প্রসব করি। শব্দ শুনলাম মানে আমার দেহস্থ ব্যোমতত্ত্ব আকুঞ্চিত (contraction) হল। আবার শব্দ করলাম অর্থ দেহস্থ ব্যোমতত্ত্ব প্রসারিত (expansion) হল। বলে রাখি যে তন্মাত্রাসকল বাইরের নয় ভিতরের জিনিষ। সেজন্য আমরা সকলে সময় সময় খুব জোরে শব্দ হওয়া সত্ত্বেও শুনতে পাই না। কারণ শব্দ শোনার জন্য ব্যোম নামক তন্মাত্রা বা স্পন্দনতরঙ্গ যদি আকুঞ্চিত (contraction) না হয় তবে বাইরের শব্দ ব্যোমতত্ত্বের তরঙ্গ যতই প্রবাহিত হোক, শব্দানুভূতি আমার হবে না, আমি শুনতে পাব না। অতএব এখানে শব্দ অর্থে আমার নিজের একরকম স্পন্দন, একপ্রকার মাত্রা বা পরিমাণের তরঙ্গ অনুভূতি বা অভিঘাত। পদার্থবিজ্ঞানী হয়ত এটাকে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু মূল ব্যাপারটাই এইরকম। একইভাবে স্পর্শ অর্থে আমার নিজস্ব অভ্যন্তরের অন্য একপ্রকার ঘনতর মাত্রার স্পন্দন অনুভূতি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার নিজস্ব পাঁচপ্রকার স্পন্দন আছে, আর বাইরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ সেই পাঁচ রকম স্পন্দনকে পাঁচ প্রকারে অভিঘাত করছে। একইভাবে মরূৎতত্ত্বের আকুঞ্চন বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক ও প্রসারণ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় হাত। তেজস্তত্ত্ব - রূপতন্মাত্রা যার প্রাণ, তার আকুঞ্চন বা জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু ও প্রসারণ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় চরণ বা গতি। অপতত্ত্বের প্রাণ রস তার জ্ঞানেন্দ্রিয় বা আকুঞ্চন জিহ্বা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ (Genital)। ক্ষিতিতত্ত্বের প্রাণ গন্ধ - জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা, কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু (Rectum) । আর এইসব আকুঞ্চন ও প্রসারণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যে কেন্দ্র (Centre) থেকে প্রসূত অর্থাৎ এই সকল তরঙ্গ যে স্থানে (Point) আঘাত করলে অনুভূতি জন্মায়, তারই নাম অন্তর। এই কেন্দ্র (Centre) যখন এই সকল প্রণালীর (Route relay channels of neuron) ভিতর দিয়ে স্বীয় স্পন্দন (Frequency signals)প্রবাহিত করে, তখনই আমাদের ঐ ইন্দ্রিয়সকল বা স্পন্দনসকল অনুভূতি জন্মাতে সক্ষম হয়। আশাকরি, মোটামুটি বোঝা গেল যে এই মাত্রা অর্থাৎ মায়া বা পরিমিতিময়(Mensurable)স্পন্দনের পরিমাণ, তাল, আকুঞ্চন প্রসারণরূপ (contraction - expansion) ব্যবচ্ছেদ (An analysis of illusion is the desection of the mensuration, volume, quantity, sequence, contractions snd expansion of such vibration)। এই মাত্রার বিভিন্নতা দ্বারা আমরা চৈতন্য অনুভব করি। এই মাত্রার স্পর্শ তারতম্যেই ঘটে যত অবিদ্যা বা অনুভূতি যা কিছু শীতোষ্ণ সুখদুঃখপ্রদ। এমনতর মাত্রার প্রভাবেই জীবাত্মা নিজেকে শক্তিমান বলে জ্ঞান করে সকল শক্তি নিজেতে স্ফুরিত করে। মাত্রার প্রভাবেই যেমন এক বিশাল ব্যাপ্তি বহু জীবাকারে রচিত হয় তেমনই আবার মাত্রার প্রভাবেই অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য বিচ্ছিন্ন ও বহুধা বিভক্ত হয়। সুতরাং মাত্রা হতেই সমস্ত এবং এই মাত্রার তারতম্যেই ব্রহ্মাণ্ড বিচিত্ররূপে সম্ভূত হয়।

আগেই বলেছি যোগাভ্যাসীগণ সাংখ্যস্তরে প্রবেশ না করলে আমার এসব কথার অর্থ ভেদ করা সম্ভব নয়, তা যতই বোঝাবার চেষ্টা করি না কেন। এই মাত্রাজ্ঞানকে হৃদয়ে কার্য্যকরী করতে পারলে, বিরাট শক্তি প্রবাহের তালমাত্রা বুঝতে পারলে, স্বচ্ছন্দে অলৌকিক কাজকর্ম্ম করাও যায়। সহসা অন্তর্হিত হওয়া বা আবির্ভূত হওয়া, গুপ্ত সংবাদ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি জানতে পারা যায়; দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়ে কারও সাথে সাক্ষাৎ করে আসা, Ventriloquism, ইত্যাদি সবই এই মাত্রাজ্ঞান ও তদনুযায়ী কৌশল অবলম্বনের ফল। যোগীরাজ, শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনীতে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। তবে সাধারণ সাধকের পক্ষে এসমস্ত পরিহার করাই কর্তব্য।

এসমস্ত মাত্রাস্পর্শানুভূতি আগমপায়ী, সুতরাং অনিত্য, স্বতন্ত্র, অস্তিত্বশূন্য অতএব অবিদ্যা। আবার এদের আসা যাওয়ার শক্তি রোধ করার শক্তিও কারও নেই, তাই ঐ সকলের তিতিক্ষা অর্থাৎ সহ্য করার অভ্যাস করাই যুক্তিযুক্ত। তিতিক্ষা অভ্যাস হলেই আর এরা সুখদুঃখপ্রদ হতে পারে না। এই তিতিক্ষার উপায় হল সাধনার দ্বারা আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করা। কারণ মূলাধারাদি পঞ্চচক্রই হল ক্ষিতি ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের স্থান কিন্তু আজ্ঞাচক্রের স্থান এসবের ঊর্দ্ধে। আজ্ঞাচক্রের নিচেই বিষয়ের সাথে সম্বন্ধ। আজ্ঞাচক্রে মন রাখতে পারলে শীতোষ্ণসুখদুঃখাদির বোধ আপনা হতেই রহিত হয়। ২/১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ।। ১৫

অনুবাদ : হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এইসকল (মাত্রাস্পর্শ) সুখদুখেঃ সমভাব যে ধীরব্যক্তিকে ব্যাথা দিতে না পারে, তিনি অমরত্ব এবং নিত্যানন্দ লাভ করেন। ২/১৫

ব্যাখ্যা : যিনি বিরাট স্পন্দন মধ্যে আপনাকে অথবা পরমাত্মার স্থির সত্ত্বাকে চিন্তা করতে পারেন, স্পন্দনতরঙ্গ বিনা প্রতিরোধে তাঁর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়, তাদের আগম নিগম বা উৎপত্তি বিনাশ তাঁর অনুভবে আসে না। তখনই তিনি ধীর পুরুষশ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হন এবং আপনার অমরত্ব অনুভবে সমর্থ হন। এই অবস্থায় যাওয়ার কৌশল হল শরীরস্থ বায়ুকে স্থির করা। সাধন দ্বারা বায়ুকে স্থির করতে পারলে যে চৈতন্যভাব থাকে তার মধ্যে কোনও সুখদুঃখ বোধ থাকেনা। এটাই পরমানন্দরূপ অমৃতপদ। তুমি তো নিজেকে নিজে দেখতে পাওনা, তোমার আমি যখন আত্মাতে মিশে থাকবে তখন তোমার জগদভ্রম ও সুখদুঃখ বোধ ছুটে যাবে। যাঁর তৃতীয় বা দিব্যচক্ষু কূটস্থতে লয় হয়েছে তিনিই জীবন্মুক্ত শরীরি। সুতরাং অমরত্ব অনুভবে সমর্থ হন। মৃত্যুজ্ঞান পূর্ব অবস্থায়ই থাকে, তাই আমরা অহর্নিশ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে থাকি। এই প্রথম স্বাধীনভাব উন্মেষিত হয়, স্থিরস্বত্তা লক্ষ্য করে জীব মৃত্যুআশঙ্কার কবল থেকে মুক্ত হয় এবং অবিদ্যার স্পন্দন হারিয়ে ফেলে বুঝতে পারে এ সব অনুভূতি তার নিজের নয়। তার উপরে এসে জোটা রঞ্জনা মাত্র। ২/১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।। ১৬

অনুবাদ : অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আত্মাতে স্বত্ত্বা নাই। নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শীগণ (সদসদবিবেকীগণ)এই উভয়ের অন্ত (পরিণাম) দেখিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মা নিত্য (অবিনশ্বর) আর সমুদায় অনিত্য। ২/১৬

ব্যাখ্যা : অসৎভাব বা বস্তু অনিত্য। নিত্য ভাব, নিত্য বস্তু, নিত্যই, তার অভাব হয়না। এক নিত্য ও চৈতন্যময় অস্তিত্ব নানা ভাবে প্রতিবিম্বিত হলেও তার নিত্যত্বের কোনও বিকার ঘটে না। ধীরত্ব প্রাপ্তি হলেই তবে এ বিরাট ব্রহ্মমণ্ডলকে এইভাবে নিত্য চৈতন্যময় অস্তিত্ব বলে বুঝতে পারা যায়। এজন্যই বলা হয়েছে যে তত্ত্বদর্শী হলে তবেই এ সকল স্পন্দন দেখা ও তার বিশ্লেষণ করা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। অর্থাৎ "এসমস্ত জগৎই আত্মময়, সেই আত্মাই সত্যস্বরূপ। হে শ্বেতকেতু ! সেই সৎস্বরূপ আত্মাই তুমি"। পাঠক প্রশ্ন করবেন, সবই যদি আত্মা হয় তবে এই জগৎ প্রপঞ্চ এমন ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় কেন ? এই ভিন্নত্বের কারণকে এযাবৎ শাস্ত্রগ্রন্থে ঐশ্বরিক মায়া (devine illusion) বলা হয়েছে। যার বর্তমান ব্যাখ্যা পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী স্পন্দনতত্ত্ব, আগেই করেছি। এই স্পন্দনকে বোধগম্য করা ও তার বিশ্লেষণ শক্তি অর্জনের জন্য যে প্রয়োজনীয় স্তরগত অভ্যাস তারই নাম যোগাঙ্গ। যাই হোক, মায়ার দ্বারাই এইসব দৃশ্য দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বোধ হয়। প্রতি পদার্থে সাধারনতঃ দুটো জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়।

একটা নিত্য অস্তিত্ব, যা দৃশ্য, যার আছে স্পন্দন শক্তি বা গুণ বা দেহ, যেভাবেই বলি আর দ্বিতীয়টি তার দ্রষ্টা।দ্রষ্টার প্রতি দৃশ্যবস্তুর তরঙ্গাভিঘাতের তারতম্যেই দ্রষ্টার অনুভবেরও তারতম্য ঘটে থাকে । বুলবুল পাখীর কূজন শ্রবন অথবা গ্রীসদেশীয় ভস্মাধারের দৃশ্য দ্রষ্টে কবি John Keats **অমর কাব্যকৃতির** (Ode to a Nightangle,Ode on a Grecian Urn) রহস্যও এহেন স্পন্দন তরঙ্গের তারতম্য মাত্র। ধরা যাক একটা ফুল আছে। সাধারণ মানুষের চোখে সেটা ফুল হলেও কোনও তৃণভোজী পশুর প্রাণে সেটা খাদ্য বলে বোধ হচ্ছে আবার যারা কোনও দিন ফুল দেখেনি তাদের কাছে একটা নতুন জিনিষ বলে বোধ হচ্ছে। এই বিভিন্ন অনুভূতিগুলো কিন্তু ফুলটার ধর্ম্ম নয়। এগুলো দর্শকদের গুণতারতম্য মাত্র। ফুলটা থেকে একপ্রকার স্পন্দন চারিদিকে স্ফুরিত হচ্ছে এবং সেই স্পন্দনতরঙ্গ (wave of vibration) নানা পদার্থে নানা রূপের তরঙ্গ বা অনুভূতি উৎপাদন করছে মাত্র। যদি তরঙ্গ (wave) রচনা না করত তবে তার অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধিতেই আসত না। যতক্ষণ মনে ঐ তরঙ্গ হতে থাকবে ততক্ষণ আমরা তার অস্তিত্ব ভূলতে পারব না। এমন অবস্থায় ক্রমশ ঐ ফুলটা ঝরে পড়তে পারে, যখন আমাদের মত সাধারণ জীবের হৃদয়ে তরঙ্গাভিঘাত বা অনুভূতি জন্মাতে পারে না । কিন্তু আমাদের চাইতে আরও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণে তার তরঙ্গানুভূতি জন্মাতে পারে এবং তার অস্তিত্ব দেখিয়ে দিতে পারে। ফলে ফুলটা শুকিয়ে গেলে সাধারণ জীব যখন তার অস্তিত্ব নেই মনে করে, সেরূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বা ধীরত্ব প্রাপ্ত হলে আমরাই সেই ফুলের ফোটা অবস্থার মতই বুঝতে পারতাম যে তার অস্তিত্ব যেমন ছিল তেমনই আছে। তরঙ্গভঙ্গ বা স্পন্দন যেমন ছিল তেমনটি হচ্ছেনা, শুধু সেই তরঙ্গের ইতর বিশেষ হয়েছ মাত্র - লয় আকারে আছে। ধীরত্ব লাভের পর প্রতি পদার্থ এরূপ দুভাবে বিভক্ত হতে দেখা যায় (১) অস্তিত্ব ও তার শক্তি এবং (২) অস্তি ত্বটির দ্রষ্টা এক চেতনা। এটুকু বুঝলেই সাধারণভাবে আমাদের সাংখ্য বোঝা হয়। সাংখ্যস্তর ভেদ হলে বা ব্রহ্মস্তরে উপস্থিত হতে পারলে তবে চিৎ ও চিতিশক্তির একত্ব বোঝা যাবে। সেটা এখন বোঝাবার চেষ্টা করা মোটেই বুদ্ধির কাজ নয়, বিড়ম্বনা মাত্র।

যাঁরা ক্রিয়া করেন না তাঁরা আত্মভাবরূপ স্থিরত্ব কি জানতে পারেন না। তাই জগদ্ভ্রম তাঁদের কোনও কালেই মেটে না। প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়, অন্যান্য মানসিক ব্যায়ামগুলিও তারই অংশ বিশেষ। যোগদর্শনেও আছে "প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং প্রাণস্য"। প্রাণের প্রচ্ছর্দন বিধারণ অর্থাৎ টানা ছাড়ার অভ্যাস করলেই আপনা অপনিই স্থিরত্ব প্রকাশিত হয়। স্থিরত্ব পেলেই জীব তত্ত্বাতীত হয়। তত্ত্বদর্শী পুরুষই পরিণামদর্শী।

মন বুদ্ধি যদি না থাকে তবে কালের অস্তিত্ব থাকে না, তার সঙ্গে সঙ্গে নামরূপও মিটে যায়। অন্তঃকরণের প্রবাহ রুদ্ধ হলে দেশ কালের জ্ঞান, নামরূপ কিছুই থাকে না, থাকে যা শুধু মাত্র স্বয়ং

প্রকাশ আত্মশক্তি। অন্তঃকরণের প্রবাহ নিরুদ্ধ হলেই তা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। এই আত্মস্বরূপের জ্ঞান তখনই পরিস্ফুট বলে বোধ হবে, যখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিছুই থাকবে না ফলে জগৎবোধও থাকবে না। লৌকিক দৃষ্টিতে জগৎকে সত্য বলে বোধ হলেও যুক্তি দ্বারা বুঝতে গেলে এটা সৎ কি অসৎ কিছুই ঠিক বোঝা যায় না এজন্যই একে অনির্ব্বচনীয়ও বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যোগীর কাছে জগতের অস্তিত্ব ভিত্তিহীন। ছান্দোগ্যে শ্রুতি বলেছেন, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" অর্থাৎ 'হে সৌম্য ! দৃশ্যমান প্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্বে তাহা সৎ স্বরূপেই বিদ্যমান ছিল, সেই সদ্‌বস্তু এক ও অদ্বিতীয়।" ২/১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ।। ১৭

অনুবাদ: যিনি (উৎপত্তি নাশশীল) এই সকল (দেহাদি) ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, (আত্মস্বরূপ) তাঁহাকে অবিনাশী (নিত্য) জানিও। কেহই সেই অব্যয়ের (উৎপত্তি নাশ শূন্য আমার) বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২/১৭

ব্যাখ্যা : বস্তু উৎপন্ন হয়, থাকে, আবার লোপ পায়; দেহ গঠিত হয়, পরিস্ফুট হয় ও বিলয় হয়। কিন্তু এ অস্তিত্বের কখনও পরিবর্তন ঘটে না। বিনাশ বলি কাকে ? পরিবর্ত্তনই বিনাশ শব্দে অভিহিত, স্পন্দনমাত্রার ইতর বিশেষই বিনাশ। স্পন্দনের মাত্রাই দেহ বা আধার রূপে কল্পিত ও তারই পরিবর্ত্তন মৃত্যু বা দেহান্তর এসব কথা আগেই বলেছি। যা কিছু দেখছি, প্রত্যক্ষ বলে অনুভব করছি, এ সমস্তের আত্মা হতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এই অনুভব সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানের সাংখ্যস্তর অতিক্রম না করলে কখনও এই ধারণাই আসে না। এই যা কিছু নামরূপময় পৃথক পৃথক বস্তু দেখছ সেটাও ঐ আত্মাই। এক আত্মসত্ত্বাই নানারূপে সবের মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে মাত্র। পুরীর সমুদ্রের অসঙ্খ্য ঢেউ দেখা গেলেও ঢেউগুলো সমুদ্রের সাথে একাকারেই থাকে। অবশ্য এই জ্ঞানে পৌঁছতে হলে আগে অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ধারণাশক্তি লাভের সেই পন্থাটিকে সাধারনতঃ ছয় বা সাতটি ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এক এক ভাগের আদর্শ এক এক খানি দর্শনশাস্ত্র যা হিন্দুর ধর্ম্মজগৎকে আলোকিত করে রেখেছে। এই ষড়দর্শনের ছটা স্তরের সংক্ষিপ্ততম ধারণাটা এই রকম। ছয়খানা দর্শনশাস্ত্রের নাম ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। আগেই বলেছি, জীবকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভের জন্য যে জ্ঞানগতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাই গীতা। সুতরাং ষড়দর্শন গীতারই অংশবিশেষ। অপৌরুষেয় জ্ঞান বা গীতারূপী পরমাত্মা এই ছয়খানি দর্শনরূপে ষাটকৌশিক দেহ ধারণ করে আবির্ভূত বা শ্রীকৃষ্ণমুখে ব্যক্ত হয়েছিল। কোষ হিসাবে তুলনা করলে গীতারূপ

পরমাত্মার যেন মনে হয়- ন্যায়দর্শন - অন্নময়কোষ, বৈশেষিক - প্রাণময় কোষ, পূর্ব্বমীমাংসা - মনোময় কোষ, সাংখ্য - জ্ঞানময় বা বুদ্ধিময়কোষ, পাতঞ্জল - বিজ্ঞানময়কোষ, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন আনন্দময়কোষ। এই সাংখ্য ও উত্তর মীমাংসার মাঝখানে বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদ নামে একটা মত স্থাপিত হয়েছে, সেটা পরে বলব। দর্শনশাস্ত্রগুলো গীতার কোষ বা দেহ - গীতা আত্মা।

প্রথমতঃ ন্যায়দর্শন - মহর্ষি গৌতম এর প্রণেতা। প্রধান মত - সংসার দঃখময়; দঃখের নাশই মুক্তি। তর্ক এর প্রধান অঙ্গ। তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বপ্রমাণ হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের কর্ম্মফলদাতা রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সাধারণ মনুষ্যজ্ঞান প্রথমতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তর্কাদির দ্বারা এর সপ্রমাণে সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বৈশেষিক দর্শন। প্রণেতা মহর্ষি কণাদ। এরও সারমর্ম্ম সংসার দুঃখময়। সেই দঃখের একান্ত নিবৃত্তিই জীবের লক্ষ্য। তত্ত্বজ্ঞানে এই নিবৃত্তিলাভ হতে পারে। এখানেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, দিক, কাল, আত্মা, মন এই সমস্তকে নিত্য পদার্থ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষিতি , অপ, তেজ, বায়ু এগুলো শরীর বা ইন্দ্রিয়রূপে অনিত্য কিন্তু পরমাণুরূপে নিত্য সত্য। মহর্ষি কণাদের মতে পরমাণুগুলো নিত্য ও অকারণ। বিরাট ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঐ পরমাণুসকল স্পন্দিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডসকল উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মাদি আবির্ভূত হয়ে সৃষ্টি কাজে নিযুক্ত হন।

এটা সাধারণ জীবের জ্ঞান প্রবাহের দ্বিতীয়স্তর। প্রত্যক্ষ জগৎসকলের স্পন্দনের অহর্নিশ পরিবর্তন ও পরিণাম দেখে, বস্তুগুলোর বিশ্লেষণ করে দেখে ও সকল পদার্থের মধ্যেই পরমাণুসকল দেখতে পায়। ফলে এমন ধারণা করে যেন পরমাণুসকল নিত্য স্বতন্ত্র পদার্থ এবং ঈশ্বর বলে এক স্বতন্ত্র মহাপুরুষ যেন স্বেচ্ছায় সেই সব পরমাণুগুলোকে এক, দুই, তিন ইত্যাদি রূপে সংযুক্ত করে বিশ্বসকল রচনা করেছেন।

অর্থাৎ, প্রথম স্তরে, জীব বিচার বিতর্কের দ্বারা ঈশ্বরের যেন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুমান ভিন্ন প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, এই দ্বিতীয় স্তরে সেই স্বাতন্ত্র্য স্ফুটতর হয়। যাই হোক, পরমাণুতত্ত্ব বর্ণনই এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয়: পূর্বমীমাংসা। মহর্ষি জৈমিনি এর প্রণেতা। এই মীমাংসা দর্শনের মতে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, কর্ম্মের দ্বারা করতে হয়। দুঃখের নিবৃত্তি ও অনন্তসুখের প্রাপ্তি কর্ম্মের দ্বারাই ঘটে থাকে। বেদই নিত্য পদার্থ, অভ্রান্ত, অপৌরুষেয়। বৈদিক কর্ম্মসকলই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির হেতু।

সেই বেদোক্ত কর্ম্মসকলই যথানির্দিষ্ট উপায়ে করতে পারলে অতুল সুখের অধিকারী হতে পারা যায়। একটা বৈশিষ্ট্য হল যে ঈশ্বরের সাথে এই মীমাংসা দর্শনের বিশেষ কোনও সম্বন্ধই নেই। এঁরা বেদকে প্রধান স্থান দিয়েছেন কিন্তু বেদ ঈশ্বরের কৃত বলে কোথাও অঙ্গীকার করেন নি। কর্ম্মই প্রধান, কর্ম্মের দ্বারাই জীব দুঃখ ও সুখ লাভ করে। কর্ম্মানুসারেই জীবের গতি সম্বন্ধ হয়। বস্তুতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মহিমা বর্ণনাই এর লক্ষ্য।

অর্থাৎ দ্বিতীয়স্তরীয় জ্ঞান পাবার পর, কর্ম্মের দিকে সাধারণ জীবের লক্ষ্য পড়ে। ধারণা করে, নিছক জ্ঞানে কিরূপে সুখোদয় হবে। যখন আহার না করলে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও তৃপ্তি হয় না তখন কর্ম্মই সব। অতএব এই তৃতীয়স্তরে জীবের কর্ম্মের উপরই একান্তভাবে লক্ষ্য পড়ে। প্রবল আসক্তির সাথে জীব ঈশ্বর নির্ভরতার আস্বাদ না পেয়ে কর্ম্মনির্ভরতায় মত্ত হয়। অত্যধিক সুখ চরিতার্থতায় মত্ত হয়ে কর্ম্মই তাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। এই স্তরে ঈশ্বর শুধু মন্ত্রাত্মক। তাই জীব মন্ত্রশক্তির মহিমা কীর্ত্তন করে।

চতুর্থ: সাংখ্যদর্শন বা নিরীশ্বর সাংখ্য। এর প্রণেতা মহর্ষি কপিল। এরও সারমর্ম্ম সেই দুঃখবাদ। দুঃখের নিবৃত্তিই মানুষের লক্ষ্য। সে দুঃখ ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও অধিভৌতিক। দুঃখের সমাপ্তির উপায় -- বিবেক বা প্রকৃতি পুরুষ ভেদ। সাংখ্যের মত - কর্ম্মই বন্ধনের হেতু। তত্ত্বদর্শন হলে কর্ম্ম আর ফলপ্রদ হতে পারে না। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দুঃখ ত্রিগুণা প্রকৃতি হতে উদ্ভূত। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। নিত্যা, জড়া ও আদি অন্তহীনা এই প্রকৃতিই ব্যক্ত হয়ে জগৎরূপে প্রকাশ পায়। ঐ মূল প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বিকারসকল সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাহলে ঐ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ এই তিন ধর্ম্ম। প্রকৃতি নিজে থেকেই সমস্ত সৃষ্টি করে, কিন্তু নিজের জন্য নয়, আত্মার জন্য। আত্মারই ভোগ ও মোক্ষ সাধনের জন্য প্রকৃতির পরিণাম সংসাধিত হয়। সে চেতন আত্মা অপরিণামী নির্ব্বিকার, অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি গুণময়ী। পুরুষ আত্মা বা চৈতন্য নির্গুণ। ঈশ্বরত্ব আত্মার স্বরূপ নয়, সুতরাং আত্মা বহু। আত্মার যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকৃতি থেকে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয়, ততদিন সে পুরুষ বদ্ধ। ঐ চেতন পুরুষ অচেতনা জাননশক্তিরূপা প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে অহঙ্কার, বুদ্ধি, জ্ঞান, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়াদিরূপে সে প্রকৃতিকে পরিণামিত করে। পরিণত করতে হয় না, প্রকৃতি আত্মার সংযোগে নিজেই পরিণত হতে থাকে ও পুরুষের মোক্ষ সাধন করে দিয়ে নিবৃত্ত হয়।

এখন এই তৃতীয় স্তরীয় জীব কর্ম্মাসক্ত হওয়ার পর যখন কর্ম্ম বিশ্লেষণ করে, দেখে, কর্ম্ম যদিও ফলদায়ী বটে, কিন্তু সে সকল চিরস্থায়ী নয়, কর্ম্মক্ষয়ে সেই ফলও শেষ হয়ে যায়। আহারে তৃপ্তি হলেও, ক্ষুধা নিবৃত্তি হলেও, খাদ্য হজম হয়ে যাবার পর আবারও ক্ষিদে পায়। তাই সে তখন কর্ম্মের মূল

কারণ খোঁজে। দেখে যে সব কর্ম্ম ইচ্ছা না করলেও নিজে থেকেই হচ্ছে। দেহের সেই সব বৃত্তির উপর লক্ষ্য পড়ে আর খোঁজে এর কর্ত্তা কে ? কর্ত্তার দিকে লক্ষ্য পড়ে, গভীর চিন্তাশক্তি দিয়ে আত্মা ও প্রকৃতি আলাদা করে দেখে, আত্মা নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি হতে সমস্ত কাজ হচ্ছে ইত্যাদি, কিন্তু তারা প্রকৃতির আদি অন্ত খুঁজে পায় না অথচ সমস্ত কাজের ভিতর এক স্থির সত্তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করে নইলে শুদ্ধ জড়া প্রকৃতি হতে এত সুশৃঙ্খলাময়, বিজ্ঞানযুক্ত, সৃষ্টি ও ক্রিয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃতি কর্তৃত্ব করলেও এক চৈতন্যসত্তার সংযোগই সৃষ্টি ও ক্রিয়ার মূলে আছে। উভয়েরই কর্তৃত্বে হলে কাজ আলাদা আলাদা রকম হত। সুতরাং আত্মা কর্ত্তা হয়েও নিষ্ক্রিয়। এই বোধে তাদের ধারণা প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভাগে সীমাবদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মাণ্ড সকলকেও হর, হরি, ব্রহ্মাদি শক্তিমান আত্মার শক্তির প্রকাশ বলে বোধ করে।

আসলে এভাবেই জ্ঞান তর্কবিচার থেকে স্থূল জড় পরমাণুবাদ আর তার থেকে স্থূল কর্ম্মবাদে এসে শেষ সূক্ষ্ম জড়শক্তি এবং তৎউদ্ভব জন্য ঈশ্বরবাদে (caused belief) পরিণত হয়। এবং প্রতিক্ষেত্রে আত্মা ও প্রকৃতির সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখে প্রকৃতি থেকে আপনাকে মুক্ত বা উদ্ধার করতে চায়; কার্যতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব এখান থেকেই ফুটে ওঠে। এজন্য দ্বৈতবাদকে গৌণরূপে ঈশ্বরের কল্পিত বিশ্লেষণ বা বিভাগকরণ (indirect hypothetical division of the existence) বলে মনে হতে পারে। জ্ঞানের এই অবস্থায় জীবের আত্মদর্শনের ইচ্ছা জন্মে এবং এই ইচ্ছাই পঞ্চমস্তর।

পঞ্চম : পাতঞ্জল দর্শন -- প্রণেতা ভগবান পতঞ্জলি। এটাই আসল ক্রিয়াযোগ। যা আসলে আত্মদর্শনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পতঞ্জলি সাংখ্যের সকল তত্ত্বই স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে সাংখ্যোক্ত পুরুষের সাক্ষাৎকার (আত্মসাক্ষাৎকার) চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা হতে পারে। অভ্যাস, বৈরাগ্য, তীব্র উৎসাহ, এবং ঈশ্বরপ্রণিধান এগুলো যোগের উপায়। যোগে দুই রকম সমাধি হয়,--সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্র চিত্তের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও নিরুদ্ধ চিত্তের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

চিত্তের এই দুই রকম অবস্থা অর্থাৎ একাগ্রতা ও নিরুদ্ধতা লাভের প্রণালী ও কৌশল গুলো এই পাতঞ্জল দর্শনে বিশদভাবে বলা আছে। নির্ব্বিকল্প সমাধিই পাতঞ্জলের লক্ষ্য। এ থেকেই কৈবল্য সিদ্ধ হয়। পাতঞ্জলে বা জ্ঞানের পঞ্চমস্তরে শুদ্ধ আত্মতত্ত্বলাভের জন্য চিত্তক্রিয়াময় প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

ষষ্ঠ : বেদান্তদর্শন। প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ। এতে বেদের জ্ঞানকাণ্ডই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জ্ঞান লাভই বেদের চরম লক্ষ্য তাই এর নাম বেদান্ত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড থেকে যেমন

পূর্ব্বমীমাংসা তেমন জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে এই উত্তরমীমাংসা। একমাত্র ব্রহ্মই এর প্রতিপাদ্য বিষয় বলে একে ব্রহ্মসূত্র বলে।

বেদান্তদর্শনের আবার দুরকম মতবাদ হয়েছে। একটা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ এবং অপরটা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" তবে জগৎ ও ব্রহ্মের ভিন্নতা বোধের কারণ মায়া বা ব্রহ্মশক্তি। তত্ত্বমসি এবং সোহহংই অদ্বৈতবাদের অমৃতময় বাণী। ব্রহ্মই ঈশ্বর, জীব এবং জগৎ, ব্রহ্মমায়া হল ব্রহ্মের অবিদ্যানামীয় শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অর্থাৎ মায়া ও ঈশ্বর অভিন্ন। কেবল যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে ততক্ষণই মায়া। জগৎ ঐন্দ্রজালিক ব্যপার মাত্র। তবে জগৎ স্বপ্নের মত অলীক নয়। ব্রহ্মই জগৎরূপে কল্পিত। যেমন রশি বা দড়িকে প্রথমে সাপ বলে ভুল করলেও, বুঝে ফেললে আর ভয় থাকে না। তেমনই জগৎভ্রম ছুটে গেলে এক অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম সর্বত্র দেখা যাবে। জগৎ ঈশ্বরের সংকল্প মাত্র। সাধারণ মানুষ কোনও সংকল্প করলে আগে মনশ্চক্ষে দেখে। সংকল্প দৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে ইন্দ্রিয়েও কিছুটা অনুভব আসে যেটা অপরের হয় না। কিন্তু যদি ঐ সংকল্প দৃঢ়তর হয়ে অপরকেও অনুভব করাতে চায় তবে সেটা অপরেরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। মেসমেরিজম, হিপ্নটিজম, ইন্দ্রজাল এগুলো যেমন জগৎ ব্যাপারও তেমন, এটাই শঙ্করমত। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মের দুই প্রকার লক্ষণ - স্বরূপ ও তটস্থ। তটস্থ লক্ষণ ও সগুণব্রহ্ম একই কথা। এই তটস্থ লক্ষণ নিয়েই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্ম এক নয়, জগৎও মায়া নয়। জীব অণু মাত্র, বহু এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন । দেহী ও দেহে যে তফাৎ ব্রহ্মে ও জীবে সেই পার্থক্য। আসলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সাংখ্য ও মায়াবাদের মাঝামাঝি একটা উপলব্ধি। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কেবলমাত্র সন্ন্যাসবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে বেদান্ত প্রচারের ফলে সগুণ ব্রহ্মকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নির্গুণেই ঝোঁক দিয়েছেন। আর পণ্ডিত রামানুজ সৃষ্টি ও স্থিতিতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে সগুণত্বকেই চরম সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন।

যাই হোক আমরা শঙ্কর ও রামানুজকে দেখব না। নির্গুণ ও সগুণ এসব কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, মায়াও ব্রহ্ম, ব্রহ্মে পৌছলেই স্বরূপ ফুটে ওঠে। তরঙ্গ ও সমুদ্রে ভেদ নেই। নির্গুণ অথচ সগুণ। নির্বিশেষ অখচ সবিশেষ। গীতারূপ এই চরম সিদ্ধান্ত ফুটে উঠতে এইভাবে ন্যায় বিচার থেকে শুরু করে বেদান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করতে হয়। জ্ঞান এইভাবে স্তরে স্তরে ঘনীভূত হতে হতে শেষে গীতায় পরিসমাপ্ত হয়। নির্গুণ ও সগুণ একীভূত হয়ে প্রত্যক্ষীভূত হয়। মায়া যে সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, দৃষ্টির তারতম্যে কখনও সৎ কখনও অসৎ, এর সম্যক কারণ ব্রহ্মত্ব লাভ না করলে শুধু

বিচারের (Logic)দ্বারা বোঝা যায় না। সত্ত্বাদি গুণ বিকারময়ী অলৌকিক এই মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা। ভগবানের কথায় –

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (৭/১৪)

তাই কর্ম্মযোগের দ্বারায় এহেন দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করে আমাকে (আত্মাকে) পেতে হয়। অথচ এই কর্ম্ম ও জ্ঞান বিভিন্ন নয়, ভক্তির রূপান্তর মাত্র। জ্ঞান ও ভক্তিহীন কর্ম্ম শষ্যহীন বীজ মাত্র। আত্মদর্শন একমাত্র গীতাতেই আছে। বেদান্ত ভিন্ন অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রগুলো যেন ক্রমশঃ সমস্ত তত্ত্বকে ব্যবচ্ছেদ (desection) করতে করতে "অনোরণীয়ান" এই তত্ত্বে এসে পৌছেছে । এগুলো শুধু যুক্তি ও মস্তিষ্কধর্ম্মের মহিমা মাত্র। অপরদিকে গীতা আত্মদর্শী। এর প্রত্যেক শ্বাসের গতি কেন্দ্রের দিকে এবং মস্তিষ্ক ধর্ম্মের সাথে সম্পর্ক থাকলেও এতে প্রাণধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ । প্রথমে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ "। এক কথায় এই সমস্তটুকু বললেই সব জ্ঞানটুকু একবারে প্রাণে যেতে পারে না। তাই সাধারণ জীবের জ্ঞানগম্য ও বোধগম্য করার জন্যই পরের শ্লোকে, আগে মূল তত্ত্ব অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। --------

" অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বামিদং ততম।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥"

অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান এখনই সমস্ত সত্য বলে গ্রহণ করতে পারবে না বুঝতে পারছি। তোমাদের চক্ষে এখন বিচিত্র জগৎ। হৃদয়ে বিভিন্ন অনুভূতি। তাই শুধু এটুকুই বোঝ যে যা কিছু তোমরা দেখছ এ সমস্তই এক অবিনাশী অব্যয় দ্বারা পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ পদার্থ সকলের উপাদানকেও উৎপত্তিনাশশূন্য বলে উপলব্ধি কর। এর প্রত্যেক অণু পরমাণু উৎপত্তিনাশহীন ! তোমাদের এই যে "সর্ব্ব " যার দ্বারা গঠিত, যার দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত, তা অব্যয় বা অবিনাশী বলে হৃদয়ঙ্গম কর। শুধু বুদ্ধিতে জানলে হবে না, অনুভব কর। খেলে যে পেট ভরে সেটা নিজে খেয়ে বুঝতে হবে। দর্শী বা দ্রষ্টা হতে পারলে মীমাংসার বাকী থাকবে না। দর্শী হতে না পারলে মীমাংসা কোনও ভাবেই হবে না ॥

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

যখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" তখন বিনাশ কারও নেই। কে কাকে বিনাশ করে ? তবে যে বিনাশ দেখা যায় তা কেবল উপাধির নাশ মাত্র। আজ্ঞাচক্রে প্রাণকে স্থির করতে পারলে মনের লয় হয়, তখন আত্মা ব্যতীত আর কিছু থাকে না, বা উপাধির নাশ হয়ে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় যে আমি ছিলাম, জেগে উঠেও সেই আমিই আছি। উৎপত্তি-বিনাশ আত্মার ধর্ম্ম নয়, আত্মা সৎ, নিত্য ও অবিনাশী। বৈজ্ঞানিক

উপায়ে কিভাবে নিজের মুক্ত অবস্থার স্বরূপ জীব দেখতে পায় তার শিক্ষা দিতে গিয়ে আগে নিজের নিত্যত্বটুকু সাংখ্যস্তরে দেখতে বলেছেন ॥ ২/১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারতঃ ।। ১৮

অনুবাদ : নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর (বলিয়া) কথিত হয়; (অতএব) হে ভারত, যুদ্ধ কর। ২/১৮

ব্যাখ্যা : জীবশরীর ও জলবিম্ব (বুদবুদ) উভয়েরই নাশ আছে। যতক্ষণ হাওয়া আছে ততক্ষণই স্থিতি, পরে নাশ। কিন্তু জলস্বরূপ ব্রহ্মের নাশ নেই। কারণ তিনি অবিনাশী। তাঁর তুলনা নেই। ব্যাপারটা অনেকটাই এরকম, যেমন আমাদের শরীরের রক্ত মাংস আসলে অনেক জীবাণুর সমষ্টি। রক্তস্রোত হৃৎপিণ্ডদ্বারা সঞ্চালিত হয়ে রক্তকণারূপ জীবাণুসকল আমাদেরই দেহের পোষণ শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট হচ্ছে। ঠিক তেমনই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তিও আমাদের দেহে প্রাণশক্তি ঢেলে দিচ্ছে। আমরা জীবিত থাকতেও আমাদের দেহস্থ জীবাণুগুলো যেমন নিজ নিজ কর্ম্মফলে মৃত্যু ও জন্মরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করে, আমাদেরও তেমনই ব্রহ্মাদির আয়ু বা ভোগকাল সত্ত্বেও বহুবার জন্ম মৃত্যু হয়ে থাকে।

স্বাতন্ত্র্যলাভই জীবগতির লক্ষ্য হওয়ায় বিরাট আত্মা বহু হবার পর আপন আপন স্বাতন্ত্র্য ঘনীভূত করে নিতে থাকে এবং এভাবেই পরমাত্মা জীবাত্মারূপে সীমাবদ্ধ হন। এরপর আমিত্বের গন্ডী সম্পূর্ণ হলে ধীরে ধীরে আমিত্ব জ্ঞানটুকুই নিয়ে অন্যসব পরিত্যাগ করতে করতে অন্তর্মুখে প্রবেশ করতে থাকে। এসব আগেও বলেছি। এভাবে জীব যখন মানুষ রূপে পরিণত হয় তখন বুঝতে হবে তার আমিত্বের পূর্ণ ঘনীভূত সঙ্কীর্ণতম অবস্থাটা তৈরী হয়ে গেছে এবং তাথেকে সারাংশটুকু নিয়ে স্থূল কোষগুলো পরিত্যাগের সময় এসেছে। অর্থাৎ অন্নময়কোষের কাজ আর নেই। মনোময় আদি সূক্ষ্ম কোষে কাজ করার সময় উপস্থিত। সুতরাং মনোময়কোষের কার্য্য শৃঙ্খলার বিশ্লেষণই মনুষ্য জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এই মনোময় কোষেই জগদাদি প্রতিবিম্বিত। শীত, উষ্ণ, সুখ,দুঃখ, স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা থেকে শুরু করে পঞ্চতন্মাত্রাদি ভাবসকল সবই মনোময় কোষের গুণ একথা আগেই বলেছি। আরও বলেছি যে স্পন্দনতত্ব যা আমার মনের মধ্যে তরঙ্গ তোলে ও তদনুযায়ী ভাব সৃষ্টি করে। যাকিছু আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় ও অনুভূতিতে আসে, সেগুলো মনের দ্বারাই রচিত এবং মনেরই তরঙ্গভঙ্গ মাত্র, তাতে মন ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাই না। জলের ঢেউ যেমন জল ছাড়া আর কিছুই নয় তেমনই বিষয় সকলও মন ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে প্রত্যেকটিতেই যদি মনের সত্তামাত্র দেখার অভ্যাস কর, তবে দেখবে যে বিনাশ বলে কোনও পরিবর্ত্তন নেই। চিত্তাকাশ দর্শন করার এটা

একটা প্রকৃষ্ট উপায়। কোনও নির্জ্জন জায়গায় বস। মনে যে সমস্ত ভাবরাশি আসবে প্রত্যেকটিকেই মন মাত্র বলে ধারণা কর। দেখবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চিত্তাকাশের জ্যোতি দেখা যাবে। তখন বুঝবে --

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ।। ১৯

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইহাকে (আত্মা) হন্তা মনে করে,এবং যে ইহাকে হত মনে করে তাহারা উভয়ই জানেনা; (যেহেতু) ইনি হত্যা করেন না এবং হতও হন না। ২/১৯

ব্যাখ্যা : এই হত ও হন্তারক জ্ঞান উভয়ই কল্পনামাত্র। যাকে তুমি হননকর্তা ভাবছ সে ত কূটস্থ ব্রহ্ম। আবার যে হত হচ্ছে বলে মনে করছ সেও তো ব্রহ্ম। আগে যেমন বলেছি সেভাবেই যখন প্রত্যেক ভাবের মূল সত্তাটুকু অপরিণামী বলে বুঝতে পারা যাবে কেবল তখনই এই হন্তা ও হত জ্ঞান তিরোহিত হবে। ব্রহ্ম নিজ কল্পনা অনুযায়ী নিজেকে দেখেন ও যখন যে স্তর দেখতে অভিলাষী হন সেই স্তরের উপরই তাঁর লক্ষ্য পড়ে। আবার বিনাশ হওয়া মানে লক্ষ্য সেখান থেকে সরে যাওয়া মাত্র। অর্থাৎ দৃষ্টির বাইরে যাওয়া মাত্র, ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হওয়া, কিন্তু এ দেহের বা প্রকৃতি নামে ব্রহ্মের যে পরিচয় তার কথা পরে বলব। এখন যাঁদের কূটস্থ দর্শন হয়েছে স্বরূপে তাঁরা সেই কূটস্থই। এই কূটস্থ একটাই জিনিষ -- পৃথক পৃথক নয়। সুতরাং আত্মাকে হত্যাকারী বা নিহত যাঁরা মনে করেন তাঁদের কূটস্থ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই। না থাকারই কথা, কারণ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে জন্ম মরণাদি শত শত বুদ্ধিকল্পিত ব্যাপারে জন্ম মরণযুক্ত শোকমোহগ্রস্থ বলেই মনে হয়। এছাড়া সেরকম দৃষ্টিতে দেখলেও যে দেহাতীত নির্গুণ অংশটা থাকে তার কথাই বলা হবে। মূল তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হলে পরে সগুণ ভাবটা বিচার করে দেখলেই বেশ স্পষ্ট করে উভয়ের একত্ব স্পষ্ট হবে। সেজন্যে যাঁরা জড় বলে পৃথক প্রকৃতি স্বীকার করেন তাঁরাও আত্মার যে রকমের সত্তা মেনে নিয়েছেন সেই রকম সাংখ্যজ্ঞান থেকেই আগে আত্মার কেবলমাত্র সাধারণ ধর্ম্মগুলোকেই শুধু বর্ণনা করে দেখান হচ্ছে। ২/১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাহ ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।। ২০

অনুবাদ: ইনি কখনও জন্মান না বা মরেন না; অথবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবেন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধি শূন্য) শ্বাশত (অবক্ষয় শূন্য) এবং পুরাণ (পরিনাম শূন্য), শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি হত হন না। ২/২০

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের সূত্র ধরেই বলি, যখন এক বই দুই নেই তখন কে কাকে নাশ করে ? যেমন ঘটের নাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, তেমনই দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি বলে একটা পৃথক পদার্থকে স্বীকার করলেও আত্মার যে স্বরূপ স্বীকার করা হয় তা বেদান্তসিদ্ধ। যোগস্থ হয়েই এর উপলব্ধি হয়। মনকে নিজ কেন্দ্রে (আজ্ঞাচক্রে) লীন করতে পারলেই আত্মার এই স্বরূপ ফুটে ওঠে। এটা একেবারে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। নিজে দেখলেই বিশ্বাস হবে। এমনকি সাধারণ চোখে দ্বৈতভাব ঘুচবার আগেও আত্মার এই স্বরূপ প্রকটিত হতে দেখা যায়।

উপাধৌ যথা ভেদতাং সম্মনীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধি ভেদেষু তেহপি।
যথা চন্দ্রিকানাং জলে চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণোঃ॥ (হস্তামলক স্তোত্র)

যেমন চঞ্চল জলে চাঁদকে সচঞ্চল মনে হয়; সেরূপ বুদ্ধিভেদে, হে বিষ্ণু, তোমার চাঞ্চল্য মনে হয় মাত্র, প্রকৃতপক্ষে তোমাতে কোথাও চঞ্চলতা নেই। তুমি এক অদ্বিতীয়, চিরস্থির, সদা একরূপ। সাধনার প্রথম অবস্থায় আত্মোপলব্ধি এমনই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চার ধারে পরিস্ফুট হচ্ছে মাত্র। আত্মার প্রতিবিম্ব মনেরই তরঙ্গে চারধারে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে ও ইন্দ্রিয়াদিতেও আত্মজ্ঞান ফুটিয়ে তুলছে। তাই বলছি মন যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে লীন হয়ে যায় তখনই আত্মার প্রতিবিম্ব সঠিক দেখা যায়। এই আত্মা স্বত্তা মাত্র। কেবল জ্ঞানস্বরূপ, চিরসত্য ও চিরস্থির, ক্রিয়ার পরাবস্থায় যা উপলব্ধি হয়। ছোট ছেলে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে, ভাবে বুঝি আর একটা বাচ্চা তাই খুব খুশি হয় কারণ সে জানেনা, যে ঐ ছবি তার নিজের। যখন বোঝে তখন সে আর তার প্রতিবিম্ব দেখতে চায় না। নিজের স্বত্ত্বাই আত্মাতে প্রতিবিম্বিত জগৎরূপে শোভা পাচ্ছে। "যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র চিন্তনাৎ।" তাও যদি ভাবতে না পার তবে যা কিছু সমস্তই "প্রাণ ব্রজতি নিঃসৃতম", এই প্রাণের উপাসনা কর। শুদ্ধ ও স্থির প্রাণের মধ্যেই জগৎপ্রাণ আত্মাকে দেখতে পাবে। তাঁর চেয়ে প্রিয়তম, লোভনীয় আর কিছুই নেই। ২/২০

বেদবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ।। ২১

আনুবাদ : হে পার্থ, যিনি ইহাকে অজ, অব্যয় (ক্ষয়শূন্য) নিত্য (সর্বদা একরূপ) এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কিরূপে কাহাকে হনন করান ? কাহাকেই বা হনন করেন ? ২/২১

ব্যাখ্যা : যখন অজ, নিত্য, অবিনাশী, ও অব্যয় বলে আত্মা মাত্র ঘটে ঘটে বা দেহে দেহে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে তখন হত্যা আত্মপক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যার আত্মবোধ হয়নি, তিনিও হয়ত আত্মা অবিনাশী

বলে কিছু কথাবার্তা শুনেও থাকতে পারেন তাতে কোনও উপলব্ধি হয় না, আর মনের ক্ষোভও মেটে না। এই ধারণা, যতদিন না সমাধিস্থ হয়ে আত্মোপলব্ধি হয় ততদিন বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্যই আমাদের শাস্ত্রগুলোতে ক্রিয়াযোগের এত সমাদর। পূর্ণব্রহ্ম উপলব্ধির আগে এই ভাবে আত্মোপলব্ধির জন্য যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান গুরুমুখী নিত্যক্রিয়ার অঙ্গ। ঠিক ঠিক মত ক্রিয়া করলে মানুষ দেহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেহস্থ কোন একটা চক্রে সুখে অবস্থান করতে পারে। তখন তার দেহ মৃতবৎ বিবেচিত হয়। চিকিৎসক পরীক্ষা করলেও মৃত প্রতিপন্ন হবে। আবার সমাধিভঙ্গে ঐ চিকিৎসকই তাঁকে জীবিত দেখবেন !

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥"
বৃহদারণ্যক উপনিষদ

"যে বিদ্বান পুরুষ আপনাকে জানেন যে'আমি' ই সেই অদ্বিতীয় আত্মা, তখন তিনি কোনও কামনার জন্য বা কি ইচ্ছা (চাহিয়া) করিয়া শরীরকে ক্লেশ দান করিবেন ?" কিন্তু এত গেল আত্মজ্ঞানের কথা। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়নি তাঁর উপায় কি? খুব মন দিয়ে ক্রিয়া করে যাও বৃথা জ্ঞানী সেজে "সব বুঝি" ভেবে বসে থেকো না। যখন ক্রিয়া করতে করতে পরাবস্থায় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানবে, তখন আর বিষয়ানন্দ নেই। আত্মার আনন্দই বিষয়ে বিচ্ছুরিত হবে। আত্মস্থ হতে পারলে আপনাতেই আপনি তুষ্ট হবে। দ্বৈত প্রপঞ্চ নেই, কর্ত্তাও নেই, ক্রিয়াও নেই। তাই জ্ঞানীর পাপপুণ্য নেই। এঅবস্থা যতদিন না পাও নিজেকে গুরুর যন্ত্র মনে কর, তিনি যা করান তাই কর। ২/২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।।২২

অনুবাদ : যেমন মানুষ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ২/২২

ব্যাখ্যা : ভারতবর্ষে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা শাস্ত্রে ও মহাপুরুষগণের মুখে শুনেছেন যে আত্মার মৃত্যু নেই। দেহটা গেলেও আত্মা থাকে। এর প্রমাণও লোকে কিছু কিছু পেয়ে থাকে। অজ্ঞানী লোক আত্মার মর্ম্ম বোঝেনা, তবুও এরকম স্বীকার করে নেয়। তাই একটু বোঝার চেষ্টা করি। দেহ কি ?

মনের সংস্কার মাত্র। মনের সংস্কার ঘনীভূত হয়ে বাহ্য প্রকৃতি, থেকে উপাদান সকল সংগ্রহ করে দেহ তৈরী করে। সুতরাং শরীর গঠনের জন্য আমরা প্রকৃতির কাছে অত্যন্ত ঋণী।

বিজ্ঞানময় কোষ যতদিন না ঘনীভূত ও দৃঢ় হয় ততদিন দেহ ধারণ তারই স্বেচ্ছাধীন। যদিও সেটা প্রথমে বোঝা যায় না। পরে বিজ্ঞানময় কোষ ঘনীভূত হলে বোঝা যায় আত্মা স্বীয় ইচ্ছায় নিজের সংস্কার অনুযায়ী দেহ আকাঙ্ক্ষা করে ও সেইমতই বাহ্য জগতে ফুটে ওঠে, মানে জন্মায়। জন্মের পর মনোময় কোষ ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত মনে কোনও রকম অনুভব জন্মে না। এ জন্যই এত বিচিত্র জগৎ দর্শন শিশুর অনুভবে আসে না, দুই হাত দুরের জিনিসও তার মনে কোনও অনুভূতি জন্মাতে পারে না। শব্দের তরঙ্গ সকলও অবাধে তার ভিতর দিয়ে চলে যায় অথচ তার প্রাণে কোনও অনুভব জাগায় না, কারণ শিশুমন তখনও স্পন্দিত হবার যোগ্যতা পায় না। ধীরে ধীরে মনোময় কোষ যত ঘনীভূত হতে থাকে বাহ্য জগতের বিভিন্ন স্পন্দন তার মনের উপরেও স্পন্দন তুলতে সমর্থ হয় এবং বিভিন্ন বিভিন্ন অনুভবও তার প্রাণে ফুটে উঠতে থাকে। এজন্যই একজন বয়স্ক মানুষ জগৎকে যেভাবে অনুভব করে একটা শিশু সেভাবে পারে না।

আমাদের জন্ম মৃত্যু অবস্থান্তর প্রাপ্তি এ সমস্ত সব বিজ্ঞানময় কোষেই ফুটে ওঠে। কেন এ অবস্থায় জন্মেছি, কেন এ অবস্থা থেকে অন্য নির্দিষ্ট অবস্থায় আমাকে যেতে হবে। আগে কি রকম অবস্থায় ছিলাম - পরে কি রকম অবস্থায় যেতে আমি কৃতসঙ্কল্প এসব বিজ্ঞানময় কোষেই পরিষ্কার দেখা যায় ও স্পষ্ট বোঝা যায়। বিজ্ঞানময় কোষ ঘনীভূত না হলে দেখা যায় না। যাঁদের ঘনীভূত হয় তাঁরা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তাই তাঁরা ত্রিকালদর্শী। বিজ্ঞানময় দেহ তৈরী হলে বোঝা যায় যে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়াটা নিজের ইচ্ছাধীন। বিজ্ঞানময় কোষে এভাবেই বিচার করে আমরা জগতে উপস্থিত হই। মরে গেলাম অর্থে সাধারণ জগতের ইন্দ্রিয় অনুভূতি হতে অন্তর্হিত হলাম মাত্র। অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমাকে দেখা বা পাওয়ার উপায় রইল না। এই মৃত্যু কিভাবে হয় ? কোন প্রণালীতে জীবাত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যায় ?

সাধারণভাবে জীব ইন্দ্রিয়পথেই বেরিয়ে যায়। চোখ, কান, মুখ, নাক এসব পথেই বের হয়। যে মানুষ জীবিত অবস্থায় যে বৃত্তির বেশী চালনা করে সেই ইন্দ্রিয়পথেই বাইরে যায়। যেমন খুব হীনচেতা সংকীর্ণপ্রাণ ব্যক্তি পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নির্গত হয়। আবার খুব পেটুক লোক গুহ্যদ্বার দিয়ে যায়। কামুক লিঙ্গপথে প্রস্থান করতে বাধ্য হয়। সাধারণ মৃত্যুভয় শঙ্কিত বুদ্ধিজীবী মুখ দিয়ে, মেধাবিশিষ্ট শান্ত, ধর্ম্মভীরু লোকেরা নাক চোখ বা কান দিয়ে এই রকম আর কি। সাধারণ জীবদের

এইগুলোই দরজা। ধর্ম্মপ্রাণ, সাধনাতৎপর, ঈশ্বরলাভে কৃতসংকল্প ব্যক্তি ললাটপথে এবং যাঁরা সাধনায় সিদ্ধ তাঁরা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ব্রহ্মলোকে মহাপ্রয়াণ করেন।

এই দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জীবাত্মা নিজ স্ফূরণশক্তি দেহের দিক থেকে ফিরিয়ে দেন। তখন মনোময়কোষ ক্রমশঃ আচ্ছন্ন, জ্যোতিহীন হয়ে পড়তে থাকে। ক্রমশঃ অনুভূতিগুলো লুপ্ত হয়ে যায়। জ্ঞানের বিকাশ স্বতঃই রোধ হয়ে যায়। প্রাণশক্তি অঙ্গসকল থেকে অপসৃত হতে থাকে। মন যখন এভাবে ক্ষীণতর হতে থাকে তখন মনের অনুভব শক্তি হারিয়ে যাওয়ার শেষ মুহুর্ত্তে যে ভাবটি প্রবল ছিল সেই ভাবটিই স্ফুরিত হয়ে থাকে। ভাবের সঙ্গে বেদান্তকথিত প্রথম সৃষ্ট তেজস্তত্ত্ব বা শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, শক্তির সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলোও একইরকম সম্বন্ধযুক্ত। প্রাণে একটা ভাব ফুটে উঠলে সেই ভাবটা শক্তিকে উদ্দীপিত করে এবং সেই শক্তিটুকু, সেই ভাবটি যে ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্বন্ধিত সেই ইন্দ্রিয়পথে ছুটে যায়। ভাবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই ইন্দ্রিয়সকল সঞ্চালিত হয়। যেমন লোভে মুখে জল আসে, জিভে লালা বের হয়। কোনও অদ্ভুত দর্শন বা অবাক হলে চক্ষু বিস্ফারিত হয়, খুব রেগে গেলে হাত পা শক্ত হয়, কেউ দাঁতে দাঁত চাপে, কেউ বা অত্যাধিক রাগে কাঁপতে থাকে, ইত্যাদি। একইভাবে মৃত্যুর সময় জীবিত অবস্থার প্রবল ভাবগুলো প্রাণশক্তিকে সেই সেই ইন্দ্রিয়পথে চালিত করে এবং সমস্ত তেজ বা শক্তি সংগৃহীত হলে সেই সেই ইন্দ্রিয় পথেই জীবাত্মা নির্গত হয়। যেমন খাদ্যরসিকের আহার ক্ষিতিতত্ত্বের উপর অধিক ক্রিয়াশীল, ফলে ক্ষিতিতত্ত্বের কর্ম্মেন্দ্রিয় পথেই তার শক্তির ও আত্মার গতি হবে। ক্ষিতিতত্ত্বের কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু (rectum)| সুতরাং ঔদরিকের আত্মা ও শক্তি গুহ্যদ্বারে আশ্রয় নেবে এবং মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তনটুকু সম্পূর্ণ হলে ঐ পথেই বেরিয়ে যাবে। এভাবেই জীবাত্মা আপন সংস্কার অনুযায়ী উর্দ্ধ বা নিম্ন পথে নিষ্ক্রান্ত হন। এই নিষ্ক্রমণই উর্দ্ধ বা নিম্ন গতির চিহ্ন। একইভাবে যোগীর প্রয়াণকালে ভগবদ্‌ভাব তাঁকে উর্দ্ধে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে যায় এবং তিনি সেই পথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে পৌছান। এত কথা বলার কারণ যাতে এই তত্ত্বটা উপলব্ধি হতে পারে যে প্রাণের উপর ভগবৎ চিন্তার সংস্কার অন্যান্য চিন্তার চেয়ে জোরালো হলে তবেই মৃত্যুর পর ভালো কিছু হতে পারে অর্থাৎ উর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হতে পারে। সেজন্য যাতে মৃত্যুকালে ভগবৎ চিন্তা সজাগ থাকে তেমন প্রকৃষ্ট উপায় অবধারণাই সাধক জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উর্দ্ধগতির একমাত্র উপায় হিসাবে মৃত্যুকালীন মনোময় কোষের অবস্থাকে অনুকুলে আনতে হলে ভগবৎ চিন্তার গভীর সংস্কার প্রাণের উপর আধিপত্য করাই যে উর্দ্ধগতির একমাত্র উপায়, এটাই স্থির সিদ্ধান্ত। এই কর্মের প্রণালীসকল যোগীদের জানা আছে । তাঁদের সেবা করে সেসমস্ত শিক্ষা কর। "তদ্বিদ্ধি প্রনিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়াঃ" এবং মনকে ললাটে আজ্ঞাচক্রে সংযত করতে অভ্যাস কর ও কৃতকার্য্য হও। ব্রহ্মশক্তি তোমার স্থুলশরীরের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কিভাবে কার্য্যকরী হয় ক্রমশঃ তা অনুভব করে

ও দেখে পুলকিত হবে। শেষে নিদ্রাকালে জাগ্রত থাকার অভ্যাস দৃঢ় হতে থাকলেই বুঝবে যে তুমি মৃত্যুসময় জাগ্রত থাকার অভ্যাস করতে পারছ। মৃত্যুকালে তুমি যখন মহানিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়তে থাকবে, তখন এই অভ্যাসের ফলে তুমি জেগে থাকতে সক্ষম হবে। বহির্জগতের চোখে তুমি মৃত্যুর গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছ মনে হলেও, তুমি নিজে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবে তুমি এক অপূর্ব শান্তিময় স্নিগ্ধ সাগরে শুয়ে পড়ছ। এটাই অনন্তশয়ন এবং তোমার শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে যোগস্থ হচ্ছে। ঐ শক্তির কেন্দ্রই ব্রহ্মলোক, সেটা প্রত্যক্ষ হলেই বুঝবে তুমি ব্রহ্মলোকে নীত হচ্ছ। অতএব মহামৃত্যুর আশঙ্কায় আর ভীত হতে হবে না। মৃত্যু বিভীষীকাময়ী না হয়ে মৃত্যুই তখন সত্য জীবনের সন্ধান বলে দেবে। বলতে গেলে মরণের জন্য তৈরী হওয়াই যেন জীবনের উদ্দেশ্য। সারা জীবন ধরে যা কিছু করছ ঐ একদিনের অভিনয়ের জন্যই তৈরী হচ্ছ। মৃত্যুই তোমার সেই অভিনয়। কিভাবে তোমার সেই অভিনয়ের অংশটুকু কতটা পরিমাণে অভ্যাস (Practice)করেছ ঐ মৃত্যুসময়েই তার পরীক্ষা। রোজ যদি সেই মহা অভিনয়ের অংশটুকু অভ্যাস করে থাক তবেই তুমি সঠিক সময়ে সঠিক অভিনয় করে কৃতার্থ হতে পারবে। আর এখন থেকেই যদি নিয়মিত ভাবে অভ্যাস না কর তবে রঙ্গমঞ্চে (Stage) উঠে হাস্যস্পদ হবে মাত্র।

মৃত্যুকালে আত্মা সংস্কার অনুযায়ী দেহদ্বারে উপস্থিত হলে ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি গুটিয়ে নিয়ে এসে তাতে লিপ্ত হয় এবং দেহের বাইরে এসে একটু উঁচুতে ব্যোমপরমাণুতে গঠিত একটি অবয়ব তৈরী করে। দেহের প্রাণশক্তি এখন এইদেহে চলে আসে। প্রাণশক্তির এই প্রবাহটা (Flow) সাদা সূতোর আকারে শরীর থেকে বেরোতে থাকে। যতক্ষণ না সবটুকু শক্তি বেরিয়ে আসে ততক্ষণই এই প্রবাহটা (Flow) দেখা যায় এবং ততক্ষণ জীবাত্মা অন্নময় স্থূল দেহের বাইরে গিয়েও দেহের সাথে একটু সংযুক্ত ভাবে বা নিকটেই থাকে, সবকিছুই ঐ ব্যোমপরমাণু গঠিত শরীরের দ্বারাই শ্রবণ, দর্শনাদি করে থাকে।

এজন্যই মৃত্যুকালে মৃতব্যক্তির কাছে শোক প্রকাশ করতে নেই। এতে চিত্তবিভ্রম ঘটতে পারে। বরং সেখানে সে সময় ঈশ্বরের নামগান, কীর্ত্তন এসব করলে তার মনোময় কোষে ভগবৎ সংস্কার ফুটিয়ে তোলা যায়। মৃত্যুকালে কোনও প্রকারে প্রাণে একটু ভগবৎভাব এলেই সদ্গতি অনিবার্য্য। এভাবে এই সূক্ষ্মদেহে প্রেতাদি লোকসকল ভোগ ও অতিক্রম করে শক্তি অনুযায়ী জ্ঞানযুক্ত বা অজ্ঞান অবস্থায়ই বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত উঠে আবার সেই আপন কর্ম্ম অনুসারে দেহ ধারণের জন্য প্রকাশ পান। সাধারণ জীব (জীবপ্রবাহ) দশদিন থেকে একবছরে প্রেতলোক অতিক্রম করে। আসক্তির প্রবণতা অনুযায়ী এইলোকে বেশীদিন থাকতে হয়। এখানে কর্ম্মের বেগটুকু ক্ষয় হয় মাত্র। এই momentum টুকু শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এইখানে থাকতে হয়। এখানে ইচ্ছামাত্র সবই পাওয়া যায়

অথচ তৃপ্তি নেই। যেমন কোনও ভাল কিছু খেতে ইচ্ছামাত্রই পাওয়া যাবে কিন্তু এ জগতে যেমন খাওয়ার একটা তৃপ্তি আছে এখানে সেসব তিলমাত্র নেই। বরং ইহজন্মের আসক্তি ও সংকল্প প্রভাবে প্রেতশরীর তেমন তেমন আকার পায়। যেমন লোভী লোকের লোলজিহ্বা বুক অবধি ঝোলে। আরও যেসব দুরাকাঙ্খা থেকে থাকে সেগুলো হৃদয়ে আগুনের মত দেখা যায় আর খুব জ্বালা যন্ত্রণা দেয়। তারপর একসময় প্রেতশরীরও ক্ষয় হয়। এই জগতেরই মত প্রেতলোকেও প্রেতশরীরের মৃত্যু হয়। তখন মনোময় দেহ পেয়ে পুণ্যকর্ম্ম ভোগের জন্য পরবর্ত্তী (Sphere) স্বর্গলোকে যায়। এই ভাবে স্তরে স্তরে এক একটা করে আবরণ খসতে থাকে। যত স্থূল আবরণ খসে সূক্ষ্ম আবরণ প্রকাশ পায় অনুভবও তত ক্ষীণ ও স্বপ্নের মত হয়। তবে যাদের সূক্ষ্মশরীর সাধনার দ্বারা কার্য্যক্ষম (ধপঃরাব) আছে তাঁরাই মনোময় কোষে ঐ বিজ্ঞানময় (স্বর্গ) উর্দ্ধতমলোকের সুন্দর ভাব হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন । সাধারণ জীব অজ্ঞান হওয়ার মত হয়ে বিজ্ঞানময়কোষে নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে। যাঁরা সাধনাতৎপর তাঁরা প্রেতলেকটিও ঝট করে পেরিয়ে যান। যাক, দেহসকল যে বস্ত্রের মত আমাদের শরীরের আবরণ মাত্র এটা বোঝা গেল। কিন্তু একটা বিষয় আরও আছে সেটা হল পরকায়ায় প্রবেশ। কিন্তু এটা প্রকাশ্য নয় সেজন্য খুলে বলব না। আর বিশদভাবে বললেও বোঝা যাবে না, একটু ধারণা দেওয়া যেতে পারে মাত্র । কারণ সেই অবস্থা না পেলে একাজ করাও যাবে না, মাঝখান থেকে কিছুটা জটিল রহস্যের ধাঁধায় ফেলে দেওয়া হবে মাত্র। আজকাল অনেককেই এরকম করতে দেখি অথচ তাঁরা একটি পথেরও সন্ধান যথার্থ জানেন না। কিন্তু তাঁদের বর্ণনা শুনে মনে হবে যেন তাঁরা যথার্থই বলছেন।

মানুষ চেষ্টা করলে দেহের ভিতরে থেকেই দেহ হতে আলাদা হয়ে থাকতে পারে। ঠিক যেন পাকা ফলের মধ্যে আঁটির মত অসংলগ্ন। ফলে দেহত্যাগের সময় স্থূলদেহের সাথে বিশেষ বাঁধন না থাকায় সহজেই দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। কৌশলের দ্বারা এ শক্তি লাভকরা যায়। প্রথমে মনকে চিন্তাশূন্য করতে হয়। পরে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে হয়। তখন মনে একটা শূন্য অবস্থা আসে এবং দেহের মধ্যে থেকেও অবলম্বনবিহীন বোধ হয়, ফলে আশঙ্কা থেকে বিকার উপস্থিত হয়, চিত্ত ঘুরে দাঁড়ায়, ফের স্থূলদেহ অবলম্বন করে আশ্বস্ত হয়। এঅবস্থা কিছুদিন চলার পর ভয় কেটে যায়। এবং অন্তরের মধ্যেই একটা শ্বেতশুভ্র জ্যোতিরেখার মত জিনিস দেখা দিলে চিত্ত সেই জ্যোতিরেখা অবলম্বন করে স্থির হয়। আসলে এই জিনিষটা একটা নাড়ীর কার্য্যকারিতা। এ অবস্থা কিছুদিন চলার পর ঐ রেখা ধরে কোন পথে যাওয়া যায় তা জানার বাসনা জাগে। এই ইচ্ছা তৈরী হতে বেশ কিছুটা দেরী হয় বটে কিন্তু ইচ্ছা হওয়া মাত্রই পূরণ হয়। তখন সে সেই নাড়ী দিয়ে সূক্ষ্মদেহের একটা কেন্দ্রে (চক্রে) গিয়ে পড়ে । ঐ কেন্দ্রে (চক্রে) স্থির হয়ে থাকলে সেই কেন্দ্রের কাজগুলো ভাল করে দেখা ও

বোঝা যায়। এবার ইচ্ছামত কিছু অলৌকিক কাজও করা যায়। কেউ দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য দেহে যেতে চাইলে সেই কেন্দ্র থেকে সূক্ষ্ম জ্যোতি বেরিয়ে অন্য দেহের সেই কেন্দ্রে গিয়ে যুক্ত হয় আর সেটা অবলম্বনে আত্মাও দেহান্তরে প্রবেশ করে। যাই হোক এবার কিছুটা বোঝা গেল যে দেহত্যাগ, বস্ত্রত্যাগ অপেক্ষা ভয়ের ব্যাপার নয়। তবে নিজেকে এভাবে পাকাতে না পারলে হবে না। কাঁচাফলের আঁটি বা বিচি আলাদা করার মত জীবাত্মাকে বেশ যন্ত্রণা পেতে হয়। আর সাধনার দ্বারা নিজের অবস্থাকে পাকা করে ফেলতে পারলে পাকা ফলের আঁটির মত একটু চেষ্টাতেই চট করে বেরিয়ে পড়ে। জীবের এই শেষ মুহূর্ত্তের ইতিহাস ভীষণ। ভক্তির উচ্ছাস প্রাণে না থাকলেও, মৃত্যুকালীন অবস্থার কথা ভেবেও সাবধান হওয়া উচিত। পরের শ্লোকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে ॥ ২/২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ।। ২৩

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।।২৪

অনুবাদ : শস্ত্রসকল ইঁহাকে ছেদন করিতে পারে না; অগ্নি ইঁহাকে পোড়াইতে পারে না। জল ইঁহাকে ভিজাইতে পারে না, এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য, (ইনি) অশোষ্য, ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব এবং সদা একরূপ ॥ ২/২৩-২৪

ব্যাখ্যা : আত্মার স্বরূপের কথাই এখানে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। এজন্য দুটো শ্লোকের ব্যাখ্যা একই সাথে বলছি। একমাত্র ক্রিয়া উপদেশ ব্যাতীত অপর কোনও উপায়ে আত্মাকে এভাবে জানা সম্ভব নয়। গুরুকৃপা লাভ করে সাধন দ্বারা এ তত্ত্ব জানতে, বুঝতে হবে। তবু চেষ্টা করে অহরহঃ ধারণাও করতে হবে যে আত্মা সর্ব্বদা এক ভাবাপন্ন, অপরিণামী ও স্থির। এই দুটো তত্ত্ব প্রথমতঃ মৃত্যু বস্ত্র বা বসনত্যাগ মাত্র এবং আত্মা অপরিণামী এমনতর ধারণা দৃঢ় ভাবে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত না হলে এগোনো যাবে না। বলা বাহুল্য এ দুটোই জড়বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। যাই হোক, নিজেকে গৃহমুখী করলে অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থার দিকে লক্ষ্য ফেরালেই বোঝা যাবে যে "আমি আসলে শূন্য"। শরীর ইত্যাদি সব উপাধি মাত্র, আর যিনি আকাশের মত অবয়বহীন, আগুন, জল, বায়ু, অস্ত্রশস্ত্র তাঁর কি করবে ? প্রাণবায়ুকে সাধনার দ্বারা স্থির করলে নিজেকেও তেমনই আকাশের মতই বোধ হয়। আত্মা গুণযুক্ত হলেই জীব, আর গুণশূন্য হলেই শিব। শূন্য মানে কিছুই নয় এমন একটা অর্থ কিন্তু নয়। শিবের একনাম এজন্যই ব্যোম্। আসলে আমাদের মনের সংকল্পগুলোই আত্মার সাথে জগৎ সংসারের বাঁধনরাশি, তাই সংকল্প না থাকলে আর সংসারের সাথে সম্বন্ধ থাকে না। তখন সব গুণ, উপাধি ইত্যাদি তিরোহিত হয়। (২/২৩)

যখন আত্মস্বরূপ ফুটতে আরম্ভ হয় তখনই বোঝা যায় যে আত্মা কোনও ভৌতিক পদার্থ নয়, নিরাবয়ব ও অমূর্ত্ত। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ বলেন " আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"। অর্থ আত্মা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, নিত্য, মহান, বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন যিনি পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী থেকে পৃথক, জলে থেকেও জল হতে আলাদা, আগুনে থেকেও আগুন নন, এবং বায়ুতে থেকেও বায়ু হতে স্বতন্ত্র। অথচ এই একই "অণু" রূপ আত্মা সকলের মধ্যেই এটা মহৎ আশ্চর্য্য হলেও সাধকের সাধনগম্য। একটু বেশ দুর্ব্বোধ্য বলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্জ্জুনকে বার বার একই কথাই বলা হয়েছে। শঙ্করাচার্য্যও বলেছেন যে "আত্মবস্তু অত্যন্ত দুর্বোধ্য তাই পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করিয়া শব্দান্তর দ্বারা ভগবান বাসুদেব সেই আত্মবস্তু নিরূপণ করিতেছেন"। কারণ এই সদ্‌বস্তু কোনও প্রকারে সংসারী জীবের বুদ্ধিগোচর হতে পারলেই তার সংসার নিবৃত্তি হতে পারে ॥ (২/২৪)

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ।২৫

অনুবাদ: এই আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, ইনি মনেরও অগোচর, ইনি কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর বলিয়া কথিত হন; অতএব ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা করিও না। ২/২৫

ব্যাখ্যা : আত্মভাবে অবস্থান বিনা আত্মাকে জানার চেষ্টা না করাই ভালো। মাঝে মাঝে আমরা মনের বিচারে আত্মাকে জানার চেষ্টা করি। অব্যক্ত জিনিষটাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করি কিন্তু এসবই সহস্রছিদ্র কলসিতে করে জল আনার মত অথবা শূন্য কে দড়ি দিয়ে বাঁধার চেষ্টার মত ব্যাপার। কেন না – " বাচা যত্র নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। " বিকারযুক্ত বাক্যের দ্বারা অবিকার্য্য পদার্থ প্রকাশ করার চেষ্টা বিফল প্রয়াস মাত্র। কেবলমাত্র ক্রিয়ার পরাবস্থায় নিজ বোধরূপ বোঝা যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাই বলতেন সবই এঁটো হয়েছে শুধু ব্রহ্মই বাদ আছেন। অর্থাৎ তিনি এইসব ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

সমস্ত ধারণা, বৃত্তি, অনুভূতি, একীভূত না হলে, ততক্ষণ আত্মাও এক অচিন্ত্য, দুর্ব্বোধ্য বিষয় হয়েই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত থেকে যাবে। আগে যে সহস্রছিদ্র কলসির কথা বলেছি ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিগুলো আমাদের হৃদয় কলসের ভিন্ন ভিন্ন ছিদ্র। যখন যেদিকে কলসি ডুবিয়ে ধরি, সেদিকের সহস্র জিনিষই

সহস্র নতুন আকারে হৃদয়ে এসে জমা হয়। আবার নতুন কিছু খুঁজি, এভাবেই সহস্র ফুটো দিয়ে কলসি শূন্য হয়, আবার ভরে। দেখা যাবে একই বিষয় পূর্ণ হচ্ছে সহস্রভাবে আবার মুহুর্ত্তে শূন্য হচ্ছে। শুধুমাত্র সংস্কারটুকু সংগ্রহ করে জল সব বের হয়ে যাচ্ছে। কলসি আর ভরা হচ্ছে না। রূপকের আশ্রয় নিয়ে গল্প বললে হয়ত ধারণাটা পরিষ্কার হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অসুস্থ হলেন। অবশ্যই নিজের ইচ্ছায়। মায়ের কোলে মুমূর্ষুপ্রায় হয়ে পড়ে রইলেন। বৈদ্যরূপে এসে বললেন যদি কেউ হাজার ছিদ্রের কলসি ভরে জল আনতে পারে এবং সেই জল একফোঁটাও না পড়ে তবে সেই জলে স্নান করলে কৃষ্ণের রোগ সারবে। সবাই বলল এ অসম্ভব। বৈদ্য বললেন অসম্ভব ঠিকই কিন্তু সতীর পক্ষে সম্ভব। যদি কেউ সতী থাক, তবে তারই হাতে আমার ফুটোওয়ালা কলসি ভরে আসবে। একফোঁটাও জল পড়বেনা। শ্রীকৃষ্ণ রোগমুক্ত হবেন। মহিলারা সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে সবাই সবাইকে বলছেন তুমি যাও, তুমি যাও, কিন্তু নিজে কেউই যান না। যাঁরা তখন সতীরূপে খুবই বিখ্যাত ছিলেন সবাই মিলে তাদের অনুরোধ করলেন। সকলের কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা একে একে গেলেন। গেলেও বিপদ, না গেলেও বিপদ। কিন্তু কেউই পারলেন না। শ্রীমতীর তো দুর্নাম ছিলই, তবে তিনি নিজের কথা ভাবেন নি। তিনি শুধু ভাবছিলেন স্বয়ং বৈদ্যনাথের রোগ! ব্যাপারটা কি ? নির্বিকারের আবার বিকার কেথায় ? অসম্ভব ! অসম্ভব ! যাই হোক সকলের কথায় শ্রীমতী ফুটো কলস নিয়ে জলে নামলেন। কিন্তু কোথায় জল ? এ যে নারায়ণ ! কোথায় কলস ? এ যে জগদাধার! শ্রীমতী কলসী ওঠালেন। একটুও জল ঝরল না, শুধু চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ সেই জলে অভিষিক্ত হয়ে বাঁচলেন। সর্বত্র এই শ্রীকৃষ্ণ বিকারের ভান করে সর্ব্বজীবে আছেন। জ্ঞনরূপী বৈদ্য এসে বলে তোমার হৃদয় পূর্ণ করলেই বিকারমুক্ত হবে। আমরা নিজেরা পারিনা, অথচ অন্যকে করতে বলি। কিন্তু যদি শ্রীমতীর মত হতে পারতাম তবে আর জ্ঞানী, যোগী, সাধু, মহাত্মা ইত্যাদি সতীত্বের পরিচয় লক্ষ্য না করে ঐ সহস্র পথে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই পেতাম। কলসী ভরে উঠত আর এই জীবভাবের বিকারমুক্ত হয়ে আত্মা মুক্ত হত। আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত। আমরা বুঝতাম, হৃদয়ে আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হত। তাই সমস্ত ধারণা এক না হলে, সব বিষয়ে এক দর্শন না হলে, এই বিকার যাবে না। এটা অব্যক্ত - ব্যক্ত করে কেউ তোমাকে শেখাতে আসবেনা। অচিন্ত্য চিন্তা করে পাবেনা। অবিকার্য্য-ভাব বর্ণনা করে, বিকৃত করে, ফুটিয়ে তুলতেও পারবে না। তখন কেউ তোমার ধান্দা ঘোচাতে পারল না বলে শোক ক'রো না। নিজের যন্ত্রণা নিজে অনুভব কর। প্রাণকে স্থির করে মনে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারলেই আত্মার স্বরূপ ফুটবে। হৃদয়কুম্ভও পূর্ণ হবে। সেই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যেসব প্রক্রিয়া আছে তা পরে বলব। শুধু কৌতুহল চরিতার্থ করা মাত্র হলে তো নিজেই নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু তা নয়। শুধু কৌতুহল চরিতার্থ করা যাদের উদ্দ্যেশ্য তাদের জন্য এই বই নয়। যাই হোক, আত্মস্বরূপ অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এটা না জানলে শোক দূর হয় না। শুধুমাত্র যোগী হব, ধর্ম্মাত্মা হব,

এমন ভেবে যোগী হওয়া যায় না। মরণের ছবি জীবনে দেখে নিয়ে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রাণ কাঁদলে তবেই পথ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। আত্মাকে যাঁরা জানেন তাঁরা শোক হতে উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় নিশ্চিন্ত হতে পারলে তাঁকে কিছুটা বোঝা যায় ও শোকোত্তীর্ণ হওয়া যায়। ২/২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ।। ২৬

অনুবাদ : আর যদি ইহাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত মনে কর, হে মহাবাহো, তথাপি তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না। ২/২৬

ব্যাখ্যা : আধুনিক মার্কসীয় বা প্রাচীন চার্ব্বাকীয় ধারণায় আত্মার অস্তিত্বই নাই। যা কিছু আছে তা হল মানুষের "মন"। এই মন দিয়েই সব চিন্তা, ভাবনা, দুঃখ, সুখ অনুভব করা যায়। আবার মধ্যপন্থী এক শ্রেণীর মতে আত্মা আছেন তবে অনিত্য। অর্থাৎ দেহের জন্মের সাথে সাথে আত্মার জন্ম এবং দেহের মৃত্যুতেই আত্মারও মৃত্যু হয়। এরাই সংখ্যায় সর্ব্বাধিক। এরাও চার্ব্বাকদের মত জড়বাদী । তাই শ্রীভগবানও বলছেন যে আত্মার নিত্যতা তো অনেক করে বোঝান গেল, তবুও যদি জড়বাদী বা ভোগবাদী নাস্তিকের মত সন্দেহ থেকে যায় তা হলেও শোকের কিছু নেই। কেন নেই সেটা পরের শ্লোকে বলা হবে। এখন শ্রীভগবান বলছেন চার্বাকীয় উৎকট জড়বাদী অথবা মধ্যপন্থী জড়বাদী যাই হও, মৃত্যু সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি হওয়ার আগেই শোক পরিত্যাগ করার জন্য অন্ততঃ যুক্তিদ্বারা বোঝ যে আজ মরলেও কাল আবার জন্মাবে তখন পুরাণো জগৎ আবার নতুন করে দেখবে। অতএব শোকের কি আছে ? মাঝে মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যেও পূর্ব্বজন্মের ঘটনা মনে পড়ার কথা শোনা যায়। এমনই একটা ঘটনা শোন। বৈশাখের দুপুরে প্রচণ্ড গরমে একজন বুড়ো লোক মাঠের মাঝে গাছের তলায় তৃষ্ণার্ত হয়ে এসে বসেছে। গাছের তলায় আর একটা লোকের কাছে জলভরা একটা কলসি ছিল। তা থেকে সে জলপান করছিল। রৌদ্রতপ্ত লোকটা তৃষ্ণার্ত তাই তার কাছে একটু জলের জন্য কাতর প্রার্থনা করল। সহসা উভয়েরই মনে ভাবান্তর দেখা গেল। প্রথম লোকটা বেশ রাগ করে বলল তোমার সেই দারোয়ান কোথায় ? মনে পড়ে ? অনেক আগে আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে তুমি আমায় দারোয়ান দিয়ে বের করে দিয়েছিলে। আজ তার চেয়ে অনেক বেশি তেষ্টা নিয়ে এই প্রান্তরে আমার কাছে জল চাইছ ? দ্বিতীয় লোকটা লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল। কি যেন বহুদিনের হারানো স্মৃতি – প্রাণে ফুটে উঠল। বলল "কই আমার দারোয়ান নেই, কখনও ছিল না। অথচ মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কেন বলি – সত্যিই তো দারোয়ান ছিল, সত্যিই তো এই লোকটাই আমার দরজায় এসে জল

চেয়েছিল। সত্যিই তো, কবে-কবে -বহুদিন, অনেক দিন" - সে একভাবে প্রথম লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ব্বজন্মের ঘটনা দেখতে পাচ্ছিল। প্রথম লোকটা আবার তাকে বলল "তোমার মনে পড়ছে না ? অনেক আগে। ঠিক কবে সেটা আমিও ঠিক করতে পারছিনা। কিন্তু তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, এটা সত্যি। জল দাওনি, এটা সত্যি। কিন্তু কবে? বলতে পার ?" উভয়েই পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি স্ফুরণে সহসা দ্বিগুণ চৈতন্যযুক্ত হয়ে পড়েছিল (induced multiplied sensitivity) একটু পরে প্রথম লোকটা বলল "এই নাও জল পান কর। আমি তোমায় ক্ষমা করলাম"। দ্বিতীয় লোকটার তৃষ্ণা আর বড় একটা ছিল না। বরং বিস্ময়ে কৌতুহলে বিবশ হয়ে তার শরীর কাঁপছিল। সে জল পান করল। তারা আর প্রত্যক্ষভাবে সেটা অনুভব করতে পারল না। কিন্তু স্বপ্নের মত একটা স্মৃতির আভাস মাত্র মনের উপর একটা ভাবের ছাপ রেখে গেল। প্রথম লোকটা সাধনায় কিছুটা এগিয়ে ছিল। ফলে সে এবার দ্বিতীয় লোকটাকে বুঝিয়ে দিল যে এটা পূর্ব্বজন্মের একটা ঘটনার উদ্ভাসিত স্মৃতি।

এখন প্রশ্ন ওঠে কেন আমরা ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয় দিক দেখতে পাই না ? আমাদের চৈতন্য ততটা সবল হয়নি বলেই। তবে আমাদের চৈতন্য, জন্ম মরণ রূপ evolution পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্দ্ধনা পাচ্ছে, ক্রমশ বাড়ছে। এটাই প্রকৃতির কৌশল। এ যাদু যে বুঝেছে, এ রহস্য যার প্রাণে ফুটেছে, তার তো এর জন্য শোকের কোনও কারণ নেই। ২/২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।। ২৭

অনুবাদ : যেহেতু জাতমাত্রেরই মরণ নিশ্চিত, এবং মৃতের জন্ম নিশ্চিত, অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিও না ॥ ২/২৭

ব্যাখ্যা : জন্ম হলেই একদিন না এক দিন মৃত্যু আসবে। আবার মৃত্যু হলেই যথাক্রমে স্তর পার হয়ে এসে আবার জন্মাতে হবে। সুতরাং এমন অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করে কি লাভ ? তার চেয়ে বরং সাহসে বুক বাঁধাই কর্তব্য।

সাধারণতঃ মানুষ তিনটে কারণে মরতে ভয় পায়।

(১) নিজের অস্তিত্ব হারাবার আশঙ্কা।

(২) এ জগতে এসে এই যে সংসার পেতে বসেছে তার সাথে বিচ্ছেদ।

(৩) মৃত্যুর পর কি অবস্থা হবে ?

প্রথম আশঙ্কাটা সকলেরই, দ্বিতীয়টা নিকৃষ্ট জীবের, তৃতীয়টা কিঞ্চিৎ উন্নত জীবের জন্য।

(১) প্রথম আশঙ্কটা ভ্রান্তি। এটা আমরা আগের আলোচনাতেই বুঝেছি। জন্মমৃত্যুতে আমাদের অস্তিত্বের বিশেষ হেরফের হয় না।

(২) দ্বিতীয় ভয়টা নিতান্তই হেয় ও অকিঞ্চৎকর। আত্মীয়স্বজন বা জগৎ বলে যেটা বোধ করি সেটা আমাদের হৃদয়ের ভাবপুঞ্জ বা ভাব অনুভাবের সমষ্টি মাত্র। হৃদয় যতক্ষণ যাতে যেভাবে নিবিষ্ট (induced) হয়, তাকে তেমন ভাবে অনুভব করি মাত্র। একথাও আগেই আলোচনা করেছি।

(৩) তৃতীয় আশঙ্কাটা কিন্তু ভাববার বিষয়। অস্তিত্ব থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেটার অনুভব কেমন হবে ? অথবা কি করে সেই অনুভবটাকে উন্নত ও সুখের করা যায় ? এ রহস্যগুলো প্রতি মানুষের জীবনে সমাধান হওয়া দরকার।

যখন বিজ্ঞানে পড়ি কোনও পরমাণুই ধ্বংস হয়না তখন আত্মাও তো চৈতন্য ও জড় পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ, তার বিনাশ কিভাবে হয় ? অতএব আত্মার যে সমস্ত লক্ষণ আগে বলেছি সেগুলো স্বীকার করে নিয়ে সাংখ্যজ্ঞানের অনুশীলন করলে তবেই আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোঝা যাবে। নইলে এসব প্রচেষ্টা শুধুমাত্র দেহ ও মনের ব্যায়ামে পর্য্যবসিত হবে। অবশ্য প্রথম দিকে এসবই করতে হবে, নইলে দেহজ্ঞান যাবেনা। কর্ম্মাসক্তি থাকতে দেহপ্রাপ্তি ও পুর্নজন্ম হবেই। প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ আত্মাতে ইন্দ্রিয়যোগের নামই জন্ম। আত্মা হতে শরীর ইন্দ্রিয়ের বিয়োগই মৃত্যু। এই বার বার জন্মমৃত্যু এড়াতে হলে কর্ম্ম যাতে কর্তৃত্ব অভিনিবেশ শূন্য হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টা চালাও। "সেই জন পারে রুধিবারে নিয়তি শাসন। যে জন কর্ম্মফল করে কৃষ্ণে সমর্পণ ॥" তাঁকে মনে মনে ফলাফল অর্পণ কর। তাঁর চাকর হয়ে, তাঁর আদেশেই সব করছ, এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে কর্তৃত্ব অভিনিবেশশূন্য যে প্রাণ সেই প্রাণের সাথে নিত্যই যোগ রাখতে হবে। তা হলেই মন প্রাণের সাথে মিশে যাবে। এটাকেই 'উন্মনী' বলে। এই 'উন্মনী' অবস্থায় আপনা আপনিই সব কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হয়। অতএব দেহ ভূলে আত্মস্থ হতে চেষ্টা কর। দেখবে দেহ, মন, বুদ্ধি সব ভেদ চলে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। কৌশল একটাই।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসিযৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদার্পণম্ ॥" ২/২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ।। ২৮

অনুবাদ : হে ভারত, ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত (চক্ষু ইত্যাদির অগোচর) কেবল মধ্যে ব্যক্ত (প্রকাশিত) এবং নিধনেও অব্যক্ত; অতএব তাহাতে আবার পরিদেবনা (শোক, বিলাপ, পরিতাপ) কি ? ২/২৮

ব্যাখ্যা : আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার জন্য দুঃখ না হলেও শরীরের জন্য তো দুঃখ হতে পারে। তাই বলা হল যে এই শরীর জন্মের পূর্ব্বে অব্যক্ত, নিধনেও তাই। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত শুধু অবস্থার তারতম্য মাত্র। শরীর ধারণ করলে স্থূল জগতে ব্যক্ত হই। দেহত্যাগ করলে আর জগতের স্থূল ইন্দ্রিয়ে ব্যক্ত হই না। তখন সূক্ষ্মতর ভূবর্লোকে ব্যক্ত হই। ইহজগতে থেকে সূক্ষ্ম জগৎ দেখার স্বতন্ত্র পন্থা আছে বটে, কিন্তু তিন অন্তর্মুখে লক্ষ্য স্থাপিত হলে সেটা আপনা থেকেই হয়। সব বিষয়েই একই রকম। লক্ষ্যে স্থির থাকলেই পৌঁছান যায়। সাধন ক্ষেত্রেও তাই সিদ্ধি সিদ্ধি করে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নানা রকম বিঘ্ন হয় এবং সিদ্ধিও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, এটা মনে রাখা দরকার। যাই হোক, জীবিত অবস্থায় স্থূল জগতে ব্যক্ত হয়েছি, মৃত্যু নামক পরিবর্তনের পরাবস্থায় অন্য জগতে ব্যক্ত হব, প্রভেদ এটুকুই। যাঁরা সাধনার দ্বারা জীবিত অবস্থাতেই সূক্ষ্মলোকে অবস্থান করেন তখন আর ইহজগৎ তাঁর ইন্দ্রিয় গোচর হয় না, তখন শুধু সূক্ষ্ম জগৎই থাকে। আবার মন ইন্দ্রিয়গত হলেই স্থূলজগৎও ইন্দ্রিয়গোচর হয়।

স্থূলজগৎ অভিমুখী হওয়া যেমন বহির্মুখী হওয়া, সূক্ষ্মজগৎ অভিমুখী হওয়াও তেমনই অন্তর্মুখী হওয়া। সূক্ষ্ম জগৎ দেখতে হলে শক্তিকে সূক্ষ্মজগৎ অভিমুখী করে নিতে হয়। সূক্ষ্মজগৎও এই জগতের ভিতরেই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। যেমন ভূত সকলের ভিতর ব্যোম্ অবস্থিত, তেমনই সূক্ষ্মজগৎ স্থূল জগতের ভিতরে ও বাইরেই অবস্থান করে। যেমন কতদিনের কত চেষ্টায়, কতরকম ক্রিয়া ও অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে জীবনগতি চালিয়ে তবেই এ স্থূল জগতে ব্যক্ত হয়েছি, তেমনই যদি সূক্ষ্ম জগতে অভিব্যক্ত হতে হয়, এই ভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূক্ষ্মজগৎ উপভোগ করতে হয়, তবে সেই রকম উপযুক্ত যত্ন ও অধ্যবসায় দরকার। একদিনে সেসব হয়না। সুদৃঢ় বলবতী ইচ্ছার সাহায্য না পেলে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এককালে উপভোগে আসেনা। স্থূল ইন্দ্রিয় পেয়েছ, স্থূল জগৎ দেখছ। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ফুটিয়ে তোল, জগতের সূক্ষ্মাংশও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে। অভ্যাসের দ্বারা সেই চিরস্থির অবস্থার দিকে লক্ষ্য ফেরাও।

জীবনের যথার্থ সূর্য্য দর্শন হবে। প্রতি শ্বাসে শ্বাসে আমরা মরছি আবার প্রতি শ্বাসে শ্বাসে আমরা জীবন লাভ করছি। ভাল করে দেখলে আমরা শ্বাসে শ্বাসে অব্যক্তে প্রবেশ করছি। অব্যক্ত থেকে নব শক্তি নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছি। তাহলে যদি ঐ শ্বাসের অনুধাবন করতে পারি, শ্বাস কিভাবে কোথায় তোমার দেহাভ্যন্তরে লীন হচ্ছে দেখার চেষ্টা কর। কোথা থেকে শ্বাসের আকর্ষণ আর কোথায়ই বা এর প্রক্ষেপণ তার সন্ধান রাখ। স্থির চিত্তে একটি করে শ্বাস টেনে কোথায় সে যায় তার পিছনে পিছনে মনকে চালাও। একবারে পারবে না। বার বার চেষ্টা কর। বার বার শ্বাসের পিছনে পিছনে মনকে ছোটাতে চেষ্টা কর। অব্যক্তের সন্ধানে তোমার এ যত্ন ও চেষ্টা, সুতরাং অব্যক্তের শরণাগত হয়েই একাজে লেগে থাক। শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তুমি না যেতে পার, অন্ততঃ তোমার কাতর আহ্বান, প্রার্থনা, যাতে যায় সে চেষ্টা কর। ক্রমশঃ দেখবে তোমার আহ্বান অব্যক্তে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রত্যুত্তর স্বরূপ অনাহত নাদ ধ্বনি তোমার কানে এসে পৌঁছে গেছে। পরমাত্মা তোমায় ডাকছেন। তখন মনোবল বাড়বে। শ্বাসের সঙ্গে অব্যক্তে প্রবেশ সম্ভব হবে। এটাই প্রাণায়াম। পরে এর বিষয়ে আরও বলার আছে।

ইন্দ্রিয়ময় দেহের মধ্য দিয়েই দেবলোক প্রবাহিত। দেবতাগণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুনঃ তিষ্ঠতি"। অব্যক্ত হলেও যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন করা যায়। আর অন্যান্য সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলোকেও ফুটিয়ে তোলা যায়। স্থূল দেহের প্রত্যেক পরমাণু ঐ দেবলোকের সূক্ষ্মশক্তি প্রবাহে অভিষিক্ত। এই দেবলোকের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতর তপলোক আছে। স্থূলদেহ ভেদ করে দেবলোক এবং দেবলোক ভেদ করে তপোলোকে উপস্থিত হতে হয়। এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হিরন্ময় কোষের সন্ধান পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কোষগুলো এ দেহের ভিতর দিয়েই বিস্তৃত হয়ে আছে। এখন অব্যক্ত হলেও যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা ব্যক্ত করে নেওয়া যেতে পারে।

আগের শ্লোকের "জাতস্য–হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ" এই জ্ঞান, অর্থাৎ কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, সম্পূর্ণ হবার পরই এই অব্যক্ত-ব্যক্ত একীকরণ জ্ঞান জন্মাবে। আসা যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই এর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু মূঢ় মানুষ বিবিধ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাওয়া সাধনালব্ধ মনুষ্যশরীরটিকে ডেইলী প্যাসেঞ্জারী, চাকুরী, ব্যবসায় ও তদনুসারী ঃবহংরড়হ ইত্যাদি জাগতিক অপকর্ম্মের দ্বারা দ্রুত জীবনীশক্তিহীন (lifeless) করে ফেলে। ফলতঃ যে কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতি চির অধরাই থেকে যায়। ২/২৮

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্,আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ।। ২৯

অনুবাদ : কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, সেইরূপ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন, অন্য কেহ উহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন, আর কেহ শুনিয়াও ইহাকে জানেন না ॥ ২/২৯

ব্যাখ্যা : সাধারণ ভাবে তো দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা করে দেখা যায় না। শুধু চিন্তা ভাবনা বা বিচার বিবেচনায় কেমন যেন একটা চৈতন্য মিশ্রিত বলে মনে হয়। এজন্যই একথা কেউ আশ্চর্য্যের ন্যায় ভাবে, দেখে, বলে ও শোনে। কিন্তু শুনেও জানতে চায়না কেউ। দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধটা না বোঝার ফলেই এমন হয়। ব্যাপারটা অনেকটা গুটিপোকা (ঊর্ণনাভ) বা মাকড়সার জালের মত, এই বন্ধন সাময়িক মাত্র। এই গুটিপোকা বা মাকড়সাকে যেমন কেউ বাইরে থেকে এনে গুটিতে বা জালে ভরে দেয়নি তেমনি একসময় নিজেই বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়ে। শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্কটাও এমনই। নিত্যযুক্ত সর্ব্বগতজ্ঞানানন্দ স্বভাব আত্মার। এই সাময়িক বন্ধন এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সঠিক ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেও বুঝতে না পেরে একে “মহতদ্ভূতম্”রূপে দেখেন। যখন ঐ অব্যক্তের সন্ধান পায় তখন তার তৃতীয় চক্ষু উন্মেষিত হয়। অপূর্ব্ব বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হয়ে পড়ে। সাধক কৃতার্থ হয়। এইরূপে আশ্চর্য্যে কেউ কেউ তাঁকে দর্শন করেন। ভাবসকল সম্মুখে ধাবিত তাই তাঁরা আশ্চর্য্যভাবে এর কথা বলেন। কিন্তু অন্যেরা, যাদের ভাব এখনও ঘনীভূত হয়নি, অর্থাৎ দেখার বা বলবার শক্তি হয় নি, তারা আশ্চর্য্যরূপে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন। কিন্তু এমনভাবে দেখে শুনেও কেউ তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। আত্মোপলব্ধি প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত –

প্রথম শ্রেণী উপাস্য দর্শনে সমর্থ হয়। তাঁর উপাস্য দর্শন হয়। ভাব ঘনীভূত হয় এবং মাঝে মাঝে হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করতে পেরে কৃতকৃতার্থ হয়। তাঁর ইন্দ্রিয়কার্য্য রোধ হয়ে যায়। এও সেই অব্যক্ত ক্ষেত্র। প্রথমশ্রেণীর সাধনা রাজগুহ্য যোগ। বিরাটে আপনাকে বিস্তৃত করে দেওয়াই এর প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনায় সাধকের আত্মদর্শন হয়না। তার ভাবও তত ঘনীভূত হয়না। তবে ভাবরাশি সজাগ হয় এবং বাক্যরূপে সে ভাব জগতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের সৌভাগ্য ততটা উজ্জ্বল নয়। তবে তাঁদের অধ্যাবসায় খুবই বেশি থাকে। ফলে তাঁরা প্রকৃষ্ট-পন্থা অনুধাবন করে অধ্যাবসায় সহকারে ভাব অবলম্বনে অন্তর্মুখী হতে থাকেন। স্থির থেকে স্থিরতর অবস্থায় যেতে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য সময়ে তাঁরা ভাব ব্যক্ত করতে থাকেন। সাধারণ জীবগণকে ভগবদ্ভাবে প্রভাবিত করেন। লৌকিক বিচারে মুর্খ হলেও এঁদের মধ্যে অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর উপদেশ ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হয় ও তাঁর শরণাগত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনার আসল উপায় বিরাটকে নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা।

তৃতীয় শ্রেণীর সাধনা হল সুরত শব্দযোগ। তৃতীয়শ্রেণীর সাধনা আবার এসমস্ত থেকে একেবারেই আলাদা। এ হল শুধুই শ্রবণ। অনাহত নাদের অফুরন্ত ধারার সন্ধান লাভ। এই শব্দস্রোতের সন্ধান পেলে তবেই এই স্রোতের ভিতর যে শক্তি সঞ্চারিত আছে তার নিকটস্থ হওয়া যায়। অনাহত ধ্বনি শোনার পর দ্বিতীয় ও প্রথম স্তরের সাধনার অধিকারী হলে তবেই সাধক আশ্চর্য্যভাবে আত্মদর্শন লাভ করে। শ্লোকটার শেষ লাইনের এটাই মর্ম্ম। নাদ সাধনার প্রণালী হল সুরত শব্দযোগ যা পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

সাধনার এই তিন শ্রেণীর কথা মনে রাখতে হয়। প্রথম শ্রেণীর সাধনায় আপনাকে অনন্তে মিলিয়ে দেওয়া। সমুদ্রে নদী প্রবেশের মত সাধককে পরাশক্তির সমুদ্রে (গুরুশক্তিতে) মিশে যেতে হয়। সেজন্যই প্রথম শ্রেণীর সাধনায় তখনই সাধক হয় শূন্যবৎ ভাবাপন্ন। সাধক গুরুকে জড়িয়ে ধরে। সর্ব্বদাই ভালমত ধরে থাকে, কখনও ছাড়েনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনায় অনন্তকে আপনাতে মিশিয়ে নেওয়া। সমুদ্র থেকে নদীতে যেমন জোয়ারের সময় হলে জল প্রবেশ করে, যেমন নদীর কূল প্লাবিত করে, তেমনই পরাশক্তিকে নিজের ভিতর প্রবেশ করিয়ে একেবারে পূর্ণ করে নিতে হয়। ফলে সাধনায় তেজ উছলে পড়ে। এই গুরুকৃপা যদি ধরে রাখা যায়, শক্তি যদি একটুও বেরিয়ে না যায়, তবেই সাধক প্রথমশ্রেণীর সাধক হবার উপযুক্ত হয়। আর তৃতীয় শ্রেণীর সাধকের ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য নাদে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকলে আশ্চর্য্য দর্শন জীবনেও হয় না। অবশ্য নাদের সন্ধান পেলে আর দিকভ্রান্ত হয়না। তখন সদগুরু কৃপায় সাধক দ্বিতীয় ও প্রথম স্তরের সাধনায় সচেষ্ট হয়। নাদ শ্রবণকেই কখনও চরিতার্থতা বলে ভেবে নিতে নেই। সহজ করে বলার জন্য সাধনার একটা শ্রেণীবিভাগ করে দেখান হল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধনামাত্রেই অধ্যাবসায় সাপেক্ষ। তাই সূক্ষ্ম অর্থে সাধনার প্রণালীতে রকমফের হলেও তার কোনও শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। যেহেতু সকল সাধনার লক্ষ্যই সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

এইসব আলোচনা থেকে এই তাৎপর্য্য পরিষ্কার হল যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় এই জ্ঞানকে (অব্যক্ত) বিজ্ঞানের ভিতর নিয়ে আসতে বা বাঁধতে কেউই পারে না। একমাত্র সাধনদ্বারা নিজ বোধরূপ। কিন্তু হায় সে ব্যাকুলতা বেশীক্ষণ থাকে না। সাধকের মুখে কৃতার্থতার কথা শুনেও কারও এই জ্ঞানাতীত নিরঞ্জনকে জানা হয় না। এটাও এই শ্লোকের মর্ম্ম হতে পারে ॥ ২/২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।। ৩০

অনুবাদ : হে ভারত, অবধ্য এই আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে আছেন। অতএব তুমি ভূত সকলের জন্য শোক করিও না। ২/৩০

ব্যাখ্যা : আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে একই বিষয়ের পুনরুক্তি যে আত্মা নিত্য ও অবধ্য সুতরাং এর জন্য অনুশোচনা করা উচিত নয় ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথা এই আত্মাকে জানবার, বুঝবার চেষ্টা যদি না করা হয় তবে বুঝাও যাবে না আর আত্মবিনাশের ভয় থেকে কোনও কালেও নিস্তার পাবেনা, সেজন্যই জ্ঞানের বড় প্রয়োজন। কারণ জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান নষ্ট হয়। অজ্ঞান থাকতে দেহাত্মবোধ নষ্ট হয় না, সদগুরুদ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি হলে এই অজ্ঞান দূর হয়। তখন সর্ব্ব ও সর্ব্বগত এক হয়ে যায়। তত্ত্বটা একটু আয়াসসাধ্য, বোঝার আছে। যেমন প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, প্রত্যেক ভাবের ভিতর, তেমনই প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর শক্তি ত্রিধা প্রকাশিত। শুরুতে ব্রহ্মা বা সৃষ্টিশক্তি, মধ্য বা বিকাশে বিষ্ণু বা স্থিতি শক্তি এবং অন্তে মহেশ্বর বা লয় শক্তি ক্রিয়াশীল, তাহলে কর্ম্মের আরম্ভ হল সতে, অবস্থান চিত্তে, এবং লয় আনন্দে। সতের অস্তিত্বের কারণে হৃদয়ে স্ফুরণশক্তি বিদ্যমান। সেই স্ফূরণ চিতে প্রতিফলিত হয়ে স্থায়িত্বলাভ করে ও সেই স্ফূরণের ধর্ম্ম অনুসারে জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে (রজঃ)। এটাই রজোগুণ। প্রত্যেক স্ফুরণই চিরস্থায়ী হয়ে থাকত, যদি তার উপর চিদাভাস সম্পাতের পর তমঃ বা লয় শক্তি বা আনন্দ ক্রিয়া না করত। জীবজগৎ ও হৃদয়ের এই তিনটি অবস্থার মধ্যে একটা বৃত্তাকার সম্বন্ধ আছে। প্রাণে যখন কোনও ভাব উদয় হয় সেটাকে সৎ বা অসৎ যাই ভাবিনা কেন সতের (সত্ত্ব) স্ফুরণ থেকেই সেটা হচ্ছে। সেইভাব ক্রমশঃ হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে ও ঘনীভূত হয়ে কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয় ও স্থূল অবয়ব গ্রহণ করে (implementation) এটাই চিতের আশ্রয়সঞ্জাত বুঝতে হবে। এভাবেই জগতের সকল কাজ, হৃদয়ের সব ভাবগুলো, কিছুদিন প্রদীপ্ত, প্রকটিত থেকে আবার যখন লুপ্ত হয়ে যায় তখন সেটা লয়শক্তি বা আনন্দের অভিব্যক্তি বলে বুঝতে হবে। এজন্যই একটা কাজ করে তার আনন্দটুকু ভোগ হলেই সে কাজটা শেষ হয়ে যায়। যত অল্পই হোক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, কোনও ভাব আনন্দস্পর্শ ছাড়া শেষ হয় না। এটাই পরিতৃপ্তি (satisfaction)। এভাবেই জীবজগতে বৃত্তাকারে ঘটে চলেছে অভাব কর্ম্মচেতনা/ কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও পরিতৃপ্তি, সত্ত্ব, রজঃ, তম বা সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও আধ্যাত্মিক পরিভাষায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভাব। একই ভাবে প্রাণে যখন ভগবদ্ভাব জাগে তখন আমরা কিছু সাহায্যকারী কাজ করে থাকি কিন্তু ক্রমশঃ ভগবদভাবটা গৌণ (secondary) হয়ে যায় এবং ঐ সহায়ক কাজটাই মুখ্য (primary) হয়ে ওঠে ও সাধনার মূলগতি বা লক্ষ্য দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। যত সব যাগ-যজ্ঞ, পূজো-পার্ব্বণ সব এভাবেই হয়েছে। আজ আর বোঝাই যায় না যে কিসের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, কিসের জন্যই বা আশ্রম, ইত্যাদি।

মূল লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তখন সব কাজের অভ্যন্তরস্থ মহাসত্য, মহা নিত্যকে অবলম্বন করেছি, আর সর্বের আত্মরূপিনীকে চিনতে পারলে বাহ্য জগতের মায়া আমাকে অভিভূত করবে কেন ? ধান পেকে উঠলে ধানের খড় বিচুলি ও তুষ যেমন ফেলে দিই তেমনই আত্মজ্ঞান লাভ হলে স্থূল দেহের জন্য শোক হয়না। এই দেহে কূটস্থজ্ঞান হলে সব কিছু তাতেই থাকে। তেমনতর জ্ঞানীর চক্ষে দেহই নাই, তার আবার জড় আর অজড় ॥ ২/৩০

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ।। ৩১

অনুবাদ : পরন্তু স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার এরূপ বিচলিত হওয়া উচিত নহে। যেহেতু ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই শ্রেয়ঃ (মঙ্গল সাধক) নাই ॥ ২/৩১

ব্যাখ্যা : এখানে ব্রাহ্মণ অর্থে যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন আর ক্ষত্রিয় তিনিই যিনি ব্রহ্মকে জানার জন্য জীবনপণ করে সংগ্রাম করে থাকেন। তাই ক্ষত্রিয়ের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মই নাই। আর যিনি ব্রাহ্মণবীর্য্যে উৎপন্ন হয়েছেন তিনিও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের কিছু সাধারণ কর্ম্ম আছে তিনি স্বভাব হতে সে সব পেয়েছেন। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়েরও নিজ স্বভাবগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে যার মূল কথা ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছুই নেই। জীবের এই ক্ষত্রিয় অবস্থার স্বধর্ম্মযুদ্ধই হল মায়াহনন। তাই অনন্ত জীবনস্রোতের ভিতর দিয়ে জীব যখন মনুষ্যকূলে উপস্থিত হয়ে এই মায়া নিগ্রহে যত্নবান হয় তখনই তাকে ক্ষত্রিয় বলে। যখনই জীবের মায়ার দিকে লক্ষ্য পড়ে আর অনুভব করে "আমি মায়াভিভূত, ইন্দ্রিয়ের মোহে একান্ত অনুলিপ্ত হয়ে মায়াবদ্ধ," ইত্যাকার জ্ঞান যখন হৃদয়ে স্ফূরিত হয়, তখনই সে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী, তার এই মায়া হননের উদ্যোগ পর্ব শুরু হয় এবং এখানেই সাধন সমরের সূচনা। এই সমর সূচনার পর যখন জীব মায়ার বিচার করে – তখনই মায়ার মোহ প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরলে সে মায়া বধ্য কি অবধ্য এই বিচারে নিযুক্ত হয়। কিন্তু তার সদগুরুসত্তা তার বিচারশক্তিকে স্বধর্ম্মে যুক্ত করে ও মায়া হননই তখন তার একমাত্র প্রবৃত্তি হয়ে ওঠে। এখানেও সেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কারণ প্রাণ তো জগৎ লালসাতেই পূর্ণ, সুতরাং তার পক্ষে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের মায়া হনন যথার্থ প্রিয় নয়। তাই সদগুরুশক্তি তার যা কিছু শ্রেয় ও প্রিয় তারই হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট হয়ে লেগে আছেন এবং তুমি নিজেকে উদ্বোধিত করেছ ও ব্রহ্মশক্তির স্ফূরণ তোমাতে হয়েছে। সেই স্ফূরণ অবলম্বনে চিৎশক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে তোমায় ইন্দ্রিয়মুক্ত (আসক্তিমুক্ত) করে দিচ্ছে। তুমি ভগবদযুক্ত হবে। যোগ অর্থে একদিকে যোগ অন্যদিকে বিয়োগ। ভগবানে যোগ হলেই আমিত্বে বিয়োগ হয়। এক দিক বাড়লে অন্যদিক কমে যায়। তাই যখন ক্ষত্রিয়ই হতে পেরেছ তখন

মায়া ত্যাগে কুণ্ঠিত হবার কারণ কি ? সাধনার পথ অত্যন্ত নীরস হোক, বিঘ্নসঙ্কুল হোক, তবুও ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন পুরুষ কিছুতেই সাধনায় নিরন্তর লেগে থাকতে বা যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ হবেন না। কতকগুলো আপাত মনোরম সুখের অভাব হবার আশঙ্কায় কোনও সাধকেরই পিছিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। তোমার স্বধর্ম্মই তো মায়া হনন। তাই এত বিচারে তোমার প্রয়োজন কি ? কিন্তু অর্জুনের একটা মহা আশঙ্কা “কেন মারব ?” সেই আশঙ্কাই ভগবান এখানে নিরাকৃত করলেন ॥ ২/৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ।। ৩২

অনুবাদ : হে পার্থ, আপনা হইতে উপস্থিত, মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় ঈদৃশ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়েরা লাভ করিয়া থাকে। ২/৩২

ব্যাখ্যা : এই যোগবিদ্যা লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। অনায়াসে সাধন সমর লাভ করে সমরে রত হয়ে থাকতে পারলে আর সৌভাগ্যের সীমা নেই। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ। একমাত্র যুদ্ধের দ্বারাই আত্মরাজ্য লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু এ যুদ্ধ তো সহজে উপস্থিত হয় না। কে আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান ? এমনতর যুদ্ধ সংঘটনই বা কয় জনের হৃদয়ে হয় ? কজনই বা আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয় ? অনন্ত জীবন গতির পথে মনুষ্যকুলে এই ক্ষত্রিয় স্তরে এসে উপস্থিত হলে তবেই এমনতর যুদ্ধের সূচনা হয়।

তুমি আজ আত্মপ্রতিষ্ঠাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বলে বুঝতে পারছ। জেনে রাখ এটাই উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার। এই সাধনার দ্বারাই স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়। সুষুম্নামুখ বন্ধ বলেই তো জীবের এই দুর্গতি; এজন্যই তো সংসার প্রবাহ। এই সাধনা দ্বারা সেই বন্ধ সুষুম্নামুখ খুলে যাবে, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ? প্রকৃত স্বর্গের দ্বার এই সাধনযুদ্ধ দ্বারাই উন্মুক্ত হয়ে থাকে। তোমার পক্ষে এটা যদৃচ্ছলাভ হয়েছে বলতে হবে। একটা জীবের সমষ্টি জীবন প্রবাহের পথে ক্ষত্রিয় অবস্থা, আর ব্যষ্টিভাবে জীবনে একদিন যোগক্রিয়া করতে বসে যখন প্রণায়ামাদি করতে হয় তখনকার অবস্থাও একই। সুষুম্নায় প্রাণবেগ সঞ্চালিত হলেই মন শূন্যে প্রবেশ করে ও সাধকের সমস্ত কর্ম্ম নির্ম্মূল হয়ে যায়। দেহরথের সারথির অনেক পরিশ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়। তাই তিনি বলছেন, আমি অনেক দূর হতে সারথির কাজ করে তোমায় এতটা এনে, এই দরজায় উপস্থিত করেছি। অনেক পরিশ্রম করে তোমাকে নরাকারে বিম্বিত করেছি। অনেক যোনির ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তোমায় ধরে ধরে এই নরকূলে এনে তুলেছি। আজ আর শুধু তোমার এই দেহরথের সারথিই নই – তুমি নর, আমি নারায়ণ। নরসমূহ আমার স্থান বলে আমার আর এক নাম নারায়ণ। অনেক আগে থেকে যখন তুমি “যৎ” মানে “যেরূপ” যেমন আমি তখনই সেইরূপ বলেই তার ভিতর “ই” অর্থাৎ “ইচ্ছা” বা গতি বা আহ্বানরূপে তোমার সারথিগিরি করছি। এই স্বর্গদ্বার তাই “যদৃচ্ছয়া উপপন্ন” তুমি যখন যে রূপে থেকেছ, তারই ভিতর ইচ্ছারূপে অনুপ্রবেশ করে তোমায় চালিয়ে নিয়ে এসেছি। তাই তুমি আমাকে শুধু নারায়ণ না দেখে সর্ব্বায়ন দেখবে – তুমি নরমুর্ত্তি ছেড়ে সর্ব্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করবে – তুমি বিশাল ভুবন জুড়ে যাবে। তাই বলেছেন যদৃচ্ছা উপপন্ন – “যদৃচ্ছয়া উপপন্ন” মানে তোমারই ইচ্ছায় অর্থাৎ আমারই ইচ্ছায় উপপন্ন। “ই” অর্থে আহ্বান। আমার মহা আহ্বানই ইচ্ছারূপে বিরাজিত। আমার মহা আহ্বানই তোমায় কোথাও দাঁড়াতে দেয় নি। অর্হনিশ চঞ্চল উৎকণ্ঠাপূর্ণ করে রেখেছে, ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরাচ্ছে। এই মহা আহ্বানের প্রতিধ্বনি তোমায় নিশ্বাস ফেলার অবসরটুকু দেয় না। মায়া থেকে মায়ান্তরে যে যন্ত্রণা ভোগ করছ সে সমস্ত আমারই আহ্বানের, মায়ার প্রতিধ্বনি। তাই আজ যখন শরণ নিয়েছ, ক্ষত্রিয় হয়েছ। তাই এস (দেহ) মন্দিরে প্রবেশ করি। চলো, চলো, ব্রাহ্মণ হবে চলো। আসলে ক্ষত্রিয় হলেই বুঝতে হবে যে জীব সুখী বা সুখান্বেষী হয়েছে। সুখান্বেষী হলে তবেই তো যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। আর ক্ষত্রিয় হলে তবে তার পরের ধাপে উঠেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। তাই এবার শুধু অপাবৃত স্বর্গদ্বার। মুক্তি, কখনও দরজা বন্ধ করে না। ব্রহ্মের দ্বার নির্ম্মুক্ত, এই মনুষ্যদেহেই, এই দ্বারের সম্মুখ থেকেই আমাকে প্রত্যক্ষ করবে, তুমি আমি ভেদ থাকতে থাকতেই সম্ভোগ করবে, তারপর একত্ব বা শূন্যত্ব, পূর্ণত্ব সব একই কথা। তাই স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত। ক্ষত্রিয়ের এই যুদ্ধের বা স্বধর্ম্মের তিন অবস্থা যথা – (১) শত্রুকে জেনে, চিনে নিয়ে তার সামনা সামনি হওয়া, (২) অস্ত্রচালনা এবং (৩) আত্মপ্রতিষ্ঠা। তা হলে সবপ্রথম শত্রুকে চিনে তার কাছে উপস্থিত না হলে তো আর অস্ত্র চালনা করে তাকে বধ করা যাবেনা। সেজন্য শত্রুর শক্তি কতখানি সেটা ভাল ভাবে জানতে হয়। নরজন্ম ছাড়া আর কোন জন্মেই অবিদ্যা এতটা কার্য্যকরী নয়। সুতরাং তুমি শত্রুসমীপে এসেই গেছ এবং শত্রুর শক্তিও তুমি ভাল মতই জেনেছ। অথচ এখন অস্ত্রচালনার সময় তুমি এই সব অবিদ্যা সমূহকে মিত্রস্থানীয় বোধ করছ। কিন্তু মনে রেখো ওরা তোমার শত্রুও নয়, মিত্রও নয়। ওরা হল “যদৃচ্ছয়া চোপপন্ন”। সুতরাং এই যদৃচ্ছা উপপন্ন যুদ্ধ যদৃচ্ছা উপপন্ন অস্ত্রে শুরু করে দাও। স্বধর্ম্ম পালনের এমন সুযোগ আর পাবে না। তুমি সৌভাগ্যশালী শিষ্য তাই এই অবসর পেয়েছ। এটাকে কাজে লাগাও, ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে লয় করে সহজাবস্থা ভোগ কর ॥ ২/৩২

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ।। ৩৩

অনুবাদ : আর তুমি যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ২/৩৩

ব্যাখ্যা : বিধিমত প্রাণ সংযমের দ্বারা নাড়ীচক্রগুলোকে বিশুদ্ধ করার যে সকল কাজ এটাই সংগ্রাম। নাড়ীচক্র বিশুদ্ধ হলেই সুষুম্নার মুখ খুলে যায়। তখন মন স্থির হলে অবিদ্যা নিজে থেকেই অপসৃত হয়। এটাই অবিদ্যার হনন। এমনতর অবিদ্যা হননই ক্ষত্রিয়াবস্থার প্রকৃতি। আসলে এটা মায়া হনন নয়, প্রত্যাহরণ মাত্র। তাহলে স্বধর্ম্ম অর্থে প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মায়া হনন। যদি ক্ষত্রিয় অবস্থায় জীব কোনও কারণে তার এই প্রকৃতিগত কাজ থেকে বিরত হয় তবে তার ধ্বংসের সূচনা হচ্ছে বুঝতে হবে। অর্থাৎ সাধকের সাধনায় কোন ব্যাঘাত ঘটলে তার নিজের সংস্কার সম্বন্ধ সূক্ষ্মদেহ ক্ষয় হতে থাকে, নিজের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে আঘাত লাগে, সাধক কক্ষচ্যুত হয়। তাই ভগবান বলছেন প্রকৃতিগত কর্ম্ম ছেড়ো না। স্বধর্ম্ম উপেক্ষা কোরো না। এতে তুমি এ অজ্ঞাতপূর্ব্ব সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত হবে। তুমি পাপযুক্ত হবে। এ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার কীর্ত্তিরাশিও ধ্বংস হবে। কীর্ত্তি কি ? কীর্ত্তি আমাদের স্বস্থানে রাখার একটা স্তম্ভ। যখন উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে জীব নিম্নস্তরীয় কাজকর্ম্ম করে, মোহাক্রান্ত হয় বা অযথা লোভে পড়ে অনুপযুক্ত কাজে আস্থা আনে, তখন কীর্ত্তি তাকে বাঁচিয়ে দেয়। লোকের প্রশংসা বা খ্যাতি তাকে অন্ততঃ সেই প্রতিষ্ঠিত অবস্থা থেকে নীচে নেমে যেতে দেয় না। নিন্দেমন্দ বা বদনামের ভয়ে অন্ততঃ আমরা সে সমস্ত কুকাজ থেকে বিরত হই। সুতরাং, স্থুল অর্থে কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ হয়ে নিম্ন গতি থেকে আমাদের রক্ষা করে। সূক্ষ্ম অর্থে মনোময় কোষে এই কীর্তি দীপ্তি নামে খ্যাত। স্বধর্ম্ম পালনে আমাদের মনোময় কোষের জ্যোতি বাড়তে থাকে। আগে বলেছি যে মনোময় কোষের বর্ণ আছে। স্বধর্ম্ম মানে ক্রিয়া করে আত্মভাবে থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় কূটস্থে থাকা। স্বধর্ম্ম পালনে সেই বর্ণচ্ছটা অপূর্ব জ্যোর্তির্ম্ময় হয়ে বিকশিত হয়। আপনার এ বর্ণ ফুটিয়ে তুলতে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। অনেক দিনের অনেক সাধনার পর মনোময় কোষের এমন অপূর্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপ পেয়েছি। আজ সহসা স্বধর্ম্মবিমুখ হয়ে তোমার এ সাধনালব্ধ অমূল্য সম্পদ হারিও না। আসলে খুব অদ্ভুতভাবে এই দীপ্তি আমাদের অভ্যন্তরে সঞ্জাত হয় এবং স্বধর্ম্ম পালনে (সাধনারদ্বারা) এই জ্যোতি বর্হিমুখে ব্যায়িত না হয়ে অর্ন্তমুখী হতে থাকে। আগেই বলেছিলাম ভাব সকলের রূপ আছে। সেই জ্যোতি ভাবরূপে আমরা ব্যায় করি। ভাব প্রকাশ করি বলেই প্রাণশক্তির ক্ষয় হয়। বর্হিমুখে ভাবকে পরিচালনা করি বলেই সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিঃ বেরিয়ে যায়। যদিও বিরাট থেকে সেই জ্যোতিঃ পরিপূরণ হয় কিন্তু যতটা ব্যয় হয় ততটা পূরণ করে নিতে পারিনা। তাই দিন দিন ক্ষয়গ্রস্ত হই, ফুরিয়ে যাই। যাই হোক, অন্তর্মুখে যদি এই জ্যোতিঃ চালিত হয় তবে ব্যয় না হয়ে এর সঞ্চয় হতে থাকে। স্বধর্ম্ম পালন হচ্ছে এই অন্তর্মুখ গতি। স্বধর্ম্ম পালনেই জ্যোতিঃ সঞ্চিত হয় আর স্বধর্ম্ম বিমুখ হলে জ্যোতিঃর অপব্যয় হবে। অর্থাৎ ক্রিয়া ছেড়ে দিলে এসব কিছুই থাকবে না। দীপ্তি নষ্ট হবে, কীর্তিস্তম্ভ ভেঙ্গে যাবে, দুরন্ত অকীর্তির গুরুভার তোমাকে নীচে নামিয়ে আনবে। কূটস্থে না থাকলেই বিষয় ভোগের দিকে মন ছুটবে। পরের শ্লোকেও সে কথাই ভগবান বলবেন ॥ ২/৩৩

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ।। ৩৪

অনুবাদ: পরন্তু লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। মানী ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক হয়। ২/৩৪

ব্যাখ্যা : এখানে সাধক হচ্ছেন অর্জুন। যিনি সাধকপ্রবর, সম্ভাবিত পুরুষ, যার মধ্যে সাধন সিদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। এমন লোকও যদি সাধন ত্যাগ করতে চায় তবে অন্যান্য সাধকের কাছে তো সে হাল্কা, লঘু হয়ে যাবে। ক্রিয়া না করলে আর কূটস্থে থাকবে কি করে ? এজন্য আগেই বলেছিলাম যে যশঃ অনেক সময়েই আমাদের পতন থেকে রক্ষা করে। পরিচিত বান্ধবকূলের উচ্ছাস আমাদের উৎসাহ দেয়। মনোবল বাড়িয়ে দেয়। ফলে মুহ্যমান অবস্থায়ও আমাদের উপরের দিকে তুলে রাখতে পারে। তাই ভগবান অর্জুনকে একথা বলেছেন। একই ভাবে যখন কোনও সাধক নিজের ভাবকে ধরে রাখতে পারেনা, অথচ সে ভাব সত্যিই অকৃত্রিম ও শক্তিশালী তাঁর চিত্ত অনন্তভাব ও উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে সত্যিই অথচ সে ভাবরাশি ধারণ করার মত শক্তি বা আধার তার নেই, তখনই তার উপকারের জন্য সেই ভাবরাশি জনমণ্ডলে অধিষ্ঠিত করে একটা শক্তিকেন্দ্র বা শক্তিমণ্ডল রচিত হয়ে ওঠে। আধেয় ও আধারের বিরাট সম্মিলনে সেও বিরাট হয়ে ওঠে। এভাবেই হয় গুরুর সৃষ্টি। এই অধ্যায়ের ২৯ নং শ্লোকেও এটা আলোচনা করেছি। অকীর্ত্তি ও কীর্ত্তির শক্তি প্রসঙ্গ আবারও চলে এল। একসময় এক গ্রামে খুব জলকষ্ট চলছিল। অতিকষ্টে বহুদুর হতে সেখানে জল সংগৃহীত হত। এক তৃষ্ণার্ত পথিক তৃষ্ণার জল চাইলে সে গৃহস্থ তাকে অন্য বাড়িতে যেতে বলল কিন্তু একে একে সকলে একই ব্যবহার করল সমস্ত গ্রাম ঘুরে একফোঁটা জলও না পেয়ে লোকটা ভাবল যে মনুষ্য সমাজ একফোঁটা জল দিয়ে তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মেটাতে চায় না সে সমাজ পশুসমাজের চাইতেও অধম। মানুষ হয়েছি বলে নিজেকে আর ধন্য বলে মনে করিনা। এই ভেবে সে বনে ঢুকে গেল। তখন রাত হয়েছে, অন্ধকার অরণ্য, কিন্তু তার হৃদয়ের অন্ধকার আরও ঘোরতর। সহসা পথিক অরণ্যে এক সাধুকে দেখলেন। সাধু যোগাসনে উপবিষ্ট। পথিক সাধুকে সমস্ত ঘটনা বলে নিজের অনুভবে সমস্ত মনুষ্য জগৎকে ধিক্কার দিল এবং নিজের মরণের কৃতসংকল্পের কথা জানাল। সাধু ধীরে ধীরে পথিককে বললেন, ‘বৎস এই গ্রামের লোকের মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত দরকার। এই আগুন নিয়ে যাও

পাপিষ্ঠদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও। পাপের গ্রাম জলতে থাকলে তারা জল দিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করবে তুমিও তখন সেই জলে তেষ্টা মেটাবে।" সাধুর আদেশে দুএকটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে আগুন ছড়াতে লাগল। সকলেই নিজের নিজের ঘর বাঁচাবার জন্য সঞ্চিত জল বের করে ঢালতে লাগল। তাদের ঘরও বাঁচল পথিকের তৃষ্ণাও দূর হল। এটা শুধুই গল্প। বলতে চাইছি যে ভগবৎ বিরহে আর্তজীব ঘরে ঘরে ফিরে আত্মদানের সন্ধান করে। দেখে কে তার তৃষ্ণা মেটাতে পারে। ভূমণ্ডলে মায়ার ক্ষেত্রে বুঝি এমন কেউ নেই যে তার তৃষ্ণা, আকাঙ্খা মেটায়। তখন তার হৃদয়ের নিভৃত ভাবশূন্য প্রদেশে তার প্রাণ প্রবেশ করতে থাকে। তখনই গুরুর সন্ধান পায়। গুরু তার হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে দেন। বলেন যাও লোকালয়ে যাও। পাপপূর্ণ লোকালয়ে ঘরে ঘরে এ আগুন জ্বালিয়ে দাও। সাধক সেই মহাগ্নি নিয়ে আসে, যে তাকে স্পর্শ করে সেই অগ্নিময় হয়ে ওঠে। এইসব সাধকই মহাপুরুষ বা অবতার বলে পরিচিত হন। তাই আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। অকীর্ত্তি মানে কালিমা। কীর্ত্তি যেমন মনোময় কোষের দীপ্তি, অকীর্ত্তি হল মনোময় কোষের কালিমা। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে মনোময় কোষের দীপ্তিও মিলিয়ে যায়। সে না হয় গেল। কিন্তু সাথে সাথে কোত্থেকে কালিমা এসে সব মলিন করে দেয়। পঞ্চভূতাত্মক দেহের দ্বারা অন্ধকার রূপে মনোময় ক্ষেত্রকে আবৃত করে – এটাই সেই ভূত কথিত অকীর্ত্তিরাশি। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে আমাদের দেহাভিমান ও ভৌতিক জগৎ মনোময় ক্ষেত্রে সমধিক ছায়া ফেলে ও জগৎমায়া ভীষণভাবে হৃদয়কে গ্রাস করে। এটাই সাধকের মরণ বা তার চেয়েও বেশি অনিষ্টকারী, এতে পতন আরও দ্রুততর হয় ॥ ২/৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ।৩৫

অনুবাদ : মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন। যাহাদের নিকট তুমি সন্মানিত ছিলে, এখন তাহাদের নিকট তুমি লঘু হইবে। ২/৩৫

ব্যাখ্যা: সাধনা ছেড়ে দিলেই প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হবে। তোমার শক্তি যে কত কম তা বুঝতে তাদের বাকী থাকবে না। এখানে "মহারথাঃ" অর্থে ভীষ্ম দ্রোণাদি ভয়, জেদ, কামরিপু ইত্যাদি রিপুগণের কথাই বলা হয়েছে। শত্রুর নিকট লঘুতা প্রকাশ হলে শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে। মায়া হননে প্রবৃত্ত হয়ে আবার যদি নিবৃত্ত হও তারা ভাববে তুমি ভয়ে নিবৃত্ত হয়েছ। তুমি যে তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে, কৃপা পরবশ হয়ে, তাদের হননে নিবৃত্ত হচ্ছ এটা বুঝবে না। তুমি তো আসলে তোমার "আমিত্ব" কে কিভাবে রক্ষা করবে, তোমার অস্তিত্ব কিসে প্রতিবিম্বিত হবে, এই চিন্তাতেই নিবৃত্ত হতে চাইছ। উত্তরে বলি তুমি অরির শক্তিতে ভীত নও সত্য, কিন্তু আপন অস্তিত্ব হারাবার ভয়ে ভীত হয়েছ। তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা শূন্যবৎ, অনুভূতিহীন, বুঝি অস্তিত্বহীন অবস্থা বিশেষে পরিণত হবে এই ভয়েই আকুল হয়েছ আর এই ভয় থেকেই মায়ার ওপর, শত্রুর ওপর তোমার মায়া পড়েছে। তোমার নিজের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয়ই তোমাকে শত্রুকে ভালবাসায় উন্মুখী করে তুলেছে। তাই শ্রীভগবান বলছেন স্বার্থনাশের ভয়ে ভীত হলে চলবেনা। ভয় যে আকারেই আসুক না কেন, বুঝতে হবে সেটা সন্দেহ থেকে জন্মায়। আমি যে চিরস্থায়ী, অব্যয়, এই জ্ঞানের বিরোধী। ভয়ই সাধককে উঠতে দেয় না। উঠতে উঠতেও সাধক ভয়ে আবার পিছিয়ে পড়ে। তোমার প্রকৃতি উর্দ্ধদিক থেকে ফিরিয়ে নিম্নদিকে দৃষ্টি স্থাপিত করেছে। তাই তুমি অবিদ্যার আনন্দকে ভালবেসে তাদের হননে প্রবৃত্ত হচ্ছনা। আমাদের প্রকৃতি সময়বিশেষে এমন অবস্থায় এসে পড়ে যখন উর্দ্ধগতির দিকে তাকাতে ভীষণ ভীতা ও সঙ্কুচিতা হয়ে পড়ে। তখনই এধরণের মোহাচ্ছন্ন বিকার সকল মনের ভিতর ভেসে ওঠে। আমরাও বিচারের ভান করি। পাণ্ডিত্যের ছল করে মাঝে মধ্যেই এভাবে নিজেরা নিজেদের ঠকাই। স্বধর্ম্ম ছাড়লে শুধু যে পতনের পথ সুবিস্তৃত হবে তাই নয়, পড়ে গিয়েও যদি কোনও ভাবে বেঁচে যাও এই আশঙ্কায় অধর্ম্ম রাক্ষসী তোমার ধ্বংসের আরও ব্যবস্থা কিভাবে পাকা করে দেবে সেটা পরের শ্লোকে আছে। ২/৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ।। ৩৬

অনুবাদ : তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্য (শক্তি) নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য (অবক্তব্য) কথা বলিবে, তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখকর আর কি (থাকিতে পারে) ? ২/৩৬

ব্যাখ্যা : সম্পূর্ণ শ্লোকে শুধু বাক্যের কথাই বলা হয়েছে। অকথা কুকথা অনেকেই বলবে। সামর্থ্যকে নিন্দা করবে ইন্দ্রিয়পক্ষ। তুমি না হয় সাধন করলে না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়েই রইলে। কিন্তু চিরকাল কুবাক্যই শুনতে হবে, সহ্য করতে হবে। প্রকৃত অর্থটা এমন যে বাক্য হল ভাবের অভিব্যক্তি। বাক্য না হলে ভাব নিরাকার হয়ে পড়ে। সেজন্য জগতের সমস্ত ভাবের ও কেন্দ্রের একটা শব্দবিশিষ্ট দেহ আছে, তার নাম প্রণব। ওটাই ভাব, ভাবের প্রাণ, আধার ও আধেয়। এই মূলভাব, এই শব্দ সর্বত্র, সর্ব্ব অণুতে, সকল পরমাণুতে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এটাই যথার্থ বাক্য। এই বাক্য আমাদের সংস্কারে দিনরাত প্রতিঘাত পেয়ে নানারূপ শব্দতরঙ্গ বা ভাবতরঙ্গ রচনা করছে, নানা আকার গ্রহণ করছে, নানা ভাব রচনা করে নানা দিকে পরিচালিত করছে। আমাদের জীবভাব উন্মেষের অর্থে – আমরা সেই মহাআহ্বান শব্দ অস্পষ্ট ভাবে – বেসুরো, বেতাল, বিকৃত ভাবে শুনছি এবং কোন দিক থেকে আসছে ঠিকমত না বুঝে কান বাড়াচ্ছি কিন্তু নানা দিকে যাওয়াই সার হচ্ছে। এভাবে ক্রমশঃ যখন বুঝতে পারি, যত লক্ষ্য স্থির হয়ে আসে, ততই আমরা নানাত্ব ছেড়ে একত্বের দিকে যেতে থাকি।

এভাবে লক্ষ্যমুখী হওয়াই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, যাকে বলে স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম আমাদের বহু পূর্ব্বাকাঙ্খিত, সেই লক্ষ্যে এনে পৌঁছে দেবে। কিন্তু যদি এখন স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করি – এত কাছে এসেও যদি আবার নানামুখী গতি ধরি তাহলে আসলে হবে কি ? আবার নানা ভাবে সেই মহাশব্দ বেসুরো হয়ে যাবে, অর্থাৎ বাক্য অবাক্যে পরিণত হবে। যতই আমরা ব্রাহ্মণত্বের দিকে এগিয়ে যাই তত যেন সেই বেসুরো ভাব ঠিক হয়ে গিয়ে সুরেলা শোনা যায়। স্বধর্ম্ম আমাদের সেই ব্রাহ্মণত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সেই স্বধর্ম্ম পালনে বিমুখ হলে অর্থাৎ আবার জীবভাবরূপ বাদ্যযন্ত্রকে বেসুরো করে বাঁধলে, মহাসুর বেসুরো হয়ে বাজবে। সে মহাবাক্য অবাক্যে পরিণত হবে। এজন্য ভগবান আদিশ্লোকে বললেন যে মায়া "অবাচ্যবাদ কহিতে থাকিবে"। স্বধর্ম্ম ত্যাগের সবচেয়ে গুরুতর অনিষ্ট এটাই।

স্বধর্ম্ম ছাড়লেই অর্থাৎ অধীরতা কমলেই সেই চিরন্তণ আহ্বান, প্রণব, সবই হারিয়ে যাবে, থাকবে শুধু জগতের ভাবহীন কোলাহলের ঝঙ্কারমাত্র, যা আবহমান কাল ধরে শুনে আসছ তাই শুনবে। সে মহাআহ্বানও শুনতে পাবেনা। মায়ার, মোহের অবাক্যই শুনতে পাবে। সেই সব অবাক্য, আরও বাড়বে আরও বহুরূপে ঘোষিত হতে থাকবে। যাকে মানুষের লৌকিক জ্ঞান বলে ভাবছ সেই জ্ঞান তোমার চক্ষের অন্ধকার আরও বাড়িয়ে দেবে। তোমাকে নাস্তিকতার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে। যতরকম অবাচ্যবাদ শুনছিলে তা বহুগুণ বেড়ে যাবে। মায়ার কুজ্ঝটিকা আরও ঘোরতর, আরও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। আসলে যে সব লৌকিক জ্ঞান, ট্রেনিং ইত্যাদি পেয়েছ তার থেকে আত্মজ্ঞান লাভের সদিচ্ছা বাদ দিলে যা থাকে সেসব জঞ্জাল মাত্র জানবে। এজন্যই এই শ্লোকে "বহূন বদিষ্যন্তি" কথাটা বলা হয়েছে। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা মায়া হননে নিবৃত্ত হলে যে যে ভাবে তোমার অনিষ্ট হবে সেসব বললাম। এর পর যদি তোমার আত্মমঙ্গলে দৃষ্টি পড়ে তবে যুদ্ধ করা যে একান্ত কর্তব্য এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছ, এ যুদ্ধের ফলও অমোঘ। শুধু যে জয়ী হলেই মঙ্গল তা নয়। যুদ্ধে এগোলেই, যুদ্ধ করলেই ফল আছে। পরের শ্লোকে ভগবান সেটাই বলছেন --- ২/৩৬

> হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
> তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।। ৩৭

অনুবাদ : যদি সমরে হত হও, স্বর্গ ভোগ করিবে, যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও। ২/৩৭

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বে (৬ষ্ঠ শ্লোকে) "ন চৈতদ্বিদ্ম কতরন্নো গরীয়ো" জয় পরাজয়ের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ তা বুঝতে পারছি না। তাই এখানে ভগবান বোঝালেন যদি সাধন করে

সিদ্ধিলাভ কর তো ভালই। আর যদি নাও হয় তবে স্বর্গলাভ অবশ্যই হবে। সমগ্র মহী সম্ভোগে আসবে। যুদ্ধ করে মনকে জয় করতে হলে অর্থাৎ মনোময় কোষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হলে যেমন সাধনার দরকার হয় তাতে তার জন্য প্রবল তৃষ্ণা প্রাণের ভিতর ফুটিয়ে তুলতে হয় – লৌকিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে উপেক্ষা করে আঁধারের ভিতর দিয়ে, নির্জনতার ভিতর দিয়ে, জগৎ চিরে চিরে, নিজেকে চিরে চিরে, যেভাবে ছুটতে হয় তেমনভাবে ছুটতে গিয়ে যদি পা পিছলে যায় বা হোঁচট খায় বা হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যায়, মোটেই ভেবোনা যে তার সে উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে যদি কেউ কোনও ভাবে অসফল হয় তা হলেও বিরাটের মনোময় কোষে সে আশ্রয় পাবেই। দেহান্তে বা সাধনার মাত্রানুসারে এই দেহ থেকেই সে অন্তর্জগতের ছবি দেখতে পাবেই। মাঝে মাঝেই সাধকেরা যে দেবলোকের দৃশ্য দেখেন, ভবিষ্যতের অথবা মৃত আত্মা ও মুক্ত সিদ্ধ পুরুষদের প্রত্যক্ষ করেন এসব ঐ মনোবিজয়ের আংশিক চেষ্টার ফল। সাধারণভাবে জাগতিক দৃষ্টিতে জগতের অতি অল্প অংশই দেখতে বা শুনতে পাওয়া যায়। সাধারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে, সাধারণ জ্ঞান দিয়ে, আমরা যে সব দেখতে বা শুনতে পাই তা হল সমুদ্রের বুকে জলবিন্দু মাত্র। সাধারণ মানুষের অধিকার এটুকুই। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে ? যদিও এ অবস্থা সাধনা বা সংগ্রাম শুরুর সাথে সাথেই হতে থাকে। জয় করতে না পারলেও, জয় করতে গিয়ে পিছিয়ে এলেও, এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, ফলে মনোবিজয়ে অসমর্থ হলেও এমনতর স্বর্গলাভ, এমন অপূর্ব অনুভূতি, নিশ্চয় তোমার অধিকারে আসবে, যদি এতদূর নাও হয়, এই অনুভূতি হওয়ার আগেই যদি মারা যাও, দেহান্তে বিরাটের মনোময় কোষে বা স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়ে এমনতর দর্শন সকল হতে থাকবে। এ জগতে নিজের অস্তিত্বের মত বা তার চেয়ে বেশি ঘনীভূত ভাবে অপূর্ব সব অনুভূতি পাবে। আগেও বলেছি যে মরার পর সব মানুষই স্বর্গে যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ যা দেখে স্বপ্নের ঘোরের মত। অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তি তার চেয়েও মলিনভাবে বা অজ্ঞান অবস্থায়ই স্বর্গলোক পার হয়ে যায়। কিন্তু সাধকদের জ্ঞান স্বর্গলোকেও এই দেহের মতই প্রবল অথবা তার চেয়েও বেশি সজাগ ও বেশি প্রস্ফুটিত থাকে। এমন কি সূক্ষ্মের চেয়েও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময় কোষ অবধি তাদের অনুভূতি অটুট থাকে। আর যদি মনোবিজয়ে সমর্থ হও, তবে এই স্থূলদেহেই এসবই অনুভব হবে, বোধ করবে, এ স্থূল জগৎ তোমার সম্ভোগে আসবে। এই পঞ্চ ভূতাত্মক জগৎকে সম্ভোগে সমর্থ হবে। সাধারণ মানুষ যে জ্ঞানে জগৎ ভোগ করে তা উপভোগ মাত্র যা নিকৃষ্ট পশুগণও করে থাকে। অত্যন্ত অধ্যাবসায়, অনন্ত পরিশ্রমেও তোমার হৃদয়ের সব আশা মেটেনা। কে যেন ভেতর থেকে মাত্র যেটুকু প্রাপ্য সেটুকুই দিচ্ছে। এ সংগ্রামের সূচনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত সবটাই লাভ। তবে অন্যতম লাভ হল আপনার ক্ষুদ্র দেহ ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য লাভ। দেহস্থ ক্ষিতি তত্ত্বের উপর সম্যক অধিকার আসে। ক্ষিতি তত্ত্বের কেন্দ্র মূলধারচক্র। সমস্ত তত্ত্বেরই এক একটি চক্র এদেহের ভিতর আছে।

একে ষট্চক্র বলে। আগেও বলেছি যে আমরা মন অনুযায়ী দেহ রচনা করি। সুতরাং মনোবিজয় হলে দেহের উপর অধিকার তো আসবেই। একেই মূলাধার গ্রন্থিভেদ বলে। বিভূতি বিচারের সময় এ আলোচনা করা যাবে। এখন বললে স্পষ্ট হবে না। ঠিক বোঝাও যাবে না।

যাই হোক, শ্রীভগবান আগে সাধনা থেকে বিরত হলে কি ক্ষতি সেসব বললেন। তারপর সাধনার শুরু থেকেই কিভাবে অলৌকিক ক্ষেত্রের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়, সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, সেই কথা বলে যুদ্ধে অর্থাৎ সাধনায় কৃতনিশ্চয় হতে উৎসাহ দেন। আর আমরা কি করি ? সেসব এখানে না বলাই ভাল। যাই হোক সাধক, এবার বুঝে দেখ স্বর্গদ্বার তোমার কাছে উন্মুক্ত কি না ? বিচার বুদ্ধি করে পা ফেলতে হবে না। মহাকাজে এগিয়ে যাও, আর কিছুই দেখার দরকার নেই ॥ ২/৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ।। ৩৮

অনুবাদ : সুখ দুঃখ, লাভালাভ এবং জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। ২/৩৮

ব্যাখ্যা : গাছে না উঠেই যেমন এক কাঁদি পাওয়া যায় না বা ব্যায়ামের শুরুতেই দশ কুইন্টাল ওজন তোলা যায় না। প্রথম থেকেই যদি মনে ভাবতে থাক যে তাইতো যোগাভ্যাস করলে কত শক্তি হবে, কত কি দেখতে পাবো, এই আশাতেই যদি ক্রিয়া কর সেটা খুব ভূল হবে। এটা শুধুমাত্র কর্ত্তব্য এবং স্বধর্ম্মও বটে। যদি সত্যি সত্যিই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রাণ উন্মুখী হয়ে থাকে তবে জয় পরাজয়, লাভ অলাভ দেখার দরকার নেই। “সুখদুঃখে সমে কৃত্বা” অর্থাৎ সুখ ও দুঃখকে একই ভাবে সমান করে নিয়ে। তাই যদি করতে পারবে তবে আর সাধনার দরকার কি ? সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ সবই যদি সমান জ্ঞান হয় তবে তো কাজ সব সুসম্পন্ন হয়েই গেছে বলতে হয়। এতটা সমতাজ্ঞান ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতি থাকতে আসতে পারেনা। এর জন্য হৃদয়কে একমুখী করা আবশ্যক ‘সুখ’ ও ‘দুঃখ’ বলতে “খ” বা আকাশের বৈচিত্র্য বোঝায়। যেখানে অন্তরাকাশ সুলভ, প্রসারিত, তার নাম সুখ। অন্তরাকাশের সঙ্কোচনই দুঃখ। অন্তরের সঙ্কোচন প্রসারণকে সুখ ও দুঃখ বলা হয়, যখন উভয়ই একই শক্তির তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। এভাবে বুঝলে বা দেখলে তবেই এমনতর সমজ্ঞান আসতে পারে। তরঙ্গভঙ্গের এই তত্ত্ব আগে আলোচনা করেছি। (১৪ নং শ্লোক ব্যাখ্যা ও ২য় অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ দ্রষ্টব্য) তখন কোন কিছু সুখ দুঃখ দায়ক হলেও তা প্রাণের উপর অশান্তি বিস্তার করতে পারেনা। মনে করলেই তো আর জগতের ভাবসকলকে উপেক্ষা করা যায় না। মনে করলেও, চেষ্টা করলেও, মান অপমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে সাধারণ লোক পারেনা। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করে, কৃতসংকল্প হয়ে সাধনা করলে, সমস্ত তরঙ্গই এক হয়ে গেলে (resonance) সেই তরঙ্গের আঘাতগুলো আর আলাদা আলাদা করে বোঝা যায় না। ফলে, চিত্তকেও আর কলুষিত করে না। তবে এসব অবস্থা চটজলদি হয়না। সমতা বা শান্তি কামনা করে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করা ঠিক নয়, তাতে শান্তি আসে না। “মালিক না রখ্‌খে হক্” প্রকৃত মালিক কারও পাওনা গন্ডা বাকি রাখেন না। সুদীর্ঘ অধ্যাবসায়ে এমন মালিকের অবশ্যই কৃপা হয় ‘কৃ-পা’ শব্দের অর্থই হল ‘করে পাওয়া’ অহৈতুকী ভক্তিতেই অহৈতুকী কৃপালাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই ভক্তগণের সেবা বা ভগবদ্ শরণাগতি দ্বারা নিজ অন্তঃকরণের মল যখন প্রায় নষ্ট হয়ে আসে তখনই উত্তমশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। সকল বস্তু থেকে আসক্তি চলে যায়। এবং তখনই প্রকৃত “ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞান” অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মোটকথা ক্রিয়ার পরাবস্থাতেই চিত্তের সমতা হয়। ক্রিয়া না করে এই পরাবস্থা পাওয়া যায় না। ২/৩৮

এষা তেঽভিহিতাসাংখ্যেবুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ।। ৩৯

অনুবাদ: আত্মতত্ত্বে (আত্মবিজ্ঞানবিষয়ে) তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইল। কর্ম্মযোগে ইহা (যাহা বলিতেছি) শ্রবণ কর। হে পার্থ, যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে, তুমি কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে। ২/৩৯

ব্যাখ্যা: শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন দেখ পার্থ, তোমাকে তো প্রকৃতি পুরুষ বিবেক বিষয়ে এতটা বললাম। এখন সেটা পাওয়ার উপায়স্বরূপ কাজের জ্ঞানটুকুও বুঝে নাও যা পেলে তুমি কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। সাধকের সাধনার জন্য এতক্ষণ যা সব বলা হয়েছে সেগুলোকে সবই স্বীকার করে নিতে হবে। কেননা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি হবার আগে সমস্ত তত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ড নিত্য ও অনিত্য, আত্মা ও প্রকৃতি, অথবা চিৎ ও অচিৎ এই দুই ভাগে বা স্তরে বিভক্ত হয়ে প্রতিফলিত হয়। সেজন্যই ভগবান ঐ দুটোর স্থূলতঃ বিচার করে বললেন আসলে ওটা দুই নয়, একই। অসৎ বা অচিৎ বলে পরমার্থের বিচারে কিছু নেই। একই তত্ত্ব সত্য বা মিথ্যা ইত্যাদিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে মাত্র। আসল পারমার্থিক সত্য যেটা সেটা আবার ভাষা বা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তবে তেমনটা না বুঝলে যে সাধনা হবে না তা নয়, যার যেমন জ্ঞান আছে, যেমন ধারণা আছে, তাই নিয়েই সে সাধনায় কৃতনিশ্চয় হোক। তা

থেকেই সে সেই নিত্য সর্ব্বগতের সন্ধান পাবে। এবার এই সাধনারূপ মহাকর্ম্ম কি রকম প্রজ্ঞার সাথে করলে তুমি মুক্ত হবে সেটাই বলব। সাংখ্যে মূলতঃ এই তিনটি জিনিষ পরিষ্কার।

(১) পুরুষ বা আত্মা অপরিণামী নিত্য;(২) প্রকৃতি বা পরিণামী নিত্য (৩) ঐ পুরুষ বহু।

সাংখ্য আত্মা বা পুরুষকেও নিত্য বলেন যদিও পুরুষ অপরিণামী কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী। তবে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে এই নিত্যত্বটুকু সাধারণ। পরিণামরূপ গুণটুকু "সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে – এক প্রকার," এইভাবে মায়াবাদে স্থান পেয়েছে। কিন্তু গীতায় "নামরূপ" আকারীয় পরিণতিটুকুও সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। যাই হোক, অত চুল চেরা বিচারে না গিয়েও এভাবে সাধারণ জ্ঞানের একটা স্থুল সামঞ্জস্য করে নিয়ে পরিণাম ক্ষণস্থায়ী বুঝে আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি নেই, অজ, অব্যয় এই বিশ্বাস নিয়ে সাধনা করতে বলেছেন।

তোমার জ্ঞানের ভিতর ঐ তিনটি স্তরের মধ্যে যে সাধারণ "নিত্য সত্য" সে টুকুই আদর্শ ধরে সেই উপলব্ধির জন্য সাধনা চালাও বা স্বধর্ম্ম পালন কর। দেখবে চৈতন্য সংকল্প যুক্ত হলেই তার নাম শক্তি – তাইই সৃষ্টি। আত্মতত্ত্ব বোধের সঙ্গে চৈতন্যের জড়দর্শন লুপ্ত হয় এবং জীব স্বরূপদ্রষ্টা হয়। সংক্ষেপে এটুকুই হল তত্ত্বগতভাবে বুদ্ধিযুক্ত হওয়া, এরই নাম প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা অবলম্বনেই শুরু কর সেই স্থিরত্বের সাধনা, কর্ম্মযোগ বা ক্রিয়া। এর দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়। অর্থাৎ চিত্তের ভিতরের বিষয়-মলটুকু দূর হলেই চিত্ত শূন্য হয়ে যাবে। তখন সেই শূন্যেতে গিয়ে নিজেই বা কে ? আর এসব দৃশ্য পদার্থই বা কি ? সে সব বুঝতে পারবে। দেখবে "শূন্য নহে শূন্য মাত্র, ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার ॥" ২/৩৯

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।। ৪০

অনুবাদ: এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রারম্ভের বিফলতা নাই, (কোনওরূপ) প্রত্যবায় (বিঘ্ন) – নাই, এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও (অনুষ্ঠিত) হইলে মহাভয় (সংসারাসক্তি) হইতে ত্রাণ করে ॥ ২/৪০

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে বুদ্ধিযোগের কথা শ্রীভগবান বলেছেন সেই নিত্য ক্রিয়ারূপ বুদ্ধিযোগের অনুষ্ঠানই স্বধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে নাশ নেই, মধ্যে বিঘ্ন নেই এবং শেষেও বিফলতা নেই। এর অতি অল্পমাত্র নিত্য নিয়মিত ভাবে করতে পারলে তোমার হৃদয়ের দুরন্ত অভাব বিনষ্ট হবে। অতিশয় সংসরাসক্তিই আমাদের মহাভয়ের কারণ। যেহেতু এর থেকেই সবরকম চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। নিয়মিত ভাবে অল্প পরিমাণ অভ্যাসেও আসক্তি নিয়ন্ত্রণে থাকে ফলে হৃদয়ও শান্ত হয়ে থাকে। খুব একটা বেশী ঝঞ্ঝা পীড়িত হয় না। যদিও কর্ম্মমাত্রেই সিদ্ধি। অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা এর একটু স্বাতন্ত্র্য

আছে। কর্ম্মই ঘনীভূত হয়ে ফলরূপে অনুভব করি। কারণ পুঞ্জীভূত হয়েই কার্য্য হয়। তখন যা কিছু উপভোগ করছি সেসব আগের আগের সঞ্চিত কর্ম্মই ঐভাবে ফুটে উঠছে মাত্র। পরে কর্ম্ম আলোচনার সময় এটা বিশদভাবে বলব। এখন বিঘ্ন আরম্ভ ও নাশের কথাই বলি।

প্রতি কর্ম্ম আরম্ভেই ফল পাই না কেন ? কালের দিকে লক্ষ্য থাকে বলে। অর্থ কর্ম্মটা এতক্ষণ হল, এতটা হল, এমন একটা ধারণা থেকে থাকে বলে। আমাদের জন্ম মরণরূপ, দেহ একটা কালের গণ্ডী এঁকে দিয়েছে বলেই আমরা সব কাজেই কালের একটা সাপেক্ষতা দেখতে পাই। কিন্তু এই অপূর্ব্ব বুদ্ধিযোগে কাল সাপেক্ষতা টিকতে পারে না। কারণ এই যোগের যা লক্ষ্য তাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই মিলে মিশে গেছে। সে জিনিসে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমান রূপেই চির প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য যেটুকু মাত্রাতেই এ কাজের সূচনা করা হোক না কেন ঐ কাল কল্পনা সবার আগেই মিটে যাবে। প্রতি পদে পদেই বোঝা যাবে যে জীবণ মরণের ভয় কেটে যাচ্ছে। মনে কর ক্রিয়া সমাপ্তি হল না অথচ মারা গেলাম অথবা দেহে রোগ ব্যাধি জন্মাল যাতে আর যোগক্রিয়া করা গেলনা, অথবা যেমন ভাবে করা উচিত কোন কারণে ঠিক তেমনটি হোল না, এমনতর বিঘ্ন যদি ঘটে তবেতো সবই বৃথা হল। কিন্তু না, বৃথা হয় না। যোগদর্শনে আছে "স তু দীর্ঘকালঃ নৈরন্তর্য্য সৎকার সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" যার অর্থ হল – সেই অভ্যাস অনেকদিন পর্য্যন্ত একটানা বহুক্ষণ খুব শ্রদ্ধাসহ আসেবিত হলে দৃঢ়ভূমি লাভ হয়। কিন্তু তা যদি না হয়, যদি খুব বেশীক্ষণ ধরে নাও করা যায়, তাতে যে একেবারে কিছুই কাজ হবে না এমনটা নয়। রোজ একটু একটু করে করলেও যে সংস্কার উৎপন্ন হবে সেই সংস্কারই তাকে পরজন্মে সাধনের ইচ্ছা ও অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করে দেবে এবং ২/৩ জন্মেই এই মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি ভাগ্যক্রমে সাধনায় ও গুরুতে প্রবল শ্রদ্ধা থাকে, তবে অল্প সাধন দ্বারাই এই জন্মে মুক্তিলাভ করতে পারবে। তাই ভগবান বলেছেন এ বুদ্ধিযোগের তিলমাত্র অনুষ্ঠান করলেও জন্ম-মরণের মহাভয় দূর হয়ে যায় ॥ ২/৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ।। ৪১

অনুবাদ: হে কুরুনন্দন, এই কর্ম্মযোগে ব্যবসায়ত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্ত অব্যবসায়ীদিগের (কামীদিগের) বুদ্ধি অসংখ্য কামনাপ্রযুক্ত, বহু শাখাযুক্ত ও অনন্ত ॥ ২/৪১

ব্যাখ্যা : এর আগে ৩৯ নং শ্লোকে যে ধরণের প্রজ্ঞার কথা বলা হয়েছে সেই প্রকার প্রজ্ঞা হৃদয়ে ধারণ করলে বুদ্ধি একমুখী (unidirectional) হয়। বুদ্ধি তখন যথার্থ বুদ্ধি নামের উপযুক্ত হয়। অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নামই বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম "চিত্ত", সংকল্প বিকল্পাত্মিকা বৃত্তির নামই "মন"। মনকে দিয়ে একবার সংকল্প করিয়ে নিতে পারলেই তখন চিত্ত বা

অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি ফুটে ওঠে। তখনই সেই প্রজ্ঞা অবলম্বনে প্রত্যেক বস্তুর ভিতর ব্রহ্মের অন্বেষণ করার জন্য বৃত্তি সকল ধাবিত হয়। কিন্তু যারা কৃতনিশ্চয় নয়, যাদের মন সংকল্প করেনি তাদের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তিও বা চিত্তও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বুদ্ধিও নিশ্চয়াত্মিকা হয় না তাই সে বুদ্ধি তখন আর বুদ্ধি নামেরই যোগ্য নয়। কেন না মনের বিকল্প ধর্ম্মের দ্বারা চিত্তবৃত্তি পরিবর্তনশীলা এবং সেই পরিবর্তনশীলা চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও মুহূর্তে মুহূর্তে ভেঙ্গে যায়। বুদ্ধির দর্শনশাস্ত্রীয় নাম “মহত্তত্ত্ব”। মহত্তত্ত্বের সহজাত আরও একটা তত্ত্ব আছে যার নাম অহংতত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব স্থিরীকৃত হলে তবে আমি বা ঐ অহংতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বই হল ব্যক্ত ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ। সুতরাং যতক্ষণ বহুপ্রকারে ঐ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি পরিচালিত থাকবে ততক্ষণ স্থিরতাই পাওয়া যাবে না, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান এসব তো দূর অস্ত। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তির প্রাণের উপর আধিপত্য করা চাই। এই আধিপত্যের জন্য চিত্তবৃত্তির ভিতরে চক্ষু বাড়িয়ে দেওয়া চাই। আরও কথা ঐরকমভাবে চোখ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হওয়া চাই। চিত্তবৃত্তিগুলোর কাজ যাই হোক, তার কাজের ফল যাই হোক, তার সাময়িক মূর্ত্তি যে যে ভাবের উদ্রেক করে সেসব গ্রাহ্য না করে চট পট চোখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র তার অন্তর্গত মহাশক্তি দর্শন কর, আরাধনা কর, দেখবে ধীরে ধীরে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হয়ে আসবে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে আছে “যোগ' ও “সাংখ্য'এই দুই উপায়ে সন্দেহবিহীন নির্ম্মল, সূক্ষ্ম জ্ঞানের উদয় হয়”। যোগের দ্বারা চিত্ত ঈশ্বরমুখী হলেই হয় ভক্তিযোগ। এই ভক্তির উদয় না হলে জ্ঞানীও কেউ হতে পারে না। আর যত রকম কর্ম্ম আছে সে সব কাজে অর্থাৎ বাহ্যিক পূজো আর্চার দ্বারা খুব ঈশ্বর সাধন করছি এমন মনে হলেও মনের বিক্ষেপ হেতু সেসব নিষ্কাম হয় না, আদৌ ঈশ্বর মুখীও হয় না ॥ ২/৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ।। ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ।। ৪৩

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।। ৪৪

অনুবাদ : হে পার্থ, বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট “ইহা ব্যতীত ঈশ্বর তত্ত্ব প্রাপ্য আর কিছু নাই” এইরূপ বাদী কামাত্মা স্বর্গপরায়ণ যে মূঢ়গণ জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত (যজ্ঞাদি) ক্রিয়াবিশেষবহুল এই যে পুষ্পিত (বিষলতাবৎ আপাত রমনীয়) বাক্য (স্বর্গাদি ফলশ্রুতি) বলিয়া থাকে,

সেই পুষ্পিত বাক্যে অপহৃত চিত্ত এবং ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত তাহাদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধির যোগ্য নহে ॥ ২/ ৪২-৪৪

ব্যাখ্যা : শরীর রক্ষক জীবনদায়ী ওষুধের স্বাদ তিক্ত, কটু, কষায়, বা জ্বালাকর ইত্যাদি হলেও শরীর রক্ষায়, জীবন রক্ষায় তার উপকার অপরিসীম। আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানীগণ (Pharmacy Scientists) অমন বিস্বাদ ওষুধের উপর শর্করা প্রলেপস্তর (sugar coating) অথবা জিলেটিন (hard zilletin/ gelatin) নামক কোন শক্ত আঠাজাতীয় দ্রব্যের মোড়কের ব্যবস্থা করেন। এখানে ওষুধের আপাত মিষ্টতা গৌণ বরং রোগ নিরাময়ই মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইরকম বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডসকল সর্ব্বসিদ্ধি ইত্যাদি মধুময় ভোগ সংযুক্ত হওয়ায় সাধারণ শিশুবৎ জীবমণ্ডলী সেই সব কাজগুলো করবে এবং প্রধানত সেইসমস্ত কর্ম্ম করে ভগবন্মুখী হবে। এই উদ্দেশ্যেই এসমস্ত যাগযজ্ঞের অবতারণা, ঠিক যেমন শিশুকে তেতো ওষুধ মধু দিয়ে খাওয়ানোর সময় মধুপান মূল উদ্দেশ্য হয়না বরং ঔষধ সেবনই উদ্দেশ্য হয়। সেইরকম বৈদিক কাজকর্ম্মগুলোর মূল লক্ষ্যটা ভুলে গেলে চলবে না। এ লক্ষ্যের ব্যতিক্রম ঘটলে হৃদয়েরও ভাব বিপর্য্যয় ঘটবে। যাঁরা বৈদিক কর্ম্মসকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মজ্ঞানলাভ ও ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়ার মহালক্ষ্য ভুলে গিয়ে সিদ্ধি ইত্যাদি বাহ্য ফলের দিকে মাত্র লক্ষ্য করেন তাঁদের বৈদিক কর্ম্মের ভিতরে ঐসব স্বর্গাদিলাভ ছাড়া আর কিছু নেই সুতরাং আমাদেরও ওগুলোই লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটা ধারণাই বদ্ধমূল হয়। এঁদেরই ভগবান “বেদবাদরতা” বলেছেন। এঁরা “খণ্ড কর্ম্মফলবাদী”। বেদের এমনতর কর্ম্মকাণ্ডে এতদূর আস্থা চলে আসে (overconfidence) যে তাঁরা বলে বেড়ান ঈশ্বর বা মোক্ষ বলে কিছু নেই। কর্ম্মই যখন সমস্ত ফল গ্রহণ করে তখন ঈশ্বর থাকলেও তাঁর স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কোথায় ? সেই কর্তৃত্ব যখন নেই তখন আপাত ফলেরই উপাসক হওয়া উচিত। কিন্তু কর্ম্ম কিভাবে ফলে পরিণত হয় ? অথবা কোন জিনিষটা কর্ম্মফল ? সেসব বুঝলে আর এমন খণ্ড কর্ম্মফলবাদ অবলম্বন করতে হয় না। যাক্ কর্ম্মরহস্য সম্বন্ধে পরে আলোচনার ইচ্ছে রইল। এখন মূল গতি বা লক্ষ্যের কথায় যাই।

পণ্ডিতদের খোসামুদে সন্তুষ্টকারক ব্যাখ্যায় কেবল বেদের কথা নিয়ে শুধুই ঝগড়া, আসল কথা কিছুই নেই। কেবল ইচ্ছার, ফলাকাঙ্খার, সাথে কর্ম্ম, ভোগ, ঐশ্বর্য্যও শুধু সুখের জন্য। যাই হোক, আবার মুল কথায় ফিরি। বিদ্ ধাতু থেকে বেদ শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ হল জানা, বেদন বা অনুভব করা। যা আমাদের বেদনা বা অনুভূতির ভিতর দিয়ে পৌঁছায় তাই জ্ঞান। যে জ্ঞান হৃদয়ের ভিতর অনুভূতি জন্মাতে পারেনা সেটা জ্ঞান পদবাচ্য নয়। পাখীর মত কণ্ঠস্থ করা যে জ্ঞান তা শুধু শব্দভঙ্গি মাত্র। বেদন বা অনুভূতিই বেদ পদবাচ্য। জ্ঞান তার আন্তরিক বিকাশ, কর্ম্ম বাহ্য বিকাশ। ভগবানকে অনুভব করার অনুভূতি থেকে যে আসক্তি জন্মায় তারই নাম ভক্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি বেদনার

ত্রিমুর্ত্তি বা বেদের বিভাগত্রয়। বেদ বা ভগবদ্‌বেদনা বা ভগবদ্‌ অনুভূতি অন্তঃকরণে ভক্তিরূপে, মনে জ্ঞানরূপে এবং দেহে কর্ম্মরূপে বিম্বিত, বিকশিত, ও প্রকাশিত হয়। যাই হোক, এই বেদন মাতৃ অলিঙ্গনের সুখমাত্র। বেদবাদরত পণ্ডিতদের জানার বাইরে। একটা জলকণা যেমন অনন্ত জলকণার সাথে অলিঙ্গনে মিশে থাকে তেমনই আমরা মাতৃঅলিঙ্গনে আবদ্ধ। এ আলিঙ্গনকে অনুভব করতে শেখ। জ্ঞানকে শুধু মনের একটা সিদ্ধান্ত না বুঝে অন্তরের অনুভূতি বা বেদন বলে বোঝ। কর্ম্মকে একটা আপাত সুখদুঃখাদি ফলবাহী মাত্র না বুঝে মাতৃঅলিঙ্গনের বেদন বলে হৃদয়ে অনুভব কর। মা আমার তোমার শরীরের একটা দ্বার দিয়ে প্রতিশ্বাস প্রশ্বাসে আপন অঙ্গে টেনে নিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে বেদনারূপ আলিঙ্গনের একটা সুখ তুমি অনুভব করছ। যখন মাতৃগর্ভে ছিলে তোমার দেহটা একটা উল্বনের (ফুল) দ্বারা আবৃত ছিল। সেই উল্বন বা ফুল মাতৃশরীরে সংযুক্ত থেকে মায়ের প্রাণশক্তি তোমার নাভি দিয়ে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তোমায় রক্ষা করত ও পুষ্টি করত। তাহলে বোঝ তোমার নাভিস্থলটাই মাতৃশরীরস্থ শক্তি তোমার দেহে প্রবেশ করাবার একমাত্র দ্বার। তুমি সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সেই ফুলটিতে বা সেই উল্বনটিতে আবৃত থেকে তার দ্বারা পরিস্ফুট হতে। তারপর যখন নাভিদ্বার এমন পরিপুষ্ট হল যে বিরাট জগৎ থেকে প্রাণশক্তি আকর্ষণ করে নিতে পার, তখন তুমি মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এলে, ভূমিষ্ঠ হলে। জীবের নাভিদ্বার যতদিন এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড থেকে প্রাণশক্তি টেনে নিতে সক্ষম না হয় ততদিন জীব মাতৃগর্ভে থাকতে বাধ্য হয়। প্রাণ প্রবেশের এটাই একমাত্র দ্বার।

আমরা যখন ভূমিষ্ট হই তখন আবার ক্ষুদ্র মাতৃগর্ভস্থ ফুলটার থেকে বেরিয়ে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডরূপ উল্বন বা ফুলটার মধ্যে এসে পড়ি। বিরাট মাতৃগর্ভস্থ ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই ফুলটার মধ্যে পড়ে আমি নাভিদ্বার দিয়ে আবার আগের মতই প্রাণশক্তি আকর্ষণ করছি। নাভিরূপ দ্বার দিয়ে মা আমাদের ভিতর প্রাণশক্তি প্রবেশ করাচ্ছেন এবং বিশ্বেশ্বরী মায়ের গর্ভে থেকে তুমি এভাবে পুষ্ট হচ্ছ, অমৃত সংগ্রহ করছ, তাই তুমি সজীব, শক্তিচেতনাশীল। মূর্খ শিশু, কিছু দেখোনা, এই মাতা পুত্রভাব উদ্বোধিত কর। তুমি অমর হবে। এজন্যই যোগী মাত্রকেই নাভিক্রিয়া করতে হয়। করেন সত্যিই কিন্তু তাঁদের অনেকেই জানেন না নাভিস্থলের ক্রিয়া কিসের জন্য করণীয়। যাই হোক, অপ্রকাশ্য হলেও একটু বলে ফেললাম। তোমরা নাভিক্রিয়া করে যোগী সাজ কিন্তু তার সাথে এই ভাবটি যোগ করে নিও, তোমাদের ক্রিয়া অমৃতময়ী হয়ে উঠবে। শুধু অন্ধের মত ক্রিয়া করলে সঠিক ফল হয় না। এই ভাব সংযুক্ত করার উপায় আছে। নাভিক্রিয়া সাধারণ যোগীরা যে ভাবে করে থাকে তা অসম্পূর্ণ। ক্রিয়ার বাহ্য অঙ্গমাত্র। ওটার অন্তরঙ্গ অংশ কারো কারো মধ্যে নিজে থেকেই সাধিত হয়ে যায় বলে তারাই ফল পায়, সবাই পায় না।

যাই হোক, নাভিস্থল দিয়ে প্রাণশক্তি প্রবেশ করে ঐ শক্তি একাদশ ইন্দ্রিয়পথেই যায় ও ব্যয় হয়। প্রাণশক্তির এই প্রবেশ ও নিকাশের ভিতর দিয়েই আমাদের অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটতে থাকে। অতিরিক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়দ্বারসকলকে পরিচালনার ফলে অপরিমিত ভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, শক্তির প্রবেশের সাথে সামঞ্জস্য থাকেনা, অধিক পরিমাণে ব্যয় হয়ে যায়। প্রবেশের পথে বা নাভিস্থানে সম্যক কাজ না হওয়ায় প্রবেশের দ্বার সংকীর্ণ হয়, খরচের মাত্রা বেড়ে যায়, আমরা বার্দ্ধক্যে পৌছাই। আয়দ্বার অপেক্ষা ব্যয়দ্বার প্রসারিত হয়ে যন্ত্রটিকে অকর্ম্মণ্য করে তোলে ও এর পরিত্যাগ দরকার হয়, তাই আমরা মরি। তাহলে এতক্ষণের আলোচনায় বুঝলাম যে প্রাণশক্তি অর্জনের দরজা নাভিস্থল যা প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্যক বাড়াতে পারি এবং ব্যয়ের মাত্রা কমাতে পারি এবং প্রাণশক্তিকে ধরে রাখতে পারি। তবে এই আয়ের দরজা প্রসারিত করার কৌশল লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর ভাবে ভক্তিতে বিভোর না হতে পারলে এটা জানাও যাবেনা।

এখন মূল শ্লোকে ফিরে আসি। "বেদবাদরতাঃ" এবং "নান্যদস্তিতিবাদিনঃ" এঁদের বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্থূল আবরণই লক্ষ্য। এসব পালন করলেও ভেবনা তোমার কাজ খুব সুসম্পন্ন হচ্ছে। তুমি ব্রহ্মবাদী বা ব্রহ্মচারী, যোগী কি যাগযজ্ঞশীল, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী যাই হও বেদের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য না জেনে শুধু এসব বাহ্যক্রিয়ায় কিছুই হবেনা। "তয়াপহৃতচেতসাম" অর্থে কেবলই সকাম কর্ম্ম করতে করতে নিষ্কাম কর্ম্ম একেবারেই ভুলে যায়, এমনকি তার কথাতেও, ভয় পায়। কঠ উপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বললেন, "জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং স তৎ।" অর্থাৎ কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি সম্পদ অনিত্য যেহেতু নিত্য সত্য ব্রহ্ম অনিত্য দ্রব্যময় যজ্ঞাদির দ্বারা পাওয়া যায়না। তাঁকে পাওয়ার উপায় "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্‌। আধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" অর্থ বীরপুরুষ আত্মার চিত্ত সমাধানরূপ যোগাভ্যাসের দুর্বিজ্ঞেয় অব্যক্ত স্বরূপ, সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট ও দেহরূপ গহ্বরে এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরে নিত্য বিদ্যমান সেই পরমাত্মদেবকে অবগত হতে পারলে তবে বিষয়, সুখ, দুঃখ ইত্যাদিকে অতিক্রম করা যায়। যতক্ষণ ভোগবাসনা থাকবে ততক্ষণ ব্রহ্মে স্থিতি হবেই না। ২০৭৩৬ বার অথবা কমপক্ষে ১৭২৮ বার প্রাণায়ামের প্রতি মনের প্রবৃত্তিই হবেনা আর মনের নিরুদ্ধভূমিতে পৌছাতে না পারলে অশান্তি, অজ্ঞান কিছুই দূর হয়না। কেউ কারোর জন্য কিছু করে দিতে পারেনা। যাদের বিষয়ের দিকেই মন তারা এত কিছু করতে যাবেই বা কেন ? বরং ঐসব স্থূলভাবে স্থূল কাজগুলো করেই নিজেকে যাগযজ্ঞশীল মনে করে, অনেক কিছু করলাম, এমন ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করুক।

অপরপক্ষে, সমাধি বললেই সাধারণ লোকে কেমন যেন একটা জড় ভাবাপন্ন অবস্থা মনে করে। কিন্তু আসলে তা নয়। অবশ্য সমাধি দুরকমের হয়। দুইই এক। যেমন জল ও জলের ঢেউ।

তবে চৈতন্য সমাধির অবস্থায় সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই ইন্দ্রিয়ের কাজগুলো সবই করা যায় । আসলে সমাধির অর্থ হল স্থিরভাব। ব্রহ্মে যুক্ত হলে এই অবস্থা হয়। ২০৭৩৬ টা প্রাণায়াম একটানা করে গেলেই এটা হয়। এর বেশী আর বলা যাবেনা ॥ ২/৪২-৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেমং আত্মবান্ ।। ৪৫

অনুবাদ : হে অর্জুন, বেদসকল (সকাম ব্যক্তিগণের) কর্ম্মফল প্রতিপাদক, তুমি ত্রৈগুণ্যরহিত (নিষ্কাম) হও। শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব রহিত হও। নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে, ব্রহ্মে অবস্থিত হও। অলব্ধ বস্তুর লাভে ও লব্ধ বস্তুর রক্ষায় যত্নশূন্য হও এবং অপ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত হও। ২/৪৫

ব্যাখ্যা : বেদের কথাই হচ্ছিল। ত্রিগুণই বেদের বিষয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপে বৈভব বিভাগ করে দেখতে গিয়েই বেদ বিভাগ হয়েছে। যার একগুণে স্বত্ব প্রথম তরঙ্গ সৎ অস্তিত্ব জ্ঞাপক, দুই গুণে রজঃ দ্বিতীয় তরঙ্গ চিৎ এবং তৃতীয় তরঙ্গ আনন্দ। এই প্রথম বা একগুণ ভক্তি, দ্বিগুণ হলে কর্ম্ম, আর ত্রিগুণ হলে জ্ঞান। এই ত্রিগুণই পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে ও সংমিশ্রণে পঞ্চতন্মাত্র রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শাদির উৎপত্তি করছে যা সকল বৈচিত্র্যের মূল ও এর থেকে যার পরিণতি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আকারে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রকটিত। অতএব জীবসকলই বা বাদ যায় কেন ? এই ত্রিগুণের মিশ্রণে উৎপন্ন বিষয় সমূহের ভিতরে থেকে আমরাও ত্রিগুণাত্মক হয়ে পড়েছি। তাই আমরাও বৈদিক কাজকর্ম্ম করা সত্ত্বেও সেই ত্রিগুণত্বই লাভ হচ্ছে যেহেতু আমরা আভ্যন্তরীন মর্ম্ম অর্থাৎ যথার্থ বেদ গ্রহণ করতে পারছিনা। একথা এর আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশদভাবে বলেছি। তাই আমরা ত্রিগুণের দ্বন্দ্ব ও ঘাত প্রতিঘাত এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বা জন্ম, অবস্থান ও মৃত্যুর কবলে পড়ে জর্জ্জরিত হয়ে থাকি। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে নিস্ত্রৈগুণ্য হতে বলেছেন।

এখানে একটা অদ্ভূত স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। ভগবান একবার বলছেন ত্রিগুণের অতীত হও, আবার বলছেন সত্ত্বগুণে অবস্থান কর। প্রকৃত অর্থ হল যতক্ষণ ত্রিগুণের ভিতরে থাকবে ততক্ষণ বেদের ত্রিগুণাত্মক স্থূল মর্ম্মই তোমার ধারণায় আসবে। তাই একগুণিত্ব না পেলে নির্দ্বন্দ্ব হওয়া যায়না। ত্রিগুণ থেকে একগুণে আসার অর্থ একটা গুণকে বাড়ানো ও অন্য দুটিকে ক্রমশঃ কমানো। অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দমন তথা সত্ত্বগুণের পরিপোষণ। সাধারণ জীব একসময়ে জগতের এই অর্ন্তমুখী ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর পড়ে বিরক্ত হয়ে অন্তর্মুখী হতে আরম্ভ করে। তখনই এই সমস্ত ত্রিগুণাদির সন্ধান পায়। আমরাও এভাবেই নিজেকে ভালমত পর্য্যবেক্ষণ করি ও নিজের অবস্থাটা

ভালমত বোঝার জন্য আমরা গুরুর শরণাগত হই। গুরুদেব আমার সেই ইচ্ছার অবস্থাটুকু বুঝে সেইমত ক্রিয়াদির ব্যবস্থা করে আমার ইচ্ছা পূরণের পথ করে দেন। আর এই অন্তর্মুখী অবস্থা না এলেই স্থূল বৈদিক যাগযজ্ঞ, ঐ ছাগপশুর বলিদান ও মাংস অনুপান সহযোগে খাওয়াই সার হবে। আর অন্তর্মুখী চেতনা থেকে সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে পারলে আর চিন্তা নেই, তখন ঠিক নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া যাবে, যেটা পরম স্থিরত্ব বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। তখনই প্রকৃত বেদজ্ঞান লাভহয়। হৃদয়ের বেদনসম্ভূত ও সঞ্জাত যে অনুভব, সেই অনুভূতি, সেটাই প্রকৃত বেদজ্ঞান।

বেদ যেমন চার, তার জ্ঞানও চার প্রকার। দেহোহহং, শূন্যোহহং, সর্ব্বোহহং, সর্ব্বাতীতোহহং। ইড়ায় শ্বাস চললে রজোগুণ সর্ব্বোহহং ভাব। অর্থাৎ আমারই সব চাই, সমস্তই আমারই ভোগের জন্য, এমন একটা ভাব। পিঙ্গলায় তমোগুণ – দেহোহহং, দেহাভিমান, আমিত্বের প্রসার, দেহের শ্রেষ্ঠত্ববোধ, দেহের সুখ অনুসন্ধান আর "আমি ধনী অর্থাৎ আমিই জ্ঞানী" দেহকে ঘিরে এমনতর একটা ধারণা। তারপর সুষুম্নায় সত্ত্বগুণ – শূন্যোহহং, এখানেই সাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকাশ। নিজেকে একটু বোধ করা যায়। মনে হয় শূন্যমাত্র, আমার সাথে কোনও কিছুরই সংযোগ নেই। তখন আমির জ্ঞান থাকলেও তাতে জগতের অন্য সম্বন্ধ থাকেনা। সব ভুল হয়ে একটা কেমন গভীর ধ্যান অবস্থা। এটা আর বলা যাবেনা। তার পরের অবস্থাই "সর্ব্বাতীতোহহং" যেটা ব্যাখ্যার অতীত। "কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, দ্বন্দ্বাতীতং, গগন সদৃশং"। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় সব মিলেমিশে একাকার। শ্বাসবায়ু আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে পৌঁছে যায়। তখনই আসল ত্রিগুণাতীত অবস্থা, "নির্দ্বন্দ্বো, নিত্যসত্ত্বস্থো, নির্যোগক্ষেম আত্মবান" যে অবস্থার কথা শ্রীভগবান অর্জুন কে বলেছেন। এ অবস্থা বলে বোঝাবার কথা নয়। "গুরুকৃপা হি কেবলং" ॥ ২/৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ।। ৪৬

অনুবাদ : সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞেরও সকল বেদে মাত্র ততটুকুই প্রয়োজন ॥ ২/৪৬

ব্যাখ্যা : সমস্ত জায়গা জলে ভরে গেলে কূয়ো, পুকুর ইত্যাদি ছোট ছোট জলাশয়ে যে পরিমাণ প্রয়োজন থাকে, ব্রাহ্মণেরও সমস্ত বেদে মোটে ততটুকুই প্রয়োজন। এখন তবে ব্রাহ্মণ কে ? "বেদ পাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ" অর্থাৎ যিনি বেদ জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। শুধু পাঠ করে জানা নয়, অনুভব করা। আগে যেমনটা বলেছি তেমনিভাবে সকল কর্ম্ম ও পদার্থের ভিতর, সমস্ত স্পন্দনের ভিতর, যিনি এই

এক স্পন্দন, এই এক বেদ অনুভব করেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। এজন্যই ব্রাহ্মণ ভূদেবতা, সর্ব্বলোকপূজ্য, ব্রহ্মলিপ্ত, ব্রহ্মজ্ঞ। তাই বিষ্ণুবক্ষে ব্রাহ্মণের চরণ চিহ্নিত। ব্রাহ্মণকে চিনতে মানুষের শক্তি নেই, দেবতারা কিছুটা বোঝেন। ব্রহ্মই ব্রাহ্মণের গৌরব জানেন, ব্রাহ্মণই ব্রহ্মের গৌরব জানেন।

এবার প্রশ্ন বেদ কি ? যে প্রজ্ঞার অনুশীলনে জীব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করে। ব্রাহ্মণত্ব পাওয়ার জন্য যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম করতে হয়, বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকার জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ রকম ভাবের দ্বারা চালিত হতে হয়, সেই সমস্ত ভাব, জ্ঞান ও কর্ম্ম সকলই বেদরূপে প্রচলিত। মানুষকে ভূগর্ভের জল পেতে হলে যেমন মাটি খুঁড়ে কুয়ো, পুকুর, দীঘি এসব তৈরী করে তবে জল পেতে হয় ও তৃষ্ণা মেটাতে হয়, তেমনই জগতে ঐসব বৈদিক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে তবেই ব্রহ্মের আভাসটুকু পেতে হয়। “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” হওয়া সত্তেও, ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, যাঁরা এখনও তা উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাদের ঐরকম কুয়ো, পুকুর ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু যাঁদের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসত্ত্বার উপলব্ধি হয়েছে তাঁদের পক্ষে ঐ সব কুয়ো, দীঘি এসবের আর প্রয়োজন হয় না। তাই বলা হয়েছে যেমন সমস্ত ভূমণ্ডল জলপ্লাবিত হয়ে গেলে কুয়ো, সরোবর ইত্যাদির খোঁজ করার আর দরকার হয় না তেমনই সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হতে থাকলে আর বৈদিক কর্ম্ম, ভাব ইত্যাদিরও আর দরকার হয়না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্লাবনে তার বিষয়াদি জ্ঞান সমস্তই ভেসে যায়, ডুবে যায়। এভাবে প্রবাহে প্রবাহে, স্পন্দনে স্পন্দনে যখন থাকে শুধুই ব্রহ্মোপলব্ধি তখনই সে ব্রাহ্মণ হয়। আর আমার মত গলায় একটা সূতো ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবার দরকার হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে গেলে একমাত্র ব্রহ্মেই, একমাত্র মায়েই, সে সব পেয়ে যায়। এটা পেতে হলে আগের শ্লোকে যা বলা হয়েছিল সেই নিত্যসত্ত্বস্থ ভাব, নির্যোগক্ষেম ভাব অবলম্বন করতে হয়।

তাহলে সেই বুদ্ধিযোগের কথা থেকে শুরু করে এই পর্য্যন্ত শ্রীভগবান যা বললেন তার সারমর্ম্ম হল তুমি সমস্ত ভাবের ভিতর প্রজ্ঞা অবলম্বন কর। এই ধর্ম্ম অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলেও মহাভয় হতে তোমাকে রক্ষা করবে। তোমার অনন্ত শাখা-প্রশাখাযুক্ত অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে প্রজ্ঞাভিমুখী কর। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন কর। বিধিমত জ্ঞান ও কর্ম্মাদির অনুশীলনে ফলের কামনা থাকলে তোমার বার বার সেই জন্মমৃত্যু লাভ হবে। কেননা বিধিযুক্ত হলেও সেগুলো ত্রিগুণাত্মক। তাই শুধুমাত্র সত্ত্বটুকুতে অবস্থান কর আর নির্যোগক্ষেম হও অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণেও যত্নবান হয়ো না এবং আত্মবান অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হও। আত্মস্থ হলেই সুখদুঃখাদির দ্বন্দ্ব সব আপনা হতেই মিটে যাবে।

স্থির প্রাণই সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী, তাঁর নৃত্যারম্ভ হলেই অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ স্থির প্রাণ চঞ্চল হলেই জগৎকে বহুরূপে দেখায়। “একৈবাহং জগত্তত্র দ্বিতীয়া কা মৎপরা।” অতএব প্রাণকে স্থির করার সাধনাই সকল সাধনার বড় সাধনা। “এক সাধে সব সাঁধিয়া সব সাধে সব যায়।” একের সাধনেই সব সাধন হয়। আর সকল সাধ মেটাতে গেলে সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। এর আগের শ্লোকের “আত্মবান হও” কথাটিই মূলকথা। সেটাকেই বিশেষভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীভগবান এই “যাবানর্থ উদপানে” শ্লোকটিতে জীব প্রজ্ঞা থেকে শুরু করে কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে সেটাই দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ॥ ২/৪৬

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ।। ৪৭

অনুবাদ : নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে কদাচ যেন (তোমার আসক্তি) না হয়, তুমি কর্ম্মফল হেতু (ফলার্থী) হইও না। সকাম কর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় ॥ ২/৪৭

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে কর্ম্মের একটা অপূর্ব্ব গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হয়েছে। সেটা হল যতটাই আমরা ফলের লক্ষ্য করি ততটাই অকাজ। অর্থাৎ যতদিন ফলের দিকে যে পরিমাণে লক্ষ্য থাকে ততদিন সেই পরিমাণে আমরা কর্ম্মহীনতা পেয়ে থাকি। উল্টোদিকে যে যে পরিমাণে ভোগের আশা বা ফলের আশা ত্যাগ করি সেই সেই পরিমাণে কর্ম্মের অধিকারও বেড়ে যায়। তাই শ্রীভগবান বললেন, “তোমার যেন কর্ম্মহীনতার বা অকর্ম্ম অবস্থার সঙ্গ না হয়।” কর্ম্মাংশে দোষ নেই ফলাংশে মাত্র দোষ। কর্ম্মের ভিতর এটাই গূঢ় রহস্য যে কর্ম্মের ফলের দিকে না চাইলে, আপাতভোগসকলের দিক্ হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে কর্ম্মের শক্তি বৃদ্ধি হয়। “অকর্ম্মাণি” শব্দটার আর এক অর্থ হল কর্ম্মমাত্রই যদি ভগবৎ সন্ধানাভিমুখী হয় তবেই সেটা কর্ম্ম পদবাচ্য, নতুবা অকর্ম্মরূপে ধরতে হবে। অতএব ফলের আশাবিহীন যে কর্ম্ম সেটাই নিষ্কাম কর্ম্ম আর ফলের আশায় কৃত সকাম কর্ম্মসকলই অকর্ম্ম। এখন বোঝা গেল যে সকল কর্ম্মই অকর্ম্ম হতে পারে আবার সকল অকর্ম্মই কর্ম্ম হতে পারে। কর্ম্মতো তার মনোমুগ্ধকর (fascinating results) ফলটি দেখিয়ে আমায় ভোলাচ্ছে আর আমিও ছুটছি। আর ফলটা না পেলেই কাঁদছি, দুঃখ পাচ্ছি। আবার ফলের দিকে লক্ষ্য পড়ে, আবার ছুটি, হাত বাড়াই, যে ফলগুলো পাই, তাই খাই। ফলের আশা আবার ছোটায়, আরও ছোটায়। ক্রমশঃ ক্লান্তি অবসাদ এসে গতি কমিয়ে দেয়; তখন ফলফুলময় কর্ম্মমণ্ডল মরীচিকা মনে হয়, ভ্রান্তি, অসার যন্ত্রণার স্বপ্ন বলে মনে হয়। মনে হয় ফল মিথ্যা, কর্ম্ম মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। মিথ্যার ছবিতে প্রাণ পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ছোটা কমেনা, গতি বন্ধ হয় না। তবে তখন আবার এই মিথ্যার চক্রের বাইরে আসার জন্য ছুটি। দূরে

কেমন যেন সত্যফলযুক্ত কর্ম্ম দেখতে পাই। তখন আবার সেই “সত্যফল” “সত্যফল” করে উর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণপণে ছুটি। কিন্তু হায়! হায়! কখনও বুঝিনা যে তখনও ফলের আশাই যুক্ত হয়ে কর্ম্মসকল আমার দখল নিয়ে ফেলেছে আর আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। মিথ্যাফল, সত্যফল এসব ভাবতে ভাবতেই জীবনের আলো ম্লান হয়ে গেল অথচ কর্ম্মের আধিপত্য আমার উপর প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েই গেল। তখন খুব পরিষ্কার ভাবে শ্রীভগবানের কথা –“অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে” অনুভব করি। পণ্ডিতের মত কথা বলি, আলোচনা করি সত্যি, কিন্তু আসলে অশোচ্যের জন্য শোক করি। সব মিথ্যা বলে তার বাইরে সত্যি বলে এক কাল্পনিক জগৎ তৈরী করে নিয়ে (সেই ফল) সেটা পাওয়ার জন্যে শোকে অভিভূত হই। কর্ম্মগতির দ্বারা সব সময় পরিচালিত হই। সত্যফল বা মিথ্যাফল যাই হোক, ফল একটা কিছু থেকে গেলেই, সেকথা ভাবলেই অকর্ম্ম। আর কর্ম্ম থেকে ফলটাকে বিচ্যুত করলেই, নিষ্কাম করতে পারলেই কর্ম্ম হল, তখন সেই কর্ম্মের অন্তে বুঝবে, অনুভব করবে, যেটা মিথ্যে ছিল সেটাও সত্যি, যেটা সত্যি ভেবেছিলে সেটাও সত্যি আর সে সত্যি মিথ্যের দেশের অতীত দেশেও মহাসত্য বিরাজিত। সব বিয়োগ গুলোও আসলে যোগ এমন অনুভব লাভ হবে। শরীরে হৃদপিণ্ডের সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কাজ থেকে শুরু করে সমস্ত কর্ম্মই সেই ব্রহ্মযজ্ঞ। সমস্ত কর্ম্মের মধ্যই সেই ব্রহ্মযজ্ঞ সাধিত ও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ ক্রিয়াটিতে পর্য্যন্ত এই যজ্ঞ দর্শন কর। হৃদপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনই এই যজ্ঞের আহুতি ভাবো। দেখবে তোমার উপর থেকে কর্ম্মের আধিপত্য দূর হয়ে যাবে। কর্ম্মই তোমার অধিকারে আসবে, সে তোমারই অধীন হবে। “কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মাণি”॥‘ফলে’ তোমার অধিকার যেন কখনও না হয়, গাছেই যদি দখল না থাকে তবে ফলে কি করে থাকবে ? গাছকে প্রতিপালন কর মাত্র কিন্তু গাছকে দখল কোরো না তবে আর ফলের আশাই হবে না। প্রাণ কর্ম্মে কর্ম্মে ব্রহ্মযজ্ঞ দর্শন করুক। কিন্তু মনে সে কর্ম্ম কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সেটা দেখো না। জীবত্ব থেকে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত যত রকম অবস্থার মধ্যেই থাকো না কেন, কিসের ফলে কি হল এসব ভাববে না। সবই যজ্ঞ বলে ধারণা কর। কেননা আগেই বলেছিলাম যে ফলও কর্ম্মেরই ঘনীভূত অবস্থা বিশেষ। কর্ম্মে তোমার অধিকার হোক অর্থে, তোমার ক্ষেত্রবিহিত কর্ম্মে অধিকার লাভ কর। দেখো আবার আসক্তি যেন না আসে। মানে তার উচ্চ অবস্থার উপর অর্থাৎ ফলের উপর আশা বা আধিপত্য বিস্তার করতে যেও না। তা হলেই অকর্ম্ম হবে। তুমি সাধনার নিচের অধিকারে থেকে উচ্চতর অবস্থার কর্ম্ম অবলম্বন করতে পার না। কেননা সে কর্ম্মের ভার ধারণ ও বহন করতে পারবে না। একতলা থেকে হাত বাড়িয়ে দোতলার জিনিষ পাওয়া যায় না। দোতলার জিনিষ পেতে হলে আগে দোতলায় চড়তে হয়। “মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূঃ” আত্মোপলব্ধির তাড়নায় বা ভগবদ্ বেদনের তাড়নায় কাজ করা আর ঈশ্বর লাভের আশায়, ভগবদ্ বেদন লাভের আশায় বা যোগবিভূতি লাভের আশায় কাজ করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। খিদের জ্বালায় খেলে শরীররক্ষা ও পুষ্টিপোষণ হয়। কিন্তু মুখের লোভে, জিভের স্বাদে ভোগ করার জন্য খেলে রোগ হয়। জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ হলে সে বেদন নিজে থেকেই প্রাণে জেগে ওঠে। অবশ্য এ অবস্থা হঠাৎই হয় না। এর জন্য আগে তোমার উপস্থিত “কর্ম্মফলহেতুরূপ” অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে, তাই সবার আগে সে কথাই বলছি।

নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার বলতে বোঝায় প্রাণকর্ম্মে অধিকার। এটাই নিষ্কাম কর্ম্ম। আগে যে প্রাণশক্তির আয় ব্যয়ের কথা বলেছি সেই কাজেই তোমার অধিকার হোক। এখন ব্যয়ের উপর যেন অধিকার না থাকে, এখন উপার্জ্জনেই ব্যাপৃত হও। প্রাণকর্ম্মের উদ্দীপক অংশই তো শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে যদি সেই আত্মঅনুভূতি, মাতৃঅনুভূতি না পাওয়া যায়, তবে সেটা কর্ম্ম নয়, অকর্ম্ম। নাভিকুণ্ডে আছেন সূর্য্য-বহ্নি তেজ (তেজস্তত্ত্ব)। যদি প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুর তাড়নায় সেই কুণ্ড থেকে লক্ লক্ করে শিখা জ্বলে না ওঠে, যদি আলোকচ্ছটা স্বচ্ছন্দে বিচ্ছুরিত না হয়, তবে তা অকর্ম্ম। এটাই কর্ম্মের সাথে মনোময় ক্ষেত্রের সম্বন্ধ। মূল কথা ক্রিয়া করতে প্রথমে যে কষ্ট ও মনের চঞ্চলতা আসে বেশীক্ষণ মন দিয়ে ক্রিয়া করলেই সে চঞ্চলতা আর থাকে না। ক্রিয়া যখন পেয়েছই বাপু, তখন মন দিয়ে করে যাও। ক্রিয়া করলে কি হবে বা যারা করছে তাদের কার কি হল এসব অনধিকার চর্চা। গুরু দিয়েছেন যে সাধনা সেই সাধনাই করে যাও। তাতে কি হবে না হবে এসব ভাবলে তোমার পতন হবে, ফলে তুমি স্থিরতারূপ ব্রহ্মানন্দলাভে বঞ্চিত হবে। অতএব কর্ম্মফল যাতে উৎপন্ন হয়, তা কোরো না। অর্থাৎ মনের দিকে খুব ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। না রাখলেই সহস্র চিন্তা, কামনা-আশা এসব এসে অন্যমনস্ক করে দেবে ॥ ২/৪৭

> যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
> সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ।। ৪৮

অনুবাদ : হে ধনঞ্জয়, ইন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগে (আমি আমার ইত্যাকার বোধ রহিত অবস্থায়) অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর। (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২/৪৮

ব্যাখ্যা : গীতার প্রথম শ্লোক থেকে শুরু করে এই প্রথম শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে “ধনঞ্জয়” বলে সম্বোধন করছেন। মহাভারতে অর্জুন বিরাটপুত্র উত্তরকে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, “আমি সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধনমাত্র গ্রহণ করিয়া অবস্থান করি তাই আমার নাম ধনঞ্জয়”। এই ধনমাত্র গ্রহণ করার গুণ লক্ষ্য করেই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে “ধনঞ্জয়” সম্বোধন করে বলেছেন সমস্ত কর্ম্মে তোমার

অধিকার প্রসারিত হলেও তুমি যে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফল গ্রহণ না করে তার সারবস্তু বা শ্রেষ্ঠ ধনরূপ ভগবদ্ অনুভূতিটুকুই গ্রহণ কর। সমস্ত কর্ম্মের অভ্যন্তরে শুধুমাত্র আমাতে যুক্ত হওয়া রূপ ফলটিরই সঙ্গ কর। আর কোনও কিছুরই সঙ্গে থেকো না। সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কোনও অনুরাগ বা বিরক্তি না এনে সমভাবাপন্ন থাক। এই যে সমাবস্থা এরই নাম সমত্ব, এটাই যোগ। সুতরাং এই ভাবে যোগস্থ হয়ে, বেদনযুক্ত হয়ে সব কর্ম্ম কর, আত্মায় যুক্ত হয়ে থাকার নামই যোগস্থ হওয়া। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমদর্শন তারই বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। এটা ভগবদ বেদনের লক্ষণ। স্বাধীন আনন্দরূপ প্রাণের এক অফুরন্ত উদ্বেলন, যে অবস্থায় কোনও দিকেই লক্ষ্য থাকে না, কোনও বিষয় বা ভাববিশেষে দৃষ্টি সীমিত থাকে না। ভগবান সন্তুষ্ট হলেন কি অসন্তুষ্ট হলেন সে সবের কোনও অবকাশ থাকে না বা লক্ষ্যও থাকে না। ভগবান প্রীত হবেন বলে কার্য্য করছি এটা মোটেই যোগস্থ হওয়ার ভাব নয়। ফলাকাঙ্খার সাথে কর্ম্ম করা ধান্ধাবাজি মাত্র। শিশু মনের আনন্দে মায়ের কোলে নাচানাচি করে থাকে তাতে মায়ের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, মা বিরক্ত হচ্ছে কি না, এসব ভাবে কি ? এও সেরকম। সাধকের ইন্দ্রিয়ের কাজ সব হারিয়ে যায়; সমস্ত শক্তি চারিদিক থেকে এসে কেন্দ্রীভূত আনন্দের উদ্বেলনে পূর্ণ হয়ে যায়। সবরকম ভাল মন্দ বোধও হারিয়ে যায়। "কু", "সু" বলে সবকিছুর অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। রামায়ণের লঙ্কা কাণ্ডে দেখি অসময়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গান হল রামচন্দ্রের নিধনের জন্য। ঘুম ভেঙ্গে গেলে কুম্ভকর্ণ তাকে এমন অসময় জাগানোর কারণ বৃত্তান্ত সব শুনে রাবণকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন যে এতই যদি সীতাকে ভোগ করার ইচ্ছা হয়েছিল তবে ভিখারী সন্ন্যাসী না সেজে রামচন্দ্র সেজে সীতার কাছে গেলেই তো সহজে নিজের উদ্দেশ্য মেটাতে পারতে, সীতাহরণ করে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার দরকার ছিল না। তার উত্তরে রাবণ একটা বড় সত্যি কথা প্রকাশ করেছিলেন, বলেছিলেন যে সেটা কি আর ভাবিনি ? কিন্তু মুশকিল হল যে মায়াবলে কোনও মুর্ত্তি ধারণ করতে হলে সেই মুর্ত্তির ভাব ও ধ্যান চিন্তনের সাহায্যে তবেই সেই মুর্ত্তিতে প্রকাশিত হতে পারি। আর রাম নামের এমনই মহিমা যে রামের চিন্তা করলেই, স্মরণ মাত্রেই তো আমার সীতা সম্ভোগের কু মতলব কোথায় পালিয়ে যেত। তাই সেই জন্যই আমি রামের মুর্ত্তি ধারণ করিনি। তবেই বোঝ, "যাঁহা রাম উহাঁ কাম নঁহী, যাঁহা কাম উঁহা রাম নঁহী।" সে জন্যই অমন ভিখারী সাজতে হয়েছিল। নিজের ভাবকে ও নিজেকে অতখানি নিম্ন গতিতে বা অধঃপতনে ফেলতে হয়েছিল যার ফল সবংশে নির্ব্বংশ হওয়া। বাস্তব অভিনয় ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে অভিনেতা যে ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি সেই সময় যতখানি সেই ভাবে আবিষ্ট থাকতে পারেন তার অভিনয়ও ততখানি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। তাই কথায় বলে "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।" রাবণের মায়াবী মুর্ত্তি ধারণও অনেকটা তাই।

এ তো গেল সাধকহৃদয়ে ভাবাবেশের ভূমিকা। এখন প্রশ্ন যোগস্থ কিভাবে হতে হয় ? আগেই বলেছি আত্মায় (ভগবানে) যুক্ত হয়ে থাকার নাম যোগস্থ হওয়া। যোগস্থ হতে হলে সত্ত্বস্থ হতে হয়। গুরুপ্রদত্ত কর্ম্ম করে সত্ত্বস্থ হতে হয়। মায়ের / আত্মার অস্তিত্ব সর্বত্র সর্ব্বক্ষণ পরিদর্শন করে সত্ত্বগুণের উদ্বোধন করতে হয়, ভিতরে জাগিয়ে নিতে হয়। তবেই কর্ম্মে অধিকার জন্মে, অর্থাৎ ভগবৎ বেদন কর্ম্মে স্ফূরিত হয়, তখনই সেটা অকর্ম্ম না হয়ে কর্ম্মে পরিণত হয়। গুরুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মও ঠিক এই ভাবের সাথে করবে, ফলের বিষয়ে মোটেই লক্ষ্য না করে পূর্ণ সার্থকতার ভাবে বিভোর হয়ে করতে থাকবে। করতে করতে দেখবে এক অব্যক্ত সাম্যাবস্থায় পৌঁছে গেছ। যেখানে সব ভাবের ঢেউ তরঙ্গ মিশে এক নিস্তরঙ্গ স্থির অবস্থা। ওটাই চিদাকাশের সমতল ক্ষেত্র, সমানাবস্থা। এটা এক বারে হবেনা। বার বার অভ্যাস কর। ফল চাইলেই হতাশা আসবে। কোনও আশা না থাকলে প্রত্যাশা বা হতাশা কোনওটাই থাকবে না। এটাই সত্ত্বস্থ হওয়া। এটাই ক্রমশঃ তোমায় সমত্বে পৌঁছে দেবে। প্রাণের স্থিরতা দ্বারাই ঈশ্বরপ্রণিধান রূপ যোগসিদ্ধি লাভ হয়। এমন একটা স্থিরভাব আসে যাতে সকল কর্ম্মের সাথে মনের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিরতা যত হবে ততই ব্রহ্মাকাশে চিত্ত বিলীন হয়ে যাবে। এই সাম্যাবস্থা অব্যক্ত কেননা যার এ অবস্থা হয়েছে তিনি এটা বলতে পারেন না। বলতে গেলে সে অবস্থা থেকে নেমে আসতে হয়, আর নেমে আসলে আর সেটা ঠিক বলা যায় না ॥ ২/৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ।। ৪৯

অনুবাদ: হে ধনঞ্জয়, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট। অতএব, তুমি (কর্ম্মযোগের দ্বারা) সেই জ্ঞান আশ্রয় কর। ফলকামী মানবেরা কৃপণ অর্থাৎ হেয় ॥ ২/৪৯

ব্যাখ্যা : আগেও যা বলা হল এখানেও তাই। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। কোনও কিছুর উদ্দেশ্যে বা লাভের জন্য কর্ম্ম সকাম আর যে কর্ম্ম স্বতঃ অনুষ্ঠিত হয় সেটাই নিষ্কাম। খাঁচার মধ্যে পাখীর ওড়ার চেষ্টায় ডানা ঝঁপটানি আর বিশাল আকাশের মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ওড়ার ভিতরে যেমন প্রভেদ তেমনই। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুধরণের শক্তি এ ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়াশীল। এক এক ধরণের কর্ম্মে এক এক রকম শক্তির ক্রিয়ায় আমাদের গতি নির্দিষ্ট হয়। যোগে যোগ, বিয়োগে বিয়োগ। যোগফল সম্প্রকর্ষণ ও বিয়োগফল বিপ্রকর্ষণ। এক শক্তি আমাদের আত্মার সাথে অর্থাৎ মায়ের কোলে যুক্ত রাখে। আর এক শক্তি সেদিক থেকে তাড়িয়ে ভোগের দিকে আমাদের গতি নির্দ্দিষ্ট করে। যতক্ষণ এই ভোগের দিকে লক্ষ্য থাকে ততক্ষণ আমাদের মন, প্রাণ, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়।

সবদিক থেকে মন, প্রাণকে সঙ্কুচিত করে এনে ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমিত হয়ে পড়ি, শুধু ঐ নির্দিষ্ট ভোগ বা ফলাকাঙ্খার প্রতি, যেমন খুব ছোট কোনও পদার্থকে দেখতে হলে চোখকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করে, তবে দেখতে হয়। তেমনই ভোগ্য ফলের দিকে তাকালেও আমাদের প্রাণের গতি, প্রাণের চক্ষুও ঐ রকম সঙ্কুচিত হয়। আবার আকাশ, প্রান্তর বা সমুদ্র ইত্যাদি দেখার সময় আমরা দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে দেখি। চক্ষুও প্রসারিত হয়ে থাকে। সেই রকম ঈশ্বরভাব প্রাণে এলে প্রাণ প্রসারিত হয়, বিস্তৃত হয়। প্রাণে শক্তি স্ফুরিত হয়ে ওঠে, হৃদয়েরও বিকাশ ঘটে। লক্ষ্য যত ক্ষুদ্র হয়, ফল তত নিকৃষ্ট হয়, শক্তিও তত ক্ষুদ্রত্ব পায়। যখন চিন্তা ক্ষুদ্র, নিকৃষ্ট, সীমাবদ্ধ, তখন প্রাণশক্তিও সঙ্কুচিত হতে হতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও স্ফূরণবিহীন হয়ে পড়ে। একইভাবে আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রতিটি পরমাণুও সঙ্কুচিত ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাদের ভিতরে আর প্রাণের প্রবাহ থাকেনা। দেহত্রয়রূপ নদী এভাবেই স্রোত হারায়, প্রবাহশূন্য, জ্যোতিহীন হয়ে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এটাই তমত্ব বা তমোগুণ। এজন্যই ফলাকাঙ্খা নিকৃষ্ট। এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিন্তা দেহত্রয়কে ফলের আকাঙ্খার বশীভূত করে, আবদ্ধ করে, জড়ত্ব এনে দেয়। আসলে এরই নাম বন্ধন। ভগবৎচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার সময় পরমাণুগুলো এই বন্ধনরূপ ক্ষুদ্রত্ব পেয়ে থাকে। ভগবৎ চিন্তায় ও ভগবদ ভাবে ত্রিদেহের পরমাণুসকল অনন্তদিকে স্ফুরিত ও কার্য্যশীল হয় ফলে এদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। অনন্তে বায়ুর যেমন বিস্তার, আকাশের যেমন বিস্তার, পরমাণুসকলেরও তেমনই বন্ধন থেকে মুক্তাবস্থার দিকে গতি ব্যাপক। ঈশ্বর চিন্তায় থাকা লোকেদের দেহ নীরোগ থাকার এটাও একটা কারণ। আসলে চিন্তার উদারতা ও ভাবের বিস্তার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের পরমাণুগুলোকে (active) কার্য্যকরী হওয়ার মত প্রসারিত স্থান, অবসর ও সুবিধা করে দেয়, ফলে পরমাণুগুলোও অতটা কঠিন না থেকে কিছুটা তরল থাকে ফলে এদের বন্ধনও (bonding) বেশ ঢিলা (শ্লথ/ loose) থাকায় অল্প চেষ্টাতেই খুলে ফেলা (মোচন করা) যায়। কারণ ভগবদ্ ভাবে জড়তা ও নিস্তরঙ্গতা মোটেই থাকতে পারে না। এজন্যই শ্রীভগবান সাধারণ কর্ম্মগুলোকে "অবর" বা নিকৃষ্ট বলেছেন। যদি সাধনা করতে গিয়ে ফলের কথা ভাব তবে তোমারও দেহত্রয় ঐ রকম সঙ্কুচিত হবে, প্রাণশক্তি সহজে পরমাণুতে যাবে না, বিপ্রকর্ষণ শক্তির বশীভূত হয়ে অকর্ম্মণ্য ও জড়বুদ্ধি হবে, স্ফুরণশক্তি যাকে 'বন্ধন' বলে সেই অবস্থায় পড়বে। এজন্যই ফলহেতু কর্ম্ম দীনতার পরিচায়ক 'অবর' নিকৃষ্ট।

প্রশ্ন উঠতে পারে পরমাণুসকল ক্ষুদ্রত্ব পেলে তো বরং আকর্ষণ শক্তি আরও দ্রুত আকৃষ্ট করবে। কিন্তু তা নয়, বিরাটের আকর্ষণ ক্ষুদ্র বস্তুর উপর কখনও কার্য্যকরী হয়না। পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণে থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর উপরের ধূলিকণা সকল পৃথিবীর উপরেই পড়ে থাকে। আকৃষ্ট হয়ে সূর্য্যে গিয়ে যুক্ত হয় না। সূর্য্যের বিরাট শক্তি ক্ষুদ্র ধূলিকণার উপর কার্য্যকরী হয়না বরং পৃথিবীর নিজের মাধ্যাকর্ষণ ধূলিকণার উপর কিছুটা কার্য্যকরী হয় মাত্র। যাই হোক কর্ম্মমাত্রই যতক্ষণ ভগবৎ অনুভূতির তাড়নায় না করা হয়, ততক্ষণ সে সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম যাই হোক, আমাদের সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ করে। সে বন্ধনের তারতম্য যাই হোক, বন্ধন কিন্তু বন্ধনই। বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্যান্য শাস্ত্রসকল যখন এতঙ্কু' ঙ্কসু' এর বিচার করছেন, গীতা তখন এই্কু' আরঙ্কসু' এর পার্থক্য মুছে ফেলতে বলছেন। এ পার্থক্য মোছার একমাত্র উপায় হল ভগবদ বেদন লাভ। আরও একটা বিকল্প আছে সেটা হল্কু' কেঙ্কসু' করে নেওয়া। সকলেই বলবেন ও দুটোই ভীষণ কঠিন কাজ। ওসব আমাদের সংসারী লোকের কাজ নয়, সন্ন্যাসী হতে হয় ইত্যাদি। মঠ মিশন এর অনেক সন্ন্যাসী মহারাজই ভগবদবেদনকে মানুষের নাগালের বাইরের জিনিষ বলে বুঝিয়ে থাকেন। বলে থাকেন আগে রীতিমত বৈরাগ্যলাভ করে, সন্ন্যাস নিয়ে, ইন্দ্রিয় জয় করে, হৃদয়কে মার্জিত না করলে হয়না, উপমা দিয়ে বলেন ক্ষেত্র তৈরী না হলে হয় না, এই সমস্ত কত কথা। এসমস্তই মঠ মিশনের ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের ব্যবসার কথা। শ্রীভগবান কোথাও অর্জুনকে গেরুয়া পরিয়ে, মস্তক মুন্ডন, বা জটা ধারণ করান নি, বরং রীতিমত সংসারের মধ্যে, রাজত্বের মধ্যেই রেখেছেন। কিন্তু যাক যা বলছিলাম। আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই তৈরী করি, আমাদেরঙ্কু' এর দুর্ব্বলতাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করি। অহর্নিশঙ্কসু' এর ছদ্মবেশ ধারণ করি। নিজেকে সবিশেষ সংযত রেখে শুধু বাছা বাছা সদ্ভাবগুলোকেই প্রকাশ করি মাত্র। এসবই সর্বক্ষঙ্কসু' সাজার চেষ্টা মাত্র। শিশু যেমন ধুলো কাদা মেখেই মায়ের কাছে ছুটে যায় তেমনই সাধনা শুরু করলেই ক্ষেত্র তৈরী হয়। সাধনারূপ কর্ম্মই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করে। ভগবানই বীজ, তাঁর শরণই কর্ষণ। ক্ষেত্র তৈরীর জন্যে বসে থাকলে সারা জীবনেও তৈরী হবে না, বীজ বোনাও হবে না। তবে কি শাস্ত্রীয় অনুশীলনের দরকার নেই ? নিশ্চয়ই আছে। বিদ্যার্থীর বই পত্রের মতই আধ্যাত্ম সাধকেরও শাস্ত্রের প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু বিদ্যার্থীর যদি সংস্কারজনিত বিদ্যা অর্জনে আগ্রহ না থাকে তবে রাশীকৃত বই পুস্তকের মধ্যিখানে বসে থাকলেই বিদ্যালাভ হয় না। যোগের ব্যাপারও তাই। মন কেন্দ্রীভূত হতে থাকলে স্থূল দেহে সে সব পরিবর্ত্তন আপনা থেকেই হতে থাকে। যাক্, আমরা আসল কথা থেকে সরে এসেছি। বলছিলাম আমাদেরঙ্কু' জিনিষগুলোকে, দুর্ব্বলতাগুলোকে আড়াল করেঙ্কসু' ভাব গুলোকে অযথা বাড়িয়ে দেখাই। এমনকি ছোট ছোট সু জিনিষ গুলোকে, যেগুলো আপাত অগ্রাহ্য, সে গুলোকেও অভিব্যক্তি ও গুণকীর্তনের দ্বারা বৃহৎ রূপে প্রতিপন্ন করি। মানুষ দিন দিন অসভ্য হচ্ছে বলেই এই দুই ভাবও প্রবলতর হচ্ছে। জামা কাপড়, পোষাক পরিচ্ছদের সাহায্যে আমরা সভ্য সাজি। আসলে তার ভিতরেও সমস্ত পুঞ্জীভূত দুর্ব্বলতাকে আচ্ছদিত রাখি। তাই নতুন নতুন ডিজাইনের পোষাক পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তিত হতে দেখি। অন্তরকে আবৃত করার জন্য যতই "ভদ্রোচিত ব্যবহার" নামক কথাটার প্রচলন শুনতে পাই ততই অভদ্রতার পরিচয় দেখতে পাই। ছোট ছোট ভাল গুলোর অর্থাৎঙ্কসু' গুলোর যত গুরুত্ব ও সম্মান দেখতে পাই, ততই জগৎঙ্কু' মুখে বা

খারাপ দিকে যাচ্ছে এটাই বুঝতে পারি। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া, রোগীকে ওষুধ দেওয়া, বিপন্নকে সাহায্য করা এসমস্ত যা কিছু ছিল মানুষের ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য সেগুলোই আজকাল বিরাট একটা রাজসূয় যজ্ঞের খ্যাতি ছড়িয়ে দেয়। ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতির কি ভীষণ সামাজিক প্রভাব ! চরিত্রবান হওয়া যেন কি ভীষণ ব্যাতিক্রমী কীর্তি! যত আমরা অসভ্য বা আধ্যত্মিকভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি ততই পোষাকের জাঁকজমক, ব্যবহার কৃত্রিম, হৃদয়হীন, মৌখিক বাক্য বিনিময় মাত্রে পরিণত হচ্ছে। এতটা ত্রুটি ও দুর্বলতার লজ্জা দামী পোষাকে আবৃত করে সেখানে গেলে হবেনা। কতকগুলো বিশেষ বিশেষ ভাব দিয়ে হৃদয়হীনতার ত্রুটি, দুর্বলতা ইত্যাদি আড়াল করলে সেগুলো থেকেই যাবে, মোটেই দুর হবে না।

মহাভারতে গান্ধারী দুর্যোধনের মৃত্যু রোধ করার ব্রত করেছিলেন। ব্রতের ফলে গান্ধারীর দৃষ্টি যার যার উপর পড়বে সে সঙ্কটকালে লৌহময় হয়ে উঠবে। কিন্তু দুর্যোধন মায়ের সামনে উলঙ্গ না হয়ে কটি ও উরুদেশ ঢেকে গিয়েছিল। ঐ অংশে গান্ধারীর দৃষ্টি পড়ে নি। অথচ দ্রৌপদীকে সভাস্থলে উরু দেখাতে তার দ্বিধা হয়নি। দুর্য্যোধনের নিধনের বীজ সেদিনই উপ্ত হয়েছিল। এজন্যই প্রাক্‌দীক্ষা স্বীকারোক্তি পর্ব্ব আছে। গুরুর সামনে সমস্ত লজ্জা, ত্রুটি, দুর্ব্বলতা সব মুক্ত করতে হয়। আধুনিক গুরুগণ শিষ্যের সামাজিক মর্য্যাদা ও নানাবিধ বিবেচনায় তাকে নিজে না শুনে, নিজের কানে নিজে শোনে, এভাবে, আড়ালে, নির্জনস্থানে, ঐ কর্ম্ম করতে বলে। যার ফলে আমাদের ঐ ভাব, ঐ দুর্বল অংশ, দুর্বলই থেকে যায়। মায়ের চোখের সামনে ল্যাংটা শিশুর মত ঘুরতে হয়। নইলে এ জগৎ ছলনার মন্দিরে পরিণত হবে। এই ধাঁধা দ্বাপর যুগের শেষ থেকেই সূচনা হয়েছিল, খুব মৃদু মাত্রায় যা অণুবীক্ষণে আসত না, আজ কলির শেষে এসে মহীরুহ হয়েছে। যা হোক আমরা তো মুখে মুখে ভোগকে দূর করে দিতে চাই সত্যিই কিন্তু আসলে কেউই পারিনা। প্রকৃতপক্ষে আমরা ভোগের দিকেই ছুটি। সাধারণ মানুষ সাধারণ অর্থকরী ইত্যাদি পার্থিব ভোগের জন্য লালায়িত, যোগীরা এক অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি বা শান্তি লাভের জন্য লালায়িত আবার ভগবৎ পিয়াসী ভগবৎ ভোগের জন্য তৃষ্ণার্ত। সুতরাং ভোগের গর্ভে কোনও প্রবঞ্চনা লুকানো নেই। ভোগ ভোগই, ভোগেই যথার্থ আনন্দ, আমরা যখন যেমন ভোগশক্তি নিয়ে এসেছি, তখন সেই রকম ইন্দ্রিয় দিয়ে সে ভাবেই ভোগ করেছি। তাহলে তারতম্য শুধু আমার শক্তির, ভোগে আমার অধিকারের। আর এই আধিকার নিয়েই যত গোলমাল। কারণ যতটা ভোগে আমাদের অধিকার, আমরা সবসময়েই তার চেয়ে উচ্চতর অধিকারীর ভোগ পেতে অস্থির হয়ে উঠি। আমার শক্তির উপযুক্ত ভোগে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারি না। যা কিছু দেখি তাতে আমার অধিকার থাক বা না থাক, তার জন্য লালায়িত হই। আমরা ভোগ অপেক্ষাও ভোগে অধিকার পাওয়াটাই বেশী জরুরী মনে করি। নিজের চারিদিকে দেখ টাকা পয়সা ভোগ করা অপেক্ষা সঞ্চয় করতেই বেশী ব্যস্ত। অর্জিত বা অধিগত বিদ্যা বা জ্ঞানকে কাজে পরিণত করার চাইতে বেশী বেশী ডিগ্রী দখল করতে ব্যস্ত। ফলে কর্ম্মের লক্ষ্য অধিকার বর্হিভূত ভোগ বা গৌণ ফলের দিকে যায়। ভোগকে নীরস করে দেয় এবং ভোগশূণ্য কৃপণ কর্ম্মমাত্রে (কৃপণাঃ ফলহেতবঃ) পরিণত হয়। জগতে ভোগার্থী সবাই, অথচ ভোগী কেউ নেই, সকলেই সঞ্চয়ী। তাই তো এখন আর ভোগে তৃপ্তি নেই, শুধুই অতৃপ্তি, তৃষ্ণার তৃপ্তি নেই, শুধু হু হু করে বেড়ে যায়। ভোগে অমৃতের বদলে শুধুই বিষ পাই। তাই শ্রীভগবান বললেন ফলহেতু কর্ম্মসকল কৃপণ, ভোগ দেয় না, সঞ্চয় মাত্র হয়, ওসব নিকৃষ্ট, অবর। কারণ কর্ম্মফল ভোগহেতু আবার জন্মমৃত্যুর চক্রে প্রবেশ করতে হয়। তাই বলছি যেমনটা ভোগক্ষেত্র পেয়েছ, তাতেই তৃপ্তিলাভ কর। কৃপণ হয়ে, সঞ্চয়ী হয়ে, জীবনকে ব্যর্থ করো না। “ফলহেতু” কর্ম্মী না হয়ে তৃপ্তিদায়িনী মায়ের চরণে আত্মনিবেদন কর। এই প্রাণ দেওয়া কাজটা ক্রিয়ার দ্বারাই হবে। আত্মায় বিশ্বাস রেখে আত্মবিশ্বাসী হও। প্রণব ধনুতে বাণ যোজনা করে সেই আত্মাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়ার অভ্যাস করে যাও একদিন ঠিক “শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ” হয়ে লক্ষ্যভেদ হবে। অর্থাৎ মন আত্মাকে লক্ষ্য করতে করতে একদিন তার মধ্যে প্রবেশ করে তাতেই লয় পেয়ে যাবে। এটাই লয়যোগ। ২/৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুস্কৃতে ।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ।। ৫০

অনুবাদ : বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুকৃত দুস্কৃত (পূণ্য পাপ) উভয়ই ত্যাগ করেন। অতএব তুমি (বুদ্ধির অনুকূল) কর্ম্মযোগে নিযুক্ত হও। সুকৌশল কর্ম্মই যোগ। ২/৫০

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছিলাম অন্যান্য শাস্ত্রসকল যখন কর্ম্মের ‘কু’ এবং ‘সু’ এর বিচার করছেন; গীতা তখন এই ‘কু’ আর ‘সু’ এর পার্থক্য মুছে ফেলতে বলছেন। বলেছিলাম এ পার্থক্য মোছার একমাত্র উপায় হল ভগবদবেদন লাভ। আর একটা বিকল্প উপায় হিসাবে ‘কু’ কে ‘সু’ করে নেবার উপায় বলেছিলাম। জল পান করে জীবন বাঁচে, তেষ্টা মেটে, আবার ইচ্ছা করলে জলে ডুবে মরাও যায়। একই অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করাও যায় আবার আত্মঘাতীও হওয়া যায়। সবটাই প্রয়োগকৌশল মাত্র। সেজন্যই ভগবান বললেন যোগ আর কিছুই নয় শুধুই কর্ম্মের প্রয়োগকৌশল মাত্র। বুদ্ধির দ্বারা ভগবানে যুক্ত হয়ে কর্ম্ম করলে এই ‘সু’ এবং ‘কু’ অর্থাৎ ভাল মন্দ, পাপ পূণ্য, সবই দূর হয়ে যায়। সব কিছুর উপরে থাকা যায় “গোপ্যঃ কামাৎ, ভয়াৎ কংসঃ, দ্বেষাৎ চেদ্যাদয়ো নৃপাঃ”। কামবৃত্তি ভগবানে অর্পণ করে গোপীগণ, ভয়ের দ্বারা কংস, দ্বেষের দ্বারা চেদিরাজ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন। তবেই বোঝ এই যে কাম, ভয়, দ্বেষ এ সবই তো দুষ্প্রবৃত্তি মাত্র অর্থাৎ ‘কু’। এসব বৃত্তি তো সকলেরই পরিত্যাগ করার চেষ্টা করাই উচিত, তবে আবার এসব দুষ্কর্ম্মের দ্বারা জীবের উদ্ধার হয়

কিভাবে ? তাহলে দেখা যাচ্ছে যেসব মানসিক বৃত্তি আমরা সাধারণ ভাবে ‘কু’ বলে জানি, সেগুলোই যদি সুকৌশলে প্রয়োগ করা যায় তবে সেগুলোতেই আমার সদগতি হতে পারে। আসলে কোন বুদ্ধিতে বা কি রকম বুদ্ধির দ্বারা সে কাজটা করা হয়েছে অর্থাৎ motive টা/ উদ্দ্যেশ্যটা কি, তারই উপর ফলাফল নির্ভর করে। সুকৌশলে প্রয়োগ অর্থে ভগবানে লক্ষ্য করে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা এটা বুদ্ধিযোগের একটা প্রধান লক্ষণ। অনেককেই বলতে শুনি কি করি ? কি ভাবে, কোন উপায়ে ভগবদ্ যুক্ত হতে পারি ? এসব চিন্তা করতে করতেই তাদের জীবন কেটে যায়। কর্ম্মের স্রোতে ভেসে চলেছে অথচ কর্ম্ম খুঁজে পায় না। কাকাবাবু চারবারে চারটে বিয়ে করলেন। ছেলেপুলেও অনেকগুলো হল অথচ তিনি ভগবানের উদ্দ্যেশ্যে কি কাজ করবেন ভেবে উঠতে পারেন নি। এসব মাছের জল পিপাসার মতই অলীক। প্রচণ্ড খিদের মুখে ভাত, রুটি, ডাল, সেদ্ধ, পোড়া যা পাই সেটাই খুব সুস্বাদু লাগে। পেট যত ভরে আসে, মানে ক্ষিদে যত কমে আসে, মুখের স্বাদও ততটাই কমে আসে। ঠিক তেমনই তাঁকে পাবার আকুলতা যতক্ষণ খুব প্রবল থাকে ততক্ষণ সকল কর্ম্মেই তৃপ্তি আসে, আকুলতা কমে গেলেই আর ভাল লাগেনা। তখন অন্য রকম কাজকর্ম্মের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তোমার নিজের ক্ষেত্রেও যা স্বাভাবিক কাজ তাইই কর, সেই সঙ্গে ইষ্টগুরু বা সদগুরু যদি কোনও পন্থা দেখিয়ে থাকেন সেসব কাজ খুবই আকুলতার সঙ্গে করে চল। তাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কোনও বিশেষ কাজ পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না কিন্তু কর্ম্মসকলকে বুদ্ধিদ্বারা ভগবানে যুক্ত করার জন্য আগে ব্যস্ত হও। তুমি সুকৃতি দুষ্কৃতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। কি ভাবে ? এর আগে প্রাণশক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছি। এখন আর একটু বলছি। ধর একটা জিনিসের দিকে যতক্ষণ তাকিয়ে আছি ততক্ষণ আমার সমস্ত প্রাণশক্তি ঐ দিকে ছোটে। এখন আমার প্রাণশক্তির উপর কর্তৃত্ব নেই বলে আমি সঠিকভাবে আমার প্রাণশক্তিকে পরিচালিত করতে পারিনা বটে কিন্তু কিছুটা হয়। জিনিসটা ছোট হলে সঙ্কুচিত হয় আর আকাশের মত বড় হলে প্রাণশক্তি প্রসারিত হয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে ভগবৎ চিন্তায়। এতে একেবারে দেহের প্রতি পরমাণুর প্রাণশক্তি স্ফূরিত হতে থাকে। অনন্তে বিস্তৃত হয়ে পড়া আর স্থির হয়ে যাওয়া একই কথা। তখন আর কোনও বিশেষ দিকে প্রাণশক্তি ছোটাছুটি করেনা। ছোটবার অবসরও থাকে না। কারণ অনন্ত মানে সবদিক ব্যাপী যে বিশাল বিস্তৃতি তার ব্যাপ্তিহীন মূলদেশ অর্থাৎ আত্মা। অতএব এইভাবে প্রাণের স্থিতি হলে পরে আর সঙ্কোচন প্রসারণ কোনও কিছুই হয় না। এটাই ‘কু’ এবং ‘সু’ এর বর্হিভূত হওয়া। মনকে আত্মাতে লাগাবার কৌশলটির নামই যোগ। এই মন ইন্দ্রিয়েরা যে কাজ করে তা সেই প্রাণের জোরে। সেই প্রাণের সাধনা করে শ্বাস যখন বুকে স্থির হয়ে যায় এবং চোখের দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ হয় সে অতি সুকৌশলের কাজ। যাঁরা করেন তাঁরাই অতি চতুর ব্যক্তি। সারাদিনে ২১৬০০ বার যে কর্ম্ম করি তার সবই লক্ষ্যহীন বা নিম্নলক্ষ্য, কিন্তু বুদ্ধিযুক্ত হয়ে অর্থাৎ পরমাত্ম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করতে পারলেই প্রাণের এই স্থিরতাকে পাওয়া যায়। ২/৫০

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবির্নিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্তনাময়ম্ ।। ৫১

অনুবাদ : বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই কর্ম্মজ ফলত্যাগ করিয়া, জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ (আমি আমার ইত্যাকার অভিমানশূন্য অবস্থা) প্রাপ্ত হন ॥ ২/৫১

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে কি ভাবে বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের দ্বারা সব রকম ‘সু’ ‘কু’ এর উর্দ্ধে ওঠা যায় অর্থাৎ সুকৃতি দুস্কৃতির বাইরে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে কর্ম্মের অতীত হওয়া সে কি শুধুই এ জন্মের মত ? তবে কি আবার জন্মাতে হবে ? তাহলে আগের যে সমস্ত জমানো রাশিকৃত সংস্কার সকল রয়ে গেছে সেগুলোকে দূর করার উপায়ই বা কি ? এখন থেকে বুদ্ধিযুক্ত হয়ে থাকলে ও কর্ম্মসকল সেভাবে সম্পাদন করলে নতুন করে আর সংস্কার জমলো না বা বন্ধনে আবদ্ধ হল না, কিন্তু তার আগের সংস্কারগুলো যাবে কোথায় ? সে সবই এই শ্লোকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

বুদ্ধিযুক্ত হয়ে বিধিপূর্ব্বক সুকৌশলে প্রাণক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলে ভববন্ধন মোচন হবে, জন্মবন্ধন ঘুচে যাবে ‘কু’‘সু’ নির্বিশেষে কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করে পুর্নজন্মের ঘোর থেকে মুক্ত হবে। শাস্ত্রের উপমা দিয়ে বলি যেমন বিশখানা পাতা একসাথে ধরে সূচ বেঁধালে একসাথে সব পাতাই বিঁধে যায় একটা একটা করে আলাদা ভাবে বিঁধলে যেমন হত ঠিক তেমনই। প্রাণকর্ম্মে প্রাণে ভগবদবেদন সৃষ্টি করে সেই আবেগযুক্ত প্রাণ অসম্ভব গতিশক্তি সম্পন্ন হয়ে জন্ম হওয়ার উপদ্রব বা সেই মহাভারতে বর্ণিত কুয়াশাস্তর ভেদ করে এসব উপদ্রবরহিত নির্ম্মল অনাময় পদে প্রতিষ্ঠিত হবে। মাতৃ আবেগে প্রাণ পূর্ণ হলে অর্থাৎ আত্মায় যুক্ত হলে সেই আবেগপূর্ণ প্রাণের গতি অসম্ভব মাত্রায় বেড়ে যায়। সংস্কার ক্ষেত্রে জন্ম ও কর্ম্মশৃঙ্খলা এমনই systematic ভাবে সাজান থাকে আর আমাদের নিশ্চিতভাবেই সেগুলোর ভেতর দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু সেগুলোকে যদি একত্র করে বেগে ভেদ করে যাওয়া যায় তবে আর সে কর্ম্মগুলো ভোগ হয় না। Superfast express train এর মত কোনও স্টেশনে না থেমে স্পিডে সব স্টেশন ছাড়িয়ে চলে যায়। এভাবেই এজন্মেই ঘটনারাশির মধ্যে দিয়ে ভেদ করে যাওয়া যায়। একান্তই যদি শেষ না হয় তো বড় জোর আর দু এক জন্ম লাগতে পারে, এ পর্য্যন্ত। অনেক উচ্চ কোটির সাধককেও বিভিন্ন উপদ্রবের দ্বারা পর্য্যুদস্ত হতে হয় কারণ হল ঐ এক

জন্মের ভোগক্ষেত্রের মধ্যে পরের জন্মের ভোগগুলোর এসে পড়া। অনেক বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষও টাকার কুমীর হয়ে বসে থাকে। অনেক সিদ্ধপুরুষও স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে এক একটা জন্ম পার হয়ে যান। এক গুপ্ত স্থানে অবতাররূপে মহাপুরুষ তাঁর প্রিয় শিষ্য সহ থাকতেন। দুপুরের খাওয়ার পর কিছু শিষ্য গুরুসেবা শেষ করে নিকটেই ঘুমোচ্ছিলেন। এক শিষ্য হঠাৎই ঘুমের ভিতর ভীষণ বীভৎস স্বপ্ন দেখে কাঁপতে লাগল আর খুব ঘামতে লাগল। “গুরু রক্ষা কর, গুরু রক্ষা কর” বলে চেঁচাতে লাগল। তার এক গুরুভাই তাকে জাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলে গুরুদেব তাকে নিষেধ করলেন। সেও নিরস্ত হল। ঘুমন্ত অবস্থায় শিষ্য আর্তনাদ করেই চলল। তারপর একসময় ঘুম থেকে উঠে দেখল গুরুদেব হাসছেন, তার গুরুভাইও হাসছিল। সে বেচারা গুরুভাই এর কাছে জল চাইল, আর বলল আমি মরতে বসেছিলাম আর তুমি কিনা হাসছ। আমাকে একটু জাগিয়ে দিলেনা কেন ? তখন গুরু বললেন “তোমার একটা জন্ম আধঘন্টার মধ্যেই বয়ে গেল। তুমি কত ভাগ্যবান।” এভাবে সুরথ রাজার কয়েক লক্ষ জন্ম পার হবার উদাহরণ তো আছেই ৷৷ ২/৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ।। ৫২

অনুবাদ : যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ (অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি) পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ২/৫২

ব্যাখ্যা : আগের আগের শ্লোকের (৪৯, ৫০) ভ্যাখ্যায় যেভাবে বুদ্ধিযুক্ত হওয়া, মাতৃভাবে যুক্ত হবার কথা বলা হয়েছে সেইভাবে আত্মায় যুক্ত হতে পারলে তবেই অন্তরে ভগবদবেদন লাভ সম্ভব নতুবা সকল শাস্ত্রপাঠ, উপদেশ শ্রবণ, কোনও কিছুতেই বিশেষ একটা কাজ হয়না, শুধু বাহ্য বিষয়ের বাড়াবাড়িই দেখা যাবে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে কখন সেইভাবে যুক্ত হব ? কখন সেই অবস্থা আসবে ? আত্মযুক্ত হলে পরে কখন সেই স্থিতিতে উপনীত হব ? কখন সেই পদ পাব ? তারই উত্তর এই শ্লোকে।

“মোহকলিলং” এর অর্থ শঙ্করাচার্য্য করেছেন মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ। সাধারণ ভাবে মোহ অর্থ দেহাত্মবুদ্ধি; কলিল অর্থ গহন। তাহলে হল গভীর দেহাত্মবোধ। যখন তুমি মোহ থেকে নির্গত হবে তখন ভালমন্দ কথা শুনে কোনও বেদনাই থাকবেনা, ভগবান/ আত্মদেবকে ভজন করতে করতে তোমার দেহাত্মবোধ নষ্ট হয়ে যাবে। এই দেহাত্মবুদ্ধি ছোট খাট জিনিষ নয়। ক্রিয়ার অভ্যাসে বাহ্য জড় জগৎকে একটু ভুলেছ কিন্তু পুরো বিস্মরণ হয়নি তখনও প্রাণময় কোষে অনেক দৃশ্য, শব্দ ও

রূপের খেলা এসে সাধনে বিঘ্ন ঘটাবে। সব ভুলে যাওয়ার দেশে যাওয়া থেকে এরা যেন আটকে না রাখে। সম্যক বুদ্ধিযুক্ত হয়ে চলতে থাকলে অবিরত গুরুসঙ্গ, সাহচর্য্যের দ্বারা একসময়ে তুমি এই মোহকলিল এর বাইরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তার আগে যেসব সূক্ষ্ম অথচ সুন্দর জিনিষ মন যে সেগুলোকে ছাড়তে চায় না, ছেড়ে স্বধামে যেতে চায় না। এটাই বুদ্ধির মোহ। বুদ্ধিযুক্ত হতে গিয়ে আমরা দ্বিগুণ মোহযুক্ত হয়ে পড়ি। তাই‘মোহকলিলং’ শব্দটা এসেছে। এই মোহকলিল অতিক্রম করতে হলে (আগে যেভাবে বলেছি সেভাবে) প্রাণের গতিকে সহস্রগুণ বাড়িয়ে নিয়ে তোমাকে দ্রুতভাবে তোমার সংস্কারত্মক মোহ সকল ভেদ করে মোহের বাইরে এসে উপস্থিত হলে তবেই এতদিন অস্ফুটভাবে, বিকৃতভাবে যা কিছু শুনেছ, চেয়েছ সে বিষয়ে নির্ব্বেদ অবস্থায় আসবে। অর্থাৎ আর কোন বভভবপঃ থাকবে না। ক্রিয়া করে বুদ্ধিকে বেশ করে ধুয়ে মুছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে পরিণত করে তুলতে না পারলে এ সমস্ত মোটা জিনিষের মোহ যায় না। মনে হয় বাঃ বাঃ! আজ কেমন শব্দ শুনলাম! কি উজ্জ্বল চিত্র সব দেখলাম! তা নয়, তা নয়, এসব পেরিয়ে যেতে হবে। “ইহ বাহ্য, আগে কহ আর”।

অবশ্যই নিরাশ হবে না। ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা তোমার সাধারণ কাজগুলোকেও যেভাবে আগে বলা আছে সেই ভাবে কর। বুদ্ধিতে এই যে মোহ লেগে আছে তা ছাড়ানো দু চার ছয় মাস বা দু পাঁচ বছরের কাজ তো নয় –

“এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা। হরত্য বিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ৷৷”

সে মনে নিরন্তর ব্রহ্মবাসনাই জাগবে, অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ হতে থাকবে। রসায়ন দ্বারা যেমন রোগ নষ্ট হয়, এই “রাম রসায়ন” দ্বারাই মোহকলিল নষ্ট হবে। এই রাম যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রমণ করেন সেই আত্মারাম বাবাজীর কাছে পৌঁছুতে হবে। তবে হ্যাঁ, কিছুই সম্পূর্ণ বৃথা নয়, তখন যেসব অস্ফুট আহ্বান শুনেছ সেগুলো প্রথম দিকে বিকৃতভাবে অনুভব করলেও আস্তে আস্তে কখনও ঘন্টাধ্বনি, কখনও বংশীধ্বনি, কখনও সমুদ্রের গর্জন, কখনও পাখীর ডাকের মত শোনাবে। বুঝবে এও তোমার প্রাণেরই ডাক। এও সেই মাতৃ আহ্বান। প্রথমদিকে যাদের এটা লক্ষ্য করান যেত তারা নিতান্ত জড়বাদী বলেই ভাবত নৈসর্গিক শব্দতরঙ্গমাত্র। যাহোক, এর গতি বাড়লে তোমার প্রাণে আরও অননুভূতপূর্ব ভাবে প্রকট হবে। আর যদি সদ্গুরুলাভ হয়ে বিশেষ প্রক্রিয়া পেয়ে থাক, তবে সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফলে সকল শব্দতরঙ্গ মিশে প্রণব আকারে শোনা যাবে। এইভাবে শুনতে শুনতে এগিয়ে গেলেই তোমার বুদ্ধিসকল একসময় মোহকলিলের বাইরে গিয়ে উপস্থিত হবে। তখন বুঝবে শব্দ শুধুই শব্দমাত্র নয়। ওটাই শক্তির ঈশ্বরী বা অক্ষরা মুর্ত্তির স্ফূটন বা ক্ষরণ – স্বাধীন স্ব-সম্বেদন –

বেদ। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, "পরীক্ষ্য লোকান কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ।" যাঁরা সেই (অবস্থা) ব্রহ্মপদকে চান তাঁরা স্বর্গাদি সুখ সকলকে তুচ্ছ মনে করে, সে সবের আকাঙ্খা না করে, তাতে বীতরাগ হবেন। দেহাদি গুণে মন থাকলে ততক্ষণ তো এগুলোতে তুচ্ছজ্ঞান হয় না। শুধু ক্রিয়ার পরাবস্থায়ই চিত্ত নেশাখোরের মত ভোঁ হয়ে থাকে। এ সবের জন্য প্রাণ আদৌ ব্যাকুল হয় না ॥ ২/৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ।। ৫৩

অনুবাদ : যখন ওঁকার ধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চল ও অভ্যাসপটুতাবশতঃ স্থির থাকিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। ২/৫৩

ব্যাখ্যা : শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অর্থাৎ যখন উত্তম প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি স্থির হয় তখন বেদন বা প্রণব দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন তোমার বুদ্ধি ভগবানের অন্যত্র অনাকৃষ্ট হয়ে অচল ভাবে অবস্থান করবে। ওঁ কার ধ্বনি শ্রবণে মতিবুদ্ধি স্থির হলে সেই স্থির অবস্থায় যোগলাভ করবে। পরবর্ত্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমন বলা আছে তেমন অভ্যাস দ্বারা কর্ম্মের অতীত অবস্থায় স্থির থাকতে পারলে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হয়ে স্থিরতাকে পেলেই সাম্যাবস্থারূপ যোগপ্রাপ্তি ঘটে।

মন দিয়ে একভাবে ক্রিয়া করে গেলে প্রথমদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত শোনা যায়, ক্রমশ প্রাণায়াম আরও একটু একটু করে বেশী করলে দূরাগত ঘন্টা ধ্বনির মত, তারপর একটু বেশী মন লাগালে বেশ একটানা ওঁকার ধ্বনি, তারপর তার সাথে বীণা, বাঁশি, শঙ্খ ইত্যাদির মিশ্রিত ঐকতান (concert) শোনা যায়। তখন মনে কোনও স্পন্দন থাকেনা, বুদ্ধি থাকে না, বেগ / উদ্বেগশূন্য, প্রণব ধ্বনিতেই সব লয় হয়।

প্রথম প্রথম অনেক দেরীতে দেরীতে এক এক বার হয়ত শোনা যাবে, শুনতে না শুনতেই মিলিয়ে যাবে, কিন্তু অভ্যাস যত ঘন হবে ততই স্থায়িত্ব হবে। বার বার অভ্যস্ত হবার পর যখন আর নেমে পড়বেনা, ইন্দ্রিয়ের পথে আকৃষ্ট হয়ে বুদ্ধি বিচ্যুতি ঘটবে না সেই অবস্থায়ই যোগপ্রাপ্তি হবে।

অনাহত শব্দের মধ্যে, মন মিশে গেলে জ্যোতির অনুভব হয়, মন অচল হওয়ায় আর কোনও বোধও থাকে না। বাক্য বা লেখনীদ্বারা এ অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। তারপর সে অমূল্য যোগের বিচ্যুতি ঘটলেও, প্রজ্ঞা তাতে অবস্থান করে। বুদ্ধি অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা যে প্রজ্ঞা তার দ্বারা সতত যুক্ত থাকে।

"অনাহত শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনি।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥"

এভাবে যোগস্থ হওয়াই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা যোগসমাধি। একে আত্মসাক্ষাৎকার বলা যায়। তাই একে বিষ্ণুর পরম পদ বলা হয়েছে। আগে বলেছি আমাদের দেহ পর পর পাঁচটি কোষের দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে আনন্দময় কোষ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, বিজ্ঞানময় কোষ-প্রজ্ঞা থেকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি পর্য্যন্ত যার বৃত্তি সেই কোষ, আনন্দময়কোষ ছাড়া অন্যান্য কোষ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর । সূক্ষ্ম জিনিষ সূক্ষ্মের সাথে খুব সহজেই মিশে যায়। ধূলোর সাথে ধূলো যেভাবে মেশে, জলের সাথে জল তার চেয়েও সহজে মিশে যায়। বায়ু জল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলে আরও সহজে মেশে। তাই বুদ্ধি মনের চাইতে সূক্ষ্ম বলে মন অপেক্ষা সহজে ভগবানে মেশে। মনোময় কোষ বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ অপেক্ষা ঘন বলে যতদিন না বুদ্ধিবৃত্তি খুব ঘন ভাবে কাজ করে বা বুদ্ধিবৃত্তির চালনা খুব ঘনীভূত না হয়, ততদিন চঞ্চল মনোময় কোষে প্রতিফলিত হওয়ার উপযুক্ত হয় না। তাই দেবতার স্থূলমূর্ত্তিই তোমার কল্পনায় আসে। তার মানে তুমি মনোময় কোষের দ্বারা যুক্ত হয়েছ, কিন্তু তাতে সজীবভাব থাকে না, প্রাণশক্তি থাকে না। কল্পনামাত্র তো, যেন মাটির প্রতিমা, নির্জ্জীব, প্রাণহীন। কিন্তু ক্রমশ লেগে থেকে যখন ঐ চিন্তা আরও ঘনীভূত হবে, যখন কার্য্যতঃ ঐ মনোময় মূর্ত্তি তুমিময় হয়ে উঠেছ তখনই তুমি তৎসারূপ্যবোধে যুক্ত হয়েছ। এভাবে সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় কোষ হতে যুক্ত হতে আরম্ভ করে স্থূলতর প্রাণময়কোষের দ্বারা ভগবদ্‌যোগ লাভ করেছ। মাঝে মাঝে যে সব আবেশ, ভাবসমাধি যা কিছু শুনি তা এই অবস্থারই ঘটনা বিশেষ মাত্র। কাজের কিছু না। অন্নময়কোষের দ্বারা তাঁতে সংযুক্ত হতে হবে, তবে কৃতার্থতা। ভাবুক সাধকদের দেবতা দর্শন প্রায়ই হয়। সেটা কিছু নয়। কারণ মনোময় কোষের দ্বারা যুক্ত হলেও প্রাণময়কোষে যুক্ত হয় নি। অন্নময়কোষ যুক্ত হলে তবে হয় সম্প্রজ্ঞাত যোগপ্রাপ্তি। অসম্প্রজ্ঞাত যোগের কথায় পরে আসছি। ২/৫৩

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ।। ৫৪

অনুবাদ : অর্জুন কহিলেন - হে কেশব, যোগে (সমাধি নিষ্ঠায়) অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? স্থিতধী ব্যক্তি কি কহেন ? কিরূপ থাকেন ? কিরূপে চলেন ? ২/৫৪

ব্যাখ্যা : স্থিতপ্রজ্ঞ কে ? স্থিরকেই প্রকৃষ্ট জেনে যিনি আপনাতে আপনি থাকেন। কিম্ প্রভাষেত, কিমাসীত, কিম্ ব্রজেত ? অর্থাৎ আবির্ভাব, অবস্থান ও শেষ ক্রিয়া বা লয়ে নিয়ে যাওয়া কি রকম - এটাই

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য। প্রণবের সাধারণ শব্দ “ওম্” (অ উ ম) এর অর্থ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। অবার অর্জ্জুন এখানে ভগবানকে “কেশব” নামে সম্বোধন করেছেন কেন ? সবই একই অর্থ -- হে কেশব, - ক - ব্রহ্মা অর্থাৎ রজোগুণ, অ - বিষ্ণু অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, ঈশ - শিব অর্থাৎ তমোগুণ, ব - গমনার্থ বা ধাতুজ। তাহলে দাঁড়াল সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় দেবতা (“ত্রয়ো দেবাঃ স্ত্রয়ো গুণাঃ”) যাঁর অধীনে আছে এবং অজপারূপ গমনাগমন করছে, তিনিই কেশব। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টি বা বৃক্ষ ও বীজ নিয়ে দর্শনশাস্ত্রে এ ধরণের একটা প্রশ্ন আছে বটে কিন্তু দর্শন তার যে মীমাংসাই করুক আমি দেখি কিভাবে বৃক্ষ ও বীজ সম্বন্ধযুক্ত যা আসলে একই তত্ত্বের দুই রকম অভিব্যক্তি মাত্র। প্রণব চৈতন্যযুক্ত হলেই বীজ হয়। হৃদয়ের অবস্থাক্রমে, সংকল্প ও ভাবের তারতম্যে যে ভাবে প্রাণে আঘাত করে এবং সেটাই হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি যে রাগের বাচক সেইরূপে পরিবর্তিত হয়ে প্রাণের ভিতর ফুটতে থাকে। সাধন করতে করতে প্রাণ যখন আটকিয়ে যায় সেই স্পন্দনহীন যোগীর কি বিশেষ লক্ষণ হয় যার দ্বারা তাকে জানা যায় ? তাঁর কি লক্ষণই বা ফুটে ওঠে ? সাধক ঠিক জাগ্রত ভাবে থাকেন না। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ আর তেমন একটা স্পর্শ করতে পারে না। ইন্দ্রিয়েরা স্বভাব বশে ক্রিয়াশীল থাকে। এঅবস্থায় তিনি সাধারণ লোকের মত সব কাজই করে থাকেন তবু সাধারণ লোকের সাথে স্থিতধীর কি পার্থক্য ? এ অবস্থা অত্যন্ত নিগূঢ় ও সাধারণের দুর্জ্ঞেয়। কারণ যোগের সপ্ত ভূমিকার প্রথম দুটো বাইরের, শুভেচ্ছা ও বিচরণা, এটা সাধন লক্ষণ মাত্র। তৃতীয় তনুমানসা -- এতে মনের ক্ষীণতা অর্থাৎ মন থাকে কিন্তু ভিতরে ডুবে থাকে। চতুর্থ সত্ত্বাপত্তি -- এতে জগৎ ভূলে নিজেকেও ভূলে যায় । এ থেকেই সমাধির শুরু। এ অবস্থা স্থির ও স্থায়ী হলেই কৃতার্থতা। সাধারণ ভাবে এ পর্য্যন্তই সাধক অবস্থা শেষ। পঞ্চম হল অসংসক্তি --- এতে যোগী কখনই ব্রহ্মভাব থেকে বিচলিত হন না। জগৎ সংসারের কোনও রূপ বা দৃশ্যে বিচলিত হন না। পাকা যোগারূঢ় অবস্থা। এ অবস্থায় থেকে সব কাজই করা যায়, আবার কিছু না করেও থাকা যায়। ষষ্ঠ পদার্থভাবনী। এটাই দ্বন্দ্বাতীত বা পরম প্রজ্ঞার অবস্থা। তারপর সপ্তম অবস্থা তুর্য্যাবস্থার শেষ প্রান্ত এবং বর্ণনার অতীত। এটাই সমাধির শেষ অবস্থা। এই অবস্থায় যিনি পৌঁছেছেন তিনিই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, ইনিই ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান।

যাই হোক এসমস্ত সাধনা বলে বিশিষ্ট কার্য্যকালের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে কি করে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় এটা জানতে আকুলতা আসে। তাই সার্ব্বজনীন ভাবেই অর্জুনের মুখে আমরা চারটি প্রশ্ন পেয়েছি। প্রথম, স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার সাধারণ লক্ষণ কি ? দ্বিতীয়, স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় যে শক্তি সঞ্জাত হয় তা কিভাবে প্রথম বিকাশ পায় ? তৃতীয়, কিভাবে তা ঘনীভূত হয়ে প্রাণে স্থিত হয়? চতুর্থ, কিভাবে এসব থেকে সমাধি আসে এবং সমাধি হলে কি হয় ? তার লক্ষণই বা কি ? এবার শ্রীভগবান একে একে এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ॥ ২/৫৪

শ্রীভগবানুবাচ,

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ।। ৫৫

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন, হে পার্থ, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট থাকিয়া যখন যোগী মনোগত সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। ২/৫৫

ব্যাখ্যা : একটু আগে ৪৯ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছিলাম মানুষ ভোগী অপেক্ষা বেশী সঞ্চয়ী। মানুষ যদি যথার্থ ভোগীই হতে পারত তবে আর তাকে অভাব ভোগ করতে হত না। কারণ ভোগ্য কোনও বাইরের জিনিস নয়। ভোগসকল আমার নিজ সত্তাতে জাত, এটা যত বোঝা যায় ততই বহির্জগতের দিক থেকে ইন্দ্রিয়সকল প্রতিনিবৃত্ত হতে থাকে। ফলে নিজের ভিতরেই সমস্ত সন্তোষ লাভ করে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থালাভ হয়। ভোগের জন্য বহির্জগতের মুখাপেক্ষী না হওয়া এটিই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সাধারণ লক্ষণ। ভাব দেখি তখন আসলে কি হয় ? বিবিধ বাহ্য বাসনা উৎপত্তির কারণ চিৎবস্তর বা চৈতন্যস্তরের অপরিণত অবস্থা। জাগতিক বিষয়সকল আমাদের চিৎ সমুদ্রে আঘাত করলে বিবিধ কামনারূপে সে স্রোত উথলে ওঠে। তাই আমরা যা কিছু দেখি সেগুলোকেই আমাদের ভোগদাতা বলে মনে করি আর সেই বস্তু অধিকার বা হস্তগত করতে উঠে পড়ে লাগি। কিন্তু যদি জানতাম বা বুঝতাম যে এই যা কিছু বাইরে দেখছি ও চাইছি সবই প্রজ্ঞাতে ও অন্তরে আছে তাহলে আমরা মুগ্ধ না হয়ে, ক্ষুদ্র বাহ্য বিষয় ছেড়ে, আমাদের চিত্ত প্রজ্ঞাতে বিস্তৃত হয়ে পড়ত। অর্থাৎ আমরা বাসনাত্যাগী হতাম। মোটামুটি ভাবে স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে এটাই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার সাধারণ লক্ষণ। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা না পেলে শুধু শুধু সে গল্প বা আলোচনা শুনে কিছু লাভ নেই। পরমানন্দময়ী যে তোমারই পিছনের খিড়কিতে তাঁর সন্ধান জানতে হয়। যখন গুরুকৃপায় কেউ সে রহস্যের সন্ধান পায় তখন নিজেকে বিষয় হতে টেনে নিয়ে গুরুদত্ত সাধনায় মগ্ন হয়ে যায়। সংকল্প বিকল্প মনের গড়ন ভাঙন কার ভাল লাগে ? তার চাইতে প্রতিদিন মনোযোগ সহ সাধন করলে মন প্রসন্ন, অচঞ্চল হয় ও আত্মারাম হওয়া যায়। “নান্যঃ কশ্চিদুপায়োহস্তি সংকল্পোপশমাদৃতে।” এই সংকল্পের উপশম ব্যতীত আর উপায় নেই। কঠোপনিষদেও আছে -

“যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যোহস্য হৃদিশ্রিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।”

হৃদয়স্থিত কামসংকল্পসমূহ যখন সমস্তই নিবৃত্ত হয়ে যায়, তখনই মর্ত্ত অর্থাৎ জীব অমৃতত্ত্ব লাভ করে এবং এ জন্মেই ব্রহ্মস্বরূপতা পেয়ে থাকে। মন দিয়ে ক্রিয়া করে প্রাণবায়ুকে স্থির করতে পারলেই সব সংকল্প মিটে যাবে তখনই স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারবে। বহির্জগৎ তথা বিষয়বস্তুকে ভেদ করতে পারলেই সেটা নিজ প্রজ্ঞা ও অন্তরে বোধ করা যায়। বুদ্ধিযোগে এই অভ্যাস করলে প্রজ্ঞাতেই নিজ সত্ত্বা হতে সমস্ত ভোগ ও ভোগ্য পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় ও স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। ২/৫৫

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ।। ৫৬

অনুবাদ : দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য মুনিকে স্থিতধী বলে। ২/৫৬

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে স্পষ্টীকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ও এই শ্লোকে বলা 'স্থিতধী' তে একটু পার্থক্য আছে। মুনি কাকে বলে ? "মুনিঃ সংলীনমানসঃ" যাঁর মন ব্রহ্মেলীন হয়েছে অর্থাৎ আপনাতে আপনি আছেন, বাইরে কথা বলার ইচ্ছে হয় না। যিনি মননশীল তিনিই মুনি। শুধুই মনন, কথা বলার ইচ্ছা নেই। স্থিতধীর সমাধি স্মৃতির রেশ এতবেশি কার্য্যকরী থাকে যে কোনও বস্তুর প্রতি অনুরাগ তো দুরের কথা, কোনও দুঃখ তাঁকে ক্ষুব্ধ করতে পারে না। নব নব সুখেও তাঁর কোনও স্পৃহা থকে না। এটাই স্থিতধীর অবস্থা। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ হলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম তো ক্ষয় হয় না সুতরাং তার ভোগও তাঁকে করতেই হয়। তাই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ সমূহও তাঁর নিশ্চয়ই আসে। তবে স্থিতপ্রজ্ঞের দেহাভিমানজাত সংস্কার না থাকায় জাগতিক সুখদুঃখ সাধারণ মানুষের মত অতখানি বিচলিত করতে পারে না। এই ৫৬ নং এবং পরবর্ত্তী ৫৭ নং শ্লোক দুটোই আসলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। ২/৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৫৭

অনুবাদ : (সর্বত্র + অনভিস্নেহ + তত্তৎ) (অনভিস্নেহ : স্নেহশূন্য) যিনি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য এবং সেই সেই শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিষাদিত হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মে স্থিত হইয়াছে) ॥ ২/৫৭

ব্যাখ্যা : এই ৫৬ এবং ৫৭ সংখ্যক শ্লোক দুটি হল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। প্রাণের ভাব উথলে উঠলেই কথার আকারে প্রকাশিত হয়। প্রাণের এই ভাবগুলো সাধারণত রাগ (ক্রোধ), অনুরাগ, ভয়, আনন্দ ও দ্বেষ (হিংসা) এই বৃত্তিকটির দ্বারা উথলে ওঠে। কিন্তু যিনি অনুদ্বিগ্ন ও বীতস্পৃহ তাঁর চিত্তে রাগ, অনুরাগ, ভয়, আনন্দ, দ্বেষ এসব কোথা থেকে আসবে ? তাই যাঁর এসকল বৃত্তি নেই তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তিও নেই। তাঁর ভাবও নেই অভাবও নেই। তাই তিনি মুনি হয়ে নিরুদ্বিগ্ন জীবন ভোগ করেন। অন্তর্মুখে মননশীল তাই তাঁকে মৌনী বলি। অন্তর্মুখের কথা বহুদূর অবধি শোনা যায়। বাইরের ব্যোমক্ষেত্র অপেক্ষা চিত্তক্ষেত্র সূক্ষ্ম তাই তার বিকম্পনও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। এমনকি একটা শব্দ যতক্ষণ ইচ্ছা অনুভব করা যেতে পারে। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ মুনি হয়ে মৌনীপ্রায় থাকেন ফলে বাইরে বড় একটা কথাবার্তা কিছু বলার থাকে না। এরপর তৃতীয় প্রশ্ন কি প্রকারে তিনি অবস্থান করেন ? এবং এর উত্তর । ২/৫৭

যদাসংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৫৮

অনুবাদ : যখন ইনি কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বথা প্রত্যাহৃত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২/৫৮

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবানের সকল কথাই আপাত রহস্যজনক, যেমন যে দেখেও দেখেনা তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যোগীর সাধারণ মানুষের মতই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক সবই আছে অথচ তিনি চক্ষু থাকতেও দেখেন না, কান থাকতেও শোনেন না। কারণ একটু আগেই বলেছি যে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করে কাজ করতে করতে ইন্দ্রিয় সকলের গতি পরিবর্ত্তন হয়। সব গতি হয় অন্তর্মুখী। বিষয় অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম তত্ত্বের ভিতর সংযুক্ত হয়। আমরা যেমন পদার্থ সকলের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই সমস্ত তন্মাত্রার দ্বারা যুক্ত হই কিন্তু এই সব তন্মাত্রাগুলোকে ভেদ করতে পারি না, এদের সূক্ষ্মতাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না, তেমনই ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম হলে, সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করতে পারলে, তখন আদিতত্ত্ব বা এসবের সূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব আমাদের উপলব্ধিতে আসে। ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মতা লাভ করলে সুগন্ধি ফুলের গন্ধ আমাদের বাহ্যতনু মুগ্ধ করতে পারে না কিন্তু তার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম গন্ধ তন্মাত্রা আমাদের উপলব্ধিতে আসে ও সহস্রগুণ অধিক তৃপ্তি দেয়। সব বিষয়ই একই রকম, ইন্দ্রিয়ের ঐ সূক্ষ্ম বোধশক্তি এলে ঐ সকল গুণ আমাদের মুগ্ধ করতে পারে না, কারণ তার ভেতরের এক মহান তত্ত্ব প্রত্যেক বিষয়ের ভিতর আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হবে। ইন্দ্রিয় সকলের এই সূক্ষ্ম শক্তি অর্জনের সাথে সাথেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্যিকার বোধ জন্মে। সাধারণ মানুষের বোধশক্তি এমন একটা পর্য্যায়ে থাকে যে তারা কিছুই বোঝে না, সেকারণ সবজান্তার মত ভাব, কথাবার্তা ও চালচলনে থাকে, এটাই তফাৎ। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যা বুঝেও বোঝেন না, দেখেও দেখেন না, যে কথা শ্রীভগবান বলেছেন।

সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়সকল পরিণত নয়। পরিণত করার চেষ্টাও নেই, বরং মনের বিকারে অবিরত ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় হয়ে চলে ও অপরিণত বোধশক্তিটুকুও বিকৃত হয়, তাই তারা ইন্দ্রিয়ারাম। কিন্তু যাক সে অন্যকথা, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হলে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সকলকে ভেদ করে সেই সূক্ষ্ম অবস্থার ভোগ লাভ করে। বুদ্ধিযোগে থাকতে থাকতে স্বতঃই এই অবস্থা লাভ হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দ্রিয়সকল যখন সূক্ষ্ম অনুভূতি অর্জন করবে, স্বভাবতঃই ভাবনা চিন্তার স্বরূপ পালটে যাবে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ আপনা থেকেই হবে। বিষয়সকলের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মক্ষেত্রে পুরুষ অবস্থান করে। ইন্দ্রিয়সকল বিষয় সমূহ থেকে তার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়সকল আর ইন্দ্রিয়ার্থ সকলের গ্রাহক (consumer) থাকে না। এর দ্বারা শ্রীভগবান স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অবস্থান কিরূপ সেটা বুঝিয়েছেন। অনেকের আবার ধারণা বুঝি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করলে ভগবদ্‌ভাব প্রাণে আসে না। তারা সব ছেড়ে ঐদিক নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যখন বুদ্ধিদ্বারা বুদ্ধিযুক্ত হয়ে যোগযুক্ত হওয়াই প্রধান কথা তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না। কিন্তু সমস্যা হল যে সবই প্রকৃতি মধ্যগত খেলা। সবই ভ্রমদৃষ্টি, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলো বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন থাকবে ততক্ষণ এ খেলা থামবে না। পুরুষেরা কন্যারাশি, মেয়েরা সিংহরাশি হয়ে ঘুরে মরবে আর কিছু দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোক বৃশ্চিকরাশি হয়ে এদের দংশন করবে। তাই কঠোপনিষদে আছে-

“পরাঞ্চি খানি বাতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নাত্মরাত্মন্।
কশিদ্ধিরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ত্বমিচ্ছন্ ॥”

“স্বয়ম্ভূ ভগবান ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ বা বাহ্য পদার্থদর্শী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্য বাহ্য বিষয় শব্দাদি সে দর্শন করে বা জানিতে পারে, অন্তরাত্মাকে জানিতে পারে না। কোনও কোনও বিবেকী পুরুষ মুক্তি ইচ্ছা করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে রোধ করিয়া “প্রত্যগাত্মা” অর্থাৎ জীবদেহে প্রকাশমান কূটস্থ বা আত্মাকে দর্শন করেন”। তাই বলছেন যে সেই “ প্রত্যগাত্মা ” কে দেখতে হলে ইন্দ্রিয়গুলোকে “কূর্ম্মোহঙ্গানীব” কচ্ছপের মত বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে আসতে হবে। চোখ মুখ শ্বাস প্রশ্বাস এমনকি মনকেও উল্টে দিতে হবে। সব গুটিয়ে একটা বিন্দুর মধ্যে স্থির হয়ে গেলেই দেখবে --

“হৃদয়াকাশে জগৎবীজ জ্যোতিরূপেতে ভাতিরে।
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে প্রণব শব্দ রোম্ রোম্ রবে বাজেরে ॥”

তাই চোখ কান থাকতেও বাইরের দৃশ্য ও শব্দ দেখা শোনা যায় না। কারণ তাদের গতি অন্তর্মুখী। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সবই মায়ার খেলা। প্রাণের কম্পনই ইড়া পিঙ্গলাতে শ্বাসের প্রবাহরূপে অনুভব হয়। অনন্ত শান্তির আশ্রয় এক আত্মাই জগৎময় ব্যাপ্ত। তবে আর এসব পঞ্চভূতের তত্ত্ব কোত্থেকে এল ? এটাই ভ্রান্তি, ভ্রম। সেই প্রকৃতিমধ্যগত খেলা। আগে যা বললাম ॥ ২/৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ।। ৫৯

অনুবাদ : ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করেন না এমন দেহাভিমানী অজ্ঞব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্তি পায়, কিন্তু ভোগাভিলাষ, নিবৃত্তি পায় না অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি থাকে; পরন্তু পরমাত্মাকে দেখিয়া ইঁহার (স্থিতপ্রজ্ঞের) অভিলাষ স্বতঃ নিবৃত্তি পায়। ২/৫৯

ব্যাখ্যা : বুদ্ধিযোগের দ্বারা আত্মায় যুক্ত না হলে, সমস্ত অনুরাগ আত্মায় আকৃষ্ট না হলে, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়নিরোধে কোনও কাজ হয় না। তাদের ফলাকাঙ্খারহিত কর্ম্মও শুধুমাত্র মুখের কথা। মাধুর্য্যাদি ষড়বিধ রস একরসে (ভক্তিরস) পরিণত না হলে সূক্ষ্মতত্ত্বে অবস্থান হয় না। এ অবস্থায় বিষয় থেকে দূরে থাকতে চাইলেও অভ্যন্তরে প্রবাহিত সেই বিষয়রস মরে না। সূর্যরশ্মি জানালার কাঁচের শার্সি ভেদ করে ঘরে ঢুকলে কাঁচের Prismic effect এ বর্ণালী বা বিবিধ বর্ণরঞ্জনা তৈরী হয় কিন্তু উন্মুক্ত আকাশে দীপ্ত শুভ্র জ্যোতি মাত্র দেখা যায়। এটিই আসল বর্ণ। ইন্দ্রিয়রূপ জানালা দিয়ে পঞ্চতন্মাত্ররূপ রঙীন কাঁচসকলের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত বর্ণালী আসছে তা রোধ করার চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে বরং ঐ জানালা দিয়েই মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক, সব বর্নালী, বর্ণরঞ্জনারূপ ভ্রান্তি দূর হবে। আকাশে পরিস্কার সাদা আলোই দেখা যাবে এখনই বা কিছু দেরীতে। পরের শ্লোকে শ্রীভগবান একথাই বুঝিয়েছেন। তাহলে দেখা গেল যে সাধারণ মানুষের যখন বিষয়েই সব রস, তখন সব কর্ম্মই সকাম, ফলাকাঙ্খাযুক্ত। ফলাকাঙ্খারহিত কর্ম্ম কল্পনায়ও আসে না। অন্য দিকে স্থিতপ্রজ্ঞের ফলাকাঙ্খারহিত কর্ম্মই হল – রস বর্জ্জিত আহার। অতএব বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম্ম করার ফলই রসবর্জ্জিত আহার করে পরব্রহ্মে স্থির থাকা। ক্রিয়ার পরবস্থা যাঁর সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে যায় তাঁর সুখাভিলাষের, ভোগবিলাসের মূলই নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর চিত্তাকাশকে বিষয়রস স্পর্শই করতে পারে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের এমন বিপরীত ভাব কেন ? সেটাই পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ২/৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ।।৬০

অনুবাদ : (ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতিরেকে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না।) অতএব সাধনাবস্থায় এবিষয়ে মহান প্রযত্ন কর্তব্য; (কেন না) প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষে প্রযত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। ২/৬০

ব্যাখ্যা : ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বতঃ ক্রিয়াশীল, এটাই তো স্বাভাবিক। তাই সংযম করলেও ইন্দ্রিয়দ্বারায় ভাল মনকেও হরণ করে। আগেই বলেছি যে এটাই তো স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়েরা কি তাদের কাজ করবেনা ? অথচ মহাত্মা শঙ্কর থেকে শুরু করে প্রায় সকল মহপুরুষগণই এই শ্লোকটিকে ইন্দ্রিয়সংযমের প্রাধান্য দেখাবার জন্য কথিত হয়েছে বলে মতপ্রকাশ করেছেন । তবে প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে শ্রীভগবান কি ইন্দ্রিয়সকলকে অক্ষম বা নিষ্ক্রিয় করতে বলেছেন ? তবে যে তিনি পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ২৭ নং শ্লোকে বলেছেন–

" প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

তবে কি শ্রীভগবান স্ববিরোধীতা করেছেন ? মোটেই না, কারণ আলোচ্য শ্লোকে পূর্ব্বসুরী মহাত্মাগণকৃত অর্থের বিপরীত ভাবই স্পষ্ট হয়। যার অর্থ একমাত্র ভগবদভাবে যুক্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই যার দ্বারা আগে যেভাবে বলেছি সেই ভাবে আমরা ইন্দ্রিয়সকল ও বিষয় সকলের সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশলাভ করেই স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারি। শ্রীভগবান বলছেন যত্নশীল সাধক, এমনকি বিবেকী পুরুষের মন পর্য্যন্ত, স্থূল বিষয়ে অপহৃত হয়ে পড়ে। অনেক সময় অনেক ভাল ছাত্র, যে পড়াশুনায় নিষ্ঠাবান সেও, পরীক্ষার সামনেই হঠাৎ সিনেমা দেখতে চলে যায়। তাই একমাত্র বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করে আত্মদর্শনের সূচনা হলে ক্রমশঃ স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মোপলব্ধি করে তবেই স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারা যায়। এটাই প্রকৃত পন্থা। বিষয়সকল -- রসসকল ভেদ করলে তবেই ইন্দ্রিয়সকল স্বতঃ নিবৃত্ত হবে। এটাই তাৎপর্য্য। এছাড়া ইন্দ্রিয় নিরোধের যে পথ ওটা বরং সংকীর্ণ, এটা বলাই ভগবানের অভিপ্রায়। ভগবানে রসবোধ হওয়া চাই। ভক্তিরস নিরন্তর ভগবৎ স্মরণের দ্বারা আপনিই হয়। সৎসঙ্গ দ্বারা বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি সকল নিবৃত্ত হয় । আর ক্রিয়া করে পরাবস্থা লাভ হলে তো রসস্বরূপ আত্মার সন্ধানই পাওয়া গেল। তখন আর ভয় নেই। "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"। ২/৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৬১

অনুবাদ : যোগী সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংহত করিয়া আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (কিমাসীত এই প্রশ্নের উত্তর) ২/৬১

ব্যাখ্যা : এইখানে এপর্য্যন্ত এসে " কিমাসীত " এই প্রশ্নের উত্তর শেষ হল। আগে যে ভাবে বলা হয়েছিল সেভাবে বুদ্ধিযুক্ত অবস্থা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করে ইন্দ্রিয়সকলকে নিজের অধীনে পেলে তখন যেমন আনন্দে থাকা যায় সে অবস্থাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন অনুযায়ী পর পর উত্তরগুলোও যথা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সাধারণ লক্ষ্মণ, কথাবার্ত্তা বা ভাবপ্রকাশ এবং অবস্থান বিষয়ে সমস্ত উত্তরই পাওয়া গেল।

(১) স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বাসনাসকল আপনাতেই মিটে যায়, জগতের মুখাপেক্ষী হতে হয়না।

(২) তাঁর ভাবসকল প্রাণের ভিতরই থাকে, কথায় প্রকাশ পায়না।

(৩) তিনি আত্মপরায়ণ, যোগযুক্ত থাকেন বলে তাঁর প্রাণ ইন্দ্রিয়ে না থেকে ইন্দ্রিয়সকলের অভ্যন্তর দিয়ে সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে প্রসারিত হয়ে থাকে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয় হতে সঙ্কুচিত হয়ে সূক্ষ্ম অন্তর্দেশ দর্শন করে বলে ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক ভোগ না হয়ে সূক্ষ্ম সম্ভোগ হয়, ফলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সম্ভোগ বোঝা যায় না এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সংযম বলে মনে হয়। এভাবেই তিনি অবস্থান করেন।

যাই হোক, এবার "ব্রজেত কিম্ " প্রশ্নের উত্তর। দেখা যাক শ্রীভগবান কি বলছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ।। ৬২

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ।।৬৩

অনুবাদ: বিষয়চিন্তারত পুরুষের (সর্ব্বদা) বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই সকল (বিষয়ে) আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনা জন্মিয়া থাকে, কামনা হইতে (কোন কারণে কামনা প্রতিহত হইলে তাহা হইতে) ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

ক্রোধ হইতে সংমোহ (হিতাহিত বিবেকশূন্য ভাব) হয়; সংমোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (আত্মবিস্মৃতি), স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃততুল্য (হইতে) হয়। ২/৬২-৬৩

ব্যাখ্যা : এবার শ্রীভগবান "ব্রজেত কিম্" প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিভাবে বিষয়সকলে এবং ব্রহ্মে বা স্থূলে সূক্ষ্মে বিচরণ করেন সেটার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন।

এখানে ভগবান বিষয়সঙ্গের ক্রিয়া পরম্পরাগুলোর উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন বিষয়সকল কিভাবে বন্ধন ঘটায় আবার তারপর ব্রহ্মই যখন বিষয় হন, অর্থাৎ ভগবানই যখন জীবের বিষয়স্বরূপ হন, তখন তা থেকেই কি করে মুক্তি লাভ হয়। দুটি শ্লোকে দুরকম ভাবের উপলব্ধি। বিষয় যখন বিষয়মাত্র, তখন সেটা, সেই ভাব যে প্রকারে বন্ধন করে, বিষয় যখন ব্রহ্ম হন তখন সেটা, সেই একই ভাবে, তাঁকে সাযুজ্যপদ প্রদান করে। আর একটু পরিষ্কার করে বলি মানুষ যখন অন্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হয়ে ভগবানেরই ধ্যানে নিরত হয় তখন সেই একই পদ্ধতিতে ভগবান তাঁকে আপন অঙ্গে যুক্ত করে নেন। এই যে আত্মিক যোজনা এরই নাম মুক্তি ---- সাযুজ্য। আসলে বিষয়গুলোও ব্রহ্মের বাইরে নয়। তোমার বউ, ছেলে, মেয়ে ও অন্যান্যরা, তোমার প্রাণ যাতে যেভাবে যুক্ত বা আসক্ত হয়ে পড়ে আকর্ষণটা সেভাবেই হয়। মা আমাদের সেভাবেই আকর্ষণ করে রাখেন। এই শ্লোকে ক্রোধ শব্দটা যেভাবে উল্লেখ আছে তাতে সাধারণভাবে অর্থ না ধরে বরং " ক্রোধের কারণ উদ্বেলন " অর্থ করলে ব্যাখ্যাটা সঠিক হয়। ধ্যান মানেই চিন্তা, সেটাই আসল বিষয়সঙ্গ করা। সবসময়েই যে বিষয় ভোগের জন্য লভ্য তাতো নয়, অনুচিন্তনের দ্বারাও সঙ্গ করা হয়। আগেই বলেছি চিন্তা মনোময় কোষের আহার। যা কিছুই চিন্তা করি তা আমাদের মনোময় দেহের অঙ্গীভূত হয়। মনোময় কোষকে পুষ্ট করে। আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে । এবার সেটা বার বার ঘুরে ফিরে এলে প্রবলতর হয়ে কামনার রূপ নেয়। কামনা হল সেই বিষয় পাওয়ার জন্য তৃষ্ণা। উপর্য্যুপরি চিন্তনের দ্বারা তৃষ্ণা ফুটিয়ে তোলা যায়। এটুকু লাভের জন্যও অন্তত; ঈশ্বরস্মরণ ও ঈশ্বরচিন্তা নিত্যক্রিয়ারূপে আমাদের করণীয়। যাই হোক বিষয়চিন্তন থেকে জাত সেই তৃষ্ণা ক্রমশই বাড়ে। বিষয় প্রাপ্তির সাথে সাথে সে তৃষ্ণা বরং আরও বাড়ে, উদ্বেলিত হয়, আবার অভাব বা প্রতিরোধেও যে ভাবে উদ্বেলিত হয় সেই অবস্থাই "ক্রোধ"। যে ভাবেই ধরি কামনা থেকে প্রাণের একটা উদ্বেলিত গতি কিন্তু অনিবার্য্য। এই উদ্বেলনের ঠিক পরবর্ত্তী অবস্থাই হল "মোহ " যখন সে গতির আর স্বাভাবিক প্রবাহ থাকে না। তেমনই কামনা ক্রুদ্ধা হলে অপ্রাপ্তিতে বা প্রাপ্তিতে হোক, প্রতিরোধে হোক, যেভাবেই হোক, সমস্ত প্রাণ কিন্তু সেই এক কামনাতেই অভিভূত হয়ে পড়ে। তখন চোখে আর কিছুই পড়েনা। আর সেই অভিভব থেকেই আসে স্মৃতিবিভ্রম । কারণ প্রাণ মোহে অভিভূত হলেই তখন স্মৃতি লুপ্ত হতে থাকে। সেই কামনা পুরণের পথে যে সব বাধা থাকে সেসব বিষয়ের স্মৃতি আর প্রাণকে সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত করে না। কারণ সেসব স্মৃতি লোপ পেয়ে যায় অথবা বিভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। এভাবেই স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধি নষ্ট হয়। কামনা পূরণে বাধা বিপদের বিষয়গুলো মনে থাকলে হয়তো সে আর এগোতো না অথবা মোহাচ্ছন্ন প্রাণ বুদ্ধিকে উজ্জীবিত করে সঙ্কল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতো বা কামনা পূরণের বিপক্ষে যুক্তি আনত। কিন্তু স্মৃতি লুপ্ত বা বিকৃত হওয়ায় সে বুদ্ধিও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় ও কামনা পূরণের গভীর গর্তে ঝাঁপ দেয় এবং পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়। বহুদিনের জন্য প্রাণের গতি গর্তে পড়ে নিরুদ্ধ, গতিহীন অবস্থায় থাকে। এটাই নাশ। এ অবস্থায়ই আমরা মড়ার মত জন্মের পর জন্ম মোহাচ্ছন্ন হয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি।

আধ্যাত্মিকতার দিক না হয় ছেড়েই দিলাম। স্থূল অর্থেও সেই একই অবস্থা, যেখানে মানুষ ও পশুর, তফাৎ করা যায়না। সুন্দর, সজীব ঘাস, লতা এসব দেখে ছাগল, গরু, মোষ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, না পেলে রেগে খুন হয়। মানুষের বেলায়ও বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে আপনি কে তা ভুলে যায়। মনকে আর আটকানো যায় না। যারা বাধা দিতে আসে তাদের উপকারী বন্ধু মনে হওয়া তো দূরের কথা, উল্টো মহা শত্রু মনে হবে। আবার সেই একই প্রণালীতে দেখি, বিষয় যখন ব্রহ্ম হন --- মা ই যখন আমাদের ধ্যানের বিষয়বস্তু, যখন আমরা মাতৃচরণ রূপ পরম বিষয়ে মগ্ন, তারও নাশের প্রণালী সেই একই। ধ্যান করতে করতেই মাকে পাওয়ার জন্য, দেখার জন্য, প্রাণে কামনা - আকুল তৃষ্ণা, আসে। যত তার সন্ধান না পাওয়া যায় ততই প্রাণ উদ্বেলিত হয়, ক্রমশ মায়ে মোহাচ্ছন্ন হয়। তখন মা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অথচ বিষয়বুদ্ধি তিরোহিত হয় না বলে একটা দারুণ জমকালো কুয়াশার দ্বারা ব্যাপৃত হয়ে যায়। বিষয় সকলই অন্ধকার কুজ্ঝটিকার মত মনের চারিদিক ঘিরে থাকে। সাধারণ মানুষ সংসার মোহে আবদ্ধ হয়ে যেমন ধর্ম্মে উপেক্ষা করে, আত্মানুসন্ধানী সাধক মাতৃ ভালবাসার মোহে তেমনই আচ্ছন্ন হয়ে জগৎ উপেক্ষা করে। সেই একাগ্রমুখী চিন্তা বুদ্ধিকে ব্যাপৃত করে স্মৃতিবিভ্রম ঘটায়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়সকলের স্মৃতি সবই প্রাণ থেকে মুছে যায়। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদির বিশেষ অনুভূতি লোপ পায়। মান অপমান, হিতাহিত জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ঘৃণা সব হারিয়ে স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ হয়। এমনকি যে বুদ্ধির দ্বারা প্রথম মাতৃচিন্তা বা আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছিল সে বুদ্ধিও লোপ পায়। প্রাণ তখন বিনা সাহায্যে, বিনা কল্পনায়, বিনা উদ্দীপনায় মাতৃভাবে যুক্ত হয়ে যায়। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, মাতৃসারূপ্য বোধে অবস্থান করে ও লীন হয়ে যায়। এটাই নাশ হওয়া। মায়ে নাশ মানে মহালয়। পূর্ণভাবে ও অবিচ্ছিন্নভাবে নাশ হতে থাকলে তখন সে দর্শন শুভ্রকিরণ, রঞ্জনাশূন্য। বিষয়ধ্যান থেকে লয় অবধি এভাবেই হয়ে থাকে। এরই অপর নাম যোগ, অর্থাৎ যে ক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত হওয়া যায়। যোগক্রিয়ারূপ ধ্যান অবলম্বনেও একইভাবে সমাধিলাভ হয়।

যে পরিমাণে ধ্যান প্রগাঢ় হয়, সেই পরিমাণে মাতৃশক্তি উদ্দীপিতা হয়ে হৃদয়ে একটা শক্তির আবর্ত্তন রচনা করে। এটাই ধীশক্তি, আমাদের পথসঙ্গিনী হয়ে পথ দেখাতে থাকেন। এই ধীশক্তিই ত্রয়ী বিদ্যার মূল, গায়ত্রীরূপে ব্রাহ্মণহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। আজকাল সহজলভ্য ছাপাখানার দৌলতে

গায়ত্রীমন্ত্রের আর গোপনীয়তা নাই সত্য কিন্তু কার্য্যকারিতাও নাই। মানুষের ছবি যেমন মানুষ নয়, কাগজে ছাপা মন্ত্রও মন্ত্র নয়। যাক সেসব অন্য কথা। মন্ত্র কার্য্যকরী হলেই সেই ধীশক্তি উজ্জীবিতা হয়ে জীবের মঙ্গল অণ্বেষণ করে। তাই ধ্যান শুধু ধ্যান নয়, ধ্যানই বেদমাতা, স্রষ্টা ও সবিতা। ধ্যানে যেমন ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেছেন তেমনি তুমিও তোমার অবস্থাসকল তৈরী করেছ। ধ্যানশক্তির ফল অনিবার্য্য। যোগক্রিয়ানুষ্ঠানের সময় ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুরূপে প্রকটিত হয়ে থাকে। তাই ধ্যান হচ্ছে কারণশরীর। ভাবনাময় দেহ রচিত হচ্ছে মানে শীঘ্রই স্থূলকোষ অবধি রচিত হবে। তারপর সেটা প্রগাঢ় হলে হবে ভাবদেহ। ওটা কামদা তাই কামদেহ। একেই গীতায় "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" বলা হয়েছে। সেই কামদায়িনী লীলাবিলাসচাঞ্চল্য লাভ করলে তার ভৈরবী মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। রাগচর্চিতা সে মূর্ত্তি লীলা-প্রকটন-নর্ত্তনশীলা হয়ে থাকেন। এটাই "কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে"। সে ভৈরবীর তাণ্ডবনৃত্যে আমরা জগৎ সংসার ভূলি। এই ভৈরব উল্লাসময়ী কামমূর্ত্তি প্রাণে প্রকটিত হলে জগৎ মনে ও স্মৃতিতে থাকলেও সবই যেন ঢেকে যায়। এটাই "ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ"। ভৈরবী ষড়স রাগে রঞ্জিতা হয়ে মোহিনী স্থূল ধ্যেয় মূর্ত্তিতে মানুষকে বা সাধককে বিমুগ্ধ করে তার স্মৃতিবিভ্রম করে। মোহিনীমূর্ত্তিতে সেই স্মৃতিবিভ্রম হলেই স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি তিরোহিত হয় ---- তার লয় হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বর্ণরঞ্জনাও পাল্টে যায়। তত্ত্বসকল পর পর এসে বিচিত্র বর্ণবেশে প্রাণকে মুগ্ধ করতে থাকে। সে বর্ণরঞ্জনা দেখা যায় সর্বত্র, তবে বিশেষভাবে ললাটক্ষেত্রে ও হৃদয়ক্ষেত্রে। জ্যোতির্গোলকের কথা পরে বলা হবে তত্ত্ববিচার আলোচনার সময়। যাঁরা এভাবে ধ্যানের স্তরগুলোকে উপলব্ধি করতে পারেন, কোন ধ্যান কতদিনে স্থূলে বা কার্য্যে পরিণত হবে, ধ্যানপ্রবাহ কোন স্তরে গতিহীন হয়ে পড়লে সুকৌশলে সেই স্তর থেকে বেগময়ী গতি প্রদান করা যায়। এজন্যই গায়ত্রী বেদমাতা। শ্রীভগবান বলেছেন মন্ত্রের মধ্যে আমি গায়ত্রী। তাই গায়ত্রী ধ্যানেই এসকল প্রত্যক্ষ হয়। আত্মা দেহান্দ্রিয়াদির সাথে মিশে জলে দুধে মিশে যাওয়ার মত থাকে তখন তাকে প্রাণেন্দ্রিয়ের চেষ্টা হতে পৃথক করে বের করাই অসম্ভব। চালাক যাঁরা তাঁরা প্রাণময়রূপ মন্থনক্রিয়া দ্বারা সেই জলেদুধে এক করা বস্তুটাকে দেহান্দ্রিয়রূপ জলভাগ থেকে পৃথক করে ফেলেন। একবার পৃথক হয়ে মাখন হয়ে গেলে আর জলে মিশবে না, জলের উপর ভাসবে। কিন্তু বুদ্ধি ঠিকানায় না থাকলেই মুশকিল হয়। তখন গুরুর কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সব ভুল হয়ে যায়। স্মৃতিভ্রংশ অবস্থা বড়ই বিপদের যা আগে বলা হল। সব জেনে বুঝেও যদি একটুও সচেতন না হওয়া গেল তবে আর গীতাপাঠে লাভ কি হল ? যাক সে কথা। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিচরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কি করে ধ্যান থেকে মুক্তি আসে সেটা বলার পর, এখন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিভাবে বিষয়সমূহে বিচরণ করেন সেটা বলছেন। ২/৬২-৬৩

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ।। ৬৪

অনুবাদ: রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। (ব্রজেৎ কিম্ এই প্রশ্নের উত্তর)॥ ২/৬৪

ব্যাখ্যা: সাধারণ মানুষ যারা যোগযুক্ত নয় বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকলেও তাদের মন থেকে বিষয়ানুরাগ যায় না। আবার যুক্তপুরুষে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। কারণ তাঁরা বুদ্ধিযোগের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় বিষয়ভোগ করেও যথার্থ শান্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। এই দুই বিপরীত গতি বোঝাতেই মূল শ্লোকে "তু" শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ মানেই যোগযুক্ত অতএব মাতৃঅনুরাগাপন্ন হওয়ায় তাঁদের বিষয় সম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলোও ততটাই অনুরাগশূন্য। তাই বিষয়সকল বিষ না হয়ে শান্তিপ্রদ হয় ও সাধনে সহায়কই হয়। যতক্ষণ আমরা কোনও কিছুকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করি, যতক্ষণ কোনও জিনিষের প্রতি বিদ্বেষ থাকে বুঝতে হবে ততক্ষণ প্রাণে সে জিনিষের সংস্কার বদ্ধমূল আছে। তাই অনুরাগের মতই বিদ্বেষও বন্ধনের হেতুমাত্র। যতক্ষণ বিষয়সকল থেকে তফাৎ হওয়ার ধারণা রাখি ততক্ষণ আমি বিষয়ীমাত্র, একথা যেন মনে থাকে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের রাজঐশ্বর্য্য ছিল তাই তিনি সেটা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। যার কিছুই নেই সে কি ত্যাগ করবে ? বরং সে যদি বিষয় ত্যাগের ভাবনা ভাবে উল্টে বিষয়ে আবদ্ধ হবে মাত্র, সেটাই হবে গোষ্পদে ডুবে মরার সামিল। ত্যাগ ভাল, কিন্তু ত্যাগ পর্য্যন্ত যাঁর ত্যাগ হয়েছে সেই মহাপুরুষ, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। এজন্যই ভগবান অনুরাগ ও দ্বেষ উভয় প্রকার সংস্কার হতেই বিযুক্ত বলে স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষকে বর্ণনা করলেন। বুদ্ধিযোগের দ্বারা আত্মস্বরূপে যুক্ত হয়ে যদি থাকা যায় তবেই এই বিষয়ানুরাগ ও বিষয়দ্বেষ থেকে বিযুক্ত হয়েও, এরই ভিতর বিচরণ করেও আত্মযুক্ত অথবা মাতৃসংযুক্ত হয়েই থাকেন। এখন প্রশ্ন এটা করা কিভাবে সম্ভব ? যে ইন্দ্রিয়েরা সুখমোহে আমাদের আবদ্ধ করে সেসব ইন্দ্রিয়ই সবরকম ভোগের মধ্যে থেকেও কিভাবে শান্তি পায় ? এটা সম্ভব হয় কি করে ? আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির অভাবে। এটা যদিও অনেক আগেও আলোচনা হয়েছে। আবারও বলি, স্পন্দনতত্ত্ব বোঝাবার সময় বলেছিলাম যে আমাদের জড় তত্ত্বসকল আকুঞ্চন - প্রসারণ বা আকর্ষণ - বিকর্ষণ এই দুইরকমের কাজ করে বলে আমরা দুরকম ইন্দ্রিয় পেয়েছি - জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় আকর্ষণের বা আকুঞ্চনের জন্য এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বিকর্ষণ বা প্রসারণের জন্য গঠিত হয়। মন ঐ সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বা বিষয়ে অহর্নিশ এত আকৃষ্ট থাকে যে ইন্দ্রিয়সকল মূহূর্ত্তের জন্যও নিস্তরঙ্গ থাকার অবসর পায় না। বিষয়ের সংস্পর্শ মাত্রেই আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়ে মনকে অভিনিবিষ্ট করতে থাকে। যেমন মন যদি ভগবদ্‌যুক্ত হয় তবে যেখানে যেখানে ভগবদভাবের উদ্দীপন থাকে শুধুমাত্র সেই সেই ক্ষেত্রেই আকুঞ্চন - প্রসারণ থাকে। এজন্যই যে যেমন ভাব অবলম্বনে থাকে তার ইন্দ্রিয়ও সেসব বিষয়ই চট করে পায়। মন প্রধান হলেও ইন্দ্রিয়গুলোরও নিজের নিজের শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম আছে।

তাই মন যেভাবে যুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়দের পরিচালনা করে - ইন্দ্রিয়রাও সেই সব ভাবোদ্দীপক গুণে গঠিত হয়ে যায়। শুধু ইন্দ্রিয় কেন পুরো শরীরটাই মনের গুণ অনুযায়ী গুণী হয়ে ওঠে। এজন্যই ভগবদপ্রাণ পুরুষ বিষয় সকলের মধ্যে থেকেও বিষয়ে আসক্ত বা অভিভূত কোনটাই হন না। সেইজন্যই আগে বলেছি যে অনুরাগ বা বিদ্বেষ যে ভাবেই বিষয়কে দেখ সেটাই বন্ধনের কারণ। তাই শ্রীভগবান বলছেন রাগ বা বিদ্বেষ প্রবলভাবে থাকলে আমাকে পাওয়া যায় না। প্রাণ আমাতে মুগ্ধ হলে, অন্য কোনও পদার্থে বা ভাবে অনুরাগ বা বিদ্বেষ সম্বন্ধ থাকে না, তাই তখনই পরমানন্দ প্রসাদ লাভ হয়। অপূর্ব প্রসন্নতায় অহর্নিশ মগ্ন থাকা যায়। তেমন প্রসন্নতা এলে কি হয় ? ২/৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ।। ৬৫

অনুবাদ : আত্মপ্রসাদ জন্মিলে ইহার সর্ব্বদুঃখের নাশ হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। ২/৬৫

ব্যাখ্যা : পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের "ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ" অর্থে বিষয় সকলের ধ্যান ও তার ফলে বন্ধন এবং তার পরের শ্লোকে "রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্ত " রাগদ্বেষাদির থেকে বিমুক্ত হলে অর্থাৎ ভগবানে বা আত্মায় যুক্ত হলে বিষয়ের মধ্যে থেকেও পুরুষ স্বচ্ছন্দে প্রসন্নতা লাভ করেন। তাই এই শ্লোকের অর্থও প্রসন্নচিত্ত পুরুষের আধ্যত্মিক, অধিভৌতিক এবং অধিদৈবিক কোনও প্রকার দুঃখই আর উপলব্ধি হয় না। অতি শীঘ্রই তার চিত্ত সমাহিত হয়ে পড়ে। এই প্রসন্নতা লাভ হলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। অনন্ত মর্ম্মদাহ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়। চিত্ত প্রসন্ন হলে বুদ্ধি সম্যকরূপে মায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মন সন্তুষ্ট থাকে। আর মন সন্তুষ্ট হলেই সব দুঃখ নাশ হয় ও বুদ্ধি স্থির থাকে। মায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই আত্মায় স্থিতিলাভ করা। মনের তুষ্টি কিভাবে হয় ? বিষয় পেয়ে মন আবার বিষয় খোঁজে। তাতে তো মনের তুষ্টি মোটেই হয় না। সেজন্যই সাধক এমন কিছু কাজ করে থাকেন যা বিষয়সম্পর্ক বর্জ্জিত। আপাত লাভবিহীন। ঈশ্বরে সমর্পিত এই কাজকেই ক্রিয়া বলে। ক্রিয়ার দ্বারা মন আত্মাকারা হয়, তখন তাতে আর তরঙ্গ থাকে না। এই নিস্তরঙ্গ ভাবই মনের প্রকৃত সন্তোষ। তখনই প্রকৃত প্রসাদ লাভ হয়। এটাই আত্মপ্রসাদ। যখন মন আত্মাকে ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, তখন আর দুঃখের অন্ত থাকেনা। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি আকাশের ন্যায় অবস্থান করে ও আত্মস্বরূপে নিশ্চলা হয়। যে চিত্ত নির্ম্মল তাতে একমাত্র আত্মবোধ ছাড়া অন্য বিষয় রুচিকর হয় না। অজ্ঞান হতেই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। দেহাদিতে চিত্ত সর্ব্বদা থাকে বলেই দেহভ্রম নষ্ট হয় না। মুখের কথায় বা ছাপা বইয়ের জ্ঞানে কিছুই লাভ হয়না। দেহবুদ্ধি ঘোচে না। চিত্তপ্রসাদই প্রসাদ,

প্রকৃত জ্ঞান। যখন সব আকাশ হয়ে যাবে এবং সেই আকাশেই মন লয় হবে, চিত্ত জমে যাবে, তখনই প্রকৃত বুদ্ধি উদয় হবে। জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্রে তাই আছে "চলচিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেচ্ছিবঃ"। চঞ্চলচিত্তে কেবলই শক্তি বা মায়ার খেলা। মায়াই ওর বসার জায়গা। আর স্থির চিত্তই পরম ব্যোম - তাইই শিবের থাকার জায়গা। যদিও দেখি প্রহ্লাদ আদর্শ ভক্তিতে ঈশ্বরে মিশেছেন অপরদিকে ধ্রুব কামনা তাড়নায়, প্রতিহিংসা প্রেরণায়, ঈশ্বরকে পেয়েছেন। ফল প্রাপ্তিতো দেখছি একই, অবশ্য যদি ফলে কিছু তফাৎ থেকে থাকে, সেটা আমার বুদ্ধির বাইরে। ২/৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ।। ৬৬

অনুবাদঃ (ব্রহ্মে) অযুক্ত ব্যক্তির (আত্মবিষয়িনী) বুদ্ধি নাই; অযুক্ত ব্যক্তির (আত্মবিষয়ক) ধ্যানও হয়না; আত্মধ্যানবিহীন ব্যক্তির শান্তি নাই, শান্তিহীনের (মোক্ষানন্দরূপ) সুখ কোথায় ? ২/৬৬

ব্যাখ্যা : আগেই বলেছি বুদ্ধিযোগ অবলম্বন না করলে প্রাণে ভগবদবেদন অনুভব হয় না। সে অবস্থায় কোনওরূপ বিচার তর্ক ইত্যাদিতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু বস্তুবাদী সমাজে যে যত বড় মূর্খ হয় সে তত লম্বা স্পীচ ঝাড়ে। বুদ্ধিযোগ অবলম্বনে যোগযুক্ত হতে পারলেই মীমাংসা আপনা আপনিই হয়। যোগযুক্ত হলেই প্রাণে ভাবও সঞ্জাত ও উপজাত হয়ে থাকে। আগেই বলেছি ভাবই ভগবদ্গতি, "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন", প্রাণে ভাব না এলে শান্তি কোনও উপায়েই পাওয়া যায় না। শান্তিলাভ না করলে আর সুখ কোথায় ? ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যাতীত বুদ্ধি হওয়ার জো নেই। যাঁর এ অবস্থা হয়নি, তাঁর ভাব নেই, ভাব নাহলে শান্তি নেই। তো সুখ কোথায় ? আমরা দুখানা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েই মনে করি বুঝতে আর কিছু বাকি নেই। তাড়াতাড়ি জয়ঢাক বাজাতে শুরু করে দিই। কিন্তু বৃত্তির দ্বারা যুক্ত হতে না পারলে কিছুই যে অনুভবে আসে না সেকথা ভুলে যাই। আমাদের এই প্রকার উদ্ভট বিষয়বুদ্ধি কোনও বুদ্ধিপদবাচ্যই নয়, বরং বিষয়বিকার বৃদ্ধির হেতু মাত্র। এতে বরং মনের অভাব বৃদ্ধি হয়, অশান্তিতে ঘিরে ধরে। যাহোক, অনুভবের দ্বারা আত্মায় যুক্ত হলে তাঁকে স্পর্শ করে থাকা অভ্যাসে পরিণত হলে, ধীরে ধীরে সেই মহতী পবিত্রা ব্রহ্মপ্রেরিতা ধীশক্তি উদ্বোধিতা হয়। এই ধীশক্তির আরাধনায় একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই নিত্য অভ্যস্ত ছিলেন। তখন তিলে তিলে আনন্দ আসে। একটা আলোকবিম্ব (Beam of light) প্রাণের উপর পড়তে থাকে। তখন একটু একটু বোঝার সুত্রপাত হয়। তাই বলি কষ্টার্জ্জিত এই বুদ্ধির অপব্যবহার কোরো না। বুদ্ধিকে বৃথা তর্কে অপচয় না করে, এস তাইই, মায়ের উদ্দ্যেশ্যে অর্পণ করি, তবে শান্তি ও সুখ পেতে পারি। ভাব যথার্থ অমৃতপ্রবাহ। এ ভাব তাঁতে যুক্ত না হলে হয় না। জগতের সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় এক প্রকার সুখ আছে। জাগতিক সুখের অতীত হলেও সে অবস্থায় সুখেরই সুপ্রতিষ্ঠা মাত্র উপলব্ধি করা

হয়ে থাকে। এই সুখ অনন্ত, পূর্ণ-- এই সুখই ব্রহ্মস্বরূপ। এর জন্য ইন্দ্রিয়গুলো যাতে খেয়াল খুশিমত না চলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। ২/৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ।। ৬৭

অনুবাদ: যেহেতু বায়ু যেমন (প্রমত্ত কর্ণধারের) নৌকাকে জলে বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ মন বিষয়ে ভ্রমণশীল অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটির অনুগমন করে সেইটিই তাহার (মনের বা পুরুষের) প্রজ্ঞাকে হরণ করে (বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে)। ২/৬৭

ব্যাখ্যা: বিষয়ে আশয়ে জীবের এত অনুরাগ কিসের জন্য? বিষয় সম্পত্তি মানুষের মনকে এমনই ভাবে হরণ করে, চুরি করে। এ চোরের হাত থেকে নিস্তার নেই ? কারণ বাসনার বায়ু যখন যে ইন্দ্রিয়পথে মনকে তাড়না করে অযুক্ত পুরুষ তখন সমস্ত বিচার বুদ্ধিকে উপেক্ষা করে সেই বিষয়েতেই দৌড়ে যায়। মহাত্মা কবীরদাসজী বলেছেন মনে ভক্তি আসবে কোথা থেকে ? মনের ঘাড়েই যে ভূত চেপে আছে।

"কঁহা সো ভক্তি ভেট ?
তিন চিজ সে লটপটাতা হ্যায়
দামরী, চামরী, পেট।"

মন তো লটপটাচ্ছে বিষয়ের মধ্যে, বাসনার মধ্যে। ইন্দ্রিয়েরা বিষয়ে বিচরণ করে, তার মধ্যে মন যেটার অনুধাবন করে সে পথেই আমরা নিজেদের প্রজ্ঞাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলি। একটু নিজের কথাও এসে যায়। ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে যৌবনভর রাজনীতি করলাম। কাগজে নিয়মিত লেখালিখিও করেছি। সিনেমা দেখার নেশাও ছিল, সিনে ফোরামেরও সদস্য ছিলাম দীর্ঘদিন। বড় লাইব্রেরীতে নিয়মিত পড়াশুনাও করতাম। কিন্তু, সকলই অযুক্ত অবস্থায়। পরিণামে নিজেরই ক্ষতি সাধন। ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও রেজাল্ট ভাল নয়। কখনও কোনও সৎকাজে লাগিনি। একশ্রেণীর লোককে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করায় সহায়তা করা হয়েছে মাত্র সেই সাথে বিশেষ রাজনৈতিক দলের পুষ্টিলাভ। দলীয় স্বার্থের পুষ্টি মানেই মানুষকে শোষণ, এতে কোনও সন্দেহ থাকতেই পারেনা। অযুক্ত বুদ্ধি থেকেই জীব এই জাতীয় কাজকর্ম্ম করে বসে, যার উপরে নিজেরই প্রজ্ঞা কার্য্যকরী হয় না। অথচ স্থির বুদ্ধিযুক্ত হলে এভাবে মূল্যবান সময় কুকাজে নষ্ট হত না। বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হতে না পারলে সে বৃথা বুদ্ধি নিয়ে কোনও কাজই হয় না। কারণ বুদ্ধি ঠিকানায় থাকেনা। বুদ্ধি স্থির না থাকলেই নষ্ট

হয়। রান্না করে রাখা তরিতরকারী যেমন বেশী নাড়া ঘাঁটা হলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তেমনই স্কুলের মাস্টারমশাইরা ও পাড়ার দাদারা কিশোর মনকে নাড়াঘাঁটা করে মন বুদ্ধিকে চঞ্চল করতে সাহায্য করেন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তোলেন। তখন আর বুদ্ধি ঠিকানায় থাকে না, ছুটে এসে ইন্দ্রিয়ও মনের সাথে যোগ দেয়। ক্রমশঃ এমন একটা অবস্থায় আসে যখন আর মন থেকে বুদ্ধিকে আলাদা করে চেনা যায় না। মনে হয় মন আর বুদ্ধি বুঝি একই জিনিস। এই অবস্থাই বুদ্ধির ঠিকানা হারিয়ে ফেলা। তখন আর আত্মা - ভগবান - কোনও কিছুরই সম্বন্ধে, মনে থাকে না। কেবলই, "কি খাব, কি খাব" ভাব। "দামরী" অর্থ হল টাকাকড়ি, "চামরী" বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট ভোগ্যশরীর, "পেট " রসনালোলুপ খাদ্য - অখাদ্য বস্তু। এরাই সকল প্রজ্ঞা হরণ করে।

তাহলে, বুদ্ধি ঠিকানায় থাকে কখন ? "যস্য তুং মস্তকোপরি" প্রাণ মস্তকোপরি চড়ে বসলে বুদ্ধিও সেই ঘর মুখো হয়। তখন আর তাতে কোনও বিষয়াভিনিবেশ থাকে না। সে বুদ্ধি তখন একমুখী হয়ে ব্রহ্মাবিজ্ঞানদায়িনী হয়। এটাই স্থিরভাব ও স্থিরবুদ্ধি অবস্থা। যতদিন এ অবস্থা না আসে ততদিন তোমার আর্তনাদ দূর হবে না। সকল প্রজ্ঞাই হরণ করবে। তাই বলেছিলাম যে চোরের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। সে জন্যই পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন. ২/৬৭

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৬৮

অনুবাদ : অতএব, হে মহাবাহো, যাহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল হইতে সর্বতোভাবে নিগৃহীত (বশীকৃত) হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত (জানিও)। ২/৬৮

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে "মহাবাহো " বলে সম্বোধন করেছেন। কারন বাহু অর্থাৎ এই হাত দিয়েই আমাদের সব কিছু স্পর্শ করে দেখার বা গ্রহণ করার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সেই স্পর্শ ও গ্রহণের ইচ্ছাকে লক্ষ্য করেই মহাবাহু বলা হয়েছে। সাধককে বাহ্যপ্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে হবে। তুমি বাহু প্রসারিত কর, হাত বাড়াও, তোমার বাহু তো ক্ষুদ্র নয়। অনন্তকে স্পর্শ করার মত উপযুক্ত বাহু তোমার আছে। আমিও হাত বাড়িয়ে দেব। সব বিষয়ের মধ্যেই আমাকে দেখতে চেষ্টা কর, সর্বত্র আমাকে পাবার, আমাকে স্পর্শ করার স্পৃহা জাগিয়ে তোল, স্পৃহাকে বাড়িয়ে তোল, বিষয়, রূপ, অপনিই স্খলিত হয়ে পড়বে। আমাকে স্পর্শ করার স্পৃহা ইন্দ্রিয়ের সকল স্পৃহাকে বিকর্ষণ করবে। তখন ইন্দ্রিয়সকল আমার দ্বারা নিগৃহীত হবে। "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।" আমার স্পর্শসুখ পেয়ে তোমার প্রজ্ঞা আমাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই বৎস মহাবাহু, বাহু প্রসারণ

কর, আমাকেই ধর, আমাতেই মিলিত হও, আমাকেই নমস্কার কর, "মম্মনাভব মদ্ভক্তো " এভাবেই হবে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। এর অর্থ কিন্তু ইন্দ্রিয় ধ্বংস নয়, বরং ইন্দ্রিয়কে সঠিক অনুভবের কাজে লাগান, যাতে নিজ ধীশক্তির সম্যক বিকাশ হয়, ধীশক্তি বিবর্দ্ধিত হয়। সাধারণ বিষয়সকল হতে অপসৃত হলে ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্মশক্তি অর্জন করে, কারণ প্রবৃত্তি ঘুরে দাঁড়ায়। বিষয়ে সংকোচ হলেই আত্মার প্রকাশ। নিগ্রহ অর্থে আত্মার পরিগ্রহণ, একদিনে হয়না, আস্তে ইন্দ্রিয়সকলকে বাইরের কাজ থেকে সরিয়ে এনে নিজের স্বার্থে, নিজের কাজে, নিযুক্ত করতে হয়। তাতে দুটো লাভ হয়। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্মুখী ব্যবহারে ইন্দ্রিয়গণ নিজের নিজের কাজে লাগে, দ্বিতীয়তঃ, তাদের শক্তি, অনুভব সবই বাড়তে থাকে। প্রবৃত্তি অন্তর্মুখী হলেই, নিজেতে ফিরে এলেই, সেটা তখন নিবৃত্তি। নীট লাভ ধীশক্তির উন্মেষ ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি। তখন ধীশক্তির অনুভব হলে বুঝবে তোমার সাথে অন্যান্য সকলের বোধ বুদ্ধির কি তফাৎ। এসব অনুভবের দ্বারা, বোধের দ্বারা বুঝতে হয়, বলে বা লিখে বোঝান যায় না। একবারে হয় না। একটু একটু করে হয়, তবে ধৈর্য্য ধরে লেগে থাকতে হবে। সব বিষয়ের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে মা আমাদের গ্রহণ করলে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন অচল অটল ভাবে তাঁতে সংযুক্ত থাকতে পারব। ইন্দ্রিয়গণও নিজের নিজের কাজ করে চলবে। মনটা এমনভাবে আপনিই আটকে থাকবে যে বোঝা যাবে ইন্দ্রিয়দের দ্বারা সব বিষয়েরই বোধ হচ্ছে অথচ মনের সেই আটকানো অবস্থায় বিষয়ের প্রতি কোনও আগ্রহ বা আকাঙ্খা হচ্ছেনা। শান্তিলাভের কি সহজ উপায়! ২/৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ।।৬৯

অনুবাদ : (অজ্ঞানাচ্ছন্ন) সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা (আত্মনিষ্ঠা) নিশাস্বরূপ, তাহাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন। যাহাতে (বিষয়বুদ্ধিতে) সর্ব্বভূত প্রবুদ্ধ থাকে, তাহা (বিষয়নিষ্ঠা) আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশাস্বরূপ। ২/৬৯

ব্যাখ্যা : পূর্ব্ববর্তী শ্লোকের সূত্র ধরেই বলা যায় যে ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, তুমি যদি তাদের বশীভূত না হও তবেই তোমার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। তাহলে এই লোকে তো আর এমন সুপ্ত লোকের মত লোক তো দেখাই যায় না। অতএব স্থিতপ্রজ্ঞের এরূপ লক্ষণ অসম্ভব হওয়ার আশঙ্কায় বলছেন যে সাধারণ সমস্ত প্রাণীজগতের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা নিশাস্বরূপ কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই আত্মনিষ্ঠা বিষয়ে জাগ্রত থাকেন। শঙ্করাচার্য্যও বলেছেন, "আত্মনিষ্ঠায় সাধারণ জগৎ নিদ্রিত, অলস, নিশ্চেষ্ট। বিষয়াদিই সাধারণ জীবসংঘের দিবাস্বরূপ; কেননা তাহারা উহাতেই সক্রিয় থাকে। মুনিদিগের উহাই নিশা। তাঁহারা বিষয়াদিতেই নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন।" আত্মনিষ্ঠা, মাতৃনিষ্ঠা, ব্রহ্মনিষ্ঠা বা ঈশ্বরনিষ্ঠা সকলই একই

কথা। এই নিষ্ঠায় জাগ্রত - প্রবুদ্ধ হতে হলে মহানিশায় সাধনা করতে হয়। সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ সমস্ত উদ্যম, উদ্বোধন সমস্ত সক্রিয়তা দূর করে মৃত্যুর মহানিদ্রায় নিদ্রিত হয়। সাধারণ জীবমণ্ডলীর এটাই মহানিশা। সমস্ত প্রাণীর, সকল ভূতের মৃত্যু মহানিশাস্বরূপ। তাহলে দিনটা কি ? বিষয়াসক্ত জীবকুলের পক্ষে বিষয়াদিই দিবাস্বরূপ যেহেতু বিষয়েই তারা জাগ্রত ও সক্রিয় থাকে। যেটা হল মুনিদের নিশা। কেননা তাঁরা বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ও স্পৃহাশূন্য। এটাই তাঁদের মহাউদ্বোধন, মহাজাগরণ। সাধারণ মানুষ মরণ সম্বন্ধে নিদ্রিত। অসাধারণ পুরুষ মরণেই জাগ্রত। সাধারণ মানুষ মরণের নাম শুনলে সে জায়গা পরিত্যাগ করে কিন্তু সাধু মরণের ধ্যানেই অহর্নিশ বিভোর । কারণ মরণ তাঁর কাছে নবজাগরণ। পূর্ণভাবে মরতে পারলেই তো মৃত্যুঞ্জয় হয়। তাই সাধক চায় মরণ, যা হল সজীব সচেতনতা। তাইতো সাধু সংসারের ভিতরও শুধু শ্মশানের দৃষ্টি দিয়েই দেখতে চেষ্টা করে। আত্মাকে জানতে পারলে মরাই বাঁচা। আত্মজ্ঞান বিনা জীবন ধারণ সেটা মরণই। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এসব কথার কোনও মূল্য নেই। তাই সে শ্মশানভূমিকেও সংসারের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে চায়। তাই তারা মরণচিন্তা বিস্মৃত। এতো গেল জীবদ্দশায় পার্থক্য। তারপর মরণেও পার্থক্য আছে। মরণের পর সাধারণ মানুষ যখন স্থূল শরীর ছাড়ে তখন চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়, কারো কারো ঈষৎভাবে প্রেত ও স্বর্গলোক অবধি থাকে, কিন্তু প্রায় সকলেরই অজ্ঞানান্ধকার আসে ও সুগভীর আঁধারে চৈতন্য নিভে যায়। অনুভবশূন্য অবস্থায় ঊর্দ্ধলোক সকল অতিক্রম করে আবার নিচের স্থূল জড়ে ফিরে এসে তবে চৈতন্য স্ফূরিত হয় - মানে ঝবহংব আসে। কিন্তু মরণসাধনসিদ্ধ পুরুষ পূর্ণ অনুভব নিয়ে সবকিছু দেখতে দেখতে যান। দেহ ছেড়ে বিজ্ঞানময় কোষে আনন্দের সাথে নিজ মহিমা অনুভব করেন, জ্ঞানের দ্বারা পরবর্ত্তী কর্তব্য স্থির করেন, কর্ম্মসাধনের জন্য মর জগতে ফিরে আসা বা না আসা স্থির করেন। পামাত্মায় লীন হতে পারলে হন, না হলে বাকি কাজ সম্পূর্ণ করতে আসতে হয়। কারণ তখন জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই জ্ঞানপূর্ণ, ইহলোক পরলোক উভয়ই তীর্থ ভ্রমণের মতন ব্যাপার হয়। এভাবেই মরণে জাগতে হয়। কালভয়ে নিজের ঘুম ভাঙ্গাতে হয়। সূক্ষ্ম কোষে সাধারণ জীব সুপ্ত, অজ্ঞান তমাচ্ছন্ন। কিন্তু সাধকের সমস্ত ক্রিয়াশীলতা সূক্ষ্ম শরীরেই থাকে। তাঁর প্রাণশক্তির কেন্দ্রসকল, যা মূলাধার ইত্যাদি চক্র নামে অবস্থিত, সেগুলো জ্যোতিরশ্মি সম্পাতে জাগ্রত ও কুসুমিত থাকে, তাই তাঁর কাছে মৃত্যুর কোনও বিভীষিকা থাকে না, বরং অমরত্বের অনুরাগে হৃদয় উজ্জ্বল থাকে। ২/৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ।। ৭০

অনুবাদ: যেমন (নানা নদীকতৃক) আপূর্য্যমান হইয়াও অচঞ্চল, এতাদৃশ সমুদ্রে (অন্য) জল প্রবেশ করে (তাহাতেই মিশিয়া যায়); সেইরূপ যাহাতে কামনাসকল প্রবেশ করে (লীন হয়) তিনিই শান্তি

প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ কামভোগেও যিনি অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে অবিচলিত, তিনিই মোক্ষ লাভ করেন) কিন্তু ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ২/৭০

ব্যাখ্যা : আগের সব শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যায় স্থিরতা লাভের যেসব উপায় বলা হয়েছে সেভাবে স্থৈর্য্য লাভ হলে তিনি পূর্ণত্ত্বের দিকে এগোচ্ছেন বুঝতে হবে, তখন জগতের বৈষয়িক কামনা আর হৃদয়কে আন্দোলিত করতে পারে না। আপূর্য্যমান নদ, নদী, প্রপাতের মত বিষয় সকল তার মধ্যে অগাধ ভাবসমুদ্রে,কোথায় মিশে যায়, সব শান্ত হয়ে যায়। পরিপূর্ণ হৃদয়ে তার প্রকৃতিসিদ্ধ অন্য কোনও বাসনা কখনই বা ওঠে, কখনই বা মিলিয়ে যায়, সেসব তার প্রাণ জানতে চায় না। পূর্ণতম আত্মতত্ত্বে যুক্ত থেকে সে এক অনির্ব্বচনীয় আত্মসত্তায় মিলেমিশে আছে বলে অনুভব করে, যদিও এই অবস্থায় আর অনুভবাদি বড় বিশেষ থাকে না বা থাকলেও সেসবের খেয়াল খুব একটা কিছু থাকে না। কোন কামনা জাগলেও সে কামনা তাকে অন্তর্মুখেই পরিচালিত করে। সেটাও মাতৃশক্তি বা আত্মশক্তিতে মিশে থাকে ও শক্তি হয়ে যায়। ফলে সে কামনা পূরণের জন্য কোনও অভাববোধ থাকেনা। সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধির ফলে কামনাগুলোকেও বরং আত্মারই ভিন্নমূর্ত্তি বোধ করেন। এইভাবে স্থূল, জড়জগৎ হতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সব কিছুতেই আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন ও অন্নপূর্ণার স্বরূপ বোধ করেন। এটাই ক্রমশঃ পূর্ণত্বলাভ, এটাই শিবত্ব। তখনই মহেশ্বরের মত অমৃতভিক্ষা লাভ করে। কৌশম্ভঃক্ষরিণী জননী শিবস্বরূপ জীবের মাথায় মোক্ষবারি অভিষেক করেন। এভাবেই জীব তখন শিব, বিষয়রূপিণী মা অন্নপূর্ণা। তাই জীব হোক বা শিব হোক, নামরূপ উপাধি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জীব ভিক্ষুক। তাই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক। জীবজগতের আদর্শ হবার জন্যই ব্রাহ্মণ ভিক্ষাব্রতী হন। সকল জীবকুলের প্রতিনিধিত্ব করে বিরাট জ্যোতির্ম্ময়ীর দ্বারে অন্ততঃ তিনবার করে গায়ত্রী আকারে অমৃত ভিক্ষা করার জন্য ভিক্ষাকেই জীবিকা করে নেন। ব্রাহ্মণ একা মোক্ষের ধান্ধা মাথায় নিয়ে একার জন্য নয়, সমষ্টির জন্য ভিক্ষুক। উপনয়নের সময় হতে এ ভিক্ষা শুরু হয়। সংস্কারশুদ্ধ শরীরে, নবসংস্কারপূত হৃদয়ে, যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, দন্ডী হয়ে, গায়ত্রীরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, পুণ্যদৃষ্টিতে, মাতৃমুখ পানে চেয়ে বলে, "ভবতী (ভগবতী) ভিক্ষাং দেহী"। ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার অন্যকিছু নয়, অন্নপূর্ণার কাছে মহেশ্বরের মত অমৃতভিক্ষার উদ্বোধন মাত্র। ব্রাহ্মণশিশু মহাপুণ্য ভিক্ষালাভ করার জন্য কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এইভাবেই ভিক্ষুজীবনের প্রতিষ্ঠা করে থাকে, অবশ্যই পুণ্যক্ষেত্র মাঝে, পুণ্যগুরু সন্নিধানে ও পুণ্য জনকজননীর তত্ত্বাবধানে। সাধারণ জীব যখন পঞ্চতম্মাত্রার দ্বারে নিজ নিজ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য ভিক্ষুক, তখন ব্রাহ্মণ পঞ্চমুণ্ডনিবাসিনী অন্নপূর্ণার পূর্ণতত্ত্বের জন্য; জীবসমষ্টির জন্য; জীবকুলের জন্য, ভিক্ষুক। "ধিয়োঃ য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" ই ব্রাহ্মণের ভিক্ষা। এভাবেই ব্রাহ্মণ বা

যুক্ত পুরুষের মত পূর্ণত্ব পেতে হলে পূর্ণে সংযুক্ত হতে হয়, তবেই তো"অচলপ্রতিষ্ঠ' হয়ে স্থৈর্য্য লাভ হয়। ব্রাহ্মণ তাই বলে "আমাদের" আমাকে ভিক্ষা দাও বলে না। যাহোক, শ্লোকের শাব্দিক অর্থ ছেড়ে এবার আসল কথায় আসি। আগে বলেছি যে আমাদের শরীরে, প্রধানতঃ মেরুদণ্ড অঞ্চলে, কতকগুলো প্রাণশক্তির কেন্দ্র আছে সেগুলোকে চক্র বা পদ্ম বলা হয়। বাইরের বিষয়গুলো সব ইন্দ্রিয়বাহিত হয়ে ভিতরে এসে চক্রে চক্রে আবর্ত্তিত হয়ে সবথেকে স্থূল ও নিচের মূলাধারে প্রবাহিত হয়ে যায় ও সঞ্চিত হয়। এটাই সাধারণ মানুষের অবস্থা। এবার মূলাধারচক্র পরিপূর্ণ হয়ে গেলে উপর থেকে নিচে প্রবাহিত শক্তি প্রবাহও দ্রুত কমে যায়। তাই কামনাসকলও কমতে থাকে। শক্তি প্রবাহ যেহেতু নিম্নমুখী তাই চক্রগুলোরও নীচের দিকে মুখ থাকে। মূলাধারের পুঞ্জীভূত শক্তি যখন ঐ শক্তিপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চারিত হয় তখন বের হবার পথ খোঁজে ও ঐ পথে উপরে ওঠে যেমন পর্বতের ওপরের থেকে নিচে আসা জল আবার প্রস্রবণের আকারে (উনুই/উলুই) উঠে আসে, তেমনি ঐ শক্তিও উপরের দিকে উঠতে থাকে আর ঐ উত্তেজনায় (Tension) চক্রগুলোও উর্দ্ধমুখী হতে থাকে তাই তখন কামনাগুলোও উচ্চাংশের ও ভেদশক্তি সম্পন্ন হয়। এই অবস্থার জীবকেই আমরা "প্রতিভাসম্পন্ন " বলি। এখন কেউ হয়ত ভাববেন কামনাজাত শক্তি নিম্নমুখে প্রবাহিত হয়ে মূলাধারে সঞ্চিত হয়ে যখন প্রস্রবণাকারে উর্দ্ধমুখী হয়, তখন উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছ কামনার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই তো সুবিধাজনক। তাতে কামনা বাসনা যত বাড়ান যাবে ততই তো মূলাধারে শক্তি জমবে, আর সঞ্চিত শক্তি সেই কামনার সন্ধানে উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হবে ? কি মজা! তাই না ? আসলে মোটেই তা নয়। কামনা অপরিমেয় রূপে সদাই আমাদের মনোময় ক্ষেত্রে প্রবাহিত থাকে। ওপর থেকে নিচে মূলাধারে কামনাশক্তি প্রবাহের দুটো মাত্র channel বা পথ আছে। সেই প্রণালী বা পথে উচ্চশক্তি অতি সূক্ষ্মধারায় প্রবেশ করে। সেই রন্ধ্রপথ অতীব সূক্ষ্ম। সংকীর্ণ বা সূক্ষ্মমুখে জল ভরতে হলে অমনই সংকীর্ন বা সূক্ষ্ম ধারারই জল ঢালতে হয় নইলে বেগে ও স্থূল ধারায় যতই ঢালা হোক না কেন সবটাই বাইরে পড়ে। সেই রকম কামনার মাত্রা বেশী হলে সেসব বাইরেই থাকে। অতি সূক্ষ্ম প্রণালী (channel) দিয়ে অতি সূক্ষ্মধারায় অতি সামান্য মাত্রই প্রবেশ করে, বাকী সবটাই বাইরে এসে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ম্মবন্ধনে নিযুক্ত করে এবং কাজের আকারে সে শক্তি খরচ হয়ে যায়। সুতরাং কামনারাশি বেশি হলে উলটো মূলাধারে শক্তি সঞ্চয়ের অসুবিধাই হবে। মূলাধারের শক্তি ঊর্দ্ধমুখে উদ্বোধিত হলেই জীব ভগবন্মুখী হয়, তখন কৌশল সাহায্যে ঐ শক্তিকে ঊর্দ্ধমুখী করা গেলে বা দৈবী বা মাতৃ কৃপায় কামনাকে যদি ফেরাবার চেষ্টা করি, তাহলেও ঐ শক্তি যেন ঊর্দ্ধমুখী হয়ে আমাদের ধর্ম্মমুখী করতে পারে। ঐ শক্তির ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতিতে সুষুম্নাপথ পূর্ণ করে চক্রগুলোকে ঊর্দ্ধমুখী করে আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারি। এইভাবে কামনাগুলোকে শক্তিপ্রবাহে রূপান্তরিত করতে পারলে কামনার কামনাত্ব দূর হয়ে পরিপূরক শক্তি হয়ে কাজে লাগবে। সুষুম্নাপথের ছিদ্র বা

রন্ধ্রপথ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র হলেও তার অভ্যন্তরস্থ অনুভবক্ষেত্র আকাশের মতই বিস্তৃত। তাই কামনার ক্ষুদ্র শক্তি সেখানে গিয়ে কোথায় হারিয়ে যায়। তাই শ্লোকেও বলা হয়েছে নদীপ্রবাহ যেমন সমুদ্রে গিয়ে মিশে লীন হয়ে যায় তেমনই ভাবে কামনার শক্তিস্রোতও সেখানে প্রবিষ্ট হয়ে লীন হয়, তাকে আর মোটেই চঞ্চল করাতো দূরের কথা। তাই বলা হয়েছে অসংখ্য নদী সমুদ্রে প্রবেশ করেও সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করতে পারে না, যোগীর চিত্তও এতটাই স্থির যে বিষয়াসক্তির আক্রমণেও সে স্থিরতা অব্যাহত থাকে। তারই ফল পরবর্ত্তী শ্লোকে .. ..

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছিতি ।। ৭১

অনুবাদ : যে ব্যক্তি সমস্ত কাম্য বস্তু উপেক্ষা করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও বিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে ভোগাদি করেন অথবা যেখানে সেখানে ভ্রমণ করেন, তিনি শান্তি (চিত্তোপরতি) প্রাপ্ত হন। ২/৭১

ব্যাখ্যা : যখন চিত্তই আকাশস্বরূপ হয়ে যায় তখন আকাশে আর কি দাগ থাকবে ? ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ একমাত্র ঘরে একাকী আমি যদি আমাকেই ডাকি, সে ডাকের উত্তর দেবে কে ? তাই মুখে ভগবান ভগবান বলে ডাকলে উত্তর পাওয়া যায় না। একটু পন্থাটা পরিষ্কার করে বলি। ঠিক মূলাধারের উপরে সুষুম্না নামক সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট আর একটা সরলপথ থাকে। আগে বলেছিলাম যে বাইরে থেকে কাম কামনার শক্তিগুলো সূক্ষ্মপথে মূলাধারে গিয়ে ঐ চক্রে সঞ্চিত হয়ে তারপর অন্যমুখে উপরের দিকে উঠে আসে। এবার মূলাধার পূর্ণ হলে ঐপথেই (সুষুম্না পথে) সেই শক্তি উঠবার সুযোগ পায়। তা না হলে শক্তিপ্রবাহ একদিক দিয়ে গিয়ে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যেত। এইভাবেই ভোগজনিত শক্তিই দিনরাত চক্রাকারে সুষুম্না পথকে বেষ্টন করে, দখল করে চলেছে। মূলাধারের সঞ্চিত শক্তিটা আর উদ্বেলিত হয়ে সুষুম্না পথে উঠবার জায়গা বা সুযোগ কিছুই পাচ্ছে না। তাই একটা কৌশল করে ভোগজনিত শক্তিপ্রবাহকে থামিয়ে যদি মূলাধার চক্রকে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, তবেই সে শক্তি অনায়সে সুষুম্নাপথে উঠে আসতে পারে। উপায়টা হল যে কেন্দ্র বা মুখদিয়ে বাইরে থেকে ঐ ভোগজনিত শক্তি এসে প্রবেশ করছে, করে মূলাধার ঘুরে আবার বর্হিমুখ হয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে সেই কেন্দ্রমুখে চাবি দিয়ে বন্ধ করা বা একটা প্রতিরোধ স্থাপন করা। সেই কেন্দ্রমুখই হল তিলস্থান বা ললাট। কৌশলে বুদ্ধিযোগের দ্বারা যুক্ত হয়ে থাকতে পারলে এই কেন্দ্রের সঙ্কোচন ক্রিয়া থেমে থাকে, ফলে ভোগশক্তির আবর্ত্তন বন্ধ হয়। কামনাশক্তিপ্রবাহ তখন বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়ে বুদ্ধিতেই যুক্ত হয়ে একটা শক্তিপ্রবাহ রূপে সুষুম্না পথে উঠতে থাকে। তখনই পুরুষ আত্মাতে অহঙ্কারশূন্য, সমস্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য ও মমতাশূন্য হয়ে থাকেন। নাদবিন্দুর অতীত হয়ে নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হন। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হলে আর ইচ্ছা - অহঙ্কার - মমতা করে কে ? কিসের জন্যই বা করবে ? আমিই যখন তিনি তখন দেহই বা কাকে ডাকে ? তাই প্রথমেই বলেছিলাম আমি যদি আমাকেই ডাকি উত্তর দেবে কে ? যোগী এমন অপূর্ব্ব অবস্থায় এলে তাঁর নাম রূপই মনে থাকে না, তাই কিসের অহঙ্কার, আর কার উপরই বা মমতা ? ২/৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ।। ৭২

অনুবাদ: হে পার্থ, ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী; (গুরুপদেশে) ইহা পাইয়া (বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ) সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না)। ২/৭২

ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মেতে থাকার এই যে কৌশল বা পদ্ধতি এরই নাম ক্রিয়া বা ক্রিয়াযোগ। এর অভ্যাস না করে বিশেষরূপে সকলে মুগ্ধ হয়ে আছে। এই বিদ্যা বা কৌশল আয়ত্ত করে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এতে অবস্থান করলে ব্রহ্মেতে মিলিত হয়ে স্থির ব্রহ্মপদকে পাওয়া যায়। অন্তকালে একমুহূর্ত্ত ব্রহ্মবোধে অবস্থান করতে পারলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হতে পারে। সারাজীবন ধরে যে থাকতে পারে তার তো কথাই নেই। অন্তকালে সেই এক মুহূর্ত্ত থাকা যে সমস্ত জীবনব্যাপী অভ্যাসেরই ফল এটা সবারই জানা উচিত। নইলে সারাজীবনে অভ্যাস করলাম না, তাঁকে একটিবার জানারও চেষ্টা করলাম না, সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর দিকে একবার ফিরেও তাকালাম না, পূর্ণ চেতনা যুক্ত সমস্ত জীবনটিতে ভগবদ্ ভাবের রেখামাত্র পড়ল না, তা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে, সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মুহুর্ত্তে হঠাৎই কোথা হতে ঈশ্বর এসে আবির্ভূত হবেন এমন কল্পনা বা আশা করা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। মৃত্যুকেই লোকের সকল ভয়। কিন্তু ব্রহ্মের মৃত্যু নেই। তাই ব্রহ্মেতে লয় হলে বেঁচে থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্ম কি ? কর্ম্মের অতীতাবস্থাই ব্রহ্ম (৬৯ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কারণ "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে" আত্মার বৃহত্ব হেতু আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা যায়। অর্থাৎ আত্মার যে বৃহৎ (মহান) অবস্থা আছে সেই বৃহৎ আত্মাই ব্রহ্ম। অজপারূপ প্রাণের গতিরহিত স্থির অবস্থাই আত্মার বৃহৎ বা মহান অবস্থা। এই অবস্থা যাঁর প্রত্যক্ষ হয়েছে তিনিই শুধু জানেন। এটা অব্যক্ত; নিজ বোধগম্য মাত্র। সদ্গুরু লাভে তৎকর্তৃক স্থিতির আভাষ উপলব্ধি হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনি মুহুর্ত্ত কালের জন্য অনুভব করিয়ে দেন। যেমন লোকে 'মৃত্যু' শব্দ বলে থাকে কিন্তু অনুভবে নেই, যিনি মরেছেন তিনিও বলতে পারেন না, যিনি জীবিত তিনি তো সেটা জানেনই না। কেবল যাঁরা জীবন্মৃত, অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থাটা সাধনার দ্বারা মরার আগেই জেনেছেন, তাঁরাই মাত্র এ তত্ত্বটা জানেন। কিন্তু বুদ্ধির ছলনায় অজপারূপ প্রাণকর্ম্মে লক্ষ্য পড়ে না। এই কর্ম্মের অভ্যাস গুরু উপদেশে করতে করতে এর অতীতাবস্থারূপ স্থিতি লাভ হলেই বুঝতে পারবে, তখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হওয়ায় মৃত্যুভয় থাকেনা। জীবন মরণ সমান হয়। মৃত্যুকালেও ঐ চৈতন্য

অবস্থায় থেকে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ পেয়ে থাকেন এবং ঐ স্থির অবস্থারূপ ব্রহ্মতেই লয় পান। বাণ অর্থ আত্মা। বাণরূপ প্রাণের গতি রহিত বা স্থির অবস্থাই নির্ব্বাণ। এর আগে অর্জ্জুন যে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটা ছিল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিরূপে বিচরণ করেন ? সেই প্রশ্নের উত্তর এখানে শেষ হল।

কাটোয়ার জনৈকা ভক্ত মহিলার বিচারবুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে সাধারণ বুদ্ধির আদর্শ ধরে নিয়ে স্থূলভাবে সাঙ্খ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনায় পেলাম যে এই মরলোকে আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা মা যেভাবেই বলি তা জীবাত্মা ও প্রকৃতি এই দুই রূপে প্রতীয়মান এটাই এই লোকের কুলধর্ম্ম। একটি পরিণামী জন্মমৃত্যু ব্যক্তাব্যক্তময়, অপরটি অপরিণামী জন্মমৃত্যুরহিত, নিত্য, নিজবোধরূপ।

যাঁরা সদ্‌গুরু কৃপালাভ করেননি তাঁদের পক্ষে প্রথমেই এই নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আত্মসত্তাকে বিনা তর্কে, বিনা বিচারে, প্রগাঢ় বিশ্বাসের সাথে স্বীকার করে নিতে হবে। তারপর প্রত্যেক পরিণামশীল বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে সেই নিত্য অপরিণামী সত্তাটি বুদ্ধিযোগের দ্বারা অবধারণ করতে হবে। এইরকম ধারণা করতে করতে ক্রমশঃ সাধকের চক্ষু হতে পরিণামযুক্ত জগৎ লুপ্ত হয়ে যাবে এবং এক অপরিণামী বোধরূপ অস্তিত্বের আভাস ফুটে উঠবে। এভাবে প্রথমে সামান্য কল্পনামাত্র হলেও সাধক পরে দেখবে যে এই কল্পনাই মহাসত্য, এই বোধসত্তাই অনন্ত জগৎসত্তারূপে প্রকাশিত ও সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক ধারণাও এই বোধরূপ আত্মারই মহিমা। আর যাঁরা সদ্‌গুরু কৃপালাভ করেন তাঁরা সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথে কাজকর্ম্মের দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে জানতে ও বুঝতে পারেন এবং ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করতে পারেন।

অধিকাংশ টীকাকার বলেছেন যে, এই ব্রাহ্মীস্থিতি সন্ন্যাসেরই লক্ষণমাত্র, গৃহীর পক্ষে এই ব্রাহ্মীস্থিতি পাওয়া দুরূহ। গীতার টীকা করতে গিয়ে এমন মন্তব্য সত্যই হাস্যকর। টীকা টিপ্পনী করার আগে প্রকৃত অর্থবিষয়ে একটু ভাবনা চিন্তা অবশ্যই করতে হবে। ব্রাহ্মীস্থিতিই সন্ন্যাস সত্য কিন্তু সেটা কর্ম্মসন্ন্যাস বা ফলসন্ন্যাস। গৃহে থাকা বা গৃহত্যাগ করা এসমস্ত জাগতিক অবস্থাতে এর কোনও হেরফের হয়না। গৃহস্থ বিষয় সম্পত্তিতে অত্যাসক্ত আবার সন্ন্যাসীও ত্যাগ ত্যাগ করেই মোহগ্রস্থ হতে পারে। আবার উল্টোটাও হয়। গৃহীও ঠিকমত ত্যাগ করা হলনা ভেবে বিমূঢ় হতে পারে, তেমন সন্ন্যাসীও সংসারে দায় দায়িত্ব ত্যাগ করেও বিষয়াদির মোহে কতখানি ভোগে সেটা মঠ মিশনগুলোতে নিয়মিত গেলেই দেখা যায়। আসল তো ফলাসক্তিত্যাগ, ফলসন্ন্যাসই সন্ন্যাস। অন্তরের জ্ঞানকর্ম্ম সমন্বয়রূপ কর্ম্মসন্ন্যাসই এই ব্রাহ্মীস্থিতির সহায়ক। এজন্যই উপনিষদে গৃহস্থের ব্রাহ্মীস্থিতির কথাই বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আসল বিষয় হল বুদ্ধিযোগের দ্বারা আত্মায় যুক্ত হতে শেখা এবং অন্তিম সময়ে সেভাবে যুক্ত থাকা গেলেই সব সার্থক। অভিনেতার রিহার্সাল নাটকের সন্ধ্যায় যেমন সাফল্য আনে -- সাধকেরও জীবনব্যাপী বুদ্ধিযোগে অবস্থান সেই অভিনয়ের রিহার্সাল এবং মৃত্যুর সেই মহামুহূর্ত্তই সেই নাটকের পষরসধী, অন্তকালে একমুহূর্ত্ত ব্রহ্মবোধে অবস্থান করতে পারলেই সেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ হয়। বস্তুবাদ পৃথিবীকে তস্করভোগ্যা করেছে সন্দেহ নেই, তাই বলে ভোগের জন্যে এতখানি তস্কর বৃত্তিতে নিজেকে হারিয়ে ফেললে আর রেহাই নেই, অনন্ত তস্করে পরিণত হবে, তখন সেটাই হয়ে দাঁড়াবে মজ্জাগত সংস্কার। অতএব সাধু সাবধান, প্রার্থনা কর যেন অর্জ্জুনের মত গুরুলাভ হয় এবং পরিণামের ভিতর অপরিণামের সন্ধান পেয়ে শান্তিলাভ হয়। তিনি আত্মরূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মময় করে, আমাদের ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা করুন ॥ ২/৭২

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষদসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সংবাদে 'সাংখ্যযোগ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।

ওঁ তৎসৎ শ্রীবিষ্ণু প্রদীপিকা নামক গীতার যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥

সাঙ্খ্যযোগের তাৎপর্য্যের সারসংক্ষেপ : সমগ্র বিষাদযোগটিই সাধকের প্রশ্নাবলী ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনের বিষয়ে। দেহাধীশ বুদ্ধি দ্বারা সাধকমনের মূল প্রশ্নসকল হৃদয়ে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দেব কি না ? সাধকের মনে যখন এসব প্রশ্ন জাগে তখন তাতে মায়ার গন্ধ থাকে তাই ভগবান আগে নিত্য (universal) এবং অনিত্য (temporary / transitary) সম্বন্ধে চোখ ফুটিয়েছেন। তাই এখন সাধকের চোখে সমস্ত জগৎ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়। যেকোনও বস্তু বা বিষয়ের মধ্যেই দুটি স্তর উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। এর কতটুকু নিত্য ও কতটুকু অনিত্য। যেটুকু নিত্য বলে বোধ হয় সেটুকুতেই ঈশ্বরত্ব খোঁজে আর অপর অনিত্য অংশকে শুধুমাত্র পদার্থ বলেই উপভোগ করে। কিন্তু শ্বাশতের এই অন্বেষণের মাধ্যম থেকে যায় দেহাধীশ ইন্দ্রিয় । ফলে যা কিছু অন্বেষণ তা সে এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই করে থাকে। ফলে বিশেষ কিছুই বোধ করতে পারে না আর তার প্রাণ শুধু আকুলি বিকুলি করে সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শনের জন্য। কারণ পদার্থবিদ্যার প্রয়োগশালায় পদার্থকে যতরূপেই বিশ্লেষণ করা যাক না কেন, অণু থেকে পরমাণুতে এলেও সেই পদার্থই থেকে যায়। স্রষ্টা - সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচার বুদ্ধি দিয়ে, মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে। তাই বুঝি ভগবান সাধকের দৃষ্টিকে একটুখানি খুলে দেন। আর তখনই জগৎ ছেড়ে তার আপনার দিকে লক্ষ্য পড়ে। একটা অভিনব বিশাল ব্যাপার তার হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়। মায়ার কেন্দ্র কোথায় ? মায়ার উচ্ছেদ সাধন করলেও কার্য্যতঃ সেই উচ্ছেদ কতটা কার্য্যকর হয় ? কারণ, মায়া যে কত কতদূর বিস্তৃত তা কেউ জানেনা। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে সে দেখতে পায় যে সংসার ত্যাগ করলেই মায়ার উচ্ছেদ হয় না। কারণ মায়া বাইরে নয়, মায়া ভিতরে। বহির্জগতে মায়া

বলে কিছু নেই। ভেবে দেখ, জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীর মৃত্যুতে নিস্প্রাণ শোকসভা মাত্র হয়, মৃতের ছবিতে একদিনের জন্য মালা পরিয়ে, এক মিনিটের মৌনতা ও পরবর্তী শুষ্কভাষণের মধ্য দিয়ে, একান্ত নিস্প্রাণভাবে, সংশ্লিষ্ট কর্মীসংগঠনের সংগঠিত ভাবের প্রদর্শন করে। কিন্তু নিজের পরিবারে পরিজনের বিয়োগব্যাথা কি সাংঘাতিক! এখন ভেবে দেখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধিতে মায়ার স্থান কোথায়? মায়ার ক্ষেত্র তারই অন্তরে। ইন্দ্রিয়সকল বহির্জগৎ থেকে যে সমস্ত জিনিষ এনে তার অন্তরে সংস্কার আকারে সাজিয়ে দিয়েছে, সেই সমস্ত সংস্কারগুলোর সাথে তার সেই একাত্মতাই মায়া। মায়ার উচ্ছেদ সাধন অর্থে সেই একাত্মতারই উচ্ছেদ। একথা বুঝতে পেরেই সাধক কাতর হয়ে ওঠেন। ভাবে তবে আমি কি নিয়ে থাকব ? ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সকলের উচ্ছেদ হয়ে গেলে আর আমার নিজের অস্তিত্ব কোথায় ? আমার আমিত্বের অস্তিত্বর এই একান্ত মৌলিক ও মহাপ্রশ্ন তার হৃদয়ক্ষেত্রকে বিশৃঙ্খল করে তোলে। সে নিজেকে নিজেরই ভিতরে খুঁজতে থাকে। শুরু হয় মহাঅন্বেষণ। তন্ন তন্ন করে, চিরে চিরে, তার আমিত্বটুকু কোথায় দেখতে চেষ্টা করে। আর ক্রমশঃ বুঝতে পারে এজগতে সমস্ত পদার্থ আর কিছুই নয় কেবল এক মহাশক্তির মাত্রার তারতম্য মাত্র। প্রথমতঃ তার উপলব্ধিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড - রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার ও মাত্রার সমষ্টিতে পরিণত হয় মাত্র (concentration of five elements) । পরবর্তী স্তরে উঠে বুঝতে পারে যে এই পাঁচ প্রকার উপলব্ধিও আসলে পাঁচরকম নয়। একটাই অনন্তব্যাপিনী শক্তি তরঙ্গের ইতরবিশেষ স্পন্দন (vibration) মাত্র। যেমন সাগরের ছোট ঢেউ বড় ঢেউয়ের মধ্যে বস্তুগত কোনও পার্থক্য নেই কেবলমাত্র স্পন্দন মাত্রার হেরফের সেই রকমই জগতের পঞ্চতন্মাত্রের শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি অনুভূতিও কেবলমাত্র স্পন্দনের রকমফের মাত্র। যেমন একই সুর্য্যালোক নানা বস্তুতে অল্পবিস্তর মাত্রার তারতম্যে নানা ভাবে প্রতিহত হয়ে বিচিত্র বর্ণরাশি জগতের চোখে ফুটিয়ে তুলছে তেমনই কোনও এক অব্যক্ত কেন্দ্র থেকে একপ্রকার স্পন্দনে এক মহাশক্তি অহর্নিশ স্ফূরিত হয়ে তার সংস্কাররাশিতে প্রতিঘাত পেয়ে অনন্ত প্রকারের তরঙ্গভঙ্গ সৃজন করে চলেছে। অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, অপূর্ব্ব জড়জগৎ ভ্রান্তি বা জীবাত্মানুভূতি এই প্রকারে তার হৃদয়ে অবিরত, অহর্নিশ রচিত হয়ে চলেছে। এই অনুসন্ধিৎসু সাধকের কাছে তাই শুধু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শময় জড়জগতই নয় - কাম, ক্রোধ, লোভ, ভক্তি, প্রীতি, করুণা ইত্যাদি মানসিক বিকার সমষ্টি বা মনোজগৎও বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দনমাত্র বলে চিনতে পারে। তাই এখন সে আর জ্ঞানে ও বর্ব্বরতায়, ভক্তি ও বিতৃষ্ণায়, করুণা ও নিষ্ঠুরতায়, দয়া ও কার্পণ্যে অথবা কাম, ক্রোধ, লোভ, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদির মধ্যে বস্তুগত কোনও তারতম্য দেখতে পায়না। কারণ তখন এগুলো কেবলমাত্র প্রতিঘাত বা স্পন্দন মাত্রার তারতম্য বলে বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সেসব বাইরে নয়, ভিতরে। আসলে আমার নিজের হৃদয়ের কোনও এক অব্যক্ত স্থানে সে সমস্ত উপলব্ধি হয়। সাধারণভাবে আমাদের

মনে হয় বহির্জগৎ যেন আমরা বাইরে দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, আঘ্রাণ বা আস্বাদন করছি; কিন্তু সত্যিই কি তাই ? আসলে বর্হিজগৎ আমার চোখ, কান, নাক, জিভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে (স্পৃষ্ট হয়ে) আমার সংস্কারপুঞ্জে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। আর সেই ধাক্কায় আমার সংস্কারচক্র নানা ভাবে স্পন্দিত (vibrated) হচ্ছে। এই সমস্ত নানা ধরণের স্পন্দন আমার ভিতরে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, কাম, ক্রোধ, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি নানা রকমের অনুভব জন্মিয়ে দিচ্ছে। অতএব কাম, ক্রোধ, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি যেমন বাইরের নয়, ভিতরের। তেমনই রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিও ভিতরে। তা যদি না হত, তবে একই জিনিষ এক এক জনের কাছে এক এক রকম হতো না। অর্থাৎ একই বস্তু বিভিন্ন হৃদয়ে বিভিন্ন রকম অনুভব এনে দিত না। তোমার কাছে একরকম, তোমার ছেলের কাছে আরেক রকম, আত্মীয়ের কাছে একরকম, আবার শত্রুর কাছে অন্যরকম হয় কেন ? তোমার স্ত্রী তোমায় দেখলে তাঁর হৃদয়ে তোমার সম্বন্ধীয় যে সংস্কাররাশি প্রচ্ছন্ন আছে সেগুলো ফুটে ওঠে, স্বামিত্বের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলে। আবার তোমার ছেলে বা মেয়ের হৃদয়ে তোমার সম্বন্ধীয় সংস্কাররাশি প্রচ্ছন্ন আছে। তোমার দর্শনে সেগুলোই পিতৃঅনুভূতি ফুটিয়ে দেয়। এইভাবে সেই একই তুমিই বিভিন্ন হৃদয়ে সংস্কারের তারতম্যে বিভিন্নভাবে ফুটে ওঠ। এভাবেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উপলব্ধি হয়। বাইরে আর কিছুই নেই, শুধু সেই এক বিশাল শক্তির নানারূপ ক্রিয়াময় তরঙ্গভঙ্গ আছে। সেই শক্তি সমুদ্রের আবর্তন আর ঢেউ ভাঙাই মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ সকলের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারপুঞ্জে বা জীবভাবে প্রতিহত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম অনুভব হয় মাত্র। এই ভাবেই সাধক নিজের হৃদয় অভ্যন্তরে কেন্দ্রের বা নিজের স্বরূপের একটুখানি মাত্র আভাস পায়। সে নিজের ভেতরে এক অব্যক্ত আদি সনাতন কেন্দ্র আবিস্কার করে যার উপরে হয়ে চলে চৈতন্যশক্তির অবিরাম স্ফূরণ সেই নিজ চৈতন্য স্ফুরণের সাথে বর্হিজগতের বিরাট স্ফূরণের ঘাত প্রতিঘাত - আর সেই উভয় তরঙ্গ সংঘাতের ফলস্বরূপ নিজের চৈতন্যতরঙ্গে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন ও তদাত্ম্যবোধের ফলে জগৎরূপ নানা দৃশ্যের বিকাশ ও বাবা, মা, ভাই, বোন, পুত্র, মিত্র ইত্যাদি নানা কল্পনা বৈচিত্র্যের মুহূর্ত্তের ব্যক্তভাব ও পরে অব্যক্তে মিশে যাওয়া এইসব আভাস ধীরে ধীরে পাওয়া যায়। সহসা বিদ্যুতের মত অপূর্ব্ব একটি জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয়ে ঝলসে ওঠে। অনুভব হয়, জন্ম, মৃত্যু, অবস্থান এসব কিছুই নয়। কেবল শক্তি ও সংস্কারের পরিবর্তন মাত্র। বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র এসবই আসলে চিত্তের ভাববিপর্য্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হল যে এই ভাবের প্রহেলিকা নিত্য নিয়মিতই জন্মাচ্ছে, লুপ্ত হচ্ছে, জ্বলছে, নিভছে। কিন্তু এরই জন্য আবার শোক কিসের ? এতে চিন্তার কি আছে ? যখনই আমি বিষয়বস্তুটা বুঝে ফেললাম তখন সেই জ্ঞানটা ধরে রাখি না কেন ? শুধু ধরেই রাখা নয়, সেই জ্ঞানে

যুক্ত হয়ে থাকি না কেন ? যখন এই রহস্যটা বুঝেই ফেলেছি তখন সংসারে থাকি বা সংসার ছাড়ি উভয়ই এক। তাতে আমার অসে যায় কি ? এটা কি একটা সমস্যা হল ? আমার আবার সুখ দুঃখ কি ? লাভ লোকসানই বা কি ? মায়ার উচ্ছেদ করতে পারলে সংসার রণক্ষেত্র থেকে ইন্দ্রিয়সংগ্রামে বিজয়ী হলে আমার আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে সত্য কিন্তু তার ফলে আমার সেই আগের বোধটা, অনুভবটা আর থাকবে কি ? যাদের ত্যাগ করতে আমি কাতর হয়েছিলাম সেসমস্ত ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়বিকারের (ভাললাগা বোধের, সুখানুভূতির) উচ্ছেদে আমার কোনও ক্ষতি নেই সত্য, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে (সাধনার সাফল্য ও ব্যার্থতায়) সমান ভেবে, আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ইন্দ্রিয়সকলের (ভ্রান্তিশক্তি) উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হতে পারি ঠিকই কিন্তু তাতে আমার থাকবে কি ? কারণ আমার আগের সেই সুখবোধ (অহং এর মদমত্ততা, ভ্রান্ত সুখ ও তৃপ্তি এসব প্রদর্শনের জায়গা) আত্মজ্ঞান লাভের সাথে সাথেই অবলুপ্ত হবে। যে অনাত্ম পদার্থই আত্মীয়রূপে বোধ হচ্ছে, এই বোধের বিনাশ করা অবশ্যই সুকঠিন সত্যি, কিন্তু এই বোধ বা ভ্রান্তিও বিনাশ হয়ে গেলে, এসব ছাড়লে আমার থাকবে কি ? (শিশুর হাত থেকে খেলনা কেড়ে নেওয়ার মতন) এসব ছাড়লে যা থাকবে তাতে আমার সুখ কি ? আত্মস্বরূপে এমন কি পাওয়া যাবে যার জন্য এত প্রত্যক্ষ সুখময় আমিত্বকে ছেড়ে দেব ? আত্ম অনাত্ম বিচারকালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের আত্মমহিমা জানা না থাকায় এসব সমস্যা এসে থাকে আর বোধ করে "স্বপন যদি মধুর এতো, হোক সে মিছে কল্পনা। জাগিও না, আমায় জাগিও না "॥

--**--

ওঁ

অথঃ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

কর্মযোগ (৩)

অর্জ্জুন উবাচ -

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ।। ১

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন। হে জনার্দ্দন, হে কেশব, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার মত, তবে কেন ঘোর (যুদ্ধরূপ) কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ ? ৩/১

ব্যাখ্যা: ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগে মোক্ষসাধনের জন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করলেন। তারপর "এষাতেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগেত্বিমাং শৃণু" বলে কর্ম্মযোগেরও উপদেশ দিলেন, কিন্তু বিবেক বুদ্ধিজনিত তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ এদের মধ্যে কোনটি যে প্রধান এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। তার মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ও নিয়তেন্দ্রিয়ত্বাদি লক্ষণ সকলের প্রশংসা করে বললেন যে এটাই হল ব্রাহ্মীস্থিতি। এতে মনে হয় যেন, কর্ম্ম ও বুদ্ধির ভিতরে বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ এমন একটা ভাব। যদি সেটাই স্থির হয় তবে আর বার বার "তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ," "তস্মাৎ যুদ্ধস্ব", "যোগায় যুজ্যস্ব" ইত্যাদি বলে কর্ম্মে নিযুক্ত করার অভিপ্রায় কেন ? অভিপ্রায় একটাই, সাধককে যোগযুক্ত করা। সেজন্যই এই ঘোর কর্ম্ম যে ক্রিয়া করা তাতেই ভালভাবে প্রবর্ত্ত করা হচ্ছে। আগেও বলা হয়েছে যে ক্রিয়াতেই মন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়, ফলে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন যদি সেটাই একমাত্র কাম্যবস্তু হয় তবে শুধুই কূটস্থে দৃষ্টিস্থির করে বসে থাকিনা কেন ? এসব ঝঞ্ঝাট প্রাণকে আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধারে ওঠানামা করাবার মত সব জটিল ব্যাপারে ঢোকার দরকারটা কি ? আর ও সমস্ত হাঙ্গামা করেও যে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে তাও তো বুঝি না। বরং মনে হয় ও সব করে শরীর মনের বিক্ষেপ হয়ে আরও পাগল পাগল ভাব আসবে। একথা বলতে গিয়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে 'জনার্দ্দন ', 'কেশব ' নামে সম্বোধন করলেন। কেশব শব্দের অর্থ আগে বলেছি, জনার্দ্দন শব্দের তাৎপর্য্য জন-জন্মান কর্ম্মের অতীত অবস্থারূপ স্থিতি পেলে ঐ জন্মরূপ অবস্থার অর্দ্দন (পীড়ন) হয়। তাই ঐ জন্মরহিত স্থিতিরূপ অবস্থাই জনার্দ্দন। তাই অর্জ্জুন ঐ স্থির প্রাণরূপ আত্মাকে সম্বোধন করেছেন হে জনার্দ্দন, কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ শ্রেয় হলে এই ক্লেশকর সাধনায় আমায় নিযুক্ত করছ কেন ? ৩/১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ।। ২

অনুবাদ: কখনও কর্ম্মপ্রশংসা, কখনও বা জ্ঞানপ্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ। যাহাতে আমি শ্রেয় লাভ করি, এমন একটি নিশ্চয় করিয়া বল।৩/২

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবানের কথায় অর্জ্জুন এখানে দোলাচল চিত্তবৃত্তিতে ভুগছেন। ক্ষণে ক্ষণে দুরকম কাজ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রশংসার দোহারা কথাতে মন বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এই দুই রকম অবস্থা আসলে ক্রিয়ার প্রশংসা এবং ক্রিয়ার পরাবস্থার প্রশংসা। নতুন সাধকের পক্ষে এই দুটো অবস্থার পার্থক্য বোঝা দায় হয়। তখন উভয় অবস্থার প্রতিই মন ছোটে। তাই অর্জ্জুনেরও ইচ্ছা যেন কৃষ্ণের অনুমতি পেলেই ক্রিয়া ছেড়ে দিয়ে চুপ করে স্থির হয়ে বসে থাকবেন। ঋষি বাল্মিকীর মত মহাপুরুষেরও এই একই প্রশ্ন ছিল "মোক্ষস্য কারণং কর্ম্ম জ্ঞানং বা মোক্ষসাধনম্ ?" মোক্ষলাভের উপায় কি জ্ঞান না কর্ম্ম ? সাধনকর্ম্মে লেগে থেকে অবস্থাটা একটু পেকে না উঠলে এই ভ্রান্তি স্বাভাবিক। ক্রিয়া না করে কখনই যে ক্রিয়ার পরাবস্থা আসে না, সেজন্যই জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই একে অপরের পরিপূরক। কারণ শুধুমাত্র তত্ত্বে ও কথায় কিছু হয় না। সুতরাং কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী, কর্ম্মানুষ্ঠান না করলে জীবনধারণ পর্য্যন্ত হতে চায় না। তবে শেষ পর্য্যন্ত সাধক বুঝতে পারেন যে দুটো পথই প্রয়োজনীয়। তাই বলা যায় যে ভগবান এখানে কোনও দোহারা বা দ্ব্যর্থব্যাঞ্জক ভাবের কথা বলেন নি। শুধুমাত্র বোঝার ভুল। ৩/২

✓ 19/03/2023

শ্রীভগবান উবাচ –

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ৷
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ।।৩

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে অনঘ, এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) আমি পূর্ব্বে (পূর্ব্বধ্যায়ে) কহিয়াছি, জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্যদিগের নিষ্ঠা এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের নিষ্ঠা। ৩/৩

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও বলেছি যে ভগবান কোনও মতেই পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে মোক্ষের জন্য কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগরূপ দুটো নিষ্ঠার কথা আলাদাভাবে বলেন নি। এখানে উনি কর্ম ও জ্ঞানরূপ উভয়পথ অবলম্বনে ব্রহ্মনিষ্ঠার কথাই বলেছেন। দুই পথ আসলে দুই রকমের স্থিতি :- ক্রিয়া করে আপনা আপনি স্থিতি, যার অবলম্বন প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগাভ্যাস এবং দেখে শুনে নিজবোধ হয়ে স্থিতি, যার অবলম্বন যোনিমুদ্রার মধ্যে দর্শনাদির দ্বারা যে জ্ঞানযোগ হয়। এই দুই প্রকার সাধনার প্রতি লক্ষ্য করেই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে "অনঘ" নামে সম্বোধন করেছেন। যার অর্থ অন্ =ন, অঘ = পাপ, অর্থাৎ যাতে পাপ নেই, নির্ম্মল, পবিত্র, তাই অনঘ। তেজের রং শুক্লবর্ণ। এইবর্ণ স্বভাবতই পবিত্র। অর্জ্জুনই এই তেজস্তত্ত্ব। মহাভারতেও নিজ নামের ব্যাখ্যায় অর্জ্জুন উত্তরের কাছে বলেছেন, "আমি সসাগরা বসুন্ধরায় সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি"। এজন্যই উক্ত দুরকমের স্থিতির কথা বলেছেন। সাংখ্য শব্দের তাৎপর্য্য হল যার দ্বারা 'আমি' কে জানা যায়। সংখ্যা বা সাংখ্য কাল হতে আরম্ভ হয়েছে। কাল অনন্ত, তার সংখ্যা নেই। কিন্তু ঘটস্থ হয়েই অজপারূপে সংখ্যা হয়েছে এবং এই সংখ্যা দিন রাতে ২১৬০০ বার। এটাই বর্ত্তমান অবস্থা, কিন্তু এদিকে তো লক্ষ্য নেই, আছে কেবল মুগ্ধতা ও মোহ। অজপারূপ সাংখ্যে লক্ষ্য করলেই এর অতীত হয়ে "আমি কে" ? এই জ্ঞান লাভ করা যায়। আগে দুরকম সাধনের কথা বললাম। এর প্রথমটি কর্ম্মযোগ, প্রাণে মন রেখে কাজ করা। সদ্গুরু প্রদর্শিত সুষুম্নাপথে ছয় চক্রের মধ্যে প্রাণকে নিয়ে তাতে মন রেখে একাজ করতে হয়। সুষুম্না পরিস্কার না হলে অবশ্য এটা হবার নয়। সুষুম্নার মধ্যে প্রাণকে ঢোকাতে হবে। তখন মদখোরের যেমন নেশা হয়, তেমনই একটা নেশার মত হবে। বাইরের কোনও চেতনা থাকেনা। প্রাণ মাথায় চড়ে বসে এবং আটকে যায়। কোনও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকেনা। জগৎ ভুলে পরম নিবৃত্তিরূপা একটা অদ্ভুত শান্তি এসে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়টিতেও সুষুম্না ভেদ হয়। এরও কৌশল আছে। সেই উপায়মত চললে ও কাজকর্ম্ম করতে পারলে অনেক অভূতপূর্ব বিষয়ের অস্তিত্ব অনুভবে আসে। অপুর্ব জ্যোতির প্রকাশ হয়, আরও অদ্ভুত অনেক কিছু ঘটে ও অনুভবে আসে, সেসব ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যদিও দুটো পথই ব্রহ্মে মিলিত হওয়ার পথ, কিন্তু যাঁদের বিষয়ে আসক্তি আছে তাদের সর্ব্বপ্রথম গুরুপদেশে আসক্তি নষ্ট হলে তারপর দ্বিতীয় পন্থায় প্রবেশ লাভই শ্রেয়। এর জন্যই চাই মনের নিশ্চলা অবস্থা। নতুবা শুধু বাইরের সাজ পরা বৈরাগ্যে কিছু হবেনা। পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান একথাই স্পষ্ট করে বলেছেন। ৩/৩

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে ।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ।। ৪

অনুবাদ : লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম অবস্থালাভ করিতে পারেনা, এবং (আসক্তি ত্যাগ ব্যতীত) কেবল মাত্র সন্ন্যাসেই (কর্ম্ম ত্যাগেই) সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ৩/৪

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত অনুবাদের যদি কেউ বিরোধিতা করেন সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই অভিমত ব্যক্ত করছি যে শাস্ত্রকারেরা বর্ত্তমানে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাই করে থাকেন। কারণ কমবেশী সকল শাস্ত্রকারই এই অর্থই করেছেন যে সন্ন্যাস ব্যতীত নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয় না। অনেকেই আবার শ্রুতি থেকে পর্য্যন্ত উল্লেখ করে থাকেন "প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি," অর্থ পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতএব যখন শুধুমাত্র সন্ন্যাসেই মুক্তি, তখন কর্ম্ম করে আর কি হবে ? চল সকলেই গেরুয়া পরে পরান্নভোজী হই। এ ধরণের ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে না।

সত্যি কথাটা হল যে চিত্তশুদ্ধি বিনা জ্ঞানশূন্য সংন্যাস হতে পারেনা, সিদ্ধি বা মোক্ষলাভ তো অনেক দূরের কথা। অতএব সম্যক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান উৎপত্তি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান একান্তই কর্ত্তব্য। নতুবা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি হবে না। আত্মকর্ম্ম না করে কর্ম্মের অতীত অবস্থারূপ নৈষ্কর্ম্মের অবস্থা লাভ হবার নয়। কর্ম্মের ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ করতে হলে আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। আসক্তিত্যাগ বাদ দিয়ে শুধু কর্ম্মত্যাগ নামক সন্ন্যাসে সেই ইচ্ছারহিত অবস্থায় যাওয়া যায় না। কারণ কর্ম্মত্যাগ কোনও ত্যাগই নয়। কর্ম্মের আসক্তিরূপ ফলাকাঙ্খা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। সেজন্য প্রথমে ক্রিয়া না করলে স্থিতি অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত উত্তম পুরুষে স্থিতি হয় না। ইচ্ছারহিত না হলে সিদ্ধিও হয় না। সিদ্ধি হলে তবে মন তৃপ্ত হয়। সেই মন ইচ্ছারহিত হলেই তৃপ্ত হল। ইচ্ছা থাকতে তৃপ্তি নেই। যদিও শাস্ত্রে আছে "ত্যাগেনৈব অমৃত্ব মানশুঃ" ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। "দন্ডগ্রহণ মাত্রেন নরো নারায়ণো ভবেৎ" অর্থাৎ দন্ড গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ হয়ে যায়। খুবই ঠিক কথা। কিন্তু তার আগে ভেবে দেখুন তো চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত বৈরাগ্যোদয় হতে পারেকি ? আর বৈরাগ্য না হলে সন্ন্যাস তো নিস্ফল। হ্যাঁ, ত্যাগ অমৃতত্বলাভের কারণ বটে, কিন্তু সে কোন ত্যাগ ? বাবা, মা, বউ, ছেলেপুলে ছেড়ে দায়িত্ব পালনে অব্যাহতি ? নাকি কেবল মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে বাইরে বেরিয়ে পড়া ? আজকাল এই জাতীয় সন্ন্যাসীরই সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। যে দন্ড গ্রহণ মাত্রে নর নারায়ণ হয়ে থাকে সে কোন দন্ড ? সে হল বাক্-কায়-মনোদন্ড। অর্থাৎ বাক্য শরীর ও মনের শাসন। একাজে যিনি সফল তিনি অবশ্যই নারায়ণ। কিন্তু একাজ তিনি করবেন কি করে ? যদি তার

আগে সাধনাদ্বারা প্রাণ ও মনকে শুদ্ধ করতে না পারেন? অত সোজা নয়। অত সোজা হলে মঠ-মিশনের মোটা মোটা মহারাজগুলো ধ্যানকেন্দ্রে ধ্যান শিখতে এসে ভয়ে পালিয়ে যেতেন না। অথচ সেখানে কমবয়সী বালক, সংসারী যুবক, বৃদ্ধ, সকলেই সাফল্যের সাথে ৮/১০ দিনের ধ্যানের বিভিন্ন পর্য্যায় সাফল্যের সাথে পার করছে। যাই হোক, যাক সেসব কথা। আগে প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া এসব না করলে মন স্থির হবে কি করে ? নৈষ্কর্ম্ম বা জ্ঞানের প্রথম অবস্থাই হল স্থির চিত্ত অবস্থা। আগেই কাজকর্ম্ম ছেড়ে বসে থাকলে স্থির চিত্ত হবে কি করে ? মন তো তোমার ভবঘুরে। মুখের কথায় বা জ্ঞানের পুঁথি পড়ে কি সে ভবঘোরা ছুটবে ? ক্রিয়া না করলে অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলো কিছুতেই থামে না। শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে পুরীর সমুদ্রের মত। একভাবে সাধন করে যাও দেখবে মনের উৎকট সংকল্প-বিকল্প নাশ হবে। ঢেউও স্থির হবে। তখন জ্ঞান হয়। "জ্ঞানং তৎ সাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্। তৎফলম্ জ্ঞাননিষ্ঠৈব।" আত্মজ্ঞানের সাধনাই হল কর্ম্ম। এই কর্ম্ম দ্বারাই স্বত্ত্বশুদ্ধি হয় ও সত্ত্বশুদ্ধি হতেই আসে জ্ঞাননিষ্ঠা। "জ্ঞানমুৎপস্যতে পুং সাং ক্ষয়াৎ পাপকর্ম্মণঃ।" পাপকর্ম্ম ক্ষয় পেলেই মানুষের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পাপ কোনটা ? ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, চাহিদা, আকাঙ্খা এসমস্তকেই এখানে পাপ বলা হয়েছে। এরাই মনকে দখল করে আছে। তাই স্থিরভাব আসবে কোত্থেকে ? পরিশ্রম না করলে হবে ? মঠে-মিশনে গিয়ে সন্ন্যাসীদের খেয়োখেয়ি দেখে এস। শাস্ত্রবাক্যের অপব্যাখ্যার ফসল কিভাবে ফলছে দেখতে পাবে। তাই গীতা অবলম্বন করে সঠিক পথে চল ॥ ৩/4

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
> কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।। ৩/৫

অনুবাদ : যে কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা। প্রকৃতিজ (সত্ত্বাদি) গুণসমূহ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়। ৩/৫

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের সূত্রেই বলা হয়েছে যে কর্ম্মসকলের সন্ন্যাস অর্থ কাজ কর্ম্ম সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকা নয়। সেটা আসলে অসম্ভব। বলা হচ্ছে কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ। তাই জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, পণ্ডিত বা মুর্খ কেউই ক্ষণকালও কর্ম্ম না করে থাকতে পারে না। লোকে নিজ নিজ স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করে থাকে। সেজন্য এ সমস্ত কর্ম্মই সকাম কর্ম্ম। কারণ এগুলোর কোনটাই স্বতঃ হয় না বরং স্বভাব প্রভাব অর্থাৎ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি প্রভাবে অবশ হয়ে করা হয়। এ সমস্ত বাহ্য কর্ম্ম ছাড়াও এইদেহে প্রকৃতির কর্ম্ম সর্ব্বদাই চলছে। প্রকৃতির গুণ সমূহ তো কাউকে স্ববশে থাকতে দেয় না, অবশ করে, অর্থাৎ প্রকৃতির পঞ্চতত্ত্ব -- মন, বুদ্ধি, অহংকার এর বশীভূত হয়ে কর্ম্ম সকল করে সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না গুণেতে। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ সব গুণের খেলা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার প্রাণের খেলা হতেই হয়ে থাকে, আর এদের মূল হচ্ছে ব্রহ্মসূত্র সুষুম্না ও সুষুম্নার অর্ন্তগত ব্রহ্মনাড়ী। এই ব্রহ্মসূত্র সুষুম্নাতেই প্রথম প্রাণের উৎপত্তি তাই, উনিই প্রকৃতিরূপিণী আদ্যাশক্তি প্রাণ। তারপর এখান থেকে ইড়া পিঙ্গলায় প্রবাহিত হয়ে জাগতিক ব্যাপার সব চলতে থাকে। সুষুম্না না থাকলে জীব জন্মাতে পারত না। পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহংকার সবই এ থেকেই উৎপন্ন তাই সকলেই এরই বশে আছে। তাই পণ্ডিত হোক আর মুর্খই হোক, সকলেরই নিজ নিজ প্রকৃতির বশীভূত হয়ে একটি করে স্বভাব তৈরী হয় । আর সেই মত প্রকৃতি অনুসারে সদ্‌সদ্ কর্ম্মসকল করতে করতে অন্তর্দশায় শ্বাসের টান ধরে, নাভিশ্বাস শুরু হয় তখন এই প্রকৃতিও তার গুণগুলোকে অবশ করে দেহকে কর্ম্মহীন লাশ বানিয়ে প্রাণবায়ু শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই জীবদ্দশায় প্রাণকর্ম্ম বিধিমত নিজের বশে রেখে না করতে পারলে জীবের যাতায়াতরূপ কর্ম্মবন্ধন ঘোচেনা। বহির্মুখী মন নিয়ে বহির্মুখী কর্ম্ম করার দরুন যে ভোগ সেই ভোগ থেকেই যায়। তাই প্রাণক্রিয়া করতে করতে সবকিছু থেকে প্রাণের প্রবাহ গুটিয়ে এনে আদিস্থান ব্রহ্মনাড়ীতে যখন এসে পড়ে তখনই গুণত্রয়ের অতীত হওয়া সম্ভব। তা নইলে এই গুণপ্রবাহ যতক্ষণ চলবে জ্ঞানী অজ্ঞানী সবারই কাজ ঐ মতই চলবে কেউই বাধা দিতে পারবে না। ৩/৫

> কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।। ৩/৬

অনুবাদ : যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলা যায়। ৩/৬

ব্যাখ্যা : নিয়মিতভাবে আত্মকর্ম্মে ব্রতী হয়ে অভ্যাসদ্বারা চিত্ত ইষ্টে লয় হলে ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃ নিরুদ্ধ হয়। সেটিই হল প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম। অন্যথায় বলপূর্ব্বক কেবলমাত্র বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলকে নিগ্রহপূর্ব্বক সাময়িক চেপে রাখলে মনে মনে কিন্তু সেই সকল ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের চিন্তা প্রচন্ড ভাবে আসবে, তখন তাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হতে হবে। তাই এটা ভীষণ কপটাচার। শুধুমাত্র গৈরিক বসন বা মুন্ডিত মস্তক ইত্যাদি বাহ্য বেশে সে অবস্থা আসে না। তখন বাইরের কর্ম্মত্যাগ দাম্ভিকতা মাত্র। বরং ফলাকাঙ্খারহিত যে প্রাণকর্ম্ম তাতে যে মন লাগাতে পারে সে তাড়াতাড়িই আত্মারাম হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারীদের যেসব আপাতদৃশ্য সম্মান, যশ ইত্যাদি দেখা যায়, তাদের যখন বিভিন্ন সভা সমিতিতে বরণ করা হয়, আমরা ভাবি কত কিছু কিন্তু সেসব এক অধটু নাম যশের সুখ কিছুই নয়। নিজেদের কাছে নিজেরা কিন্তু বিষে ভরা, উপরটাই যা একটু সুন্দর লাগে, বাইরে থেকে। এঁরা ঈশ্বর বিষয়ক কথাবার্তা বললেও মনটা কিন্তু বিষয় লোলুপই থাকে। মন চায় শুধু কে কতটা আমাদের দান করল, চেকে (পযবয়েঁব) টাকার অঙ্কটা কত লিখল, ইত্যাদি। এদের উপরটা ত্যাগীর সাজ হলেও মনটা

বিষয়ের জন্য উদগ্রীব থাকে। এরা একই সাথে লোককেও প্রবঞ্চনা করে এবং আত্মবঞ্চনাও করে থাকে। কোনও কোনও স্বামিজী মহারাজকে অন্তিমকালে এজন্য অনুতাপ করতেও দেখা যায়। এজন্য মহারাজদের অন্তিম সময়ে গৃহী বা সাধারণ ভক্ত শিষ্যদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ থাকে। যাক সেসব কথা। আসল কথা বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগ্রহকারীর পক্ষে চোখ বুজে বসে ধ্যান ধারণার ভান করা বৃথা বিড়াম্বনা মাত্র কারণ সবটাই কপটাচার।৩/৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ।। ৭

অনুবাদ : হে অর্জ্জুন, যিনি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ফলকামনাহীন তিনিই বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য হন। ৩/৭

ব্যাখ্যা: শ্রীভগবান বলেছেন - যিনি অনাসক্তভাবে কর্ম্মসকল করে থাকেন তিনিই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আসক্তি তো মানুষের সঙ্গের সাথী। আসক্তি থেকেই তো মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহলে দেখি আসক্তি আসে কোত্থেকে ? আসক্তি আসে ফলাকাঙ্খা থেকে। মাস গেলে মাইনে পাব এই ফলাকাঙ্খা থেকেই তো সারা মাস চাকুরী করি। তাই ওই ফলাকাঙ্খাকেই রহিত করার উপায় খুঁজতে হবে। মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে নিয়ন্ত্রিত ও ঈশ্বরতৎপর করে তুলতে পারলে সেই অবস্থায় যে সব কর্ম্ম করা হয় সেগুলোই হয় ফলাকাঙ্খারহিত। যেমন যখন আমরা গভীরভাবে ঘুমাই তখনও কিন্তু কিছু কিছু কাজকর্ম্ম করে থাকি, যেমন গা চুলকাই, পাশ ফিরে শুই, মা কে জড়িয়ে ধরি ইত্যাদি করি, অথচ কিছুই বুঝতে পারি না। অনেকটা সেই রকম আর কি। ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে মনকে ঐ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারলে মনই থাকে না তো আসক্তি আবার কোথা থেকে আসবে ? তখন মন তাঁতে লেগে থাকবে অথচ অভ্যাসবশতঃ বাইরের সব কাজই হতে থাকবে অথচ আসক্তি থাকবে না। এরকম যোগীরই চিত্তশুদ্ধি হয়েছে বুঝতে হবে। এর বিপরীতটাই অশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ। তারা বাইরের কাজকর্ম্মও কিছু করে না। আসনে বসে আছে ঠক ঠক করে মালাও জপে চলেছে, কেউবা ফোঁসফোঁস করে প্রাণায়ামও করে অথচ বিষয় চিন্তাও করে চলেছে, বিষয়ী চার্ব্বাকীয় ভোগবাদী ও বস্তুবাদী যোগীর দল। এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যায় কিভাবে ? নিজের ইচ্ছায় বিষয়াসক্তি ত্যাগ, তা না পারলে কান্না, আর জোর করে নিজেকে নিয়মের মধ্যে রাখা। গুরুবাক্যে অবিচল থাকা। বিষয়াসক্তিই তো মধু। এই মধুর লোভেই তো মন ভ্রমর আকুল, এই মধুকে তিনিই নষ্ট করে দেন, তাই তাঁর নাম মধুসূদন।

"বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা ন কৃতং ময়া, সোহহং কর্ম্ম দুরাচারঃ ত্রাহি মাং মধুসূদন।"

মনদিয়ে যে ক্রিয়া অভ্যাস করতে পারে তার মন তাঁতেই সমর্পিত হয়, স্থির হয়ে যায়। মনের এই স্থিরভাবই প্রসন্নতা। এটাই তাঁর প্রসাদ এই প্রসাদ্‌ওক্‌' অর্থাৎ করে,ওপা' অর্থাৎ পাওয়া, অভ্যাস করে লাভ করতে হয়। মূলকথা ক্রিয়া অভ্যাসে প্রাপ্তি হয় যে অবস্থা তাই পরাবস্থা। যে অবস্থায় সদাই প্রসন্নতা, কোনও আসক্তির চিহ্নও থাকে না, সেটাই কর্ম্মের অতীত অবস্থা, অনাসক্তি ॥ ৩/৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ।।৮

অনুবাদ : তুমি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা করা ভাল। সর্ব্ব কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। ৩/৮

ব্যাখ্যা : ভগবান বলছেন কর্ম্ম না করে যখন উপায় নেই তখন অন্ততঃ কিছু কাজ কর যা তোমার শরীর যাত্রা নির্ব্বাহে সহায়ক। মূল অর্থ চিত্তশুদ্ধির জন্য কিছু অবশ্যকরণীয় কাজ আছে, যা না করে ত্যাগী সাজলে একটি আস্ত অকর্ম্মার ঢেঁকি হবে। সকাল সন্ধ্যায় কিছু কিছু উপাসনাদি কাজ (গুরু প্রদত্ত) করতে পারলেও অনেকটা ভাল। অনেকে বলে থাকেন, এমনকি লেখাও আছে যে সন্ন্যাসী হলে বা আশ্রমে অথবা মিশনে থেকে ব্রহ্মচর্য্যকালীন বেদান্ত আলোচনা করে পূর্বসংস্কার নষ্ট হয়। এটা একেবারেই বাজে কথা। শুধু সমালোচনায় কিছুই হয় না। সুখাদ্য বা পুষ্টিকর খাদ্যের আলোচনায় সেই খাদ্যের ক্যালোরি ভ্যালু শরীরে যায় না, সেই রকম জ্ঞান আলোচনায় কোন সংস্কারই দূর হয় না। কর্ম্মাধিকারী হয়েও যে কর্ম্ম না করে তার ইহকাল পরকাল দুইই যায়। কারণ তুমিতো কর্ম্মাধিকারী, আস্ত একটি মনুষ্য শরীর পেয়েছ, এখনও কর্ম্মক্ষম আছ, একেবারে অশক্ত, বৃদ্ধ তো নও যে শুধু শাস্ত্র আলোচনায়ই তুষ্ট থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, শাস্ত্রজ্ঞান যেটুকু প্রয়োজন সদ্‌গুরু নিশ্চয়ই সেটা তোমাকে দেবেন। তাই প্রতিদিন তোমাকে গুরুপ্রদত্ত কাজ করতেই হবে। গুরুর জন্য যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করা, গো পরিচর্য্যা, আশ্রম পরিচর্য্যা করা এসব তো আছেই এছাড়া ক্রিয়াযোগও প্রতিদিন কিছু না কিছু করতে হবেই। গুরু যেমন আদেশ করেন তেমন ভাবেই নিয়মিত করতে হবে। এলোমেলো ভাবে করলে হবেনা। সব বিষয়ে যোগীকে খুব নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়। নইলে যে উদ্দেশ্যে জগতে আসা সেটা হবে না। তোমার মনোরথ আমার ভক্ত হওয়া। আমার ভক্ত হতে হলে শুধুই গুরুভক্তিতে হয় না। গুরুভক্তি পূর্ণতা পায় দেহাভিমানশূন্য হলে। প্রাণকর্ম্ম করতে করতেই তোমার দেহাভিমান চলে যাবে, দেহাভিমান শূন্য হলেই আত্মদর্শন হয়। তখন আর অহঙ্কার থাকে না। গুরুপদে লীন হওয়া যায়। তখন নিজের কাজ বলে কিছু থাকে না। সব কাজই ভগবানের কাজ। এভাবেই চরম জ্ঞান লাভ হবে। গুরুপদেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারলে স্বাভাবিক অবস্থা (ভাব) পাওয়া যায়। ফলাকাঙ্খাও রহিত হয়। তাই নিয়মিত ভাবে গুরুর আদেশ পালন করে চল ॥ ৩/৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।।৯

অনুবাদ : বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে এই লোকে কর্ম্মবন্ধন হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে নিষ্কাম (অনাসক্ত) হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৩/৯

ব্যাখ্যা : শ্লোকের অর্থ অনুযায়ী যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করলে বা যজ্ঞ করলে কর্ম্মবন্ধন হয় না, কিন্তু অন্য কর্ম্মে আসক্তিরূপ বন্ধন হয়ে থাকে। তবে কি আগুনে ঘি ঢালা বা ঘি পোড়ানোই ভগবানের অভিপ্রায় ? একটু শাস্ত্রের ভিতরে লক্ষ্য করা যাক।

"ন হোমং ইত্যাহুং সমাধৌ তত্ত্ব ভূয়তে। ব্রহ্মাগ্নৌ হুয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে॥"

অতএব আগুনে ঘি ঢেলে হোম করার যে প্রথা দেখি সেটা কোনও হোমই নয়। প্রাণযজ্ঞই প্রকৃত হোমরূপ যজ্ঞ। এখানে ব্রহ্মাগ্নি অর্থ নাভিমণ্ডলস্থিত জঠরাগ্নি। এই অগ্নিতে প্রাণবায়ুরূপ ঘৃতের দ্বারা যে হোম হয় সেটাই যজ্ঞ। (৪র্থ অধ্যায় ২৪ নং শ্লোক) প্রাণই সব। এই প্রাণশক্তিই নাভিতে সমান বায়ু । বিষ্ণুশক্তি রূপে (দেহ) জগৎকে ধারণ করে আছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা প্রাণই শক্তি, বিশ্বব্যাপী সকল বিশ্বের মহাপ্রাণ। তাই আত্মজ্ঞান লাভের উপায় যে প্রাণযজ্ঞ তারই অনুষ্ঠান কর। তবেই যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর তৃপ্তিলাভ হবে। এই কর্ম্মই ইচ্ছারহিত কর্ম্ম। কারণ এতে ইন্দ্রিয়ের কোনও আরাম হয় না। আসক্তিও থাকে না। করতে হলে অনাসক্ত হয়েই করতে হবে। লোকে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের আরামের জন্যই সবকিছু করে থাকে। তাতে একটু তাৎক্ষণিক সুখ হয় বলেই তাতে আসক্তি হয় খুবই। সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনও হয়। অর্থাৎ ঐরকম আরাম বার বার পেতে ইচ্ছে হয়। না পেলেই দুঃখ অশান্তি এসব হয়। কিন্তু বাপু ভেবে দেখ দেখি জগতে তুমি আর কটা দিনই বা আছ ? তাই তোমার নিজের জন্য এত কাজের কি দরকার ? আমরা আসক্তির জন্যই কর্ম্মের বোঝা বাড়াই। এসবই অকাজ, অপকর্ম্ম, প্রাণশক্তির অপচয়। ঋষি অষ্টাবক্র বলেছেন-

"যদি দেহং পৃথক কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠতি।

অধুনৈব সুখী শান্তঃ বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥"

চিত্তই চিন্তা দ্বারা আমাদের বন্দী করেছে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপী কারাগারে। তাই চিন্তা প্রবাহের বিরাম হলেই নাড়ী শুদ্ধ হয় ও প্রাণশক্তি মস্তিষ্কে স্থির হয়। তখনই দেহ আত্মা হতে পৃথক হয়। তখন প্রাণ বিশ্রাম লাভ করে থাকে ও সজীব হয়, পরমানন্দরূপ মুক্তির দিকে এগোয়। তাই মুক্ত অবস্থা লাভ করতে হলে গুরুপদেশে নিষ্কামভাবে প্রাণযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হও। এই শরীরই গয়াক্ষেত্র। এই গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে (আজ্ঞাচক্রে) পিণ্ডদান (কুণ্ডলিনী শক্তিকে অর্পণ করা) করতে পারলেই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না রূপ তিন কুলের মুক্তি হয়ে যায়। ৩/৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহাস্তিষ্টকামধুক্ ।। ১০

অনুবাদ: সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি প্রাণযজ্ঞ সহ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্ট, ভোগপ্রদ হউক॥ ৩/১০

ব্যাখ্যা : শ্লোকের অর্থ অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা আদিতে ব্রাহ্মণকে যজ্ঞাধিকারীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন আর বলেছিলেন যে এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা অভিবৃদ্ধি বা উন্নতিলাভ কর। সেকারণ এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হোক । ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে প্রাণের একটি নাম প্রজাপতি । আবার ব্রহ্মা সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে কাজও দিয়ে দিয়েছেন। এই কাজই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ যজ্ঞ। গীতার ৪র্থ অধ্যায়েও এই প্রাণযজ্ঞের কথাই বলা আছে। কৈবল্য বা মুক্তিলাভও এই যজ্ঞের দ্বারাই হয়ে থাকে। "নিশ্বাসরূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে॥" এই শ্বাস-প্রশ্বাসই মন্ত্র। প্রকৃত উন্নতি এই যজ্ঞের দ্বারাই লাভ হয়। সাংসারিক উন্নতি তো অতি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু তাই নিয়েই মানুষের মাথা খারাপ হয়ে থাকে। সেই সুযোগে কিছু লোক আগুনে ঘি পোড়ায়, তুকতাক্, ফুকফাক্ করে সংসারী জীবকে ঠকায়। কিন্তু এই যজ্ঞদ্বারা জীব ত্রাণলাভ করে। "যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ"। প্রাণই যজ্ঞ এবং যজ্ঞেশ্বর হলেন বিষ্ণু। অসীম স্থিরতাই যজ্ঞেশ্বরের রূপ। এর দ্বারাই পরমাত্মার সাথে জীবের একচিত্ততা হয়। এতেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। "যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগ মধ্যেকচিত্ততা" এ থেকেই মুক্তিলাভ হয়। আত্মার সাথে চিত্তের একাত্মতার নামই যোগ। কূটস্থ গহ্বরে মনোনিবেশ করলে ব্রহ্মযোনির কুন্ড উপলব্ধি হয়। সুষুম্না অন্তর্গত আদ্যাপ্রকৃতির সাথে মিলন হয়েওঁম' কার স্বরূপ বিন্দুর উৎপত্তি হয়। কূটস্থ মধ্যে এই বিন্দুই দেখা যায়। এই বিন্দুর বিস্তার হতেই সৃষ্টিতত্ত্ব। বিন্দুর বিস্তারে প্রাণ চঞ্চল হয়ে নীচে এলেই ইড়া পিঙ্গলার গতি শুরু হল এবং নাভিচক্র হতে প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে ও আপানবায়ুকে নীচে ঠেলে দিয়ে প্রাণের কর্ম্ম ঠিকভাবে হয়ে অজপারূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তার হয়। এইওঁম'কার স্বরূপ বিন্দুই ব্রহ্ম। বিন্দুর বিস্তার হতে সৃষ্টিতত্ত্ব বলেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি। গুরুপদেশ প্রাণের বহির্গতি নিবারণ করে আত্মমৈথুন পূর্ব্বক ব্রহ্মযোনিস্থ কুন্ড (কূটস্থ গহ্বরে)মধ্যে প্রাণের স্থিতি করতে পারলে প্রবোধরূপ পুত্র (আত্মজ্ঞান) লাভ হয়। নইলে জড় মিথুনচক্রে পড়লে চর্ম্মকুন্ডে আসক্তির সাথে গেলে কামরূপ পুত্র (অজ্ঞান) উৎপন্ন হয় ও নানা প্রকার অশান্তি ভোগ হয়। ৩/১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ।। ১১

অনুবাদ: এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবৰ্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবৰ্দ্ধিত করুন, এইরূপ পরস্পর সংবৰ্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে। ৩/১১

ব্যাখ্যা : দেবতা ও মানুষের ইষ্টকামনায় (reciprocity) পারস্পরিকতা বোঝান হয়েছে, কে কার “ইষ্টকামদোগ্ধা” হবে ? দেবতা ও মানুষ পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ করবেন অর্থাৎ (reciprocal relationship) দেখান হচ্ছে - যার আপাত দৃষ্টিতে অর্থ এমন দাঁড়ায় যে তোমরা দেবতাদের হবির্ভাগ দ্বারা অর্থাৎ ঘৃতাহুতি দ্বারা সংবৰ্দ্ধন কর। সেই দেবগণও তোমাদের বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ধ্যান্যাদি খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাহায্য করে সংবৰ্দ্ধন করুন। এইভাবে পরস্পর সংবৰ্দ্ধন দ্বারা অভীষ্ট লাভ করবে। এখন এইভাবে স্বর্গের দেবতার সাথে মাটির মানুষের পারস্পরিক লেনদেনের অর্থটা ঠিক বোধগম্য হল কি ? দেখা যাক কি হতে পারে ? সমাজের পুরোহিত সম্প্রদায়, যাঁরা দেবতাদের নিয়ে সদাসৰ্ব্বদা deal করে থাকেন তাঁরা কি বলেন ? শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজো দিয়ে শুরু করে মরলে শ্রাদ্ধ পৰ্য্যন্ত তো তাঁরাই সব কিছুতে বিধান দিয়ে থাকেন। অনেক বড় বড় প্যাণ্ডেলে বিরাট বিশাল বড় বড় পূজো করে থাকেন। দয়া করে একটু দেবতা ও মানুষের এই পারস্পরিক লেনদেন এর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন কি ? নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে হলে বলতেই হবে বৰ্ত্তমান কালের পুরোহিত সম্প্রদায় ও তাঁদের অবলম্বন “পুরোহিত দর্পণ” আদ্যন্ত লোকঠকানোর উপকরণ মাত্র। এর ভিতর সততার লেশটুকুও নেই। ধৰ্ম্ম ও পূজাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে বোধকরি লেখক “পুরোহিত দর্পণ” লেখার কষ্ট স্বীকার করতেন না। “পুরোহিত দর্পণ” গ্রন্থের লেখক তথা অনুসরণকারী সম্প্রদায়, অগণিত সরলপ্রাণ গৃহস্থকে বঞ্চনা করেন। প্রকৃত পূজোর রহস্য অবগত হয়ে পূজো করতে পারলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক। এর আগেও বলেছি যজ্ঞ অর্থ আগুনে ঘি পোড়ান নয়। বেদে আছে “হবির্বৈ আয়ুঃ” অর্থ হবিই আমাদের আয়ু। যখন সকলেই আমরা কর্ম্মের অনুরূপ নির্দিষ্ট অজপা সংখ্যা বা আয়ু পেয়েছি, তখন এই অজপা দ্বারাই হোম ক্রিয়ারূপ যজ্ঞ করতে হবে। যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। আবার সমস্ত জপযজ্ঞের মধ্যে অজপা জপই শ্রেষ্ঠতম। এই অজপাই আমাদের আয়ু। এই অজপা ক্রিয়াদ্বারা হোম করতে হবে। এই হোমের আগুন হলেন কূটস্থ ব্রহ্ম বা পরমশিব। এই কূটস্থ লক্ষ্য করে প্রাণকে হোম করলেই প্রাণ স্থির হবে। প্রাণশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত হলে বিদেহ মুক্তি হয়। এর দ্বারাই দৈবশক্তি পুষ্টিলাভ করে। দেবতা কারা ? কাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে ? আমাদের দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণই দেবতা। এই কর্ম্মদ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তার ভিতরের সূক্ষ্ম শক্তিসকলের স্ফূরণ হবে। সেই শক্তি জাগ্রত হয়ে সাধককে অভীষ্ট বর প্রদান করবে, মানে সাধককে কর্ম্মে সাফল্য অর্জনের মত মেধাশক্তি এনে দেবে। তাই বলা হয়েছে এই ক্রিয়াতে সমস্ত দৈবশক্তিও পুষ্টিলাভ করবে। গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজো কি ভাবে হয় ? দেখুন, সৰ্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ সৰ্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি করে সাধককে কৃতার্থ করবেন কখন ? যখন ক্রিয়াসাধনে মূলাধারে শক্তি চৈতন্যলাভ করলে ক্ষিতিতত্ত্বকে জয় করা যাবে। সেই একই শক্তি যখন স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণুরূপে থাকেন তখন সেই বৈষ্ণবী শক্তিকে জাগাতে পারলে সাধক অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। এই একইভাবে পাঁচ চক্রে পাঁচ দেবতা যথা মণিপুরে অগ্নি বা রুদ্র, অনাহতে বায়ু বা ঈশ্বর, বিশুদ্ধাক্ষ্যে সদাশিব বা আকাশ সাধনা দ্বারা প্রাণ পেয়ে বা জাগ্রত হয়ে বা শক্তি সঞ্চারিত হয়ে, বা সংপূজিত হয়ে, যেভাবেই বলি, সাধকের চিরদিনের বাসনা পূর্ণ করেন। অবশ্য এসমস্ত কাজের আগে আসনে স্থিত হয়ে ষট্‌কৰ্ম্ম দ্বারা শরীর শুদ্ধ না হয়ে থাকলে এ কাজ করার বিপদ আছে। শরীরকে ষটকৰ্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ করলেই আসনশুদ্ধি হয়। তারপর উক্ত উপায়ে পঞ্চচক্রে ভূত সকলের উপাসনায় ভূতশুদ্ধি হলে তপোলোক বা আজ্ঞাচক্রে কূটস্থ বা অক্ষর পুরুষের উপাসনা সুসম্পন্ন করে তবে সহস্রার বা সত্যলোকে উত্তমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করে সাধক সদসদ প্রকৃতি পুরুষের অতীত হয়ে সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ হন। তবে এসব কাজ করেই বা কে ? আর করায়ই বা কে ? পরিশ্রমে সাধনায় সময় খরচ করতে কেউই চায় না। ভোগের পিছনে সময় শক্তি সবই খরচ হয়। ভোগবাদী জগতে জড়বাদী মানুষের যখন অন্নগত প্রাণ আর যোনিগত মন তখনই “পুরোহিত দর্পণ” এর মত ফক্কিকারী গ্রন্থের উৎপত্তি হয় এবং পুরোহিত নামক “নেপোর দল” চরম সুবিধাবাদী তথা জড়বাদী গৃহস্থের দই সুলভে মারতে থাকে। ওরে বাপু, মাটির তৈরী মূৰ্ত্তির সামনে আগুনে ঘি পুড়িয়ে আর পশুবলি দিয়ে যদি কোনও কাজ হত তবে তো আর এত ত্যাগ তিতিক্ষার কোনও দরকারই হত না। কিন্তু সে কথা বললেই বিপদ আছে, তখনই আমি নাস্তিক এবং শাস্ত্রবিরোধী বলে পরিগণিত হব। সকলের ঘৃণার পাত্র হব। যাই হোক, মূলকথা হল প্রকৃত পূজোর রহস্য জেনে পূজো করতে হয়। ভূতশুদ্ধির রহস্যবেত্তাই প্রকৃত পূজা করে থাকেন। ক্রিয়াদ্বারা প্রতি চক্রে চক্রে মন দিতে দিতে লয় হয়ে সৰ্ব্বদেবতার উপাসনা হয়ে থাকে। এই পূজো করতে পারলেই জীবন সফল হয়, না করলে জীবন ব্যর্থ হয়। প্রকৃত পূজোর রহস্য জেনে পূজো করলে মানুষই দেবতা হয়ে যায়। তখন যে যে দেবতার ভাবনা করেন, সেই দেবতাও তাকেই ভাবেন। এইভাবে পরস্পর ভাববিশিষ্ট হয়ে কল্যাণ লাভ করেন। সমস্তই যখন দেবোময় তখন ভাবনা গুলোও দৈবী শক্তিসম্পন্ন হয়। সে জন্যই যখন আমরা কারও শুভকামনা করি তখন তারতো ভাল হয়ই সেই সাথে সাথে আমারও মঙ্গল হয়। শুভকামনাময়ী দৈবীশক্তিকে আমি আমার ঐশী ভাবনা দ্বারা প্রবুদ্ধ করে থাকি তাই তিনি আমাকে শুভভাবাপন্ন করেন। আমাদের চিন্তাশক্তি পবিত্র ও শুভশক্তিসম্পন্ন হয়। অবার উল্টো কাজ করলে উল্টোটা হয়। তখন অশুভকারিনী শক্তি পুষ্টিলাভ করে ও অমঙ্গল ঘটায়। এজন্য কখনও কারও অমঙ্গল কামনা করতে নেই। এতে অন্যের যাই হোক নিজেরও খারাপ হয়। যাই হোক, আগেকার দিনের “আশীৰ্ব্বাদ” “অভিশাপ" ইত্যাদি এভাবেই ফলপ্রদ হত। এর উৎপত্তিও এর থেকেই হয়েছিল। এখন এ যুগেও ক্রিয়ার পরাবস্থায় থেকে যদি কেউ সেই অনিচ্ছার ইচ্ছায় কিছু চাইতে পারেন তবে সেটা অব্যর্থ ফলপ্রদ হয়ে থাকে ॥ ৩/১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ।। ১২

অনুবাদ: যেহেতু দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগসকল দান করিবেন; তাঁহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোর ॥ ৩/১২

ব্যাখ্যা: দেবগণের দেওয়া অন্নাপানাদি দেবগণকে পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা না দিয়ে ভোগ করাই চৌর্য্যবৃত্তি। কারণ দেবগণই যজ্ঞভাবিত হয়ে অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়ে, সবরকম অনুকূল অবস্থা বৃষ্টি, বর্ষা ইত্যাদির দ্বারা তোমাদের অভীষ্ট ভোগ প্রদান করেন। আসলে এই শ্লোকে কর্ম্ম না করার যে দোষ সেটাই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আজকাল সবকাজেই উপলক্ষ্য আসল বস্তুকে অতিক্রম করে চলে যায়। ধরা যাক যোগাভ্যাসের উদ্দেশ্য কি ? উত্তর জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। এই উদ্দেশ্যে যদি সাধন করা যায় তো অতি উত্তম। কিন্তু দেখা যায় যে বেশিরভাগ লোকে এখন যোগাভ্যাস করে শুধুই শরীরের বল পুষ্টি ইত্যাদি লাভের জন্য। কিন্তু এইসকল লাভের আশায় যোগাভ্যাস শুরু করলে লাভ বিশেষ কিছুই একটা হয় না। স্বাস্থ্য যদি বা একটু ভালও হয়, খুব একটা স্থায়িত্ব লাভ করে না। অথচ যদি একাজের উদ্দেশ্য যোগলাভ হয়, তবে কিন্তু পরোক্ষে স্বাস্থ্যলাভ আপনিই হয়। যোগের উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাস করলে নিজের ও জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন সম্ভব, কিন্তু শুধুই শরীরের বল, পুষ্টি পেয়ে যদি পার্থিব ভোগেই সেসমস্ত শক্তি ক্ষয় করা হয় তবে সেটা চোরের কাজ হয়। তাই সাধনার ফলে বিভূতিলাভ করলে তাতে ইহকাল পরকাল খুবই তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। তার চেয়ে বিভূতিলাভে চিরতরে বঞ্চিত থাকা ঢের ভাল। বাহ্য যোগের উদ্দেশ্য কিছু সুখভোগ ত্যাগ, তপস্যার উদ্দেশ্য কিছু সুখত্যাগ, কিন্তু যোগের উদ্দেশ্য সমুদায় ত্যাগ। (complete sacrifice / dedication) মহাভারতের শান্তি পর্ব্বেও আছে সর্ব্বত্যাগেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। এছাড়াও বিধিপূর্ব্বক প্রাণণক্রিয়ার দ্বারা যে স্থিরতা লাভ হয় তার বৃদ্ধি না করে সেই অবস্থাই ভোগে লাগিয়ে আবার যে চঞ্চলতাকে ডেকে আনে, সেই চোর। কারণ ফলাকাঙ্খা ত্যাগ না করে যোগের অভ্যাস করি, তারপর পূর্ণ অহংজ্ঞানে সকল কাজ করি, তখন গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাই, আর শুধু মুখে কেবল প্রাণযজ্ঞের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে থাকি। আমি অনেককেই জানি যাঁরা যোগার্জিত শক্তি ভোগের দ্বারা অপব্যয় করেন। এজন্যই এই যোগবিদ্যা সকলকে দেওয়া নিষেধ করা আছে (এই অধ্যায়ের ২৬ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)। যাই হোক মুখে মুখে অর্পণ করলে প্রকৃত অর্পণ করা হয়না, খাদ্য বস্তু তাঁকে অর্পণ করলে যদি তিনিই খান তবে আমি সেটা খেয়ে মিষ্টি, টক, ঝাল এসব বোধ করি কেন ? যাঁরা শুধু মাত্র বিভূতি লাভের আশায় যোগাভ্যাস করতে আসেন তাঁরা এবার এই আলোচনা থেকে আশাকরি নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। ৩/১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ।। ১৩

অনুবাদ: যজ্ঞাশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন (হয়ে থাকেন); কিন্তু যাহারা আপনার (পরিতৃপ্তি সাধন) জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে ॥ ৩/১৩

ব্যাখ্যা : সময়ের পরিবর্ত্তনের সাথে শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও কিছু পরিবর্তন না করে উপায় থাকেনা। পাপের ধারণা সময়ের ব্যবধানে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়। এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ দেখা যাচ্ছে যজ্ঞকারীরাই শ্রেষ্ঠ, অপরে নয়। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনে পঞ্চসূনাকৃত পাপাদি হতে মুক্ত হওয়া যায়। মনুস্মৃতি অনুসারে পঞ্চসূনা হল, উনুন, যাঁতা, জলকুম্ভ, ঝাঁটা ও উদুখল। এই পাঁচ জিনিসের ব্যবহারের সময় অজান্তে অনেক কীটপতঙ্গ মারা যায়। এজন্যই গৃহীরা এসব জিনিস ব্যবহার করে বলে তারা স্বর্গে যেতে পারেনা। তাই পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা এই পাঁচ রকম পাপের নিবৃত্তি হয়। মনুস্মৃতি অনুসারে "ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥"

ঋষিযজ্ঞ = বেদপাঠ, ত্রিসন্ধ্যা এবং উপাসনা ইত্যাদি।
দেবযজ্ঞ = অগ্নিহোত্র ইত্যাদি ব্রত অনুষ্ঠান।
ভূতযজ্ঞ = বৈশ্বদেব প্রবর্তিত বাস্তবধর্ম্মী যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
নৃযজ্ঞ = অন্নপানাদি দ্বারা অতিথি সৎকার।
পিতৃযজ্ঞ = পিতামাতা পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজ।

ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্রগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য দ্বিজাতিগণের এসব আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করলে কোনও অসুবিধে নেই, বরং তাদের একাজ প্রশংসনীয়, (মনু ১০ম অধ্যায়) তাঁরা প্রশংসা লাভ করেন। যারা শুধু নিজেদের খাবার জন্যই রান্না করে সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে। তাই সেই সময় এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হত। কিন্তু কালের প্রবাহে অধ্যাত্মবাদ অতীত হয়ে গেছে। সেই জায়গা দখল করেছে বস্তুবাদ যার অপর নাম ভোগবাদ বা জড়বাদ (materialism)। তাই এখন কীটপতঙ্গ নিধন হল কিনা, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এসব ধারণা পাগলের চিন্তা বলেই পরিগণিত হয়। কেবল বস্তুগত লাভ, টাকাকড়ির আমদানির চিন্তায় উদয়াস্ত কেটে যায়। যার অব্যবহিত ফল মানসিক বিকার। পরিণাম দুরারোগ্য মানসিক ও শারীরিক ব্যাধিসকল যথা : এইড্‌স, এ্যালজাইমার, আরও কত কি। সতীত্বের গঙ্গাযাত্রা ও মানবিক চেতনা, মূল্যবোধ ইত্যাদির শ্রাদ্ধশান্তি এর অনেক আগেই হয়ে যায়। ঘুষ বা অবৈধ লেনদেন ইত্যাদিও এখন স্বাভাবিক। তাই বলছিলাম শ্লোকের ব্যাখ্যাও সময়ের পরিবর্তনকে মনে রেখেই করতে হবে। যাইহোক, যোগার্থ ধরলে বলতে হয় যে চঞ্চল প্রাণকে স্থিরে লয় করে, স্থিরব্রহ্মে আহুতি দিয়ে সেই যজ্ঞের শেষভাগ

মানে কর্ম্মের অতীত অবস্থায় স্থিতি পাওয়া গেলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ সকল ইচ্ছারই নাশ হয়। মনে রাখতে হবে ইচ্ছামাত্রই পাপ। ইচ্ছার নাশ হলে আর কোনও পাপই থাকেনা। আর যারা বিষয়ভোগ ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য ঐ যজ্ঞের পাকরূপ নিষ্পত্তি বা খাস আধুনিক বাংলায় ধান্ধাবাজি করে থাকে তারা পাপই ভোগ করে থাকে। কারণ তাদের কাজের সময় নানা ইচ্ছার সাথে কর্ম্ম করায় অতীত অবস্থায় স্থিতি তো দুরের কথা বরং ইচ্ছাকেই পেয়ে থাকে। ফলে আরও বেশি করে ইচ্ছারূপ পাপের বশীভূত হয়। এই ইচ্ছাই ভোগবাসনার আগুনকে এমনই ভাবে জ্বালায় যে তা শরীর ও মনকে একেবারে দগ্ধ করে ফেলে। আত্মদর্শনাদি তো দুরের কথা, ভোগের ইন্ধন প্রচুর পেয়ে শেষে দেহ, মন বুদ্ধি সব জ্বালিয়ে দিয়ে প্রাণকে নির্ব্বাপিত করে দেবে। এও এক ধরণের যজ্ঞ ঠিকই তবে অমন্ত্রক। ফলে দেবোদ্দেশে যায় না। এতে আসুর ও রাক্ষসী শক্তি এসে যজ্ঞকারীকে ধ্বংস করে দেয়। এটাই পাপ যার ফল মৃত্যু। ভোগের এমনই মহিমা ৷৷ ৩/১৩

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ।। ১৪

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ।।১৫

অনুবাদ : ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি; বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ - কর্ম্ম হইতে সমদ্ভূত হয়। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ৷৷ ৩/১৪-১৫

ব্যাখ্যা: মনুস্মৃতি অনুসারে – প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে তাদের জীবন রক্ষার জন্য সেই রকম যজ্ঞেরও সৃষ্টি করেছেন। অতএব পরমেশ্বরের অনুগত হয়ে সেই কাজ সকলেরই করা উচিত। আরও বলা হয়েছে – "অন্নাদিতি স্বাভ্যাম্"। পঞ্চভৌতিক প্রাণিগণ অন্ন হতেই পুষ্ট হয়। সেই অন্নের জন্ম বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্ম মেঘ হতে, মেঘ যজ্ঞ হতে, যজ্ঞ ঋত্বিক এবং যজমানাদি কর্ম্ম হতে সমুদ্ভূত হয়, মানে জন্মায়।

এটা খুব রহস্যজনক কথা কারণ পরবর্ত্তী ১৫ নং শ্লোকের অর্থ এর সাথে যুক্ত করলে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়। যার অর্থ দাঁড়ায় ব্রহ্ম হতে সব ভূত (পদার্থ) হয়েছে। বৃষ্টি দ্বারায় অন্ন, যজ্ঞের দ্বারা মেঘ, যজ্ঞ কর্ম্ম হতে অতএব সকলেতেই ব্রহ্ম আছেন। এই ব্রহ্ম অক্ষর হতে হয়েছেন। তাই ব্রহ্ম যজ্ঞেতেই (সব কর্ম্মতেই) আছেন। অর্থাৎ অক্ষরব্রহ্ম সর্ব্বগত হলেও সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, মানে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা প্রাপ্ত। তাই বলা হয় "উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্মীঃ" অর্থাৎ লক্ষ্মী সর্ব্বদা উদ্যমে স্থিত। আসল মানে হল জগৎ চক্রের মূলই কর্ম্ম। লিঙ্গপুরাণ অনুসারে ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, তাঁরই শক্তিতে এটা বিধৃত, আবার তাঁতেই সব লয় হচ্ছে। অবিনাশী কবীরগীতায় বলেছেন "কালের উৎপত্তি এই ওঁকারস্বরূপ শরীর থেকে হয় এবং কাল কালেই লয় হয়, সকল কালের কাল মহাকাল ব্রহ্ম পরাব্যোম, তাইই আবার মহাকাশ, চিদাকাশস্বরূপ হয়েছেন ক্রিয়ার পরাবস্থাতে। সেই শূন্য মহাকাশ অনুপব্রহ্মতে থাকেন। অনুপব্রহ্মই ক্রিয়ার পরাবস্থা, চিদাকাশ, নিরঞ্জন যাঁর উৎপত্তি অনিল বা স্থির বায়ু থেকে, থাকেন সুষুম্নার মধ্যে।"

প্রাণকর্ম্ম থেকে শক্তি বা তেজের বিকাশ হয়, সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, ক্রিয়াশক্তি ফল উৎপন্ন করে তাই এটা যজ্ঞ। যজ্ঞ থেকে সমস্ত ক্রিয়াশক্তির পরিচালনে রস বা আনন্দ হয়। এর ভিতর সমস্ত শক্তি নিহিত থেকে ভবিষ্যতের ফল উৎপাদক হয়, স্থুলরূপে এটাই শুক্র বা সমস্ত কিছুর বীজ। কারণবারিতে যেমন নারায়ণ শায়িত তেমনই শুক্র মধ্যে শক্তিসহ বীজ সুপ্ত থাকে। রস বলেই এটা পর্জ্জন্য। এই রস বা বীজ হতে ক্ষিতি তত্ত্ব বা মূলাধার – যেটা অন্নময় কোষ, বা স্থুল শরীর। সমস্ত কর্ম্ম এই স্থুল বা পিণ্ডদেহ হতে নিষ্পন্ন হয়। এই মূলাধারই হল মায়াচক্র। এখানেই জগৎপ্রাণা মহামায়া যোগনিদ্রায় থাকেন। এনাকে জাগাতে না পারলে মূলাধার চক্র জয় হয় না আর পিণ্ডের (দেহের) অভিমানও যায় না। কিন্তু ইনি "নিত্যংযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং" কেন ? যেহেতু যজ্ঞই ক্রিয়াশক্তি যার বাহ্য (external) এবং আন্তর (internal) দুই ভাবে প্রকাশ। প্রথমটি বাহ্য ক্রিয়া সংসার বাসনা। জন্মমৃত্যু বা সংসারলীলা, অপরটি যখন প্রাণ অন্তর্মুখী হয় তখন সংসার অসংসার হয়, চঞ্চল স্থির হয়, জন্মমৃত্যুর অতীত হয়ে চিরস্থির কৈবল্য পদে স্থিত হয়। মহামায়াই তখন মহাবিদ্যা হয়ে ঘোর থেকে অঘোররূপিনী হয়ে যান। ৩/১৪-১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ।। ১৬

অনুবাদ: এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপজীবন সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে ৷৷ ৩/১৬

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে কর্ম্মচক্রের কথা বলা হল সেই চক্র জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বরই প্রবর্ত্তন করেছেন। চক্রটা ছিল এইরকম – পরমেশ্বরের বাক্যভূত বেদাখ্য ব্রহ্ম হতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি । প্রবৃত্তির কারণ হতেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান, তা থেকে পর্জ্জন্য, তা থেকে অন্ন, অন্ন হতে ভূতগণ (জীব), আবার ভূতগণের কর্ম্মপ্রবৃত্তি। এইভাবে বৃত্তাকারে চক্রের অনুবর্ত্তন না করলে তাকে বলেছেন পাপী ও ভোগী, অর্থাৎ ভোগীরাই পাপী। শুধু নিজের ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্যই জীবিত থাকা পাপ।

এতো গেল একরকম। আবার এভাবে দেখ বিদেহ থেকে স্থূলদেহ, অবাচ্য থেকে জাগ্রত, নিঃশব্দ থেকে বাক্ বৈখরী, কূটস্থ বা পরাশিব হতে ব্রহ্মা, নিরঞ্জন হতে ক্ষিতি, ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে গুহ্যদ্বার, আজ্ঞা থেকে মূলাধার, "অনুভব বিন্দু" হতে "তারক", অবরুদ্ধরূপ থেকে হ্রস্বমাত্রা, নিরাকার হতে সদ্যোজাত, "সোহহং ব্রহ্ম" থেকে স্থূল শরীর সাড়ে তিন হাত। ক্রমবিকাশ হতে হতে একে বারে স্থূল ভূত হয়েছে। এখন এই স্থূল শরীরই সব, এছাড়া আর কোনও কিছুরই বোধ নেই। স্বরূপে পৌঁছতে হলে আবার সেই মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্য্যন্ত যেতে হবে। এটাও একটা কর্ম্ম চক্র। অনুলোম বিলোমে যাতায়াত করতে করতে মূলাধারস্থিত সুপ্ত শক্তি জাগলেই, sensitive হয়ে উঠলেই , অনুবর্ত্তন সম্পূর্ণ হবে ও বিদেহ মুক্তি পাওয়া যাবে। এই চক্র এভাবে পূর্ণ হল। ভগবান বলেছেন এই চক্রে যে না থাকে সে তো শুধুই ইন্দ্রিয়ের জন্যই কর্ম্ম করে, তার জীবন বৃথা। আজ্ঞাচক্র থেকে এক এক ধাপ করে নামতে নামতে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল হতে হতে মূলাধারে এসে স্থূলতম। শরীরে ওঁকাররূপ দেখতে পারলেই এটা পরিষ্কার হবে। যাই হোক এতটা গভীরে না গিয়েও বলা যায় যে মনস্থির করার কৌশল না অভ্যাস করলেই ইন্দ্রিয়ারাম হতে হয়। তখন শুধুই পেঁচো হয়ে বসে বিষয় ভোগে জীবন কাটে। ফলে জীবনে "আবাদ করলে ফলতো সোনা" আর হয় না। তাই ভগবান বললেন এমন জীবনে ধিক্। ভোগীর জীবন বৃথাই। ৩/১৬

> যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
> আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ।। ১৭

অনুবাদ: কিন্তু যিনি আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কিছু কার্য্য(কর্ত্তব্য) নাই॥ ৩/১৭

ব্যাখ্যা: ক্রিয়া ততদিনই করা দরকার যতদিন ক্রিয়ার পরের স্থিরাবস্থার অনুভব না হয়। ক্রিয়াফল অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতিটা বেশ জমে গেলে আর চট করে নষ্ট হয় না, তখন আর ক্রিয়া করার দরকার হয়না। শ্বাস সুষুম্নায় চলাচল শুরু হয়ে গেলেই রাস্তা খুলে গেল। তখন বায়ু দূষণের এলাকা পরিহার করা উচিত। যাই হোক, প্রাণের গতি সুষুম্নাবাহিনী হয়ে আত্মারাম হতে পারলে তখন আর কোন বিষয়েই দৃষ্টি থাকেনা, তাই বিষয় সংগ্রহের জন্য ইন্দ্রিয়দেরও আর কাজে লাগাতে হয় না। দেখ আসক্তিশূন্য হতে পারলে কত মজা। এজন্য মুণ্ডক উপনিষদে আছে "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষু ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" আত্মাতেই যার খেলা, আত্মাতেই রতি, যিনি ক্রিয়া সাধন করে শান্তি পেয়েছেন তিনিই ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ।

তাই বলছিলাম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যেন কেউ ভাববেন না যে জন্ম জন্মান্তর শুধু ক্রিয়াই করে যেতে হবে। তা নয়। আত্মসাক্ষাৎকার হলে এবং তাতে (আত্মাতে) সম্পূর্ণ স্থিতি হলেই হল, তখন আত্মাতেই প্রীতি, তাতেই আনন্দ, আত্মাতেই সন্তুষ্টি, অতএব সেই অনুভবে আর কোনও রকম ইচ্ছাই থাকে না। আত্মার বাইরে আর কোনও কিছুরই দরকার হয় না। এর পরেও শ্লোকে পাবেন "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ॥" ৩/১৭

> নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনাহ কশ্চন ।
> ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ।।১৮

অনুবাদ : ইহলোকে কৃতকর্ম্মদ্বারা তাঁহার পূণ্যও হয় না, অকরণ হেতু কোনও পাপও হয় না এবং সর্ব্বভূতে কেহ ইহার ঐহিক বা পারত্রিক কোন বিষয়ে আশ্রয়ণীয় নাই ॥ ৩/১৮

ব্যাখ্যা : বেদে আছে মানুষ ব্রহ্মকে জানুক এটা দেবতাদের কাম্য নয়, প্রিয় নয়। সুতরাং মানুষের মোক্ষপ্রাপ্তিতে দেবতারা বাধা দেবেন, দৈবী বাধা কিছু আসবেই। সেই বাধা বিঘ্ন এড়াতে কর্ম্মের দ্বারা দেবসেবা করণীয়। অবশ্য বেদে একথাও বলা আছে যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মত্বের পথে বাধা দিতে দেবতারাও অসমর্থ। এই দুই কথা থাকলেও আসলে সত্যি কথা হল ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভের আগে পর্য্যন্ত কিন্তু দেবকৃত বিঘ্ন সকল ঘটেই থাকে। যাক সেসব কথা। ঠিক মত লেগে থাকলে গুরুকৃপায় যত জ্ঞানোৎপত্তি হতে থাকে, বাধা বিঘ্নও সব কেটে যায়। তাছাড়া বাধা বিঘ্ন কতক্ষণ ? যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ। যখন আমিই নেই, তখন আর আমাকে বাধা দেবে কে ? সেই জন্য আগে আমিহারা হতে হয়। বুদ্ধি ব্রহ্মভাবময়ী হলে আর অহঙ্কার কোথায় ? অহঙ্কার যার নেই তার আবার কর্ম্মফল কিসের ? "আমি" অভিমান না থাকলে বন্ধন হবে কার ? তাই ব্রহ্মবিজ্ঞান ভাসিত হলে তাঁর দ্বারা কৃত কর্ম্মও তাঁর হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানে আমিত্বের লোপ পায়। সপ্তজ্ঞান ভূমিকার চতুর্থ ভূমিকা থেকেই সাধকের নিজের স্বরূপে অবস্থান হয়। সেখানে সদা নিশ্চিন্তভাব। আত্মজ্ঞান স্ফূরিত হয় তাই ক্রিয়া করার দরকার হয় না। কারণ কিছু পাবার নেই, হারাবারও নেই। এই পর্য্যায়ের যোগীর কোনও রকম দৈবী বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকেনা। সব বাধা বিঘ্নই প্রথম দিকে। শুরুতেই খুব বেশি হয়। পরাবস্থার ঘনত্ব আসার আগেই সবচেয়ে বেশি হয়। ক্রিয়াটা জমবার মুখেই বাধা খুব বেশি হয়। যাক্ সে তো গেল আগের কথা। কিন্তু আত্মজ্ঞান অনুভবে, বোধে পূর্ণত্ব এলে তখন ভাল মন্দ কিছু করলে বা না করলেও সে সবটাতে থেকেও কোন কিছুতেই নেই। একথাই শ্লোকে বলা আছে ॥ ৩/১৮

> তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর ।
> অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ।। ১৯

অনুবাদ: অতএব তুমি ফলাকাঙ্খাশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ৩/১৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে ধরণের জ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে সেই প্রকার জ্ঞানীর আর যোগকর্ম্মের প্রয়োজন নেই ঠিকই, কিন্তু তুমি কি সেই রকম জ্ঞানী ? ভেবে দেখতো। না, তা নয়। কারণ সে রকম জ্ঞানী কিছু ভাবতেও পারেন না, সবকিছুরই অতীত হয়ে যান। তাই তুমি সেইরকম জ্ঞানী নও। অতএব তুমি কর্ম্ম কর। কি ভাবে ? ফলসঙ্গ রহিত হয়ে। যেহেতু ফলাকাঙ্খারহিত হয়ে ক্রিয়া করতে পারলে তবেই পরম পুরুষকে পাওয়া যায়। কিন্তু ফলাকাঙ্খা ত্যাগ কেউই করেনা, করতে পারে না। কারণ কি? কারণ হল দেহেতে অভিমান ও আসক্তি। আসক্তিটা আবার শুধু দেহতেই সীমিত নয়, বিষয়েও অপরিমিত ভাবে থাকে। তাই দেখা যায় এমনকি ক্রিয়া করেও পর্য্যন্ত আমরা ফলাকাঙ্খা করি। যেখানে আসলে কোনও ফলই নেই। তবুও ভাবি ক্রিয়া করলে শরীরটা ভাল হবে বাঁচতেও পারব অনেকদিন, এই সব। অনেকেই আবার ভাবেন ক্রিয়া করতে করতে কত সব অদ্ভুত শ্রবণ হবে দর্শন হবে ইত্যাদি। এইসব আকাঙ্খা সব ক্রিয়াবানদেরই হয়। তাইতো ফলাকাঙ্খা হয়, আর তার ফলে কিছুই কাজ হয়না, সবই জল। আরে বাপু একটু ভেবে দেখছনা কেন যে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের লোভে তো বহু কালই কাটল। লক্ষ লক্ষ জন্মতো ঐ সব সেবাতেই কেটে গেল, এখনও কি সেই মোহ কূপেই পড়ে থাকব ? নিষ্কাম ভাবে সাধনা করলেই খুব অল্প চেষ্টায়ই পরাবস্থা পাওয়া যায়। এটাই সেই পরম পদ। কারণ এই অবস্থাতেই সেই পরম পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। কবীরদাসজী বলেছেন –

“সহকামী সুমিরণ করে পাওয়ে উঁচা ধাম।
নিহকামী সুমীরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম।”

সকাম অবস্থায় সাধনা করে একটু উচ্চভাব পেলেও নিষ্কাম অবস্থায় সাধনা করতে পারলে কিন্তু চিরস্থির জন্মমরণ রহিত অবস্থায় যাওয়া যায়। আর এই অবস্থা পেলেই পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হয়ে দুঃখের এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করা যায়। একথা তো আগেই বলেছি। তাই সব কাজেই ফলাকাঙ্খা রহিত হওয়া দরকার। সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ নিজের কাজটুকুও আগে ফল হিসেব করে তবেই করে থাকে, কাজের আগেই শুরু করে লাভের হিসেব। সাধনা, তপস্যা, ক্রিয়া এসমস্ত তো অনেক দূরের কথা। মানুষের নিজের প্রতিই নিজের কোনও দয়ামায়া নেই। থাকলে একটু এবিষয়ে তৎপর হোত। “গুরু, কৃষ্ণ, সাধুর তিনের দয়া হইল। আপনার দয়া বিনা জীব ছারে খারে গেল।” গুরু, দেবতা বা সাধু এঁরা কি শিষ্যের হয়ে সাধনা করে দিতে পারেন ? তাই সকলে নিজের প্রতি দয়া করুন। ৩/১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ।। ২০

অনুবাদ: জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, লোক সকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার বিষয়েও দৃষ্টি রাখিয়া (তোমার) কর্ম্ম করা উচিত ॥ ৩/২০

ব্যাখ্যা: এখানে পর পর দুটো শ্লোকের ব্যাখ্যা থেকে শ্রীভগবানের কথা কিছুটা স্ববিরোধিতা বলে মনে হতে পারে। কারণ আগের শ্লোকে বলেছেন পরাবস্থা প্রাপ্ত হলে তাঁর আর ক্রিয়ার দরকার নেই। আবার এই শ্লোকে বলছেন যে দরকার আছে এবং জনকাদি ঋষিগণের উপমাও দিয়েছেন, যাঁরা সিদ্ধর্ষি হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়ায় অবিচল ছিলেন। তাঁর যুক্তি হল সিদ্ধর্ষিগণ ক্রিয়া না করলে সাধারণ সাধকেরাও সব ক্রিয়া বা সাধন ত্যাগ করবে। প্রকৃতপক্ষে এটা স্ববিরোধিতা নয়। লোকরক্ষার প্রয়োজনেই মহাপুরুষেরা অনেক বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করেন। গুরুদেব ক্রিয়ার পরাবস্থায় থেকে সব ভাল মন্দের অতীত হয়েছেন কিন্তু শিষ্য তো এখনও অজ্ঞানী। তাই তারই জন্য গুরুকেও মিছি মিছি অজ্ঞানী সেজে থাকতে হয়, আর তেতো ওষুধটাও গিলতে হয়, শুধুমাত্র অজ্ঞ ভক্ত ও শিষ্যগণের প্রয়োজনে। তাই এই শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন যদ্যপি তুমি নিজেকে যথার্থ জ্ঞানী মনে কর তথাপি এই কর্ম্ম করাই তোমার পক্ষে মঙ্গল জনক। লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনের জন্যও কর্ম্ম করা তোমার কর্ত্তব্য, অবশ্যই উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে। সবসময় ভাবতে হবে যে আমি কর্ম্ম করলে তবেই অন্যেরাও করবে। নচেৎ তোমার দেখাদেখি তোমার শিষ্যরাও নিজ ধর্ম্মত্যাগ করে পতিত হবে ও অধঃপাতে যাবে। অতএব “লোকসংগ্রহং সংপশ্যন্” অর্থাৎ “সকল লোক যাহাতে সংগৃহীত হয় সে জন্যও এই কর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য”। তাছাড়া লোকশিক্ষা দিতে হলে তো আগে নিজেকে তৈরী করতে হয়। ফাঁকি দিয়ে কোন কাজটা হয় ? প্রকৃত যোগ শিখতে হলে তো খাটতে হবেই। অবশ্য এই “লোক-সংগ্রহং” কথাটির আরও গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সেটা হল এই আকাশ থেকে পড়লে পর্য্যন্ত মানে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত পর পর এক লোক থেকে আর এক লোকে লয় করতে করতে একেবারে সহস্রারে এসে পূর্ণাহুতি দিতে হবে। তবেই সপ্তলোককে এক করা হবে। ভূলোক, দ্যুলোক, সত্যলোকাদি সপ্তলোককে এক করে তুলে দেখার অর্থও “লোকসংগ্রহং সংপশ্যন্”। এভাবে যদি বিদেহমুক্তি কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় তবেই ব্রহ্মতত্ত্ববোধিনী স্বচ্ছবুদ্ধি সীতারূপ কন্যা লাভ হয়। কারণ পূর্ণাহুতি দিয়ে তুমি তখন বিদেহরাজ হয়েছ। নিদিধ্যাসনের এটাই লক্ষ্য। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবেনা। তাই ভগবান বলেছেন লোকরক্ষা প্রয়োজনেও কর্ম্মানুষ্ঠান তোমার কর্ত্তব্য। তাই কোন রক্ষা আর কোন কর্ম্মানুষ্ঠান সেটা বললাম। যাঁরা আত্মারাম হয়ে গেছেন তাঁদেরও লোকরক্ষার কথা দুভাবেই ভাবতে হবে। স্থূলদৃষ্টিতে শিষ্যের উন্নতি এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সবকটি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে লয় হওয়া। শ্লোকে জনকাদি ঋষির কথা উল্লেখ করা হল কারণ রাজা জনক বিদেহ মুক্তিলাভ করে বিদেহরাজ হয়েছিলেন এবং শুভবুদ্ধিরূপ সীতা বা শুভ্রজ্যোতি লাভ করেছিলেন কিভাবে ? হলকর্ষণ করে। দেহরূপ ভূমিতে

প্রাণায়ামরূপ হলকর্ষণ করেই তিনি এই শুভ্রজ্যোতি পেয়েছিলেন। তাই জনকাদি ঋষির মত লোকযাত্রা নির্ব্বাহে ফলাকাঙ্খারহিত হয়ে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ৩/২০

9/6/24, 9:58.

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ।। ২১

অনুবাদ : (কেননা) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহা তাহা করে; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে। ৩/২১

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের কথারই অংশ বিশেষই এই শ্লোক। লোকশিক্ষা দিতে হলে আগে নিজে তৈরী হতে হয়। ক্রিয়া নিজে না করে জ্ঞানলাভ হয় না আর জ্ঞানী সেজে বসতে গেলেও বিপদ আছে। ক্রিয়া না করলে ক্রিয়াতে অধিকার আসে না। আজকাল ঠিক এর উল্টো হচ্ছে বলে এই সময় গীতার বিশেষ দরকার। ক্রিয়া না করে মঠ মিশনে গিয়ে রক্তবস্ত্র বা গেরুয়াবস্ত্র বা পট্টবস্ত্রের বেশ ধারণ, বিভূতি, তিলক এসব ধারণই প্রধান হয়ে উঠেছে। এদের জন্যই এই অধ্যায়ের প্রবর্তনা। মূল কথা কর্ম্ম করেই তবে লোক সংগ্রহ করতে হবে। কারণ গুরু যা করেন শিষ্যগণও সেরূপই করে থাকেন, যেমন গুরু নিজে ধূমপায়ী হয়ে শিষ্যকে ধূমপান পরিত্যাগ করতে বলা বৃথা। তেমনই ক্রিয়ার বিষয় না জেনে শিষ্যদের মালা জপতে বলা বা উল্টোপাল্টা কাজ করানোও ঠিক নয়। নিজের মধ্যেই এর প্রমান দেখ।

দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের ভিতর মনই সর্ব্বপ্রধান। ইন্দ্রিয়রা মনের অনুগামী হয় তাই এদের‘জন’ বলা যেতে পারে। তাহলে দেখছি যে‘মন’ই শ্রেষ্ঠ তাই সে যেভাবে ভাবনা চিন্তা করে‘জনগন’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণও সেদিকে ছুটে যায়। এবারে দেখ এই মন শ্রেষ্ঠ। অতএব সে যদি আত্মজ্ঞান তৃষ্ণার্ত হয় তবে ইন্দ্রিয়সকলও সে দিকেই ছুটবে। আবার এই মন যদি বিষয়ে বদ্ধ হয় ইন্দ্রিয়গণও বিষয়ে বদ্ধ হবে। সে জন্যই ক্রিয়াতে মন বসে গেলেই ইন্দ্রিয়েরা আর দৌরাত্ম্য করে না। একেবারে শুরুতে অবশ্য খুবই করে থাকে। পরে তাদের বিদ্রোহ দমিত হবার পর আর করে না। রাণী মৌমাছির আদেশে শ্রমিক মৌমাছিদের মত যে কাজে লাগান যায় সেই কাজই করে থাকে।এজন্যই মহাপুরুষের ভাষায়, “মাতা পিতা হর আদমিকা মান্য হ্যায়, পূজ্য হ্যায়। তবভি দীক্ষাকা জরুরৎ হ্যায়। জনম মরণ কা সাথী এক গুরু নির্বাচন করনা হর ইনসান কা ফর্জ হ্যায়।” তাই ভগবান বললেন গুরু এখানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শুদ্ধভাষায় পুরুষোত্তম। তিনি কর্ম্ম বা কর্ম্মনিবৃত্তি যা গ্রহণ করেন শিষ্যগণও তারই অনুসরণ করে থাকেন। অতএব শ্রেষ্ঠ জনের কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। নিজের দরকার না থাকলেও। পরের শ্লোকে দেখ ভগবান নিজের উদাহরণ দিয়েছেন ॥ ৩/২১

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এ বচ কর্ম্মণি ।। ২২

অনুবাদ: হে পার্থ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; (কেননা) ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই রহিয়াছি। ৩/২২

ব্যাখ্যা : এখানে শ্রীভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন। ত্রিলোকে ভগবানের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ব্যাপার তো কিছুই নেই তবুও তিনি কিভাবে কর্ম্ম করে চলেছেন। এর পরের শ্লোক দুটোতেও তিনি নিজেকে দিয়েই বুঝিয়ে বলেছেন যে কর্ম্ম না করে থাকারও উপায় নেই। যাঁরা ক্রিয়া করেন তাঁরা সবাই জানেন যে ক্রিয়ার পরাবস্থায় কিছুই করার থাকে না, তখন তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। যেখানে সমস্ত কর্ম্মেরই লয় হয় সেখানে আবার কাজটা কি থাকে। কিন্তু এবারে বলি যে তাঁরা কি কর্ম্ম না করে থাকতে পারেন ? না পারেন না। কারণ দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব কাজই করি। কাজের অন্তও নেই তাই কাজের বিরামও নেই। তবে যতক্ষণ ক্রিয়া করি ততক্ষণ স্থির। শ্বাসের গতি সূক্ষ্ম হয়। তা সত্ত্বেও প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করলেও অতি সূক্ষ্মভাবে শ্বাসের কাজ ঠিকই চলে। কারণ দেহ থাকতে সে কাজ যায় না। কারণ প্রাণ সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। যারা ক্রিয়া করেন না তাঁদের অন্যভাবে বলি, ধরুন গভীর ঘুমে আমার মন বুদ্ধি স্থুলইন্দ্রিয় সূক্ষ্মইন্দ্রিয় সবই স্থির ও সুপ্ত হয়ে যায় বটে কিন্তু প্রাণ ঠিকই প্রবাহিত হতে থাকে তাই বেঁচে থাকি ও শেষে এক সময় ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠি। তাই বলছি প্রাণের সূক্ষ্মতম গতিসূত্রে তাঁর কাজ চলবেই। তাই প্রাণের এই কাজ দ্বারা প্রাপ্তব্য কিছু না থাকলেও এই ক্রিয়া চলেই, বন্ধ হয় না। তবে মনন, সংস্কার, আবেশ, অভিনিবেশ এসব কিছুই থাকে না। প্রাণক্রিয়া বন্ধ হলে তো জীবলীলাই শেষ। আব্রহ্মস্তম্ব সবই লুপ্ত হয়ে যায়। তবে সাধনদ্বারা ইচ্ছারহিত অবস্থা পাওয়া যায় তাই প্রাপ্তির ইচ্ছাও মিটে যায়। কোনও কিছুই চাওয়ার পাওয়ার নেই, এমনকি মুক্তিও না। কারণ চাইবে কে ? তিনি তো তাইই হয়ে গেছেন। তুলসীদাস বলছেন – “জানত তুম্হে তুম্হী হোই যাই।” যে তোমাকে জানে সে তুমিই হয়ে যায়। ভগবানও পরবর্ত্তীতে বললেন “মন্মনাভব মদ্ভক্তো” অর্থাৎ তুমি আমিময় হয়ে যাও। ৩/২২

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।। ২৩

অনুবাদ : হে পার্থ, অনলস হইয়াও যদি আমি কদাচিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করিবে। ৩/২৩

ব্যাখ্যা : ভগবান নিজের দৃষ্টান্তেই বলছেন তিনি আলস্যহীন, তিনি তাই অনলস। যদি তিনি ক্ষণকালের জন্যও অলস হন তবে সবই অচল হয়, অর্থাৎ প্রাণশক্তি। প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হলেই সব বন্ধ। তাই বলেছেন যে কর্ম্ম না করলেই লোকনাশ হবে। মানে সবরকম জ্ঞান, বিজ্ঞান, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রাণের প্রবাহ নিরুদ্ধ হলে সবই শেষ। তাঁর অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি রূপ কৌশলেই এই ছোট্ট ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহখানি ও সমুদায় বর্হিজগৎ অর্থাৎ বহুদেহের সমষ্টি যে সমাজ সংসার সেই জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। তাই তিনি কর্ম্মশূন্য (অচল) হলে সকল লোকও তৎক্ষণাৎ অচল হয়ে পড়ে। তাই বলেছেন যে যিনি যাই করুন সব আমারই রাস্তায় চলেছেন। আপনি বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান যাই হোন না কেন প্রাণশক্তিকে বাদ দিয়ে আপনি নেই। প্রাণশক্তির ক্রিয়া সর্ব্বদাই আপনাতে বর্ত্তায়। ইড়া নাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হলে আবার নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য এসে অধিকার করে। তেমনই সুষুম্নায় থাকলে জ্ঞান বিজ্ঞান, ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাবের কাজকর্ম্ম ভালই হয়। তাই বলছেন যে যাই কর বাপু সবাই আমাতেই আছ, আমার পথেই চলেছ। তোমাদের প্রবৃত্তিসকল আমারই অনুসারী। তোমার সেই একই প্রাণ কখনও ইড়া, কখনও পিঙ্গলা আবার কখনও সুষুম্নায় প্রবাহিত হয়, তাই সেই সময় সেই অনুযায়ী প্রবৃত্তিরও প্রভাব ঘটে। তাই ভগবান বলছেন যে যাই করুক, যাই ভাবুক, সবই তাঁর খেলা। এসব খেলাই বন্ধ হয়ে যাবে, সব কাজ কর্ম্মই চুকে বুকে যাবে যদি প্রাণপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সব কাজকর্ম্মের শক্তির লোপ হয় তাই জগতের অস্তিত্বও থাকে না ॥ ৩/২৩

> উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
> সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ।। ২৪

অনুবাদ : আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে এই লোকসকল{ধর্ম্মলোপবশতঃ} বিনষ্ট হইবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব। এইরূপে আমি প্রজাগণকে মলিন করিব ॥ ৩/২৪

ব্যাখ্যা : এখানেও আগের শ্লোকের কথাই বলা হয়েছে। প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হলে সবরকম ধর্ম্মই যথা– দেহধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, ও সকলপ্রকার চিত্তবৃত্তি, ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে তাতে আর বর্ণসঙ্কর হল কিভাবে ? তাই ভগবান বলেছেন যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে এই সকল লোক নষ্ট হবে। তাতে যে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হবে তার কর্ত্তা আমিই হব। এভাবে সমস্ত প্রজার অমিত ক্ষতি হবে। তারা অসময়ে মৃত্যুলাভ করে সমাজকে অসংহত করবে ও জগতে অসাম্য তৈরী হবে। লিঙ্গপুরাণেও আছে "লয়নং লিঙ্গমিত্যুক্ত তত্রৈব নিখিলং সুরাঃ"। সুর শব্দের অর্থ ক্রিয়াযোগী। এই শ্বাস ও শরীর শিবের উত্তম লিঙ্গ। অলিঙ্গই লিঙ্গের মূল এই শ্বাসই সমস্ত শরীরব্যাপী আছে। অর্থাৎ কিছু ছিল না তা থেকেই সব হল। তাইতো মহাদেব সর্ব্বশরীরে ও সর্বত্র ব্যাপ্ত। মহাদেব, অর্থাৎ শ্বাস, কূটস্থ ব্রহ্ম। কর্ম্ম না করলে মহাদেব সকল প্রজাকে হনন করবেন। মানে এই ক্রিয়া যদি না করা হয় তবুও প্রাণের ক্রিয়া তো বন্ধ হবে না। তাই সাধনা দ্বারা প্রাণকে স্থির করে ব্রহ্মপুরীতে প্রবেশ করতে না পারলেই যমপুরীতে যেতে হবে। এই শ্বাসরূপী মহাদেবই ঘটস্থ হয়ে "কাল" স্বরূপ হয়েছেন। ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়া করে তাঁকে স্থির করতে না পারলে এই ঘটস্থ কাল যত সব ব্যর্থ বাজে কাজেই ফুরিয়ে যাবে। আসল জ্ঞানলাভ তো দুরের কথা, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আয়ু শেষ। তাই সঙ্করভাবের কথা বলেছেন যে সব দোষ মিলে প্রজা সকলকে মানে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত শরীরকেই বিকৃত করবে অর্থাৎ সাম্য (balance) নষ্ট করবে। আর ঠিক তালে তালে চলতে পারবে না। ৩/২৪

> সক্তাঃ কর্মণ্যোবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত ।
> কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসহক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ।। ২৫

অনুবাদ : হে ভারত, কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানীগণও লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপই করিবেন ॥ ৩/২৫

ব্যাখ্যা : ভগবান কথাটার উপসংহার করছেন এ ভাবে যে আত্মজ্ঞানীও কর্ম্মসকল করবেন তবে এমনভাবে যেন সাধারণ মানুষ তাঁর কাজের মধ্যে অনাসক্তির ভাব না বোঝে। অর্থাৎ তিনি অতি সাধারণ ভাবেই কর্ম্মাসক্তের ভূমিকায় অভিনয় করে চলবেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞেরও লোকসংগ্রহের জন্য তাদের প্রতি কৃপাবশতঃ সব কাজই করা উচিত। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি অনাসক্তই থাকবেন। সম্পূর্ণ অনাসক্ত ব্যক্তির বিপদ হল যে তার অনাসক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে পরিবার পরিজনের ও সম্পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ ভক্তের কাছে। সেখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করতে পারেন না। সেই জন্য ভগবান বলছেন জ্ঞানীরও অজ্ঞকে অনুসরণ করা উচিত কর্ম্মের অভিনিবেশ আনার জন্য। অর্থাৎ অজ্ঞ যেমন কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়ে কর্ম্ম করে জ্ঞানীও তেমনই করবেন তবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে। এছাড়াও শরীরটা যতদিন আছে ততদিন তাকেও তো খেতে পরতে দিতে হবে। সেই অর্থে বিদ্বান ব্যক্তিরও কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে। তাই বলছি বিদ্বান ও অজ্ঞ উভয়কেই কর্ম্ম করতে হবে। তবে তফাৎ হল অজ্ঞ সম্পূর্ণ আসক্তিতে ভরপুর আর জ্ঞানী পূর্ণমাত্রায় নিরাসক্ত থাকেন। অবশ্য ঈশ্বরে নির্ভর করেও বসে থাকা যায়, সমাধিবান পুরুষ তেমনটা করলে বলার কিছু নেই। কারণ তাঁর কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বলে কিছু নেই কিন্তু ভগবান বলছেন অবিদ্বান মূর্খদের প্রতি কৃপাবশতঃ তিনি কর্ম্ম করবেন। তাছাড়া যারা নতুন ক্রিয়া পেয়েছেন তাঁরাও ভাবতে পারেন মহাপুরুষ স্বয়ং যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন তবে আমরাও বা খেটে মরি কেন ? এরূপ ভাবনার মূল হল তার তখনও রসবোধ হয়নি। পরাবস্থার খবর এখনও সে পায়নি। তাই তিনি বিদ্বান ব্যক্তিকেও নিয়মিত সাধনা করতে বলেছেন। অজ্ঞ লোকেদের মধ্যে একটা চিরাচরিত ধারণা প্রচলিত আছে এই যে সাধনা করতে হলে বিষয়ত্যাগই নিয়ম। এই

অমূলক ভ্রান্ত ধারণার বশে কেউই সাধন পথে আসতে চায় না। এরাও যদি দেখে যে না, এতে তো প্রত্যক্ষভাবে কোনও ত্যাগ নেই বরং বিনা বিষয় ত্যাগেও একাজ করা যায় তখন তারাও স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে। যেমন রাজা জনক তাঁর অসামান্য অনাসক্তির প্রভাবে রাজা হয়েও ঋষি হতে পেরেছিলেন ॥ ৩/২৫

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
> যোজয়েৎ সর্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।। ২৬

অনুবাদ : অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, অর্থাৎ পরাবুদ্ধির রহস্য বলিবেনা। বরং ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞানীদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন ॥ ৩/২৬

ব্যাখ্যা : যদি জ্ঞানীকে লোকসমাজে এতটাই দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হয় তবে তো যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সকলকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তাতেই ভগবানের আপত্তি। বলছেন অজ্ঞ ও অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে নেই। পরাবুদ্ধির রহস্য সাধারণ মানুষকে কখনও ব্যক্ত করতে নেই। কারণ আত্মা অকর্ত্তা এই জ্ঞান এসে গেলেই মুশকিল। তখন তারা আসল সাধনকর্ম্মের ভিতর না গিয়ে সহজে বাজিমাৎ করার চেষ্টা করবে। ভগবান অর্জ্জুনতুল্য ভক্ত শিষ্যদের জন্য এই অমূল্য উপদেশ রেখে গেছেন, এই চেতনা আর কোনও ধর্ম্মেই স্পষ্ট করে বলা নেই। বুদ্ধির পর যে পরাবুদ্ধি সেটাই হল কর্ম্মের অতীত অবস্থার জ্ঞানরূপা আত্মবিষয়িনী বুদ্ধি। সাধনদ্বারা এই অবস্থায় না পৌঁছালে ক্রিয়াবানকে বুঝে ওঠা অজ্ঞ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে কর্ম্মাসক্ত সামাজিক জীব স্থিতধী যোগীর কাজকর্ম্মে অসামাজিকতা ও ভ্রষ্টাচার খুঁজে বের করেন ও তাঁকে বিবিধ উপায়ে হেনস্থা করে থাকেন। সেজন্যই খুব স্পষ্ট করেই ভগবান একথা বলেছেন। কোনও রাখ ঢাক করেন নি। কর্ম্মাসক্ত, অজ্ঞ বক্তিদের সেই জ্ঞান হবে না। তাই যোগীকেও সমাজে থাকতে হলে ঐরূপ অজ্ঞ ও কর্ম্মাসক্তদের মতই ভাবভঙ্গী ও আচরণ করে টিকে থাকতে হবে। এজন্যই ভগবান বলেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজেও সকল বিষয় কর্ম্মাদি করবেন এবং অজ্ঞানী শিষ্য ও ভক্তগণকেও ঐসকল বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত রাখবেন। প্রথমে উত্তমরূপে গুরুসেবাদি বা গুরুগৃহে বিষয়কর্ম্মাদি করতে করতে বুদ্ধির বুদ্ধি পরাবুদ্ধির অবস্থায় পৌঁছে গেলে তবে গুরুকে অল্পস্বল্প চিনতে পারতেন। তখন ব্রহ্মজ্ঞানের পাঠ শুরু হত। ব্রহ্মজ্ঞ ও পণ্ডিত শব্দের অর্থ হল যাঁর ব্রহ্মকে জানারূপ প্রকৃত জ্ঞান হয়েছে এবং পণ্ডা অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। এ বুদ্ধি যাঁর আছে তিনিই বাস্তবিক পণ্ডিত। ক্রমশঃ ক্রিয়া করতে করতে ক্রিয়ার পরাবস্থা বেশ একটু ঘনীভূত হতে আরম্ভ হলে তখনই নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যসত্তার অবধারণ হতে থাকে। ক্রিয়া করে এই অবস্থায় না পৌঁছালে বাইরের দিক থেকে এসব বোঝাতে গেলে বিষম অনর্থের সূত্রপাত হয়। এজন্যই জ্ঞানীগণ অজ্ঞ ও অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ যারা ক্রিয়া করছে অথচ এখনও গভীরে ঢোকেনি তাদের কোনও রকম নিগূঢ় তত্ত্বকথা বলেন না। বরং তাদের দোখয়ে দেখিয়েই জাগতিক আসক্তি ব্যক্ত করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম জ্ঞানভূমিতে থেকে এসব কাজ সহজেই করা যায়। একমাত্র যোগীশ্বর ছাড়া এ রহস্য অন্য কেউ বুঝবে না। তাছাড়া আমরা সবাই ভোগবাদী সমাজে বাস করি। সবাই এখানে বিষয়ী অতএব প্রকৃত অর্থেই অজ্ঞানী। মূর্খ যেমন বিজ্ঞানের কথা বোঝেনা, তেমনই অজ্ঞানীরা কর্ম্মের পরাবস্থার কথা ধারণাও করতে পারেনা। শুধুমাত্র যখন“মন’ এই উপাধির নাশ হয় তখনই ঐ অবস্থার ধারণা আসে। বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি মানেই “কর্ম্মের পরাবস্থা”। যাদের বুদ্ধিরই উন্মেষ হয়নি তারা পরাবুদ্ধির কি বুঝবে ? মাঝখান থেকে একটা অদ্ভুত সামাজিক অশান্তিতে টেকাই দায় হয়ে উঠবে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি এমনভাবে কাজকর্ম্ম করবেন যাতে তাঁর ভক্তরা প্রথমে কর্ম্ম করে পরে জ্ঞানলাভ করে। অন্য সকলের চোখে তুমি বেঁচে থাকতে শয়তান, কিন্তু চলে গেলে ভগবান। কারণ অনেকেই তোমার কাছে ক্রিয়া চাইবে, স্বাভাবিক ভাবেই সকলকে দিতে পারবে না। তখনই তুমি তাদের চোখে শয়তান কিন্তু তুমি নিজের কাছে নিজে ভগবান ॥ ৩/২৬

> প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
> অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ।। ২৭

অনুবাদ : কর্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়গণ)দ্বারা সর্বতোভাবে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত (অবিদ্বান, দেহান্দ্রিয়াদিতে আত্মধ্যানে বিমূঢ় বুদ্ধি) ব্যক্তি “আমি কর্ত্তা” এইরূপ মনে করিয়া থাকে ॥ ৩/২৭

ব্যাখ্যা : এই অধ্যায়ের প্রথমশ্লোকেই বলা হয়েছে যে জন্মের শুরু থেকেই প্রকৃতির গুণ ক্রিয়া করতে শুরু করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি প্রকৃতির গুণ এবং এর দ্বারাই শরীর মনের সব কাজ হয় অর্থাৎ রক্ত মাংসে বায়ু গিয়ে তেজের দ্বারা প্রাণাপানের কাজ হয়। এই গুণের সাথে ইন্দ্রিয়ের যোগ হয়ে (Nervous system) অন্যান্য সব কাজ হয়ে চলেছে। যেমন, চোখে তেজস্তত্ত্ব যা দিয়ে দেখা যায়, কানে বায়ুতত্ত্ব যা থেকে শুনতে পাই, জিহ্বায় জলতত্ত্ব যা থেকে আস্বাদ পাই, নাকে ক্ষিতিতত্ত্ব যা থেকে ঘ্রাণশক্তি আসে। এইভাবে প্রকৃতির গুণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সব কাজ নিজে থেকেই হয়। সন্ধ্যাকালে হাসনুহানা ফুল ফুটলে সুন্দর গন্ধ পাই। এতে আমার কি ভূমিকা ? সুগন্ধটা প্রকৃতির গুণ যা ইন্দ্রিয়দ্বারায় অনুভব হচ্ছে মাত্র। কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেকেই সব কাজের কর্ত্তা মনে করে থাকে। এই একইভাবে প্রাণের উর্দ্ধ ও অধোগতিতে অর্থাৎ প্রাণ উপরে এবং নীচে স্থির, শুধু মাঝখানেই চঞ্চল থাকে আর মনের এই কর্ত্তা সাজার মূল কারণও এটাই। বিদ্বান ব্যক্তি এটুকু বোঝে কিন্তু অজ্ঞের এসব ধারণা সামান্যমাত্রও থাকে না। অজ্ঞতা থেকে আসে অহঙ্কার, আর অহঙ্কার থেকে আসে ভ্রান্তি। অহঙ্কারদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলে আত্মার

অধ্যাসহেতু বিমূঢ় বুদ্ধি হয়েই এমনটা মনে হয়। অধ্যাস কথার মানে হল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আত্মাতে এবং আত্মার ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়েতে আরোপ। এই ভুল থেকেই শুরুতে যা বললাম যে পঞ্চতত্ত্ব মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক হয়েই অহঙ্কারে মুগ্ধ হয়ে সব ভুলে গিয়ে চরম আসক্তিতে পর্য্যবসিত হয় যার মূলে থাকে দেহাভিমান, যার পুরোটাই মিথ্যে। যেমন মাটির তৈরী পুতুলের নাম, রূপ, রং, যাই থাক না কেন জিনিসটা আসলে মাটি। তেমনই আমার চেহারা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শক্তি, বল, বিক্রম, অর্থসম্পদ যাই হোক আমি আসলে কি ? মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেমন ত্রিগুণের খেলা মাত্র তেমনই আমি আসলে আত্মামাত্র। বাকি কোনও কিছুই সত্য নয়। শুধু ঐ নামরূপের খ্যাতি অখ্যাতির খেলা মাত্র। এসবের জন্য সাময়িক গর্ব অনুভব হলেও সেটা সত্যি নয়। আর যা সত্যি নয়,সেটাকে সত্যি মনে করাই মূর্খতা। মন আত্মাতে না থাকলে এসব খেলা চলে আবার আত্মাতে ডুব মারলে, মিশে গেলেই, এ সব খেলা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ আত্মাই চেতন আর মন বুদ্ধি এ সবই জড়। তাই বললাম যে ঐ অধ্যাসের দ্বারাই জড় মন, বুদ্ধিকে চৈতন্যযুক্ত বলে মনে হয় ফলে মনের মননত্ব আর অহঙ্কারের কর্তৃত্বভাব গিয়ে নিঃসঙ্গ আত্মাতে আরোপিত হয়। আত্মার সম্বন্ধে কিছুই ধারণা না থাকায় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকেই আত্মা ধরে নিয়ে অদ্ভূত এক খেলা শুরু হয়ে যায়। শৈশব থেকে কৈশোর এবং তৎপরে যৌবনে যত দিন যায় এ ধারণাই এত বদ্ধমূল হয় যে কোনও জ্ঞানীর পক্ষেই এই অজ্ঞান দূর করা অসম্ভব। তাই‘আত্মা’ যে অসঙ্গ সেটা এসব মূঢ়বুদ্ধিরা মোটেই জানতে পারেনা, এই ভাবেই চলতে থাকে। এ থেকেই শুরু হয় “পথের পাঁচালী”, “অপুর সংসার” যা ক্রমশঃ চক্রাকারে “অপরাজিত” থেকে যায় ॥ ৩/২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ।। ২৮

অনুবাদ : কিন্তু হে মহাবাহো, – গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ এই দুইয়ের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি “ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে(আমি নহি)” এই মনে করিয়া (কর্ম্মসমূহে) কর্তৃত্বাভিমান করেন না ॥ ৩/২৮

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের সূত্র ধরে ভগবান বলেছেন আত্মা যে অসঙ্গ মূঢ় বুদ্ধিরা সেটা কিছুতেই বোঝে না। জড় মন ও বুদ্ধিকে অহঙ্কার দ্বারা আত্মা মনে করে। কিন্তু তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ স্বরূপবেত্তা যিনি, যিনি বিদ্বান, তাঁর কর্তৃত্বাভিনিবেশ হয় না। কারণ তিনি গুণ থেকে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম্ম থেকেও আত্মার বিভাগ এই তত্ত্ব বেশ ভাল মত জানেন। এরূপ তত্ত্বজ্ঞ যিনি তিনিই অনুভব করেন যে ইন্দ্রিয়গুলোই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে, আমি নই। তাই তাঁর কর্তৃত্বাভিমানও নেই। রহস্য থেকে গেল একটাই, যেটা এর আগেও বলা হয় নাই, যে এটা কিভাবে হয় ? সহজেই ভেবে দেখ যে মন বুদ্ধি অহঙ্কার না থাকলেই আত্মার অস্তিত্ব বোঝা যাবে। মনই নিজের সংকল্প বিকল্প তৈরী করছে, বুদ্ধি সেটাকে শক্ত পোক্ত করছে আর অহঙ্কার সেটাকেই জাহির করে চলছে। তাই মনকে নিষ্ক্রিয় করার কৌশল যিনি আয়ত্ত করেন তাঁর সবরকম কল্পনা ও মনন তিরোহিত হওয়ায় আত্মার অকর্তৃত্বস্বভাব বেশ বোধগম্য হয়ে থাকে। ক্রমশঃ এই কৌশল প্রয়োগের সময় বাড়িয়ে ক্রিয়াটা বেশ জমে উঠলে ঐ অবস্থা কিছুটা কিছুটা করে স্থায়ী হতে শুরু হলেই গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ বেশ বোঝা যায়। তুমি যদি মাঠের ফুটবল খেলার দর্শক মাত্র হও তবে কে কিরকম খেলছে সেটা বুঝতে পার কিন্তু তুমি নিজেই যদি মাঠে নেমে খেলতে থাক তাহলে তুমিও একটা দলের হয়ে গেলে, লক্ষ্য রইল বলের দিকে, গোলের দিকে, জেতার দিকে ইত্যাদি ভাবে সক্রিয় খেলোয়াড়, শুধু সাক্ষীমাত্র নও। কিন্তু দর্শক শুধুই সাক্ষীমাত্র। তেমনি শুধু সাক্ষীমাত্র হয়ে কূটস্থে থাকতে পারলে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ ভালমত লক্ষ্য করা যায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এদের পরিণাম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দেহ ইত্যাদির পৃথক পৃথক কাজের সাক্ষীরূপে সকলের কাজই দেখা যায়। জানা যায়, বোঝা যায় কিভাবে “আমি” বা “আত্মা” এই দেহ, মন, বুদ্ধি হতে পৃথক। কারণ শরীরের ক্ষয়, পুষ্টি, মনের নানাবিধ কল্পনা, বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা, ইত্যাদি ধর্ম্ম আছে কিন্তু আত্মার এসব কিছুই নেই। তাই যিনি কূটস্থে থাকেন তিনি এসকল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক কাজকর্ম্ম ও গুণ সকলের হ্রাস বৃদ্ধি ও তার ফলস্বরূপ প্রকৃতিতে কি কি তরঙ্গ উঠছে ইত্যাদি সবই দেখতে পান। কিন্তু এসব কোন কিছুতে তাঁর মমত্ব বা অভিমান না থাকায় তিনি চুপচাপ থাকেন। দীর্ঘকাল ক্রিয়া করলে এই অবস্থা লাভ করা যায়। “তস্য চঞ্চলতা যৈষা ত্ববিদ্যা রাম সোচ্যতে। বাসনাপদনাম্নীং তাং বিচারেণ বিনাশয় ॥” মানে, “হে রাম! চিত্তের যে চঞ্চলতা তাহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যার নামই বাসনা। বিচার দ্বারা ইহাকে বিনাশ কর।” চিত্তের চঞ্চলতা ক্রিয়া না করলে যাবে না। আত্মাতে সর্বদা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টার ফলে একভাবে লেগে থাকলেই একাগ্রতা আসবে। এইভাবে একাগ্র হতে পারলেই মনের অন্যান্য বৃত্তি নিরোধ হবে। বাসনাতরঙ্গময়ী নাড়ীর গতি ঠিক করতে না পারলে বাসনার ঢেউ ওঠা বন্ধ হয় না। অন্তঃকরণ থেকে “আমি” “আমার” জ্ঞান নিরুদ্ধ হলে মন ও আত্মাতে যে ভুল বশতঃ তদাত্ম্যবোধ রয়েছে সেই অধ্যাসটা নষ্ট হয়ে যাবে। গুরুবাক্য অনুসারে জীবনচর্য্যা করলে, অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় ফলে রজঃ ও তমোগুণ নষ্ট হয় তাতে প্রজ্ঞা বাড়ে ও রজোগুণে অভিনিবেশও নষ্ট হয়। এই হল মোটামুটিভাবে গুণ হতে ও কর্ম্ম হতে আত্মার বিভাগ আর এই দুয়ের তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় ॥ ৩/২৮

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তান কৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ।। ২৯

অনুবাদ : প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণে মোহিত হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগকে বিচলিত করিবেন না ॥ ৩/২৯

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটা ২৬ নং শ্লোকেরই অর্থের অংশ বিশেষ। যাঁর "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" জ্ঞান হয়েছে তাঁরা জড়বাদী বা ভোগবাদীদের নিকট সৎকথা, সদালোচনা বা ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই বলবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। তারা ভাল কথার কদর্থ করবেন ও শেষ পর্য্যন্ত সাধু সজ্জনদের প্রহার করবেন। একারণ শ্রীভগবান এ বিষয়ে বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। সাধারণভাবে মানুষ জড়বস্তু দেখে ও ভোগ করে তাই তাতেই বিশ্বাস করে। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণে মুগ্ধ থাকে এবং সেই সব গুণের যা কাজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায়ই আসক্ত থাকে। কথায় আছে "পাঁচ কৌড়ি দো লেকিন বুদ্ধি মাত দো" মানে বিষয়ী মানুষকে পারলে কিছু পয়সা দিও, তাতে সে খুবই খুশী হবে। কিন্তু ভূলেও সুযুক্তি, সুপরামর্শ দিতে যেও না। এ শ্লোকেও ভগবান একথাই বলেছেন, শেষে বলছেন পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও অজ্ঞান ও মন্দমতিদের বিচলিত করবেন না। এ কথাই প্রকারান্তরে এই অধ্যায়ের ২৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে। কারণ খারাপ প্রকৃতির লোকেরাই গুণেতে সম্মোহিত হয়ে কর্ম্ম করে, তাই তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। অবশ্য এর বিরল ব্যতিক্রম যে নেই তাও নয়। মূর্খ হলেও সাধক যদি গুরুবাক্য মত কাজ করে চলেন তবেই তরে যেতে পারেন, পার পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু অলসের কোনও উপায় নেই। অলস ভাল পথ পেয়েও পরিশ্রম করেনা, কারণ সে হল উদ্যমশূন্য গর্দ্দভ। এদের জন্য মহাপুরুষরাও কিছু করতে পারেন না। সাধারণ সাধকেরা আর কিই বা করতে পারেন। সাধারণতঃ অলস মাত্রেই ভোগের অভিলাষী হয় অথচ মুখে বড় বড় কথা বলে। দল, ক্লাব, রাজনীতি ইত্যাদিতে নেতৃত্ব দেয়, সর্বোপরি নিজে কিছুই না বুঝে মানুষকে বোঝাতে যায় ও তার মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেই বিবাদ ঘটে। এই শ্রেণীর কিছু কিছু লোক আবার শ্রীমদ্ভাগবদগীতার উপদেশের প্রতিও কটাক্ষ করে ও অকথ্য কথাবার্তা বলে থাকে। তাই এদের থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন। ৩/২৯

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যাস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ।। ৩০

অনুবাদ : সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া আত্মাতে মন রাখিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূণ্য হইয়া শোকত্যাগপুর্ব্বক (রিপু গণের অর্থাৎ অন্তঃশত্রুগণের সহিত) যুদ্ধ কর ॥ ৩/৩০

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্ব্বেই শ্রীভগবান স্থির করে দিয়েছেন যে তত্ত্বজ্ঞ হলেও তাঁর কর্ম্ম করাই উচিত। সুতরাং কর্ম্মের প্রয়োজন না থাকলেও কর্ম্ম করতে হবে, এটাই স্বতঃসিদ্ধ। আর যাঁরা এখনও তত্ত্ববিৎ হন নাই তাঁদের জন্যই তো কর্ম্মের বিধান। এবার কতকগুলো কথা বলছি যা কর্ম্মবিষয়ে জেনে রাখা খুব দরকার। তাহলেই বুঝবে যে কিভাবে কর্ম্ম করলে ঠিক হবে। আমাতে সমর্পণ করে, অধ্যাত্মচিত্তদ্বারা, নিষ্কাম হয়ে, ভগবানের উদ্দেশ্যে –

(১) আমাতে সমর্পণ করে
(২) অধ্যাত্মচিত্তদ্বারা
(৩) নিষ্কাম হয়ে
(৪) ভগবানের উদ্দেশ্যে

পদ্ধতিটা এত সুন্দর যে এই ভাবনা রপ্ত করতে পারলে ক্রিয়ার সব বাধাই দূর হয়ে যায়।

(১) আমাতে (ব্রহ্মে) সব সমর্পণ করে ক্রিয়া করার অর্থ আলস্য ত্যাগ করা। সর্ব্বদা মনে ভাববে এ কাজটা আমি নিজের জন্য করছি না। প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর ভৃত্য আমি তাঁর আদেশ পালন করছি মাত্র, এতে আমার কোনও হাত নেই। তাহলেই দেখবে সব আলস্য পালিয়ে গেছে। কারণ এ কর্ম্ম তোমার নিজের নয়। ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত করণীয় কাজ। ভাববে আমার যিনি প্রিয়তম অর্থাৎ "আত্মা" তাঁর কাজই করছি, এই ভাব মনে স্থায়ী হলে কোনও কর্ম্মের তাপই গায়ে লাগে না। অবশ্য এভাবে ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করতে হলে অধ্যাত্মচিত্ত হওয়া চাই।

(২) অধ্যাত্মচিত্ত কি ? আত্মায় যুক্ত বা সংস্থাপিত চিত্তই অধ্যাত্মচিত্ত। নিরুদ্ধচিত্তই অধ্যাত্মচিত্ত। কারণ তাতে বিষয় কালিমা লিপ্ত থাকে না। ফলে আসক্তিশূন্য হয়। আর আসক্তিশূন্য হলেই সে চিত্ত সহজে ব্রহ্মার্পিত হয়। প্রথমে যে কথা বলা হল অর্থাৎ ব্রহ্মে সব সমর্পণ করার কথা – সেই ব্রহ্মার্পণ এমন চিত্তদ্বারাই হয়। কর্ম্ম মাত্রেই তো স্পন্দন। স্পন্দন মাত্রেই তাপ। কর্ত্তা মাত্রেই কর্ম্মের তাপবাহী কিন্তু ব্রহ্মার্পিত হয়ে কর্ম্ম করলে সে তাপ লাগেনা। তাই জ্ঞানীর মন তাঁতে সমর্পিত হওয়ায় সব কর্ম্ম করলেও তাপ লাগেনা।

(৩) নিষ্কাম হয়ে কর্ম্ম করা। ক্রিয়া নিজের সুখের উদ্দেশ্যে না করলেই নিষ্কাম হল। ক্রিয়ার ফল চরম সুখ, শান্তি এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেজন্যই তো সবাই করে। কিন্তু এমন ভাব থাকলে আর ক্রিয়া হয় না। অধ্যাত্মচিত্ত হতে পারলে কর্ম্মের ব্রহ্মার্পণ হয়। আর ব্রহ্মার্পণ হয়ে গেলে সে কর্ম্ম স্বঃতই নিষ্কাম হয়। সকল কর্ম্মই নিষ্কাম হওয়া উচিত, ফল সর্ব্বদাই অশান্তি বহন করে, সে ভাল, মন্দ যাই হোক। কারণ আমরা যেটাকে ভাল মনে করি সেটা আসলে ভাল নয়। তাই নিষ্কাম না হতে পারলে অধ্যাত্মচিত্ত বা ব্রহ্মার্পণ কোনওটাই হয় না। একটা অপরটার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

(৪) ভগবানের জন্যই – যে কর্ম্মই করি তা যদি সত্যই ভগবানের জন্যই হয় তা হলে আর তার ফল ভাবনা আমার মনে আসবেই না। কারণ এ কর্ম্ম আমার জন্য নয়। এভাবে মমতাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করলে তা স্বঃতই ব্রহ্মার্পিত হয়।

উপরে কর্ম্মের যে চার দফা উপায় বা পদ্ধতির কথা বলা হল সেই কর্ম্ম সম্পাদনের হেতু সম্বন্ধে ভগবান বলছেন (১৮ শ অধ্যায়ে) (১) শরীর (২) অহঙ্কার (৩) ইন্দ্রিয় (৪) চেষ্টা (৫) দৈব। শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা যা কিছু করে সে সমস্তর এই পাঁচটিই হেতু। আগেই বললাম যে কর্ম্ম ভগবানের, আমার নয় এমন ধারণা ছাড়া কর্ম্মের ব্রহ্মার্পণ হয় না , ভগবানের না হলে চিত্ত নিরুদ্ধও হয় না অর্থাৎ অধ্যাত্মচিত্ত হয় না। একটার অভাবে আর একটা হয় না। তাই ভগবৎপর হতে গেলে প্রাণকে ভগম্মুখী করতে হয়। সেটা কেমন করে হয় ? –

“ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মানি সংনস্য” উপরিউক্ত চার দফার প্রথম দফা দই থেকে যেমন করে মাখন তোলা হয় তেমনি নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করলে দেহ, মন ও বুদ্ধি জাগ্রত থাকে তখন (গায়ত্রীমন্ত্র দেখ) সেই সবিতার বরণীয় ভর্গের প্রকাশ দেখা যায় ও বোঝা যায় সেই প্রকাশশক্তিই শরীর, মন ও বুদ্ধির প্রকাশ নিয়ে আসে। তাহলেই বোঝা যায় যে শরীর, মন বুদ্ধির শক্তি এবং কর্ম্মসকল প্রকৃতপক্ষে এদের নিজেদের নয়, পরন্তু সেই সর্ব্বশক্তিময়ী প্রাণরূপিণী জগন্মাতারই শক্তি, অতএব এইসকল কর্ম্ম যার দ্বারায় করা তাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করা উচিত, নিশ্চয়ই নিজেকে নয়। কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম্ম করছি সেটা জানতে পারলেই তখন অহঙ্কারশূন্য অবস্থা আসবে এবং স্বাভাবিকভাবে অধ্যাত্মচিত্ত হওয়া যাবে। এভাবেই “নিরাশী নির্ম্মমো” হওয়া যায়। এ অবস্থায় যেতে হলে “যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ” হতে হবে।‘জ্বর’ এখানে প্রমাদ বা আলস্য যা কিছু ক্রিয়ার বাধা, “ওঃ এখন আর পারছিনা”,“থাক এখন, পরে আবার করব” এমনটা ভেবে নিয়ে একটু গল্পগুজব করা বা ঘুমিয়ে পড়া বা টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখা, এই ধরনের যেসব প্রমাদ, আলস্য, গাছাড়া ভাব, এক কথায় অনিষ্ঠা (রহংরহপবৎরঃ) এগুলোই হল সাধনার‘জ্বর’ হওয়া। আসলে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণ বিষয় খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, তাদের আত্মমুখী করে আত্মসমর্পণ করাতে হয়। এ গুলোই চিত্ত স্পন্দনের কারণ এবং শরীর কর্ম্মেরও নিয়ামক। তাই এসমস্তকেই ক্রিয়া করতে করতে নিস্পন্দ করতে হবে। তবেই প্রাণ স্থির হবে ও আত্মস্থ হবে। তখন এরা সবাই আর মনকে চালাবে না, মনই বরং আত্মার অনুগত হয়ে একাকার হবে। এ অবস্থায়ই সব ব্রহ্মার্পণ হয়, তখন থাকেন শুধু অন্তর্য্যামী। তখন আসল কর্ত্তাই কর্ত্তা হয়ে রইলেন ফলে আমার আর কোনও চিন্তা নেই, তাই অহঙ্কারও থাকল না, শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এই অবস্থাটা পাওয়ার জন্যই, মানে যতক্ষণ না পাওয়া যায়, “বিগতজ্বরঃ” হয়ে “যুধ্যস্ব” মানে যুদ্ধ কর, অর্থাৎ যুদ্ধ করতে হয় ॥ ৩/৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ।। ৩১

অনুবাদ : (আমার বাক্যে) শ্রদ্ধাবান্ এবং দোষদৃষ্টিবিহীন যে সকল মনুষ্য আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও (কর্ম্মকারী হইয়াও) সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন ॥ ৩/৩১

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ হচ্ছে উদ্যম অর্থাৎ আলস্য ত্যাগ। আগের শ্লোকের “বিগত জ্বরঃ” কথাটা দেখ। আলস্য ত্যাগ না করলে ক্রিয়া হবে না, ফলে সর্ব্বকর্ম্ম আত্মাতে সমর্পণও হবে না। তাই ভগবান বলছেন যে আমার কথায় শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য অর্থাৎ আমার কথার ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজবে না। অর্থাৎ যে আমার কথামত কাজ করে সদাই আমার অনুগত থাকবে, সেই সমুদয় পাপমুক্ত হবে, অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকবে। মানুষ নিজের শরীরের কষ্টকেই বড় করে দেখে। প্রকৃতির রহস্য বুঝতে অক্ষম, ভগবানের অভিপ্রায়ের কথা তো ছেড়েই দিলাম। মঙ্গল অমঙ্গল সবই প্রকৃতির বশে হয়। ভগবান কারও অমঙ্গল করেন না। যদিও প্রকৃতির অধীশ্বর তিনিই। তাঁকে না বুঝে উঠতে পারলে কেবল নিজের বুদ্ধিতে সুখ দুঃখ গুলোকে বিচার করতে গেলে তখন তার কাছে নিজের দুঃখই খুব বড় হয়ে ওঠে। পাপ কি ? কর্ত্তা সেজে বসা। ভগবানের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে অহংবশতঃ ঈশ্বরাবেশের বাইরে এসে পড়া ও অভিমানী হওয়া। এমনতর হলে সে তো দুঃখ পাবেই। বিশ্বসংসারের কর্ত্তার আন্ত রিক ভাব সে তো বুঝতে পারেনা। তাই এই দেহমন সব তাঁকে দিয়ে দাও আর তাঁর শরণাগত হয়ে যাও। প্রকৃতির খেলার দিকে না তাকিয়ে দিন রাত ক্রিয়া করে যাও তবেই তাঁর শরণাগত হতে পার। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাস্থাপন প্রথম কথা। এটা করতে পারলেই বাকীটা হয়ে যায়। সাধকদের মোটামুটিভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। পরবর্ত্তী শ্লোকেও পাবেন। প্রথমতঃ, যাঁরা গুরুতে সর্বস্ব সমর্পণ করে থাকেন তাঁরাই তীব্র বেগের সাথে সাধনা করেন কেননা গুর“ বিনা তাঁদের আর কেউই নেই। দ্বিতীয়ত, যাঁরা গুরুপদেশে পরম শ্রদ্ধালু, কিন্তু সাধনায় ততটা তীব্রতা নেই। তৃতীয়তঃ গুরুর উপদেশে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, সাধনায়ও যথেষ্ট শ্রদ্ধা কিন্তু সাধনায় তেমন তৎপর নন। চতুর্থত যাঁদের গুরু ও সাধনা কোনওটাতেই তেমন একটা বিশ্বাস নেই, বিধিমত সাধনকর্ম্মও করেন না। মাঝে মাঝে একটু আধটু করেন কিন্তু সর্ব্বদাই বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। পরের শ্লোকে ভগবান এদের কথা বলেছেন যে এদের মহা অনিষ্ট হয়। প্রথমশ্রেণীর সাধক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক জন্মেই কৃতকৃত্য হন। অনেকে গুরুর আগে আগেও সফল হতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক দুই তিন জন্মেই কৃতকৃত্য হন এবং তৃতীয় শ্রেণীর সাধকের গুরুকৃপায় কোনও না কোন সময় জ্ঞানলাভ হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকে লক্ষ্য করুন। ৩/৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ।। ৩২

অনুবাদ : কিন্তু যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করেনা, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও নষ্ট বলিয়া জানিও। (তাহাদের অধোগতি হয় জানিও)।

ব্যাখ্যা : ভোগবাদী সমাজে জনমত প্রধানতঃ ভোগবাদের দিকেই থাকে। এতৎ সত্তেও জড়বাদী মানুষের মধ্যে যদিচ এক আধ জন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব থাকে, যাঁরা যোগাভ্যাসে ইচ্ছুক হন এবং সাধনপথ লাভের ইচ্ছুক হয়ে একটু অন্যরকম ভাবে থাকেন। কোথাও কোনও যোগীর সন্ধান করেন অথবা কোনও যোগীর সন্ধান পেয়ে সেখানে একটু যাতায়াত করতে থাকেন এবং উপদেশ গ্রহণ করতে থাকেন, অমনি চারদিকে একটা "গেল গেল" রব উঠে যায়। বিভিন্ন ধরনের হিতাকাঙ্খীর দল এসে জুটে যায় এবং নানা ধরনের অহিতকারী মন্তব্যে তাকে অস্থির করে তোলে। কেউবলে "কোন্ ভণ্ডের পাল্লায় পড়েছ ?" কেউ বা বলেন "যোগ করলে মৃত্যু হয়", কেউবা বলেন "এসমস্ত সাধনকর্ম্মে কি ফল ?" ইত্যাদি নানাবিধ কথা। শেষপর্য্যন্ত পরিবার পরিজনদেরও "ওকে হিপনোটাইজ করেছে" ইত্যাদি বলে এমন বিভ্রান্ত করে দেয় যে তারাও বেচারা সাধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে নাজেহাল করে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সাধনপথ থেকে বিচ্যুত করে তবে ছাড়েন। তাই শ্রীভগবান এই শ্লোকে বলেছেন যে এমন দোষদর্শী লোকেদের নষ্ট এবং বিবেকহীন বলে জানবে। যারা এমন দোষদর্শী হয়ে এই আত্মকর্ম্ম না করে তারাও সর্ব্ববিধ জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে মূঢ় বলে জানবে। কারণ আসক্তিশূন্য অবস্থা না হলে কখনও বিবেকবুদ্ধি জন্মায় না। তাই তারা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানে বিমূঢ়। তারা "অচেতসঃ" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের অনুপযুক্ত সুতরাং "সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়" যেহেতু সাধনহীন অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তও ধারণা করতে পারেনা। অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের রহস্য ব্যাপারে চির অনভিজ্ঞই থেকে গেল। তাই তার ইহকাল পরকাল সব ইহতেই, মানে এখানেই নষ্ট ভ্রষ্ট হয়ে গেল। স্থিরতা কি তা জানল না। ব্রহ্মেতে থেকে যে কি পরমা শান্তিলাভ হয় তা বুঝল না, জানল না। মনুষ্য জীবন পেয়ে যদি সেই অবিকৃত স্থির ভাবকেই বুঝতে না পারল তাহলে শুধু জীবনের কষ্টের দিকটাই ভোগ করা হল। শুধুমাত্র মনুষ্য জন্মের ক্লেশ,কষ্ট,গ্লানির ক্লেদাক্ত অনুভবই বহন করল। এর বেশী আর কিছু হল না। তাই বলা হচ্ছে যে ইহকাল থেকে পরকাল সব কিছুরই বারোটা বাজল। ৩/৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ।। ৩৩

অনুবাদ : জ্ঞানবানও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করেন। প্রাণীগণ প্রকৃতির অনুসরণ করে। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিবে ? ৩/৩৩

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবানের উপদেশ পালনের কি অপূর্ব্ব মহাফল ! কিন্তু তথাপি প্রায় কেউই এই স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। এর রহস্য কি ? এমন একটা প্রশ্ন ওঠাই সম্ভব। তাই আগে থেকেই শ্রীভগবান বলে রেখেছেন যে, যার যেমন প্রকৃতিতে জন্ম, তাঁকে তার নিজের প্রকৃতি অনুসারেই চলতে হয়। প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মও অবশ্যই করতে হয়। এখানে "প্রকৃতি" অর্থ প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারাধীন স্বভাব। দোষগুণবেত্তা জ্ঞানবান লোকও নিজের স্বভাবের অনুরূপ কাজই করে, অজ্ঞ ব্যক্তির তো কথাই নেই। এখানে প্রকৃতিই বরং বলবতী। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ থাকলেও তা আর মানছেটা কে ? মানবার মত শক্তিই বা কোথায় ? শঙ্করাচার্য্য বলেছেন "পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমান জন্মাদাবভিব্যক্তঃ। সা প্রকৃতি।" অর্থ হল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মাদিকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের যে সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয় সেই সংস্কারের নাম প্রকৃতি। অতএব জন্মজন্মান্তরের সংস্কার থেকেই প্রকৃতি তৈরী হয়ে থাকে। এই প্রকৃতিই জীবের স্বভাব। তার উপর আছে আবার পঞ্চতন্মাত্রের খেলা। হাজারবার বোঝালেও মন তাতে বিচরণশীল। এই স্বভাবের কি পরিবর্ত্তন হয় ? তবে আর জোর করে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করে কি হবে ? মন যা ভাববার তাই ভাবে, যা করবার তাই করে। তা হলে এটা পরিষ্কার যে আমরা আমাদের কর্ম্মের সংস্কারবশতঃ স্বভাব, প্রকৃতি নিয়ে জন্মাই। আবার সেই স্বভাবের বশবর্ত্তী নতুন নতুন কাজকর্ম্ম করি আবার তাতে জড়াই অর্থাৎ স্বভাব, প্রকৃতি সে দিকে ঘুরতে থাকে কিন্তু এসব কর্ম্মের যখন ফল উৎপাদন হয় তখনই বলি ঈশ্বরের এবং অদৃষ্টের দোষ বা ভাগ্যদোষ ইত্যাদি নানাবিধ কথা। সত্যিই কি তাই ? আমাদের নিজের কর্ম্মসকলই কি ফল প্রসব করে না ? আমরা কখনও বুঝেও বুঝতে চাইনা যে এসব আমার কৃতকর্ম্মেরই ফল। প্রকৃতির আবর্ত্তনের বেড়াজালে পড়ে লালসা, ক্ষোভ, রাগ, দ্বেষ, অহংকার ইত্যাদির আগুনে জ্বলতে জ্বলতে একদিন ছাই হয়ে পঞ্চভূতে লীন হই। তবে কি প্রকৃতির এই আবর্ত্তনরূপী বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবার কোনও উপায়ই নেই ? আছে, আছে। সাংখ্যসূত্র দেখুন, "সৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" অর্থ পরমপুরুষের সন্নিধান বশতঃ প্রকৃতি তখন চৈতন্যযুক্তা বা চৈতন্যময়ী হয়ে যান। ব্যস্, চৈতন্য এলেই জড়ত্বের বিকার নষ্ট হয়ে যায়। তখন আর জড় নয়, পূর্ণচৈতন্যরূপ, এই চৈতন্যময়ী প্রকৃতিই স্থিরপ্রাণ বা ভগবতী।

এই অবস্থা পেতে হলে আগে নিজের প্রকৃতি বিষয়ে একটু বুঝে নিন। নিজের অনুভব এবং বোধশক্তিকে নিজের অধ্যাবসায়ের দ্বারা নিজে নিজে যতটা পারেন বাড়িয়ে নিন তারপর নিজের প্রকৃতিকে বোধ করুন। তাতে একটা সামান্যতম বোধ হলেও যা বললাম সেটা আপাতভাবে বোঝা যাবে। এই অবস্থায় এলে দেখবেন আপনার বোধশক্তি একটু হলেও বেড়েছে। আগে যা কিছু যেভাবে বোধ করতেন তার চেয়ে বেশ কিছুটা অন্যভাবে বোধ করছেন। অনুভবের এই পরিবর্ত্তন (transition) এর সময়েই একেবারে দেরী না করে, কারণ দেরী হয়ে গেলে অবস্থাটা ঠিক ধরে রাখা যায় না, এমন একজন পুরুষের সন্ধান করুন যিনি অবশ্যই বর্ণে ব্রাহ্মণ, বিবাহিত, গৃহী, সংসারী এবং

বেদজ্ঞ অর্থাৎ বেদপাঠ করে যাঁর বুদ্ধি বেদোজ্জ্বলা হয়েছে। আপাততঃ তাঁকেই আপনি পরমপুরুষ ধরে নিয়ে তাঁর শরণাগত হন, সেবা করুন এবং সন্নিধানে থাকুন। এতে আপনার প্রকৃতি সমভাবাপন্ন হতে থাকবে। কি ভাবে ? সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সমভাবাপন্ন হলেই দেখবেন আপনি ঈশ্বরমুখী হচ্ছেন আপনার নিজের প্রকৃতির মধ্যেকার রজঃ ও তমের ঢেউ শান্ত হচ্ছে। প্রকৃতির মধ্যের সব হিল্লোল থেমে গিয়ে প্রকৃতি শান্ত হয়ে যাচ্ছে। আপনি গুণাতীত অবস্থা লাভের পথে এগোচ্ছেন। আপনি এত বড় পরিবর্ত্তন নিজে খুব একটা বুঝবেন না যদি না ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। তবে শান্তি অনুভব করার সাথে সাথে একটা জিনিষ আসবে সেটা হল সংসারের কাজ আর কিছুই হয় না। স্থিরপ্রাণ হলে, চৈতন্যময় হলে, চৈতন্যময়ী ভগবতীর অধিষ্ঠান হলে আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু পরিবার পরিজনের তো চাহিদার অন্ত থাকে না, একটা জিনিষ পেতে না পেতেই আর এক জিনিষের চাহিদার জন্ম হয়ে যায়।

যাই হোক, প্রকৃতি স্থির অবস্থায় নির্গুণ কিন্তু নৃত্যপরা হয়ে উঠলেই আবার গুণময়ী, তখনই আবার বর্হির্মুখী হয়ে সংসার লীলা, খেলা চলতে থাকে। কিভাবে আটকাবেন ? সে চেষ্টা করবেন না। শরীর, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল যখন প্রকৃতিকে অনুসরণ করবে দেখবেন তারা শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে সমতা লাভ করবে, বর্হির্মুখী বৃত্তি নিজে থেকেই গুটিয়ে এসে আত্মাতে স্থির হবে, তখনই অনুভব করবেন সেই দুর্লভ শান্তি। আর কিছুই এর থেকে বেশী এ জীবনে হতে পারে না। এ না হলে শুধু কথায় কিছু হয় না। ইন্দ্রিয়েরা আপনা আপনিই শান্ত হয়ে গেলে বোধ করবেন "পরমানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্"। যাই হোক, এ অবস্থায় আসতে হলে অবশ্যই পঞ্চতত্ত্বকে অতিক্রম করতে হবে এবং আপনার সেই transition period এ আপনি যাঁর শরণ নিয়েছেন তিনি সামান্য মানুষ নন, অবশ্যই দেবতারও অধিক। প্রথমতঃ, তাঁর শক্তি ও উপদেশেই এ অবস্থা পাবেন। ক্রমশঃ তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে, তাঁর কথামত কাজকর্ম্ম করে, নিজেকে তাঁর উপযোগী করে তৈরী করে নিয়ে, নিজ অধ্যবসায়ে ঐ অবস্থায় পৌঁছান তাতে গুরুশক্তিও আপনার সহায় হবে। নচেৎ ঐ শান্তি কিন্তু স্থায়ী হবে না। কারণ মূল প্রকৃতি বা সাম্যাবস্থা থেকে পঞ্চতত্ত্ব উদ্ভূত হয়ে এই বিরাট সংসার রচনা করে। তাই এর বাইরে বেরিয়ে আসতে হলেও ঐ পঞ্চতত্ত্বকে অতিক্রম করতেই হবে, পার করতেই হবে। আর আপনার গুরুই হবেন সেই ভব পারের কান্ডারী ॥ ৩/৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ।। ৩৪

অনুবাদ: প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে (অনুকূলে) অনুরাগ ও (প্রতিকূলে) দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ঐ উভয়ের বশীভূত হইবে না। কেননা তাহারা মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ (বিরোধী) ॥ ৩/৩৪

ব্যাখ্যা : ভগবান বলছেন ইন্দ্রিয়গণ মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ। তাই তুমি তাদের বশীভূত হবে না। আরও বলছেন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অনুকূলে অনুরাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষভাব থাকে। খুবই স্বাভাবিক, আমার নিজেরই আছে। তবে আর ইন্দ্রিয়েরই বা থাকবে না কেন ? ক্ষণকাল চোখ বন্ধ করে থাকলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের বিরক্তি ঘটে তাই চোখ খুলে ফেলি তবে বশীভূত না হবার উপায় কি ? আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেভাবে নিজেকে পর্য্যবেক্ষণের কথা বলেছিলাম সেভাবে একটু লক্ষ্য করলেই এটা আপনি বুঝবেন যে কিসের দ্বারায় আমাদের (প্রাণীগণের) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আসে ? ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মগুলোকে জানা চাই, বুঝতে পারা চাই। যদিও কাজটা খুবই কঠিন। কারণ ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয়ে হয় না, হয় মনের অভ্যন্তরে। যদিও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব ধর্ম্ম আছে। সন্দেহ নেই যে তোমার পর্য্যবেক্ষণে কিছু ঘাটতি তো অবশ্যই থাকবে তাই বাকিটা গুরুসেবা করে জেনে নেওয়া চাই। গুরুর কৃপায় ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে বিশেষভাবে বুঝতে পারা চাই। বুঝতে পেরে সাবধান হওয়া চাই। ইন্দ্রিয়সকলের নিজ নিজ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ থাকে আর তা থেকেই জীবপ্রকৃতিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উৎপাদন হয়। এটা ভালমত বুঝে নিতে পারলে আর তাদের বশবর্ত্তী হতে হয় না। তখন সহজেই ইন্দ্রিয় জয় হয়। কিন্তু যেভাবে বললাম ঐ ভাবে, ঐ পথে, অন্যভাবে নয়। অন্য উপায়ও নেই। অনেকে ভাবতে পারেন ঈশ্বর স্মরণ করছি, জপ, তপ ইত্যাদি করে চলেছি, অতএব ইন্দ্রিয়ের উৎপাত হবে কেন ? এ অতিশয় মূর্খের ভাবনা। প্রকৃতিকে বশে আনা দুষ্কর কাজ। তার চেয়ে বরং প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করছে, করুক, ক্ষতি নেই। তুমি তাদের বশবর্ত্তী হবে না। তোমার কাজ তুমি করে চল। তোমার গুরুর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চল। প্রতিটি অবস্থা তাঁকে জানাও তিনিই তোমার কাজ সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট করে দেবেন। তবেই দেখবে যে তুমি যত গভীরভাবে যত দীর্ঘসময় ধরে আত্মকর্ম্মে মন বসাতে পারছ ততই তোমার মন বিষয় থেকে সরে আসছে, এই অবস্থায় তোমাকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, আর তখনই বুঝবে যে তুমি সঠিক পথেই আছ এবং তোমার সাধনা সঠিক হচ্ছে। তবে আবার প্রতিকূলতা কেন ? এটাও প্রকৃতিরই আর এক রূপ। এই প্রতিরোধ প্রবাহ কে বলশালী করার জন্যই আসে। আসে তোমার পুরুষার্থকে মজবুত করার জন্য। দেখবে নানাবিধ বিষয় সম্ভার ভোগ উপকরণ হিসাবে সামনে আসবে। ঘটনাচক্রে সুন্দরী সুন্দরী স্ত্রীলোক, কন্দর্পকান্তি পুরুষগণ তোমার সংস্পর্শে আসছেন এবং তুমি কামে মোহিত হচ্ছ। আর খুবই আশ্চর্য্যভাবে তোমার পুরুষার্থ সক্রিয় হয়ে সমস্ত মোহকেই "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" করে খুব সুন্দরভাবে পরিস্থিতি সামলে নিচ্ছে। এ অদ্ভুত কাজটা কিভাবে হল ? সাধনাভ্যাসে একটা শক্তি জন্মায়, তার দ্বারা তুমি ধরে ফেলছ যে প্রকৃতির কাজটা কিভাবে হচ্ছে। ফলে প্রকৃতি এসে আর মনের ঘরে সিঁদ কাটতে পারছে না। প্রকৃতি একা কোনও কাজই করতে পারেনা। মনের ঘরে ঢুকে পড়ে তাকে দিয়ে করায়। প্রকৃতির কাজ এখানে রূপ ও মন দুইই। যাহোক দেখবে এই উত্তরণে তুমি অদ্ভুত প্রশান্তি লাভ করছ। হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে থাকছে। তখন সদাই সদ্‌গুরু সন্নিধানে থাকতে ইচ্ছা হয়। আপনা হতেই

শাস্ত্রাদেশ ও গুরুবাক্য পালনে ইচ্ছা হয়। এটাকেই মুমুক্ষুত্ব বলা হয়েছে। এই মুমুক্ষুত্বের দ্বারা অতিবড় পাষণ্ড ও নাস্তিককেরও আমি পরিবর্ত্তন হতে দেখেছি। সদ্গুরু এমনই স্পর্শমনি। কবীর সায়েবের কথায় "গুরু পারশ গুরু পারশ হ্যায়, গুরু চন্দন সুবাস। সদ্গুরু পারশ জিউকে জিনহো. দীনহো মুক্তি নেওয়াস ॥" সদ্গুরু স্পর্শমণি বিশেষ। এঁর কাছে এলে জীবের জীবত্ব ঘুচে শিবত্ব লাভ হয়। এটাই মুক্তি। যাক্ সে অন্য কথা। এখানে পুরুষার্থ কিন্তু অহংকার মাত্র নয়, নয় পুরুষের অর্থ বা বিষয়। পুরুষের নির্লিপ্ত, নির্গুণ, আপনাতে আপনি মগ্ন থাকার যে স্বাভাবিক বৃত্তি(phenomena) ও ঝোঁক সেটাই পুরুষার্থ। কিন্তু প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত হয়ে সে যখন কামভোগপরায়ণ হয়ে ওঠে তখন আর তার কোনও পুরুষার্থ থাকে না। ক্রমশঃ জড়বাদী হয়ে নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য ও বৃথা আমোদ প্রমোদের বশবর্ত্তী হয়ে সুখ দুঃখের জ্বালায় জ্বলতে থাকে। তাই ভগবান বলছেন ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকলের প্রতি যে স্বাভাবিক অনুরাগ বিরাগ ও দ্বেষ বিদ্বেষ থাকে তা নিজের বুদ্ধিতে নির্দ্ধারণ করা যায় না। এর জন্যই চাই নিয়মিত শাস্ত্র আলোচনা ও শাস্ত্র বিচার। শাস্ত্রসকল আবার সাধারণ বুদ্ধি বিচারে কিছুটা confusing ও পরস্পর বিরোধী, তাই সদ্গুরুসঙ্গ একেবারে ঔষধির মত কাজ করে। পরের শ্লোকে লক্ষ্য করুন ॥ ৩/৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।। ৩৫

অনুবাদ : সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ ॥ ৩/৩৫

ব্যাখ্যা : আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে অর্জ্জুন যুদ্ধ এড়াতে চাইছেন তাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন যে অহিংসা এ সমস্ত সুখকর হলেও পরধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধকরা। সে যুদ্ধে মরণও শ্রেয়ঃ, ইত্যাদি। কিন্তু গীতা ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্রগ্রন্থ। এখানে আবার নিজের ধর্ম্ম পরের ধর্ম্ম ইত্যাদি নিয়ে দলাদলির স্থান থাকার কথা নয়। তাই প্রকৃত তাৎপর্য্য লক্ষ্য করা যাক।

স্বধর্ম্ম হল আত্মধর্ম্ম আর পরধর্ম্ম হল ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়সকলের স্ব স্ব ধর্ম্মের বিষয়ে ও তাদের পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। এখন ধর্ম্মের বিষয়ে শুনুন–

(১) ব্রাহ্মণ – যিনি ব্রহ্মকে জানেন।
(২) ক্ষত্রিয় – যিনি ব্রহ্মকে জানার জন্য ইন্দ্রিয়ের সাথে যুদ্ধ করেন।
(৩) বৈশ্য – যিনি ফলাকাঙ্খার সাথে কর্ম্ম করেন।
(৪) শূদ্র – যিনি সাধু পরিচর্য্যা করেন।

এই চারটিই কিন্তু উত্তরণেরই পথ মাত্র। তাই এরা ধর্ম্মবিশেষ নয়, কর্ম্ম অনুযায়ী বর্ণ মাত্র। (৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম ও ১৩শ শ্লোক এবং ১৮শ অধ্যায়ের ৪৭ ও ৬৬ নং শ্লোক দেখ)।

এ তো হল কর্ম্ম অনুসারে বর্ণের ভেদ কিন্তু কর্ম্মটা কি ? কর্ম্মটা হল আত্মকর্ম্ম যা উত্তরণের জন্য করা হয় যেমন শূদ্র থেকে বৈশ্য বা বৈশ্য থেকে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণে উত্তরণ। এই উত্তরণের প্রচেষ্টায় যা কিছু করা হয় সেটাই স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজ নিজ সাধন ক্রিয়ার স্তর যা বর্ণানুসারে আলাদা আলাদা। নিজ নিজ সাধন ক্রিয়াই নিজ নিজ ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। তবে পরধর্ম্ম কোনটা ? ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে ইন্দ্রিয়গত হয়ে যাওয়াই পরধর্ম্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম। বিষয়াসক্তিতে থেকে বিষয়কর্ম্ম তো অবশ্যই সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, এতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু আত্মকর্ম্ম পেতে হলে গুরু সকাশে যেতে হয়, তাঁকে সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট করতে হয়, তাঁর স্নেহ মমতা অর্জ্জন করতে হয়। তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে প্রাণকর্ম্ম তার সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এসব কি কম ঝামেলা ? তাই পরধর্ম্ম পালন অনেক সহজে, অনেক সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়, অথচ আত্মধর্ম্ম পালন করতে ধৈর্য্য, মনঃসংযম, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদির সমন্বয় আরও কত কি প্রয়োজন হয়। তথাপি "আত্মধর্ম্মই শ্রেয়" ভগবান বলেছেন। কারণ আত্মকর্ম্ম করে তুমি তোমার এই কঠিন ভবব্যাধি থেকে মুক্ত হবে আর পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান যত সুন্দর হবে ততই ভবব্যাধি বেড়ে যাবে। নিরন্তর চাঞ্চল্যভাবই মরণের পথ। মরণের পথের গতি খুবই মসৃণ হয় কিন্তু তুষারতীর্থের পথ অতি বন্ধুর।

স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিছু ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, ভয় নেই, শ্রীগুরুদেব আছেন। সব ঠিক করে দেবেন। তাছাড়া এই প্রাণকর্ম্ম তো আমরা জন্মের সাথে সাথে, দেহলাভের সাথে সাথে পেয়েছি। এখন শুধু শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সুষুম্নাকে চৈতন্যযুক্ত করার জন্য যোগ কৌশলটুকু জানা চাই। প্রাণায়ামের দ্বারাই শ্বাস চৈতন্যযুক্ত হয় ও সুষুম্নার দ্বার খুলে যায়। তখন মনের ত্রাণ হয় তাই একে মন্ত্র বলা হয়। তন্ত্রে আছে "শিবাদি কৃমি পর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্ত্তনং। নিঃশ্বাসঃ শ্বাসরূপেন মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে ॥" শিবাদি কৃমি পর্য্যন্ত প্রাণীগণের প্রাণাবর্ত্তনরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকেই মন্ত্র বলে। সুতরাং মনের ত্রাণ হয়ে গেলে আর ভয় কি ? তাই শ্রীভগবান বলেছেন স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হলেও শ্রেষ্ঠ। আত্মকর্ম্ম করতে গিয়ে যদি নিধন (মৃত্যু) হয় সেও ভাল কিন্তু পরধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম (বিষয়াসক্তি) আশঙ্কাজনক, মানে সর্ব্বদাই ভয়াবহ ॥ ৩/৩৫

অর্জ্জুন উবাচ –

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ।। ৩৬

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়, পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও এই পুরুষ কাহারও কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপ আচরণ করে ? (বার্ষ্ণেয় সম্বোধনের তাৎপর্য্য ১ম অধ্যায়ে ৪০ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা আছে) ৩/৩৬

ব্যাখ্যা : এখানে অর্জ্জুন ভগবানের উপদেশাবলী রাগ, দ্বেষ ইত্যাদির অধীন হবে না বলে যে সমস্ত উপদেশ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আছে সে সমস্ত পালন বেশ অসাধ্য মনে করেই এই প্রশ্ন করেছেন যে অসংযমী হতে না চাইলেও এমনকি বিবেকবলে কাম ক্রোধকে সাময়িক নিরস্ত করলেও পরে আবার সেসব কাজেই প্রবৃত্তি বেড়ে যায়। তবে কে বলপূর্বক একাজ করায় ? এর মূল প্রবর্ত্তক কে ? সবই জানি, সবই বুঝি, সর্ব্বদা যে এসব প্রবৃত্তির কাজ করতে ভাল লাগে তাও নয়, অথচ কোত্থেকে কি ভাবে যেন মানুষ প্রবৃত্তির কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। তাই কি উপায়ে এই প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয় তারই উপায় সাধকরূপী অর্জ্জুন গুরুরূপী ভগবানের কাছে জানতে চাইছেন। কারণ উপায় জানা থাকলে তবেই সাধক সে বিষয়ে যত্নবান হতে পারেন এবং তেমনটা অভ্যাস করতে পারেন। শ্রীভগবান এই প্রশ্নের উত্তর পরের শ্লোকেই দিলেন ॥ ৩/৩৬

শ্রীভগবান উবাচ –

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ।।৩৭

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন, ইহা রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং (উহা কোনরূপে প্রতিহত হইলে, উহা হইতে উৎপন্ন) ক্রোধ। মোক্ষমার্গে ইহাকে (এই কামকে) বৈরী বলিয়া জানিও ॥ ৩/৩৭

ব্যাখ্যা : এবার আগের শ্লোকে যে প্রশ্ন সাধক প্রবর অর্জ্জুন করেছেন, শ্রীভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে সাধকের সেটা কূটস্থে চৈতন্যদ্বারায় অনুভব হচ্ছে বা প্রকাশ পাচ্ছে। যেন ভগবান বলছেন, যা তুমি জিজ্ঞাসা করছ তার মূলগত হেতুই হল কাম। অবশ্য ক্রোধের কথাও বলা হয়েছে। কাম আর ক্রোধ আলাদা কিছুই নয়। কোনভাবে বাধা পেয়ে কামই ক্রোধ হয়ে প্রকাশ পায়। কাম, ক্রোধ দুইই রজোগুণ থেকে উদ্ভূত। আসলে গ্রহণ ও ত্যাগের ইচ্ছাসমূহই কাম যার আর এক রূপ হল ক্রোধ। সংসার ক্ষেত্রে এবং সাধন ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই এ দুটিই প্রধান শত্রু। আরও মজার কথা এই যে আমরা যত শিক্ষাই লাভ করি বা তথাকথিত জ্ঞানী হই না কেন মন কিন্তু কাম ক্রোধের উপর কর্তৃত্ব করতে পারেনা বরং কাম ক্রোধই মনের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। তবেই বোঝ মানুষ কত অসহায়। এর বশবর্ত্তী হয়ে কত ধ্বংস হয়েছে। কতই না অনর্থ ঘটেছে তাই একে ভগবান, মহাঔঅশন' (আগুন) বলেছেন; মহাশত্রু মনে করতে বলেছেন; পরবর্ত্তী শ্লোকগুলোতেও এর আরও বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি ভাবে ? প্রবল শত্রুকে সাম, দান, ভেদ ইত্যাদি উপায়ে বশ করা যায় কিন্তু কামকে উপভোগ দিয়ে বশ করা যায় না। “কামান্ ন উপভোগেন শাম্যতি” দানে হয় না কারণ এ হল মহাশন। সাম দ্বারা হয় না যেহেতু “মহাপাপ্মা” মানে অতি উগ্র, তা হলে উপায় ? উপায় আছে, অশ্বমেধ পর্ব্বের কামগীতায় দেখুন – কামনিগ্রহই ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ। নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কাম জয় হয় না। আত্মা হতে অন্য কিছু বোধ করাই মূল অজ্ঞান। এদিকে কাম সংকল্প যতই বাড়ে আত্মদৃষ্টি ততই লোপ পায় আর বর্হির্দৃষ্টি ততই প্রসারিত হয়। অতএব কাম যাতে মনের দখল নিতে না পারে তাই প্রাণায়াম করতে হয়। প্রাণায়াম করতে করতে ব্রহ্মনাড়ী ভেদ হলেই প্রাণ ও সেই সাথে মনের বিশ্রাম ও আরাম লাভ হয়। এজন্য সর্ব্বদা শ্বাসে লক্ষ্য রাখতে হয়। খুব মন দিয়ে টানতে ফেলতে হয়। নইলে মনে যত সঙ্কল্প বিকল্প হয় ততই একটার পর একটা আবরণের পর আবরণ পড়ে গিয়ে মনের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হতে হতে এক সময়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র হয়ে বসে পড়তে হয়। ৩/৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ।। ৩৮

অনুবাদ : যেমন অগ্নি ধুমদ্বারা, দর্পণ ময়লাদ্বারা, গর্ভ জরায়ুদ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ ইহা (আত্মজ্ঞান) তাহা (কাম) দ্বারা আচ্ছন্ন ॥ ৩/৩৮

ব্যাখ্যা : ভগবান কামের কার্য্যকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং বৈরিত্ব দেখিয়েছেন। আসক্তিরূপ প্রবল ইচ্ছার আগুন ধোঁয়ায় ঢাকা আছে, কিন্তু আছে| “There is no smoke without fire.” কিন্তু তা আমরা বুঝি না। স্বাভাবিক অবস্থায় মনে হয় কামক্রোধ রিপুরা আমাদের কোথায় ? বেশ তো আছি। ভালই আছি। কিন্তু বাসনার বাতাস লাগলেই সেটা বোঝা যায়। বিবেকজ্ঞানকে এরাই নষ্ট করে। এগুলো না থাকলে হয়ত আত্মদর্শন খুব একটা শক্ত হত না সকলের পক্ষে। তাই কামই অজ্ঞানের সুদৃঢ় আধার। কাম নষ্ট হলেই অজ্ঞানও দূর হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে কাম তিন ভাবে আবৃত করে। মূল অবিদ্যা নষ্ট না হলে জীবের কারণ শরীর নষ্ট হয় না, জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কারণ শরীর থাকে। জীব স্থূল শরীর ধারণ করার আগে কারণ শরীর তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত সংস্কার অনুযায়ী স্থূল শরীর রচনা করে। সেটাই আবার পিতৃ মাতৃ সংযোগের দ্বারা স্থূল শরীর (পিণ্ডদেহ) রচনা করে। প্রতি জন্মে জীবের সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির সাথে এই কাম সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্মশরীরে বর্তমান থাকে। স্থূল শরীরের পুষ্টির সাথে সাথে সূক্ষ্ম শরীরেরও পুষ্টি হয় আর সেই সাথে নতুন ভাবে কর্ম্মচক্রে পড়ে গিয়ে

আগের যে বাসনা নিহিত ছিল তাও মহীরুহ হয়ে ওঠে। ভগবান এখানে তিনটে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কাম কি ভাবে পরাজ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে তিন ভাবে আবৃত করে ফেলে।

(১) প্রথমতঃ “ধুমেন আব্রিয়তে বহ্নি” ধোঁয়া হল কারণ শরীর আর আগুন হল তার মধ্যস্থিত আত্মা।

(২) দ্বিতীয়তঃ “আদর্শ মলেন” আদর্শ মানে হল আয়না, মলেন অর্থ ময়লার দ্বারা। মানে ময়লালিপ্ত আয়নায় প্রতিফলন হয়না বা হলেও খুব আবছা, অস্পষ্ট হয়। সেই রকম সূক্ষ্মশরীরের ভিতর জীব বহু বাসনায় আবৃত হয়ে ঢাকা, চাপা পড়ে থাকে।

(৩) তৃতীয়তঃ “উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ” মানে হল জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ যেমন অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ কাম উপভোগের ইচ্ছা থেকে জড়বুদ্ধি হওয়া ও ভোগ্য বস্তু সংগ্রহে মন প্রাণ ঢেলে দেওয়া। ফল হল অত্যাধিক বিষয়দর্শী হওয়া এবং বুদ্ধির স্থূলত্বপ্রাপ্তি। যাকে চলতি কথায় “মাথামোটা” বলি। জ্ঞানশক্তির কোনও প্রকাশই সেখানে থাকে না। সংক্ষেপে কামের দ্বারা এই তিন আবরণের কথা বলা হয়েছে।

তাই আবরণ যেমন তিনটি তখন তার উন্মোচনের উপায়ও তিনটি থাকার কথা। উপায় তিনটি সাধকের সাধনার অবস্থাত্রয় মাত্র।

(১) প্রথমটা সেই জরায়ুর আবরণের মত সমস্তই অন্ধকার আত্মা, ঈশ্বর, জ্ঞান ইত্যাদির কোনও বোধই নেই। ভগবান সম্পূর্ণরূপে জীবের বুদ্ধির বাইরে। জীব শুধু জাগতিক কাম উপভোগে মগ্ন। এ অবস্থায় কোনও ভাবে নিজের কোনওরূপ পূর্ব্বকৃত সুকৃতি অথবা পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের কাহারও কোনও সুকৃতি অথবা দৈবাধীন কোনও কারণে সে সাধন গ্রহণ করলেও কিছুই করতে পারেনা কারণ তার সাধন করতে ইচ্ছাই হয় না, আনন্দ পাওয়া তো দুরের কথা।

(২) তবু যদি এমন কেউ থাকে যে নিষ্ঠার বলে এই স্তরকে অতিক্রম করতে পারে এবং সাধনে দৃঢ়চিত্ত হয়ে “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ” “do or die” করতে পারে সাধনাকে তখন তার ভাল লাগতে আরম্ভ করে। এটা হল দ্বিতীয় স্তর। আয়নায় ময়লা যেমন ঘসতে ঘসতে উঠে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেলে প্রতিবিম্ব সঠিক ও সুন্দরভাবে দেখা যায় তেমনি সাধনার প্রবল অভ্যাসে মন জড়ভাব থেকে সূক্ষ্মভাবের দিকে যেতে থাকে। বহিরঙ্গে জিহ্বা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আত্মজ্যোতির বিমল প্রকাশ মনকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করে রাখে। কিন্তু তখনও কিছুই হয় নি। আরও সুতীব্র সাধনার প্রয়োজন থাকে। সেটাই তৃতীয় স্তরের সাধনা।

(৩) তৃতীয় স্তরের সাধনায় সাধক ওঁকার ক্রিয়ায় জাগ্রত হয়ে ভূতশুদ্ধি আরম্ভ করে থাকেন। তখন মন্ডলাকার গর্ভ আচ্ছাদক উল্ব ভেদ করে দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হয় ও অন্তরকে আলোকিত করে তোলে। সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার সরে যেতে থাকে। দিব্য চেতনার প্রকাশ ঘটে। সাধক বুঝতে পারেন কে তিনি ? কোথা থেকে এসেছেন ? এই ভূতশুদ্ধি শেষ হলে তবে সব আবরণ মুক্ত হয়। এপর্য্যন্ত এক জীবনে হলেই যথেষ্ট।

এর পরের অবস্থায় যেতে অবশ্য সাধকের বহুদিন শত জন্ম লাগে। লাগুক তাতে কোনও ক্ষতি নেই। স্থূল শরীরে থেকেও যদি তা থেকে মুক্ত থাকা যায় তবে আর কিসের চিন্তা ? এ অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর থাকলেও তার আর গুণ নেই। শুদ্ধ চৈতন্যে অবস্থান করায় নতুন করে বন্ধনের আশঙ্কা নেই। জমানো টাকা একদিন না একদিন ঠিকই খরচ হবে। তেমনই প্রারব্ধ। সে আর কতদিন ? আসল শেষ আবরণটী থাকে কারণ শরীরের, ওতেই অনাদি অনন্ত বীজ সুপ্ত থাকে। ওটা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা, শুধু অপেক্ষাই নয়, ক্রমাগত পরাবস্থায় থাকার অভ্যাস। সুখে থাকার অভ্যাস করা চাই, মহামহেশ্বরভাবে থাকা চাই। “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা না শোচতি ন কাঙ্ক্ষ্যাতি ॥” ৩/৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ।।৩৯

অনুবাদ : হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩/৩৯

ব্যাখ্যা : আগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ নং শ্লোকেও বলা হয়েছে। এই শ্লোকে ভগবান কামের বৈরীতা সম্পর্কে আরও বিশেষভাবে স্পষ্ট করে বলেছেন। আত্মজ্ঞানীর চিরশত্রুই হল কাম। কারণ কামের দ্বারা বিচার বিবেক আচ্ছন্ন থাকে। যদিও অজ্ঞের পক্ষে কামভোগই সুখের কারণ কিন্তু জ্ঞানীর কাছে সেটা দুঃখদায়ক যেহেতু জ্ঞানী ব্যাপারটা জানেন। যদিও যোগারূঢ় জ্ঞানীর কাম থাকেই না। কিন্তু যাঁরা যোগারূঢ় নন অথচ যোগের পথে চলেছেন তাঁদেরই হয় সমস্যা। তাঁরা অবশ্যই জ্ঞানী, তাঁদের বাহাত্তর হাজার নাড়ী বিশুদ্ধিকরণ ক্রিয়ার অন্তর্গতও আছে। কাম তাঁদের একান্তই অপ্রিয় বিষয় কিন্তু তাঁদের বিপদ আনে সংস্কার, যেহেতু সংস্কারই তাঁদের বিষয়াসক্তির দিকে টানে। ফলে কর্ম্মেরদ্বারা জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সর্ব্বেদান্ত সিদ্ধান্ত সংগ্রহম্ গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন – “জ্ঞানী হি জানাতি – অনেনাহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবেতি। অতো দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব, অতহসৌ জ্ঞানিনো নিত্য বৈরী, ন তু মূর্খস্য।” জ্ঞানীই বুঝতে পারেন যে এই কামের দ্বারাই আমি অনর্থে যুক্ত হয়েছি। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই দুঃখী থাকেন। এই জন্য ওটা (কাম) জ্ঞানীরই নিত্য বৈরী, মূর্খের নয়। তাই কামজয়ের উপায়ও শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বেদান্ত সিদ্ধান্ত সংগ্রহম্ গ্রন্থে লিখেছেন “সংকল্পানুদয়ে হেতুর্যথা

ভূতার্থ দর্শনম্। অনর্থ চিন্তনং চাভ্যাং নাবকাশোহস্য বিদ্যতে॥" বস্তুর প্রকৃত স্বরূপবোধ ও তাহা হইতে অনিষ্টপাতের চিন্তা এই দুইটি জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে মনে কাম সংকল্পের উদয় হইতে পারেনা।

যোগী হবার চেষ্টায় যোগের পথে থেকে সাধক অবশ্যই জ্ঞানী হয়ে যান তাই কাম হয় তাঁর চিরশত্রু, তবে যোগারূঢ় হতে পারলে নিশ্চিন্ত। তখন আর বৈরীতা থাকে না। কিন্তু জ্ঞানীকে নষ্ট করতে পারে তার সংস্কার আর অভিমান। ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে অভিমানের ছড়াছড়ি, উপচে পড়ে। নতুন সাধক কিছু জিজ্ঞাসা করলেই উচ্চ ক্রিয়ান্বিত বলে ওঠেন আপনি ঐখানে গিয়ে মালিককে জিজ্ঞাসা করবেন। অর্থাৎ আখড়ায় গিয়ে ঋত্বিকাদি প্রধান পদে যিনি অসীন তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন। ছেলের বয়স হয়ে যাচ্ছে, পৈতা দিতে হবে। উপনয়ন উপলক্ষে আপনি নিমন্ত্রণ করতে গেছেন আপনাকে অন্ততঃ একশটা এমন উপদেশ দেবেন যে আপনার পুত্রের উপনয়ন অনুষ্ঠান পিছিয়ে যাবে, কাজকর্ম্মে অনর্থ বাধবে। অথচ গুরুদেব কিন্তু কখনও এসব কথা বলেন না। তিনি চান শিষ্য সঠিকভাবে ক্রিয়া অভ্যাস করুক। আপনি আপনার উচ্চবস্থার সাধক গুরুভাইকে অথবা কোনও সতীর্থকে ক্রিয়া বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করুন অথবা ক্রিয়ার কোনও বিশেষ কাজ সম্বন্ধে, ঠিক ভাবে করার জন্য, কিছু জানতে চান, আপনাকে উল্টোপাল্টা কিছু কথা বলে নিয়ে তারপর বলবে আপনাকে এসব বিষয়ে বললে আমার কর্ত্তা সাজা হয়ে যাবে। বুঝুন, এরাই আবার যোগী, উচ্চক্রিয়ান্বিত, অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব করে থাকেন, ইত্যাদি কত কথা শুনে থাকি। এসব কোনও সমালোচনা নয়, শুধু সংস্কার এবং অহং, অভিমান কিভাবে সক্রিয় হয়ে থাকে সেটাই বললাম। কাম অর্থ sex এ সীমিত নয়। কাম হল অহং এর অসাধারণ শক্তি ও ব্যাপ্তি (সিগমান্ড/সিগমুন্ড ফ্রয়েডের Egoএবং Super Ego অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই Libido কে যতক্ষণ না ক্রিয়াদ্বারা লয় করা যায় ততক্ষণই বিপদ জেগে থাকে। তাই ভগবান বললেন কাম জ্ঞনীর নিত্য বৈরী॥ ৩/৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ।। ৪০

অনুবাদ: ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি ইহার (কামের) অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইহাদিগের (ইন্দ্রিয়াদির) দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে॥ ৩/৪০

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবান কাম বলতে সিগমান্ড ফ্রয়েড বর্ণিত Libido কেই বুঝিয়েছেন বিশেষভাবে কোনও sex aspect কে বোঝাননি। তাহলেই বোঝা যায় যে এই Libidoর আশ্রয় প্রধানতঃ মনের অভ্যন্তরে। শিশুর জন্ম থেকেই Libido কার্য্যকরী হয়। জীবনের সর্ব্বস্তরে প্রতি পদে পদে সকল ভাবনা চিন্তাই এই অর্থে কামনার রঙে রাঙা। তাই ভগবান বলেছেন যে একমাত্র আত্মা বাদে মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণই কামের বশবর্ত্তী এবং কামেই মোহিত হয়ে আছে। তাই জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য নেই। এই মোহই প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করে থাকে বলেই জীব জ্ঞানকে বিস্মৃত হয়ে, কামনার বশে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে, সব কাজই কামনার বশবর্ত্তী হয়ে

করে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই এটা বুঝবেন। কোনও উৎসব আয়োজন, বিবাহ অনুষ্ঠান, বা সভা সমিতি যেখানেই যান, আপনার সত্তাকে ছাড়িয়ে আপনার status ই আপনার পরিচয় হয়ে উঠছে। আপনার পরিচিতিই হয় আপনার status অর্থাৎ কি পদে অধিষ্ঠিত আছেন ? আয় কত ? জীবনযাত্রার মান কিরূপ ? বিদেশ ভ্রমণ কতবার করেছেন ? ইত্যাদি কত কি ? কামের প্রতিপত্তি জ্ঞানবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে যে অর্থ উপার্জন সেটাকেই আপনার অস্তিত্বরূপে জাহির করে চলেছে। কি করুণ অবস্থা ! তবু যদি জীবনটা ক্ষণস্থায়ী না হত। যাক সে সব কথা। ভাবতে হবে এই কামের আশ্রয় কি ? আর তার জয়ের উপায়ই বা কি ? প্রথমে দেখুন কামের অধিষ্ঠান কোথায় ? মনে। সতত তিনটী বিষয়দ্বারা কামের আবির্ভাব ঘটে। (১) মনের সংকল্প, (২) বুদ্ধির অধ্যাবসায়, (৩) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে দেখা শুনা ইত্যাদি তো আছেই। প্রথমে থাকে মনে, মন থেকে গিয়ে বুদ্ধিকে আশ্রয় করলেই বিপদ বাড়ে। তখন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করেই কামের চরিতার্থতা হয়। ফল কি ? ফল বিবেকজ্ঞান আবৃত হওয়া। কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আসক্ত হয়ে কোনও কিছু দেখেই মোহিত হয়ে যায় তাই আত্মাতে আর থাকতে পারেনা। পাকা সিদ্ধ সাধক কিন্তু আত্মায় অবস্থিত থাকেন ফলে তাঁর কোনও সংকল্প বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানেও বিপদ থাকে, সংকল্পের উদয় হয় না ঠিকই কিন্তু স্থির মনও তো মন। তাই স্থির মনও অনাদি বাসনাবীজ প্রভাবে নিজের জায়গা থেকে সরে যায় আর সংকল্পে প্রবৃত্ত হয়ে ইচ্ছার উদয় ঘটায়। কিন্তু মন বুদ্ধি যদি পঞ্চতত্ত্বের এলাকা পার হয়ে আজ্ঞাচক্র বা আজ্ঞাচক্র ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং সেখানে স্থিতি লাভ করে, তবে নিশ্চিন্ত। সেখানে তার শক্তি অসাধারণ হয়ে ওঠে। সেটা তার "আপনা মহল"। সেখান থেকে তাকে টেনে নামানো অসম্ভব ব্যাপার। আর সেখানে তো বিষয় দর্শনই নেই তো সংকল্প আসবে কোথা থেকে ? বিষয়ভোগ, বিষয়তৃষ্ণা মনের ইচ্ছায় বুদ্ধি দ্বারা লাভ করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ হয় বলেই তো মন, বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়কে কামের আধার বলা হল। কাম নিরন্তর বিষয়ভোগের চেষ্টায় থাকে বলেইতো জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়। তাইতো জীব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মোহের অন্ধকারে পড়ে থাকে (শ্রীশ্রী চণ্ডী দ্রষ্টব্য)। সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার আগে কামের পরীক্ষা নিরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হওয়া চাই নয়ত যতই পরিশ্রম কর ওখানে এসে পড়ে যাবে। অনেকের মত আমারও এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে তবে সেসব একান্তই গুপ্ত বিষয়। উপযুক্ত সাধকব্যক্তি ছাড়া প্রকাশ্য নয়। তবে সাধারণভাবে এটুকু বলা যায় যে মন বিষয়মুখী হলে যত সহজে বিষয়রস গ্রহণ করে আত্মমুখী হয়ে আত্মরস গ্রহণকরা কিছুটা ক্লেশকর তো বটেই তাই একটু অধ্যাবসায় সহকারে রসস্বরূপ আত্মার রসকে বের করার সাধনা করা দরকার। "রসো বৈ সঃ"। নিজে যদি না পার ছুটে কোনও সাধু বন্ধুর কাছে যাও। তাঁর হাতে পায়ে ধরে তাঁরই কাছে পড়ে থেকে মনের চিকিৎসা করিয়ে নাও। আর জোরে মুদ্রা ও প্রাণায়ামসকল করে চল দেখবে তাতে মনের ঊর্দ্ধগতি হতে হতে একসময় মন সমত্বলাভ করছে। এখানেই যোগের সূচনা হয় "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। এই সমরস পান করতে হলে এর

বিরোধী রসকে নিংড়ে ঝেড়ে বার করতে হবে। সাধু গুরুগণ এটাই করে দেন। প্রাণাপানের গতি সমভাবে থাকলেই আর বিষয়ে স্পৃহা থাকে না, প্রাণাপানের এই স্থিরতাই সমরস। একজনের এমনতর কষ্ট দেখে তাকে একটা সহজ উপায় শেখানোর জন্য আমার নাকের কাছে তার হাত ধরে বললাম দেখ এইভাবে আসতে হলে নিজের নিঃশ্বাসকে এই কায়দায় ফেল। তা আমার কথা আর শোনে কে ? সে আমাকেই উল্টে বলল, "দেখ দেখ আমারও নাকে এরকমই শ্বাস বেরোচ্ছে। আমারতো এমনটাই হয়"। আমি বুঝে গেলাম "নিয়তি কেন বাধ্যতে" তার যা ঘটার ছিল তাই ঘটল। এর বেশি বললে অনেকে ঘটনাটা ধরে ফেলবে। কাউকে ছোট করা তো আমার বলার উদ্দেশ্য নয় ॥ ৩/৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ।। ৪১

অনুবাদ : অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ের বিনাশক পাপরূপ এই কামকে জয় কর ॥ ৩/৪১

ব্যাখ্যা : নতুন করে আর কামের বিষয় বলব না। ২য় অধ্যায়ের ৫৪ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলাই আছে। এখানে ভগবান কামকে আগেই বিনাশ করতে বলেছেন। নইলে তোমাকে বিমোহিত করে ফেলবে, তাই তার আগেই তুমি তাকে বিনাশ কর। কেননা এই কাম জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক। যে জ্ঞান তুমি শাস্ত্র অধ্যয়নে ও গুরুর উপদেশে লাভ করেছো, আর নিজের বোধশক্তি দ্বারা যে অনুভব লাভ করেছ সেটাই হল বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। বোধশক্তির দ্বারাই এই "বোধি" বা বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতেও তাই স্বানুভবজ্ঞানই বিজ্ঞান। বেদেও এমনটাই আছে। শিষ্য স্থিরত্ব পেয়ে গুরুমুখে ও শাস্ত্র উপদেশে তাঁকে জেনে সাধনদ্বারা এই বিশেষজ্ঞান লাভ বা স্বরূপ বোধের জন্য চেষ্টা করবেন। তাই একাজের জন্য আগেভাগেই নিঃশেষরূপে সংযম করে এই দুটোকে জয় করতে হবে, নইলে এরা কিছুতেই তোমাকে কোনও ক্রিয়া ও মুদ্রা করতে দেবেনা। কেননা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় স্পর্শ হলেই আসক্তি ও কাম উৎপন্ন হবে। তাই দৃঢ় বিষয়বুদ্ধি যুক্ত পুরুষ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ আগে আগেই আচার্য্যের ভোগে অর্পণ করে থাকে। "বাজে ঘন্টি লাগে ভোগ। পহলে গুরু পিছে আউর সব লোগ॥" "তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যে ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ" গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক, সংসারে এবং দেহে থেকে বিষয়কে এড়াবার এতদ্ভিন্ন পথ নাই। মনের দৃঢ়তা না থাকলে সব কিছুতেই সংশয় আসে। এমনকি গুরুবাক্যে পর্য্যন্ত সংশয় আসে। দৃঢ়চিত্ত না হলে দীক্ষাগ্রহণ করাও উচিত নয়। পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প, অথচ আমরা অল্পে তুষ্ট নই। তাই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় চিন্তাতেই আমরা ধীরে ধীরে বিনাশের পথে চলি।

ধরা যাক তোমার মনে একটা অনাবশ্যক চিন্তা এল। তুমি গুরুদেবকে সেটা নিবেদন করে দিলে। গুরুদেব শুনে মনে মনে চিন্তাটাকে বিশ্লেষণ অথবা যা উপযুক্ত তাই করবেন কিন্তু তোমাকে তিনি একটা কড়া ধমক দেবেন, নয়ত বলবেন, "হাঁ, উও আতা হ্যায় জানে কে লিয়ে"। দেখবে ঐ চিন্তাটা তোমার মনে আর আসছে না। জপে ক্লান্ত হলে ধ্যান শুরু কর। ধ্যানে ক্লান্ত হলে আবার জপ শুরু কর, তবে মন দিয়ে প্রাণায়ামে লেগে থাকা চাই এবং কূটস্থে থাকা চাই। অতএব আগে সব ভালমত বুঝে গুরুতে আত্মসমর্পণ করে গুরুতেই মজে যাও। শ্রীগুরুর দুর্লভ চরণ আশ্রয় কর। মানুষের শরীর বলে তাঁকে মোটেই যেন অবহেলা কর না। ভেবে দেখ জীবনে কতবার কত কাম্য বস্তু পেয়েছ। কতভাবে উপভোগ করেছ। কতবারই না মনে হয়েছে যাক্ সব আশা মিটে গেল। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই ? ভোগবাসনা কি নিঃশেষে ফুরিয়েছে ? কাম উপভোগে বাসনার কাঁটা মেটেনা। কাম জয়ও হয়না। আরও বেগে সে দিকেই ধেয়ে যায়। সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোও ফুটে উঠতে পারেনা। তাই সময় থাকতেই গুরুর শরণাগত হয়ে ক্রিয়া করে চল। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সন্ত কবীরদাসজী বলেছেন – " কবীর, কাহাঁ ভরসা দেহকা ? বিনাশি যায় ছিনমাহি। শ্বাস শ্বাস সুমীরণ করো, আউর উপায় কুছ নাহি।" ৩/৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ।। ৪২

অনুবাদ : {তত্ত্বজ্ঞেরা} ইন্দ্রিয়গণকে (দেহাদী অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি পর (শ্রেষ্ঠ), তিনি সেই (আত্মা) ॥ ৩/৪২

ব্যাখ্যা : ভগবানের তাৎপর্য্যপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক কথা। ইন্দ্রিয়গণ দেহে থেকেও দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ দেহ নিজেই কর্ম্মক্ষমতার প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়নির্ভর। দেখবেন শবদেহে ইন্দ্রিয়হীন অবস্থায় কোনও ক্ষমতাই থাকে না। আবার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ কারণ ইন্দ্রিয়ের কাজগুলো তো মনের দ্বারাই অনুভব হয়। মন চাইলে তবেই ইন্দ্রিয় সেই কাজে রত হয়। যাতে মনকে নিবিষ্ট করতে পারলেই ইন্দ্রিয়গণ নিজে থেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে সেই বস্তুই হল আত্মা। যা দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি থেকে একেবারেই আলাদা। আলোচ্য শ্লোকে এটাই বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে। যেমন দেখুন, দেহের থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইন্দ্রিয়ের কাজ সূক্ষ্ম এবং তার প্রকাশ আছে। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মনের সংকল্প আছে এবং ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করে থাকে। মনের চাইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, তাই সংকল্প থেকে নিশ্চয় (positive) শ্রেষ্ঠ। আর যিনি বুদ্ধিরও উপরে সাক্ষীরূপে আছেন তিনিই হলেন আত্মা। কাম বিষয়স্পর্শে সঞ্জাত হয়ে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সব কিছুরই দখলদার হয়ে আত্মাকে আবৃত করে ফেলে। তাই মন যতদিন ইন্দ্রিয়যুক্ত থাকে ততদিন এর লাফালাফি কমে না। একমাত্র ক্রিয়া করতে করতেই এর স্থির অবস্থা হয়। তখন যে অবস্থায় আসে

তারই নাম বুদ্ধি। "বোধ" থেকে "বোধি" তারই অপভ্রংশ "বুদ্ধি"। চলতি কথায় আমরা চালাকিকেই বুদ্ধি বলে মনে করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বুদ্ধি মনের মত চঞ্চল নয়। মন যেমন বহুদিকে ছোটে, বুদ্ধি তেমন নয়। তাই এই বুদ্ধিকে একটু সাধনার দ্বারা কৌশলে আত্মমুখী করতে পারলেই তাতে আত্মা ছাড়া আর কিছুই স্থান পায় না। তখন ইন্দ্রিয়সকল আপনা থেকেই জব্দ হয়। মনের গতি নিরুদ্ধ হলেই আত্মস্বরূপের বিকাশ হয়। এই সাধনা আয়ত্ত করতে হলে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি সহ ক্রিয়া করা দরকার, তেমনি মনকেও সমাহিত করার দরকার। মন সমাহিত না হলে সত্যিকার বিবেক জন্মায় না। কঠোপনিষদে আছে –

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্ত পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্নাপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

ইন্দ্রিয় সকল দিয়ে অন্তরের যে অনুভব হয় সূক্ষ্মত্বের জন্য তারা ইন্দ্রিয়র চাইতে শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণের বিষয় গ্রহণের শক্তি বিষয়সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মনের চেয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আবার বুদ্ধির চাইতেও অন্তঃকরণের আদি কারণ সেই হিরণ্যগর্ভ বা মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভর হতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, মহামায়া, মা ভগবতী বা জীবের প্রাণশক্তির কেন্দ্র। তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ হলেন পরমাত্মা বা পুরুষ। তিনি প্রকৃতিরও অতীত। সেই পরব্রহ্ম হতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। তাই তিনিই কাষ্ঠা মানে শেষ সীমা। তিনিই শ্রেষ্ঠ গতি – অর্থাৎ সংসার গতির অবধি, জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের পরপার। অতএব যতক্ষণ সেই পরমানন্দস্বরূপ অবস্থা না পাওয়া যায় ততক্ষণ সাধক তাঁর সাধনার উৎসাহকে কখনই কমাবেন না। একমাত্র তুচ্ছ বিষয়াসক্তিই সাধনার উৎসাহকে কমিয়ে দমিয়ে দেয়। সংসারে অনেকেই অনেক ভাল সাধন পেয়ে, ভাল গুরুলাভ করেও, সাধনে বসেন না। বরং কোন কোম্পানির এজেন্সি নিয়ে সামান্য দু পয়সা কমিশনের আশায় কোম্পানির মিটিং, সেমিনার ইত্যাদি করে দিন রাত কাটিয়ে দেয়। তাই এই মোহবৃত্তের বাইরে নিজেকে রাখার চেষ্টাও একটা প্রাথমিক সাধনা এই বস্তুবাদী যুগে॥ ৩/৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ।।৪৩

অনুবাদ : হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, আত্মা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে (মনকে) নিশ্চল করিয়া, কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় কর॥ ৩/৪৩

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবান এই প্রসঙ্গের উপসংহার করেছেন এই শ্লোকে, বলেছেন বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানবে। কিন্তু বিষয়ে আসক্তির জন্যই প্রথমে ইন্দ্রিয়ের ও মনের, তৎপরে বুদ্ধির, এই কাম প্রভৃতি বিকার ঘটে থাকে। তাই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই আত্মাকে জেনে নিয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা (আত্মনা), আত্মানং মানে মনকে, সংস্তভ্য মানে নিশ্চল করে, তবেই হে মহাবাহো, মহাবাহোর ব্যাখ্যা আগে করা হয়েছে, এই দুরাসদ, মানে দুর্নিবার, ভীষণ কামকে বিনাশ কর। প্রকৃত অর্থ হল স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাদ্বারা চঞ্চল আত্মাকে নিশ্চল করে কামরূপ শত্রুকে জয় কর। অর্থাৎ প্রাণের আগম নিগমরূপ গতি স্বতঃ রহিত হলেই ক্রমশঃ স্থিরভাব হয়। সেই স্থির অবস্থাই স্থিরপ্রাণ। অতএব চঞ্চল প্রাণের গতিকে স্থির আত্মায় লয় করে দিতে পারলেই সেই দুর্নিবার কামরিপুকে জয় করতে পারবে। অন্য কোনও ভাবে কামের অবদমনের চেষ্টা হলেই কিন্তু বিপরীত ফল হবে, বহুগুণ বেগে কাম ধাবিত হয়ে তোমাকে নষ্ট করবে। সুতরাং শ্বাস স্থির হলে মন স্থির হল। স্থির মনে কোনও ঢেউ নেই অতএব কামও নেই, তখনই উত্তম ক্রিয়া করে প্রাণকে মহাশূন্যে প্রবেশ করাও। প্রাণকে শূন্য পথে চালাতে গিয়েই তুমি যখন ওঁকার ধ্বনি শুনতে থাকবে তখনই বুঝবে সব ঠিক হচ্ছে। ধীরে ধীরে ওঁকার ধ্বনির লয় হবে, সাথে সাথে তোমার প্রাণও সেই পরব্রহ্মে লয় হবে। তখন কোথায় কাম, আর কোথায়ই বা কি ? নিজেও নেই আর কিছুই নেই। ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে স্থির বুদ্ধির দ্বারা মনকে একেবারে নিশ্চল করে ফেলা যায়। মান অপমান বোধ কোনও কিছুই থাকেনা। লজ্জা ঘৃণা বোধ অন্তর্হিত হয়। আরও দীর্ঘ সময় অভ্যাস করলে একেবারে নিরহংকার হওয়া যায়। এটা হতে পারলে আর ভয় নেই। এই নিরহঙ্কার চিত্তই ভগবানের অধিষ্ঠান বা আসন। ক্রমাগত অভ্যাস আরও বাড়াতে ভালই লাগে। অভ্যাস এই ভাবে বাড়িয়ে যেতে যেতে অমানী চিত্তে তাঁতে চিত্ত রাখতে পারলেই চিত্ত পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যায়। আর কোনও কাজ থাকে না। কোনও কাজের কথাও মনে আসেনা। মনই থাকে না। এটাই প্রকৃত নৈষ্কর্ম বা জ্ঞান। "সুখেন ব্রহ্মস্পর্শং অত্যন্তং সুখেমশ্নুতে।"

তাহলে মূল কথা হল মনের স্থিরতাই কাম জয়ের উপায়। কারণ মনের চঞ্চলতাই কামভাব। এই চাঞ্চল্য নষ্ট হলেই মনত্ব নষ্ট হয়। সংকল্প চলে যাওয়ার সাথে সাথে শুধু কামভাব কেন, সবই চলে যায়। তখনই আরও উচ্চ ক্রিয়ার অনুকূল অবস্থা আসে, উচ্চতর ক্রিয়া লাভ করে ব্রাহ্মীস্থিতিকে লক্ষ্য করে এগোতে হয়।

এই যোগাভ্যাস অতিশয় সহজ। শুধু চাই ঐকান্তিক ইচ্ছা ও দৃঢ় মনোবল । নিজেকে একটু পর্য্যবেক্ষণ করলেই নিজের অনুভবে এ সমস্তই আসবে। নিজেরাই বুঝতে পারবেন দেহ হতে ইন্দ্রিয় কি ভাবে শ্রেষ্ঠ। কখনই বা ইন্দ্রিয় থেকে বিষয়কে শ্রেষ্ঠ ভাবি ? বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের অনুভবই বা কি রকম ? এভাবে পর্য্যবেক্ষণ শুরু করে দিলে দেখবেন আপনার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বাড়বে, প্রশ্ন

জাগবে, আপনার নিজের সম্পর্কে কৌতুহলই আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে। মন সাধনাদ্বারা একাগ্র হলে একমুখী নিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিরূপা হয়ে থাকে। তখন বোধশক্তি বাড়ে। অনেক দুরূহ বিষয়ের জ্ঞানও অতি সহজেই হয়। সূক্ষ্মবোধ থেকেই সূক্ষ্মতত্ত্ব বোঝা যায়।

“এষা সর্ব্বেষু ভুতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥” ৩/৪৩

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাষু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগোনামঃ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে “কর্ম্মযোগ ” নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীবিষ্ণু প্রদীপিকা নামক গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তাৎপর্য্যের সারসংক্ষেপ: গীতার অধ্যায়গুলো সাধনার স্তরে পরম্পরাক্রমে রচিত ও সন্নিবেশিত। সাধক হৃদয়ের ভাব ও তত্ত্বসকল পর পর যে ভাবে প্রকাশ পায় বা পাওয়া যুক্তিসঙ্গত ঠিক সেই ধারাবাহিকতার পরিস্ফুটনেই গীতার অধ্যায়গুলির ক্রমসন্নিবেশ। প্রথম অধ্যায় সাধকের আর্ত্তভাব অবলম্বনে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার সনাতনত্ব বর্ণনা করে তৃতীয় অধ্যায়ে বিভুত্ব পরমেশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্ব এসমস্ত যে এক চিদ্‌ঘন আত্মতত্ত্বেরই স্বরূপধর্ম্ম এটাই দর্শন আকারে বলা হয়েছে। জীবের কর্ম্মই দেহাদিরূপে পরিণাম লাভ করে। জীবের মধ্যে যে বহুধাশক্তি বর্ত্তমান আছে তার বিকাশ সাধন এবং সেই শক্তিকে দেবোদ্দেশে ত্যাগ বা উৎসর্গ করার নামই কর্ম্ম। এছাড়া যা কিছু কাজ কর্ম্ম সে সমস্তই বাহ্যকর্ম্ম যার দ্বারা কেবল বন্ধন হয়। কিন্তু যে কর্ম্মদ্বারা কূটস্থে মন স্থির থাকে ও উত্তম পুরুষের দর্শন হয় সেটাই আসল আধ্যাত্মিক কর্ম্ম যেটা বিনা ত্যাগে হবার নয়। একমাত্র ক্রিয়াসাধনের দ্বারাই সেই দৈবীশক্তি প্রবুদ্ধ হয়। কি ভাবে এ কর্ম্ম সম্পাদন হয় সেটা জানলেই আর নিজেকে কর্ম্মের কর্ত্তা ভেবে বিড়ম্বিত হতে হয় না। কর্ম্ম অর্থে প্রাণকর্ম্ম, যোগ অর্থে মিলন। ইড়া ও পিঙ্গলার মিলনরূপ কর্ম্মের মিলন অবশ্যই কর্ম্মযোগ।

ওঁ

অথঃ চতুর্থোহধ্যায়ঃ

জ্ঞান যোগ (৪)

শ্রীভগবান উবাচ –

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ ।।১

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন, আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য্য স্বপুত্র মনুকে কহিয়াছিলেন। মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে কহিয়াছিলেন ॥ ৪/১

ব্যাখ্যা : আবির্ভাব ও তিরোভাবের হাত থেকে স্বয়ং ঈশ্বরেরও রেহাই নেই। সেটা কি ভাবে হয় ? সেই উপনিষদের “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের “তৎ” ও “ত্বম” অর্থাৎ ‘সে’ ‘তুমি’ এই দুইজন কে ? এটা বোঝবার জন্যই আগের অধ্যায়ে এত কর্ম্মযোগের প্রশংসা। আরও আগের দুই অধ্যায়ে এই বিষয়ে, বিশেষতঃ সাংখ্যযোগে, তত্ত্বগত ভাবে বোঝান হয়েছে কর্ম্মযোগ কিভাবে মোক্ষসাধক। এই অধ্যায়েও আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে ব্রহ্মার্পণ ইত্যাদি কর্ম্মের দ্বারা কিভাবে সেই “তৎ” ও “ত্বম” কে আরও পরিষ্কারভাবে অনুভব করা যায়, এই পরম্পরাপ্রাপ্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেই। শ্রীভগবান তো মাত্র আগের অধ্যায়েই অর্জ্জুনকে এই কর্ম্মযোগের কথা বললেন তবে আবার পরম্পরাটা কিসের? তাই শ্রীভগবান বললেন অর্থাৎ যোগীর অনুভবে ভগবদ্দত্ত এই যোগ চিরন্তন, যবে থেকে আকাশে সূর্য্য রয়েছে তবে থেকেই। কিন্তু বস্তুবাদের আবির্ভাবে মানুষ জড়বাদী হয়ে পড়ায় এই মহাযোগের বিষয় বিস্মৃতিতে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যখন ঋষিগণ যোগবলে অসাধ্য সাধন করতেন তখন তাঁদের কথা কেউই অমান্য করত না। তাঁরা বলেছেন “নাস্তি যোগঃ সমং বলম্”। অন্যত্রও যোগশাস্ত্রে দেখুন, “নাস্তি মায়াসমং পাশং নাস্তি যোগাৎ পরং বলং। নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ ॥”

সুতরাং যে ভাবেই বলি যোগের তুল্য বল নাই। যোগের এই চিরকালীন উপযোগীতার কথাই শ্রীভগবান বোঝাতে চেয়েছেন। আলোচ্য শ্লোকে যখন বললেন এই যোগ আমি সূর্য্যকে প্রথম উপদেশ করি, সূর্য্য মনুকে উপদেশ করেন, মনু রাজা ইক্ষাকুকে উপদেশ করেন। অর্থাৎ গুরুপরম্পরায় একে অপরকে এই যোগ শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। তাই এটা একান্তই গুরুমুখী বিদ্যা। সব কাজই “যোগস্থ কুরু কর্ম্মানি” অর্থাৎ যোগস্থ হয়ে করতে হয়। নইলে হয় না। শিবসংহিতাতে দেখুন শিবই যোগের আদি বক্তা। শঙ্করাচার্য্য তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন “জগৎ পরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়ানাম্ বলসাধনায় অহং যোগং প্রোক্তবান্।” অর্থাৎ জগৎ পরিপালয়িতা ক্ষত্রিয়দের বলাধানের জন্য ভগবান তাঁদের এই যোগ

বলেছিলেন, সুতরাং জগতের আদি রাজাদের যোগবলে বলীয়ান করে তবেই ব্রহ্মা আদি সুরেন্দ্রগণ প্রাচীন আদি রাজগণকে জগৎ পালনের ভার দিয়েছিলেন। এখানে ভগবান যে যোগ শিখিয়েছিলেন সূর্য্যকে, তিনি কে ? তিনিই সেই আদি রাজা, যাঁর বংশ সূর্য্যবংশ নামে বিখ্যাত। তাঁর সাথে আকাশের সূর্য্যের সম্পর্ক কি ? পূরাণ শাস্ত্রমতে সূর্য্য ব্রহ্মার প্রপৌত্র। সূর্য্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষাকু। ইক্ষাকু সূর্য্য বংশের আদি রাজা। ইক্ষাকু বংশেই পরবর্ত্তী যুগে দিলীপ, রঘু এবং পরে রাজা রামচন্দ্রও জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তাঁরা সকলেই যোগে ও তপস্যায় পারঙ্গম ছিলেন এবং বশিষ্ঠের ন্যায় গুরু ছিলেন তাঁদের সব কাজের নির্দ্দেশক সে কথা ইতিহাসেই আছে। যাই হোক, এ সবই তো বই পুস্তকের কথা। এক আধটু যোগাভ্যাস যাঁরা করেন সকলেই জানেন যে সূর্য্য আদি রাজা হলেও আমাদের সকলেরই অভ্যন্তরে একজন পুরুষ আছেন যিনি পুরুষোত্তম, যাঁর অভাবে দেহ মন সবই অচল হয়ে যায়। তাঁর থেকে জাত ‟সবিতা' তিনি হলেন জগতের প্রাণ। এই ‟সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী" পুরুষই নারায়ণ, যিনি আমাদের গোলকপতি পুরুষোত্তম, ‟স উ প্রাণস্য প্রাণঃ" প্রাণের প্রাণ। ইনিই আমাদের গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই স্বয়ং সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপ নির্বিকার কূটস্থস্বরূপ আর সুবর্ণলাঞ্ছী উজ্জ্বল কিরণরাশি তাঁরই মহিমাচ্ছটা মাত্র, তাইই সূর্য্য যা জগৎকে উদ্ভাসিত করে। ইনিই সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ তাই ইনি আদিত্য। যে সাধক সাধনে সিদ্ধ হতে পেরেছেন, সকল সংকল্প বিকল্পের অতীত হয়ে এই কূটস্থে স্থিত হয়েছেন, তাঁকেই ইনি মন দিয়ে দেখেন এবং মনের ইচ্ছা বুঝিয়ে থাকেন। তাই এই অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকই হলেন ‟মনু"। এরকম মনুদের দ্বারাই ধর্ম্মসংস্থাপিত হয়ে থাকে। সাধকের মন আবার যখন বহির্জগতে আসে তখন বিষয় ভোগ করে থাকে। সাধনশীল হয়ে অন্তরে যোগস্থ হলেই আবার অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা সব জানতে পারেন বলে তিনি ইক্ষাকু, যার অর্থ হল প্রজ্ঞাচক্ষু বা মানসনেত্র। এই প্রজ্ঞাচক্ষু যাঁরা লাভ করেছেন সেই সমস্ত ইক্ষাকুদের দ্বারাই মোহান্ধ জীবেরা অন্তর্মুখী হবার পথ দেখতে পায়। এভাবেই যোগবিদ্যা পরম্পরাগত ভাবে জগতে প্রচলিত ছিল। মানুষ জ্ঞানবলে ও যোগবলে বলীয়ান হয়ে সংসারজীবনে সুখে শান্তিতে থেকে মহাসুখে মহাপ্রয়াণ করতেন। মৃত্যু তাঁদের কাছে মোটেই কষ্টকর ছিল না, বরং সুখের ছিল। শাস্ত্র, পুরাণ এবং ইতিহাস সে কথাই বলছে। ইচ্ছামৃত্যু কেবল ভীষ্মেরই নয়, আরও আগের যুগে প্রায় সকলেই ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হতেন। সত্যযুগ স্বর্ণযুগ, ত্রেতাকে রৌপ্যযুগ, দ্বাপরকে তাম্রযুগ ও কলিকে লৌহযুগ বলা হয়। ইচ্ছামৃত্যুর স্বর্ণযুগ এখন অতীত, লৌহযুগে জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্যই স্বভাবিক। কম্পিউটার অনেক কাজকে সহজ সরল করতে পারলেও মানুষের শান্তিবিধান কতটুকু করতে পারে ? জড়বাদ মানুষের ভোগস্পৃহাকেই বাড়ায় মাত্র। ভোগস্পৃহা অধ্যাত্মের পরিপন্থী। এই অধ্যাত্মই হল আত্মজ্ঞান। নিজেকে না জেনে না বুঝে শুধু কম্পিউটার কেন কোনও কিছু জেনেই লাভ বিশেষ একটা নেই । কিন্তু সেসব তো অন্য কথা। পরম্পরাগত এই অমূল্য যোগবিদ্যার কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়াটাই হল সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। এ বিষয়ে পরের শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন ৪/১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমংরাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ।। ২

অনুবাদ: {নিমি প্রভৃতি}রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, ইহলোকে সেই যোগ কালবশে নষ্ট হইয়াছে ॥ ৪/২

ব্যাখ্যা : এর আগের শ্লোকের সূত্র ধরেই বলা যায় যে মানব সভ্যতার সুবর্ণযুগে বা শাস্ত্রমতে সত্যযুগে এই যোগাভ্যাসরূপ কর্ম্ম সমাজের আপামর সকল বর্ণ, শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই গুরুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হিসাবে পালিত হত। আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বলেছি ষড়দর্শনের যুগে কালে কালে কিভাবে মানুষের ধ্যান, ধারণা ও চেতনার পরিবর্ত্তন হয়েছিল। ক্রমশঃ ত্রেতাযুগ পার করে দ্বাপরযুগের শেষে এসে দেখা গেল সাধারণ মানুষ যোগভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যোগধারণা শুধুমাত্র মুনি ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একারণ দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও গীতার প্রয়োজন হয়েছিল। আসলে ষড়দর্শনের ঋষিগণ প্রত্যেকেই সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এক একজন এক একদিক এক একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ষড়দর্শন মিলে একটাই দর্শন মাত্র, এভাবে বুঝলেই কিন্তু ধারণায় ভ্রান্তি আসে না। যা হোক সে অন্যকথা। কালের প্রভাবে মানুষের ধারণায় ভ্রান্তি এসেই মানুষ জড়ত্বের পথে এগিয়ে চলল। তাই মানুষের আজ এত দুর্দ্দশা। পুরাকালে নিমি প্রমুখ রাজর্ষিগণ এভাবেই পিতৃপরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জেনেছিলেন ও জানিয়েছিলেন। কিন্তু হে পরন্তপ, হে শত্রুতাপন, কালবশে আপামর সব মানুষের জন্য সৃষ্ট এই যোগ একটা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মাত্র হয়ে গিয়েছে, যাদের আমরা যোগী বলে থাকি। যোগসাধনা যেহেতু সম্পূর্ণই গুরুমুখী বিদ্যা, সেকারণ গুরু পরম্পরায় প্রচলিত থাকে। কিন্তু কালবশে উপযুক্ত অধিকারী না থাকায় তার প্রচার বিরল হয়ে যায়। মনে হয় যেন জগৎ থেকে সাধনাভ্যাস উঠে গেছে। এতো গেল দ্বাপর যুগের শেষের কথা। কলিযুগ বা লৌহযুগ সম্পূর্ণ জড়ভাবনার যুগ । এখন সমাজ জড়বাদী, তাই এ সমাজে কোনও মনিষীর আবির্ভাব নেই। তবে কি যোগ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ? না এখনও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। কোনও কিছুই একেবারে নিঃশেষ হয় না। প্রকৃতির নিয়মে টিকে আছে গুপ্তভাবে কোথাও কেথাও সুপ্ত ফল্গুধারার মত বহে চলেছে কোনও সাধারণ গৃহীর ঘরের মধ্যে বা হিমালয়ের গিরিকন্দরে নতুন যুগের ভোরে নতুনভাবে ব্যাপ্তির অপেক্ষায় নব পরম্পরা লাভের জন্য ॥ ৪/২

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ।। ৩

অনুবাদ : তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, এইজন্য এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে কহিলাম। যেহেতু এই গূঢ়তত্ত্ব উত্তম। ৪/৩

ব্যাখ্যা : যে যোগবিদ্যা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে-গেছে সেই লুপ্ত এবং গুপ্ত বিদ্যা আজ তোমাকে বললাম যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা সর্বদা আমার পাশেই আছ, আমার সাহচর্য্যে জীবনপাত করছ। এই যোগ আর আমি কাউকেই বলিনি। মুক্তির সাধনায় এ অতীব উত্তম ও রহস্যময়। সত্য ও ত্রেতা যুগে মানুষের মন স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক ছিল। তাই তখন সকলেই এই যোগ অভ্যাস করতেন। আস্তে আস্তে সময়ের প্রভাবে মানুষের মন মলিন ও ঘোরালো প্যাঁচালো হওয়ায় মন আর মুখ আলাদা হয়ে গেল, তাই ঈশ্বরপরতন্ত্রতা ভাব উঠে গেল। সাধারণ মানুষ মনে ভাবে এক, আর মুখে বলে অন্যকথা, মনে যে ভক্তি একেবারে নেই তাও নয়। ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তিও বেশ পূজা করে। স্নানের পর ঘরে ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম ও ধূপদীপ দানেরও অন্ত নেই। বড় বড় জমকালো মঠ-মিশনে গিয়ে সৌম্যদর্শন, মুন্ডিত-মস্তক, গেরুয়াধারী-গণের কাছ থেকে দীক্ষা আদিও যথারীতি নিয়ে থাকেন ও সেসব মঠ মিশনের পত্র,পত্রিকা, বই পুস্তকও বেশ পড়েন। শুধু নিজেকে জানার চেষ্টাটাই নেই। তাতে অসুবিধা আছে। কেননা সে চেষ্টা করতে গেলেই আগে মন আর মুখ এক করতে হবে, অন্ততঃ গুরুর কাছেতো বটেই। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সেটা হবার নয়, কারণ সে অভ্যাস এখন সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে যা হল মজ্জাগত। এজন্য শ্রীভগবান বলেছেন যে এই যোগ হল গূঢ় রহস্য। কারণ এ যুগের মানুষ বড় দুঃখী। সুখের পথে ভগবান হাত ধরে হাঁটাতে গেলেও এরা সেটা চাইবে না। বলবে কাজ নেই বাবা, এই আমি বেশ আছি। বাবা আপনি এখন আসুন, বলে কিছু ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় করবে। এজন্য ভগবান বলছেন যে তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তাই তোমাকে এই যোগ বিষয়ে বললাম। কিন্তু দ্বাপরের শেষে কলির শুরুতে কেন অর্জ্জুনকে এই রহস্যের কথা প্রকাশ করছেন ? কারণ অতি দুষ্ট যুগেও এই মহামূল্যবান বিদ্যা একেবারে নষ্ট হয় না। অধিকারী অভাবে গতিটা থমকে থাকে মাত্র। আজ গুরুরূপী ভগবান শিষ্যরূপী সাধকপ্রবর অর্জ্জুনকে পেয়ে তাঁর ভক্তের নিকট এই রহস্য ব্যক্ত করছেন। অর্থাৎ সদ্‌গুরুগণ একমাত্র প্রয়োজন বোধেই এই রহস্য জনসাধারণকে বলেন, কিন্তু সকলের জন্য নয়। শুধুমাত্র গুরুগত প্রাণ শিষ্যগণকেই বলেন। কৃষ্ণসখা-অন্তঃপ্রাণ অর্জ্জুনই এই অধিকারসম্পন্ন। তাছাড়া শাস্ত্রমতেও এই রহস্য অনধিকারীকে বলা নিষেধ। মুন্ডক উপনিষদে আছে "বিদ্যা হে বৈ ব্রাহ্মণমা জগাম, গোপায় মা শেবধিষ্টেহহামস্মি" যার অর্থ হল এই যে "এক সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, তোমরা আমাকে গোপনে রক্ষা কর, তা না হলে আমি শুভফল দানে সমর্থ হব না।" সেই থেকে যোগবিদ্যা যাঁর অধিগত তিনি সাধন করতে গিয়ে তাঁর সাথে এক হয়ে মিশে যেতে পারেন। সখার কোনও তত্ত্বই তাঁর অজানা থাকে না। ৪/৩

অর্জুন উবাচ –

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ।। ৪

অনুবাদ : অর্জ্জুন কহিলেন, আপনার জন্ম পরবর্ত্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব আপনি অগ্রে সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কিরূপে জানিব ? ৪/৪

ব্যাখ্যা: অর্জ্জুন শিক্ষার্থী শিষ্য, তাঁর ভাবনাও তেমনটাই; তাই তিনি ভাবছেন- শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সূর্য্যকে উপদেশ দেওয়াটা অসম্ভব ও অবাস্তব। জিজ্ঞাসা করলেন যে সূর্য্য তো কত প্রাচীন আর আপনার জন্ম তো কত পরে হয়েছে। আপনি তাঁকে প্রথমে যোগ শিখিয়েছেন, এ সমস্ত কি বোঝাচ্ছেন আমাকে ? আর আমিই বা এটা বুঝি কি করে যে তোমার জন্মের আগেই তুমি সূর্য্যকে উপদেশ দিয়ে দিলে ? ভেবে দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের কত আপনজন এই অর্জ্জুন ! কত অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী, বারো বছর বনবাস কালে দ্রৌপদীর ভোজনশেষে বহুশিষ্য সহ ঋষি দুর্ব্বাসার আবির্ভাব তখনও ত্রাণকারী এই ভগবান। সভাস্থলে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করার সময়ে অবিরত বস্ত্রের যোগান দিয়ে দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করেন এই ভগবান। আরও কত সঙ্কটকালে কতভাবেই না উদ্ধার করেছেন এই লীলাময় ভগবান। আজ কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন তাঁরই কথায় যুগপৎ বিস্ময় সন্দেহ দুয়েরই শিকার হয়ে বসলেন। এটাই মোহ, এটাই অজ্ঞতা। সবকিছুকেই নিজের বুদ্ধি ও বিচারে যাচাই করার চেষ্টা। স্বয়ং অর্জ্জুনের যদি এই দশা হয়, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। আমরা কয়জনই বা ভগবানকে চিনতে পারি ? চিনব কি করে ? এই চর্ম্মচক্ষুতে কি কিছু দেখা যায় ? এযে ভোগের চক্ষু। ভোগ্যদ্রব্য ছাড়া কিছুই এ চোখ দেখে না, এ মন বোঝে না। তাই এমন কি সদুপদেশেও সংশয় আসে, আর সংশয় থেকেই হয় বিনাশ। আমার শ্বশুর মশাই খুবই সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এক প্রতিবেশীর গুরুদেব যিনি একজন ভাল যোগী ছিলেন, শিষ্যের বাড়িতে বসেই অন্ত্র বাইরে এনে ধৌতি করতেন, এমন বড় যোগী নিজে থেকে এসে আমার শ্বশুরকে বললেন- বাবা, তোমার এই প্রৌঢ়ত্বেও শরীরের শক্তি যেটুকু আছে সেটুকু পরকালের কাজে লাগাও। আমি এখানে এখন কয়দিন আছি। এই সুযোগে তুমি আমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকর্ম্ম কিছুটা আয়ত্ত করে নাও, সময় বেশী নেই। বুঝুন তিনি কত করুণাময়, যিনি নিজে থেকে এসে যোগশিক্ষা দিতে চাইছেন! কারণ আমার শ্বশুর মশাইয়েরও বেশ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা ছিল এবং মানুষ হিসাবেও ভাল মানুষ ছিলেন। তাই হয়ত শ্রীগুরুদেবের এই করুণা। যাই হোক, উত্তরে আমার শ্বশুর বলে উঠলেন- হ্যাঁ, তবে তার আগে দেখতে চাই তুমি

নিজে কত উচ্চকোটির সাধক। তুমি যদি আজ রাতে আমাকে স্বপ্ন দেখাতে পার এই বিষয়ে, স্বপ্নে এসে আমাকে এই প্রস্তাব দিতে পারলে তবেই আমি তোমাকে গুরু বলে মেনে নেব। বুঝুন একবার ব্যাপারটা! যদি বা হয়ত কোনও পূর্বসুকৃতির বশে শ্রীগুরুদেব নিজে এগিয়ে এসে কৃপা করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর ঘটমান প্রারব্ধবশে তিনি তাঁকে সন্দেহ করে বসলেন এবং সংশয় তাঁর পূর্বসুকৃতির ফলটাকে বেঘোরে নষ্ট করে দিল। কলির জীবের এই অবস্থা, এই বিশ্বাস। এখানে অর্জুনের অবস্থাও এমনটাই, এর চাইতে একটুও উন্নত নয়। কারণ তিনি এখনও জানেন না যে পরব্রহ্ম ভগবান নামরূপ বিহীন- "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" - তাঁর কোনও মূর্ত্তি হয়না। তবে হ্যাঁ, আছে শুধু চিন্ময় রূপ যেটা মাত্র চিদাকাশ। রূপের এটাই আদি, এটাই পরাপ্রকৃতি শ্যামা, অরূপের রূপ। সাধক প্রথমে দেখেন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যরূপ। কারণ চিদাকাশরূপেও তো একেবারে প্রথমে সাধক পান না। তাই অর্জুনের আশঙ্কা সূর্য্যই তো প্রথম, তবে তুমি কৃষ্ণ তার আগে এলে কোত্থেকে ? কারণ অর্জুনরূপী সাধক এখনও জানেন না যে শ্যামসুন্দরের অঙ্গজ্যোতিই সেই জ্যোতির্ম্ময় গোলকরূপী সূর্য্যমণ্ডল। যাই হোক, অর্জুনের সকল প্রশ্নের মত এই প্রশ্নের উত্তরও শ্রীভগবান ধৈর্য্য সহকারে পরবর্ত্তী শ্লোক গুলোতে বেশ বিস্তারিত ভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন, লক্ষ্য করুন। ৪/৪

শ্রীভগবানুবাচ –

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ।। ৫

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সমুদায় জানি কিন্তু তুমি (অবিদ্যাবৃত বলিয়া) তাহা জান না। ৪/৫

ব্যাখ্যা : জীবের একের পর এক জন্ম অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মহাপুরুষদেরও তাই। কারোরই রেহাই নেই, দেবতারাও বাদ যান না। তবে তাঁদের অবতার লীলার ব্যাপার গুলো তাঁদের পুরোপুরি স্মরণ থাকে, একেবারে ছবির মত। আর সাধারণ জীব সেটা জানে না, তাদের বোধশক্তি ততটা হয় না, যেহেতু তাদের বোধজ্ঞান সবই দেহের অবলম্বনে যেটুকু থাকার সেটুকুই মাত্র থাকে। এখানেও ভগবানের অলুপ্ত জ্ঞানশক্তির জন্য তিনি তাঁর পূর্ব পূর্ব জীবনের অবতার লীলা সবই জ্ঞাত আছেন কিন্তু অর্জুন অবিদ্যাবৃত সাধারণ জীব হওয়ায় পূর্ব পূর্ব জীবনের বৃত্তান্তসকল অবগত নয়। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান এই তিন কালই তো মায়াশক্তির লীলা। তাই এই কালের প্রবাহেই আজ যে ছোট, কাল সে বড় হয়। কেউ হয়ত ছোটবেলায় সব বিষয়েই পশ্চাদপদ, অথচ বড় হয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি; আবার কেউ বা ছাত্রাবস্থায় খুব ভাল ছাত্র, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অতি নগণ্য সাধারণ জীবনে পড়ে থাকে। এ সবই ঐ কালের প্রবাহে হয়। জড়বাদী মানুষ এর ব্যাখ্যা অন্যভাবে করে থাকলেও এটা ঘটে থাকে। কেউ বলে ভাগ্য, কেউ বলে দৈব ইত্যাদি। জন্ম, মৃত্যু এসমস্তই সেই একই ভাবে সঞ্জাত হয়। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায়ও আছে বাসুদেবের অনীশ্বরত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব আশঙ্কা মূর্খদের হতে পারে, সেটাই পরিহারের জন্য অর্জুনের এই প্রশ্ন ও ভগবানের এটাই উত্তর। আমি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব হেতু আমার জ্ঞানশক্তি অন্য কোনও প্রতিবন্ধকাদির দ্বারা অনাচ্ছাদিত, তাই আমি সব জানি। কাল যেমন বদ্ধ জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে, মহাকালে স্থির দৃষ্টি, মুক্ত জীবের জ্ঞান কোনও ভাবেই আবৃত হবার নয়। তাঁদের স্মৃতিও চির অম্লান যাকে চণ্ডীতে "মহামেধা মহাস্মৃতি" বলা হয়েছে। তাঁদের দৃষ্টি ঘটাকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঘটমধ্যস্থ আত্মবিস্মৃত জীব ঘটাকাশকেই আপনার স্বরূপ মনে করে, তাই অজ্ঞতানিবন্ধন জন্মে ক্লেশ, মৃত্যুতে ভয়, জীবনের বিবিধ পর্য্যায়ের বিভিন্ন ধরণের বিপর্য্যয় ঘটে থাকে, নিরন্তর বিষাদ ও শোক হয়। ধ্রুবাস্মৃতি লাভ করলে এই জীবই শিব হয়, স্থিরত্ব লাভ করে, বিশোকা পদ পায়। বিস্মৃতিহেতু জীবের প্রকৃতি নানা ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে ও সেই সেই রূপে প্রকাশ পায়, যার পুরোটাই অবিদ্যামূলক, তাই ঐসব মায়াপহৃত চিত্তের কোনও চেতনা থাকে না। চৈতন্য বিকৃত থাকায় কোনরূপ বোধ, অনুভব বা প্রকাশ কিছুই থাকেনা, সবই যেন ঢাকা পড়ে থাকে। তাই ভগবান বললেন যে - এই জন্য তুমি কিছু জাননা, আর কোনও আবরণ আমাকে, আমার জ্ঞানকে, স্মৃতিচিন্তাকে, ঢাকতে পারেনা; তাই আমি সব জানি। সাধারণ জীবের ধারণা - দেহে জীবের প্রকাশের সাথে সাথেই তো আত্মার প্রকাশ, অতএব দেহের সাথেসাথেই আত্মারও তো বহু জন্ম হয়েছে; কিন্তু আত্মবিস্মৃত জীব বুঝতে পারে না যে জন্ম মৃত্যু কারোরই নেই, তার অজ্ঞতাই যে জন্মমৃত্যুর বোধ এনে দিয়েছে, দেহেতে আত্মবুদ্ধির কারণে। আমার দেহবোধ নেই, তাইতো আমি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। দেহজ্ঞান বিস্মৃত হতে পারলে তুমিও আমিই হয়ে যাবে। যতক্ষণ দেহাভিমান ভুলতে না পারবে প্রকৃতি তোমাকে নাচাবে, যে প্রকৃতিকে আমিই নাচিয়ে থাকি। কাল আমার নেই, তাই আমিই মহাকাল। আমার ত্রিকাল নেই, - তাই আমার ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ইত্যাদি নানা ভাব নেই। আমি সর্বদাই একরূপ। জন্মমৃত্যুর অতীত হয়ে সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করি। তাই বলেছেন তোমার - আমার দুজনারই বহু জন্ম অতীত হয়েছে, কিন্তু বোধ দুজনের দুরকম। এসমস্ত রহস্য আমার জানা আছে, কিন্তু তুমি কিছুই জাননা যেহেতু তুমি অবিদ্যাবৃত হয়ে আছ। পরের শ্লোকে ভগবান বুঝিয়েছেন কিভাবে জন্মমৃত্যু সত্ত্বেও এই অনাদিত্ব সম্ভব। ৪/৫

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।। ৬

অনুবাদ : জন্মহীন অবিনশ্বর ও প্রাণীগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই। ৪/৬

ব্যাখ্যা : অর্জুনের সেই “কথমেতদ বিজানীয়াম” প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান কত প্রাঞ্জল ভাবে করেছেন। ভগবান নিজেই প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিয়েছেন। দেখুন -- অনাদি যিনি, তাঁর জন্ম কিরূপে সম্ভব ? যিনি অবিনাশী পুরুষ, তাঁর পুনর্জন্ম কিভাবে সম্ভব ? তাছাড়া তুমি হলে পাপপুণ্যবিহীন ঈশ্বর, সাধারণ মানুষের মত জন্মমরণ তোমার থাকে কিভাবে ? এর উত্তরে সাধারণ জীবের সাথে ঈশ্বরের দেহ ধারণের পার্থক্য স্পষ্ট করে বলছেন সত্যিই বটে আমি জন্মরহিত অজ, কিন্তু আমার এই যে দেহ ধারণ এ কোনও কর্ম্মফল ভোগের জন্য সৃষ্ট দেহ নয়, এই দেহধারণ স্বকীয় ইচ্ছাশক্তি বশে হয়। নিজের ইচ্ছামত স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজ ইচ্ছামত দেহ ধারণ করতে পারি। কিন্তু সাধারণ জীবকে কর্ম্মফল অনুসারে দেহ ধারণে বাধ্য করা হয়। তাদের জন্মও নিজের ইচ্ছামত নয়, মৃত্যুও তাই। কর্ম্ম শেষ হলেই কর্ম্মায়তন এদেহ শেষ হয়ে যায়। তাই সাধারণ জীবের দেহ হল ভোগদেহ যা শুধুমাত্র কর্ম্মভোগের জন্য সৃষ্ট হয়। কিন্তু ভগবান নিজেকে প্রকাশের জন্য যে দেহ নিয়ে আসেন, তা মায়িক দেহ মাত্র; মহাভারতেও ভগবান নারদকে একথাই বলেছেন

“মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যম্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥”

হে নারদ, তুমি সাধারণ চোখে আমার এই যে শরীর দেখছ, এ শুধু আমারই মায়ায় রচিত। আমার স্বরূপ তুমি এই চোখে দেখতে পাচ্ছনা। আরও বলেছেন ---

“কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মানাম্ ।
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।”

এই যে কৃষ্ণকে দেখছ, নিখিল ভূতের ইনিই আত্মা। জগতের কল্যাণের জন্য নিজের মায়ার দ্বারা দেহী জীবের মত আবির্ভূত হয়ে রয়েছেন।

বাস্তবিক মহাভারতে লীলাবসানে কৃষ্ণের দেহ পাওয়া গেলনা, তাঁর দেহের সৎকারও নেই। সত্যিই তো, হাড় মাংসের দেহটা গেল কোথায় ? একমাত্র কৃষ্ণ বাদে অন্যসকল দেহেরই, ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদির অগ্নিসংস্কার সৎকারাদি হয়েছিল। তাহলে এটা বোঝাগেল যে ভগবান “ভূতানুগ্রহ প্রয়োজনম্” অর্থাৎ জীবজগতের দূঃখ দূর করার জন্যই মায়িক দেহ অবলম্বনে আবির্ভূত হন। তাই স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করেন, আর কাজ মিটে গেলে সেই মায়িক দেহকে সঙ্কুচিত করে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। কারণ এ তাঁর নিত্যসিদ্ধ শরীর, তাতে অধিষ্ঠিত থাকে পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা। তাই সেই আবির্ভূত মূর্ত্তিই জগতে পূজিত হয়। তাঁর সেই মূর্ত্তির উপাসনা করে জীব কৃতকৃত্য হয়। এটাই ভগবান বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর এই শরীর জগৎ মায়াধীন নয়, তাঁর ইচ্ছাই সংকল্প ও বেদ, এই

বিরাট বিশ্ব। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টির প্রভেদেই এত ভিন্ন বোধ হয়। অজ্ঞানী সবকিছুকেই আলাদা আলাদা করে দেখেন, তাই এত মায়াবদ্ধ হয়ে নিজেকে পৃথক করে রেখেছেন। দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের ভ্রমে পড়ে সব কিছুতে পৃথক পৃথক ভাব দর্শন করেছেন। কিন্তু জ্ঞানী স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদ করে শুদ্ধ চৈতন্যে বা স্বরূপে লীন হয়ে যান ঠিক বরফ যেমন বাষ্প হয়ে যায়। আত্মার সাথে যুক্ত হওয়ায় সর্বত্রই, সবকিছুতেই, নিজেকে দেখে থাকেন। যাই হোক, অর্জুন এখনও মায়াবদ্ধ শ্রোতা, তাই ভগবানের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইছেন; আর তাঁর দৃষ্টিতেই ভগবান বুঝছেন তাঁর মনের প্রশ্নের বিশ্লেষণ, কোথায় কোথায় আরও ব্যাখ্যা দরকার। এভাবে বলতে বলতে যতক্ষণ না বিশ্বরূপ দেখান হয় ততক্ষণ অর্জুনের মনের প্রশ্ন ভগবান নিজেই অনুভব করে নিজে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সুন্দর করে বলে চলেছেন। অবশ্য যোগী জানেন যে পুরোটাই তেজস্তত্ত্ব (অর্জুন) ও কূটস্থ চৈতন্য (শ্রীভগবানের) এই দুই তত্ত্বের অনুভবের পারম্পর্য্য মাত্র। লক্ষ্য করুন, পরের শ্লোকে স্বাভাবিক ভাবেই এবার প্রশ্ন ওঠে : তাহলে তোমার এই মায়িক শরীর তুমি কখন কখন গ্রহণ কর ? কোন্ কোন্ প্রয়োজনেই বা জগতে আবির্ভূত হও ? এরই উত্তর ভগবান দিচ্ছেন পরের শ্লোকে ॥ ৪/৬

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।। ৭

অনুবাদ : হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি হয় এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি। ৪/৭

ব্যাখ্যা : প্রশ্ন ছিল আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গের ক্রমে কখন তুমি শরীর গ্রহণ কর আর কখনই বা অবতীর্ণ হও ? উত্তর হল - যখন ক্রিয়া লুপ্ত হয়। ক্রিয়া কি আর একদিনে লোপ পায় ? নাকি একভাবে লোপ পায় ? তা নয়, যখন যখন বর্ণাশ্রম ও শ্রেয়সাধনরূপ ধর্ম্মের হানি হয়, জীব কালস্রোতে বিপথগামী হয়ে বিপর্যস্ত হয় এবং সর্বোপরি অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি নিজেকে নিজে সৃজন করি। নিজেকে নিজে সৃজন করার অনুভব তো শুধুমাত্র নিজের কাছে, কিন্তু অপরের কাছে এর প্রকাশ কিভাবে ? একের অনুভূতি তো অন্যের অনুভবে আসেনা , তার জন্যে চাই প্রকাশ বা আবির্ভাব। এ আবির্ভাব কিভাবে হয় ? জীব বিপথগামী হয়ে পড়লে তাদের পথ দেখাতে ভগবান বিভিন্ন ভাবেই আবির্ভূত হন। কিন্তু মানুষ বা জীব জড়বাদী বা ভোগবাদী এমনতর হলেই বিপদ। কারণ এতে তাদের বোধশক্তি, অনুভব এ সকলই নষ্ট হয়ে যায়। নিজের ভাল-মন্দ লাভ-লোকসান কিছুই বুঝতে পারে না। জড়বাদ জড়ত্বই এনে দেয় - আর শুধুমাত্র ভোগ, সম্ভোগ ছাড়া আর কোনও অনুভবই তাদের থাকে না। যা থাকে তা হল ভোগ থেকে উদ্ভূত বিকার মাত্র। যাহোক, অনুভব বা বোধের বিকৃতি ঘটে থাকলে কিন্তু ভগবানের অবির্ভাব বা লীলা এর কোনটাই বোঝা যায় না। এ আবির্ভাব শুধুমাত্র শুদ্ধচৈতন্যসম্পন্ন জীবই বুঝতে

পারে, কারণ তাদের অনুভব সজাগ থাকে। অজ্ঞতা নিবন্ধন বুদ্ধি অপরিণত হতে পারে, বিচার বিবেচনাও কম থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বোধশক্তির বিপর্যয় ঘটেনা, ফলে অনুভবও হারিয়ে যায় না। তাই ভগবান কখনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, কখনও বা হৃদয়ে জ্ঞানরূপে আবির্ভূত হন, আবার কখনও বা শুদ্ধ, মুক্ত পুরুষের বুদ্ধিস্থ হয়ে পৃথিবীতে প্রকাশিত হন, মানে মাটিতে নেমে আসেন। কিন্তু সেটা কখন ? দীর্ঘকাল যাবৎ তো এমন কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে না। এখনও কি ধর্ম্মের গ্লানি সম্পূর্ন হয়নি ? ধর্ম্মের গ্লানি বলতে সাধারণতঃ বুঝি যখন সত্যের প্রতি লোকের আদর থাকে না, যেমন নিজের বোধ বুদ্ধি ছাপিয়ে কোথায় কোন নেতা কি বলল সেটাই বড় হল, এমনটা তো এখন হয়ই - আসল সত্য কোথাও ধামাচাপা পড়ে থাকে। শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতাকে কেউ মানেনা। অখাদ্য কুখাদ্য খেতেই বরং রুচি হয়। ধর্ম্মাচরণের নামে বাহ্যাড়ম্বরও বেড়ে যায় এবং ওটাই বেশ উৎসব আকারে পালিত হয়। দেখুন কেমন বড় বড় পুজোর ব্যবসা মানুষকে কোথায় এনে নামিয়েছে। লোককে ঠকানোই এখন বুদ্ধির লক্ষণ বলে গৃহীত হচ্ছে। নারীদের মধ্য সতীত্ব থাকেনা, গুরু ও পতিসেবা তুচ্ছ জ্ঞান হয়, নারীরা পুরুষভাবাপন্ন ও পুরুষেরা নারীভাবাপন্ন হয়, ইত্যাদি। এছাড়াও থাকে রোগ ভোগ, শোক সন্তাপ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি। তখন অধার্ম্মিকেরা আনন্দ উৎসবে নেচে বেড়ায়, ধার্ম্মিকেরা অপদস্থ হয় পদে পদে। সত্য কথা চলেনা, পদে পদে মিথ্যাভাষণ ও নির্লজ্জ চাটুকারিতাই প্রাধান্য পায়। এমন অবস্থায় মানুষ মনের আসল বৃত্তি হারিয়ে বহুবৃত্তি গ্রহণ করে। ধর্ম্মের গ্লানি শুরু হলে সবচেয়ে খারাপ হয় ধর্ম্মের দিকটাই, ধর্ম্ম নিয়ে ব্যবসা রমরমিয়ে চলে। ধর্ম্মের ধ্বজাধারী প্রচুর মঠ-মিশন, মন্দির মসজিদ, গীর্জা মাজার গজিয়ে ওঠে। এগুলোতে কারও না কারও এমন একটা নাম যুক্ত হয়ে থাকে যাতে যেভাবে ব্যাবসাটা জমে ওঠে আর কি। মঠ-মিশনের লোকেরাও বড় বড় উপাধি ব্যবহার করেন, অমুক স্বামী ১০৮, অমুক মহারাজ, অমুক আচার্য্য বা অমুক ফাদার, বিশপ, সন্ত, পীর, গাজী ইত্যাদি। ধর্ম্মের ধারে কাছে না থেকেও গেরুয়া পোষাক ও মুণ্ডিত মস্তক অথচ এদিকে আসক্তির চূড়ান্ত। যাঁরা এক আধটু যোগাভ্যাস করেন অথবা করেন না কিন্তু মনস্থির, তাঁরা একটু লক্ষ্য করলেই মানে এসব ধর্ম্মব্যবসায়ীদের চোখের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই, বুঝতে পারবেন ভোগাসক্তি কতদূর হতে পারে। তারপর যদি বা কেউ একটু এঁদের সাথে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করেন তা হলেই চিত্তির। যা হোক, মোট কথা, এসবই ধর্ম্মের গ্লানি সূচিত করে। তাই মনকে এসমস্ত কিছু থেকে বিপরীতমুখী করতে হয়। সদা নিরাভিমানী হয়ে, ভোগবর্জিত পবিত্রতা রেখে, মনকে অহংশূন্য করে, কায়মনোবাক্যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করে চলতে পারলেই হল। আর এর সাথে একটু তপস্যা করতে পারলে তো কথাই নেই। কিন্তু মনকে অহংশূন্য করতে হয় প্রথমেই, নইলে দেহাভিমান এলেই সব গেল। দেহাভিমান ও দেহাত্মবুদ্ধি যত বাড়ে ততই মানুষ ভগবান থেকে দূরে সরে যায়। সাধনা দ্বারাই তো ধর্ম্ম রক্ষা হয়। যার দ্বারা সকল গুণকে ধারণ করা যায় তাই হল ধর্ম্ম। দেহ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির নির্মলতাই ধর্ম্মের লক্ষণ। এতে লক্ষ্য স্থির থাকলে মন অন্তর্মুখী হয়ে একাগ্রতা লাভের চেষ্টা করে তখন ধৈর্য্য বাড়ে, মন বুদ্ধি স্থির হয়ে ঈশ্বরার্পিত হয়। সমাজে এ ধরনের ধার্ম্মিক পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে তাঁদেরই কারো কারো মধ্যে বুদ্ধিস্থ হয়ে তিনি পথ দেখান সাধারণ মানুষের জন্য। কারও কারও হৃদয়ে তিনি জ্ঞানরূপেও প্রকাশিত হয়ে থাকেন আমাদের মত বহু জীবের উদ্ধারের জন্য। তখন তাঁরা আমাদের কাছে মহাপুরুষ, যুগপুরুষ ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়ে থাকেন; যেমন শঙ্করাচার্য্য, শ্রী চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, নিগমানন্দ পরমহংস ইত্যাদি, আর যদি ঈশ্বর তাঁর অবতার লীলা প্রকাশের জন্য স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন তখন জগৎ ধন্য হয়, নূতন যুগের সূচনা হয় ॥ ৪/৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।। ৮

অনুবাদ : সাধুবৃত্তি সংরক্ষণের জন্য এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (প্রকাশিত) হই।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে ব্যাখ্যা হল কখন তুমি অবতীর্ণ হও ? এই প্রশ্নের। এর পরেই প্রশ্ন ওঠে, কিজন্য অবতীর্ণ হও ? কেনই বা শরীর ধারণ কর ? ভগবান উত্তর দিয়েছেন এখানে -

১. সাধুদের রক্ষার জন্য

২. দুস্কৃত অর্থাৎ পাপীদের বিনাশের জন্য। এবং

৩. ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য মানে ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে।

এককথায় সাধুর রক্ষা ও দুষ্টবধের দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের রক্ষা তথা ধর্ম্ম স্থির ও স্থায়ী করার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে অর্থাৎ সেই সেই প্রয়োজনের সময়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কিভাবে ? লক্ষ্য করুন।

১. সাধুদের পরিত্রাণ :

যাঁরা আত্মধর্ম্ম পালক অর্থাৎ সাধনশীল এবং সাধনে বেশ কিছুটা এগিয়েছেন, বেশ উন্নতিও হচ্ছে, অনেক যোগবিভূতির উদয় হয়েছে, এ অবস্থায় যা হয় তাই হল, অর্থাৎ একটু অহংকারের উদয় হয়ে পড়ল। ব্যাস, আর যায় কোথায় ? সব রাস্তাই বন্ধ হল। সাধক চোখে অন্ধকার দেখেন মনে হয় বুঝিবা নিজের অবস্থা থেকে পতন হল। ভয়ে ত্রাসে তাড়াতাড়ি আবার তাঁর শরণ নিলেন। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গেই "শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে" মালিকের আবির্ভাব ঘটে একথা সাধক মাত্রেই জানেন এবং তিনি সাধকের হৃদয়ে "বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা" হয়ে দীনার্ত্ত সাধককে সাধনপথে পুনঃসংস্থিত করে সাধকের ধর্ম্মরক্ষা করেন। এই রকম নানা ভাবে সাধনায় বিঘ্ন হয়, হয়ত পূর্বজন্মের কোনও দুষ্কর্ম বশতঃ বা অপর কোনও প্রারব্ধ বশতঃ সাধনক্রিয়া এগোতে চায় না বা তত্ত্ব বিচারে কোনও ত্রুটি

বিচ্যুতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণেই ক্রিয়ায় বাধাবিপত্তি কালে "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" রূপে যে জ্ঞান, বুদ্ধি, মনোবল ইত্যাদির দ্বারা সাধকের যে পরিত্রাণ ঘটে একথা সাধক মাত্রেই জানেন, এটাই হল সাধুদের পরিত্রাণ।

২. ভোগবাদ পরিণামী দুস্কৃতীদের বিনাশ :

নাস্তিক্যবুদ্ধির লোকজন স্বেচ্ছাচারী ও পরপীড়নকারী, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ডিগ্রি, উপাধীর অভাব নাই অথচ সেসব বিদ্যার দ্বারা মানুষের অপকার সাধনই করে, সে সব আসুরিক বৃত্তির লোকের বিনাশের জন্যও ঈশ্বর ধরায় অবতীর্ন হন। কেউ বলতে পারেন ঈশ্বরও তো দেখছি প্রতিহিংসাপরায়ণ। কিন্তু আসলে কি তাই ? না তা নয়। অধ্যাত্মশক্তি আসুরিক শক্তির বিনাশক। উলটো ভাবেও হতে পারে যেমন অসুরিক ভাব বৃদ্ধি হলে অধ্যাত্মচেতনা, আধ্যাত্মিক ভাব সকলই লোপ পায়। তাই আসুরিক ভাব মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি হলেও কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা, বাক, ক্ষমা ইত্যাদি সপ্তমাতৃকা শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। তাই এই সংহার দ্বারা জগতের স্থিতি হয়। চন্ডীতেও একথাই বলা হয়েছে। জগতের উপকার ও স্থিতির জন্যই এই সকল অশুভ শক্তির বিনাশ প্রয়োজন।

৩. ধর্ম্মসংস্থাপন :–

ধর্ম্মের মূল কেন্দ্র ভগবান। ধর্ম্মই জগৎকে ধারণ করে থাকে। তাই অবতার আবির্ভাবের মূল কারণই ধর্ম্মসংস্থাপন, জগতের সুষম ধারণাশক্তির জন্য। ধর্ম্মের মূলকেন্দ্র বা শক্তি যেহেতু ভগবান তাই এই কেন্দ্র থেকেই শক্তি স্ফুরিত হয়ে পরিধিতে বিস্তার লাভ করে আবার কেন্দ্রে ফিরে আসে। এমনতর আবর্ত্তন বিবর্ত্তনই তো ধর্ম্মচক্রের নিয়ম। স্বর্গ ও বিস্বর্গ সৃষ্টি ও লয়। এখানে ধর্ম্ম কি ব্যাখ্যা করতে গেলে বিষয় অনেক বড় হয়ে যাবে। সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়েও বলা যায় ধর্ম্ম হল সেই (balance) সাম্য যে সমতার অভাব হলে প্রকৃতিতে, অর্থাৎ দেহ প্রকৃতি, মনোজগৎ ও বাহ্যপ্রকৃতিতেও বিপর্য্যয় ঘটে। তাই ধর্ম্মের মানদন্ডে বিষমতা এলেই ধর্ম্মের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয় ও গ্লানি হতে থাকে। তখনই জগতের ধারণশক্তিকে সুষম অবস্থায় আনার জন্য ভগবানের প্রকাশ হয়। ঠিক যেমন শরীরের অপব্যাবহারের কারণে শারীরিক ক্রিয়ার সমতা নষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি ফলে ডাক্তার ডাকতে হয় এবং খাদ্য পানীয়ের নিয়ম রক্ষা ও ঔষধপত্র খেয়ে আবার শারীরিক ক্রিয়া সামঞ্জস্যকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয় ঠিক তেমনি ধর্ম্মের গ্লানি হলেই প্রাকৃতিক নিয়মেই জগৎ বিধ্বংসী আসুরিক ভাবের প্রদুর্ভাব ঘটে, তখনই ভগবান, যিনি স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ, যাঁর কাছে ধর্ম্মের মানদন্ড সদা সাম্যে স্থিত, জগৎ প্রকৃতির শৃঙ্খলা যাঁর মধ্যে পূর্ণ, তিনি এসে উপস্থিত হন। তাই তিনি বলেছেন "ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।" ভগবানের আবির্ভাবের অর্থই তাঁর প্রকাশ। ধর্ম্মের মানদন্ডে প্রচণ্ড বিষমতা এলেই তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন এবং তাঁর দ্বারাই আবার ধর্ম্মের বৈষম্য নষ্ট হয়, নতুন ভাবে স্থিতিলাভ করে, এই বৈষম্যনাশই ধর্ম্মসংস্থাপন। দেবতারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোনও নিয়ম ভাঙ্গেন না তাই সুখে থাকেন, "ন দেবাঃ সৃষ্টি নাশকাঃ"। কিন্তু স্বাধীন জীব আত্মবিস্মৃত। সে ভগবানকে কোনও ভাবেই পাত্তা দিতে চায় না। তাই মাঝে মাঝে তাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য শাস্তি দেন ভগবান। তাই সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুস্কৃতীদের বিনাশ যদিও বা তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত ও ভক্ত জ্ঞানীদের দ্বারা হতে পারে, ধর্ম্মসংস্থাপনের কাজটা কিন্তু অপর কেউ করতে পারে না। এটা ভগবানকে নিজেকেই করতে হয়। এক কথায় ভোগবাদ বা জড়বাদের প্রাদুর্ভাবই ধর্ম্মের গ্লানি সূচিত করে। একথা ইতিহাসই বলে। প্রাচীন গ্রীসের সডোম নামক নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীগন অপরিমিতমাত্রায় ভোগবাদী হয়ে ওঠার ফলে সারাদেশে অনাচার সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের এডস্ (AIDS) নামক মারণ রোগ উৎপত্তি হয়েছিল সে দেশেই প্রথম। সমকামীতারও উৎপত্তি প্রথম সডোম নামক রাষ্ট্রেই হয় তাই এই সডোম থেকে সডোমি (Sodomy) কথারও উৎপত্তি। শেষে সমস্ত দেশই ধ্বংস হয় নানাবিধ মারণ রোগের কবলে পড়ে।

এ সকল অবস্থা থেকে ত্রাণের জন্যই যুগে যুগে অবতারগণ প্রকাশিত হয়ে ধ্বংসাত্মক (destructive elements) কারণাবলীকে উৎখাত করে সৃষ্টিরচনাশীল (Creative constructive elements) উপাদান সমূহের আগমের পথ প্রশস্ত করে থাকেন। যতটুকু জানা যায় তাতে অবতারগণ হলেন দশজন, যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ও কল্কি এই দশজনই ভগবান শ্রীশ্রীবিষ্ণুর অবতার এঁরা সকলেই যুগে যুগে চঞ্চলপ্রাণের জীবনে স্থিরতা দিতে এসেছিলেন। প্রথম অবতার মৎস্য স্থিরত্বর প্রতীক, স্থিরত্বের সাধনা করে বেদসকল জানা যায় তাই এই অবতারে নারায়ণ চতুর্বেদ হাতে ধরেছেন। দ্বিতীয় অবতারে কূর্ম্ম মন্দার পর্ব্বত পিঠে নিয়েছেন। যে পর্ব্বত হল ব্রহ্মযোনী, প্রাণকর্ম্মের দ্বারা এই ব্রহ্মযোনী মন্থন করে ভেদ করে অমৃতলোক পেতে হয়। তৃতীয় বরাহ অবতারে অসুর দমন করে পৃথিবীকে নাকের উপর রাখার অর্থ হল শ্বাস-প্রশ্বাস অন্তর্মুখী করে অসুররূপী ইন্দ্রিয়সকলকে দমন করা অর্থাৎ শ্বাসের গতিকে উল্টে দিয়ে দেহবোধকে বিদায় করতেই শ্বাসকে অন্ততঃ দুই ভ্রুর মাঝে রেখে গলার নিচে থেকে পুরো শরীরটা মৃতদেহে পরিণত করার অভ্যাস করা। এইভাবে নৃসিংহ অবতারে প্রাণকে মস্তকে ধারণ, পরশুরামে ক্ষত্রিয় দমন অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ করা, রাম অবতারে শরক্ষেপণ দ্বারা দেহকে দেবক্ষেত্র বা দেবদেহ তৈরী করা। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে সেই দেবক্ষেত্রে অমৃতরূপী দুগ্ধপান, বুদ্ধ অবতারে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্তি এবং দশম কল্কী অবতারে পরম ব্রহ্মপদ পাওয়া, এই সকলই হল দশাবতারের আবির্ভাবের যৌগিক তাৎপর্য্য। এর গূঢ় রহস্য সাধকের জানা। মূলকথা হল শ্বাসের গতিকে উল্টো করে দুই ভ্রুর মাঝে নিয়ে দেহক্ষেত্রকে কর্ষণ করে তাকে জয় করে সহস্রারে পৌছে সমাধি লাভ করা। এই কাজে নেমে প্রচণ্ড অধ্যবসায় নিয়ে লেগে থাকতে হয় আর শ্রীগুরুদেবকে আকূল ভাবে ডাকলে তিনি সাধকের

শরীরে প্রবেশ ও অবস্থান করে তার ক্রিয়া করে দেন। বিষয়টা সাধারণ বুদ্ধি বা বৈষয়িক বুদ্ধিতে ভাবলে কিছুটা অবাস্তব মনে হলেও সাধক মাত্রেরই এই বোধ আছে, তাঁদের কাছে এটা সহজ সরল বিষয়।

যাহোক এসকল স্থূলতর ব্যাখ্যা অপেক্ষা একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলেও দেখা যায় যে বিষয়াসক্ত মন আত্মাকে ভূলে বিষয় নিয়েই উন্মত্ত হয়ে থাকে একথাও যুগে যুগে মহাযুরুষগণ বলেছেন। তাই সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথে চললে বিষরূপ বিষয়াসক্তি ও দুস্কৃতকারী মোহ ধ্বংস হতে থাকে। এটাই হল প্রকৃত অর্থে দুস্কৃতদের বিনাশ। অনুভব করে দেখুন আপনি সদ্‌গুরু উপদেশ পাবার আগে আপনার মন যেমন বিকৃত ও পাপাসক্ত ছিল আজ মন দিয়ে সাধন করতে করতে সেই আগের ভাব বদলে গেছে কিনা ? আপনার ভিতর এই মৌলিক পরিবর্তন এসেছে কি না ? এটাই হল একাধারে দুস্কৃতিদের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন। কারণ এতে আপনি অন্তরের যে বৈষম্য ঘটেছিল ক্রিয়াদ্বারা তার সমতা নিয়ে আসছেন। এই সমতালাভই ধর্ম্মসংস্থাপনা। ভগবানই বলেছেন "সমত্বং যোগ উচ্যতে।" এভাবেই মানুষের শরীর, মন ও প্রাণের মধ্য দিয়ে ধর্ম্মসংস্থাপন কর্ম্ম চলতে থাকে। সমস্ত শরীরের মধ্যে দ্বিদ্বল পদ্ম মনের স্বস্থান। আজ্ঞাচক্রেই আত্মার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের সাথে মন নামতে নামতে এতদূর নেমে যায় যে নিজ নিকেতনের কথা আর মনে থাকে না তখন বুঝি আত্মার সাথে সব সংযোগই ছুটে যায়। একমাত্র দেহ ও ইন্দ্রিয়বিষয় ছাড়া আর দেশ, বাড়ি, ঘর সব ভুলে যায়। কিন্তু পরমাত্মা তো জীবের বন্ধু, তিনি কখনও জীবকে ভোলেন না। তিনি যখন বোঝেন যে ভোগবাদ জীবকে মূঢ়, নাস্তিক ও পশুবুদ্ধি করে তুলেছে এবং তারা পশুর মত শুধুমাত্র ভোগলালসা তৃপ্তির জন্য সব কাজ করে, নিজের স্বরূপ কি বা আত্মা কি এসব কিছুই বোঝে না, তখনই তাঁর আবির্ভাব ঘটে। এখানে আবির্ভাব মানে প্রকাশ। পাপকে নাশ করার জন্য যুগে যুগে তাঁর প্রকাশ ঘটে। এখানে যুগ মানে যুগ্ম,অর্থাৎ শ্বাসের যুগ্ম অবস্থা। ইড়ার সাথে পিঙ্গলার যুক্ত অবস্থাই যুগ। এই মিলন সময়ের ব্যপ্তিটাই যুগ। এই ব্রাহ্মমুহুর্তেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। সহস্র স্থানে প্রক্ষিপ্ত মনকে প্রাণপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে নিজ নিকেতনে নিয়ে যাওয়ার সুন্দর কৌশলগুলি শিখিয়ে শিষ্যের অন্ধনয়ন উন্মীলন করতেই সদগুরুর আবির্ভাব হয়। তাই আবারও বলি "তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥" ৪/৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুনঃ ।। ৯

অনুবাদ : হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত জন্ম, অলৌকিক কর্ম্ম, যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৪/৯

ব্যাখ্যা : ঈশ্বরের জন্ম মরণ আবার কি ? ঈশ্বর তো চিরন্তন । তাঁর আবার কর্ম্মই বা কি ? ঈশ্বরীয় সমস্ত কিছুই হয় অলৌকিক। তাঁর শরীর গ্রহণ ও কৃতকর্ম্মসকল সবই পরানুগ্রহে মাত্র। নিজের জন্য তাঁর কিছুই নয়। তিনিই তো সর্বভূতে আছেন তাই তিনি বলেছেন যে তাঁর জন্ম কর্ম্ম সবই দিব্য। মায়াকে আশ্রয় করে, মায়াকে বশীভূত করে, প্রকাশিত হন। জীবেরও স্বরূপ এমনই জ্ঞানময়। স্বরূপে পরমাত্মা ও জীব এক প্রকারের অজ, অব্যয় ও অবিনাশী, কিন্তু জীবের দেহেতে আত্মবোধ হওয়াতেই অজ্ঞান। ভগবানের এই অজ্ঞান কখনও হয় না তাই তাঁর বন্ধন নেই। জীব যখন পরমাত্মার জন্য কর্ম্মের কথা বোঝে তখনই তার জ্ঞান হয়, বুঝতে পারলেই আত্মবিস্মৃতি ঘুচে যায়। তখন বোঝে "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং," সে আর নিজেকে দেহ বলে বোধ করে না। দেহে আত্মবোধই অজ্ঞান। দেহ বোধ প্রাণের মধ্যে এসে, অজস্র নাড়ীর ভিতরে গিয়ে নিজের কথা ভুলে শুধু দেহবোধ নিয়েই থাকে। মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবারই আত্মবিস্মরণ হয়। এই রহস্য যে জানে তার সকল অজ্ঞান দুর হয়ে যায়। শরীর ত্যাগ করার পর আর না চাইলে পুনর্জন্ম হয় না। তখন জন্ম, কর্ম্ম সবই বিরাট আকাশের মত। এটা যে জানে এবং জেনে ক্রিয়া করে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। মায়ামুক্ত হতে পারলে এই জীবই শিব হয়ে যায়। বুদ্ধির দোষে কিভাবে জীব মায়ার অধীন হয় এবং সেই মায়া হতে রেহাই পাওয়ার উপায় জানলে তখনই স্বস্থানে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং একবার ঠিক জায়গায় এসে পড়লে সব ক্লেশ মিটে যায়। প্রাণ স্থির হয়ে কূটস্থ ব্রহ্মে নির্ব্বাণলাভ করলে মন বুদ্ধিও ব্রহ্মলীন হয়। এটাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। এ অবস্থার ক্ষণিকের স্পর্শেই জীব চমৎকৃত হয়, গুরুর উপদেশে চলতে চলতে সাধকের প্রথমে আজ্ঞাচক্রে ও পরে সহস্রারে স্থিতি লাভ হয়। তখন এখানে যে জন্ম হয় সেটাই জীবের দিব্যজন্ম, কারণ সেখানে সবই শূন্য অথচ সবই পূর্ণ। এটাই তার নিজ নিকেতন, এখানেই সে শিব হয়। ৪/৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ।। ১০

অনুবাদ : আসক্তি ভয় ও ক্রোধশুন্য এবং মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া আত্মজ্ঞান ও স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত অনেকে আমার ভাব পাইয়াছেন। ৪/১০

ব্যাখ্যা : এখানে আসলে একটা অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটা হল তাঁর জন্ম ও কর্ম্মের জ্ঞানের। প্রকৃত কর্ম্মের জ্ঞান হলে অর্থাৎ কর্ম্ম ও অকর্ম্মের ভেদ নির্ণয় করতে পারলে এবং অকর্ম্মরহিত হয়ে কর্ম্মের দ্বারা তাঁতে যুক্ত হতে পারলেই তাঁর বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা জন্মে। এখন প্রশ্ন তাঁকে কিভাবে পাওয়া যায় ? ভগবান বলেছেন - ইচ্ছারহিত হয়ে, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করে, সমানে আত্মকর্ম্ম (আত্মারই প্রিয় কাজ)করে, সর্বদা কূটস্থে থেকে, পবিত্র হয়ে তবেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় যায়। তা এসব করতে

পারলে তো ভালই হত। কিন্তু করা যায় কিভাবে ? তবে ভাবুন, ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখী হয় কেন ? আত্মা বিষয় গ্রহণে ইচ্ছুক হলেই মন এসে জায়গা করে নেয়। ঐ মন ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে বাইরে এসে বিষয় গ্রহণ করে। আবার বিষয়ে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আছেন তা ধারণা করতে না পেরে ভোগ্যরূপে বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে এবং ফলে বিমুগ্ধ হয়। এই বিমুগ্ধ অবস্থাই জীবের বন্ধন। এই বিমুগ্ধতার বাধনে বাঁধা পড়ে জীব বিষয়ী হয়। আর যাবে কোথায় ? বিষয়ী জীবের যে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা আছে তাতে জ্বলতে জ্বলতে অঙ্গার হলে তবেই তো নিজের আদি অন্ত জানতে ইচ্ছা হবে। এই ইচ্ছা হলে পরে গুরুপদেশ মত সাধন করতে পারলে তবেই ধীরে ধীরে মন স্থির হয়ে অন্তর্মুখী হয়। এই অন্তর্মুখী ভাব হলে পরেই এই ভাব থেকেই ইচ্ছা ভয় ক্রোধ এসমস্ত আত্মবোধের বিপরীতমুখী ব্যাপারগুলো ঠিক কমতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত এতই কমে যায় যে মন আর বাইরের কিছুই দেখতে পায় না। কারণ মনন বলে আর কিছুই থাকে না। তখন খুবই আরাম বোধ হয়। বাইরের কোথাও কিছুতেই মন না থাকায় শুধুমাত্র আত্মাতে লেগে থাকে। এ অবস্থাটায় সত্যিই খুব আরাম, এটাই সেই "মদ্ভাব" প্রাপ্তি। এখন আর কোনও বিষয় চিন্তা, উদ্বেগ কিছু নেই, শ্বাস সর্বদা স্থির। তাই অনায়সেই কূটস্থে থাকা যায়। এটাই হল শুদ্ধ জ্ঞানতপস্যা। অন্য কোনও তপস্যা নয়। প্রাণায়াম অভ্যাসে কূটস্থে থাকা, আর জ্ঞানময় তপস্যায় পরাবস্থা পাওয়া, সব একই তপস্যার ফল এ অবস্থার ফলে নতুন অবস্থা আসে তাতে বিষয়ানুরাগ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, কপটতা সব এক এক করে পালাতে থাকে। এরা সবাই চলে গিয়ে মনকে খালি করে দিলে সত্যিকার নিঃসঙ্গতা হয়, তখনই জ্ঞানময় তপস্যার পূর্ণতা সম্পন্ন হয়। তার পরেই আসে সেই অনন্য শরণাগতি। কিসে শরণাগতি ? পরমাত্মাতে। পরমাত্মার শরণ নিতে পারলে তবেই "মদ্ভাবমাগতাঃ" সম্পূর্ণ হল, মোক্ষপথে পা পড়ল।

এখানেই আর এক প্রশ্ন উঠে আসে তবে কি তাঁর ভাবে না গেলে পরে বা তাঁর শরণাগত না হলে তিনি কাউকে দেখেন না ? তবে তো মনে হয় যেন ঈশ্বরের মধ্যেও কিছু বৈষম্য ভাব আছে। এর ব্যাখ্যা পরের শ্লোকে আছে। ৪/১০

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।। ১১

অনুবাদ: যাহারা আমাকে যে ভাবে (সকাম বা নিষ্কাম যে ভাবেই হউক) ভজন করে, তাহাদিগকে আমি সেভাবেই ভজন করি। (অর্থাৎ যাহার যেমন মতি তাহার তেমন গতি হয়)। হে পার্থ, মনুষ্যগণ, সর্ব্বপ্রকারে আমারই অনুবর্ত্তন করে ॥ ৪/১১

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবান বলেছেন, সকলেই আমার লাইনেই আছে। তার মানে কি সবাই তোমার শরণাগত ? তুমি কি শুধুমাত্র তোমারই শরণাগত যারা তাদেরই আত্মভাব দান কর ? তবে তো তোমারও বৈষম্যভাব ভাব আছে, যারা সকাম কর্ম্ম করে তাদের জন্য তোমার কিচ্ছু নেই ? উত্তরে ভগবান বলছেন যে না, তা নয়। সকাম বা নিষ্কাম, যে যেভাবেই আমার ভজনা করে সে সেভাবই আমাকে পায়। অর্থাৎ তুমি সকাম ভজনায় অনেক টাকা পয়সা চাইলে, কন্দর্পকান্তি পতি অথবা সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি চাইলে তাই পাবে আবার নিষ্কাম সাধনা দ্বারা যদি আমাকে চাও তবে আমাকেই পাবে। এত খোলাখুলি ভাবে চাঁচাছোলা কথা এর আগে কেউ কোথাও বলেননি। বেদ, কোরাণ, বাইবেল, পুরাণ, জেন্দ-আবেস্তা, ত্রিপিটকাদি কোনও গ্রন্থেই এত স্পষ্ট কথা নেই। তাই বলেছেন আমারই পথে সব মানুষ। যে যে আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে আমিও তাকে সেই সেই ভাবে ভজন করি অর্থাৎ তার কর্ম্মানুযায়ী তার আকাঙ্খা মিটিয়ে থাকি, তা সে সকাম বা নিস্কাম যাই হোক না কেন। আমি কাউকে ফল দিতে ছাড়ি না। তবে তার কর্ম্মের অনুরূপ ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি। এখন প্রশ্ন ওঠে তবে আর ভগবানের সমভাব রইল কই ? উত্তরটাও এখানেই আছে, মনে করুন কেউ সর্ব্বদা প্রাণপণে ডাকে, কেউবা কালেভদ্রে ডাকে, যদি সকলকে একভাবে কৃতার্থ করতে গিয়ে একইভাবে সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন তবে সাধনার অভাবে জ্ঞানের যে অপুষ্টি রয়ে গেল সেটা কি মিটবে ? কখনই না। কোনও ছাত্র পড়াশুনা ঠিকমত না করলেও যদি তাকে পাশ করিয়ে দেওয়া হয় তবে কি তাতে তার নিজেরও বিপদ বাড়েনা ? সাধক অজ্ঞানী হলে জ্ঞানের অপূর্ণতার জন্য পরমাত্মাকে চেনা দূরের কথা, তার বোধশক্তির আওতার মধ্যেই আসবে না। জহুরী না হলে জহরাদি মণি মাণিক্য চেনা যায় না, অজ্ঞ লোককে মণি মাণিক্য দিলে সে কাঁচ বলে ফেলে দেবে। যদি এটাই ভগবানের কথা হয়, সেখানেও তো প্রশ্ন ওঠে তবে আর সকলেই তোমার রাস্তায় চলছে কি ভাবে ? উত্তরে বলি যে সকামী নিষ্কামী, অজ্ঞ ও জ্ঞানী বা বিষয়ী সবাই একটা আনন্দের টানে পড়ে আছে। আমার এক অতি আপনজন যার সকল বিষয়ে সবিশেষ যোগ্যতা ও জ্ঞানবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কোনও এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের Agency নিয়েই মেতে আছে। তার কাছে এ জিনিসের এতই উন্মাদনা আছে যাতে সে জীবনের মূল্যবান সময়টা এ নিয়েই মেতে আছে। বিষয়াসক্ত সকামী জীব এই রকমই এক একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দে ও নেশায় মশগুল হয়ে থাকে। এভাবেই সবাই বিষয়কেই আনন্দের হেতু মনে করে। একজন কৃষিবিজ্ঞানী যার অধীনে ভাল ছাত্ররা রিসার্চের কাজ করে তেমন বিজ্ঞানমনস্ক লোকের মুখে একটা অদ্ভূত কথা শুনেছি যেহেতু তিনি সেই উৎপাদন সংস্থার এজেন্ট বা distributor এবং সে সব Product সম্বন্ধে ভাল জানেন সুতরাং তিনি নাকি কোনও দিনও মরবেন না। সে সকল Product ব্যবহার করে তিনি নাকি অমরত্ব পেয়েছেন। এসব থেকে এটাই বোঝা যায় যে রস বা আনন্দই তাঁদের এই অদ্ভুত অনুভবের হেতু। সকল বিষয়ের সব রসেই সেই আত্মা। "রসো বৈ সঃ" সকলেই আনন্দের টানে পড়ে আছে। তারা জানে রস বা আনন্দ আর কোথাও নেই বা আর কিছুতে নেই। এভাবেই সব চলছে, কেউ ভাবে টাকাই সব, কেউ মনে করে ছেলেই সব, এইরকম আর কি ?

এবারে বলুন সকলেই কি নিজের নিজের আনন্দ বা স্বার্থর (interest) পথে চলছেন না ? তবে আর ভগবান কি ভুল বললেন ? সকলেই তাঁর পথে আছে কিভাবে ? যে যা লক্ষ্য করেই ছুটুক, শেষপর্য্যন্ত সব বিতৃষ্ণায় মিশে তাঁরই পায়ে লুটিয়ে পড়বে। এটাও সেই রাস্তা একটু ঘুরপথে আসা আর কি, area of interest হয়ে ঘুরে আসা। যখন বুঝবে সে যা খুঁজছে সেটা ধন, যশ, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী, পুত্র কোনও কিছুতেই নেই, সেদিন সে তাঁকেই চাইবে এবং তাঁকেই পাবে। আমি যেমন আত্মারূপে আছি তেমনই বিষয়রূপেও আছি। আত্মারূপে থাকতে হলে আত্মজ্ঞানের পথে এস, বিষয়রূপে জানতে হলে বিষয়ের মধ্যে থাক। যে যে আমাকে যে যে ভাবে চাইবে তার তার কাছে সেই সেই ভাবেই যাব। এজন্য আমি মোটেই পক্ষপাতী নই, কারণ সে তো আমায় চেয়েছে এভাবেই। এই শ্লোকের আরও অনেক জলজ্যান্ত ব্যাখ্যা আছে, সেটা উপযুক্ত সাধক ব্যতীত প্রামাণ্য নয়। সাধারণভাবে সাধকের মধ্যেও দেখা যায় কেউবা শুধুই স্থিরতা চায়, কেউবা ধ্বনিতে মোহিত, কেউ দর্শনের আকাঙ্খী, সব বুঝেও কিছু বলার নেই। সবই তো সেই আত্মারই বিভূতি। অথচ এইসব বিভূতিকে না ছাড়তে পারলে সেই অনন্ত স্থিরতার মধ্যে প্রবেশ সম্ভব নয়। তাই বলি যে নিস্কাম সাধকগণও তো সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশেরই ভজনা করে চলেছে তবে বিষয়ীর আর নতুন কি ? ৪/১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ।। ১২

অনুবাদ : এই মনুষ্যলোকে কাম্যকর্ম্মের সিদ্ধিপ্রার্থীরা (আমাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রাদি) দেবতা দিগের ভজনা করে (কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি অনিশ্চিত); পরন্তু নিষ্কাম কর্ম্মজনিত সিদ্ধি (ইচ্ছা রহিত অবস্থা) নিশ্চয়ই শীঘ্র হইয়া থাকে। ৪/১২

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে অত বিস্তারিত বলার পরও দেখা যায় যে অন্ততঃ যাঁরা মুক্তিকামী ও মোক্ষলাভেচ্ছু তাঁরাও কিন্তু প্রায় কেউই আত্মা বা পরমাত্মা বিষয়ে মোটেই উৎসুক নন। এমনকি তাঁরা নিজেকে জানতেও উৎসুক নন, কর্ম্মসুত্রে আমাকে বিভিন্ন দেশে প্রদেশে, নগরে বন্দরে ঘুরতে হয়। আমি দেখেছি কম বেশী সকলেই আত্মা পরমাত্মা বাদে অনেক ধরণের পূজা, অর্চনা বিবিধ পদ্ধতিতে করে থাকেন। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, মহম্মদ, অনুকূল, প্রতিকূল আরও কত দেবদেবী ইত্যাদি যার ভেতরে আত্মজ্ঞান লাভের কোনও দিশাই নেই। তাই প্রশ্ন তোমাকে পেলেই যদি সব পাই তবে মোক্ষের জন্যে সকলে তোমারই ভজনা করে না কেন ? সাক্ষাৎ তোমাকে ভজলেই তো সব হল। এই শ্লোক এ প্রশ্নেরই উত্তর। কর্ম্মফল আকাঙ্খা করে মানুষ অনেক দেবদেবীর ভজনা করে অথচ কেউই সাক্ষাৎরূপে আমার ভজনা করে না। এর কারণ হল ফলাকাঙ্খা। কর্ম্মের ফল চট করেই হয় কিন্তু জ্ঞানের ফল যে কৈবল্য তা তো আর তাড়াতাড়ি হয় না কারণ জ্ঞান অতীব দুস্প্রাপ্য। মানুষেরা ফলাকাঙ্খার জন্যই দেবতাদের পূজো করে থাকে অথচ সেই ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কর্ম্ম না করতে পারলে তো ইচ্ছারহিতও হওয়া যায় না, সিদ্ধি তো দুর অস্ত। অনেকে যোগাভ্যাস করতে করতেও যোগসিদ্ধি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু ভাবুন দেখি যোগসিদ্ধি মানে কি কতকগুলো ঐশ্বর্য্য লাভ ? প্রকৃত যোগসিদ্ধি বা যোগৈশ্বর্য্য হল ইচ্ছারহিত হওয়া যে অবস্থাটা সেটা, নৈষ্কর্ম্ম বা জ্ঞান। এর মূল্য আমরা বুঝি না। ইচ্ছারহিত কি সহজে হয় ? যদি বা কেউ হয় তাকে বুঝতে চাই না অথবা ভুল বুঝি। সর্বদাই বহু বাসনার অজস্র ঢেউ উঠছে। শুধুই চাই ভোগ আর ভোগ। দুর্লভ কৈবল্যপদে লক্ষ্যই নেই। শুধুই আছে চাওয়া। প্রাণ, কুণ্ডলিনী শক্তি নিজের ঘর ছেড়ে, অন্তঃপুর ছেড়ে স্বৈরিণীর মত বাইরে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের তালে তালে মন উচাটন হয়, কত কি চায়, কত কি পায়, কিন্তু শান্তি নেই। তাই সাধন ভজনেও সে কামনা রহিত হতে পারছে না, সকাম ও নিস্কাম ভজনায় যে অনেক তফাৎ। কিছুটা সাধনা করতে পারলেই উচ্চলোক প্রকাশিত হয়। দিব্যদর্শন, দেবদর্শন এসবই হয় কিন্তু কেউই কৈবল্য দান করতে পারেন না। এরই জন্য সেই ইচ্ছারহিত ও নির্ম্মল মনের দরকার হয়। নতুবা দিব্যদর্শন তো অল্প চেষ্টাতেই হয়। ওসব কোনও কাজের জিনিষই নয়। কবীর দাসজীর কথা আগেও বলেছি -

"সহকামী সুমীরণ করে পাওয়ে উঁচাধাম। নিহকামী সুমীরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম।।"

সকাম সাধনায় মৃত্যুর পর হয়ত উচ্চধাম মিলতে পারে কিন্তু নিষ্কাম সাধনায় অবিচল রাম অর্থাৎ চিরস্থির পরমপদ পাওয়া যায়। যদিও কৈবল্য জ্ঞান বা মুক্তি খুব একটা সহজ সাধনলভ্য কিছু নয়। কিন্তু তাতেই চিরশান্তি হয়। তাই ভগবান বলেছেন লোক আমাকে ছেড়ে দেবদেবীর ভজনা করে বটে কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই কারণ কাম্যকর্ম্ম বিধিমত না হলে তার কোনও ফল নেই কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইচ্ছারহিত অবস্থা নিশ্চয়ই হয়, যদি কোনও কামনা ছাড়াই করা যায়। ৪/১২

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম ।। ১৩

অনুবাদ : আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি (সত্য, কিন্তু) তাহার কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ আমাকে অব্যয় (অসক্তিশূন্যতা বশতঃ) অকর্ত্তা জানিও ॥ ৪/১৩

ব্যাখ্যা : আবার সেই রকম প্রশ্ন তুমিই যদি এইসব বৈচিত্র্যের কর্ত্তা হও, যেমন অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বিভাজন সকাম ও নিষ্কাম তেমনি। সর্বকর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও উত্তম মধ্যম ইত্যাদি বিভেদ বৈচিত্র্য। তবে তো মনে হয় তোমার লোকেরা সমতা বিহীন এবং এর কর্ত্তা হিসাবে তোমাতে বৈষম্য আছে ? এই সংশয়ের নাশ করার জন্য ভগবান বলেছেন : চার প্রকার বর্ণ সৃষ্টি করেছি ত্রিগুণের অনুপাত অনুসারে, যদিও এরও কর্ত্তা সেই আত্মাই। অত্মার অভাবে মন, বুদ্ধি বা কোনও ইন্দ্রিয়ই,কোনও কাজ করতে পারেনা। এর আগে সাংখ্যযোগের ব্যাখ্যায় এই বর্ণরঞ্জনার মূল ধারণাটা

দেওয়া হয়েছে। এখানে স্থূল বা বাহ্য অর্থে জাতি, সম্প্রদায় হলেও সূক্ষ্ম বা আভ্যন্তরিক অর্থে কিন্তু সেই পূর্ববর্ণিত বর্ণরঞ্জনা বা রঙের খেলা। ঋগ্বেদে আছে --

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ॥"

অর্থাৎ বাহ্য অর্থে মুখ হতে জ্ঞানের আগম নির্গম যার মাধ্যম বাক্যস্ফূর্তি অতএব সেটি হল ব্রাহ্মণস্থান। কর্ম্ম পরিচালনার মাধ্যম বাহু এজন্য সেটা ক্ষত্রিয়স্থান। আবার বসে বসে যেসব শিল্প উদ্ভাবন ও তার ব্যবসায়িক পরিচালন যেভাবেই বলি তার জায়গা উরু যদিও সেটা ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ মুখ থেকে অনেকটাই দুরে, সেটা হল বৈশ্যস্থান। এ থেকে নিশ্রেয়স কোনও কিছুলাভ না হলেও জাগতিক প্রয়োজনে বৈশ্য জাতিকেই বৈষয়িক উন্নতির কেন্দ্র বলে ভাবা হয়েছে। পদদ্বয় থাকে নিচে অর্থাৎ সব থেকে স্থুল কর্ম্ম যাতায়াত করা ইত্যাদি। এখানেই ব্রহ্মশরীরে শূদ্রের স্থান। মূল কথা অঙ্গসংস্থানে যার যে জায়গাই হোক সকলেই কিন্তু সেই ব্রহ্মকেই আশ্রয় করে আছেন। বড় বটগাছের মূল শিকড় থেকে ডগার পাতাটি পর্য্যন্ত সবাই সেই বটগাছেরই অংশ। সুতরাং ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় কোথাও কাউকে ছোট করা হয়নি। জাগতিক প্রয়োজনেই কোথাও তমোগুণ ও রজোগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। ফলে কেউবা বিষয় চিন্তায় দক্ষ কারও বা ব্রহ্মজ্ঞানে ঝোঁক, এটুকুই তফাৎ, সমস্ত গুণ সেই একেরই অভিব্যক্তি। এই গুণ অনুসারেই জীবের মনে চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান ধারণায় বিভিন্নতা আসে। সে যাই হোক, দীর্ঘ তপস্যায় সকল গুণই শেষে সত্ত্বে লয় হয়। তখন আর চিন্তা নেই কারণ তখন সব বর্ণই ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। নিজেকে এভাবে পূর্ণ বিকশিত করাই সাধনার উদ্দেশ্য। এইটাই যখন সত্যিকথা এখনও বেশ কিছু লোকের ধারণা এবং অপর দলের অনুমান এই শ্লোকটির উপর ভিত্তি করেই হিন্দুদের সামাজিক বর্ণাশ্রম তৈরী হয়েছিল। আবার আধুনিক জড়বাদীগণ বলেন জাতি ও বর্ণের বিভাগ সমাজের ধান্ধাবাজ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর দ্বারাই তৈরী হয়েছিল। সুতরাং এসবই ঘৃণার বিষয়। ভোগবাদের দ্রুত ও অপরিমিত বিস্তারের সাথে সাথে এই ভ্রান্তিও অতিদ্রুত বিস্তৃত হয়েছে। তার ফলে অনেকেই এই সনাতন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে প্রকৃত উন্নতির পথ বন্ধ করে নরকের পথ প্রশস্ত করছেন। কি ভাবে ? সেটা সবার সামনেই ঘটছে বেশী লিখে বা বলে আর কি লাভ ? জাতিভেদ অনাদি কাল হতেই আছে। এখন ভগবানের এই গুণকর্ম্ম বিভাগ ব্যাপারটা না বোঝার ফলেই এত বিপত্তি। বর্ণবিভাগ ও জাতিগঠন কোনও ব্যক্তি বা শ্রেনীবিশেষের পরিকল্পনার পরিণাম নয়। এটা প্রকৃতির নিজস্ব কর্ম্মবিভাগ বা পরিনাম। প্রণব হতেই দ্বিজত্ব। শূদ্রেরা সাধনের অভাবেই প্রণব থেকে বঞ্চিত, নইলে বৈশ্যরাও দ্বিজ প্রণব প্রাপ্ত সাধক। কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যেই এটা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। সঙ্কল্পাত্মক মন বা বিশ্ব লয় হয় জ্যোতিতে। জ্যোতি শব্দে এবং শব্দ পরব্রহ্মে লয় হলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যিনি এঅবস্থা লাভ করেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ, প্রণবরূপে নিজেকে জানতে পারেন

বলেই ব্রাহ্মণ মানবকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ। অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ হয়ে তিনি কৈবল্য শান্তি লাভ করে থাকেন। আবারও বলি দেহের মূলতত্ত্ব সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ ভেদে অধিকারের ভিন্নতা এসেছে। কিন্তু জড়বাদীগণের ধারণা ভগবান নামক কোনও ব্যক্তি বা দেবতাশ্রেণীর কেউ একজন সকলকে সমান করে মানুষ নামক জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। ক্রমে যাঁরা পূজো পাঠ করত তারাই ব্রাহ্মণ হল, আর যারা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকত তারা ক্ষত্রিয় হল, এই রকম ব্যাপার। কিন্তু একথার বা তত্ত্বের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি বা দার্শনিক প্রমান নেই বা কোনও সংকেত পর্য্যন্ত নেই, এটা শুধুমাত্র একটা কল্পনামূলক ধারণা, বাস্তবে এমনটা হতে পারে না। ঈশ্বর সমদর্শী ও নিরপেক্ষ হয়ে ক্রমানুসারে কাউকে উৎকৃষ্ট, কাউকে নিকৃষ্ট, করবেন এমনটা হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন তিনি কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা । তবে এসমস্ত বর্ণবিন্যাস তিনি কিভাবে করেন ? শুনুন, ওসব প্রকৃতির স্ফূরিত উচ্ছাস মাত্র। কারণ ঈশ্বর সবকিছুর কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা বটে কিন্তু প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও অনাদ্যা। তাই যখন যে গুণ অনুসারে যে সব বৃত্তির বিকাশ হয় সেই সেই বৃত্তিগুলো সেই সেই গুণের কাজ। যেমন সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে প্রকৃতিতে যে মানুষরূপী বুদ্বুদ তৈরী হয় তাতে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ইত্যাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। যেহেতু এই বৃত্তিগুলোর সবই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম তাই গুণকর্ম্ম অনুসারে এই শ্রেণীর মানুষ ব্রাহ্মণ। একই ভাবে আবার রজোগুণের মুখ্য অধিকারে সত্ত্বগুণ গৌণ হয়ে পড়ায় প্রকৃতিসত্তায় যে শ্রেণীর বুদবুদরূপী মানুষের সৃষ্টি হয় তার ভিতর শৌর্য্যবীর্য্যের বিকাশ হয় যা হল রজোগুণের ধর্ম্ম। গুণকর্ম্ম অনুসারে এই শ্রেণীর মানুষই ক্ষত্রিয়। এভাবেই তমোগুণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে বৈশ্য এবং তমোগুণের মুখ্য আধিপত্যেই শূদ্র জাতির আবির্ভাব। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরই জাতিবিভাগ জন্মগত। আপনি যদি সত্য সত্যই সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারেন তবে লক্ষ্য করুন শুধু মানুষ কেন পশু পাখি কীট পতঙ্গ নদী পর্ব্বত গাছপালা, সব কিছুতেই সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও গুণের বিভিন্নতা অনুযায়ী সবকিছুতেই এই চার প্রকার জাতভেদ আছে। সুতরাং গুণ অনুযায়ী কর্ম্মবিভাগও অবশ্যই থাকবে। এখানে আমি নতুন কিছুই বলিনি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই সবই আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে, তাতেও বিরুদ্ধবাদীরা সন্তুষ্ট হবেন বলে মনে হয় না। যাক সেসব অন্যকথা, গুণকর্ম্মবিভাগ অনাদিকালসিদ্ধ। সুতরাং বর্ণভেদও অনাদিকাল সিদ্ধ। এখন এইরকম বর্ণধর্ম্মী মানুষের বৃত্তিগুলো ময়লা হলে বা নষ্ট হলে তাদেরও সেই অনুযায়ীগুণ নষ্ট হয়, ফলে প্রতিভাহানি ও পতন হয়। সেটা এখনকার মানুষের দিকে তাকালেই বেশ বোঝা যায়। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হলেও জড়বাদী মূর্খ ব্রাহ্মণ দ্বিজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন, আবার দ্বিজ ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। আবার বেদঅধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। তাহলে ব্রাহ্মণেই আবার গুণঅনুসারে কত বিভাগ করে দেখালাম। সুতরাং গুণই সব। উচ্চগুণ সম্পন্ন মানুষের সেবা করে আমরা তাঁর সেই সেই গুণ নিজেদের মধ্যে আনার চেষ্টা অবশ্যই করব। তাই জেষ্ঠ্য ও

কনিষ্ঠের যে সম্পর্ক, গুরু ও শিষ্যের যে সম্পর্ক, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সম্পর্কও অনেকটা তাই। সবকটা ভাইই যেমন বড়ভাই হতে পারে না সেই রকম সকল বর্ণই একবর্ণ হয় না। কেউ কখনই ভাববেন না যে শূদ্র ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস। ঈশ্বর কখনই পক্ষপাতিত্ব করেন না, ছোট বড় করেন নাই, প্রকৃতির গুণকর্ম্ম বিভাগেই এমনটি হয়েছে মাত্র। উৎসব অনুষ্ঠানে একসাথে মেলামেশা বা আহার বিহারেই যে সমতুল্যতার পরিচয় তা ঠিক নয়, সদগুণ অর্জনই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। সত্ত্বগুণে স্থিত কোনও নিম্ন জাতীয় মানুষও নিজেকে হীন মনে করেন না এবং তিনি ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়েই থাকেন। এসমস্তই বাহ্য অর্থে বর্ণবিভাগ। প্রকৃত বর্ণরঞ্জনা কিন্তু একমাত্র যোগীদেরই অনুভবগম্য। তাই এই ব্যাখ্যার শুরুতেই বলেছি এ শ্লোকের অর্থ বাইরের দিক থেকে জাতি হলেও ভিতরের দিকে এটাই বর্ণের খেলা। যোগদর্শনের বর্ণবিন্যাস যা সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হলেও সংক্ষেপে সহজ করে প্রকাশ করছি। সত্ত্ব শুভ্রবর্ণ বা সাদা, কূটস্থের চারিদিকে আকাশ যখন শুভ্রজ্যোতিতে পূর্ণ হয়, এই জ্যোতির (Aura) প্রভাবে বুদ্ধি সুস্থ, শান্ত, নির্ম্মল হয় এবং বুদ্ধিতে সব বিষয়ই প্রকাশিত হতে থাকে। মন শুদ্ধ, শান্ত হয় তখনই সত্ত্বভাবময় বিপ্রবর্ণ। আবার যখন স্বত্বভাব থাকা সত্তেও রজোগুণেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে, মনে যথেষ্ট তেজ ও বুদ্ধিতে দৃঢ়তা আসে তখন অন্তরাকাশও শ্বেতাভাযুক্ত লাল রং অর্থাৎ গোলাপী রং এ রঞ্জিত হয়, তখন সেটা ক্ষত্রিয়বর্ণ। আবার যখন পীতাভ রঙে ভরে যায় তখন আর মনের স্থিরতা, দৃঢ়তাও তেমন একটা থাকেনা তখন সেটাকে রজোগুণময় বৈশ্য বর্ণ বলে জানবে। আর যখন কূটস্থের চারপাশের জ্যোতিটা অন্ধকারময় বলে মনে হয়, কোনও জ্যোতি বা প্রকাশ দেখা যায় না, তখন সেটা তমোময় শূদ্রবর্ণ। মোটামুটি ভাবে এই হল ভিতরের দিকে বর্ণের খেলা যা দেখে যোগীরা যোগস্তরে আধ্যাত্মিক ভাবে বর্ণ নির্ণয় করে থাকেন। এবিষয়ে এর বেশি আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন ॥ ৪/১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ণ স বধ্যতে ।।১৪

অনুবাদ : কর্ম্মসকল আমাকে আসক্ত করে না; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই; যিনি আমাকে এই প্রকার জানেন, তিনি কর্ম্মে বদ্ধ (অর্থাৎ নিরহঙ্কারিতা, নিস্পৃহতাদি জানায় তাঁহারও অহঙ্কারাদি থাকে না) ॥ ৪/১৪

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে আমিই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছি ঠিকই তাই আমি সেই কর্ম্মের কর্তা হলেও আসক্তি রহিত হওয়াতে আমাকে অকর্তা বলে জানবে। কি সাংঘাতিক কথা! আমরা সাধারনতঃ একটা কুকুর বিড়াল পুষেই নিজেকে তার কর্তা ভাবি। যখন স্ত্রী পুত্রাদির শোকে লোকে পাগল পর্য্যন্ত হয়ে যায়, তখন বিশ্বসৃষ্টি ও তৎপরে জগৎ সংসার রচনা করেও সেসব কর্ম্ম তাঁকে আসক্ত করতে পারেনা। এখন প্রশ্ন এ যদি সম্ভব হয়, তো কিভাবে সম্ভব হয় ? ভগবান নিজেই উত্তর দিয়েছেন - যে ফলে স্পৃহার অভাব। চাকুরিতে মাস মাহিনা বা অপর কোনও ভাবে কোনও প্রকার প্রাপ্তিযোগ না থাকলে সে চাকুরিতে কোনও স্পৃহা হয়না। গৃহপালিত গরু ছাগল দুধ না দিতে পারলে তার মনিব তাকে কসাই এর কাছে বেচে দেয় এরও কারণ সেই ফলাসক্তি। ভগবানের অনাসক্তি এতই অসীম যে তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হয়েও তাতে তাঁর কোনও অহং আসে না তিনি এতটাই নির্লিপ্ত। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"? যিনি আপ্তকাম অর্থাৎ সবেতেই যাঁর আত্মভাব, সর্বত্রই যাঁর আত্মদৃষ্টি, সেখানে আর তাঁর অভাব কোথায় ? সাধনার দ্বারা যাঁরা আত্মাকে জানেন এবং বোঝেন যে আত্মা স্বয়ংসম্পূর্ণ তখন আর তাঁদের বাসনার লেশ থাকেনা। আত্মারাম হয়ে সাক্ষীস্বরূপে দেহ মন বুদ্ধি ইত্যাদির কাজকর্ম্ম দেখে যান মাত্র। এই অবস্থায় তিনি বুঝতে পারেন কি ভাবে সমস্ত মন, বুদ্ধি হতে স্পৃহা মুছে যায়। তাই কিই বা তার কার্য্য থাকতে পারে ? কর্ম্মই নেই তাই কর্ম্মফল কোত্থেকে আসবে ? কোনও স্পৃহা না থাকলে আত্মবোধ জন্মে। এ অবস্থায় ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পরাবস্থায় যেতে পারলে নিজেই আত্মা হয়ে যায়। প্রকৃত নির্লিপ্তভাব একমাত্র পরাবস্থাতেই বোঝা যায়। এই অবস্থা পর পর বার বার পেতে থাকলে তবেই আত্মার নিজের স্ব ভাবটা পুনঃ পুনঃ বোঝা যায়। পুনঃ পুনঃ এই ভাবে (আত্মভাবে) আবিষ্ট হতে হতে, সেই ভাবটা পেকে গেলে এবং স্থায়ী হলে আর বন্ধন থাকে না। অর্থাৎ যা কোনও কিছুতেই লিপ্ত হবার নয়, এমন আত্মাই যে তুমি এই বোধ স্থায়ী হলে ও পেকে গেলে আমাদেরও আর সুখ দুঃখ ও আকর্ষণ বিকর্ষণ বোধ থাকে না। ধীরে ধীরে সকল প্রকার ইচ্ছা অনিচ্ছাদি অন্তর্হিত হয়ে দেহাভিমান লুপ্ত হতে থাকে ও পরিবর্তে আত্মভাব ফুটে ওঠে, যে ভাবের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কোনও সময়ে ঘুম ভাঙ্গার পর যেমন স্বপ্নে দেখা বিষয় স্মরণ করে তাতে আর নিজেকে জড়িয়ে ভাবতে ইচ্ছে করেনা, তেমনি ভাবে জগৎ স্বপ্নময় বোধ হলে তাতে আর নিজেকে কোনও ভুমিকায় জড়াতে ইচ্ছে করেনা। ফলে কোনও রকম কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি ভাব থাকে না ॥ ৪/১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ।।১৫

অনুবাদ: (অহঙ্কারাদি রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হয় না), এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষগণও কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব তুমিও পূর্ব্বতনগণকর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে কৃত কর্ম্মই কর ॥ ৪/১৫

ব্যাখ্যা : আগের চারটে শ্লোকেই প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের কোনও বৈষম্য নেই দেখান হয়েছে। অতএব ঈশ্বরের বৈষম্যাদি অনুসন্ধান না করে পূর্বোক্ত যোগের অনুষ্ঠান করে কেন কিভাবে পূর্বতনেরা সকল প্রকার বন্ধন পরিহার করে থাকতেন সেটাই দেখাচ্ছেন। পূর্ব্বপুরুষগণ জানতেন যে অহং রহিত হয়ে কর্ম্ম করলে কর্ম্মবন্ধন হয় না। তাই জনকাদি মুমুক্ষগণ এবং তারও আগের আগের লোকেরাও

স্বত্বশুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করতেন। অতএব তুমিও প্রথমে সেই কর্ম্মই কর। অর্থাৎ তন্নিমিত্ত ক্রিয়া কর যেমনটি পূর্ব্বের লোকেরা সকলে করে এসেছেন। একটু বিশদে বলি :-

কর্ম্মতে আত্মা লিপ্ত হন না। আত্মজ্ঞও কর্ম্মেলিপ্ত হন না এ তো বোঝা গেল কিন্তু সমস্যা হল যে কাজ করতে গেলে সেই সেই কর্ম্মজনিত কর্ত্তৃত্ব, ভোর্ক্তৃত্ব ও মোহজনিত একটা অব্যক্ত আবরণ এসে পড়ে এবং সবই ভুলিয়ে দেয়। এথেকে মুক্তির উপায় হল কর্ম্মে লিপ্ত না হবার যে পূর্ব্বকথিত জ্ঞান তাকে স্থায়ী ও স্থির করার জন্য আত্মকর্ম্ম (প্রাণকর্ম্ম) করা। আগেকার মুক্তিকামীগণ ও তৎপরবর্ত্তী জনকাদি ঋষিগণও আত্মতত্ত্বটা বেশ ভাল বুঝেছিলেন, তাই ঐ ভাব নিত্য প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ক্রিয়া কখনও ছাড়েননি। আর আমরা একটুখানি অনুভব করেই ক্রিয়া থেকে বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত হয়ে পড়ি, এতই আমাদের সময়ের অভাব। ছাড়লেই পতন হয়। শুধু বুঝে রাখলেই তো হবে না। কাজ করে স্থায়ী ভাবে যুক্ত হতে না পারলে তো কিছুই হবে না। স্থিরত্বের অনুভব একটুমাত্র পেয়ে শুধু বুঝে নিয়ে রেখে দিলে কোনও লাভ নেই। ক্রিয়ার পর অবস্থায়ই আত্মার সাক্ষীত্ব বুঝা যায়। এই ভাবকে স্থায়ী করতে পারলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। যতক্ষণ না এই আত্মতত্ত্ব একেবারে সূর্য্যের প্রকাশের মত প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণই চিত্ত অশুদ্ধ থাকে। স্থায়ী ভাবে পরাবস্থায় যাঁরা পৌঁছে যান তাঁদেরও লোকশিক্ষার জন্য ক্রিয়া করা দরকার। জনকাদি ঋষিগণও তাই করতেন। ৪/১৫

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহ শুভাৎ ।।১৬

অনুবাদ : কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, এবিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন; অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব ॥ ৪/১৬

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে জনকাদি পূর্ব পূর্বতর মুমুক্ষগণের কথা বলা হয়েছে যাঁরা বেশ করে আত্মতত্ত্ব বুঝেছিলেন। আত্মভাব অর্জনের জন্য ও সেই ভাবকে ধরে রাখার জন্য এবং তৎপরে সেই আত্মভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ক্রিয়ায় অবিচল থাকতেন। এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন তাই বলে আমাদের লোক পরম্পরানুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্মের অনুসরণ করা ঠিক নয়, সেটাও তত্ত্ববিদ্ গণের নিকট হতে বিচার করেই করা উচিত। এখানেও সেই শ্রীগুরুদেবের দায়িত্ব বৃদ্ধির কথা বললেন। কারণ তাঁরাই হলেন প্রকৃত তত্ত্ববিদ। কেউ হয়ত আত্মকর্ম্মে অর্থাৎ যোগে খুবই সিদ্ধ। ক্রিয়ায় যথেষ্ট পরাঙ্গম, কিন্তু তা হলেই হবেনা। কারণ কীদৃশ কর্ম্ম করণীয় এবং কোন কর্ম্মই বা অকরণীয় এ বিষয়ে বিবেকীরাও মোহিত হন। এজন্যই কথিত আছে গুরু তৈরী হয়না, গুরু তৈরী হয়েই আসেন। আজকাল অবশ্য বিপরীত ভাবই দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থিত শিষ্যগণের মধ্যে যে বা যাঁরা সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের পার্শ্বচরের মত সদা সর্ব্বদা তাঁর সেবা শুশ্রূষা করে থাকেন অথবা অন্য কোনও কারণে যাঁর ওপর প্রসন্ন থাকেন তাকেই তাঁর অবর্ত্তমানে গুরুপদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। তাতে মানুষের আত্মতত্ত্ব অধিগত হোক বা না হোক একটি পদের সৃষ্টি তো হল। পরম্পরা ক্রমে নিজ নিজ প্রিয়জনকে মনোনীত করার উত্তরাধিকার এল এবং এভাবেই উপলক্ষ্য আসল বস্তুকে অতিক্রম করে চলতে থাকে। ফলে অন্তর্লক্ষ্যের কথা ভুলে বাহ্যিক ভাবে আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক ও জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষাই গুরুর পদমর্যাদাচিহ্ন বহন করে চলতে থাকল। যাহোক সেসব অন্যকথা। আসলে শিষ্যরাই করেন গুরুর সৃষ্টি। গুরু কখনও কোনও পরম্পরা হতে পারেনা। কবীরদাসজীর কোনও পরম্পরা নেই। যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কোনও পরম্পরা নেই। এক কথায় কোনও সাধকেরই নিদিষ্ট বা মনোনীত পরম্পরা হতে পারে না। তাই বলেছেন করণীয় বিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন। অতএব যা অনুষ্ঠান করলে মানে যে কাজ করলে তুমি অশুভ বা সংসার হতে মুক্ত হবে সেই কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে তোমায় যিনি বলবেন তিনিই গুরু। তিনি কি বলবেন ? ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এই কথাটাই এর চেয়ে সহজ করে বলেছেন। প্রকৃত কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় কিন্তু কর্ম্ম বুঝে না করতে পারলে ভববন্ধন কাটে না। তাই আগে কর্ম্মের রহস্য জানা দরকার। একই কাজ কখন আকাম কখনও কুকাম এ সমস্ত জানা না থাকলে ভাল কাজ করতে গিয়েও লোকে অপকর্ম্ম করে ফেলে। তাই কোন কর্ম্ম কিভাবে অনুষ্ঠেয় সেটা বুঝে রাখতে হয়। নইলে ক্রিয়ায় বসেও মন বিষয় চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়বে। সব কর্ম্মই অকর্ম্মে পরিণত হবে। প্রকৃত গুরুর শিষ্য সকল বিষয় কর্ম্মই করেন কিন্তু আত্মস্থ হয়ে বা আত্মায় লক্ষ্য রেখে। ফলে সেই কর্ম্ম বন্ধকত্বশূণ্য হয়। এই মহা মৃত্যুপাশ হতে বিমোচনের উপায়টাই জগদ্‌গুরু বলেছেন। পরবর্ত্তী শ্লোক লক্ষ্য করুন ॥ ৪/১৬

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহণা কর্মণো গতিঃ ।। ১৭

অনুবাদ : {নিষ্কাম}কর্ম্মেরও বোদ্ধব্য {বিষয় আছে) বিকর্ম্মেরও বোদ্ধব্য{বিষয় আছে) আর অকর্ম্মেরও (সকাম কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্য{বিষয় আছে) কম্মের গতি দুর্জ্ঞেয় ॥ ৪/১৭

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছিলাম যে কর্ম্মের রহস্য আগে জানা দরকার। প্রকৃত গুরুর প্রাথমিক কর্তব্যই হল আধারভেদে শিষ্যের করণীয় কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা নতুবা সকল বিকল হয়ে যায়। অন্তর্লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিরেখে শিষ্যের জন্য সদ্‌গুরু কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করে থাকেন। নইলে সাধারণভাবে দেহাদি ব্যাপারগুলিই "কর্ম্ম' এবং দেহাদির "অব্যাপারই " অকর্ম্ম। তবে আর বিবেকীগণ এ বিষয়ে মোহিত হন কেন ? এরই উত্তর আছে এই শ্লোকে – ভগবান বলেছেন যে কর্ম্মের অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে। শুধুমাত্র পরম্পরায় জ্ঞাত হলেই চলেনা বা লোক প্রসিদ্ধ মাত্র হলেও চলেনা। যা অকর্ম্ম অর্থাৎ অবিহিত ব্যাপার তারও জ্ঞাতব্য আছে, আবার বিকর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়

তারও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে। এজন্যই কর্ম্মের গতি “গহণা” অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয় যা সহজে বোঝা যায় না। যেহেতু কর্ম্মই জীবনের গতি তাই এই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বিষয়টা বোঝা দরকার, না বুঝে কাজ কর্ম্ম করলে বিপরীত ফল হয়। সাধারণভাবে আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম্ম করে থাকি সেগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজনে বা লোভবশতঃ করে থাকি। লাভ না থাকলে বা ফল প্রাপ্তি না থাকলে সে কাজ করতে ইচ্ছাই করেনা। এই আসক্তিটাই হল কর্ম্মের বন্ধন। এই ধরণের আসক্তিজনিত কর্ম্ম করতে করতে শেষে সংস্কার এত দৃঢ় হয় যে দরকার না থাকলেও সেই কাজ করে চলি। ঠিক পশুকে যেমন নাকে বা গলায় দড়ি বেঁধে কাজ করিয়ে নেয় তেমনি আমাদের সংস্কার বা লোভ বা প্রবৃত্তির প্ররোচনাও ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। এটাই কর্ম্মের বন্ধন অথবা কর্ম্মের উৎসাহ। নির্ব্বোধের এই বন্ধন থাকেই। কারণ ফলের আশা না হলে নির্ব্বোধের সেই কাজে উৎসাহই আসেনা। অষ্টম অধ্যায়ে আর একটু সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। এখানে এটুকুই বলি কর্ম্মের মধ্যে যে বিষ বা বন্ধনকারিনী শক্তি আছে সেটাকে দূর করতে হলে কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত করতে হয়, নইলে সে বিষ কিছুতেই যায় না। অথচ কর্ম্ম না করেও থাকা যায় না। কর্ম্মের গতি এজন্যই দুর্বিজ্ঞেয় কারণ আসক্তি ও লোভই কর্ম্ম করার কারণ হয়। তাই কর্ম্মের রহস্য এটাই যে কর্ম্মও করতে হবে অথচ সেটা অকর্ম্ম হবেনা এই উপায় জানা। তত্ত্বটা এই রকম :- আগেই কর্ম্মের রকম বলেছিলাম কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। আচার্য্য শঙ্করের মতে শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারে‘কর্ম্ম’, শাস্ত্র প্রতিবিদ্ধ ব্যাপারে ‘বিকর্ম্ম’ এবং কোনও প্রকার ব্যাপার রহিত হয়ে তুষ্ণীভাব বা কর্ম্ম অকরণ তাইই‘অকর্ম্ম’। শ্রীমদাচার্য্যদেব বলেছেন ফলাকাঙ্খাসহিত হলেই‘অকর্ম্ম’ আর ফলাকাঙ্খারহিত হলেই‘কর্ম্ম’ এবং ঈশ্বর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সাধন কর্ম্মদ্বারা পরাবস্থা প্রাপ্তিই ‘বিকর্ম্ম’ অর্থাৎ “ক্রিয়া রহিত” অবস্থা। শ্রীগুরুদেবের এই ব্যাখ্যা প্রাচীন মনিষীগণের ব্যাখ্যা হতে কিছুটা পৃথক হলেও মূলতত্ত্বের দিক থেকে একই আছে বরং আরও সহজবোধ্য হয়েছে। ঠিকমত ভাবলে আরও সহজ হবে। ভেবে দেখুন, দেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হলে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং বাহ্য জগতে বিচরণশীল হয় এই জন্যই প্রাণ (শ্বাস প্রশ্বাস) বাইরের দিকেই চলতে থাকে। প্রাণবায়ু বর্হিমুখী হওয়ায় ইন্দ্রিয় ও মনও বাইরেই ঘোরাফেরা করে। এটা কর্ম্ম হলেও কাজের কিছু নয় তাই এটা অকর্ম্ম বা অপকর্ম্মের সমান। যেহেতু এর কোনও positive aspect নেই বরং আছে শুধু নানাবিধ আশা আকাঙ্খার জাল বোনা ও সেই অনুযায়ী কিছু পরিকল্পনা যাতে কর্ম্মবন্ধন মাত্র হয় যার ফল জন্মান্তর ও তৎসহগামী দুঃখ ও ক্লেশ। জানতে দেয় না আমি আসলে কে ? কোথেকে এলাম ? ইত্যাদি ভাবজনিত আত্মজ্ঞান ও আত্মবোধ তো অনেক দুরের কথা। যদিও এই অবস্থাটাই চলতে থাকে বহুদিন ধরে কারণ কর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞতা অথচ কর্ম্ম ছাড়াও থাকা যায় না, যেহেতু কর্ম্মই মানুষের গতি। এই অবস্থা থেকে জীব যখন ধীরে ধীরে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে, তখনই গুরুলাভ করে, কর্ম্মের উপদেশ পায় তখন সেই উপদেশ মত শ্রদ্ধার সাথে চলতে চলতে মন অন্তর্মুখী হলে তবেই ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারেও ক্ষীণতা আসে। ফলে বেশি করে শান্তিলাভ করতে থাকে। এই অবস্থায় গুরুপদেশে যে কর্ম্ম করা হয় সেটাই হল প্রকৃত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করতে করতে প্রাণমন স্থির হলেই “তন্মন বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং”। এটাই “বিকর্ম্ম ” বা কর্ম্মের শেষ। কর্ম্ম সম্বন্ধে এই তত্ত্বটা না বুঝে নিলে কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও ধারণাই হয়না ফলে সারাজীবন অকর্ম্মেই রত থাকতে হয়। যাই হোক, কর্ম্মের প্রকারভেদে অনুষ্ঠান বিষয়ে পরের কয়েকটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় লক্ষ্য রাখুন ॥ ৪/১৭

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ।। ১৮

অনুবাদ : যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনিই (ব্রহ্মে) যুক্ত ॥ ৪/১৮

ব্যাখ্যা : কর্ম্মসকল কেন ও কিভাবে দুর্বিজ্ঞেয় সেটা নির্দিষ্ট করে নিয়ে বলছেন যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন অর্থাৎ বোঝেন যে এটা কর্ম্ম নয়, এই কর্ম্ম জ্ঞানলাভের কারণ, আবার অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন অর্থ হল বিহিত কর্ম্ম না করায় কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হয় বোঝেন, তিনি কর্ম্মকারী মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। জ্ঞানযোগে যুক্ত হয়ে তিনি (কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ) সর্ব্বকর্ম্মকারী হয়েও নৈষ্কর্ম্মবোধেই থাকতে পারেন যেহেতু আত্মাকে দেহাতিরিক্ত বলে অনুভব করেন। তিনি যদৃচ্ছা আহারাদি করেও আত্মাকে অকর্ত্তা জ্ঞানে সমাধিস্থ হতে পারেন। ফলে অনাসক্তি প্রাপ্ত এমন প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাংস ইত্যাদি খেলেও দোষের নয়, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি আসক্তিবশে যা করে সেসবই কুফল প্রসব করে। অতএব শ্রীগুরুদেবের কথায় ফিরে আসি ফলাকাঙ্খার সাথে যা করি তা অকর্ম্ম। ফলাকাঙ্খা রহিত যে কর্ম্ম মানে ক্রিয়া, যা করলে মানুষ বুদ্ধিমান হয় ও স্থির থাকে এবং সেই ভাবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে সবকিছু করেও কিছুই করা হয়না, মানে তার শুভাশুভ কোনও ফলই হয়না। তাহলে বোঝা গেল যে নিষ্কর্ম্ম কথার অর্থ গায়ের জোরে বা জোর করে কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা নয়। অমন করলে কখনই ইচ্ছারহিত অবস্থা আসেনা। বরং বিহিত কর্ম্ম না করায় দোষ হয় এবং কর্ম্ম বাসনা থাকায় কর্ম্মফলের হাত থেকেও রেহাই হয় না। বুদ্ধিমান যোগীরা জানেন প্রাণকর্ম্ম ফলাকাঙ্খাশূন্য তাই সমস্ত শক্তিই প্রাণের সাধনায় নিয়োগ করেন। তাই তাঁদের মন স্থির হয়। আর এই স্থির মনই বুদ্ধি। আগে বলেছিলাম যে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এসমস্তই জড়। শুধু আত্মার চৈতন্যধর্ম্মেই এদের চেতনাবান বলে মনে হয়। তাই ক্রিয়ার পরাবস্থায় যাঁরা থাকেন তাঁরাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আত্মাতে যোগযুক্ত পুরুষ অহঙ্কারশূন্য হওয়ায় কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা সকল কর্ম্ম করলেও কোনওরূপ কর্ম্মবন্ধন ঘটেনা। যেহেতু আত্মা অকর্ত্তা তাই তিনি সবকিছু করেও কিছুই করেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ অযুক্ত বুদ্ধির অর্থাৎ আত্মজ্ঞান নেই। তারা কর্ম্মসকলের কর্ত্তা হন। তাঁরা জ্ঞানী নয় কিন্তু চালাক

যেহেতু আত্মার সাথে বুদ্ধির মিলনে উৎপন্ন হয় অহংকার। এই অহংকারই সদসৎ বিহিত, অবিহিত, সব কাজের কর্ত্তা এবং ইন্দ্রিয়সকল এর কারণ স্বরূপ। তাই আত্মা কিছু না করলেও চেতনধর্ম্ম যে আত্মার, তা বুদ্ধিতে আরোপিত হয় এবং সেই বুদ্ধি দ্বারা কৃত কর্ম্মসকল আত্মকৃত বলে বোধ করি, ফলে এমন এমন কঠিন কাজ গুলো সব যত করি অহংকারও তত বেড়ে চলে সাথে সাথে কাজও বাড়ে আর আমাদের বন্ধনও ততই সুদৃঢ় হতে থাকে। বিষয়টা বলে বা লিখে বুঝান খুবই কঠিন। মন বুদ্ধিকে স্থির করার জন্য নিয়মিত যোগাভ্যাস করা উচিত কারণ যোগাভ্যাস জনিত পরাবস্থা লাভ হলেই আত্মার নিষ্ক্রিয়তা বোধ করা যায় তখন কোনও কাজ করতেও ভয় পায় না আর সংসারাসক্ত জীবের মত কর্ম্মের জন্য মন ব্যাকুলও হয়না যে তাইতো এটা হলনা, ওটা হলনা ইত্যাদি। দেখা যায় প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকার্তও হয়েছে আবার একই সাথে লাভ লোকসানের হিসাব ও করছে, মৃত স্বামীর বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে কালি লাগিয়ে দরকারি কাগজে ছাপ তুলে নিচ্ছে। যাক সেসব কথা, আত্মক্রিয়ার শেষ ফল একাগ্রতা বা মনের নিরোধ। মনে যখন আর কিছুতেই সঙ্কল্পের তরঙ্গ ওঠেনা তখনই চিত্ত শুদ্ধ। তখন বোঝা যায় কর্ম্মমাত্রই অনাত্মকৃত ধর্ম্ম ওটা আত্মার একেবারেই নয়। আত্মার ও কর্ম্মের এই তত্ত্ব বুঝলেই কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা হল। আত্মা কর্ত্তা নয় এই অনুভব হয়ে গেলে অহঙ্কার থাকে না ফলে সব কর্ম্ম করেও কোনও কর্ম্মবন্ধন ঘটেনা। অহঙ্কারই যদি মিটে গেল তো ফলপ্রাপ্তি কার ? সুতরাং কর্ম্মফলও মিটে গেল। এইজন্যই ধ্যানী বা স্থির পুরুষ ব্যাবহারিক কাজ কর্ম্মে ব্যাস্ত থেকেও লক্ষ্যহারা হয়ে যান না। এটাই সাধনার উৎকৃষ্ট ফল, কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন। বশিষ্টদেবও বলেছেন .. .. ..

"পশ্যন্ কর্ম্মণ্যকর্ম্মত্বমকর্ম্মণি চ কর্ম্মতাম্।
যথা ভূতার্থচিদ্রূপঃ শান্তমাসস্ব যথাসুখম্ ॥"

মানেটা হল কর্ম্মকে অকর্ম ব্রহ্মরূপে এবং অকর্ম্মকে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপকে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মরূপ জ্ঞান করে তুমি যথাসুখে শান্ত চিৎস্বরূপে অবস্থান কর। এতবড় সুন্দর জীবন দর্শনের প্রকাশ করা ভগবান বশিষ্টের পক্ষেই সম্ভব। যাহোক, পরবর্ত্তী শ্লোকে কর্ম্মের প্রকরণ আরও সুন্দর ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে করা হয়েছে ॥ ৪/১৮

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহু পণ্ডিতং বুধাঃ ।। ১৯

অনুবাদ: যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম ও কামনা সঙ্কল্পবিহীন, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে পণ্ডিত বলেন ॥ ৪/১৯

ব্যাখ্যা : আলোচ্য পাঁচটা শ্লোক আসলে আগের শ্লোকের "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" এই কথার তাৎপর্য্য স্পষ্টীকরণ মাত্র। বর্ত্তমানে সবাই বিপরীত বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ এখন যোগসিদ্ধ ব্যক্তি পণ্ডিত নন। পরিবর্ত্তে যাঁর যত বেশি ডিগ্রী তিনি তত বড় পণ্ডিত। তাই তাঁরা বলেন চণ্ডী পাঠ করে অমুক ফললাভ হবে। অমুক যজ্ঞ করে বা অমুক তাগা, তাবিজ ধারণ করে তোমার ছেলের পরীক্ষার ফল ভাল হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যাই হোক, গীতার বক্তব্য হল যাঁর সমস্ত কর্ম্ম ফলকামনা বর্জিত বিবেকিগণ তাঁকেই পণ্ডিত বলেন, কারণ ঐ কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হলে, শুদ্ধচিত্তে যে জ্ঞান জন্মে তার দ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হয় ও অকর্ম্মতা লাভ করে। অর্থ এই রকম প্রকৃত পণ্ডিতগণ কর্ম্মের কোনও ফলাকাঙ্খা করেননা। সুতরাং একাজ কে করল, কেন করল এমন কোনও বোধও আসে না। তাহলে এরকম দুটো অনুভব যাঁদের কর্ম্মের হেতু তাঁরাই পণ্ডিত। আমি কিছু কিছু মঠ মিশনের গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে পর্য্যন্ত আক্ষেপ করতে শুনেছি যে এই এত বছরে উনি এত এত কাজ এতখানি দায়িত্বের সাথে সম্পন্ন করেছেন তবুও উনি আজও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারেননি। প্রসঙ্গতঃ একটু বলে রাখি বড় বড় মঠের সন্ন্যাসী মহারাজদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে উচ্চশ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসীগণের সুযোগ সুবিধা লাভও বেশীই হয়ে থাকে। যাহোক এখানে সন্ন্যাস নিয়েও কর্ম্ম কিন্তু অভিমানশূন্য হয়নি। সাধককে দগ্ধকর্ম্মা হতে হবে। অভিমান থাকলেই অভিমান হতে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে আসক্তি এবং আসক্তি থেকেই কামের উৎপত্তি হয়। এটাই ঘোর অন্তরায়। একটা ইচ্ছা বাদে তা হল শুধুমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তি বা মুক্তির ইচ্ছা। সেটা কাম নয় "ন তু কামায় কল্পতে "। কিন্তু সাধনায় বসে যদি মনে হয় আমার সিদ্ধি হবে, কত কি দেখব, শুনব, তবেই সব শেষ। কারণ তবে আর "যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা কামসংকল্পবর্জিতা" হল না। কারণ তাঁর ক্রিয়ানুষ্ঠান কামসংকল্প বর্জিত নয় তাঁদের ক্রিয়াটা কাজ হলেও শুভকর্ম্মফলপ্রসূ নয়। তাই বলে এই লেখা পড়ে যেন কেউ ক্রিয়া বন্ধ করবেন না, বরং চেষ্টা করুন কাম সংকল্প বর্জিত হতে। ক্রিয়াকর্ম্ম দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানলাভ হওয়া দরকার কারণ এটাই গীতার Practical work, বরং বলব কোনও রকম লাভ লোকসান না ভেবে কেবলই গুরু বাক্য পালন করে যান। সেজন্য কোনও সংকল্প করবার দরকার হয়না। বলা অনুচিত হলেও চুপ করে জেনে রাখুন সব কর্ম্মেরই ফল যথাসময়েই লাভ হয়। ভাল কাজের ফল দেরীতে হলেও দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনও ভাবে আসে এবং একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানীই সেটা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারেন। দেখবেন কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্খা না থাকলে কর্ম্মও বেশ সুন্দর cyclic order এ একটা (flow) প্রবাহের আকারে চলতে থাকে আর এভাবে কর্ম্ম করতে পারলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় যাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয়েছে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। এই রকম জ্ঞানীগণই প্রকৃত পণ্ডিত, এখানে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ইত্যাদি অমূলক। ৪/১৯

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ।। ২০

অনুবাদ : যিনি কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দতৃপ্ত ও নিরবলম্ব হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না। ৪/২০

ব্যাখ্যা : প্রবাদ আছে "কামান ন উপভোগেন শাম্যতি।" আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয়না। একের পর একটা চলে আসে। এটাই আকাঙ্খার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ফলাকাঙ্খা থাকতে তৃপ্তির উপায়ই নেই। মন সংকল্প বিকল্প যুক্ত হয়ে কোনও না কোনও কিছুকে অবলম্বন করবেই। একমাত্র যাঁর মন থেকে ফলের ইচ্ছা মুছে গেছে তিনিই তৃপ্ত, নিত্যই তৃপ্ত। তাই শ্রীভগবান বলেছেন ফলাকাঙ্খা যদি না থাকে তবে সে আর কোনও কিছুকেই অবলম্বন করবে না। তখন সে নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয় হয়ে সব কাজ করলেও তাঁর কিছুই করা হয়না। মন তখন তার নিরাবলম্বনে স্থির থাকে। এটাই নিরাশ্রয় অবস্থা। কোনও রকম আসক্তি থাকলে সেটাই হয় মনের আশ্রয়। মন সেটাই অবলম্বন করে থাকে, ব্যস্ আর যায় কোথায় ? আসক্তি থাকলেই কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় আর সেই অনুযায়ীই জীবের অদৃষ্ট রচিত হয়। আর সেইমত সুখ দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করতে হয়। এটাই হল কর্ম্মফল। এই যে এখন গীতার ব্যাখ্যা লিখছি এটা যদি ফলাকাঙ্খার সাথে করে থাকি তবে অবশ্যই সেই ফল অদৃষ্টে কর্ম রচনা করে যাবে। কি রকম ? ধরুন কেউ পড়ে এর বিরূপ সমালোচনা করলে মন খারাপ হতে বাধ্য, মনে হবে তাইতো এত খেটেখুটে মানুষের উপকারের জন্য লিখলাম অথচ তারাই যা তা বলছে। উল্টোটাও হতে পারে, প্রশংসা শুনলেই মাথায় চড়ে বসলাম, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল। ভাবলাম আর কি ? এই তো বুঝিবা আমি এইবার পরমহংস হয়ে গেলাম! এই উভয় ভাবই পরম ক্ষতিকর। আর যদি সত্যিই নিরাসক্ত হয়ে শুধুই লেখার জন্য লিখি তবে সে কর্ম্মে প্রবিলয় হয়। অর্থাৎ কোনও কিছুর জন্যই চিত্তের কোনও অপেক্ষা থাকবে না। গোবিন্দের কাজ করেছি। গোবিন্দ কাজ করিয়েছেন উনিই সব জানেন। মনের আশ্রয় তখন একমাত্র পরমানন্দময় আত্মা, তাই তাতেই তৃপ্ত। তা সত্ত্বেও পুরাণো সংস্কারবশতঃ যদি কোনও কাজ করতেও হয় বা কোনও সুখ দুঃখ ভোগও করতে হয় তাতে কর্ত্তৃত্ব ইচ্ছা না থাকায় অর্থাৎ আমিই এ কাজের কর্ত্তা এই Rubber stamp না মারলেই ফলাকাঙ্খা রইল না তাই সে কাজ করা বা না করা দুইই সমান সেজন্য তাতে করে কোনও কর্ম্মবন্ধনও হয়না, অদৃষ্টও রচনা হয়না। ৪/২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।। ২১

অনুবাদ : যিনি শরীরের দ্বারা "কেবল" নামক কর্ম্ম করেন, তিনি যতচিত্তাত্মা ও ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহ হওয়ায় পাপ প্রাপ্ত হন না ॥ ৪/২১

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটি বোঝার জন্য মূল শ্লোকের শব্দের সাথে অনুবাদটাও পড়ুন। তবে বুঝতে পারবেন "নিরাশীঃ" অর্থ নির্গত হয়ে গেছে এমন, "যতচিত্তাত্মা" অর্থ চিত্ত ও দেহ সংযত হয়েছে যাঁর এমন আত্মা। অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম যাঁর শরীর ও মন সর্ব্বতোভাবে সংযত, তিনি কর্তৃত্বের ভাব না রেখে যোগারূঢ় হয়ে শুধুমাত্র শরীর যাত্রার উপযোগী কাজকর্ম্মটুকু করলেও কিল্বিষ, অর্থাৎ যথাবিহিত কর্ম্ম না করার জন্য তাঁর কোনও দোষ, ঘটে না। সোজাসুজিভাবে বলা যায় আশারহিত হয়ে কূটস্থে মন রেখে মানে আত্মমগ্ন হয়ে কোনওদিকে লক্ষ্য না রেখে শরীর দ্বারা কেবলই ক্রিয়া করে গেলে আর কোনও রকম পাপ, কর্ম্মফল, বন্ধন, ইত্যাদি কোনও কিছুই থাকে না। এভাবে করতে না পারলে পূণ্যকর্ম্মও বন্ধনের কারণ হয়। তবে একটা প্রশ্নতো উঠতেই পারে যে ক্রিয়াযোগে আসক্ত হলে দোষ হবেনা কেন ? এর উত্তর পূর্ব্বপৃষ্ঠার ১৯ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে বলা আছে। কারণ এটাও ক্রিয়ার ব্যবহারিক (practical) দিক বটে। এজন্যই এই শ্লোকের শুরুতেই বলা হল আশারহিত হওয়ার কথা। আসলে এমন আশারহিত হয়ে কূটস্থে মন রাখা অভ্যাস করলে নিজে নিজেই চিত্ত ও দেহের সংযম অভ্যাস হয়ে যায়। এমন এক শরীর দ্বারা সম্পন্ন যে "কেবলকর্ম্ম" (ক্রিয়াযোগ) তা করলে সেই সাধকের আর পাপ বলে কিছুই থাকে না, কারণ আত্মাতে লক্ষ্য না রেখে অন্য দিকে মন দেওয়াই পাপ যা আমরা সর্ব্বদাই করে চলেছি। কিন্তু আগে মন আত্মায় স্থির হয়ে গেলে সব কাজ করলেও কোনও কাজই করা হয়না অর্থাৎ ফল স্পর্শ করেনা। বরং কাজগুলোও বেশ অনায়সেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এজন্যই এটাকে "কেবল কর্ম্ম" বলা হয়। এই কর্ম্মের দ্বারাই কৈবল্য পদ লাভ হয়। "কেবল প্রাণায়াম" দ্বারা প্রাণবায়ুকে মাথায় রাখতে পারলেই কৈবল্যপদ পাওয়া যায়। শিব সেইজন্যই প্রাণগঙ্গা (প্রাণবায়ুকে) মস্তকে ধারণ করে থাকেন। সংসারী জীবের পক্ষে আশারহিত হওয়া সত্যই কষ্টকর কাজ। পরিবারের কাছে লাঞ্ছনার শুরু হয়ে সেটা সর্বত্র ছড়াতে থাকে। কিন্তু জীবন তো একটাই, এ সুযোগ ছাড়ি কেন ? এই মনোভাব নিয়ে লেগে থাকলে পরমাত্মাই সহায় হন। এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় ॥ ৪/২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ।। ২২

অনুবাদ : (যিনি) যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, সর্ব্বত্র ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছু না দেখায় ভেদজ্ঞানশূন্য, অতএব শত্রুতাশূন্য ও সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদহীন হওয়ায় (তিনি) কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না ॥ ৪/২২

ব্যাখ্যা : আকাঙ্খা না করে যেটুকু পাওয়া যায় তাতেই খুশি থাকাটাই হল "যদৃচ্ছালাভ"। শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই সমান সহনশীলতা হল দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। "বিমৎসরঃ" মানে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যিনি সমান থাকেন। যাঁর কোনও আনন্দ বা দুঃখ কিছুই নেই এমন লোক সবকিছু করেও সবরকম ভালমন্দের উর্দ্ধেই থাকেন। থাকবেন নাই বা কেন ? ক্রিয়ার পরাবস্থায় কোনও বাহ্য বিষয়ই থাকেনা, বাহ্য চেষ্টা

তো দূরের কথা। অবশ্য ব্যুত্থিত যোগীর বাহ্য চেষ্টা থাকে কিন্তু পরাবস্থাপ্রাপ্ত যোগী কখনও নিজের দরকারে কিছু চেষ্টার প্রয়োজন বোধ করেন না। এটাই তাঁর দ্বন্দ্বাতীত ভাব আবার ব্যুত্থান কালেও যা পেলেন বা না পেলেন তাতেই খুশি তাঁর মনে কোনও রকম ঢেউ ওঠেনা, সদাস্থির। এখানে লাভ লোকসান নেই, ভালমন্দ নেই, সুখ দুঃখ নেই, শীত গ্রীষ্ম নেই, হর্ষ বিষাদ নেই। আবার স্বাভাবিক ভাবে সব কাজই করে থাকেন তাতেও কোনও ঢেউ ওঠে না, মন আন্দোলিত হয়না। এই অবস্থায় কোনও কাজই তাঁকে কোনও সংস্কার এনে দেয়না। বন্ধন তো দূরের কথা। ৪/২২

গতসঙ্গস্যমুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ।।২৩

অনুবাদ: নিষ্কাম, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং প্রাণযজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সমুদায় কর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪/২৩

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকগুলোতে যে কথা বলা হয়েছে সে সমস্তই আসলে একমাত্র যোগারূঢ় ব্যক্তির অনুভব। এ সব কথা বলে বা লিখে বোঝাবার নয়, তবু চেষ্টা করা আর কি। নিষ্কাম, ইচ্ছারহিত অবস্থায় সবরকম রাগ অনুরাগের উর্দ্ধে গিয়ে প্রকৃত জ্ঞানে অবস্থিত হতে পারলেই সব ইচ্ছার লয় হয় এবং সব কর্ম্মই তখন অকর্ম্ম। কারণ কোনও কর্ম্মেই তার নিজ উদ্দেশ্য থাকে না, সবই ব্রহ্মে অর্পিত হয়ে থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোকেই এটা আরও স্পষ্ট করে ভগবান বলবেন। যাই হোক, আত্মস্থিত হতে পারলেই, অভিলাষ, বাসনা কিছুই না থাকায়, সবকিছুতে ব্রহ্ম দর্শন হয়। চিত্তবৃত্তি আত্মস্বরূপে লয় হওয়ায় জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন। তাই তাঁর বোধ কখনও সাধারণ জাগতিক বুদ্ধির লোকের সাথে মেলেনা। লোকে তাঁকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে, তর্ক বাধিয়ে তাঁর কথা শুনতে চেষ্টা করে ও তার কথায় হাস্য পরিহাস করে থাকে। আত্মার অস্তিত্ব সর্ব্বভূতে লক্ষ্য করে যোগী নিজেও সদা প্রসন্নভাব যুক্ত হয়ে যান। এ অবস্থাটা বুঝতে হলে তখন তাইই হতে হবে। এই ভাবটা আনার চেষ্টাতেই ক্রিয়া করা, অতএব সেটা বন্ধনের বিপরীত পথ। আবার যিনি মানুষের কল্যাণে, অন্যকে স্বপথে আনার জন্য, এই ক্রিয়ার প্রচার করেন তিনিও আরূঢ় পুরুষ বলে জানবে এবং তাঁর কর্ম্মেরও কোনও বন্ধন হয় না, তিনিও ব্রহ্মভাবাপন্নই হয়ে থাকেন। একমাত্র অপর কোনও যোগারূঢ় ব্যক্তিই তাঁর ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পারে। অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। ৪/২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ।। ২৪

অনুবাদ: অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম; ঘৃতও ব্রহ্ম; ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক (সমস্তই ব্রহ্ম, যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে) তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধি দ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন ॥ ৪/২৪

ব্যাখ্যা: আপনারা রামকৃষ্ণ মন্দিরের যে কোনও শাখায় গেলে দেখবেন, বিশেষতঃ খেতে বসার জায়গায়, এ শ্লোকটি সুন্দর করে লেখা আছে। খাবার সময় সকলেই এই শ্লোকটি উচ্চারণ করে তবেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন। আমি দু একজন মহারাজকে যথা স্বামী অমেয়ানন্দ মহারাজ, জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের, বেলুড়ের পণ্ডিতপ্রবর রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজকেও এর তাৎপর্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা তাঁদের মত করে ব্যাপারটা বললেও কেন জানিনা আমার মনঃপূত হয়নি। অর্থটা এরকম হলে কেমন হয় ? পূর্বশ্লোকের সাথে সঙ্গতি রেখে ভাবুন আগেই বলেছি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের কথা। আরূঢ় অবস্থায় আত্মা আর কোনও কর্তা নয়। আমিত্বের নাশ হলেই আত্মা অকর্তা। অতএব কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ সর্বত্রই ব্রহ্মঅনুস্যূত (induced)। এ অবস্থায় অর্পণ করার হাতাও ব্রহ্ম, হবনীয় দ্রব্যও ব্রহ্ম, যে আগুনে অর্পণ করা হচ্ছে সে অগ্নিও ব্রহ্ম আর যিনি এই হোম করছেন তিনি মানে সেই হোতাও ব্রহ্ম। অতএব এই ব্রহ্ম আত্মকর্ম্মে যাঁর একাগ্রতা আসে তিনিও অবশ্যই ব্রহ্মকেই পেয়ে থাকেন। এতো গেল মূল অর্থ। কিন্তু খাবার সময় একথা বলা কেন তার সদুত্তর এতে হোলনা। সেটাও এবার বলি। ভাত বা রুটি খাদ্যও ব্রহ্ম। অর্পণ করার কাজটা মানে মুখে ভাত তুলে দেওয়া সেটাও ব্রহ্ম, ব্রহ্মতেই যাবার জন্য। জঠরাগ্নিও ব্রহ্ম। অতএব হজম ক্রিয়াও ব্রহ্ম। ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধানের জন্য অর্থাৎ শরীর রক্ষার জন্য। এও গেল এক অর্থ, এবার আর এক অর্থ বলি।

ব্রহ্মার্পণই কর্ম্মবন্ধন থেকে বাঁচার উপায়। আত্মাতো চিরকালীন ব্রহ্ম। কিন্তু মনটাই সব গোলমাল বাধায়। এর জন্য মনকেও ব্রহ্মার্পণ করে ব্রহ্মের সমধর্মী করে দিতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই মনে যদি শুধুমাত্র ব্রহ্মবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই না থাকে তবেই মন আর মনের মননধর্ম্ম দুইই ব্রহ্মময় হতে পারে। তবে হ্যাঁ, মনকে স্থির করতে না পারলে এটা কখনই সম্ভব নয়। যেহেতু কর্ম্ম করলে ফল আসেই আবার কর্ম্ম না করলেও চলেনা, উপায় নেই। তাই কর্ম্মমাত্রেরই ব্রহ্মার্পণ আগে দরকার। কিভাবে ? বার বার ক্রিয়া করতে করতে মনের সক্রিয় ভাবটা লয় পেয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেই সেটা হল ব্রহ্মার্পণ। বেদেও তাই মনকে বা মনের কল্পনা বা বস্তুমাত্রকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসিত "। তাই মনের সক্রিয় ভাবরাশিকে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মভাবে পরিণত করার জন্যই এই অর্পণদ্বারা সর্বতোভাবে সকলকে অর্থাৎ অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা সবই ব্রহ্মরূপে দর্শনের কথা বলা হল। মূল কথা হল গুরু নির্দেশে পঞ্চপ্রাণকে প্রাণেই আহুতি দেওয়ার কর্ম্ম করলে কর্তা নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। এই হোম ক্রিয়াই প্রকৃত হোম। সাধারণ মানুষ এসব জানেনা। তাই তাঁরা খাবার আগে ঐভাবে আগুনে ঘী পোড়ান আর খাওয়ার সময় অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা, প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি বলে জল দিয়ে আচমন করে থাকেন। বস্তুতঃ এসবই বাহ্যাড়ম্বড় মাত্র।

বর্তমান প্রাণকে স্থির প্রাণে লয় করাই অর্পণ ব্রহ্ম। নিজ নিজ সদ্‌গুরু নির্দেশে খাওয়ার আগে পঞ্চপ্রাণের ক্রিয়াই হোম ক্রিয়া। ৪/২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ।। ২৫

অনুবাদ : অন্য যোগীগণ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কেহ বা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ॥ ৪/২৫

ব্যাখ্যা: এখানে জ্ঞানের প্রশংসায় আটটা শ্লোকে, অধিকারী ভেদে, জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে নানাবিধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে এবার কর্ম্মযোগীগণ কিভাবে দৈবযজ্ঞ কাজটা সমাধা করবেন সেটা বলা হচ্ছে। দৈবযজ্ঞ মানে হল হঠযোগের খেচরীমুদ্রা সাধন। দিব থেকে দৈব। দিব মানে আকাশ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র। এখানে সদ্‌গুরুনির্দেশে যে স্থিরবায়ুর কাজ করা হয় যোগীগণ সেই দৈবযজ্ঞ করে থাকেন। কেউবা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ করারূপ উপায়ে যজ্ঞ করেন, মানে ওঁ কার ক্রিয়া করেন অর্থাৎ মনিপুরচক্রে(ব্রহ্মাগ্নিস্থান)রেচক করা। সুষুম্নাপথে প্রাণবায়ুকে প্রবাহিত করে মূলাধার পর্য্যন্ত নিয়ে আসা এটাই হোম। এটাই ব্রহ্মযজ্ঞ। এই কাজের অভ্যাসেই গ্রন্থিমোচন হয়। কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গমুরারীত্ব মোচন হয়। প্রাণকৃষ্ণ মুক্ত হন। শঙ্করাচার্য্যও বলেছেন "সোপাধিকম্যাত্মানো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেনৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমঃ"। অর্থাৎ সোপাধিক আত্মাকে নিরূপাধিক পরব্রহ্মস্বরূপে যে দেখা, মানে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে হোম করা বা লয় করা, এটাই জ্ঞান যজ্ঞ ॥ ৪/২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ।। ২৬

অনুবাদ : অন্য যোগীগণ ইন্দ্রিয় সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন (সংযম প্রধান হইয়া অবস্থান করেন) অন্য কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকল নিক্ষেপ করেন (অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন) ॥ ৪/২৬

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে দ্বিতীয় ওঁকারের কাজের কথা বলা হল। এতে করে স্বতঃই (automatically) ওঁকারের ধ্বনি শোনা যায় এবং এই ধ্বনি শ্রবণে স্বতঃই ইন্দ্রিয় সংযমও হয়ে যায়। কারণ তখন আর তাঁর জীবনে পঞ্চতন্মাত্রের শক্তি বিশেষ একটা কার্য্যকর হয়না। ফলে দর্শন শ্রবণের ইন্দ্রিয়জনিত মনোমুগ্ধকর বিষয় সমূহ তাঁকে মোহিত করতে পারে না। এই দ্বিতীয় ওঁকারের কাজ ঠিকমত করতে পারলে প্রত্যাহার খুব ভাল হয়। শেষে এত ঘন হয় যে বাহ্য শব্দের কোনও(touch)স্পর্শই পাওয়া যায় না। যোগদর্শনে যে "ত্রয়োমেকত্র সংযমঃ" বলা আছে এতে সেটাও হয়ে যায়। মানে কোনও বাহ্য বা

অভ্যন্তর বিষয় অবলম্বনে তাতেই ধারণা, ধ্যান ও সমাধিলাভের নামই সংযম। কিভাবে হয় ? শুনুন, প্রণায়াম করার পর বেশ অনেক্ষণ যাবৎ মনটা বেশ স্থির থাকে, দেখবেন কথা কইতে ইচ্ছা করেনা। বেশ আত্মস্থ থাকে। তখন মনে যে সদৃশ ও একমুখী প্রবাহ (Similar unidirectional flow) চলতে থাকে সেটাই ধারণা। এঅবস্থাটা দৃঢ় হলে মন সুন্দর শান্ত হয় ও একটা খুশির ভাব থাকে। প্রথমদিকে যদিও এমনটা হয়না। কিন্তু খুব করে অভ্যাস করতে পারলে আস্তে আস্তে সেটা গভীর ও স্থায়ী হতে শুরু করে। তখন সহজেই মন অর্ন্তমুখী হতে শুরু করে। এই অবস্থাটা দীর্ঘতর হলে সেই সাথে চিত্তবৃত্তি যদি আবার কোনও উল্টোপথে, মানে, বিজাতীয় বৃত্তি দ্বারায় বিচলিত (disturbed) না হয় এবং ক্রমশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে থাকে সেই অবস্থাটাই আসলে ধ্যান। নতুবা আগে যেসব জায়গায় যেতাম সেখানে বয়স্ক লোকেদের চুপচাপ বসে থাকতে দেখতাম। বড়দের মুখে শুনতাম যে তাঁরা নাকি ধ্যান করছেন। অথচ তাঁরা সবই শুনতে পাচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাকিয়ে এটা ওটা দেখেও নিচ্ছেন। ফলে আমার সাথে তাঁদের তফাৎ বুঝতাম না। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে একটু বিশ্রামলাভ হয় মাত্র, সেটা ধ্যান নয় মোটেই। যাক সে অন্য কথা। গভীর ধ্যান অবস্থায় চিত্তের বৃত্তি নিরোধ না হলেও সদৃশ স্বজাতীয় প্রবাহ (Similar unidirectional undisturbed continuous flow) অব্যাহত থাকলে যে অবস্থা আসে সেটাই সমাধি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার সমাধি বিষয়ে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রাণায়াম অভ্যাসে প্রাণবায়ু স্থির হলে ভিতর থেকে অভ্যন্তরীয় শব্দ শোনা যায়। এটাই "অনাহত" শব্দ। এই শব্দও চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করার সহায়ক। এই শব্দে মন রাখলে অস্তে আস্তে আপনিই সমাধি উৎপন্ন হয়। ৪/২৬

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ।। ২৭

অনুবাদ : কেহ কেহ জ্ঞানদ্বারা প্রজ্জ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমুদায় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম হোম করেন। ৪/২৭

ব্যাখ্যা : প্রাণায়ামরূপ আত্মকর্ম্মের কথাই সবরকম যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে। তাই ভগবান বলছেন কোন কোন ধ্যাননিষ্ঠগন ধ্যেয় বিষয়কে জেনে নিয়ে তাতেই মন রেখে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম থেকে উপরত হন। ইন্দ্রিয় দুরকম, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ পাঁচ দশটি। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি হল মুখ, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ যার বিষয়গুলো হোল বচন, গ্রহন, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটা হল নাক, কান, চোখ, জিভ ও ত্বক বা চামড়া যাদের বিষয়গুলো হল পঞ্চতন্মাত্রাসকল যথা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ। প্রাণকর্ম্ম হল দশ রকম যথা: ১) প্রাণ=বর্হির্গমণ, ২) অপান = অধোগমন, ৩) ব্যান= আকুঞ্চন প্রসারণ, ৪) সমান = ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমুন্নয়ন, ৫) উদান = উর্দ্ধোন্নয়ন, ৬) নাগ =

উদ্গার, ৭) কুর্ম্ম = উন্মীলন, ৮) কৃকর = ফুৎকার, ৯) দেবদত্ত = জৃম্ভণ (হাই তোলা) ও ১০) ধনঞ্জয় = সমস্ত শরীরের সংস্থান সংরক্ষণ।

এজন্যই মরার পরও ধনঞ্জয় বায়ু শরীর ছাড়ে না। তাহলে এই সমস্ত কিছু থেকেই উপরত হয়ে প্রাণকে হৃদয়ে (আদিত্য হৃদয়) তুলে স্থির করে রাখলে যে আত্মঃজ্যোতি দর্শন হয় সেটাই সেই জ্ঞানদ্বারা প্রজ্জ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি। যার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় আর ঠিক ঠিক মত নিরোধ হলেই জ্ঞান দীপিত হয় অর্থাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হয়ে যায়। এই অবস্থাটাকে পাকাতে পারলেই বিষয় বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়। যাই হোক, আগের আগের শ্লোকেও অনেক বারই মনকে নিরুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সত্যিকথা হল সংযমাগ্নিতে মন কিছুক্ষনের নিরুদ্ধ হলেও মনের মননত্ব একেবারে নষ্ট হয়না। কেননা তখনও তো দর্শন, শ্রবণ এ সবের অনুভব ইত্যাদি হতে থাকে। তাই ভগবান এখানে বলতে চাইছেন যে ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে সংযম সেই অগ্নিতে যাবতীয় প্রাণকর্ম্মই ইন্দ্রিয়কর্ম্মের সাথে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। যাই হোক, যেহেতু অধিকতর সূক্ষ্ম অনুভবাদি আমার নেই তাই এখন পর্য্যন্ত এ জীবনে সফলতা কিছুতেই আসেনি সুতরাং বেশি কথা বলতেও চাই না। অপর কোনও অনুভবী কৃপা করে লিখলে সবাই জানতে পারবে। সাগরে ডুব দিয়েছি বটে কিন্তু তার অতল থেকে এখনও মণি সংগ্রহ করতে পারিনি। ডুব দিয়েও যে মন মজে গিয়েছিল সেও তো শুধুমাত্র বিষয় পেয়ে, যেহেতু যোগলাভও তো একটা বিষয় লাভ বটে। তবে এটুকুও তো সত্যি, যে আইন পড়া ত্যাগ করা, চাকুরীতে প্রমোশনের লোভ ত্যাগ করা এসবের যে একটা মূল কারণ ছিলই সেটাও তো সত্যিকথা। সেটাই সেই অব্যক্ত প্রাপ্তি যাতে বিষয় সম্পর্কহীন পরমানন্দের উদয় হয়ে বেশ একটা কল্যাণকর অবস্থা পাওয়া যায়। এটাই আমার আত্মভাব, এটাই আমার পরাগতি। গুরুকৃপায় এ অবস্থাটুকু পেয়েই আমি আর কোনও কিছুই লাভ করতে চাই নি। এর কাছে সকল লাভই তুচ্ছ হয়ে গেল। তাই বলছিলাম যে, ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পরাবস্থায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত এবং তথায় স্থিতিলাভ না করা পর্য্যন্ত অন্যভাবে কিছুই হবার নয়। ৪/২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাহপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।। ২৮

অনুবাদ : কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী; কেহ বা তপোরূপ যজ্ঞের (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে অবস্থানরূপ যজ্ঞের) অনুষ্ঠাতা; কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং অপর সংশিতব্রত যতিগণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ॥ ৪/২৮

ব্যাখ্যা : সর্ব্বকর্ম্মই যজ্ঞ, যদি যজ্ঞ মনে করা হয়। ভগবান পতঞ্জলী যাকে সার্ব্বভৌম মহাভারত বলেছেন। শ্রৌত বিধানের মতে, বিবিধ দানের নাম দ্রব্যযজ্ঞ। কৃচ্ছসাধন অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদি কঠিন কঠিন ব্রত পালন দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করার নাম তপোযজ্ঞ। অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগযজ্ঞ। গুরুর সেবা শুশ্রূষাদি করে বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র অভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়যজ্ঞ। বেদাদির নিশ্চয় অবধারণের নাম জ্ঞানযজ্ঞ। আর সংশিত ব্রতযজ্ঞ হল আসলে দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ মানে যাতে নিয়মগুলোর কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়। এইসকল যম, নিয়ম, অহিংসাদির সাধন তো কোনও দেশ, কাল, জাতি দ্বারা সীমিত বা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না তাই এটা হল সার্ব্বভৌম। তাই কতকগুলো বিষয় আপাতদৃষ্টিতে পাপ বলে মনে হলেও অবস্থাবিশেষে সেটাই করণীয় হয়। আমার কথিত সাধু ও চোর গল্পেও একথা বলেছি, শাস্ত্রবিধিও সেকথাই বলে। লোকে এখন এসব পড়া ছেড়ে দিয়েছে, তাই জানেনা। যেমন ক্ষিদেয় প্রাণ যাবার উপক্রম হলে চুরি করে খাওয়াটা শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু সংশিতব্রত যিনি তিনি মৃত্যুকেও বরণ করবেন তথাপি নিজের নিয়ম পালনে অবিচল থাকেন। সংক্ষেপে এই হল ভগবানোক্ত ছয় প্রকার যজ্ঞ। এসকল যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীগণ প্রত্যেকেই হন প্রযত্নশীল ও তীক্ষ্ণব্রহ্মপরায়ণ। অতএব লক্ষ্য কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞান। সেটি না পেলে কিন্তু "ন তপস্ত পইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যম্"। অতএব এসকল বাহ্য তপ কোনও তপ নয়। ব্রহ্মচর্য্য করার অর্থ অবিবাহিত থাকা নয় অথবা স্ত্রী সহবাস বর্জন করে গেরুয়া পরে সং সেজে থাকা নয়। এভাবে থাকতে পারলেই যদি ব্রহ্মত্বলাভ হত, তাহলে সবার আগে খাসি, ভেড়া ও হিজড়েদের ব্রহ্মত্বলাভ হত একথা আগেই বলেছি। যে অবস্থায় মন ব্রহ্মে বিচরণ করে সেটাই প্রকৃত তপ। তাহলে সংশিতব্রত যতিগণ কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ? যে যজ্ঞের দ্বারা প্রাণের ব্যাপকত্ব অবস্থা লাভ হয়, সেটাই কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ মহান অবস্থা। "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে" এই অবস্থাই ব্রহ্মপদবাচ্য এবং এই ব্রহ্মকে জানার নামই ব্রহ্মজ্ঞান। ভগবান পতঞ্জলীর সার্ব্বভৌম মহাভারতে উল্লিখিত সকল যজ্ঞই সেই এক লক্ষ্যেই অনুষ্ঠিত, এটাই আসল যজ্ঞ। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতি সহজে কিভাবে করা যায় সেটা পরের শ্লোক গুলোতেই পাবেন। যদিও প্র্যাকটিকাল না করলে লাভ নেই, তবু থিওরিটিক্যালটাই শুনুন। ৪/২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।। ২৯

অনুবাদ : (ক) অপর কেহ কেহ পূরকের দ্বারা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন (এক করেন) (খ) (এইরূপ করিতে করিতে 'কেবল' নামক কুম্ভকের দ্বারা প্রাণ অপানের উর্দ্ধ ও অধঃ গতি স্বতঃ রোধ হওয়ায়) প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া থাকেন। ৪/২৯

ব্যাখ্যা : ভগবান এবারে যোগের মূল ক্রিয়াটাই ব্যক্ত করেছেন। যোগ অনুষ্ঠানের আসল কাজটির দিকে লক্ষ্য করুন। সাধনার সমস্ত অঙ্গ গুলোই আসলে প্রাণায়াম ও কুম্ভকের উপর নির্ভর করে এবং কুম্ভকও প্রাণায়ামের সাহায্যেই অনুষ্ঠান করতে হয় তাই -- প্রাণায়ামই অন্তরঙ্গ যোগের মূল অংশ। বহিরঙ্গ

যোগের মূলভাগ যেমন যম, নিয়ম, আসন ষটকর্ম্ম আদি, অন্তর্ভাগ তেমনই সম্পূর্ণ প্রাণায়ামকেন্দ্রিক। সে যাই হোক, বেশি বলার আবার অসুবিধাও অনেক, তবে প্রাণায়াম কেন ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় সেটাই একটু আলোচনা করি।

আগেই বলা হয়েছে যে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম নির্গুণ আবাঙমনসাগোচর। সেখানে ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কিছুই নেই। এই ব্রহ্ম অব্যক্ত কিন্তু সামান্য হলেও একটু ব্যক্ত অংশ আছে যাকে বলি ষোড়শ কলার এক কলা মাত্র। এই ব্যক্ত অংশটিই হলেন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। আর প্রকৃতি থেকেই এই ত্রিগুণ ও তার খেলাই এই শরীর, সংসার, সমস্ত কিছু। এটাই ব্রহ্মের সৃষ্টি ইচ্ছা বা তাঁর বহু হবার বাসনা “একোহম বাহুস্যামঃ”! সত্যিকথা হল যে, এই ত্রিগুণই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সংসারলীলা সম্পন্ন করছেন। অতএব এই প্রকৃতিই প্রাণশক্তি এবং এ থেকেই এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ বার বার উৎপন্ন এবং লয় হচ্ছে। প্রাণের এই বাইরে ঘোরাফেরার জন্যই কিন্তু সংসার বাসনার অনুভব হয়। এই বাসনার নাশ না হলে কোনও জ্ঞানই হয়না। এটাই প্রথম কথা, এটাই শেষ কথা। এই সহজ ও খাঁটি সত্যি বুঝেও না বোঝার জন্য বহু সাধক এ পথে এসে সমস্ত প্রকার বহিঃ ও অন্তরঙ্গ যোগে পারদর্শী হয়েও কিন্তু শুধুমাত্র বড় বড় যোগ ব্যায়ামবিদ্ ও প্রাণায়ামবিদ্ এ পর্য্যবসিত হয়েছেন। যোগী হওয়া তাঁদের আর হয়ে ওঠেনি শুধুমাত্র এই সংসার বাসনার জন্যই। কারণ এই কাজ দেখিয়ে ও মানুষকে শিখিয়ে, এর ব্যাপক প্রচার করে, তাঁরা যশ, খ্যাতি, সবই পেয়ে তাঁদের সংসার বাসনাই বহুগুণ প্রসারিত হয়েছে মাত্র। কারণ সকাম নিষ্কাম, সগুণ নির্গুণ, এরা দুটো বীপরিত মেরুতে থাকে। তাই আবারও সাবধান করি সংসারবাসনা বিনষ্ট না হলে কারও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ঈশ্বর দর্শনও হয় না। মনের বিষয়গ্রহণ স্পৃহাই সংসার বাসনা বা অজ্ঞান। বিষয় স্পৃহা থেকে মন চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, তখন আর ঈশ্বরস্মরণ হবে কি করে? মহাত্মা কবীর দাসজী বলেছেন ---

“মালা তো করমে ফিরে, জিহ্বা ফিরে মুখমাহি।
মনুয়া চৌদিশ ফিরে, য়হ তো স্মরণ নাহি ॥ ”

তাই এই বিষয় গ্রহণ স্পৃহা নষ্ট করিয়ে মনকে স্থির করা এবং নিরুদ্ধ অর্থাৎ ভিতরে মনকে আটকে দিতে হলে আগে প্রাণকে আটকাও, প্রাণ আটকাতে পারলে মনও আটকাবে। বেদে যা গানের আকারে আছে তাও ভেবে দেখার মত “নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাংসি”। বায়ুরূপে প্রাণশক্তির তরঙ্গই দেহ ও মনকে সঞ্জীবিত রাখে। ঐ প্রাণশক্তিকেই কুলকুন্ডলিনী বলা হয় যে শক্তি পায়ের আঙ্গুল থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেরুমধ্য থেকে এর শক্তি উদ্ভূত হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক গুহ্যদেশের (pirreneum) নিচ থেকে উঠে ভ্রূমন্ডলকে বেষ্টন করে ডানে বামে সব জোড়া (joint) গুলোকে স্পর্শ করে আবার সেই মূলাধারে গিয়ে মিশে যায়। ঠিক ধনুকের (গান্ডীব) আকৃতি। প্রাণের

সমস্ত শক্তি সম্মিলিতভাবে এই স্থানে প্রসুপ্ত আছেন। এটাই বাহ্য বায়ুকে স্পন্দিত করে থাকে যার ফলে প্রাণ আপান ইত্যাদি ৪৯ রকমভাবে বায়ু ক্রিয়াশীল হয় এবং মনের মধ্যে বিবিধ ইচ্ছাশক্তির স্ফূরণ ঘটায়। কুন্ডলিনীই প্রাণবায়ুকে উপরে তুলে আপান বায়ুকে নিচে নামিয়ে অবিরাম শ্বাস প্রশ্বাস করিয়ে যাচ্ছে তাতেই আমাদের জীবনপ্রবাহ উপর ও নীচমুখে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত অনুভব ও জ্ঞানের মূল এটাই। এই শক্তি হৃদয়ে স্থিতিলাভ করলেই তার নাম, মানে ঐ স্থিতিপদের নাম, “হংস”। যখন ভ্রূমধ্যে যায় ও বিন্দুরূপ দেখায় তার প্রকাশই আদিরূপ বা কূটস্থ। কিন্তু ব্রহ্ম যিনি তিনি “রূপাতীতং নিরঞ্জনং”, প্রাণায়ামাদি যোগ সাধনার দ্বারা যে পরমা স্থিতি লাভ হয় সেটাই এই রূপাতীত নিরঞ্জন। যাই হোক আবার সেই প্রাণের কথায় আসি। এই প্রাণ যখন অজস্র নাড়ীর ভিতরে এসে শরীরসঞ্চারী হয় তখনই ইন্দ্রিয়েরা বাইরে ছুটে যায়। সুখ দঃখ বোধ ও নানা রকম মনোবৃত্তি তৈরী হয় এবং শ্বাসপ্রবাহ চলতে থাকে। এটাই আমাদের মৃত্যুপথ বা সংসারপথ। যখন জানা গেল যে এটাই মৃত্যুপথ তবে এর থেকে মুক্তির পথ কি ? ভগবান বলেছেন মুক্তি হবে ঐ অবিদ্যারূপী শ্বাসের সাহায্যেই যার পীঠস্থান মেরুমধ্যগত সুষুম্না নাড়ী। প্রাণবায়ু যখন সুষুম্নায় প্রবেশ করে তখনই প্রকৃত বিদ্যার উপাসনা হয়। এভাবেই প্রাণায়াম দ্বারা কৌশল করে বাইরের শ্বাসকে নিগ্রহ করে সুষুম্নায় নিয়ে যেতে না পারলে স্থির হয়না। বাহ্য প্রাণের নিগ্রহ ছাড়া স্থির প্রাণ বা মুখ্য প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। একাজ করেই প্রাণ ক্ষীণ হলে তা থেকে মনের লয় হলেই যে সমরস ভাবের অবস্থা হয় সেটাই হল সমাধি। তখনই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হয় সেসব অনেক ভিতরের কথা। আসল কথা শ্বাস জয় না হলে মন স্থির হয়না। শ্বাসজয় প্রাণায়াম ছাড়া হয়না। তাই আবার প্রাণায়ামে ফিরে আসি। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য প্রাণবায়ুর নিরোধ, শ্বাস প্রশ্বাসের গতিচ্ছেদই প্রাণায়াম। শ্বাস বেরিয়ে আর ভিতরে যাবেনা, ভিতরে গিয়ে আর বের হবেনা, এই কুম্ভকের অবস্থাই হবন ক্রিয়া। এটাই হোম, এমন হোমের কথাই পরের শ্লোকে পরিমিতাহারী হয়ে করতে বলা হয়েছে। আপানবায়ুকে মূলাধার থেকে মস্তক পর্য্যন্ত আকর্ষণ ও প্রাণবায়ুকে মূলাধার পর্য্যন্ত বিসর্জন রূপ ক্রিয়া করতে করতে প্রাণ ও আপান একসাথে মাথায় চড়ে স্থির হয়ে যায়। অর্থাৎ পূরক ও রেচক দ্বারা বার বার টানা ফেলা করতে করতে এই উভয় বায়ুর গতি একসময় রুদ্ধ হয়ে যায়। চন্দ্র ও সুর্য্য নাড়ী একসাথে হলে সুষুম্নাও যুক্ত হয় কারণ গতি রুদ্ধ থাকে। এইভাবে তিনে এক হয়ে মহাতীর্থ প্রয়াগে পরিণত হয়। আবার আপান বাইরে থেকে এসে নাকের ভিতর দশ কি বারো আঙুল ভিতরে ঢোকে এবং প্রাণ নাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে দশ কি বারো আঙুল পর্য্যন্ত এসেই বাইরে মিশে যায়। এরপর যখন আপান বায়ু বাইরে থেকে ভিতরে গিয়ে স্থির হয় তখনই সে প্রাণবায়ুকে গ্রাস করে এবং এই অবস্থাটা যতক্ষণ থাকে ততটুকু সময়ই শরীর নামক ব্রহ্মান্ডে সূর্য্যগ্রহণ হয়। অপরপক্ষে, প্রাণবায়ু যখন ভিতর থেকেই আপানবায়ুকে গ্রাস করে বসে, ফলে আপানবায়ুর বাইরে আসা রহিত হয়ে যায়, তখনই হয় চন্দ্রগ্রহণ। ইড়ার সাথে

পিঙ্গলা ও পিঙ্গলার সাথে ইড়ার মিলনেই এমনটা ঘটে। এই উভয় প্রকার গ্রহণই হয় কুম্ভক অবস্থার ফলে। প্রাণায়ামকালীন এভাবেই প্রাণ ও আপান বায়ু নিরুদ্ধ হয়ে কুম্ভক হয়। এসবই অন্যকুম্ভক। বাইরের পার্থিব জগতের গ্রহণে যখন চাঁদ বা সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখি তখন কোনও জ্যোতির প্রকাশ থাকেনা। শরীর অভ্যন্তরে এরূপ প্রণায়ামে পূর্ণগ্রাস হলে পৃথক কোনও বস্তু বা কোনও বিষয়েরই প্রতীতি থাকেনা। এক অখণ্ড আনন্দময় চেতনা এসে সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। এটাই সমাধি এবং এই স্তরের সাধকই সাধনার এই স্তরে থেকে কৈবল্যপদ লাভ করেন। যাহোক, সাহস করে অনেক কিছু লিখে ফেললাম। শ্রীভগবানের কথার ব্যাখ্যা একমাত্র শ্রীভগবানই করতে পারেন, অপরে নয়। উপরে বিবৃত ব্যাখ্যার পক্ষে অপরিমেয় শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দেবার আছে, তাতে কলেবর বৃদ্ধিই সার হবে। অনেকে বলেছেন কেবল বা কেবলী কুম্ভক শুধু চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারাই হয়ে থাকে, এতে বায়ু ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের দরকার নেই। কিন্তু এটা ভুল। পূরক রেচকের সাহায্য ছাড়াই সহজে প্রাণবায়ুর নিরোধ করা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণসংযম না হলে হবেই না। যাইহোক শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডের জোয়ার ভাঁটা, পূর্ণগ্রাসে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ সকলই সেই কুম্ভকের অবস্থা বিশেষ, যেখানে আলো আঁধার সবই একাকার হয়ে মিশে যায়। শূন্যে শূন্য মিলায়। এও একপ্রকার উচ্চস্তরীয় মৈথুন। এ মৈথুনে অব্যক্ত আনন্দ অপরিসীম। তাই অষ্টাঙ্গযোগ ও অষ্টাঙ্গমৈথুন সবই একাকার হয়ে যায়, কোনও কিছুর সাথে তফাৎ হয়না। এ মৈথুনেই হয় অমাবস্যায় চাঁদের উদয়, যা একমাত্র যোগী বাদে অপরে জানেনা। যোগমহিমা অপরিসীম, অপরিমেয় ও অব্যক্ত। সংক্ষেপে এটুকুই বলি যে কুন্ডলিনীই জীবের জীবনীশক্তি। প্রাণাপানের গতিরোধ হলে তবেই প্রকৃত স্বরূপ চিৎশক্তির স্ফূরণ হয়। তখনই জীবের মোহনাশ ও সত্য জ্ঞানের উদয় হয়। এই শক্তিই অক্ষয়প্রভাবা বিষ্ণুর পরমাশক্তি। নিখিল বিশ্বের মূলবীজস্বরূপা, মহামায়া। চন্ডীতে আছে –

"ত্বংবৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরামাসি মায়া।
সংমোহিতম্ দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবিমুক্তিহেতুঃ॥"

তাই প্রাণায়াম সাধনকালে সাধক এ শক্তির প্রতি প্রণতা হন। কি ভাবে ? সেটা সদ্‌গুরু ঠিক সময় ব্যাবহারিক ভাবে বুঝিয়ে দেবেন। ১৪৪ ী ১২ = ১৭২৮ বার প্রাণায়াম ধ্যান করতে পারলেই ওঁ কার স্বরূপটা এই শরীরে লয় হয়ে যায়। এভাবেই প্রণতা হতে হয় –

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণী, ত্রৈলক্যবাসীনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥" এই ভাবে প্রণতা হলেই সকল প্রকার নাদশ্রবণেও দড় হয়ে যাবেন। জয়গুরু। অলমতি বিস্তরেণ। ৪/২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ।। ৩০

অনুবাদ : (আবার) অপর কেহ কেহ পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন (গুরুপদিষ্ট ওঁ কার ক্রিয়া করেন) এবং (এইরূপ) যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন॥ ৪/৩০

ব্যাখ্যা : নিয়তাহার অর্থাৎ পরিমিত ও সংযত আহার, বিহার সকল রকম যজ্ঞ সাধনার প্রথম উপায়। তাতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি। সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ॥" একারণ সকল যজ্ঞেরই প্রথম উপাদান হল নিয়তাহার। এমনতর নিয়তাহারীগণই পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত প্রাণযজ্ঞের অধিকারী। একমাত্র তাঁরাই প্রাণবায়ু সকলকে পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত উপায়ে প্রাণবায়ুতে হোম করে থাকেন উক্ত বিশেষ প্রক্রিয়ায়। আগের আগের শ্লোক গুলোতে মোট যে বারো রকম যজ্ঞের কথা বলা হল এসমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাগণ সবাই যজ্ঞবিদ বা যজ্ঞজ্ঞ। তাই তাঁরা এসমস্ত যজ্ঞ করে ক্ষয়িতকল্মষ অর্থাৎ সকল কর্ম্ম ক্ষয় করে পাপশূন্য হন, কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন, যজ্ঞের অবশিষ্টভাগরূপ অমৃত ভোজন করে সনাতন ব্রহ্মকে পেয়ে থাকেন। মহা অণুগীতায় আছে পরব্রহ্ম এ যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ স্তোত্র, অপান মন্ত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এর হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এবং সর্ব্বত্যাগ হল এর দক্ষিণা। আসল কথা হল যে সব ক্রিয়ারূপ যজ্ঞের কথা বলা হল ঐ সব ক্রিয়ার অতীত অবস্থাই হল যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত। যিনি এ অবস্থা পান তিনি ইচ্ছারহিত অবস্থা পেয়ে নিষ্পাপ হন। ৪/৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ।। ৩১

অনুবাদ : যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভেজনকারী এই সকল যজ্ঞজ্ঞগণ সনাতন ব্রহ্মলাভ করেন। (কিন্তু) হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞানুষ্ঠানহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকও নাই, পরলোক তো নাইই। ৪/৩১

ব্যাখ্যা: তাহলে বুঝলাম যে যজ্ঞ হল ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান আর যজ্ঞাবশিষ্ঠ অমৃত হল ক্রিয়ার পর অবস্থাপ্রাপ্তি, যে অবস্থা ঘনীভূত হলে সনাতন ব্রহ্মকে পাওয়া যায় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। ভগবান আগের শ্লোকে যারা ক্রিয়া করে তাদের যজ্ঞফল যে পরাশান্তি তার কথা বললেন, আর যাঁরা এসব করেনা তাঁদের অবস্থাটা কি তাই বলছেন এই শ্লোকে 'কুরু' অর্থ ক্রিয়া, আর শ্রেষ্ঠ অর্থ হল 'উত্তম' মানে যে ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হয়। সেই ক্রিয়ার কর্ত্তাই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ মানে কৃতকৃত্য ক্রিয়াবান। এখানে অবশ্য ভগবান অর্জুনকেই কুরুশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করলেন। কারণ অর্জুন হলেন শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব এবং এই তেজস্তত্ত্বের দ্বরাই প্রাণবায়ুর কাজটা ঠিক ঠিক মত সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই ভগবান এমনতর সম্বোধন করে বলছেন যাঁরা এই প্রাণ ক্রিয়াদি করেন না তাঁরা আত্মজ্যোতির সন্ধান পান না কারণ মন প্রাণ তাদের সদা চঞ্চল থাকায় 'সু'ও 'কু' এর বোধ হয় না। মন, প্রাণ স্থির না হলে শরীরও ভাল থাকবে না। উটকো চিন্তায়ই জীবন কাটে। আর সর্বদা "টাকা" "টাকা" করেই বেশিরভাগ লোকই একটা শঠতা, ছলনা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ জীবনযাপন করে থাকে। এরা মুখে অনেক

সুন্দর সুন্দর ও মহৎ কথা বললেও কাউকে ভালবাসা এদের পক্ষে সম্ভব হয়না, যেহেতু এঁরা নিজেকেই ভাল বাসেন না। তাই এঁদের সবকিছুই সোনার পিতলে ঘুঘু মাত্র। এঁরাই প্রকৃত দুঃখী। কারণ এঁদের ইহলোকই নেই, মানে বর্তমান (নরাধম) অবস্থারূপে নরলোকও তাঁদের স্থায়ী নয় যেহেতু তাঁরা অধোরূপ তমোগুণেই ধাবিত বলে পশুভাবই আশ্রয় করেন সেজন্য ইহলোকের অধোদেশেই নিপাতিত বলে ইহলোকই তাঁদের নেই। আর ইহলোকের অতীত যে পরলোক তার তো কোনও কথাই ওঠেনা কারণ তাদের দুঃখের মূলটাই উৎপাটিত হয়না। সুতরাং এই দেহে থেকেই সুখ শান্তির সন্ধান পেলেন না যাঁরা তাঁরা আর দেহাতীত কৈবল্য পদ কি করে পাবেন ? তাঁদের অবস্থাটা হল অনেকটা "খাও দাও ওড়াও কম্বল। পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় ঘোড়ার ডিম সম্বল ॥" ৪/৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ।।৩২

অনুবাদ : ব্রহ্মজ্ঞের মুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে। সেই সকলকে কর্ম্মজ জানিও; এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ৪/৩২

ব্যাখ্যা : আগের আগের শ্লোকগুলোতে (২৬ এবং ২৭ নং) যেমন যেমন বলা আছে সেই সব রকম বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুগণের মুখে। অর্থাৎ এটা হল গুরুমুখী বিদ্যা যা বই পুস্তক পড়ে হবার নয়। লেখারও বিষয় নয়, যোগতত্ত্ব তো আর লিখে প্রকাশ সম্ভব নয়। যা কিছু লেখা তা কেবল আকার ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ মাত্র। যদি পাঠ্য বিষয়ই হত তবে তো শ্রীভগবান বলতেন যে এরূপ বহুবিধ যজ্ঞ শুধুমাত্র শাস্ত্রাদিতে বিহিত আছে। " ব্রহ্মণো মুখে " বলতেন না নিশ্চয়ই, আর ঐ সকল "কর্ম্মজ জানিও", অর্থাৎ আত্মকর্ম্মের অন্তর্গত জানবে। মানে কাজ করে সেই অনুভব পেতে হবে। সহবাস না করে যেমন রমন সুখের উপলব্ধি হয় না, সন্তানও জন্মে না, তেমনই আত্মায় উপরতি না হলে আত্মবোধও জন্মায় না । তাই একে কর্ম্মজ বলে জানবে। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে এই সাধনক্রিয়ার উপদেশ পেয়ে তার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলে বহুবিধ উচ্চাবস্থা লাভ হয়। এই তত্ত্ব জানাটাই জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া। এভাবে জ্ঞাননিষ্ঠ হয়ে আত্মজ্ঞানে নিঃশেষ রূপে স্থিতি হলে তবেই সেই কর্ম্মের অতীত অবস্থারূপ'ওঁখং' ব্রহ্মে স্থিতি পাওয়া যাবে। আর একটু সহজ করে বলতে হয় যে নিষ্ক্রিয় পদ কর্ম্মের অতীত হলেও ক্রিয়াদ্বারাই এই ক্রিয়ারহিত পদের সন্ধান পাওয়া যায়। ৪/৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।। ৩৩

অনুবাদ : হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মব্যাপারহীন দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু হে পার্থ, জ্ঞানেতেই সমুদায় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। ৪/৩৩

ব্যাখ্য : পরন্তপ বলে ভগবান অর্জুন কে সম্বোধন করেছেন যার অর্থ হল (পরান্ শত্রুন্ তাপয়তি) ইন্দ্রিয়রূপ পরাশত্রুকে যিনি দমন করেন যা উৎকৃষ্ট সাধকের প্রথম বৈশিষ্ট্য। তিনি সর্বদাই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ তাই প্রবৃত্তিকে পরাভূত করে নিবৃত্তি মার্গের অধিকারী হতে পারেন। যেহেতু নিবৃত্তিমার্গের পথিকেরই যজ্ঞে অধিকার হয়। এবার বলছেন দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যদান কর্ম্মের সাথে আত্মকর্ম্মের সংযোগ নেই। মানে নিরন্নকে অন্নদান, দুস্থকে বস্ত্রদান ইত্যাদি খুবই ভাল কাজ সন্দেহ নেই কিন্তু এসব কাজের সাথে আত্মকর্ম্মের কোনও যোগ নেই তাই এমন দৈবযজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। যদিও জ্ঞানযজ্ঞও মনোব্যাপারের অধীন থাকে তবুও অধ্যাবসায় দ্বারা আপনাকে (নিজেকে) জেনে আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ার জন্য মনরূপ পরিণাম হলে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। নইলে আত্মস্বরূপ জ্ঞান মন হতে উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটাই যে সমস্ত ফলসংযুক্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। যেমন শিশুদের পরীক্ষায় পাশ করার ফলাকাঙ্খা থেকে পরিণামে কিছু পুস্তকীয় পাঠাভ্যাসের দ্বারায় জ্ঞানলাভ করানো হয়ে থাকে অনেকটা সেরকম আর কি। এই জ্ঞানযজ্ঞে ফলাকাঙ্খা থাকতে কিছু হয়না সত্যি তবে জ্ঞানলাভ না হলে তো আর আকাঙ্খার বিদায় হবে না তাই দ্রব্যযজ্ঞ বা দৈবযজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু জ্ঞানলাভ হলে তবেই স্থিরাবস্থায় যেতে ইচ্ছুক হয়। আর সেই ইচ্ছা থেকেই প্রাণকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীত অবস্থায় মনের স্থিতি হয়ে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটলে তখন আর উর্দ্ধ অধো গতিরূপ চঞ্চলতা থাকেনা। নিজে থেকেই প্রাণ স্থির হয়ে কর্ম্মের পরিসমাপ্তিরূপ অবস্থা আসে। ৪/৩৩

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।। ৩৪

অনুবাদ: প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ কর; জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন। ৪/৩৪

ব্যাখ্য: জ্ঞানলাভের সনাতন কৌশলই হল প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। কিন্তু কাকে ? কাকে প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এসব করবে ? এক কথায় শ্রীগুরুদেবকে কারণ তিনিই হলেন একমাত্র তত্ত্বদর্শী। শিষ্যের ধীশক্তি কতখানি, শিষ্যের শরীরের ধাতু কি ? এ সকল বিষয়ের এবং মানসিক গভীরতা আদি তিনিই একমাত্র পরিমাপ করতে সক্ষম। তাই শিষ্যের নিকট তিনিই সেই এক ও আদি গুরু। বেদে আছে "তদ্বিজ্ঞানার্থ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ৎ ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

এই গুরু হন শাস্ত্র পারদর্শী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। এমন গুরুর কাছে তত্ত্বজ্ঞান পেতে হলে গুরুকে দীর্ঘ দন্ডবৎ প্রণিপাত করতে হবে অর্থাৎ তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর দাসানুদাস হতে হবে এবং নিজের প্রপন্ন অবস্থা জানাতে হবে। বিনয়পূর্বক বার বার নিবেদন করতে হবে, হে কৃপালু গুরু, কৃপা করে বলুন কি ভাবে ভবসিন্ধু পার হব, আমাকে সেই উপদেশ দিন। শুধু প্রার্থনাই নয়, জিজ্ঞাসাও করবেন আমিই বা কে ? কিভাবেই বা এসে এ দেহ বন্ধনে পড়লাম ? এ থেকে মুক্তিই বা কিভাবে হতে পারে ? শুধু প্রশ্ন করলেই হবেনা, প্রাণ ঢেলে গুরুর সেবা করা চাই। সে সেবা, সে আত্মত্যাগই বা কি অদ্ভুত; সে গুরুর প্রতি প্রাণের আকর্ষণই বা কি চমৎকার ! তবেই তো শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হবেন। গুরুর জন্য সমর্পিত প্রাণ শিষ্য গুরুর জন্য আত্মত্যাগে ধন্য হয়ে যায়। উপনিষদের ঋষিগণ গৌতম, ধৌম্য, উপমন্যু, আরুণি সকলেই এমন শিষ্যত্বের উজ্বল নিদর্শন। গুরুও তেমনটিই হন। তিনি শিষ্যকে যতখানি বুঝতে পারেন শিষ্য নিজেও নিজেকে তার কিয়দংশও বোঝে না। তবেই তো তিনি গুরু। তবে আসল কথা ভববন্ধন বোধ। শিষ্য ভববন্ধনে প্রকৃতপক্ষে কতখানি কাতর এটাই আসল কথা। প্রাণের জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে না উঠলে শিষ্য হওয়াই বৃথা। যদি ঈশ্বরই জীবনের সর্ব্বস্ববোধ না হয়, তাঁকে পাওয়ার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে কিছুমাত্র সংকোচ থাকে, নিজের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুর চরণে প্রদান করে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতে না পার, তবে বুঝবে এখনও তোমার সময় হয়নি। শুধুমাত্র উগ্র কৌতুহল বশতঃ, অথবা কারও পরামর্শে অথবা সাময়িক শান্তিলাভ বা কোনওরূপ পার্থিব প্রাপ্তিযোগের জন্য বা নিছক সংস্কার বশতঃ উপদেশ গ্রহন শিষ্য ও গুরু উভয়ের পক্ষেই বিড়ম্বনা মাত্র। সদ্‌গুরুর মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। কারণ প্রকৃত সদ্‌গুরুর সময়ের অভাবই সবচেয়ে বেশী। তাঁর কাজই সাধন ভজন। বেশীর ভাগ সময়ই তাঁকে সাধনে রত থাকতে হয়। শিষ্যসংখ্যা বাড়লে বিপদ। কারণ শিষ্যকে সময় দিতে গেলে তাঁর নিজের সময় যে কমে যায়। তাই প্রকৃত সদ্‌গুরুগণও নিজেকে গোপন রাখতেই তৎপর হন। আবার প্রকৃত ভবরোগীকে উপদেশ করাও তো তাঁরই অবশ্যকর্তব্য। তাই তিনি শিষ্যকে কিছুদিন পর্য্যবেক্ষন করে বুঝবেন তাঁর ভবরোগ কতখানি। প্রকৃত ভবরোগীকে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করেন। শিষ্য গৃহী হলে অবশ্যই গৃহী গুরু তাঁর উপযুক্ত, অন্যথায় শিষ্য সন্ন্যাসী হলে সন্ন্যাসী গুরুর সেবাই করণীয়। গুরুর পর্য্যবেক্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি শিষ্য নির্বাচন করে থাকেন। নইলে বিপরীত ভাব নিয়ে কাজ করলে কিছুই হয়না। শিষ্য নির্বাচনে আরও কিছু বিষয় ও নিয়ম আছে সেসব আর বললাম না। অনেককেই মিষ্টিকথায় বুঝিয়ে বিদায় করতে হয়। সময় না হলে তো হয় না। সময় মানে প্রাণের ব্যাকুলতা। তাছাড়া সাধন পথে তো প্রাণের ব্যাকুলতাই একমাত্র মূলধন নইলে প্রণিপাত, সেবা, জিজ্ঞাসা কিছুই অন্তর থেকে হয় না। শুধুমাত্র লোকায়ত বিষয় বুদ্ধির ব্যাপারে পর্য্যবসিত হয় এবং বিপরীত অবস্থা হয়। ৪/৩৪

যজ্‌ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ।। ৩৫

অনুবাদ : হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান অবগত হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্বারা আত্মাতে ও অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দর্শন করিবে। ৪/৩৫

ব্যাখ্যা : সার্দ্ধ তিনটি শ্লোকে ভগবান এই জ্ঞানফলের কথা বলেছেন। জ্ঞান হলে কি হয় ? হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান পেয়ে অর্থাৎ আগের আগের শ্লোকগুলোতে, বিশেষতঃ এই অধ্যায়ের ২৯ নং শ্লোকে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, সেই বোধশক্তি জাগ্রত হলে আর তোমার ভিতর মোহ এত বেশী মাত্রায় ফলবতী হবেনা। এই জ্ঞান দ্বারাই তোমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়ে তুমি আলোকিত হবে তখন প্রথমে নিজের পিতা পুত্র সকলকেই স্বকীয় আত্মাতেই দেখতে পাবে। পরে অভ্যাসের দ্বারা আরও বেশীমাত্রায় প্রাণস্থির হলে নিজের আত্মাকেই পরমাত্মায় (কৃষ্ণে) দর্শন হবে। আসলে আত্মদর্শন হলেই জগৎ দর্শন হয়ে যায়। তাই যোগীর তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না। জগৎ প্রপঞ্চের দ্বারা যে অনুভবের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যা থেকে সব কিছুকেই আলাদা আলাদা বোধ হয় সেসব আর থাকেনা। মেলাতে বা দোকানে যে চিনির পুতুল রাজা, পুতুল রাণী, হরিণ, বাঘ, পাখী ইত্যাদি এ সবই যে আসলে চিনিই এ বোধ জন্মালে দেবতা থেকে জীবাণু পর্য্যন্ত সবই আত্মস্বরূপে বোধ হয়ে থাকে। তাই তখন তুমিও সেই পরমাত্মা থেকে নিজেকে আর আলাদা বোধ করবে না। এক অদ্ভুত অভিন্নতার বোধ এসে অনুভবে ঢোকে। এই বিরাট জায়গায় বিরাট অনুভবে পৌঁছেই অভিন্নতা বোধ থেকে সকলের মধ্যে নিজেকেই দেখে সকলের সেবায় মানুষ নিজেকে নিয়োগ করে ফেলে। সুদূর অতীত থেকে আজও সেই পরম্পরা (tradition) সমানে চলেছে লালবাবারা আজও তীর্থযাত্রীদের সেবা করেন। ভোলানন্দগিরি, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, শঙ্করাচার্য্য, স্বামী প্রণবানন্দ, নিগমানন্দ সরস্বতী, শিবানন্দ সরস্বতী সকলেই শিষ্যসমভিব্যাহারে মানব সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন যার উৎস ছিল সেই অভিন্ন আত্মবোধ। শিষ্যগণের সাধনা পন্ড হয় কারণ তাঁরা ওনার দেখাদেখি বা আদেশে এসমস্ত কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেন, শুধুমাত্র আজ্ঞাপালনের জন্য, নিজের বোধ থেকে নয়। এজন্যই সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো তৎপরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃই সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে থাকে। যাক সে অন্য কথা। জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানের প্রথমেই বোধ হয় কূটস্থের, যে কূটস্থর রূপে এ বিশ্ব ভরে আছে। তার পরের স্তরে আর বহু চন্দ্র দর্শন হয় না, নিজের দেহে অভিমান হেতু যে পৃথকত্ব বোধ, সেটা না থাকায় সব কূটস্থই সেই এক অসীম আত্মজ্যোতি বা চিদাকাশে এসে মিশে যায়। এর বেশী আর বলা যাচ্ছে না। ৪/৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।। ৩৬

অনুবাদ : যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমুদায় পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ৪/৩৬

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবান নিজে বলছেন যে অতি বড় পাপী হলেও সে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ভগদ্বাক্য তো বৃথা হতে পারেনা। অর্থ হল তুমি যদি ইচ্ছার দাসত্ব ও তমঃ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হতে পার তবেই তো তুমি পাপের চক্কর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে। কারণ যত পাপ সবই আগে মনে আসে, তা থেকেই ইচ্ছার উদয় হয়। আর ইচ্ছেটা পূর্ণ করি,সেই সদ্সদ্ বিবেচনা বোধ হারিয়ে। যদিও সাধনায় নিজেকে সঁপে দিতে পারলে আর কোনও কথাই নেই। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে যে সাধনার আগে থেকেই যে পাপ কাজে আসক্ত তার কি গতি হবে ? তারই উত্তর ভগবান দিচ্ছেন যে যদি কেউ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অর্থাৎ সাধনা করতে করতে মনকে নিশ্চল করতে পারে, তখন সেই নিশ্চল ভাব তাকে অন্য জগতে নিয়ে যায় যেখানে দেহ বোধ আছে, সুখ দূঃখাদি দ্বারা বিচলিতও হয়, পাপ, পূণ্য, স্বর্গ, নরক সবই আছে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও, সেখানে মন অর্ন্তমূখী হয়ে দেহ সম্বন্ধের অতীত হয়ে যায়। ফলে সেই মনে আর পাপ পূণ্যের জায়গা নেই তাই আর তাকে পাপ পুণ্যের ফলভোগও করতে হয়না। প্রাণবায়ু সুষুম্নায় প্রবেশ করলেই মনও তখন শুধুমাত্র আজ্ঞাচক্রে স্থির হয়। ব্যস্ আর কোনও পাপপুণ্য তাকে ছুঁতে পারে না। সুতরাং অতিবড় পাপীও যদি সাধনা করে এমন একটা অবস্থা পেয়ে যান তবে পাপই বা কি ? আর পূণ্যই বা কি ? সে সব কিছুরই অতীত হয়ে যায়। তাই তো ভগবান বলেছেন যখন দেহ ও ইন্দ্রিয়তে মন আসাই পাপ, তখন যে মন সাধন দ্বারা আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করতে পারে, তার আর পাপ পুণ্য থাকেনা, সে সর্ব্বাতীত হয়। কথায় বলে, "অজ্ঞানে করে পাপ জ্ঞান হলে সারে।" মানে জ্ঞান হলেই আর কর্ম্ম থাকল না। তখনই প্রকৃতির থেকে নিস্কৃতি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও একথাই বলা আছে। "কষ্ট করলেই কেষ্ট মিলে" সাধনা করে আত্মস্বরূপে স্থিত হতে পারলে আর কোনও পাপ পুণ্যই তাকে আটকাতে পারেনা। সুতরাং পাপীও বেশ সুন্দরভাবে প্রকৃতির বেড়া টপকে যেতে পারে এই জ্ঞানের সাহায্যে। এটাই তো ব্রহ্মপদ। কিভাবে জ্ঞানাগ্নি সকল সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম ভস্ম করে দেয় সে সমস্ত পরবর্তী শ্লোকে আছে ॥ ৪/৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ।। ৩৭

অনুবাদ : হে অর্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে।৪/৩৭

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হল যে পাপ কর্ম্ম করা সত্ত্বেও জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির বেড়া টপকানো যেতে পারে। মানে সাধনলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পূর্বকৃত পাপের সমুদ্র পার হতে পারে কিন্তু আগের করে আসা পাপের তাতে নাশ হয় কি ? উত্তরে শ্রীভগবান স্পষ্ট করেছেন যে হ্যাঁ, হয়। কাঠকে আগুন যেমন পুড়িয়ে ফেলে, ভগবান বলেছেন, তেমনিভাবেই আত্মজ্ঞানরূপ আগুন শুধুমাত্র প্রারব্ধ বাদে অন্য সব কর্ম্মকেই পুড়িয়ে ফেলে মানে নাশ করে। প্রারব্ধ বাদে কেন ? একটু খুলে বলি -

(১) সঞ্চিত কর্ম্ম। যে কর্ম্ম জ্ঞান লাভের আগে মানে অনেক অনেক আগে থেকে করা হয়ে আছে এবং সেই সাথে যে সব কর্ম্ম জ্ঞানলাভকালীনও করা হয়েছে।

(২) ক্রিয়মান কর্ম্ম। যেসকল কর্ম্ম এখন করা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে, কারণ কর্ম্ম ছাড়া কেউই নয়।

(৩) প্রারব্ধ কর্ম্ম। আগের করা যেসব কাজের ফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে এবং যেগুলো ঠিক ফল ফলবার মুখেই আছে। যার ফল এই শরীর এবং এ শরীর ধারণের ফলে যা ঘটবে সে সমস্তই প্রারব্ধ কর্ম্মের অন্তর্গত।

যাহোক, কর্ম্মের রকমফেরটা তো অন্ততঃ বোঝা গেল। এবার বলি যে জ্ঞানলাভের পর থেকে আগের বলা (১) ও (২) নং কর্ম্ম অর্থাৎ ঐ সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান কর্ম্ম সবই নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্ত কর্ম্ম আর জ্ঞানীর থাকেনা। কিন্তু ঐ (৩) নং কর্ম্ম মানে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল জ্ঞানীকেও ভোগ করতে হয়, এথেকে কারোরই রেহাই নেই, এমনকি অতি বড় মহাপুরুষেরও। তবে হ্যাঁ, জ্ঞানীর কর্ম্মফলে স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য জ্ঞানীকে কর্ম্মফলভোগ কখনওই অভিভূত করতে পারে না। আর ঐ সকল ভোগ থেকে নতুন করে আর কর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হয় না, কারণ ঐ বীজ আর সক্রিয় থাকে না, অনেকটা ভাজা বীজের মত যা আর অঙ্কুর বের করতে পারেনা। কারণ কর্ম্মাশয়টাই অকেজো হয়ে যায়। লিঙ্গ শরীরে এটা তখনও থাকে কিন্তু এর কোনও কার্য্যকারিতা থাকেনা, ফলে সব কাজ করলেও তখন আর সেসব কর্ম্মেও কোনও ফল উৎপাদন হয় না। আশা করি বুঝেছেন। এবার প্রশ্ন করুন কর্ম্মাশয়টা কি ? জীববিজ্ঞানে পিত্তাশয়, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি তো পড়েছি, কিন্তু কর্ম্মাশয় তো পাইনি। না, পাননি ঠিকই। তবে এখন বুঝে নিন, যদি যোগাভ্যাস ইতিমধ্যে শুরু করে থাকেন, কর্ম্মাশয় হল জীবের হৃদয়গ্রন্থি। যোগীরা ভয় পাবেন না, হৃদয়গ্রন্থি আপনার বিকল হওয়া সহজ নয়। এর জন্য অনেক সাধনার দরকার। হৃদয়গ্রন্থিই আত্মার অজ্ঞানতার অপর নাম। দেহ এবং আত্মাকে একই বোধ করার নামই অজ্ঞান। তাই এই দেহকে ভূলতে না পারলে আত্মা স্বরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে এসে পৌঁছোয় না। যাতে দেহকে ভোলা যায় আর আত্মাকে চেনা যায় ও তাতে স্থিতি লাভ করা যায়, তারই জন্য সব রকম

চেষ্টা করতে হয়। সেই চেষ্টাই এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদের চেষ্টা । “ভিদ্যতে হৃদগ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ” সর্বসংশয় নাশের সাথে সাথেই সব পাপ নষ্ট হয়। সংশয়ই পাপ। জ্ঞানই পাপ নাশ করে। ৪/৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।। ৩৮

অনুবাদ : ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছু নাই। কর্ম্মযোগদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতেই স্বয়ং লাভ করেন। [ন তু কর্ম্মযোগং বিনা; কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত নহে।] ৪/৩৮

ব্যাখ্যা: সত্যই জগতে আত্মজ্ঞানের মত পবিত্র, বিশুদ্ধ আর কিছুই নেই। নিজেকে জানাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বেদেও তাইই বলা হয়েছে “আত্মানং বিদ্ধি ” (know thyself)। যতই জপ তপ, যাগ যজ্ঞ, হোম, পূজাপাঠ যাই করুননা কেন, এই জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধকর আর কিছুই নেই। আপনারা ভাবছেন কিন্তু জোরে জিজ্ঞাসা করছেন না যে এতই যখন শুদ্ধিকর, এতই যদি ভাল, তবে আর সব ভাল ভাল বিখ্যাত লোকেরা এটার অভ্যাস করে না কেন ? তাঁরা কেন এসব নিয়ে ব্যাস্ত হন না ? আমি আর কি বলব ? স্বয়ং ভগবান কি বলছেন, শুনুন। দীর্ঘকাল ধরে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে চললে তবেই এর যোগ্যতা তৈরী হয়। তারপর শিষ্যত্বে যোগ্যতা অর্জনের পর হয় সাধন প্রাপ্তি। সেই সাধনা দীর্ঘকাল ধরে করার পর যখন জ্ঞনোদয় হয় তখন তা অনায়াসে, আপনি লাভ করেন। সেটাই আত্মজ্ঞান। কিন্তু কর্ম্মযোগ ছাড়া এসব কিছুই হয়না। তাই যাদের আমরা ভাল লোক বা বিখ্যাত লোক বলি, মানে যাঁদের অনেক টাকা আছে, তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় এবং শক্তি কোনওটাই এসব কর্ম্মের পেছনে নষ্ট করেন না। কারণ “ইসমে নাফা নেহি”। এতে কোনও মুনাফার সুযোগ নেই। পারলে বরং গীতার কিছু শ্লোক আউড়ে অথবা তার নিজের সুবিধা করার মত অপব্যাখ্যা করে যদি মুনাফাটাই কিছু কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে নেওয়া যায় তারই জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বড় বা বিখ্যাত মানুষের নিকট টাকার মূল্য অপরিসীম। সাধারণ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। ভক্তি ও অর্থের মধ্যে তুলনায় অর্থের ওজন ও শক্তি ভক্তির তুলনায় অনেক বেশি, সেজন্যই বড়লোক, ভাল লোক ও বিখ্যাত লোকজনেরা কেউই এসব নিয়ে ভাবেন না। যেহেতু তাঁদের সে সময় নেই। কবীর দাসজী বলেছেন -

“ কাঁহা সো ভক্তি ভেট ?
তিন চিজ্ সে লটপটাতা হ্যায়,
দামড়ি চামড়ি আউর পেট। ”

বড় লোকেরা যখন দামড়ি অর্থাৎ টাকা ও চামরী মানে সেক্স এর পিছনে দৌড়ায় গরীব মানুষের তখন পেটের খিদের জ্বালায় অন্নচিন্তাই চমৎকার হয়। এজন্যই কলিতে জীবের হয়েছে “অন্নগত প্রাণ ও লিঙ্গগত/যোনিগত মন,” ব্রহ্মবাক্য তো মিথ্যা হবার নয়। অবশ্য কিছু ব্যাতিক্রম তো চিরকালই থাকে। যথা গৌতম বুদ্ধ, লালাবাবু ইত্যাদি। এঁরা ধনীগৃহে জন্মেও পরাবিদ্যাচর্চা করেছিলেন, তবে এসব নিতান্তই ব্যাতিক্রম। আর বর্ত্তমানে মধ্য তথা নিম্নবিত্ত শ্রেনীর কথা না হয় বাদই দিলাম, তাঁরা তো সবচেয়ে বেশী বোঝেন, তাই নিজেদের স্ত্রীগণকেও বিজ্ঞাপনের পসরা করে দিয়ে ধন্য হন নিছকই অর্থাগমের জন্য। যাহোক, মূল কথায় ফিরে আসি কর্ম্মযোগ না হলে কিছুই হবেনা। এই কর্ম্মযোগই সব ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান যার দ্বারাই আগের শ্লোকে বর্ণিত কর্ম্মসকলের ক্ষয় হয়ে থাকে। “ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়ে থাকে। এ রহস্য নিজ নিজ সদ্গুরুর নিকট হতে জেনে নেবেন। কর্ম্মের দ্বারা সেই পরাবর (পর অপর, আসল নকল, স্থায়ী অস্থায়ী আদি) দেখে বুঝে নিতে পারলেই সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয়ে যায়। এইভাবে আত্মার মধ্যে ডুবতে ডুবতেই, থাকতে থাকতেই সমস্ত অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ধৈর্য্যই আসল কথা, যা বেশির ভাগেরই থাকেনা। ধৈর্য্যের সাথে সাধন অভ্যাস করতে হয়। কাঁচা ফলে যেমন কষ থাকে, চিত্তেও তেমনি অশুদ্ধ সংসার ভাব থেকে যায়, ফলে কিছুই বোধে আসেনা। তাই সাধনদ্বারা কামবীজকে নষ্ট করতে পারলেই শুদ্ধ ও পরম নিশ্চিন্ত হতে পারবে, যে নিশ্চিন্তভাবই জ্ঞানানন্দময় অবস্থা। এ অবস্থায়ই সেই জ্ঞান ভোগ হয় ॥ ৪/৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৩৯

অনুবাদ : শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ গুরুপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন; জ্ঞানলাভ করিয়া অতি শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥ ৪/৩৯

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে আস্তিক্যবুদ্ধির উপযোগীতা ও পরবর্ত্তী শ্লোকে নাস্তিক্যবুদ্ধির অপকারিতা বোঝান হয়েছে। গুরুবাক্যে যত বেশি শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে লাভও তত বেশি হয়। গুরুবাক্য পালনে যদি জীবন উৎসর্গীকৃত হতে পারে তবে ইন্দ্রিয়জয় আর এমন কি কথা ? তাই জ্ঞানলাভে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া খুব দরকার চিত্তশুদ্ধির জন্য। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা সহ ক্রিয়া করতে পারলেই বেশ সুন্দর একটা বোধ মনের মধ্যে জন্মায় যে “ আমি কিছু নই, আমারও কিছু নেই ” এই বোধটা যে কতখানি শান্তি দেয় সেটা যিনি এই বোধে এসেছেন তিনিই জানেন। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সবার আগে দরকার। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন “শ্রদ্ধা বিধি সমাযুক্তং কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে নৃভিঃ সুবিশুদ্ধেন ভাবেন তদানন্ত্যায় কল্পতে”। যে কোনও কাজই হোক মানুষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশুদ্ধভাবে করতে পারলে তবে তা অনন্ত ফল প্রদান করে। মহাভারতেও আছে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির অন্ন পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে নেই, খাওয়া তো দুরের কথা। অনেকেই ক্রিয়া নিয়মিতভাবেই করে থাকে কিন্তু গুরুদেব ও তাঁর উপদেশের প্রতি ততটা শ্রদ্ধা নেই তা বোঝা যায়, কারণ এরা ক্রিয়ার প্রভাবেই আসেনা, মহিমাও বোঝেনা। কারণ এরা অশ্রদ্ধাবান পুরুষ। আবার একদল আছেন যাঁরা গুরুবাক্যে বিশেষভাবে শ্রদ্ধাবান। ক্রিয়া করে মাঝে মাঝে বেশ ফলও পান কিন্তু

তেমন নিষ্ঠা নেই। গুরুদেব আর তাঁদের জন্য কতটা টানবেন। এঁদের বোঝা উচিত যে গুরু কখনও শিষ্যের হয়ে সাধনটা করে দিতে পারেন না। অনলস হয়ে বেশ নিয়মের সাথে প্রতিদিন অনেক্ষণ সাধন করার সামর্থ্য এঁদের নেই। সাধনে তৎপর ও অলসতা শূন্য না হলে শুধুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে খুব ভাল ফল কিন্তু হবেনা। আবার অনেকে ভীষণ শ্রদ্ধাবান এবং তৎপরও বটে কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব থাকায় বেশি এগোতে পারেননা। গুরুদেবকে সব না বললেও তিনি সবই বোঝেন। তাই শ্রদ্ধা, তৎপরতা ও ইন্দ্রিয়সংযম তিনটাকে দখলে এনে সাধনা করুন, চেষ্টা চালিয়ে যান। দেখবেন জ্ঞানলাভে খুব বেশি দেরী হবে না। ৪/৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ।। ৪০

অনুবাদ : সদগুরুপদিষ্ঠ অর্থে অনভিজ্ঞ, গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়িত চিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই ॥ ৪/৪০

ব্যাখ্যা : এর আগে ৩৯ নং শ্লোকে জ্ঞানাধিকারীর বিষয়ে অর্থাৎ গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিষয় বলে ভগবান এখন অনধিকারী ও নাস্তিক্যবুদ্ধিশালীগণের বিষয়ে বলছেন।

যাঁরা অনধিকারী অর্থাৎ গুরুপদেশ গ্রহণে অসমর্থ আর এক আধটু জ্ঞান জন্মালেও মুখের বাচালতাতেই সেসব সীমিত এবং সেই জ্ঞানের প্রতিও অশ্রদ্ধা, আবার শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের সিদ্ধি বিষয়েও সংশয়াক্রান্ত, তাই এই সংশয়হেতু ইহলোক ভোগও তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ তার ধন অর্জন, বিবাহ ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না। অতএব ইহলোকে কোনও সুখই তার নাই। তাই ভগবান বলছেন মূর্খ, অশ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তির সংশয় হেতু ইহকালেও সুখ নেই, পরকালেও সুখ নেই। সাধারণভাবে তিন ধরনের লোক সাধন অভ্যাস করে না। যদিও এই না করার প্রত্যক্ষ কারণ মূর্খতা, অশ্রদ্ধা, সংশয় যাই হোক না কেন এর, যদিও পরোক্ষ, কিন্তু মূল কারণই হল ভোগবাদ। অসম্ভব রকমের ভোগের বাসনা ও তাড়না থেকেই মানুষ বোধ করে অন্ধকারের প্রতি টান। যাইহোক তিন ধরনের লোক সাধন করেন না। (১) যারা মূর্খ :– পরম তত্ত্বটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ফলে জীবনের কিসে সার্থকতা এসব মনেই আসেনা বরং শুধুই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ইত্যাদি নিয়ে পশুভাবেই জীবন কেটে যায়। (২) অশ্রদ্ধান্বিত :– যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান কিনা বোঝা যায় না, হয়ত বুদ্ধিমান, কিন্তু এই শ্রেণীর লোকজন নিজেরা নিজেদের প্রচণ্ড বুদ্ধিমান বলে ভেবে থাকেন এবং ভীষণ আত্মাভিমানী, কোনও কিছুতেই আস্থা নেই। অথচ সব বিষয়েই খুব কৌতূহল আছে। সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই মহাপুরুষদের কাছে ঘোরাফেরা করে যে কোনও উপায়েই হোক সাধন রহস্যটুকু জেনে নেন। কিন্তু জেনে নিয়েও তার প্রতি আস্থাহীন, পরিশ্রম করতে বিমুখ, ভাবে এসব করে কি হবে ? আবার কিঞ্চিৎ বিভূতির সন্ধান পেলেই সেটা দুইদিন অভ্যাস করেই ছেড়ে দেবে। সাধনপথে কাজ যদি কিছু করে তা নিছক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই। এদের অর্থলিপ্সা, সাধনস্পৃহা কেন ? সবরকম ভাল দিকই নষ্ট করে থাকে। একমাত্র টাকাকড়ি এবং নিজ স্ত্রী, পুত্রই এদের জীবনকেন্দ্রে থাকে, এমনকি নিজেকেও এঁরা ততটা ভালবাসেন না। (৩) সংশয়াত্মা – এঁদের সব কিছুতেই সংশয়, সন্দেহ মনকে ব্যাকুল করে। ফলে পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই, গুরুবাক্যে সন্দেহ, শাস্ত্র উপদেশেও সন্দেহ। তবে লোকদেখানো ভাবে গুরুর নিকট উপদেশ নেয় কিন্তু তাতে শ্রদ্ধাভক্তি না থাকায় গুরুর দোষ খোঁজে ও সাধনোপায়গুলোর ত্রুটীবিচ্যুতি দর্শন করে। ভাবে দূর, ওসব কিছুই নয়, এরা শুধু লোক ঠকিয়ে বেড়ায়। গুরু তো আমারই মত, খায় দায়, ছোটাছুটি করে, সুখ সুবিধা খুঁজে বেড়ায়। সংশয়াত্মার ঘরে, বাইরে কারোর কাছেই কোন কিছুই প্রাপ্য হয় না। তার পরলোকেও বিশ্বাস নেই তাই তার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মও নিস্ফল আড়ম্বর মাত্র। এতদঞ্চলে একসময়ে নৃপেন সরকার নামে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি বাস করতেন যাঁর কুলগুরু ছিলেন বিখ্যাত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। আমাদের কাছে সর্বদাই তিনি স্বামী দয়ানন্দের অলৌকিক বিভূতির গল্প শোনাতেন। তাঁর বাড়ির সর্বত্রই এমনকি রান্নাঘরে পর্য্যন্ত স্বামী দয়ানন্দের বাঁধানো ছবি ছিল। বৈঠকখানায় স্বামীজির বড়ো তৈলচিত্রের দিকে দেখিয়ে বলতেন, "দেখুন, আমাদের গুরুদেব যেমন পণ্ডিত, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।" ভুলেও কিন্তু পরম্পরা অথবা আর কারও কাছে তিনি দীক্ষা প্রার্থী কিনা এ সব বলতেন না। শুধু বলতেন, "আমাদের এই গুরুর কাছে কত মহারাজা, শেঠজীরা আসতেন" ইত্যাদি। হঠাৎ একদিন ঐ পথে ওঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি কোথাও দয়ানন্দজীর কোনও ছবিই নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বয়স্ক নৃপেনবাবু বললেন, "আরে সে সব ফটো ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছি। লোকটা শুধুই বচন সর্বস্ব ছিল। শুধু বড়লোক শিষ্যদের নিয়েই থাকত। অত ভোগ, রাগ, মান মর্য্যাদা আর প্রতিষ্ঠার মধ্যে কি কোনও তপস্যা হয় ? এই যে আপনাকে দেখছি কত simple living অথচ কত জ্ঞানী!" এসব কথা শুনে মনটা বেশ বিমর্ষ হল। বুঝলাম এধরণের সংসারী বিষয়াসক্তের দল সামান্য স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেই কতটা চটে যায়। যে লোক উঠতে বসতে দয়ানন্দের ছবিতে প্রণাম করত আজ হয়ত কোনও একটা স্বার্থ পূরণ হয়নি বা আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে গেছে তাই কুলগুরুকে এত অশ্রদ্ধা। পরবর্ত্তী কালে এই নৃপেন সরকার মহাশয় দীর্ঘকাল আমার কাছে যাওয়া আসা করতেন। এঁকে দেখলে বা ইনি যতক্ষণ আমার কাছে বসতেন আমাকে ঐ ভাবনায়ই পেয়ে বসত। ভাবতাম এঁর কেমনতর ভক্তি ? কেমনতর গুরুজ্ঞান! যাঁরা পাই-পয়সার মাপকাঠিতে ধর্ম্মের বিশ্লেষণ করেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি নৃপেন সরকার। তাই তাঁদের ভাবনায় ও দৃষ্টিতে গুরুগণ –

"কইলে কথা বচন বাগীশ, স্বার্থ পূরলে যোগী।
মৌন থাকলে ভণ্ড বলে, খেলে পরেই ভোগী॥" ৪/৪০

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।। ৪/৪১

অনুবাদ : হে ধনঞ্জয়, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভের উপায়ভূত যোগদ্বারা কর্ম্মসকল আত্মাতে সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি আত্মবোধ দ্বারা সংশয় ছেদ করিয়াছেন, এতাদৃশ আত্মবান্ অর্থাৎ অপ্রমাদী ব্যক্তিকে কর্ম্মসকল আবদ্ধ করিতে পারেনা। ৪/৪১

ব্যাখ্যা : এবার শ্রীভগবান আগে পরের ভূমিকা ছেড়ে সোজাসুজি কর্ম্মময়ী ও জ্ঞানময়ী দুরকম নিষ্ঠারই উপসংহারে পৌঁছেছেন এবং বলছেন, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের উপায়রূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দ্বিবিধ যোগের দ্বারা আত্মবোধে স্থিত হয়ে কর্ম্মসকল আত্মাতে অর্পণ করতে পেরেছেন তিনিই আত্মবান্। এভাবে বললে একটু জটিল মনে হচ্ছে। সহজ করে বললে, কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ মূলতঃ একই, কারণ সাঙ্খ্যযোগ কর্ম্মযোগেরই নামান্তর। আসলে কর্ম্ম একবারে মানুষকে ছাড়ে না। ছাড়ার দরকারও নেই। দরকার হল কর্ম্মবাসনাটাকে যোগাভ্যাস দ্বারা নষ্ট করার। কর্ম্মবাসনাটা মোটামুটি ভাবে নষ্ট না হলে আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছাটাই হয় না। যাবতীয় সংশয় বিদূরিত হয়ে, এবং কর্ম্মবাসনা নষ্ট হয়ে, ভালমত ক্রিয়াকরে যেতে পারলে তবেই “দেহোহং ” অবিদ্যাবুদ্ধি নষ্ট হবার অনুকূল স্থিতি হয়। এরপর কূটস্থ দর্শন ও ক্রিয়ার পরাবস্থা পেলে পরে আর অবিদ্যাবুদ্ধি থাকে না, তাই তখন সব কাজ করলেও তার কোনও টান থাকেনা। আসক্তিশূন্য হওয়ায় কোনও কর্ম্মকেই নিজের মনে হয় না। এমন নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয় পুরুষ স্বভাবিক ভাবে সমস্ত কিছু করলেও সেই কর্ম্মের ফলভোগ তাঁর হয় না। মন তো বিষয়শূন্য থাকে, আত্মা প্রত্যক্ষ অবগম্য হওয়ায় “আমি আমার” বোধ থাকে না। এই স্পৃহাশূন্য নিষ্কামভাবই অপরোক্ষ অনুভূতি, তখন একমাত্র আত্মকারা বৃত্তি ছাড়া আর কোনও বৃত্তির উদয় হয় না। এই অনুভবে থাকতেই ভাল লাগে। অনুপম সুখ অনুভব হয় ॥ ৪/৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ।। ৪২

অনুবাদ : অতএব মনের অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থ এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর। হে ভারত, উঠ। ৪/৪২

ব্যাখ্যা : মনের অজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন যে সমস্ত সংশয় তোমার ভিতর হৃদয়ে আছে, সে সমস্ত, জ্ঞানরূপ খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেল। মানে হৃদয়ের সকল সংশয় দূর করে ফেল আর শ্রীগুরুদেবকে স্মরণকরে কোমর বেঁধে সাধনায় লেগে যাও। বেদেও আছে– “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নস্য পন্থা বিদ্যতেহয়নায়” মানে হল ব্রহ্মকে জানলে তবেই অতিমৃত্যু, মানে বারবার মৃত্যু এবং

অতিমৃত্যুভয়, অতিক্রম করা যায়। মুক্তির আর অন্য পথ নাই। অতএব আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়ে সাধনায় লেগে যাও, তবেই জীবনের এই রহস্যরাশি একে একে ধরা পড়বে। বুঝতে পারবে তুমি কে ? কোত্থেকে এলে ? কোথায়ই বা এলে ? তুমি কার ? এ দেহই বা কি ? আর আত্মাই বা কি ? তার সাথে দেহের সম্বন্ধই বা কিভাবে হয় ? এসবই জানতে ও বুঝতে পারবে। কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের পুত্র পণ্ডিত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী নিজের শ্রীগুরুদেবকে এসে বলেছিলেন, “বাবা আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ভগবানকে এত ডাকছি , সাধ্যমত ধ্যান ধারণাও করছি, কিন্তু অনুভূতিতে কিছুই ফুটছে না কেন ?” গুরুদেব উত্তর দিলেন, “কে বলল হচ্ছেনা, হয়েছে তো! কেবল ‘ডাকছি’ টা ছায়া ফেলেছে, আড়াল করে রেখেছে ‘ডাকছি’ টা মানে তো আমি ডাকছি। এই উহ্য ‘আমি’ র আমিষ গন্ধটা উবে গেলেই মকরন্দ মধুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যাবেন।” সুতরাং ই হকে সংশয় কোরো না। আর নিজের শক্তি সামর্থ্যের প্রতিও সন্দেহ কোরো না। কে বলেছে তোমার নিজের গঠন ঠিক নয় ? কে বলে তোমার শ্বাসের গতি অনিয়মিত ? ওসব কিছু নয়। তোমার ভিতর যে শ্বাশ্বত পুরুষোত্তমের লীলা চলছে সেটা বোঝবার চেষ্টা কর। তুমি যে তাঁর থেকে আলাদা কিছু নও। শ্রীগুরুদেবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে এটা জেনে নাও। আর গুরুর দেওয়া সাধনা অভ্যাস করে তা থেকে পাওয়া জ্ঞানের আগুনে তোমার অজ্ঞানরাশিকে, অবিবেক উৎপন্ন কর্ম্মরাশিকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেল। দেখবে অনন্ত দুঃখের মূল যে অজ্ঞান সে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। মনের সব ধাঁধা মিটে যাবে। নিবৃত্তিরূপা পরম শান্তিতে, স্নিগ্ধ জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত অপূর্ব্ব স্থিরতার মধ্যে অনন্ত অনৈক্য সমস্ত এক হয়ে যাবে। তুমি অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করবে। সমস্ত জাগতিক অশান্তি থেকে অনেক অনেক দূরে থাকতে সক্ষম হবে। নিজের বোধের জগতে প্রবেশ করবে। শুধুমাত্র সুখদুঃখকে সমজ্ঞান করে সাধনায় সচেষ্ট হওয়াই তোমার কর্ম্মযোগ। এটুকু বুঝে কর্ম্মযোগে স্থিরবুদ্ধি লাভ কর। তাতেই জ্ঞানলাভ হবে। বাকিটা আর চাইতে হবে না। না চাইতেই পাওয়া যাবে ॥ ৪/৪২

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার : জ্ঞানযোগে জ্ঞান মানে হল জানা, আত্মজ্ঞান অর্থে নিজেকে জানা। কিন্তু কিভাবে জানা ? বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখা নয়, নিজের অন্তরস্থিত আত্মাকে জানা।

এমনভাবে জানার উপায়টা কি ? চিত্তের বৃত্তি রহিত করতে পারলেই স্বরূপে আসা যায়। চিত্তের বৃত্তি রহিত অবস্থার নামই যোগ, অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাণের চঞ্চল গতি রহিত স্থির সাম্যবস্থা। দেহের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হলেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি উৎপন্ন হয়ে বাইরে ছুটে যায় যেহেতু প্রাণের গতিও বহির্ম্মুখী থাকে। জীবের চেতনা জাগ্রত হলেই গুরুপদেশে শ্রদ্ধাসহকারে কর্ম্ম করে মনকে অন্তর্ম্মুখী করতে পারলেই ইন্দ্রিয়সকলেরও বিষয়গ্রহণ ব্যাপারে ক্ষীণতা আসে। এভাবে বাইরের বিষয় গ্রহণ কমতে থাকলেই তখন মনেও পরমার্থ অনুসারিণী বুদ্ধি আসে। প্রাণকর্ম্মের অনুসরণ করতে করতে প্রাণ মন শূন্য হয়ে স্থির অবস্থায় এলেই দেহ, মন, প্রাণ, স্থির হয়ে “তন্মনঃ বিলয়ং যাতি তাদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” অর্থাৎ পরম পদ লাভ হয়। আত্মার পরমাত্মায় মিলনরূপ এই যে অবস্থা এটাই হল জ্ঞানযোগ। অনন্ত দুঃখের মূলই হল অজ্ঞান। গুরুপ্রদত্ত সাধন অভ্যাসে অবিবেক উৎপন্ন সকল কর্ম্মরাশি ভস্ম করে ফেলতে পারলেই নিজের সামর্থে ভরসা আসবে, হৃদয়ের ধুকপুকুনি মিটে যাবে। তখন তোমার ভিতরে যে পুরুষোত্তমের লীলা চলছে তাঁর থেকে তুমি যে আলাদা নও, সেটাও বুঝতে পারবে, নিবৃত্তিরূপা পরম শান্তিতে জীবন সার্থক হবে। কিন্তু সমস্য হল যে এত কিছু করেও কিছুই হতে চায় না কেন ? পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলো ভালোমত পড়লেই বুঝতে পারবেন যে এর মূলে আছে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব। বাস্তবিকই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকলে এ সংসারেই হোক বা পরকালের জন্যই হোক, নিশ্চিত ভাবে কিছুই করা যায় না। জ্ঞানযোগের তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে ধরেই ভক্তিকে অবলম্বন করে, পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুশীলন দ্বারা সাধনায় এগিয়ে যেতে হবে। এটাই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়ে সাধন। পরবর্ত্তী শ্লোকগুলোতে এ বিষয়ে আরও সূক্ষতত্ত্বসকল শ্রীভগবান খুব সুন্দরভাবে বলেছেন ॥

-০০-

ওঁ

অথপঞ্চমোহথ্যায়

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ (৫)

অর্জুন উবাচ –

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ।।১

অনুবাদ: অর্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ, কর্ম্মসকলের ত্যাগ উপদেশ করিয়া পুনরায় কর্ম্মযোগ উপদেশ করিতেছ, এই দুয়ের মধ্যে আমার পক্ষে যেটি শ্রেয়ঃ, নিশ্চয় করিয়া সেই একটি বল ॥ ৫/১

ব্যাখ্যা: মন যতক্ষণ অসংস্কৃত থাকে ততক্ষণ সকলই ভ্রমাত্মক, তাই গুরুপদেশও দুর্ব্বোধ্য হয়। একমাত্র যোগীই যোগীর উপদেশের সম্যক গ্রহীতা হতে পারেন। অর্জ্জুন উপযুক্ত শিষ্য, তাই ভগবানকে নিজের অজ্ঞতা সরাসরি নিবেদন করেছেন এবং উপদেশের স্পষ্টীকরণ চাইছেন। কারণ ভগবান এর আগের অধ্যায়ের ৩৭ নং শ্লোকে বলেছেন জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে আবার ৪১ নং শ্লোকেই বললেন যোগদ্বারা আত্মাতে কর্ম্মসমর্পণকারী ব্যক্তিকে কর্ম্ম আবদ্ধ করতে পারেনা। ৪২ নং শ্লোকে বললেন, হে ভারত ওঠ, কর্ম্মযোগ আরম্ভ কর। এই যে কর্ম্মের অতীত অবস্থারূপে স্থিতিলাভ করে আত্মাতে কর্ম্ম সমর্পণ করা এবং কর্ম্মের অতীত অবস্থাই যে কর্ম্মক্ষয়রূপ অবস্থা জীবভাব বা জীবাত্মার কাছে বিষয়টা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। এখন এই কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মযোগ অর্থাৎ সন্ন্যাসকর্ম্ম আর যোগকর্ম্ম বা জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই বা জ্ঞানেতেই সমুদয় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি, কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এসব কথা পরস্পর বিরুদ্ধ, মনে হচ্ছে সংসার করতে গেলে কর্ম্ম ছাড়া উপায় নেই। সংসার কর্ম্মও বড় শ্রমসাপেক্ষ। সেই সাথে যোগকর্ম্ম যে সিদ্ধই হবে তারও কোনও ঠিক নেই, এসব নানা পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। সুতরাং কর্ম্ম অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম করে আত্মদর্শন অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া সংসার মানেই তো সুখবাসনা। ওসব মেটাতে গেলেও বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাই যখন কর্ম্মনিরপেক্ষ সন্ন্যাস নিলেও আত্মদর্শন তথা মুক্তিলাভ হতে পারে এবং কর্ম্মত্যাগটাই বরং অনেক সহজ অতএব সেইটি গ্রহণই কাম্য। এই ধরনের উল্টোপাল্টা চিন্তা ও ধারণা থেকে সাধক গতিহারা হতে থাকেন ও একটা অদ্ভূত ভ্রান্তি এসে মনকে গ্রাস করে। এ ধরনের ভাবনার অসারতা ও অবাস্তবতা চিন্তা করেও দেখেনা। কষ্টের ভয়ে সংসার করতে না চাওয়াটা যেমন মোটেই বৈরাগ্য নয়, বৈরাগ্যের ভান মাত্র। তেমনি আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে বা ভগবানকে পেতে হলেও বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হয়। আদর্শ শিষ্য অর্জ্জুনই এতখানি দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে পড়ে আছেন যে কর্ম্ম ও কর্ম্মসন্ন্যাস এর মধ্যে কোনটা তাঁর পক্ষে শ্রেয়ঃ তাই তিনি বুঝতে পারছেন না। আর সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। অর্জ্জুন সরাসরি ভগবানকে জিজ্ঞাসাই করে বসেছেন সন্ন্যাস অথবা কর্ম্ম মানে সংসার অথবা সংসারত্যাগ কোন পথে যাব ? স্পষ্ট করে বল, আমাকে বেছে নিতে বোলো না। সত্যিকথা, জ্ঞানলাভ করতেই হবে কারণ জ্ঞান বিনা সংসার বাসনার নিবৃত্তি হয় না। আবার কর্ম্মসন্ন্যাস বিনা জ্ঞানলাভও অসম্ভব, সুতরাং সন্ন্যাসও তো দরকার। কিন্তু কি সেই সন্ন্যাস ? এবং কখনই বা সেই সন্ন্যসের সময় ? “ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ ; গৃহী ভূত্বা বনি ভবেৎ, বনী ভুত্বা প্রব্রজেৎ।” অর্থ হল এই যে ব্রহ্মচর্য্য শেষ করে গৃহী হবে, পরে বানপ্রস্থ এবং তৎপরে সন্ন্যাস। এ সমস্তই হল বেদের কথা যার প্রকৃত তাৎপর্য্য হল যখন বিষয়ে বৈরাগ্য হবে তখনই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। সে কোন সন্ন্যাস যাতে কেবল মাত্র বিষয়ে সম্পর্কছেদ হয় ? আমরা তো জানি সন্ন্যাস মানে মস্তক মুন্ডন করে গেরুয়াবস্ত্র পরিধান করা এবং গৃহত্যাগ করে স্বজন বান্ধব বর্জন ইত্যাদি। কিন্তু সন্ন্যাস অর্থ এমনতর ভড়ং নয়। সন্ন্যাস হল বিষয়ে সম্পর্ক রহিত অবস্থা, যা হল সম্পূর্ণ হৃদয়াভ্যন্তরের ব্যাপার, মনের অবলুপ্তি বা

বিষয়ে সম্পর্করহিত অবস্থা। একেই বলা চলে অন্তঃসন্ন্যাস। যেমনটি আগে ছিলাম, তেমনই আত্মীয়, পরিজন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহ গার্হস্থ্য জীবন যাপন। শুধু অন্তরে অন্তরে বিপ্লব সংঘটন যাতে মন আর মোটেই বিষয়ে বিচরণ না করে। বিষয়ে বীতরাগ হলে তবেই মন ব্রহ্মে বিচরণ করে থাকে। এটা একমত্র বৈরাগ্য এলেই সম্ভব। কিন্তু কোথায় বৈরাগ্য ? বিষয়াসক্তির রাজত্বে বৈরাগ্যের স্থান নাই। বিনা বৈরাগ্যে, অবিরক্ত অবস্থায় সন্ন্যাস কলিতে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা, শরীরে কিছুটা ছাইভস্ম মাখা, অথবা সুদর্শন মুন্ডিত মস্তক পরনে সিল্ক বা দামি গেরুয়া বস্ত্র, আজব ও অদ্ভুতদর্শন এক একটি সং বিশেষ, যা দেখে মূর্খের দল আভূমি প্রণত হয় ও টাকটা সিকেটা, আলুটা মুলোটা দিয়ে থাকে। "মন না রাঙায়ে বসন রাঙায়ে কি ভুল করিলি যোগী !" মন যদি বৈরাগ্যের রঙে রঙীন না হয় তবে এসব ধরাচূড়া গ্রহণে ফল কি ? এতে দুঃখও মেটে না, কর্ম্মও কাটে না। মনে রাখতে হবে কর্ম্ম কি ? কর্ম্ম বাসনারই বেগ মাত্র। সুতরাং সহজে ছেড়ে যাবার জিনিষ নয়। যতক্ষণ সাঁতারে দক্ষতা না আসে ততক্ষণ শূন্য কলসী উল্টে বুক বা পেটের তলায় দিয়ে তার উপরে ভাসতে হয়। তেমনই সম্পূর্ণ জ্ঞানের নিরালম্ব অবস্থা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ একজনকে মধ্যবর্ত্তী করে চলতে হয়। তাঁতে চাই প্রচন্ড ভক্তি যার অপর নাম নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। শুধু কাপড় রাঙিয়ে সন্ন্যাসের ভড়ং করতে নেই, তাতে খারাপ বই ভালো কিছুই হয় না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধির অভ্যাসে নিজ হৃদয়েই আত্মদর্শন হয়ে থাকে। তা নইলে জোর করে সন্ন্যাস নিলে ইহকাল ও পরকাল সবই নষ্ট হয়ে যায়। কর্ম্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান না করলে বৈরাগ্য আসেনা, জ্ঞানও হয় না। তাই কর্ম্মের অনুষ্ঠান ছাড়া প্রকৃত সন্ন্যাস সম্ভব হয় না, এটুকু মাত্র বুঝতে পারলেই সব গোলমাল মিটে যায়। ৫/১

শ্রীভগবান উবাচ -

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ।। ২

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক ; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর ॥ ৫/২

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা আছে শিষ্যের গুরুপদেশের বিষয়ে সম্যক বোধ না হওয়াতেই এই প্রশ্ন হয়েছিল। এখানে তারই স্পষ্টীকরণ। বেদান্তবিদ আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের জন্য কর্ম্মযোগের উপদেশ নয় কারণ তিনি তো আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়ে আছেনই তাঁর আর কর্ম্ম কি ? অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানের উচ্চভূমিতে যিনি থাকেন তাঁর তো আর দেহাত্মবুদ্ধি নেই, অতএব সর্বকর্ম্ম সন্ন্যাস তো আপনা আপনিই হয়ে যায়, কিন্তু যাঁরা দেহ ও আত্মার তফাৎ জানেন না, দেহকেই আত্মা ভেবে বসে আছেন, জ্ঞানের অভাবে সংশয় তাদের পিছু ছাড়েনা, সেজন্য তাদের সেই পরমাত্মজ্ঞানের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ আশ্রয় করতে হয়। আগের শ্লোকের ব্যাখায়ও বলা হয়েছে যে কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হলে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় সেই অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার জন্য, মানে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ নিজেকে হজম করার জন্য মনকে যে অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে হয়, সেটাই সংন্যাস বা সন্ন্যাস। এখন মনের সেই অবস্থায় দেহাত্মবুদ্ধি বিনাশের কারণে দেহের প্রতি উদাসীনতা আপনিই আসে, ফলে বাইরে থেকে লক্ষ্য করলে সেই যোগীকে একটু অন্যরকম মাত্র দেখাতে পারে, কারণ সে তখন সব কিছুতে ইচ্ছারহিত হয়ে থাকে। তাই বলে কোনও কিছু ধরাচূড়া গ্রহণের বা কারো কাছে প্রকাশের দরকার হয় না, তেমন ইচ্ছাই হয় না। সেজন্যই বলেছেন মুক্তিলাভেচ্ছু অথচ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিকভাবে সকল কর্ম্ম করাই ঠিক, শুধু গুরুপদেশে অবিচল থেকে। কর্ম্ম না করে কর্ম্মের অতীত হওয়া যায় না। গৌতম বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন, তাই রাজঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেছিলেন। যাঁর কিছুই নেই তিনি আর কি ত্যাগ করবেন ? গায়ের জোরে কর্ম্মত্যাগ করলে কোনও লাভ নেই। ভেবে দেখুন তো মনে বৈরাগ্য আনা কত কঠিন! ভগবানে অর্পণ করে সব কাজ করলেও কর্ম্মত্যাগ হয় না বটে কিন্তু ফল ত্যাগ হয়। এভাবে ঈশ্বরে অর্পিত চিত্তে কর্ম্মযোগে যদি সব ঠিকমত নাও হয় তবুও একেবারে নিস্ফল তো হয় না। সে একটা বেশ আনন্দের মধ্যেই থাকে। ক্রিয়া করে চললে ক্রিয়ার পরাবস্থা একদিন নিশ্চয় আসবে। এই কর্ম্ম বা ক্রিয়া যে করবে তার একদিন প্রকৃত সংন্যাস বা সন্ন্যাস অন্তরে আসবেই। সুখ, আনন্দ সবই তখন আসবে। কর্ম্মের ফলত্যাগেই সন্ন্যাসের ফললাভ হয়। সন্ন্যাস সম্বন্ধে মূল ধারণাটা পরিষ্কার হলে আর বুঝতে ভুল হয় না। অর্জুন উপযুক্ত শিষ্য হয়েও সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য বুঝে উঠতে পারেননি আর সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। ৫/২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ।। ৩

অনুবাদ: যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্খাও করেন না, তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া (অর্থাৎ গৃহী সংসারী ও সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও সন্ন্যাসী) জানিও। যেহেতু হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংসারাসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৫/৩

ব্যাখ্যা: দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হলে তবেই আত্মতত্ত্ব জানা সম্ভব। দেহাভিমান থাকতে শুধুমাত্র শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা পরাজ্ঞানের উচ্চভূমিতে অবস্থিত থাকাই প্রকৃত (universal) চিরন্তন সন্ন্যাস। সেই অবস্থায় কোনও রকম আশা আকাঙ্খা, হতাশা বিরক্তি বা কোনও রকম দ্বেষ বিদ্বেষ, ঈর্ষা চীকীর্ষা, অনুরাগ বিরাগ কিছুই থাকে না। সবরকম মোহ ও দ্বন্দ্বের অতীত এই অবস্থাই নিত্য সন্ন্যাস। এর আগে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮ নং শ্লোকের আলোচনাতেও কিছুটা বলা আছে কি

ভাবে বিষয় অনুরাগ, বিষয় বিদ্বেষ এ সমস্তকে জয় করে অনায়াসে সংসারাসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে কর্ম্মের অতীত অবস্থায় স্থিতিলাভ হয়। এটাই নিত্যসন্ন্যাস, তখনই ইচ্ছারহিত ও দ্বিধারহিত হয়ে, সুখেতে সবরকম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সহজে ফাঁকিবাজি করে সবকিছু পেতে চাইলে কিছুই হয় না। তাই যে সমস্ত নিত্যসন্ন্যাসী বলতে বুঝি গেরুয়া বসন ধারণ করে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে, মস্তক মুন্ডন করে, সংসারের ঝামেলায় না গিয়ে বরং পাহাড় পর্ব্বত বা মন্দির আশ্রমে গিয়ে থাকা, এসব করে কিছু হয় না। এর আগের অধ্যায়েই ৩২ নং শ্লোকে বলা আছে –"এবং বহুবিধা যজ্ঞ বিততা ব্রহ্মণো মুখে। কর্ম্মজান্ বিদ্ধিতান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥" যার অর্থ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট বহুবিধ উপায়ের উপদেশ পেতে পার যা বেদে উক্ত আছে। কিন্তু মুক্তিলাভের সকল পথেই তেমাকে কর্ম্ম করে এগোতে হবে। সবগুলি পন্থাই কর্ম্মজ বলে জানবে অর্থাৎ সবকটিই ক্রিয়াযোগ, যার অনুষ্ঠান না করে কিছু হবে না। তাই সন্ন্যাস পেতে হলে কর্ম্ম করে পরাজ্ঞান অর্জ্জন করে তবে সেই জ্ঞানের উচ্চভূমিতে আরোহণ করার পর কর্ম্মের অতীত অবস্থা লাভ করে সন্ন্যাস পেতে হয়। এটাই নিত্যসন্ন্যাস, যার আর কোনও reverse effect নেই, সেখান থেকে আর পতন নেই, শুধুই উত্থান। এখন একটা কথা থেকেই যাচ্ছে তা হল যে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের কথাই তো শুনলাম, জ্ঞানীর নিত্যসন্ন্যাস ও অজ্ঞানীর পক্ষে হয় সন্ন্যাসের ভেকধারণ। কিন্তু তাতে আমাদের কি ? আমাদের কি করণীয় আছে ? দেখুন, আমরা কোনও উচ্চকোটির সাধক নই কিন্তু মুক্তিকামী, নইলে গীতাপাঠ বা আলোচনা, ব্যাখ্যায় যেতাম না। আমাদের একমাত্র করণীয় এখন গুরুবাক্য অনুসারে কাজ করেই নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু আমরা কি তাই করি ? না। এমনকি সাধন করতে গিয়েও তাড়াতাড়ি সিদ্ধির আকাঙ্খা করে বসি। ক্রিয়া করে কি হল না হল বা কি হবে না হবে ওসব চিন্তায় কাজ নেই। মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে একভাবে সাধনক্রিয়া করে যাওয়াই একমাত্র কাজ আমাদের। এটা করে যেতে পারলেই ক্রিয়ায় পূর্ণ স্থিতিলাভ না করলেও পরম শান্তিলাভ করা যায়। যদি মনে করা যায় –" আমি কিছু নই, আমার কিছু নয়, সবই তিনি, সবই তাঁর " তখন আর কর্ম্ম করতে ভয় হয় না বরং আনন্দ হয়। বহু কষ্টে কোনও কাজে সফল হলে "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু " বলে আনন্দে বিভোর হওয়া যায়। আবার বহু পরিশ্রমেও কোন কাজ না হলেও কোন রকম ব্যার্থতার গ্লনি স্পর্শ করতে পারেনা বরং মনে মনে হাসি পায়, মনে হয় যিনি কাজে লাগিয়েছেন তাঁর যা ইচ্ছা হয় হোক। কাজের শুরুতে যে ভাব, কাজ পণ্ড হয়ে গেলেও সেই ভাব, সেই আনন্দ। এই যে নিশ্চিন্ত ভাব, এটাও আমাদের সন্ন্যাস। কিন্তু এ অবস্থাটাও না পেয়ে যদি সব ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকে, সেটা মোটেই সন্ন্যাস নয়; ভণ্ডামি। ৫/৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগবালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ।। ৪

অনুবাদ : অজ্ঞরাই (বালাঃ) জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক বলিয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন না। একমাত্র সাধন সম্যকরূপে আশ্রয় করিলে, দুয়েরই ফল (মোক্ষ) লাভ করা যায়। ৫/৪

ব্যাখ্যা : আগের দুটো শ্লোকের উপসংহার হল এই শ্লোক। অর্জ্জুন অজ্ঞতাবশতঃ প্রশ্নটা করেছিলেন। নবীন সাধকের যোগ বিষয়ক অজ্ঞতা খুবই স্বাভাবিক। তাই ভগবান বুঝিয়ে দিলেন যে আসলে সবটাই সেই যোগ। অর্থাৎ আমরা অঙ্কে যে বিয়োগগুলো করে থাকি সেগুলোও আসলে যোগ। বালাঃ মানে অজ্ঞ বা মূর্খ। এরাই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে পৃথক করে দেখে। কর্ম্ম না করে জ্ঞানার্জ্জন হয় না। দুয়ের একটাতে থাকলেই দুয়েরই ফললাভ হয়। পড়াশুনারূপ কর্ম্ম না করে কি পুস্তকের জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় ? এও তেমন। সাংখ্য এবং যোগ পৃথক নয়। পণ্ডিতেরা এমনটা ভাবেন না। "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" কারণ সাংখ্য এবং যোগ দুয়েতেই প্রাণায়ামের কথাই বলা আছে। প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ীচক্রের শোধন হলে মনকে উপরে তুলে সহস্রারে প্রবেশ করানোটা সহজ হয়। সুষুন্মা জাগরণ হলেই স্থিরতা লাভ হয় আর সেটাও প্রাণায়াম দ্বারাই হয়ে থাকে। এসব কৌশল যাঁরা জানেন না তাঁরা শাস্ত্রপাঠ করলেও পণ্ডিত নন। কেননা তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেননি। যাই হোক, সাংখ্য যোগে কূটস্থ জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করে নাদবিন্দু ভেদ করে পরাস্থিতি লাভ করে নিশ্চিন্ত একাত্মভাবের উদয় হয়। আবার কর্ম্মযোগ বা ক্রিয়াদ্বারা কেবল প্রাণায়াম অবলম্বনেও এই অবস্থালাভ করা যায়। প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণকে নিরুদ্ধ করতে পারলে চিত্তের বৃত্তিরও স্বতঃই নিরোধ হয়। তখন মনপ্রাণ স্থির হয়ে পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। তখন আর কোনও কর্ত্তৃত্বাভিমান নেই, কিছুই নেই। আপনাকে ভূলে সমস্ত কিছুর অতীত হয়ে থাকা যায়। এটাই নিষ্কাম কর্ম্ম বা প্রাণকর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ, যেভাবেই বলি না কেন, তারই ফল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পথ দুটো হলেও বিষয়বস্তু ও তার ফলাফল কিন্তু সেই একই। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই চিত্তবৃত্তি নিরোধ এবং উভয়েরই ফলে কর্ম্মের অতীত অবস্থারূপ ব্রহ্মমার্গে স্থিতি লাভ করা যায় ॥ ৫/৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ৫

অনুবাদ : জ্ঞাননিষ্ঠগণ যে স্থান (মোক্ষ) লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন, যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, তিনিই সম্যক দর্শন করেন ॥ ৫/৫

ব্যাখ্যা : দুই যোগ দুইয়ের যা ফল, তিন যোগ একেরও তাইই ফল। তেমনই সাংখ্যের শেষ ফল এবং যোগের শেষ ফলও সেই একই, এতে তফাৎ কিছুই নেই। ষট্‌চক্রের ক্রিয়াতে সহস্রারে আটকে থেকে যে অবস্থালাভ হয় আর যোনিমুদ্রার দ্বারা সূর্য্যের মত প্রকাশ দেখতে দেখতে তার অন্তর্গত যে স্থিতিলাভ

দুটোই সেই একই অবস্থা। দুটোর দ্বারাই চিত্তের নিরোধ হয়। ব্রহ্মনাড়ীর প্রকাশ অনুভব হয়। সুতরাং ফলের কোনও তারতম্য নেই। তাই সাংখ্য এবং যোগের ফল যিনি এক দেখেন তিনিই ঠিক দেখেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও এ কথাই বলা হয়েছে যে "যোগীরা যোগবলে যাঁকে দর্শন করেন, সাংখ্যেরাও তাঁকেই প্রাপ্ত হন।" এই দুই ভাবেই চিত্ত নিরোধ হয় এবং ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ দর্শন হয়। অতএব এমন সমদর্শন যাঁর, তাঁর দেখাই ঠিক এবং তিনিই ব্রহ্মবিৎ ॥ ৫/৫

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৬

অনুবাদ : হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মকে জানেন ॥ ৫/৬

ব্যাখ্যা : আগে বলেছি বইটি না পড়লে যেমন তার বিষয়বস্তু জানা যায় না, তেমনই কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা সেই কর্ম্মের বিষয়ও জানা যায় না। মোটরগাড়ী চালানো ভালমত না শিখে রাস্তায় গাড়ী চালাতে গেলে যেমন দুর্ঘটনা ও দুঃখকেই ডেকে আনা হয় মাত্র তেমনই শুধুমাত্র কাজকর্ম্ম বা বিষয় ভাল লাগে না বলে মনের বেগে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শুধু শুধু দুঃখকেই ডেকে আনা হয় মাত্র। কারণ কর্ম্মের অভ্যাস বা যোগাভ্যাস বিনা চিত্তশুদ্ধিই হয় না, আর চিত্তশুদ্ধি না হলে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যে সন্ন্যাস তা হয় না। কারণ মনে কামসংকল্প, ইচ্ছা, আকাঙ্খা এগুলো তো থেকেই যায়। জোর করে একটা বৃত্তি বা সংকল্পকে তাড়ানো গেল, তো তার পরপরই শত শত কামসংকল্প বা ইচ্ছার উদয় হয়। আবেগীর বিষয়গ্রহণ অভিলাষ যায় না। কেই হয়ত বলতে পারেন যোগেতেও বিষয় ত্যাগ, সন্ন্যাসেও বিষয়ত্যাগ, আর যদি কর্ম্মযোগীরও শেষে সন্ন্যাস দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা হয় তবে শুরুতেই সন্ন্যাস নেওয়া ভাল। পাছে এমন ভ্রান্তি আসে, তাই ভগবান সতর্ক করে দিচ্ছেন যে প্রথমে যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে স্থির কর। নইলে অশান্তচিত্তে বনে গেলেও মনের শান্তি হবে না। চিত্তশুদ্ধ ও স্থির না হলে বিষয়বৈরাগ্য আসে না। শুধু শুধু হুজুগে পড়ে সন্ন্যাস নিলে ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হয়, বিষয় বিরক্তি ছাড়া যে সন্ন্যাস তা কেবল পাপজনক ও পণ্ডশ্রম। প্রকৃত সন্ন্যাসী আজকাল আর নেইই। এখন অতিবস্তুবাদের যুগে সন্ন্যাসও যে একটা ভোগের carrear মাত্র, তা মঠ মিশনগুলোর দিকে তাকালেই সুন্দর ভাবে বোঝা যায়। যাক সে কথা। প্রকৃত সন্ন্যাসীর শুধুমাত্র চারটি কর্ম্ম। এছাড়া আর কোনও কর্ম্ম থাকতে নেই। "ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা " যার মানে হল ধ্যান, শরীর মনের শুদ্ধি, ভিক্ষান্ন ভোজন ও একান্ত বাস। সন্ন্যাসীর গৃহ থাকে না, সঞ্চয়ও নিষেধ। তারপর ভিক্ষা। সাধারণ 'ভিখারীর ভিক্ষা' ও সন্ন্যাসীর 'মাধুকরী ভিক্ষায়' কিছু তফাৎ তো নিশ্চয়ই আছে। সন্ন্যাসীর মাধুকরী ভিক্ষা কোনও পেটের যোগাড় নয়, দণ্ডী সন্ন্যাসীর পক্ষে মাধুকরী হল একটা ব্রতের অনুষ্ঠান, যেটা তাঁর তপস্যার অঙ্গ। চোখ আছে দেখবে না, কান আছে শুনবে না, মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে যাবে "প্রভু, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ন্যাস করার ব্রত নিয়েও আজ যে অন্নময় খাঁচাটার জন্য গৃহস্থ পল্লীর মধ্য দিয়ে চলেছি তার জন্য অপরাধ মার্জনা কর।" সত্যি কথাটা হল দণ্ডী সন্ন্যাসীর কখনও গৃহীর দ্বারপ্রান্তে গিয়েও দাঁড়াতে নেই, বাড়িতে তো নয়ই। তা হলে তুমি আর সন্ন্যাসী রইলে না, সত্যিকার ভিখারী হয়ে গেলে। প্রকৃত নিয়ম হল বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাবে, বেদমন্ত্রের চিন্ময় প্রভাবে আকাশ বাতাস শুদ্ধ হবে, আর এমনতর সন্ন্যাসী দর্শনে গৃহীদেরও মঙ্গল হবে। এটা সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁর ঋণশোধ। সন্ন্যাসী সমস্ত ঋণ আহুতি দিলেও যেহেতু দেহে থাকতে দেশের ভাত, জল এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু গ্রহণ করে, তাই এজন্য মাধুকরীর মাধ্যমে সন্ন্যাসীকে এটুকু করতেই হয়। এমনতর সন্ন্যাসীকে রাস্তায় দেখে যদি কোনও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহী কিছু খাদ্য শ্রদ্ধাভরে তার করঙ্গাতে ঢেলে দেয়, তাই নিয়ে সোজা গঙ্গায় যাবে। যেহেতু সন্ন্যাসীর কোনও স্বাদ গ্রহণ করতে নেই তাই সব খাবার নেকড়ায় জড়িয়ে পাঁচবার জলে ডুবিয়ে সর্ব্বাধিক পাঁচ গ্রাস মাত্র খাবে, স্নান করবে এবং যে গৃহী খাদ্য দান করেছিল তার মঙ্গলের জন্য একশো আটবার প্রণব জপ করবে। এটাই হল সন্ন্যাসব্রতে ভিক্ষার নিয়ম। একবেলায় সংগৃহীত মুষ্ঠিভিক্ষা হতে পরের বেলার জন্য কিছু রেখে দেওয়াও নিষেধ। অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের স্থান বিশেষের শাখায় গেলেই সন্ন্যাসী আমানতকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবেই চোখে পড়ে। তাই ভগবান বলছেন প্রকৃতই সন্নসী হতে হয়, সন্ন্যাসী সাজলে হয় না। বৈরাগ্যবিহীন সন্ন্যাসীর শান্তিলাভ অসম্ভব। এই বিষয়বৈরাগ্য যোগাভ্যসের দ্বারা আগে অর্জন করতে হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসীর ধ্যান ও একান্তশীলতা ভীষণ প্রয়োজন। ক্রিয়াযোগের ক্রমাগত অনুশীলন দ্বারা মনে ধ্যাননিষ্ঠা উৎপন্ন করে তাকে একেবারে একাকী করে দেবে। সেখানে মনই থাকবে না তো মননশীলতাই বা কোথায় ? আর বাসনাসংকল্পই বা কোথায় ? আর কোলাহলই বা কোথায় ? প্রকৃত সন্ন্যাস এভাবে কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জন করতে হবে। তা না হলে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ভাষ্যে যেমন বলা আছে জোর করে সন্ন্যাস নিলে যেসব কুফল ফলতে পারে অর্থাৎ প্রমাদী, পিশুন, বহিশ্চিত্ত, কলহোৎসুক, দৈবদূষিত, দুষ্টাশয় ইত্যাদি ধরণের সন্ন্যাসীর উৎপত্তি হয়ে থাকে (বার্ত্তিককার ভাষ্য)। যেহেতু অযোগীর বিষয়গ্রহণ অভিলাষ যায়না, তাই তার সন্ন্যাস হয় দুঃখের কারণ। তাই উপসংহার হল এসব ফাঁকিবাজির উৎপাৎ না করে বরং সোজা পথে চলুন, কিছু যদি না পারেন তো ভগবদর্পিত চিত্তে সংসারের সমস্ত কাজ করে চলুন। ঐভাবে কর্ম্ম করতে করতে একসময় সহজেই কর্ম্মাসক্তি খসে পড়ে। এর সাথে একটু একটু করে প্রাণকর্ম্মের সাধনায় শ্বাসের স্থিরতার সাথে সাথে মনের স্থিরতা আসে। এইভাবে ক্রমশঃ বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেলে আর বিষয় বাসনার উৎপাৎ হয় না। তখন যে শান্তি পাওয়া যায় তা কোনও দর্শনধারী সন্ন্যাসীর পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। ৫/৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।। ৭

অনুবাদ: যোগযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সকল জীবের আত্মাই যাঁর আত্মা, ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে বদ্ধ হন না ॥ ৫/৭

ব্যাখ্যা: কর্ম্মযোগের উপযোগীতা এতখানি ব্যাখ্যার পরেও এই শ্লোকের অবতারণার কারণ হল সংশয় মোচন। যেহেতু কেউ এমন আশঙ্কা করতে পারেন যে কর্ম্মযোগের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম অধিগম্য হলেও সেই কর্ম্মের দ্বারাও নতুনতর বন্ধন হতে পারে সেই বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্যই এই শ্লোকে বলা হল যে অন্যান্য সকল কর্ম্মের দ্বারা জীবের বন্ধন (কর্ম্মবন্ধন) হয় ঠিকই কিন্তু প্রাণকর্ম্মরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের নিরোধ হলে চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, সেখানে আর কোনও বাসনা সংকল্পাদির ঢেউ থাকে না। এমন শুদ্ধ ও নির্ম্মলচিত্তেই আত্মসাক্ষাৎকার হয় যার ফল ইন্দ্রিয়ে অনাসক্তি। ইন্দ্রিয়ে অনাসক্ত ব্যক্তির পক্ষেই সম্যক যোগভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়জয় বেশ তাড়াতাড়িই হয়, মানে ইন্দ্রিয়েরা আর খেয়ালখুশি মত চলতে পারে না অর্থাৎ মনের দখল নিতে পারে না। তারা তো তখন খুবই neglected, একেবারেই পাত্তা পায়না। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হলে শরীরও বেশ বশে থাকে। এমনতর যোগী যদি প্রারব্ধ বশে দেহকর্ম্মাদি করেন তবুও তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হন না। কারণ কর্ম্মতো রেকর্ড হয় মনে, সেখানে কোনও ছাপই পড়ে না। কেননা মন তো সেই মন নেই, তখনতো চিত্ত বিশুদ্ধ ও চিদ্‌মুখী হয়ে গেছে। তাঁর কথাবার্ত্তা, শরীর, মন, সবই ব্রহ্মরূপ খুঁটিতে বাঁধা পড়ে আছে, আটকে আছে। চিত্ত সংকল্পশূন্য, মনে বাসনার লেশমাত্রও নেই, জিতেন্দ্রিয়। সেই দেহ দিয়ে আর অসৎ কিছু হবার নয়। আমরা তাঁর আচরণকে স্বেচ্ছাচারিতা মনে করে ভুল বুঝে নিজেদেরই ক্ষতি করি মাত্র। তাঁর সর্ব্বাত্মক দৃষ্টি খুলে যায়। তাই তিনি সবকিছুতেই নিজেকে অনুভব করে থাকেন। আর এই অনুভব, এই অবাধ প্রেমজনিত আচরণ আমাদের ভোগবাদী মনকে তোলপাড় করতে থাকে, সন্দেহের দোলায় অস্থির করে তোলে। সেই অপ্রকাশিত পুরুষকে, তাঁর মহত্ত্বকে আমরা ভুল বুঝি। কখনও ভাবিনা যে তাইতো, তাঁকে বুঝতে গেলে আগে তাঁর মত হতে হবে। মনে আমাদের সহজেই বিরুদ্ধ ভাব চলে আসে ও আমাদের পতন হয়। সর্ব্বভূতের আত্মাই তখন তাঁর আত্মা যেহেতু তিনি যোগেতে আটকে থাকেন আর সকল ভূতে শরীরে ও আত্মায় নিজ আত্মাকেই বোধ করে থাকেন। তাই তিনি সমস্তকর্ম্ম করেও কোনও বন্ধনে বদ্ধ হন না। ৫/৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।। ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। ৯

অনুবাদ: ব্রহ্মে যুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, এই নিশ্চয় করিয়া কিছুই আমি করিনা এই মনে করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ঐসকল কার্য্য করিয়াও অনভিমান বশতঃ কর্ম্মে লিপ্ত হন না। ৫/৮-৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যেসব কথা বলা হল এই শ্লোক তারই স্পষ্টীকরণ ব্যাখ্যা। আগের শ্লোকে বলা হয়েছে সর্ব্বকর্ম্ম করেও কোনও কর্ম্মে লিপ্ত হন না বা কোন কর্ম্ম করেন না। কথাটা ভীষণ অদ্ভুত ও স্ববিরোধী অর্থ বহন করেনা কী ? হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথাই বটে। তাই এর ব্যাখ্যায় আবারও বলছেন যে এটা অসম্ভব নয় শুধুমাত্র যাঁর কর্তৃত্বাভিমান নেই তাঁর পক্ষে। কি ভাবে ? সেটাই বলা হচ্ছে যে একমাত্র যিনি যুক্তাবস্থায় মানে যোগে যুক্ত তিনি ক্রমশঃ তত্ত্ববিৎ হয়ে ওঠার পর বৃত্তি নিরোধে নিশ্চল অবস্থাপ্রাপ্তিতে কি তাঁর মৃত্যু হয় ? না তা হয় না। বরং আরও ভালভাবেই ও আরও সুখেই বেঁচে থাকেন। কিভাবে ? তিনি যখন সব কাজই করেন, বিশেষতঃ আমরা যখন যোগীকে দেখি, তিনিও আর দশজনের মতই খান, দান, ঘোরাফেরা করেন, সবই করেন। কিন্তু পার্থক্যটা হয় যোগীর অভ্যন্তরে যেখানে তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না। তাঁর অনুভবটাই এমন হয়ে যায় যে “আমি কিছুই করছি না”। তবে এই যে খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা, নিদ্রা এসব কি ভাবে হচ্ছে ? যোগীর অনুভবে এসবই ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয়েরা করছে, আমার কোনও ব্যাপার নয়। এসবই দেহপ্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত। যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় মন নিষ্ক্রিয় থাকলেও শ্বাস প্রশ্বাস স্বতঃই চলতে থাকে অথবা আমরা চাই বা না চাই খিদের সময় আপনিই খিদে পায়। আমরা না চাইলেও ঠিক সময়মত খিদে পেয়ে যায় আবার খাবার পর আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করেই দেহ প্রকৃতি আপনা থেকেই সেই খাদ্য পরিপাক করে থাকে। আমরা কোনও শব্দ শুনতে না চাইলেও শব্দদূষণে বিরক্ত হলেও মাইকের শব্দ বা মোটর গাড়ির তীব্র জোরাল হর্ন আমাদের কানে আসে ও বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে। ইচ্ছামত শুনব বা ইচ্ছা না হলে শুনব না, এমনটা নয়। এমন আরও যেসব প্রকৃতি নির্দ্ধারিত কাজকর্ম্ম তা সময় সময় আমাদের বিপদে ফেলে। যেমন ব্যস্ততম, জনবহুল, অজানা শহরে বা পথেঘাটে, যেখানে বাথরুম পায়খানার ব্যবস্থা নেই, সেখানে হঠাৎ বেগ এলে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলে বৈকি। আমাদের মত সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাবশতঃ যে কর্তৃত্বাভিমান থাকে তা থেকেই অনুভব করি যে সব কাজই আমিই করি এবং আমি চাইলে তবেই সেটা হয়, আমি না চাইলে হয় না। সত্যই যদি তাই হত তবে কি এখন এই সভাস্থলে বসে বসে হাই তুলে জনসমক্ষে লজ্জায় পড়তাম বা শোকসভায় নীরবতা পালনকালে অত জোরে হাঁচি পেত, বা রাতে শোয়ার সময় কাউকে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হত ?

ইন্দ্রিয়গণই যদি আমি হতাম বা ইন্দ্রিয়েরা যদি আমার হত বা আমার কথা শুনত তবে শরীরে অস্ত্রোপচারের আগে সংজ্ঞাহীন করার জন্য এবং পরে জ্ঞান ফেরানোর জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থায় anesthesia, anasthesist এত কিছু লাগত না। আসলে এই শরীর যেমন আমি নই, ইন্দ্রিয়গণও এই শরীরেরই অঙ্গ, অংশমাত্র, আমার কিছু নয়। এই অনুভব আমাদের বোধে না এলেও যিনি তত্ত্বজ্ঞ, মানে যোগযুক্ত হয়ে তত্ত্ববিৎ, তাঁর কাছে এটা সদানুভূত বিষয়। তাই তাঁর কাছে সমস্ত কর্ম্মই ইন্দ্রিয়গণ তাদের বা তাদের শরীরের প্রয়োজনেই করে থাকে মাত্র। তিন নিজে থেকে কিছুই করেন না। কারণ যিনি তত্ত্ববিৎ হয়েছেন তাঁর আর বিমুগ্ধতা থাকে না। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত রঁমা রলাঁ তাঁর "বিমুগ্ধ আত্মা" (enchanted soul) গ্রন্থে খুব সুন্দর ভাবে এটার ব্যাখ্যা করেছেন। পড়লে আপনাদের সকলের খুব ভাল লাগবে। দেহকেই আমি বোধ করাই অভিমান। আসলে আত্মা দেহাভিমান যুক্ত হলেই এমনটা ঘটে থাকে। হাতি যেমন শুঁড় দিয়ে গাছ পাতা টেনে খায়। দেহাভিমান যুক্ত হলেই প্রকৃতি সহ মন উৎপন্ন হয় আর তার দ্বারা যাবতীয় ভোগ ইন্দ্রিয়দ্বারে এনে আমি গ্রহন করছি এমন একটা বোধে আত্মা মুগ্ধ হয়। এটাই, মানে এই অজ্ঞানতাটাই আসলে আত্মার বদ্ধ অবস্থা, নইলে আত্মা কখনই বদ্ধ নয়। সাধন দ্বারা সম্যক জ্ঞান হলে তবেই এই ভ্রান্তি বা অসম্যক জ্ঞান নষ্ট হয়। তখন আর প্রকৃতির কাজে কোনও অভিমান থাকে না, যেন আপনা আপনিই সবকিছু হতে থাকে। শিশু যেমন বড় আয়নার মধ্যে দেখা নিজের প্রতিবিম্বের সাথে খেলা করে, তেমনি নিখিল বোধ স্বরূপ যে পরমাত্মা আমিও তাঁরই অংশ, আমিই সে। এই অখণ্ড বোধের অন্তর্গত হতে পারলেই আর পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। তখনই অভিমান শেষ হয়। কচ্ছপ যেমন গুটিয়ে নিজের মধ্যে ঢুকে যায়, তেমনই সবই আত্মায় প্রবেশ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এটাই অদ্বয় বা অদ্বৈত জ্ঞান। এই জ্ঞানে স্থিত যিনি তাঁর কোনও কাজই নিজের নয়, প্রকৃতির ক্রিয়া মাত্র। সেই প্রকৃতি ও নিজ অস্তিত্ব চৈতন্য বা সৎস্বরূপের সাথে একাকার হয়ে যায়। এটাই স্বরূপে অবস্থান বা মুক্তি ॥ ৫/৮-৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গ ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।। ১০

অনুবাদ : ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি পূণ্যপাপাত্মক কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না। যেমন (জলে থাকিলেও) পদ্মপত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না। ৫/১০

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হল যে "আমি কিছুই করি না" এমন অনুভবে যিনি আছেন তাঁর কর্ম্মজনিত কোনও বন্ধন হয় না। খুব ভাল কথা। কিন্তু যার কর্তৃত্বাভিমান আছে অর্থাৎ "আমিই করছি" এমন অভিমান আছে তাঁর অবস্থাটা কি ? তাঁর কর্ম্মলেপ দুর্ব্বার। আবার অমন অবিশুদ্ধ চিত্তে সন্ন্যাসও হবার নয়। তাই এই ধরণের মানুষের আশঙ্কা দূর করার জন্য ভগবান বলছেন কর্ম্মের কোনওরূপ ফলাকাঙ্খা না থাকলেই সে কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করা সহজ হয়। অতএব, কর্ম্মসকল পরমেশ্বরে সমর্পণ করে ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম্ম করলেও সেই কর্ম্মদ্বারা বন্ধন হয় না। ফলে পাপপূণ্যাত্মকও হয়না। বাস্তবিক কর্ম্মের কর্ত্তা যখন প্রকৃতি, যার ব্যাখ্যা আগের শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে, তখন ব্রহ্মে কর্ম্মনিক্ষেপ করা মানেই সে কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তার আর কোনও অভিমান থাকে না। জীব অধ্যাসবশতঃ প্রকৃতির কর্ম্মকে নিজের কাজ মনে করে আবদ্ধ হন। "বন্ধন" কথার অর্থ এককথায় আমিত্বের বাঁধন, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদিকে নিজের করে নেওয়া। প্রকৃতিতে যা হওয়ার তাই হয়। অথচ আমি ভাবি আমি দুঃখ পাচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি। নিস্কাম ব্যক্তি কর্ম্মহীন নন, কিন্তু তাঁর ভাবটা চাকর যেমন মালিকের ইচ্ছামতন কাজ করে অনেকটা সেই ধরণের। তাই তাঁর কাজের ফল সম্বন্ধে কোনও আশা প্রত্যাশাও থাকে না। তাই তাঁর কর্ম্মে সাফল্য ও ব্যর্থতা সমতুল হয়। কিন্তু যাঁরা গুরুপদেশ পেয়ে ভাবেন সাধনা করি, কিন্তু শান্তি পাই কোথায় ? এত পরিশ্রম করি, কিন্তু যা হওয়া উচিৎ ছিল তাতো হল না। শান্তিলাভ হল কই ? এমন চিন্তা কিন্তু কোনও গুরুভক্ত সাধকের হওয়া উচিৎ নয় মোটেই। গুরুর আদেশ পালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেই নিশ্চিন্ত। তাতে লাভ লোকসান চিন্তা এলেই সব নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কম বেশি নিয়েও তাঁরা মাথা ঘামান না। শুধুমাত্র প্রভূর আদেশ পালনেই কৃতার্থ হন। এভাবে কর্ম্মসকল করতে পারলেই কর্ম্ম "ব্রহ্মণি আধায়" হয় কিন্তু কি ভাবে ? ঐ যা বলা আছে "সঙ্গং ত্যক্ত্বা" মানে ফলাভিনিবেশ ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করে। লাভালাভের চিন্তা না থাকলেই শুধু সে কাজটার জন্যেই কাজটা করা হল। তাতে পদ্মপাতা যেমন জলে থেকেও ভেজে না ঠিক সে রকম আমিও আমার কাজের দ্বারা পাপ পুণ্য, সাফল্য ব্যার্থতা ইত্যাদির জন্য সুখ দুঃখ কোনও কিছুই বোধ করি না। আসলে মনে অস্থিরতাই বন্ধন। প্রতি চক্রে চক্রে মন রেখে প্রাণের কাজ করলেই মনস্থির হয়। সুষুম্নায় প্রাণের প্রবাহ চলতে থাকলেই সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পন হয়। ব্রহ্মের অতি সূক্ষ্ম অণুতে মন লেগে থাকলে বিষয়ের এত বড় ভারি ভারি অণু আর মনকে ছুঁতে পারেনা। আর ব্রহ্মাণু এত হালকা যে বিষয়াণুর সাথে মিশলেও ওপরেই ভাসতে থাকে। বিষয় তাকে জড়িয়ে ফেলতে পারেনা। তাই সাধকও সব রকম আসক্তির ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন। এমন আসক্তিশূন্য হতে পারলেই ব্রহ্মে যুক্ত বা প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এটাই "ব্রহ্মণি আধায়"। ৫/১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ।। ১১

অনুবাদ: শরীরদ্বারা, মনদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা এবং কর্ম্মাভিনিবেশশূন্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগীগণ কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ৫/১১

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলা হয়েছে নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ম্মবন্ধনহীন হবার উপায়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে কিভাবে কোন রকম সদাচার দ্বারা সেই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করলে সেই কর্ম্মই মুক্তির হেতু হবে। কায়েন মানে শরীরের দ্বারা, মনসা বুদ্ধ্যা মানে মন ও বুদ্ধির দ্বারা, কেবল অর্থে চোখের দ্বারা, যোগীরা যে কর্ম্ম করেন তার দ্বারা প্রথমে হয় আত্মশুদ্ধি ও তারপর ক্রমে ক্রমে শরীর মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমস্ত ই রুদ্ধ হয়ে যায়। শরীরমধ্যস্থ অজস্র নাড়ী শুদ্ধ না হলে চিত্তশুদ্ধ হয় না, ফলে মনও স্থির হয় না। সূক্ষ্ম জ্ঞানপ্রবাহিকা নাড়ীগুলো সাধারণভাবে বায়ু পিত্ত কফ দ্বারা বন্ধ হয়ে থাকে, তাই আগে প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে ঐসব নাড়ীপথে চালনা করে নাড়ীগুলো শুদ্ধ করতে পারলে আস্তে আস্তে সুষুম্নার পথ পরিষ্কার হয় এবং খুলে যায়। ঐ পথে প্রাণ প্রবেশ করলেই মনস্থির হয়। প্রাণ সুষুম্নায় গেলে প্রথমেই উন্মনী অবস্থা লাভ হয়। সেটাই মনের নিশ্চল ভাব। এরই নাম স্থির বুদ্ধি। এই অবস্থা হলেই আপনাতে আপনি থাকা যায়। কিন্তু এসব ক্রিয়াকলাপ যা গুরুর নির্দ্দেশে করতে হয়, তা অনুষ্ঠানের মাধ্যমই হল শরীর, মন ও বুদ্ধি। ক্রিয়া সাধনের জন্য শরীর এবং সমাধি লাভের জন্য মন ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও সময়ে সময়ে বিভিন্ন ক্রিয়ায় অপরাপর ইন্দ্রিয়গণেরও প্রয়োজন হতে পারে। এভাবে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে করতে হবে। আসক্তি থাকলেই বুঝবে চিত্ত অশুদ্ধ। সেই চিত্তে কখনই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ৫/১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ।। ১২

অনুবাদ: ব্রহ্মে যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্ম-নিষ্ঠোৎপন্না শান্তিপ্রাপ্ত হন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনা প্রবৃত্তি হেতু ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বদ্ধ হয়। ৫/১২

ব্যাখ্যা : আগের আগের শ্লোকের পূর্ব্বাপর যে ব্যাখ্যা করা হল তাতে দেখা যায় যে একই কর্ম্মদ্বারা কেউবা মুক্ত হয় আবার কারও বা তাতেই বন্ধনদশা ঘটে। এমনটা কেন হয় ? এই শ্লোকে সেটাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এখানে দুটো অবস্থার কথা বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যুক্ত অবস্থা এবং অযুক্ত অবস্থা। অযুক্ত অবস্থা কোনও আলোচ্য বিষয় নয়। বাকী রইল যুক্ত অবস্থা। কোথায় বা কিসে যুক্ত ? ব্রহ্মে যুক্ত। ব্রহ্ম কি ? এখনও অজ্ঞাত। তাহলে যেটা জানিনা তাতে যুক্ত হয় কি করে ? সুতরাং যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ যুক্ত অযুক্তর ব্যাপার স্থগিত রেখে কি কর্ত্তব্য সেটা ভাবা যাক। ততক্ষণ কর্ত্তব্য পরমাত্মা বা পরমেশ্বরে বিশ্বাস রেখে গুরুবাক্য পালনে তৎপর হওয়া। এটাই যুক্তাবস্থা লাভের প্রচেষ্টা। গুরুবাক্যের দ্বারা সাধনে তৎপর হয়ে সাধনার পরাবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতিলাভ হলেই নৈষ্ঠিকী শান্তিলাভ হয়। এটাই যোগযুক্ত অবস্থা। যোগাভ্যাস করে এই অবস্থায় এলে আর "আমি," "আমার" বোধ থাকে না। সুতরাং এই অবস্থায় বিষয় বাসনার যে এক ভীষণ জ্বালা সেটা নিবৃত্ত হয়ে পরমা শান্তির উদয় হয়। কিন্তু যাঁরা ক্রিয়া করেন না বা করলেও অতি সামান্য মাত্র করেন, তাঁরা সাধনদ্বারা যুক্ত হতে না পারায় "আমি", "আমার" করেই দিনরাত জ্বলতে থাকেন। গুরুবাক্য পালন করে নিয়মত ক্রিয়া করতে পারলেই পরাবস্থা লাভ হয় এবং এই পরাবস্থাই যোগযুক্ত অবস্থা। যার অনুভব নিজ নিজ বোধরূপ। গুরুবাক্য অনুসারে নিয়মিত প্রাণায়াম দ্বারা এই অবস্থা সহজেই পাওয়া যায়। তখন সব জ্বালা নিবৃত্ত হয়ে পরমাশান্তির উদয় হয়। অন্ততঃ এই অবস্থাটুকু হলেও তো অনেক শান্তি। কারণ কোনও কর্ম্মেই তখন আর ফলাকাঙ্খা থাকে না। তাই আপাততঃ এটাই যুক্ত অবস্থা আর যাঁর এটুকুও নেই তাঁরই অযুক্ত অবস্থা। গুরুবাক্য অনুসারে নিয়মিত ভাবে যোগাভ্যাস দ্বারা যোগযুক্ত হতে পারলে কিভাবে পরাশান্তি লাভ হয় সেটা বুঝলেন। কিন্তু যারা এটুকুও বোঝেন না বা বুঝতেও চাননা বা বুঝেও গুরুর নির্দ্দেশ মানেন না অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁদের গুরুই নেই বা গুরুতত্ত্বে বিশ্বাসই নেই। কলিযুগে সবই সম্ভব। তাঁদের অবস্থাটা কি ? তাঁরা তাঁদের নিজেদের বোধবুদ্ধি মতই চলেন এবং তাঁদের নিজেদের প্রয়োজন, চাহিদা ইত্যাদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায়। সাথে সাথে আকাঙ্খা, কামনা, বাসনা ইত্যাদিও হু হু করে বেড়ে চলে যার পরিণাম চূড়ান্ত জ্বালা ও তীব্র অশান্তি, যার উৎস হ'ল নিয়ত কর্ম্মবন্ধন। অপরদিকে যুক্তব্যক্তির কিন্তু যোগসিদ্ধি কিছু হোক বা না হোক, শান্তিতো তিনি অবশ্যই পেয়ে থাকেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ"। ৫/১২

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ।। ১৩

অনুবাদ: জিতেন্দ্রিয় দেহী বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ঠ পুরবৎ দেহে স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া সুখে বাস করেন ৷৷ ৫/১৩

ব্যাখ্যা: সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য অনেক আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে সন্ন্যাস অর্থ অবিবাহিত থাকা নয় বা জটাজুট রেখে রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান, ত্রিশূল ধারণ এ সমস্ত কিছুই নয়। সন্ন্যাসলাভ হয় চিত্তক্ষেত্রে। সুতরাং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে সন্ন্যাসের ধারণালাভও সম্ভব নয়। অশুদ্ধ চিত্তে বরং কর্ম্মযোগ অধিক শ্রেয়। কিন্তু শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্ববর্ণিত অন্তঃসন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। সংযতচিত্ত দেহী চিত্তবিক্ষেপক সকল কর্ম্ম বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সংন্যাস করে সুখে থাকেন, মানে জ্ঞাননিষ্ঠ হয়ে অবস্থান করেন। কোথায় ? নবদ্বারেপুরে। মনে নবদ্বার বিশিষ্ট এই দেহপুরে, মানে অহংকারশূন্য দেহে। অহং বুদ্ধিবৃত্তি না থাকায় নিজে দেহের দ্বারা কিছু করেন না। কারও দ্বারা কিছু করানও না। সাধনার দ্বারা মন এমন সংকল্পশূন্য হলে পরে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলো স্বভাববশতঃ কর্ম্ম করে বটে কিন্তু সেসব কর্ম্মে দেহাভিমান থাকে না। দেহীর অভিমান না থাকায় কোন কর্ম্মই প্রকৃতপক্ষে করা হয় না। বাসনা না থাকায় বশীভূত ইন্দ্রিয়গুলো

চাকরের মত তাঁর সেবা করে মাত্র, কোনও প্রভুত্ব করেনা, ফলে সাফল্য ও ব্যর্থতা সমতুল হয়। সর্ব্বদা আত্মানন্দে থাকার জন্য কোনও কাজই তাঁর নয়। কিছুতেই তিনি জড়িত নন। “যথা চন্দ্রিকানাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণোঃ।” যার অর্থ – তুমি নিজে স্থির আছো কিন্তু সচঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত তোমার ছায়াকে চঞ্চল বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা যেমন ভুল, তেমনই আত্মা চিরস্থির। দেহের বিবিধ গতি দেখে আত্মারও বিবিধ গতি মনে হয়ে থাকে বটে কিন্তু নিষ্ক্রিয় আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব কল্পনা আপাত দৃষ্টিতে সত্যি মনে হলেও আসলে ভুল। মিথ্যা। মনই সব চিন্তা, কল্পনার ধারক বাহক। মনের স্থিরতা হলে কল্পনা, চিন্তা ওসব ফুরিয়ে যায়। নিজের কাজ না থাকলেও দেহীর দেহের নটা দরজাই খোলা থাকে, সব দরজা দিয়েই কাজ হয়, যাতায়াত হয় কিন্তু আত্মানন্দে থাকার জন্য কোনও কাজেই অভিমান থাকে না। তাই নিজে কিছু করেন না, করানও না। ৫/১৩

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ।। ১৪

অনুবাদ : ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্মসকলও সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফল সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু জীবের স্বভাবই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫/১৪

ব্যাখ্যা : জীবভাব কি ? মানে জীবের স্বভাব হল “অহং কর্ত্তা” হওয়া। এই অহংকর্ত্তা হয়েই জীব কর্ম্মফলে আবদ্ধ হয়। ঈশ্বর কিন্তু এমন কর্তৃত্বের সৃষ্টি করেন নাই। কর্তৃত্বও ফলাকাঙ্খা থেকেই আসে। যার পরিণাম ভোগ। কর্তৃত্বই পরিণামে ভোক্তৃত্ব। শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন “করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামি।” অর্থ “করি, করাই, ভোগকরি ও ভোগকরাই”। এই ধরণের কথা অজ্ঞান মোহিত হয়েই তো লোক বলে। সব কাজই নিজের কাজ, নিজে করছি, এজন্য করছি, সেজন্য করছি ইত্যাদি ভেবে কর্ম্মফলে আবদ্ধ হয়, কারণ কাজগুলোকে নিজের কাজ ভেবে অভিমান থাকে। যেমন ভূতে পাওয়া লোক ভূতের ইচ্ছামতন কাজ করে নিজের চেষ্টা মনে করে থাকে। জীবের এই ভূতে পাওয়া ভূতাবেশটা ছাড়াতে পারলেই হয়। ভূতাবেশ কেন হয় তা বলতে পারিনা। তবে চেষ্টা করে ভূত ছাড়াতে হয়। অনাদিপ্রবৃত্তি বাসনাই স্বভাব যার বশে জীব চালিত হয়। পরমাত্মার তো স্বভাব নেই অথচ জীবের এই স্বভাব কেন ? এ খুবই রহস্য। এর কারণ খুঁজে কতজন কতকথা বলেছে, লিখেছে তার সীমা নেই। “স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া”। ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই ঈশ্বরের প্রকৃতি। এই প্রকৃতি না থাকলে জগৎ সৃষ্টি হয় না। আবার “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ”। কর্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সম্পাদিত। তবে জীব বদ্ধ হয় কেন ? “অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।” অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি “আমি কর্ত্তা” মনে করে। তাই জীব বদ্ধ হয়। ভগবানের প্রকৃতি এ বিশ্ব রচনা করেও সেই কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান নেই বলে এত বড় বিশ্বকাজেও তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনা। জীবের স্বভাব আছে, ঈশ্বরেরও স্বভাব আছে কিন্তু তফাৎ হল যে জীবের স্বভাব জীবের কর্ম্মের নিয়ন্তা এবং জীব সেই স্বভাবে মিশে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়। আর ঈশ্বরের স্বভাব বা মায়া দ্বারা জগদ্ব্যাপাররূপ কাজ হয় বটে কিন্তু তিনি তাতে লিপ্ত হন না। তিনি নিজের স্বভাবের দর্শকমাত্র, কিন্তু জীবের মত প্রকৃতির বশীভূত হন না। তিনি মায়ার অধীশ্বর। কিন্তু আমরা জীবেরা মায়ার বশীভূত। তাই তিনিই বলতে পারেন “ন মাং কর্ম্মাণি লিপান্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।” কর্ম্মফল সকল আমাকে আসক্ত করেনা, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই এমনটা যিনি আমাকে জানেন তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হননা, অর্থাৎ তাঁরও অহঙ্কারাদি ঘুচে যায়। তবেই বুঝে দেখুন এই “অহং” মানে “আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল”। ভগবান তাঁর মায়া নিয়ে খেলা করেন আর জীব সেটা আসল মনে করে বিপদে পড়ে হাহাকার করে। তাই ঠাকুর, গৃহীর ভগবান, শ্যামাচরণ লাহিড়ী বলেছিলেন “আমি কচ্ছি এরূপ কূটস্থ বলেন না। কর্ম্মও তিনি কিছু করেন না ফলাকাঙ্খার সহিত। কিন্তু সকলকে সৃষ্টি করিতেছেন আর প্রকৃষ্টরূপে হইতেছেন। কর্ম্মের ফলের কিছু সংযোগ নাই তাঁহাতে। আপনার ভাবেতে তিনি রহিয়াছেন”। দুঃখপীড়িত আর্ত জীবকে তাই তিনি যেন বলছেন – তুমি এসব জগদ্ব্যাপার দেখে এত বিচলিত কেন ? আপনাতে আপনি ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থায় মগ্ন হয়ে যাও। তখন দেখবে এসব জগদব্যাপার তোমাকে স্পর্শই করছেনা। তুমি যে কি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় তার পরিচয় পাবে, তোমাকে কেবল প্রবুদ্ধ হতে হবে। শ্রদ্ধার সাথে ক্রিয়া করতে হবে। তাহলেই ক্রিয়ার পরাবস্থায় সব স্বপ্নের শেষ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। এমন এই ত্রিগুণাতীত স্থিতির মধ্যে সব ভেল্কিবাজি উড়ে যাবে। যখন দীর্ঘকাল ধরে বার বার ক্রিয়া করে বাসনার নির্মূল হয়, তখনই স্বভাব পাল্টে যায়। স্বভাবের পরিবর্তনের ফলে আর সুখদুঃখের সংযোগ থাকেনা। গীতায় ভগবান অর্জুনকে অনেক ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তোমার পথ যে অন্য। তুমি ইন্দ্রিয়দের পথে চলবে কেন ? তুমি ক্রিয়া করে আত্মস্থ হতে চেষ্টা কর, তোমার স্বভাব পাল্টে যাবে, জীবত্ব ঘুচে শিবত্ব লাভ হবে। এটাই জীবত্ব নাশের উপায়। মনে রেখো, স্বভাব বা প্রকৃতির থেকে মুক্ত থাকা, প্রকৃতির অধীন না হওয়াই মুক্তভাব, এটাই ব্রহ্মভাব। এইরকম প্রকৃতির অনধীন থাকাই ঈশ্বরভাব, নইলে প্রকৃতি আত্মাকে ঘিরে আবিষ্ট করে রাখে, জীব + আত্মা। জীবত্বের সাথেই প্রকৃতির সম্বন্ধ। জীবত্ব ঘুচে গেলে প্রকৃতিও আত্মায় মিশে যায়। জানবে প্রকৃতির সমস্ত বন্ধনের মধ্যেও জ্ঞানের অন্তঃপ্রবাহের একটা ধারা আছে, সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। তখনই সব ভয় মিটে অভয়পদ পাওয়া যাবে ॥ ৫/১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ।। ১৫

অনুবাদ: ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেননা, অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই জন্যই জন্তুগণ মোহিত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকে। ৫/১৫

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হল কূটস্থের কর্ম্ম নেই। সকলকে সৃষ্টি করলেও তাঁর সাথে কর্ম্মফলের সংযোগ নেই। সকল মায়ার অধীশ্বর হওয়া সত্তেও তাঁর কোনও কিছুতেই স্পৃহা নেই। তাই কোনও কিছুই তাঁকে আসক্তও করে না, বন্ধনও করে না। সুতরাং বিভু যদি এতই পরিপূর্ণ ও আপ্তকাম তখন তাঁর আর কোনও পাপ পুণ্য, কোনও কিছুরই বা প্রয়োজন কি ? তিনি কাউকেই পাপ পুণ্য কোন কিছুই দেন নি। শুধুমাত্র নিজ নিজ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবকে কর্ম্মাকর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন মাত্র। আর জীব অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে নিজেকে দেহ মনে করে আসক্তিপূর্ব্বক সবকিছু দেখে ও নিজের মধ্যকার সমভাবটা নষ্ট করে ফেলে(Paradise Lost)। সমভাব(balance)নষ্ট হলেই পাপ পুণ্যের উৎপত্তি হয় ও নিজ নিজ আসক্তি অনুসারে তখন জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ও জন্তুতে পরিণত হয়। মোহই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে, মোহই জন্তু বা পশুত্বের উপাদান। মোহ হল নিছক জান্তব ধর্ম্ম। জীবগণ অজ্ঞানে মুগ্ধ হয়েই ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হয়ে থাকে ও জীব থেকে জন্তুত্বের মূল শিকড়। বাইবেল গ্রন্থে এর সুন্দর বর্ণনা আছে। এ অবস্থায় বর্হিদৃষ্টি বাড়ে তাই আর আত্মচিন্তন হয় না। মন চঞ্চল হয়ে বর্হিদৃষ্টিসম্পন্ন হলেই জীব তখন স্বরূপ দর্শনে অপারগ হয়। দেহাভিমানবশতঃ সর্ব্বত্র আপনাতে কর্ত্তৃত্বভিমান হয়। সকল পাপপুণ্য ও সুখদুঃখের এটাই কারণ। যোগবলে ক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থ হতে পারলেই আত্মার বিভুপদ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব অনুভব হয়। প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা ঐ অজ্ঞানরূপ মেঘাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলে তখন সূর্য্যালোক প্রকাশের মত জ্ঞানেরও প্রকাশ হয়ে থাকে। ৫/১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ।। ১৬

অনুবাদ : আত্মজ্ঞানদ্বারা যাহাদের সেই অজ্ঞান নাশিত হয়, সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া নিখিল বস্তুজগৎ প্রকাশিত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সেই জ্ঞান পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। ৫/১৬

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলা হল যোগবলে ক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থ হতে পারলেই অজ্ঞানরূপ মেঘাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে সূর্য্যালোক প্রকাশের মত জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আপনাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানদ্বারা আগের শ্লেকে বলা অজ্ঞান নাশিত হয় এবং সেই আত্মজ্ঞান“তৎপরং’ মানে পরমাত্মভাবকে অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রাণরূপী আত্মাই হলেন সূর্য্য। “আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ।” এই প্রাণরূপী সূর্য্যের দ্বারাই সমুদায় তমঃ (অন্ধকার) নাশ হয়ে জ্ঞানালোকরূপ আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। ঐ আত্মজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞানপদে মানে কূটস্থের উপরে স্থিতিপ্রাপ্তিরূপ পরমাত্মভাবের প্রকাশ হয়। আগের শ্লোকের বর্ণিত অবস্থা অনুভব করতে পারলে সাধকের নিকট যে অবস্থা প্রকাশিত হয় সেটাই এখানে বলা হয়েছে। আত্মস্থ হতে পারলে অনাত্মদৃষ্টি দূর হয় তখন কূটস্থের আদিত্যবৎ প্রকাশ অনুভব হয়। এই প্রকাশের সাথে সাথে নিখিল বস্তুজাত জ্ঞান জন্মে ও অনু পরমাণুতে প্রবেশলাভ হয়। কিন্তু সমাধি শেষে পুনরায় অজ্ঞান অবস্থা আসে আবার দেহাত্মবোধ জেগে ওঠে। সেই জন্যেই এই যোগাভ্যাস নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। শাস্ত্রেও আছে “আদৌ স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধমানস”- মানে হল, “বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস আপনা আপনি হইয়া যাইবে”। এই জন্যই সকল কর্ম্ম ভগবদার্পিত চিত্তে করতে হয়। ইন্দ্রিয়ার্থে কর্ম্ম করতে নেই। বেদেও সেই ভাবেই বলা আছে। ক্রিয়াও সেই নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যে কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করে পরমার্থতত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥ ৫/১৬

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ।। ১৭

অনুবাদ : সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের চিত্ত আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের পরমগতি এবং জ্ঞানকর্ত্তৃক যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে, এতাদৃশ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন। ৫/১৭

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে তেমনি পরমাত্মাতে যাঁদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে তাতেই যাঁদের মন, তাতেই যাঁদের একাগ্রতা, তিনিই যাঁদের পরম আশ্রয়, তাঁর প্রসাদে যাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে ও পাপক্ষয় হয়ে গেছে, তাঁদের আর জন্মের পুনরাবৃত্তি হয়না মানে তাঁরা মুক্তিলাভ করে থাকেন এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে। যোগের দ্বারা একমাত্র কূটস্থে লক্ষ্য রাখতে পারলে তাঁদের জন্য আর বাইরের ক্রিয়া কিছু থাকেনা। একমাত্র আত্মায় লক্ষ্য থাকলে আর কোনও কিছুতেই লক্ষ্য থাকেনা। তখন আর কোনও চঞ্চলতা বা পাপের জায়গা কোথায় ? চেতনা সকল অনু পরমাণুতে প্রবেশলাভের ফলে তখন সকলই চৈতন্যময়। সকলই ব্রহ্মময়, সকল অজানার রহস্যভেদ হয়ে গেলে আর মরীচিকায় প্রবেশের সম্ভাবনা নেই। অতএব আগমন ও নির্গমনরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অতীত যে

মুক্ত অবস্থা তাতেই নিঃশেষরূপে স্থিতিলাভ হয়। জন্মজন্মান্তরের মূল কারণ যে অজ্ঞান সেটা বিনষ্ট হলেই হল ॥ ৫/১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।। ১৮

অনুবাদ : (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) জ্ঞানীগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে (সর্ব্বত্র) সমদর্শী। ৫/১৮

ব্যাখ্যা : আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীগণের অবস্থা কেমন হয় ? তারই লক্ষণ বর্ণনা হচ্ছে। যাঁর কর্ম্মের অতীত অবস্থায় স্থিতি হয় এবং "আমি কে" ? এটা জানতে পারেন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি সর্ব্বত্রই আত্মাকেই দর্শন করে থাকেন। এটাই আত্মবিদ্যা যা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মানে ব্রাহ্মণে আছে। সেই আত্মা চণ্ডাল, গাভী, হস্তী, কুকুর ইত্যাদি সবকিছুতেই আছে। সুতরাং জ্ঞানীগণ সর্ব্বজীবে আত্মদর্শন করে সমদর্শী হয়ে থাকেন। কারণ আত্মা কোনও বস্তুর গুণের সাথে মিশে যায় না, নির্ব্বিকার। তাই সেই আত্মাকে যিনি দেখতে পান তাঁর চোখে বিভিন্নদেহে প্রকটিত চৈতন্য একই বলে বুঝতে পারেন। যেমন নদী, নালা, খাল, বিল, জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য একই, সেই রকম সর্ব্বজীবের দেহস্থিত আত্মাও একই রূপ ॥ ৫/১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।। ১৯

অনুবাদ : যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত, সংসারে থাকিয়াই তাঁহারা সংসার জয় করিয়াছেন; যেহেতু ব্রহ্ম (সর্ব্বত্র সমান ও নির্দ্দোষ); অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৫/১৯

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটা আগের শ্লোকের ব্যাখ্যাটাকে আরও একটু পরিষ্কার করেছে। কারণ বিষমে সমদর্শন নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই কাজ যাঁরা করে থাকেন তাঁরা আবার পণ্ডিত কিসের ? এছাড়াও ঋষি গৌতম বলেছেন অসমান ব্যক্তিগণকে সমভাবে পূজো করলে সেই পূজক ইহলোক ও পরলোকে হীনতা প্রাপ্ত হয়। একথা যদি ঠিক হয় তবে সমদর্শীগণ পাপভাগী হবেন না কেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে ব্রহ্ম সম এবং নির্দ্দোষ। সুতরাং যাঁরা ব্রহ্মে অবস্থান করে ব্রহ্মভাব পেয়েছেন তাঁরা এ সংসারের বাইরে। সংসারের নিয়মের তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম। সুতরাং সেক্ষেত্রে এটা খাটেনা। তাঁরা এ নিয়মের বাইরে। জীবদ্দশাতেই তাঁদের সংসার নিরস্ত হয়ে গেছে তাই তাঁদের মন সমত্বে অবস্থিত হয়েছে । এমন সমতাপ্রাপ্ত মন আর মন নয়। সেটা হল ব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং ঋষি গৌতমের এ নিয়মদর্শন এমন ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির আগের অবস্থা পর্য্যন্ত প্রযোজ্য মাত্র। কারণ জীবের সাথে জীবের পার্থক্য আছে সত্যি কিন্তু জড়ের সাথে চেতনের প্রভেদ আকাশ পাতাল। তবুও সকল বৈসাদৃশ্যের ও বৈষম্যের মধ্যেও একটি পরম ঐক্য আছে যেটি জীবের আত্মা যা অনন্ত জড় পদার্থেরও সত্তা বা মূল। আত্মা বা সত্তাময় ভাবটি কিন্তু নির্লিপ্ত বলেই দেহাদির সাথে তার সম্বন্ধ নেই। যাঁর মন সাধনার দ্বারা চিদাকাশে মিশে গেছে তাঁর নিকট সমস্তই ব্রহ্মময়। সকলই সমান। এজন্যই তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হাতী, কুকুর সব সমান। তাঁর সুখ এসংসারেই। কেননা তিনি সমতাকে পেয়েছেন, তাঁর মনই ব্রহ্ম। তাঁর স্থিতি ব্রহ্মযোনিতে সর্ব্বদা। তাই তাঁর দোষ নেই। তিনিও সর্ব্বত্রতে সমান। ৫/১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।। ২০

অনুবাদ : ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে অবস্থিত ও মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও বিষণ্ণ হন না। ৫/২০

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলা হচ্ছে। ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মেই লেগে আছেন এমন স্থির, যুক্তবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বুদ্ধি সর্ব্বদা আত্মাতেই লেগে থাকে। কেননা সাধনার দ্বারা প্রাণ স্থির হলে মন বুদ্ধি স্থির হয়, তখনই ব্রহ্মে স্থিত হওয়া যায়। উচ্চ শ্রেনীর সাধকেরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে মন চঞ্চল হয়ে বিষয়ের দিকে ছোটে। তখন আরও যত্ন সহকারে সাধন করতে পারলে মন বুদ্ধি স্থির হয়ে আবার সব একাকার হয়। তখন আর দেহাত্মবুদ্ধি থাকেনা, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হন। ক্রিয়ার দ্বারা বিপরীত ভাবনা নষ্ট হলেই এটা হয়। অনিত্য দেহকে নিত্য মনে করাই বিপরীত ভাবনা। এই বিপরীত ভাবনা নষ্ট হলে মনের আত্মাকারে স্থিতি হয়। এটাই আত্মসাক্ষাৎকার এবং অদ্বৈতভাবে অবস্থিতি। এ অবস্থায় ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি ব্যতীত অন্য বুদ্ধি উৎপন্নই হয় না। আর অন্য বুদ্ধি না থাকলে প্রিয় বা অপ্রিয়, হর্ষ বা বিষাদ কিছুরই বোধ থাকেনা। অবস্থাটা অনেকটা মড়া মানুষের মত। মড়ার যেমন প্রিয় অপ্রিয় কিছুই থাকেনা। মৃতদেহের কাছে বসে আত্মীয়রা কান্নাকাটি করলেও মৃতদেহ সাড়া দেয় না। তেমনই যিনি জীবন্মৃত পদে আছেন তাঁরও প্রিয় অপ্রিয়, ভাল মন্দ কিছুই নেই, কারণ তিনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দেখছেন ॥ ৫/২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ।। ২১

অনুবাদ : বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সকলে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে শান্তিসুখ, তাহা লাভ করেন; তিনি ব্রহ্মে যোগদ্বারা যুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। ৫/২১

ব্যাখ্যা: সকল রকম অস্থিরতা, চঞ্চলতা ও অসুস্থতার মূল কারণই হল মোহ। এমনকি আমাদের জন্মমৃত্যুর চক্রে প্রবেশও এই মোহ থেকেই। সেই মোহ নিবৃত্ত হলেই বুদ্ধির স্থিরতা আসে তখন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয় উপলব্ধি হয় তাতে আর আসক্তি থাকে না। এমন অনাসক্তি এলেই অন্তঃকরণে একটা, কি বলব, উপশমাত্মক শান্তি অর্থাৎ যে সাত্ত্বিক সুখ আছে তার অনুভব হয়। এমন সুখের ক্ষয় নেই, অন্যান্য সুখ ক্ষণস্থায়ী। তখন বাইরের হাওয়া বাইরে বইছে, আর ভিতরের বায়ু ভিতরে, মানে প্রাণাপানের কাজ চলে। সাধকের অন্তঃকরণে নিরন্তর আনন্দের প্রবাহ চলতে থাকে। চিত্তের স্থিরতাই আনন্দ। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত স্থির হলেই এ আনন্দ পাওয়া যাবে। “চলে বাতে চলচ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।” বিষয়ের দ্বারা যে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ আমরা পাই, সেটা কিভাবে ? আকাঙ্খিত ও কাম্য বিষয় পেয়ে সাময়িকভাবে চিত্ত স্থির হয় বলেই যৎসামান্য আনন্দ হয়ত পাই। নইলে বিষয়ে আনন্দ নেই। বিষয়ের দ্বারা সুখ হয় এটা শুধুমাত্র মনের ভূল বা সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। বিষয়ে সুখ থাকলে ধনীদের আর দুঃখ থাকত না। যাক সেসব অন্য কথা। স্থিরতাজনিত যে আনন্দ সেসব বাহ্য চিন্তা বর্জিত। সবরকম কাম, কামনাবর্জিত এক নিশ্চল অবস্থা। যখন প্রপঞ্চের উপশম হয়, মানে এরা (বষবসবহঃং) আর কোনও সুখ দুঃখ তৈরী করতে পারেনা, তখন অনন্ত শান্তি লাভ করা যায়। যার সাথে অন্য কোনও ঐহিক সুখের তুলনা চলেনা। নইলে দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন যেমন হয় তেমনি ভাবে সুখ দুঃখ কম বেশি করে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, “চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ,” কিন্তু প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তস্থির হলেই পরমানন্দ লাভ হয়। তখন আনন্দের জন্য আর বিষয় দরকার হয় না॥ ৫/২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দূঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ।। ২২

অনুবাদ: বিষয় জনিত যে সকল সুখ, সে সকল সুখ নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য। হে কৌন্তেয়, এ জন্য বিবেকী ব্যক্তি এ সকলে রত হন না॥ ৫/২২

ব্যাখ্যা : বেশ তো, আগের শ্লোকের কথামত প্রিয় বিষয়ভোগের নিবৃত্তিতেই যদি প্রকৃত সুখ মোক্ষ হয়, তবে সেই নিবৃত্তি সাধক মোক্ষ কি ভাবে পুরুষার্থ হতে পারে ? যদিও এর উত্তর কিছুটা আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায়ই বলা হয়েছে, এখন বাকিটা শুনুন। বিষয় সম্পর্কিত যে সকল ভোগসুখ যথা অর্থকড়ি সম্পর্কিত, যা কিছু স্পর্ধা, অসূয়াদি দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে অথবা ইন্দ্রিয়জনিত ভোগসুখ, রমণ, মৈথুনাদি এতে বায়ুর ক্ষণিক অন্যদিকে মনোযোগ করাতে সাময়িক ভোগ হয়, সুখও হয় ঠিকই, কিন্তু সেই ভোগের আগে ও পরে খুবই দুঃখ হয়। আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্পন্দনতত্ত্ব আলোচনা করেছিলাম সে কথা স্মরণ করুন তবে বিষয়টার অনুভব সহজ হবে। কারণ সুখ ফুরিয়ে গেলেও, ভোগের শক্তি শেষ হয়ে গেলেও প্রাণে কিন্তু সেই ভোগের ও ভোগজনিত সুখের স্পন্দন থেকে যায়। সেই স্পন্দন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। প্রাণের সেই স্পন্দনে মন ভোগকে নিয়ত না পেয়ে ভোগলালসায় উন্মত্তবৎ হয়ে ওঠে। ভোগের শক্তি যত নিঃশেষ হয়ে আসে, তৃষ্ণা ততই বেড়ে ওঠে। এর ফলে, ভোগবাদী ও জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী জীবের অবস্থা সত্যই বড় করুণ হয়। আমার কর্ম্মজীবনে আমি একাধিক প্রতিপ্রত্তিশালী, অর্থবান শ্বশুরকে পুত্রবধুর সতীত্বহানি, তথা ধনী প্রতিপ্রত্তিশালী, মান্যগণ্যা মহিলাগণের নিজ জামাতা বোনপো, ভাসুরপো ও ভাইপো অথবা কম বয়সী ছেলেদের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা জানি। এসবই স্পন্দনতত্ত্বের কারণে ঘটে থাকে। প্রাণের স্পন্দন বিভ্রাটেই অতি সাধারণ বিচার বিবেকও নষ্ট হয়ে যায়। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত এত নীচে নেমেও কিন্তু প্রাণের হাহাকার কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। ভোগের বিকৃত উপকরণ পেলেও দুঃখ, না পেলেও দুঃখ ও দাহ শেষ পর্য্যন্ত থেকেই যায় যাতে করে জীব ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে অথচ বাইরে থাকে সুদৃশ্য পোষাকের আচ্ছাদন ও কসমেটিকের মোহময়ী আবরণ। এদিকে চিত্ত গাঢ় তমাসাচ্ছন্ন আর বুদ্ধি হয় ম্লান, কিন্তু কুবুদ্ধি ও কুটিলতা পুষ্টিলাভ করে থাকে। সেই বিচার বুদ্ধিতে কখনও মনে হয় না এসব বিষয়জনিত ভোগসুখ অফুরন্ত, এরা আমার কেউই নয় অথচ এর আদিতে ও অন্তে দুঃখ। প্রতিক্ষণে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত কোন অদৃশ্য কোটরে লুকিয়ে যায় বোঝাও যায় না। আর বোঝা গেলেও প্রাণের হাহাকার ও দুঃখ তাতে একটুও কমে না। পুত্র ধনাদিতে আসক্ত জীব সে সমস্ত র বিয়োগে কতই না ব্যাথাতুর ও বিধুর হয়ে ওঠে। তাই বিবেকী ব্যক্তিরা শান্তভাবে বিচার করে এসমস্ত বিষয় লালসা থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। মনে বিষয়াসক্তি থাকলে যেকোনও অবস্থায়ই শান্তি পাবেনা একথা নিত্যসত্য। বিষ্ণুপুরাণেও আছে “যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান মনসঃ প্রিয়াম্। তাবন্তোহস্য নিধনন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥” জীব যতই বাহ্য বিষয় ভাল বাসবে, ততই শোকরূপী শঙ্কু তার হৃদয়কে বিদ্ধ করবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন –

“ নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার শুধু
পথিকে ধাঁধিতে।”

প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ বা আধুনিক সাহিত্যেও একবাক্যে স্বীকার করা হয়েছে যে স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে অনুরাগ যার যত বেশী, ততই সে বিবিধ দুঃখের জালায় জ্বলতে ও পুড়তে থাকে। কি মর্ম্মান্তিক ! বিভিন্ন কারণে যাঁদের মন ও প্রাণের সমতা নষ্ট হয়েছে, তাঁদের ভগবান সাবধান করে দিচ্ছেন যে বাস্তবিকই বিষয়ে সুখ নেই, সুখ আত্মাতেই আছে। যদি সুখ চাও, তবে বিষয়ে মনকে ছুটিও না। বিবেক দ্বারা বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করে আত্মস্থ হবার উদ্যোগ কর। সদা সতর্ক থেকো নইলে ভোগবাদ বিচিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, বিভিন্ন সেমিনারে নিয়ে গিয়ে তোমায় পথভ্রষ্ট করবে, বিভ্রান্তিকর সব দর্শন প্রচার করবে। উঠে এসো, আসক্তিই তো জীবনের সার, টাকায় পুত্রশোক নিবারণ করে। অপরিমিত অর্থ উপার্জনে ব্রতী হও। তোমার আগামী চার পুরুষ বসে খাবে। আমার উৎপাদিত ভোগ্যবস্তুর বিপণন কর। মিথ্যাকে সত্যের রং এর প্রলেপ দিয়ে উদ্দীপিত কর। নিজে ও সপরিবারে উদ্দীপিত হও। প্রয়োজনে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকেও শর্করাবরণ হিসাবে কাজে লাগাও। সর্ব্বপ্রকার অশান্তিকে আমন্ত্রণ করার প্রতিযোগীতায় সামিল হও। অতএব সাধক সাবধান। প্রাণবায়ুর নিরোধদ্বারা প্রাণস্পন্দন রহিত হয়ে গেলে মন থেকে বিষয়স্পৃহা মুছে যাবে। স্পন্দন রহিত না হলে মন আত্মস্থ হতে পারবেনা। অতএব প্রাণস্পন্দন রহিত যাতে হয় সেই পথ ধরে চল, তাহলে আর আদ্যন্তযুক্ত বিষয়ের মোহে পড়ে ব্যাকুল হতে হবেনা ॥ ৫/২২

> শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরাবিমোক্ষণাৎ।
> কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ।। ২৩

অনুবাদ: যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কামক্রোধজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং তিনিই সুখী অর্থাৎ মৃত্যুর পরে রোরুদ্যমানা যুবতী ভার্য্যা কর্তৃক আলিঙ্গ্যমান হইয়াও এবং পুত্রাদি কর্তৃক দহ্যমান হইয়াও যেমন প্রাণহীন ব্যক্তি কাম ক্রোধ বেগ সহ্য করে, জীবিত থাকিয়াও যিনি (ইন্দ্রিয়জনিত যাবতীয় আবেগ) সেইরূপ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং সুখী ॥ ৫/২৩

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে ভগবান কামক্রোধের বেগকে সহ্য বা প্রতিহত করার কথা বলছেন। আগের শ্লোকে তো বললেন বিষয়ে সুখ নেই। তবে তো বিষয় ত্যাগ হলেই হল। তাহলে এখানে কামক্রোধকে সহ্য করার কথা বলছেন কেন ? বলছেন এই জন্যই যেহেতু মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং কাম ক্রোধাদির বেগ তার প্রতিপক্ষ অতএব সেটাকে সহ্য করার শক্তি সামর্থ্যই তো মুক্তির চেষ্টায় সাফল্য। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় সমূহের জন্য মনে যে তীব্র বেগ হয় সেটাই কাম। আর সেই কাম বাধা পেলে মনে যে তীব্র বেগ বা প্রতিক্রিয়া শুরু হয় সেটাই হল ক্রোধ। তাই কাম ও ক্রোধ আসলে একই জিনিষ। মানব জীবনে এমন একটি শত্রু আর নেই। আর মজার কথা হল এই যে বুদ্ধিদ্বারা এর অনিষ্টকারিতা বুঝলেও কিন্তু তাতে কাম বা ক্রোধ কোনও কিছুরই হ্রাস হয় না। বরং দেহ ও মনে সাত্ত্বিকভাব স্ফুরণের সাথে সাথে বিষয়ের তীব্র আকর্ষণ কমতে থাকে। এভাবে কমতে কমতে অবশেষে গুণাতীত অবস্থায় এই কামক্রোধের বেগ আর কিছুই থাকে না। সুতরাং আগে চেষ্টা করা উচিত কিভাবে সাত্ত্বিক ভাবকে বাড়ান যায় ? সাত্ত্বিকভাব বাড়তে পারে যদি প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণকে স্থির করা যায়। প্রাণের আগম নির্গম স্থির হলে সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধিও স্থির হয়ে যায়। এই স্থিরতা লাভ করাই সাত্ত্বিকতার লক্ষণ। এই স্থিরভাব ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে এতদুর বাড়ে যে এর দ্বারা সাধক গুণাতীত হতে পারেন। যোগশাস্ত্রে আছে – "মনোস্থৈর্য্যে স্থিরো বায়ুস্ততো বিন্দুঃ স্থিরো ভবেৎ। বিন্দুস্থৈর্য্যাৎ সদা সত্ত্বং পিণ্ডস্থৈর্য্যং প্রজায়তে।" মনের স্থিরতার সাথে সাথে অন্তঃ প্রাণবায়ু স্থির হয়, প্রাণবায়ুর স্থিরতার সথে সাথে বিন্দু স্থির হয়, বিন্দু স্থির হলে সদা সত্ত্বভাব এবং এই শরীরের কাম, ক্রোধ, লোভাদি তৃষ্ণারও শান্তি হয়। কিন্তু মনোবেগ প্রবল হলেই পিণ্ডদেহকে আর স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে সুতরাং দেহমধ্যস্থ প্রধান ধাতু ক্ষয় হয়ই। ফলে শরীর মন প্রাণ সবই শক্তিহীন ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শরীর মন নষ্ট হলে আর সাধন করবে কি দিয়ে ? আগেই তো বলেছিলাম যে "শরীর ধারণ হরির কারণ"। আগেও বহুবার আলোচনা হয়েছে যে কামের বাস হল মনে। মনের লালসা মনের বিক্ষেপ থেকেই উৎপন্ন হয়। মনের সেই বিক্ষেপ ভাবকে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব। মনের অভ্যন্তরস্থ সেই কাম বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, চিত্তের যে বিক্ষেপ সৃষ্টি হয় তার থেকে প্রচণ্ড মনোবেগ সৃষ্টি হয়ে শরীর ও হৃদয়কে যে ধাক্কা দেয় তা থেকেই হার্ট এ্যটাক বা আরও বিপদজনক কিছু হয়ে পড়ে। যাই হোক, বাধাপ্রাপ্ত কাম মনে বিক্ষোভ তোলে ও এক অব্যক্ত ক্রোধ এসে নিজেকে ভিতরে ভিতরে ধ্বংস করতে থাকে। এজন্যই শ্রীভগবান বলেছেন "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দূরাসদম্।" যাহোক বিষয়ের সংস্পর্শে না এসে থাকাও যায়না। বনে গেলেও বিষয় সঙ্গ নিবৃত্ত হয় না। ঠিক এজন্যই বহুলোক বনে গিয়েও বা অন্যান্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করেও কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারেনি, শান্তি পাওয়া তো দূরের কথা। একমাত্র আত্মা বা ভগবানে অনুরাগ প্রবল হলেই বিষয়ানুরাগ কিছুটা কমতে পারে। সেজন্য যখনই জানতে পারবে যে মনে কোনও সংকল্প জাগতে শুরু করেছে তখনই প্রবুদ্ধ হয়ে মনকে সেই বিষয় চিন্তা থেকে বিরত করবে। এর একটা সুন্দর উপায় হল তক্ষুনি মন দিয়ে দশ বারোটা প্রাণায়াম করা। প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গেই সকল আবেগও শেষ হবে। পিণ্ডস্থ পঞ্চভূতাত্মক ভাবই পঞ্চতত্ত্ব যার স্থান পঞ্চচক্রে। এই সকল চক্রের মধ্যে দিয়ে মনের যাতায়াত হতে হতে মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় এবং ক্রমশঃ সুষুম্না ভেদ করে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভের শক্তি আসে। এই আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভকেই শরীর বিমোক্ষণ বলা হয়েছে। যদিও একটা কথা বলা দরকার তা হল পঞ্চতত্ত্বের সাধনার সময় অনেক শক্তি লাভের সাথে সাথে কিন্তু কাম ক্রোধের বেগও অস্বাভাবিকভাবে বাড়ে। আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থের মধ্যে প্রবেশের আগেই এতসব কামাদি বেগকে যিনি

সহ্য করতে না পারেন তিনিই যোগভ্রষ্ট হয়ে যান। একমাত্র গুরুকৃপায় যিনি সফল হন তিনিই চিদাকাশে প্রবেশলাভ করে ধন্য হন এবং সুন্দর খং মানে শূন্যে বা চিদাকাশ আশ্রয় করে অনন্ত আনন্দধামে প্রবেশ করেন। তিনিই তখন যোগযুক্ত ও প্রকৃত সুখী মানুষ। ৫/২৩

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ।। ২৪

অনুবাদ : আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আমোদ, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, তিনিই যোগী। তিনিই ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৫/২৪

ব্যাখ্যা: পরমপুরুষার্থ মোক্ষের জন্য প্রয়োজনে কামক্রোধাদির প্রচণ্ড বেগ ধারণ ও তৎসহনের কথা ভগবান আগের শ্লোকে বলেছেন, কিন্তু এই শ্লোকে বলছেন সেই সাথে আরও কিছু করা আবশ্যক। শুধুমাত্র কামক্রোধের বেগ সংবরণই যথেষ্ট নয়। সেই আরও কিছুটা কি ? সেটা হল "মনঃস্থং মনোমধ্যস্থং মনস্থং মনোবর্জ্জিতং। মনসা মনমালোক্য স্বয়ং সিদ্ধন্তি যোগিনঃ॥" এখানে ব্রহ্মতে স্থিরবুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ক্রিয়াকরে ক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থিতি লাভ করলে মনের এমন স্থিরতা পাওয়া যায় ও মনোমধ্যস্থ হয়ে থাকা যায়। স্থির মনে কোনও সংকল্পের বেগ থাকেনা। সেই ব্রহ্মবুদ্ধি, ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্ব, যে ভাবেই বলি না কেন, হয় মনোমধ্যস্থ, কিন্তু মন সেখানে থাকেনা। মনের চারিদিকের পরিধি কমতে কমতে মন একেবারে কেন্দ্রগত হয়ে পড়লে তখন সেটা আর মন থাকেনা অথচ মনমধ্যস্থও বটে। এইভাবে স্থিরীকৃত মন দ্বারা মনাতীত আত্মাকে দর্শন করে যোগীরা সিদ্ধিলাভ করেন। তখন বিষয়ের আনন্দ আর থাকেনা। চাই তখন শুধু সেই আত্মজ্যোতি, যাকে রবীন্দ্রনাথ "সোনার হরিণ চাই" বলেছেন। সেখানে সকল রূপের অন্তররূপ প্রকাশ পায়, যা আলোকও নয়, অন্ধকারও নয়। এ অবস্থায় থাকতে থাকতে ক্রমশঃ একটা আলাদা অনুভব প্রাপ্ত হয় যাকে ব্রহ্মপদ বলে। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে তখন আর বিষয় দর্শন হয় না, শুধুই ব্রহ্মদর্শন বা সমাধি। তখন আর কোনও আকর্ষণও নেই, বিকর্ষণও নেই। সর্ব্বপ্রকার (বিষয় জনিত) তাপ থেকে সদামুক্ত। শুধুই ব্রহ্মেতে অবস্থান ও পরিণতিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ। ৫/২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ।। ২৫

অনুবাদ : ক্ষীণপাতক, ছিন্নসংশয়, সংযতচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতে রত, সম্যগদর্শী ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ৫/২৫

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে যে অবস্থার কথা বলা হল সেটা ছিল ব্রহ্মনির্ব্বাণ পদ। নির্ব্বাণপদ ঋষিরা নিষ্পাপ তো হবেনই কারণ ওঁদের ব্রহ্মব্যতীত অন্য কোনও কিছুতেই দৃষ্টি নেই। তবে হ্যাঁ, নির্ব্বাণপদ পাওয়ার আগে এমনটি নিষ্পাপ অবশ্যই হওয়া চাই। পাপ মানে এখানে " একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি " অবস্থা থেকে বিচ্যুতি, মানে হল ব্রহ্মব্যতীত অন্যদিকে দৃষ্টি যাওয়াই পাপ। পাপশূন্য হতে পারলেই জ্ঞানলাভ হয়, সেটা হল নির্ব্বাণপদের একমাত্র সেতু। নির্ব্বাণলাভ হলে শুধুমাত্র আত্মকারাবৃত্তি থাকে, তাই সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়। গুরুই আত্মা, আত্মাই গুরু। " আত্মা বৈ গুরুরেকঃ"। তাই সবই গুরুবৎ পূজনীয় মনে হয়। এই অবস্থালাভ হলে মায়ামুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, যাঁরা ভগবদ্‌লাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁদের প্রতি কৃপালু হয়ে, তাঁদের গোপনীয় পরমগুহ্য সাধনরহস্য বলে দেন ও শিষ্যত্ব প্রদান করেন যার দ্বারা ভগবদ্‌স্বরূপ অনুভব হয়, যে অনুভবদ্বারা সাধক মোক্ষপথে যথাযথ অগ্রসর হতে থাকেন। এভাবেই ঋষিগণ সর্ব্বভূতের হিতে রত হন ॥ ৫/২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ।। ২৬

অনুবাদ : কামক্রোধ-বিমুক্ত, সংযতচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণের উভয়ত্র ব্রহ্মনির্ব্বাণ (মোক্ষ) আছে, অর্থাৎ দেহান্তেই যে তাঁহারা মুক্ত, এমন নয়, জীবিতাবস্থাতেও তাঁহারা মুক্ত ॥ ৫/২৬

ব্যাখ্যা : সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও ব্রহ্মে লক্ষ্যসম্পন্ন যাঁরা তাদেরই যতি বলা হয়। সাধনাদ্বারা দেহাভিমানশূণ্য হতে পারলেই তাঁদের আর শরীরে কামক্রোধ উৎপন্ন হয় না। এ অবস্থা পেয়ে সদা সাধনশীল মানে প্রাণায়ামপরায়ণ ও ক্রিয়ায় লেগে থাকতে পারলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ইতিপূর্ব্বে ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম থেকে ৯ম শ্লোক পর্যন্ত এর বিশদ আলোচনা হয়েছে। তাই আর পুনরুল্লেখ করলাম না। বিদিতাত্মা যোগীগণ যে শুধু মৃত্যুর পরই মুক্তিলাভ করেন তাই নয়, দেহে থেকেও তাঁরা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিবশতঃ সদা মুক্ত। একথা ২৪ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও বলা আছে। যাহোক এই মোক্ষলাভের অন্তরঙ্গ সাধনকথা এর পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন । ৫/২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপাণৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ।। ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ।।২৮

অনুবাদ : রূপরসাদি বাহ্য বিষয় সকল বাহিরেই রাখিয়া চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণাপান বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমকারী, মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূণ্য যে মুনি, তিনি সদা মুক্ত। ৫/২৭-২৮

ব্যাখ্যা : আগের আগের শ্লোক সমূহে যে সকল শ্রেষ্ঠ অবস্থাপ্রাপ্তির কথা বলা ও আলোচনা করা হয়েছে, সেই অবস্থা পাওয়ার জন্য যেসকল সাধন করতে হয়, সেই সমস্ত অন্তরঙ্গ সাধনার মূলসূত্র মাত্র এই দুটি শ্লোকেই শ্রীভগবান বলে দিয়েছেন। ভগবান তো মাত্র দুটো শ্লোকেই বলে দিলেন কিন্তু তা বোঝেই বা কে আর বোঝায়ই বা কে ? এই নিজে বোঝা এবং পরে অন্যকে বোঝাবার সমস্যার জন্যই এই অমূল্য যোগবিদ্যার অবলুপ্তি হয়েছে। যাই হোক, আগে নিজে বুঝে নিয়ে পরে অন্যকে বোঝাবার দায়িত্ব যিনি পালন করতে পারেন, তিনিই গুরু। তাই এই বিদ্যার নাম হয়েছে গুরুমুখী বিদ্যা। যে কথা শুরুতেই বলে রেখেছি যে শুধু গ্রন্থপাঠে এ বিদ্যা বোঝা বা জানা যায় না। গুরুসেবা করে জেনে নিতে হয়। আর এর আগে যে অনুবাদ করা আছে সেটাকেও একটু পরিষ্কার করে বলতে হবে। আক্ষরিক অনুবাদ যথেষ্ট নয়। ২৪ নং শ্লোকে “স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং” ইত্যাদি বলা হলেও ঠিক কিভাবে সেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয় ? রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ে ভাবলেই তো অন্তরে প্রবেশ করে। তাই চিন্তাকে ত্যাগ করে দিতে হবে প্রথমেই। চক্ষু ভ্রূর মধ্যে থাকবে এবং কোনও চোখেই পলক পড়বে না। চোখের ব্যাপার হল চোখের পাতা একটু বেশী নিচে আনলেই ঘুম পায় ও সেই ঘুমের দ্বারাও মনের লয় হয়। আবার চোখের পাতা টান টান করে খুলে চোখ মেলে ধরলে মন বাইরে ছোটে তাই চোখকে আধবোঝা করে রাখতে হবে। আর উচ্ছাস ও নিঃশ্বাসরূপে নাকের ভিতর চলাচল কারী প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধ ও নিম্ন গতিকে নিরোধ দ্বারা সমান অর্থাৎ কুম্ভক করে অথবা প্রাণ যাতে বাইরে না আসে এবং অপান যাতে ভিতরে না ঢোকে অথচ উভয় বায়ুই নাসিকার মধ্যেই (inside nostril) সঞ্চরণ করে এমন মৃদু মৃদু উচ্ছাস নিঃশ্বাস দ্বারা প্রাণ ও অপানকে সমান করে সেই উপায় অবলম্বনে মন ও বুদ্ধি সংযত হয়। এভাবেই অভ্যাস করতে করতে প্রথমদিকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য ও ধীরে ধীরে অভ্যাস বাড়াতে পারলে মোক্ষপরায়ণ ও নিষ্ক্রিয় হওয়া যায়। সজ্ঞানেই নিজেকে ইচ্ছারহিত ও ভয়, ক্রোধ রহিত করতে পারা যায়। এই অবস্থাকে পাকাতে পারলে মুনি হওয়া যায়। তবে এসব শুধু বই পুস্তক পড়ে হয় না। হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুকে বর্হিগমন থেকে নিবৃত্ত করে গুহ্যস্থ অপান বায়ুতে পাঠানো ও বিপরীত ভাবে অপান বায়ুকে হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুতে নিয়ে আসার যে কাজ বা ক্রিয়া এটাই প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ ক্রিয়া এতে কষ্টের কোনও ব্যাপার নেই। অভ্যাস করতে করতেই প্রাণবায়ু সুষুম্নামধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায় – “সুরত নিরত মন পবন পর সোহহং সোহহং হোয়”। সে বড় অদ্ভুত অবস্থা! আপনা হতেই নাসিকা পথে উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসে ‘হংস’ এবং নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসে ‘সোহহং’ এর মূর্চ্ছনা জেগে ওঠে আর মেরুদণ্ডে থর থর কম্পন অনুভব হয়। হং+সঃ এই দ্বিধাবিভক্ত মন্ত্র আপনা হতেই জপ হতে থাকায় কিছুক্ষণ পরেই অনুভব হয় শুধু অনুলোম ক্রমে ‘হংসঃ’ অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা এবং বিলোমক্রমে ‘সোহহং’ = (সঃ + অহং) অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই আমি এমনতর বোধের স্ফূরণ হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট অনুভব হবে ঐ অনুলোম বিলোম ক্রমে শুধু নিঃশ্বাস উচ্ছাস ও উচ্ছাস নিশ্বাস শুধুমাত্র প্রাণবায়ুর যাতায়াত নয়, ঐ পথে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক জ্যোতির রেখাই কেবল ওঠানামা করছে। আমার যেন কোনও দেহ নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নেই, বোধশক্তিও নেই, কেবল নাসারন্ধ্র সংলগ্ন একটা উল্টানো ইংরাজী অক্ষর ইউ এর দুই নল দিয়ে জ্যোতির ধারা ঝিলিকে ঝিলিকে যাতায়াত করছে আর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ঐ জোতির্ম্ময় উল্টানো ইউ নলের সন্ধিস্থলে গিয়ে মূহুর্ত্তের জন্য ঐ জ্যোতির রেখা, চিতিশক্তির নর্তনক্রিয়া বা গতি স্থির হচ্ছে। ঐ অবস্থায়ই কূটস্থে শ্রীগুরুদেবের দর্শন মেলে। তিনিই প্রোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। বলে দেন – ঐ যে চিতির ধারা ছোটাছুটি করছে, ঐ প্রাণোপহিত চৈতন্যই তোমার স্বরূপ, প্রতি জীবেরই স্বরূপ। হং=অহং= ব্যষ্টিপ্রাণোপহিত চৈতন্য বা জীব। ব্যষ্টিভাবে জীব, সমষ্টিভাবে ঈশ্বর।

ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থলে ঐ জ্যোতির্ম্ময় ইউ এর দুই নলের সন্ধিস্থলে গিয়ে চিতিশক্তির যাতায়াতে যে পলককাল মাত্র বিরতি বা স্থিতি ঘটে ওটাই হল বিরতিক্ষণ, স্থিতিক্ষণ বা স্বাভাবিক কুম্ভকক্ষণ। যোগীগণ এই বিরতিক্ষণকেই তীব্র সাধনদ্বারা বাড়িয়ে নিয়ে প্রাণশক্তি স্বরূপে স্থিত থাকতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কারণ ঐ বিরতি বা স্থিতিক্ষণেই জীব প্রাণশক্তিস্বরূপে স্থিত হয়।

“মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃ স্থৈর্য্যং প্রজায়তে।
সুষুম্নাবাহিনী প্রাণে শূন্যে বিশতি মানসে।
তদা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নির্মূলয়তি যোগবিৎ ॥
যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে।
তদা সমরসত্বং চ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ”

প্রাণায়াম করতে করতে শ্বাসের গতি সরু সুতোর মত হয়ে যায়, শ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যায় না। এমনটা হলে প্রাণ অপানের গতি সমান হয় বুঝতে হবে। এ অবস্থায় স্বতঃই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সব সংযত হয়ে আসে। তখন আর জাগ্রত অবস্থা বা সুপ্ত কি স্বপ্ন কোনও অবস্থাই থাকেনা। এভাবেই সমরস বা সমাধিলাভ হয়। তবে যারা নাক টেপাটেপি ইত্যাদি ছাড়া প্রাণায়াম জানেন না তারা অনেক

যুক্তি তর্ক খাড়া করে দেন। কিন্তু ওসব কথায় কোনও কাজ নেই। ৪র্থ অধ্যায়ের ২৯ নং শ্লোক দেখুন, আর শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষদ, ধ্যানবিন্দু উপনিষদ, যোগশিখোপনিষদ, যোগচূড়ামণি উপনিষদ এবং যোগদর্শন ভাল করে পড়ুন। আর সবচেয়ে ভাল হল এর অভ্যাস শুরু করে এ সমস্ত অনুভব দ্বারা বোধ করা। নইলে শুধু তর্ক করলে কথাই হবে, কাজ কিছু হবেনা। ৫/২৭-২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ।। ২৯

অনুবাদ: আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা বা পালক, সর্ব্বলোকের মহান ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের সুহৃদ জানিয়া তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ৫/২৯

ব্যাখ্যা: কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ নামক এই অধ্যায়ের এটাই শেষ শ্লোক। এই শেষ শ্লোকেই এই কর্ম্মসন্ন্যাস লাভের শেষ কথায় সকল সন্দেহের নিরসন ভগবান করছেন। অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল অর্জ্জুনের প্রশ্ন দিয়ে যে সন্ন্যাস, মানে কর্ম্মত্যাগ, অথবা কর্ম্ম এই দুইয়ের মধ্য কোনটা শ্রেষ্ঠ ? উত্তরে সমগ্র অধ্যায়ের শ্লোকের মধ্য দিয়ে ভগবান কিভাবে কোন কোন কর্ম্মের দ্বারা সন্ন্যাস ও শেষে মোক্ষলাভ হয় সেসব বলছেন। তার মধ্যে আছে যজ্ঞ, তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম, বনগমন, আরও কত কি! কিন্তু তাই কি ? শুধু ইন্দ্রিয়সংযমাদি করলেই কি ব্রহ্মচর্য্য হয়, না মুক্তি হয় ? না তা হয় না। না জেনে, না বুঝে, ইন্দ্রিয় সংযম করলে কিছুই হয় না। একথা আগের আগের অধ্যায়েও অনেকবারই বলা হয়েছে। সন্ন্যাস অর্থ ইন্দ্রিয়সংযম নয়। যদি তাই হয়, তবে কিছু কিছু প্রাণী, যথা – খাসি, ভেড়া, হিজড়ে, বলদ ইত্যাদির সন্ন্যাস লাভ সর্ব্বাগ্রে হত। ব্রহ্মে বিচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য এবং মহাভারতে আছে অরণ্যই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল স্থান। নিমেষমধ্যেই এমনতর বন সৃষ্টি হয় বলেই এর নাম নৈমিষারণ্য। অরণ্য শব্দের অর্থ যদি বন হয় তবে এই বন কি ? ঔপনিষদিক অর্থে এই বন হল ব্রহ্ম। "তদ হ তদ বনং নাম, তদ্বনমিতি উপাসিতব্যম্"। (কেনোপনিষদ ৪/৬ বল্লি) অতএব এমনতর বনে অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য। গুরুকৃপায় জীব-চৈতন্যের ধারা যখন ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী স্থানে সহসা কেন্দ্রীভূত হয়, তখন চক্রাকারে একটি জ্যোতির বলয় সাধকমাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হয়। এমনতর অখণ্ডমণ্ডলাকার চিদ্‌জ্যোতিঃ দর্শন হলে তবেই হয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা। একমাত্র শ্রীগুরুদেবই পারেন এমনতর অখণ্ড মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়ে দিতে। সেজন্যই গুরুপ্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে – "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ" ॥ প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম জ্ঞানের দ্বারাই হয়। না বুঝে কিছু করার বিপদই এখানে। অতি সামান্য কাজও বুঝে নিয়ে করাটাই জ্ঞানলাভ। অর্জ্জুন তো ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণরূপেই বার বার দেখছিলেন তবুও তাঁর কোনও রকম জ্ঞানের উদয় হয় নি যতক্ষণ

না ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বুঝিয়েছেন কতভাবে কত ব্যাখ্যা দ্বারা। কিন্তু কেন ব্যাখ্য করেছেন ? অর্জ্জুনকে এই অজ্ঞান পাশ থেকে মুক্ত করার জন্য। তাই জেনে বুঝে না নিয়ে শিব পূজো করতে গিয়ে শুধুই পাথরে জল ঢালা হয়। অথচ যদি জানা যায় যে সর্ব্বকর্ম্ম করার কর্ত্তা কূটস্থ ব্রহ্ম – তিনিই ভোক্তা, তিনিই আপনাতে আপনি থাকেন, এই কূটস্থে থাকাটাই তপস্যা। সবার মধ্যে ইনি আছেন– জীবই শিব। সেজন্যই পৃথকরূপে মহা+ঈশ্বর = মহেশ্বর। সকলের হৃদয়ে সুন্দর (প্রাণ) রূপে বাস করেন। তাই জীবের জীবন থাকা মানে বেঁচে থাকা। জীব বেঁচে আছে এটাই তার কাছে চরম ও পরম সত্য, তাই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। আগের আগের শ্লোকগুলোতে যেমন বলা আছে সেভাবে সাধন করতে করতে কূটস্থের জ্ঞান হলে সব বোঝা যায়। এবং কূটস্থের জ্ঞানই আসল জ্ঞান। তাই জ্ঞানের কথাই বলা হল। এই জ্ঞান হলে তবেই বোঝা যায় যে তিনিই বিষ্ণুরূপে সর্ব্বকর্ম্মের ফলভোক্তা। তিনি ও বিশ্ব আলাদা নয়। তিনি আপনাতে আপনি থাকেন। কর্ম্ম করে, মানে সাধন কর্ম্মের দ্বারা প্রাণবায়ু মস্তকে স্থির হয়ে গেলেই আপনাতে আপনি থাকা হয় ও সর্ব্বের জ্ঞান হয় কারণ সর্ব্বের মধ্যেই কূটস্থ জ্যোতিরূপে তাঁর অনুভব হয়। এখনই সংসারে বিপদ। কারণ সাধক সকলকে আপনার জ্ঞানে সকলের মঙ্গল ভেবে অযাচিত ভাবে কথা বলেন, সতর্ক করেন, উপদেশ দেন ও ফলস্বরূপ জনসমক্ষে ক্রমাগত হেয় হতে থাকেন। এবং আমরা বিষয়ী মুর্খের দল তাঁদের এই অবস্থায় পাগল, nonsense ইত্যাদি বলে অভিহিত করে থাকি। কিন্তু এর পরবর্ত্তী অবস্থায়ই যখন এই সর্ব্বজ্ঞান মিটে গিয়ে এক অখণ্ড সত্তামাত্রে পরিণত হয়, তখনও এই কূটস্থই অখণ্ড ও অদ্বিতীয় সত্তা যিনি প্রাণরূপে নামরূপময় জগৎ প্রকাশ করে তার মধ্যই আবার বাস করতে থাকেন। এই অবস্থা পেয়ে এই জ্ঞানের উদয় হলেই সব জানা যায়। এটাই প্রকৃত জ্ঞান, পরমজ্ঞান যা শান্তিপদ বা মুক্তিপদ এনে দেয়। তখন যে "আমি" ও "আমার" করে বেশির ভাগ লোক ব্যাকুল সেই "আমি" কে জানতে বুঝতে পারলেই এতদিনের সব ভূল ভেঙ্গে গিয়ে সব অজ্ঞান অন্ধকার কেটে গিয়ে সেই অসীম মহাশূন্যকেই মহামহেশ্বর বলে বোধ হয় ফলে মনের সবরকম বিক্ষেপ আক্ষেপ মিটে গিয়ে নিবৃত্তিরূপা পরাশান্তি বিরাজ করে।

এই অধ্যায়ের মূল কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি। সন্ন্যাস মানে রহিত অবস্থা। কর্ম্মসন্ন্যাস মানে কর্ম্মরহিত অবস্থা। যার অর্থ মোটেই কাজকর্ম্ম ছেড়ে, বিশেষ ধরণের পোশাক পরে, আলাদা দল বা শ্রেণী তৈরী করা নয়। বিশেষ বিশেষ কাজ করে একটা বিশেষ অবস্থা লাভ করা, যে অবস্থায় একটা অদ্ভূত স্থিরভাব বা সাম্যাবস্থা লাভ হয়, সেটাই হল কর্ম্মের অতীত অবস্থা বা সন্ন্যাস, যা এই সংসারে থেকে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে সর্ব্বোপরি নিজের উপার্জনে সংসার প্রতিপালন করে তবেই করতে ও পেতে হয়। অন্য কোনও ভাবে কোনও রকম সং সেজে ধান্ধাবাজি করতে গেলে উল্টো ফলই হবে। তার চাইতে গৌতম বুদ্ধের "ধর, কর, পাও" অনুসরণ কর। শ্রীগুরুদেবকে জাপটে জড়িয়ে ধরে থাক,

একদম ছাড়বে না। নিঃসংশয় হয়ে গুরুবাক্য পালন কর ও নিষ্কাম ফলভোগ কর। বহু তত্ত্ব জানা বা বহু গ্রন্থ পাঠ অপেক্ষা একাজ অনেক সহজ ॥ ৫/২৯

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীবিষ্ণু প্রদীপিকা নামক গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ: তত্ত্বগতভাবে কর্ম্মসন্ন্যাস বা সন্ন্যাস বুঝলেও নিয়মিত যোগাভ্যাস ব্যতীত সংস্কার নষ্ট হয় না। একারণ কাম ক্রোধাদির বেগ তো সহ্য করতেই হয়। যোগের দ্বারা যতক্ষণ না মন আত্মাতে নিবিষ্ট হয় ততক্ষণ এসব সহ্য না করে উপায়ও থাকেনা। তারপর অবিরাম চেষ্টাদ্বারা ক্রিয়ায় স্থিত হলে পর সর্ব্বত্র ব্রহ্মে দৃষ্টি হলে তার দ্বারা ভিতরে যে জ্যোতির সন্ধান মেলে সেই আত্মজ্যোতিতে মগ্ন থাকা যায়। এ অবস্থায় মন আত্মাতে নিবিষ্ট থাকলে বুদ্ধির স্থিরতা হেতু ইন্দ্রিয়াদির আকর্ষণ বিশেষ অনুভব হয় না। অবিরাম যোগাভ্যাসের দ্বারা এ অবস্থায় ধীরে ধীরে ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ হলে মন এত সুন্দর ভাবে লীন হয়ে যায় যে সব ভেদবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। প্রিয় অপ্রিয়, হর্ষ উদ্বেগ, আকাঙ্খা কিছুই আর থাকেনা। তখন মনে হয় সকলেই এমন আনন্দে থাকুক, সকলের চিত্তই এমন উপরাম লাভ করুক। কিন্তু এ অবস্থায় নিজের আর কোনও কাজ না থাকায় অর্থাৎ প্রকৃত অন্তরঙ্গ সন্ন্যাস লাভ হওয়ায় যোগীর চিত্তে সর্ব্বভূতের হিত কামনা এত দৃঢ় হয় যে এই বস্তুবাদী যুগে সর্ব্বভূতের হিত কামনার ফলে নানাবিধ বিড়ম্বনা ঘটে। ভোগবাদী মানুষের জড়বাদী মন যোগীকে ভুল বোঝেন ও তাঁদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন না। যোগীর মন বুঝে উঠতে পারেনা যে সকলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করে নিষ্কামভাবে এই স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেনা কেন ? আসলে মানুষ কেন, সর্ব্বজীবই প্রকৃতির অনুগামী। যদিও মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তবুও দেখা যায় জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুযায়ীই কাজ করেন। আর এই প্রকৃতি তৈরী হয় নিজের বহু বহু পুরাণো জন্মগত স্বভাব থেকে। তাই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করার ইচ্ছা হলেও করা যায় না। এরপর শ্রীভগবান যোগের অন্তরঙ্গ সাধন রহস্য ব্যক্ত করেছেন, যা অব্যক্ত হলেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে নির্দ্দিষ্ট শ্লোকের ব্যাখ্যাসমূহে। সাধনার এই স্তরে অর্থাৎ এই অন্তরঙ্গ সাধনস্তরে কামক্রোধরূপী প্রবৃত্তিপক্ষ খুবই প্রবল হয়ে ওঠে এবং ভীষণ শত্রুতা শুরু করে। তাই ভগবান দেখিয়েছেন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী তাই এই মহা শত্রুর সাথেও যুগপৎ সংগ্রাম করতে হয়। প্রকৃতি টানা হেঁচড়া করতে বল প্রকাশ করবেই। সে সময় যাতে প্রবৃত্তির অতলে তলিয়ে না যাও, তার জন্য নিজ নিজ আচার্য্যের সন্নিধানে থেকে, গুরুপদিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক তৈরী করে নিতে হয়। তাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়ে অন্যান্য গুণের নাশ হলে নির্ভয় হওয়া যায়। এ সবই সাধনার ফল হিসাবে আসে, বই পড়ে নয়। এটা এলেই পূর্ব্ব সংস্কার নষ্ট হতে থাকে এবং মনে প্রাণে একটা শান্তির আনন্দ অনুভব হতে থাকে। তখন থেকে সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ এই অবস্থাটাকে পাকিয়ে নিতে হয় ও স্থায়ী করতে হয়।

-০০-

ওঁ

অথঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ (৬)

শ্রীভগবান উবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ।। ১

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন। যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। (কিন্তু) নিরগ্নি (অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি কর্ম্মত্যাগী) বা অক্রিয় (অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্মত্যাগী) সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন। ৬/১

ব্যাখ্যা : আগের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে যোগ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সেটা বিশেষ ভাবে বলার জন্যেই এই অধ্যায়ের অবতারণা।

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগে বলা হয়েছিল যে সন্ন্যাস হবে মনে মনে। বাহ্য কর্ম্মত্যাগ কোনও সন্ন্যাসই নয় বরং মন থেকে কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগই সন্ন্যাস বা কর্ম্মসন্ন্যাস। কিন্তু কেউ যেন অজ্ঞতাবশতঃ বা চালাকি করে বা ধান্ধাবাজি করে অলসতাকে প্রশ্রয় না দেন। কর্ম্ম করতে পরিশ্রম বা ক্লেশ হয় বলে, সাধনদ্বারা কর্ম্মত্যাগের উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্তির আগেই সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে বসে থাকার ইচ্ছে বা ঝোঁক যাতে না আসে সে জন্য ভগবান কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করছেন এবং বলছেন –

কর্ম্মফলের আকাঙ্খা না করে সকল করণীয় কর্ত্তব্য যে করে থাকে সেইই সন্ন্যাসী, সেইই যেগী। কোনও ওজর বা অজুহাতেই কাজ না করার প্রবণতা ঠিক নয়। আমি “নিরগ্নি ” অর্থাৎ আগুন ছুঁই না বা আমি “অক্রিয়” অর্থাৎ পূর্ত্তাখ্য কর্ম্ম করি না মানে নিজের স্নান আহারাদি ছাড়া অন্যান্য পূর্ত্তাখ্য অর্থাৎ মেরামতি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরী, পুকুর কাটা ইত্যাদি করি না। এধরণের কথা যাঁরা বলেন তারা মোটেই সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন। ধান্ধাবাজ অলস ভোগীমাত্র। “নিরগ্নি” বা “অক্রিয়” ব্রত ধারণ এসব ছিল দ্বাপর যুগীয় ধান্ধাবাজি। কলিযুগে এসে এঁরাই সব‘হোলটাইমার’ নাম ধারণ করেছেন। সর্ব্বভোগীদের ধান্ধাবাজিটা একই আছে শুধু রং চং এবং লেবেলের কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে মাত্র। কর্ম্মসকল যখন করতেই হবে তখন আর কর্ম্মত্যাগ করার জন্য এত ছলচাতুরীর প্রয়োজন কি ? শাস্ত্র কখনও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেয় নি। মানুষ যুগে যুগে চালাকি দ্বারা পরের উপার্জন ভোগ করেছে আর এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে নিজের সুখ সুবিধা কায়েম করেছে। যাই হোক, শরীর থাকতে কর্ম্মত্যাগ হয় না, দুইভাবে মানুষ কর্ম্ম করে। এক নিজের জন্য, আর অপরের জন্য। এরা আবার আস্তিক নাস্তিক ভেদে দুই ধরণের হয়ে থাকেন। নাস্তিকেরা শুদ্ধভাবাপন্ন হয়েও ভগবানে বিশ্বাস না থাকায় তারা কেবল লোকহিতের জন্য কাজ করেন। অপরপক্ষে আস্তিকগণ সর্ব্বজনহিতায়, মানে অপরের জন্য, সব কাজ করেও ভাবেন যে সর্ব্বভূতস্থ ভগবানের প্রীতির জন্যই কর্ম্ম করছেন। যেহেতু তাঁদের কর্ম্মের লক্ষ্য হলেন ভগবান, তাই তাঁদের কর্ম্মসকলও ভগবানেই অর্পিত হয়ে থাকে। এইভাবে কর্ম্ম করলে অলসতা, বিষয়লোভ এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধি ইত্যাদি সকলই ত্যাগ করা হয়। তাই এঁরাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা যোগভ্যাস দ্বারা চিত্ত বিক্ষেপশূন্য করে থাকেন তাঁরাই যোগী। বেদে যে সন্ন্যাসের কথা বলা আছে বৈদিক পরবর্ত্তী যুগে সে সন্ন্যাস হওয়া কঠিন। তেমন দেহ মনের গঠন কোথায় ? মন থেকে ত্যাগ না এলে শুধু সন্ন্যাসী সেজে বেড়ালে কুকর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু সম্ভব নয়। তা সে গেরুয়াধারী আস্তিক হোলটাইমার হয়ে মঠ মিশন ভর্ত্তি করুন অথবা নাস্তিক হয়ে সামাজিক পোষাকে বিভিন্ন সংগঠন বা দল ভর্ত্তি করুন সব একই কথা। কারণ তাতে অন্ততঃ লোকের বিবিধ অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ তো করতেই হয় এবং বহু অকর্ম্ম করা এদের পক্ষেই সহজ হয়ে থাকে। এঁরা সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ যাই হন এঁদের স্বভাব ব্রহ্মাভ্যাসের বিরোধী এবং ঐরূপ দেহ মন নিয়ে আত্মধ্যানে মগ্ন হওয়া সম্ভব নয়। সাধনদ্বারা নিরালম্ব অবস্থায় পৌছাতে না পারলে সন্ন্যাসী বা যোগী কোনওটাই হওয়া যায় না। প্রকৃত সন্ন্যাসী বা যোগীকে সাধারণ মানুষ সাধারণ চোখে বুঝতে পারেন না কারণ তিনি সর্ব্বসংকল্পশূন্য হয়ে থাকেন। অথচ সব কাজই করে থাকেন একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্খা তাঁর মধ্যে থাকে না। ’ অকর্ম্মকৃৎ ’ হয়ে কেউই থাকতে পারেনা। সে সন্ন্যাসী,

যোগী বা গৃহস্থ যেই হোন। এই জন্যই পরের শ্লোকে যাকে সন্ন্যাস বলে, তাকেই যোগ বলা হয়েছে। ৬/১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ।। ২

অনুবাদ : হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, [কেবল ফল সন্ন্যাস হেতু] তাহাকে যোগ বলিয়া জানিও। যেহেতু ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই এইরূপ কেহই যোগী নহেন। ৬/২

ব্যাখ্যা : আগেই বলা হয়েছে যে কর্ম্ম করতেই হয়। সন্ন্যাসীকেও করতে হয় ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে। তাই কর্ম্মসন্ন্যাস মানে হল ফলসন্ন্যাস। মূল কথাটা হল ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করা। কি ভাবে ?

ফলসংকল্প ত্যাগ বিষয়ে যোগী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমভাব। সন্ন্যাসী বর্ত্তমানের ইচ্ছারহিত আর যোগী ভবিষ্যতেরও ইচ্ছারহিত। রহস্য হল সন্ন্যাসীর জাগতিক আশা না থাকলেও মুক্তির বা মোক্ষের আশা থাকে কিন্তু যোগীর সেটুকুও থাকে না, যোগী তাই সন্ন্যাসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ যোগী সর্ব্বসংকল্প বর্জিত। “নান্যঃ কশ্চিদুপায়োহস্তি সংকল্পোপশমাদৃতে” – সংকল্পের উপশম ব্যাতীত সত্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হওয়ার আর কোনও উপায়ই নেই। চিত্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ। চিত্তের পাঁচরকম বৃত্তিগুলো হল – প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। সম্যক শুদ্ধ চিত্তে আর কোনও বৃত্তির উদয় হয় না। যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রাণ সুষুম্না মার্গে প্রবাহিত হলেই চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হয় তখন সংসার বাসনা, ফল কামনা এসব কিছু থাকে না। এ অবস্থাকে স্থায়ী করে এগিয়ে যেতে হয়। সুদৃঢ় অভ্যাসের দ্বারাই যোগারূঢ় অবস্থা লাভ হয়। “সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।” এই যোগারূঢ় অবস্থাটাকেও আবার নিয়ত‘শমতা’ সাধন দ্বারা স্থায়ী করতে হয়। কারণ প্রাণ ঠাণ্ডা না হলে উপরাম লাভ হওয়া কঠিন। এই সাথে নিয়মিত গুরুসঙ্গ ও ভগবৎ কথা শোনা ইত্যাদির দ্বারাও জ্ঞানভক্তি লাভের দিকে অনুরাগ বাড়াতে হয়। ভাগবতেও আছে “মৎকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্ব্বান মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্।” আমাতে অনুরক্ত হলে ধীরে ধীরে হৃদয়স্থ ভোগ বাসনা পরিত্যাগে সমর্থ হন। এজন্যই প্রথমাভ্যাসী অথবা যাঁরা অনেকটা এগিয়েছেন তাঁদেরও আরুরুক্ষ পুরুষের সঙ্গ করা দরকার। আরুরুক্ষ পুরুষ বিষয়ে পরের শ্লোক দেখুন ॥ ৬/২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ।। ৩

অনুবাদ: জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির সম্বন্ধে, কর্ম্মই কারণরূপে উক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানযোগে আরূঢ় তাহার সম্বন্ধে সমাধি কারণরূপে উক্ত হয়। ৬/৩

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা পড়ে এমনটা মনে হতেই পারে যে, তবে কি বাবা সারাজীবনই শুধু এই একই কাজ করে যেতে হবে ? এযাবৎ শুধুইতো ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কর্ম্মকরার কথাই বলা হল। কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য বিনা কর্ম্ম কি করা সম্ভব ? না, উদ্দেশ্য থাকেই। উদ্দেশ্যটা বৈষয়িক লাভালাভ সংক্রান্ত না হলেই হল। উদ্দেশ্য যদি জ্ঞানলাভ হয় তবে কর্ম্মই তার কারণরূপে নির্দিষ্ট হয়। যেমন ক্রিয়া করার সময় ভাল কিছু একটা হবার আশা নিয়েই তো লোকে করে থাকে। নইলে করবে কেন ? সেই কর্ম্মটাই ভালমত হবার উদ্দেশ্য যিনি করেন তাঁকেই আরুরুক্ষু বলে। এইভাবে এই ক্রিয়া করতে করতে যখন নিয়মিত করার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় এবং ঠিক সময়মত না করলে চলে না এমন নেশার মত হয়ে যায় তখন শুধু কাজটা করার মধ্যেই আনন্দ থাকে এবং ফলাকাঙ্ক্ষা স্বতঃই রহিত হয়ে যায়। প্রাণ যখন স্থির হয়ে আসে, মন বিক্ষেপশূন্য হয় ও চিত্ত আনন্দে ভরে ওঠে আর কোনও ফলাকাঙ্ক্ষার ইচ্ছা থাকেই না অথচ নেশার ঘোরে কাজটা করে চললে শমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন আর কোনও বৃত্তিরই উদয় হয় না, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। ক্রিয়া করে এমন অবস্থা পাওয়া যাবে এই ভেবে ক্রিয়া যিনি করেন তিনিই আরুরুক্ষু। আরুরুক্ষুর আনন্দলাভের ধারণাটা একটু থাকবেই। যদিও সেই আনন্দটাও স্থায়ী হয় না। ঐ অবস্থার স্থিতি বাড়াতে হলে ‘শম’ অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় মনের বিক্ষেপ সম্পূর্ণ নিরোধ হতে হয়। আরুরুক্ষু পুরুষ সাধনা করেন। চিত্তও স্থির হয় কিন্তু আবার সেই চিত্তেই সংসার স্মরণ হয়। মানে অন্য চিন্তাও আসতে থাকে। সুতরাং এতসব বিপত্তিকে কাটিয়ে উঠতে ইচ্ছুক আরুরুক্ষুগণ যাঁরা যোগারূঢ় হন নাই কিন্তু হতে চান, তাঁরা প্রাণপণ যত্নে ক্রিয়া করবেন। আত্মচিন্তার বৃত্তি বারবার উদয় হতে থাকলেই যোগারূঢ় অবস্থা আসন্ন বলে বুঝতে হবে। যখন নিত্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষে মন আর অন্যদিকে ছুটবে না, অবসর পেলেও মনে অন্য বৃত্তির উদয় হবে না, শুধুমাত্র আত্মায়ই লক্ষ্য থাকতে চাইবে তখনই বুঝবে আরুরুক্ষু পুরুষ খুব তাড়াতাড়িই স্থায়ীভাবে যোগারূঢ় হতে চলেছেন। প্রকৃত যোগারূঢ় অবস্থা কি সেটা পরের শ্লোকে লক্ষ্য করুন। ৬/৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জ্যতে ।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ।। ৪

অনুবাদ: মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহ এবং তৎসাধনভূত কর্ম্মসমূহে আসক্তি না করেন, তখন সর্ব্ববিধ সংকল্পত্যাগী, তিনিই যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৬/৪

ব্যাখ্যা : যোগারূঢ় পুরুষ কেমন হন ? সাধারণ মানুষের সাথে যোগারূঢ় পুরুষের তফাৎই বা কি ? সাধারণ মানুষ “লাভে লোহা বয়” অর্থাৎ “ইন্দ্রিয়ার্থে” মানে ভোগসাধনের জন্য কর্ম্ম করে কিন্তু যোগারূঢ় পুরুষ বিনালাভেই লোহা বয়ে চলেন। অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হয়েই সকল কর্ম্ম করেন। কোনও ইন্দ্রিয়সুখের জন্য এমনকি কেউ কিছু প্রশংসা করুক বা স্বীকৃতি দিক এমনটাও ভাবেন না। যুক্ত পুরুষের এটাই কর্ম্মের ধারা। ‘শম’ লাভ হলে এভাবেই অহংশূন্য ও আসক্তিশূন্য হয়েই সকল কাজ করে থাকেন। মনোবৃত্তি অন্তর্মুখী হলে মন সবসময় ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত হয়। চিত্ত শমিত হলে ইন্দ্রিয়ও স্বতঃই দমিত হয়। মনথেকে বাসনা চলে গেলেই যে সর্ব্বসংকল্পহীন নিরোধ অবস্থা আসে সেটাই ধ্যান অবস্থা। ধ্যানটা ক্রমশঃ খুব গাঢ় হলেই সমাধি আসে। তখন প্রশান্তচিত্তে একমাত্র আত্মাকারা বৃত্তিরই উদয় হতে থাকে। এটাই আত্মসাক্ষাৎকার বা স্বরূপদর্শন যা একমাত্র যোগারূঢ় হলেই হয়। প্রশ্ন একটা উঠবেই এখানে। আমি জানি যে এসবই তো বড় বড় তত্ত্বকথা এতে আমাদের কি হবে ? আমরা তো অতখানি যোগী নই। আমাদের কিসে কী হতে পারে ? শুনুন এখন শুধু মনকে কাজে লাগান। মনে ভাবুন যা ভাল লাগে তা ভাল নয়। বিষয় চিন্তাই সব দুঃখের মূল। “আরও চাই, আরও চাই,” ভাবের কি বিশাল বিশাল ঢেউ! এই ঢেউ থামাবার একমাত্র কৌশলই যোগাভ্যাস যা আপনাদের করতে দেওয়া হয়েছে। দেখবেন প্রাণায়াম অভ্যাস করতে করতে সব ঢেউ তরঙ্গ স্থির হয়ে যায়। আস্তে আস্তে চিত্তের চাঞ্চল্য, স্পন্দন সব স্থির হয়ে যাবে। প্রাণের স্পন্দন থেকেই চিত্তের স্পন্দন। চিত্ত স্পন্দিত হলেই তাতে বাসনার ঢেউ উঠতে থাকে। বড় বড় সংকল্পের তরঙ্গ চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মনের সংকল্পত্যাগেই বাসনার ত্যাগ হয়। ক্রিয়া করতে করতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে মন ঘুরে গিয়ে অন্ত র্মুখী হয়ে যায়। আরও কি ভাবে একাজ করবেন পরের শ্লোকে শ্রীভগবান নিজেই বলছেন, লক্ষ্য করুন ॥ ৬/৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

অনুবাদ: আত্মাদ্বারা আত্মাকে ঊর্দ্ধে রাখিবে। আত্মাকে অধঃপতিত করিবে না। যেহেতু (গুরুপদেশ দ্বারা আত্মাকে উর্দ্ধে রাখিলে) আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই (গুরুপদেশ বিনা আজ্ঞাচক্রের নীচে রাখিলে) আত্মার শত্রু ॥ ৬/৫

ব্যাখ্যা: ভগবান বলছেন আত্মার দ্বারাই আত্মাকে ঊর্দ্ধে রাখবে, কখনও নীচে নামাবে না। কিন্তু কি ভাবে ? কিভাবে আত্মাদ্বারা আত্মাকে উর্দ্ধে রাখা যায় ? কোন পদ্ধতিতে ? সেই পদ্ধতিই হল গুরুপদেশ। গুরুপদেশ অনুযায়ী কর্ম্ম করে আত্মাদ্বারা আত্মাকে উপরে তুলে রাখতে পারলেই আর

আত্মার নীচে নামার বা অধঃপতিত হবার প্রশ্ন নেই। কারণ মনের থেকে ছাড়তে পারলে, মনের সঙ্গ থেকে উপরত আত্মাই আত্মার নিজের একমাত্র উপকারী বন্ধু। নইলে মনের সঙ্গী হয়ে গেলে বিষয়াসক্ত আত্মা নিজেই শত্রু অর্থাৎ অপকারী হয়ে যায়। জগতের সকল রকম দুঃখ অশান্তি, জ্বালা যন্ত্রণার মূল কারণ কিন্তু এটাই। বিভীষণ থাকে ভিতরেই, বাইরে নয়, একটু ভেবে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। বিভীষণরূপী অন্তঃশত্রু মানবাত্মার অভ্যন্তর থেকে শুরু করে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি সর্ব্বত্রই ক্রিয়াশীল রয়েছে নইলে মানবজাতি মর্ত্তকেই স্বর্গ তৈরী করে ফেলতে পারত কিন্তু এই স্ববিরোধী শক্তির জন্যই পারে নি। "জীবের কিসে মঙ্গল জীব তাহা জানেনা। জানলেই তো শিব হল।" তাই এই শিবত্বলাভের জন্য যে সম্বল চাই তা হল গুরুপদেশ। এরূপ উপদেশপ্রাপ্ত ক্রিয়াবানই বুঝতে পারেন যে মূলাধার ইত্যাদি পঞ্চচক্রই পঞ্চতন্মাত্রের লীলাক্ষেত্র। মন এই ক্ষেত্রে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই বিষয়াদির আকর্ষণ। এর সাথে অভ্যাস ও সংস্কার তো মনকে জোর করে আকর্ষণ করেই। ফলে মন বিবিধ বৃত্তির অধীন হয়ে পড়ে। তাই গুরুপদেশ মত কাজ করে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে মনকে আজ্ঞাচক্রের উপরে আনতে পারলে মন স্থির হয় ও বিষয়ের টান খসে পড়ে। এরই নাম আত্মার উদ্ধার বা উর্দ্ধে উন্নয়ন। আজ্ঞাচক্রের নিচে গেলেই বিষয়ের টান এসে পড়ে তাই আজ্ঞাচক্রের নিচে নামতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবেই বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে হয়। যে এটা না করবে সে নিজের শত্রুতা নিজে করবে। ৬/৫

> বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
> অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ।। ৬

অনুবাদ: যিনি আত্মাদ্বারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন, আত্মা সেই ব্যক্তির আত্মার বন্ধু। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মাই শত্রুতা সাধনে শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৬/৬

ব্যাখ্যা : পূর্ব্বশ্লোক পাঠের পর স্বাভাবিকভাবেই পাঠক মনে প্রশ্ন ওঠে তাহলে কার মনই বা বন্ধু আর কার মনই বা শত্রু ? তারই উত্তর এখানে বলা হয়েছে। যিনি আত্মাদ্বারা মানে আত্মক্রিয়ার দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ আত্মাকে স্থির করতে পেরেছেন তিনিই আত্মার বন্ধু আর অজিতাত্মার আত্মা মানে স্থূল মন যাঁর, মানে যিনি ক্রিয়াসাধন করেন না, তাঁর এই স্থূলমন কিন্তু তাঁর আত্মার শত্রু। অর্থাৎ শত্রু যেমন অনিষ্ট করে, দুঃখ দেয়, অজিতাত্মার মনও তেমনিভাবে শত্রুর মত নিজেকে নিজে উৎপীড়িত করে। এই হল যে প্রশ্ন দিয়ে ব্যাখ্যা শুরু হয়েছিল তার উত্তর। এ সম্বন্ধে বলা যায় চেষ্টা করলে সবাই নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে পারে। তুমি সেই চিরস্থির আনন্দময় আত্মার কথা চিন্তা কর, দেখ মনের অবস্থা কেমন হয়, আবার নিজের পাপ পঙ্কিল দেহ মনের কথা ভাব, দেখবে নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পাবে। তখনই সুখশান্তিময় নিজের আত্মার কথাই মনে পড়বে, কোনও উপায়ে যদি সেই আত্মার শরণাগত হতে পার তবে অবশ্যই তুমি তোমার নিজের আসল রূপে ফিরে যেতে পারবে। দেহাভিমান থেকেই যত দুঃখের সৃষ্টি হয়, কারণ ইন্দ্রিয়েরা বশে না থাকায় যথেচ্ছাচারী হয়ে জীবকে অজিতাত্মা, বিষয়লোলুপ ও কামাসক্ত, করে তোলে এবং জীব নিজেই নিজের দুঃখ সৃষ্টি করে থাকে যার মূল কারণ সেই দেহাভিমান। তাই তোমার এ দেহ কৃষ্ণে অর্পণ করে দাও। কৃষ্ণকে পাচ্ছনা, গুরুদেবকে নিজের দেহ মন প্রাণ পূর্ণাহুতি দাও। পূর্ণাহুতি মানে আগুণে ঘৃতাদি সামগ্রীসকল পোড়ান নয়। শ্রীগুরুপদে সঠিক পূর্ণাহুতি হলেই সম্যক বোধ হবে কিভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধা শরীর প্রকাশিত হয়। কিভাবে স্থূল শরীর ঘুমোলেও সূক্ষ্ম শরীর জেগে থাকে এবং সুষুপ্তিতে সূক্ষ্ম শরীরও যখন ঘুমায় তখন কিভাবে অজ্ঞানরূপ আবরণটা একেবারে সঠিকভাবে বজায় থাকে। পূর্ণাহুতি হলেই শরীরের এ সকল রহস্য জানা যায়। নচেৎ শরীর কেই 'আমি' ভাবলে নিজের শরীরের রহস্য জানতে পারবে না। প্রতি মুহুর্ত্তেই ডাক্তারকে স্মরণ করবে। যে ডাক্তার সদা সর্ব্বদা তোমার শরীর নিয়ে খালি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে ও নানাবিধ ওষুধ খাইয়ে, ইন্জেকশান দিয়ে নাকাল করবে। যাক সে অন্য কথা। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীররূপ এই ত্রিপুরকে বশে আনতে পারলে প্রকৃতির ক্রিয়া থামে। চঞ্চল প্রাণ স্থির হলে ইন্দ্রিয়েরা আর ত্রিতাপে দগ্ধ করতে পারেনা। মনও প্রশান্ত হয়। এমনটি স্থির চিত্ত হতে পারলে সেই মহাত্মাই আপনি আপনার বন্ধু হয়ে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখেছি নানাবিধ নামে নানারকম যজ্ঞ যথা বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ, বিষ্ণু যজ্ঞ ইত্যাদি যেখানে শুধু রাশি রাশি কাঠ, ঘী ও অন্যান্য জিনিষ আহুতির নামে পোড়ান হয়, যে কাজের অর্থ, যাঁরা সেকাজ করেন তাঁরা নিজেরাই জানেন না এবং বলতেও পারেন না, অথচ যে মন্ত্র তাঁরা উচ্চারণ করছেন সেগুলোর অর্থবোধ হলেই এর রহস্য পরিষ্কার হয়। কিন্তু সে অর্থ বোঝেই বা কে আর সেইমত কাজ করেই বা কে ? যাহোক ঐ সকল পূর্ণাহুতি সময়, অর্থ ও শক্তির বৃথা অপচয় ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যজ্ঞ ও আহুতি বিষয়ে নিজ নিজ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন। সুযোগ হলে অন্যত্র আলোচনার ইচ্ছাও রইল ॥ ৬/৬

> জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
> শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ।। ৭

অনুবাদ: জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রোষাদিশূন্য ব্যক্তিরই আত্মা শীতোষ্ণ সুখদুঃখে ও মানাপমানে সমাহিত (অবিচলিত) থাকে ॥ ৬/৭

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত জিতাত্মা পুরুষের বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কিভাবে তিনি নিজের বন্ধু হয়ে থাকেন।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করতে যিনি সমর্থ তাঁর চিত্ত আর ব্যাকুলিত হয় না। অবশ্য আত্মাকে জানলেই এটা সম্ভব হয়। এমন পুরুষই আত্মজয়ী বা জিতাত্মা। তাঁকে বহির্জগৎ আর কোনও ভাবেই প্রভাবিত বা আলোড়িত করতে পারেনা। তখনতো শুধু আত্মাতেই লক্ষ্য, আর কোনও দিকেই লক্ষ্য নেই। নিজে আত্মা জেনে লক্ষ্য করেন পরমাত্মার দিকে। যে শিশু মেলায় গিয়ে ভিড়ের মধ্যে কোনও দিকে না লক্ষ্য করে শুধুমাত্র পিতা বা মাতার হাতটা শক্ত করে ধরে থাকে, সে আর হারিয়ে যায়না। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে খেলনার দোকান বা ভাজাভুজির দোকানে মোহিত হয়ে, ভিড়ে অনেকেই হারিয়ে যায়। তেমনই যিনি আত্মাকে জেনে শান্তিপদ লাভ করেছেন তিনি আর কোনও কিছুতেই ব্যাকুল হন না। সুখদুঃখ, মান অপমান ঠাণ্ডা গরম এসবই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে হয়। প্রারব্ধবশে সুখদুঃখ, মান অপমান সবই পেয়ে থাকেন কিন্তু তাতে বিচলিত হন না। নেশাখোরের মত খায় দায়, পড়ে যায়, লাগে তবু বুঝতে পারেনা, অনেকটা তেমন। শুধুমাত্র পরমাত্মা কূটস্থতে স্থির হয়ে থাকেন আর কোনও দিকেই গ্রাহ্য নেই। ক্রিয়ার পরাবস্থাই শান্তিপদ। এই শান্তিময় অবস্থায়ই উর্দ্ধতন আত্মা প্রকট হয়। উর্দ্ধতন আত্মাই অক্ষর কূটস্থ। জীবমনে দেহাধীশ বুদ্ধির নাশ হলে তবেই আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হয় ও ধীরে ধীরে জীব নিজ আত্মা ও জীবাত্মাকে জানতে ও চিনতে পারে। এইভাবে নিজেকে, মানে নিজ আত্মাকে, জানাই সম্যক আত্মজ্ঞান লাভ। একবার আত্মসচেতন হলে স্বতঃই পরমাত্মায় লক্ষ্য এসে যায়। এটাই হল জীবের ক্রমবিবর্তন। এই বিবর্তনের পথে আত্মসচেতন চেতনাই জীবের উপকারী বন্ধু কেননা সেই চেতনাই আত্মবিবর্ধনাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে যার পরিণামে মনুষত্বের পরেই আসে দেবত্ব, অর্থাৎ পরমাত্মায় লক্ষ্য। কিন্তু বাধা হল এই মন যে প্রায়ই, ঘন ঘন, ইন্দ্রিয়গত হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে এটাই বাধা কারণ মন ইন্দ্রিয়গত হলেই আবার দেহাধীশ বুদ্ধি এসে নিজের জায়গা করে নেয়। তাই অধিক সময় ক্রিয়া করে এই অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আত্মজ্ঞানী মনই হয় আত্মার বন্ধু ॥ ৬/৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।। ৮

অনুবাদ : যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা আকাঙ্খাহীন, নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় অতএব মৃত্তিকা, পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি বিশিষ্ট, এতাদৃশ যোগীকে যুক্ত বলে। ৬/৮

ব্যাখ্যা: আগে ৪নং শ্লোকে যোগারূঢ় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন যোগারূঢ়ের লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উপসংহার করা হচ্ছে। যিনি গুরুপদেশলব্ধ জ্ঞান মানে কূটস্থ দর্শন এবং বিজ্ঞান মানে অপরোক্ষ অনুভব, এই দুয়ের দ্বারা তৃপ্ত ও আকাঙ্খাহীন হয়েছেন, তাঁর কাছে সোনা, পাথর, মাটি সবই সমান হয়ে যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" এটাই হল যোগারূঢ় অবস্থার লক্ষণ। প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞান শব্দে বুঝায় বিশেষ জ্ঞান কিন্তু এখানে বিজ্ঞান শব্দের সঠিক অর্থকরা উচিত বিগত জ্ঞান। তার মানে যখন অন্তঃকরণ লয় হয়ে গিয়ে সবই ফুরিয়ে যায় তখন এক আত্মভাব ছাড়া আর কোনও রকম অনুভবই থাকে না। অপর কোনও সত্তার বোধই হয় না, এটাই বিজ্ঞানপদ। যখন মন দেহে থাকেনা, মহাশূন্যে লয় হয়, থাকে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিকার ভাব, তখন সমস্ত জগতের যে কোনও কিছুর প্রকাশই সেই পরমানন্দেরই প্রকাশ বলে অনুভব হয়। ফলে সকল বস্তু, ঘটনা ও ব্যক্তির প্রতি সমদর্শন আসে। সকল দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের উর্দ্ধে উঠে আত্মজ্ঞানে এমন যে পরিতৃপ্তি লাভ এবং সর্ব্বোপরি অক্ষর আত্মার মতই কূটস্থে নির্ব্বিকার হয়ে থাকাই হল যোগারূঢ় অবস্থা। এই অবস্থা যার হয় তিনিই যুক্ত যোগী ॥ ৬/৮

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ।। ৯

অনুবাদ: সুহৃদ মিত্র (স্বভাবতঃ হিতৈষী বন্ধু) অরি (ঘাতক) উদাসীন (উভয়পক্ষেরই উপেক্ষাকারী) মধ্যস্থ (দুই পক্ষেরই হিতৈষী) দ্বেষ্য (দ্বেষের পাত্র), বন্ধু (সম্বন্ধ বিশিষ্ট), সাধু এবং পাপিষ্ঠ এ সকলে যিনি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট তিনি প্রশংসনীয় ॥ ৬/৯

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে যোগারূঢ়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলোই বলা হচ্ছে। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" সমত্বই যোগ আর যিনি যোগবলে এই সমত্ব অধিগত করেছেন তিনি যোগী। যোগারূঢ় ব্যক্তির সর্ব্বত্র সমজ্ঞান হয়। দেহে অভিমান না থাকায় ভাল মন্দ, আপন পর এ সবের বোধ না থাকায় সবরকম রাগদ্বেষশূন্য "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" ভাবে অভেদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। অন্তঃকরণ লয় হয়ে যায়। তখন মন ইন্দ্রিয়গত হলেও অন্তঃকরণ বিকারশূন্য ও ইন্দ্রিয়সকল এতটাই নিষ্ক্রিয় যে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ থাকে না। সংশয়হীন হওয়ার ফলে কোনও ক্ষণস্থায়িত্বের জায়গা থাকেনা। যোগারূঢ় যিনি তিনি ভালমতই জানেন যে শত্রু মিত্র এ সকলভাবই ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনময় জীবনধারায় উদ্ভূত মাত্র। তাই তাঁর আর কোনও ভ্রান্তি নেই, তিনিই অভ্রান্ত ॥ ৬/৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ।। ১০

অনুবাদ: যোগী সর্ব্বদা একান্তে (যেখানে কিছুই নেই এরূপ স্থানে) অবস্থিত হইয়া একাকী সংযতচিত্ত, সংযতাত্মা, আকাঙ্খাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া মনকে সমাহিত (একাগ্র) করিবেন ॥ ৬/১০

ব্যাখ্যা: এইভাবে যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলতে বলতে এই শ্লোক থেকে নিয়ে একবারে ৩২নং শ্লোকে "....স যোগী পরমো মতঃ।" পর্য্যন্ত যোগাঙ্গ সহ যোগ ব্যাখ্যা করছেন। তবে এখানে যাঁরা ঠিক মুমুক্ষু নন অথচ দেখাদেখি যোগাভ্যাস করতে আসেন, তাঁদের এসব আলোচনায় লাভ কিছু নেই। এছাড়াও ভাল গৃহস্থদের পক্ষে, গৃহস্থলী কাজে বেশী আসক্তি নিয়ে অথবা পরের চাকরি করতে করতে যোগাভ্যাস করতে যাওয়া যে নিতান্ত বিড়াম্বনা তা প্রকৃতসাধক মাত্রেই জানেন। এখন যোগ আরোহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের কি কি করা দরকার শুনুন।

প্রথমতঃ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" চিত্তের বৃত্তি নিরোধ দীর্ঘ অভ্যাসসাপেক্ষ। তাই যোগাভ্যাসীকেও সঙ্গশূন্য হয়ে চিত্ত নিরোধের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কি ভাবে ? একান্তে বাস করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বহু পুস্তকাদির সংগ্রহ এবং পাঠ দুইই নিষেধ। এতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিষয় পাঠ করে ও বহুবিধ মতের বিষয়ে জানতে গিয়ে মনে স্ববিরোধীতা তৈরী হয়। তৃতীয়তঃ মনোবল বাড়াতে হয়। একমাত্র শ্রীগুরুদেব ছাড়া অপর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য ও শ্রবণযোগ্য নয় এটা জানতে হবে। গুরুবাক্যে সংশয় এলেই সমস্ত মনোবল ধ্বংস হয়ে যায়। গুরুবল মনোবলকে বৃদ্ধি করেই থাকে কিন্তু "সংশয়াত্মা প্রণশ্যতি"। গুরুতে সংশয় এলেই অথবা বিশ্বাস কোনও কারণে সামান্য কমলেও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। চতুর্থতঃ যতচিত্তাত্মা ও নিরাকাঙ্খী হতে হবে। একটি হলেই আর একটি আপনা আপনিই হয়। পঞ্চমতঃ বহুলোকের সঙ্গ করা নিষেধ। আর সাধনাভ্যাসী বহুলোকের সঙ্গ করবেনই বা কেন ? যদি লক্ষ্য ঠিক থাকে তবে শুধুমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই পটুতা অর্জন হয়ে থাকে। গুরুতে জীবনপাত করে লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিলেই হল। নইলে চিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত না হলে অরণ্যে গিয়েও যোগাভ্যাস সম্ভব নয়। ষষ্ঠতঃ দেহ, মন, প্রাণ গুরুকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করাই পূর্ণাহুতি প্রদান। "কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্" "সকল যজ্ঞই কর্ম্মজ বলিয়া জানিবে।" এবং "বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।" গুরুমুখে প্রাপ্ত উপদেশ মত কাজ করে চলবে। তৃতীয় অধ্যায়ের ১১, ১২, ১৩ নং শ্লোক অনুসরণ করে গুরুসেবা করে চল। সপ্তমতঃ তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত উপদেশ অনুযায়ী গুরুসেবা করতে করতে যা কিছু প্রদান করবে সে সমস্ত বিষয়েই সমস্ত রহস্য যেন ভেদ হয়। গুরুকে সর্বস্ব প্রদান করে শরীরের মধ্যকার সব রহস্যস্থান জেনে নেবে, বিশেষতঃ সুষুম্না যার মধ্যে প্রাণকে নিয়ে যেতে হবে। গুরুপদেশ মত সর্ব্বদা ক্রিয়া করে লক্ষ্যস্থির হলেই ঠিক রহস্যস্থানে পৌঁছান যায়। সেইখানে সব আছে অথচ কিছুই নেই। "ন চন্দ্রস্য গতিস্তত্র নসূর্য্যস্য গতিস্তথা" মানে আলো নেই, অন্ধকার নেই অথচ এক দিব্যপ্রকাশ। আর বেশী বলা উচিত নয়। নিজে করে দেখুন। আপাততঃ এপর্য্যন্ত থাক। পরবর্ত্তী শ্লোকে সাধন কর্ম্মের জন্য কিভাবে আসন প্রস্তুত করবেন সেটা ভগবান বলছেন। ৬/১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ।। ১১

অনুবাদ: পবিত্রস্থানে অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশের উপর ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া আপনার আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। ৬/১১

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে সাধনার নিমিত্ত বাহ্য বস্তুদ্বারা আসন প্রস্তুত পদ্ধতি ভগবান বলছেন। শুদ্ধস্থানে অর্থাৎ পরিস্কার জায়গায়, শুদ্ধ, শান্ত, পরিবেশে যেমন নদী উপকূলে, যে জায়গা শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই চলবে না তারপর আবার মাটি ও গঙ্গাজল দ্বারা লেপে নিতে হবে। তারপর স্বকীয় মানে অপরে ব্যবহার না করা, আসন প্রস্তুত করবে। কি ভাবে ? স্থির – অচল মানে বার বার আসন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাবে না। জায়গাটা যেন সম্পূর্ন সমান (সমতল) হয়। অসমান জায়গা হলে আসন নড়তে পারে। নাতি উন্নত – বেশী উঁচুতে নয়। বেশি উঁচু হলে পড়েও যেতে পার তাছাড়া স্থিরতাও নষ্ট হয়। নাতি নীচ – বেশি নীচেও নয়। বেশী নিচেতে হলে পোকা মাকড় বিরক্ত করতে পারে। তাছাড়া দীর্ঘ সময় বেশি নিচু ভূমিগত আসনে বসলে মাটির ঠাণ্ডা থেকে বাত ক্ষোভ, শ্লেষ্মা ব্যাধি এসমস্ত হতে পারে। চেল অজিন কুশোত্তরম – কুশাসনের উপর হরিণের বা বাঘের চামড়া ও তার উপর কম্বল বা কাপড় বিছিয়ে আসন তৈরী করতে হয় যাতে দীর্ঘক্ষণ বসা যায়।

এমনভাবে আসন তৈরী করে নিয়ে বসলে সাধনা করতে করতে শরীরে নিজের অজান্তেই কিছুটা দিব্য তেজ ও শক্তির উদ্ভব হয় সেটা কিছুটা হলেও অনেকক্ষণের জন্য থাকে। নইলে ক্ষিতি অত্যন্ত শক্তি পরিবাহী (ংঁৎবৎ পড়হফঁপঃড়ৎ) এবং বিভবশূন্য (বৎড়ুঢ়ড়ঃবহঃরধষ) হওয়ার কারণে, সাধনদ্বারা অর্জিত বা উদ্ভূত শক্তি পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গেই টেনে নেয় ও নিঃশেষ হয়ে যায়, কোনও অনুভবেই আসেনা। তাই এসব অপরিবাহী (হড়হ পড়হফঁপঃড়ৎ) বস্তুদ্বারা আসন স্থাপনার কথা বলা হয়েছে। তবে এ সমস্ত ঝামেলায় না গিয়ে একটু পুরু কম্বল ব্যবহার করলেও সাধারণভাবে যোগাভ্যাস শুরু করা যেতে পারে। তবে আর প্রাণীবধ করে সংগৃহীত চামড়ার দরকার হয় না। ভাল কম্বলেও অপরিবাহীতা (রহংঁষধঃরড়হ াধষঁব) আছে। কিন্তু এতো হল বাহ্যিক আসন স্থাপনা ও প্রস্তুত প্রণালী। যোগীর শুধু এমন বাইরের জিনিষের আসনেই সব হয় না। শরীর নিয়ে যাঁর সাধনা তাঁকে শরীর

অভ্যন্তরেই স্থির আসন পাততে হয়। কিন্তু বর্ণনামত সেই পবিত্র, অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, এবং চৈল, অজীন, কুশোত্তরম ইত্যাদি আসন আবার শরীরের মধ্যে কোথায় ?

"স্থিরমাসনমাত্মানঃ" অর্থাৎ আমার জন্য স্থির আসন হল সুষুম্নার অভ্যন্তরে পরমপাবনী ব্রহ্মনাড়ী। সেটাই সরস্বতীর (নদী) উপকূল। এর চেয়ে পবিত্রস্থান আর কোথায় ? এখানে নাতিউচ্চ নাতিনীচ মানে ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটা হল হৃদয়াকাশ বা অনাহতচক্র। এখানে বসতে পারলে সংশয়হীন ও স্থির হওয়া যায়। এখানে আসন পাওয়ার অর্থ হল চৈলাজিন, কুশের উত্তরে মানে উপরে থাকা। কিভাবে ? কুশ = কু+শ, কু = পৃথিবী, শী = শয়ন। পৃথ্বী মানে মূলাধার; সেখানে যিনি শায়িত, মানে ব্রহ্মা। অজিন মানে চর্ম্ম বা চামড়া। যার উপর কৃষ্ণ লিঙ্গমূলে মানে স্বাধিষ্ঠানে বিরাজমান। চেল - তেজ উৎপাদক মনিপুর চক্র, অগ্নির মত দীপ্তিসম্পন্ন যার স্থান হল নাভি। চেল্ মানে রেশম যা শীতকালে অন্ধকার ঘরে রগড়ালে আগুনের মত আলো দেখা যায়, সেটী তেজস্তত্ত্বের প্রতীক। বিভিন্ন বাহ্য পূজায় আপনারা চেলির ব্যবহার দেখেছেন। যাই হোক অর্থটা দাঁড়াল মূলাধার, স্বধিষ্ঠান ও মনিপুর এই তিন চক্রের উপরে হৃদয়ে মন কে প্রতিষ্ঠিত করা যা করতে পারলে সবই মন দিয়ে করা যায়। সহজ করে পদ্ধতিটা বলতে গেলে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে শ্বাস টানতে গেলে হৃদয়ে একটু জোর লাগলে হৃদয়কে একটু সঙ্কোচন করে পরে অর্পণ করা মানে ফেলার সময় যেন বায়ুর স্থান অনাহতচক্র পর্য্যন্ত নেমে আসে আর হৃদয়টা যেন প্রসারিত হয়। তাই প্রাণের বেগ ধারণই হয় এই অনাহত চক্রে। এই চক্রে প্রাণশক্তির স্থিরতা হলেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় ও সত্যকার দৃঢ়তা লাভ হয়। আসন দৃঢ়, স্থির ও অটল হয়। এটাই হল অন্তর্নিহিত অর্থ। এইরকম আসনে বসে কিভাবে ভগবদচিন্তায় ব্যাপৃত হবেন সেটা পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন ॥ ৬/১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ।। ১২

অনুবাদ : সেই আসনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগাভ্যাস করিবেন। ৬/১২

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে যে আসন প্রস্তুত প্রণালী জেনেছেন এখন সেই আসনে বসতে হবে। বসে বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সমবেত ভাবে যাতে ভগবদচিন্তায় ব্যাপৃত হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন মনকে সম্পূর্ণ বিক্ষেপরহিত করা, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম ও অন্তঃকরণ শুদ্ধি। এসব করবে কি ভাবে ?

(১) বেশ মন দিয়ে প্রাণায়াম করলে বিষয়স্মরণ থাকেনা, মনের ভিতর ঢেউ ওঠাও বন্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গুলোও অর্ন্তমুখী হয়, চিত্তের বৃত্তিস্ফূরণ কমে গেলে মন একাগ্র হতে থাকে, তখন আজ্ঞাচক্রে মন রেখে বিন্দুচিন্তা করলেই চিত্ত স্থির হয়ে আসে। (২) যখন কোনও সাধনা করছেন না, তখনও মন যেন বেশী চঞ্চল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মন ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়েই বিষয় গ্রহণ করে কিন্তু প্রাণের স্পন্দন বিনা মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ হয়না তাই সর্ব্বপ্রথম প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণকে স্থির করুন। (৩) মনকে ভগবন্মুখী করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। মাত্র ধ্যেয় বস্তুটাই যখন মনে স্ফুরিত হয় তখনই মনের একাগ্রতা হয়। এই একাগ্রতা যত গভীর হবে সমাধিও তত শীঘ্র হবে। সংকল্প বিকল্প রহিত হয়ে মন একাগ্র হলেই চিত্ত হতে বৃত্তি আর উত্থিত হয় না। এই অবস্থাই সমাধি। (৪) চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসংযম করতে হলেও সেই একই উপায় শ্বাসকে স্থির করতে হবে। কারণ চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকতে যোগলাভ হয় না। চিত্তের অক্রিয় অবস্থাই আত্মার স্বরূপ। শ্বাসকে স্থির করারও একটাই উপায়। শ্বাসে লক্ষ্য রাখতে পারলেই শ্বাস আপনা আপনিই স্থির হয়ে আসে। (৫) এবার অন্তঃকরণ শুদ্ধি। অন্তঃকরণ শুদ্ধি কোনও আলাদা কাজ বা ব্যাপার নয়। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে চিত্তের বৃত্তি যত ক্ষীণ হয়ে আসবে অন্তঃকরণও ততই বিশুদ্ধ হতে থাকবে। এই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই একাগ্রতার ভিত্তিভূমি। যাহোক, এখন এই একাগ্রতার উপযুক্ত দেহ ও ধারণার কথা পরের শ্লোক দুটিতে দেখুন ॥ ৬/১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ।। ১৩

অনুবাদ : দেহের মধ্যভাগ মস্তক ও গ্রীবাদেশকে (অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া) অচল ও স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে (ভ্রূমধ্যে) দৃষ্টি রাখিয়া এবং অন্যদিক অবলোকন না করিয়া (অর্দ্ধনিমীলিত শিবনেত্র হইয়া) যোগী অবস্থান করিবেন। ৬/১৩

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকগুলোতে আসন প্রস্তুত করা ও চিত্তের একাগ্রতার কথা বলা হয়েছে। এখন ঐ আসনে কিভাবে অবস্থান করলে চিত্তের একাগ্রতার পক্ষে উপযোগী হবে সেটাই ভগবান বলছেন। এখানে লেখা হলেও জেনে রাখুন এসকল অনুষ্ঠান করার সময় গুরুমুখে জেনে নিয়ে বেশ বুঝে করতে হবে। কায়, শির ও গ্রীবা মানে মেরুদণ্ড ঘাড় ও মাথা সরলভাবে রেখে, কণ্ঠা একটু চেপে, থুতনি একটু কণ্ঠকূপের দিকে নামিয়ে দিতে হবে আর শরীরটা যাতে না নড়ে বা না কাঁপে এমনভাবে বসতে হবে। এবার দৃষ্টি ভ্রূমধ্যস্থ করতে হবে, "সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং" অর্থ বাইরের নাকের ডগা দেখা নয়। মানেটা করতে হবে যেন স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া। চোখ আধবোজা আধখোলা অবস্থায় মনে

মনে কূটস্থ চিন্তা করলে চাক্ষুষীবৃত্তি মানে সর্ব্বদা সবকিছু চোখ মেলে দেখার বৃত্তিশূন্য হয়ে যাবে। তবে আরও সহজ মানে হয় চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে মনকে আজ্ঞাচক্রে রাখা। শঙ্করাচার্য্যও বলেছেন, "ন হি স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতম্। কিং তর্হি ? .. ..স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমেব চেদ্বি বক্ষিতং মনস্ত ত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি।" নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখাটা ঠিক বিধিমত নয়। তবে কি ? নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখলে মন সেখানেই সমহিত হয়ে পড়তে পারে তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। সে জন্যই সহজতর উপায়ের কথা বলা হল। এভাবে অভ্যাস করতে পারলেই চিত্ত তরঙ্গহীন শান্ত শূন্য হয়ে সহজে আত্মায় ডুবতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান তখনই হয়। এভাবে প্রশান্তচিত্ত হয়ে কি করতে হবে তা ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন ॥ ৬/১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।। ১৪

অনুবাদ : প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া, মনকে সংযত করিয়া, আমাতেই চিত্ত সমর্পন করিয়া, মৎপরায়ণ ও যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন। ৬/১৪

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকগুলোতে যেভাবে বলা হল ঐ ভাবে বসে, ঐ ভাবে মনকে নিশ্চল করে প্রশান্ত আত্মা হতে হয়। তারপর ধারণা করতে হয় যে আমি কিছুই নই, আমারও কিছু নয়। কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলেই বৃত্তি বিস্মরণ হয়ে যায়। মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হতে থাকে। তবে হ্যাঁ, ভয় পেতে নেই। অবশ্যই নির্ভয়, নির্ভীক হবে। নইলে এগোতে পারবে না, বিপরীত ফল হবে। মনের শান্তভাব ভয়শূন্য হতে সাহায্য করবে। যোগী হতে এসে ভয় কিসের ? খুব বেশি হলে মরে গেলাম, দেহপাত হল, এর বেশি আর কি? ভয়শূন্য হলেই আর দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ থাকে না। তখন মনের স্থিরতার দ্বারা ভাবনা সুদৃঢ় করতে পারলেই সেই অব্যক্ত আত্মাও সাধকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। এটাই ব্রহ্মে বিচরণ বা ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিতি মানে থাকা। ষড়ঙ্গ যোগই স্থির ব্রহ্মে বিচরণ করা বা ব্রহ্মচর্য্য। বিয়ে না করা বা স্ত্রীলোকের মুখদর্শন না করা এসমস্তর কোনওটাই ব্রহ্মচর্য্য নয়, হতেও পারেনা। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা লাভ করতে হয়। বিবাহ জীবনের স্বাভাবিক গতি। জীবদেহ বিবর্তনে স্ত্রীসঙ্গ ও সন্তান উৎপাদন এক স্বাভাবিক পরিণতি। একে গায়ের জোরে অস্বীকার করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে গমন; যার পরিণামও স্বাভাবিক নয়। যাক সে সব অন্য কথা। ঐভাবে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হয়ে মনকে প্রত্যাহৃত করে এনে আমাতে (পরমাত্মায়) অর্পণ করে পরমাত্মায় পরায়ণ ও যোগযুক্ত হয়ে অবস্থান করার কথা শ্রীভগবান বলছেন। এভাবে পরমাত্মা না হোক অতি সহজে আত্মায় যুক্ত বা অন্ততঃ আত্মমগ্ন হতে পারলেও অনেক লাভ। সে লাভ নিজ বোধরূপ। যে আত্মাকে বাইরের শত চেষ্টাতেও খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই অব্যক্ত আত্মা ব্যক্ত হয়ে পড়লে আর কি চাই ? তখন পরমাত্মায় আগ্রহ আপনিই আসে ॥ ৬/১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ।। ১৫

অনুবাদ: উক্তরূপে সদা মনকে সমাহিতকারী, সংযতচিত্ত যোগী নির্ব্বাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৬/১৫

ব্যাখ্যা: পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত উপায়ে অভ্যাস করতে পারলে কি হবে সেটা বলা হচ্ছে। এইভাবে সর্ব্বদা ক্রিয়া করে মনকে সমাহিত করলে মনের বহির্বিচরণরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। মনের বৃত্তিসকল বিনিবৃত্ত হলেই যোগী নিজ স্বরূপে নিমগ্ন হয়ে যান। চিত্তের সমতা না হলে "যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ" হওয়া যায় না। এর আগে সাংখ্যযোগের আলোচনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলেছিলাম। এইভাবে সাধন করলে প্রথমে সাধনার দ্বারা (যে সহজ কুম্ভক হয় তাতে) প্রাণ মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করলে একপ্রকার নিরোধ সমাধি হয়। প্রথমদিকে খুবই অল্প সময় হয়, পরে অভ্যাসদ্বারা খুবই ধীরে ধীরে এই নিরোধসময়টা বাড়তে থাকে মনের একাগ্রতার উপর নির্ভর করে। এভাবে অভ্যাস দ্বারা মনের একাগ্রতা বাড়তে বাড়তে যখন অনেকটা বেড়ে যায় তখনই সমাধি প্রজ্ঞার উদয় হয়। ধ্যেয় বস্তুতে মনের সম্পূর্ণ একাগ্র ভাবই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই কৌশল আয়ত্ত করে এই একাগ্রভূমিতে চিত্তকে দীর্ঘসময়ব্যাপী অভিষ্ট বস্তুতে সংলগ্ন রাখা যায় ফলে সেই বস্তুর অভ্যন্ত রে প্রবেশ করে সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় এজন্যই একে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। তবে এতে বিক্ষিপ্তভূমিতেও সমাধিদ্বারা সেই বিষয়ে বা পদার্থ বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ হয় ঠিকই বা অভিষ্টও লাভ হয় ঠিকই, তবে সেটা সর্ব্বদা থাকে না এবং এতে ক্লেশেরও ক্ষীণতা হয় না, এজন্য বৈরাগ্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়না। নিছক কৌশল অবলম্বনের ফলরূপই হয়ে থাকে। তাই এর সাথে ভগবদ্‌ভক্তি যুক্ত হলে ভগবদারাধনারূপ যোগাভ্যাসে চিত্ত অপ্রসবধর্ম্মা হয়ে গেলে সেই একাগ্র রুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান স্থায়ী হয়, বৈরাগ্যও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। কোনও বিক্ষেপ না থাকায় আর সুখদুঃখের দ্বারা মুগ্ধ হতে হয় না। সহস্র কামনা বাসনার ভাণ্ডার, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অজস্র দুঃখের কারণ এই চিত্তই সমূল উৎপাটিত হয়ে যায়। জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানও নিরুদ্ধ হয়ে যায় বলে এটাই প্রকৃত সমাধি অবস্থা এবং এটাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অবশ্য এ অবস্থা সাধকের এক জন্মে লাভ হয় না। তবে চেষ্টা করলে, লেগে থাকলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সহজেই হতে পারে। প্রাণায়াম ইত্যাদির দ্বারা নাড়ীচক্র বিশুদ্ধ হলেই

দৃশ্যাবলী যে স্রষ্টারই স্বরূপ এই ধারণা প্রবল হলে মনের যে নিরোধ অবস্থা হয় এটাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এটা চার প্রকার যথা – বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা।

(১) সমাধি বিষয়ে কিছু না জেনে না বুঝেও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে বা মন্ত্র জপ করতে করতে বা যোগে কূটস্থাদি দর্শনে তন্ময়তা থেকে বা অনেকের নামকীর্ত্তন করতে গিয়েও এক ধরণের নিরোধ অবস্থা আসে বা ভাবসমাধি হয় এটাই বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

(২) সংযতচিত্ত, দৃঢ়বিচারবান পুরুষের৩আমিই সেই আত্মা' অথবা ৩আত্মাই আমার সর্ব্বস্ব', এমন ভাবনা থেকে চিত্ত মগ্ন হয়ে স্থির হয়ে গেলেই বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

(৩) ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় ব্যাপারহীন হয়ে মনেই বিলীন হয়ে গেলে যে মগ্নতা ও সুখ হয় সেটাই আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

(৪) ক্রমশঃ অধ্যাবসায়ের ফলে যখন এ তিনটিই চলে যায় অথচ৩আমি' বোধটিই শুধুমাত্র থাকে আর সবই চলে যায় তখন যে সমাধি ঘটে সেটাই অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

নিজের চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা লাভ করা সমাধির এটাই চরম অবস্থা কিন্তু তখনও 'আমি' থেকেই যায় তাই এ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত নয়। এতে বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বই এসমস্ত জ্ঞানের গ্রহীতা।

এই বুদ্ধিতত্ত্ব লীন হয়ে গেলেই আত্মস্বরূপের সাথে এক হয়ে যায় তখন আর অস্মিতা থাকে না। এটাই স্বরূপাবস্থা বা কৈবল্যজ্ঞান যা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায়ই একমাত্র সম্ভব। এ বিষয়ে সাংখ্যযোগে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আরও বলা আছে যে যা কিছু স্পন্দন তাইই মন এবং জগৎ। যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রাণকে স্পন্দনশূন্য করতে হয়।৩চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত কর হে।" (প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রাণ নিস্পন্দিত হলে মন, ইন্দ্রিয় সবই নিস্পন্দিত হবে। প্রথমে নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমদ্বারা যতটা সম্ভব করে নিন। তারপর সূক্ষ্ম দর্শন করার বুদ্ধি জোরাল হলে বাকীটা ভগবদ্‌কৃপায় হবে।

এপর্য্যন্ত এটুকু বোঝা গেল যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির যে চারটে অবস্থার কথা বলা হল যখন সেই একটা বৃত্তিও আর থাকেনা এবং দীর্ঘকাল পরেও আর কোন বৃত্তিই উদয় হয় না তখনই একমাত্র অসম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থা ॥ ৬/১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ।। ১৬

অনুবাদঃ কিন্তু হে অর্জ্জুন, অত্যধিক ভোজনকারীর যোগ হয় না, একান্ত অনাহারীরও হয় না; অতি নিদ্রাশীলেরও যোগ হয় না, আবার অতি জাগরণশীলেরও হয় না ॥ ৬/১৬

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে যোগাভ্যাসের জন্য খাওয়া দাওয়া কেমন দরকার তারই একটা সাধারণ নিয়ম শ্রীভগবান বলছেন। খুব বেশী একেবারে পেট ঠেসে ভরে খেলে হবে না। আবার একেবারে না খেয়ে থাকলেও হবে না। খুব বেশী ঘুমানোও যেমন চলবে না আবার খুব কম ঘুমালেও হবে না। এছাড়া ব্যাতিক্রম হলে শরীরও তো খারাপ করে।৩অতিভোজনম্ রোগমূলম্" অতিভোজনই রোগের কারণ। আর অসুস্থ শরীরে যোগ হয় না। স্বাস্থ্য ও শক্তিরক্ষার মত পুষ্টিকর ও বলকারক খাবার খেতে হবে আর রাতের খাওয়া নিশ্চয়ই কম হওয়া দরকার। যাঁরা খুবই উচ্চপর্য্যায়ের যোগাভ্যাস করেন তাঁদের একাহার করাও ভাল। নিয়মিত ও শুদ্ধ আহার না হলে যোগাভ্যাস হয় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে অনাহারী, ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত বা ব্যাকুল চিত্তে যোগাভ্যাস করতে নেই। আহার সম্বন্ধে আছে মুগ, গম, যব,শালিতণ্ডুলের অন্ন, ক্ষীর, দুগ্ধ, ঘৃত, শুটি, পটল, ফল, পলতা ও হিঞ্চে শাক এসব যোগীর সুপথ্য আবার নিষিদ্ধ আহার মাংস, দধি, কুলত্থকলাই, রসুন, পেঁয়াজ, শাক, কটু ও অম্ল, তিক্ত পিণ্যাক (তিলের খৈল) হিং, কুল ও সর্ষের তেল। ঠাণ্ডা খাবার গরম করে খেতে নেই, বিশেষতঃ ফ্রিজে রাখা খাবার নিষিদ্ধ।

এবার নিদ্রাবিষয়ে – অতিনিদ্রায় তমোগুণ বাড়ে, আবার অনিদ্রায় মাথা গরম হয়। বেশি রাতজাগা যেমন ভাল নয়, তেমনি দিবানিদ্রাও ঠিক নয়। যারা বেশি ঘুমায় তাদের শরীরে কফের ভাগ বেশি। বৃদ্ধাবস্থার কথা আলাদা। প্রথম ও চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে সাধন করাই ভাল। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রার জন্য রাখা উচিত। যোগাভ্যাসীর দিবানিদ্রা বা অধিক জাগরণ কোনওটাই ঠিক নয় ॥ ৬/১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ।। ১৭

অনুবাদ: যিনি নিয়মত আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে নিয়মিতরূপে চেষ্টা করেন, নিয়মিতরূপ নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ নিবারক হয়। ৬/১৭

ব্যাখ্যা: কি ধরনের লোক যোগাভ্যাসের উপযুক্ত ? ভগবান বলছেন যোগাভ্যাসের প্রথমদিকে নিয়ম বিষয়ে বেশ কড়াকড়ি থাকাই ভাল। নিয়ম না থাকলে কোনও কাজই ঠিকমত হয়না আর সাফল্যও আসে না। ঠিক সময়মত ঘুমভাঙ্গা, ওঠা, ঠিক সময়ে খাওয়া, সময়মত ভজন, ধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে সময়ানুবর্ত্তিতা পালন করতে হয়। নইলে এলোমেলোভাবে সাধন করলে সুফল তো হয়ই না, বরং কুফল ফলে। সময়ানুবর্ত্তী হয়ে সাধন করলে যোগের দৃঢ়ভূমি লাভ হয়। তৎপরে যোগযুক্ত হয়ে সাধন করতে পারলে এই শ্লোকেরই অপর তাৎপর্য্য মনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখনই বোঝা যায় যোগযুক্ত আহার ও বিহারাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য কতখানি। সে সমস্ত অনেক গুপ্ত বিষয় যা নিজ নিজ বোধরূপ। সবকিছু নারায়ণে সমর্পণ হয়ে গেলে নিজে খেলেও নিজের জন্য খান না, বিহারও নিজে করেন না। জ্ঞানের বিকাশের সাথে নিরোধ অবস্থা উৎপন্ন হলে ব্যবহারিক জগৎ ও তৎসম্বন্ধ যোগীর মন থেকে সরে যায়, মুছে যায় যেমন স্বপ্নে দেখা সুখ দুঃখগুলো জাগ্রত মানুষকে সুখী ও দুঃখী করতে পারেনা ঠিক তেমনি। এটাই দৃশ্য ও দ্রষ্টার একান্ত অনুভবরূপ যোগ। প্রথমদিকে ঠিক ঠিক মত সময়ে সাধন করে এ অবস্থা লাভ করতে হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলোতে গেলে এর অর্থ ও তাৎপর্য্য আরও পরিষ্কার হবে ॥ ৬/১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।। ১৮

অনুবাদ : যখন বাহ্যচিন্তা হইতে বিশেষরূপে সংযত হইয়া চিত্ত আত্মাতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তখন সর্ব্বকামনা হইতে নিস্পৃহ ব্যক্তি যুক্ত বলিয়া কথিত হন। ৬/১৮

ব্যাখ্যা : যোগাভ্যাসীকে যোগী কখন বলা যায় ? ভগবান বলছেন, যোগী মানে যিনি যুক্ত। যুক্ত মানে যিনি এঁটে আছেন। কার সাথে এঁটে আছেন ? পরমাত্মায় এঁটে বা যুক্ত হয়ে আছেন। অর্থাৎ নিরুদ্ধ অবস্থার ঘনীভূত রূপ। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা পার করে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এসে স্থির হওয়া। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চাররকম অবস্থার একটা বৃত্তিও যখন আর থাকেনা, এমনকি দীর্ঘকাল পরেও, বৃত্তির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা, তখনই সেটা অসম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থা। যা "নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ"। এই অবস্থা যিনি লাভ করেছেন তিনিই একমাত্র যোগী। অন্যেরা অভ্যাসীমাত্র। অভ্যাস করে চলেছেন ঐ অবস্থা লাভের উদ্দেশ্যে, মানে যোগী হওয়ার উদ্দেশ্যে। সাধুসঙ্গ দ্বারা অন্তরে বৈরাগ্য এলে তবেই ভগবদ্ বিজ্ঞান বা জ্ঞানের স্ফূরণ হয়। তমোগুণের প্রভাবে মনে যেসব কুতর্ক ও অসম্ভাবনারূপ সংশয় আসত সে সবও নষ্ট হয়। এইসাথে পরাভক্তি দ্বারাই আমাকে (আত্মাকে) তত্ত্বতঃ জানতে পারে। একমাত্র শুদ্ধচিত্ত ব্যতীত এসব কিছুই সম্ভব নয়। আগেও বহুবার বলেছি বহুবাসনা কিভাবে প্রাণদ্বারা স্পন্দিত হয়ে মনে বাসনার তরঙ্গ তোলে। সেজন্যই প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের প্রয়োজন সকল গ্রন্থেই স্বীকার করা হয়েছে। শ্রুতিতে আছে, "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধর্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি"। সবরকম অজ্ঞান প্রাণায়ামদ্বারাই ক্ষয় হয়। যোগাভ্যাসদ্বারা যে অশুদ্ধি ক্ষয় হয় তা থেকে অখণ্ড জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়। তার ফলে চিত্ত বুথ্যানরহিত হয়ে আত্মায় মিলে যায়। সুতরাং যোগী হতে হলে যোগাভ্যাস করতেই হবে, এবং অভ্যাস দ্বারাই একটার পর একটা অবস্থা পার হয়ে আসতে হয়। Practice makes perfect ॥ ৬/১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ । ১৯

অনুবাদ: যেমন নির্ব্বাতস্থানে প্রদীপ বিচলিত হয় না, আত্মবিষয়ক যোগের অভ্যাসকারী সংযতাত্মা যোগীর অচঞ্চল চিত্তের সেইটি উপমা ॥ ৬/১৯

ব্যাখ্যা : আগের প্রশ্ন ছিল যোগাভ্যাসী যোগী কখন হন, উত্তর ছিল অভ্যাস করতে করতে যখন আত্মাকারা হয়ে পরমাত্মায় পাকাপাকি ভাবে যুক্ত হয়ে যান তখনই সেই যোগাভ্যাসকারী যোগী হয়ে থাকেন। তবে এখন প্রশ্ন উঠেছে যে আত্মাকারা কিভাবে হয় ? আত্মাকারে অবস্থিত চিত্তের দৃষ্টান্ত নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না। আত্মবিষয়ক যোগাভ্যাসকারীর সংযতচিত্তের এইটি যথার্থ উপমা। যোগাভ্যাসে চিত্ত সংযত হতে হতে সব বৃত্তিগুলো একমুখী হয়ে একাকার হতে থাকে এবং শেষে সুক্ষ্মতম স্পন্দনটিও অসীম চিদাকাশের মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এভাবে চিত্তবৃত্তিশূন্য হয়ে গেলে যে স্থিরতার অনুভব হয় সেটাই চিরস্থির সত্য বা ব্রহ্মসত্তা। চিত্তের স্পন্দন রহিত অবস্থাতেই জ্ঞানের বিকাশ হয়। কোনও সময় দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল কলেজের) শিক্ষা কিছুমাত্র নেই অথচ এমন ব্যক্তিও অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। এর রহস্য হল সময় বিশেষে ঐ ব্যক্তির চিত্তের ন্যূনতম স্পন্দন, আর কিছু নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পন্দনতত্ত্ব আলোচনার সময় একথা

মোটামুটি ভাবে বলা আছে। স্পন্দন রহিত অবস্থায় যোগী ইচ্ছা করলে তাবৎ বিষয়ই জানতে পারেন। জ্ঞানের স্বচ্ছতায় চিত্তে কোনও দাগই পড়েনা, আর যে সমস্ত অহংযুক্ত জ্ঞান তা চিত্তকে শুধু মলিনই করে থাকে। যাক, সেসব অন্য কথা। প্রাণের চঞ্চলতা থেকেই চিত্তের স্পন্দন। তাই এই স্পন্দন দূর করতে হলে যোগাভ্যাসীকে আগে প্রাণের স্পন্দনকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কারণ স্থিরতা না হলে সমাধি আসেনা। পূর্ণ স্থিরতাই সমাধি। ৬/১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ।। ২০

অনুবাদ: যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা সংযত চিত্ত উপরত হয় এবং যে অবস্থায় আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনাকে দেখিতে দেখিতে অপনাতেই তুষ্ট হন (তাহাই যোগ) তাহাই যোগশব্দ বাচ্য জানিবে। ৬/২০

ব্যাখ্যা: যোগ কাকে বলে ? "যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ" চিত্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ। আগে ভগবান বলেছিলেন কর্ম্মই যোগ অর্থাৎ যাকে সন্ন্যাস বলে সেটাই আসলে কর্ম্মমাত্র। আবার পরে অতিভোজন ও অতিনিদ্রাশীলের যোগ হয়না ইত্যাদি দ্বারা সমাধিলাভের কথাও, বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যোগাভ্যাসের মূল লক্ষ্য হল সমাধি এটাই তিন শ্লোকে বলা হয়েছে। যে অবস্থাদ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত উপরত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয় সেটাই যোগ। অতএব যোগাভ্যাস দ্বারাই যেহেতু চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়, সেই ক্রিয়ার অভ্যাসই যোগাভ্যাস (পাতঞ্জল সূত্র দ্রষ্টব্য)। বায়ু স্থির হয় ক্রিয়ার দ্বারাই। এভাবে স্থির বায়ুর অভ্যাসে প্রাণ স্থির হয়ে গেলে মন বলে কিছু থাকে না। মন না থাকলে আর বিষয়ও থাকে না, তাই মনের ছোটাছুটি বলতেও কিছুই নেই। আরও স্থির হয়ে গেলে সেই অভ্যাসকারীর দেহ ভুল হয়ে যায়। যত বেশি স্থিরতা হয় ততই খণ্ড চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যের সাথে একাকার হয়ে যায়। ঘটাকাশ অখণ্ড মহাকাশের সাথে অভিন্ন হয়ে থাকে। চিত্তের এতখানি বৃত্তিনিরোধই যোগ। চিত্তের এহেন বৃত্তি নিরোধ প্রথম প্রথম সামান্য সময় হলেও অভ্যাসের ফলে পরবর্ত্তীতে বেশি সময় স্থায়ী হয় তখনই সেই আলাদা রকম বা বিশেষ অনুভব জন্মায় যাকে যোগশাস্ত্রে " বিজ্ঞানপদ" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ছাড়াও অভ্যাসের ফলে প্রাণ কিছুটা স্থির হলেই কত কি জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য দেখা যায়। এই জ্যোতিও পৃথক কিছু নয় এও নিজেকেই নিজে দেখা। যোগী ভাবেন এই জ্যোতি কি ? আমি ? কে একে দেখছে ? সেও কি আমিই ? ক্রমশঃ এই সব বিতর্ক বিচারও লয় পেয়ে যায়। যত স্থিরতা বাড়ে ততই এসব লয় পায়, চলে যায়। এটাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর। তাই ভগবানও সে কথাই বলছেন যে অবস্থা বিশেষে শুদ্ধমন দ্বারা আত্মাকে দেখা যায় এবং তাতেই পরিতুষ্ট হও, সে অবস্থাই সমাধি বা যোগ বলে জানবে ॥ ৬/২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ।। ২১

অনুবাদ: যে অবস্থা বিশেষে (অবস্থান কালে) যুক্ত ব্যক্তি সেই যে অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত অনন্তসুখ অনুভব করেন এবং যে অবস্থাবিশেষে থাকিয়া তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না (তাহাই যোগ শব্দবাচ্য জানিবে)। ৬/২১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে আত্মানন্দে তুষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই সন্তুষ্টির কারণ কি ? কারণ এটাই সেই সুখ যা বুদ্ধির গ্রাহ্য নয় আর ইন্দ্রিয়ের সাথে যার কোনও যোগই নেই। এ আবার কেমন সুখ ? যার কোনও বিষয় নেই ? হ্যাঁ, এ এক অনির্ব্বচনীয়, ভাষায় প্রকাশের মত নয়, এমন সুখ। তাই একে আত্যন্তিক সুখ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়েন্দ্র সম্বন্ধরহিত এ সুখ শুধুমাত্র আত্মকারাকারিত বুদ্ধিরই একমাত্র গ্রাহ্য। এ সুখ কখন হয় ? কোনও এক অবস্থাবিশেষে এই অনির্ব্বচনীয় নিত্য সুখ অনুভব হয়। সে অবস্থায় যোগী আত্মস্বরূপ থেকে বিচলিত হন না, তাই সে অবস্থাটাই exact যোগ বা সমাধি। এ অবস্থায় বাহ্য অনুভব না থাকলেও অন্তরে নিরন্তর এক অসীম আনন্দের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। নির্ম্মল বুদ্ধির দ্বারা এ আনন্দের অনুভব হয়। এটাই সমাধিসুখ। প্রাণের স্পন্দন তিরোহিত হয়ে যায়। তুমি বলবে প্রাণস্পন্দন না থাকলে সে বাঁচবে কি করে ? বাঁচে, বেশ ভালভাবেই বাঁচে। বাইরের বায়ু স্থির হয়ে গেলেও মূলাধার থেকে বিশুদ্ধাখ্য পর্য্যন্ত চক্রে চক্রে বায়ু সূক্ষ্মভাবে চলতে থাকে। নইলে দেহ থাকত না। যেহেতু এটা শুধুমাত্র সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তাই বুদ্ধি তখনও লয় হয় না। বুদ্ধি জেগে থাকে, তাই বুদ্ধিতে সে সুখের স্পর্শ লেগে থাকে। সেজন্য সে সুখের অনুভব থাকলেও প্রকাশ সম্ভব হয় না। কারণ প্রকাশের দরজা জানালা নামক ইন্দ্রিয়গুলো তখন সুষুপ্ত (dormant)। এ অবস্থা ছুটে গেলেও তারপরও এ সুখ বোধ হয়, অথচ বলার ভাষা থাকেনা। এ সুখ ইন্দ্রিয়ে অনুভব হয় না তাই প্রকাশও হয় না। পরমানন্দরূপ, অন্তহীন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির এই তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে এসে জগতের সমস্ত পদার্থই সেই অত্যান্তিক সুখের আনন্দঅণু দ্বারা পূর্ণ মনে হয় কারণ এ সুখের একটু স্পর্শও বহুকাল স্মৃতিতে থাকে। এর অনেক পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সেটা হল সম্পূর্ণ সমাধি। ৬/২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।। ২২

অনুবাদ : যে অবস্থায় অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে করেন না, যে অবস্থায় থাকিলে মহাদুঃখেও অভিভূত হন না (তাহাই যোগ শব্দ বাচ্য জানিবে)। ৬/২২

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেমন বলা হল তেমনিভাবে সুষুম্নামধ্যে মূলাধার থেকে বিশুদ্ধাখ্য পর্য্যন্ত তত্ত্বে তত্ত্বে চলতে চলতে তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্বে লয় হওয়ারূপ স্থিতিলাভ হলেই অপর কোনও লাভকেই সে লাভের অপেক্ষা অধিক বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় অষ্টপ্রহর স্থিতি হলে আর কোনও দুঃখেও বিচলিত হয় না। (শতদুঃখেও ক্রিয়া ছাড়ি না) এ অবস্থা পাকাপাকি হলে সেই পুরুষকেই "আপ্ত" বলে। তাঁদের কোনও ভুল নেই, ভ্রান্তি নেই। এ অবস্থায় ব্যবহারিক জগতের সমস্ত কাজই তাঁরা করতে পারেন। অথচ আশা, বাসনা, সংকল্প কিছুই থাকে না। অন্তঃকরণের বৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধি আত্মার সাথে সমাহিত হয়ে যায়। এই সুখের কাছে বিষয়সুখ আর কি ? এই সাধনযোগকে কি ছাড়া যায় ? যোগের এই অপূর্ব্ব মহিমা দেখে যোগী সব ছেড়ে যোগকেই একমাত্র মনে করে এগিয়ে চলেন। এটাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সে কথা পরের শ্লোকে আরও ভালমত বলা হয়েছে। ৬/২২

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিণ্ণচেতসা ।। ২৩

অনুবাদ: এবম্ভূত অবস্থা বিশেষকে সুখদুঃখ সম্পর্কশূন্য যোগ শব্দবাচ্য জানিবে। সেই যোগ অবসাদরহিত চিত্তদ্বারা গুরু উপদেশে নিশ্চিত হইয়া অভ্যাস করিবে। ৬/২৩

ব্যাখ্যা: আগের তিনটি (২০, ২১ ও ২২ নং) শ্লোকে বর্ণিত অবস্থা বিশেষকে যোগ শব্দবাচ্য বলে জানবে। পূর্ব্বশ্লোকত্রয়ে যে যে অবস্থার কথা বলা হল সেটাই সুখদুঃখের অতীত প্রকৃত যোগের অবস্থা। অন্য সব দিক থেকে আসক্তিরহিত হয়ে গুরুবাক্যে নিশ্চয় হয়ে এই কাজ করা উচিত। শঙ্করাচার্য্যের মতে "বিদ্যাহি যা ব্রহ্মগতিপ্রদা যা"। "যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে তাহাই বিদ্যা।" সেজন্য সাধকের (১) অধ্যাবসায় (২) অনির্ব্বিন্নচিত্ত থাকা প্রথম প্রয়োজন। অবশ্য অনেক দুঃখকষ্ট করেই পেতে হয়, "হাসি খেলে না পিয়া মিলে"। জগতের খেলা নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকলে প্রিয়তম আত্মার সন্ধান তো হয়ই না বরং যাঁরা এ পথে থাকেন তাঁদের প্রতি নানাবিধ কটু, উৎকট সন্দেহ জন্মে। সেজন্য প্রথমে নীরস মনে হয়, বহু যত্নেও কিছুই হচ্ছেনা ভেবে পাছে কিছু নিরাশা বা শিথিলতা আসতে পারে তাই "অধ্যাবসায়" ও "অনির্ব্বিন্ন" চিত্তের কথা বলা হয়েছে। এখনও যা কিছু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিনা সেটা নিজের দুস্কৃতির ফল মাত্র। "তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ" যতদিন মন চঞ্চল হয়ে বিষয়ে যাবে ততদিন তাকে বিষয় থেকে টেনে এনে আত্মায় স্থাপন করতে হবে। প্রাণের বিকৃতি বশতঃ জীব শুধুই বিষয়ে রমণ করে। "মনোনাথস্তু মারুতঃ"। মনের চালক এই প্রাণবায়ু। সর্ব্বব্যাপী এই প্রাণবায়ুকে শুদ্ধ করাই ভবরোগ হতে পরিত্রাণের উপায়। কিন্তু এসমস্ত কাজ করেই বা কে? করায়ই বা কে? এখন যোগের প্রকৃত বক্তা বড় দুর্লভ। ভগবদ্গীতাতেই এর সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। যা হোক, এখানে বৈশেষিক দর্শন অবলম্বনে একটু আলোচনা করা হল, যাতে পাঠক এ রহস্যের মর্ম্ম কিছুটা হলেও বুঝতে পারেন।

শরীরস্থ স্থির বায়ু হল প্রাণ বা ব্রহ্মদেব যার সপ্তস্কন্ধ। সপ্তস্কন্ধের উপর সাত রকম বায়ু আছে। এর মধ্যে যেটি বামে চলে সেটি ইড়া, যিনি ডানে (দক্ষিণে) চলেন তিনি পিঙ্গলা, আর তৃতীয় যিনি মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে প্রবাহিতা তিনি সুষুম্না। প্রধান হলেন এই তিন। এছাড়া বাম চক্ষুতে পুষা, ডান চক্ষে অলম্বুষা, ডান কানে হস্তিনী, বাঁ কানে গান্ধারী (কাবেরী)। এই সাত স্কন্ধের আবার সাতটা করে শাখা আছে। মোট মিলিয়ে হল (7x7=৪৯) উনপঞ্চাশ। এছাড়া নাভির স্থির বায়ুর নাম সমান। ইনি কণ্ঠে গিয়ে হন উদান। আবার ঐ বায়ু কণ্ঠে গিয়ে চাপ পেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়, তখন নাম হয় ব্যান। ব্যানবায়ু এক এক জায়গায় গিয়ে এক এক নামে অভিহিত হন। যেমন গুহ্যদেশে যখন তখন নাম হয় "অপান" আবার হৃদয়ে "প্রাণ"। এঁদের কর্ম্মানুযায়ী বর্ণনায় প্রাণের কর্ম্ম চেষ্টা করা। এই চেষ্টা যে বায়ুর দ্বারা হয় তার নাম :-

(১) প্রবাহ – যাঁর রূপ বিদ্যুৎপ্রভ, জ্যোতির্ম্ময়।
(২) আবহ – এর কর্ম্ম জীর্ণ করা, – রূপ বালার্ক সদৃশ, স্থান অন্তর্দেহে, ইনিই উদান।
(৩) উদ্বহ – সমস্ত শিরার দ্বারা রক্তসঞ্চালন আর শ্বাস টানার সময় উর্দ্ধে অর্থাৎ মাথায় নিয়ে যাওয়া। শাস্ত্রে যাকে রূপকার্থে বলা হয় চারি সমুদ্র, মানে মুখ, নাক, চোখ ও কান, যেখানে বায়ুর গতি সর্ব্বদা চলছে। এখান থেকে মাথায় নিয়ে সেখানে শ্লেষ্মারূপ মেঘ ও তা থেকে বৃষ্টি মানে তরল শ্লেষ্মা নির্গমন করিয়ে থাকেন। ইনি সর্ব্বশরীরে থাকায় এর রূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট নেই এর নাম ব্যান।

(৪) সংবহ – এই বায়ুর কাজ মেঘরূপ শ্লেষ্মাগুলোকে কমজোর করে নিচে নামিয়ে বর্ষণ মোক্ষণরূপে বের করে দেওয়া। ঘাম বের হয় এই পদ্ধতিতে। তাই শরীরের নদীগুলো (রূপকার্থে) ইড়া=গঙ্গা, পিঙ্গলা=যমুনা, গান্ধারী=কাবেরী, হস্তিনী = সিন্ধু, পুষা=তাম্রপর্ণী, অলম্বুষা=গৌতমী, সুষুম্না = সরস্বতী, কুহু = নর্ম্মদা, বারণী=গোমতী, সর্ব্বাঙ্গে পয়স্বিনী। এইভাবে বারটি বায়ু নদীরূপে সর্ব্বশরীরব্যাপী প্রবাহিত, যাদের গতিতেই জীব বেঁচে আছে। এই সমস্ত বায়ু মস্তকে গিয়েই এই পঞ্চভূত হচ্ছে। রথরূপ এই শরীর আপানবায়ুর দ্বারা (সঠিক প্রাণায়ামে) উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে (ফাটিয়ে) চলে যায়, তখন যোগীর মৃত্যু হয়। একেই গিরিমর্দ্দন বলা হয় যেমন ভূমিকম্পে পর্ব্বত পড়ে যায় তেমনি ভাবে যোগীদের শরীরত্যাগ হয়। থাকুক সেসব কথা।
(৫) বিবহ – এই বায়ুর ব্যতিক্রমে সব রোগ উৎপন্ন হয়। এই বায়ু রুক্ষ হলে রজোগুণ মানে রাগ (ক্রোধ) বাড়ে। আবার এই সমান বায়ুর সঙ্গে মেঘরূপ শ্লেষ্মার যোগ হলে তবে খুবই বিপদ। মানে মৃত্যু বা তেমন মারাত্মক উৎপাত সৃষ্টি হয় এবং আকাশে মিশে যায়।

(৬) পরিবহ – এই বায়ুর দ্বারা সব আকাশময় হয়, জলে চলে, পাখী ওড়ে। এর দ্বারাই ইড়া নাড়ী (চন্দ্র) স্থির থাকে, এই বায়ু দেহরূপ পৃথিবীকে ঠাণ্ডা করে রাখে। শ্রেষ্ঠ সাধকগণ এই বায়ুর জপ করেন।

(৭) পরাবহ – এই বায়ুর দ্বারা জীব বাঁচে ও মরে কারণ এই বায়ুই প্রাণীগণকে ভরণপোষণ করে ও মৃত্যুকালে বেরিয়ে যায়।

এতক্ষণে এটুকু অন্ততঃ বোঝা গেল যে সবকিছুই বায়ুর দ্বারা হচ্ছে। ডাক্তার বাবুদের এ অংশটুকু পড়তে অনুরোধ করি এবং কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে অসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে বলি। এখন প্রশ্ন বায়ুসকল শরীরে আছে ঠিকই কিন্তু তারা কাজ করে কিভাবে ? কে তাদের কাজ করায় ? সেই শক্তিটা কি ? উত্তর হল "কূটস্থ"। কূটস্থ শরীর মধ্যে আছেন বলেই বায়ুরা কাজ করে থাকে, কাজ করতে পারে। শ্বসন, মানে শ্বাসক্রিয়া, স্পর্শন, দর্শন, শ্রবণ, সকল কাজই বায়ুর কাজেরই ফল। "বায়ো ত্বং প্রত্যক্ষ্যং ব্রহ্মাসি" একথা বেদে আছে। যেমন ধরুন এই পৃষদশ্য নামক বায়ু অদৃশ্য গতিতে ত্বক বা দেহচর্ম্মের (Skin layer) মধ্যে যায় বলেই ত্বক স্পর্শ অনুভব শক্তি পায়। নাকের ভিতরে গন্ধবাহ নামক বায়ুরদ্বারা (হবংধষ হবৎবং) নাক গন্ধগ্রহণ শক্তিলাভ করে। ঐবায়ুর প্রবাহ কিছুক্ষণ থাকায় ভোগিকান্ত নামক বায়ুর গতিতে ঐ গন্ধের পুনঃকামনা জন্মে। একটু বলে রাখি যে এই ভোগিকান্ত বায়ুই জীবের সকল ক্লেশের মূল। শ্বসিনী বায়ুর দ্বারা এই মহাবল পরাক্রান্ত টান অনুভব হয়। জীবের সকল কর্ম্ম এই প্রবাহ শক্তিরদ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যদিও এই ভোগিকান্তই প্রাণ যার আর এক নাম ইড়া। অবশ্য একে প্রবাহ বায়ুও বলা হয়। এই প্রবাহের কবলে সবাই পড়ে আছে। ক্রিয়ারদ্বারা ইচ্ছারহিত হতে না পারলেই এর পাল্লায় পড়তে হয়, ততক্ষণ ইনিই সকলের হৃদয়ে কর্ত্তা হয়ে বসে থাকেন। এঁর উৎপত্তি আকাশ হতে, আকাশের উৎপত্তি কূটস্থ ব্রহ্ম হতে। কূটস্থ ব্রহ্মই গুরু। আকাশ গুরুপুত্র এবং ইড়া পৌত্র। তাই আগেই বলেছিলাম যে বায়ুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। একে গুরুবাক্যের দ্বারা সাধন করলে স্বপ্রকাশ স্বরূপ অধিদৈবত পুরুষকে পাওয়া যায়। এঁরই জ্যোতিতে চক্ষু দিয়ে রূপ, কান দিয়ে শব্দগ্রহণ, মুখ জিভ দিয়ে শব্দ নির্গমন ও স্বাদ বিচার ইত্যাদি হয়। যতদিন ইনি দেহে আছেন, ততদিনই মানুষের আয়ু ও বল। ইনি অপানবায়ুর দ্বারা আকর্ষিত হয়ে থাকেন। অপানের অপর নাম পিঙ্গলা। এর গতি নিম্নে, নাভি থেকে গুহ্য পর্য্যন্ত। ঘুমন্ত লোককে প্রভাতসমীর যেমন জাগায় তেমনি গুরুবাক্যের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে ঠিকমত কায়দায় জাগাতে পারলে, মানে মূলাধার থেকে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত স্থির রাখতে পারলে, মানুষকে মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেয়। কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি। এর অর্ধমাত্রা স্থির অর্থাৎ অমর অপরার্ধ চঞ্চল। এই চঞ্চলার্দ্ধকে ক্রিয়াদ্বারা স্থির করতে পারলেই আর প্রাণের স্থানচ্যুতি হতে হয়না। স্থানচ্যুত না হলে মৃত্যু হয় না। এজন্যই হৃদয়কে অনাহত বলে। প্রাণের এই স্থিতি ঈশ্বররূপে হৃদয়ে রয়েছেন। এই ঈশ্বরকে ভুলে, প্যান্ডেলে মাটির প্রতিমা বসিয়ে, মাইক বাজিয়ে নাচানাচি করার মত অপকর্ম্ম ও মহাপাপ আর নেই। মূল যদি দৃঢ় না হয় গাছ কোনও মতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। কিন্তু বায়ু তো স্থিতিস্থাপক (বষধংঃরপ) রবারের মত, উপরদিকে টানলে নীচের ভার সাথে সাথে যেমন উপরদিকে উঠে যায়, তেমনই অপানের শক্তি কমে গেলেই প্রাণ উপরের দিকে টান দেয় আর সেই টানের সাথে সাথে নাভির সমান বায়ু রবারের মতই উঠে মনিবন্ধে যায়, সেখানে নিচের থেকে কোনও টান বা আকর্ষণ না থাকায় আর নিচে আসতে পারেনা। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলেই বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যায়। মানুষ জন্মাবামাত্রই মরে যেত কিন্তু অপানবায়ুর স্থিতিশক্তিই তাকে হঠাৎ মরতে দেয় না। এজন্যই বলি যে খুব ভীষণভাবে চেষ্টা করে ক্রিয়া কর্ম্মকরে প্রাণবায়ু যদি অপান বায়ুতে যায় তবেই সেই বিশেষভাবে স্থিতিটা হয়। আর বিশেষভাবে করলে সেই বিশেষরূপ দেখাও যায়। এই জন্যেই এই যোগকর্ম্ম অভ্যাস করা। এই রকমভাবে ক্রিয়াকর্ম্ম অভ্যাস করার পরেও মানে অপান বায়ুতে স্থিতি হবার পরেও প্রাণের টান হয় মানে চার দিকে ছুটে যেতে চেষ্টা করে এবং এসময়ই কাঁপতে থাকে। এজন্যই বায়ুকে প্রকম্পন বলে । যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর বোধের কর্ত্তা তাঁর কর্ত্তা এই বায়ু। তন্ত্রে যে শক্তি চালনের কথা বলা আছে সেই শক্তি চালনায় কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে থাকেন। অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা যাঁর এবম্বিধ অনুভবশক্তি কিছুটা অন্ততঃ হয়েছে তিনি বোঝেন যে এই বল যে বায়ুর দ্বারা হয় তাঁর নাম অপান। এই অপান বায়ু না থাকলে খিদে পেতনা । দেখবেন খিদের সময় কূটস্থ থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত টান পড়ে। ক্রিয়ার পর অবস্থাও বলা যায় প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিতে সমান বায়ুর উৎপত্তি। এই বায়ুর গতি অতিসূক্ষ্ম। যাকে বলে সুষুম্না। ইনি থাকেন নাভিতে। এর নাম হল "বিবহ"। কারণ ইনিই খাদ্যদ্রব্য ও সবকিছু বিশেষভাবে জীর্ণ ও বিরেচন করছেন। ইনি নিতম্ব (পাছা) থেকে কূটস্থ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে নিজে স্থির হয়ে উচ্চ ও নীচ দুই অংশকে বা দিককে ঘর্ষণ দ্বারায় আগুণ জ্বালিয়ে ভুক্ত দ্রব্যকে (চর্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়কে) জীর্ণ করে তারপর প্রথমে শুকিয়ে হজম করায় এবং পরে নাভিতে তার স্থান হওয়ায় ঐ জায়গায় চাপ দিয়ে বা কোঁৎ দিয়ে ভুক্তাবশেষ (মল) কে বের করে দেয় যাকে অয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভাষায়‘বিরেচণ’ বলা হয়। এই বিরেচন ক্রিয়াটা (excretion task) প্রকুঞ্চন শক্তিদ্বারা হয়ে থাকে। আগেই বলেছি যে মূলাধার থেকে নাভি পর্য্যন্ত যে অপান বায়ুর টান আছে, সেই টানের স্পর্শ নাভিতে লাগে, তারপর সমস্ত ত্বকের তলায় যে স্পর্শবায়ু আছে, আগেই বলেছি, তার স্পর্শবোধ হয়। ওখানে গিয়ে মেরুদণ্ডের দিকে সরল ভাবে থাকলে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মনের ছবি পাওয়া যায়। কারণ তখন ব্রহ্মেতে স্থির হওয়ায় পুরোটাই দেখা যায়। যেমন অর্জুন কূটস্থের মধ্যে সমস্ত ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন। যোগীরাও এভাবেই কূটস্থের মধ্যে সহজেই সমস্ত দেখতে শুনতে পান। এখানে যে সব মূর্ত্তি দেখা যায় তাদেরও গতি দেখা যায়। কিন্তু সমাধি অবস্থায় আর গতির অনুভব হয় না কারণ নিজে তখন থাকেনা। এই

স্থির আকাশ সমাধিতেও (সাধারণ সমাধি) প্রায় ৩৫% বায়ুর ভূমিকা আছে। যখন বায়ুর ভূমিকা থাকবেনা তখন পূর্ণ গতিহীন হবে ও এক ব্রহ্ম হয়ে যাবে। এই স্থির বায়ু কণ্ঠে থাকলে কালের অনুভব হয়, তখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের অনুভব হয়। তখনই মনে হয় "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" নাভিতে মনের আধার, ওখান থেকেই শব্দের উৎপত্তি। সেই বায়ু নিজে থেকেই স্থিরে মিলেমিশে গেলে মনও মনে মিশে যায়। যা হোক, আবার সেই সমান বায়ুর কথায় ফিরে আসি। সমানবায়ু সকলের গতিকে সমান করে রাখে। শুধু সমান রাখাই নয় বা বায়ুরদ্বারা স্থিতিস্থাপকতা রাখাই নয়। শরীরের চামড়া এই স্থিতির দ্বারা স্থির হয়েই বৃদ্ধিলাভ করে। এই স্থিরত্ব, স্থিতি ও স্থিতিস্থাপকতা না থাকলে চামড়ার অণুগুলো সব পৃথক হয়ে যেত। চামড়ার নিচে তিনটি স্তর আছে চর্ব্বি মাংস ইত্যাদির কিন্তু একটি যে বায়ুর স্তরও আছে সেটা শরীর বিজ্ঞানীদেরও বোধগম্য হয়না। কারণ সেই স্তর অদৃশ্য। যদিও শবব্যবচ্ছেদ কালে আপাতদৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও মৃত্যুর অন্ততঃ দশ মিনিটের মধ্য শব ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হলে বায়ুচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রে এর অস্তিত্ব কিছুটা হলেও সাড়া দেবে। যাহোক স্থিতিস্বরূপ আকাশ শরীরের উপরেও আছে। ব্রহ্মের অণু আকাশে থাকায় আকাশকে অনন্ত দেখায়। আকাশের অনন্ত অণুর স্থিরভাবে দাবনেতে এই উপরের চামড়ার অণুগুলো গলে বিচ্ছিন্ন না হয়ে স্থিরভাবে লেগে আটকিয়ে আছে। স্বাভাবিক ভাবে এর ফলে ঐ রক্ত দাবনবশতঃ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে পায়ের আঙুল থেকে মস্তক পর্য্যন্ত খুব দ্রুতগতিতে ভিতর ভিতর আসা যাওয়া করছে। এই রক্ত নামক তরলের রং প্রথম রস হওয়াতে জলের মত বর্ণহীন পরে অস্থিমজ্জা মধ্যে গিয়ে লাল রং পায়। ঐ রক্ত তেজের দ্বারা সমান বায়ুতে এসে সর্ব্বত্র ব্যাপক হয়। ঐ রক্তকেও আবার স্থির বায়ুই স্থির রেখেছে। স্থির না থাকলে ঐ রক্তও ফেটে বের হয়ে যেত। এই স্থিতি আছে বলেই জীবজগতের স্থিতি। মরুতের স্থিরত্বের বিষয়টা যোগীরা ভাল জানেন। মরুত না থাকলে সবাই মরে যেত। এজন্যই আগে বলেছিলাম, "বায়ো ত্বং প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাসি।" এই বায়ুই সর্ব্বশরীরে গিয়ে ব্যান নাম ধারণ করেছেন। এই বায়ুনাড়ীর নাম পুষা একথা আগেও বলেছি। এই বায়ু বেগে সর্ব্বশরীরে চলেছে। এই বায়ু শক্তির দ্বারা মাংসগুলো সারা শরীরে ধরে লেগে আছে। শরীর থেকে খসে পড়েনা। ব্যান বায়ুর গতি বিদ্যুৎগতি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে চলাচল করছে। ব্যানের প্রধান অভিব্যক্তি হয় চোখ কান তালু ও গলা। হাই তোলে, আড়ামোড়া খায় এই বায়ু থেকে। এই জায়গায় এসে উপরদিকে যাওয়ার শক্তি থাকায় এখানে আবার এই ব্যান বায়ুরই নাম হয় উদান। উদান বায়ুর কেন্দ্রগুলো কণ্ঠ, মস্তক, নাকের ডগা। এই বায়ুনাড়ীর নাম অলম্বুষা। ঢেকুর তোলার সময় কিছুটা এর অনুভব হয়। ব্যান থেকে ফেরৎ আসার (reverse motion) সময় অববহ বলে তখন তিনি গন্ধের অণুকে বয়ে আনেন। এজন্য যে যেমন খায় তার তেমন ঢেকুর ওঠে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে ইনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন স্থানেরই সুখদাতা। অর্থাৎ ঠিকমত ঢেকুর তুললে গুহ্যদ্বার (rectum), পেট (stomach) এবং মাথা (head) এর অসুখ নিবারণ হয়। এই বায়ুর যখন যোনী থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত গতি হয় তখন নাম হয় পবন কারণ এতে শরীর শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। প্রাণায়ামে এই গতি মস্তকে হলে প্রকৃত উর্দ্ধগতি, মানে ব্রহ্মপদ পাওয়া যায় যা নিজ বোধরূপ। তখন শ্বাস প্রশ্বাস বাইরে আসেনা, ভিতরে ভিতরে চলে। ইনি চর্ম্মসহ সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপী। এর দ্বারা কূটস্থ দর্শন হলে সবপাপ নাশ হয়। মাথায় উঠে থাকায় এর তখন নাম পরিবাহ। এর দ্বারা মাথা ভার বোধ হয়। এই বায়ু সবারই আছে কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়না। এর নাড়ীর নাম গান্ধারী। গুরুবাক্যে ক্রিয়ার অনুভব হলেও ক্রিয়া করতে মন যায়না ও চায়না যাঁর দ্বারা তাঁর নাম অনিল। এই বায়ু গুহ্যদ্বার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত বহুক্ষণ থাকে। ঠিক নীল রংও নয় অথচ ধোঁয়ার চাইতেও পাতলা, এই বায়ু স্থির থাকলে শরীর ঠিক থাকে। ব্যতিক্রমেই রোগব্যাধি হয়। এই স্থিরবায়ু না থাকলে প্রশ্বাসই হতনা, কারণ শ্বাস উপরে গিয়ে স্থিরবায়ুর প্রতিঘাতে নিচে আসার নামই প্রশ্বাস। এখানে এই বায়ুর নাম হল সুষেণ। এঁকে সক্রিয় (active) রাখতে পারলে শীত গরম এসব বোধ হয়না, ভূত ভবিষ্যৎও দেখা যায়। ভূত ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে বর্ত্তমান তো দেখা যাবেই তাই এর নাম প্রসদীক্ষ। আবার কারণ বিশেষে ইনিই সুঘোষ, এই বায়ুতে থাকায় বিশেষ সুখ হয়। এসব লিখতে গেলে অনেক বড় লেখা হয়ে যায়। ক্রিয়া না করলে বায়ুর বিষয় বোঝার ক্ষমতা হয় না। যিনি যেমন ক্রিয়া করবেন তিনি তেমন সুখ পাবেন। এই বায়ুতে থেকে দেবতারা দেবতা হয়েছেন, মহাদেব ত্রিলোচন হয়েছেন। ষড়দর্শন অনুযায়ী বায়ুর ক্রিয়া ব্যক্ত করতে হলে একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে একটু মাত্র বললাম। কর্ম্ম অনুযায়ী এই বায়ু বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন নামে পরিচিত। সকৃৎ, বিহগ, উড্ডীয়ান, ঋতবাহ, পরাবহ, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, ত্রিশক্র, হরি ইত্যাদি। সংক্ষেপে এটুকুই বলি যে ইনি প্রাণরূপে কূটস্থে থেকে ইচ্ছা তৎপর হয়ে চিত্তকে চালিয়ে থাকেন (active করে থাকে)। কিন্তু স্থিরত্ব পেলে আর কোনও ইচ্ছা থাকেনা, একেই সমাধি বলে। ইচ্ছাকে হরণ করেন বলেই এঁর নাম হরি। এঁতে থাকলেই মোক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য দিকে মন যায় না। ইনি সকলের শেষ সময়ের বন্ধু, শেষ খেয়ার পাটনি। এঁকে স্মরণ করে মরলে পরমগতি হয়। ইনিই অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। তাই বলি যে বায়ু প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। যার একতা (link) ছয় চক্রের সাথে। মূলাধারে চার, লিঙ্গমূলে ছয়, মনিপুরে আট, হৃদয়ে বারো, কণ্ঠে ষোল, আজ্ঞায় তিন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এই ছয় দেবতা স্বশক্তির সাথে উনপঞ্চাশ দেবতা হয়েছেন। প্রত্যেক চক্রের দলে যে দেবতা এঁরাও উনপঞ্চাশ। এসব কথাই তন্ত্রশাস্ত্রে বিশদভাবে দেওয়া আছে। এসমস্ত বায়ু যেমন অন্তর্জগতে তেমনি বহির্জগতেও আছে। তাইতো শরীর মন ও পৃথিবীর সম্বন্ধ এত নিকট। মেঘলা দিনে মন উদাস হয়। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখুন বায়ুর বিকারেই রোগ উৎপত্তি। তবে ওষুধ খেলে সারে কেন ? ঐ ওষুধে বায়ুর (disbalance factor) বিষম উপাদান আছে। যাহোক এসব আয়ুর্ব্বেদিক বা ডাক্তারী ব্যাপার, এসব আলোচনা

নাই বা করলাম। আমি তো ডাক্তার নই। তার চেয়ে বরং দেখা যাক পরের শ্লোকে ভগবান কি বলছেন ॥ ৬/২৩

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ।। ২৪

অনুবাদ : সঙ্কল্প হইতে জাত সমুদয় কামনা গুলিকে নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব্ববিষয় হইতে বিশেষরূপে প্রত্যাহৃত করিয়া যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ৬/২৪

ব্যাখ্যা : সঙ্কল্পপ্রভব মানে মনের ইচ্ছা থেকে জাত যোগ-প্রতিকূল সকল ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হবে। কখনও মনে এমন ভাবতে নেই যে আমি এটা করব বা ওটা করব। বিষয় দোষদর্শী মন দ্বারা (matured mind) সর্বত্র প্রসারিত চারিদিকে ধাবমান ইন্দ্রিয় সমূহকে বিশেষভাবে সংযত করে যোগাভ্যাস করতে হবে। আসলে সংকল্প থেকে জাত অসংখ্য কামনাই যোগাভ্যাসের প্রতিকূল। মনের গতি ইন্দ্রিয়ের দিকে হওয়া মাত্রই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে রত হয়। কামসংকল্পকে তো যাও বললেই যাবেনা, তাই বিষয়ের দোষদর্শন কর আর মনকে আত্মমুখী কর। আর মনদিয়ে গুরুপ্রদত্ত সাধন অভ্যাস কর। দেখবে অভ্যাসে সব হয় (practice makes perfect)। চঞ্চল প্রাণই তো মনকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। একটু সচেষ্ট হও ও গুরুপদে লেগে, সেঁটে পড়ে থাক। দেখবে, সাধনদ্বারা প্রাণকে শুধু স্পন্দন রহিত করে দিলে ইন্দ্রিয়, মন সবই নিস্পন্দ হয়ে যাবে। আর এটাই সবচেয়ে সহজ উপায় ॥ ৬/২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগ্রহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।। ২৫

অনুবাদ : ধারণা বশীকৃত বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ (ধীরে ধীরে, সহসা নহে) উপরত হইবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ৬/২৫

ব্যাখ্যা: যোগের পরম বিধি হল মনকে আত্মসংস্থ করা। সোজা কথায় আত্মাই সব। আত্মা ছাড়া আর কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই এই ধারণা একেবারে হৃদয়ঙ্গম হওয়া। আর অন্য কিছুই চিন্তা করবেনা। অর্থাৎ আমি কিছু নয়, আত্মাই সব। আমি যে ধ্যান করছি এমনটা ভাববেনা। এটাই ধারণা বশীকৃত বুদ্ধি। এর দ্বারা মনকে আত্মাতে নিশ্চল করে উপরতি অবলম্বন করবে, ধীরে ধীরে, হঠাৎ নয়। অভ্যাস করতে করতেই হবে। উপরতি অর্থাৎ উপরামের স্বরূপ হল আত্মা ভিন্ন অপর কিছুর চিন্তা বা ধারণা না থাকা। মন নিশ্চল হলে স্বয়ংই প্রকাশমান পরমানন্দস্বরূপ হয়ে যাবে। এই শ্লোকে ভগবান সাধনক্রিয়ার অভ্যাস কিভাবে করতে হবে তারই উপদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ খুবই ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হবে, জোরে বা তাড়াতাড়ি নয়। যদিও যোগশাস্ত্রে "বলাৎকারেণ গৃহ্নীয়াৎ" বলা হয়েছে হয়েছে তবুও প্রাণকে অতিবেগে চালনা করলে অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে। প্রথম দিকেই জোর দিতে নেই। পরবর্ত্তীতেও বেশী জোরে কিছু করা উচিত নয়। রাজযোগে মনকে নিয়েই সব সাধনা। তাই ধীরে ধীরে প্রাণকে আকর্ষণ করলে মন প্রতি চক্র স্পর্শ করে উঠতে পারবে। প্রতি চক্র স্পর্শ না করলে সেই সেই জায়গায় শক্তি জাগবে কি করে ? এছাড়াও ক্রিয়ার অভ্যাসকালে যে সমস্ত রূপ সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য দৃশ্যসকল দেখা যায় তাতেও মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই এসময় এই উপদেশ মত ধারণা ছাড়া অপর দর্শন শ্রবণকে আমল দিতে নেই, এছাড়াও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ মনে অন্যান্য চিন্তারও উদয় হয়ে থাকে। তাই একটু সাবধান হয়ে, অন্য চিন্তা যাতে না হয়, সেটা লক্ষ্য রাখতে হয়। এর পর পরঅবস্থা একটু ঘনীভূত হয়ে গেলে আর এসব দরকার হয় না, তখন আপনিই সব হয়ে থাকে। তখনই ধারণা বশীকৃত চিত্তে আসল পরাবস্থার উদয় হয় ও মন নিশ্চল অবস্থায় স্থিত হয়। এটাই প্রত্যাহার। শনৈঃ শনৈঃ অর্থাৎ ধীরে ধীরে এই অবস্থাকে আয়ত্ত করতে হয়। মনতো এযাবৎ বহু চিন্তা, বহু বাসনা করে এসেছে। মনের ভেতর সে সব কিছুরই ছাপ পড়ে আছে। আজ হঠাৎ "যাও" বললেই যাবে না। ধৈর্য্যের সাথে সাধনা করে সে সমস্ত দাগ মেটাতে হবে ॥ ৬/২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ।। ২৬

অনুবাদ: (স্বভাবতঃ) চঞ্চল ও অস্থির এমন মন যে যে বিষয়ে স্বভাবদোষে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হইতে এই মন কে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির (বশীভূত) করিয়া রাখিবে। ৬/২৬

ব্যাখ্যা: সাধন সমাধির বাধা বিঘ্নগুলো মোটামুটি চাররকম :- কষায়, বিক্ষেপ, লয় ও রসাস্বাদ। তাই পুরানো স্মৃতি ও সংস্কারজনিত কারণে মনে বিষয়তৃষ্ণা জেগে উঠতেই পারে বটে কিন্তু তখনই বেশ জোর করেই তাকে বিষয় থেকে ফেরাতেই হবে। আগুণ নিভে যাওয়ার সময় জোরে ফুঁ দিলে আবার যেমন জ্বলে ওঠে তেমনি বিভিন্ন নাড়ীর মুখে শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা যে প্রাণের গতি হয় তাতেই বাসনাময় বৃত্তিগুলো জেগে ওঠে। এভাবে জেগে উঠলে তখন অবশ্য শুধুমাত্র বাহ্যিক বিচার বুদ্ধিদ্বারা নিরস্ত করা খুবই কঠিন হয়। তাই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বা বেশী ঘুম পেলেও প্রাণায়াম ও আসন মুদ্রাদি করবার ব্যবস্থা আছে তাতে চিত্তের বিক্ষেপ বৃত্তির অবসান হয়। লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় বিচার বুদ্ধি

খুব ভাল থাকলেও অতিরিক্ত লয় বিক্ষেপের সময় সে সব কোথায় যেন ভেসে যায়। সেজন্যই প্রাণায়ামের অভ্যাস যাঁদের আছে তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ কটা প্রাণায়াম করলে এ সমস্ত রিপুদের প্রবল আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আসলে যা কিছু যোগ সমাধির বিরোধী মনের সে গুলোই খুব প্রিয় কাজ। সাধনে একটু এগিয়ে গেলেই একটু কিছু সিদ্ধিলাভ হলেই মন তাতে ডুবে যায়। যোগের বিশুদ্ধ ও নিরুদ্ধ ভূমিতে প্রবেশ করতে মন আর চায় না। কষায়রূপ বিঘ্ন অবশ্য শুধু প্রথম দিকেই হয় কারণ সাধনায় (interest) আগ্রহ না পাওয়া। কিন্তু বাকি তিনটে বিঘ্ন এই পরবর্ত্তী অবস্থায়ই ঘটে থাকে। ভগবদ্‌কৃপায় পরাবৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটলেই, মনে হয়, এই বিঘ্ন কাটতে পারে ॥ ৬/২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ।। ২৭

অনুবাদ: (এমন) রজোগুণহীন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগীকে উত্তম সুখ আপনিই আশ্রয় করে। ৬/২৭

ব্যাখ্যা: পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে (২৫ নং) যে প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে সেরকম প্রত্যাহার দ্বারা (process of withdrwals) বার বার প্রযত্ন করে যিনি মনকে বশীভূত করে থাকেন, এরূপ অধ্যাবসায়ের দ্বারা তাঁর রজোগুণও ক্ষয় হয়ে যায় বা নষ্ট হয় ফলে মনও প্রশান্ত হয়। এমন নিষ্পাপ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত যোগীকে সমাধিসুখ স্বয়ংই carna) আশ্রয় করে। "আমি - আমার" ভাব থেকেই আসক্তি আসে ও বিষয়দৃষ্টি হয়, সুতরাং ব্রহ্মভাব আসবে কোত্থেকে ? "আমি আমার" না থাকলে অন্য কোনও দিকেই মন যায় না। ব্যস্ আর কি চাই? মন অন্য দিকে না ছুটলেই পাপশূন্য অবস্থা। তখন শুধু নিরতিশয় সুখ, মানে, ক্রিয়ার ঘনীভূত পর অবস্থা। রজঃ তমঃ এর ক্ষয় হয়ে গেলেই বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, সেই বুদ্ধি নির্ম্মল, স্বচ্ছ আত্মার সাথে একভাবাপন্ন হয়ে যায়। যোগদর্শনে এ কথাই আছে। "সত্ত্ব পুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যং"। বুদ্ধির পূর্ণ স্বচ্ছতায় আত্মার কল্পিত অশুদ্ধি দূর হয়। তখন চিদাভাসরূপ বুদ্ধিতত্ত্ব চিৎরূপ আত্মাতে মিশে একাকার হয়ে যায়। এটাই সর্ব্বোত্তম সুখ বা কৈবল্য মুক্তি ॥ ৬/২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ।। ২৮

অনুবাদ: এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে ব্রহ্মে যুক্ত করিতে করিতে নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়াতীত) সুখ প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ তিনি জীবন্মুক্ত হন।) ৬/২৮

ব্যাখ্যা : এইভাবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ২৫ ও ২৬ নং শ্লোকে যে ভাবে বলা হয়েছে) মনকে সর্ব্বদা কর্ম্মের অতীত অবস্থা রূপ স্থির ব্রহ্মে যুক্ত করতে করতে যোগী নিষ্পাপ অবস্থা পান, মানে তাঁর ক্রিয়ার পর অবস্থাটা খুব ঘন হয় অর্থাৎ তখন দেহ, মন, প্রাণ বিক্ষেপশূন্য ও বুদ্ধি আত্মাকার পায়। এমন পরিপূর্ণ চিদানন্দময় অবস্থার সাথে আর কোনও অবস্থারই কোনও তুলনা হয় না। দেহ থাকতে আমরা দেহ সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, মনের সুখ, বুদ্ধির প্রয়োগে লাভ, মুনাফা ইত্যাদি বহুবিধ সুখের আস্বাদন করি বটে কিন্তু অবিদ্যার নাশে যোগীর যে মুক্তিসুখ অনুভব হয়, সে সুখের তুলনায় ঐসকল সুখ কিছুই নয়। সমাধিভঙ্গে বোঝা যায় যে সুখে ছিলাম তার তুলনায় এসব দৈহিক ও জাগতিক সুখ কত তুচ্ছ। ঐ প্রকৃত সুখ লাভ করতে হলে তার অন্তরায়গুলোকে আগে চিনতে হবে যাতে সেগুলো দুর করতে সচেষ্ট হওয়া যায়। কপিলাশ্রমীর যোগদর্শনের সমাধিপাদ থেকে যোগাধ্যবসায়ের মূল অন্তরায় গুলোর উল্লেখ করলাম। "ব্যাধিস্ত্যন সংশয় প্রমাদালস্য বিররিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ ভূমিকাত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহন্ত রায়াঃ" এই নয়টি অন্তরায় হল চিত্তবিক্ষেপের হেতু –

(১) ব্যাধি – অসুস্থতা – ধাতু রস ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বৈষম্য।

(২) স্ত্যান – চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা – সাধন অধ্যাবসায়ে আলস্য।

(৩) সংশয় – উভয়দিকস্পর্শী বিজ্ঞান – হবে কি হবেনা, উচিত বা অনুচিত ইত্যাদি দোলাচল বৃত্তি।

(৪) প্রমাদ – সাধনে ভুল ধারণা থাকা, চিন্তা ভাবনা না করা।

(৫) আলস্য – অলসতা – সাধনায় অপ্রবৃত্তি।

(৬) অবিরতি – বিষয় ভোগরূপ তৃষ্ণা।

(৭) ভ্রান্তি দর্শন – বিপর্য্যয় জ্ঞান, ভুলটাই ঠিক মনে হয়।

(৮) অলব্ধভূমিকত্ব – সমাধি না হওয়া।

(৯) অনবস্থিত্ব – লব্ধ ভূমিতে প্রযত্নের শিথিলতা বশতঃ চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা।

এই নয় ধরনের চিত্তবিক্ষেপই যোগের অন্তরায় বলা হয় ॥ ৬/২৮

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।। ২৯

অনুবাদ : যোগদ্বারা সমাহিত চিত্ত এবং সর্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাবলোকনকারী সেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অভেদে দর্শন করেন। ৬/২৯

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে শ্রীভগবান একেবারে সরাসরি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে পৌঁছে গেছেন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে কেমন হয় সেটাই বলছেন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে সেই ব্রহ্মদর্শী যোগী সর্ব্বভূতে অবিদ্যাকৃত দেহাদি পরিশূন্য নিজ আত্মাকে দেখেন ও নিজের আত্মাতেই সর্ব্বভূতকে অভিন্নরূপে দেখে থাকেন। এটা আসলে সমাধি অবস্থাপ্রাপ্ত অথচ ব্যুত্থিত যোগীর অনুভব। প্রকৃত "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" অনুভব একমাত্র সমাধি অবস্থায়ই হয়ে থাকে। কিন্তু এমন যোগীর সমাধিভঙ্গেও ব্রহ্মকারাকারিত জগৎই দর্শন হয় যার পরিনামে সমদর্শন ঘটে। এজন্য সমদর্শী সকলের আত্মাতে নিজেকে দেখেন। ফলে সকলের দুঃখ, ক্লেশের ভোগে তাঁরও দুঃখভোগ হয়ে থাকে। এজন্যই পার্থিব দৃষ্টিতে বিচার করলে আত্মদর্শনে ক্ষতি ব্যতীত লাভ কিছুই নেই। তবে এতেও একটা বিশেষত্ব আছে সেটা এই যে তাঁর সমদর্শন হয় জ্ঞানের দ্বারা, তাই জ্ঞানীর দুঃখ কিছু নেই, সম্ভবও নয়। কারণ সমাধিবান পুরুষ অজ্ঞানের পরপারে চলে যান। এজন্যই বলা হয় জ্ঞান দুঃখনিবারক। সমদৃষ্টি সম্পন্ন যোগীশ্বর পুরুষ দুঃখীর দুঃখ ও ব্যাথিতের ব্যাথা খুবই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। "মোক্ষয়িষ্যামী মা শুচঃ" এটা তাঁরই অভয়বাণী। অর্দ্ধলব্ধ চেতনাবান পুরুষগণ দুঃখীর দুঃখমোচনের নিমিত্ত বিবিধ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। যেমন বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ হাসপাতাল তৈরী করালেন, এমন অনেক উদাহরণ দিয়ে লেখা বাড়াতে চাই না। কিন্তু পূর্ণ আত্মচৈতন্যে চৈতন্যবান জ্ঞানী পুরুষ স্বয়ং মায়ার পরপারে পৌঁছে মায়ানদীর স্রোতোৎক্ষিপ্ত আর্ত্ত দুঃখী জীবকে সুখের সৈকত বা অজ্ঞাননাশের উপায় বলে দিয়ে থাকেন। করুণার অবতার এই যোগীন্দ্রগণ মানুষকে বার বার জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর কঠোর অভিনয়কে রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করেন। ৬/২৯

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।। ৩০

অনুবাদ : যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হইনা, তিনিও আমার অদৃশ্য হননা ॥ ৬/৩০

ব্যাখ্যা: পূর্ব্বশ্লোকে (২৯ নং) কথিত সমদর্শনই আত্মজ্ঞানের প্রধান কারণ। এজন্যই শ্রীভগবান বলছেন – পরমেশ্বররূপ আমাকে (আত্মাকে) ভূতমাত্রে যিনি দেখেন এবং সর্ব্বপ্রাণীমাত্রকেই আমাতে যে দেখে আমি তাঁর চোখের আড়াল হই না সেও আমার চোখের আড়াল হয় না বরং আমার কৃপাদৃষ্টির মধ্যেই থাকে। কি ভাবে ? কূটস্থ ব্রহ্মে চিত্ত নিয়ত নিবিষ্ট থাকলে ক্ষণমাত্রও আত্মসহবাস বা ব্রহ্মসহবাস হতে বঞ্চিত হতে হয় না। "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে", তাই বলছি সর্ব্বভূতের মধ্যে কৃষ্ণ দেখতে হলে আগে নিজের মধ্যে তাঁকে দেখতে হবে। নিজের মধ্যে তাঁর সাড়া পেলে তবেই সর্ব্বত্রে তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে। তিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট আছেন। এ জগৎ সংসার সবই তাঁর রূপ। আসলে আমরা মড়ার মত উপাসনা করি, তাই জীবন্ত ও জাগ্রতরূপে তাঁকে পাইনা। তাঁকে পাওয়া দূরের কথা, নিজেকেও পাই না। নিজেকে খুঁজে মরি লোভনীয় খাদ্যের মধ্যে, রক্ত মাংসের (carnal) তথা কথিত সুন্দর সুন্দরীদের মধ্যে এবং তাবৎ চোখ ধাঁধানো চমকের (glamour) মধ্যে। একবার ভেবেও দেখিনা যে শক্তি আমার মধ্যে সুপ্তভাবে আছে, তাকে যদি জাগাতে পারি তবে বিশ্বের মধ্যে যে শক্তি ধ্যানমগ্ন আছে তাও জেগে উঠবে। ভক্ত প্রহ্লাদের এমন জাগ্রত ধারণা ছিল বলেই স্তম্ভের মধ্যে তাঁর ঠাকুরকে দেখতে পেয়েছিলেন। আসলে প্রপঞ্চ বর্জিত সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মই কূটস্থ চৈতন্য আর মায়োপহিত অহং বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রপঞ্চ জ্ঞানই জীবভাব। এটা নিজের অন্তঃকরণে আগে অনুভব করতে হয় তবেই বাইরে অনুভব হয়। বরফ পাথরের মত দেখতে হলেও আসলে জল ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই রকম, যোগী জগৎকে দেখেও সেই আত্মাকেই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের মূল বলে বুঝতে পারেন তাই এই জগৎ উদ্ভাসিত হলেও তারই মধ্যে তিনি ব্রহ্মদর্শনই করে থাকেন। ৬/৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজ্যত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ।। ৩১

অনুবাদ : যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া (ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ভজনা করেন, বিষয় সকলে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন। ৬/৩১

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বর্ণিত এমন যে যোগী তিনি কোনও বিধি-কিঙ্কর নন। মানে তিনি সকল অবস্থায় থেকেও বৈধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করলেও আর কদাচ ভ্রষ্ট হন না। কারণ তখন তিনি আমাতেই অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মুক্তিলাভ হয়ে যায়। কার ? যিনি সর্ব্বভূতে স্থিত এমন অভেদভাবে আমাকে ভজনা করেন, এমন জ্ঞানী যোগীর। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাঁর যে ঐক্য অনুভব হয় আত্মা ও পরমাত্মার সাথে তাতেই তিনি মুক্ত অবস্থায় পৌঁছে যান। তাঁর জন্য আর কোনও বিধিনিষেধের ব্যাপার নেই। এমনকি বিষয়াদি ভোগ সময়েও তাঁর চিত্ত বাসনাশূন্যই থাকে। সাধনাদ্বারা ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না খুলে গেলেই এমন একত্ব বোধ হয়। আর কোনও কিছুতেই আগ্রহ থাকেনা। সত্যি সত্যিই চিত্তের অতীত হতে না পারলে কিন্তু সেই দেহবোধই থেকে যায় তখন আর পরোক্ষানুভবের বিলোপ হয় না তো অপরোক্ষানুভব আসবে কোথা থেকে ? আর অদ্বৈতভাবেরই বা

বোধ হবে কোথা থেকে ? কষ্ট করে সাধন করে ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না খুললে তবেই এই একত্ববোধ সম্ভব। শুধু খুললেই হবে না অবিরাম ক্রিয়ার দ্বারা সেই অবস্থাকে বেশ পাকিয়ে তুলতে পারলে তবেই সেই অদ্বৈতভাবে স্থিতি হতে পারে। নইলে শুধু মুখে ব্রহ্মাস্মি বললে অদ্বৈতের অনুভব হয় না। পরোক্ষানুভবের বিলোপ হলেই তবে অপরোক্ষানুভূতি মেলে। ৬/৩১

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ।। ৩২

অনুবাদ: হে অর্জুন, যিনি আত্মতুলনায় সর্ব্বভূতে সমান দেখেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান দেখেন, সেই যোগীকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। ৬/৩২

ব্যাখ্যা: ভগবান এখানে স্বসাদৃশ্যে আত্মার উপমায় সর্ব্বভূতানুকম্পীকেই শ্রেষ্ঠ যোগী বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে যাঁরা যোগাভ্যাসে রত থাকেন তাঁরা তো অপরের কথা বা অন্য কোনও বিষয় ভাবতেই পারেন না। কারণ অন্য কোনও ভাবনা এলেই যোগে বিঘ্ন হয়। সুতরাং বুঝে নিতে হবে যে ভগবান এখানে কোনও শিক্ষার্থী যোগীর কথা বলছেন না। বলছেন তাঁদের কথা যাঁরা একেবারে পাকা যোগী মানে যোগে আরূঢ় পুরুষ যাঁরা কোনও বাসনার মোহে লোকহিত করতে যান না। এঁদের কোনও সংগঠন বা সংস্থা থাকে না। সংগঠন, সংস্থা, মঠ, মিশন ইত্যাদি মানুষের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, কিছু কাজকর্ম্মও করে থাকে বটে, কিন্তু সেই সংগৃহীত অর্থের বেশিরভাগটাই investment, reinvestment করে তার profit নিজেদের ভোগ বিলাসেই ব্যায় করে থাকে। এসব সংস্থা সংগঠনের সাথে কিছুদিন নিজেকে জড়িত করলে ভালভাবে জানা যায়। অথচ আমি একজন ডাক্তারবাবুকে জানি যিনি প্রথম জীবনে নিজের পূর্ব্বপুরুষের বাড়ি ঘরের সবকিছু বেচে বেচেও রোগীর সেবা করতেন। অবশেষে একদিন বুঝলেন এভাবে পাকাপাকি ভাবে মানুষের দুঃখ সম্পূর্ণ মোচন হয় না। সে দিন তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। বর্ত্তমানে উত্তরকাশী গঙ্গোত্রীতে অবস্থান করছেন। টেহরী গাড়োয়াল এ গিয়ে যোগশিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন প্রকৃত যোগারূঢ় পুরুষ। এঁর সান্নিধ্যে থাকলে বোঝা যায় যে জীবের দুঃখে এঁদের চিত্ত বিচলিত হয় অথচ তাতে কোনও মোহ থাকে না। এই অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশ দুইই করতে হয়। তত্ত্বাভ্যাসের জন্য দরকার সৎসঙ্গ ও তত্ত্বালোচনা যা একমাত্র গুরুসকাশেই সঠিক হয় আর মনোনাশের একমাত্র উপায় যোগাভ্যাস। কল্পনার অজস্রতায় মনকে আমরা সমুদ্রের মত অত ভীষণ করে তুলি। আবার কল্পনার ঢেউ কমে গেলে মন কিছুটা হাল্কা হয়, ঠিক হয়, সুস্থ হয়। সাধনার দ্বারা মনোনাশ কর এবং বুত্থিত কালেও সর্ব্বরূপে তিনিই যে আছেন এমন ভাবনায় স্থিত থাকলেই ব্রহ্মধ্যান আর ছুটবেনা। মনোনাশ হলে আর দুঃখ সুখ থাকেনা জাগতিক ভাবসমূহকেও আর সত্য বলে মনে হয়না। সেগুলোকে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। কাউকে এমন দুঃখ শোক পেতে দেখলে নিজের পূর্ব্বাবস্থার কষ্ট মনে পড়ে যে তাইতো আমিওতো এক সময় এমন অজ্ঞানতাবশতঃ কত কষ্টই পেয়েছিলাম। এমন অনুকম্পাবশতঃই তিনি তখন ভবরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সদুপোদেশ দিয়ে থাকেন। যে যোগী নিজের ব্রহ্মলীন অবস্থা থেকে উঠে এসে ব্যাথিত কাতর জীবকে অনুগ্রহ করে থাকেন সেই কৃপাসিন্ধু মহানুভব যোগীন্দ্রগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী ও জগৎগুরু। দুঃখত্রাণপরায়ন সেই মহাপুরুষগণকে মুহুর্মুহু প্রণাম করি ॥ ৬/৩২

অর্জুন উবাচ –

যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ।। ৩৩

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন। হে মধুসূদন, তুমি সমতাদ্বারা (মনের লয়-বিক্ষেপ শূন্যতা হেতু কেবল আত্মাকারে অবস্থান দ্বারা) এই যে যোগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কহিলে মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আমি ইহার নিশ্চল অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি না। ৬/৩৩

ব্যাখ্যা: শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বের পক্ষে কূটস্থের এমত অভিব্যক্তি হজম করা বড়ই কষ্টকর হয়েছে। অর্জ্জুনের পক্ষেও এমন লক্ষণযুক্ত যোগ বেশ অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। তাই তিনি বলছেন যে মনের লয় বিক্ষেপশূন্য হয়ে কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে যোগের কথা আপনি বলছেন এই স্থির অবস্থা আর কতটুকু সময়ই বা থাকতে পারে। তাই এরদ্বারা খুব একটা কিছু স্থির স্থিতির সম্ভাবনা দেখছিনা। এটাও খুব ভূল নয়। এর আলোচনা আগে ২৮ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছি যে যোগের বিঘ্ন কত রকম। যোগের দুটো প্রধান বিঘ্নই হল – অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব। যার অর্থ হল অভ্যাস দ্বারা স্থিরাবস্থা চট করে না পাওয়া বা সেই অবস্থা পেলেও সেটা স্থায়ী না হওয়া। এ জন্যই এই সাম্যভাব এসেও আবার ভেঙ্গে যায়। তখন মনে বেশ হতাশাই আসে যে এত অল্পেই সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ! ৬/৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ।। ৩৪

অনুবাদ : হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, অজেয় ও দৃঢ়, আমি তাহার নিরোধ বায়ুর নিরোধের ন্যায় দুষ্কর মনে করিতেছি। ৬/৩৪

ব্যাখ্যা : অর্জ্জুনের আগের শ্লোকের বক্তব্যের স্পষ্টীকরণ এই শ্লোকে। বলছেন, হে কৃষ্ণ, মনের স্বভাবইতো চপল, দেহন্দ্রিয় ক্ষোভকর ও বলবান। বিষয় বাসনার আসক্তিতে তৈরী দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাই একে বিচার বুদ্ধিদ্বারা বশ করা অসাধ্য ঠিক যেমন আকাশের সমস্ত বায়ুকে কলসীর মধ্যে এনে আটকে রাখার মতই অসম্ভব। জন্মান্তরের সংস্কার সমূহ একে আরও প্রবল করে তোলে। সত্যিই খুব বড় সমস্যা। প্রবল ঘুর্ণিঝড় যেমন রোখা যায় না, তেমনি বাসনাব্যাকুল চিত্তকে স্থির করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন ছুটে বেড়ায়, আর দুরন্ত শিশুর মত এটা দাও, ওটা দাও বলে চিৎকার করে। আগে যেসব প্রাণায়ামের বিষয় বলেছ কিন্তু কই সেই প্রাণবায়ুকে স্থির করাও তো খুব সহজ বলে মনে হচ্ছেনা। বলেছিলে প্রাণবায়ু স্থির হলে মন নিশ্চল হবে। কিন্তু কই তাই বা হল কোথায় ? বাসনাবিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করা যেমন অসম্ভব, ভয়ঙ্কর চঞ্চল প্রাণবায়ুকে স্থির করাও তেমনিই অসম্ভব ॥ ৬/৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ –

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।। ৩৫

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে মহাবাহো, মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, কর্ম্মযোগাভ্যাস দ্বারা এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়। ৬/৩৫

ব্যাখ্যা: শ্রীভগবানের উত্তর খুব সুন্দর। লক্ষ্য করুন ; আরে বাবা, মনের অমনতর চপলতা, দেহন্দ্রিয় ক্ষোভকর ভীষণ শক্তি, কঠিনতর বিষয়বাসনাদি আছে বলেই তো তার নিগ্রহের জন্য এত লাঠি সোটার আমদানি। তুমি যা বলেছ তা নতুন কিছু নয়। যত কঠিন বা অসম্ভব যাই বলনা কেন, হাল ছাড়লে চলবে না। বরং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে রোধ করতে হবে। “তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ”। পরমাত্মায় মনকে রাখার যে চেষ্টা সেটাই অভ্যাস। সাধন প্রণালীর দ্বারা বার বার মনকে কূটস্থে সন্ধান ও স্থাপনা করা চাই। এতে চিত্ত একাগ্র হয়ে আত্মাতে স্থির হয়। তবে হ্যাঁ, একটু চেষ্টা করেই ছেড়ে দেওয়া যাবেনা। শ্রদ্ধা সহকারে একটানা দীর্ঘ জীবনব্যাপী অভ্যাস করে যেতে হয়। মনকে নিরুদ্ধ করার অপর উপায়টি হল বৈরাগ্য, যার মানে হল অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, ভাবনা বা কল্পনা সকলকে মনে ঠাঁই না দেওয়া। সংকল্পের দ্বারাই মনে বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মে। সংকল্প না হলে আসক্তিও থাকেনা। তাই এককথায় মনকে অপ্রয়োজনীয় সংকল্প করতে না দেওয়াই বৈরাগ্য। অবস্থাবিশেষে পর ও অপর ভেদে বৈরাগ্যও চার রকমের যথা :- যতমান, ব্যাতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার। সর্ব্ববিষয়ে বিতৃষ্ণা ও নিস্পৃহভাবের উদয় না হলে কোনও বৈরাগ্যই হয় না। আর বৈরাগ্য কখনই কোনও বই পুস্তক পড়ে হয় না। গুরুপদেশে প্রাণস্পন্দন রোধ করতে পারলেই হয়। অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত অন্তর্মুখী হলেই বৈরাগ্য আপনিই উদয় হয়। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বাদশ সূত্রে আছে, “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ।” মানে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। একই কথাই এখানে ভগবান বললেন যে মনোনিগ্রহের জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্যই প্রধান উপায়। ৬/৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ । ৩৬

অনুবাদ : যাঁহার চিত্ত সংযত নহে, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার মত। কিন্তু গুরুউপদিষ্ট উপায় দ্বারা সংযতচিত্ত ব্যক্তি প্রযত্নশীল হইলে যোগ পাইতে পারেন ॥ ৬/৩৬

সংযত কথার অর্থ এখানে‘বৈরাগ্যদ্বারা বশীকৃত’।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটিও প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বশ্লোকেরই অংশবিশেষ। সেই সূত্রেই ভগবান বলছেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্ত সংযত ও বশীকৃত না হলে তার পক্ষে যোগলাভ দুরূহ। অভ্যাস বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত যাঁর বশে আছে একমাত্র সেই পুরুষই সম্যক উপায় দ্বারা অভ্যাসযোগে যোগলাভে সমর্থ হন। যা হোক, এ কথাটার আসল তাৎপর্য্য হল যে কিছু লোক অল্পদিন সাধন করেই বেশ অগ্রগতি লাভ করলেও অনেকেই দেখি “আমার চিত্ত সংযত নয়, মন বশে থাকে না” ইত্যাদি বলে হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু তেমনটা হলে চলবে না। যোগক্রিয়া হল একরকমের কৌশল যা প্রতিদিন নিয়মিত করা মাত্রই তোমার কর্তব্য। তাই দীর্ঘ দিন ধরে করে যাও। কার কি হল, আর তোমারই বা কি হল না, এ ধরণের ফলাকাঙ্খার সাথে কাজ করলেই তা নিস্ফল হতে বাধ্য। এতে শুধু শুধু অনাবশ্যক চিন্তায় চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করা হয় মাত্র। চিত্তজয়ের প্রধান উপায়ই হল পৌরুষ প্রযত্ন বা সাধনাভ্যাস। এ সমস্ত যোগ কৌশল সংযমের সাথে রোজ কিছুক্ষণ, অন্ততঃ ৬ ঘন্টা, অভ্যাস করতে পারলে প্রাণস্পন্দন কিছুটা হলেও রোধ হয়। বাকিটা আস্তে আস্তে অভ্যাস সময় একটু একটু বাড়িয়ে নিলে গুরুকৃপায় প্রজ্ঞার উদয় হয়, তখন থেকেই প্রারব্ধ ক্ষয় হতে থাকে। এজন্যই সাধনকর্ম্মে পুরুষকার নিতান্তই আবশ্যক। এটা কখনোই শুধুমাত্র প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে না। পুরুষার্থই আমার মতে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদে আছে – “শ্রদ্ধাবীর্য্য স্মৃতিসমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্।” এর অর্থ হল শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এসকল উপায়দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হয়ে থাকে। “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং” কেবলমাত্র কোনও বিষয়কে জানবার কৌতুহলই শ্রদ্ধা হতে

পারেনা। শ্রদ্ধা হল শ্রদ্ধেয় বিষয়ে তীব্র অনুরাগ। এই অনুরাগ ব্যতীত কোনও বিষয়েই প্রবেশলাভ হয় না। মনের প্রবল উৎসাহের নামই বীর্য্য। তথাকথিত অর্থের ন্যায় বীর্য্য শব্দের অর্থ শরীরস্থ ধাতুরস (ংবসবহ) নয়। এই বীর্য্যের অভাবেই সাধনাভ্যাসে আলস্য ও নৈরাশ্য আসে যেটা একমাত্র এই বীর্য্য বা মনের জোর থাকলেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। গৌতম বুদ্ধের কথায় "অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভং"। ৬/৩৬

অর্জুন উবাচ –

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ।। ৩৭

অনুবাদ : অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ, প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে যুক্ত, পরে শিথিলাভ্যাস বশতঃ যোগ হইতে যাহার মানস বিচলিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি যোগফল (জ্ঞান) না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয় ? ৬/৩৭

ব্যাখ্যা : অর্জ্জুনের প্রশ্ন ভগবানের প্রতি পূর্ব্বশ্লোক অবলম্বনে। যদি সত্যই এমন হয় যে প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েই যোগাভ্যাস শুরু করেছে কিন্তু ভগবান যেমনটা বলেছেন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের জন্য প্রযত্ন করার কথা, যদিই তেমনটা অভ্যাস না করতে পারে। শিথিলতা আসে অথবা এমত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে ও প্রারব্ধ বশে মৃত্যুসময়ে ভগবদ্স্মরণও না হয়, তবে সেই যোগভ্রষ্টের তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অভাবে কি গতি লাভ হয় ? এটাই প্রশ্ন । ৬/৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ।। ৩৮

অনুবাদ : হে মহাবাহো, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া নিরাশ্রয় ও উভয় বিভ্রষ্ট সেই ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না কি ? ৬/৩৮

ব্যাখ্যা : ভগবানের পূর্ব্বোক্ত ৩৫ ও ৩৬ নং শ্লোকের কথার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ৩৭ ও ৩৮ নং শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন। তবে কি সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করায় সুকর্ম্ম সকলের ফল পেলেননা অথচ যোগাভ্যাসও সম্পূর্ণ করতে না পারায় ব্রহ্মত্ব হল না ফলে মোক্ষও হল না এমন উভয় বিভ্রষ্ট ব্যক্তির পরিণতি কি ? এভাবে ধর্ম্ম ও মোক্ষ দুই দিকই হারিয়ে বসলে তার গতি কি হয় ? যোগাভ্যাস শুরু করায় প্রচলিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করা হল না। সুতরাং পিতৃযান মার্গ রুদ্ধ। আবার যোগাভ্যাস অপূর্ণ থাকায় ব্রহ্মেতে থাকাও হলনা, মোক্ষলাভ তো দুরের কথা। এমনতর লোকের কি অবস্থা হবে ? এ অবস্থারই উপমা খণ্ড মেঘের সাথে করা হয়েছে। সেকি টুকরো মেঘের মত মাঝপথেই নষ্ট হয় না ? ৬/৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ।। ৩৯

অনুবাদ : হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন কর। তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের নিবর্ত্তক আর নেই। ৬/৩৯

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবান নিজেই যেহেতু এখন এই যোগের প্রবক্তা, সর্ব্বজ্ঞ। অতএব সংশয়ের মীমাংসা একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব। তিনি ভিন্ন অপর কোনও ঋষি বা দেবতার দ্বারা এই সংশয়ের সম্পূর্ণ স্পষ্টিকরণ সম্ভব নয়। দেখুন শ্রীভগবান উত্তরে পরবর্ত্তী পাঁচটি শ্লোকে কি বলছেন। ৬/৩৯

শ্রীভগবান্ উবাচ –

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যানকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ।। ৪০

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন। হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার বিনাশ হয় না। যেহেতু হে তাত, শুভকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়না। ৬/৪০

ব্যাখ্যা : এবার শ্রীভগবান সার্দ্ধ চারটি শ্লোকে, আগের তিনটি শ্লোকে অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বলছেন, হে পার্থ কল্যাণকৃৎ মানে কল্যাণকারী মানুষের কখনও দুর্গতি হয় না। তবে প্রশ্ন হয় কল্যাণকৃৎ কে ? যে জীবাত্মা, দেহ মন, মানে ইন্দ্রিয়বুদ্ধির পাল্লায় পড়ে, কত দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করে কিন্তু নিজের অবস্থাটা বুঝে উঠতে পারলেই আর দেহ, মন ইন্দ্রিয়াদিকে পাত্তা না দিয়ে সোজা নিজ নিকেতনের পথে পাড়ি জমায় এবং গুরুতে ও শাস্ত্রেতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সেই পথে এগিয়ে চলে সেই আসল কল্যাণকৃৎ। এঁর কখনও দুর্গতি হয় না। আত্মা থেকে দুরে থাকাই আসল দুর্গতি। তাই বলছেন আত্মায় স্থিতি লাভের চেষ্টায় যিনি থাকেন তিনিই প্রকৃত কল্যাণকৃৎ। যোগাভ্যাস হল আত্মার সাথে মনের সংযোগ স্থাপনের কৌশল। তবে আজকাল যোগাভ্যাসী পুরুষেরাও কখনও কখনও বিষয়াকৃষ্ট হয়ে যোগভ্রষ্ট হয়ে থাকেন তখন তাঁদের গতি কি বা কেমন হবে এটাই ছিল মূল প্রশ্ন।

তারই উত্তরে ভগবান্‌‌কল্যাণকৃৎ' কথাটি বলেছেন। একবার গুরুকৃপায় যে আত্মজ্যোতি দর্শন করেছে অথবা কোনও দিন ক্ষণকালের জন্যও ক্রিয়ার পরাবস্থায় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেছে, সে যদি কোনও ঋদ্ধি সিদ্ধি নাও পায় বা যোগভ্রষ্টও হয় তবুও তার কোনও রকমেই কোন অসদ্‌গতি হতে পারেনা। সমাধি, সিদ্ধি এসব না হলেও সে যে চেষ্টায় লেগে থাকে সে অবস্থায় মৃত্যু হলে সংস্কারবশে সে শুভগতি ও শুভ দেহলাভ করবেই এ একেবারে পরিস্কার বিজ্ঞান। কেবলমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনে তেমন কোনও পুরুষার্থ লাভ হয় না। কিছু কিঞ্চিৎ হলেও সে সব বোঝা যায় না এতই ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু ভগবদ্‌স্মৃতি স্বর্গতুল্য। ভগবদ্ বিস্মৃতিই বিপদ ৷৷ ৬/৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ।। ৪১

অনুবাদ : সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূণ্যকারীদের সকল লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর বাসসুখ অনুভব করিয়া, পরে শুচি ও শ্রীমান্ দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৬/৪১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বলা হল যোগভ্রষ্ট শুভগতি ও শুভদেহ লাভ করেন। কিন্তু সেই গতিটা কেমন ? এরই বিশদ ব্যাখ্যা। যোগভ্রষ্ট দুই ধরণের হয়। একদল সামান্য কিছু যোগৈশ্বর্য্য লাভ করে তাতেই মোহিত হয়ে অভিমান ও স্পর্ধা হেতু বিপথগামী হয়ে যোগভ্রষ্ট হয়ে থাকেন। ফলে এরা ধন ও বিষয় সুখে মজে গিয়ে থাকেন। এদের কিন্তু মৃত্যুর পর বহুদিন স্বর্গাদি সুখভোগ ও কর্ম্মফল ভোগান্তে আবার এখানে এসে জন্মাতে হয় বটে কিন্তু এদের পুনরাবৃত্তিটা ঠিক সবার মত নয়, কারণ এক সময় যে চিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠার উদয় হয়েছিল, সেই সংস্কার হেতু শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নিয়ে, মানে সদাচারী আস্তিক ব্রাহ্মণকুলে জন্মে, আবার ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য প্রারব্ধ সাধনকর্ম্ম শুরু করতে হয়। কিন্তু যাঁদের জীবনের সাধনা সম্পূর্ণ নিষ্কাম ছিল, বিষয়াসক্তির ছিটেফোঁটাও ছিল না, তাঁদের আর জন্মাতে হয়না, সুখ দুঃখও ভোগ করতে হয় না। তাঁরা জন্মমৃত্যুর অতীত হয়ে যান। মহাত্মা কবীরদাসজী বড় সুন্দরভাবে বলেছেন –

"সহকামী সুমিরণ করে পাওরে উঁচা ধাম,
নিহকামী সুমিরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম।
সহকামী সুমিরণ করে ফির আওয়ে ফির যায়,
নিহকামী সুমিরণ করে আওয়া গমন নাশায়।"

যার অর্থ কামনাসহিত স্মরণে উচ্চধাম লাভ হলেও নিষ্কাম স্মরণে নিত্যপদ লাভ হয়। সহকামীর ভগবৎ স্মরণে জগতে যাতায়াত বন্ধ হয় না, কিন্তু নিষ্কামীদের ভগবদ্ স্মরণ তাদের জন্ম মরণ রুদ্ধ করে দেয়। দ্বিতীয় প্রকারের যোগভ্রষ্টদের গতির কথা পরের শ্লোকে দেখুন। ৬/৪১

অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ।। ৪২

অনুবাদ : অথবা তিনি জ্ঞানী যোগীদিগেরই বংশে জন্মগ্রহন করেন। ঈদৃশ যে জন্ম, তাহা জগতে নিশ্চয়ই দুর্লভতর। ৬/৪২

ব্যাখ্যা: অল্পসময়ের যোগভ্রষ্টের গতি তো আগের শ্লোকে শুনলেন এখন দ্বিতীয় প্রকারের যোগভ্রষ্ট মানে চিরভ্যস্ত যোগভ্রংশের গতি কি হয় শ্রীভগবান বলছেন - বহুদিন ধরে যোগভ্যাস করা সত্ত্বেও এই অধ্যায়ের ২৮ নং শ্লোকে বর্ণিত যোগের অন্তরায় জনিত কারণে যার যোগসিদ্ধি হল না, বিশেষতঃ অলব্ধভূমিকত্ব বা অনবস্থিত্বরূপ বাধা বিপত্তির জন্য অথবা আয়ুষ্কাল কম হওয়ার জন্য সময় কম পাওয়ায় যথেষ্ট নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা যোগে অসফল তাঁরা মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গিয়ে সেখানে সাধনের বাকি অংশ সমাপন করে থাকেন। আর কোনও কারণে যদি ততটা উচ্চ অবস্থাও না পেয়ে থাকেন তবে এ জগতে ফিরে আসতে হলেও যোগীর ঘরে এসে জন্মলাভ হয় এবং সহজেই যোগপন্থার উপদেশ পেয়ে থাকেন। এই জন্মেই পুনঃ পুনঃ স্বরূপে স্থিতিলাভের অভ্যাসে দক্ষতা অর্জন করেন এবং চরম সিদ্ধিলাভ করে কৃতকৃত্য হন। এজন্যই ধনী শ্রীমানের ঘরে জন্ম অপেক্ষা যোগীর ঘরে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠতর। এখানে নিশ্চিন্তচিত্তে সাধনা করে জন্ম সফল করা যায়। নির্জনে বহুক্ষণ যাবৎ অতিপ্রিয় প্রাণের মধ্যে আত্মার অনুসন্ধান করা যায়। ৬/৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ।। ৬/৪৩

অনুবাদ : তিনি সেই দুইপ্রকার (পূর্ব্বোক্ত) জন্মেই পূর্ব্ব দেহজাত সেই ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন। অনন্তর মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা : পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত যোগীর ঘরে জন্মলাভের পর যোগভ্রষ্ট এঁরা সেই পূর্ব্বদেহজাত ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধির সংযোগ (connection) পেয়ে যান। ঠিক ঘুম ভাঙ্গার পর মানুষ যেমন আগের স্মৃতি ও অবস্থা ফিরে পায়। গভীর ঘুমের ভিতর স্বপ্নাদি যাই দেখিনা কেন নিদ্রাভঙ্গে ঠিক অবস্থাটাই ফিরে পাওয়া

yay। তেমনই আগের জন্মের সাধনার ইচ্ছাও এ জন্মে তীক্ষ্ণ সংস্কার রূপে দেখা যায়। সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার সূক্ষ্মশরীরেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার থাকলেও বিনা পরিশ্রমে কিছুই হয় না। তাই এ জন্মেও তাকে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়। সমস্যা হল গত জন্মের মত এ জন্মেও তো আবার সেই প্রবৃত্তির আবির্ভাব হতে পারে। এখানে সুবিধা এটাই হয় যে গত জন্মে যতটুকু সাধন পথে এগিয়ে যাওয়া গিয়েছিল ততটা যেতে খুবই অল্প পরিশ্রম লাগে। শুধু লেগে থাকলেই হল। এতে প্রবৃত্তিপক্ষ সময় সুযোগ বেশি না পাওয়ায় সাধকের সাধন পরিণতি তরান্বিত হওয়ায় প্রবৃত্তির সুবিধা খুব একটা হয়না। কিন্তু বাকি পথটার জন্য খুব ভীষণভাবে না খাটলে এ জন্মেও সহজে সফলতা আসবে না। তবে সাধনার এই জোরটা জন্মান্তরেও থেকে যাবে এটুকুই যা নিট লাভ। তাই আয়েস আরাম না করে সময়টা কাজে লাগাতে হয়। ৬/৪৩

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোহপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ততে ।। ৪৪

অনুবাদ: সেই পূর্ব্বদেহজাত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকে। যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক ব্যাক্তিও বেদকে অতিক্রম করিয়া থাকেন অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মফলসমূহ অপেক্ষাও অধিকতর ফল পাইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন।৬/৪৪

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে শ্রীভগবানের বাণীর তাৎপর্য্য লক্ষ্য করুন। এই দেহ মন দিয়ে যে কাজ করব, যেমন যেমন কাজে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলব, যেমন যেমন কাজের নেশা, অভ্যাস হয়ে যাবে ঠিক তেমন তেমনই সংস্কারও তৈরী হয়ে যাবে। কর্ম্ম দিয়েই সংস্কার তৈরী হয়। সেই সংস্কার আমাদের সাথে সাথে যায়। তাই কথায় বলে কর্ম্ম করলেই ফল পেতে হয়। সংস্কারটাই সেই ফল। এর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। অতএব সাধু সাবধান। ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। এবার যোগভ্রষ্টের কথায় ফিরে আসি। আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছিলাম যে এই বর্ত্তমান জন্মেও আগের মত সেই প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ওঠেও, কিন্তু সুবিধা করতে পারে না। কারণ সেই পূর্ব্বদেহকৃত অভ্যাসের দ্বারা কোনও অন্তরায় হেতু অনিচ্ছুক হলেও তাঁকে বিষয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। এই জন্যই অনেককে দেখা যায় ঐশ্বর্য্যবানের ঘরে জন্মেও, ভোগাসক্তির মধ্যে লালিত হয়েও কেউ কেউ যোগ জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। এটা সে যে খুব একটা নিজের বিচার বিবেচনাবশতঃ করছে তা কিন্তু নয়। তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারই তার সাধনকে মানে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে দেয়। ফলে তিনি ব্রহ্মপিপাসু হয়ে ওঠেন এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করেন। ৬/৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ।। ৪৫

অনুবাদ: কিন্তু প্রযত্ন সহকারে উত্তরোত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া পরে পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৬/৪৫

ব্যাখ্যা: এবার শ্রীভগবান বিষয়টার উপসংহার (conclusion) করতে চাইছেন। তাই বলছেন যে যাঁরা প্রযত্নশীলতার অভাবে (insincere) যোগভ্রষ্ট হয়ে থাকেন তাঁরাই যদি এভাবে, মানে আগের আগের শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে, উতরে যান মানে পরাবস্থা লাভ করেন, তখন যাঁরা যোগভ্যাসে খুবই প্রযত্নশীল (sincere) তাঁরা যে শীঘ্রই সর্ব্বপাপ বিধূত হয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন এবং শ্রেষ্ঠগতি লাভ করবেন তাতে আর কিই বা বলার আছে ? আসলে যে সাধক পূর্ব্ব জন্মের সাধনসংস্কার নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন তাঁর সাধনে প্রযত্ন (sincerity) বেশি থাকে। যেন কোনও হারানিধি ফিরে পাওয়া গেছে এমনভাবে তাঁর সাধনার প্রতি বেশি সমাদর হয়। যোগের অনেক ধাপ যেন খুবই চটপট পার হওয়া যায়। অন্তঃকরণও শুদ্ধ হতে থাকে। কোনও আলতু ফালতু চিন্তা আসেনা। সাধনায় বসা মাত্র মন জমে যায়। আস্তে আস্তে বাইরের বিষয় সব ভুলতে থাকে। একটু অবসর পেলেই মন অন্তর্মুখী হতে চায়। এই অবস্থার নাম "সংশুদ্ধ কিল্বিষ," যদিও এ অবস্থার পরও আরও অনেক দেরী হয়, অনেক জন্ম লাগতে পারে। এতে হতাশ হবার কিছু নেই। শুরু করে দিলে, track এ উঠে গেলে ঠিক মতই যাওয়া যাবে। খুব নিষ্ঠাবান (sincere) সাধকের বহু প্রণায়ামের দরকার হয়না। মন দিয়ে করতে পারলে ১২ টায় প্রত্যাহার, ১৪৪ টায় ধারণা, ১৭২৮ বারে ধ্যান ও ২০৭৩৬ বারে সমাধি হয়। ৬/৪৫

তপস্বিভ্যোহধিকা যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ।। ৪৬

অনুবাদ: আমার মতে যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। ৬/৪৬

ব্যাখ্যা: উপসংহারে শ্রীভগবান নিজ শ্রীমুখে যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করলেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, তপস্যা এ সমস্ত কিছু থেকেই যোগ শ্রেষ্ঠ। কারণ যোগাভ্যাসেই মনোনাশ হয়, মনোনাশ হলেই বাসনার ক্ষয় হয়, বাসনাক্ষয় থেকেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। অতএব যোগাভ্যাসই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু। এজন্যই

অন্যান্য সবরকম জপ, তপ, ব্রত পালন ইত্যাদি অপেক্ষা যোগাভ্যাসই শ্রেষ্ঠ। কারণ এর দ্বারাই সহজে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়। তাই যোগধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অভ্যাসী যখন প্রাণে মন রেখে চক্রে চক্রে আরোহণ অবরোহণ করেন ও ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে প্রবেশ করিয়ে দেন তখন তিনি তপস্বী। যখন যোনীমুদ্রায় দর্শন ও শ্রবণ করেন ও পরে নাদবিন্দুর সন্ধান পেয়ে মন স্থির করে থাকেন, তখন তিনি অন্ত র্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে জ্ঞানী হন। যাঁরা গুরুপদেশে ক্রিয়াভ্যাসে রত থাকেন তাঁরা কর্ম্মী। কিন্তু এসকলের মধ্যেই যোগী শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি পরাবস্থা পেয়েছেন এবং সেখানে তাঁর স্থিতি হয়েছে। এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনার শেষ হয় না। সে জন্যই ভগবান অর্জুনকে বললেন, তুমি সাধন করতে করতে মাঝপথে বসে পড়না, ছেড়ে দিওনা, বরং যোগের চরম অবস্থা লাভে তৎপর হও, এটাই এর নিগূঢ় অর্থ। ৬/৪৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ।। ৪৭

অনুবাদ: যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি মদ্গতচিত্ত দ্বারা আমাকে ভজনা করেন তিনি সকল যোগী দিগের মধ্যে যুক্ততম (অতিশ্রেষ্ঠ যোগী) এই আমার অভিমত। ৬/৪৭

ব্যাখ্যা : উপসংহারে শ্রীভগবান একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেটা হল, সকল যোগীগণের মধ্যে আমার ভক্তই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যোগীগণের মধ্যে ভক্তযোগীই শ্রেষ্ঠযোগী। মনে অগাধ শ্রদ্ধা না থাকলে কেউই এই সুদুর্গম যোগপথ পার হতে পারেন না। যাঁর প্রাণের টান সবথেকে বেশী তিনিই শ্রীগুরুদেবকে "যথা দেবৌ তথা গুরৌ" জ্ঞান করেন আর তাঁর নিকটই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যোগী ভক্ত হলেই তাঁর নিকট যোগাভ্যাস সুখকর হয়। সর্ব্বাত্মক ভাবে আত্মসমর্পণ না হলে সবই বৃথা হয়ে যায়। তাই ভগবান সতর্ক করে দিলেন যে যোগভ্যাস করলেও মনে ভক্তি না থাকলে শুধু শুধু বৃথা পণ্ডশ্রম করে কোনও লাভ নেই ॥ ৬/৪৭

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ধ্যানযোগো (অভ্যাসযোগো) নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ **৪২৭**

সংবাদে ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ন হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণু প্রদীপিকা নামক গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

<u>ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ</u> :- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারবস্তু সম্পূর্ণই ব্যাবহারিক (চৎধপঃরপধষ চধৎঃ) অংশ। একবারে আসন রচনা থেকে শুরু করে আত্মস্থ হওয়া ও পরমাত্মায় যুক্ত হবার কৌশল দেখান হয়েছে। কেমন করে জ্ঞানভূমিতে নিজ বোধকে অবলম্বন করে যোগস্থ হতে হয় এবং সেই যোগ সম্যক পূর্ত্তিলাভ করলে জীব নিজ আত্মাতে ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করে যুক্ততম যোগী হতে পারে সেটাই বিশদভাবে বলা হয়েছে। সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মাই আমার আত্মা এ উপলব্ধি না হলে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হয়না। চেতন অবচেতন সর্ব্বভূতই যে আত্মশক্তি, আত্মাই ঈশ্বর, এবং পরমাত্মাই পরমেশ্বর, আত্মতত্ত্বে যুক্ত হলেই এই তত্ত্বটার আবিষ্কার হয়। এই ষষ্ঠ অধ্যায়েই সেই উপায়ের বর্ননা করা হয়েছে যে উপায়ে জীব নিজ বোধকে সর্ব্ববোধের আশ্রয়স্বরূপ জানতে পারে এবং তাঁকে ক্রমশঃ পরমেশ্বর বলে জানতে সমর্থ হয়। আত্মতত্ত্বে যোগস্থ হলেই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে। আত্মতত্ত্বে অবস্থান করার শক্তি হলেই আত্মার মহিমাসকল প্রকাশ পেতে থাকে এবং আত্মতত্ত্বে যে সকল বিজ্ঞানগুলো লুকানো আছে সে সমস্তই জানতে ও বুঝতে পারা যায়। যে কোনও বস্তুকেই জানতে গেলে তার ভিতরের সমস্ত ধর্ম্মের উপলব্ধি না হলে সে বস্তু বা বিষয়ের পুরো জ্ঞান হয়না। আত্মতত্ত্বেও সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করতে হয়, অর্থাৎ আত্মার ঈশ্বরত্ব ও পরমাত্মার পরমেশ্বরত্ব বুঝতে পারা, নিজ বোধে আনা। নিজ বোধের যা কিছু মহিমা, সমস্ত না জানা পর্য্যন্ত নিজ বোধে অধিষ্ঠিত থাকা যায় না। সকল বিষয় সম্বন্ধেই এই একই নিয়ম ॥

--**--

ওঁ

অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ (৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ –

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ।।৭/ ১

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন, হে পার্থ তুমি আমাতে নিবিষ্টচিত্ত অনন্যশরণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য্যাদি যুক্ত আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। ৭/১

ব্যাখ্যা: ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান বলেছিলেন মদ্গতচিত্তে যে আমার ভজনা করে সেই যুক্ততম এই আমার অভিমত। কারণ যুক্ততম যোগী হতে না পারলে ভগবানে ভক্তি হয় না। প্রচলিত যে সকল

ভক্তি দেখা যায় সেগুলো আদৌ কোনও ভক্তিই নয়, স্বার্থ পূরণের নিমিত্ত আকুল প্রার্থনা মাত্র। ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশুনা না করেই পরীক্ষায় পাশ করার আর্তি জানায়, পিতা মাতা পুত্রের চাকুরি অথবা অনূঢ়া কন্যার বিবাহের আর্তি জানায়, রোগী তার রোগমুক্তির জন্য ভক্তি করে এই রকম সব আর কি। যুক্ত মানে যোগস্থ হতে পারলেই আপনাকে তাঁর আশ্রিত বলে জ্ঞান করা যায়। “মদাশ্রয়” এই অবস্থাকেই বলে। মন দিয়ে ক্রিয়া করলে মন আত্মার মধ্যে ঢুকে তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। সেই আত্মমগ্ন সাধকের কাছে সমস্ত বোধাত্মক বিশ্বের মূলাশ্রয় ঐ নিজ বোধ এবং সমস্ত শক্তিপ্রকাশ যে তাঁরই প্রকাশ, সমস্ত শক্তি যে তাঁর থেকেই জাত হয়, অথচ তিনি নিত্য, অজাত, সাধকের এমনতর বিজ্ঞান উন্মেষিত হতে থাকে। আত্মাই প্রাণের প্রাণ, চোখের চোখ (দৃষ্টিশক্তি), শ্রোতার শ্রোত্র, মনের মন, সমস্ত শক্তিই আত্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয়সার তত্ত্বই আত্মপ্রত্যয় পরিস্ফুট করে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা হন। “পশ্যন চক্ষুঃ, শৃণ্বেণ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ” – তিনি দেখে চোখ হলেন, শুনে শ্রবণ হলেন, মনন করে মন হলেন। বেদে সুস্পষ্টভাবে আছে এ কথা। “নহি দ্রষ্টুদৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ” – দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয়না, সেটা অবিনাশী। তিনি যখন দেখেন না, তখন যেন দেখেও দেখেননা, এভাবেই নিজের দেখা শোনা ইত্যাদি সকল শক্তিকে নিজেতে একীভূত করে আপনাতে আপনি অনির্ব্বচনীয়ভাবে অবস্থান করেন। সুতরাং আত্মশক্তিই সেই একমাত্র শক্তি যে শক্তি প্রভাবে তিনি এমনতর অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় থেকেও আবার পরমেশ্বর সাজেন। আত্মতত্ত্বের এই নিজ বোধরূপ বৌদ্ধ আভাস অবলম্বন করলে তারপর সমস্ত শক্তি আত্মাতেই উপলব্ধ হবে। সেই ‘আত্মা’ বা ‘আমি’ র তত্ত্বে ভগবান অর্জুনকে সশক্তি বা সমগ্রভাবে পরমেশ্বরকে জানবার কথা নিজবোধ বর্ণনার পর বলতে আরম্ভ করলেন ॥ ৭/১

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ।। ২

অনুবাদ: আমি তোমায় বিজ্ঞান সহিত এই (মদ্‌বিষয়ক) জ্ঞান বিশেষরূপে বলিব; যাহা (যে জ্ঞান) অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকেনা। ৭/২

ব্যাখ্যা: মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান মানে হল আত্মতত্ত্ব জানা। সবিজ্ঞান আত্মজ্ঞান হলে আত্মাকেই সর্ব্বজ্ঞানের বা শক্তির আধার বলে উপলব্ধি হয়, তারপর আর জানবার বা পাবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনা। কোন জানাকে এমন জানা বলে ? তত্ত্বতঃ জানাকে। আত্ম ও অনাত্ম ভাবে পরিচিত যে দুই জ্ঞানমূর্তি, পরমাত্মার সেই উভয় প্রকাশকে জানলেই জীব সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ হয়। এর আগের (ষষ্ঠ) অধ্যায়ে আত্মজ্ঞানটার কথা প্রধানভাবে বলে এ অধ্যায়ে আত্মাশ্রয়ী অন্য তত্ত্বগুলোকে বলবেন। কিভাবে প্রথমে বুদ্ধি দিয়ে জানা, তারপর তত্ত্বতঃ দেখা ও তারপর তাঁতে প্রবেশ করা এবং অবশেষে তিনিই হয়ে যাওয়া, এই তিন ভাবে জানা হলেই সঠিক জানা হল। প্রথমে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে সব দেখে তারপর তত্ত্বতঃ দেখে কৃতার্থ হতে হয়, যার ভিতর এই দ্বিতীয় প্রকার দর্শনও থাকে। এটাই বলার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী শ্লোকে বললেন.. ..৭/২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ।। ৩

অনুবাদ: সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করেন; সিদ্ধির জন্য যত্নবান দের মধ্যে কেহ আমায় প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারেন। ৭/৩

ব্যাখ্যা : আলোচ্য শ্লোকের মূল কথা যে যতই ধ্যান, জ্ঞান, হঠযোগ, রাজযোগাদি ১৬৪ রকম যোগের অনুষ্ঠান কর না কেন, সকল উপায় অবলম্বন করেও এক ভক্তি বিনা সকলই নিস্ফলা। মদ্‌ভক্তি ব্যতীত মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান দূর্লভ। এ জন্যই ভগবান এই কথা বলেছেন যে অসংখ্য জীবকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষ ব্যতীত অন্য জীবের শ্রেয় লাভের প্রবৃত্তি দেখা যায়না। আবার সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে মাত্র কেউ কেউ পুণ্যবশে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। আবার এমন সব সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে প্রকৃষ্ট পুণ্যবশে কেউবা আত্মাকে জানতে পারে। আবার এমন সহস্র সহস্র আত্মজ্ঞ পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কৃপায়, আমার প্রসাদে আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে। এর কারণ কি ? কারণ একটাই। প্রথমতঃ মনুষ্যেতর জীবের আত্মজ্ঞানে অধিকার নেই। আর মানুষের কথা আর কি বলব ? বিষয় চিন্তা আর বিষয়ানুরাগ তার হৃদয়কে পূর্ণ করে রেখেছে। সেখানে আত্মচিন্তার জায়গা কোথায় ? এই বিষয়রূপ পরের দাসত্ব করতে করতে আর্ত্ত কেউ যদি কখনও, কোনও পুণ্যবশে, পরিত্রাণের জন্য কেঁদে ওঠে এবং যদি সে কান্না সত্যিই খুবই আন্তরিক হয়, তবে স্বয়ং তাঁকে অন্ত র্য্যামী, যিনি তাঁর অন্তরে থেকে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই তাঁকে আত্মলাভে কৃতসংকল্প করে দেন। তবে সহস্রকোটি মানুষের মধ্যে দৈবাৎ হয়ত এমন একজন হলেও তাঁরও কতদিন কতকাল বয়ে যায় শুধু লক্ষ্যস্থির করতে, বুদ্ধিকে সংশয়শূন্য করতে। চৎড়ভ. J.B.S Haldane এর Duty of Doubt প্রবন্ধে এই সংশয়ের ধর্ম্ম খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এরপর আসে শুধু সদ্‌গুরুর আলোকে আত্মারূপে ভগবদ্‌অস্তিত্ব আপনার অন্তরে নিঃসংশয় ভাবে অবগত হতে। এই জানাটাও বুদ্ধি অপহিত আত্মজ্ঞান মাত্র। কারণ সে জ্ঞানকে দেখা বলেনা। আরও বহু সৌভাগ্যের উদয় হলে তবেই আত্মাকে দেখা হয় বা তত্ত্বতঃ জানা হয়। সেটা হয় হৃদয়ে, হৃদয়ের দুটো ভাগ, একভাগে আমরা ভোগময় ও কর্ম্মময় হয়ে পরিচালিত হই। অপর ভাগটি গুহ্যতর (secret) যেখানে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঈশ্বরে লীন হয়ে থাকি। তত্ত্বতঃ দেখাটা সঠিক ও সুসিদ্ধ হয় হৃদয়স্থ এই উভয় অধিষ্ঠান দেখতে পারলে। তত্ত্বতঃ দেখা মানে এমন সশক্তি, সমহিম দেখা। আগের অধ্যায়েও এটাই বলা আছে

যে কোনও বিষয়কে তার সমস্ত ধর্ম্মের সাথে পূর্ণভাবে জানার নামই তত্ত্বতঃ জানা। নইলে সাধারণ আত্মজ্ঞানলব্ধ পুরুষদের জানাও শুধু জ্ঞানের আভাসমাত্র। সাধারণ জীব ভোক্তা আত্মাকে জানে কিন্তু প্রেরক আত্মাকে জানে না। প্রেরককে জানা দুর্লভ। বহু পুণ্যের ফলে জ্ঞানমূর্ত্তি গুরুর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। নিজের বোধ ও অনুভব সংযোগ দ্বারা ঈশ্বর ও ভোক্তা জীবের সম্বন্ধ নির্নয়ের পর, বোঝার পরই প্রেরক ঈশ্বরকে কিভাবে দর্শন হয় সেটাই পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ৭/৩

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।। ৪

অনুবাদ: ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি আট রূপে বিভক্ত। ৭/৪

ব্যাখ্যা: ভগবান ইতিপূর্বে (২ নং শ্লোকে) যা বলবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এখন যেন নিজ প্রকৃতিকে সামনে রেখে অপরা ও পরা অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় প্রকৃতিদ্বয়কে প্রকটিত করছেন। অপরা শক্তি ক্ষেত্রশক্তি ও পরাশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ভগবান সূক্ষ্ম তন্মাত্রার কথাই উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শ্লোকে আবার এগুলোকে ভূতসকলের যোনি বলে উল্লেখ করেছেন। বেদে আছে ইন্দ্রিয় হতে তন্মাত্রা শ্রেষ্ঠ, তন্মাত্রা থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে মহানাত্মা শ্রেষ্ঠ। এই মহানাত্মাই মহত্তত্ত্ব যা হল মহদহঙ্কারের আশ্রয়। এই আশ্রয়কেই অহঙ্কার শব্দে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণ অব্যক্ত প্রকৃতিকে অহঙ্কার শব্দের মধ্যে গ্রহণ করলেও আমরা তেমন অর্থ গ্রহণ করব না, কেন সেটা পরে বলছি। ভগবান বলছেন পঞ্চতম্মাত্র ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এগুলো অপরা প্রকৃতি। এদের অন্য নাম হল ক্ষেত্র। ভূতাত্মক বিশ্বের উপাদানই তন্মাত্রা বা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শাদি আকারীয় জ্ঞানস্পন্দন। আত্মপ্রত্যয়াত্মক জ্ঞান দুই আকারে হয়। এক আমি জানছি ও জানারূপ ক্রিয়া হচ্ছে, মানে জ্ঞাতা ও জ্ঞানক্রিয়া অর্থাৎ সেই জানার মধ্যে নিজেকে জানা ও সেই জ্ঞানক্রিয়াটিকে জানা। আর যেখানে তিনি মাত্র জ্ঞান প্রকাশকেই বিশেষ ভাবে জানেন অথচ নিজেকে যেন জেনেও জানেন না সেখানেই তাঁর নাম জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ। আগেও বহুবার বলেছি জ্ঞানশক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে পাঁচটি মাত্রায় পাঁচ রকম স্পন্দন করে এবং সেই স্পন্দনই রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের জ্ঞান আকারে প্রকাশ পায়। অনুভুতিই হল জ্ঞানক্রিয়া। একে যিনি স্বেচ্ছায় যতটা বাড়াতে পারেন তিনি ততটা অনুভব করতে, জানতে, বুঝতে, প্রকাশ করতে ও ভোগ করতে সক্ষম। এই প্রকাশ করার নাম অপরা প্রকৃতি বা ভূত হওয়া এবং প্রকাশের বৈচিত্র্যকে অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তন্ময় হয়ে জানা বা ভোগ করার নামই ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মারূপে অবস্থান করা। জ্ঞানশক্তির প্রকাশ যে কোনও ভাবে পেলেই তার অন্তরে আত্মজ্ঞানটা জ্ঞাতারূপে থাকবেই। এটাই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব। এই ক্ষেত্রজ্ঞের কথা পরের শ্লোকে আছে। ৭/৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।। ৫

অনুবাদ: হে মহাবাহো, ইহা কিন্তু অপরা (নিকৃষ্টা); ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপা (চেতনময়ী) আমার প্রকৃতি অবগত হও; যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। ৭/৫

ব্যাখ্যা: অপরা প্রকৃতির পর এবার পরা প্রকৃতির কথা। মানে আগের শ্লোকের যে অষ্টধা প্রকৃতির কথা বলা হল প্রকৃতির জড়ত্ব ও পরাধীনতাহেতু সেটা নিকৃষ্টা। এর চাইতে উৎকৃষ্ট অন্য একটা চেতনময়ী জীবরূপা আমার প্রকৃতি অবগত হও। ঐ প্রকৃতিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপা চেতনশক্তি, যিনি স্বকর্ম্ম দ্বারা এই অচেতন জগৎকে ধারণ করে আছেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা নিজবোধ সর্ব্বজ্ঞান হতেই পৃথক। এখানে পরমেশ্বরের সাথে জীবাত্মার পার্থক্য শুধু একটাই মাত্র। সেটা হল পরমেশ্বর ভূতমাত্রাময় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ আর জীবাত্মা নিজ ক্ষেত্রের ভোক্তা মাত্র, স্রষ্টা নয়। এজন্যই পরমাত্মা জীবাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে আলাদা, এজন্যই তাঁকে জীবভূতা প্রকৃতিও বলা যায়। অসঙ্গ আত্মরূপে দেখে নিজেকে ব্রহ্ম বলে অনুভব করে, ব্রহ্মত্ব ভোগের অধিকার জীব মাত্রেরই আছে। কিন্তু জীবত্বের নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ পরমাত্মার নিয়ন্ত্রণে। পরমাত্মা যেখানে পরমেশ্বর রূপে অভিব্যক্ত, সেখানে তাঁর আত্মত্ব বা শক্তিত্ব বিশিষ্টভাবে পরিস্ফুট থাকে। কিন্তু তিনি ও তাঁর মহিমা একই বলে অবিভক্তভাবে অবস্থান করে। তা দেখার কেউ থাকেনা, দেখেও না, এটাই অদ্বয় ব্রহ্মরূপ। জীবত্ব আবার এর ঠিক উল্টোটা। যেখানে শক্তি মাত্রই প্রকাশ কিন্তু আত্মতত্ত্ব জেনেও না জানার মত (অজ্ঞান) থাকে সেখানেই তার নাম জীবাত্মা। এই একই পরমাত্মা কিভাবে পরমেশ্বর, জীবাত্মা ও ভূতাত্মক বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করেন এটা তাঁরই মূল বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানের মধ্যে দুটো জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। একটা আত্মস্বরূপ বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্ব কেমন করে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন হন, আর কেমন করে জ্ঞানমাত্রা বা জ্ঞানশক্তি স্থূল ভূতের আকার গ্রহণ করেন সেটি। এই দুটো ধারণা করতে পারলে আত্মার ব্রহ্মত্ব তথা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করতে পারবে। এই দুটো গ্রন্থি ভেদ করতে পারলেই অবাধে আত্মদর্শন হবে। এজন্যই এই অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান বলেছেন এই সবিজ্ঞান জ্ঞান লাভ হলে জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তুমি নিজের আত্মার এই ভোগময় জীবত্বটির তলে তলে আর এক অসঙ্গ নিজ স্বরূপে রয়েছেন, এটা প্রত্যক্ষ করলেই বুঝবে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই ভূমা – তোমার দেহ ব্রহ্মাণ্ডের

নিয়ন্ত্রক। অসঙ্গ আত্মপ্রকাশই "নিজ" আকারীয় চৈতন্য প্রকাশ – এটা মুখে বলা যায়না – অনির্ব্বচনীয় – শুধু মগ্ন হওয়া যায় – আত্মা নিজে বলেই অভিব্যক্তি হয়, এমনই এই পরমাত্মতত্ত্ব 'অসঙ্গ' শব্দটা একটু ভালমত বোঝার আছে। মানে যেখানে চিত্তের সাথে সঙ্গ হচ্ছেনা। অর্থাৎ চিত্ত বা সর্ব্ববিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞানে লীন বা একীভূত হয়ে যাওয়াই অসঙ্গ আত্মার প্রকাশ। এই চঞ্চল শ্বাস স্থির হলেই তাঁকে বোঝা যায়। এই জড়াদি দৃশ্য প্রপঞ্চই অপরা প্রকৃতি এবং যে চৈতন্যকে অবলম্বন করে এই জড় প্রকাশ পায় সেই পরাপ্রকৃতি, সেইই সর্ব্বক্ষেত্রের অধিষ্ঠান স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যই দৃশ্য প্রপঞ্চকে ধারণ করেন। ৭/৫

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।। ৬

অনুবাদ: সমুদায় ভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। আমি প্রকৃতিসমেত জগতের উৎপত্তি ও লয় স্থান।৭/৬

ব্যাখ্যা : নিজের দুই রকম প্রকৃতির কথা বলে এখন তার দ্বারা তিনি যে সৃষ্টি আদির কারণ সেটাই বেঝাচ্ছেন। সর্ব্বভূতের মূল কারণই ভগবান। বীজস্বরূপ ভগবান নিজ শক্তিকে চালনা করে সেই শক্তিকে যোনিস্বরূপ অবলম্বন করে তার ভিতর দিয়ে তাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন। তাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয়ই যাঁর যোনি বা কারণ যেহেতু সেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূত এই প্রকৃতিদ্বয় হতেই উৎপন্ন। তার মধ্যে জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয় এবং আমার অংশভূতা চেতনা প্রকৃতি ভোক্তারূপে দেহে প্রবেশ করে স্বকর্ম্মদ্বারা দেহাদিকে ধারণ করে অবস্থান করছে। অতএব আমিই সপ্রকৃতিক জগতের উৎপত্তির পরম কারণ এবং সেরূপ আমিই আবার জগতের প্রলয়কর্ত্তা বা সংহর্ত্তা। আমার এই শক্তিমূর্ত্তির সাথে পরিচয় হলেই তোমার সবিজ্ঞান ভগবানকেই জানা হবে ও তুমি যে তাঁতেই বসবাস করছ এটাও দেখতে পাবে। যতক্ষণ আপনাকে তাঁতে অধিষ্ঠিত না দেখেবে ততক্ষণ এ বিশ্বের মূলে তাঁকে দেখতে পাবেনা। কারণ তুমি যে জ্ঞানস্বরূপ, অবিকারী, আত্মবোধরূপে নিজের ভূতাত্মক দেহের ভিতর ও জ্ঞানাত্মক সর্ব্ববোধের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছ ও জ্ঞানময় বিশ্বের ধর্ত্তা হয়ে অবস্থান করছ নিজের সেই অন্তঃসত্তাটিকে দেখ এবং এক চৈতন্যশক্তিই যে আত্ম – অনাত্ম জ্ঞান আকারে উভয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত এই শক্তিতত্ত্বটি বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম কর। যখন শক্তি স্ফূরিত হয়ে সৃষ্টির দিকে উন্মুখ হয়, তখন সেই অব্যক্ত ব্রহ্মকলা হতে নাদ সমুত্থিত হয়, এই নাদ হতে ব্রহ্মবিন্দু প্রকটিত হয়, নাদ বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করে। এটাই গর্ভাধান। সেই বিন্দুর মধ্যে তুমি, আমি ও সারা বিশ্ব লুকিয়ে থাকে এবং তা থেকেই উদ্ভূত হয়। এই বিন্দুই জগতের মাতৃস্থানীয়া ব্রহ্মযোনী এবং নাদই অক্ষরব্রহ্ম বা পুরুষশক্তি, যিনি এক হয়েও অনন্তাকারে আপনাকে প্রকাশ করেন। তাতে যে আত্মভাবের বিস্মৃতি ঘটে সেটাই জীবের বন্ধন। স্বরূপ স্মৃতি থেকেই এ বন্ধন ক্ষয় হয়। সুতরাং যা থেকে উৎপত্তি তাতেই লয়॥ ৭/৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।। ৭

অনুবাদ: হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে। ৭/৭

ব্যাখ্যা : তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ। পরমাত্মাই পরমেশ্বর। পরমাত্মাই পরাশক্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গীতার ব্যাখ্যাকারগণ এযাবৎ সকলেই পরমাত্মাকেই পরাশক্তি বলে দেখতে অনিচ্ছুক, তাই তাঁরা পরমাত্মা ও পরমেশ্বর দুই পৃথক তত্ত্ব বলে ধারণা করেন। শক্তিবিজ্ঞানকে আত্মবিজ্ঞানে যাঁরা পূর্ণমাত্রায় একীভূত করতে পারেন নাই, "মত্তঃ পরতরং নাস্তি" এই শব্দটি তাঁদের সকল যুক্তি খর্ব্ব করে। এছাড়া অবাধ আত্মদর্শনের দীপ্তিও তাঁদের চোখে ফোটেনা। সমস্ত শক্তি বিকাশের মূল পরম তত্ত্বই পরমাত্মা। শক্তিকে প্রকটিত করে তিনিই সাজেন পরমেশ্বর। তাই তিনি বলছেন সমস্ত কিছুই আমাতে অনুস্যূত। মণিমেখলার ভিতর সুতোর মত বিশ্ববোধ মেখলার ভিতর দিয়ে আমার আত্মবোধ অনুস্যূত রয়েছে, ব্রহ্মসূত্ররূপী এই আমাতেই আমিময় সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে। মণিমালার সুতোটা না থাকলে মণিগুলো খুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, আর সে মালার অস্তিত্ব থাকেনা। ব্রহ্মসূত্রের অভাবে জগতেরও অস্তিত্ব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। জীবের ক্ষেত্রেও বলি যতক্ষণ প্রাণসূত্র বর্ত্তমান ততক্ষণই তার এবং তার জগতের অস্তিত্ব। ঐটির অভাবে আর কিছুই থাকেনা, জীবদেহ শবদেহে পরিণত হয়। তাই পরমেশ্বরই যে বিশ্বমূল, সমগ্র বিশ্ব সূত্রে মণিগণের মত তাঁতেই অবস্থিত, তিনিই যে বিশ্বের অনতিক্রমণীয় মূল কারণ, পাঁচটি শ্লোকে সেই সম্মূলত্ব, সদায়নত্ব ও সৎপ্রতিষ্ঠা দেখান হয়েছে॥ ৭/৭

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ।। ৮

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, আমি জলে রসস্বরূপ, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা – স্বরূপ, আকাশে শব্দ – স্বরূপ এবং মনুষ্যসকলে পৌরুষ স্বরূপ অবস্থিত আছি॥ ৭/৮

ব্যাখ্যা: জগতের স্থিতির হেতুই যে একমাত্র পরমাত্মা সেটাই এই পাঁচটি শ্লোকে দেখান হয়েছে। তাই ভগবান কূটস্থ চৈতন্য বলছেন আমি জলে রসস্বরূপ। রস তন্মাত্ররূপ বিভুতির দ্বারা আমি জলের আশ্রয় হয়েছি। চন্দ্রে সূর্য্যে প্রকাশরূপ বিভূতিদ্বারা তাদের আশ্রয়। এভাবে সমস্ত পদার্থেরই আমি

আশ্রয়। সর্ব্ববেদ প্রণবেরই বৈখরীরূপ আর আমি সেই প্রণবরূপে সর্ব্ববেদের মূল। আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপে এবং পুরুষের মধ্যে উদ্যম রূপেও সেই আমিই আছি। অর্থাৎ যেমন যেমন প্রকৃতিতে আছি তেমন তেমন ভাবেই তার প্রকাশ হয় যেমন সৎ লোকের মধ্যে সৎ বৃত্তিরূপে এবং অসৎ লোকের মধ্যে অসৎ বৃত্তিরূপে সেই ভগবৎ সত্তারই স্ফূরণ, সর্ব্বত্রে সেই একই শক্তি, শুধু আধারের ভিন্নতা হেতু সৎ আধারে সৎরূপে ও অসৎ আধারে অসৎরূপে। যে আধার যত স্বচ্ছ তাতে প্রতিবিম্বও তত স্পষ্ট। যেমন সূর্য্য বা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে যেমন প্রকাশিত হয় মাটিতে পড়ে তেমন ভাবে প্রতিফলনের প্রকাশ দেখিনা। প্রাণ বায়ুর মধ্যেই প্রকাশ বেশি কিন্তু আরও বেশি প্রকাশ হয় শূন্যে। তাই মন শূন্যে অবস্থান করে শূন্য হয়ে গেলেই চিদাকাশে অসংখ্য সূর্য্য চন্দ্রের মনিমাণিক্যের মত অত অপূর্ব্ব প্রকাশ ঘটে। এই ব্রহ্মশক্তিরই প্রকাশ মানুষের মধ্যে হয় পুরুষকার রূপে। যে পুরুষকারকে নিজের শক্তি বলে অভিমান করে সে অজ্ঞ। আবার যে মনে করে যে, যদি আমার কর্ম্মশক্তি ও উদ্যম আমার না হয়ে ব্রহ্মসত্তারই প্রকাশ হয় তবে আমি কেন খেটে মরি ? ব্রহ্মই করুন সব, এমন মনে ভেবে কর্ম্মোদ্যম করে না, বশিষ্টদেব তাদের গর্দ্দভের সাথে তুলনা করেছেন। এটা অস্বীকার করার আছে কি যে পৌরুষরূপে তিনিই আমার মধ্যে আছেন এবং তাঁর শক্তিতেই আমি কাজ করি, এতে গর্ব্ব বা অভিমান করার কি আছে ? কোনোপনিষদ তৃতীয় খণ্ডে যক্ষ ও ইন্দ্র আদি দেবতাদের গল্পে বেশ ভালভাবে দেখান আছে। কর্ম্ম না করলে আপনি সে শক্তির পরিচয়ই বা পাবেন কিভাবে ? এজন্যই গীতায় কখনই কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হয়নি। সব কাজই করতে হবে অনাসক্তভাবে। কারণ স্থুল ভূততত্ত্বের অন্তরে সূক্ষ্মশক্তির আকারে সেই ব্রহ্মসত্তাই বিদ্যমান ॥ ৭/৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।। ৯

অনুবাদ: আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সর্ব্বভূতে জীবন এবং তপস্বীগণে তপঃস্বরূপে আছি। ৭/৯

ব্যাখ্যা: প্রতি ভূতের অন্তরে যে আগ্রহী উদ্যমী সত্তা আছে যে শক্তি তাকে সফল ও সার্থক করে থাকে সেই শক্তিকেই প্রথমে ভগবান বলে বুঝবে। সেজন্যই সর্ব্বভূতের ক্রিয়াশক্তির মূল যে চিৎ বা জ্ঞানশক্তি সেটাই জড়শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল হয় আর এই জড়শক্তির স্পন্দনই যে বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণ সেটা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে বলা হয়েছে। তাই "পুণ্যগন্ধ তন্মাত্রারূপে পৃথিবীর আশ্রয় আমি" বলার অর্থ যে ভাল গন্ধের আকার নেই অথচ প্রকৃতিতে এসে গন্ধরূপ যে প্রকাশ সেটাও তাঁরই রূপ। সূর্য্যের তেজ আকাশ থেকে এলেও সেটা প্রকৃতিস্থ হলেই তার তেজোরূপ দেখা যায়, তেমনই নিরাকার ব্রহ্মশরীর অদৃশ্য কিন্তু মণিপুরে থেকে কথাবার্তা দ্বারা প্রকাশ হয়, তেমনই জীবন অর্থাৎ মহাদেব, যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তাঁকেও কেউ দেখতে পাচ্ছেনা অথচ গুরুবাক্যের দ্বারা জানা যাচ্ছে, যাঁর অস্তিত্ব সমস্ত জীবের প্রকৃতিতে প্রকাশ পাচ্ছে, যা কেউ দেখতে পায়না অথচ সকলের মধ্যেই আছেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমার রূপ। সুতরাং আমার অহঙ্কার করার কিছু নেই। সকল জীবের জীবনমধ্যে তাঁরই প্রকাশ, শুধু গন্ধ বা প্রদীপ্ত অগ্নি কেন ? মানুষের বল, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, তপস্যা, শীতাতপ সহ্যকরা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, যোগীর প্রাণসংযম এ সমস্ত তাঁরই শক্তি, তাঁরই চিৎ শক্তির খেলামাত্র ॥ ৭/৯

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।। ১০

অনুবাদ: হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের বীজ এবং সনাতন অর্থাৎ নিত্য বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃ স্বরূপে আছি। ৭/১০

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মযোনী থেকেই সবভূতের উৎপত্তি। (৬ নং শ্লোক দেখুন) তাই ভগবানই চরাচর বিশ্বের বীজস্বরূপ। এই বীজশক্তি অতি অপূর্ব্ব, অনন্ত, অব্যয়, ক্ষরণশীল হয়েও অক্ষর। তাই ক্ষুদ্র বটবীজের ভিতর থাকে প্রকাণ্ড মহীরূহ। আবার সেই মহাপাদপের বীজে বীজে লুক্কায়িত সেই একই আকার ও সামর্থ্যযুক্ত বীজ। বীজশক্তির পৌনঃপুনিক আবর্ত্তনের শেষ নেই। এক একটি বীজ স্বতুল্য, অনন্ত বীজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে প্রত্যেকটি হয় সমান শক্তিসম্পন্ন যার প্রত্যেকটির ভিতরই থাকে অনন্তে প্রকাশিত হবার যোগ্যতা। এমনকি একটা বালুকণার ভিতর যে শক্তিটুকু লুকানো থাকে, বালুকণার আকার ভেঙ্গে সেই শক্তিটুকুকে স্বাধীন প্রবাহের সুযোগ দিলে সে শক্তিও অনন্তে বিস্তৃত হতে পারে। জড় শক্তিতে যেমন এই বিজ্ঞান পাই, জড় বীজেও যেমন অনন্ত পৌনঃপৌনিক প্রকাশ যোগ্যতা, তেমনই স্বাধীন চিন্ময়মূর্ত্তি বীজেও চিন্ময় পরমাত্মতত্ত্বরূপ স্বাধীন তত্ত্বেও এই শক্তি নিহিত আছে। এই ধর্ম্মের জন্যই তিনি বিশ্ববীজ। এরই মহিমায় তিনি অনন্ত জীবাকারে অনন্তকাল ধরে আপনাকেই প্রকাশ করেন। তিনি আত্মবোধরূপ বীজশক্তির প্রভাবে আপনাকে বহু করেন। সেই বহু আত্মার প্রতিটির মধ্যেও আবার ঐরকম পৌনঃপৌনিক বীজ প্রকাশশক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। এজন্যই তিনি বীজস্বরূপ। আপনি আপনাকে ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করে বীজরূপে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীব ও জগৎ আকার সংসারবৃক্ষের মূর্ত্তি রচনা করেন। এজন্যই পরমাত্মা পরমবীজ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের উভয়েরই বীজস্বরূপ এই পরমতত্ত্ব। চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতেরই তিনিই বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজঃ, জলে রস, সূর্য্য চন্দ্রের প্রভাস্বরূপ, প্রকৃতির অভিব্যক্তির মত বিনশ্বর নয়, অবিনশ্বর। অর্থাৎ

বীজ যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে নিজে নষ্ট হয়, ভগবদ্‌বীজ তেমন নয়। অনাদি বীজ স্বরূপ আত্মাই একমাত্র সত্য, যাঁকে আশ্রয় করে এ বিশ্বভুবন রচনা হয়েছে ॥ ৭/১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্‌।
ধর্মবিরুদ্ধো ভূতেষু কামহস্মি ভরতর্ষভ ।। ১১

অনুবাদ: হে ভরতর্ষভ, আমি বলবানদিগের কামরাগসম্পর্কশূন্য বল, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত সামর্থ্য। এবং প্রাণীগণে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম, অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম দ্বারা প্রবোধরূপ পুত্রোৎপত্তির উপোযোগী কামরূপে অবস্থিত আছি ॥৭/১১

ব্যাখ্যা: কোনও কোনও গ্রন্থে “বলবতাং চাহং” আছে। তাতে অর্থের মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয় না। যাই হোক, ভগবান এখানে অর্জুনকে “ভরতর্ষভ” বলে সম্ভাষণ করলেন। পালনার্থক ‘ভৃ’ ধাতু থেকে “ভরত” শব্দের উৎপত্তি। জীব চায় নিজেকে, ভগবানকে অথবা বিষয়কে। এই কামনা করা তার স্বভাবসিদ্ধ। তাই সকাম হয়েও অকাম, পরিপালক, পরিবর্ধক এবং পরমাত্মতত্ত্বে পুনঃ প্রবেশের একমাত্র পন্থা। তাই ভগবান জীবকে বলছেন হে জীব, হে ভরত, হে আত্মপরিপোষণশীল, আমিই এই কামস্বরূপে তোমাতে অবস্থিত। জলের যেমন মূলতত্ত্ব রস, কাম ও রাগের তেমনই মূলতত্ত্ব বল। রসতত্ত্ব বললে যেমন স্থূল জলমূর্ত্তিটি বাদ দিয়ে শুধু মূল তত্ত্বটা বুঝতে হয় তেমনই শুদ্ধ বলতত্ত্বটা বুঝতে হলে কাম ও রাগ বিবর্জিত সামর্থ্য তত্ত্বটিই বুঝতে হয়। অপ্রাপ্ত বস্তু পাওয়ার অভিলাষ হল কাম। প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি অধিক তৃষ্ণাই রাগ। এমন কামরাগশূন্য যে বল তাই হল সাত্ত্বিক বল। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বা আত্মকর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত যে সামর্থ্য তাই হল সাত্ত্বিক বল। বিষয় প্রাপ্তির জন্য যে বল, পৌরুষ শক্তির প্রকাশ করি এই বল তেমন কোনও আসুরিক শক্তি নয়। এ হল আত্মবল বা যোগবল। এই ধর্ম্মবল বা ক্রিয়া করার শক্তি সামর্থ্য যার যত হয়, সে ততই আত্মবলের সাথে বেশি করে পরিচিত হতে থাকে। এই অবস্থায় এই শক্তির অপব্যবহার, যেমন চিত্তের অপার করুণাবশতঃ অপরের দুঃখ, রোগ, শোক, তাপ ইত্যাদি মোচন, নিষিদ্ধ। ব্যুত্থিত অবস্থায় এসকল সামর্থ্যকে সিদ্ধি বলে, কিন্তু সমাধি সাধন পক্ষে এও উপসর্গ বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যোগদর্শনেও আছে – “সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ” মানে তাহারা সমাহিত চিত্তের বিঘ্নস্বরূপ, কিন্তু ব্যুত্থিত চিত্তে তাহারা সিদ্ধি। ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামই ভগবদ্‌বিভূতি। আত্মাতে মনের যে সম্পূর্ণ স্থিতি তাইই হল ধর্ম্ম, আর এই স্থিতিলাভের জন্য যে চেষ্টা বা সাধন করা বা সাধন করার যে ইচ্ছা সেটাও তো ধর্ম্মই। কিন্তু সংসারের অন্য কাজ করলে এই স্থিতি নষ্ট হয়। বেশি লোকজনের সাথে মেলামেশা করলে, তাদের সমস্যা শুনলে অথবা সেসব চিন্তা করলেও সেই স্থিতাবস্থা আর থাকে না। কিন্তু মন দিয়ে ক্রিয়া করলে এই স্থিতি নষ্ট হয়না বরং আত্মকর্ম্ম দ্বারা মন আরও স্থির হয়। বিক্ষেপশূন্য মনেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। শুদ্ধজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা কাম হলেও সেটা ভগবদ্‌বিভূতি। তাই ভগবান বলেছেন তোমার যে ধৃতিশক্তি আমিই সেই কামস্বরূপে তোমাতে অবস্থিত। আর এই কামময়ত্বই তোমাকে একদিন উপনীত করবে ব্রহ্মত্বে। কিন্তু যে কামনায় আত্মিক পরিপালন ও পরিপোষণ হয়না, আমাদের মুগ্ধ, মূঢ় করে ও অজ্ঞানতা রচনা করে সেটাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামনা ॥৭/১১

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ।। ১২

অনুবাদ: যে সকল স্বাত্ত্বিকভাব (শম দমাদি), রাজসিকভাব (হর্ষদর্পাদি) এবং তামসিকভাব (শোকমোহাদি) সে সকল আমা হইতেই উৎপন্ন জানিও। আমি সে সকলে নাই, কিন্তু সে সকল আমাতে আছে ॥ ৭/১২

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকগুলোতে কতকগুলো অধিভূত ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে নিজের অধিষ্ঠানের কথা বলে এখন এই শ্লোকে সকল ক্ষেত্রমধ্যস্থ শক্তিবিলাসে নিজের অধিষ্ঠানের কথা বলছেন। শমদমাদি সাত্ত্বিকভাব হর্ষদর্পাদি রাজসিকভাব এবং শোকমোহাদি তামসিকভাব এসবই গুণত্রয় হতে উৎপন্ন এবং সেই গুণত্রয় ভগবানেরই প্রকৃতি হতে জাত। যখন এসমস্তই ভগবান হতে উৎপন্ন তখন তিনি এসকল কর্ম্মে জড়িত নন এমনটা বলেন কি করে ? বলেন এজন্যই যে, জীব যেমন গুণের বশীভূত ভগবান কিন্তু তেমনভাবে কোনও গুণেরই অধীন নন। সমস্ত শক্তিবিলাসের আধার তিনিই কিন্তু তবুও তিনি সেই শক্তিবিলাসের অধীন নন বরং সমস্ত শক্তিবিলাসই তাঁর অধীন। জগৎ তাঁর আশ্রয়ে অবস্থিত হলেও তিনি জগদাশ্রিত নন। কিভাবে ? দেখুন। কূটস্থ চৈতন্যরূপে পরমাত্মা দেহের মধ্যে বিরাজ করছেন। তিনি না থাকলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন কারও কোনও স্পন্দন থাকত না অথচ তাঁর অস্তিত্ব দেহের মধ্যে এতই সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল যে দেহ ও ইন্দ্রিয় কোনও ভাবেই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির কাজের প্রকাশক হলেও এদের কোনও কাজ তাঁকে বিকৃত করতে পারেনা। কিন্তু সমস্যা হল যে তাঁর মুখ্য প্রকৃতিই হল প্রাণের স্পন্দন। আর প্রাণ স্পন্দিত হলেই তিনি নিজের জায়গা থেকে সরে যান এবং মনরূপে উপর থেকে নিচে নেমে পড়েন। আর তখন যেমন যেমন নামতে থাকেন তেমন তেমন গুণসকল উৎপন্ন হয়ে সেই সেই গুণ অনুযায়ী সদ্‌সদ্‌ চিন্তা ভাবনা, মানসিক অবস্থা ও কাজকর্ম্ম ইত্যাদি হয়ে থাকে। উল্টোটাও হতে পারে। বিপরীত মুখে মনের গতি হলে মানসিক অবস্থারও উর্দ্ধগতি হয়, নীচে থেকে উচ্চস্তরে যেতে থাকে। এইভাবেই মন নাভির নীচে থাকলে তামসিক ভাব, নাভির উপরে কিন্তু কণ্ঠের নীচে থাকলে রাজসিক

ও কণ্ঠের উপরে থাকলে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হয়। এইভাবে চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা মনকে আজ্ঞাচক্রে রাখতে পারলে সত্ত্বগুণ বেশ বাড়তে বাড়তে শেষে একেবারে গুণাতীত হওয়া যায়। এমনটি হলেই আর মন বলে কিছু থাকেনা। তাই কোনও গুণই সেখানে পৌছাতে পারেনা। এজন্যই কূটস্থ চৈতন্য গুণাতীত ও নির্ব্বিকার। দিনের আলোয় ঘরের ভিতরের জিনিষপত্র সবকিছু দেখা গেলেও সেই আলোর সাথে জিনিষপত্রের যেমন কোনও সম্বন্ধ নেই তেমনই পরমাত্মা কূটস্থরূপে সর্ব্বজীবের মধ্যে থাকলেও সেই জীব কূটস্থে স্থিত না হলে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানতে পারেনা। তাই জগৎ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি অচ্যুত ভাবেই থাকেন কিন্তু শক্তিক্রিয়া রুদ্ধ হলেই জীব নিজেকে হারিয়ে ফেলে। যেমন ঘুম (নিদ্রা)। সকল ক্রিয়া রুদ্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ি তখন আছি কি নেই এ জ্ঞানটা পর্য্যন্ত থাকেনা। ভগবতত্ত্বটা কিন্তু ঠিক এর উল্টো। তিনি সুপ্তিরও সাক্ষী অবার প্রলয়েরও দ্রষ্টা; সর্ব্বদা সর্ব্বভাববিলাসের কর্ত্তা অথচ তৎবহির্ভূত। ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, মনরূপ হয়েও অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধিস্থ হয়েও বুদ্ধির অতীত। এ পর্য্যন্ত আলোচনা হলেও যাঁরা কোনও রকম যোগাভ্যাসাদি করেন না তাঁদের মনে খুবই স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রশ্ন উঠবেই সেটা হল এমনই যদি হন জগদীশ্বর তবে লোকে তাঁকে জানেনা কেন ? এরই উত্তর ভগবান দিচ্ছেন পরের শ্লোকে ॥ ৭/১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ।। ১৩

অনুবাদ: এই ত্রিবিধ গুণময় (সাত্ত্বিকাদি) ভাবসকল কর্ত্তৃক মোহিত এই সমুদায় জগৎ এই সকল ভাবের অতীত এবং নির্ব্বিকার আমায় স্বরূপতঃ জানিতে পারেনা ॥৭/১৩

ব্যাখ্যা: সাধারণ মানুষ নামের জীবেরই একটুতে কত খ্যাতি তবে পূর্ব্বশ্লোকে কথিত এমন যে শক্তিবিলাসের আধার তাঁকে মানুষ জানতে পারে না কেন ? তার উত্তরে ভগবান বলছেন যে আমরা সাধারণ জীব আমরা জানতে পারি না তাঁর এই ত্রিবিধ শক্তিবিলাসে মুগ্ধ আছি বলে। আরও জানিনা তিনি এই শক্তিবিলাসের বাইরে নিরীহ, নিস্পৃহ ভাবে থাকেন বলে। এই দুটো কারণে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তাঁকে ধরতে বা জানতে, বুঝতে পারি না। তাঁর এই ত্রিবিধ শক্তিক্রিয়ায় মুগ্ধ আমরা শক্তিতরঙ্গ ভেদ করে তার মূলে দৃষ্টি দিতে পারি না। আর তিনি আছেন শক্তিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েও পরমস্বরূপে, এই ত্রিশক্তি মণ্ডলের আবর্ত্তনের বাইরে। তাই ভগবান বলছেন আমি যে অব্যয়, অবিনাশী, সকলের পর তা কেউ জানেনা। মানে হল অহং পদবাচ্য যে আত্মা তিনি ত্রিগুণাতীত, তাই এই তিন গুণের আসক্তিতে মত্ত জগতে চলায়মান সকলেই মোহিত হয়ে রয়েছে এমন মায়ামুগ্ধ জীব আত্মার স্বরূপ বুঝতে পারে না। গুণদ্বারা মোহিত জীব শুধু মাত্র বাহ্য পদার্থগুলোই দেখতে পায় ও তাতে আসক্ত হয়। অথচ সকল পদার্থের আশ্রয় সেই আত্মার দিকে ভুলেও লক্ষ্য করে না। আত্মাকে ছেড়ে প্রকৃতিতে থাকায় এই রূপময় জগৎ প্রকাশিত হয়। মোহমুগ্ধ জীব তাই তাঁর গুণাতীত, অব্যয় ভাবকে ধারণাই করতে পারে না। মহামায়ায় জড়িত হয়ে এই নিত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্যই করতে পারে না। এমন ব্যাখ্যায় বর্ণনার পর স্বাভাবিক ভাবেই পাঠক প্রশ্ন করবেন বেশ, সবই বুঝলাম, তবে কারা তোমায় জানতে পারে ? এর উত্তরও ভগবান পরের শ্লোকেই দিচ্ছেন ॥ ৭/১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।। ১৪

অনুবাদ: এই সত্ত্বাদি গুণ বিকারময়ী অলৌকিক আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁরা (কর্ম্মযোগ দ্বারা) আমাকেই পান তাঁরা এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন ॥ ৭/১৪

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে এই প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল যে সমগ্র বিশ্ব কেন এই গুণময় শক্তিবিলাসে মুগ্ধ এবং কে বা কারা এই মুগ্ধতা থেকে অব্যহতি পায় ? সেটাই শ্রীভগবান এই শ্লোকে বলছেন। ত্রিধা শক্তি আকারে এই যে আমার গুণময়ী দৈবী মায়া এ দুরতিক্রম্যা। পরম অব্যয়স্বরূপ ভগবান দৈবীরূপে প্রকটিতা, এই জন্যই অনির্ব্বচনীয়া ও দুরতিক্রম্যা। নির্গুণ হয়েও গুণময়, অগ্রাহ্য হয়েও সর্ব্বপ্রকাশ সম্পন্ন। দুই বিপরীত ভাব পরিগ্রহণ করে আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, তাঁর সেই প্রকাশশক্তির মহিমা যে দুরতিক্রম্যা, দুর্জ্ঞেয় এতে আর বিচিত্র কি ? এটা ভগবানের পরাবিদ্যারূপ। একই শক্তি আত্মজ্ঞের নিকট পরাবিদ্যা ভগবতীরূপে এবং অনাত্মজ্ঞের নিকট অবিদ্যারূপে প্রতিভাত। আত্মজ্ঞান না হলে এ শক্তিটি অবিদ্যার আকারে এবং আত্মোপলব্ধির সাথে সাথে বিদ্যা আকারে উপলব্ধ হন। সুতরাং পরম অব্যয় আত্মতত্ত্বটা চিত্তের মূল স্বরূপে অবস্থিত এটুকু দেখলেই পরমেশ্বর দর্শন করা হয়। এভাবে মন দিয়ে বিচার করে আত্মক্রিয়া দ্বারা তাঁর শরণাগত হতে পারলে মায়ার এই অবিদ্যাবিলাস অতিক্রম করা যায়। মন দিয়ে যোগাভ্যাস করলে সঙ্গে সঙ্গেই একথা সকলেই বুঝতে পারবেন। শরণাগত হওয়ার অর্থ কখনই এমনটা নয় যে নিজে কোনও চেষ্টা, পরিশ্রম না করে তাঁর উপর ভার দিয়ে বসে থাকা। এটা আলস্যজনিত ধান্দাবাজি ও চিত্তের মূঢ়তা মাত্র। বিচারবিহীন মন হলেই মানুষ এমনটা করে থাকে। পুরুষ একমাত্র আত্মা। সাধনাও মানুষ এই আত্মশক্তির দ্বারাই করে। আর চঞ্চল প্রাণই হল এই মহামায়া যিনি বলপূর্ব্বক জীবকে মোহযুক্ত করে রাখেন। চণ্ডীতে আছে "বলদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।" তাই "শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্ব্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতে।" যে নিজের দীনতা বুঝে আর্ত্তভাবে তাঁর শরণাগত হয়, তাকে পরিত্রাণ করাই তাঁর স্বভাব। এটা জেনে বরং একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আত্মায় যে থাকে, মায়ার স্বরূপ যে দেখতে

পায়, সে আর মায়ায় মুগ্ধ হয়না। যে যোগাভ্যাস করে না, সে আত্মায় থাকে না। ক্রিয়াদ্বারা স্থিরতা পেলেই এই মায়াকে অতিক্রম করা যায়। সেজন্যই বলি আর কোনও দিকে তাকিওনা, কেবল মাত্র গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে শ্রদ্ধার সাথে যোগক্রিয়া করে যাও তাহলেই বার বার জন্ম মরণের ক্লেশ ঘুচে যাবে। ভেবে দেখ কি ভাবে প্রাণ চঞ্চল হয়ে শত বন্ধনে মনকে জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছে। ক্রিয়া দ্বারা মনের এই বাঁধনগুলো সব খুলে ফেলতে হবে, তবেই ত্রিতাপের সব জ্বালা শান্ত হবে। কূটস্থে স্থিতি হলেই দৈবীগুণসকল অশ্রয় করে ॥ ৭/১৪

ন মাং দুস্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ।। ১৫

অনুবাদ: পাপশীল বিবেকহীন নরাধমগণ মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে পায়না। ৭/১৫

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যানুযায়ী আর্তভাবে তাঁর শরণাগত হতে পারলেই এই অবিদ্যারূপ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাহলে প্রশ্ন একটা থেকেই যায় যে যদি তাই হয় তবে তো সকলেই তাঁর ভজনা করে এই অবিদ্যার কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। কিন্তু সকলেই তা করে না কেন ? এরই উত্তরে ভগবান বলেছেন কে আমার ভজনা করে না এবং কেই বা করে ? প্রথমে বলছেন কার অদৃষ্টে আমার ভজনা হয় না। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখিয়েছেন যে কাদের ভাগ্যে আমার ভজনা করার সৌভাগ্যের উদয় হয়। প্রথমে শুনুন যাদের ভজনাধিকার আসেনি তাদের কথা। নরের মধ্যে যারা একেবারেই অধম একমাত্র তারাই আমাকে(পরমাত্মাকে) ভজনা করেনা। এই অধমত্বের হেতু কি ? হেতুটা হল– অ = মনিবন্ধ - কূটস্থ, অধঃ = নীচে মানে কূটস্থের নীচে থাকে, উপরে দৃষ্টি যায় না, তাই অধম। অন্যদিকে আসক্তি সহ দৃষ্টি দেওয়ায় আত্মায় দৃষ্টি ছেড়ে যায়। দেবতা বা সুরের কাজ হল সর্ব্বদা আত্মায় দৃষ্টি রাখা। অ = মানে এর উল্টোটা। তাই তারা অসুরের কাজে নিযুক্ত থাকে। তারা দুস্কৃত, মানে সুকৃত অর্থাৎ যাঁরা আত্মস্থ থাকেন তাঁদের বিপরীত, এমন দুস্কৃত বা পাপিষ্ঠগণ চার রকম হয়ে থাকেন।

(১) মূর্খ = পশুর মত বুদ্ধি যাদের, যারা সাধনার ধার দিয়েও যায় না।

(২) নরাধম = এর অর্থ আগেই বলেছি। এরা চুড়ান্ত ভাবে বিষয়াসক্ত তাই সাধন পেলেও সাধন করে উঠতে পারেন না।

(৩) মায়াপহৃতজ্ঞান = যারা সন্তসদ্গুরুর কাছে আত্মজ্ঞানের কথা শুনলেও সেসমস্তর মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়। কখনও বা মনে একটু ভাল লাগলেও ধৈর্য্য থাকে না। যেমন যদি ছেলের অসুখ বা অন্য কোনও বিপদসংবাদ পায় আর ধৈর্য্য থাকে না। আবার যদি সাধনে বসেও, তখন মনে মনে বৈষয়িক লাভের সন্ধান করে। এদের জ্ঞান থেকেও নেই। বৈষয়িক লাভের পিছনেই শুধু দৌড়ায়। তাই সাধন পেলেও সাধন করতে পারেনা।

(৪) আসুর প্রকৃতি = একান্তই বস্তুবাদী বা ভোগবাদী; যারা সব বুঝলেও তা স্বীকার করে না, এজন্য মিথ্যাও বলে। এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত ডিগ্রী থাকলেও সে সমস্তই মূল্যহীন। কারণ জীবনের ওপর সে জ্ঞানের আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনা। কারও কারও বা রাবণের মত পূজার আড়ম্বর যথেষ্ট থাকলেও যত রকম দুষ্কর্ম আছে তাই শুধু করে বেড়ায়। বড় বড় প্যান্ডেল করে মূর্ত্তি পূজোয় এদের জুড়ি নেই ॥ ৭/১৫

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ।। ১৬

অনুবাদ: হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্ত্ত (রোগাদিতে অভিভূত), আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী এবং আত্মজ্ঞানী এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন ॥ ৭/১৬

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভজনহীনদের কথা বলা হল, এই শ্লোকে ভজনশীলদের বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে। কারা আমার ভজনা করে ? সুকৃতিপুরুষগণই আমার ভজনা করেন। সুকৃতিরাও আবার চারভাগে বিভক্ত।

(১) আর্ত্ত - আর্ত্ত কে ? রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ব্যক্তিকে আর্ত্ত বলি ঠিকই কিন্তু এ সমস্তর কবল থেকে ত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া কি সুকৃতি পুরুষের লক্ষণ ? রোগ হলে ডাক্তারের সাহায্য নিলেই তো হয়। প্রথমে ডাক্তারের কাছেই তো যায় কিন্তু রোগ যত জটিল হয় ঈশ্বর ভক্তিও ততই বাড়ে আর দেবদেবীর মন্দিরে ধর্ণা দেয়। অনেকে সাধুর কাছে সাধন শেখে রোগমুক্তির আশায়। কেউবা দস্যু হস্তে পড়ে বা অন্য বিপদে পড়ে ভগবানকে ডাকে। এরা কেউই ঠিক সুকৃতি নয় বটে তবুও এক ধরণের সকাম ভক্তি এদের একটুমাত্র হলেও থাকে কিন্তু এরাও ভজনহীনদের মতই ভগবৎ বিমূঢ়। প্রকৃত আর্ত্ত তাঁরাই যাঁদের সংসারের সকল সুখ দুঃখের মধ্যে থেকেও পরমাত্মলাভের জন্য অন্তরের ভিতর সর্ব্বদাই একটা ব্যাকুলতা ও আর্ত্তনাদ জেগে থাকেই; তাঁরাই বিপদে পড়লে যাঁর

শরণ নেন তিনি অলক্ষিতে তাঁদের ত্রাণও করেন। মহাভারতে দ্রৌপদী সভামধ্যে বিবসনা হবার ভয়ে যেমন প্রাণ ভরে ডেকেছিলেন ও তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এটা আর্ত্ত ভক্তির সুন্দর দৃষ্টান্ত ॥

(২) জিজ্ঞাসু - যাঁরা আত্মানুসন্ধানের জন্য শাস্ত্রাদি পড়েন, সাধুসঙ্গ করেন তাঁরাই জিজ্ঞাসু। এতবড় বিরাট বিশ্বজগৎ ও জীবের জন্ম-মরণ এসব দেখেও জিজ্ঞাসু না হওয়াটাই তো আশ্চর্য্যের। কিন্তু হায়! পূর্বশ্লোকে কথিত ভজনহীনদের এমন জিজ্ঞাসাও মনে জাগে না, জড়বাদের এমনই দুষ্প্রভাব। এটাই নরক্ষেত্রের দ্বিতীয় স্তরের দুষ্কৃতি ও সুকৃতিতে পার্থক্য।

(৩) অর্থার্থী - অর্থার্থী দুই রকম – এক, যাঁরা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য ঈশ্বর ভজনা করেন। এঁরা দৃঢ় বিশ্বাস থেকে শাস্ত্র নির্দিষ্ট ব্রত নিয়মাদি পালন করে থাকেন। ভগবানের নিকট এমনতর দেনাপাওনা ছাড়া আর কিছু চিন্তা এদের আসেনা। তবে ব্রত নিয়মাদি পালন করতে করতে অনেক অনেক জন্মের পর ভাবের ও চৈতন্যের একটা গভীরতা আসার সম্ভাবনা থাকে। দুই, জিজ্ঞাসা ও প্রচেষ্টার ফলে বহু প্রকারের জ্ঞান অন্তরে সঞ্চিত হওয়ায় তার প্রকৃত মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যিনি যত্ন ও চেষ্টা চালিয়ে যান তিনিও প্রকৃত অর্থের জন্য অর্থী। এমন সুকৃতি পুরুষের হৃদয়ে ভগবৎ কৃপায় প্রাতিভ জ্ঞান প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং স্বতঃসিদ্ধ আলোর মত তত্ত্বধারা প্রবাহিত হয় ও ভগবৎসান্নিধ্য উপলব্ধি হতে থাকে। তখনই তার চতুর্থ স্তরে উন্নীত হবার যোগ্যতা হয়।

(৪) জ্ঞানী - চতুর্থস্তরীয় সুকৃতি পুরুষকে ভগবান জ্ঞানী বলেছেন। জ্ঞানী কে ? পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে তিনিই জ্ঞানী। আগে যে তিন রকম ভজনশীলের কথা বলা হল তারা সকলেই সকাম। কেবলমাত্র জ্ঞানী ভক্তই নিষ্কাম। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হলে সেই পুরুষের কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত না হয়ে থাকতে পারেনা। মেধার উৎকর্ষতায় জ্ঞানভূমি যতই সম্পন্ন হোক না কেন দুষ্কৃতিপুরুষের হৃদয়গ্রন্থিভেদী পরমার্থজ্ঞানে অধিকার হয়না। কিন্তু সুকৃতিপুরুষ প্রাতিভ বিজ্ঞানলাভে কৃতকৃতার্থ হয়ে পরমতত্ত্বে স্থিত হন। নারদ, বশিষ্ঠ, শুকদেব, সনকাদি জ্ঞানীগণ ও প্রহ্লাদ, উদ্ধব ইত্যাদি ভক্ত সাধকগণ সকলেই জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন ॥ ৭/১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।। ১৭

অনুবাদ: তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয় ॥ ৭/১৭

ব্যাখ্যা: পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় শেষ অনুচ্ছেদে চতুর্ব্বিধ ভজনকারীদের মধ্যে জ্ঞানীর বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা থেকেই যা স্পষ্ট হয় সে কথাই ভগবান এই শ্লোকে বলেছেন যে ঐ চতুর্ব্বিধ ভজনাকারীদের মধ্যে জ্ঞানীই নিত্যযুক্ত, একভক্তিবিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর একান্ত প্রিয়, আর জ্ঞানীও আমার একান্ত প্রিয়। এর কারণ হল :

(১) জ্ঞানী সদা মন্নিষ্ঠ – অর্থাৎ সকলকে ভুলে একমাত্র আত্মাকেই আশ্রয় করেন এজন্য তিনি আত্মাতেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

(২) একমাত্র আমাতেই তাঁর ভক্তি – যতক্ষণ‘তুমি’ ‘আমি’ থাকবে ততক্ষণ একভক্তি হওয়া যায়না। কিন্তু আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হলে আর অমিত্বের বোধ থাকেনা।

(৩) এই হেতু আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় – নিরভিমান জগৎভোলা আত্মময় জ্ঞানীর আত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকেনা।

(৪) তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানীতো আমার প্রিয় হবেনই কারণ তিনি আত্মার সাথে একই হয়ে যান। আত্মাই আত্মার প্রিয়।

যিনি আত্মাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর আমিত্বের বোধও থাকেনা। আত্মা ব্যতীত আর সবই পরমাত্মা থেকে দূরে। আত্মবিদ্ পুরুষ আত্মাই হয়ে যান। তাই আত্মজ্ঞানীরা পরমাত্মার এত প্রিয়। ৭/১৭

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ।। ১৮

অনুবাদ: ইহাঁদের সকলেই মহান; কিন্তু জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ এই আমার মত। যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বোত্তমা গতি আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন ॥৭/১৮

ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে যে চতুর্ব্বিধ ভজনশীল সুকৃতি পুরুষের কথা বলা হয়েছে তাঁরা সকলেই উদার, মৎ অভিমুখী গতি সম্পন্ন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ বলে নিজেকে বোধ করে, সেই হিসাবে সেও আমিই, কারণ সে আমাকে আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু বলে ভাবে না। এভাবেই সে আত্মদ্বারা বা স্বীয়বোধের দ্বারা আমাতে যুক্ত থাকায় আমাকে পেয়েছে বলে উপলব্ধি করে। “অয়মাত্মা ব্রহ্ম ” বলে যে উপলব্ধি তাই আমাকে পাওয়া। তাই আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী এদের এ অবস্থায় মৎ অভিমুখী গতি থাকলেও জ্ঞানীর মত তাদের এমন প্রাপ্তিবোধটা কিন্তু মোটেই নেই। এই প্রাপ্তিবোধটাই হল জ্ঞানীর বিশেষত্ব এবং এই প্রাপ্তিবোধের ফলেই সে চিরদিনের জন্য

আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, মানে সর্ব্বোত্তম গতিকেই আশ্রয় করে। তিনি ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে অণু হ'য়ে যান, তাই দেহাভিমান আর থাকে না। বিষয়ান্তরে চিত্ত না থাকলেই আত্মার সাথে স্বাভাবিকভাবেই বেশ ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকে। তখন আত্মা ব্যতীত আর কোনও কিছুতেই চিত্ত লেগে থাকে না। একমাত্র সেই পরমাস্থিতি ছাড়া আর কোনও বৈষয়িক ব্যাপার মনে স্থান পায় না। এমন জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই হলেন জ্ঞানীভক্ত যাঁরা পরমাত্মা সারূপ্য উপলব্ধি করে আত্মযুক্ত পুরুষ হন। ঝরনার জল গঙ্গায় মিশে যেমন গঙ্গাজলই হয়ে যায় তেমনই যিনি যোগেরদ্বারা আত্মায় মিশে যান তিনিও আত্মস্বরূপ বলে গণ্য হন। এজন্যই বলা হয়েছে “ জ্ঞানী আত্মারই স্বরূপ”। ৭/১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।। ১৯

অনুবাদ: বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ “এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেব” এই জ্ঞানে আমাকে প্রাপ্ত হন। তেমন মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। ৭/১৯

ব্যাখ্য : পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ তিনি আত্মারই স্বরূপ। এখন এই শ্লোকে বলছেন যে এমন জ্ঞানী অত্যন্ত দুর্লভ। কারণ ভূতপদলেহী জীব বহুজন্মের ঘাত প্রতিঘাতে আবর্ত্তিত হতে হতে তবেই এই জ্ঞান লাভ করে। এক জন্মে কখনই নয়। কোন পদার্থকে তার মূল উপাদানে পরিণত করতে হলে যেমন দহন, বিদ্রাবন, চূর্ণন, বিচূর্ণন আদি নানাবিধ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তবেই তাকে তার মৌলিক ভাবে পরিণত করা যায়, তেমনই বহু জন্মের বহুরকম অনুভূতির ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর দিয়ে শুদ্ধিকরণ হতে হতে তবেই আপনাকে ও জগৎকে জ্ঞানস্বরূপে দর্শন করার মত বোধশক্তি পাওয়া যায়। সাংখ্যযোগের ব্যাখ্যায় বিস্তৃত ভাবে আলেচনা করা হয়েছে কিভাবে ভূতমাত্রাময় বাহ্য জগতের উপাদান স্বরূপে এর অন্তরে জ্ঞানমাত্রা হয় এবং সেই জ্ঞানমাত্রাময় অন্ত র্বিশ্বের মূল দেশে তার উপাদান স্বরূপে থাকেন পরমাত্মা। এমন পরমাত্মাই সর্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকাশিত, এই জ্ঞানারূঢ় হয়ে থাকাটা বহু জন্ম-মরণ ভোগময় তপস্যারই ফল। অনেক জন্ম তপস্যা করে সাধক জ্ঞানলাভ করেন। আবার বহু জন্ম এমন জ্ঞানলাভ করতে করতে শেষ জন্মে হয়ত বা প্রকৃত জ্ঞানী হন। তখন “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” বেদের এই কথা উপলব্ধিতে আসে। এই উপলব্ধিই আসলে “বাসুদেবঃ সর্ব্বম্” এর অনুভব। জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তবেই “সমস্তই বাসুদেব ” এই জ্ঞান ও বোধ আসে। এই আত্মত্ব দেখার জন্যই ষষ্ঠ অধ্যায়ে অসঙ্গ আত্মদর্শনের অভ্যাসের কথা বলা আছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য। তিনি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, তাই থেকে জগতের অস্তিত্ব। যত রূপ সব রূপের রূপই হলেন কূটস্থ যার পিছনে থাকলে ত্রিভূবন দেখা যায়;

প্রথমে জ্যোতিঃচক্র, পরে কৃষ্ণচক্র, আরও পরে নক্ষত্রচক্র। এই তিন চক্রে থাকলে সুন্দররূপে ব্রহ্মে থাকা যায়। পরে কোটি সূর্য্যের উদয় হয়। তখন সবই ব্রহ্মময়– “বাসুদেবঃ সর্ব্বম্”। এমন সর্ব্বাত্মভাবে ব্রহ্ম দর্শন যাঁর হয় তিনিই মহাত্মা। আর এমন মহাত্মা সত্যিই জগতে দুর্ল্লভ, কারণ তিনি তো আর নিজেকে চট করে প্রকাশ করেন না; নিজের ভাবে ও আনন্দে নিজেই আত্মস্থ হয়ে থাকেন। আত্মাতে ব্রহ্মবিলাস উপলব্ধি না হলে “ভগবান” শব্দের আসল অর্থই বোঝা যায়না। “বাসুদেবই সমস্ত কিছু” এমন উপলব্ধি তো অনেক দূরের কথা। সুতরাং “বাসুদেবঃ সর্ব্বম্” এমন জ্ঞানে আরূঢ় হওয়া যে কত দুর্ল্লভ এটা বোঝা গেল। ৭/১৯

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।। ২০

অনুবাদ: সেই সেই (নিজ নিজ) কামনায় হৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা সেই সেই দেবতার আরাধনে (বিষয় ভিত্তিক কাল্পনিক দেবদেবীগণ) সেই সেই নিয়ম (উপবাসাদি যেসব নিয়ম) অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রকৃতিতে নিয়মিত হইয়া (আমাকে ছাড়িয়া) অন্য দেবতাসকল ভজনা করিয়া থাকে। ৭/২০

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলা হল যে “সমস্ত জগৎই বাসুদেবময়” এমন অনুভবের মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। তবে সুলভ কারা ? সে কথাই ভগবান এই শ্লোকে বলেছেন। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র সুলভ এঁরাই যাঁরা হলেন শুধুমাত্র কামনার দাস। একমাত্র কামনা বাসনার দাসত্ব করার জন্যই এঁরা পৃথিবীতে এসেছেন। সেজন্যই এঁরা বিষয়কামী হয়ে কাম প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করে নিয়েছেন। তাঁদের পূজোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধি বিধানও রচনা করে নিয়েছেন এবং উপবাসাদি ব্রত নিয়মও এসবের অন্তর্গত, যে সকল অনুষ্ঠান কালের আবর্ত্তনে গৃহস্থের গৃহ জীবন থেকে ক্রমশঃ বৃহত্তর জনজীবনে এসে জায়গা করে নিয়েছে। যার পরিণতি অবৈধ অর্থাগমের নব নব উপায় উদ্ভাবন, সামাজিক উশৃঙ্খলতা, সংগঠিত অপরাধ ইত্যাদির জ্যামিতিক হারে বিবৃদ্ধি। কালের প্রভাবে ধর্ম্ম এখন আর অধ্যাত্মবিষয় নয় বরং ব্যবসা ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তাই ভগবান বলছেন যারা অত্যন্ত রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির তারাই কামাভিভূত হয়ে কাল্পনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতা সকলের পূজা, উপবাসাদি করে ও যাতে প্রাণের ক্ষয় হয় এমন সমস্ত পাপ কর্ম্ম করে থাকে। অথচ আত্মাই সর্ব্বকামদ এবং পরমেশ্বর। পরমাত্মাই যে কামকল্পতরু এই জ্ঞানটুকুও তাদের এখনও হয়নি। যারা এখনও পরমেশ্বর তত্ত্ববিজ্ঞানে প্রবেশের অধিকার লাভ করেনি, জগতে নানা আকারে যা কিছু দেখা যায় সব কিছুকেই এক পরমেশ্বরের অঙ্গীভূত করার শিক্ষা পায়নি, তারাই কামনার দ্বারা অপহৃত বিবেক হয়ে ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা ও অপদেবতার ভজনা

করে ও সেই সেই নিয়মে চলে। কখনও বা উপবাস করে, কখনও বা অরন্ধনাদি বিবিধ ব্রত পার্ব্বণের নামে বাসি, পচা, তামসিক আহার করে, কখনও বা মদ খায়, মাংসভক্ষণাদিও করে, পূজার নামে পশু বলি দিয়ে তার মাংসও ভোজন করে থাকে, এবং সেই সেই ভাবে ভাবিত হয়ে জীবনের সমস্ত শক্তিকে পরিচালিত করে। কারণ সকল দেবের দেব যে পরমপুরুষ, যিনি সর্ব্বব্রহ্মময় রূপে জগৎব্যাপী আছেন, সেই আত্মাকে ভুলে আছে। প্রাণকর্ম্মরূপ প্রকৃত উপাসনা তাঁরা করেন না। প্রাণের উপাসনা তাঁদের নেই। তাঁরা আমাকে (প্রাণকে)ছেড়ে বিভিন্ন প্রকার কামভাবেরই উপাসনা করে থাকে ॥ ৭/২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ।। ২১

অনুবাদ: যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি। ৭/২১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে যে পূজার কথা বলা হল তার সবকটিই সকাম। পূজা কখনও বারোয়ারী হতে পারে না, এমনকি পারিবারিক পূজোও কখনই পূজা নয়। পূজা সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত ব্যাপার। একজনের উপাসনার অংশীদার কদাচ অপরে হতে পারে না। সকাম উপাসনাও যদি নিয়ম নিষ্ঠামত ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সে ক্ষেত্রে সেই পূজা পরোক্ষে সেই পরাশক্তিরই পূজা হয়। তেমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের উপরই উপাসনা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সেই দেবমূর্ত্তিও পরমাত্মারই পরোক্ষমূর্ত্তি বিবেচিত হয়, যদি অবশ্যই সে উপাসনা শুদ্ধাভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ অর্পিত হয়ে থাকে। শ্রদ্ধাসহ দেবার্চনা করতে থাকলে কালে কালে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে সদগুরুলাভ হয় এবং গুরু কৃপায় গুণাতীত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সাধক রামপ্রসাদ সেন, প্রথমে কালী মূর্ত্তি উপাসনা করতে করতে পরে তাঁর সদ্গুরুলাভ হয় এবং সদ্গুরু প্রদর্শিত পথে তিনি সাধনার প্রকৃত পথ পেয়ে যান। সেটা তার রচিত সঙ্গীত ধারার পরিবর্ত্তনেই ধরা পড়ে। যেমন ঃএবার এক ভাব ভেবেছি। এক ভাবির কাছে ভাব শিখেছি ॥ যেদেশে রজনী নেই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি ॥ এখন তারার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ভুলেছি" ইত্যাদি। উপাসনা ঠিক এমনটি ব্যক্তিগত ভাবে হওয়া চাই, এমনটি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হওয়া চাই। তবেই ভগবান সাধকের সেই শ্রদ্ধা অনুযায়ী তেমন সহায়তাই বিধান করবেন। ভক্তকে প্রকৃত পথ দেখাতে, ভজন শেখাতে, দেবতাদের (সবারই) আনন্দই হয় ॥ ৭/২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ।। ২২

অনুবাদ: সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া তাঁহার (মুর্ত্তির) আরাধনা করে। তদনন্তর আমা কর্তৃক বিহিত সেই সেই কামনা সকল লাভ করে। ৭/২২

ব্যাখ্যা : বলা হয় দেবশক্তিসকল ভগবতী শক্তি। তাহলে ভগবতী কে ? ভগবতী হচ্ছেন সেই দেবতাসকলেরও অন্তর্যামী আত্মা। সুতরাং আত্মা থেকে আলাদা বা ভিন্ন এমন অনাত্মজ্ঞানে উপাসনা করলেও যে কাম্য-ফল লাভ হয় তাও আমারই দেওয়া। কারণ সকল আরাধনাই আমারই আরাধনা। জেনে বুঝে করলেই বিধিপূর্বক আমারই ভজনা হল কেননা দেবতাদের মধ্যেও আত্মারূপে তিনিই বিদ্যমান। তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের ফল বিধাতা। যেমন ধরুন আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক দেবতা আছেন। চণ্ডীতত্ত্ব লক্ষ্য করুণ, সেই সমস্ত অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ পূজিত হয়ে সন্তুষ্ট হলে সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তির বলাধান হয় বা সে সে ইন্দ্রিয় মধ্যে দৈবশক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু হাত পা চোখ কান কোনও ইন্দ্রিয়কেই কোনও দেবতা কোনও শক্তি দান করতে পারতেন না যদি সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি প্রভৃতির অধীশ্বর রূপে আত্মা তার মধ্যে না থাকতেন। তিনিই যে প্রত্যেক দেবতার অন্তরস্থ হয়ে ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করছেন, সেটা এই সব ভক্তবৃন্দগণ ধারণাও করে উঠতে পারেন না। তাই যে যে দেবতারই আরাধনা করুক সে সমস্তই অবিধিপূর্ব্বক আমারই আরাধনা করা হয়। আর যা কিছু কাম্য বলে জান বা ভোগ কর সেটাও আমিই দিই। কিন্তু তোমরা মনে ভাব যে অন্য কিছু পেলাম বা অন্য কেউ দিল। তাই দেবসাধনাও আমারই সাধনা। পরে ভগবান একথা বিশেষভাবে বলেছেন। এখানে এটুকু বলা দরকার যে যাই পূজো কর, সদ্গুরুর কৃপায় শ্রদ্ধার সাথে মূল বস্তুরূপ আত্মনারায়ণের উপাসনা যাঁরা করেন তাঁরা কিন্তু সেই আত্মনারায়ণকেই পেয়ে থাকেন। এটা পরের শ্লোকে দেখুন। ৭/২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ।। ২৩

অনুবাদ: কিন্তু ক্ষুদ্রদৃষ্টি তাহাদিগের সেই ফল বিনাশশীল। দেবযাজিরা অন্তবিশিষ্ট দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তগণ আমাকে পান। ৭/২৩

ব্যাখ্যা: দেবতাসকলও সশেষ (limited) আবার কামনাসকলও সশেষ। উভয়ই অন্তবান কারণ তারাও আমারই সৃষ্ট। কাজেই কামনার দ্বারা অথবা ও রকম পরিচ্ছিন্ন দেব দেবীর ধারণার দ্বারা ঐরকম সসীম ও অন্তবান ফলই পেয়ে থাকে। কিন্তু পরমাত্মার সাধকগণ পরমাত্মাকেই লাভ করে। তাই তাঁদের লাভটা অনন্ত, অপরিসীম। তাই যাঁরা শুধুমাত্র কাম্যবস্তু লাভের আশায় দেব দেবীর পূজা,

আরাধনা ইত্যাদি করেন তার ফল ক্ষণস্থায়ীমাত্র হয়, যদি আদৌ ফলে, কারণ দেবদেবীগণ নিজেরাই অন্তযুক্ত। একমাত্র পরমাত্মা ব্রহ্মই অনন্ত। সুতরাং আত্মোপাসকগণই অনন্ত ফললাভ করেন। যেখানে যা কিছু শক্তি ইত্যাদি আছে সে সবই সেই পরমাত্মারই শক্তি, যদিও প্রত্যক্ষভাবে বাসুদেব বা পরমাত্মাকেই সর্ব্বেশ্বর বলে জেনেছে এমন জ্ঞানবান পুরুষ খুবই অল্প। জ্ঞানীভক্তরা তো অন্তে পরমপদ বা ব্রহ্মপদ লাভ করেনই। অন্য তিন প্রকার ভক্তও বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত ও স্তর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন ও পরিশেষে জ্ঞানলাভ করে মুক্তিপদ লাভ করেন। অমৃতত্ব লাভের জন্য একমাত্র সেই অবিনাশী আত্মারই উপাসনা করা উচিত। নতুবা এমন ক্ষয়োদয়শীল দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে অমনতর ক্ষয়োদয়শীল ফলই হয়ে থাকে। স্বভাবিকভাবেই পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, তা হল পূজা, উপাসনা, আরাধনা, তপস্যা, যাই বলিনা কেন, তাতে প্রচেষ্টা, প্রযত্ন যখন সমানই অথচ ফলে প্রভেদ এতখানি, তখন লোকে এসব দেবদেবীর ঝঞ্ঝাট ছেড়ে, সেই পরমাত্মাকেই ভজন আরাধন করে না কেন ? এর উত্তর আছে পরের শ্লোকে ॥ ৭/২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ।। ২৪

অনুবাদ: অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য সর্ব্বোত্তম পরমস্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে। ৭/২৪

ব্যাখ্যা: এখানে ভগবান বলছেন আমি অব্যক্ত অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত। তাই আমি সকলের নিকট প্রকাশবান নই। মূঢ় জীব, অজ ও অব্যয় আমাকে জানতে পারে না। সেজন্য অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরা আমাকে মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম্ম ইত্যাদি ভাবপ্রাপ্ত বলে মনে করে থাকে। আসলে পরমাত্মা অব্যক্ত ও অব্যয়। দেহদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ দেহাতীত অব্যক্ত স্বরূপকে বুঝতে পারেনা, কারণ দেহভাবের বাইরে কিছুতে তারা থাকে না, থাকতে পারেও না। সে বিদ্যার অভ্যাস তারা করেনি। সে কারণে তারা পরমাত্মা বিষয়ে জানা বা বোঝার চেষ্টা না করে বরং নিজ নিজ কামনা, বাসনার প্রাপ্তির জন্য দেহধারী দেব মূর্ত্তিরই পূজা, উপাসনাদি করে থাকে। এ ধরণের উপাসনার পরিণাম হয় ত্রিতাপজ্বালা। কারণ যারা ভোগে মুগ্ধ হয়, তাদের দেহজ্ঞান ছোটে না, ঘোচে না। সুতরাং পরমাত্মার নিত্যস্বরূপের সন্ধান না পাওয়ায় তারা মূঢ়ই থেকে যায়। তাঁর অনুত্তম পরমভাব আর তাদের কাছে ফুটে ওঠেনা, প্রকাশিত হয়না। সাধারণ জীব অসঙ্গ ও অকর্ত্তা আত্মার প্রভবস্বরূপ এই ঈশ্বরত্ব না দেখে নিজেদেরই কর্ত্তা ভাবতে বাধ্য হয় ও ত্রিতাপের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ বিবিধ দুঃখময় অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে একসময় আবার শ্রদ্ধাসহকারে সদ্‌গুরু প্রদর্শিত সাধন অভ্যাস করতে করতে শেষে পরাবস্থারূপ

অসঙ্গ, অদ্বৈত অবস্থার উপলব্ধি করে থাকে। তখন বোঝে যে এটাই জ্ঞান, আর যা দেখি সবই অজ্ঞান। দেহভাবই সঙ্কীর্ণভাব। দেহ থাকলেই পাপ পুণ্য বোধ। অব্যক্ত ব্রহ্ম দেহ ও ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়। পরমাত্মার প্রপঞ্চাতীত অব্যয় স্বরূপ নিত্য, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ও নিরাকার। এই দেহাতীত ভাবটা ক্রিয়ার পরাবস্থায়ই উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ দেহীর দেহমধ্যে সেই ব্রহ্ম আবৃতই থাকেন। সাধনার দ্বারা সেই আবরণ খুলে ফেলতে হয়। ক্বচিৎ কোনও দেহে ব্রহ্ম অনাবৃত, আবরণমুক্ত অবস্থায় থাকেন। তাঁরাই অবতার পুরুষ, জীবন্মুক্ত পুরুষ কিন্তু অজ্ঞানান্ধ জীব সেটা জানেনা। যেমন পাই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে, যাঁকে কেউই বুঝে উঠতে পারেননি। কংস, শিশুপাল, দুর্য্যোধন কেউই শ্রীকৃষ্ণকে বোঝেন নি। পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণকে গালাগালি দিতে দেখে জ্ঞানবৃদ্ধ যোগী ভীষ্মদেব শিশুপালকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন

"কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্।।
অয়ন্ত পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেবং প্রভাষতে।।"

মহাভারত – সভাপর্ব্ব, ৩৮-অধ্যায়।

"এই শ্রীকৃষ্ণের হতেই লোকসমূহের উৎপত্তি, এ চরাচর বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণকৃত। এই অল্পবুদ্ধি শিশুপাল তাঁকে চিনতে পারেনি তাই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ বলে।"

সবশেষে, আবারও সেই একটা প্রশ্ন থেকে যায় – এমন কেন হয় ? উত্তর একটাই – আত্মজ্ঞানের অভাব। আবারও প্রশ্ন হয়, তবে সে আত্মজ্ঞানের অভাবেরই বা কারণ কি ? দেখুন পরের শ্লোকে। ৭/২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ।। ২৫

অনুবাদ : আমি যোগমায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি, মূঢ় এই জীবলোক জন্মরহিত ও নিত্যস্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না। ৭/২৫

ব্যাখ্যা: সাধারণ জীবের আত্মজ্ঞানের অভাবের কারণ কি ? মায়া। সে মায়া কেমন মায়া ? ভগবান বলছেন যোগমায়া। বলছেন'আমি ' যোগমায়ায় সমাবৃত বলে সকলের নিকট প্রকাশ নই। এখানেও

প্রশ্ন ওঠে যোগমায়া কি ? ভগবানের অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ সংকল্পই হোল যোগ। এটা অঘটন – ঘটন পটিয়সী বলে একে তাঁরই মায়া বলা হয়। এ অবস্থাতেই গুণের যোগ বা সংঘটন হয়। এই যোগমায়া দ্বারা পরমাত্মা জগতের সঙ্গে এক হয়েও জগতের অতীত, সকলের হৃদয়ে থেকেও সকলের নিকট প্রকাশ নন। প্রাকৃত মানুষ মনে করে প্রকৃতির সকল প্রকাশ ও অভিব্যক্তিই ভগবান। তাই তারা বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, জলের দেবতা বরুণ ইত্যাদিরূপে ভগবানের অর্চনা করে থাকে। কিন্তু এগুলো আসলে তাঁর কর্ম্ম ও শক্তিমাত্র যা তাঁকে আড়াল করে রাখার আবরণ মাত্র। এজন্যই লোকে তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে না। তিনি যে অজ ও অব্যয় তাও জানতে পারে না। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় – সকলের দৃষ্টি অন্য বিষয়ে আসক্তিপূর্ব্বক লেগে থাকে আর এ আসক্তি এমনই আসক্তি যে তাতেই তাদের জ্ঞান সমাচ্ছাদিত থাকে। এই অজ্ঞানের আবরণ ভেদ করতে পারেন একমাত্র জ্ঞানীরা, অজ্ঞানীরা পারে না। তাই তারা চিরস্থির নিত্যস্বরূপকে বুঝতে পারেনা। পরমাত্মজ্ঞানশূন্য মানুষ বিষয়েতে বিমূঢ় হয়ে সেই বিষয়ের তরঙ্গেই আবর্ত্তিত হতে থাকে তাই আত্মার অজত্ব ও অব্যয়ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। পরমাত্মাই যে সর্ব্বশক্তির শক্তি এবং সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান তাদের বোধে আসে না। এজন্যই সাধারণ মানুষ মূঢ় জীব নামে অভিহিত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন মহাত্মাগণ সুদুর্লভ হয়ে থাকেন। দুটো প্রশ্ন পাঠকের মনে উঠতে পারে সে প্রশ্ন শ্লোক বর্হিভূত হলেও খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। যেমন সেই পরমাত্মা তাহলে কেমন ? এবং কিভাবে বা কোন অবস্থায় তাঁর উপলব্ধি সম্ভব ? এ দুটো প্রশ্নের উত্তরই মুখের কথায় বা লিখে বোঝান অসম্ভব কেননা পুরোটাই নিজ নিজ বোধরূপ। তবুও চেষ্টা করে দেখা যাক। প্রথম আলোচ্য পরমাত্মা কিরূপ ? তিনি কোনওরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, ব্যবহারের অযোগ্য, এমন কোনও চিহ্ন নেই যার দ্বারা বোঝা যায়। তিনি অচিন্ত্য, মন তাঁর মনন করতে পারে না। আত্মপ্রত্যয় মানে নিজ বোধরূপ। কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেনা। নিজে নিজে বুঝতে হয়। তিনি প্রপঞ্চোপম মানে উপাধিশূন্য, শান্ত, উদ্ধতভাবরহিত – এজন্য জন্মমরণাদি অমঙ্গলশূন্য শিবস্বরূপ। এবার দ্বিতীয় আলোচনা কিভাবে, কোন অবস্থায় তাঁর উপলব্ধি হতে পারে ? একমাত্র যখন ইন্দ্রিয়েরা কোনও বিষয় গ্রহণ করেনা তখনই উপলব্ধব্য। সাধনার দ্বারা এই অবস্থাটা লাভ করতে হয়। এঅবস্থা লাভ হলে দেহাভিমান থাকে না। গুণের আবরণও থাকে না। আর গুণসংযোগ ছিন্ন হলে সব মায়া, মোহও অদৃশ্য হয়ে যায়। আসলে গুণত্রয়ের দ্বারা দৃষ্টি বহির্মুখী হওয়ায় গুণ ও তার কাজের প্রতিই খুব জোরাল ভাবে লক্ষ্য থাকে। তাই গুণাতীত ভাব সর্ব্বদাই আচ্ছাদিত। তাই তারা মোহাচ্ছাদিত ও মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয় ও সেই অসীম স্থিরতা ও শিবত্বকে ধারণাও করতে পারে না। ৭/২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ।। ২৬

অনুবাদ : হে অর্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত এই ত্রিকালবর্ত্তী ভূত সকলকে জানি, কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। ৭/২৬

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলা হল আমার সর্ব্বোত্তম নিত্যস্বরূপ অজ্ঞজনেরা জানতে পারেনা। এবার নিজের অনাবৃত জ্ঞানশক্তির কথা বলে অপর সকলের অজ্ঞান সম্বন্ধে বলছেন -- হে অর্জুন, যারা গত হয়েছে, যারা বর্ত্তমান রয়েছে এবং যারা ভবিষ্যতে আসছে এই ত্রিকালবর্ত্তী ভূত সকলকেই আমি জানি। অর্থাৎ জীবসমূহের তিন কালের সংবাদ, মানে কোথা থেকে এল ? কোথায় আছে ? এবং কোথায় যাবে ? এ একমাত্র আমিই জানি, কিন্তু ভূত সকলের মধ্যে কেউই আমাকে জানে না। কারণ তারা আত্মভাবে না থেকে ভূত ভাবেই থাকে। সুতরাং তারা পরমাত্মভাবরূপ তাঁকে জানবে কিভাবে ? আমিই মায়ার আশ্রয়। তাই মায়া তার নিজের আশ্রয়কে মোহিত করতে পারে না কিন্তু অপরের মোহ উৎপাদক। সীমাবদ্ধ কাল অস্থির ও চঞ্চল। তাই তাতে ত্রিকালের বোধ হয়, মহাকাল অচঞ্চল, স্থির স্বভাব। সুতরাং তাতে ত্রিকাল আর নেই। কালের মধ্যেই যখন অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ রূপ ভেদ থাকে তখন কালাধীন বস্তু মাত্রেই ভেদ থাকবে। সেজন্য এমনভাবে কালের ভেদ হওয়াতেই – জন্ম, জীবনের স্থিতিকাল ও তারপর মৃত্যু বোধ হয়। এমন বোধই অজ্ঞান। কিন্তু ব্রহ্ম কালাতীত। দেহবৃত্তি বা দেহধর্ম্মে দৃষ্টি থাকলে কালাতীত হওয়া যায় না তাই ব্রহ্মকেও জানা যায় না। একমাত্র ব্রহ্মই ব্রহ্মকে জানতে পারেন। তাই ব্রহ্মকে জানতে হলে কালাতীত ব্রহ্মস্বরূপ হতে হয়। কালজয়ী যোগীন্দ্র পুরুষের কাছে সবটাই বর্ত্তমান, কেননা তিনি কালকে জয় করেছেন, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। কালের অধীন জীব যত বড়ই বিখ্যাত পণ্ডিত হন না কেন তিনিও সেই অল্পবুদ্ধি জীবই তা সে ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, মোক্তার যাই হন। এখানে পণ্ডিতগণ প্রশ্ন করবেন যদি বুদ্ধিমান বিদ্বানরাই তাকে জানতে না পারেন তবে তাঁকে কেই বা জানবেন, কিভাবেই বা জানবেন ? উত্তরে বলি শাস্ত্রপাঠে তাঁকে জানা যায় না। তাঁকে জানার একটাই উপায় আছে, তাই হয়ে যাওয়া, নামরূপ বিবর্জিত অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া। এই অবস্থায়ই কালাতীত অবস্থার সাক্ষাৎকার হয়। এমন সমাহিত চিত্ত না হলে ইন্দ্রিয়াতীত আত্মস্বরূপের ধারণা হয় না। শাস্ত্রপাঠ ও বিচারে কূট যুক্তি তর্কের সুবিধা হয় ঠিকই কিন্তু ওতে চিত্ত আরও অসমাহিত হয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই বিচরণ করা হয়। একমাত্র ক্রিয়ারূপ যোগাভ্যাসে চিত্তকে লয় করতে পারলে অনুভব হয় কিভাবে পরমাত্মা শক্তি প্রকাশে ফলনময় হয়েও অব্যয়রূপে সমস্ত ফলনের অন্তরে বিরাজ করেন। সব রকম দ্বন্দ্ব রচনা করেও সেই দ্বন্দ্বের মাঝে দ্বন্দ্বহীন হয়ে অবস্থান করেন। জ্ঞাতারূপে তিনিই সমস্ত জ্ঞেয়রূপ ভূতের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এজন্যই ভগবান

বলছেন আমি সমস্তের বেত্তা হলেও আমার বেত্তা কেউ নেই। পাণ্ডিত্যে এ বোধ কেন আসে না ? পরের শ্লোকে ভগবান আরও বলেছেন। ৭/২৬

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ।। ২৭

অনুবাদ: হে পরন্তপ ভারত, রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে জাত দ্বন্দ্বমোহ হেতু (শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত বিবেক ভ্রংশের জন্য) সমুদায় জীব সংমোহ প্রাপ্ত হয়। ৭/২৭

ব্যাখ্যা : শাস্ত্রবিচারে মায়া দুর হয় না তাই ভগবৎ জ্ঞানও হয় না। সেজন্য বুঝতে হবে অজ্ঞান এত দৃঢ় কেন ? স্থুল দেহ উৎপন্ন হলেই পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে অনিচ্ছা, দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন ইচ্ছা হয়, হিংসা হয়, দ্বিধা জন্মে, সন্দেহ করে, মোহ জন্মে আর সবসময়ে সুখ খুঁজে বেড়াতে হয়। এসব তো গেল পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ। এর উপর থাকে শরীরের চাহিদা – ঠান্ডা, গরম, সুখ, দুঃখ এসমস্ত নানাবিধ দ্বিধা দ্বন্দ্ব এসে জীব নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করে। সুখী নিজেকে খুব কম লোকই মনে করে। সাময়িক, কদাচিৎ এমন মনে হলেও হতে পারে। অনাত্ম বিষয়ে আত্মবোধ থেকেই এমনটা হয়ে থাকে। আত্মজ্ঞান যত আবৃত থাকে অজ্ঞান ততই গভীর হয়। শাস্ত্রজ্ঞ এখন প্রশ্ন করুন কেন এমন হয় ? দ্বন্দ্ব হতেই ইচ্ছা দ্বেষ, ইচ্ছা দ্বেষ থেকে মোহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ সৃষ্টি দ্বন্দ্বময়, শক্তিপ্রকাশ মানেই দ্বন্দ্বপ্রকাশ। কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে কেন্দ্রে অবস্থান ও কেন্দ্র হতে ক্রিয়াশীল হয়ে বহির্ভূত হওয়ার বেগ, এই দুইরকম মূল বিপরীত প্রবৃত্তির বৈষম্যে যে প্রবাহ তৈরী হয় তারই নাম শক্তিপ্রকাশ। শক্তিতত্ত্বের নিয়মই হল কেন্দ্র অভিমুখে আকৃষ্ট থেকে কেন্দ্র হতে ব্যাপ্তি গ্রহণ করা বা ছড়িয়ে পড়া। এজন্যই ঋষির বর্ণনায় পরমাত্মা "তদেজতি তন্নৈজতি.. .. " "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যতি সর্ব্বতঃ" ---- পরমাত্মা শক্তিরূপে অবস্থান করেই সর্ব্বত্র বহু আত্মারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাইতো এ বিশ্বপ্রকাশই দ্বন্দ্বময়। সুতরাং যেখানেই প্রকাশ দেখা যায় সেখানেই বুঝবে যে উভয়মুখী ক্রিয়া তার অভ্যন্তরে চলছে। কেন্দ্র অভিমুখে আকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রতিরোধ না থাকলে বহির্মুখী গতি শক্তি পায় না, বলবতী হয় না। জড় বা চেতন যে পদার্থেরই হোক বা জ্ঞানেরই হোক, প্রতিক্রিয়া, প্রতিস্পন্দন, প্রতিচাঞ্চল্য, সবই উভয়-বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বময়। শীত - উষ্ণ, সুখ - দুঃখ, সৃষ্টি - প্রলয়, চেতন - অচেতন, আলো - অন্ধকার এ সবই দ্বন্দ্ব, এমনই দ্বন্দ্বময় এ সংসার। এমনই ইচ্ছা দ্বেষময় দ্বন্দ্ব হতে যে মোহ জন্মায় সেটাকেই ভগবান "ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থদ্বন্দ্বমোহ" বলেছেন। কোনও বস্তু, বিষয় বা অবস্থার প্রতি ইচ্ছা বা দ্বেষ থাকলেই বুঝতে হবে যে, সে তাতে মোহগ্রস্থ আর সেই মোহবশতঃই তাকে আবার ঘুরে ফিরে সেই বস্তু, বিষয় বা অবস্থার পাল্লায় পড়তে

হবে। এটাই হল জীবের পুনর্জন্মের প্রত্যক্ষ কারণ। আশাকরি শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ এতক্ষণে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। এর চেয়ে আর বেশী সহজ করে বলতে পারব না। জেনে রাখুন, যে সাধক সব দ্বন্দ্বের মাঝে একত্বটি দেখে, একেরই উভয় রকম প্রকাশ দেখে, দ্বন্দ্বের মোহকে এড়িয়ে সেই একত্বে নিজেকে সংন্যস্ত রাখতে সচেষ্ট থাকেন সেই পুণ্যকর্ম্মা সাধকই এই মোহের হাত থেকে রেহাই পান, কিন্তু যারা ইচ্ছাদ্বেষজাত মোহে আবর্ত্তিত থাকে তারাই পাপিষ্ঠ। পরের শ্লোকে এটাই বিশদভাবে বলা হয়েছে। ৭/২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ।। ২৮

অনুবাদ: কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারী জনগণের পাপ নষ্ট হইয়াছে, যাহারা দ্বন্দ্বজনিত মোহ (বিবেকভ্রংশ) হইতে মুক্ত, তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ৭/২৮

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভগবান বললেন যে সৃষ্টি দ্বন্দ্বময়, অতএব মোহাত্মক। যদি তাই হয় তবে কেন শুধুমাত্র কিছু কিছু লোককে তোমার ভজন সুমিরণ করতে দেখা যায় ? উত্তরে ভগবান বলছেন হ্যাঁ ঠিকই। কেউ কেউ আমার ভজনা করে ঠিকই তবে প্রকৃত পক্ষে একনিষ্ঠ ভাবে ভজনা শুধুমাত্র তাঁরাই করতে পারেন যাঁদের সাধন দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়েছে। পাপ কি ? ইন্দ্রিয়াসক্তিই পাপ এবং যে কর্ম্ম দ্বারা ঐ পাপ নষ্ট হয় তাইই পুণ্যকর্ম্ম। তাই আত্মকর্ম্ম করে যাঁদের সেই পাপ নষ্ট হয়েছে তাঁরাই দ্বন্দ্ব ও মোহ হতে মুক্ত হয়েছেন। এবং দৃঢ়ব্রত মানে একান্ত যত্নপরায়ণ হয়ে স্থির প্রাণরূপ আত্মার আরাধনা করছেন। নইলে পাপ পুণ্য বলে কিছুই নেই। দৃশ্যমান সুখ-দুঃখ, আলো- অন্ধকার, জ্ঞান-অজ্ঞান, ইচ্ছা-দ্বেষ এমন সবরকম দ্বন্দ্বের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখলে তিনটে জিনিষ দেখা যায়। প্রথম হল এদের পরষ্পর বিরুদ্ধভাব, যেমন সুখের বিপরীতেই দুঃখ, অন্ধকারের বিপরীতে আলো ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত এদের সংযুক্তভাবে অবস্থান। লক্ষ্য করুন, দুঃখ আছে বলেই সুখবোধ হয়, অন্ধকার হয় বলেই আলোর দরকার পড়ে, এমনই একটির জন্য অপরটির অস্তিত্বের সংস্থান। তৃতীয়ত হল এদের মৌলিক একত্ব। যেমন সুখ ও দুঃখ মূলতঃ একটা অবস্থা, ভালোমন্দ উভয়ই একটা অবস্থা মাত্র, যেগুলো জীব গ্রহণ করে, ভোগ করে ও তাতে মুহ্যমান থাকে। তাই যে ভাবেই বলি, আসলে এগুলোই হল বিষয়ের বাহ্য মূর্ত্তিতে বিমূঢ় হওয়া। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো বিষয়ের বাহ্য মূর্ত্তিতে বিমূঢ় না হয়ে তার মূলের দিকে লক্ষ্য রাখলে প্রতি বোধের অন্তরে যে জ্ঞানময় মূর্ত্তি এবং প্রতি জ্ঞানপ্রকাশের ভিতরে যে আত্মমূর্ত্তি বিরাজিত সে দিকে লক্ষ্য রেখে জগৎ ব্যবহারে বিচরণশীল থাকলেই কি প্রকৃত পুণ্য আচরণ করা হয়না ? এইভাবে পুণ্যাচারী হওয়াটাই হল দ্বন্দ্বমোহ বিনির্ম্মুক্ত

হওয়া। এমন মোহমুক্ত পুরুষই একনিষ্ঠ ভাবে আত্মলাভে সচেষ্ট থাকে। এই আত্মাই আমি সর্ব্বত্র সমস্ত “কু” – “সু”, আলো অন্ধকার, সুখ দুঃখ সবকিছুর ভিতর একমাত্র আমাকেই অন্বেষণ করে, সমস্তটাই আমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলে সর্ব্বত্র আমাকেই বরণ করে নেয়। ভগবানের কথায় “অন্ত গতপাপ, পুণ্যকর্ম্মা, দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্ত” এই তিনটে কথার এটাই হল সমানাধিকরণ (equation)॥ ৭/২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলাম্ ।। ২৯

অনুবাদ: জরা মরণের নাশ [সদ্গুরুপদেশে] এর জন্য আমাকে আশ্রয় করে যাঁরা [সাধনায়] প্রযত্ন করেন, তাঁরা সেই ব্রহ্মকে, সমস্ত অধ্যাত্মকে [আত্মবিষয়ক রহস্যকে] এবং সরহস্য কর্ম্মকে জানেন ॥ ৭/২৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যেভাবে বলা হল সেই ভাবে সব রকম দ্বন্দ্বমোহের অতীত হয়ে যাঁরা আমাকে ভজনা করেন সেই ভক্তগণ সব রকম রহস্য উন্মোচন করে কৃতার্থ হন। অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্য তিনিই জানতে পারেন। কারণ বাসুদেবই সমস্ত একথা আগেই বলা হয়েছে। তিনিই মূল ব্রহ্মবিজ্ঞান। তাই জরা মরণ হতে পরিত্রাণের জন্য তাঁর আশ্রয় নিতে পারলেই তাঁর ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁর আত্মপ্রত্যগাত্ম ও আত্মশক্তি প্রকাশরূপ সমস্ত কর্ম্ম বা বিশ্বতত্ত্ব বিশেষ ভাবে জানা যায়। বাসুদেবই মূল ব্রহ্মবিজ্ঞান। এর বাইরে আর কোনও বিজ্ঞান নেই। দেহলাভ করে দেহীর পরম সঙ্কট হচ্ছে জরা ও মরণ। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ জরায় জীর্ণ হয়ে যায়। আজ যিনি পরমাসুন্দরী অপ্সরা, যাঁর অলোকসামান্য রূপ দেখে চোখ ফেরাতে পারি না, কালই তা শ্রীভ্রষ্ট, কদর্য্য হয়ে যায়। কাল বশীভূত জীব কালের প্রভাবে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে এটাই প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু ভোগসুখে আসক্ত জীব কালের দ্বারা এমন পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না। তারা সর্ব্বদাই রূপে রসে মজে ডুবে থাকতেই চায় কিন্তু বাসনা কিছুতেই মেটেনা। ভোগ করতে করতে আশা না মিটতেই জীবন ফুরিয়ে যায়। মনের আশা মনেই থেকে যায়। অবশ হয়ে কোন্ অজ্ঞাত দেশে বা আবাসে তাকে চলে যেতে হয় যেখান থেকে তাঁর আর কোনও সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এমনতর এই জরা মরণের দোর্দ্দমনীয় প্রতাপে জীব সদা সন্ত্রস্ত, বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সবাই এর হাত থেকে রেহাই চায় বটে; কিন্তু এর হাত থেতে নিস্কৃতি লাভের উপায় কি সেটা জানে না। এখন সেটাই শুনুন। যদিও কথাটা আপনাদের খুব একটা মনঃপূত হবেনা তবুও শুনুন। বিষয় বিমুখ চিত্তে অনন্যশরণ হয়ে তাঁকে আশ্রয় করতে পারলেই এই কালভয় দূর হতে পারে। কিন্তু কামোপহতচিত্ত সাধারণ পুরুষ তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে অন্য একজন, দ্বিতীয় একজন এমন একটা ধারণা করে বসে অথবা পরমেশ্বরই আমার আত্মা এমন একটা ধারণা শুনে শুনে নিজের অজ্ঞাতসারে তৈরী করে এবং নিজের জীবত্বটাকে পূর্ণমাত্রায় ছাড়তে সক্ষম না হয়েই “ অহং ব্রহ্মাস্মি ” এই ভাবে ধারণা করতে গিয়েই ব্রহ্মরাক্ষসত্বে উপনীত হয়ে পড়ে। এজন্যই ইতিপূর্বে ভগবান বলেছেন যে “বাসুদেবং সর্ব্বম্ ” এই জ্ঞান যথাযথ ধারণা করতে পারে এমন পুরুষ সত্যই দুর্লভ। আগে পরমাত্মার পরমসত্তায় আস্তিক্যবোধসম্পন্ন হয়ে নিয়ে তারপর সেই পরমাত্মা থেকেই আমার আত্মা বা আমার প্রকাশ। সুতরাং আমিও তাঁরই প্রকাশ, এই ভাবে সংযত সুবৈজ্ঞানিক ধারায় জ্ঞান প্রকাশ না হয়ে ঐ রকম জ্ঞানবিপর্য্যয়ের কারণ হল কামনা। কামনার দ্বারা চিত্ত এত আচ্ছাদিত থাকে যে ভগবৎ ধারণা করতে গিয়েও কামসঙ্কীর্ন চিত্তের আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। নিজের জীবভাব অজ্ঞাতসারে সাধককে জীবত্বের গন্ডীর মধ্যেই ধরে রাখে। ফলে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না যে প্রকৃত চিত্তভূমির কোন অংশে সে অবস্থান করছে, কারণ শুধুমাত্র ব্যক্ত বিষয়েই জীবের কামনা, অভ্যাস সব। ব্যক্তের মূলে যে অব্যক্ত পরম আত্মস্বরূপে তাঁর অবস্থান এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ ইত্যাদি সঞ্চয় করেও কার্যতঃ তাতে শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠতে পারে না। তাই শুরুতে বললাম যে “কথাটা খুব একটা মনঃপুত হবে না তবুও শুনুন”। ব্যক্ত মাত্রেই দ্বন্দ্বময়। অব্যক্তে প্রকাশ নেই তাই দন্দ্বও নেই। দ্বন্দ্বময় বিষয়ের কোথাও ইচ্ছা, কোথাও দ্বেষ, জাগ্রত থাকে বলে জ্ঞানকে এক সমভূমিতে উন্নীত রাখতে পারেনা। তাই ব্যক্ততায় মূঢ় পুরুষ আত্মাকে ভগবান বলতে গিয়েও ব্যক্ত জীবত্বটাকেই ভগবান বলে ফেলে নতুবা নিতান্ত অন্য একজনকে ভগবান বলে ধারণা করতে বাধ্য হয়। বিষয় জরা মরণময় বলে বিষয়বিমূঢ় জীবও জরামরণময়, বিষয় মানেই ব্যক্ত, ব্যক্ত মানেই দ্বন্দ্ব আর দ্বন্দ্বই বস্তু। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কবলে একবার পড়লে বিমূঢ় হয়ে বিষয়াশ্রয়ীই থেকে যেতে হবে। শুধু মুখে বেশ আদর্শের বুলি থাকলেও মুখ আর মন কোনও দিনও এক হবেনা। কারণ এর মূলে থাকে সেই দন্দ্ব, যা আসলে ইচ্ছা ও দ্বেষ, বস্তুবাদেই যার চূড়ান্ত প্রকাশ। সর্ব্বপ্রকাশের জ্ঞাতা যে একমাত্র অন্তর্য্যামী আত্মা এটা বুঝতেই পারে না বরং আমিই জ্ঞাতা, আমার মূলে আর কাউকে দেখছি না এইভাবে বিমূঢ় হয়ে বিষয়াশ্রয়ীই থেকে যায়, আত্মাশ্রয়ী আর হতে পারে না। তাই মনুষ্য সমাজ এত বিষয়ী ও ভোগী। তার সাহিত্য, তার দর্শন, সর্বত্রই হাহাকার, চাই আরও আরও ভোগ, সকলই হল সেই দ্বন্দ্বমোহের চূড়ান্ত পর্য্যায়। তবে এসব সত্তেও যদি কোনওরকম ব্যতিক্রম বশতঃ কেউ দ্বন্দ্বমোহের ভিতর বা বস্তুবাদের ভিতর বিষয়ের বিষত্ব লক্ষ্য করেন, তখনই তাঁর ভিতর আসে এক জিজীবিষা, শুধু আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে নিত্য জীবনের সাক্ষাৎকারই হয় তাঁর প্রাণের তৃষ্ণা ও সাধনা। অধ্যাত্মকর্ম্ম দ্বারাই তখন একমাত্র অনন্যশরণ হতে হয়, এটাই ভগবদাশ্রয়। আত্মদেবের ভজনা বা আত্মোপাসনা করাই তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা। এই আশ্রয় গ্রহণ করলেই চিত্ত শুদ্ধ হবে, মনস্থির হবে। বুঝতে পারবেন যে তাঁর মধ্যে যিনি কৃষ্ণ বা কূটস্থ রূপে আছেন তিনি

পরব্রহ্মের সাথে এক ও অভিন্ন। এটা বুঝলেই জরা-মরণের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং কর্ম্মের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হবে, সে কাজের দ্বারাই সেই অধ্যাত্ম কর্ম্মের রহস্যও জানা যাবে। আত্মার আত্মপ্রকাশরূপ অখিল কর্ম্মবিজ্ঞান উপলব্ধি করাই প্রকৃত জ্ঞান। প্রয়াণকালে মোক্ষকামী জীবের হৃদয়ে ভগবান যে জ্ঞানপ্রদীপ্ত মূর্ত্তিতে দীপ্তি পেতে থাকবেন সেই জ্ঞানকেই ভগবান পরবর্ত্তী শ্লোকে সাধিভূত, সাধিদৈব ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেছেন ॥ ৭/২৯

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ।। ৩০

অনুবাদ: যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত অবগত আছেন, আমাতে আসক্তচিত্ত সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন ॥ ৭/৩০

ব্যাখ্যা: যাঁরা অধ্যাত্মকর্ম্মের দ্বারা অনন্যশরণ হয়ে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁদের যোগভ্রংশের আশঙ্কা থাকে না। ভগবান বলছেন যাঁরা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সাথে জানতে পারেন, আমাতে আসক্ত সেই যুক্তচেতাগণ মরণ সময়েও আমাকে জানতে পারেন। তাই তাঁদের আর যোগভ্রংশ হবার আশঙ্কা থাকে না। এখানে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সাথে জানা কেমন সেটা ভগবান পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভালোমত বলেছেন। তাই সেটা আর এখানে আলোচনা করলাম না, আর প্রয়াণকালে যুক্তচিত্ত থাকার প্রয়োজন কি সেটাও পরের অধ্যায়ে বলা আছে। এখানে ভগবান বলছেন যে সাধক পরমাত্মার ত্রিবিধ স্বরূপ জ্ঞাত হন এবং সে জ্ঞান এমন অবিচ্যুত ভাবে লাভ করেন যে মরণকালেও তা থেকে ভ্রষ্ট হন না। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়াই প্রকৃতপক্ষে "বাসুদেবং সর্ব্বমিতি" এই জ্ঞানে আরূঢ় হওয়া। আসলে মৃত্যুসময়ে শরীরে বিবিধ যাতনায় ইন্দ্রিয় মন অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধনা দ্বারা যাঁরা আত্মাতে যুক্ত হওয়া বা আটকে থাকা অভ্যাস করেছেন তাঁদের মন চিৎ রূপে মগ্ন হয়ে যায়। মরণমূর্চ্ছাতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলেও অন্তঃজ্ঞান ছিন্ন হয় না। আত্মধ্যানে অভ্যস্তচিত্ত আত্মচিন্তা বিস্মৃত হয় না, তাই এদের যোগভ্রংশ হবার আশঙ্কা নেই। আগেভাগেই এঁরা মৃত্যুলক্ষণ বুঝতে পারেন এবং তৈরী থাকেন। যাঁরা প্রকৃত যোগী তাঁরা কিভাবে মূলাধার থেকে কুলকুণ্ডলিনীকে মেরুমার্গের মধ্য দিয়ে সহস্রারে নিয়ে পরমপুরুষ শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তাঁর জন্মমৃত্যু পথে আসা যাওয়ার খেলা বন্ধ করে দেন সেটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। এঁরা তো সর্ব্বদাই মুক্ত। কিন্তু যাঁরা শরীর থাকতে এতটা এগোতে পারেনি তাঁদেরও সে পথটা অন্ততঃ খোলা থাকে এগিয়ে যাবার জন্য। যে শরণাগত ভক্ত সর্ব্বদা সাধন ভজনে থাকে তাঁকেও ভগবান মরণকালে দিব্যজ্ঞান দান করে নিজ ধামে প্রবেশে সাহায্য করেন। মৃত্যুকালে তাঁরাও নিত্য উপাস্য সেই বাসুদেবকেই লাভ করেন ॥ ৭/৩০

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে "জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ" নামক সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥

ইতি শ্রী বিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার সপ্তম অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ :- এই অধ্যায়ের মূল অর্থ হল জ্ঞান অর্থ জানা, বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ রূপে জানা। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানার নাম জ্ঞান এবং পরমাত্মতত্ত্ব জানার নাম বিজ্ঞান। মূল সিদ্ধান্ত হল প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মক্ষেত্রে যিনি অন্তর্য্যামি আত্মারূপে অবস্থিত, তিনি বিশ্বেশ্বর, সমগ্র শক্তি তাঁরই শক্তি, সমগ্র বিশ্বপ্রকাশ তাঁরই বিশ্বরূপ। তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব, বিশ্বের আশ্রয়, কিন্তু কামমোহিত সংকীর্ণচিত্ত, বস্তুবাদী পুরুষ তাঁর এ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী ও ভোগবাদী হয়ে পড়ে ও দ্বন্দ্বমোহের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হতে থাকে যেহেতু "কামান্ ন উপভোগেন শাম্যতি।" দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল কথাই কামনা ও ভোগ। এরা যেমন বৃত্তাকারে ঘোরে তেমনই পুনঃ পুনঃ জন্ম, জরা ও মরণও চক্রাকারে ঘোরে। ভোগবাদীগণ তাই আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না। তারা আত্মা হতে ভিন্নদর্শী হয় এবং বড় বড় প্যান্ডেল করে প্রতিমা পূজার উল্লাসে মেতে থাকে। পূজো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হুজুগে মেতে ওঠে ও আত্মজ্ঞান থেকে দুরে থাকারই চেষ্টা করে। তার ফল হল মৃত্যুলাভ ও পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের কবলে গ্রাসিত হওয়া। মরণ হতে উদ্ধার পাবার জন্য দৃঢ়ব্রত যাঁরা এই আত্মতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরাই তাঁর সর্ব্বব্যাপী সাধিভূত, সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ এই ত্রিবিধ স্বরূপ জেনে কৃতকৃতার্থ হন। মৃত্যুকালেও তাঁরা তাঁদের চির ও নিত্য উপাস্য বাসুদেবকেই লাভ করেন। এটাই হল আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞান। কূটস্থ তত্ত্বজানারূপ আত্মজ্ঞানদ্বারা কূটস্থ উর্দ্ধস্থ পরমাত্মতত্ত্ব জানারূপ ব্রহ্মকে জেনে ঐ ব্রহ্মে অর্থাৎ সেই বিজ্ঞানপদে লয় প্রাপ্তিরূপ মিলিত হয়ে যাওয়ার নামই জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ ॥

-- ০০ --

ওঁ

অথ অষ্টমোহধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম যোগ (৮)

অর্জুন উবাচ -

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ।।১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিনন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ।।২

অনুবাদ: অর্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম্ – সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? আর কাহাকেই বা অধিদৈব বলে ? অধিযজ্ঞ কে ? কিরূপে তিনি এই দেহে অবস্থিতি করেন ? হে মধুসূদন, অন্তকালে তুমি কি উপায়ে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞেয় হও ? ৮/১-২

ব্যাখ্যা: শ্রীভগবান এর আগেই সপ্তম অধ্যায়ে সাধিভূত, সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ এই ত্রিমূর্ত্তির বিষয়ের কথা বলেছেন এবং বলেছেন কৃষ্ণৈকচিত্ত ভক্তগণই ব্রহ্ম, কর্ম্ম ও অধিভূতাদি ভালমত জানেন। ফলে তাঁরাই, সেই মদ্‌যুক্তচেতা পুরুষরাই, প্রয়াণকালে আমাকেই উপলব্ধি করতে থাকেন। সাধকপ্রবর অর্জুন কিন্তু শ্রোতামাত্র নন, রীতিমত মননশীল শ্রোতা। ভালমত না বুঝে শুধুমাত্র শুনেই সন্তুষ্ট হন না। সেজন্য ভগবান নিজের এই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতারূপ ত্রিমূর্ত্তির অবতারণা করায় অর্জুন সে বিষয়ে বিশদ ভাবে জানার জন্য ভগবান কথিত – ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ইত্যাদির সাত পদার্থের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন। অর্জ্জুনের এই সপ্ততত্ত্ব জিজ্ঞাসা দিয়েই অষ্টম অধ্যায় শুর" হল।

অর্জ্জুন বললেন, হে পুরুষোত্তম ১) সেই ব্রহ্ম কি ? ২) অধ্যাত্ম কি ? ৩)কর্ম্ম কি ? ৪) অধিভূত কাহাকে বলে ? ৫) অধিদৈব বা কাহাকে বলে ? ৬) দেহস্থিত যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা কে ? ৭) সেই অধিযজ্ঞের অধিষ্ঠানের প্রকার কিরূপ ? (মানে এই শরীরে থেকে কি প্রকারে তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ? যজ্ঞ শব্দে এখানে কর্ম্মলক্ষণকেই বলা হয়েছে) এই সাত তত্ত্বের বাইরে আর একটা প্রশ্ন হল ৮) অন্তকালে নিয়তচিত্ত পুরুষগণের দ্বারা কিভাবে তাদের জ্ঞেয় হও ?

একটু লক্ষ্য করুন অর্জ্জুন ভগবানকে এই প্রশ্ন করার সময় " পুরুষোত্তম " বলে সম্বোধন করলেন কারণ পরমাত্মা ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সর্ব্বপুরুষরূপে বিরাজিত। বহুরূপে অধিষ্ঠিত সেই পরমপুরুষেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিময় সংস্থিতির কথা হচ্ছে এই অধ্যায়ে। পরমাত্মাই যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনিই বাসুদেব, এই বিজ্ঞানটা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনার পর এই অধ্যায়ে তাঁর সেই সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিময় অব্যক্ত ব্রহ্মভাবটাকে সাধক হৃদয়ে প্রকটিত করে কিভাবে সাধক তাঁতে চিরদিনের জন্য প্রবেশ করবেন এবং কিভাবেই বা তাঁতেই সর্ব্বদা সৃষ্ট ও প্রবিষ্ট হচ্ছে সেটাই বর্ণনা করা হচ্ছে। সেজন্যই এই অংশটিকে ব্রহ্মখণ্ড বলা হয় এবং যে জ্ঞানের সাহায্যে এমন জন্মমরণ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই জ্ঞানে যোগস্থ হওয়াই সেই তারকব্রহ্মযোগ। এই তারকব্রহ্মযোগ বর্ণনার উদ্দেশ্যে এই ত্রিবিধ ভাবময় ব্রহ্মতত্ত্বকে সুগম ও স্পষ্ট করার জন্য অর্জ্জুনের এই প্রশ্নাবলী খুবই প্রাসঙ্গিক ও সমীচীন। ৮/১-২

শ্রীভগবান উবাচ -

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ।।৩

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন, পরম যে অক্ষর (যাহার ক্ষয় নাই এবং জগতের মূল কারণ) তিনিই ব্রহ্ম; স্বভাবই (আত্মভাবই) অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়; ভূত – ভাবোদ্‌ভবকর{ভূত সকলের ভাব (উৎপত্তি) ও উদ্ভব (ক্রমশঃ বৃদ্ধি) এই উভয়কারী}বিসর্গ (দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ যজ্ঞ) কর্ম্ম – পদবাচ্য। ৮/৩

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের অর্জুনের প্রশ্নের ক্রম (ংবৎরধষ) অনুসারে শ্রীভগবানের উত্তর।

(১) তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ কূটস্থ অক্ষর পরব্রহ্ম। যার ক্ষরণ নাই তাই অক্ষর। পরব্রহ্মই একমাত্র ক্ষয়হীন, অবিনাশী বস্তু। ভূতসকল ক্ষরপুরুষ এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। সুতরাং পরম অক্ষরত্ব যাঁর লক্ষণ তিনিই ব্রহ্ম। এখানে ভূতসকল ক্ষরপুরুষ বলা হয়েছে কিন্তু জীবাত্মা ক্ষর নয় । ক্ষর না হয়েও ক্ষররূপে নিজেকে দেখাটাই হল জীবধর্ম্ম। জীব অক্ষর থাকলেও ক্ষরত্বই অনুভব করে। জীবে ও ঈশ্বরে এটাই পার্থক্য। অক্ষর পুরুষই পরমব্রহ্ম। পরমব্রহ্ম বলতে অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মার পরম অক্ষরবোধময় অক্ষরব্রহ্মরূপটিকেই বুঝায় যদিও সেই পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর ক্ষর অক্ষর উভয়েরই অতীত তবুও সর্ব্বভূতে কূটস্থরূপে তাঁর অবস্থানটিকে লক্ষ্য করেই তাঁকে

অক্ষরপুরুষ বা সগুণব্রহ্মরূপে গ্রহণ করা হয় নতুবা তিনি গুণাতীত। সগুণ বলতে উভয়লিঙ্গাত্মক কিন্তু মূল পরমেশ্বরে কোনও লিঙ্গ নেই। সগুণের মধ্যেও নির্গুণত্ব প্রকাশে উভয়বিধ ব্রহ্মপ্রকাশ সুস্পষ্ট হওয়াতে সগুণব্রহ্ম বলা হয়। পরব্রহ্মই পরমেশ্বর হিসাবে অক্ষরপদবাচ্য – " অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম " কথাটির এটাই প্রকৃত অর্থ।

(২) “স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে” অর্থাৎ এই আত্মা যখন দেহকে অবলম্বন করে বা অধিকার করে তাকে সুখ দুঃখ ভোগ করায় সেই জীবকেই অধ্যাত্ম বলে। এককথায় ক্রিয়া করার নাম অধ্যাত্ম। এজন্যই স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়।‘স্বভাব ও অধ্যাত্ম’ সম্পর্কে শঙ্করাচার্য্য লিখেছেন “তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যাগাত্মভাবঃ স্বভাবঃ। – স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ – অধ্যাত্মমুচ্যতে। আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যাগাত্মতয়া প্রবৃত্তং” – সেই পরব্রহ্মের দেহরূপ আত্মাকে আশ্রয় করে প্রত্যগাত্মা বা জীবরূপে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই অধ্যাত্ম। ভোক্তা জীবরূপে ‘স্ব’ এর ভবন বা অবস্থিতির নামই স্বভাব এবং তাইই অধ্যাত্ম। আর “ভূত” মানে ‘হয়েছি’ বা ‘হয়েছে’, এমন ভাব, যা দেখে উদ্ভূত হয় তারই নাম ‘ভূতভাবোদ্ভবকর’। ভূত শব্দটা তাই অতীত ক্রিয়ার ভাবাত্মক। পদার্থ বলতে যা কিছু বুঝি সে সবই ক্রিয়াময়। তাদের বাহ্য ভূতমূর্ত্তির অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়াময়ী মূর্ত্তি আছে। ক্রিয়া যে আকারে বা ভাবে প্রকাশ পায় সেই অনুযায়ী সেই ভূত নামে সেই ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। এজন্য জল, মাটি, বাতাস, আগুন এ সবই সর্বদা স্পন্দনময়, ক্রিয়াময়, কিন্তু আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য হয় না বলে সেই ক্রিয়ার রূপটিকে ভূত বা বস্তুরূপে দেখি যার অন্তরের অব্যক্ত ক্রিয়াটি (matter এর ভিতরে nucleas এর চারিদিকে electron এর গতিশীলতা) যেন বর্ত্তমান এবং বাহ্যরূপটি অতীত বা ভূত। আর ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত শক্তিই ভবিষ্যৎ মানে যা সব হয় বা হবে। এই ক্রিয়াই হল কর্ম্ম তা সে জড়মূর্ত্তি প্রকাশক ক্রিয়া বা বিভিন্ন জ্ঞানায়তন রচনাময় জ্ঞানক্রিয়া যাই হোক, বিশ্ব মূলতঃ জ্ঞানময়। জ্ঞানস্বরূপ অক্ষরব্রহ্মের ব্যক্ত শক্তিময় ভাবই বিশ্বরূপ।

(৩) তাই এখানে কর্ম্মের অর্থও জ্ঞানক্রিয়া। আর এই জ্ঞানক্রিয়া করার নামই অধ্যাত্ম। " ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ " ই কর্ম্ম। বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগই কর্ম্ম। নিজ শক্তির ব্যয়ই কর্ম্ম। নিজ নিজ লক্ষ্য সাধনে নিজ শক্তির ব্যয়ই তপস্যা বা সাধনা। যে সাধনা দ্বারা নিজের মধ্যে আত্মস্বরূপের দর্শন হয় সেই সাধনাই আধ্যত্মসাধনা। কারণ এই সাধনা দ্বারাই আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হয়ে যায় তখন যে ভাব উপলব্ধ হয় সেটাই প্রকৃত “অধ্যাত্ম " বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা। জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ সাধন হল পরমাত্মার সাথে মিলন লাভ করা। সুতরাং সেই কর্ম্মই অধ্যাত্মকর্ম্ম । পাঠক এখন অধৈর্য্য হয়ে প্রশ্ন করুন, বলুন এ সবই তো তত্ত্বকথা, আসল অধ্যাত্মকর্ম্ম কি ? তবে আবার সেই “ভূত ভাব” এ আমি যা হল চৈতন্যের জীব অবস্থা, স্থির প্রাণ চঞ্চল হলেই জীবভাব ব্যক্ত হয়। তখনই প্রাণ বহির্মুখী হয়ে শ্বাস- প্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, যা থেকে সৃষ্টি, স্থিতি, পোষণ, পরিপোষণ – এক কথায় সংসার প্রবাহ চলতে থাকে যা কিছুতেই থামতে চায় না। বেশিরভাগ জীবই এমনতর প্রবাহেই মত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনও জীব সংসার তাপে উত্তপ্ত ও অসহ্য হয়ে ওঠে, আর সহ্য করতে না পেরে শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হয়, তখন তিনি কৃপা করে আর্ত্ত শিষ্যকে উদ্ধারের পথ বলে দেন। পথটা কি ? পথটা হল ঠিক উল্টো পথ। যে পথে এসে এই প্রবাহে পড়েছ ঠিক তার উল্টো পথে হাঁটা। মানে যাতে সংসার প্রবৃত্তি আরম্ভ হয় তা থেকে নিবৃত্ত হতে হলে আবার সেই পথেরই উল্টোদিক ধরতে হয়। যে ভাবে শ্বাস – প্রশ্বাস চলাচল ক'রে জীবভাবকে সঞ্জীবিত করে রাখে সেটাই জীবপ্রবাহের জন্ম মরণ পদ্ধতির " উদ্ভবকর "। শ্বাসের বেরিয়ে যাওয়াই সেই “ভূতভাবোদ্ভবকরঃ” ভাব বা অবস্থা যাতে জীবজগতের আরম্ভ ও বিস্তার চলতে থাকে। এই অবস্থা যতক্ষণ ততক্ষণই জন্মমৃত্যুর এবং নানাবিধ কর্ম্মের প্রবাহ তুফান রূপে চলে। সেজন্য ঠিক এর উল্টোপথে চলতে হয় এবং এই ভাব থেকে ফিরতে ফিরতে শেষে সেই এক অনাদি ও অব্যক্তভাবে এসে মিলতে হয়। তখন আর বহুত্ব (diversity) নানাত্ব থাকে না। তখনই প্রলয়ের অবস্থা বা অব্যক্তে আত্ম বিসর্জ্জন। এটাই শিবভাব বা ব্রহ্মভাব। এই শিবভাব সংস্থাপিত হলেই প্রাণকর্ম্মের অবসান হয় এবং আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হয়। তখন সমস্ত প্রবৃত্তিপ্রবাহ সঙ্কুচিত হয়ে অপরিণামী বিন্দুতে এসে মিশে যায় এবং শ্বাশ্বত অপরিণাম ভাবকেই প্রকাশ করে। যে কর্ম্মের দ্বারা এই জীবভাবের বিসর্গ হয় ও আত্মভাবের সংস্থাপন হয় সেই কর্ম্মই হল আসল অধ্যাত্মকর্ম্ম ॥ ৮/৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ।। ৪

অনুবাদ: হে দেহিশ্রেষ্ঠ, বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ ভূত অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে অধিকার করিয়া অবলম্বন করে, এজন্য তাহা অধিভূত (যে অবস্থায় ‘আমি ও আমার’ থাকে)। পুরুষ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বিরাট, স্বীয় অংশভূত সমুদয় দেবগণের (ইন্দ্রিয়গণের) অধিপতি বলিয়া অধিদৈবত এবং এই দেহে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া আমিই অধিযজ্ঞ (প্রাণকর্ম্ম) ॥ ৮/৪

স্পষ্টীকরণ ঃ-{অধিভূত ভাবটি ক্ষরণশীল (transitory/degenerative)। অধিদৈব ভাব পুরুষ, হে শরীর শ্রেষ্ঠ, ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের দেহে পুরুষোত্তম আমিই অধিযজ্ঞ।}

ব্যাখ্যা: প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের ক্রম (serial) অনুসারে প্রশ্নের উত্তর।

(৪) অধিভূত ঃ- "অধি" মানে হচ্ছে বুদ্ধি। এই বুদ্ধি যখন আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দেহটিকেই নিজের স্বরূপ বলে বোধ করেন এবং শুধুমাত্র দেহ নিয়েই ব্যস্ত ও দেহ নিয়েই খেলা করেন এবং দেহই তাঁর একমাত্র জগৎরূপে বোধ হয় তখনই "অধিভূত" অবস্থা। আকাশ, বাতাস, আগুণ, জল ও মাটি এবং এদের গুণ বা সূক্ষ্ম অবস্থা যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এরাই হল তন্মাত্র এবং পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূতে মন থাকলেই অধিভূত ভাব। এই পঞ্চভূতে মন দিয়েই আত্মা জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি ক'রে জীবরূপে নিজেকে তার মধ্যে বন্দী করে ফেলেছেন। এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে কর্ম্মফল প্রাপ্তিতে জীব ভূতময় হয়ে আপনাকে জাত, মৃত ইত্যাদি ভাবে ধারণা করতে বাধ্য হয় এবং ভূতাশ্রয়ে জীব নিজত্ব বা আত্মত্বকেও ভূতবৎ উপলব্ধি করে বলেই জীবের এই অধ্যাত্ম ক্ষর ভাবটিকে প্রকাশ রাখাই অধিভূতত্ব। স্থাবর – জঙ্গমাত্মক (static & kinetic) সব কিছুই পরমাত্মার তন্মাত্রাজ্ঞানজাত ভূত, আর এই ভূতত্ব আশ্রয় করে অবিদ্যাময় করে রাখাটাই অধিভূত পুরুষের ধর্ম্ম এবং ক্ষরণশীলতার কারণ। এখানে পাঠক প্রশ্ন করবেন সবই তো বুঝলাম এখন এই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার বা মুক্তির উপায় কি ? উপায় আছে। "বিষস্য বিষমৌষধম্" (Similia Similibus curantur)। বিষ নিবারণের ঔষধই হল বিষ। যে পঞ্চভূতে জড়িত হয়ে গুটিপোকার মত নিজেরাই নিজেদের বেঁধে ফেলেছি তেমনিভাবে ঐ পঞ্চতত্ত্বেই মন রেখে সাধন ক'রে সেই বাঁধন কেটেই নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

(৫) অধিদৈব ঃ- আমাদের দেহরূপ পুরমধ্যে যে চৈতন্যরূপ আকাশ বা চিদাকাশ আছেন তিনিই অধিদৈব। অনন্তকে চট করে দেখা বা বোঝা যায় না কিন্তু অনন্ত যখন অন্তআকারে বা ছোট আকারে নিজেকে প্রকাশ করেন তখনই দেখা বা বোঝা যায়। সূর্য্যের দিকে স্বাভাবিকভাবে তাকান যায় না ঠিকই কিন্তু ভূসো কালি মাখান কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় বা পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হলে দেখা যায়। সেই রকম দেহপুরমধ্যে যে চিরজ্যোতির প্রকাশ দেখা যায় তাইই অধিদৈব পুরুষ। জ্যোতি পুরুষ কেন ? যেহেতু তিনি দেহরূপ পুরে শয়ন করে থাকেন সেজন্যই তিনি পুরুষ এবং এই আদি পুরুষই অধিদৈব। এই কূটস্থ তেজঃ, অপ, অন্নস্বরূপ, তিনিই, গায়ত্রী, পরম সূক্ষ্ম ধ্বনিরূপা নিত্যা, ইনিই দুর্গা, এই শরীর রূপ দুর্গে রয়েছেন। সেই কূটস্থ ব্রহ্ম অমৃত অক্ষর ও সূর্য্যস্বরূপ। সেই সূর্য্যই বরণীয় শক্তি। তাঁর উপাসনাতে মধুর রসের মত রস অনুভব হয়। এই উপাসনা দ্বারা বিদ্যা, শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তিরূপা চার প্রকারের শক্তি প্রকাশিত হয়। এরা সমস্তই ওঁ কার ধ্বনির আশ্রয়েই থাকে। "শক্তি প্রথমসম্ভূতা গায়ত্রী সা পদোত্তমা" (বায়ুপুরাণ), সংক্ষেপে আদিদেব অক্ষরব্রহ্মই ব্যক্তকালে অধিদৈব পুরুষ নামে পরিচিত। এখানে পাঠক একটু সাহস করে প্রশ্নটা করেই ফেলুন যে কিভাবে এই মহাপুরুষকে দেখা, জানা, বোঝা ও লাভ করা যায় ? মাহেশ্বরী শক্তিদ্বারায় ওই রকম দর্শন ও প্রাপ্তি ঘটে। এখন বলুন মাহেশ্বরী শক্তিটা আবার কি বস্তু ? মাহেশ্বরী শক্তি হল এক পরাশক্তি যা উপাধিযোগে বহুরূপা হয়ে থাকেন। আত্মকর্ম্মের দ্বারা শ্বাস প্রথমে ব্রহ্মযোনীর মধ্যে প্রবিষ্টা হলে গায়ত্রী পদ পেয়ে থাকেন। এই ব্রহ্মযোনির মধ্যে (মস্তকে শ্বাস স্থির করা) অধিক দিন ধরে স্থিতির অভ্যাস করলে শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি এই শক্তির অনুভব হয়। এই চার মূর্ত্তিই মহাদেবের, যা জগতের ভিতরে ও বাইরে আছেন। এতেই আত্মানন্দলাভ হয়। এখানে বেশি বলার অসুবিধা হল যে বলতে গেলে ক্রমশঃ হেঁয়ালীতে পরিণত হবার আশঙ্কা থাকে। তখন বিজ্ঞান যদি বুদ্ধির অগম্য হয় তাহলেই তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাই এই ব্যবহারিক (practical) বিদ্যা বিষয়ে আর বললাম না।

(৬) অধিযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ঃ- পূর্ব্ব কথিত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষে যা কিছুই কর্ম্মাকারে প্রকাশ হচ্ছে সে সকল কর্ম্মমাত্রই মূলতঃ ব্রহ্মযজ্ঞ। পরমাত্মতত্ত্বই তার উপাদান, তার প্রকৃত অধীশ্বর। সেজন্য পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ। মহদ্ব্রহ্মে এবং জীবদেহে যজ্ঞাধিরূঢ় প্রকৃতপক্ষে তিনিই। যোগী এই অধিষ্ঠাতার দর্শন পান প্রথম কূটস্থে। তাই কূটস্থই প্রথম সবিতা, ক্রিয়ার পরাবস্থা দ্বিতীয় সবিতা, আর তৃতীয় সবিতা পরমজ্যোতিঃ, সত্যব্রহ্ম। ইনিই অধিযজ্ঞ পুরুষ। আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ।

(৭) অধিযজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকার আর নতুন কিছুই নয়। অধিযজ্ঞপুরুষের পরিচয় লাভের পর তাঁতে মন রেখে সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত অধিযজ্ঞের অনুষ্ঠান। তোমার হৃদয়ই তোমার যজ্ঞভূমি বা যজ্ঞকর্ম্মের ক্ষেত্র বিশেষ। আত্মভাবই এই ভূমির প্রধান ভাব। এইখানে তুমি আত্মদান ও আত্ম আহরণরূপ কর্ম্মে বা যজ্ঞে নিয়তই যুক্ত আছ। এই যজ্ঞের অনুভূতির ফলস্বরূপ তোমার গতি নির্দ্ধারিত হয়। নিজের প্রীতির (satisfaction) জন্য এই যজ্ঞ সম্পাদন করছ মনে করলেও তোমার নিজত্বের আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মাই এতে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন অথচ তুমি নিজেকে প্রকৃত যজ্ঞভোক্তারূপে দেখছ। তোমার এই প্রীতিময় যজ্ঞশীল আয়তনে আত্মবোধ জড়িয়ে থাকার জন্যই এমনটা হচ্ছে। তাই আত্মভাব এ যজ্ঞভূমির প্রধান ভাব হলেও এ ভূমিতে পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ। আরও সোজা করে বললে বলতে হয়, যে ভগবান সকলের দেহমধ্যেই গুপ্তভাবে থেকে এই যজ্ঞ গ্রহণ করছেন তিনিই অধিযজ্ঞ ॥ ৮/৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।। ৫

অনুবাদ: অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। ৮/৫

ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ প্রশ্ন ছিল নিয়তচিত্ত পুরুষগণের অন্তকালে কিভাবে তুমি তাঁদের জ্ঞেয় হও ? অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলছেন অন্তকালে কূটস্থকে স্মরণ করে যে কেউ শরীর ত্যাগ করে সে আমাতেই মন থাকার জন্য আমারই ভাবে অর্থাৎ আমাতেই স্থিতি হ'য়ে মুক্ত হয়। আসলে এই লয়যোগ অভ্যাস করলে এমনতর অনুভব রোজই হয়। আর যাঁরা এতটা উন্নতি করে উঠতে পারেননি অথচ দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করেন এবং বেশ নিষ্ঠাবান সাধক তাঁরা এমন নিত্য স্থিতি লাভ করতে না পারলেও স্মরণাভ্যাসে দৃঢ় হলে মানে অধ্যাত্মভাব, ব্রহ্মভাব ও কর্ম্মময়ভাব বিজ্ঞাত হলে মৃত্যুকালে অবশ্যই ভগবদ্ ভাব হৃদয়ে উদিত হবে। কর্ম্মময় বা অধিযজ্ঞ ভাবে ভগবানকে জানলে প্রত্যেক কাজে ভগবানকেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হিসাবে দেখতে পাবে। এই পরমাত্মপ্রীতিই সর্ব্বকর্ম্মের সার বিজ্ঞান। আর যাঁরা ভগবানকে অধিদৈব বা সর্ব্বশক্তিময় অক্ষরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভাবে জেনেছেন তাঁরা বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিবর্ত্তনে, বিশেষ বিশেষ গতির পরিবর্ত্তনে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, জরা, দেহত্যাগ অথবা সুপ্তি, স্বপ্ন, জাগরণ অথবা জীবন হতে মরণে তিনিই যে অক্ষর পরমেশ্বর – জীবের গতাগতির একমাত্র কারণ এটা বুঝেছেন, প্রয়াণকালে তাঁদের হৃদয়ে যে ভগবৎ স্মরণ অবশ্যই আসবে এটা আর বিচিত্র কি ? এছাড়া ক্রিয়াবানদের একটা বিশেষ সুবিধা হল অন্তকালে কূটস্থের স্মৃতি উদয় হলে তাতেই মন থাকে, আর অন্য চিন্তা থাকে না ফলে মনের আত্মাকারে স্থিতি হয়, সে অবস্থায় প্রাণ বের হলে পরাবস্থা বা মোক্ষলাভ তো হবেই। "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার স্থান হৃদয়, মৃত্যুকালে সেই হৃদয়ের অগ্রভাগের জ্বলন দ্বারা দীপ্তি হয়। সেই তেজমালা হৃদয় হতে চক্ষু, ওষ্ঠ, মুর্দ্ধা ইত্যাদি দ্বার হতে উৎক্রমণ ক'রে, সেই হৃদয় প্রকাশিত দ্বারে জানার জোরে পরমাবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে সামর্থ্য তার প্রভাবে অনুস্মৃতি যোগের দ্বারা শেষে ব্রহ্মে গতি হয়।" আজকাল তো মরণকালেও শান্তি নেই। ডাক্তারের কাটা, ছেঁড়া, অপারেশন করতে করতে হসপিটাল বা নার্সিং হোমে বিবিধ অবস্থায় লোক মারা যায়। অনেকে হয়ত তার মৃত্যুকাল বা মৃত্যু বিষয়ে সম্যক জানতেই পারে না। এখনও সুদুর গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুকালে জীবকে নাম শুনায়, যদি তার জ্ঞান থাকে তাতে কিছুটা উপকার তো হয়ই। কিন্তু নিরহঙ্কারী, নিত্য সাধনশীল, ভগবদর্পিতচিত্ত সাধকের মৃত্যু সময়ে অজ্ঞান আসে না। শরীরে কষ্টের জন্য বিক্ষেপ আসে কিন্তু তবু সে ভগবানকে ভোলে না। জন্মের দ্বারা যেমন নবজীবন লাভ হয় মৃত্যুতেও তাই হয়। মৃত্যু মানেই শেষ নয়। অন্তিম মুহূর্ত্তে আমাদের চৈতন্য (sense) যে চিন্তা ও ভাবে পূর্ণ থাকে এ শরীর ছেড়ে সেই অনুযায়ী আমরা নবজীবন লাভ করি। সুতরাং যাঁরা পুরুষোত্তমকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তাঁরা তাঁরই ভাবগতি পেয়ে থাকেন। সেটাই হয় কর্ম্মের শেষ পরিণতি। শেষ সময়ে এমন স্মরণ করার জন্যই চাই সারা জীবনের সাধনা। রোদ্দুর থাকতেই ধান শুকিয়ে নিতে হয়। তেমনি সময় থাকতেই শ্রীগুরুদেবের পদতলে বসে স্মরণ করার

সকল কৌশল আয়ত্ত করে নিতে হয়। নইলে শুধুমাত্র মরণকালে হরির নাম করে লাভ বিশেষ একটা হয় না। ৮/৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ।। ৬

অনুবাদ: যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই ভাবে (ভাবনায়) চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় তাহারা সেই সেই ভাবই পায়। ৮/৬

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে মৃত্যুর পর ভগবৎ লোকই লাভ হয় এই কথা বলে শ্রীভগবান এখন এই শ্লোকে কেন সেটা হয়, কেন এমন হয় সেই বিজ্ঞান বর্ণনা করছেন। বলছেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করলেই আমার ভাব পায় এমনটাই নয়, জীব তার জীবদ্দশায় সর্ব্বদা যে ভাব অবলম্বন করে বিচরণ করে মৃত্যুকালে সেই ভাবটাই বিশেষভাবে তার অন্তরে উদিত হবে এটাই বিজ্ঞান। শুধু ভগবৎ স্মরণই নয়, সকলভাব সম্বন্ধেই এই এক বিজ্ঞান। মৃত্যুর সময় জীব তার মন প্রাণ ও শরীরের উপর নিজের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যেমন স্বপ্নের উপর মানুষের কোনও কর্তৃত্ব থাকে না, নিয়ন্ত্রণ থাকে না বলেই শিশুর শয্যামুত্র তথা যুবকের সুপ্তিস্খলনাদি হয়ে থাকে। ইচ্ছামত বা নিজের চেষ্টামত স্বপ্ন যেমন দেখা যায় না তেমনই মৃত্যুসময়ে নিজের চেষ্টায় বা ইচ্ছায় কোনও অভীষ্ট ভাবকে জাগ্রত করে রাখা যায় না। নতুন কোনও সদ্ ভাব বা সৎ চিন্তা করা তো দূরের কথা বরং জীবনে সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে যে ভাবেতে সে বিহার করত সেই ভাব তার স্বভাবগত হয়ে যায় বলে সেই অবশ, শক্তিহীন অবস্থায় সেই ভাবই তার অন্তরে প্রকাশ পায়। তখন তার আর মন বা চিন্তা, ভাবনা কোন কিছুরই উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। তাই মৃত্যুর আগে অতি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকেও মুরগির মাংস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শোনা যায় এবং সেই মুরগি মাংস খাওয়ার পরই সে দেহত্যাগ করে। এটাই সেই রহস্য। মরণ মুহূর্ত্তের চিন্তাশক্তি অতিশয় প্রবল। মৃত্যুসময় উপস্থিত হলে চিত্তের ব্যাকুলতা বশতঃ বহুভাবনা একসাথে চলে আসে কিন্তু ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় ও মন নিস্তেজ হয়ে যায়, তখন মনের মধ্যে অবশভাবে কতকগুলো চিন্তার উদয় হয়। সেগুলোই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের চিন্তা বা অনুধ্যান। কারণ তখন আর এ চিন্তা করব না বা ঐ চিন্তা করব না এ অবস্থা থাকে না। শুধু অবশভাবে কৃতকর্ম্মের প্রতিচ্ছবি গুলো মনের পর্দ্দায় ফুটে উঠতে থাকে। ক্রমশঃ সেই সব চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে দলা হয়ে পিণ্ডাকারে যেন সামনে ভাসতে থাকে মুমূর্ষু তখন যেন তার ভিতরে প্রবেশ করে তাইই হয়ে যান। সেজন্যই ভগবান বলছেন মরবার সময় যে যে ভাবেতে থাকে তার সেই ভাবাপন্ন পরজন্ম হয়। আর এজন্যই প্রত্যেকের দেহ তার নিজের নিজের

ভাব অনুরূপ হয়ে থাকে। এই ভাব আবার কর্ম্ম অনুসারে উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম শক্তি প্রয়োগের তারতম্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। কর্ম্ম, ভাব ও শক্তির ফলনজাত সমীকরণ অনুসারে জীবের সেই সেই ভাবযুক্ত দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় গঠিত হয়। যে পুরুষ অনুকম্পাযুক্ত তার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গঠন একরকম। আবার যে ক্রূর তার দেহ মন ও ইন্দ্রিয়গঠন আর একরকম। এভাবেই কর্ম্মজাত সংস্কার অনুযায়ী দেহ লাভ হয়ে থাকে। এক জন্মের দস্যুবৃত্তি করা ডাকাত পরজন্মে আসুরিক শক্তিলাভের ব্যতিক্রমে পরজন্মে কসাই বা রাজনীতিক এর বৃত্তি গ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মসংস্কারই তাকে সেভাবে পরিচালিত করে থাকে। বাইরে থেকে সবসময়ে বুঝতে না পারলেও সূক্ষ্মদর্শীদের কাছে এটা ধরা পড়ে। সরলমতি শিশুও সহজে বুঝতে পারে কে তাকে ভালবাসে আর কে তাকে ভালবাসে না। ভাবনা চিন্তা দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে আমাদেরও অন্তঃ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। এজন্য আমাদের যেমন কর্ম্মসংস্কার বা ভাবনা থাকে, মৃত্যুর পর তেমন দেহই আমরা পেয়ে থাকি। জীবদ্দশায় বহু ভাব পরিবর্ত্তন হলেও একই দেহে থাকার জন্য একআধটু সাময়িক পরিবর্ত্তন হলেও স্থায়ী পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু মরার সময়ে যখন এ দেহটা ছেড়ে যাচ্ছি তখন মুত্যুকালের ভাবটা সেই সূক্ষ্ম দেহে স্থায়ী হয়ে যায়। কারণ, দেহে ফিরে এলে,যে পরিবর্ত্তনটা হতে পারত শারীরিক মৃত্যুর জন্য সেটা আর হতে পারল না। তাই মৃত্যুকালীন চিন্তার অনুরূপ ভাবটাই স্থায়ী হয়ে রইল মানে মনোময় সূক্ষ্ম শরীরটা সেইভাবেই ভাবিত (influentially impressed) হয়ে রইল। এই অবস্থায় যে সময় অতিক্রম করতে হয় বই পুস্তকের ভাষায় সেটাই পরলোক, সেই সমস্ত process এর পর আবার কর্ম্মের ভোগায়তন রূপ স্থূলদেহ সেই মৃত্যুকালীন ভাবময় বা মনোময় সূক্ষশরীরের অনুরূপেই তৈরী হতে থাকে। এটাই বিজ্ঞান যা হল ঐশ্বরিক বিধান। পাশ্চাত্য দার্শনিক চার্লস্ ডারউইনও এ কথাই বলেছিলেন যা তখন সবাই বুঝে উঠতে পারেন নি। সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গ শরীরেই জীবের শুভ অশুভ সকল কর্ম্মের সংস্কার নিহিত থাকে। এই সংস্কারের ভোগ সম্পাদনের জন্য প্রকৃতি সেইরকম উপযুক্ত স্থূলদেহই তৈরী করে নেয়। তাই মহাভারতে ও বিভিন্ন গ্রন্থে, গল্পে দেখা যায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেও রাজা ভরত মৃত্যুকালে হরিণশিশুর চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকায় তাঁকে হরিণজন্ম পেতে হয়েছিল। আবার নন্দিকেশ্বর সর্ব্বদা শিবের ভাবনা করায় সেই দেহেই তিনি শিবরূপ পেয়েছিলেন। এজন্মের গভীর অভিনিবেশ দ্বারা এজন্মেই পরিবর্তনের অনেক কথাই গল্পে কাহিনীতে পাওয়া যায়, তন্ময়তার এতই প্রভাব। তাই সাধনার দ্বারা মন যে আত্মার সাথে তন্ময়তা লাভ ক'রে আত্মারাম হয়ে যেতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। আত্মাই ভাব হতে ভাবান্তরে, লোক হতে লোকান্তরে জীবকে পরিচালনা করেন। জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলকেই স্বভাব অনুসারে এইভাবে ক্ষেত্রদান করে ভোগে ও মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একসাথে, একই সময়ে তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপ জীবের ত্রিকালদ্রষ্টা। এই যুগপৎ ত্রিকালজ্ঞানই তারকজ্ঞান। এটাই তারকব্রহ্মতত্ত্ব। এটা বোঝার চেষ্টা করুন। আমাদের চৈতন্য সৃজনীশক্তিময়। সর্ব্বদা যেমনভাবে যা কিছু চিন্তা করি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যাতে নিবিষ্ট হই, অভ্যন্তরীণ সত্তাও তাতেই গড়ে ওঠে। কথায় বলে "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ"। "যস্য ভাবনা যদৃশী তাদৃশী" মৃত্যুর সংকট মূহূর্ত্তে মনের অবস্থা কেমন থাকবে তারই ওপর গীতা বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। সারাজীবন কিছু চেষ্টা না করে বুড়ো বয়সে কাশীবাস অথবা মরণকালে হরিনাম শোনালে বা গঙ্গাতীরে নিয়ে রেখে দেওয়া, অন্তর্জলি, প্রভৃতি, দেওয়া এসবই ভ্রান্ত কুসংস্কার। মৃত্যুকালে যে দিব্যভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট করতে হবে, সারা জীবন ধরে চিন্তায় ও কর্ম্মে তারই জন্য প্রস্তুত হতে হয় এবং এরই জন্যে গুরু অনুসন্ধান ও দীক্ষা গ্রহণ, সেবা, বন্দনা, দীনতা ইত্যাদি যত কিছু ॥ ৮/৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ।
ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ।। ৭

অনুবাদ: অতএব সর্ব্বদা আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর)। আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে। (অর্থাৎ তুমি আমিই হইয়া যাইবে।) ৮/৭

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে অত কথা বলার পরেও ভগবান এই শ্লোকের অবতারণা করেছেন কারণ কেউ কেউ মনে করতে পারেন বা মনে করেও থাকেন যে সারা জীবন এসব ভগবানের চিন্তা না করে মরণকালে একবার তাঁকে ভাবতে পারলেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়। কিন্তু সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দিয়ে যেমন পরীক্ষায় পাশ করা যায় না, তেমনি চিরজীবন ফাঁকি দিয়ে আসন্ন মৃত্যু সময়ে তাঁকে স্মরণ করে তুমি পার হয়ে যাবে তেমনটা মোটেই ভেব না। যদি কখনও কোথাও এমনটা ঘটে থাকে তবে তার মূলে কোনও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার থেকে থাকতে পারে। তাই বলে সকলেরই যে এমনটা হবে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। সেজন্য নিজের সাধ্যের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্তকে উপেক্ষা করে সময় নষ্ট করলে শুধুমাত্র ঠকেই যেতে হবে। তাই নিজের তারকব্রহ্ম স্বরূপ ত্রিবিধভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমানতায় পরিস্ফুট করে কর্ম্ম করাই যে যুক্তিসঙ্গত সে কথাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন। সেজন্যই তিন মূর্ত্তিতে আমাকে দেখাই তোমাকে অবশ্য অনুশীলন করতে হবে। এজন্যই যুদ্ধ কর। মানে প্রাণপণে চেষ্টা কর, সাধন অভ্যাস থেকে বিরত হয়ো না। সাধকের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ, মানে প্রাণপণে সাধনাভ্যাস। যে সর্ব্বদা মন দিয়ে ক্রিয়া করে তাঁর মন আত্মস্থ হয়ে যায়। আত্মসমর্পণ এরই নামান্তর। এই সমর্পণ যার ঠিক ঠিক হয়ে গেছে তার আর বহির্দৃষ্টি থাকে না। এজন্য প্রত্যেক শ্বাসটি যাতে বিফলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রতি শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ হওয়া চাই। সাধকপ্রবর সন্ত কবীরদাসজী বলেছেন, "কাহে ভরোসা দেহকা, বিনাশি যায় ছিনমাহি। শ্বাস শ্বাস সুমিরণ করো আউর উপায় কুছ নাহি ॥" এজন্যই ভগবান বললেন "স্মরণ কর"। কিন্তু স্মরণেও বহু বিঘ্ন আসবে, তাই যুদ্ধ

কর, মানে প্রাণপণে চেষ্টা কর। প্রবৃত্তিপক্ষীয় বাসনারাশি পালিয়ে যাবে। যাঁর সর্ব্বকালে বিবশ হয়ে এমনভাবে স্মরণ চলতে থাকে তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। "সর্বেষু কালেষু" মানে সকল কালে আমায় অনুস্মরণ কর। তিন প্রজ্ঞাভূমিতেই, যথা – অধ্যাত্মক্ষেত্র বা ভূত (অতীত), কর্ম্ম বা হৃদয় (বর্তমান) এবং ব্রহ্ম বা অধিদৈব, যা ভবিষ্যত কালজ্ঞাপক, আমাকে দেখ, তবে ত্রিকালেই আমাকে দেখা হবে। এভাবেই তাঁতে মনকে যোজনা করতে হবে। এমন সংযোগের চেষ্টাতেই ভূতশুদ্ধি হয়। আর ভূতশুদ্ধি হলে পরে সবই ব্রহ্মময় হয়ে যায়। এই অবস্থাতে তুমি নিঃসংশয়রূপে আমাকে পাবে অর্থাৎ'আমি'ই হয়ে যাবে, আর'তুমি' থাকবে না। তিন স্তরেই তোমার ভগবদনুভূতি পরিস্ফুটিত হবে ॥ ৮/৭

অভ্যাসযোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ।। ৮

অনুবাদ: হে পার্থ, অভ্যাস–যোগদ্বারা একাগ্র এবং অনন্যগামী (চাঞ্চল্য রহিত) চিত্ত দ্বারা পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮/৮

ব্যাখ্যা: আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যাঁর চেষ্টা আছে এমন যত্নবান পুরুষ ভগবানকে ত্রিবিধরূপে জানতে পারে। সেই চেষ্টা বা যত্নটা কেমন আর জানতে পারাটাই বা কেমন সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। নিজের চেতনা যখন অন্য বিষয়াভিমুখে ছুটে যাবে না, নিজের মন, চৈতন্য সবকিছু তোমারই ভিতরে স্থিত হবে, একমাত্র তখনই নিজের ধ্যেয় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাবে, তৎসারূপ্য লাভ করবে, আপনাকে সেই ধ্যেয় বলে অনুভব করবে এবং এভাবেই তুমি সেই দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করবে। এটাই চেতনার ধর্ম্ম। প্রত্যয়বিশেষে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হওয়ার নামই অভ্যাস। এমনভাবে অভ্যাস করলে চিত্ত আর বহির্মুখী হয় না, আত্মাতেই লেগে আটকে থাকে। তাই আর মন অন্যদিকে যায়না। বারোটা উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা সাময়িক একাগ্রতা হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত অভ্যাসযোগদ্বারা প্রাণকর্ম্ম করতে করতে বারোটা উত্তম প্রাণকর্ম্মে প্রত্যাহার (প্রবৃত্তি হতে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া ও নিবৃত্তিতে মনের একাগ্রতা) হলে পরে ১৭২৮ টি উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা ধ্যানের ক্ষমতা হয়, যখন অনন্যগামী স্থিরচিত্ত দ্বারা কূটস্থের অভ্যন্তরস্থ মহাপ্রাণরূপী পরমপুরুষকে চিন্তা করার নামই দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান। এভাবে চিন্তা করতে করতেই সেই পরমপুরুষকে পাওয়া যায়। গুরুপদেশে যে কোনও ভাব গ্রহণ করে তোমার জ্ঞানশক্তিকে একধারায় (Unidirectionally) পরিচালিত করবে। সেই ভাবটি একধারায় প্রবাহিত রাখতে পারলেই তুমি দেখবে, তুমি আপনিই তদ্ভাবময় হয়ে গেছ, তোমার আত্মপ্রত্যয়টি তাঁতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে, তুমি তখন নিজেকে সেই ভাবময় বলেই অনুভব করছ। এটাই ভাবে অনুপ্রবেশ, এই হল অনুচিন্তা, ধ্যান সাহায্যে ধ্যেয়ের সারূপ্যলাভ। অধ্যাত্মভূমিতে এইভাবে ভগবদ্ভাবে সারূপ্যলাভ অভ্যস্ত হলেই অধিদৈবে তাঁকে পাওয়া যাবে। কূটস্থে চিত্তস্থিতির প্রযত্নই অভ্যাস। অভ্যাস ও ব্রহ্মবিচার আলাদা কিছু নয়। ব্রহ্মসত্তায় অবস্থানের প্রযত্নই ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্মে বিচরণ, বসে বসে বেদান্তের মৌখিক আলোচনা করা বা কূট তর্কের নাম ব্রহ্মবিচার নয় ॥ ৮/৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।।৯

অনুবাদ: সেই কবি (সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ) পুরাণ (অনাদি) অনুশাসিতা (নিয়ন্তা) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের পালন কর্ত্তা, মলিন মনোবুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পর বর্ত্তমান, সূর্য্যসম ভাস্বর। (তাঁকে অনুস্মরণ করিলে প্রাপ্ত হয়।) ৮/৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে কথিত সেই স্মরণীয় পরম দিব্য পুরুষ সম্বন্ধে ভগবান এই দুটো শ্লোকে আবার বলছেন যে সেই স্মরণীয় পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যা নির্মাতা, অনাদিসিদ্ধ নিয়ন্তা সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, মন যাকে মনন করতে পারে না। অর্থাৎ মন সেই ব্রহ্মাণুর নিকট অতি স্থূল। স্থূল মন সেই ব্রহ্মাণুর ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। তাই অণু হতে অণুব্রহ্মের দর্শন হয়না। মুণ্ডকোপনিষদে আছে –

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচ্য নানৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
এষোহনুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ॥"

যার অর্থটা এমন – রূপ না থাকায় দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, অনির্ব্বচনীয়তার জন্য বাক্য গ্রাহ্য নয়, অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারাও কোনও ভাবেই বোধগম্যও নয়, তপস্যা বা কর্ম্মদ্বারাও গ্রহণ করা যায়না। যে শরীরে এই প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হয়ে আছে, সেই শরীরস্থ হৃদয়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম এই আত্মাকে জানতে হবে। তাহলে এটুকু বুঝলাম যে এই পরম পুরুষ তাঁর কালাতীত সত্তায় সকল প্রপঞ্চের বহু ঊর্দ্ধে বিরাজিত, পরম অব্যক্ত। কিন্তু তিনি শুধুই অরূপ বা অনির্দ্দেশ্য নন। কেবল তাঁর সূক্ষ্মতা আমাদের মনের অগোচর, তাঁর রূপ আমাদের চিন্তার অতীত তিনি অনন্ত দৃষ্টি ও জ্ঞানে এ জগৎ পরিচালনা করছেন এবং সকল জিনিষকে নিজের সত্তার মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করছেন। তোমার ভূমিত্বের তিনটে স্তর আছে এটা সুস্পষ্ট করে আগেই বলেছি। তার মধ্যে তোমার ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, তোমার সমস্ত শক্তি ও ভোগের পরিচালক, তোমার সমস্ত বিজ্ঞাতারূপে যে অধিষ্ঠান তাঁর নাম অক্ষর পুরুষ বা পরম পুরুষ। তাঁরই দর্শন, শ্রবণ, বিজ্ঞাত হওয়া, হৃদয়ময় হওয়া, ইত্যাদি শক্তির কর্ম্মফল অনুযায়ী অংশটুকু নিয়ে তুমি দ্রষ্টা, শ্রোতা ও বিজ্ঞাতা হয়ে রয়েছ। তাঁর প্রাণ নিয়ে তুমি প্রাণী,

তাঁর হৃদয় নিয়ে তুমি হৃদয়বান, তাঁর শক্তি নিয়ে তুমি শক্তিমান। প্রতিটি জীবের সারা জীবনের অনুভূতির ফলস্বরূপ তার দেহত্যাগের সময় প্রবলভাবে অঙ্কিত বিশিষ্ট অনুভূতিটাই আবির্ভূত হয় এবং সেই অনুযায়ী বিরাট এই অক্ষর পুরুষের বিশ্বরূপের সেই ধর্ম্মপ্রধান জায়গাটিতে যে এই অক্ষরপুরুষের দ্বারাই নীত হয় এটা সহজেই বুঝতে পার। কারণ তোমার অন্তরে যিনি অক্ষর এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরেও তিনিই অক্ষরব্রহ্ম। যদিও তোমার কাছে তিনি তোমার একার ঈশ্বর, তোমার একার সবকিছুর জ্ঞাতা এভাবেই প্রথমে তিনি তোমার মাঝে প্রতিভাত হন। তিনি সমস্ত কালক্রমের জ্ঞাতা। তোমার চাইতে অনেক বেশী সূক্ষ্মভাবে তোমার তুমিত্বের অন্তরে থেকে তোমায় চালাচ্ছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাই তিনি "অনোরনীয়ান্" রূপে তোমার মাঝে পরিলক্ষিত। যদি দেহত্যাগের সময় সেই অনোরনীয়ান্ মূর্ত্তিটী অনুস্মরণ করতে সক্ষম হও, বা যদি তাতেই আত্মভাব পেতে বা উপলব্ধি করতে পার, তখন তুমি নিজেকেই "অনোরনীয়ান্" ভাবে উপলব্ধি করবে। এরই জন্য সময় থাকতে গুরুপদেশে চিত্তশুদ্ধি করে নিতে হয়। বিশ্বভ্রমণকারী এই মনকে ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়ে স্থিতি লাভ করাতে হয়। নইলে সেই অচিন্ত্যরূপ, সূর্য্যসম ভাস্বর দিব্যরূপ দেখবেন কি করে ? এ জন্যই শ্লোকে "অদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে ॥ ৮/৯

> প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
> ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।। ১০

অনুবাদ: প্রয়াণকালে (অন্তকালে) ভক্তিযুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে যোগবল দ্বারা সুষুম্না পথে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশিত করিয়া যিনি ধ্যান করেন তিনি সেই দিব্য পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৮/১০

ব্যাখ্যা: এপর্য্যন্ত ভগবান সাধারণ জীবসকলের অক্ষরপুরুষ প্রাপ্তির বিজ্ঞান বর্ণনা করেছেন। এবার যাঁরা অভ্যাসযোগের দ্বারা অধিভূত, অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব ভাব ধারণায় কৃতকার্য্য হয়েছেন এবং নিত্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই অক্ষরভাবে যুক্ত হতে সমর্থ হয়েছেন সেই যোগীরা প্রয়াণকালে কি ভাব অবলম্বন করে দেহত্যাগ করবেন সে কথাই বলছেন। সাধারণ মানুষের মৃত্যু ও যোগীর মৃত্যুতে বেশ পার্থক্য আছে। বাদরায়ন বেদান্তসূত্রে বলেছেন যে জীবের মরণকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও প্রাণবৃত্তি সূক্ষ্মদেহে এসে সম্পিন্ডিত হয়। তাই জীব মৃত্যুকালে সূক্ষ্মশরীর নিয়ে পরলোক গমন করে। সাধারণ মানুষ কর্ম্মাসক্ত ও কর্ম্মে লিপ্ত থাকায় কর্ম্মসংস্কারকে সঙ্গে নিয়েই স্থূলদেহ ত্যাগ করে। এবং বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা সমস্তই তার অনুগমন করে। এটা হল সাধারণ মানুষের মৃত্যু। আর যোগীর মৃত্যু কিরূপ ? যোগীও সাধারণ মানুষ তবে তিনি দৈনন্দিন জীবনে কিছু সময় যোগাভ্যাসে ব্যয় করেছেন, পরিণামে যতটা এগোতে পেরেছেন মৃত্যুকালীন অবস্থাও তেমনটাই হয়ে থাকে। পূর্ণজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষের মৃত্যুতে দেহ হতে উৎক্রান্তি হয় না, কারণ তার দেহ, মন, প্রাণ ব্রহ্মময় হয়েই থাকে। কিন্তু যাঁদের বিদেহ মুক্তি, মানে মৃত্যুর পর মুক্তি, ঘটে তাঁরাও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তবে তাঁদের জীবদ্দশায় সাধন বিষয়ে পৌরুষ প্রযত্নের ভেদ অনুসারে তাঁদের গতিরও হেরফের হয়। এর বিস্তারিত বিজ্ঞান বেদান্ত দর্শনের নিম্বার্ক ভায্যে আছে এখানে আলোচনা করে বাড়ালাম না। যাঁরা উৎসাহী তাঁরা পড়ে নেবেন। সংস্কৃতে মূল ভায্য পাঠে অসুবিধা হলে শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্ম্মাচৌধুরী কৃত অনুবাদ পড়লেও বুঝতে পারবেন। এখানে শুধুমাত্র সাধারণ পাঠকের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল শ্লোকের তাৎপর্য্যটা বলছি। ভগবান বলেছেন যোগীপুরুষ প্রয়াণকালে ভক্তিযুক্তভাবে অবিচলমনে যোগবলে ভ্রুমধ্যে প্রাণকে সম্যকভাবে স্থাপন করে তাঁকে লাভ করবেন। ঐ যে কপালের নিচে ও চোখের উপরে আকর্ন বিস্তৃত দুটো কেশ রেখাকে'ভ্রূ' বলে কেন 'ভ্রূ' শব্দ ভ্রমণ বাচক এবং ঐ ভ্রূ দুটো হল দৃষ্টির গতি নির্নায়ক। ভিতরে শব্দ বা নাদ অনুসরণে দৃষ্টি প্রবাহিত ও রূপান্বেষী হয়। দৃষ্টির গতি এমন শব্দ বা নাদাভিমুখী বলে ভ্রূ দুটো কানের দিকে প্রসারিত। এ জন্যই ভ্রুমধ্য বলতে অন্তর ও বাহ্য নামক দুই প্রজ্ঞার মধ্য বা সন্ধি বুঝতে হয়। অনন্তর অবাহ্য যে আত্মবোধ, ওটাই অন্তর্বাহ্য প্রজ্ঞার সন্ধিস্থল। বেদেও আছে যা প্রাণ তাই প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা তাই প্রাণ। এজন্যই জ্ঞান ও প্রাণের অন্তর্ব্বাহ্য গতি ও তার সন্ধিক্ষেত্র ভ্রমধ্যস্থলকে আত্মবোধের বাহ্য প্রতীকভূমি রূপে লক্ষ্য করা হয়। আর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুচ্ছের সন্ধিও ঠিক পিছনে। সেদিক থেকে ওটাও স্থূল অন্তর্বাহ্যসন্ধি। সুতরাং আত্মবোধে জীবভাবরূপ প্রাণপ্রবাহকে লীন করে দেওয়াই ভ্রমধ্যে প্রাণস্থাপন। এভাবে প্রাণস্থাপন করতে পারলে স্থূলতর সমস্ত শরীরক্রিয়া জ্ঞানে ও জ্ঞান আত্মবোধে আপনা থেকেই যুক্ত হতে থাকে। যখন সমস্ত শক্তিসহ জীবভাব এই প্রক্রিয়ায় কূটস্থ হবার পথে হৃদয় থেকে উঠতে উঠতে হৃদয়স্থ অপুনর্ভবা নামক নাড়ী বা গতি প্রস্ফুটিত হয়, তখনই সঠিকভাবে আত্মস্থ হওয়া হয়। তখন আর সেই কূটস্থ স্থান থেকে নিচে গতি নামে না বা বাইরেও যায় না। হৃদয়ের যে চার রকম গতি আছে – রমা, অরমা, ইচ্ছা ও অপুনর্ভবা - এর মধ্যে অপুনর্ভবা গতিতেই "আমি আর ফিরবনা" এমন একটা হার্দ্য প্রজ্ঞা উজ্বল হয়ে উঠে জীবকে সেই উর্দ্ধে সংলগ্ন করে বা আটকে রেখে দেয়। পূর্ণমাত্রায় অসঙ্গ আত্মত্বের দর্শনেই এই প্রজ্ঞা আলো জ্বলে ওঠে। এটাই সেই অপুনর্ভবা। এই গতি ফুটলে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ, এবার ঠিক ঠিক কূটস্থ হওয়া হচ্ছে। প্রয়াণকালে এইভাবে সম্যকরূপে পরমপুরুষে বিলীন হবার চেষ্টা করতে হয় – যতক্ষণ না অধিদৈব পুরুষ তাঁকে শরীর থেকে ছাড়িয়ে নেন। এই হল সাধারণ মানুষ যাঁরা প্রত্যহ কিছু সময় গুরুপদেশে ব্যয় করেন, তাদের জন্য নুন্যতম প্রয়াণকালীন পদ্ধতি যা শ্রীভগবানের কথার মূল অর্থ। আর যাঁরা আরও বেশী করে সাধনা করে ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌঁছাতে পারেন তাঁরা তো আত্মার ঐশ্বর্য্যকেই লাভ করেন ও ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে যান। ওঁ কার ক্রিয়ার অভ্যাসে পটু হয়ে এক নিঃশ্বাসে কুড়ি হাজার সাতশত ছত্রিশ বার করতে পারলেই ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায়। এই সাধনায় যিনি সদাভ্যস্ত

তাঁর যোগবল উৎপন্ন হয়, দৃষ্টি হয় নিমেষহীন, নিশ্চল মন ও শ্বাস স্থির। এমনটা হলেই ঐ শক্তি হয়েছে বলে বুঝতে হয়। তখন প্রাণ মন আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত হয়ে জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডলের সাথে এক হয়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে দিব্য পুরুষের সাথে এক হয়ে যায়। এটাই পরমপদ প্রাপ্তি। প্রাচীনকালে ভীষ্মাদি যোগীগণ ও বর্ত্তমানে প্রণবানন্দ (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নন) যিনি তৎকালীন বি এন্ রেলওয়েতে কর্ম্মরত ছিলেন ও পরে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেছিলেন, এভাবে দেহত্যাগ করেছেন। নিজ নিজ সদ্‌গুরু সান্নিধ্যে তাঁর আদর্শক্রমেই এসব ক্রিয়াদি করতে হয়। পুস্তকপাঠে যোগাভ্যাস নিষিদ্ধ। যাহোক ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটানোর বিজ্ঞানটা প্রণবগীতা অবলম্বনে সংক্ষেপে বলছি। সুষুন্মা নাড়ী মূলাধার (চরৎৎবহরঁস) থেকে উঠে মস্তক গ্রন্থিতে গিয়ে দুভাগে ভাগ হয়েছে। একটা শাখা মস্তিষ্কের নিচে দিয়ে বেঁকে এসে ভ্রূর কাছে একটু ঊর্দ্ধমুখ হয়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে ইড়া পিঙ্গলার সাথে মিশেছে, আবার আর একটু উপরের দিকে উঠে কপালের ঠিক মাঝামাঝি এসে ভিতরে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্র পার হয়ে ভিতরে ঢুকে একটু ঝুলে পড়ে, অল্প বেঁকে উপরদিকে উঠে মস্তিষ্কে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আর দ্বিতীয় শাখাটা মস্তকগ্রন্থি থেকে উপর দিকে শিখর পর্য্যন্ত উঠে একটু অর্দ্ধবৃত্তাকারে ব্রহ্মরন্ধ্রে এসে ঢুকেছে। এই শাখাটার মুখ একেবারে বন্ধ কিন্তু অন্যটার খোলা। সুতরাং এক শাখার ছিদ্রের সাথে অন্য শাখার কোনও সংযোগ নেই। এখন যোগী যখন এক নিঃশ্বাসে ২০৭৩৬ বার ওঁ কার ক্রিয়া করেন তখন ঐ সুষুন্মাস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রগত বন্ধ মুখটা খুলে যায় ও উভয় শাখারই ছিদ্র এক হয়ে যায়। এরই নাম হল ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ বা ব্রহ্মরন্ধ্রফাটা বা চল্‌তি কথায় "ফুটে যাওয়া"। তবে বাস্তবে এমনভাবে দেহত্যাগ করাও সব যোগীদের দ্বারা সম্ভব হয় না। একমাত্র কুণ্ডলিনীশক্তিই হল প্রাণশক্তি "সা দেবী বায়বী শক্তিঃ"। এই শক্তি ধারণোপযোগী ফুসফুস তথা শরীর সাধন দ্বারা তৈরী করতে হয়। এই কুণ্ডলিনীশক্তি যাঁদের সদা জাগ্রত একমাত্র তাঁরাই চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তাঁদের পক্ষেই শুধু সম্ভব হতে পারে এমন ব্রহ্মরন্ধ্রভেদে দেহত্যাগ ॥ ৮/১০

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ।। ১১

অনুবাদ: ব্রহ্মজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, অনুরাগবিহীন যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সেই প্রাপ্য বস্তু সংক্ষেপে বলিতেছি। ৮/১১

ব্যাখ্যা: আলোচ্য শ্লোকে ভগবান কেবল অভ্যাসযোগ অপেক্ষা অক্ষরব্রহ্ম বাচক মন্ত্র অবলম্বনে সাধনের কথা অর্থাৎ প্রণবাভ্যাসের অন্তরঙ্গ বিধান সূচিত করছেন। গৃহী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সকলেই যে ব্রহ্মকে

জানার জন্য, পাওয়ার জন্য, ব্যাকুল সেই ব্রহ্মকে যে মন্ত্র দ্বারা সাধন করতে হয়, সংক্ষেপে বা বীজ আকারে তাঁর যা নাম এবং সেই নাম অবলম্বনে যে ভাবে তাঁর কাছাকাছি হতে হয় সেটাই বলছেন, যেহেতু সকলেই তাঁকে পাবার জন্যেই বিভিন্ন উপায় ধরে আছে। যেমন গৃহী তাঁকে পাবার জন্যই বেদবিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত, সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ধর্ম্মে নিযুক্ত এবং রাগময় কর্ম্মত্যাগী আর ব্রহ্মচারীও ব্রহ্মবোধে বিচরণের জন্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের শিক্ষানবিশী করেন। সুতরাং, ব্রহ্মই সকলের লক্ষ্য। যদিও বেদবিদ শব্দে এখানে গৃহীকেই স্থূল অর্থে বোঝায় যেহেতু তাঁরা বৈদিক অনুষ্ঠান নিয়ে সর্ব্বদা বেদেরই অনুধাবন করেন, সর্ব্বদা বৈদিক তত্ত্বই অনুশীলন করেন, জ্ঞাত হন এবং উপলব্ধি করেন। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে, মধ্য ও আধুনিক কালের সূচনা পর্য্যন্ত বেদবিৎ গৃহী ও পুরুষেরই জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চিত ছিল। কারণ ব্রহ্মের সঙ্গে ভূতাত্মা জগতের যে বীজ অঙ্কুর সম্বন্ধ সেটা স্মরণে রেখে তাঁরা সংসার কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্ম বলে বেদিত হয়ে (জ্ঞান করে) কর্ম্মযজ্ঞে যুক্ত থাকতেন। সেজন্য ভগবান "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামানুস্মর যুধ্য চ" বলে জীবকে এই গৃহস্থ ধর্ম্ম পালনেরই উপদেশ দিয়েছেন যেহেতু গৃহস্থ ধর্ম্ম পালনেই জীব তার নিজের মধ্যে ত্রিবিধভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করে। আর সেই দর্শনের ফলে সেই কর্ম্মী গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী হতেন, স্ত্রীসংযুক্ত হয়েও ব্রহ্মচারীই থাকতেন। সংস্কারগ্রন্থিতে যে ব্রহ্মে বিচরণ করে সবকিছু তিনিই, সকল শক্তি তাঁরই এবং তিনিই তার মধ্য দিয়ে আপনাকে বহু করতে প্রযুক্ত এটাই সে স্ত্রীসঙ্গে দেখে। সে হৃদয়ের অসঙ্গ আত্মদর্শনে অপনাকে দেখে এবং সংসারের সকল কাজকে ব্রহ্মকর্ম্ম বলে অনুভব করে বলে কর্ম্ম তাকে বহির্মুখী করতে পারে না, অন্তরে মূলে ব্রহ্মতত্ত্বেই পরিচালিত করে। গার্গী পুরুষ ছিলেন না, নারীই ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে – "হে গার্গী, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে"। বেদ মানে জানা। কূটস্থকে যারা জানে তারা ব্রহ্মেতেই থাকে। তাদের কাছে দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই "ওঁ' এই অক্ষরাত্মক। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন " ওম্ ইত্যেতৎ; তদেতৎ পদং যদ্ বুভুৎসিতং ত্বয়া, তদেতৎ ওম্ শব্দবাচ্যম্, ওম্ শব্দ প্রতীকঞ্চ" – অর্থাৎ যাহা তুমি বুঝিতে ইচ্ছা করিয়াছ "ওম্" সেই পদ "ওম্' শব্দে ব্রহ্ম "ওম্' শব্দ ব্রহ্মপ্রতীক – এই উভয়কেই সেই পদ বলে জানবে। (শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ)

এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীর, সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্মশরীর, এবং কারণশরীর এবং এর অতিরিক্ত যে (তুরীয় অবস্থা) নাদ, বিন্দু, কলা ও কলাতীত অবস্থা – একত্রে ওঁকার । বেদজ্ঞ যোগীরা এঁকেই কূটস্থ বলে জানেন। এই পরমপুরুষের সাথে মনের সংযোগই যোগ। ভুল ভ্রান্তি না করে, প্রমাদরহিত হয়ে যোগাভ্যাস করলে তাড়াতাড়িই ইচ্ছারহিত অবস্থা পাওয়া যায়। সেটাই পরমপদ। সেই পরমপদ প্রাপ্তির উপায় কি ? পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ৮/১১

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধণ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ।। ১২

অনুবাদ: সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার প্রত্যাহরণ করিয়া (ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া) এবং মনকে হৃদয়ে (বিনা অবলম্বনে) স্থির করিয়া আর ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে আপনার প্রাণকে রাখিয়া স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে হয় ॥ ৮/১২

ব্যাখ্যা: ইচ্ছারহিত অবস্থাপ্রাপ্তির উপায় যোগাভ্যাস। একমাত্র যোগাভ্যাস দ্বারাই সে অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। সেই উপায়ের বর্ণনা এই শ্লোকে। যদিও এটাই মূল তত্ত্ব, তথাপি এই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নারায়ণ ব্যতীত সম্ভব নয়। সেই সবিতৃমন্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ যিনি তোমারই মধ্যে আছেন। তবে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে যতক্ষণ সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হতে না পারছ, যতক্ষণ তাঁতে মিলতে না পারছ, অন্ততঃ ততক্ষণ অর্জুনের মত একজন কৃষ্ণকে বরণ করে নাও যিনি হবেন তোমার জীবনসখা, বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক, এ ভবার্ণবের কান্ডারী, যাঁর হাতে তুমি নিজের জীবন মরণের ভার স্বচ্ছন্দে তুলে দিতে পার, যদি তিনি কৃপাবশতঃ তোমার জন্য কিছু সময় দিতে রাজি থাকেন তবেই তুমি অন্ত তঃ চেষ্টাটা করতে পারো। সে চেষ্টারই প্রতিজ্ঞাত উপায় অঙ্গসহ ভগবান বলছেন। ইন্দ্রিয়সকলকে মনে মনে সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে, নিজের শিরোদেশে প্রাণ সন্নিবেশিত করে, যুক্ত হয়েওম্' এই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণে আমাকে অনুস্মরণ করে যে দেহত্যাগ করে চলে যায়, সে পরমাগতি লাভ করে। এটা বুঝবার আগে স্থূল শরীর সম্বন্ধ অবলম্বন করে দু চার কথা বলি। আধুনিক বিজ্ঞান থেকে এটুকু অন্ততঃ জানা যায় যে মস্তিষ্কের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির অতিসূক্ষ্ম কেন্দ্রসকল আছে। মাথার মধ্যে মাখনের মত শুভ্র ঘনপিণ্ড (gray matter) যাতে অসংখ্য কোষসকল সন্নিবিষ্ট এবং প্রতিটি কোষই এক এক স্বতন্ত্র বোধ ও শক্তি প্রকাশের কেন্দ্র স্বরূপ। দর্শন, শ্রবণ, শরীরাদি সঞ্চালন, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, অনুভব আদি সব কিছুরই কেন্দ্র ওই মস্তিষ্কে। যতকিছু জ্ঞান বিজ্ঞান মনে বা চেতনায় প্রকাশ হওয়া সম্ভব, পরম ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে তুচ্ছজ্ঞান পর্য্যন্ত, অলৌকিক যোগশক্তি থেকে সাধারণ রক্তসঞ্চালনশক্তি পর্য্যন্ত সমস্তই ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্রে অবস্থিত। ওই মস্তিষ্কের প্রেরণা ছাড়া একটা অনুভূতিও ফোটেনা। যেমন তোমার পায়ে মশা কামড়ালে তুমি পায়ের সে জায়গাটাই চুলকাও, হাত বা পিঠ চুলকাও না। পায়ে হোঁচট খেলে, মাথা ধরে ব্যাথারমূর্ত্তি আর ব্যাথা ভোগ করে পা। এটাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় ৎবভষবী বলে, যন্ত্রণাজ্ঞান জাত হল মস্তিষ্কে, ভোগ করল পা। সুতরাং মস্তিষ্কই ঈশ্বরের মত তোমার সকল সুখ, দুঃখ ও তার সকল শক্তি এবং পরিবর্তন তোমার জন্য রচনা করে দিচ্ছে আর তোমার সর্ব্বাঙ্গ তার ভোক্তামাত্র হয়ে বিরাজ করছে। মস্তিষ্ক যেন নিয়ন্তা, দাতা, সাক্ষী কিন্তু ভোক্তা নয়, ভোক্তা তোমার সর্ব্বাঙ্গ। তাহলে ভগবানের স্থান তোমার ঐ মস্তিষ্কে। আর তুমি ভোক্তা, শরীরাভিমানী, শরীরকেন্দ্র হৃদয়ের শেষ প্রান্তে হৃদপিণ্ডে তোমার স্থান। তাহলে এই মস্তিষ্কই তোমার শরীরের সর্ব্বস্বের দাতা, নিয়ন্তা, সাক্ষী অথচ ভোক্তা নন। তোমার এক হাতে মশা কামড়াল, মশার কামড়ের তীব্রতা কতটা জানিয়ে দিল মস্তিষ্ক, মশাটা তাড়াবার দরকার এ জ্ঞানটা মস্তিষ্কই দিল এবং তাড়াবার জন্য যে শক্তি যেখানে পরিচালনার দরকার তাও করল ঐ মস্তিষ্ক, কিন্তু যন্ত্রণা বা পরে আরাম সবই ভোগ করল কিন্তু তোমার হাত, মস্তিষ্ক নয়। অতএব তোমার শরীর সমস্ত কিছুরই ভোক্তা হয়েও কিভাবে মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বিধৃত, পালিত সেটা বোঝা গেল। ভগবানও ঠিক এভাবেই জীবকুলের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক, দাতা, সাক্ষী, অথচ ভোক্তা নন। এজন্যই আমরা মস্তিষ্কে সহস্রারে অর্থাৎ ঐ সহস্র বিজ্ঞানময় মন্দিরে অনুশাসক ভগবানের বাসস্থান বলে বুঝে থাকি। তবুও এই যে মস্তি ষ্ক থাকা সত্ত্বেও তুমিতো সমগ্র বিশ্বের ভোক্তা হতে পারছ না, সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হতে পারছ না! তোমাতে তুমি ভোগ করতে পাচ্ছো অতি সামান্য, সাধারণ মানুষের মত কতকগুলো অনুভব, আর কিছু সামান্য সীমিত শক্তি মাত্র। দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, গমনশক্তি সবই সীমিত। অথচ তোমার মস্তিষ্কে আছে সমস্ত, অসীম, অফুরন্ত। তা সত্ত্বেও তোমাকে দেওয়া হচ্ছে,যেন মেপে মেপে। প্রজ্ঞা ও প্রাণ, অনুভবশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সবই যেন পাচ্ছ খুবই হিসাব মত কোনও একজন বা ঐ মস্তিষ্কের নির্দ্দেশে।

এইসব স্থূল লক্ষণের সাহায্যে সত্যি সত্যিই যে সর্ব্বজ্ঞ সব্বশক্তিধর ভগবান তোমার শিরোদেশে এটা ধারণা করে ধন্য হও। এক দেহ, এক নিজবোধে ধরা এই শরীরে ভোক্তা ও অভোক্তা বিভাগ দেখে, এক আত্মবোধে ঈশ ও অনীশ দুই পুরুষের ধারণা কর। আগেও বেদের অপৌরুষেয় বাণীর কথা – যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ, যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা।"যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ, যঃ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা" – বলেছি। জীব তার মস্তিষ্ক প্রতীক ভগবান হতে তাঁর আজ্ঞামত প্রজ্ঞা ও প্রাণ ভোগ করতে পায় বলে মস্তিষ্কের যে ভূমি থেকে ওটা ঐ রকমভাবে দুইভাগে বিভক্তরূপে ক্রিয়াশীল, সেই ভূমিকেই দ্বিদল আজ্ঞাচক্র (plexus of command) বলে। এই প্রজ্ঞা বা অনুভূতি অন্তর্বোধাত্মক (internal sense) এবং প্রাণ বাহ্য বোধাত্মক (external sense)। এদের স্থূল প্রবাহী নাড়ীগুলো বোধাত্মক ও ক্রিয়াত্মক স্নায়ু (Sensitivity and activity nerves) নামে পরিচিত। এদের ক্রিয়াশীলতাই মানুষকে introvert অথবা extrovert বা intro-extrovert তৈরী করে । এ হল ঈশ্বরের তৈরী অত্যাশ্চর্য্য পযরঢ় দিয়ে ততোধিক আশ্চর্য্য electronic circuit, Sensory neurons (nerve cells) এবং motor neurons ইত্যাদির সমন্বয়ে। এখন ঐ যেখান থেকে স্নায়ু আরম্ভ ও যতদুর যেখানে পর্য্যন্ত তার বিস্তৃতি সেখান থেকে ততদুর পর্য্যন্ত ভোগভূমি, ততদুর তুমি ভোক্তা। যেখানে এই স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে মিশেছে, অনেকটা নদীর মোহনার মত, সেখান থেকে ঈশ্বরভূমি – সেটাই হল যোগীদের যোগশাস্ত্রের ভাষায় ওরুদ্রগন্থি'। এই স্নায়ুগুলো প্রজ্ঞা ও প্রাণের প্রবাহের প্রণালী, মানে সেখানে জীবত্ব। আর যেখান থেকে

এই ক্ষরণ বা প্রবাহ জন্মে সেই মস্তিষ্কে ক্ষরণ নেই তাই ওটাই অক্ষর ব্রহ্মভূমি। তাই মনে করি স্নায়ুগুলো যেন জীব-শরীর আর মস্তিষ্ক যেন ঈশ্বর-শরীর। প্রজ্ঞাঘন পরমেশ্বরকে পেতে হলে এই মূলভূমিতে আসতে হবে। বিভক্ত প্রবাহভূমিতে থাকাই জীবত্ব। জীবত্ব থেকে ভগবানে প্রবেশ করতে হলে এবার হৃৎপিণ্ড থেকে মস্তিষ্কে যাও। "মূর্দ্ধিণ আধায় প্রাণং" মানে মূর্দ্ধায় প্রাণকে ধারণা করে যোগস্থ হও, জ্ঞান ও প্রাণের যোগ। প্রজ্ঞা ও প্রাণ একীভূত হওয়া মানে জীব ও ভগবানে এক হওয়া। আগে জীবের যে তিনটে প্রধান চেতনভূমি – অধ্যাত্ম, কর্ম্ম ও ব্রহ্ম অথবা অধিভূত, অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব এই ত্রিসংস্থানের কথা বলেছিলাম, এই তিনের মধ্যে মস্তিষ্কই হল অক্ষর ব্রহ্মভূমি, হৃদয় হল কর্ম্ম বা যজ্ঞভূমি, আর মূলাধারই হল প্রকৃত অধিভূত ভূমি। মূলাধার থেকে নাভিদেশ পর্য্যন্ত এর বিস্তার –– মূলাধারই হল মূল কেন্দ্র। জ্ঞান ও প্রাণের ক্রিয়া এখানে এসে মূল ভৌতিক পরিণতি গ্রহণ করছে, এটাই মূলাধার। সাধারণ জীব " আমি " বলতে তার ভৌতিক স্থিতিটাই অনুমান করে থাকে। এই সেই ভূতভূমি বা জ্ঞানসংস্থান যেখানে প্রজ্ঞা ও প্রাণ ক্রিয়াশীল হয়ে ক্রিয়ার উপরে নিজ সত্তাভাব কঠিন আস্তরণের মত সম্বুদ্ধ করে রেখেছে। এটাই তোমার সেই ভৌতিক স্থিতি। এখান থেকেই বাক্‌শক্তি প্রবাহিত হয়ে বাইরে বৈখরী নাদে কথায় প্রকাশ হয়। এই স্থানেই কামবৃত্তি জননক্রিয়া উদ্দীপিত করে। এখান থেকেই ওজঃশক্তি তৈরী হয়ে শরীরকে বলবীর্য্যে পুষ্টিময় করে। আবার সেই প্রজ্ঞা ও প্রাণ এক হয়ে ভূত বা তামসিক স্থিতি তৈরী করে। তাই তুমি এখন ভূতাভিমানী। এই অবস্থা থেকে যদি সেই প্রজ্ঞানঘন ভগবানে প্রবেশ করতে চাও, তবে তোমার নিজত্ব, আমিত্ব বা অহংবোধটাকে এখান থেকে তুলে নিতে বা প্রত্যাহার করতে হবেই। আত্মবোধকে ব্রহ্মবোধে যুক্ত করতে হলে মূলাধার থেকেই উত্থান আরম্ভ করতে হবে এবং শুধু মন নয়, প্রাণ নয়, একেবারে আত্মাকে – নিজেকে ঐ মূর্দ্ধাদেশে তুলে নিতে হবে। এটাই হল "মূর্দ্ধ্যাধ্যায়াত্মানঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্"। আর "সর্ব্বদ্বারানি সংযম্য" অংশটাও একান্তই ব্যবহারিক (practical)| সবটাই ব্যবহারিক। খুবই অভ্যাসের দ্বারা প্রথমেই শরীরের সব দরজাগুলো বন্ধ করতে হবে এবং ইন্দ্রিয়গুলোকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার (withdraw) করতে হবে। যদি নিজে থেকে সংযম করতে না পার তবে ইন্দ্রিয়দ্বার গুলিকে বাহ্যিক উপায় দ্বারা নিরোধ কর। ইন্দ্রিয়দ্বার খোলা থাকলেই বাহ্যবিষয় প্রবেশ করে মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে, ফলে আর যোগ ধারণা হবে না। ঐ দ্বারগুলো ঠিকমত বন্ধ করতে পারলে মন আর বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং তার শক্তির আর অপচয় হয় না, ফলে শক্তির অন্তঃস্ফূরণ হয়। অন্ত স্ফূরিত হলেই তার বিদ্যুজ্জ্বলাময়ী শক্তিপুঞ্জের প্রকাশ অনুভব হয়, তাতেই সুষুম্নার অবরোধভাব কেটে গিয়ে তার প্রকাশশক্তির বিকাশ হয়। এই প্রকাশের স্ফুরণই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুণ্ডলিনীশক্তিই ঈশ্বরের পরাশক্তি জীবভূতা প্রাণ। এই প্রাণেরই রূপান্তর হয়ে হয় মন। ক্রিয়াদ্বারা মন অণুস্বরূপ হয়ে যায় তখন মন প্রাণসহ সুষুম্নায় প্রবেশ করে। তখনই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হন। শ্রীগুরু কৃপায় তাঁর

ক্রিয়াদ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর সাময়িক জাগ্রতভাব এসে থাকে ও আত্মসূর্য্যের প্রকাশ ঘটে। এ সূর্য্যে মন লয় করাই উপবাস অর্থাৎ আত্মায় অবস্থান বা আত্মদেবের নিকটে থাকা। কিন্তু বস্তুবাদীর দল বিবিধ ভোগের কামনায় অনাহারে থেকে শরীরের ক্ষতি সাধন করাকে উপবাস বলে থাকে। কেউ কেউ আবার আকাশের সূর্য্যের পূজো করে থাকে। নিজদেহ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত আত্মসূর্য্য নারায়ণকে অবহেলা করে আকাশের হাইড্রোজেন বল বা গোলার উপাসনা একান্তই হাস্যকর নয় কি ? জড়বাদীরা আবার সাত ঘোড়ায় টানা যানে আরূঢ় পুরুষমূর্ত্তিকে প্যান্ডেলে বসিয়ে মাইক বাজিয়ে ধূমধাম শুরু করে ও উল্লাসে মেতে ওঠে। যাক সে অন্য কথা। যোগীরা যে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করেন সে কথা শাস্ত্রেও আছে। এই দ্বার দিয়েই অব্যয় আত্মাতে উপনীত হওয়া যায়। এই উর্দ্ধগতিশীল জ্যোতির্ম্ময়ী ধারাটিই সুষুম্না বা সূর্য্যদ্বার। এরই মধ্যে একটি ছিদ্র আছে সেটা ব্রহ্মলোকাদির সাথে যুক্ত। প্রাণের স্থিরতা দ্বারা মনের সংযোগ কমে গেলে, ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন শক্তি যখন মনে এসে মনে লয় হয়, তখন বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব লোক ও জীব আমাদের জ্ঞান গোচর হতে থাকে। ব্রহ্মলোক বলে সত্যই যদি কিছু থাকে তবে সে দেশের সাথে এ দেশের যোগ থাকারও তো একটা উপায় থাকা দরকার, সেটাই দেবযান পন্থা। এখানে লেখা বড় হয়ে যাবে তাই দেবযান পিতৃযান বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। যাহোক, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মৃত্যুকালে ঐ পথ খুলে যায়। পরবর্ত্তী শ্লোক লক্ষ্য করুন। পরবর্ত্তী শ্লোক এই শ্লোকেরই অংশ বিশেষ ॥ ৮/১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রজাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ।।১৩

অনুবাদঃওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। ৮/১৩ বীজ কী? বীজমন্ত্র -এর বিশেষত্ব ও

ব্যাখ্যাঃওঁ' কি ? ব্রহ্মবাচক বীজ ই "ওম্"। প্রাণ ও প্রজ্ঞা আত্মবোধে সমবায়ী হয়ে প্রণব হয়েছে। তাই ওঁ কারই প্রণব। এজন্যে "ওম্" শব্দটা উচ্চরণ করতে গেলে মূলাধারঃঅ' হৃদয় থেকে মূর্দ্ধা পর্য্যন্তঃউ' এবং মূর্দ্ধার ভিতর থেকে অনুনাসিক ভাবে "ম্" মুখ ও ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসে। অধিভূত, অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব এই ত্রিভাবসংস্থানের তটভূমি দিয়ে গতি বলেই শব্দটা ব্রহ্মবাচক। সে জন্যই "ওম্" অক্ষর উচ্চরণ করে ভগবানকে অনুস্মরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গুরুপদেশে কৌশল অবলম্বন করে ব্রহ্মবোধিকা (সুষুম্না) নাড়ী দিয়ে মূলাধার থেকে বায়বী শক্তি (কুন্ডলিনী) কে ব্যাহৃতি পূর্ব্বক ব্রহ্মের অণুতে স্মরণ করে ওঁ ভূঃ – মূলাধার মানে পৃথিবী, ওঁ ভূবঃ – স্বাধিষ্ঠান – জল মানে প্রস্রাব, ওঁ মহঃ – মহর্ল্লোক - মণিপুর (ক) নাভিস্থান, যা রুদ্ররূপে সকল লোকের মধ্যে বিরাজমান – এই হল

মনের গোপনীয় যোগীগম্য স্থান। ওঁ স্বঃ – যা থেকে সকলের জন্ম হয় অর্থাৎ হৃদয়ের অনাহত, (খ) মহাদেবের স্থান – আপনি জন্মগ্রহণ করেন। ওঁ জনঃ – যেখান হতে সকল স্বরের উৎপত্তি– অ, আ, ই, ঈ, অং, অঃ ইত্যাদি ষোল অক্ষর – সেজন্য ষোড়শাধার বিশুদ্ধাক্ষ্য (গ) শিবের স্থান – শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ – তৎপরে কূটস্থ। (ক) মণিপুরে তেজে বায়ুর দ্বারা সকল কথোপকথন হয় – (খ) ঐ উপযুক্ত আগুন জ্বলে উঠে হৃদয়ে স্থিত হয়ে সকল অন্ন ভস্ম করে বায়ুতে তেজকে মিলিয়ে দেয়। (গ) সেই বায়ু কণ্ঠেতে গিয়ে শূন্যে মিশে ষোলরকম শ্বাস প্রকাশ করে, যে ষোল রূপের অন্ত হল – স্থির সূক্ষ্মরূপ – কূটস্থ স্বরূপ – দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে ব্রহ্মস্বরূপ। এই ভাবে ওঁ কার অনুস্মরণে শুধু মন প্রাণ নয়, একেবারে আত্মাকে – নিজেকে উঠিয়ে নিয়ে ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ৩৪৫৬ বার ওঁ কার ক্রিয়া প্রতি চক্রে এক নিঃশ্বাসে করতে করতে দেহত্যাগ করলে পরমগতি লাভ হয়। এটাই যোগবলে প্রাণত্যাগ করা। আর এটা যে না পারে সে ঐ চার চক্রের কূটস্থেতে ধ্যান করে ব্রহ্মের অণুকে স্মরণ করে প্রাণত্যাগ করতে পারলেও পরমগতি লাভ হয়। এই সাধনায় নবদ্বার রোধ করতে হয়। ভালমত অভ্যাস হয়ে গেলে সাধক নিজে নিজেই পারেন, মানে সেই সেই জায়গা থেকে মনকে সরিয়ে মনের নিজের জায়গা মত, আজ্ঞাচক্রে, স্থাপন করলে মনের সাথে ইন্দ্রিয়সকলও রুদ্ধ হয়ে যায়। যাঁরা এটা না পারেন তাঁরা অপর বাহ্য উপায়ে দুপায়ের গোড়ালি দিয়ে গুহ্যদ্বার চেপে গুরুপদেশমত বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বার সংযত করে প্রাণবায়ুকে মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্রে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলে সেখানে স্থাপন করবেন। এখানে সহস্রারস্থিত দিগম্বর পরমাত্মার সাথে মূলাধারস্থিত দিগম্বরী কুণ্ডলিনীকে সংযোজন করতে পারলেই যোগী কৃতকৃতার্থ হয়ে যান। কুণ্ডলিনী পরমশিবের সাথে মিলিত হবার অনেক আগেই স্বর্গীয় দুন্দুভি বেজে ওঠে। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত ক্রমাগত প্রণবধ্বনি নিজেকে আর নীচে নামতে বা বিষয় রসে মিলতে দেয় না। সেই সাথে আত্মজ্যোতি ফুটে উঠে চতুর্দ্দিক কিরণ বিকীরণ করতে থাকে। তখন পাঞ্চভৌতিক জীবলীলা শেষ হয়ে যায়। অশ্রুতপূর্ব্ব বেদধ্বনির বিকাশে মনের বর্হির্মুখী বৃত্তি লুপ্ত হয়ে গেলেই "তচ্ছুভ্র জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" বা বিষ্ণুর পরম পদ প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত আছে পৃথু রাজাও এই একই পদ্ধতিতে স্বরূপাবস্থা লাভ করেছিলেন। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণস্থির হলে ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির মধ্যে যে স্থৈর্য্য লাভ হয় ওটাই আসল যোগধারণা। এই যোগধারণায় অভ্যস্ত হলে আর মুখে ওঁকার উচ্চারণের দরকার হয় না। তখন দৃশ্য অদৃশ্য সকলই ওঁ কার। এর জন্য একটা পৃথক যোগক্রিয়া আছে যেটা দেহত্যাগের সময় স্বতঃসিদ্ধ ভাবে হতে থাকে। এটাই যোগদ্বারা দেহত্যাগ। বেদে প্রণবকে ধনু ও আত্মাকে শর (তীর) স্বরূপ ব্রহ্মলক্ষ্যে নিক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। অতএব ঐ ওঁ কার ক্রিয়াদ্বারা নিজেকে মূর্দ্ধাদেশে নিয়ে ব্রহ্মসারূপ্য বোধে সমৃদ্ধ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করলে সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরাগতিই লাভ হয়। ৮/১৩

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ।। ১৪

অনুবাদ: অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমায় সর্ব্বদা নিরন্তর স্মরণ করেন, হে পার্থ, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। ৮/১৪

ব্যাখ্যা: পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকগুলোতে ঈশ্বরে যুক্ত থাকা ও প্রয়াণকালে তাঁকে পাওয়ার কথা বলে এখন তিনি যে নিত্যযুক্ত পুরুষের পক্ষে সুলভ সেই কথা বলেছেন। ভগবান বলছেন যে তিনি সুলভ। কি অদ্ভুত কথা ! অথচ দ্রষ্টা ঋষিগণ তোমাকে "অচিন্ত্য" বলেছেন। বলেছেন যে জানলেও জানা হয়নি এমন। অথচ তুমি বলছ যে তুমি সুলভ ! ভগবান এখানে বলছেন আমি সুলভ অপেক্ষাও সুলভ আবার দুর্লভ অপেক্ষাও দুর্লভ। ভগবানের কথা মানুষের কাছে হেঁয়ালীর মতই শোনায়। তাই ভগবান স্পষ্ট করে বললেন যে একান্ত অনন্যচিত্ত হয়ে যিনি আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন সেই সমাহিত চিত্তের নিকট আমি সহজলভ্য হই, অন্যের কাছে নয়। এই নিরন্তর স্মরণের অর্থ শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় – "সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে। নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে – ন ষন্মাসং সংবৎসরং বা। কিং তর্হি ? যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেন যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্য যোগিনোহহং সুলভঃ, সুখেন লভ্য।" – এখানে "সতত" অর্থে নিরন্তর এবং "নিত্যশঃ' অর্থে দীর্ঘকালব্যাপী বলা হয়েছে। ছয় মাস বা একবছর নয়, যতদিন বাঁচবে ততদিন নিরন্তর আমায় স্মরণ করবে, আমি তেমন যোগীর নিকটই সুলভ, মানে অনায়সলভ্য। তাহলে মূল কথাটা হল অনন্যচিত্তে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। এটাই সবচেয়ে দরকারী কারণ আত্মাছাড়া আর কিছুতে যদি লক্ষ্য না থাকে, সে আর অন্য কিছুর কথা ভাববেই বা কেন ? কেবল আত্মচিন্তায়ই তন্ময় হলে, আত্মার মধ্যে আত্মারাম হয়ে থাকলে, সংসারের আর কোনও বিষয়ই তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। তবে এ অবস্থাটা তো আর দুচার বছরের চেষ্টায় হয় না। খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ প্রাণায়াম করতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধি পাদে চতুর্দশ সূত্রে আছে – "স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" অর্থ দীর্ঘকাল অভ্যাস ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। প্রবল অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানের (তুরীয়) তুর্য্যগানাম্নী চরম ভূমি লাভ হয়ে থাকে। যে দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর তাঁর স্মরণাভ্যাস করে সে এই সুদুর্লভ যোগ পেয়ে থাকে। সহজ হচ্ছে সময় পেলেই মনকে প্রতিটি চক্রে নিয়ে যাওয়া আর মাসে অন্ততঃ দুবার না হলে একবার ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করা। কিন্তু মনের ভিতর ইচ্ছা বা বাসনা নিয়ে যেমন " আজই আত্মানন্দ লাভ করব" বা " আত্মায় ডুবে থাকব " এমনতর ইচ্ছা বা লোভ থাকলে অশান্তি বাড়ে। কোনও কিছু না ভেবে মনকে স্মরণে লাগিয়ে রাখতে হয়, তাহলে নিজের অজান্তেই পরমাত্মার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কিছু নয়, আগের আগের অধ্যায়গুলোর মত বিজ্ঞান নয়, জ্ঞানের কোনও নিগূঢ় তত্ত্বও নয়, যোগের গুপ্ত কৌশল

নয়, রহস্যময় মন্ত্রও নয়, শুধু যেভাবে নিজের চেতনার তিনটি ভূমিতে তাঁকে দেখার চেষ্টা যেমনভাবে করার কথা বলা আছে সেই ভাবে ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, যদি কেউ সাধনা করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই ভগবৎ লাভ অত্যন্ত সুলভ। শুধু শ্রীগুরুর ইচ্ছা ও নির্দ্দেশে মনটাকে স্মরণে লাগিয়ে রাখ দেখবে, ভালবাসবে বলে ভালবাসোনি ভালো না বেসে পারোনি। ৮/১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবান্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ।। ১৫

অনুবাদ: মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্যজন্ম লাভ করেন না অথবা পুনর্জ্জন্ম এবং দুঃখসকলের স্থান এই নিত্যসংসার প্রাপ্ত হন না, (সংসারে যাতায়াত করেন না) যেহেতু তাঁহারা পরম সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮/১৫

ব্যাখ্যা: পূর্ব্বশ্লোক পাঠের পর পাঠক হৃদয়ে যে প্রশ্নটা উঠে আসে সেটা হল ভগবানকে জিজ্ঞাসা যে তুমি কিভাবে সুলভ হও তাতো বললে কিন্তু যদি সুলভ নাই হও, যদি সুদুর্লভই হও তাতেই বা কি এসে যায় ? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। কোনও আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার এই বিষয়ে একজন রীতিমত শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে "আমি গীতাকে মানি না" আমি তাঁকেই সমর্থন করেছিলাম যেহেতু তিনি পৃথিবীতে বারবারই ঘুরেফিরে আসতে চান এবং জীবনবোধ তাঁর কাছে খুবই সুখের, খুব সঙ্গত কারণেই শ্রীমদ্ভাগবদগীতা তার নিকট অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যাঁদের কাছে বারবার জন্ম, মৃত্যু ও জীবনের অনিত্যতা দুঃখেরই অনুভব মাত্র, তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনেই ভগবানকে চান, যেহেতু ভগবৎ প্রাপ্তিতে পুর্নজন্ম হয় না, পরমাসিদ্ধি লাভ করে জীব মহাত্মা হয়ে যায়। পরমাসিদ্ধিই হল আপ্তকামত্ব মোক্ষ। আপ্তকাম মুক্ত পুরুষ কখনও পরমাত্মরূপে অবস্থান করেন, কখনও বা পরাসিদ্ধির ঐশ্বর্য্য প্রকাশে ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা হন। বার বার জন্ম, পৃথিবীতে, সংসারে যাতায়াত বন্ধ হয় তাঁকে পেলে। তাই মহাত্মাদের আর জন্মাতে হয় না। ভূমা পুরুষতুল্য আত্মা যার তিনিই মহাত্মা। আত্মবোধ জন্মালেই মহাত্মা হওয়া যায়। আর আত্মবোধ একবার হলে আর নষ্ট হয় না। আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হলে বোঝা যায় যে তিনিই বিশুদ্ধতত্ত্ব শিবরূপ, যাঁকে তিনি অন্বেষণ করছেন। আত্মস্বরূপে স্থিত হলে আর কোনও ইচ্ছা বা আকর্ষণ থাকে না। এটাই পরমাগতি। যোনি থেকে মাথা পর্য্যন্ত প্রাণের প্রবাহ স্থির হয়ে যায়। বাহ্য শ্বাসও স্থির, তখন সবই আছে অথচ কিছুই নেই, নিজের অস্তিত্বও সচেতন নয়, এ অবস্থায় আর কিসের বন্ধন ? একদিকে অনাবৃত্তি, অন্য দিকে আপ্তকামত্ব। এটাইতো পরাসিদ্ধির লক্ষণ। অবশ্যই গুরুবাক্য পালনে নিরন্তর ক্রিয়াদ্বারা, সেবা, বন্দনা ও দীনতার দ্বারা এ অবস্থালাভ করতে হয়। ফাঁকি দিয়ে কোনও মহৎ কাজ হয় না। ৮/১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।। ১৬

অনুবাদ: হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতেও সকল লোক পুনরায় আবর্ত্তনশীল হয়, (পুনরায় ভূ লোকে জন্মগ্রহণ করে) কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে লোকের পুর্নজন্ম হয় না। ৮/১৬

ব্যাখ্যা : জন্মমরণের আবর্ত্তনই ব্রহ্মের সৃষ্টির ধর্ম্ম। তাই এই ভূ লোক থেকে শুরু করে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তলোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল। প্রতিটি ভুবনের সাথেই সেই সেই ভুবনবাসী সকলেই এমন ভাবে জন্মমরণশীল। এই শ্লোকে তাই ভগবান অনাবৃত্তি যে কত দুর্ল্লভ সেটাই ব্রহ্মাণ্ডের সাথে তুলনা করে বলছেন। কিন্তু মৃত্যুশীল এ সৃষ্টির মাঝে অমৃতত্ব লাভের মহা গৌরব পায় তোমার আমার মত নগণ্য জীব। কিভাবে ? ভগবান বলেছেন আমাকে যে পায় সে এ আবর্তন থেকে উদ্ধার পায়। শ্রীরামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শে পাথরের অহল্যা জীবন্ত হয়ে রক্ত মাংসের শরীর ধরে উঠে দাঁড়াল তখন শ্রীরামচন্দ্র পড়লেন বিপদে। ঘাটের মাঝি আর তাঁকে কাঠের নৌকা স্পর্শ করতে দেয়না পাছে তাঁর চরণস্পর্শে কাঠের নৌকা মানবীতে পরিণত হয় ! তখন দরিদ্র মাঝি নৌকার দ্বারা করে খায়, নৌকার বদলে আর একটি মানবী নিয়ে তার অন্নকষ্টই বাড়বে শুধু। পাথর মানুষ হয়ে গেলে নৌকার কাঠও যে মানুষ হবে না মাঝির এ বিশ্বাস হবে কিসে ? ভাল করে ভেবে দেখ মাঝির বিশ্বাসই ঠিক। হেসো না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু রামচন্দ্রে পূর্ণ। সে রামচন্দ্রের স্পর্শে নিয়তই প্রতি ভূতে, কাঠ, পাথর সব মানুষ হচ্ছে। মৃতও হচ্ছে জীবনময়, যে সমস্ত কাঠ, পাথর ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে ভক্ষ্য হচ্ছে সে সমস্তই আবার রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, মস্তিষ্ক, মন, প্রাণ, বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছে। কার প্রভাব বা স্পর্শে এমন ম্যাজিকটা প্রতিক্ষণে হচ্ছে ? আজ যেখানে একটু জল পাতা ইত্যাদি পড়ে আছে, কালই তার ভিতর দেখা যায় অগণিত, অসংখ্য জীবনকণা, প্রাণ ও প্রজ্ঞার আবির্ভাব। এতেও কি তুমি মৃত্যুর মাঝে জীবনকণায় রামচন্দ্র দেখলে না ? কোনও বৈজ্ঞানিক একটু রক্ত, একটু মস্তিষ্ক কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা জীবন্ত করতে পারেন ? কিন্তু রাম যে আত্মারাম হয়ে তোমার হৃদয়েই আছেন। সেই রামকে যদি স্পর্শ কর তবে সে আত্মব্রহ্মের স্পর্শে তুমিও হবে মৃত্যুহীন ও সনাতন, জন্ম মৃত্যুর অতীত হয়ে , ব্রহ্মভোগে, অভয় আত্মরমণে। তাই ভগবান বলছেন, হে কৌন্তেয় আমাকে পেলে, মনে পরমাত্মজ্ঞান থাকলে, পরমাত্মায় প্রবেশ লাভ হলে, আর পুর্নজন্ম হয় না। সমাধিবান পুরুষেরও সমাধি ভাঙলে আবার সেই সংসার ঘিরে বসে। কিন্তু আত্মা ব্রহ্মে লয় হলে সমস্তই ব্রহ্ম হয়ে যায়। পর অবস্থায় মানে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে মনের স্থিতি হলে পরমাত্মায় মনের লয় হওয়ায় পুনর্জ্জন্ম হয় না। দেখা যায় ও ভোগ করা যায় পরমব্রহ্ম রামচন্দ্রের সহস্র যুগ পর্য্যন্ত দিবা রাত্রিময় মহাজীবনের লীলা খেলা। সেটাই পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখুন। ৮/১৬

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ।। ১৭

অনুবাদ: সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন তাহা যাঁহারা জানেন এবং সহস্রযুগান্তা যে রাত্রি তাহাও যোগবলে যাঁহারা জানেন সেই ব্যক্তিরাই বাস্তবিক অহোরাত্রবেত্তা ॥ ৮/১৭

ব্যাখ্যা: ভগবান নিজের ব্রহ্মত্বের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবের চিরন্তন বিশ্বরহস্য ক্ষর পুরুষকে শোনাতে দৈব কালবিস্তার বর্ণনা করেছেন। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের কথায় –

“ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষয়াত্মনো ঈশতে দেব একঃ ॥”

অর্থাৎ ক্ষরই প্রধান (প্রকৃতি) অক্ষর অমৃত বা হর। যে দেবতা ক্ষর ও আত্মার প্রভু তিনিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও আছে “কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।” “মহাকাল সমগ্র প্রাণীকে কলন মানে গ্রাস করেন তাই তিনি মহাকাল বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।” অর্থাৎ এই পরমাত্মাই মহাকাল। তাঁকে জানতে পারলে তাঁর কালবিস্তৃতি কত অপার, কত সুদীর্ঘ তার বর্ণনা দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষরের চোখে সেটা ফুটিয়ে তুলে তাঁর ক্ষুদ্রতা দুর করছেন। যার অর্থ তাঁর এতটুকু জীবনের সাধনা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, কি দেখাবে ও কি দেবে তা বুদ্ধিতে বুঝতে গেলেও সব ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে যায়, সকল দৈন্য মুছে যায়। এর আগে শুরুতেই বলা হয়েছে যে মহাকাল ঘটস্থ হলে মানে দেহস্থ হলেই তার কাল সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এটাই জীবের আয়ু। আর এটুকু মাত্র আয়ু নিয়ে কতই না লাভ লোকসানের হিসেব। তাই যে অবস্থা পাওয়ার জন্য, যাঁকে পাবার জন্য তোমায় বলা হচ্ছে, সে অবস্থার ও তাঁর সময়ের মাপকাঠিটা কি ? সাধারণতঃ চারিযুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি)। এমন চার যুগ সহস্রবার অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মার একদিন, আবার ঐ পরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। কিন্তু যাঁরা সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দেখে দিন রাত্রি নির্নয় করেন ও হিসাব করেন তাঁরা সব অল্পবুদ্ধির লোক, অহোরাত্রবেত্তা নন। কালের পরিমাণ যেখানে আছে, জন্ম মৃত্যু যেখানে আছে, সেখানে আরম্ভের নামই জন্ম আর শেষের নামই মৃত্যু। মাঝখানটাই জীবের আয়ুষ্কাল যার পরিমাপ যোগীরা অজপা দ্বারা করেন। পূর্ব্বকর্ম্ম অনুসারে জীব এই শ্বাসের পূঁজি নিয়ে জন্মগ্রহন করেন। গড়ে মিনিটে ১০ থেকে ১৫ বার মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস চলে। আর দিবা রাত্রিতে ২১৬০০ বার। এই পূঁজি ফুরালে আর দেহ থাকে না। তবে যোগীরা প্রাণায়াম দ্বারা এই আয়ুষ্কাল বাড়াতে পারেন। প্রাণায়ামে শুধু আয়ুই নয় বিশুদ্ধ জ্ঞানও লাভ হয়। শ্বাস অন্তর্মুখী হয়ে সুষুম্নাগামী হলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের প্রকাশকালকেই, যোগীগণ দিবাভাগ, দিবস বা দিন বলে থাকেন। দিবাকালই প্রকাশ বা জ্ঞানরূপ। শ্বাস ইড়া পিঙ্গলায় চললে তখন হয় রাত্রি। রাত্রিই অপ্রকাশ বা অজ্ঞান। ক্রিয়াকালীন শ্বাস ইড়া পিঙ্গলা অতিক্রম করে সুষুম্নায় চলাকালীন বিজ্ঞান পদ লাভ হয়। এই জ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরাই অহোরাত্রবেত্তা হয়ে থাকেন। যিনি প্রাণায়াম দ্বারা অজপাকে কমিয়ে ২১৬০০ বার থেকে ২০০০ বারে আনতে পারেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা মহর্ষি এবং তিনিই অহোরাত্রবেত্তা। তাঁর বাম নাকে এক হাজার বার ও ডান নাকে এক হাজার বার এবং প্রতিবারই তাঁর প্রাণের স্থিতি সুষুম্নামার্গে হয়ে থাকে। কারণ ইড়া সুষুম্নাতে অথবা পিঙ্গলা সুষুম্নাতে যুক্ত হয় তাই একে যুগ বলে। ইড়া চন্দ্র এবং পিঙ্গলা সূর্য্য আর ইড়া থেকে পিঙ্গলা বা পিঙ্গলা থেকে ইড়ায় যাবার সময় শ্বাস যে সুষুম্নাগামী হয় সেটাই অব্যক্তপদ। ২১৬০০ বার এর বদলে ২০০০ বার মাত্র অজপা হলেই ব্রহ্মার অহোরাত্র কারণ তাঁর স্থান তখন ব্রহ্মলোকে। যা দেবলোকের দুই সহস্র যুগ তাই ব্রহ্মার অহোরাত্র। এভাবেই সহস্রযুগান্ত অহোরাত্রির বেত্তা হলে তুমি পরমাত্মতত্ত্বের অক্ষরত্ব আত্মায় উপলব্ধি করতে পারবে এবং তোমার গতি কোথায় কি বিশাল কালাবর্তনের বাইরে গিয়ে পড়বে সেটা একবার ভেবে দেখ। যিনি কালমূর্ত্তি ধরে এমন অহোরাত্রি রচনা করেন সেই অক্ষর পুরুষই তোমার অন্তর্য্যামী ॥ ৮/১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।। ১৮

অনুবাদ: ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত (চরাচর প্রাণীগণ) প্রাদুর্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির উপক্রমে সেই অব্যক্তস্বরূপ কারণরূপেই প্রলীন হয়। ৮/১৮

ব্যাখ্যা: সমস্তকিছুই অব্যক্তভাবে সেই অক্ষর পুরুষেই নিহিত। যখন বিশ্ব ব্যক্ত হয়, তখন বোঝা যায় এই অব্যক্তসংজ্ঞক অক্ষর হতেই এ সমস্ত উৎপত্তি হয়। কাজের যা কারণ তাই অব্যক্ত। অব্যক্তই কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয়। সমস্তের বীজস্বরূপ অক্ষরপুরুষ হতে দিন রাত্রিরূপ দুটো বিপরীত প্রকাশে সমস্ত সৃষ্টি ব্যক্ত ও অব্যক্ত হতে থাকে। আকাশে মেঘ ও তড়িৎপুঞ্জ নিহিত থাকলেও তা অব্যক্তই থাকে কিন্তু মেঘের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ লহর চমকে উঠলেই তার প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ ব্যক্ত হয়। তাই ভগবান বলছেন কার্য্যের কারণ অব্যক্ত হলেও সেই অব্যক্তই কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয়। কখন ব্যক্ত হয় ? ব্রহ্মার অহরাগমে মানে দিবসের উপক্রমে। দিবাগমে সৃষ্টি প্রভবময় হয়। আর নিশাগমে সৃষ্টি বিলয় হয়। সূর্য্য উঠলে পরেই জীবজগৎ জেগে ওঠে, জীবকুল জাগলেই সূর্য্য ওঠে না। দিবা ও রাত্রির অভ্যুদয়ই সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ। তাই ব্রহ্মার রাত্র্যাগমে, অর্থাৎ ব্রহ্মশয়নে অব্যক্তসংজ্ঞক কারণ রূপে চরাচর প্রলীন হয়। যোগাভ্যাসীদের কাছে বিষয়টার বোধ খুবই পরিষ্কার যেহেতু শ্বাস সুষুম্নাতে প্রবাহিত হলে যোগীর যে বিজ্ঞানপদ লাভ হয় সেটাই যোগীর পক্ষে দিন। তখন এ প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জগৎ যেন অব্যক্ত কারণে বিলীন হয়ে যে স্বপ্রকাশ অনুভবটা অব্যক্ত ছিল

সেটা যোগীর প্রত্যক্ষাবগম হতে থাকে। আর যখনই অন্য বিষয়ে আসক্তি হয়, তখনই অব্যক্ত ব্রহ্মনাড়ী হতে শ্বাস সরে যায় ও ব্রহ্মদৃষ্টি নষ্ট হয়। যা স্ফুরিত হচ্ছিল তা আর হয় না সব যেন অন্ধকারে ডুবে যায়। এটাই যোগীর পক্ষে রাত্রি। এই জ্ঞান যা সংসারাতীত ভাব এবং অজ্ঞান বা সংসারভাব এটাই প্রকৃতপক্ষে যোগীর দিন ও রাত্রি। স্বপ্রকাশ অনুভবই হল আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ আর তার অন্তর্গত বিজ্ঞানপদই সেই পুরুষোত্তমভাব যে পুরুষোত্তম বা নারায়ণের শরীরেই সমস্ত জীবজগৎ বা বাহ্য প্রকাশসকল লীন হয়। তাই আগেই বলেছি যে সমস্ত কিছুই অব্যক্তভাবে সেই অক্ষর পুরুষেই নিহিত। তাই একদিক থেকে দেখলে দেহধারী জীবসকল অমর (immortal)| জগৎ লয়প্রাপ্ত হলে জীবকুল ধ্বংস হয় না, তাদের বাহ্যরূপই ধ্বংস হয় মাত্র। ব্রহ্মের মধ্যে তারা অপ্রকট অবস্থায় অবস্থান করে যেটা সাময়িক বিরতি মাত্র। শীগগীরই আবার নতুন সৃষ্টিতে নতুন রূপ নিয়ে দিব্য বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। ৮/১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ।। ১৯

অনুবাদ : হে পার্থ, সেই এই ব্যক্ত চরাচর ভূতসকল বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে প্রলীন হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে স্ব স্ব কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়। ৮/১৯

ব্যাখ্যা : পুরুষোত্তমের সাধর্ম্ম্য লাভই জীবের লক্ষ্য ও পরমগতি। অথচ ইতিপূর্ব্বে বহুবারই ভগবান বলেছেন সকলই পুনরাবর্ত্তনশীল। এমত অবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব নিজ প্রকৃতির সম্যক বিকাশ করে ঐ পরমভাব লাভ করতে না পারছে ততক্ষণ তাকে নিজ স্বভাবের দ্বারা বাধ্য হয়ে বার বার জন্মগ্রহণ করতেই হয়। তাই এটা নতুন নতুন ভূতগ্রামের উৎপত্তি ও প্রলয় নয়। অব্যক্ত হতে যা জাত হয় তা আবার অব্যক্তেই বিলীন হয়। অকৃত ভূতগ্রাম সৃষ্ট হয় না অথবা কৃত ভূতগ্রাম বিনষ্ট হয় না। ঐ একই শক্তি ভূতগ্রামরূপে বার বার জাত ও প্রলীন হচ্ছে। অতএব চরাচর প্রাণীসমূহ যারা আগেও ছিল তারাই ব্রহ্মার অহরাগমে জন্মলাভ করে তাঁর রাত্রি আগমে প্রলয় প্রাপ্ত হয়। এমন প্রলয়ের পর আবার ব্রহ্মার দিন আগমনে জন্মগ্রহণ করে, অবশ্য সকলে নয় যারা কর্ম্মপরতন্ত্র শুধু তারাই। ঠিক আমরা যেমন ঘুমের সময় আগের দিনের চিন্তা ও কর্ম্মসংস্কার নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলে আবার সেই চিন্তা ও সংস্কার সহ জেগে উঠি তেমনি ভাবেই জীবসকল প্রলয়কালে তাদের কর্ম্ম ও চিন্তা নিয়েই অব্যক্তে প্রবেশ করে, আবার সৃষ্টিকালে ঐ সমস্ত চিন্তা নিয়ে অব্যক্ত থেকে বেরিয়ে আসে। এমনটাই বার বার ঘটছে। অবশ জীব বিবশ হয়ে মায়ার স্রোতে ভাসছে। ব্রহ্মা কর্ম্মসহ জীবদের প্রকাশ করেন, তাকেই সৃষ্টি বলে। কিন্তু এ সৃষ্টির মধ্যে কোনও নতুন জীব জন্মায় না, আগে যারা ছিল তারাই আসে, তবে একটু বেশভূষার অদল বদল করে তাদের নিজেদের ভালমন্দ কর্ম্ম অনুযায়ী।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় – "যে কর্ম্ম করিল না – তাহার ফললাভ হইল, আর যে কর্ম্ম করিল তাহার ফললাভ হইল না – এইরূপ দোষকে যথাক্রমে কৃতনাশ ও অকৃতভ্যাগম দোষ বলে। এইরূপ দোষ পরিহার করার জন্য বন্ধ ও মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করিয়া লোকের যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তির সাফল্য প্রদর্শন করিবার জন্য এবং অবিদ্যাদি ক্লেশ-নিমিত্ত কর্ম্মাশয়ের বশে অস্বতন্ত্র প্রাণীনিচয় পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়া মরিয়া যায়, এই কারণে সংসারে বৈরাগ্য হয়, ইহাও প্রদর্শন করাইবার জন্য (ভগবান) বলিতেছেন যে ভূতগ্রাম প্রাণীসমুদায় স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয়বিধ, যাহা পূর্বকল্পে ছিল, তাহাই আবার এই পরিদৃশ্যমানরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্য নহে। দিনের আগমন হইলে এইরূপ ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়া রাত্রির আগমনে পুনঃ পুনঃ বিলীন হইয়া যায়। "অবশ" অর্থাৎ অস্বতন্ত্র আবার দিবসের আগমনে সেইরূপ অবশ হইয়াই উৎপত্তি লাভ করে "। এজন্য গীতাতেই শ্রীভগবান বলেছেন "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত..." ঋগ্বেদে আছে – "সূর্য্যচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিব্যং চ পৃথবী চান্তরীক্ষ মথো স্ব ॥" যার অর্থ হল সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গাদিলোক, পূর্ব্বকল্পে যা যেমন ছিল, বিধাতা পর কল্পেও তেমনই রচনা করেন। গীতাতেই অছে – "নাসতে বিদ্যতে ভাবো ... ..." অসৎ বলে কোনও ভাব নেই, আবার সতেরও অপলাপ হয় না। সুতরাং ভৌতিক সৃষ্টি এক অনাদি সৎশক্তিরই প্রকাশ। রাত্রি আগমে ভূত সকল স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একীভূত হয়ে যায় আবার দিবা আগমে সেই অক্ষর হতে স্বতন্ত্রবৎ আলাদা হয়ে জন্মায়। এইভাবে অব্যক্তস্বরূপ অক্ষর অব্যক্ত থেকে তাঁর সেই মূল অব্যক্তস্বরূপের উপরেই একটি ব্যক্ত লীলা রচনা করেন। এভাবেই চক্রাকারে সৃষ্টিচক্র ঘুরে চলছে। জীব বারবার জন্মায় নিজের স্বরূপ বোঝার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটা ভুলে যায়। তাই বার বার আসে আবার বার বারই চলেও যায়। কত বাসনাই করে, কাজে পরিণত হয় না। তাই এ জন্ম মৃত্যুর প্রবাহও থামে না। সব ভূতই সৃষ্টি হয়ে লয় পায়, ক্রিয়া না করলে অবশ হয়ে থাকতে হয় এটাই অন্ধকার রাত্রি। আবার ক্রিয়া করলেই অন্ধকার হতে স্বপ্রকাশ স্বরূপ ফিরে পায় ॥ ৮/১৯

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।। ২০

অনুবাদঃ কিন্তু সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ (তাহারও কারণভূত) অতীন্দ্রিয় অনাদি যে একটি ভাব আছে, তাহা সমুদায় ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না। ৮/২০

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভূতসকলের অব্যক্তে লয় পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে বলা হল সেই বিনাশেই সমস্তটুকুর শেষ নয় কারণ বাবারও বাবা আছে। সেই অব্যক্তেরও অব্যক্ত আছে যা

চক্ষুরাদির অগোচর, সনাতন ও অনাদি, সর্ব্বকার্য্যকারণ লক্ষণ ভূতসমূহের বিনাশেও যিনি বিনষ্ট হন না। সেজন্য সেই অব্যক্ত অক্ষর যখন যোগনিদ্রা সম্ভোগের জন্য রাত্রি রচনা করেন তখন সমস্ত ভূতগ্রাম তাঁতেই প্রলীন হয় কারণ সেই প্রলীয়মান ভুত সকলের অন্তরেও এমন একজন আছেন অক্ষরেরও অন্তরে যিনি অবিদ্যাময় ক্ষর ও বিদ্যাময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অক্ষর হতেও আলাদা একজন, জীব ও ঈশ্বর উভয়ের অন্তরেই যিনি সমানভাবে অবস্থিত, সগুণ নির্গুন সকল ভাবের অতীত পরমাত্মা, যাঁকে গীতায় বলা হয়েছে পুরুষোত্তম। অব্যক্তের অন্তরেও তিনি অন্য এক অব্যক্ত। তিনিই একদিকে জীব আবার অপর দিকে বিশ্ববীজ পরমেশ্বর। এ জন্যেই বেদে তাঁর দুটো প্রকাশ বা রূপের কথা বলা হয়েছে। একদিকে পরমাত্মা, অন্যদিকে পরমেশ্বর । বেদে তাঁকেই বৃক্ষ কল্পনা করা হয়েছে, যে বৃক্ষে অবস্থিত দুটো পাখী, একটা অক্ষর হলে অপরটা পরমাত্মা। পাঠক এখানে প্রশ্ন করুন – ভুত সকলের বিনাশে তিনি বিনষ্ট হন না মানে কি তবে অক্ষর পুরুষেরও বিনাশ আছে ? না, তা নয়। অক্ষর পুরুষের রাত্রি রচনার অর্থ হল পরমাত্মভাবে অবস্থান। দিনের আলো ফুটলে যেমন ঘরের লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয় কারণ জ্বালা থাকলেও সে আলো দেখা যায় না তেমনই ক্ষরত্ব বিলয় হলে অক্ষরত্বও আর দৃশ্যমান থাকে না। তাই ভগবান বলছেন প্রলয়ে জগতের যে অব্যক্তে লয়, সেটা ভগবানের আদি সত্তা নয়, তারও ওপরে আরও একটা পদ অছে যা বিশ্বের অতীত। নিচের অব্যক্তের মত তাতে পরিবর্ত্তন নেই, সেটাই ক্রিয়ার পর অবস্থা যা হল নির্ব্বিকল্প ভাব, শাশ্বত, যেখানে ব্যক্তও নেই, অব্যক্তও নেই, নিরাধার ও নিরাশ্রয়, সকল প্রপঞ্চ থেকে আলাদা, অক্ষর স্বপ্রতিষ্ঠ। এমন জ্ঞান যাঁর হয়েছে তিনি নাশমান হয়েও বিনষ্ট হন না অর্থাৎ অন্তরীক্ষে অণুস্বরূপে থাকেন ব্রহ্মের রূপ হয়ে। এটা যথার্থ এবং প্রত্যক্ষ। যিনি করছেন তিনিই দেখছেন এবং যিনি করবেন তিনিও দেখবেন। একথা বললে বিশ্বাস হবে না, সে জন্য নিজে করে দেখুন। বামশ্বাস, ডানশ্বাস ও মধ্যশ্বাস তিনই সুষুম্নাস্থ সূক্ষ্ম বায়ুর রকমফের মাত্র। সুষুম্নাই নিজেকে জানার মন্ত্র। কিন্তু সুষুম্নামার্গে স্থিতিরূপ যে ভাব সে ভাব ইন্দ্রিয়াতীত নয়। কারণ মূলাধার থেকে ব্রহ্মোযোনি পর্যন্ত সুষুম্নার যে স্থানের ভিতর কেবল আজ্ঞাচক্র ও তার উপরকার স্থানসমূহই ইন্দ্রিয়াতীত। কিন্তু আজ্ঞাচক্রের নীচটা আর ইন্দ্রিয়াতীত নয় । এজন্যই সুষুম্নাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলা যায় না। কিন্তু সুষুম্নার অতীত স্থানরূপ যে বিজ্ঞানপদরূপ সহস্রার সেখানে কোনও ইন্দ্রিয় নেই, অতএব সেটাই অতীন্দ্রিয়স্থান এবং সেখানেই স্থিতিরূপ ভাবই স্থির পরমভাব যা অনাদিকালরূপে রয়েছে। সমুদায় ভূত বিনষ্ট হলেও প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণরূপ ঐ স্থির পরমভাব নষ্ট হবার নয়, কেননা ওটাই সনাতন অব্যক্ত ভাব যা অনাদি কাল থেকেই আছে। তাই প্রণায়াম করলেই মনের প্রসন্নতা হয়, যে প্রসন্নতাই স্থিরতা, যা নিজেকে নিজত্ব অনুভব করিয়ে দেয়। তখন ইন্দ্রিয়ের বোধ না থাকায় সব কিছু থাকা না থাকা সমান হয়। এ অবস্থায় দৃশ্যমান “আদিত্যবর্ণো ভূবনস্য গোপ্তা” ই অব্যক্তেরও অব্যক্ত। এঁর পরিবর্তন নাই, ইনিই শ্বাশ্বত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ ॥ ৮/২০

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।।২১

অনুবাদ: যে অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় ভাব অক্ষর বলিয়া (বেদে) উক্ত আছে, তাহাকে পরমাগতি অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ বলে, যাহা পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহা আমারই পরম ধাম (স্বরূপ) অর্থাৎ আমিই পরমগতি। ৮/২১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছিলাম যে পরমাত্মা ও পরমেশ্বর আত্মতত্ত্বেরই প্রকাশদ্বয়। এই শ্লোকে ভগবান বলছেন পরমেশ্বরত্বই অক্ষর, সর্ব্বশক্তিরূপ ও সর্ব্বগতির নিয়ন্তা আর পরমাত্মত্বই সবকিছুরই উপাদান স্বরূপ। আগে যে‘অব্যক্ত’ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা অক্ষরপুরুষকেই বলা হয়েছে এবং সে অক্ষরত্বই যে পরম গতিরূপা শ্লোকটার আগের অংশ বা প্রথম পাদে সেই কথা বলেছেন আর শেষার্দ্ধে যে পরমাত্মারই এই পরমেশ্বরত্ব সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পরমেশ্বরত্বটি গতি শব্দে এবং পরমাত্মত্বটি ধাম শব্দে বর্ণনা করে ভগবান বলছেন তাঁর ঐ অব্যক্ত ভূতবীজ ভাবটি অক্ষর। ঐ রূপেই তিনি সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, আশ্রয় ও সর্ব্বভূতময়। উনিই নিজেকে সকলের অসঙ্গ আত্মস্বরূপ বহু করে বিস্তৃত। মানুষ নিজের ঘরে ফিরে এলে তার সমস্ত পথচলার যেমন শেষ হয় তেমনি তাঁতে উপগত হলে তাঁকেই পরম ধাম বুঝতে পারে এবং পরমাত্মত্ব দেখতে পায়। মানুষের দেহবোধ থেকেই আমি ও আত্মা যেন দুটো আলাদা বস্তু বলে মনে হয় কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পরের অবস্থায় স্থিত হলে দেহদৃষ্টি তো থাকেই না বুদ্ধিরও কাজ থাকে না। তাই পৃথক সত্তার উপলব্ধি না থাকায় জীবভাব গিয়ে এক অখণ্ড আত্মাই বিরাজ করেন। অন্য সময় বুদ্ধিতে উপস্থিত পরমাত্মাই জীবরূপে প্রকাশিত হন কিন্তু ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণের নিরোধ হলে সেই সাথে মন বুদ্ধিও নিরুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই জীবভাব না থাকায় শুধুই আত্মবোধ থাকে। এই অখণ্ড পরমাত্মার সাথে জীবের সম্বন্ধ জানলে জীব বুঝতে পারে “এষোহস্য পরমা গতিঃ” ইনি তার যথাসর্বস্ব। সুষুম্নায় স্থিতিটাই অব্যক্তভাব তাই বেদে এটাকেই অক্ষর বলা হয়েছে যেহেতু এটাই ক্ষররহিত অবস্থা। এতে অপানবায়ুর অধোগতি রহিত হয়ে ঊর্দ্ধগতি হয়ে অপান আজ্ঞাচক্রে গিয়ে স্থির হয় বলে একে পরমগতি বলে। আবার অন্তিমকালে যখন সুষুম্নাপথে বের হয়ে গিয়ে দেহান্তে পরমাত্মায় স্থিতি হয় বলেও একে পরমগতি বলে। পরমাত্মস্থানে গিয়ে প্রাণবায়ু স্থির হলে প্রাণের চঞ্চলতার পুনরাগমন নিবারিত হয় বলে সেই কূটস্থের উপরের স্থানই পরমধাম অর্থাৎ ভগবান বলতে চাইছেন আমিই সুষুম্নামধ্যস্থ স্থির প্রাণরূপ পরমগতি। এই পরমাত্মত্বই তোমাদের ধামস্বরূপ, আবার এই পরমেশ্বরত্বই তোমাদের গতিস্বরূপ। এটিই আমার প্রকাশের উভয়লিঙ্গত্ব; মানে আমিই উপাদান (পরমাত্মত্ব), আমিই নিমিত্ত (পরমেশ্বরত্ব)। আগের ২০ নং শ্লোক এবং এই ২১ নং শ্লোক মিলে একটাই অর্থ প্রকাশ করে। অক্ষর উচ্চতম সত্তায় অব্যক্ত, যা

বিশ্বপ্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থারও উপরে। জীব যদি এই অক্ষরকে লাভ করে তাহলেই বিশ্ব ও প্রকৃতির সকল বন্ধন তার থেকে খসে পড়ে, সে জন্ম মৃত্যুর উর্দ্ধে শ্বাশ্বতপদে চলে যায়। ৮/২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম ।। ২২

অনুবাদ: হে পার্থ, যাহাতে ভূতগণ রহিয়াছে এবং যিনি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরম পুরুষ (আমি) একান্ত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য ॥ ৮/২২

ব্যাখ্যা: গীতার শুরুতে ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ উপায় হিসাবে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছিল কারণ ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরীয় জ্ঞানলাভ ও ভগবৎকর্ম্মে জীব প্রেরণা পায়। সেজন্য এই শ্লোকে সেই দিকটার পুনরুল্লেখ করে ভগবান বলছেন যদিও সেই পরমপদ বিশ্বাতীত ও চির অব্যক্ত তবুও সেই পরমপুরুষকে ভক্তির দ্বারাই লাভ করতে হবে। কারণ পরমপুরুষ একেবারে সকল সম্বন্ধশূন্য নন। বিশ্বচৈতন্য কোনও মায়া বা বিভ্রম (illusion or obsession) নয়, পরমপুরুষ বিশ্বাতীত হয়েও সমগ্র জগৎ, সর্ব্বভূতকে নিজের সত্তার মধ্যে ধরে রেখেছেন। কূটস্থের পর একটা পুরুষকে দেখতে পাওয়া যায়, যা সকলভূতের মধ্যেই আছে তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ বা ঈশ্বর যেভাবেই বল, তা থেকেই এ সমস্ত যা কিছু দেখছ সবই হয়েছে। তাই এটা বুঝতে হলে কেবল শাস্ত্রপাঠ করে বা ব্রহ্মবিচার করে লাভ নেই। কারণ "শাস্ত্রান্যধীতাপি ভবন্তি মূর্খাঃ" – শাস্ত্রপাঠ করেও লোকে মূর্খ হয়। আজকাল যেটা আরও বেশী করে বোঝা যায়। যে যতবড় মূর্খ হয় সে তত লম্বা স্পীচ ঝাড়ে। ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় হল অনন্যভক্তি। সে ভক্তি কি রকম ? তার লক্ষণই বা কি ? সে ভক্তির লক্ষণ হল – "স্ব স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যাভিধীয়তে " – স্ব স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি। তাই বলছিলাম শাস্ত্রীয় পণ্ডিত যদি ভক্তিবিহীন হয় তবে সে অবশ্যই মূর্খ। তবে আর বিদ্বান কে ? " যস্ত ক্রিয়াবান পুরুষঃ সঃ বিদ্বান্।" যিনি শাস্ত্রবিহিত ও গুরুপদেশ মত সাধনা করে মনকে আত্মমুখী করতে পারেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান। এখানে পাঠক প্রশ্ন করুন, যদি তা থেকেই সবকিছু হয়ে থাকে, এ সমস্ত ব্যাপ্তি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই পরিব্যাপ্তি হয়, এবং তিনি সকল ভূতের মধ্যেই বিরাজ করেন তবে তাঁকে আমরা পাই না কেন ? আর যদি তাঁতেই সকলে রয়েছে বা তিনিই আমাদের মধ্যে আছেন তবে আবার নতুন করে তাঁকে পাবার কথা বলাই বা কেন ? সত্যিই যদি তাঁকে পেয়েই রয়েছি, যদি সে অগাধ প্রীতির সাগররূপ পরমাত্মার বুকেই আমি রয়েছি তবে এত অপ্রীতি কেমন করে আমায় পেয়ে বসল ? উত্তরে বলি এটা শুধু না জানার ফল, না জানার ফলই হল না দেখা। আর না দেখার ফলই হল তাঁতে আকৃষ্ট না হওয়া। তাঁকে জানতে হবে, শুধু জানলে কিছু হবে না, তাঁকে দেখা চাই। তবেই তাঁর প্রতি আকর্ষণ হবে্ প্রাণের সকল অনুরাগ দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে হবে। যেমন তেমন ভাবে জড়িয়ে ধরলে হবে না। তিনিই আমার আত্মা, তিনি আমার পর কেউ নন, এইভাবে তাঁতেই নিজের সমস্ত অস্তিত্ব দেখে, তাঁকে সেই ভাবে প্রাণে বরণ করে নিতে হবে। তাঁরই অন্তরে তোমার সমস্ত – তোমার আত্মা হতে স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সমস্তটা ব্যাপী তিনিই আছেন এটা ঠিক মত দেখলে তবেই তাঁকে অনন্য ভক্তি দ্বারা তৃপ্ত করা হবে। অনন্যভক্তির স্বরূপ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেছেন "অনন্যয়াত্মবিষয়া' – আত্মবিষয় ছাড়া আর কিছু বলতেও ইচ্ছা করে না, ভাবতেও ইচ্ছা করে না, দেখতে, শুনতে বা জানতেও ইচ্ছা করে না – তখন অনন্যভক্তি হয়। ক্রিয়া করতে করতে মন যখন খুব জমে ওঠে, নেশা হয় তখন মন আর অন্য বিষয়ে যায় না, তখনই সেই অনন্যভাব হয়। এই জন্যই মনোযোগ দিয়ে ক্রিয়া করতে হয়, অন্যমনস্ক হয়ে ক্রিয়া করলে ক্রিয়ার ফল পাওয়া যায় না। যাঁরা ভাল করে ক্রিয়া করেন তাঁরা নিজের মধ্যেই সূর্য্যের মত প্রভাবিশিষ্ট একটা স্বর্ণ অণ্ড/পিণ্ড দেখতে পান যা থেকে পুরুষোত্তমের উৎপত্তি প্রকাশ হয়। হিরণ্যবর্ণের কূটস্থের মধ্য যে কৃষ্ণবর্ণ গোলক দেখা যায় তাইই কারণবারি, তারই ভিতর নক্ষত্রস্বরূপ বীজ আছে। কূটস্থের এই দরজা দিয়ে অন্তঃগমন হলে পুরুষোত্তমরূপ অনুভব হয়। কূটস্থের কালো বর্ণের কারণ সলিলে অবস্থান হেতু তিনি নারায়ণ যা হতে এ বিশ্ব উদ্ভূত। এরও পরের অবস্থায় আর বুদ্ধি থাকে না, নিরুদ্ধ হয়ে যায়; দ্রষ্টা, দৃশ্য, দিক, কাল, দিন, সময় সব কিছুর জ্ঞান বোধ নিবৃত্ত হয়ে সব সমান হয়ে যায়। এই সাম্যাবস্থাই শিবত্ব। দীর্ঘসময় যাবৎ ক্রিয়া করতে পারলে অপূর্ব্ব সমরসযুক্ত শিবভাব দ্বারা সমস্ত পূর্ণ বলে বোধ হয়। এজন্যই ভক্তি আর কিছু নয় নিজের নিজত্বের অন্তরতম দেশে তাঁর থাকার তত্ত্বটা জেনে, তদনুরক্ত প্রাণ হয়ে নিজেকে তাঁতে ডুবিয়ে রাখা। এটা বলার জন্যই ভগবান শ্লোকের শেষ লাইনটা বললেন। এই ভক্তি কথাটার উল্লেখ যেন তাঁর তারকব্রহ্মতত্ত্বটা বোঝাবার শেষ কথা। সেই বিজ্ঞানটা সুন্দরভাবে বর্ণনা করে তার ফল যে ভক্তি এবং সেই ভক্তিদ্বারা পরমাত্মভাবে মগ্ন হলেই অনাবৃত্তি হয়। আর সেই পরমাত্মপদ পেতে হলে মহাকালস্বরূপ অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা, সেই অক্ষরকে তোমার তিন গ্রন্থিতে দেখে নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হতে হয়। এটাই সাধন সমর। ৮/২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ।।২৩

অনুবাদ: হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে যে কালে অর্থাৎ কালরূপ পথে (মরণান্তে প্রয়াত হইয়া যোগীগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) এবং পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনরাগমন) প্রাপ্ত হন, সেই কাল অর্থাৎ কালরূপ পথ কহিতেছি ॥ ৮/২৩

ব্যাখ্যা: যোগী যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে চান তাহলে তাঁকে কোন সময় দেহত্যাগ করতে হবে এবং যদি পুনর্জন্ম এড়াতে চান তবে কোন সময়ে তাঁকে দেহত্যাগ করতে হবে, সে সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকদের মত গীতা এখানে বিবৃত করছে। অবশ্য একথায় মনে হতে পারে যে কোনও বিশেষ কালব্যাপ্তিতে মৃত্যু হওয়াই ফল তারতম্যের কারণ ; যেন এসময় দেহত্যাগ করলে মুক্তি হবে অথবা ঐসময় দেহতাগ করলে পুনর্জন্ম হবে কিন্তু আসলে এমন নয়। গতির কারণ অনুবেদন, কাল উপচার মাত্র। একই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী ও অব্রহ্মজ্ঞ অজ্ঞানী দেহত্যাগ করলেও উভয়েরই গতি যে কালগত ফল অনুযায়ী হবে এমন ভাবার কারণ নেই। কাল বলতে এখানে যে কালাভিমানী পুরুষের সহায়তায় অনাবৃত্তি লাভ হয় বা যে কালাধিকার দিয়ে যেতে হয় সেই কালের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই অক্ষর ব্রহ্মকে পরমাগতি বলা হয়েছে। মৃত্যু অথবা মুক্তির পথে তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা, অহোরাত্রিময় পুরুষ। মুক্তি অথবা ভোগের পথে জীবের যে গতি, তিনিই সেই গতিশক্তি। এজন্যই তাঁরই কাল, তিনিই কালাধীশ। কোন জীব দেহত্যাগ করে কোন মার্গে, কি ভাবে, তাঁতে মিলিত হয় অথবা মিলিত হয়েও অজ্ঞানতার আবরণের জন্য, অননুবেদনের জন্য আবার ভূতযোনিতে ফিরতে বাধ্য হবে, সেটা স্পষ্ট করে, সৃষ্ট প্রিয়জীবকে বুঝিয়ে দিতে তিনি যেন বদ্ধপরিকর। এজন্যই এ অধ্যায়ের নাম তারকব্রহ্মযোগ। অক্ষরব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব ও জীবের গতাগতির বিজ্ঞান এখানে পূর্ণমাত্রায় বলা আছে। তাই মূল কথা হল সংসারেই থাক আর সন্ন্যাসই নাও, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে যদি পার তবেই সে তারকব্রহ্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হয়ে, নিজের গ্রন্থিত্রয়ে যদি তাঁর সেই অধিদৈবাদি মূর্ত্তির সাথে পরিচিত হতে পার এবং সে পরিচয় বেশ নিবিড়, ঘন হয়ে তাঁকেই নিজের আত্মা বলে বোধ করতে পার, তবেই সে বেদনে অনুবেদিত হয়ে তদনুরক্তিতে, তাঁতে সমস্ত প্রাণ ডুবে গেলে তখন সে, অনাবৃত্তিরূপ গতিলাভ করবে এবং সেইমত উপযুক্ত কালমার্গ অবলম্বন করতে সমর্থ হবে। কিন্তু সেই কর্ম্মমার্গ ভালমত অবলম্বন করেও যদি তাঁর তারকব্রহ্মত্ব দেখার সুযোগ না হয়, তবে তাকেও পুনরাবর্তনরূপ গতিলাভের উপযোগী কালমার্গ পেতে বাধ্য হতে হবে। আর সন্ন্যাসীর তো কথাই নেই। সে তো না ঘরকা না ঘাটকা, তার কোনও দিকই নেই। পুরোটাই তার দেনায় দেউলিয়া। এজন্য আগেই বলেছি গতির কারণ অনুবেদন, কাল উপচার মাত্র। তাই যোগবলে মরতে পারার মত শক্তি না হলে বাহ্য উত্তরায়ণে মরলেও মুক্তিলাভ হয় না। জ্ঞানী সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় তাঁর প্রাণের উৎক্রামণ হয় না। বেদে আছে " ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি "। কারণ তখন ক্রিয়ার পরঅবস্থায় জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণ সমেত পরমাত্মায় লয় হয়ে থাকে। মনের চিন্মাত্রে স্থিতিলাভ হলে শরীরও ব্রহ্মময় হয়ে যায়, তখন ইন্দ্রিয় সকলেরও কোনও বিষয় না থাকায় কর্ম্মও থাকে না, দেহটা শুধু শুকনো পাতার মত পড়ে থাকে। কারণ দেহী তো ব্রহ্মময় অবস্থায়, তাই তার আর দেহ হতে উৎক্রান্তি হবে কি করে ? এটাই তো এঁদের জীবন্মুক্তি। আর যাঁরা এমন জীবন্মুক্ত হননি, হতে পারেন নি, তাঁদেরও মুক্তি হয় তবে তা দেহান্তের পর। কারও ঠিক পরেই, কারও বা কিছুকাল পরে। একে ক্রমমুক্তি বলে যা আসলে বিদেহমুক্তি। এবিষয়ে ভগবান এর পরের শ্লোকে বলবেন ॥ ৮/২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ।। ২৪

অনুবাদ: অগ্নি এবং জ্যোতিঃ (তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাধিষ্ঠত্রী দেবতা) উত্তরায়ণরূপ ষন্মাস (উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ঐ দেবতাগণের যে মার্গ, তাহাতে গমনশীল ব্রহ্মাত্মাগণ (মৃত্যুর পর) ব্রহ্মকে পান ॥৮/২৪

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটা পড়লে এবং অর্থ করতে গেলে প্রথমে কেমন হেঁয়ালীর মত বোধ হয়। অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ, ষন্মাস ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ব্রহ্মত্বলাভ বেশ জটিল, মোটেই সহজবোধ্য নয় বরং বহু রকমের অর্থ বোঝায়। এখানে প্রথমে শুক্লাগতি বলতে অনাবৃত্তি মার্গের কথা বলা হয়েছে। স্থূল অর্থে অগ্নি বলতে অন্তেষ্টিক্রিয়ায় চিতার আগুনকেই বোঝায়। বেদে আছে " যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ ন, অচ্চিষমেব অভিসম্ভবন্তি " – মানে শব্য বা অন্তেষ্টিক্রিয়া কর বা না কর, আত্মজ্ঞ পুরুষ জ্যোতিম্মার্গ লাভ করেন। তাই স্থূল চিতাগ্নির কথা বাদ দিচ্ছি। তবে কোন আগুনে ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মগতি সূচনা হয় ? দেহত্যাগের ঠিক আগে পঞ্চপ্রাণ আত্মার সাথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। যে পঞ্চপ্রাণ নিয়েই দেহীর বেঁচে থাকা রূপ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ (fire work) নিষ্পন্ন হচ্ছিল, সেই আগুনই বৈশ্বানর, অগ্নি, যাতে প্রাণ সহ আত্মা ঐভাবে হৃদয়ে প্রবেশের পর হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই প্রদীপ্ত হওয়া বা প্রদ্যোতনই জ্যোতি। "এতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈব আত্মা নিষ্ক্রমতি।" এই প্রদ্যোতন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের পূর্ণ মাত্রায় হয় এবং সেই জ্যোতি অবলম্বনে মুর্দ্ধাভিমুখে সূর্য্যনাড়ীতে দিবাভিমানী পুরুষকে পেয়ে বিজ্ঞানময় হন। এখানে সূর্য্যনাড়ী আত্মজ্ঞানোজ্জ্বল বোধপ্রবাহ। এই জ্ঞান দুচার পাতা বেদান্ত পাঠ করে অথবা আত্মা অনাত্মার মৌখিক বিচার দ্বারা হয় না। বহু সাধন করতে হয়। তবে যাঁরা ততটা এগোতে পারেননি এমন উচ্চাধিকার সম্পন্ন যোগীরাও প্রস্তুত হয়েই দেহত্যাগ করেন। ছয়মাস দিন রাত ক্রিয়া করতে করতে সামনে কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের মত শ্বেতবর্ণ জ্যোতির প্রকাশ হয়, সবদিক যেন প্রজ্জ্বলিত শিখার মত জ্বলে ওঠে আর তার ভিতর অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ প্রকাশ হয়ে চার দিক দিনের আলোর মত আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এটাই হল উত্তরায়ণের পথ। এ পথে গেলেই উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সারা জীবন ধরে প্রাণায়াম অভ্যাস করে সুষুম্নার দ্বার সব সময়ের জন্য খুলে গেলে এমন হয়। তখনই গুরুপদেশ মত ওঁকার ক্রিয়া করে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে প্রাণ বের করে ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন। প্রাচীনকালে ভীষ্ম প্রমুখ বহু যোগী এবং বর্ত্তমান কালেও

কিছু কিছু অঞ্চলে কয়েকজনের এভাবে দেহত্যাগের কথা জানা যায়। তবে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে না জানলেও বা সাধনকর্ম্মে এতটা অগ্রসর না হলেও ক্রিয়া সাধকগণ সাধনকালে যে বহুবিধ জ্যোতি দর্শন করেন তাঁরাও শক্তিমান দেবতা যাঁরা ব্রহ্মলোক গমনে দেবযান পন্থায় জীবকে ভিন্নভিন্ন উচ্চতর স্থানে নিয়ে যান যদিও ব্রহ্মলোকে নিতে পারেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে একথা বলা হয়েছে। পিঙ্গলা এই দেবযান মার্গ। ঐ নাড়ীতে মনকে সমাহিত করে সাধন করলে জ্যোর্তিময় দেবপথে উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধগমন ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এজন্যই সূর্য্যনাড়ী পাওয়াই দিবাভিমানী দেবতাকে পাওয়া। ক্রিয়া করলেই অগ্নির্জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ওটাই পঞ্চতত্ত্বের তেজের অগ্নি বা তেজ। পঞ্চাগ্নি হল অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চন্দ্র ও কূটস্থ। এটাই ভিতরের পঞ্চাতপারূপ তপস্যা। একমাস পরে এক বছর কূটস্থে থেকে তপস্যা করলে নিজের মত এক পুরুষ দেখেন। পরে যিনি চন্দ্রের মধ্যেও, বিদ্যুতের মধ্যেও ঐরকমই দেখতে পান, তিনিই ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। এটাই দেবযান গতি। কূটস্থের মধ্যে যে নক্ষত্র দেখা যায় উনিই এই শরীরের কর্ত্তা, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। ক্রিয়া দ্বারা এই ব্রহ্মে চিত্ত থাকলেই আর অন্ত তঃ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবার দরকার হয় না। সকাম সাধকেরা এভাবে দেহত্যাগ করতে পারেন না তাই ওঁদের পুনরাবৃত্তি হয়। একমাত্র জীবন্মুক্ত পুরুষ বাদে কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সবারই মৃত্যুসময়ে ইন্দ্রিয়সকল মনে এবং মন মুখ্য প্রাণে লয় হয় ; মুখ্যপ্রাণ ভূত-সূক্ষ্মকে আশ্রয় করে। এপর্য্যন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভিতর কোনও পার্থক্য নেই। এর পর থেকে পথটা আলাদা হয়ে যায়। অজ্ঞানী তার কর্ম্মোপযুক্ত নাড়ী দিয়ে বের হয়ে নিজের কর্ম্মানুযায়ী তেমন লোক পেয়ে থাকেন ; কিন্তু জ্ঞানী তাঁর হৃদয়ের একশত নাড়ীর মধ্যে যেটা মূর্দ্ধাভিমুখে গেছে সেই সুষুম্নাকে অবলম্বন করে উপরদিকে গিয়ে ব্রহ্মস্বরূপকে পেয়ে থাকেন। এটা কিছুটা অভ্যাস থাকলেই হবে। তবে সারাজীবন ধরে অভ্যাসটা (practice) আগে থেকেই করে রাখতে হবে এবং চালিয়ে যেতে হবে। মস্তিষ্কের (brain) দুটো ভাগ, বড় ও ছোট ভাগ। বড়টা অধ্যাত্মের ভাষায় দেবলোক, যা বাহ্যে সূর্য্যদ্যুতিময় উর্দ্ধাকাশ (cerebrum), ছোট ভাগটার (cerebellus) সান্নিধ্যে প্রাণকেন্দ্র, যোগশাস্ত্রের চন্দ্রমা (lunar) সামনের দিক থেকে তালুমূলের কাছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে "তালুমূলে বসেচ্চন্দ্র"। ছোট বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটা পিতৃলোক নামে খ্যাত। এই চন্দ্রগ্রন্থি ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক জীবের সমস্ত শারীর বীজ ও শক্তির উপর আধিপত্য করে। জীবের ভূতাভিমানজাত জ্ঞানসংস্কার বীজাকারে এই পিতৃলোকে থাকে আর সেই সংস্কার শক্তিগুলো শরীরের সমস্ত বীজ, পেশী ও পরিচালক স্নায়ুর উপর কর্তৃত্ব করে। মূর্দ্ধার এই স্থানে প্রয়াণকালে আসার নামই চন্দ্রমার অধিকারে আসা। এই অধ্যাত্ম চন্দ্রলোকেও বাহ্য অন্তঃরীক্ষের মত দুই পক্ষ আছে – বড় মস্তিষ্কজাত আত্মবোধ সম্পর্কিত জ্ঞানক্রিয়া থেকে যে ধ্রুবজ্ঞান জন্মে শক্তির আকারে বিকীর্ণ হয়ে ছোট বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ও চন্দ্রে এসে সংস্কার তৈরী বা বীজশক্তিরূপে সংগৃহীত হচ্ছে সেটি কৃষ্ণপক্ষ আর যেদিকে সেই সংগৃহীত বীজশক্তি বা সংস্কার ভূতাভিমানী জীবের উপর আধিপত্য করে সেটিই শুক্লপক্ষ। একদিকে পিতৃলোক শক্তিসংগ্রহে বা অনুগ্রহণে নিযুক্ত অর্থাৎ সেদিকে জাগ্রত এবং অপর যে দিকে বিশেষ কিছুই করতে হচ্ছে না সেই দিকটা রাত্রি। তাই কৃষ্ণপক্ষই পিতৃলোকের দিন আর যে দিকে পিতৃলোককে বিশেষ কিছুই করতে হয় না সে দিকটাই রাত্রি। তাই কৃষ্ণপক্ষই পিতৃলোকের দিন ও শুক্লপক্ষই রাত্রি। আত্মজ্ঞ পুরুষ পিতৃলোকের এই রাত্রিকালের ভিতর দিয়েই পিতৃলোক অতিক্রম করেন। কারণ আত্মবোধ প্রকাশরূপ সূর্য্যালোকে সমস্ত সংস্কার দগ্ধবীজের মত মৃতকল্প হয়ে যায়। এখানে এই অধ্যাত্ম দিবাই প্রধান। বাহ্য অহঃ (দিবা) শুক্লপক্ষ উপচারস্বরূপ।

এখন বৃহৎ মস্তিষ্ক বা গুরুমস্তিষ্কের (cerebrum) কথায় আসি। এটা হল সমগ্র চেতনশক্তির সমুদ্র, বিজ্ঞান দেবতাময় ঈশানভূমি, যার বাহ্যে সূর্য্য দ্যুতিময় ঊর্দ্ধাকাশ, অধ্যাত্মের দেবলোক। এই ক্ষেত্রের গতি দুইভাগে বিভক্ত – এক ঊর্দ্ধ বা উত্তরমুখে বা বিশুদ্ধচিৎমুখে - এটা উত্তরায়ণ। আর একটি নিম্ন বা দক্ষিণমুখে বা ভূতক্ষেত্রমুখে যা হল দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ হল ব্রহ্মের অকর্ষণী শক্তি আর দক্ষিণায়ন হল বিকর্ষণী শক্তি।

দক্ষিণাভিমুখী গতিতে যেমন চন্দ্র ও পিতৃলোকরূপ স্বায়ত্বশাসনশক্তিতুল্য কেন্দ্র (দেহের সমগ্র ভৌতিক অংশের নিয়ন্ত্রণ এই লঘু মস্তিষ্ক ও চন্দ্রগ্রন্থির উপর থাকে), উত্তর বা ঊর্দ্ধগতিতেও তেমনই সমস্ত জ্ঞানের মূলস্বরূপ আত্মবোধটা কেন্দ্ররূপে সংন্যস্ত। জীবের সমস্ত বিজ্ঞানক্রিয়া আত্মবোধরূপ এই উত্তরাভিমুখে আকৃষ্ট। এটাই ব্রহ্মের আকর্ষণী শক্তি, এই আকর্ষণী শক্তির কেন্দ্রই ধ্রুবলোক যার ব্রহ্মবোধের সাথে সরাসরি সম্বন্ধ। এখানে যাওয়াই অক্ষরপুরুষ ব্রহ্মাকে পাওয়া। গীতায় ভগবান ব্রহ্মাভিমুখী গতি এপর্য্যন্তই বলেছেন। বেদে অবশ্য ঊর্দ্ধভূমির বিশ্লেষণ আরও আরও কিছুটা করা আছে। বাকিটা যা বলা হল না তা ব্যবহারিক অংশ (practical part) যে অভ্যাসের দ্বারা (practice) জীবের ক্রমবিকাশ (evolution) ঊর্দ্ধমুখে তরান্বিত হয়। যোগাভ্যাসই হল সে পদ্ধতি যার দ্বারা শরীর তথা মস্তিষ্কে exercise দ্বারা সঠিক জ্ঞান পেয়ে চেতনার ভূমিকে প্রসারিত করা। যার উদ্দেশ্য sublimation এবং perfection, আরও উন্নততর অবস্থালাভের জন্য যাতে ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে দেহত্যাগের সময়ের মধ্যেই অধ্যাত্মে ও তার অনুসরণে অধিদৈবে ব্রহ্মানুসরণে এগিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় ॥ ৮/২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ।।২৫

অনুবাদ: ধূম (ধুমাভিমানিনী দেবতা), রাত্রি (রাত্রিভামিনী দেবতা), কৃষ্ণ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা), দক্ষিণায়ন রূপ ষন্মাস (দক্ষিণাভিমানী দেবতা), কর্ম্মযোগীগণ (মরণান্তে) এই সকল দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং ভোগাবসানে তথা হইতে সংসারে পুনরাগমন করেন। ৮/২৫

ব্যাখ্যা : পূর্ব্বশ্লোকের অনাবৃত্তি মার্গ ও দেবযানের পর এবার ভগবান এই শ্লোকে আবৃত্তিমার্গ এবং পিতৃযানের কথা বলছেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের দেবযানের ক্রমগুলো (sequences) খুব ভালমত লক্ষ্য করলে তার বিপরীত গতির ক্রমটিও সহজেই অনুমান করা যায়। এটা উত্তরায়ণের ঠিক উল্টোপথ। এইভাবে অনাবৃত্তি ও আবৃত্তিমার্গকে উপনিষদে যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান বলা হয়েছে এখানে যার ব্যবহারিক অংশগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। যৌগিক অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে আমাদের মধ্যে জ্যোতির শক্তি ও অন্ধকারের শক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে তাতে প্রথমোক্ত শক্তিগুলো দিন বা অন্য আলোর সময় প্রবল হয় এবং শেষোক্ত শক্তিগুলো রাত্রি বা অন্য অন্ধকারের সময় প্রবল হয় এবং এভাবে যতদিন না অন্ধকারের শক্তিগুলো সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হচ্ছে ততদিন ক্রমান্বয়ে এমনই চলতে থাকে। স্থূল ইন্দ্রিয়গুলোই জীবের কর্ম্ম করার কারণ। মৃত্যুর পর সেগুলো সংপিন্ডিত হয়ে গেলে ইন্দ্রিয়শক্তি সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী শক্তিগুলো, এখানে যাদের দেবতা বলা হয়েছে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্নিহিত হয়ে যায়, যা শেষে চন্দ্ররূপ হয়ে যায় মানে মনোময় মাত্র হয়ে যায়। এই মন ও চন্দ্রমা একই বস্তু ‘চন্দ্রমা মনসা যাতা’ ঘুমিয়ে পড়লেও সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সুপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তর্নিহিত হয়ে যায়। কিন্তু সে অবস্থাতেও মনের ভোগ হয়। এই ভোগকাল বা চান্দ্রশরীর ততদিন থাকে, যতদিন ভোগের ক্ষয় না হয়। ভোগের ক্ষয় হলেই জীবের অবরোহণ হতে থাকে এইভাবে। এটাই সেই বিপরীত গতির ক্রম (reverse sequences) পিতৃযান। অনাত্মজ্ঞ অজ্ঞানী দেহত্যাগের আগে হৃদয়েও মূঢ়ভাবেই প্রবিষ্ট হয়। প্রাণসকল তারই সাথে হৃদয়ে প্রবেশ করলেও আত্মবোধের অজ্ঞতার জন্য, আত্মজ্ঞান না থাকার জন্য, সেখানে সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না – শুধুই ধোঁয়া মাত্র থাকে, যাকে এখানে ধূমময় হয় বলা হয়েছে। ঐ যে বিষয়জ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করার ফলস্বরূপই নিদ্রার মত গাঢ় অজ্ঞানতাই অধিকার বিস্তার করে হৃদয়াগ্রভাগে আত্মবোধরূপ দিবা অস্তমিত ও আত্মবিস্মৃতিরূপ নিশার অভ্যুদয় হয়। সুতরাং অনাত্মসংস্কারসকল যে পক্ষে প্রভাবশীল, চন্দ্রমার সেই কৃষ্ণপক্ষই তারা পেয়ে থাকে। এবার আবার সেই সংস্কারসকলের পুনরভ্যুদয়ের জন্য বিকর্ষণীশক্তির (repulsive force) প্রয়োজনে দেবলোকের দক্ষিণায়ন রূপ ষন্মাসাভিমানী দেবতাকে পেয়ে পুনরায় চন্দ্রমার স্থান লাভ করে এবং সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে মর্ত্তে পুনরাবর্ত্তন করে মাসসমূহ পিতৃলোকে, সেখান থেকে আকাশে, আকাশ থেকে চন্দ্রমায় সেখান থেকে জ্যোৎস্না অবলম্বনে ব্রীহি যবাদিতে প্রবিষ্ট হয় (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫/১০)। তবে বলি এতে ভয়ের কিছু নেই, কারণ চন্দ্রমণ্ডল হতে অবরোহণের সময় জীব সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় সে অবস্থায় কোনও অনুভবই থাকে না। আর ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত ব্রীহী যবাদির দেহগুলো তো ভোগদেহই নয়, পৃথিবীতে আসার জন্য ঐ অবস্থাগুলোকে আশ্রয় করে আসতে হয় মাত্র। আসল কথা অধ্যাত্মে অজ্ঞ যিনি তিনি মুর্দ্ধার পূর্ব্ববর্ণিত পিতৃলোক অবধি গিয়ে, দেবলোকে মানে বৃহৎ মস্তিষ্কে ঢুকেও অক্ষর পুরুষকে পায় না। সুতরাং আকর্ষণী শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ সেই শূন্য অব্যক্ত হয়ে যায় এবং বিরাটেও চন্দ্রলোক অভিমুখে অজ্ঞান অবস্থায়ই ফিরে আসে। দেহত্যাগের আগে কিন্তু অধ্যাত্মে এই দুই রকম গতি হয়ে তবেই বিরাটে নিষ্ক্রান্ত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে –

“যোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ”

অর্থাৎ যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, যে পুরুষের প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ধান্ধাবাজ সন্ন্যাসীরা বলে থাকেন যে ও সমস্ত জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠানসাপেক্ষ দেবযান মার্গ শুধুমাত্র সংসারীদেরই ক্রমমুক্তির পথ। যেহেতু তাঁরা বংশ বিস্তার দ্বারা সৃষ্টিরক্ষণ ও বিবর্দ্ধন কর্ম্মে অংশীদার। কিন্তু সন্ন্যাসীর ব্রহ্মলাভ স্বতঃই এখানেই হয়ে থাকে, সেজন্য সন্ন্যাসীর ব্রহ্মলাভের জন্য কোনও কিছুই অতিক্রমের দরকার নেই। কথাটা কি অকিঞ্চিৎকর সাম্প্রদায়িক মোহেরই পরিচায়ক নয় ? ব্রহ্মবিৎ হতে পারলে, তবেই, গৃহী বা সন্ন্যাসী যাই হন, এই দেবযানে তাঁকে যেতেই হবে। কেননা স্থূল দেহতো সন্ন্যাসীকেও ত্যাগ করতে হবে অবশ্যই। স্থূলদেহ ত্যাগ হলেই দেবযান ও পিতৃযানে যেভাবে বলা আছে সেই ক্রম অনুসারে অধ্যাত্মে সেভাবেই গতিলাভ হয় তবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে জীবম্মুক্ত হতে পারলে,সে গৃহী বা সন্ন্যাসী যাই হন, তাঁর দেবযানের পথে যাওয়াটা আগে থেকেই সিদ্ধ হয়ে থাকে বলে দেহত্যাগের সময় যে নতুন করে একটা গতি বা বেগ লাভ হয়, জীবম্মুক্ত পুরুষ সেটা অনুভব করেন না। এজন্যই বেদে বলা আছে “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি” কিন্তু যাঁরা এতদুর এগোতে পারেননি এবং ব্রহ্মবোধে সিদ্ধ হন নাই তাঁরাই দেবযান গতি অনুভব করেন। এখানে অবশ্য শুধু দক্ষিণায়নই আলোচ্য বিষয় ছিল। যাই হোক যাঁরা যোগাভ্যাস আদি করেন না, অথচ সুকর্ম্মকারী গৃহী তাঁরাই দক্ষিণায়নে পিতৃযান গতি প্রাপ্ত হন। প্রকৃত দেহত্যাগ এই দুই ভাবেই হয়। আর কর্ম্মবিমুখ সন্ন্যাসের পরিনাম কি ?

“সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুঅযোগতঃ।” অর্থাৎ এতদুভয়ের কোনও পথ দ্বারাই তাঁরা গমন করেন না ফলে নিত্য আবর্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে জাত হয়, যেটা হল তৃতীয় স্থান। এটা বেদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং পিতৃযানও একটা মহামার্গ। যদিও এটা উত্তরায়ণের উল্টোপথ এবং এতে দেহত্যাগ হলে স্বর্গাদি

ভোগানন্তর আবার মর্ত্তলোকে ফিরে আসতে হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও একই ভাবে দক্ষিণায়নের পর পিতৃলোকাদি হয়ে চন্দ্রমণ্ডলে গমনের কথা আছে। দক্ষিণায়নের মৃত্যু তো আর ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়, মৃত্যু যেন তাকে টেনে নিয়ে যায়। অল্পস্বল্পমাত্র ক্রিয়া করলে আর উত্তরায়ণ গতি হয় না। কারণ কূটস্থের প্রকাশ তেমন হয় না। মন চঞ্চল থাকলে রাত্রির অন্ধকারের মত তামসী শক্তির বিকাশ হয়। অল্পসময়ের জন্য যে একটু জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেও ক্ষণস্থায়ী, স্বল্পপ্রকাশ যুক্ত। তবে ভক্তিমান প্রাজ্ঞ যোগী যখনই দেখেন তাঁর মনে তখনও বিষয়ের ছায়া পড়ছে, কূটস্থদর্শন ঠিকমত স্পষ্ট হচ্ছে না, তখন পরিশ্রম করে ছয়মাস দিনরাত ক্রিয়া করতে থাকেন ফলে স্পষ্টভাবে কূটস্থ দেখতে পান। আয়ু ও শক্তি থাকলে আরও ছয়মাস পরিশ্রম করে ক্রিয়া করলে খুবই বড় কূটস্থজ্যোতির প্রকাশ অনুভব হতে থাকে, সেসময়ও যদি মৃত্যু হয় তাহলেও আর পুনরাবৃত্তি হয় না। দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে গতি হয়ে যায়। সূর্য্যের আলো আর চাঁদের আলোর মধ্যে যে তফাৎ, সাধারণ যোগাভ্যাসীর সাথে প্রকৃত সিদ্ধ জ্ঞানীরও সেই পার্থক্য। যোগীদের ভৌতিক বস্তুর প্রতি মন গেলেই জগদ্ ব্যাপার আরম্ভ হয় তখন জ্ঞানের বিভূতি নষ্ট হয় ও অল্পসুখে মোহিত হয়ে বিবেকভ্রষ্ট হয়ে যায়, তখনও কিছু জ্ঞান থাকলেও সেটা চন্দ্রালোক মাত্র। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় তেমনই বিমূঢ় যোগীদের স্থিরতা থাকে না, ফলে গতিও দক্ষিণায়নেই হয়ে থাকে। কিন্তু আত্মবোধসম্পন্ন থাকলে প্রাণাগ্নি প্রদ্যোতনশীল থাকে ও জীব বাঙ্ময় থাকে কারণ অগ্নির অন্বিষ্ঠ অংশই বাক্। আত্মজ্ঞান অব্যক্ত হওয়ার অর্থই বাঙ্ময়ত্ব অব্যক্ত হওয়া। এই বাকের অব্যক্ততাই ধূম ও রাত্রিলাভের কারণ ॥ ৮/২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ।। ২৬

অনুবাদ: "প্রকাশময় অর্চ্চিরাদি শুক্লগতি এবং তমোময় ধূমাদি কৃষ্ণগতি" জগতের এই দুই মার্গ অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে ; এই দুয়ের মধ্যে একটি (শুক্লাগতি) দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, অপরটি (কৃষ্ণাগতি) দ্বারা পুনরায় সংসারে আগমন হয় ॥ ৮/২৬

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের আগেরও আগে ২৪ নং শ্লোকে শুক্লাগতি এবং ২৫ নং শ্লোকে কৃষ্ণাগতির যে কথা বলা হয়েছে এই দুটো গতি বা মার্গ বা পথ অনাদিকাল থেকেই রয়েছে। সর্ব্বভূতের পক্ষে এ গতিদ্বয় নিত্য যার একটার দ্বারা লাভ হয় মুক্তি বা অনাবৃত্তি আর অন্যটার দ্বারা হয় পুনরাবর্তন। এখন এই দুটো পথের উপসংহার করে ভগবান বলছেন হে জীব, অনাবর্তন ও আবর্তনের দুটো পথ বুঝে নিয়ে সাবধানে না চললে কৃষ্ণাগতির চেয়েও নিকৃষ্টা গতিলাভ হতে পারে। শুক্লাগতিতে চিরদিনের জন্য আমাতে এসে আমাতেই স্থান পাবে। গুরুপদেশ মত সাধনশীল ও উৎসাহশীল হলে এ পথের সাক্ষাৎ এজন্মেই বহুবার হয়। সাধকদের মৃত্যুসময়ে আগের আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেমন যেমন বলা আছে ঠিক তেমনি ভাবেই কোটি চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশ হয়, চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে সৌদামিনীসমা জ্যোতির প্রকাশ ঘটে যার ভিতর থাকেন পুরুষোত্তম নারায়ণ। এটাই সালোক্য মুক্তি, সারূপ্য ও সাযুজ্য আরও পরে হয়। দেবযানের কথায় অগ্নি ও জ্যোতির কথা আগেই বলেছি। অতএব তারকব্রহ্ম কিভাবে জীবকে পরিচালিত করেন সেটা বিশদভাবে বলে শেষে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁকে চিনতে না পারলে কিভাবে অজ্ঞানান্ধকারের পথে বীজ সংস্কারের গণ্ডিতে পুনরাবর্ত্তন করে আবার মর্ত্তে ফিরবে। এথেকে কারও রেহাই নেই। এ বিধান শাশ্বত ॥ ৮/২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ।। ২৭

অনুবাদ: হে পার্থ, মোক্ষ ও সংসারপ্রাপক এই দুই মার্গ জানিলে কোন যোগী মোহিত হন না। (সুখবুদ্ধিবশতঃ স্বর্গাদিফল কামনা করেন না।) অতএব, হে অর্জুন, তুমি সদা যোগযুক্ত হও ॥ ৮/২৭

ব্যাখ্যা : ২৪ ও ২৫ নং শ্লোকের মধ্য দিয়ে ভগবান সাদা আর কালো রূপে নিত্যজগতের গতি ও সেই মার্গজ্ঞানের ফলাফল দেখিয়ে এখন ভক্তিযোগে তার উপসংহার করছেন। বলছেন এই মার্গ জ্ঞাত হলে, এই জ্ঞান সজাগ থাকলে, কোনও যোগী আর স্বর্গ ভোগ লালসায় মুগ্ধ হয় না, কারণ তাঁরা জানতে পারেন যে স্বর্গ থেকেও পতনের আশঙ্কা থাকে। তাই স্বর্গের উর্দ্ধস্থানরূপ মহাকাশে স্থিতিলাভের চেষ্টা করেন। যদি এখনও কেউ তা না করেন, তবে বুঝতে হবে যে তিনি এখনও বোঝেননি, অধিদৈবাদি ত্রিভঙ্গিম তারকরূপ এখনও তার চোখে প্রতিভাত হয় নি। এই অক্ষর তারকব্রহ্মজ্ঞানই তোমাদের একমাত্র তরণী। এরই অবলম্বনে সচেষ্ট হও, শুক্লাগতি অবশ্যই লাভ করবে। সর্ব্বদা ইড়া পিঙ্গলার মিলনরূপ যোগে যুক্ত হও অর্থাৎ ২৪ নং শ্লোকে যেমন বলা আছে সেই মত সর্ব্বদা সুষুম্নায় যুক্ত হও, লেগে থাক। কূটস্থ জ্যোতিমধ্যে পুরুষোত্তমকে দর্শন করে বার বার যাতায়াতের শেষ হোক। আর এই চেষ্টাতেই সর্ব্বদা লেগে থাক। এটাই ভগবানের অনুস্মরণ, এটাই যোগযুক্ত হয়ে থাকা। তাই যোগাভ্যাস কর। যোগাভ্যাস করে ধ্যানধারণা আয়ত্ত কর। ধ্যানের গভীরাবস্থায় নিজেকে ভুলে যাবে তখনই মায়ার স্পর্শের বাইরের জগতে পৌঁছাবে। যোগদর্শনের কৈবল্যপাদে আছে – " তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ " । ৮/২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ।। ২৮

অনুবাদ: বেদ সকলে, যজ্ঞসকলে, তপস্যা সকলে, দানে যে পূণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, আমার কথিত এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং জগতের মূলভূত পরমস্থান অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্ত হন। ৮/২৮

ব্যাখ্যা : জীবাত্মা বিকাশ ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে যে পরমকাম্য অবস্থা বা পরমপদের দিকে এগিয়ে যায় যোগী তাইই লাভ করেন; সেখানেই চূড়ান্ত; সেখানে আর কোনও বিবর্ত্তন নেই, গতিও নেই সেটাই আদি ও শাশ্বত স্থান। এই শুভ পরিণতির আশায় সবাই কত রকম দান, তপস্যা, বেদ অধ্যায়নাদি যত কিছু পূণ্যফলপ্রদ কাজ কর্ম্ম করে থাকে সেসমস্ত কিছুরই ফল নশ্বর (transitory), কোনওটাই অক্ষয় নয়। কিন্তু এই তারকব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে যোগী অবিনশ্বর (permanent) ফল লাভ করেন। আর সমস্ত রকম পূণ্যকর্ম্মফল এর কাছে কিছুই নয়। বিশ্বের মূলীভূত কারণ পরমব্রহ্মে স্থানলাভই ক্ষরণময় কর্ম্মের ক্ষরণময় ফলভোগ হতে অনন্ত নিবৃত্তি। কিন্তু শুধুমাত্র এটা বুদ্ধিতে বুঝে নিলেই কি ফল হবে ? না শুধু বুঝলেই হবে না। এ জ্ঞান এমন মাত্রায় হওয়া চাই, যাতে তার প্রতি অনন্যাভক্তির উদয় হয়। এমন অনন্যা ভক্তির উদয় হলেই বুঝবে যে এ জ্ঞানে অধিকার এসেছে। কারণ, আনুমানিক বস্তুতে অহৈতুকী ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং তারক পুরুষকে ধ্রুব বোধে নিজের সর্ব্বতঃ আশ্রয় বলে না দেখা গেলে ভক্তির উদয় হয় না, মোহও কাটে না। সেটা কিভাবে হবে ? ক্রিয়া করতে করতে মাঝে মাঝে একাসনে ২০৭৩৬ বার প্রাণায়াম করলে ধ্যানাবস্থা সুদীর্ঘ হয়। ঐ অবস্থায় যিনি সর্ব্বদা থাকেন তিনিই মুক্তপুরুষ। এ অবস্থাই বিষ্ণুর পরমপদ। তাহলে এটা বোঝা গেল প্রাণায়াম অভ্যাস ও তাতে পটু হওয়া দরকার। এই অভ্যাস দ্বারাই প্রাণের উর্দ্ধগতি লাভ হয় ও স্থির হয়। তখন ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। এর কাছে সকল বিভূতি তুচ্ছ। ইন্দ্রিয় ও মনের সকল চপলতা দূর হয়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে, সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণেই পরমপদ প্রকাশিত হয়। তা নইলে এ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অবিনশ্বর ফল পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষাবগম জ্ঞান হওয়া চাই ; তবেই আসবে এ শ্রদ্ধাভক্তির পূত প্রবাহ, ক্রিয়ার পর অবস্থা। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীভগবান সে কথাই বিশেষভাবে সবিজ্ঞান আলোচনা করেছেন ॥ ৮/২৮

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগ নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু প্রদীপিকা নামক গীতার অষ্টম অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ: এই অধ্যায়ের নাম অক্ষরব্রহ্মযোগ। অক্ষর অর্থ ন - ক্ষর অর্থাৎ যাঁর ক্ষয় নাই। একমাত্র সেই স্থির প্রাণরূপ আত্মা, কূটস্থচৈতন্যই অক্ষয় ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মার বৃহৎ অবস্থারূপ পরমাত্মভাবই ব্রহ্ম। "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে"। অক্ষররূপ আত্মভাব এবং ব্রহ্মরূপ পরমাত্মভাব এই দুটোভাব এক হয়ে যাবার নামই অক্ষরব্রহ্মযোগ। পরমাত্মতত্ত্বের মূল – পরমেশ্বরত্বই অক্ষর বা তারক ব্রহ্মরূপে পরিচিত। পুরে পুরে, দেশে দেশে, যুগে যুগে, ক্ষরভাবময় বহু জীব হয়ে এবং তার মূলে কূটস্থ অক্ষররূপে থেকে ইনিই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাই একদিকে তিনি ক্ষরভাবময় জীব, সেই ক্ষরণ শক্তির উপর অধিষ্ঠিত বলে এঁর নাম অধিভূতপুরুষ। আবার সেই ক্ষর জীবশক্তির আধারস্বরূপ জড় জগতের শক্তিকেন্দ্র (সূর্য্যাদি) রূপে ইনি অধিদৈব পুরুষ। আর যে পরম আত্মতত্ত্বের উপর এই ক্ষরত্ব ও অক্ষরত্ব ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে থাকে, যাঁকে উপাদানস্বরূপ অবলম্বন করে জীবের শক্তি বীজ আকারে ও ব্যক্ত আকারে গঠিত হয় সেই জ্ঞানস্বরূপ পুরুষোত্তমই ক্ষরে ও অক্ষরে অধিযজ্ঞ। অর্থাৎ ব্যাষ্টি ক্ষরত্বে ব্যক্ত অধিভূত, সমষ্টি শক্তিপ্রকাশে ব্যক্ত অধিদৈব এবং সমস্ত জীবলীলার উপাদান এবং অবলম্বনরূপী জ্ঞানমাত্রস্বরূপ পুরুষোত্তমই অধিযজ্ঞপুরুষ। পরমাত্মার মহাকালার্ণবস্বরূপ শক্তিবিলাস ও তার দ্বারা ক্ষরভূতসকল কিভাবে জাত ও প্রলীন হয়, তাদের পুনরাবর্তন এবং এই জন্মমৃত্যুর আবর্তন চক্র থেকে রেহাই পাবার বিভিন্ন গতাগতির বিজ্ঞান আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাষ্টি জীবের ক্ষরভাবে অধিভূত বা জীবত্বের ধর্ত্তারূপে ও তার সংস্কার গ্রন্থিতে অক্ষর পুরুষরূপে ও তার ব্যক্ত শক্তিতে অধিদৈব রূপে ইনিই অবস্থিত। এই ক্ষরভাব হতে ঐ অক্ষরভাবে প্রবেশ করাই অনাবৃত্তি লাভ। অর্থাৎ কূটস্থের উর্দ্ধে অব্যক্ত অংশে আত্মায় স্থিতি হয়ে পরমাত্মভাবের প্রকাশ অবস্থাই অক্ষরব্রহ্মযোগ। এই অধ্যায় এই পর্য্যন্তই। এখানে শুধু অধিযজ্ঞ পুরুষোত্তমের শক্তিময় তারকত্ব ও রাজরাজেশ্বরত্ব বর্ণনা করা হয়েছে আর ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের উপাদানস্বরূপ উভয়ের অন্তরে অসঙ্গ পরমাত্মারূপে উভয়ের অবলম্বনস্বরূপ যিনি আছেন, সেই জ্ঞানময় পরমাত্মতত্ত্ব পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হবে।

--০০--

ওঁ

অথ নবমোহধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ (৯)

শ্রীভগবান্ উবাচ -

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ।। ১

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন, এই পরম গুহ্য বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান, দোষ – দৃষ্টি বিহীন তোমাকে কহিতেছি, যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৯/১

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বে ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে অর্জুনকে অনুভবের সঙ্গে জ্ঞান এবং অষ্টম অধ্যায়ে সাধনদ্বারা ক্রমমুক্তি ও সেইসাথে শ্রদ্ধাভক্তির দ্বারা কিভাবে পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় সে কথা বলেছেন। এখন নবম অধ্যায়ে সেই তারকব্রহ্ম পরমেশ্বরের পরমাত্মাস্বরূপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করা হচ্ছে। অবশ্য সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত অনুভব যে দুর্ল্লভ এটাও আগেই বলা হয়েছে। এই স্বানুভব জ্ঞান সকলের হয় না। তাই উপযুক্ত অধিকারীকে এই জ্ঞান দিতে হবে, কখনওই অনুপযুক্তকে নয়। এটাই শাস্ত্রাদেশ, শুধুমাত্র যার গুরুর প্রতি অচলাভক্তি থাকে, গুরুবাক্যে কোনওরূপ দোষ দর্শনের কল্পনাও হয়না, গুহ্য বিষয় শ্রবণে শুধুমাত্র তারই অধিকার। অর্জুন আদর্শ শিষ্য। তাই ভগবান অর্জুনকে আদর্শ অধিকারী বোধ করে তাঁর নিকট গুহ্য হতেও গুহ্যতর জ্ঞান উপদেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। এখানে পাঠক প্রশ্ন করবেন "জ্ঞান" কি ? আর "গুহ্যতর জ্ঞান"ই বা কি ? শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে আছে – "কিং করণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা, জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠাতাঃ কেন সুখতরেষু, বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।" বেদে কথিত জ্ঞেয় বস্তুকে জানবার জন্য মনের যে উদ্যোগ তাইই "জ্ঞান"। আবার জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা যে প্রকৃতি – যা প্রাণশক্তিরূপে প্রাণীগণের প্রাণ ধারণের নিমিত্তরূপা, যিনি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে এই জগৎকে বিধৃত করে রয়েছেন সেই পরমাত্মার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ। জীবাত্মাকে জানতে পারাই "গুহ্যতর জ্ঞান"। গুরুর উপদেশে যে আত্মবোধের বিকাশ সেটাই জ্ঞান আর সাধন সাহায্যে তার অনুভবের নামই বিজ্ঞান। যোগাভ্যাসে নাড়ী ও প্রাণ শুদ্ধ হলে ও চিত্ত স্থির হলে ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি দুটোর সাথে পরিচয় হয়। অতএব এ গুহ্যতম কথা তাকেই বলা যায় যার এমনটা হয়েছে, যে শিষ্যের চিত্ত সাধন দ্বারা শুদ্ধ হয়েছে তাই সে সহজ সরল ও সংযমী। প্রকৃতির রহস্য সে উদ্ভেদ করেছে তাই এবার তাকে আত্মার রহস্য বলা হবে। এমন উচ্চ অধিকার না জন্মালে এ গুহ্যতম জ্ঞানের কথা তাকে বলা যায় না। বললে বিপরীত ফল হয়। এজন্যই অনধিকারীকে রহস্য কথা বলা শাস্ত্রের নিষেধ। আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে কূটস্থ, অচিন্ত্য, অপ্রত্যক্ষ্য মাত্র অনুশাসক শক্তি দ্বারা অনুমেয়, তারকব্রহ্মরূপ অক্ষর পরমেশ্বর। তা অপেক্ষাও ব্যক্ত, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরমাত্মস্বরূপ – যে স্বরূপে তিনি সকলেরই উপাদান, তাঁকে আত্মবোধ দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে, হৃদয়ের মাঝে অহৈতুকী ভক্তির প্লাবনে নিজেকে অভিস্নাত করতে সমর্থ হয়, সেই স্বরূপের কথা বলার জন্যই এই নবম অধ্যায়। নইলে "বাসুদেবঃ সর্ব্বম" একথা শুধু মুখে বললে হবে না, সমস্ত বিশ্ব দেখতেই যখন সশরীর আমাকেই দেখবে তখন চেতন অচেতন ভিন্ন ভাবে দেখা যে উপায়ে তিরোহিত হবে সে তত্ত্বই তোমাকে বলব তাই তোমাকে অসূয়াশূন্য "অনসূয়বে" বলে সম্বোধন করছি। তোমার হৃদয়ের যে গুহ্যতম দেশ উন্মোচন করছি – বিজ্ঞানের সাথে, ভাবের আবেগে নয়। যে জ্ঞানালোক জ্বলিয়ে দিলাম এতেই তোমার অচেতন দেখা ঘুচে যাবে। ব্যস্ তাহলেই সকল অশুভ দূর হবে। আসলে ঈশ্বরভাবটা সুসঙ্গতভাবে অনুভব করতে পারলে তবেই তার চাইতে ঘনিষ্ট ভাবটাতে লক্ষ্য পড়ে। অধিদৈবাদিভাবে তারকব্রহ্মত্ব বুঝলে তবেই তার চেয়ে নিকটতম প্রাণারাম পরমাত্মভাবে থাকা যায়। গীতাপাঠ যাঁরা করছেন করুন। নিশ্চয় করবেন। তবে এইজ্ঞান শুধু বই পড়ে হয় না। চিত্তশুদ্ধি নাহলে প্রকৃত শ্রদ্ধাভক্তি হয় না এবং প্রকৃত শ্রদ্ধাভক্তি বিনা জ্ঞানলাভ হয় না, আর জ্ঞান না হলে ভগবৎ প্রাপ্তিও হয় না। তাই সংসার বন্ধনও দুর হয় না। ৯/১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ।।২

অনুবাদ : বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ, এবং অতিগুহ্য পরম পবিত্র, কার্য্যদ্বারা নিজ বোধরূপ, ধর্ম্মসম্মত, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ॥ ৯/২

ব্যাখ্যা: এই যে বিদ্যাটার কথা এখন বলছি এটা রাজবিদ্যা মানে সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ যা জানলে সকল তৃষ্ণা দুর হয়ে যায়। সর্ব্ববিদ্যা এর অধীন হয়ে পড়ে। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য। এ গোপনীয়তাটাও এত অপূর্ব্ব যে গোপন হয়েও একান্তই প্রত্যক্ষ, নিত্যবোধরূপ, তাই একান্ত রহস্যময়ী এ বিদ্যা যা অন্তরে গৃহীত হলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বিজ্ঞান রহস্য দিনের আলোর মতই প্রকাশিত হয় বলেই এটা রাজবিদ্যা। এ বিদ্যা যাঁর বিদ্যা তাঁতেই একীভূত হয়ে থাকে। তিনিই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম

আত্মা। তিনি রয়েছেন আত্মবোধরূপে আমার সমগ্র আমিত্বের অন্তরে, একান্ত গুহ্য অথচ আমার আমিত্ব প্রকাশের দ্বারাই তাঁর অস্তিত্ব নিত্য প্রত্যক্ষ। এঁকে পেলেই সমগ্র বিশ্ববিজ্ঞানময় আমাকেও পাওয়া যায়। জীবের নিজত্ব অপেক্ষা প্রত্যক্ষ আর কিছু নেই। জগদ্দর্শন অপেক্ষা তার নিজত্ব অনুভূতিই সম্যক সুপ্রকাশ। এজন্যই "প্রত্যক্ষাবগম" বলা হয়েছে। ধর্ম্মতত্ত্ব লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দু'রকম হলেও উভয়ই রহস্যময়। একটু সুকৃতির দ্বারা পূণ্য সঞ্চয় হলেও সেটা সঞ্চিত থেকে তাকে দৈবী সম্পদমণ্ডিত করে। কিন্তু সেটা কিভাবে হয় বা কে করে দেয় এটাই বুদ্ধির অগোচর। আবার দুষ্কর্ম্মের ফলও একই ভাবে ফলে যা জীবকে বহুকাল পরেও সুখ দঃখের ভাগী করে থাকে। বুঝে দেখুন এটা কি কোনও রহস্য নয় ? এজন্যই ধর্ম্মও গুহ্য ও রহস্যময়। যদিও এ সমস্ত সাধারণ পাপপুণ্য বোধ সবটাই অবিদ্যা। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা ? সে তো আরও দুর্ল্লভ ও গুহ্যতর। আবার আত্মজ্ঞানের কাছে এও তুচ্ছ। তাই আত্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ট ও গুহ্যতম। এতে প্রত্যক্ষাবগম হয় এবং এর সাধনও খুব একটা কষ্টসাধ্য নয় বরং সুখেই করা যায়। শুধু সদ্‌গুরুর কাছে বসে শিখতে হয়, কিন্তু সেই ভাগ্যের উদয় না হলে কারও সদ্‌গুরু লাভ হয় না। যাতে আত্মদর্শন হয় সেটাই ব্রহ্মবিদ্যা এবং ভক্তিও সেই বিদ্যারই অন্তর্গত। কেবলমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গই ব্রহ্মবিদ্যার পন্থা নয়। অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হলে তবেই জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা ব্রহ্মকে জীবাত্মার সাথে অভেদভাবে অনুভব করলেই জীব ব্রহ্মের সাথে যোগযুক্ত হয়। এটাই ভাগবতে কথিত "হরিতোষণম"। তবে এ সমস্তই অত্যন্ত রহস্য সাধনা। তাই গুরুগণ সহজে কাউকে সাধন দেন না। অত্যন্ত রহস্য বিদ্যা বলেই একে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য বলে। যদিও সাধন পথটা একেবারেই কঠিন নয়। এজন্যই "সুসুখং কর্ত্তুম্" মানে সহজেই করাও যায়। অব্যয় অর্থাৎ এই জ্ঞান অব্যয়। কারণ পরমাত্মবোধের ক্ষরণ নেই। কাল একে বিনষ্ট করতে পারে না বা বিস্মৃতিও মুছে দিতে পারে না। কারণ অনন্তে অনন্তে বহু বহু অব্যয় সনাতন আত্মা এতে আর সঙ্গে সঙ্গে ইনি সেই ক্ষর আত্মারাশির তলায় কূটস্থ আত্মারূপে অবস্থান করেন। এঁকে প্রত্যক্ষ করাই হল "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং"। দীর্ঘকাল ক্রিয়াভ্যাসে দেবতা হয়ে গেছেন যাঁরা সেই নরদেবগণই আজ্ঞাচক্রের ত্রিকূটির মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় সনকাদি ঋষিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণকে স্তবগানরত দেখতে পান। তুমি যেদিন মুক্ত হবে সেদিন তোমাকেও ওইখানে হাজির দেখা যাবে। বিশ্বাস না হয় নিজে করে দেখ। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ নয়, নিজ বোধ মাত্র। চঞ্চল চিত্তের নিরোধ বিনা স্বরূপজ্ঞান কারোরই বোধে আসে না। তাই উচ্চসাধকের পক্ষেই সুখসাধ্য হয়, অযোগীর পক্ষে এটা মোটেই সুখসাধ্য নয়। এটাই বাস্তব কথা ॥ ৯/২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ।। ৩

অনুবাদ: হে পরন্তপ, এই ধর্ম্মের অশ্রদ্ধাকারী পুরুষেরা আমাকে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৯/৩

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর করে, এই সত্যের সাথে দৃশ্যমান জগতের মিল খুঁজে পায় না বলে একে অবিশ্বাস করে, তাকে মৃত্যু, ভ্রান্তি ও অশুভের অধীন এই সাধারণ মরজীবনের মধ্যে ফিরে আসতেই হয়। ভগবানকে অস্বীকার করে তাঁর ভাব লাভ করা, ভাগবতজীবন ও অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। যুক্তি তর্কের দ্বারা এই সত্যকে প্রমাণ করা যায় না। শ্রদ্ধার সাথে এই সত্য অনুসারে জীবনকে চালিত করেই এই সত্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ভগবানকে পেতে হলে তাঁকে জানতে হয়, দেখতে হয় এবং তাঁতে প্রবেশ করতে হয়। মন দিয়ে জেনে, প্রাণ দিয়ে ভালবেসে, তেজ বা সংস্কার দ্বারা সংস্কারময় হয়ে তবে তাতে প্রবেশলাভ হয় ও তদ্‌ধিবাসী হতে হয়। চেতনা যখন কোনও কিছুকে বুদ্ধির দ্বারা জেনে, প্রাণের দ্বারা ব্যবহারময় হয়ে তবে তাকে দেখে তার পরিচয় পায় তবেই তাঁকে ত্রিবিধ ভাবে পাওয়া হয়। এটাই হল চেতনতত্ত্বের বিজ্ঞান। প্রাণময় ব্যবহার ভিন্ন কারও যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। বুদ্ধিময়, হৃদয়ময় ও সংস্কারময় হওয়াই চেতনকে কোনও কিছু তত্ত্বাধিকারে নিয়ে আসার উপায়। হৃদয়ের ব্যবহারই ভক্তি শ্রদ্ধা। বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানার কথা বলে আগের অধ্যায়ে সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির কথা বলা হয়েছে। তাই বুদ্ধিতে যতটাই সুদৃঢ়ভাবে ব্রহ্মপুরুষকে ঈশ্বররূপে জানা যায় ততটাই তাঁতে হৃদয় দেবার পথ খুলে যায়। হৃদয়বৃত্তি সে দিকেই প্রবাহিত হবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে তখনই হৃদয়মাঝে তাঁর অধিষ্ঠানটি পাকাপাকি ও নিত্যসিদ্ধ হয় এবং আত্মরূপতার সংস্থানটি আবিষ্কৃত হয় নিজেরই প্রাণস্বরূপে, নিজত্বের জন্মস্থলস্বরূপে, উপাদান স্বরূপে ও আত্মবোধের আত্মাস্বরূপে। তাই হৃদয়ই জীবের যজ্ঞভূমি, ভোগভূমি ও আবাসভূমি। হৃদয়ই সকল তত্ত্বের সমুদ্র, সর্ব্বভোগের আগার, সর্ব্বশক্তির গুপ্ত গৃহ। এজন্য হৃদয়েরই মাঝে আপনি ও আপনস্বরূপ পরমাত্মা এটা একটু সজীবভাবে বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিলেই সেই আত্মায় আত্মার জন্য হৃদয়ে আলোড়ন উঠবেই এবং সেই হৃদয়মধ্যস্থ নিজেরই মূলে দৃষ্টি পড়বেই। এটাই যখন চেতনবিজ্ঞান তখন ভাগবদন্বেষণের পথে শ্রদ্ধা আসতে বাধ্য। সুতরাং হৃদয়ে শ্রদ্ধা না এলে সেই চিত্তে ধর্ম্মসাধনা দূরের কথা, ধর্ম্মের কথা বলাও তেজারতি ব্যাবসা মাত্র। আজকাল এটা খুবই দেখা যায়। বিভিন্ন ব্যবসায়ের কারবারীগণ, যেমন রাজনীতির কারবারী, সরকারী বেসরকারী সংস্থার দুর্নীতিপরায়ণ অসাধু আমলা গোমস্তার দল, বানিজ্যিক প্রতিনিধিগণ, কোম্পানির এজেন্টগণ যাঁরা জীবনলাভের অর্থ ও ব্রতমাত্র অর্থোপার্জন বলেই ধারণা করেন, সে যে উপায়েই হোক, প্রয়োজনে

আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়েও, তাঁরাই এমন ধর্ম্মের তেজারতি করে থাকেন। আবার যাঁরা এদের সংস্পর্শে আসেন তাঁরাও ঐ একই ভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়ে ঐ একই রকম ভাবে বিষয়কে গ্রহণ করেন, ফলে তাঁদেরও চিত্তে তেমনই সমস্ত বিষয়ের ধারণা হয়। এমন ধারণাগুলো বেশ পাকা হয়ে গেলে আর সঠিক তত্ত্ব সেখানে যেতে পারে না। আর এ জীবনেও প্রকৃত ভগবদ্‌মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এজন্যই শিশুকাল থেকে শুদ্ধসংস্কারের যে প্রথা ছিল অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, দীক্ষা সবকিছুই এ যুগে এসে প্রকৃত তাৎপর্য্য হারিয়ে পারিবারিক উৎসবের আকারে ভূরিভোজের উপলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে। প্রাণের মধ্য থেকে কোন চিন্তার সংস্কার ক্ষয় হয়ে গেলে আর তা মনে আসতে পারে না। এজন্যই কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান কখনই অন্য বর্ণের মানুষের নিকট হতে কোনও রকম ধর্ম্মকথা, আধ্যাত্মিক আলোচনা শুনবেন না। এতে তাঁর শুদ্ধসংস্কারের ক্ষয়সাধনই হবে মাত্র। এটাই বিজ্ঞান, কোনও জাতভেদের উস্কানি নয়। আর কর্ম্মস্থলে ধর্ম্মকথা নয়। আপনার উর্দ্ধতন অফিসার আপনার কাছ থেকে বেশি কাজ পাবার আশায় আধ্যাত্ম বা ধর্ম্মকথা শোনাতে পারেন। সেটা কিন্তু দুষ্টের দুষ্টবুদ্ধি। অনুরূপভাবে কোনও বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রতিনিধি যদি এমন ব্যবস্থা করেন যে সংস্থার উৎপাদন বা সেবাকে বিস্তারের জন্য আপনার গৃহজীবন তথা পারিবারিক জীবনকেও প্রভাবিত করতে চান তবে তাঁরা বা তাঁদের উর্দ্ধতন বা তদুর্দ্ধতন কোনও না কোনও সংগঠক আপনাকে ধর্ম্মকথা বা আধ্যাত্মকথা শোনাতে বাধ্য। এমন ক্ষেত্রে বিচক্ষণ ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জীব অবশ্যই জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থায় উদ্যোগী হবেন এবং ঐ সংসর্গ যত সত্বর সম্ভব পরিহার করবেন। কারণ ঐ রকম সংসর্গ চিত্তকে খুব দ্রুত অশুদ্ধ করে। অর্থাগম যতই হোক অশুদ্ধ চিত্তের নিস্তার নেই, শান্তি তো সুদুর পরাহত। প্রকৃত জীবনের স্বাদ থেকেই বঞ্চিত হতে হবে। এ যুগে সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার ভিতর অসাধু প্রতিযোগীতা মানুষের চেতনার সাম্যাবস্থা নষ্ট ক'রে তাকে এভাবেই অধঃপাতে পাঠায়। এমন অশুদ্ধচিত্তে একমাত্র বিষয়াসক্তি ছাড়া আর কিছুই স্থান পায় না। যোগাভ্যাস তো কোন দুর অস্ত্। এঁরা ক্রিয়া পেলেও কোনও কাজে লাগে না। যেমন পাথরের উপর বীজ পড়লে তা থেকে গাছ হয় না। তবু ভালো, কোনও কিছুই না জন্মানো কিন্তু ঐ রকম অশুদ্ধচিত্তে বর্ণসংকরই হয় মাত্র, যা কেবল চিত্ত বৈকল্যই সৃষ্টি করে, এটা অতি ভয়ানক। এ জন্যই প্রাজ্ঞজন বলেন কর্ম্মস্থলে ধর্ম্ম (আধ্যাত্ম) নয়। কিন্তু অধিকাংশ অফিস কাছারীতে লেখা থাকে – "কর্ম্মই ধর্ম্ম"। এ কোনধর্ম্ম বা কোনকর্ম্ম বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই বুঝতে পারেন যা প্রকৃত অর্থে squeez of man power। ধর্ম্মের নামে উস্কানি দিয়ে আপনার পরিশ্রম নিংড়ানো। ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ এসব থেকে অনেক দুরে। অর্থ লোভে বুদ্ধিনাশই হয় মাত্র। তখন মন দিয়ে আত্মার সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা বিড়াম্বনা মাত্র। ফলে বিষয়ান্তরে মনকে বসাবার চেষ্টা করেন ও দিন দিন শ্রদ্ধাভক্তিশূন্য হয়ে পরমানন্দলাভে বঞ্চিত হন এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম ও যাতায়াতের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন না। কঠোপনিষদেও আছে বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না। সাম্পরায় হল সদ্‌গতি প্রাপ্তির সাধনা। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন দৃঢ়ম্। অয়ং লোকা নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পূর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥" যার অর্থ – (১) যাহারা প্রমাদী অর্থাৎ পুত্র ধনাদিতে আসক্ত চিত্ত, যাহারা বিত্তজনিত মোহে সমাচ্ছন্ন, এই প্রকার লোকের নিকটেও সাম্পরায় প্রকাশ পায় না। (২) আর যাহারা এই পরিদৃশ্যমান জগতেই আছে এবং অপ্রত্যক্ষ কোনও লোক বর্ত্তমান নাই এইরূপ অভিমানগ্রস্থ – তাহারা বারম্বার মৃত্যুরূপী আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এদের জন্মমরণাদি দুঃখধারা আর নিবৃত্ত হয় না।

এজন্যই বলি, যাঁরা কর্ম্মস্থলে দুটো পয়সা বেশী উপার্জনের লোভে উপরওলার কাছে ধর্ম্মকথা শুনে থাকেন ও অতিরিক্ত খেটে মরেন বা নির্দ্দিষ্ট কাজের পরেও আবার কোন অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করে থাকেন, করুন যদি সেটা শুধুমাত্র কাজের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সাবধান সেক্ষেত্রে যদি কোনও উপরওলা (বস্) বা তারও উপরওয়ালা বা এজেন্ট / ডিস্ট্রিবিউটর আপনার ব্যক্তিজীবন, পরিবার বা পরিবারের কোনও সদস্যকে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে ধর্ম্মকথা বা আধ্যত্মতত্ত্ব তিনি অবশ্যই শোনাবেন নিজেরই স্বার্থে এবং প্রতিষ্ঠান তথা ব্যাবসার স্বার্থে। এমনটা হলে আপনাকে সতর্ক হতে হবে এবং প্রয়োজনে জীবিকার বিকল্প উৎস অনুসন্ধান করতে হবে, নইলে আপনার এবং পরিবার তথা পরবর্ত্তী প্রজন্মের বিপদ আছে। আর যদি আপনি প্রকৃতই উপরিউক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের অনুগামী হয়ে থাকেন মানে জড়বাদী বা ভোগবাদী হয়ে থাকেন তবে কিছু বলার নেই। আপনার এসব লেখা পড়ারও দরকার নেই। কারণ আপনি থাকছেন কামরূপী দুর্য্যোধনের দলে।

তবু দুঃখ হয় কেন এদের জন্য ? কারণ এরা সত্যই আত্মপ্রবঞ্চিত জীব। এঁদের মধ্য যাঁরা আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁরাও আপাত উদ্দ্যেশ্য সাধনেই সন্তুষ্ট থাকেন ও সব কিছুকে এক করে ফেলেন। যেমন নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সাধনক্রিয়াটা গৌণ হয়ে যায়। গুরুদেবকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন ছেলের চাকুরী বা মেয়ের বিয়ের জন্য অথবা অন্য কোনও জাগতিক প্রাপ্তির উদ্দ্যেশ্যে। প্রকৃত সদ্‌গুরুগণ শত পীড়াপীড়িতে বা অনুরোধেও বেশ বুঝে শুনে দীক্ষাদান করে থাকেন। বর্ত্তমান কালের গুরু ব্যবসায়ীগণের কথা অবশ্যই আলাদা। তাঁরা প্রণামী, দক্ষিণা, ইষ্টভৃতি বা চাঁদা ইত্যাদির নামে কিছু অর্থাগমের আশায় শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকেন। প্রকৃত সাধকগণ অবশ্য ভীড় দঙ্গল এড়িয়েই থাকেন। কিন্তু প্রমাদী ও ভোগবাদীর সংখ্যা যেমন বেশী তেমনিই ব্যবসায়ী গুরুর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে নইলে অনুপাত রক্ষা হয় কি করে ? তাই যাঁদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় না হয় সাধারণ ভাবে তাঁরাই প্রাতিষ্ঠানিক দীক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। এতে করে যা হোক কিছু একটা মনকে চোখ ঠারা গোছের কাজ করা হয় মাত্র। তাই ভগবান বলছেন এই আত্মবোধরূপ স্বরূপধর্ম্মটিতে শ্রদ্ধাবান না হলে তাঁকে না পেয়ে মৃত্যুময় সংসার পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করতে হয়। ৯/৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ।। ৪

অনুবাদ: অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চরাচর ভূত সমুদায় আমাতে অবস্থিত। আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। ৯/৪

ব্যাখ্যা: এবার আত্মতত্ত্বের সেই পরম রহস্য বলা হয়েছে সেটা হল এই যে ভগবান বিশ্বাতীত হয়েও তাঁর যোগমায়ার দ্বারা বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন, এখানকার সব কিছুই তিনি, অথচ তিনি এ বিশ্ব হতে এতই ভিন্ন ও মহত্তর যে বিশ্বের কোনও বস্তু বা সকল বস্তু মিলেও তাঁকে ধারণ করতে পারে না। এই সান্ত জগতের (limited sphere) কোন ভাষাই তাঁর অচিন্ত্যনীয় সত্তার সত্য পরিচয় দিতে পারে না। আত্মতত্ত্বের দুটো প্রধান বিষয় হ'ল আত্মার অসঙ্গত্ব ও ঈশিত্ব। তিনি নিরাবলম্ব্য, তাঁকেই অবলম্বন করেই ভূতসকল অবস্থিত। তিনি ভূতের আশ্রিত নন। আত্মতত্ত্ব ধারণা করতে গেলে এটা বুঝতে হবে যে আত্মাই আমাদের আধার, আমরা আত্মার দ্বারাই পরিবৃত। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, একান্ত অমূর্ত্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম আশ্রয়, স্থূল তাঁর আশ্রিত এটা ভালমত বুঝতে হয় কিন্তু দেহাত্মবোধের প্রাধান্য বশতঃ এই উপলব্ধি সহজে হয় না বরং উল্টোটাই মনে হয় বুঝি সূক্ষ্মের আশ্রয় স্থূল। বোধহয় স্থূল দেহজ্ঞানের ও স্থূল জগতের সত্তাই যেন প্রধান সত্তা এবং যা কিছু জ্ঞান, চেতনা, প্রাণ সবই বুঝি ঐ স্থূল সত্তার আশ্রিত, ঐ স্থূল সত্তারই ধর্ম্ম। এমন ভুল সংস্কারই আত্মধারণার প্রথম ও প্রধান অন্তরায়। সেজন্য ভগবান বলছেন "অব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছি, সমস্তভূত আমাতে অবস্থিত, আমি ভূতে অবস্থিত নহি।" আত্মত্ব ও ঈশিত্ব উভয় লিঙ্গত্ব যাঁর প্রকাশ, তিনি ঈশিত্বরূপ কারণ লিঙ্গের দ্বারা জগৎব্যাপী অবস্থান করেও পরমাত্মরূপে অসঙ্গই থাকেন। সুতরাং অব্যক্ত বীজস্বরূপ ও পরমাত্মা কিন্তু একজনই। এখানে পরমাত্মতত্ত্বের অসঙ্গত্বের কথাই বিশেষ ভাবে বলা হবে সেজন্য তিনি অব্যক্ত বিশ্ববীজ হয়েও যে অসঙ্গ এটাই পরিষ্কার ভাবে ধারণা করতে বলছেন। আমাদের জীবক্ষেত্রেও সেই একই স্থিতি। জীব ভোক্তা হয়েও অসঙ্গ। সাধারণ উপলব্ধি যে শরীরই আশ্রয় এবং তাতেই বসবাস করি এটাও এই জীবত্বেরই তামসিক সংস্কার। আমরাই বরং আত্মায় বসবাস করি। স্থূল থেকে সূক্ষ্মসত্তাবোধটি পর্য্যন্ত সমস্তর মূল আশ্রয়ই যে আত্মা এই ধারণাটাকে পাকা করতে হবে। দুধ দই হলে, দইতে দুধ আছে এমন নয় বা দড়ি সাপ মনে করলেও দড়িটাই সাপ হয় না। তাই সোনাকে বাদ দিয়ে সোনার কাঁকন হয় না, তেমনি কূটস্থ চৈতন্যকে বাদ দিয়ে জগৎ সম্ভব নয়। আত্মাকে নিয়েই তো তুমি আমি ও অনন্ত জগৎ। অনন্ত তরঙ্গের সমুদ্রই একমাত্র আশ্রয়। সমুদ্র না থাকলে তারা যেমন থাকে না তেমনি আত্মাছাড়া তুমি, আমি, অনন্ত জগৎ কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আত্মারূপ সমুদ্রে বুদ্বুদের মত তুমি আমি ও এই অনন্ত জগৎ ভেসে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে।

ওটাই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় চক্র, এককথায় জগৎলীলা। এই জগৎলীলা প্রকাশের কারণভূত ব্রহ্ম

আমরা বস্তুমাত্রের নামরূপ সব দেখছি বটে কিন্তু অব্যক্ত সেই প্রাণসূত্রের কোনও সন্ধান জানি না যাতে ব্রহ্মাণ্ডই প্রাণরূপ সূত্রে গাঁথা আছে। প্রাণই সেই স্থির অব্যক্ত কিন্তু তাতে লক্ষ্য না থাকায় আত্মাই যে সকলের মধ্যে সেটা বোধগম্য হয় না। এ কথা জানার পর এখনও শ্বাসকে দেখলেও তাতে সম্যক লক্ষ্য নেই তাই ধাঁধাও কাটছে না এখনও। শুধুই বাহ্য বস্তুতে লক্ষ্য রয়েছে আর জগদাদি অনন্ত তরঙ্গ দেখে বার বার মুগ্ধ (enchanted) হচ্ছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্পন্দন তত্ত্বের কথা স্মরণ করুন বুঝতে পারবেন কিভাবে প্রাণের এই ব্যক্ত অবস্থাতেই স্পন্দনতরঙ্গ অনুভব হয়। যে স্পন্দন থেকে বাসনা আর বাসনা থেকেই জন্মমৃত্যুরূপ সংসার চক্রের খেলা চলে। অস্পন্দিত নিস্পন্দিত স্থিরভাবই মহাপ্রাণ –"স চ প্রাণস্য প্রাণঃ" এই মহাভাব ঘটস্থ হয়ে কূটস্থ চৈতন্যরূপে বিম্বিত হলেই তিনি ধ্যেয় ও সাকার দুইই হন। তাঁর ভূতধারক ও ভূতপালক রূপ পরবর্ত্তী শ্লোকে পাবেন। ৯/৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।। ৫

অনুবাদ: আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ – ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে ; আমি ভূতগণের ধারক ও পালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি ॥ ৯/৫

ব্যাখ্যা: সাধারণ জীবগণ দেহ ধারণ ও পালন করে অহঙ্কারবশতঃ তৎসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু আমি ভূত সকলকে ধারণ পালন করেও নিরহঙ্কার হওয়ায় তাতে সংশ্লিষ্ট থাকি না। জড় জগৎ বা বস্তুজগতে আমরা যেমন দেখি কোনও জায়গায় কোনও জিনিষ রয়েছে সেইভাবে সর্ব্বভূত ভগবানের মধ্যে আছেন এমনটা বলা বা ভাবা ঠিক নয় কারণ ভগবান দেশ ও কালের অতীত। আর এই জগৎ জড় বলে মনে হলেও আসলে জড় নয়, এটা ভগবানেরই যোগমায়া বা অধ্যাত্মচৈতন্যশক্তির দ্বারা আত্মসৃষ্টি বা আত্মবিস্মৃতি। তাঁর আত্মা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থেকে সর্ব্বভূতকে ধরে রেখেছে, প্রকাশ করছে কিন্তু তিনি নিজে কিছুতে নেই। এই শ্লোকের অর্থ এখানে আগের শ্লোকের বিরুদ্ধ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এক আত্মাই সত্য আর যা কিছুই দেখি তা কিন্তু পরমার্থিক সত্য নয়। রশি বা দড়িকে সাপ মনে হলেও সেটা কল্পনা মাত্র। ভালমত দেখে বুঝতে পারার পরই আর দড়িতে সর্পজ্ঞান থাকে না। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে ব্রহ্মে বহুবিধ কল্পনা বা ভ্রান্তির নাশ হয়। তাই সংসারও ততদিনই সত্যি যতদিন আত্মজ্ঞান প্রকাশ না হয়। আগের শ্লোকে "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" মানে আমাতেই সকলভূত অবস্থিত বলে আবার ঠিক পরের শ্লোকেই "ন চ মৎস্থানি ভূতানি" যার অর্থ আমাতে

ভূতসকল অবস্থিত নয় একথা বলায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে আগের শ্লোকে ভগবান নিজের বিশ্বাশ্রয়ত্বের কথা বলছেন আর এই শ্লোকে তাঁর অসঙ্গস্বরূপ যোগশক্তির কথা বলছেন। এই যে কথাটা‘তাঁহাতেই অথচ তাঁহাতে নয়’ এইভাবে নিজের শক্তিপ্রকাশকে ব্যবস্থিত করার মত যে স্বরূপগত মহিমা সেই মহিমার নামই অসঙ্গত্ব। ঐ ভাবে নিজেকে নিজের শক্তিপ্রকাশ থেকে আলাদা করে রাখতে পারেন বলেই তিনি নিজের শক্তির উপর আধিপত্য করতে পারেন। এটাই সেই ঈশ্বরত্ব প্রকাশের যোগস্বরূপ বা‘যোগমৈশ্বরম্’। আসল কথা চেতনতত্ত্ব বুঝতে হলে এই অসঙ্গত্বরূপ ধর্ম্মটা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। যতক্ষণ না নিজের ভিতর নিজের অসঙ্গত্বটা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পার, ততক্ষণ কিন্তু পরমাত্মার স্বরূপ ও তাঁর ঈশ্বরীয় রহস্য বুঝতে মোটেই পারবে না। এ জন্য তোমার নিজের অন্তরে যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়ার তলায় নিজ বোধটা কিভাবে সে সমস্ত পরিণামী জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র থাকে সেটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখ। দেখবে তোমার জ্ঞান ও জ্ঞানশক্তির আবর্ত্তনের তলায় তুমি যেমন অসঙ্গ, সমগ্র বিশ্বক্রিয়ার তলায় পরমাত্মাও তেমনই অসঙ্গরূপেই প্রতিষ্ঠিত। সাধারণভাবে যে নিজেদের ভূতস্থ ভাবটি নিয়েই থাক তাই ভূতভৃৎ অথচ ভূতস্থ নও এই ভাবটাকে লক্ষ্য কর না। এই ভাবটা লক্ষ্য করতে চেষ্টা কর। পরমেশ্বর জীবরূপে ভূতস্থ হয়ে তা থেকে স্বতন্ত্র – ভূতভৃৎ – ভূতস্থ নন – এমনই ভাবে থাকেন এবং এমনভাবে থাকতে পারেন বলেই তিনি ভূতভাবন – অসঙ্গ হয়েও ভূতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের নিয়ন্তা – এককথায় ঈশ্বর, যিনি দেবতা হতে মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গাছপালা সমস্ত প্রাণীকেই প্রাণসূত্রে মালার মত তাঁতে গেঁথে রেখেছেন। আর প্রাণই সেই সূত্র। সূত্ররূপ সেই প্রাণকে বুঝে উঠতে না পারলে, লক্ষ্য করতে না পারলে সে প্রাণকে ধরাও যায় না। জগৎদৃষ্টির রোধ করতে না পারলে আত্মার স্বপ্রকাশও অনুভব করা যায় না। মন আত্মাতে না থাকলে সে অন্যান্য বস্তু দেখবেই, যে সকল আদৌ সত্য নয়। বেদে আছে একথা। সত্য কেবল সেই এক পরমাত্মা। সেই একত্ব দর্শন তখনই হয় যখন মনের চাঞ্চল্য থাকে না। অতএব মনের বিক্ষোভ রোধ করার সাধনা কর। ওসব বাহ্যাড়ম্বর তিলক, মালা, গেরুয়া, জটা, মঠ, মিশন, উৎসব, অনুষ্ঠান, সজ্ঞ কর্ম্মের ভড়ং ছেড়ে গুরুপদেশ মত প্রাণপনে সাধনা কর। আর এ যাবৎ করছই বা কি ? জগৎ দৃষ্টি রোধ কর। মন দিয়ে ক্রিয়া করলেই আত্মলক্ষ্যে স্থিতি হয় ও সকল ভ্রান্তি দূর হয়। যা হোক, আত্মার এমন অসঙ্গত্বের বর্ণনা উদাহরণ সহযোগে ভগবান পরের শ্লোকে বলেছেন ॥ ৯/৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ।। ৬

অনুবাদ: সর্ব্বব্যাপী এবং মহান বায়ু যেরূপ অসংশ্লিষ্টভাবে আকাশে অবস্থিত, সমুদয় ভূতও সেইরূপ ভাবে আমাতে অবস্থিত, ইহা জানিও। ৯/৬

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে কথিত আত্মার অসঙ্গত্ব বিষয়টা এই শ্লোকে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যতক্ষণ না আমরা পরম চৈতন্যে পৌঁছে সবকিছুকেই অধ্যাত্ম চৈতন্যময় দেখছি ততক্ষণ জড় জগতের উপমা প্রয়োগ করেই ভগবান বলছেন মহান বায়ু যেমন আকাশে থেকে আকাশের সর্বত্র সঞ্চরণশীল অথচ আকাশে সংশ্লিষ্ট নয়, ভূত সকলও ঠিক সেই ভাবেই আমাতে স্থিত থাকে। আমারই উপর বারবার আবর্ত্তিত হয়েও আমাকে সংক্ষুব্ধ করতে পারে না। বরং আমা হতেই জাত হয়ে আমার দ্বারাই পরিধৃত, পরিবৃত ও আমাতেই অবস্থিত থাকে তবুও আমার কি অদ্ভুত আশ্চর্য্য নিঃসঙ্গতা। বেদে আছে “আকাশাৎ বায়ুঃ” মানে আকাশ হতে বায়ু জাত। অতএব ভগবান আকাশ ও বায়ুর উদাহরণটা জীব ও পরমাত্মার সম্বন্ধটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য বলেছেন আকাশে বায়ু থেকেও যেমন আকাশে মিলতে মিশতে পারে না, তেমনি দেহাদি আত্মার সাথে যুক্ত থেকেও আত্মার সাথে মিলতে বা মিশতে পারে না। দেখুন বায়ু আকাশের মধ্যে সর্বত্রগামী হয়েও যেমন পৃথকভাবে থাকে, তার সাথে মিশতে পারে না, তেমনই এই ভূত নিচয় নির্লিপ্ত আত্মচৈতন্যে অবস্থিত থেকে সেই চৈতন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। আকাশস্বরূপ ভগবান নিজের বুকে নিজেই নিজেকে প্রাণরূপে প্রকাশকরে “আপনি সাজিলে পরমেশ্বর, আপনি সৃজিলে বিশ্বভূত, আপনার বুকে ভূমা ঈশ্বরলীলা আপনি করিলে রচনা।” অথচ নিজে রইলে সে লীলার মাঝেও অচঞ্চল, সে প্রাণময় গ্রন্থিজালের বাইরে। তোমাতে আমাতে মিলন ও বিচ্ছেদের এই যে অদ্ভুত সম্মেলন, আমি তুমি হয়েও তুমি নই, তোমাতে থেকেও তোমাতে নেই, আমার অন্তরে থেকেও তুমি আমার বাইরে। এ ধাঁধার শেষ কি হবে আমার ভিতর তোমার ঐ অসঙ্গত্ব দেখলে ? আমার মাঝে তোমাকে দেখতে গেলে তোমার এই অসঙ্গত্বেই লক্ষ্য পড়ে আর অমারও জগৎসঙ্গ ছুটে যায়, ছুটে যায় সকল ভ্রান্তি ও গ্রন্থিজাল। তবে কি তোমার ঐ অসঙ্গত্বের অনুভবের ভিতরেই তোমার দেখা মিলবে ‘ইত্যুপধারয়’ বলে এই মিলন বিচ্ছেদময় অদ্ভুত সম্মেলনের ধারণা করার উপদেশ কি সেজন্যই দিয়েছ ভগবান ? “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্ব মেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥” (শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৪/৯)

মানে হল – মায়াধীশ্বর পরমেশ্বর এ বিশ্বকে অক্ষর ব্রহ্ম হতে সৃষ্টি করেছেন, অন্য অর্থাৎ জীব সেই বিশ্বতেই মায়া দ্বারা বদ্ধ হয়ে আছে। তূরীয় ব্রহ্মই নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি শান্ত, স্তব্ধ ও মগ্ন, কোনও স্ফুরণ ও সৃষ্টিবিহীন, নিঃসঙ্গ। কিন্তু নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম যখনই মায়াকে অঙ্গীকার করেন তখনই তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরী হন। তখনই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি ইচ্ছার উদয় হয় –– “স ঐক্ষত একোহহম্ বহুস্যাম” সেই ঈক্ষণ হতে ব্রহ্মশক্তি প্রাণ স্পন্দিত হয়ে ওঠে, তখন যে প্রকৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশেছিল তা তাঁর থেকে একটু আলাদা হয়ে যায় যার পরিণাম পুরুষপ্রকৃতিরূপ, শেষমেশ অসংখ্য পরিণাম ও অসংখ্য জীব যা মূলতঃ সেই একেরই পরিণাম। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই একেকে অনুভব করতে পারলেই বহুত্বের

এই বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়, সেই যে এক ছিল সেই একই রয়ে যায়। এজন্যই জ্ঞানীগণ মধ্যাবস্থায় এই অসংখ্য জীবের উৎপত্তিকে মায়া বলেছেন যা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের চতুর্থের নবম শ্লোকে আছে যা ভগবান্ঙইত্যুপধারয়' বলে ধারণা করতে বলেছেন। সম্যক ধারণা হলেই বোঝা যাবে সর্ব্বব্যাপী মহান বায়ু আকাশে থেকেও কিন্তু মোটেই স্থির নয় তাই আকাশে স্থিত হতে পারে না। তেমনই চঞ্চলভাব ভূতসকলও আত্মাতে থেকেও শুধুমাত্র চঞ্চলতার জন্যই আত্মায় মিশতে পারে না। একমাত্র যাঁর প্রাণকর্ম্মের সাধনায় চঞ্চলভাব রহিত হয়ে স্থিরতা আসে তিনিই ভূতভাবের অতীত অবস্থায় গিয়ে তত্ত্বাতীত পরমাত্মায় মিলতে পারেন, মানে পরের শ্লোকে যেমনটা বলা হয়েছে তেমন ভাবে মহাকাশে লয়প্রাপ্তিরূপ স্থিতি লাভ করেন। আর যে মায়ার কথা বলা হল তারও অপররূপ ঐ পরের শ্লোকেই আছে ॥ ৯/৬

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ।। ৭

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে সর্ব্বভূত মদীয় ভাব প্রাপ্ত হয় এবং আবার সৃষ্টি কালে আমি তাহা দিগকে উৎপাদন করি ॥ ৯/৭

ব্যাখ্যা: জীব ভগবানের নিজ দিব্য প্রকৃতিরই অংশ। দিব্য প্রকৃতির যে বিশিষ্ট অংশ তার স্বভাব হয় সেই অনুসারেই সে বিবর্ত্তিত হয়। কখনও এক ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করে কখনও অন্য ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করে। অসঙ্গ ভগবানের যোগমায়ার দ্বারাই যে সংসার স্থিতি হয়ে থাকে আবার তা থেকেই সৃষ্টি ও লয়ও হচ্ছে। সেজন্য কল্পের শেষে প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হলে তা আবার নিশ্চল নীরবতার মধ্যে ফিরে আসে মানে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়। আবার কল্পারম্ভে মানে সৃষ্টিকালে সে সমস্ত ভূতকেই বিশেষ বিশেষ ভাবে ভগবান সৃষ্টি করেন। তাহলে আগের শ্লোকে যে মায়ার কথা বলা হয়েছে সেই মায়া কতই অনির্ব্বচনীয়া যা থেকে এ জগৎ বার বার সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে। এ মায়া সৎ ও অসৎ কিছুই নয়, ঘট যে মাটি থেকে তৈরী হয় সেই মাটিতেই মিশে যায়। এই মায়া নিজেই সত্যি নয় তাই এ থেকে সৃষ্ট জগদাদি ভাবও সত্যি নয়, কিন্তু যাকে অবলম্বন করে এই মায়িক পরিণাম সেই মূল কারণটা সত্যি। মায়া বা প্রকৃতি যাই বলি কিছুই ব্রহ্ম হতে পৃথক নয়। আগের শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্ম কিভাবে সগুণ মহেশ্বরী রূপ পেয়ে থাকেন সে কথা বলা হয়েছে। শ্রীরামতাপনী উপনিষদে আছে – " জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তাদি প্রপঞ্চ যৎ প্রকাশতে। তৎ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥" অর্থাৎ জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রার মধ্য দিয়ে যে প্রপঞ্চ প্রকাশিত হচ্ছে, তাও যে সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমি, এটা জানলেই সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃতি মানে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই

অষ্টপ্রকৃতি দেহান্তের পরও দেহীর অনুগমন করে আবার জীবরূপে উৎপন্ন হয়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিসহ জীবের অন্তরে অধিযজ্ঞরূপে এবং সর্ব্বযজ্ঞের সাক্ষী ও নিজবোধের আশ্রয়রূপে তিনি নিত্য অনুভূত। দ্রষ্টার দৃষ্টি, শ্রোতার শ্রবণ, প্রাণীর প্রাণ ও মনস্বীর মনরূপ পরমাত্মাই পরমেশ্বর হয়েও অসঙ্গ এটাই স্পষ্ট করার জন্য নিজশক্তি ও অসঙ্গ আত্মত্বটাকে আলাদা করে, সেই শক্তিতে বা প্রকৃতিতে ভূত বীজত্ব দেখিয়ে নিজের অসঙ্গ প্রভুত্বের রহস্যটা বলতে চেয়েছেন। এখানে প্রকৃতি হল তাঁর সেই স্বাত্মশক্তি যার উপর অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অক্ষর নামে পরিচিত হন, যিনি সেই অব্যক্ত পরমেশ্বর যাঁকে শুধু বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে দেখলে পরমেশ্বর বলতে হয়। কেবল মাত্র মুক্ত পুরুষ বাদে সকল ভূতই কল্পক্ষয়ে প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়, আবার কল্পারম্ভে ঐ প্রকৃতিতে অধিরূঢ় আত্মাই তাদের সৃজন করেন। এটাই সেই পরমাত্মার পরমেশ্বরত্ব। আগে পাঁচ নং শ্লোকে – ঙন চ মৎস্থানি ভূতানি " বলে নিজের আত্মত্বের যে অসঙ্গত্বটা তুলে ধরেছিলেন, এখানে ঙপ্রকৃতিতেই বিলীন হয়" বলে আত্মার সেই অসঙ্গত্বটাকে আরও স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তা ছাড়া শক্তি অংশে জন্মে শক্তি অংশেই লীন হওয়ায় আত্মত্বও কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। কিন্তু চিত্ত অন্যমনস্ক হলেই মায়ায় মুগ্ধ হয়। এজন্য ক্রিয়া বেশী করে করতে হয়, করলেই নেশা হয়, তখন আর চিত্ত অন্য কোনও কিছুতে যায় না তাই কোনও কল্প বা কল্পনা সৃষ্টি হয় না। এভাবে চিত্ত যখন চিত্ততেই থাকতে পারে তখনই সেটা ঙচিন্মাত্র" হয়ে যায়। এটাই ভগবদরূপ। একেই চিত্তে চিত্ত রাখা বা মনে মন রাখা বলে। এখানে একটা জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে ঠিক মত পরিষ্কার হল না যে যিনি নিজে অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার তিনি আবার সৃষ্টি কিভাবে করবেন ? লক্ষ্য করুন পরের শ্লোকে যদি এটা কিছুটা বোঝা যায় –– ৯/৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ।। ৮

অনুবাদ : আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির বশে কর্ম্মাদিপরবশ এই সমস্তভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৯/৮

ব্যাখ্যা: ভগবান তাঁর বিশ্বাতীত পদ হতে তাঁর প্রকৃতির উপর চাপ দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু নিহিত আছে, যা কিছু ব্যক্ত হয়ে আবার অব্যক্ত হয়েছে সেই সমস্তকে বার বার প্রকট করেন। আর অজ্ঞান জীব অবশ, অক্ষম ভাবে প্রকৃতির এই চাকায় ঘুরপাক খায় যতক্ষণ না ভগবৎ চৈতন্যে ফিরে গিয়ে প্রকৃত প্রভুত্ব ও মুক্তিলাভ করতে পারে। প্রকৃতির চাকায় ঘুরপাক খাওয়াটা কি ? সেটা হল ঐ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ময় হওয়া। কারণ এই যে সর্ব্বভূত, তোমরা শক্তিহীন, অবশ। কিন্তু কেন এমন শক্তিহীন ? যেহেতু আত্মাতে লক্ষ্য নেই। তাই বুঝতেও পারে না যে আমার এই শক্তি অধিরূঢ়, নিষ্ফল, নিশ্চিন্ত,

শান্ত ও অসঙ্গ রূপটাই আমার সমস্ত শক্তি প্রকাশের মূলে। সর্ব্বশক্তির মূলটা না দেখে শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ড বিস্ময় শক্তিবিলাস দেখে অভিভূত হয়ে মজে যাও, বিমূঢ় ও আত্মহারা হয়ে যাও অথচ এ শক্তির অভিনবত্বের মাঝে আমাকে বুঝলে না, আমাকে খুঁজলে না, একবার ভেবেও দেখলে না যে এ শক্তি, এ চমৎকার, এ আশ্চর্য্য বিস্ময় কোথা থেকে কি ভাবে এল ? এর মূলে কি আছে বা কে আছেন ? তাই এ সবের মূলে আমাকে না দেখে নিজেও হয়েছ অমূল আর এ বিশ্বকেও করেছ অমূল। বুঝতেও চেষ্টা করোনা কেন যে সব কিছুরই একটা মূল কিছু নিশ্চয়ই আছে। বীজ ছাড়া গাছ নেই, পিতামাতা ছাড়া সন্তান নেই, আগুন ছাড়া ধোঁয়া নেই তাই এ ব্রহ্মাণ্ড নৃত্যের শক্তিকেও আমার শক্তি বলে বুঝতে পারোনা কারণ এর মূলে আমার শিবশম্ভু স্বআত্মমূর্ত্তিটা একটুও লক্ষ্য করোনা বলেই, বিশ্বের মূলে বিশ্বনাথকে তোমরা খুঁজে পাওনা। অচেতন শক্তি শুধু অচেতন শক্তিই দেখে, অচেতন বিশ্বেরই সেবা করে তোমরাও হয়েছ অচেতন – জড়তুল্য। জড়তুল্য তাই শক্তিহীন, জড়াশ্রয়ী তাই শক্তিশূন্য, জড়বাদী তাই আত্মবোধহীন, তাই বিশ্ব তোমার আত্মহীন, তাই তুমি জড়ের পায়ে লুণ্ঠিত, জড়ের অধিকৃত, বলহীন, অবশ। তাই বার বার তোমার বুকে এ জন্মমৃত্যুর সংঘাত। কারণ, তুমি যে এ শক্তির মায়ায় মোহে বিস্মিত, মুগ্ধ, মোহিত হয়ে এ শক্তিতে রীতিমত অনুপ্রবিষ্ট হয়েছ তাই তুমি শক্তিহীন হয়েছ, হয়েছ সে শক্তির আবর্তনে ঘুর্ণায়মান। আর অপরদিকে আমি এশক্তির উপরে অধিরূঢ়, তাই আমি এশক্তির নিয়ন্তা। আর যেহেতু আমি অসঙ্গ তাই আমার এই শক্তির উপর প্রভুত্ব। এখন বুঝে দেখ কিভাবে আমি নিরীহ, শান্ত, সাক্ষীমাত্র হয়েও তোমাদের যজ্ঞালয়ে পরমেশ্বররূপে আমার শক্তির উপর সম্রাটবৎ অধিপত্য বিস্তার করে তোমাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ময় করে থাকি। তাহলে জীবে ও পরমেশ্বরে এই যে শক্তির দাসত্ব ও প্রভুত্বরূপ পার্থক্যটা বোঝা গেল যা শুধু সঙ্গত্ব ও অসঙ্গত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের সাক্ষাৎ ফল মাত্র। আত্মসম্বন্ধশূন্য হলেই অচেতন অতএব জড়, এই দেখেই জীব হয় পরবশ, জড়বাদী, আত্মশক্তিহারা তাই তারা থাকে শক্তিত্বের মাঝে বদ্ধ ভোগবাদী হয়ে যে শক্তি জড়ারূপে দিগদিগন্তে জীবের চোখে প্রতিভাত। আর পরমাত্মা অসঙ্গত্বরূপ যোগপ্রভাবে সেই প্রকৃতির উপর করেন আধিপত্য, বস্তুবাদী ও জড়াভিমানী প্রকৃতির অধীন ভূতসকলকে করে থাকেন পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ময়। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার হয়েও ভগবান কেন জগৎ রচনা করেন ? তিনি যেহেতু নির্ব্বিকার তারতো কেনও কিছুতেই আগ্রহ (রহঃবৎবংঃ) থাকার কথা নয়। তবে তিনি কি সত্যই নির্বিকার ও নির্লিপ্ত ? যদি তিনি তাই হন তবে আবার একটা মায়া মরিচীকাময় জগৎ রচনার দরকারটা কি ? উত্তর হল ঈশ্বর বা পরমাত্মা সত্যই নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। তাঁর এ জগৎ রচনার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে কেন এ মায়ার রচনা ? এর কারণ এই ভূতগণ নিজেরাই। নিজেরাই আমরা অজ্ঞান অঘটন হেতু আর একটা ঘটন বন্ধনে জড়িয়ে ঊর্ণনাভ হয়ে থাকি আর প্রলয়কালে প্রকৃতিতে বিলীন থাকি যে প্রকৃতির অধিশ্বর তিনি, যদিও তাঁর কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নেই, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ন, অভাব নেই তাই অভাব পূরণের জন্য জগৎ রচনার হেতু নেই। আত্মা চিরমুক্ত তাই বন্ধনও নেই যে মুক্তিলাভের জন্য জন্মাতে হবে। আসলে ভূতগ্রাম মায়াকে বশীভূত করতে পারে না। ঐ মায়াই জীবের ইচ্ছা বা কল্পনা, প্রকৃতিতে আটকে থেকে বার বার ইচ্ছা করে সেজন্য বার বার জন্ম মৃত্যু হয়। আর পঞ্চভুতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্) যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) সেই ভূতেরা সেই ইন্দ্রিয়ের বশ। সেই ইন্দ্রিয়সকল শরীর মধ্যে থেকে যে প্রকৃতি তৈরী হয় সেই শরীর যা নিজেই অবশ, যাকে বশে রাখাই সুকঠিন আর ইন্দ্রিসকলও সেই ঘরের হওয়ায় তারাও বশে থাকে না এই হল অদ্ভূত প্রকৃতি যথায় এ শরীর স্বয়ং অবশ পঞ্চভূতের খেলাঘরে। আর পাঁচ ইন্দ্রিয় হল এ ঘরের জানালা, দরজা, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি। এ পঞ্চভূতের চঞ্চলতায় শরীর চঞ্চল আর শরীরের চঞ্চলতায় ইন্দ্রিয়েরাও চঞ্চল যা থেকে মন উৎপত্তি ও চঞ্চল হয়ে ৫ী৫ = ২৫ তত্ত্বের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ব্যাকুল হয়। ভগবান নিজেই গীতাতেই অন্য অধ্যায়ে বলেছেন “ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ”। তাহলে এটুকু তো বোঝা গেল যে সকলই এ প্রপঞ্চের খেলা, যে প্রপঞ্চ মায়াময়। সকল প্রপঞ্চের মূল যে প্রাণ সে প্রাণ স্থির হলেই বেশ বোঝাযায় যে এই ভূতগ্রাম, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ইন্দ্রজালের দৃশ্যের মত অদ্ভুত অথচ মিথ্যে, অলীক। এ খেলায় বহুত্বের খেলা থাকলেও অভিনেতা কিন্তু বহু নয়, সেই একজন। সাধন দ্বারা প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়েরা ধীরে ধীরে স্থির হয়ে এলেই এ বিশ্বখেলার ম্যাজিকশো শেষ হয়ে যায় ও একের ভিতর বহুত্বের শেষ হয়, শুধু সেই দেবাদিদেব পরমাত্মাই অখণ্ড মন্ডলাকার হয়ে বিরাজ করেন। “ওরে কালো ধলো যত বলো মেয়ে পুরুষ সেই সকল। যেমন নানা বুলি বাজায় ঢুলি বাজে কিন্তু একই ঢোল ॥” ৯/৮

> ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
> উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ।। ৯

অনুবাদ: হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কর্ম্মে অসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে সেই সব কর্ম্ম, আবদ্ধ করিতে পারে না। ৯/৯

ব্যাখ্যা : ভগবান প্রকৃতির সাথে থেকে তাকে কর্ম্ম করাচ্ছেন অথচ তাঁর সে বিশ্বাতীত ঈশ্বরিক সত্তার বাইরেও রয়েছেন। তাঁর সত্তা ঐ কর্ম্মে নিমগ্ন নয়। তিনি কোনও রকম অদম্য বাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে আসক্তও নন। তাই তাঁর কর্ম্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। তিনি অনন্তকাল ধরে যেমন আছেন তেমনি আছেন। প্রকৃতির কোনও আবর্তনেই তাঁর এই অক্ষর সত্তার কোনও তফাৎ হয় না। এখানে পাঠকের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে যে তুমিতো নানাবিধ কাজকর্ম্ম কর তথাপি তোমার কেন কর্ম্মবন্ধন নেই ?

আবার এ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে‘ধনঞ্জয়’ বলেই বা সম্বোধন করছেন কেন ? আগেও বলেছিলাম ব্রহ্মৈশ্বর্য্যরূপ ধন বিজয়ী হতে, আত্মশক্তির উপর বিজয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যমীরূপে জীবকে ভগবান দেখতে চান এবং সাধকপ্রবর অর্জুন এই বিজয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী সেটা জেনেই ভগবান অর্জুনকে ‘ধনঞ্জয়’ বলে সম্বোধন করেছেন। পাঠকের অপর প্রশ্নটি ছিল মায়া যখন তোমারই আর তাতে যখন কিছু কর্ম্ম হবেই তাহলে অন্যান্য জীবের মত তোমারই বা বন্ধন হবে না কেন ? এরও উত্তর এই শ্লোকেই আছে যেখানে ভগবান বলছেন আসক্তি ও কর্তৃত্বের অভিমানই কর্ম্মবন্ধনের হেতু। আমি উদাসীন এবং কোনও কিছুরই কর্ত্তা নই তাই কর্তৃত্বাভিমানরূপ বিকার আমাতে নেই। অসক্ত (অনাসক্ত) বলে কর্ম্মের ভালমন্দ ফলের প্রতি আমার আসক্তি থাকাও সম্ভব নয়। অতএব মায়াযুক্ত হলেও মায়ার দ্বারা অথবা মায়ার কাজের দ্বারা আমি কোনও ভাবেই আবদ্ধ নই। আমি বিশ্বসৃষ্টি পুনঃপুনঃ করি সত্যিই কিন্তু সেটা কি ভাবে করি ? কেমন করে করি ? সেই সৃষ্টিকর্ম্মে নিজে থাকি উদাসীনবৎ, অসঙ্গ, অনাসক্ত যে কারণে এই সমস্ত সৃষ্টি আদি কর্ম্মসকল করলেও আমার উপর কোনও গ্রন্থিবন্ধন করতে পারে না। ফলাসক্তি না থাকলে বন্ধনও নেই। আসলে ভোগময় শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট বদ্ধজীবের আত্মা যে সত্যিই অসঙ্গ, স্বাধীন স্বরূপে আছে সেদিকটা দেখতেই চায় না, শুধুই ভোগাধীন অবস্থাটার দিকেই চেয়ে থাকে। কাজেই সে শক্তিতে যা প্রকাশ পায় সেও তেমনটাই হয়ে পড়ে। সুখ প্রকাশ হলে সুখী, দুঃখপ্রকাশ হলে দুঃখী এভাবে প্রতি জ্ঞানপ্রকাশেই আপনি তন্ময় হয়। ভোগ সার্থকতার এটাই বিজ্ঞান, ভোগের এটাই নিয়ম। তাই আত্মার এই ভোগময় দিকটাই জীবত্ব। এদিকে তিনি বহু জীব, কিন্তু যে দিকটা আবার পরমেশ্বর সেদিকটায় তিনি স্বীয় অসঙ্গত্বের জন্য উদাসীন অনাসক্ত আর সেজন্যই সৃষ্টি আদি সকল কর্ম্মই তিনি করলেও তাঁকে সে সমস্তর অধীন করতে পারে না। ভগবান এখানে “উদাসীনবৎ” শব্দটা ব্যবহার করেছেন। মানে উদাসীনের মত, অর্থাৎ পুরোপুরি উদাসীন নয়। কারণ পুরো উদাসীন হলে তো কোনও কাজই হোত না। এখানে ভগবানের কাজটা অনেকটা যেন বৃষ্টির মত। বৃষ্টি যেমন সমানভাবে জল বর্ষণ করে গাছপালার উপর কিন্তু বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী গাছ হয়। মিষ্টি ফলের বীজ থেকে মিষ্টি ফলের গাছ, টক বা তেতো ফলের গাছ থেকে টক বা তেতো ফলের গাছ হয় আবার অমৃতফল বা বিষবৃক্ষের বীজ থেকে অমৃত বা বিষবৃক্ষই জন্মায়। এখানে বৃষ্টিপাত যেমন গাছের মিষ্টি, টক, তিক্ত, অমৃত বা বিষফল উৎপাদনের জন্য দায়ী বা দায়বদ্ধ নয় ঠিক তেমনই ঈশ্বরও সৃষ্টি আদি কর্ম্মের জন্য অনুরূপভাবেই দায়বদ্ধ থাকেন না। ভগবান জীবের সুখদুঃখের উৎপাদকও নন। সুখ দুঃখ জীবের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে হয়ে থাকে। বীজের মধ্যে যেমন ফল উৎপাদক শক্তিই থাকুক বৃষ্টিপাত ছাড়া কোনও বীজই অঙ্কুরিত হয় না তেমনই তাঁর অধিষ্ঠান ছাড়া মায়া একা কিছু করতে পারেনা। কেমন অধিষ্ঠান ? উদাসীনবৎ। বেশ ! তাহলে পাঠক এখানে প্রশ্ন করুন যে এমন উদাসীন ভগবানকে ভজনা করে আমাদের কি লাভ ? এর উত্তর হিসাবে ভাবুনতো দেখি যে প্রচণ্ড শীতে আগুনের কাছে যেতে পারলে আগুনের ইচ্ছা না থাকলেও তার স্বতঃস্ফূরিত তাপ থেকে আমাদের ঠান্ডা দুর হয়। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা না করলেও, না চাইলেও, সমুদ্রবায়ু এসে আমাদের বাতাস দিয়েই থাকে ঠিক তেমনি ভাবেই ঈশ্বর ভক্তেরও ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ হয় এর জন্য ভক্ত সাধককে প্রার্থনাও করতে হয় না আর ঈশ্বরকেও কারও জ্বালা নিবারণের জন্য সঙ্কল্প করার দরকার হয় না। নির্ব্বিকার ভগবান স্বতস্ফূর্ত ভাবেই কল্যাণ করে থাকেন, শুধু তাঁর কাছে যেতে হবে মানে তাঁকে লক্ষ্য করতে হবে। তিনি কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা এই ভাবটা বিশেষভাবে তাঁর ঐ কর্তৃত্ব রহস্যের ভিতর লক্ষ্য করতে হবে। তবেই বোঝা যাবে উদাসীন না বলে “উদাসীনবৎ” কেন বলেছেন। নিজের কর্তৃত্বের মূলে এই অসঙ্গ অকর্ত্তা ভাবটা অব্যাহত রাখেন বলেই কর্ম্ম সকল তাঁকে বন্ধন করতে পারে না। আর জীবকূল কি করে ? ঐ কর্তৃত্বাভিনিবেশটুকু অবলম্বন করেই জন্মায়। সুতরাং তার ভোক্তা হতেও বাধ্য হয় অর্থাৎ তিনিই জীবরূপে ভোক্তা হয়ে থাকেন। কি অনির্ব্বচনীয় এই পরমাত্মতত্ত্ব ! দেখুন যার একদিকে অসঙ্গত্ব প্রধান পরমেশ্বর অন্যদিকে ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রধান জীবত্ব। তাই তোমরাও যদি ধনঞ্জয় হয়ে ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা হতে চাও, তবে নিজের নিজের মূলে উদাসীনবৎ অসঙ্গ সংস্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত হও। এখনও সময় আছে। বস গিয়ে গুরুর কাছে ॥ ৯/৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে ।। ১০

অনুবাদ: অধিষ্ঠাতা আমা কর্তৃক প্রকৃতি চরাচর সহিত বিশ্ব প্রসব করে। হে কৌন্তেয়, এই হেতু জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয়। ৯/১০

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভগবান যে কথা বললেন তারই সপ্রমাণ হিসাবে এই শ্লোকে বলছেন, ভগবানও এই আবর্তন চক্র অনুসরণ করেন, কিন্তু জীবের মত অবশভাবে নয়। তিনি নিজেই অধ্যক্ষরূপে তাঁর কার্য্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রকৃতির দ্বারা চরাচর জগৎ সৃষ্টি করান। কি ভাবে ? উদাসীনবৎ জগৎকর্ত্তা হলে পরে ঔদাসীন্য ও কর্তৃত্ব উভয় বিরুদ্ধভাব কিভাবে একত্রে তাঁতে সন্নিবেশিত থাকতে পারে ? লক্ষ্য করুন প্রতি কর্ম্মেরই দুইরকম কারণ – নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। জ্ঞানমাত্রস্বরূপ পরমাত্মার সেই উভয়বিধ প্রকাশও জগদ্ব্যাপারের দুই কারণ ‘চিতিশক্তি’ হল নিমিত্ত কারণ ও ‘জ্ঞানশক্তি’টা হল উপাদান কারণ। এই চিতিশক্তিই অধ্যক্ষরূপে থাকেন এবং সেই অধ্যক্ষ্যতার প্রভাবে প্রযুক্ত হয়ে তাঁর শক্তিটাই কর্ম্মময়, রূপময় ও নামময় জগদায়তন রচনা করে। এই পরাশক্তিই নিজেকে বহু আত্মারূপে বিভক্ত করেও আপনি পরমেশ্বরীরূপে বিরাজ করেন।

সপ্রকাশ পরমাত্মার আপনার দ্বারা আপনি নিত্যপ্রকাশ থাকার মহিমাই সর্ব্বাত্মরূপা পরাপ্রকৃতি বা চিতিশক্তি। এবং আপনার সর্ব্ববিজ্ঞাতৃরূপ শক্তিই হল অপরা প্রকৃতি। তাহলে দেখা গেল যে একই শক্তি এই দুইভাবে প্রকাশিত হয়ে অবস্থান করছেন। বেদে এভাবেই বলা আছে – “স্ব মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতং যদি বা ন মহিম্নি ইতি” অর্থাৎ তিনি ও তাঁর মহিমা এভাবে বিভক্ত করে দেখলেও চলে না দেখলেও চলে। কর্ম্মের দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি ও তাঁর মহিমা এমন আলাদা করে দেখলে সহজে বোঝা যায় কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে ওভাবে ভাগ করা যায় না। সবই একই প্রজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বলে বুঝতে হয়। তাঁর মহিমার এই পরা ও অপরারূপ দুটো দিক এভাবেই বুঝতে হবে। তৈত্তীরীয় ব্রাহ্মণে আছে – “যোহস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ ” এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের যিনি অধ্যক্ষ তিনি পরম আকাশে বিরাজমান। মায়াবশতঃই ব্রহ্মচৈতন্যের বিপর্য্যয় জ্ঞানে জীবভাব বিকশিত হয় ঠিকই কিন্তু ভগবানের অধ্যক্ষতা বিনা এই চরাচরাত্মক ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ নানা অবস্থাতে পরিবর্ত্তিত হতে পারে না। এজন্য ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলা হয়। এখানে আবার সেই প্রশ্ন যে যখন অন্য কিছুই সত্য নয়, ‘এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ’ তাহলে পরমার্থতঃ তাঁর কোনও কিছুর সাথেই ভোগসম্বন্ধ নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনও চেতনসত্তাও নেই, ভোগসত্তাতো বাদই দিলাম। তবে জগৎ কে উৎপন্ন করল ? এথেকে বোঝা যায় যে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এ সমস্তই মিথ্যা। আর মিথ্যাই যদি হয় তবে আমরা যে এ যাবৎ সবই সত্যি বলে দেখে ও বুঝে আসছি। এমন হয় কেন ? তার উত্তরে ভগবান পঞ্চম অধ্যায়েই বলেছিলেন “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ” – “অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত, এজন্যই জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়।” অর্থাৎ আত্মার চৈতন্য ভাবটাই দেহ ও ইন্দ্রিয়েতে প্রতিফলিত হওয়ায় সেগুলোও সচেতন বোধ হয় ঠিক যেমন আমরা চাঁদের আলো দেখি, যদিও চাঁদের কোনও আলো নেই। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের চেতনাটা যে কার ? বা কোথা থেকে আসছে ? এসব না ভেবে শুধুমাত্র জড় চেতনাত্মক দৃশ্য জগৎটাকেই দেখে, যা থেকে চৈতন্য আসছে সেই মূল কেন্দ্রে লক্ষ্য করতে পারে না। ফলে উল্টো রাস্তায় চলে। তাই জগৎদর্শনই হয়, ব্রহ্মদর্শন হয় না। যাঁরা কিছুটা জন্মান্তরের সুকৃতি আর কিছুটা পুরুষকার ও অধ্যাবসায় সহযোগে এই বোধে পৌঁছাতে পারেন তাঁরাই ব্রহ্মদর্শন করেন, সত্য বোধটাকে সাময়িক হলেও আয়ত্ত করতে পারেন। এ বিজ্ঞান একটু আয়ত্ত হলে তবেই অপরকে আত্মজ্যোতি দর্শন করান সম্ভব হয়। শুধু মুখে বললে হবে না। চৈতন্যস্বরূপ তিনি, সেই চৈতন্যকে বিপরীত ভাবে দেখা হয়। গাছের যেমন মূল নীচে এবং ডালপালা উপরে এখানে ঠিক উল্টোভাবে মূল উপরে ডালপালা নীচে। মূল হল মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্রে যেখানে সেই পরম কারণের কারণ বর্ত্তমান। যেখানে শিব ও শক্তি একাধারে মিলিত। সেই শক্তি অসংখ্য প্রবাহিকার মধ্য দিয়ে নামতে নামতে বিবিধ ইন্দ্রিয় ও দেহাদিরূপে একেবারে স্থূল ভূতময় ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এখন সেই ভূতনাথের কাছে যেতে হলে আবার সেই বিবিধ নাড়ীর মধ্যদিয়ে সহস্রারে পরাব্যোমে এসে মিশলেই সব একাকার হয়ে যাবে। তিনি যে অধ্যক্ষ (অধি + অক্ষ) = অক্ষিস্থ পুরুষ। ইনিই সকলের মধ্য সবকিছু। ইনি না থাকলে কিছুই থাকে না, অথচ কোনও কিছুরই ভোক্তা নন, দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতির ভাঙ্গা গড়া যা কিছু এই অধ্যক্ষ পুরুষ আছেন বলেই সম্ভব হয়। আবার এ প্রকৃতিও তিনিই একথা আগেই বলেছি, পরা এবং অপরা রূপের কথা, এটা তাঁরই জগৎরূপী পরিণাম পাওয়া বা অবতরণ। এজন্যই তিনি বললেন – আমার অধ্যক্ষতা দ্বারাই প্রকৃতি রচিত, জগৎ বিপরিবর্ত্তনময়। বিপরিবর্ত্তন মানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মভোগ ও মুক্তি আদি উদ্দেশ্যযুক্ত বা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন। তাঁর অধ্যক্ষতার দ্বারা তিনি প্রত্যাগাত্মভাবে সঙ্গময় হয়েও একান্ত অসঙ্গভাবেই থাকেন। নইলে শুধু অব্যক্ত অপরাপ্রকৃতিই জগৎকারণ হলে এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এতটা ঃংঃবসধঃরপ হত না আর তার মধ্যেও এতটা বিচিত্র প্রকাশ ও এমন একটা বৈজ্ঞানিক ক্রমমুক্তিময় ধারাও থাকত না। এজন্যই একদিকে তিনি লীলায়ন শূন্য অন্যদিকে নিত্য লীলাময়, এই উভয়লিঙ্গত্বটা যে ধরতে পারে ও বুঝতে পারে সেই তাঁকে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বাকারে জেনে তাঁতে প্রবেশ করতে পারে। এমনি ভাবেই তিনি কর্ত্তা, অকর্ত্তা ও উদাসীনবৎ থেকেই জগৎ রচনা করতে পারেন। একথা আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও ভালমত বলা হয়েছে। ৯/১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ।। ১১

অনুবাদ: বিমূঢ়চিত্ত মূর্খগণ সর্ব্বভূত -মহেশ্বররূপ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া মনুষ্য দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ৯/১১

ব্যাখ্যা: ভগবান তাঁর পরম সত্তায় সকল বিশ্বের অতীত, কিন্তু এ বিশ্বও তাঁর নিজ প্রকৃতির ক্রিয়া এবং ভাগবৎ প্রস্তুতি কখনই ভগবানকে ছেড়ে থাকতে পারে না, যে যা কিছু সৃষ্টি করছে তারই মধ্যে ভগবান অনুস্যুত রয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন কিন্তু মায়ার অন্তরালে, আর অবতারে ভগবান একেবারে সামনাসামনি প্রকট হয়ে থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে পূর্ণ যোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে এ সত্যটা সবার আগে স্বীকার করা অবশ্য প্রয়োজন তবে না বুঝে নয়, আগে ভালমত বুঝতে হবে। নইলে মূঢ় মানুষের মতন মানব দেহধারী অর্থাৎ জীবের আত্মারূপী সর্ব্বভূত মহেশ্বরকে না বুঝে, না জেনে, অজ্ঞতাবশতঃ অবহেলা করা হবে। আরও বেশি আশ্চর্য্যের বিষয় হল মানুষ নিজের মাঝে আমাকে আত্মারূপে অনুভব করেও আমার সঙ্গময় জীবভাবটারই উপাসনা করে, আমার অসঙ্গ সর্ব্বভূতেশ্বর পরম ভাবটি দেখে না, দেখতে চায়ও না, সে চেষ্টাও করে না। কার্য্যতঃ তারা আমাকে অবহেলাই করে থাকে। কেন এমন করে ? মূঢ়তা বশতঃ। মূঢ়তাবশতঃ

জীবত্বেরই করে উপাসনা, জীবত্বেই করে উপভোগ, জানেও নিজেকে জীব বলেই, তাই সিদ্ধিলাভও করে ঐ জীবত্বের। কিন্তু যদি ঐ সঙ্গময় অপরা মহিমার তলায় অসঙ্গ পরা-মহিমাটির উপাসনা করতো, তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতো, তার সাথে পরিচিত হত ও তাতেই বিলাস করতো তবেই ঐ অসঙ্গত্বে সিদ্ধিলাভ করে, আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বর ভাবটাও দেখতে পেত আর ব্রহ্মপরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতো। কিন্তু এ পরমভাবটা লক্ষ্য না করে জীবকুল শুধু মূঢ়ের মতই রয়ে গেল। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা মাতৃদুগ্ধের প্রবাহিকা স্তনটিকেই আসল মনে করে, আঁকড়ে ধরে থাকে, ছাড়তে চায়না, তার মূল উৎসটার দিকে লক্ষ্য করতে পারে না, তেমনই জীব তার সেই মূল অব্যক্ত উৎসটাকে ধারণায় আনতে পারে না যে উৎসটা থেকে এই প্রাণের প্রবাহ বহির্মুখে ছুটে এসেছে। সেই উৎসের কেন্দ্রটা অত্যন্ত স্থির ও চির নির্ম্মল। এই পরম স্থির অবস্থাটাই আত্মার পরম ভাব ও স্বরূপ। এ অবস্থার আরম্ভ বা শেষ নেই, উৎপত্তি বা নাশ নেই, এঁকে ধরা বা বোঝা যায় না বটে কিন্তু তাঁর থেকে উৎপন্ন যে প্রাণের বেগ বা শক্তি সেটাই বহু আকারে নিজেকে প্রকাশ করে এই জগদব্যাপার সম্পন্ন করছে। আর মূঢ় বা মূর্খেরা ঐ আকারযুক্ত জীবভাবকেই আসল মনে করে ঐ নামরূপ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে, যেহেতু মনে ভাবে যেন ঐ রূপ, ঐ নাম, না থাকলে আর কিছুই বুঝি থাকবে না। মূর্খ ও অজ্ঞানান্ধ মানুষ নামরূপময় কার্য্যকারণের অতীত যে অব্যক্ত অবস্থা, সকল রূপাতীত অরূপ যে মহেশ্বর, যিনি আমাদের সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁকে দেখতে পায় না। ইনিই আত্মা, অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ, যাঁকে জানতে হলে চাই একটু ধৈর্য্য, একটু পরিশ্রম ও একটু সময়। কৃপণ জীবকুল, ভোগের কাল থেকে একটুও খরচ করতে নারাজ তাই তারা মূঢ় এবং নিজেদের পরমভাব অরূপ মহেশ্বরকে না বুঝে, না জেনে, মায়াময় নামরূপসর্ব্বস্ব জড়জগৎকেই জগৎরূপে দেখে থাকে ॥ ৯/১১

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ।।১২

অনুবাদ : বুদ্ধিভ্রংশকারী তামসী ও রাজসী প্রকৃতি অবলম্বনকারী বিফলাশা বিশিষ্ট, বিফলকর্ম্মা ও বৃথাজ্ঞান বিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত চিত্ত বিবেকহীনগণের নিকটই আমি এরূপ উপেক্ষিত ॥ ৯/১২

ব্যাখ্যা: যে চেতনা ভিতরের সত্যকে দেখায় না, যে জ্ঞান মাত্র বর্হির্জগৎকেই দেখায়, সেই চেতনা, সেই জ্ঞান নিতান্তই বৃথা। যে আশা স্থায়ী নিত্য সত্য বস্তুকে ছেড়ে অলীক, অনিত্য বস্তুর পিছনে ছুটে বেড়ায়, সেই আশা বৃথা। আর যে পরিশ্রম লাভ লোকসানের হিসাবে নষ্ট হয় সে পরিশ্রমও ব্যর্থশ্রম মাত্র। অন্ত রস্থিত ভগবানকে দেখতে না পেলে তাঁকে স্বীকারও করা যায় না, তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর সাধর্ম্ম্যও লাভ করা যায় না। তাই নিচের প্রকৃতিতে বদ্ধ থেকে সারাটা জীবনই বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র হয়ে পড়ে। সে জন্যই আগের শ্লোকের শেষ কথাটা অর্থাৎ আত্মার ঐ পরমভাবটা না বুঝলে, না জানলে, তাঁতে উপনীত হতে না পারলে জীব পড়ে রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির কবলে। রাক্ষসী মানে হল কামক্রোধবিপ্লবাত্মক রাজসী প্রকৃতি। আর আসুরী প্রকৃতি হল অন্ধ, তমসাবৃত মৃত্যুময়ী তামসী প্রকৃতি। সনাতন আত্মার উপলব্ধি না হওয়াই এ মৃত্যুর কারণ। বেদেও আছে এ কথা। আত্মদর্শনহীন পুরুষ অন্ধতমসাবৃত অসুরলোক পায়, বেদে এমন পুরুষকে আত্মঘাতী, বরিতমৃত্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমভাব মানে পূর্ব্বশ্লোকে কথিত সর্ব্বভূতমহেশ্বর ভাবটি যা জীবত্বের আশ্রয় হয়েও তাতে অসঙ্গ, সেটা না পাওয়াই কামক্রোধ, বিক্ষোভ ও বিপ্লবময়, ত্রাহি ত্রাহিময় রাজস ও মৃত্যুময় তামস ভাবের কারণ। ঐ রকম প্রকৃতিগত হয়ে পড়লেই জীবের আশা আকাঙ্খা, কর্ম্মোদ্যম, জ্ঞানবিবেক, বুদ্ধি, হৃদয়ের প্রসন্নতা সবই অসার ও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তখন সবই অর্থহীন। অসঙ্গ আত্মা না দেখা আর আত্মহত্যা করা সমান কথা। উগ্র ভোগপ্রবণতায় আত্মাকে করে হতভুল্য। আত্মা তো আর হত হন না, তাই হততুল্য বলা হল। বিধ্বস্ত, বিড়ম্বিত,ব্যর্থতায় বিফলতায়, সকাম জীবন হয়ে ওঠে মৃত্যুর বিদলনে বিমর্দ্দিত যা আত্মহত্যার চাইতে বেশি ছাড়া মোটেই কম নয়। এজন্যই আত্মহত্যাপ্রবণ বা অমন মানসিকতার জীবকে নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে থাকি। কিছু বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থীর উপর পরীক্ষায়ও দেখা গেছে মূল কারণটাই ঐ প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে। যাক সেসব অন্য কথা। আবার কিছু কিছু অতিশয় সংসারাসক্ত অতি চালাক গোছের জীব মনে করে সে যতই কুকর্ম্ম করুক ঐ যে রোজ একটু জপ করে বা ঠাকুরের মূর্ত্তির সামনে কিছু ভোগ দেয় ওতেই বুঝি যমদণ্ডকে ফাঁকি দিতে পারবে। কিন্তু যম তো তার কর্ম্মচারীমাত্র নয় যে তোষামদে সন্তুষ্ট হবেন। যম আমি স্বয়ং – "যমঃ সংযতামহং"– ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলদানরূপ নিগ্রহ ও অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে আমি যমরাজ। তাই মঠ-মিশনের স্বামিজী বাবাজীরা যাই বলে থাকুন ও সমস্ত ফক্কিকারীতে যমদণ্ড থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সবই নিস্ফল। আবার আমাকে চায়না অথচ আমার দেওয়া ধনাদির লোভে দেবদেবী পূজো ও যাগযজ্ঞ করে থাকে যা সকলই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আবার যাদের দেখা যায় শাস্ত্রজ্ঞান আছে অথচ কুতর্কাশ্রয়ী, ইচ্ছামত কাজ করে ও সে কাজের সমর্থনে কিছু যুক্তিও বেশ খাড়া করে দেয় এবং কুতর্কের দ্বারা সবকিছু প্রমাণ করে ও লোককে বোঝায় অনাহারে থেকে ফুঁ দিয়ে আগুন বের করতে না পারলে ভক্ত হয় নাকি ? এরা ভগবানকে স্বীকারও করে না, একমাত্র নিজের দরকার ছাড়া। এরা দেহ ব্যতীত অন্য কিছু দেখে না, যা করে সবই সাংসারিক লাভের আশায়। এরা ক্রিয়া-দীক্ষাদি প্রার্থী হলেও দিতে নেই কারণ দিলেও তাতে প্রবেশ করবে না, তার জন্য পরিশ্রমও করবে না। এসকল বিমূঢ়চিত্ত জীবগণ, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ ভগবানকে কখনও ভালবাসতে পারে না। এরা আমার ভক্তকে অবজ্ঞা করে। এরাই জড়বাদী ও ভোগবাদী। এঁদেরই ভগবান এই শ্লোকে রাক্ষস ও অসুর বলেছেন ॥ ৯/১২

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ।। ১৩

অনুবাদ: হে পার্থ, দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্যস্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন ॥ ৯/১৩

ব্যাখ্যা : পূর্ব্বশ্লোকের সূত্র ধরেই বলা যায় যে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা অনুসারে রাক্ষস ও অসুর প্রকৃতির মত দিব্য প্রকৃতিরও সম্ভাবনা আছে। নিতান্তই জড় ও ভোগবাদীদের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে একমাত্র যাঁরা এই দিব্য প্রকৃতির জ্যোতি ও উদারতার দিকেই নিজেদের উন্মুক্ত করে দেয় শুধু তারাই ঠিক পথ ধরেছে। এ পথটা প্রথমে একটু সঙ্কীর্ণ মনে হলেও শেষ পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় ভাবে প্রসারিত হয়ে মুক্তি ও সিদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। আপনার মধ্যে দেবত্বের বিকাশ করাই হল আসল কাজ। নীচের দিকের ঐ আসুরিক ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে দুরনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত করতে হয়। এটাই হল মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্য। রহস্য না হয় বলা হল কিন্তু সে কথা শোনেই বা কে ? জড়বাদের আকর্ষণ ভীষণ সাংঘাতিক। এ আকর্ষণের বৃত্তে ঢোকা যত সহজ বেরিয়ে আসা মোটেই তেমন সহজ নয়। এ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে দেখুন। সাধনার দ্বারা বিবর্ত্তন যত তরান্বিত হয় এ বিকাশও ততই বর্দ্ধিত হয় ও মায়ার আবরণও ততই খসে পড়ে। জীব প্রকৃত কর্ম্মের সন্ধান পেলেই অভ্যাসের ফলে তার মহত্তর উপযোগীতা, উপলব্ধি করতে পারে এবং সেই কর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠানেই জীবনের প্রকৃত সত্য বুঝতে ও দেখতে পায়। এই না হলে আত্মার পরমভাব না বুঝলে না জানলে পরেই জীব রাক্ষসী বা আসুরী ভাব পেয়ে থাকে যদিও বাইরের মূর্ত্তি ও সাজগোজে তার কিছুই বোঝা যায় না। সেজন্য ভগবান, তাঁকে জানলে জীব যে প্রকৃতি পেয়ে থাকে ও যেমন ব্যবহারময় হয়ে ওঠে সেটাই বলছেন। আত্মাই যে ভূতসকলের আদি কারণস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম, পরমেশ্বর এবং অব্যয় এইভাবে আত্মাকে জানলে ও বুঝলে জীব দৈবীপ্রকৃতি লাভ করে আত্মার এরূপ মহত্ব বা পরমেশ্বরত্ব বা ব্রহ্মত্ব দর্শন করলে সেই জীব নিজেও মহান হয়ে যায়,ভগবান আর তাঁর কাছে ইতস্ততঃ অনৃতময় থাকেন না। আত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই আমার আত্মারূপে অবস্থিত। এই বোধে দৃঢ় ও অনন্যমনা হয়ে পরমাত্মোপাসনায় নিযুক্ত হয় আর তখনই জীব মহাত্মা হয়। ভগবান এমন জীবকেই মহাত্মা বলে সম্ভাষণ করেছেন। এমন মহাত্মাগণ সারাৎসার ব্রহ্মকেই আশ্রয় করে থাকেন, এবং যাতে এই আশ্রয় থেকে আর বিচ্যুত না হতে হয় সেজন্যই দৈবীপ্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি কি সেটা আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। তবুও বলি, দৈবী প্রকৃতি হল ভগবানের প্রকৃতি। ভগবানের প্রকৃতিটা কি ? ভগবানের প্রকৃতিই হল প্রাণ যা অবলম্বন করে এই জগৎ খেলা চলে। চঞ্চলপ্রাণ বর্হির্মুখী হলেই সেটা রজঃ ও তমঃ অভিভূত হয়ে রাক্ষসী আসুরভাবে মনকে গ্রাস করে থাকে কিন্তু যাঁরা ক্রিয়া করে জগতের স্থিরপ্রাণরূপা আদি কারণকে আশ্রয় করে থাকেন ওটাই হল দৈবী প্রকৃতি। এই স্থির প্রাণই আত্মা। শ্রদ্ধার সাথে ষটচক্রে ক্রিয়া করলে ষটচক্রস্থিত যে মহাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম। এই অব্যক্ত মহাস্থির রূপই পরব্রহ্ম বাসুদেব। মহাত্মাগণ সর্ব্বময় এই বাসুদেবেরই ভজনা করেন ॥ ৯/১৩

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ।। ১৪

অনুবাদ: কেহ কেহ সর্ব্বদা কীর্তন করিয়া, কেহ কেহ দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া প্রযত্ন করিয়া, কেহ কেহ ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া,কেহ কেহ বা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ৯/১৪

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভগবান কারা তাঁর ভজনা করেন সেকথা বলেছেন। এখন এই শ্লোকে কিভাবে ভজনা করেন সেটা বলছেন। মানুষ ও জগতের মধ্যে বিরাজমান ঈশ্বরের প্রতি একটু সজাগ হতে পারলেই হল। তখন সমগ্র জীবনই হয়ে ওঠে ভগবানের উপাসনা। তাঁর প্রতি অপরিমেয় প্রেমভক্তিতে আমরা পূর্ণ হয়ে উঠি। যদিও এটাই পূর্ণভক্তির পন্থা, হৃদয়ের যজ্ঞদ্বারা পুরুষোত্তমের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তবুও দেখা যায় বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরণের ও মতের উপাসনা। তাই যে পথই অবলম্বন করুন তাতে শ্রদ্ধা থাকা খুবই দরকার কারণ পথটাতো খুবই দুর্গম। তাই শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে গুরুর কাছে সদা সর্ব্বদা বসে থেকে তাঁর সেবা পরিচর্য্যা করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সেখানে পৌছাবার উপায় বার বার আলোচনা করতে হয়। নইলে বহির্মুখ থেকে চিত্তকে অন্তর্মুখ করা যায় না। যদিও এটা হল বহিরঙ্গ সাধন। এর সাথে আবার কিছু অন্তরঙ্গ সাধনও দরকার। এটা কিন্তু বহিরঙ্গের মত সাধারণ নয়। এটা শরীর ও মনের গঠন অনুসারে সদ্গুর" কতৃক নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় সাধক সাধারণতঃ দুইরকম – জ্ঞানপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান। বহিরাঙ্গিক উপাসনা একই রকম হলেও কেউবা ভগবদ্ ভাবটাই প্রধানভাবে অবলম্বন করে, তার সেবাপরায়ণ ভাবটাকেই প্রকৃতি অনুসারে প্রাধান্য দেয়। আবার কেউবা ব্রহ্মভাবপ্রধান ধারণায় থেকে মূলতঃ তাতেই সমাহিত থাকতে চেষ্টা করেন। এঁদের বিষয়ে পরের শ্লোকে বলা হবে। এখন এই শ্লোকে বর্ণিত সাধারণ ভজনার কথাগুলোই প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়। বাক্, প্রাণ ও মন অনুভূতির তিনটে ভাগ। চিত্তে রজোগুণাধিক্য হলে অনুভূতি বাগব্যবহারপ্রধান, তমোগুণাধিক্যে মন ও ইন্দ্রিয়প্রধান এবং সত্ত্বাগুণাধিক্যে প্রাণব্যবহারপ্রধান উপাসনা হয়। এটাই এই শ্লোকে ভগবানের বলা কথার অর্থ। ভগবান বলছেন সাধক সর্ব্বদা আমাতে তিনভাবে যুক্ত থেকে উপাসনা করে। এই রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্ব যেটার আধিক্যে যেমনটা হয়। এ গুণ বিচারে সদ্গুরুগণ যথেষ্টই পারঙ্গম হয়ে থাকেন। তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকেন কে কি ভাবে যুক্ত হতে তাড়াতাড়ি সক্ষম। যা হোক বহিরঙ্গে কেউ বা কীর্ত্তন ও মহিমা কথনে,

কেউবা চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের সংযত ভাবের মধ্যে, কেউ বা প্রাণময় ব্যবহারপ্রধান হয়ে ভগবানে যুক্ত হতে পারে নিজ নিজ গুণের আধিক্য অনুযায়ী। তবে সাধন দ্বারা যে তন্ময়ভাব আসে সেটাই মুখ্য কীর্ত্তন নতুবা শুধুমাত্র জোরে জোরে ভগবানের নাম উচ্চারণে যে কীর্ত্তন হয় সেটা গৌণ কীর্ত্তন। ওতে কিছু হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সংকীর্ত্তন চালু করেছিলেন সেটা শুধু সাধারণের রুচি আকর্ষণের জন্য, মোক্ষ লাভের জন্য নয়। তাই যাঁরা মুখ্য কীর্ত্তন জানে না তাঁরা গৌণকীর্ত্তন করতে পারেন শুধু সময়টা ভগবানের নাম করে কাটানোর জন্যই, এর বেশি কিছু নয়। আর মনকে অন্তর্মুখ করতে হলে প্রাণায়ামের সাথে অনুলোম বিলোমে বার বার যে ভগবদ্স্মরণ হয় তাতেই মন অন্তর্মুখ হয় সহজে। মন অন্তর্মুখী হলেই নিরুদ্ধ হতে থাকে এবং নিরুদ্ধ চিত্তেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তবেই তাঁতে নিত্যযুক্ত হওয়া সম্ভব। এভাবে নিত্যযুক্ত হয়ে উপাসনা করতে পারলে সকল উপাসনাই উপাসনা হয়ে ওঠে। নইলে শুধু শুধু দলবদ্ধ হয়ে 'ওঁ' অক্ষর সাজিয়ে চিড়ে মুড়ি খেয়ে বা খোল করতাল বাজিয়ে চিৎকার করলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। ৯/১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ।।১৫

অনুবাদ: অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া আমাকে উপাসনা করেন। তাঁহাদের মধ্য কেহ কেহ অহংজ্ঞান রাহিত্যে, কেহ কেহ'আমি-দাস' এইভাবে, কেহ কেহ সর্ব্বাত্মক আমাকে নানারূপে উপাসনা করেন। ৯/১৫

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে সাধনার সাধারণ ভক্তিপ্রধান দিকটা বলা হয়েছে যাকে ত্রিগুণাত্মক অবস্থাভেদে বাঙ্ময়, প্রাণময় ও মনোময় অভিব্যক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি অপেক্ষা ভগবৎ সেবাতত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই শ্লোকে সাধ্যকে সাধকেরা, বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রধান সাধকেরা, কিভাবে নেন সেটাই বলা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা কখনও এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধে তাঁকে উপাসনা করে। "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" এই জ্ঞানে আরূঢ় হয়ে কখনও দেখে এক অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বে এক পরমেশ্বরই বহুরূপে আবির্ভূত, আর কখনও বা এক অদ্বয় চেতনস্বরূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই দেখে না। সেজন্য কখনও তত্ত্বৈকত্বের দিকটাকেই প্রধান করে আবার কখনও বহুধাবিভক্ত মহিমময় স্বগতভেদযুক্ত পরমেশ্বরভাবটাকে প্রধান করে সাধ্য পরমতত্ত্বের উপাসনা করে। বেদ ও গীতা উভয় শাস্ত্রেই এই দর্শনই বার বার উপস্থাপিত হয়েছে। "সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মানি .. .. .." যে জ্ঞানযজ্ঞের কথা এখানে বলা হয়েছে তা কেবল অনির্দেশ্য কৈবলাত্মক বিশ্বসত্তায় মনোনিবেশ করা নয়, তা হল অনন্যকে তাঁর অনন্ততায় দেখা আবার সকল সীমিত, সান্ত বস্তুর মধ্যেও দেখা। জ্ঞানযজ্ঞের এ দর্শন অনেক অধ্যবসায়ের ফল। যজ্ঞাগ্নিতে হবি নিক্ষেপে অগ্নি জ্যোতির্ম্ময় হয়, আত্মক্রিয়ারূপ যজ্ঞেও মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে হবিরূপে দান করলে জ্ঞানাগ্নি জ্বলে ওঠে তখন ঐ জ্ঞানাগ্নির প্রকাশই পূর্ব্ববর্ণিত বোধ সকল যা একান্তই নিজ নিজ বোধরূপ আত্মসাক্ষাৎকার, এটাই স্বরূপ স্থিতি। এরপর দ্বিতীয় প্রকার বোধ হল দর্শন যা এককথায় শ্যামসুন্দররূপ অপূর্ব্ব জ্যোতির্মণ্ডল মাঝে নক্ষত্রখচিত ঝলমল নীলাকাশ আর তৃতীয় বোধে অনাহত নাদের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার সাধকের অন্তরে বিশোকা জ্যোতি ফুটিয়ে তোলে যার বর্ণনায় পাতঞ্জলে আছে "বিশোকা বা জ্যোতির্ম্ময়ী "। প্রাণায়াম ও যোনীমুদ্রার অভ্যাসে এভাবেই বিবিধ জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে যা সহজেই ত্রিতাপ জ্বালা ছুটিয়ে সকল বোধকে পরম ভক্তি, প্রেম ও আত্মসমর্পণে পরিণত করে ॥ ৯/১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম।
মন্ত্রোহহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ।। ১৬

অনুবাদ: আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমিই স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ, আমিই পিত্রার্থে শ্রাদ্ধাদি, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমাদি সাধনভূত, আমিই অগ্নি এবং আমিই হোম ॥ ৯/১৬

ব্যাখ্যা: কর্ম্মের পথও ভক্তি ও আত্মসমর্পণে পরিণত হয় যখন সকল সংকল্প ও কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে এক পুরুষোত্তমে করি সমর্পণ। এই আভ্যন্তরীণ যজ্ঞই প্রকৃত যজ্ঞ, যেখানে ভগবান নিজেই হন যজ্ঞ, যজ্ঞের প্রত্যেক ক্রিয়া ও উপকরণ। তিনি নিজেই হন এ হোমের আগুন। আসলে আমাদের ভগবদ্মুখী সংকল্প ও উর্দ্ধমুখী অভীপ্সাগুলোই হল আগুন। তাই ভগবান নিজেই আমাদের মধ্যেকার সেই অগ্নি। বাইরের যজ্ঞানুষ্ঠানও এই আভ্যন্তরীন যজ্ঞেরই প্রতীক। তাই এ বিশ্ব যজ্ঞমূর্ত্তি। প্রতি ভূতেও তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বর মূর্ত্তিতে বিরাজিত। তাঁর যজ্ঞময় মূর্ত্তি চার ভাগে বিভক্ত যথা – ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা ও ঔষধ।

১) ক্রতু = ক্রতু হল বেদবিহিত সোমরসসাধ্য যজ্ঞ। ক্রিয়াকরাকালীন ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষরিত সোমধারা পানের তৃপ্তিতে বাহ্যদৃষ্টি লোপ পায় ও সাধক তত্ত্বে তত্ত্বে প্রবেশের শক্তিলাভ করে।

(২) যজ্ঞ = যজ্ঞই বিষ্ণু, সমগ্র বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যসত্তা ও পালনকর্ত্তা। কারণ আজ্ঞাচক্রে ইনিই দ্বীপ্তি, জঠরে অগ্নি, নাভিস্থলে সমানবায়ুরূপে প্রাণ আপানের গতির নিয়ন্ত্রণকারী পালনকর্ত্তা বিষ্ণু।

(৩) স্বধা = স্বধা হল সকল প্রাণীর অন্ন ও সাধকের ব্রহ্মতেজ ও জ্ঞান।

(৪) ঔষধ = কিসের ঔষধ ? ভবরোগের। আগের আগের শ্লোকের অর্থেও আছে জগদ্দৃষ্টিই ভবরোগ। গুরুকৃপায় সাধনবলে প্রাণের স্থিরতাই এর একমাত্র ঔষধ। এর বেশি আর এ রোগের ওষুধ নেই। এটুকু হল শ্লোকের প্রথমার্ধের উপাদান। দ্বিতীয়ার্ধে বা শেষার্দ্ধে ভগবান বলছেন যে উনিই মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম যার অর্থ নিম্নরূপ।

(৫) মন্ত্র = মন্ত্র, যা মনকে ত্রাণ করে তাইই মন্ত্র। মনের ত্রাণ হয় একমাত্র আপনাতে আপনি থাকতে পারলে যার উপায়ই হল শুধুই ক্রিয়া করা। “নিঃশ্বাসশ্বাসরূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে” “প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য” – যার অর্থ শুধুই ক্রিয়া করা।

(৬) আজ্য = আজ্য মানে হল ‘ঘী’ যা দ্বারা হবন করা হয় ‘হবন’ মানে হল প্রক্ষেপ বা ত্যাগ। কি ত্যাগ করবেন ? দেহাভিমান যা হল বিপরীত শক্তি এটা আত্মশক্তিই কিন্তু বিপরীত দিকে কাজ করে মানে বহির্ম্মুখী করে। এই দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করতে না পারলে আত্মসাক্ষাৎকার হবে কি করে ?

(৭) অগ্নি = অগ্নি কে ? আত্মাই অগ্নি যার নাম “স্বযোনিভুক” যে বস্তুর ভিতর তাঁর প্রকাশ হয় তাকেই তিনি খেয়ে ফেলেন। তখন সমস্ত নামরূপ মিটে গেলে আবার তিনি আত্মারূপেই প্রকাশ পান।

(৮) হোম = এখানে এই “হবন” কাজটিও আত্মারই “আমি” রূপ। কারণ আমি না থাকলে হোম হবে কি করে ? ক্রিয়াটা হয় আত্মা আছে বলেই তো। সদ্‌গুরু উপদেশে প্রাপ্ত ক্রিয়াই প্রকৃত হোমকর্ম্ম।

তাহলে দেখা গেল যে আত্মা আছেন বলেই ক্রিয়া করা সম্ভব হয়। সুতরাং আত্মাই সব। তিনিই মন্ত্র, তিনিই আজ্য, তিনিই অগ্নি এবং তিনিই হুত – যজ্ঞেশ্বর। আত্মার আত্মা এই যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করে যজ্ঞময় হয়ে “বাসুদেবং সর্ব্বং” জ্ঞানকে নিজের পরমা সাত্ত্বিকী প্রকৃতিতে জাগিয়ে তোল। ৯/১৬

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ।। ১৭

অনুবাদ: আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্ম্মফল বিধাতা), এবং পিতামহ, আমি জ্ঞাতব্য, পবিত্র ওঁকার, ঋক্, সাম্ ও যজুঃ।

ব্যাখ্যা: তাহলে যে যজ্ঞে যজ্ঞময় হতে পূর্ব্বশ্লোকে বলা হল সেই যজ্ঞ হল আসলে একই সঙ্গে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যজ্ঞ। যে জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয়ই আমি (পরমাত্মা) পিতামহ ব্রহ্ম। সবই আমা হতে নির্গত হয়েছে, আমিই রক্ষা করছি, আমিই সকলের জানবার বস্তু। আমিই সকলের ঠাকুরদাদা, আমার মত পবিত্র কিছুই নেই, আমিই এই শরীররূপ ওঁকার এবং সর্ব্ববেদ – সবই আমি। বিশ্বের অন্তরে যজ্ঞ, যজ্ঞের অন্তরে বেদ, বেদের অন্তরে অক্ষরব্রহ্ম ওঁকার যজ্ঞেশ্বর। তোমারও অন্তরে যজ্ঞ, যজ্ঞের অন্তরে বেদ, বেদের অন্তরে মন্ত্র, মন্ত্রের অন্তরে অন্তর্য্যামী যজ্ঞেশ্বর। তবে তুমি যতক্ষণ বদ্ধ, অজ্ঞ, ততক্ষণ তুমি পরাধীন, বিশ্ব তোমার নিকট অচেতনরূপে প্রতিভাত। আর যখন তুমি মুক্ত তখনই তুমি স্বাধীন, তোমার নিকট বিশ্ব প্রতিভাত হয় আত্মার বিশ্বরূপ বলে। তখন তোমার বিশ্ব প্রাণময়, চিন্ময়, বেদময় ও আত্মময়। তখন তোমা হতে যে বেদন প্রকাশ পায় তাইই অপৌরুষেয় বেদ। যে ব্যক্তি এভাবে জানে, সাধনকর্ম্ম করে, তার সকল জীবন ও কর্ম্মকে এক মহান আত্মনিবেদনে শাশ্বত পুরুষকে অর্পণ করে। তার কাছে ভগবানই সব এবং সবই ভগবান। বেদ হতে বিশ্ব উৎপন্ন একথা এ জন্যই বলা হয়। তিনিই ঋক্, যজুঃ ও সাম –সৃজন, স্থিতি ও মৃত্যু যা অবলম্বন করে এ বিশ্ব সংসার। এ শরীরই ওঁকাররূপ। ঋচ্ মানে স্তুতি মানে প্রাণায়াম দ্বারা স্তব। ঋক্ মানে নিজেকে জানার মন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রী। যজুঃ মানে যজ্ অর্থাৎ পূজো করা। ক্রিয়াদ্বারা মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বায়ুর স্থিতিতে কখনও সাদা কখনও কালো বা ঘন নীল রং দেখা যায় এটাই হল শুক্লযজুঃ ও কৃষ্ণযজুঃ। সা -অর্থে পশ্চিমে বায়ু গেলে যে ওঁকার ধ্বনি শোনায় সেই বেদ জানলেই ব্রাহ্মণ হয়। এমন ব্রাহ্মণ সাধকই সর্ব্বজ্ঞ। ঋক, সাম ও যজুঃ একধর্ম্মী, একশক্তি, জীবত্বে যা গ্রন্থি, পরমেশ্বরে তাই শক্তি। যিনি বেদ জনক ও ওঁকাররূপ অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই জীবরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাই এ জগৎ বাসুদেবেরই বিশ্বরূপ ॥ ৯/১৭

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।। ১৮

অনুবাদ : আমি এই জগতের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং বীজ অর্থাৎ কারণ ও অবিনাশী। ৯/১৮

ব্যাখ্যা: ভগবান নিজেকে যজ্ঞ ও বেদরূপে বর্ণনা করার পর এখন সেই অনুযায়ী তিনি জীবের সাথে বাস্তবে ব্যবহারিকভাবে কিভাবে সম্বন্ধযুক্ত সেটাই বোঝাচ্ছেন। বলছেন, আমি এই জগতের গতি অর্থাৎ কর্ম্মফল। আমি পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা। আমি ভোগস্থান; আমিই শরণ অর্থাৎ রক্ষক। আমি হিতকারী, আমি দ্রষ্টা, সংহর্ত্তা। আমি আধার ও লয়স্থান। আমিই অব্যয়বীজ, মানে অবিনাশী কারণ।

প্রথমেই বলছেন, তিনিই গতি – যার অর্থ গমনগতি ও স্বরূপগতি। জন্ম হতে জন্মান্তরে, লোক হতে লোকান্তরে এবং সবশেষে স্বরূপে ব্যক্ত ও মিলিত হবার জন্য যে গতি, সে গতি আমিই। সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম দ্বারা জীব যে গতি পায়, তার কর্ম্মে কর্ম্মফলরূপে থেকে, আমিই সেই শুভাশুভ গতির বিধান করি।

আবার আমিই জীবের ধারক বা ভর্ত্তা, মানে নিজ নিজ কর্ম্মফল দ্বারা উৎপন্ন সেই কর্ম্মকারী জীবের অদৃষ্ট, যাতে জীবের ভরণপোষণ হয়।

আমিই প্রভু, কারণ আমিই জীবের কৃত ও অকৃত কর্ম্মের দ্রষ্টা, তাই সাক্ষীও আমিই।

আবার নিবাসও অমিই, কারণ দেহ না থাকলে তো কর্ম্মফল ভোগ হয় না। প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান এ দেহপুর তো আমা হতেই প্রকাশিত। এজন্যই আমিই নিবাস।

আমিই তো জীবের আশ্রয়, তাই স্থির প্রাণকে অবলম্বন করেই জীবের এ বর্হিমূখী প্রাণবৃত্তি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সুতরাং আমিই তোমাদের একমাত্র শরণ, আশ্রয়, অতএব স্মরণযোগ্য। চিরস্থির আত্মাই জীবের একমাত্র গতি। তাই আমিই একমাত্র সুহৃৎ। যা কিছু প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া সবই আমার আশ্রয় লাভের জন্যই।

মরণ হতে জীবনে গিয়ে যে প্রভব লাভ হয় সেও আমিই। আবার জীবন হতে মরণে গিয়ে যে প্রলীণতা প্রাপ্তি, সেই প্রলয়ও আমিই। আর জীবন-মরণের মাঝের যে স্থিতিকাল সেই স্থিতি বা স্থান সেও তো আমিই।

এবার নির্ব্বাণ, নিত্যাবাস, সে কে ? সেও আমি এই প্রত্যক্ষাবগম আত্মা। আত্মস্বরূপই হল সেই পরম সংস্থান যাতে অবস্থান করে এত প্রভব, প্রলয়, স্থিতি, এতসব।

আর আমিই সেই বীজস্বরূপ আত্মা। সে কেমন বীজ ? অন্যন্য বীজের থেকে পার্থক্য কোথায় ? যেহেতু আমি বীজ হলেও অব্যয়, যার ব্যয়, ক্ষয়, শেষ কিছুই নেই। এ অব্যয়বীজ আত্মস্বরূপ আছি জীবকুলের "আমি" তে, আত্মাতে। এই উভয়রূপে আমিই তোমাদের গতি, পরাগতি, সকলই প্রত্যক্ষীভূত আমি। আমাকে প্রত্যক্ষ কর। সাধনদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হলেই তুমি যাকে দেখে বলবে যে "আমি নিজেই "। তখনই সবকিছুর সাথে নতুনভাবে পরিচয় হবে। গুরু কর্ণধার হয়ে সবকিছুই তো আমাকেই বলছেন, পরিত্রাণের উপায়ও বলছেন, তাই তাঁর চাইতে জীবের শুভার্থী আর কেই বা আছে। তাই আত্মলাভ পর্য্যন্ত কর্ণধার গুরুই এই শ্লোকের মূল অর্থ ও লক্ষ্য, কারণ গুরু থাকুন আর নাই থাকুন ব্রহ্মবীজের নাশ নেই। এ ভাবে ভগবানকে জানলেই সেই শাশ্বতের নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা হয়। তখন আর নিয়তি বা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভয় থাকে না। তখন একমাত্র

ভগবানই পথ এবং গন্তব্যস্থল। প্রতিমুহূর্ত্তে সেই নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে কর্ণধার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে সেই দিব্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। ভয় নেই, সে পথে কোনও অন্যায়, অনিষ্ট বা পাপ,প্রত্যবায় নেই ॥ ৯/১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদাসচ্চাহমর্জুন ।।১৯

অনুবাদ: হে অর্জুন, আমিই তাপ দিয়া থাকি, আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং বৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই স্থূল এবং আমিই সূক্ষ্ম ।৩/১৯

ব্যাখ্যা: এসমস্ত জড় প্রকৃতিও ভগবান এবং তারই ক্রিয়া। তিনিই আদি তাপস, তপস্যারূপ তাপ, যে তাপ দ্বারা জীবের কর্ম্মবারির শোষণ হয়। "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানজ্যোতি" – প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নেই। প্রাণায়ামদ্বারা মনের বিশুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তি হয়। পাঠক প্রশ্ন করুন – প্রাণায়াম করে জ্ঞানের দীপ্তি কি করে হয় ? তবে তো স্কুল কলেজ ছেড়ে প্রাণায়াম করলেই সব জ্ঞান হত ? প্রথমে তবে বুঝতে হয় অজ্ঞান কি ? অনাত্ম বস্তুতে আত্মবোধই অজ্ঞান। দেহকে আমি বোধ করাই চরম অজ্ঞান। দেহ আর আমি এমনভাবে জড়িয়ে আছি যে এ দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আলাদাভাবে বুঝতে না পারলে কিছুতেই এ চৈতন্য হবে না যে দেহ থেকে আমি পৃথক। প্রাণায়াম দ্বারা শরীর থেকে আমিত্বের বোধ নষ্ট হয় বলেই প্রাণায়ামই জ্ঞান উৎপাদক ক্রিয়া এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। ভগবান বলছেন আমার এই তপস্যায় বর্ষণ সকল রচিত হয়। প্রাণায়ামরূপ তপস্যার তাপে অজ্ঞানবারি শুকিয়ে যায় এটাই " নিগৃহ্ণামি" এবং তারপর ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে শীতল শান্তিবারি বর্ষণ হয় সেটাকেই ভগবান "উৎসৃজামি" বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিনি খেয়ে চিনি হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। তেমনি এই ক্রিয়ার ফল ভোগ করতে করতে সাধকের অমৃতপদে লক্ষ্য পড়ে এবং শেষে নিজেই পান করে অমর অমৃত দেবতা হয়ে যান। এই হল আমার বর্ষণ ও বর্ষণফল। দিক, দেশ, কাল ও তদ্গাত অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈবরস – সব বর্ষণ। এজন্যই কালের ও দেশের বিভাগ বর্ষ নামে অভিহিত। যে বর্ষ বা বর্ষণকে কখনও করি " নিগৃহ্ন" মানে নিঃশেষে গ্রহণ, অব্যক্ত, অব্যক্তভোগ। আবার কখনও করি উৎসৃজন, ব্যক্ত, ব্যক্তভোগ। কোথাও কখনও ব্যক্ত ও কখনও অব্যক্ত ভোগক্রিয়া, ভোগতৃপ্তি উৎসৃজন ও নিগৃহ্ন। ক্রিয়া করে আত্মস্থ হয়ে গেলেই নিজেকে সৎস্বরূপ বলে বুঝতে পারা যায়। তখনই আমি "অমৃত" আবার যখন ক্রিয়া না করে সংসারচিন্তায় ডুবে থাকি তখনই দেহে আত্মবুদ্ধি আসে। দেহে আত্মবুদ্ধিই "অসৎ" সেটাই আমার মৃত্যুতুল্য। অতএব এ সমস্ত ভাল মন্দ, সৎ ও অসৎ, মৃত্যু ও অমৃত সকলই এই "আমি"রই অনন্ত

বর্ষণ, আমার নিগৃহ্নন ও উৎসৃজন, যা দেখে জীব নিজের অন্তরে। যত জ্ঞান, যত উপলব্ধি সবই সেই গুণত্রয় পদবাচ্য। সেই তিনিই ফলোদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা। আবার কর্ম্মফলেরও উপভোক্তা। অন্তরে তোমার যত অনুভূতির বিশ্বজাল, যত সদসদ্ সংস্কার, সে সমস্তই তোমার ভোগ ও তৃপ্তি। তুমিই মৃত্যু, তুমিই অমৃত, তুমিই সৎ, তুমিই অসৎ, তুমিই ব্যক্ত, তুমিই অব্যক্ত; ব্যক্ত ভোগরূপ ও অব্যক্ত মৃত্যুরূপ। মৃত্যুর মাঝেও তুমিই। এ মৃত্যুকে তৃপ্তি বলে যদি চিনতে পারো, জানতে ও উপলব্ধি করতে পারো, তবেই তুমি মৃত্যুঞ্জয়, অমৃত আত্মা। এই উপলব্ধির কৌশল খুব শক্ত কিছু নয়। সমস্তকিছু ভোগের তলে তলে শুধু আত্মবোধটাকে ধরতে সচেষ্ট থাকো, তবেই বুঝতে পারবে যে এ মৃত্যু তোমার তৃপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সংকল্প ও অহংবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও দেহ ধর্ম্মে থেকে নিজেকে পরমাত্মা থেকে পৃথক বোধ করাতেই যত বিপত্তি ঘটে থাকে। নইলে " দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মর্ত্তং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।" সৎ বা অসৎ যা কিছু কল্পনা কর, আমিই সব। আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়, কিছু নয়। আমিই ব্রহ্ম, আমিই বাসুদেব। মৃত্যু আমাদের ছদ্ম মুখোশ। অমৃতত্বই আমাদের আত্মপ্রকাশ ॥ ৯/১৯

> ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
> তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ।। ২০

অনুবাদ: বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারীগণ যজ্ঞসকল দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পূণ্যফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগসকল ভোগ করেন ॥ ৯/২০

ব্যাখ্যা: বেদকে ত্রয়ী বলে। বেদ বিদ্যাই ত্রয়ী বিদ্যা। যাঁরা পরলোকেই বেশী বিশ্বাসী এবং স্বর্গাদি ভোগেই বেশি উৎসাহী তাঁরা যাগযজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করে, বিগতপাপ হয়ে দেবলোকে গতি প্রার্থনা করে ও দেবলোকে গিয়ে দিব্য ভোগে ভোগী হয় মাত্র। ক্ষণস্থায়ী সে ভোগ সম্পন্ন হলেই আবার ফিরে আসতে হয়। কারণ মর্ত্ত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এভাবে সিদ্ধ হয় না। যজ্ঞে সোমরস যাঁরা পান করেন তাঁরা সোমপা। তাঁদের শুধু মন নিয়েই কারবার তাই মন কি চায় সেদিকেই লক্ষ্য করেন। আত্মবোধের কারবারী তাঁরা নন। পরমাত্মতত্ত্ব জানা না থাকায় বেদের জ্ঞানকাণ্ড ছেড়ে শুধু কর্ম্মকাণ্ডেই মেতে থাকেন। জ্ঞানকাণ্ডে এলেই দেখা যাবে এ শরীর ওঁ কার। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সোমধারা পানেই সোমপা হওয়া যায়। শরীরে কূটস্থ ও কূটস্থে উত্তম পুরুষ রয়েছেন। পরে শুদ্ধ নির্ম্মল রশ্মি, তাতে কোনও রং ই নেই। পরে যে বিদ্যুৎশক্তি শরীরে উৎপন্ন হয় তিনি শক্তিরূপা ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রী।

ইনিই বেদমাতা। বেদকে ত্রয়ী বলে। প্রাণ, অপান ও ব্যানের ক্রিয়াই ত্রয়ী বিদ্যা। এই ত্রৈ-বিদ্যায় স্থিতি ব্যানের ক্রিয়াতেই হয় যাকে তুরীয় অবস্থা বলে। এ অবস্থাকে জানাটাই বেদ। প্রাণস্বরূপ গায়ত্রীতে, মানে ওঁকার ক্রিয়াতেই, ত্রাণ পায় তাই এই ক্রিয়ার নাম গায়ত্রী। ভূ র্ভুব স্বঃ - যখন তিন লোক এক হয় তখনই ব্রহ্ম, এটাই ত্রিপদা গায়ত্রী। প্রথম পদে মাথায় (cerebrum) বায়ু স্থির থাকবে আর দ্বিতীয় পদে বাহুতে (arm) বায়ু স্থির ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সর্ব্বত্রে ব্রহ্মদর্শন হ'ল তৃতীয় পদ। এই হ'ল গায়ত্রীর প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক ত্রিপদা অংশ। প্রাণায়াম দ্বারা স্থির অনিলে পরমাস্থিতির প্রকাশই অমৃত যা পান করে সাধক পরমানন্দরূপ ব্রহ্মে লীন হন। এটা সম্পূর্ণ নিজ বোধের বিষয়। যে ক্রিয়াদ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্তি হয় সেটাই আসল যজ্ঞ। যাঁরা দিনরাত অষ্টপ্রহর এতেই লেগে থাকেন তাঁরা হলেন «সুর" আর যাঁর শক্তিতে এই সুরত্ব লাভ হয় সেই কূটস্থই সুরেন্দ্র। সেই সুরেন্দ্রলোকে অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থমণ্ডলে যে সকল দিব্য দর্শন ও শ্রবণাদি হয় সেটাই পরমানন্দ। আর তারও পরের অবস্থায় সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যে পরাজ্ঞানের উদয় হয় সেটাই সেই পরমধাম সুরেন্দ্রলোক, সংশয়াতীত অবস্থাই সুরেন্দ্রলোক আর পরাজ্ঞানই দেবভোগ ॥ ৯/২০

> তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি।
> এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ।। ২১

অনুবাদ: তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্তলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদত্রয়-বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কামনা পরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন ॥ ৯/২১

ব্যাখ্যা: পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় এটুকু অন্ততঃ বোঝা গেল যে অন্য কোথাও নয়, এ পৃথিবীতেই পরম ভগবানকে লাভ করতে হবে। অপূর্ণ স্থূল মানবীয় প্রকৃতি থেকেই জীবের দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করতে হবে এবং ভগবান, মানব ও বিশ্বের সাথে ঐক্যের ভিতর দিয়ে জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যের সন্ধান লাভ করতে হবে। সেই সত্য অনুসারে জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ইহজীবনেই তার অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি ভাবে ? শুধুমাত্র স্থূলদৃষ্টিতে অনুষ্ঠানতৎপর কর্ম্মকাণ্ডে তৎপর হয়ে অনভিজ্ঞগণ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকার মত কিছু পুণ্যসঞ্চয় ও তার ভোগ, আবার কিছু সঞ্চয় ও তার ভোগ, এভাবে আবর্ত্তনের পথেই চলতে থাকে। কারণ তারা আত্মজ্ঞানশূন্য – তাই আত্মকামী নয়, কামকামী। তাদের কামচক্ষু থাকে ভোগে – বিরতিতে নয়, পরে – আপনাতে নয়, অনাত্মে – আত্মাতে নয়। যেহেতু এমন লোকেদের কামনা সম্বুদ্ধ হয়নি তাই তারা যাই চায়, তাদের আমি তাইই দেই। তারা ভোগলাভ করে, পূণ্যক্ষয়ে আবার সেই কর্ম্মচক্রে পড়ে পাক খায়। এটাই হল

ধর্ম্মার্থকামের তেজারতি ব্যবসার সঞ্চয় ও ভোগ সম্বন্ধ। আর পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত পরাজ্ঞান হল জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় যা সাধারণের চেতনায় চট করে আসেনা। কারণ পাপ পুণ্যের ধারণাটাই তাদের কাছে অলাদা। বেদের জ্ঞানকাণ্ডস্তরে বিক্ষেপশূন্য অবস্থাই পুণ্য, তার বিপরীত অবস্থাই পাপ। জ্ঞানকাণ্ড সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সূক্ষ্মবোধের বিষয় তাই স্থুলদৃষ্টি ও স্থুলবোধ সম্পন্ন মানুষ, স্থুল কর্ম্মকাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকে ও ভগবান বর্ণিত উপায়ে আবর্তন চক্রের অনুগত হয়ে থাকে যার পরিসমাপ্তির সুযোগই দেওয়া হয় মানব জন্মে জীবকে; কারণ যতক্ষণ না জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনে যোগযুক্ত ও কৃতকার্য্য হতে না পারেন ততক্ষণ এ যাতায়াত ও জন্মান্তরের শেষ হয়না।। ৯/২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ।। ২২

অনুবাদ: অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া আমাকে চিন্তা করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন আমি সর্ব্বপ্রকারে মৎপরায়ণ তাঁহাদের যোগক্ষেম (সমাধি ও তার সংরক্ষণ বা মোক্ষ) বহন করি ॥ ৯/২২

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে কামকামীদের কথা বলে এই শ্লোকে ভগবান আত্মকামীদের কথা বলছেন। কামকামীগণ তেজারতি করে থাকেন কিন্তু আত্মকামীগণ তদ্বিপরীত। কামনানুসারেই জীব ভোগক্ষেত্র পায় ও ভোগ সম্পাদিতও হয়। কামকামীদের বিপরীতে আত্মকামীগণ অনন্যচেতাই হয়ে থাকেন। তাই তাঁদের কাছে এক আত্মা ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ই নেই। অপর কোনও কাম্য বা ভজনীয় দেবতান্তর কিছু তাঁদের নেই। তাই তাঁরা অনন্যচিত্ত হয়ে সেই পরমাত্মারই উপাসনা করেন, তাই তাঁরা শুধুমাত্র মৎকামী। শুধুমাত্র আমিই তাদের প্রধান কাম্য। তাঁরা আর অন্য কোনও কিছুর জন্য কামময় হন না। শরীর কর্ম্ম সম্পাদন ও সাংসারিক কর্ম্মসকল আসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তো সে সমস্ত করতেই হয়। তাই তাঁদের শরীর মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় আমাতে সংন্যস্ত হলেও একটু বিষয় প্রবণতা না থাকলে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে কারণ সেই অনন্যচেতা উপাসকদের যোগক্ষেম আমি নিজে বহন করি যাতে আমার দিকে অবিচল স্থিতি সম্বর্দ্ধিত করাটা তাদের পক্ষে সহজ হয়। যোগক্ষেম শব্দার্থটা হল – অপ্রাপ্ত আবশ্যকীয় বস্তু প্রাপ্তি সংঘটনের নাম যোগ এবং সেই বস্তুর বা তার রক্ষণাবেক্ষণের নাম ক্ষেম। সেসব বস্তু এখন তার পক্ষে যোগেরই অঙ্গস্বরূপ তাই সেগুলোও যোগ বলে মনে করতে হবে। সেজন্য তা রক্ষণাবেক্ষণের নামই হল ক্ষেম। যে আমাতে মন প্রাণ সমর্পণ করে, একমাত্র আমি ভিন্ন অন্য কামনা হৃদয়ে রাখেনা, পার্থিব সুবিধা অসুবিধা গ্রাহ্য না করে, এক আমাতেই মনঃসংযোগে তৎপর, তার সুবিধা অসুবিধা আমি নিজে দেখি। যে এক আমাকেই চায় তাকে আমিই দিই সমস্তকিছু, কেমন করে কিভাবে দিই সে নিজেই দেখে অবাক হয়ে যায়। এমন করে দিই যেন তার যে বস্তু ভোগে সুখ তার চাইতে তাকে ভোগ করিয়ে যেন আমারই সুখ বেশি হয়। তখন শুধু সেই যে আমার উপাসক তা নয়, আমিও তার উপাসক। এ হল যারা এখনও ব্রহ্মে পূর্ণ মাত্রায় স্থিতধী হয় নি তাদের কথা কিন্তু যাঁরা সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত আত্মা, যাঁরা ব্রাহ্মীস্থিতি দ্বারা ধ্রুবভূমি লাভ করেছেন, যাঁদের আত্মবিজ্ঞানটা ঠিকমত অধিগত হয়ে গেছে, তাঁরা নিজ নিজ আত্মা হতেই যোগক্ষেম লাভ করেন। তাঁরা হলেন আপ্তকাম। ইচ্ছামাত্রেই সকল সম্পন্ন হয়। পাতঞ্জলদর্শনের সমাধিপাদে আছে “ঈশ্বর প্রনিধানাদ্‌বা” যার ভাষ্যে ব্যাসদেব বলেছেন “প্রনিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিণ আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি” – ভক্তিবিশেষের দ্বারা আবর্জ্জিত বা অভিমুখীকৃত হয়ে ঈশ্বর অভিধ্যানের দ্বারা সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁর অভিধ্যান হতেও যোগীর সমাধিলাভ ও তৎফল কৈবল্য আসন্ন হয়। যে যোগী গায়ের জোরে হঠকারিতা করে সাধন করে না, বরং ঈশ্বরার্পিত চিত্তে সাধন করেন, তাঁর চিত্ত ঈশ্বরার্পিত ও ঈশ্বরমুখী হয় বলে ঈশ্বরচিত্তও তার অভিমুখীই হয়ে থাকে। এভাবে ভগবান ভক্তের দিকে চাইলেই সাধকের সকল বিঘ্ন নষ্ট হয়ে আত্মার সাথে মিলন বা সমাধি তাড়াতাড়িই হয়। এজন্য যোগে ঈশ্বরপ্রণিধানের এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সর্ব্বময় পরমাত্মা ভগবান এই দুই ভাবে যোগক্ষেম প্রদান করেন। পূর্ণমাত্রায় সমর্পিত প্রাণ কিন্তু অনাত্মজ্ঞকে বাহ্য বিশ্ব থেকে উপাদান প্রদানে এবং আত্মজ্ঞ ঋষিকে তাঁর আত্মা থেকেই যোগ উপাদান প্রদান মহিমা প্রকাশ করান। শাস্ত্রে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই উভয়ই যেগাক্ষেম বহন। ভক্তাধীন ভগবান, এশুধুই কথার কথা নয়, সাধক মাত্রেই এটা জানেন ॥ ৯/২২

যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ।। ২৩

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া যাঁহারা অন্য দেবতার ভজনা করেন তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষপ্রাপক বিধি বিনা) ভজনা করেন ॥ ৯/২৩

ব্যাখ্যা: সকল ঐকান্তিক শ্রদ্ধাপূর্ণ ধর্ম্মোপাসনাই আসলে এক পরম বিশ্বময় ভগবানেরই উপাসনা। তবে আর এমন কথা ভগবান বলছেন কেন যে তাঁরা অবিধিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে ? বলছেন এই জন্য যে যারা জ্ঞানের সাথে পূর্ণতম ভগবানের উপাসনা না করে, অংশ বিশেষরূপ অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে, তারা জীবনের পরম তত্ত্ব অবগত হয় না। তাই তাদের উপাসনা যজ্ঞের উত্তম বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয় না। হবেই বা কি করে ? মোক্ষপ্রাপক বিধিই একমাত্র বিধি। অন্যান্য সকল প্রচলিত পূজো পার্বণ যা কিছু আছে সকলই অবিধিপূর্ব্বক কৃত কর্ম্ম। কারণ ঐসকল কর্ম্মের সাথে

মোক্ষের সম্পর্ক কিছুই নেই। যেমন গৃহী ব্যক্তির সন্ন্যাসীর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ চরম অবিধি কারণ ঐ কর্ম্ম মোক্ষের চুড়ান্ত অন্তরায়। অনুরূপভাবে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে প্রতিষ্ঠান হতে দীক্ষা গ্রহণ বা প্রতিষ্ঠানের তরফে গৃহী ব্যক্তিবিশেষকে দীক্ষাদান অথবা ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু বালকের গৃহীর নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণাদিও অবিহিত কর্ম্মের চুড়ান্ত রূপ। ১৬শ অধ্যায়ের ২৩ নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" সুতরাং বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মই কর্ম্ম, অন্যথা অকর্ম্ম। কর্ম্ম যদি বিধিপূর্ব্বক হল তবেই মোক্ষপথে পা পল (পড়ল)। যদিও পরমাত্মাই সর্ব্বদেবতারূপে ব্যক্ত এবং যে কোনও দেবতার উপাসনাই তাঁরই উপাসনা তথাপি প্রত্যক্ষাবগম আত্মায় সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান না দেখলে সে উপাসনা মহিমামাত্রের উপাসনা হয়, তা কখনও মোক্ষ দিতে পারেনা। এজন্যই অমন উপাসনা বৈদিক বিধানে নেই, অতএব বিধিসম্মত হতে পারেনা। তাই ভগবান বলছেন, শ্রদ্ধাবান হয়ে অন্য দেবতার উপাসনা করলে সেটাও আমারই উপাসনা হয় ঠিকই, কিন্তু বিধানোচিত নয়। আমার মূলে আছে প্রত্যক্ষীভূত স্বয়ং আত্মা যা স্বতঃ উপলব্ধ, ইনিই সর্ব্বদেবময় – আমিও পরমার্থতঃ এঁরই, এই বোধে সর্বদেবতাশ্রয় বলে এই আত্মাকে গ্রহণ করতে হবে। আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুর পূজো গৌণ পূজো। অবিধিপূর্ব্বক পূজো মানেই অজ্ঞানের পূজো, তাতে কোনও রকম সুখ বা শান্তিলাভ হতেই পারেনা; ভাল কিছু তো দূর অস্ত। যেহেতু অবিধিই অজ্ঞান। বিশেষরূপে বুদ্ধিতে থাকার নামই বিধি। লক্ষ্য স্থির হলেই বুদ্ধিও স্থির হয়। স্থিরবুদ্ধিরা হন অসংমূঢ়। তাঁরা চিরস্থির সুনির্ম্মল আত্মাকে ছেড়ে অন্য বিষয়ে মন দেন না। তাই তাঁদের আরাধনাই হয় বিধিপূর্ব্বক আরাধনা আর অন্য সব অবিধিপূর্ব্বক, নিস্ফল আরাধনা। নেহাৎ সময়, সামর্থ্য ও দ্রব্যাদির অপচয় মাত্র। মূর্ত্তি, প্যাণ্ডেল, মাইক অথবা মঠ ও মিশনে গিয়ে যে উপাসনা তা একান্তই মনের স্পৃহাবশতঃই হয়ে থাকে। ওতে জীবনের পরমতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, পরমগতি তো অনেক দূরের কথা, তার অর্থটুকুও বোঝা সম্ভব হয় না। এটা খুবই অপ্রিয় সত্য ॥ ৯/২৩

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ।। ২৪

অনুবাদ: যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ স্বামী, কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানেনা, এজন্যই পুনরাবর্তিত হয়ে থাকে ॥ ৯/২৪

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে আগের শ্লোকের কথারই আরও স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সজ্ঞানে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করতে হলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা নইলে পরমাত্মতত্ত্বশূন্য হয়ে কোন দেবতারই উপাসনা সম্ভব নয়। অথচ চারদিকে সেই অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরটাই অবিরতভাবে হয়ে

চলেছে। এমন অবিধিপূর্ব্বক উপাসনায় কিছুই লাভ নেই বরং ক্ষতিই হয়। পরমাত্মাই যখন পরমেশ্বর তখন তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও সকল যজ্ঞের প্রভু। জীব শুধুমাত্র জীবত্বের ভোক্তা কিন্তু পরমেশ্বর সমগ্র চরাচর নিয়ে পরমেশ্বরত্বের ভোক্তা। জীবত্বের ভোগ বিষয়াধীন মাত্র কিন্তু পরমেশ্বরের ভোগ স্বাধীন ভোগ। এটাই পার্থক্য। জীব বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অনুভোক্তা মাত্র কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বররূপে সম্ভূত শক্তি বলে বিশ্বরূপ ধারণ করে সেই অনুসারে সম্ভোক্তা। তাই সে ভোক্তৃত্ব জীবের মত ভোক্তৃত্ব নয়। যেহেতু তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সকলই তাঁর ইচ্ছাধীন, সেজন্যই এমন স্বাধীন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয়। তাঁর এমন ভোক্তৃত্ব ও প্রভুত্ব না জানলে তাঁকে তত্ত্বতঃ জানাই হয় না। এমনভাবে আত্মাকেই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা ও ফলদাতা রূপে না জানলে আত্মতত্ত্বের রহস্যই উদ্ঘাটিত হয় না। অভোক্তা, ভোক্তা, অনুভোক্তারূপ ভাবসকলে ভাবময় হওয়া আত্মতত্ত্বেরই স্বাধীনতা এটা বুঝলে ভোগক্রমময় নিজের সত্ত্বাটাও উপলব্ধি করতে পারবে। আমি অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা ও ফলদাতা। সকল কর্ম্মতো ইন্দ্রিয়েরাই করে ঠিকই কিন্তু যদি তাদের প্রভুরূপে আত্মা না থাকত তবে তারা কোনও কিছুই করতে পারত না। সেজন্য সকল যজ্ঞের অধিপতিও সেই আত্মা। পরমাত্মা কি ভাবে প্রতি অধ্যাত্মক্ষেত্রে অসঙ্গ বা অভোক্তা, অনুভোক্তা বা জীব ও ভোক্তা বা যজ্ঞেশ্বর হয়ে অবস্থান করছেন সেকথা আগেই বলেছি। সেইভাবে আত্মাকে না দেখে, না চিনে, না জেনে থাকলে বার বার সংসারে যাতায়াত করতেই হয়। নিজের মধ্যে এই অহং তত্ত্বকে জানতে না পারলেই অজ্ঞানান্ধ হয়ে ঘুরতে হয়। এমন অসঙ্গ আত্মবোধে অভিনিবিষ্ট থাকতে পারলে দেখবে তাঁতেই অক্রম সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব বর্তমান যা তোমার জন্ম থেকে বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যতরূপে কিভাবে কর্ম্মফলরূপে সকল পরিবর্তন সংসাধিত হয়ে চলেছে। এই অক্রম সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব মানে ঐ তোমার বর্তমান ও ভূত ভবিষ্যতের প্রকাশরূপের বীজত্ব যদি তোমার মূলে না থাকত তবে ঐসকল পরিবর্তন সাধন অসম্ভব হত। সুতরাং ঐ অসঙ্গ চিৎস্বরূপটাতে গিয়ে তুমি নিজেকেই অসঙ্গরূপে দেখার চেষ্টা কর। স্ফুলিঙ্গ থেকেই যেমন আগুনের সৃষ্টি হয় তেমনই অখণ্ড চৈতন্য থেকে সৃষ্টি প্রসবিনী মহা শক্তিরূপা প্রাণের উৎপত্তি হয়। প্রাণ থেকে মন এবং মন থেকে জীবসমূহের উৎপত্তি হয়। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে আছে – "চিত্তকারণমর্থানাং তস্মিন্নন্তি জগত্রয়ম্" – চিত্তই সমস্ত বিষয়ের হেতু তাতেই জগত্রয় যেন গাঁথা আছে। সেজন্য বলছি মন থাকলে সংসার থাকবেই। মন উৎপন্ন হয় প্রাণের চঞ্চলতা থেকে। প্রাণ চঞ্চল থাকলে আর তুমি অসঙ্গ হবে কি করে ? প্রাণের চাঞ্চল্য না ঘুচলে জগৎদর্শনও ঘোচে না। যখন " আমি " বা পরমাত্মাই সকলের মূল তখন এ পঞ্চতত্ত্বে পড়ে রইলে মানে প্রকৃতিতে থাকলে চলবে কেন ? মনকে ছয় চক্রে নিয়ে যেতে হবে। এটা করলে মন স্থির হবে। কূটস্থে থাকলেই আত্মাকে জানা যায়। কাঠের ভিতর আগুন থাকে ঠিকই কিন্তু সেটাকে শুকিয়ে নিয়ে ঘসাঘসি করতে করতে তবে সে আগুন বের হয়। তেমনই প্রাণাপান ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘর্ষণ ছাড়া আত্মাগ্নির প্রকাশ হয়

না। আত্মার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত যেভাবে সংস্কার ও তার পরিণতি তোমার ত্রিশরীর ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়াশীল হতে থাকে তার উপর তোমার কোনও কর্তৃত্ব থাকে না। তাই এত সুখী পুরুষ হয়ে জন্মেও তুমি এত দুঃখী হও ॥ ৯/২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভুতানি যান্তি ভুতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোহপি মাম।।২৫

অনুবাদ: দেবার্চ্চনাকারীগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধাদিরদ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনাকারীগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। ভূত পূজাকারীগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। আর আমার অর্চ্চনাকারীগণ, পরমাত্মনিষ্ঠগণ, আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯/২৫

ব্যাখ্যা: প্রাচীন বৈদিক যুগের শেষে দ্বাপরে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ দিকটা ধীরে ধীরে যোগীদের মধ্যে সীমিত হতে শুরু করে পরিবর্তে বহিরঙ্গ দিকটা বিকশিত হতে শুরু করে। এখানে সেই বহিরঙ্গ দিকটার কথা বলা হয়েছে। এই বহিরঙ্গের উপাসনাকে বলা হয়েছে অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ। সাধারণ ধর্ম্মের অংশস্বরূপ যে দেবগণের পূজো করা হয় সেটা পূর্ণ ভগবানের উপাসনা নয়। পরমতত্ত্ব না জানা অবধি মুক্তি নেই। যাঁকে জানব তাঁতে উপ-আসন রচনা করব, অন্ততঃ পক্ষে অস্থায়ীভাবে হলেও তাঁতে সমাসীন হয়ে তদ্ধর্ম্মে ধর্ম্মী হব। এমনভাবে জানাকেই বেদে " অনুবিদ্য বিজানাতি" বলা হয়েছে। মানে অনুবেদিত হয়ে জানা। উপাসনা করার অর্থই হল সেই চৈতন্যে চৈতন্যময় হওয়া। উপাসনাই জীবধর্ম্ম সন্দেহ নাই কিন্তু পরমতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হয়ে কে কার উপাসনা করে ? আদিবাসী সাঁওতালরা " মারাং বুরু " র পূজো করে। আফ্রিকার এক আদিবাসী গোষ্ঠী "বোঙ্গা " র পূজো করে। তবে এরা কারা ? কোন দেবতা ? দেবতা কি বিভিন্ন বিচিত্র ? তা মোটেই নয়, সাধারণ জীবই বিভিন্ন ও বিচিত্র তাই তার দৃষ্টিতে দেবতাও বিভিন্ন ও বিচিত্র। সাধারণ পুরুষ মাত্রেই কামময়। আত্মা তার কামনার অন্ন চায়। যতক্ষণ না পরমাত্মাতে নিজ আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ততক্ষণ বিষয় কামনা ফুরায় না। আপনাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত এ কামনার বিরাম নেই। ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বের বিপুলা শক্তিলীলাকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী জ্ঞানে উপাসনা শুরু করে। এটাই বিভিন্নতা ও বৈচিত্রের কারণ। এটাই দেবোপাসনা। মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর ইত্যাদি বললেও এসব উপাসনা মোটেই পরমেশ্বরের উপাসনা নয়। ঐ বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রকার উপাসনাই তাদের সার হয়। পরমাত্মভাবটা তাতে মোটেই থাকেনা। বরং পরমাত্মবোধহীন ভাবে পিতৃযাজী, ভূতযাজী ইত্যাদি হয়ে থাকে। যাতে আপনার শরীর, সুখ, স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুতে সজাগ হওয়া সম্ভব নয়। ফলে ক্রমশঃ স্থূল জড় ভূতত্বে পরিণতি হতে থাকে। মোটামুটিভাবে আত্মজ্ঞানশূন্য মানুষের এই তিন রকমভাবে উপাস্য ভাবটা পরিবর্তিত হয়ে সেই লোকস্থ করে তোলে। যে, যে বিশিষ্ট ভাবে চেতনাময় থাকে সে সেই লোকে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে প্রবেশ করে থাকে। কেউ কেউ দেখা যায় সংসারাদি উপেক্ষা করেও পরমাত্মবোধহীন দেবতা উপাসনায় বিমুগ্ধ থাকে। যা হোক, এই তিন প্রকার জ্ঞানে থেকে এরা দেবলোক পিতৃলোক বা ভূতলোকে গতি পেয়ে থাকে। ঠিক একই ভাবে "যান্তি মদযাজিনোহপি মাম্" অর্থাৎ যাঁরা পরমাত্মার উপাসক হয়ে পরমাত্মায় উপ-আসন রচনা করেন তাঁরা পরমাত্মগতিই প্রাপ্ত হন। আর কালাকালের অধীন হতে হয় না। নিজের আত্মাতেই পরমাত্মাকে লাভ করে আপ্তকাম হয়ে থাকেন। এটাই পরমগতি। সবটাই বুঝে নিয়ে করতে হয়। এটাই মদ্‌যাজি হওয়া আত্মার উপাসনা করে, পরমানন্দরূপ আত্মা ই হয়ে যাওয়া। যাকে কবীরদাসজী বলেছেন – " তু তু করতে তু ভয়া তুঝমে রহা সমায় "। সব ছেড়ে আত্মচৈতন্যের উপাসনা করতে পারলে মরণ সময়ে ব্রহ্মনাড়ী উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ফলে অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয় মানে অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যের সাথে এক হওয়া যায়। এটাই "মদ্‌যাজিনোহপি মাম্" ॥ ৯/২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ।। ২৬

অনুবাদ: যিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র,পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি কর্তৃক ভক্তিপূর্বক উপহার রূপে প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করি ॥ ৯/২৬

ব্যাখ্যা: আত্মা উপাসনার প্রধান অঙ্গই হল ভক্তি। পাঠক এখানে প্রশ্ন করুন যে ভক্তিতো সকলের মধ্যেই থাকে তবে আত্মা উপাসনায় কেমন ভক্তি আবশ্যক ? উত্তর হল সবিজ্ঞান ভক্তি। না বুঝে, না জেনে নয়। মনের তলে যিনি মাত্র অসঙ্গ পুরুষ রূপে প্রতিভাত, হৃদয়ের তলে যিনি অসঙ্গ অথচ পরমেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মায় যিনি পরমাত্মভাবে অভিন্নাত্মা সেই পরমব্রহ্মপুরুষ আমিই। তত্ত্বতঃ এভাবে জানতে পারলে তবেই বেলপাতা, ফুল, ফল, জল যে কেউ, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, সেই অনুসারে কর্ম্ম করে, সেই পদ্ধতিতে আমাকে দেয় আমি তা সমুদায় গ্রহণ করি। পাঠক প্রশ্ন করুন, সে পদ্ধতিটা কি ? পদ্ধতিটা কিছুই নয় শুধু ভালরূপে সমাধিস্থ হওয়া। সেভাবে যা দেবেন সবই তিনি গ্রহণ করবেন, সবিজ্ঞান ভক্তিতে থেকে দেওয়া যদি হয়। তাই এই ভক্তির উল্লেখ। তত্ত্বতঃ জানা হলেই, সে জানাটিই, সেই জ্ঞানটিই ভক্তির আকারে প্রবাহিত হয়, উদ্বেলিত হয়, হৃদয়গ্রন্থির সকল কাঠিন্য বিদূরিত হয়ে হৃদয় দ্রবময়ী গঙ্গায় পরিণত হয়। জানা মানেই বেদিত হওয়া আত্মৈকতায় নির্বেদ হওয়া। ফল, ফুল যা কিছুই দাও তিনি নেবেন ঠিকই কিন্তু দিতে হবে শুদ্ধচিত্তে। তাই চিত্তকে শুদ্ধ করতে হলে চিত্তকে রোধ করতে হবে। চিত্তের লক্ষ্য যদি একমাত্র আত্মাই হয়, তবেই হয় সে

নিরোধ অবস্থা যখন একমাত্র ধ্যেয় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু প্রত্যয় নেই। প্রশ্ন করুন এ অবস্থায় কি ফল, জল দেওয়া সম্ভব হয় ? মোটেই না। তবে কেন প্রযত্নাত্মা হয়ে এসব ফল, জল, ফুল, বেলপাতাদি দিতে বললেন ? উত্তরে বলছি চিত্তশুদ্ধ হলে, অপরাভক্তির উদয় হলে, সকল প্রকার কর্ম্মের ফল, শুদ্ধ চিত্তে, শুদ্ধ চৈতন্যের সুন্দর চিন্তা সকল হল জল, প্রযত্ন মানে সমাধিলাভের প্রযত্ন রূপ বিল্বপত্রাদি ও ভক্তিপুষ্প সকলই পরমাত্মায় অর্পিত হয়ে থাকে। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্ত আত্মময় হয়ে আত্মাই হয়ে যায়। সুতরাং সেখানে তো সবই আপনা আপনিই অর্পণ হয়ে গেল। সমাধির পরও, মানে মন ইন্দ্রিয়গত হবার পরও, সমাধির রেশটা থেকে যায় তখনও অনুভব হয় যা দেখছি আত্মাই এ সমস্ত হয়েছেন। সুতরাং ফুল, ফল, দুধ, জল সবই যোগী গ্রহণ করেও ভাবেন যে এতে আত্মচৈতন্যেরই তৃপ্তিলাভ হচ্ছে। সাধনকালীন গৌতম বুদ্ধকে সুজাতা কর্তৃক পায়েস নিবেদন কাহিনী স্মরণ করুন। যখন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, সবই যখন তিনি, তখন তিনি ছাড়া আর কার তৃপ্তি সাধন হবে ? এছাড়াও আরও সাধুপ্রকৃতির মানুষ আছেন যাঁরা এখন যোগের অভ্যাস হয়ত করেন না অথচ ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে ভগবানকে ভালবাসেন। তিনি যে সর্ব্বময় একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন ও পূজো পাঠাদি করে থাকেন, তাঁরাও যদি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁদের প্রাণের দেবতাকে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করেন, তাও তিনি গ্রহণ করেন তা সে দৃশ্য অদৃশ্য যেভাবেই হোক। ভক্ত জানেন ভগবানের সম্পদ অসীম তবু তিনি ভক্তের নৈবেদ্য উপহার গ্রহণ করে ভক্তের ভক্তি, চিত্ত ও বিত্তকে পবিত্র ও সার্থক করে তোলেন। ভক্তগণ সর্বভূতস্থিত, ভগবানকে পূজো করে ও দরিদ্রকে দান করেও নিজেদের বিত্ত ও সামর্থ্যকে সার্থক করেন এবং হৃদয় পবিত্র করে থাকেন। আর যারা ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে গেরুয়া বসন পরে মিথ্যা কথা বলে, ভক্ত ও দর্শককে প্রতারণা করে, তারা নিজেরাও জানে ও যাদের বলে তারাও জানে যে আমরা মিথ্যা কথা বলছি। সেখানে ভগবান কিছু গ্রহণ করেন না। ছোট বেলায় শুনতাম ঠাকুরের ভোগ পাঁচসিকে, এ সমস্ত রীতি এখনও চলে আসছে সে সব আলোচনা এখানে নিস্প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের জন্য, যারা সত্যই কর্ম্মব্যস্ত, ঈশ্বরসাধনার সময় মোটেই নেই, অথচ হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, তাঁদের ভক্তিপূর্ণ জ্ঞানে সাধারণ ভাবে জানা ও প্রবিষ্ট হওয়াটা এক জানারই বিলোম ক্রমপরম্পরা। সোনায় খাদ মেশানোর মত পূর্ণভক্তির সাথে একটু কল্পনার খাদ মিশিয়ে হলেও হৃদয়মাঝে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর। দেখবে আমার সম্বেদন অহেতুক ভক্তিপ্রবাহের আকার নেবে। তখন আমার অন্ন, আমার ভোগ, আমাতেই হবে আত্মসাৎ। ঠিক যেমন তোমাদের অন্ন তোমাদের আয়তনে আত্মসাৎ হয়ে থাকে। তোমাদের আয়তনটা হল জ্ঞানপ্রধান তাই তোমাদের ভোগ তোমাদের আয়তনে হয় একাকার। আর অমি হলাম অনায়ত ও আত্মময় তাই আমার ভোগ আমাতে হয় আত্মময় – "অশ্নামি", "গৃহ্নামি " নয়। লক্ষ্য করুন কারটা এমন করে গ্রহণ করি ? শুধুমাত্র প্রযতাত্মা পুরুষের। যে আত্মারূপী আমাতেই জাত ও বিলীন হয়। আমাতেই জগৎ ভোগ করে যার আমি ভিন্ন আর কিছু নেই, তার। ধন্য সেই পুরুষ, যার ফুল, ফল, পাতা, জল এমনকি জীবনের তুচ্ছতম ক্ষুদ্রতম দান ও কর্ম্ম সকলই এইভাবে এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের গ্রহণযোগ্য হয়, সেটিকেই উপলক্ষ্য করে তিনি ভগবদ্ ভক্তের আত্মা ও জীবনকে অধিকার করেন ॥ ৯/২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ।। ২৭

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে ॥ ৯/২৭

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভগবান দ্রব্যময় যজ্ঞের কথা বলে এই শ্লোকে সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করতে বলছেন। বলছেন, ওহে বাপু, অতকষ্ট করে বেলপাতা, ফুল, ফল, জল, বলির জন্য পশু, সমিধ, হবি (ঘী) ওসমস্ত অতশত কিছুই জোগাড় করার দরকার নেই। বরং শাস্ত্রবিহিত ও অবশ্য করণীয় যে সমস্ত কাজকর্ম্মগুলো করে থাক, মানে তোমার খাওয়া দাওয়া, দান ধ্যান, তপস্যা ইত্যাদি সবকিছুই যাতে আমাতে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা কর। এমনতর পূর্ণতম ভক্তি ও ঐকান্তিক আত্মসমর্পণই হল কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। সমস্ত কর্ম্ম ও চেষ্টা এমন ভক্তির দ্বারাই পরম বিশ্বপুরুষের নিকট অর্পণে পরিণত হয়। প্রযতাত্মা পুরুষ হলে তার সকল কর্ম্ম স্বতঃই ভগবানে সমর্পিত হয়ে যায় কেননা তাঁর কর্তৃত্ব করার অভিমান থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতের **১১শ** স্কন্ধে আছে –

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহনুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদযৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সর্মপয়েত্তৎ ॥"

যার অর্থ হল কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মাদ্বারা অথবা স্বভাববশে যে কোনও কর্ম্ম করা হয়, তৎ সমস্ত পরম পুরুষ নারায়ণে সমর্পণ করিবে। শুধু পূজা অর্চ্চনাই নয় লৌকিক কর্ম্মসকল যথা আহার বিহারাদিও নারায়ণে সমর্পণ করতে হবে। অবশ্য কর্তৃত্ব করার অভিমান যখন থাকে না তখন তাঁকে সর্ব্বস্ব অর্পণ না করে থাকারও উপায় থাকে না। তাই প্রযতাত্মা পুরুষ হলে তাঁর সমস্ত কর্ম্ম স্বতঃই ভগবানে সমর্পিত হয়ে যায়। সবার মধ্যেই যে 'আমি' আছে সেই 'আমি'গুলো যে সেই এক অনন্ত, অখণ্ড 'আমি'র ই অন্তর্গত, এই ধারণায় প্রবুদ্ধ না হলে প্রকৃত নিষ্কামী হওয়া যায় না। এমন ধারণার প্রধান বাধাই হল কামসংকল্প যেটা হল আসল অজ্ঞান বা হৃদরোগ। এই কামসংকল্পটা নিঃশেষে নিবৃত্ত হলেই জীব যে স্বয়ংই সেই অমৃতস্বরূপ সেটা বুঝতে পারে। তখন আমার তৃপ্তিকেই সে তার তৃপ্তি

বলে বুঝতে পারে। তুমিও আমার তৃপ্তিকেই তোমার তৃপ্তি বলে গ্রহণ কর। আমার সত্তাকেই তোমার সত্তা বলে ভোগ কর। আমার শক্তিকেই তোমার শক্তি বলে ধারণা কর, আমার কর্তৃত্বকেই তোমার কর্তৃত্ব বলে অভিমান কর। তবেই হৃদয়ের অনুরক্তি নিয়ে যা কিছু আমাকে দেবে তা আমি সবিশেষ প্রীতির সাথে ভোগ করবই। এজন্য আমার অসঙ্গ ব্রহ্মত্বকে জেনে বুঝে তোমাদের সকল প্রচেষ্টা ও কর্ম্ম, পরিশ্রমাদি সবই আমাতে অর্পণ করতে থাকো। দেহাভিমানযুক্ত‘আমি’ না থাকলে সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্ম কর্ম্ম বলে মনে হয়। ক্রিয়া করতে করতে এই‘আমি’‘পরম আমি’ র সাথে মিলে মিশে এক হয়ে গেলেই প্রকৃত অর্পণ হয় এবং সেটাই হল ব্রহ্মার্পণ বা স্বরূপ স্থিতি ॥ ৯/২৭

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ।। ২৮

অনুবাদ: এইরূপ করিলে কর্ম্মে আসক্তিজনিত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে। পরে সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা, অর্থাৎ আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণরূপ যোগযুক্তচিত্ত, হইয়া তুমি আমাকে পাইবে ॥ ৯/২৮

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যেমনটা বলা হল ঠিক তেমনিভাবে সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করতে পারলেই তুমি কর্ম্মফলে আসক্তিরূপ ওই বিচ্ছিরি বন্ধনটা থেকে মুক্ত হতে পারবে। শুভাশুভ ফলপ্রসূ কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্তির এটাই উপায়। শুধুই যে বন্ধনমুক্তি তা নয়, এটা হল মুক্তির একটা সোপান যার অন্য সোপানটাই হল ব্রহ্মত্বলাভ। এ ত্যাগের কৌশল যাঁরা জানেন তাঁরাই বোঝেন যে আমার ‘আমি’ ভাবটা কিভাবে খসে পড়ে। সর্ব্বকর্ম্মার্পণের আগে দেহাধীশবুদ্ধিযুক্ত‘আমি’ ইন্দ্রিয়ের সাথে মিশে কর্ম্ম করত ও তার ফলও ভোগ করত। আর এখন ঐ ছোট্ট‘আমি’টা বড়‘আমি’তে মিশে হারিয়ে যাওয়ায় আর দেহের সাথে কোনও যোগ রইল না। সুতরাং দেহের সাথে কর্ম্মফল ভোগেরও কোনও উপায় রইল না। এটাই দেহাভিমানবিহীন অবস্থা বা সংন্যাস, মানে সং অর্থাৎ সম্যক পদ্ধতিগতভাবে ত্যাগ। ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পিত হয়ে গেলে তবেই এভাবে‘আমি’ হওয়া যায়। নইলে দেহতে অহং জ্ঞান থাকলেই ফলভোগ করতে হয়। ঠিক ঠিক মত লেগে থেকে ক্রিয়া অনুষ্ঠান নিয়মিত করলে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব হবে নিজের দেহাধীশ‘আমি’টা কিভাবে লাফিয়ে বড়‘আমি’তে পড়ে হারিয়ে যায়, এবং দেহের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। মস্তকে বায়ু ধারণের সময় ক্রমশঃ বাড়াতে পারলে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভোগ হলেও মনে কোনও সংকল্পের উদয় হয় না। এ অবস্থাই সন্ন্যাস। গেরুয়া পরে মঠ মিশন তৈরী করলে ভোগ ব্যতীত ত্যাগ মোটেই আসে না, বড় বড় সাইনবোর্ড না লাগিয়ে প্রচারবিমুখ হয়ে একাকী হয়ে মনকে নিরালম্বে রেখে মাথার ওপরে শ্বাস চড়িয়ে দিতে পারলে সেই চিরস্থির আসন থেকে আর কেউ টলাতে পারে না। তখন সর্ব্বকর্ম্ম করে কর্ম্মময় থাকলেও সমস্তকর্ম্ম আমাতেই

সংন্যাস্ত হবে এবং তুমি কর্ম্মপাশ থেকে মুক্ত হবে। তখন বন্ধনমুক্ত হয়ে আমার ব্রহ্মস্বরূপে, পরমাত্মস্বরূপে উপনীত হবে এবং নিজেকেই ব্রহ্ম বলে বিজ্ঞাত হবে। এভাবেই পূর্ণতম আত্মসমর্পণের দ্বারা সকল অহংমুখী বাসনা হৃদয় থেকে দুর হয়ে যায় এবং জীব আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পরিহার করে ভগবানের সাথে পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। আর তা না করে, গেরুয়া পরে মাথা কামালে তুমি ঠকাবে ও ঠকবে নিশ্চয়। শ্রীঅরবিন্দ দুর্দ্দান্ত, দুর্দৈব কারাবাসের মধ্যেও সিদ্ধিসীমায় পৌছাতে পেরেছিলেন এমন কর্ম্মসমর্পণের দ্বারাই। আর এ যুগে জয়েন্দ্র সরস্বতীদের একরাতের সবরকম সুখ সুবিধাযুক্ত কারাবাসেই শরীর অর্ধেক হয়ে যায়, মুখে দুশ্চিন্তার কালো রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃত সন্ন্যাসে মোটেই এমনটা হবার নয়। তাই বলছিলাম আভ্যন্তরীন সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। সাইনবোর্ড লাগানো মঠমিশনের সন্ন্যাস নিছকই ভড়ং ছাড়া আর কিছু নয় ॥ ৯/২৮

সমোহহং সর্বভুতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ।। ২৯

অনুবাদ: আমি সর্বভূতে সমান। অতএব আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নেই। কিন্তু যাঁরা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেসকল ব্যক্তিতে থাকি ॥ ৯/২৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকটার মর্ম্মার্থ ঠিকমত বুঝতে না পারলে এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে তাহলে ভগবান কি শুধুমাত্র ভক্তগণকেই মোক্ষ প্রদানে ইচ্ছুক, অন্যকে নয় ? তবে তো ঈশ্বরও সমদর্শী নন। সেখানে তাঁতেও কিছু ভেদবুদ্ধি পাওয়া গেল। এমন সন্দেহের নিরসনের জন্যই ভগবান এই শ্লোকে বলেছেন, আমি সর্বভূতেই সমান। তিনি কাউকে পরিত্যাগ করেন নি, আবার খাম খেয়ালের বশে কাউকে কৃপাও করেন নি। মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন, ভগবানের মধ্যেই মানুষ আছে – এটা সজ্ঞান অনুভূতিতে প্রমাণ হয়। অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ হলে তবেই শেষ পর্য্যন্ত সকলে সমানভাবে তাঁর কাছে পৌছায় এবং সর্ব্বতোমুখী মিলনে পরিণত হয়, কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই। ভগবান সকলের পক্ষেই সমান, জীবের নিজ নিজ কর্ম্মের প্রতিক্রিয়াই ভগবানকে ভাল লাগা বা না লাগার কারন। জীবের প্রকৃতির তারতম্যবশতঃ ভগবানের শুদ্ধ, আনন্দময়, শান্তভাব ও ভীষণ হতে ভীষণভাব প্রকাশিত হয়। বৃষ্টির জলে ওষধি ও আগাছা সবরকম গাছই জন্মে এতে যেমন বৃষ্টির কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। তেমনি অজ্ঞ জীবের হৃদয়স্থ আত্মা তার প্রাপ্ত সংস্কার অনুসারে শুভাশুভ অর্পণ করেন মাত্র। তাঁর পরমাত্মস্বরূপ মহিমময় স্বরূপ কিন্তু তার নিকট প্রকাশ পায় না। আবার জীব তত্ত্বজ্ঞ হয়ে ভগবদ্ ভক্তিময় হলে পরে তাঁর হৃদয়স্থ আত্মাই ভূমা পরমাত্মারূপ মহতী তনু প্রকাশ করে তার জীবত্বের বিষয়াধীনতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে তাকে ব্রহ্মত্বের স্বাদে ও অসঙ্গের আস্বাদে

চর্চ্চিত ও মন্ডিত করে দেখিয়ে দেন যে আত্মারূপে স্বয়ং পরমাত্মাই তাঁর অন্তরে বিরাজিত অর্থাৎ সেই ভক্ত স্বীয় আত্মাতেই পরামাত্মত্ব লাভ করেন। যে ভক্তি সহকারে ভজনা বা ক্রিয়া করে তারই নিকট তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দ নিত্যচৈতন্য ভাবটিকে প্রকাশিত করেন। নিজের খেয়াল খুশিমত কাউকে স্নেহ বা দ্বেষবশতঃ কারও কাছে প্রকাশ বা গোপন করেন এমনটা মোটেই নয়। যিনি সাধনা করেন না তার নিকট এ চিন্ময় ভাবের প্রকাশ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্বাসের অভাবেই উপাসনার বদলে বিষয়ভোগের জন্য ব্যাকুল হয় ও ফলস্বরূপ বিবিধ দুঃখের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। শান্তির মুখ দেখবে কোত্থেকে ? যাঁরা ভগবানের ভক্ত তাঁরা এটা ভাল মত বোঝেন, আর বোঝেন বলেই ভজনা থেকে নিবৃত্ত হন না ॥ ৯/২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ ।। ৩০

অনুবাদ: যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভজনশীল হয়ে (অন্য দেবতাও বাসুদেব এমনভাবে আত্মপরায়ণ হয়ে) আমাকে ভজনা করেন তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য, যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন। ৯/৩০

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বলা হল ভগবান কাউকে পরিত্যাগ করেননি। তারই প্রমাণস্বরূপ এ শ্লোকে বলা হয়েছে অধিকতম পাপী এবং দুরাচারী ব্যক্তিও যদি নিজের চরমতম পতনটা উপলব্ধি করে অন্ত রস্থ ভগবানকে ভজনা ও অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাতেই সে রক্ষা পায়। সেই ফিরে দাঁড়ানোর জন্যই সে চট করে সাত্ত্বিক পথটা ধরতে পারে যা তাঁকে সিদ্ধির ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়। রামায়ণের দস্যু রত্নাকর এর সুন্দর উপমা। সুদুরাচারী পুরুষও যদি আমার ভজনা করে, মানে ৩অনন্যভাক্' হয়ে একমাত্র আত্মার ভজনা করে, আর কোনও ঠাকুর দেবতা না মেনে, সবই সেই একমাত্র বাসুদেব এই ধারণায় দৃঢ় হয়ে স্বয়ং আত্মার উপাসনাতেই রত থাকেন, তবে তাকে সাধু বলেই জানবে। কেন ? কেননা তার জীবনগতির দিক নির্ণয় হয়ে গেছে। এখন তার সঠিক দিকে লগ্ন দৃষ্টি, ভগবানকে সে নিজের মধ্যে বসিয়েছে, নিজের মধ্যে আত্মার আত্মাকে সে দেখতে শিখেছে। যদিও তার দুস্কৃতির অন্ত নেই, তবু সে দেখতে শিখেছে কলুষহরণ দেবতাকে। তাই তার আর পতনের ভয় নেই, এখন শুধুই উত্তরণ। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হলেই সেই হৃদয়নাথের মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। আত্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান হতে পারলেই চিত্তের গতির পরিবর্তন হয়, ধীরে ধীরে মনেরও উন্নতি হয়। আরও অনেক পরে চিত্ত অনন্যভাবে আত্মাতেই রমণ করে। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করলে, ভজনানন্দের রস পেলে, বিষয়ানন্দকে বিরস বোধ করবেই। শঙ্করাচার্য্য এমন পরমেশ্বর ভজনের

দ্বারা কৃতার্থ হওয়াকেই " অনন্যভাগনন্যভক্তি" বলেছেন। যা হোক, আত্মাতে মন নিশ্চল হয়ে গেলেই দস্যু রত্নাকর মহামুনি বাল্মিকী হয়ে যান। অনন্য ভজনার এটাই ফল। যেভাবেই বলি, অধ্যাত্মে কি অধিদৈবে, যে দিক দিয়েই ভাবি, জ্ঞানসম্পদময়, জ্ঞানশক্তিময়, আত্মবোধময় পরমাত্মা ভিন্ন কাউকেই তো পাই না। সুতরাং জ্ঞানময়, আত্মময় এক সর্ব্বজ্ঞ দেবতার এই অসীম, অনন্ত এ বিশ্বরূপ। আমিও এ বিশ্বরূপের অন্তর্গত। এ বহু জীবাত্মময় বিশ্বরূপের তলে স্থির স্থবির পরমাত্মরূপে আছেন তিনি। তাঁর স্থূল ভূতাকৃতি জ্ঞানায়াতনই এ বিশ্ব। তাই কে দুরাচার ? একমাত্র মৃত্যুই দুরাচার, মৃত্যুর বাহকই দুরাচার। কিন্তু যখন মৃত্যুও প্রাণ তখন মৃত্যুও নেই, দুরাচারও নেই। সবই সদাচার, নারায়ণ, বাসুদেব। পরমদেবতার সজীব, সত্য, আশ্বাসময় এ বাণী। এ বাণী পঙ্গুকে করে চলনশীল, ভূলুণ্ঠিতকে তোলে স্বর্গে ও অন্ধকারে জ্বালে পঞ্চপ্রদীপ। যে আলোয় যুগান্তের অন্ধকার হয় দূরীভূত। এর তুলনা নেই ॥ ৯/৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।। ৩১

অনুবাদ: অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে ভজন করিলে শীঘ্র ধর্ম্মত্মা হন এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হন। হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিত ভাবে বলিতে পার ॥ ৯/৩১

ব্যাখ্যা: পূর্বশ্লোক পাঠে সংশয় হয় তবে কি অতিশয় দুরাচারীরা এমন হঠাৎ সাধু বলে পরিগণিত হলে সত্যিকার সাধুদের মত হতে পারে ? পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে দৃঢ় সংকল্প তা আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ভগবানে পূর্ণ আত্মদান হয়ে গেলে আমাদের নিচের প্রকৃতিকে দ্রুত অধ্যাত্মপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে আমাদের আধারের সকল অংশকে দিব্য জীবনের ধর্ম্মে গড়ে তোলে। আত্মসমর্পণের সংকল্পের যে শক্তি তা ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিত মায়ার আবরণ সরিয়ে দেয়, সকল ভ্রান্তিকে নাশ করে। ফলে সকল বাধা বিপত্তি দূর হয়। পূর্ব্বাভ্যস্ত দুষ্কর্ম্ম আর তাকে সেদিকে টেনে নিতে পারেনা। সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় মানে ক্রিয়া করে ধর্ম্মশীল হয়। যদি বল দুষ্কর্ম্মকারীর আবার ধর্ম্ম কি ? ধর্ম্ম সকলেরই আছে। ঃধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুঃ" প্রাণের অবিরত চাঞ্চল্যে মন সর্ব্বদা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই চঞ্চল মন যখন ক্রিয়ারদ্বারা স্থির হবে সেই স্থিরতাই যোগধারণা, সেটাই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করলে পূর্বসংস্কার আর তাকে পাপ ও অশুভ কাজে টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। আর ক্রিয়া না করলেই মনের চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ তাকে অবশ করে অন্যায় কাজে টেনে নামাবে। কারণ চঞ্চল মনের অকরণীয় কিছুই থাকেনা। যে কেউ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করে দিলে ও ভক্তিপূর্বক ক্রিয়াভ্যাস করে গেলে যোগধারণারূপ স্থিতাবস্থা পায়। তখনই সে ধীরে ধীরে অনন্যভাক হয়ে পরম শান্তিপদ লাভ করে। কুতর্ক ও কর্কশবাদীরা অবশ্য এটা মানবে না। কিন্তু এটাতো তর্কের

বিষয় নয়, করে দেখতে হয়। তাই ভগবান বলছেন যে, আমি একথা প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি; উত্তম ক্রিয়াবান ক্রিয়া করে দেহে আত্মবোধ লাভ করলেই জন্ম মরণের খেলা সে বোঝে তাই তার আর ভয় থাকেনা। সে হয় ধর্ম্মময়, প্রাণে তার প্রবাহিত হয় পরম শান্তি, ত্বরিতে চলে যায় জীবন মৃত্যুর পরপারে। তাই ভগবান বললেন আমার ভক্তের বিনাশ নেই, সে স্বয়ং প্রকাশ, চিরব্যক্ত, চিরজ্যোর্তিম্ময় ॥ ৯/৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ।। ৩২

অনুবাদ: হে পার্থ, যাহারা পাপবংশসম্ভূত অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য কিংবা শূদ্র, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৯/৩২

ব্যাখ্যা : আমাদের সকলের মধ্যে যে ভগবান অধিষ্ঠিত রয়েছেন তিনি কিন্তু আর কিছুই চান না যদি এসমস্ত আত্মসমর্পণ, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে হয়ে থাকে। এ পথ দিয়ে পুণ্যবান সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য পাপজন্মা চণ্ডাল সবাই একপথে যেতে পারে। চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনলাভ সবার পক্ষেই সমানভাবে সম্ভব। ক্রিয়া সাধনে সকলেরই অধিকার আছে। অন্ত্যজ জাতি, বৈশ্য বা শূদ্রাদি ভেদে শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপার কোনও তারতম্য হয় না। কায়েমি স্বার্থরক্ষায় স্বরচিত ধর্ম্মপ্রবর্তকগণ স্ত্রীজাতির ধর্ম্মাচারণকে স্বীকৃতি দেন নাই। এটাও ভেদবুদ্ধি প্রসূত। পরিণামে দেখা যায় গৌতম বুদ্ধ বিশ্বের সকল পুরুষকে সন্ন্যাসী বানাতে গিয়েছিলেন। ইসলামেও দেখা যায় স্ত্রী জাতি, মসজিদে নিষিদ্ধ এমনকি স্ত্রীজাতির প্রকাশ্য ঈদগাহ প্রভৃতি স্থানেও নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। যাই হোক অণুগীতায় আছে "স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র এই আত্মদর্শনরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই পরমগতি লাভে সমর্থ হয়। ছয় মাস যোগ সাধন করিলেই যোগফল লাভ হয় – তাতে সন্দেহ নাই।" জ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বা ভক্তিপূর্ণ ক্ষত্রিয়ই শুধু নয়, শূদ্র, বৈশ্য বা স্ত্রী যেই হোক আপামর সবাই আমাকে পাবে, পার্থ, এ বাণী ভুলোনা। তবে শ্রীগুরুদেবকে আত্মারূপে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হলেই হল। ক্রমমুক্তির উপায় তো আমি করেই রেখেছি। জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে যেই হোক ক্ষতি নেই, সকলেরই হৃদয়ে আমি আত্মারূপে অধিষ্ঠিত। তাই আত্মধর্ম্ম পালনে স্বরচিত কোনও প্রবর্ত্তনার স্থান নেই। আত্মধর্ম্ম সনাতন ও সার্ব্বভৌম ॥ ৯/৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।। ৩৩

অনুবাদ: সুকৃতিশীল ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন ইহাতে কথা কি ? অতএব, তুমি অনিত্য এবং অসুখকর এই মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া (সংসারে আসিয়া) আমাকে ভজনা কর ॥ ৯/৩৩

ব্যাখ্যা: যে কথা আগের শ্লোকে বলা হল যদি তেমন আচারভ্রষ্টগণ, শূদ্রগণ, বৈশ্যগণ এমনকি স্ত্রীলোকেরাও যদি সেইমত গুরুকৃপালাভ করতে পারেন ও তদাশ্রয়ে আত্মধর্ম্ম পালন করতে সক্ষম হন, তবে সৎকুলজাত ও সদাচারী ভক্তগণ যে পরমগতি লাভ করবেন তাতে আর সন্দেহ কি ? সুকৃতিশীল ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ তাঁদের আর কথা কি ? এ চলমান জগৎই অনিত্য। মানুষের যন্ত্রণাও অনেক বেশি। কারণ কোনও একটা বস্তুতে কোনও সুখ নেই। এটাই বস্তুবাদ বা জড় বাদের বিপদ। মানুষ যত সমস্ত অস্থায়ী বস্তুতে ও সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় ও সবরকম দ্বন্দ্বকেই জীবনের নীতি বলে গ্রহণ করে। এটাই হল বস্তুবাদীর দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বমূলক বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যার পুরোটাই অলীক। শুভ অশুভ, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বই ভোগ করা সার হয়। এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে বাইরে থেকে ভিতরে আসা, অর্ন্তমুখী হওয়া। কারণ ভগবান আমাদের অন্তরের মধ্যেই প্রকট হবার জন্য অপেক্ষা করছেন। শুধুমাত্র মানুষের শরীরই জ্ঞানভক্তি লাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র। অন্য কোনও শরীর এর উপযুক্ত নয়। তাই পুরুষার্থসাধক এ মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ জন্ম। মনুষ্যজন্ম পেয়ে বস্তুবাদী হওয়ার মত বঞ্চনা আর নেই। নরতনু লাভ দুর্লভতর কারণ এ তনুদ্বারা সাধন করা যায়। সুষুম্নাদ্বারকে উন্মুক্ত করা যায় যাতে মোক্ষদ্বারের তালা খুলে যায়। মনুষ্যদেহে যে কেউ সাধন করবে সেই মুক্তির স্বাদ পাবে। তাই কথায় বলে, "শরীর ধারণ হরির কারণ"। মানুষের জীবনে বাহ্যিক সংসার বন্ধন কমবেশি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই থাকে বটে, কিন্তু সেটা প্রকৃত বন্ধন নয় কারণ সেটা নিজেকে নিজে বন্ধন করা নয়, শুধু দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন, সেখানে কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না। গুরুকৃপালাভে সে বন্ধন অচিরেই ঘুচে যায়। প্রকৃত বন্ধন হল দ্বন্দ্বে প্রবেশ করা। সুতরাং দ্বন্দ্ব বিনির্ম্মুক্ত হও। বস্তুবাদ থেকে দূরে থাক। উর্ণনাভ বা গুটিপোকা হয়ো না। আত্মচিন্তা ছাড়া জাগতিক চিন্তায় সুখ নেই। এটা বস্তুবাদীরা কেউ কেউ বোঝে, তবে অনেক দেরীতে, তখন আর সময় থাকে না। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কখন আছে কখন নেই। তাই আবার বলি গুরুর নির্দ্দেশটুকু স্মরণ রাখ, কোথাও এমন কোনও জ্ঞানক্রিয়া নেই, যার তলে নেই আত্মবোধ, কোনও জ্ঞান নেই যার তলে নেই আত্মা। আমি পরমাত্মা বিশ্বভূ। আছি এ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুর তলে তলে, যেথায় সব দেখেও দেখি না। যেথায় আমি পরমাত্মা সদাশিব। আমার ভজনা করার অর্থই নিত্য করা, সুখময় করা, জীবন্ত করা –

এ অনুভূতির বিশ্বকে। আর যদি ভিতরকে অস্বীকার করে শুধু বাইরেটাতেই মজে থাকো তবে তোমার অনুভব অনিত্য, তাই আছে বিনাশ, অনিত্য তাই থাকে অসুখ। কিন্তু ভিতরে দেখ, নিজেকে দেখ, বিশ্বব্যাপী আত্মা দেখ, বিশ্ব হবে সম্ভূতিময় – কতবড় অনুভব হবে তোমার! এমন সম্ভূতি হলেই নিত্য (universal) হবে সব। নিত্য হলেই সুখ। সম্ভূতিবোধশক্তিময় বিশ্বই পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ। অনুভব ও চেতনার এমন সম্ভূতি হলে, একবার সেই নিগূঢ় অন্তরতমকে জানতে ও ধরতে পারলে, সমগ্র সত্তা ও জীবন অত্যাশ্চর্য্যভাবে রূপান্তরিত হবে ॥ ৯/৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ।। ৩৪

অনুবাদ: তুমি মদগতচিত্ত, মদ্‌ভক্ত ও আমার উপাসক হও। আমাকেই নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে মন কে (আমাকে) সমাহিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯/৩৪

ব্যাখ্যা: আত্মজ্ঞান লাভই যে মর্ত্তজীবন থেকে দিব্যজীবনে উত্তরণ (sublimation) একথা বলে, ভক্তি মহিমা বিস্তার করে আগের শ্লোকে যে ভজনা করার উপদেশ দিয়েছেন এই শ্লোকে সেই ভজনের ক্রমপর্য্যায় (seriatim) দেখাচ্ছেন। ভগবানই জীবকে উদ্ধারের জন্য গুরুর ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। বলেন, মন্মনা ভব – আমাতে মন দাও মানে যে দিক থেকে যে বিষয়ই আসুক, সেই সেই বিষয়ে আমাকে দর্শন কর। নইলে অন্যকে মন দেওয়া হবে। সবকিছুতেই যে "আমি" জড়িয়ে আছি সেই "আমি" কে ছাড়িয়ে আনতে হবে। বিষয়ই তো মনকে বিভ্রান্ত করে রাখে। তাই বিষয়নিবৃত্তি হলেই মন আত্মাকারিত হয়। আত্মারূপে ভগবান সর্ব্বত্র এটা বুঝতে পারবে না, যদি ক্রিয়া না কর। জ্ঞান যেখানে সমগ্র ইন্দ্রিয়বাহিত বস্তুর সাদৃশ্য গ্রহণ করে, এবং সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, সেই জ্ঞানাংশের নামই হল মন। এই মন আমাকে না দিলে তোমার ক্রিয়া হবে কি করে ? তাই আমার ভক্ত হও – মানে অনুরক্তি আমাতে দাও। এখানে তিনি হৃদয়গ্রন্থি অর্পণের কথা বললেন। কারণ অনুরাগের আধারই হল হৃদয়। তাই হৃদয়ের অনুরাগ দিয়ে তাঁকে বাঁধতে বলেছেন। হৃদয় দিয়ে অর্চ্চনাই হল অর্চ্চিতে যজ্ঞময় হওয়া – ভাব দিয়ে, দ্রব্য দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে সদা সর্ব্বদা শুধু তাঁরই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকা। ভাবের পরিণতিই কর্ম্মে প্রকাশ পায়। এই কর্ম্মই হল যজন বা যজ্ঞ। এটাই মদযাজী হওয়া। তাই বলেছেন মদ্‌যাজী হও। আর আমাকে নমস্কার কর। যে নমস্কার হবে মানসিক। যাতে হৃদয় দ্রবিত হয়ে পূর্ণ সমর্পিত হবে, নমিত হবে। নমস্কার করা মানেই নমিত হওয়া। কায়মনঃপ্রাণে আমাতেই নত হও। আমাতেই সমর্পিত হও। আর কোনও কিছুর দরকার নেই। এভাবেই মৎপরায়ণ হও, মদ্গত চিত্ত হও অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপ আত্মায় চিত্তের (মনের) লয় করে

আপনাতে আপনি মগ্ন থাক। আত্মার দ্বারা যুক্ত হলে তবেই পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। অন্য কোনও উপায় নেই। এ অধ্যায়ের শেষে দুটো জিনিষ বোঝার আছে। প্রথমতঃ – অধ্যাত্মে যা উপলব্ধি করবে, অধিদৈবেও তাই পেতে হবে। দুদিক থেকে তাঁকে না পেলে উপলব্ধিটা সম্যক্ (perfect) হবেনা। দ্বিতীয়তঃ – ভক্তি। অনন্যভক্তি দিয়ে যে তাঁর ভজনা করবে সেই তাঁকে লাভ করবে। যদি তাই হয়, তবে পাঠকের প্রশ্ন হবে তাই যদি হয় তবে আর এ সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণবিভাগের প্রয়োজনই বা কি ? তফাৎ একটু আছে। প্লেনে বা ট্রেনে যেমন Executive class অথবা AC class ইত্যাদি থাকে, পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও পুণ্যবান শূদ্রের গতির তফাৎটাও অনেকটা তেমনই। উভয়েই একই সময়ে একই লক্ষ্যে পৌছাবে সত্যই কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্মময়তার জন্যে তার যাত্রা যতটা গতিযুক্ত ও সুনিশ্চিত হয়, অন্যের ততটা হয় না। সে যেমনভাবে প্রতিটি তত্ত্বে উপনীত হতে পারে অপরে তেমনটা পারেনা। সেজন্যই ভক্তিমান্ শূদ্র গতিলাভ করলেও সে অন্যকে গতিযুক্ত করতে বা কোনও বিশেষ সাহায্য করতে পারলেও অন্যের চক্ষুকে মুক্ত করতে সে পারেনা। ভক্ত ব্রাহ্মণ সুনিশ্চিত ও সংশয়হীন হওয়ায় তাঁকে লাভ করে। শূদ্র যদি ধর্ম্মাত্মা হতে অবসর পায় তবে হয়ত সে জন্মেই সে তাঁকে লাভ করবে ঠিকই, কিন্তু শূদ্র সংশয়হীন হবার মত সুযোগ বা অবসর কোনওটাই পায় না কারণ তার মনের গঠনপ্রকৃতিই তার অন্তরায় হয়ে থাকে, সে জন্যই এ অবস্থায় তাকে জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা" কথার এটাই তাৎপর্য্য। এমন ধর্ম্মাত্মা হতে হলে মনকে অবশ্যই আত্মায় সমাহিত করতে হবে যার মাধ্যমই হলেন স্বয়ং শ্রীগুরুদেব। এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন এই তাৎপর্য্যে যে ওঁ কার ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে আপনি নমস্কার করে মৎপরায়ণ হও তবেই সকল তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কারণ আত্মাকে সর্ব্বভূতাত্মারূপে না দেখা পর্য্যন্ত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। অধিদৈবের প্রকাশে তাঁর উপলব্ধি হলে তবেই জীব তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকার লাভ করে। সে জন্যই ভগবান আগে সমস্ত তত্ত্ব বর্ণনা করে তার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিভূতিযোগে নিজের সে দৈবপ্রকাশ ঘটিয়েছেন ॥ ৯/৩৪

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাসংবাদে রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ নাম নবমোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ নামক নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণু প্রদীপিকা নামক গীতার নবম অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ : নবম অধ্যায়ে ঈশ্বরসাধনার গুহ্যতম অথচ প্রত্যক্ষাবগম সাধন রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। পরব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এটা না বুঝলে ব্রহ্মতত্ত্বে যাওয়া

যায় না। এজন্যে ব্রহ্মতত্ত্বে যাওয়ার আগে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রত্যাগাত্মার কথা ও সপ্তম অধ্যায়ে “বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি” বলে আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এই অধ্যায়ে তাঁরই সর্ব্ব উপাদানরূপে অবস্থানটির কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ্যগ্রাহ্য অসঙ্গ পরমাত্মবোধে আত্মাদ্বারা তাঁকে জড়িয়ে ধরতে হয়। জড়িয়ে ধরার এই কৌশল গুরুবক্ত্রগম্য তাই সবার আগে শ্রীগুরুদেবকে জড়িয়ে ধর তবেই সকল ধরতে পারবে নইলে সকলই বেকল হবে, তখন শাপ, স্বপন সব মিথ্যে হয় শুধু বিছানায় মোতাই সার হয়। অত্যন্ত সংসারাসক্তি থাকলে বুঝতে হবে তার আত্মতত্ত্বে প্রবেশের সময়ই হয় নি। জোর করে কিছু করার চেষ্টায় স্বামী স্ত্রী বা অপর কারো সাথে ভূল বোঝাবুঝি চূড়ান্ত আকার নেয় এ সমস্তই পরীক্ষিত সত্য। বিশদ আলোচনা নিস্প্রয়োজন। স্বানুভব জ্ঞান সকলের জন্য নয়। সকলে বুঝতেও পারেনা। এজন্যই অনধিকারীকে দীক্ষাদান তো দূরের কথা এমন কি শাস্ত্রজ্ঞানও দিতে নেই। এটাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এ বিধি উল্লঙ্ঘন করলে নিজেরও অশান্তি বাড়ে। যাইহোক এ ভাবে জড়িয়ে ধরতে না পারলে ব্রহ্মতত্ত্বে অধিগমন করা যায় না। ভাল করে বোঝাবার জন্যেই ব্রহ্মতত্ত্বটা অষ্টম ও নবম এই দুটো অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে কূটস্থ হল অক্ষর পরমেশ্বর আর হৃদয়ক্ষেত্রে ব্যক্ত ভাবসকলের মধ্যে আত্মস্বরূপ যেটি সেটাই পরমাত্মভাব। সমগ্র অব্যক্ত জন্ম জন্মান্তরীয় কর্ম্ম ও ফলের মূল নিয়ন্তা ও বীজরূপে অবস্থিত কূটস্থই পরমেশ্বর আর প্রতি জীবক্ষেত্রে ব্যক্ত আত্মবোধরূপে ভূমা উপাদানস্বরূপ সত্যটিই পরমাত্মা। হৃদয়ভ্যন্তরের এই ব্যক্ত পরমাত্মভাবটির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অব্যক্ত কূটস্থের অনাগত অক্ষরভাব অপেক্ষা সহজ হলেও সংসার আসক্তি ও স্বামী, স্ত্রী,পুত্র পরিবারে বা বিষয়ে আসক্তি বেশী হলে পরে তদপেক্ষাও ঘনিষ্ট এ ভাবটির অস্তিত্বটা বোধেই আসেনা। সকল ব্যক্ততার মধ্যে ও মূলে তাঁর অবস্থান প্রত্যক্ষীভূত হলেও তিনি অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত রূপেই প্রত্যক্ষ হন। এই প্রত্যক্ষীভূত আত্মতত্ত্বই যে পরমেশ্বর এমন প্রজ্ঞায় আরূঢ় হলেই ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়। মন আর মুখ এক করে সর্ব্বস্ব সমর্পণের ফলস্বরূপ (শ্রীগুরুদেব) তিনি পরমেশ্বরত্ব ও অব্যক্ত নিয়ন্ত্রিত্ব সে জীবের (শিষ্যের) চোখে মুক্ত করে ধরেন। তখনই সে জীব বুঝতে পারে যে তাইতো সবই তো তিনিই! সকলই তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, সব তাঁরই বিভূতি। এটা এর পরের অধ্যায়ে ভালমত বলা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে বলা আছে ব্যক্ত বিভূতির কথা আর একাদশ অধ্যায়ে বলা আছে অব্যক্ত বিভূতির কথা। এ সমস্ত অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলা হলেও প্রতিটা জীবই নিজের ব্যক্ত জীবনের ব্যক্ত ভাবাবর্তনের মূলে মূলে তাঁকে দেখতে চেষ্টা করলেই তিনি তাঁকে দেখিয়ে দেন। হৃদয় থেকে মস্তিষ্কে সহস্রারে অব্যক্ত পরমেশ্বরে নিয়ে আসেন এবং তার অব্যক্ত জীবন নাটক তাকে দেখিয়ে দেন, তার ধ্রুবাস্মৃতি জেগে ওঠে। যেমনটা যোগীরাজ শ্যামচরণ লাহিড়ীতে জাগিয়ে ছিলেন তাঁর শ্রীগুরুদেব, বাবাজী মহারাজ, দ্রোণগিরিতে নিয়ে। এভাবে অর্জুনও নিজের সহস্রারেই বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। হৃদয়ের অন্তরস্থ পরমাত্মা ও তাঁর অব্যক্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দেখে জীবের হৃদয়ে সত্যিকার অহৈতুকী ভক্তির বান ডাকে। সেজন্যই ভগবান দশম অধ্যায়ে ব্যক্ত বিভূতি ও একাদশ অধ্যায়ে অব্যক্ত বিভূতি বর্ণনার পরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বর্ণনা করেছেন। বুঝবার সুবিধার জন্য দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সার সংক্ষেপ একবারেই বলে দিলাম। রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ মানে সংক্ষেপে রাজ মানে প্রকাশ, বিদ্যা মানে জ্ঞান। অর্থাৎ নিজেকে নিজে জানারূপ আত্মজ্ঞানের প্রকাশ অবস্থাই রাজবিদ্যা। এ বিদ্যাটা যেহেতু পরম গোপনীয় তাই এটা রাজগুহ্য মানে অতিশয় গুপ্ত। যে পূর্ণজ্ঞানরূপ অবস্থা, সেই অবস্থায় ব্রহ্মে মিলে যাওয়া বা লয় পাওয়াটাই রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ। আত্মবোধ থেকে ব্রহ্মত্বে যাওয়া পর্যন্ত সবিজ্ঞান বর্ণনা আছে বারোটা অধ্যায়ে যেখানে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার উভয়বিধ প্রকাশ ক্রমপরম্পরায় সুস্পষ্ট হতে থাকে। যে বিজ্ঞান জানলে সকল অশুভ থেকে বন্ধনমুক্তি ঘটে, সেই গুহ্যতম সাধনজ্ঞান পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখুন ॥

-- ০০ --

ওঁ

অথ দশমোহধ্যায়ঃ

বিভূতি যোগঃ (১০)

শ্রীভগবান উবাচ -

ভুয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ।। ১

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে মহাবাহো, পুনর্ব্বার আমার পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর। যাহা প্রীতিমান্ তোমাকে আমি হিতার্থ (তোমার মঙ্গলের জন্য) কহিতেছি ॥ ১০/১

ব্যাখ্যা: ভগবান এতক্ষণ যা বলছিলেন (৮ম এবং ৯ম অধ্যায়ে) তারই সার সঙ্কলন করে বলছেন এটাই তাঁর পরমবাক্য, অন্যকিছু নয়। তথাপি এ অধ্যায় সূচনা করেই ভগবান অর্জুনকে‘মহাবাহু’ বলে

সম্বোধন করলেন। কেন ? সূক্ষ্মাদাপি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব থেকে স্থূলাদপি স্থূল জড়ের প্রকাশ পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টির বাহু বিস্তার করে তবেই ঈশ্বরের পদস্পর্শ করতে হবে। সে জন্যই এইভাবে‘মহাবাহু’ বলে সম্বোধন করেছেন। ভগবৎ তত্ত্বের উপলব্ধি যতক্ষণ ভগবানকে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষভাবে সত্যকার বিশ্বরূপে ফুটিয়ে না তোলে ততক্ষণ তত্ত্ব উপলব্ধি সম্যকভাবে হয় না। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ দুরকমের (১) সোপাধিক ও (২) নিরূপাধিক। প্রথমটাতে রূপ গুণ আছে, দ্বিতীয়টি রূপগুণবিবর্জিত। প্রথমটিতে প্রকাশ্যভাবে রূপগুণ ভাবাদি বর্ত্তমান যার অনুভবও প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত। কিন্তু দ্বিতীয়টী অব্যক্ত ও অনুভববিহীন। এই দ্বিতীয়টীর দ্রষ্টা হওয়া ও তৎস্বরূপে অবস্থানই যোগ। এই নিরূপাধিক আত্মার সোপাধিক ভাবরাশিও কূটস্থের মধ্যেই প্রথম ফুটে ওঠে যা একমাত্র যোগীর যোগদৃষ্টিতেই অনুভব হয়। এটাই সোপাধিক ভাব। এই সোপাধিক ভাবের বিষয়ই দশম অধ্যয়ের বর্ণনায় বিষয়। ভগবান জীবের হিত কামনায় অর্জুনকে লক্ষ্য করে এ বর্ণনা করেছেন তাই অর্জুনকে মহাবাহু বলে সম্বোধন করেছেন। জীবের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যে সেটা সাধন করে জাগাতে ও কাজে লাগাতে পারে সেই প্রকৃত মহাবাহু। যে সাধনে শক্তিশালী প্রপঞ্চ (মায়া) বিলুপ্ত হয় ও ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয়। যে অবস্থায় সাধক নিজ মনের অজ্ঞাতে যা কিছু সংকল্প করেন সবই সত্যি হয়। আর সাধারণ মানুষ ভাবে বুঝিবা সাধুর সাধনায় এ সমস্ত সিদ্ধ হচ্ছে। আসলে তা নয়, মনে ইচ্ছা থাকতে কিছুই হয় না। যোগীর শাম্ভবী মুদ্রার ফলে সকল অনিচ্ছাকৃত স্বতঃপ্রসূত সংকল্প মাত্রই বিনা চেষ্টাতেই সংঘটিত হয়। তার আগে অবশ্যই প্রপঞ্চভাব বিলুপ্ত হতে হবে। তবেই সৃষ্টির প্রতিটি মূর্ত্তিতে ভগবানের অবস্থান মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। দৃষ্টি এতদূর বিস্তৃত হওয়া দরকার হয়। এমনতর দর্শনের উপদেশ দেওয়াই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সঙ্কীর্ণ জীবচক্ষুতে এ দর্শন বা ধারণা কোনওটাই সম্ভব নয়। ঋষিরাও সঠিক ধারণা দিতে পারেন না। ভগবান তাই নিজে এই অব্যক্তের ধারণা দেওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ ভাবে তাঁর বিভূতি যেখানে প্রকটিত সেগুলো এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পাঠে পাঠক এ শ্লোকের তাৎপর্য্য আরও সম্যক উপলব্ধি করবেন ॥ ১০/১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ।। ২

অনুবাদ: দেবগণ আমার প্রভব (আবির্ভাব) অবগত নহেন। মহর্ষিগণও অবগত নহেন, যেহেতু আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি মূল ॥ ১০/২

ব্যাখ্যা: ভগবান এ বিশ্বেরও অতীত। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। আবার তাই বলে তিনি জগৎসম্বন্ধ রহিতও নন। যে সকল দেব ও মহর্ষিগণ দ্বারা জগৎ ব্যাপার চলছে, সেই তাঁরাও যে পরমতম ভগবান থেকেই সৃষ্ট ও সেই আদি দেবেরই বিভিন্ন রূপ। তাঁদের নিজেদের সত্তা, প্রকৃতি, কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদি সবই সেই পরমতম বিশ্বতীত সত্তা থেকেই আসছে। যদিও এ একই কথার বার বার পুনরাবৃত্তিতে বিষয়টা বোঝা একটু জটিল ও দুর্জ্ঞেয় হয়ে পড়ে। সেজন্য ভগবান বলছেন যে যাঁরা প্রকৃতই ভক্তিমান এবং নিয়মিত ভাবে ক্রিয়াযোগ সাধন করেন তাঁরাই দেবতা। তাঁদের কিছুটা শক্তি সামর্থ্যও আছে কিন্তু তাতে আসল কাজ কিছু হয় না। কারণ তাতে আমাকে বোঝা যায় না। এজন্য যাঁরা মহর্ষি তাঁরাও আমাকে জানেন না। “আমি” এতই দুর্জ্ঞেয়, সর্ব্বউপাধিমুক্ত, আমাকে যে জানবে তাঁরও আর কোনও উপাধি থাকে না, সেও তাইই হয়ে যায়। সব কিছু ভুলে যে সেই একমাত্র আত্মাই না হতে পারে সে কখনও আত্মার বিষয় বা তার মহিমা জানতে পারেনা। আবার যে আত্মা হয়ে গেছে সেও আত্মার বিষয়ে কিছুই বলতে পারেনা মানে নিজের বিষয়ে কিছু বলতে পারেনা, কারণ তখন আর তার কোনও বক্তব্য থাকে না। এজন্যই দেবতা ও মহর্ষিগণ সম্বন্ধে ভগবান এমন কথা বলেছেন যে তাঁরাও জানেন না। তুলসীদাসের ভাষায় “জনত তুমহে, তুমহী হোই যাই” – মানে হল তোমাকে যে জানে সে তুমিই হয়ে যায়। বেদেও আছে এমন কথা “কো বা বেদ, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব” – অর্থাৎ এই সৃষ্টি কোথা থেকে হোল কেই বা জানে ? দেবতাগণও এই সৃষ্টির পরে, সুতরাং ওটা যেখান থেকে আবির্ভূত হল (ফুটে উঠল) কি ভাবে তাকে জানবে ? তাই বলি কূটস্থচৈতন্য এবং প্রাণ, মন, বুদ্ধি এ সবই সেই অব্যক্ত পরাবস্থা থেকেই এসেছে সুতরাং এঁরা (দেবতা ও মহর্ষিগণ) কেউই তাঁর (আত্মার) কারণ জানেন না। এটাই তাঁর দুর্জ্ঞেয়ত্ব, এ জন্যই তিনি দুর্জ্ঞেয়। প্রভব অর্থে তাঁর বিভূতি রূপে উৎপত্তি, যা তিনি বিশেষভাবে হয়েছেন সেটাই বোঝায়। যেটা দেবতা ও মহর্ষিগণের পরমতত্ত্ব সন্নিকর্ষ্য অনেক বেশি হওয়ায় তাদের পক্ষে জানাই সম্ভব ছিল কিন্তু তবু তাঁরা এজন্যই জানেন না কারণ সবই সেই অব্যক্ত পরাবস্থা থেকে সমুদ্ভূত। আর এ অবস্থাই হল আদি। তাই তিনি দেবতা ও মহর্ষিগণেরও আদি। কাজের কারণটাই হল আদি কিন্তু কাজ তার কারণটা যেমন জানতে পারেনা তেমনি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি বলে তাঁরাও তাঁকে জানতে পারেন না। এভাবে তাঁর আদিত্ব উল্লেখের কারণটা পরে বলবেন এর পরের শ্লোকে ॥ ১০/২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।। ৩

অনুবাদ : যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও লোকসমূহের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মনুষ্যলোকে মোহ-রহিত হয়ে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ১০/৩

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে তাঁকে কেউই জানেনা কারণ তিনি দেবতা ও মহর্ষিগণেরও আদি। অর্থাৎ এই যে সব প্রজাপতি, দেবতা, ঋষি সবই তাঁর থেকেই নানা ক্রিয়ায়

অবতীর্ন হয়েছেন। তাঁদের নিজেদের প্রকৃতি, শক্তি ও কার্য্যপ্রণালী সবরকমেই সেই অনির্ব্বচনীয় পরমতম বিশ্বাতীত আদি সত্তা থেকেই আসছে। সুতরাং তিনিই অনাদি, যাঁর আদি নেই, তিনিই অজ যেহেতু তাঁর থেকেই সব কিছু জাত হয়েছে। জ্ঞানস্বরূপের এই অজত্ব ও অনাদিত্বই তাঁর সর্ব্বাত্মত্ব। আর এই সর্ব্বাত্মত্বের উপলব্ধি থেকেই তাঁর লোকমহেশ্বরত্ব জানা যায়। সর্ব্বভূতেই সেই জ্ঞানস্বরূপ মহেশ্বর এটা দেখেই জীব অসংমূঢ় হয়। অসংমূঢ় হলেই মর্ত্যের সকল পাপ দূর হয়। মানে মর্ত্য দর্শনজাত যত সংস্কার আছে সে সব বদ্ধমূল সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়। বৈষয়িক জড়বাদী তত্ত্বগুলোর নাশ হলেই ভোগসকলও মৃতবৎ প্রত্যক্ষ হয়। আত্মা দেহেতে থেকে জন্মমৃত্যুর অভিনয় করেন। তাই যতক্ষণ নিজেকে দেহ মনে করা যায় ততক্ষণ জন্ম মরণের হাত থেকে রেহাই নেই। কিন্তু ক্রিয়া করে দেহাতীত অবিচল ভাবটার সন্ধান পেলেই বোঝা যায় যে এই স্থির অবিচল ভাবটাই আমার স্বরূপ। ব্যস্ এটুকু হলেই হল। তখন আর এ মর্ত্যধর্ম্ম জন্মমরণ এসব থাকে না। সাধন করতে করতে শ্বাস যখন সহজে সুন্দরভাবে স্থির হয়ে আসে তখনই হয় সেই কালাতীত মহেশ্বরভাব, পরমহংস। তখনই নিজের আত্মাকে লোকমহেশ্বর বা তুরীয়ব্রহ্মরূপে অনুভব করে। এভাবে জানাই প্রকৃত জানা। এভাবে যে জানবে সে ফুরিয়ে যাবে নির্ব্বাণে মানে যিনি বেত্তা তাঁতে। সুতরাং তাঁকে আর জানবে কে ? কেননা এ বৈষয়িক জগতে, বৈষয়িকভাবে থেকে তাঁকে সমগ্র জানতে পারেনা। পুরোপুরি জানতে হলেই সে আত্মতত্ত্বে পৌছায় এবং রোদ উঠলে কুয়াশার মত জীবত্বও তার অন্তর্হিত হতে থাকে, মানে চঞ্চলতা পালিয়ে স্থির ঘরে পৌছায়। চঞ্চল প্রাণই মহামায়া, আর স্থির প্রাণই মহাবিদ্যা। যদিও বহিঃপ্রাণে যা দেখি সেও সেই বিশ্বেশ্বরেরই স্থূল মূর্ত্তি। অজ, অনাদি আত্মাকেই সর্ব্বলোকমহেশ্বর উপলব্ধি হলে তবেই এমনতর অবাধভাবে দেখা সম্ভব। নইলে প্রজ্ঞামাত্রায় উপলব্ধি (theoritically) করে ভৌতিক বিশ্বপ্রকাশটা যদি প্রজ্ঞাবহির্ভূত আবরণের মত থাকে তবে তার লোকমহেশ্বরত্বের বোধ আসেনি বুঝতে হবে। বুঝবে সে জড়ত্বে বিশ্বাসী হয়েও শোনা বা বই পড়া কথা বলছে যেমনটা আজকাল প্রায়ই দেখা ও শোনা যায়। প্রাণই চরাচর বিশ্বের মালিক। প্রাণহীন দেহের আদর নেই। প্রকৃত ভালবাসা তাই দেহের ভালবাসা নয় প্রাণের ভালবাসা। জড়বাদী কিন্তু নিছক সুন্দর দেহটাকেই ভালবাসে। তাই সুন্দরী রূপসীদেরও বিয়েতে বাজারদর বেশি হয়। ভোগবাদী সমাজে এ জন্যই রূপের বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে থাকে, কিন্তু আসলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কিছু নেই। তাই সেই প্রাণকেই আদর কর ও ভালবাস। প্রাণকে স্থির করতে না পারলে হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে দেহকেই ভালবাসবে যা হল রূপজ মোহ যাকে বলি নামরূপকে ভালবাসা। তোমার ভালবাসা এমনটা হলেই তুমি ঠকবে ও ঠকাবে নিশ্চয়, কারণ "রূপ কখনও সমান নাহি রয়"। আর প্রাণকে স্থির করতে পারলেই কালাতীত মহেশ্বরভাবে পৌঁছে গেলেই প্রাণকে ভালবাসতে পারবে, যেটা প্রকৃত ভালবাসা, যার স্বাদ ও আনন্দই আলাদা। তখন মনুষ্যদেহে থাকলেও তুমি চির আনন্দময় ও মুক্ত। এ বিজ্ঞানটা জানার জন্যই এই শ্লোকে অজ, অনাদি আত্মাই যে সর্ব্বলোকমহেশ্বর এটা বললেন এবং সে অবস্থাটার উপলব্ধি লক্ষ্য করেই পুরো বিভূতিযোগের বর্ণনা ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্যস্বরূপ সেই অজ, অনাদি ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকেই লোকমহেশ্বর বলে দেখার কথা বলেছেন। পরবর্ত্তী তিনটে শ্লোকেও ভগবান তাঁর এই লোকমহেশ্বরতাকেই আরও পরিস্ফুট করে তুলেছেন ॥ ১০/৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ।। ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ।। ৫

অনুবাদ: বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ (ব্যাকুলভাব), ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অপযশ প্রাণীগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে ॥ ১০/৪-৫

ব্যাখ্যা: প্রকৃতির সকল খেলাই ভগবান হতে উদ্ভূত। শুধুই ভাল ভাল সাত্ত্বিক দিব্য ভাবগুলোই ভগবান থেকে উৎপন্ন হয় তা নয়। যেগুলো মানুষের চিত্তকে বিমূঢ় করে থাকে তেমন সব সুখ, দুঃখ, ভয়, অভয় ইত্যাদি সমস্তই তাঁর থেকেই এসেছে। তবে হ্যাঁ, তিনি এসমস্তর দ্বারা বদ্ধ নন। প্রকৃতির অতীত হয়েই তিনি প্রকৃত জীবনের সাথে নিবিড় ও অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছেন। ঈশ্বর, পথপ্রদর্শক, গুরু, আশ্রয়দাতা, সুহৃদ, প্রেমিক ইত্যাদি বিভিন্নরূপে সবাইকেই আপাতদৃশ্যে দুঃখ, শোক, পাপ ও অশুভের ভিতর দিয়ে এক পরম জ্যোতি, আনন্দ ও অমৃতত্ত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এজন্যে তাঁর বিভূতিগুলোকে তিনি অধ্যত্মবিভূতি ও অধিদৈববিভূতি এই দুটো পর্য্যায়ে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন যে আত্মারূপ ব্রহ্ম থেকেই সঞ্জাত হয় অধ্যাত্ম ও অধিদৈব সকল। এ অধ্যত্মে ও অধিদৈবে তোমার আত্মাই বিস্তৃত ও বিভূতিময়, অতএব তুমিই এ সমস্তের ভোক্তা হতে পার। অধ্যাত্মে আত্মস্বরূপ দর্শন হলে বোঝা যায় যে অধিদৈবে সমস্তকিছু সেই আত্মারই বিভূতি। এটা বুঝতে পারলেই আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। আত্মার এমন সর্ব্বব্যপকত্বই তাঁর ভূমা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, আত্মাই মহেশ্বর। অধ্যাত্মে আত্মার মহেশ্বরত্বই হল – শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুদ্ধি মানে অন্তঃকরণের যে শক্তি দিয়ে কোনও বিষয় নিশ্চয়রূপে বুঝতে পারি সেটাই বুদ্ধি বা সর্ব্ববোধশক্তি, সারাসার বিবেকনৈপুণ্য ও মনের একাগ্র অবস্থা যা একমুখী (unidirectional) সেজন্যই অনেকটা নিরুদ্ধ অবস্থার জ্ঞাপক। এজন্যই মনের গতি ব্রহ্মমুখী হলে সেখানেই নিরুদ্ধ বা স্থির হয় ও ব্রহ্মের সাথে লীন হলে তাকেই প্রকৃত বুদ্ধি বলে।

আর জ্ঞান মানেই হল আত্মবিষয়ক জ্ঞান, আত্মবোধশক্তি। বুদ্ধি স্থির হয়ে গেলেই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। এমনভাবে বুদ্ধিকে স্থির করতে হলে মনের আক্ষেপ বিক্ষেপ ও আবরণরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় করতে হয়। কি ভাবে এই অশুদ্ধি ক্ষয় হবে ? পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে – "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ" (সাধনপাদ) অর্থ হল যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে অশুদ্ধি ক্ষয় হয় ও অশুদ্ধিক্ষয় হলে বিবেকখ্যতি পর্য্যন্ত জ্ঞান দীপ্তি হয়ে থাকে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগাঙ্গ হল প্রাণায়াম। এই যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ " এটাই প্রণায়ামের ফল। যোগসূত্রে আছে একথা। অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা প্রকাশস্বরূপ আত্মার আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রধান শক্তি প্রাণশক্তিকে এভাবে প্রাণায়ামদ্বারাই বুঝতে পারা যায়, এবং আত্মাতেই প্রাণ মন প্রতিষ্ঠালাভ করে, ফলে মায়াপ্রপঞ্চ আর মুগ্ধ করতে পারেনা। আর করলেও " কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥" এভাবে তখন মনোবিকার জন্মালেও যেভাবে চিত্তের বেগ সহ্য করে তা থেকে নিবৃত্তিলাভ হয় সেটাই প্রকৃত "ক্ষমা"। ইন্দ্রিয়েরা স্বতঃই নিবৃত্ত হয় বলে শম, দমাদিও স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। এছাড়া অসংমোহ মানে দীপ্তপ্রজ্ঞতা, সুখ, দুঃখ মানে মনের অনুকূল ও প্রতিকূল সংবেদন, ভব – উদ্ভব, অভাব – তার বিপরীত মানে নাশ, অহিংসা – পরপীড়া নিবৃত্তি, সমতা সমচিত্ততা, তুষ্টি – লাভে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি, তপঃ – শারীর তপস্যা, দানং – যথাশক্তি ধন বিতরণ, যশ – সৎকীর্ত্তি, অযশ – দুষ্কীর্ত্তি, এ সমস্ত যত রকম বুদ্ধি ও অবুদ্ধি (বিপরীত বুদ্ধি) ইত্যাদি নানাবিধ ভাব সবই আত্মা হতেই পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ পায়। আত্মা না থাকলে কিছুই থাকে না। অতএব এসমস্ত তোমার আত্মারই পৃথক পৃথক বিভূতি বলে দর্শন করে আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হও, তাহলে আর অমন পৃথক পৃথক বোধ থাকবে না। সমস্ত বৃত্তিই মায়ার খেলা মাত্র। চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তির সাথে সাথেই সব নিবৃত্ত হয়ে যাবে। এই হল ভগবানের সংক্ষেপে অধ্যাত্ম বিভূতির বর্ণনা। পরের শ্লোকে দেখুন অধিদৈব বিভূতি ॥ ১০/৪-৫

> মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
> মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ।।৬

অনুভব : ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু – ইহারা সকলে আমার প্রভাববিশিষ্ট এবং হিরণ্যগর্ভ রূপ আমারই সংকল্পমাত্র হইতে জাত, জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সমুদয় ব্রাহ্মণাদি যাঁহাদের সন্ততি ॥ ১০/৬

ব্যাখ্যা: এবার অধিদৈব বিভূতি সংক্ষেপে প্রকাশ করছেন। যে ভাগবৎ প্রজ্ঞা নিজের অনন্ত চৈতন্য হতে সমস্ত জিনিষ বিকাশ করেছে, সপ্ত প্রাচীন ঋষি তারই সাতটি ধীশক্তি যা হল বেদের সপ্ত ধিয়ঃ। এঁরাই সকলকে ধরে রয়েছেন, জ্ঞানের আলো দিচ্ছেন ও অভিব্যক্ত করছেন। তাঁদের সাথে

আছেন চার মনু। মানবের পিতা। জ্ঞান, শক্তি, সুসঙ্গতি ও কর্ম্ম – ভাগবত প্রকৃতির এ চারটি দিক মানব জাতির মধ্যেই অভিব্যক্ত। সাত প্রাচীন ঋষি হলেন ভৃগু, মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত ও ক্রতু। বেদেও সপ্ত ধিয়ঃ হল এঁদেরই সপ্ত ধীশক্তির প্রতীক, যে ধীশক্তি সকল মনীষায় ধৃত, আলোকিত ও অভিব্যক্ত। পূর্ব্ববর্ত্তী চারজন মহর্ষি হলেন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ কুমার (চতুঃ"স' কার) চিরকুমার থাকায় এদের পুত্রাদি ছিল না। পাঠক হয়ত বলবেন, তবে ভগবান এঁদের সম্বন্ধে "যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ" বললেন কেন ? উত্তর হল জ্ঞানের ধারাটা শিষ্য পরম্পরায় চলে, পুত্র পরম্পরায় নয়। সারা পৃথিবীতেই এটা প্রযোজ্য প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু করে বর্তমান ভারত পর্য্যন্ত একই কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শিক্ষাবিদ হন নাই, রবীন্দ্রনাথের পুত্রও কবি ছিলেন না বা রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘজীবিও হন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি কুলের আদর্শ ও প্রেরণা। সক্রেটিস্, প্লেটো ও এরিস্টটল হলেন গ্রীসের শিষ্য পরম্পরা। এমনইভাবে বৈদিক জ্ঞানধারায় কুলও শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারাই রক্ষিত হত। এই ভৃগু আদি সপ্তঋষি ও সনকাদি চারজন ঋষি এঁরা হিরণ্যগর্ভের মানসপুত্র রূপে জাত। চতুর্দশ মনু হলেন সায়ম্ভুব, স্বারেচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্নি, দক্ষসাবর্নি, ব্রক্ষসাবর্নি, ধর্ম্মসাবর্নি, রুদ্রসাবর্নি, দেবসাবর্নি, ও ইন্দ্রসাবর্নি। এঁরাও সব ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি এবং বর্তমান জীবকুল এই সকল প্রজাপতি থেকে জাত। তাই ভগবান বললেন ভৃগু আদি সপ্তমহর্ষি, সনকাদি চারজন মহর্ষি ও স্বয়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু, এই লোকে সকলেই যাঁদের প্রজা বা সৃষ্টি তাঁরা সব আমারই প্রভবজাত, আমারই সংকল্পে উৎপন্ন। সুতরাং বিশ্বপ্রকাশ আমারই বিভূতির প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার সংকল্প নেই। তাঁর অনিচ্ছার ইচ্ছাতে এসকল উৎপন্ন হয়েছে। অনিচ্ছার ইচ্ছাটা আবার কি ? আসক্তিবশতঃ মনে যে সংকল্পের উদয় হয় তেমন কোনও সংকল্পই থাকে না। অথচ যে অবস্থায় কখনও কখনও আপনা থেকেই কেমন একটা সংকল্প বিকল্পশূন্য ভাবের উদয় হয় যেটাকেই ভগবদিচ্ছা বলা হয়। এমন ভগবদিচ্ছাই হল অনিচ্ছার ইচ্ছা। যেটা কখনও অসিদ্ধ থাকেনা। ব্রহ্মহতে এভাবেই বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়ে থাকে। কারণ সেটাই একমাত্র সত্যসংকল্প একথা মুণ্ডকোপনিষদেও আছে। "যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥" যেমন পুরুষের (কোনও রকম ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছাড়াই) কেশ ও লোমসকল উৎপন্ন হয় সেইরূপ এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগৎ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার সেই মুণ্ডকোপনিষদেই তারপর দেখুন – "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপময়ঞ্চ জায়তে" –– যার অর্থ হল – এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্য ব্রহ্ম নামরূপ ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের অমন সংকল্প থেকেই আদি বা সমষ্টি মন হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন এবং তার থেকেই এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলতে থাকে। মন না থাকলে সৃষ্টি করে কে ? এক মনেই কত কিছু উদয় হয় তেমনিই যে বিরাট মনের সংকল্প থেকে এ ব্রহ্মাণ্ড; তাতে অবস্থিত জীবকুল ও তাদের খাদ্য পানীয় সকলই উৎপন্ন হয়। যদিও সে অক্ষর পুরুষ

নিরাবয়ব, নিরাকার অথচ স্বপ্রকাশ, জ্ঞানরূপে বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে বুদ্ধির বাইরেও থাকেন, নিস্প্রাণ, নির্মন, শুভ্র শুদ্ধভাবময়, অক্ষররূপা অব্যক্ত প্রকৃতিরও অতীত। কবি কালিদাসের সর্ব্বসম্বন্ধ বিবর্জিতশুদ্ধজ্ঞানরূপা শুভ্রজ্যোতি সপ্তঋষির কল্পনাও এই মুণ্ডকোপনিষদ অংশের অবলম্বনে হলেও হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য এটা আমার নিছক অনুমান, কোনও অনুসন্ধান নেই এর মূলে। সব শেষে বলি যে সরস্বতীর কথা বলা হল এগুলো প্রাণেরই উপাধি যার প্রমান হল ছান্দোগ্য উপনিষদ দ্বিতীয় খণ্ড। আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল রূপ সাত নক্ষত্র সহ আরও বহুবিধ নক্ষত্র সকল জীবের কূটস্থরূপ হৃদয় আকাশেও আছে যা অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনযোগে নিজের শরীরেই কূটস্থে দেখেছিলেন। যা আবার সপ্তবায়ুরূপে দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত ৭Ï৭ = ৪৯ বায়ুর একত্রীভূত রূপ, মানে ৭ বায়ুর ক্রিয়া যোগের দ্বারা ৪৯ বায়ুর প্রকাশ হয়। সপ্ত বায়ু হলেন : ১/ প্রবাহ (প্রাণ), ২/ সংবহ (অপান), ৩/ বিবহ (সমান), ৪/ উদ্বহ(ব্যান), ৫/ আবহ (উদান), ৬/পরিবহ (গান্ধারী নাড়ীস্থ স্থির বায়ু) এবং ৭ পরাবহ (হস্তিনী নাড়ীস্থ স্থির বায়ু) সাত ও সাত (৭Ï৭ = ৪৯) আলাদা কার্য্যকারিতার জন্য, যা প্রাণ থেকেই উৎপন্ন হয় তাই মহৎ + ঋষি = মহর্ষি। প্রাণের চেয়ে মহৎ আর কি আছে ? প্রাণই মহর্ষি। মনরূপ মনু দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে চার যুগেই উৎপন্ন হন বলে "চত্বার মনবঃ"। সত্ত্ব, রজ, তমঃ এবং রক্তস্তম এই চার গুণে, চার যুগে, চারি মন। যা বর্তমান মনে প্রকাশ পেয়ে সন্তান বিস্তাররূপ মানসেতে ব্যক্ত লোকসৃষ্টির প্রকাশ। মানে হল ৭ থেকে ৪৯ বায়ু বিস্তৃত হয়ে লোকসৃষ্টি হচ্ছে এবং মনের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এসমস্ত বোধ হচ্ছে। এসব প্রজারূপ সন্তান মানে মনের ভাব থেকে উদ্ভূত এ সবই স্থির প্রাণরূপ আত্মারই বিভূতি ॥ ১০/৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।। ৭

অনুবাদ: যিনি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা আমার এই বিভূতি এবং যোগ(ঐশ্বর্য্যলক্ষণ) জানেন, তিনি অচল সমাধিতে যুক্ত হন (আমি আমার রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন), ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০/৭

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের তাৎপর্য্য মানে ৪৯ বায়ুর প্রকাশরূপ বিভূতির যে অবস্থা সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফল এই শ্লোকে ভগবান বলছেন যে এই যোগের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি জানেন তাঁর প্রাণ মনের সকল চঞ্চলতা ও সংশয় দূর হয়। তিনি সর্বদা ভগবানের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখেন। সবরকম জাগতিক কর্ম্মসকল করেও তিনি ভগবানের এই নিবিড় মিলন থেকে আলাদা হন না। প্রাণের তত্ত্ব বিশেষভাবে জেনে ঐ প্রাণকে স্থির অচলরূপে স্থির করে স্থির সাম্যাবস্থা রূপ সমাধিতে অবস্থিত হন মানে আমিহারা ভাবরূপ সমাধি পেয়ে থাকেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। এ আমি হারাভাব সত্যিই খুব আনন্দদায়ক। পঞ্চতত্ত্ব ভেদ করে আজ্ঞাচক্রে স্থিত হলে তবেই প্রকৃত ইচ্ছারহিত ও সংশয়শূন্য অবস্থাটা আসে। তখনই মন অন্য বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়ে শুধুই আত্মাতে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। প্রথম শ্লোকে যে শাম্ভবী মুদ্রার কথা বলা আছে এটাই সে অবস্থা। প্রকৃত অভ্যাসকারীর খেচরীসিদ্ধির পরেও দৃঢ়তা অবলম্বন করে সাধনে লেগে থাকলে এমন অবস্থাটা পাওয়া যায়, এটাই শাম্ভবী। সাধনদ্বারা যতই বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায় ততই সংশয়হীন হওয়া যায় ও অননুভূত অভূতপূর্ব্ব সূক্ষ্ম বিষয়সকল প্রত্যক্ষ হতে থাকে ও অদ্ভুত সেই বোধ জন্মে। আত্মার এই বোধ, এই অনুভব প্রত্যক্ষাবগম, অব্যাহত, অবাধ, মহৎ হতেও মহীয়ান্, সীমারেখাশূন্য, অপার। তাই ভগবান বলছেন তাঁর অধ্যাত্মভূমি থেকে অধিদৈবভূমি পর্যন্ত এ বিস্তার যতটা পরিমাণ তোমার উপলব্ধিতে আসবে, জ্ঞানদৃষ্টি যতদূর প্রসারিত হয়ে তাঁর দৃষ্টির সন্ধান পাবে, যতদূর পর্য্যন্ত সকল বিভূতির আড়ালে আমাকেই দেখতে পাবে, ততদূর পর্য্যন্ত পাবে তুমি আমার ভোগে অধিকার, ততটাই হবে তুমি এই ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের অনুভোক্তা, মুক্তপুরুষ ও আপ্তকাম। যেহেতু আমার সীমা নেই তাই তোমারও এ ভোগ হবে অসীম। এমনি ভাবে তত্ত্বতঃ আমার বিভূতি দেখতে সক্ষম হলে তবেই তখন থেকে আমার সাথে যুক্ত থাকাটা হয়ে দাঁড়াবে তোমার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। আর কষ্ট করতে হবে না, খাটতে হবে না। তখন আমি ছাড়া কাউকেই দেখবে না। তখন তুমি আমারই মত অণুর মধ্যে অসীম হবে। তোমার আমার প্রভেদও ঘুচে যাবে চিরতরে। অধ্যাত্মে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির সার্থকতার আসল পরীক্ষাই এখানে। মুক্তপুরুষ সংসার ও কাজকর্ম্ম ফেলে নির্জনে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকবেন এটা গীতার শিক্ষা নয় মোটেই। ভগবান বিশ্বের অতীত হয়েও বিশ্বের সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রয়েছেন। নিজের প্রকৃতির পরিণতিরূপে সকলকে নিজের মধ্যে ধরে রেখেছেন। এটাই ভগবানের ঐশ্বরযোগ বা বিভূতি। এই বিভূতিরূপী বিজ্ঞানটার মূল সূত্রটা হল আত্মার অঙ্গে স্থূলবিশ্ব স্থূলমূর্ত্তিতে, স্থূলভোগে যতদিন না দেখবে, অধ্যাত্মে জ্ঞানমাত্রার রচিত বিশ্বদর্শন ততদিন হবে না। ব্রহ্মতত্ত্বে অবগাহনের অর্থই হল ব্রহ্মবিভুতিতে বিভূতিময় হওয়া এবং বিভূতিময় হয়েও তার অন্তরে নিস্ফলস্বরূপে অবস্থান করা। এই নিস্ফল স্বরূপটা একসঙ্গে বিভূতিস্বরূপের সাথে উপলব্ধি না হলেই তুমি হলে জীব আর একই সাথে প্রকাশিত হলেই হল শিব। সেই এক আত্মাই হন পরমেশ্বর, আপ্তকাম, নিত্যপুরুষ। এভাবে যে প্রাণের তত্ত্ব বিশেষভাবে জেনে প্রাণকে অচলরূপে স্থির করতে পারে তারই হয় স্থিরতারূপ সাম্য বা সমাধি ও স্বরূপের অনুভব। এই বিভূতিই ভগবানের অতুলনীয় মহত্ব ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ॥ ১০/৭

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ।। ৮

অনুবাদ : আমি সমুদয় জগতের উৎপত্তি – হেতু এবং আমা হইতে সমুদয় প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা সম্যক অবগত হইয়া বিবেকীগণ আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ১০/৮

ব্যাখ্যা: বিভূতি এবং যোগের জ্ঞানসম্ভূত সেই অবিকল্প যোগজ্ঞান প্রাপ্তির কথাই ভগবান এই চারটি শ্লোকে বলছেন। অধ্যাত্মে ও অধিদৈবে যা দেখা যায় সকলই আমার বিভূতি, যা কিছুই সেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সবই আমার প্রভব, আমা হতে জাত ও প্রবর্ত্তিত। যা কিছু হৃদয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবই আমা হতেই বৃত্তিময় হয়েছে। বিজ্ঞ পুরুষগণ এমন ভাবে ভাবসমন্বিত হয়েই আমার উপাসনা করতে করতেই সাধনার দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী স্তরে প্রবেশ করেন। যা ছিল এতদিন শুধুমাত্র যুক্তিসিদ্ধ অথবা অনুমানসিদ্ধ বা শুধুমাত্র জ্ঞাত সেটাকে তত্ত্বতঃ জানার পথে এগিয়ে চলেন এবং যিনি যেমন সাধন করেন পরমতত্ত্বে তাঁর তেমনটাই অভিনিবেশ হয়। এমন সংহত অভিনিবেশসম্পন্ন যোগীরই প্রত্যক্ষ অনুভবে আত্মাই হয় স্থাবরান্ত সমুদয় বিশ্বের হেতু। “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।” জগতে যা কিছু, যতকিছু সবই সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সোনার গয়না বলতে হার, বালা, চুড়ি, চূড়, বাউটি, ব্রেসলেট, আর্মলেট যত যাই গড় সকলই সেই সোনা দিয়েই গড়া, শুধু নাম আর ডিজাইনের তফাৎটুকু। সোনা না থাকলে কোনও গয়নাই থাকে না। তেমনই আত্মা না থাকলে কিছুই থাকেনা। এটা বুঝতে পারলেই অন্য চিন্তা ছেড়ে শুধুই আত্মার ভজনা করেন অর্থাৎ শুধু ক্রিয়াতেই যুক্ত থাকেন। আর নানা বিষয়ের পিছনে ছুটতে ইচ্ছা হয়না। প্রথমে ভালমত ধারণা কর ভগবান কোনও স্বপ্ন বা মায়া নন অথবা তিনি কোনও শূন্য বা অলীক কিছু থেকে জগৎ সৃষ্টিও করেন নি। সবই নিজ মধ্য হতে সৃষ্টি করেন ও নিজেই সব হন। সকল বস্তুই তাঁরই সত্তা থেকে এসেছে, তাঁতেই বিধৃত রয়েছে। এই সমগ্র জ্ঞানটা প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা জানা যায়। পরে হৃদয়ের অধ্যাত্ম অনুভূতিতে, ভাবে পরিণত হয়। হৃদয় মনের এমন পরিবর্তন থেকেই সমগ্র প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর আরম্ভ হয়। ১০/৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।। ৯

অনুবাদ: যাঁহাদের চিত্ত কেবল আমাতেই রত, যাঁহাদের প্রাণ কেবল আমাতেই অর্পিত, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সদা আমার কথা কীর্তন করিয়া, সন্তোষ এবং শান্তি প্রাপ্ত হন। ১০/৯

ব্যাখ্যা: ভগবানের প্রীতিপূর্ব্বক সাধনরীতি। সেটা কেমন ? আগে অনুভব। কেমন অনুভব ? আগের আগের শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে সেই ভাবে ভগবানকেই বিশ্বের উর্দ্ধে এবং সর্বত্র বিরাজমান দেখে তাঁর মহিমা, সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতায় এমন গভীর প্রীতির অনুভব হয় যে সংসারের সাধারণ সুখদুঃখ সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রাণ, মন, হৃদয় এক দিব্য আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে, জীবনের সমস্ত ব্যাপার ভগবানের সাথে একান্ত প্রেমলীলায় পরিণত হয়। এটা হল সাধনার দ্বিতীয় স্তরের কথা। প্রথম স্তরে অনুমান ও যুক্তিসিদ্ধ স্তরের কথাই থাকে। দ্বিতীয় স্তরে “মচ্চিত্তা মদ্গাত প্রাণা” বলতে ‘মন’ ও‘হৃদয়’ এই গ্রন্থি দুটোর কথাই বলা হল। আর “বোধয়ন্তঃ” শব্দের দ্বারা আত্মার বা আত্মবোধের তন্ময়তা প্রাপ্তির কথা বলা হল। তাহলে মনোগ্রন্থি, প্রাণগ্রন্থি ও সংস্কারময় আত্মগ্রন্থি এই তিন স্তরেই ভগবানকে আয়তনময় করে নিয়ে নিজেদেরও ভগবন্ময় হয়ে গিয়ে বহির্জগতেও ভগবৎ কথায় বিভোর থাকার কথা বলা হল। কিন্তু এ তো আর সে দ্বাপর যুগ নয়, ঘোর কলিযুগ, যেখানে শুধুমাত্র জড়বাদেরই প্রাধান্য। এমন পরিস্থিতি বুঝেই বোধকরি শ্রীচৈতন্যদেব আপামর জনগণের জন্য শুধুই নামকীর্ত্তনের বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শুধু নামকীর্ত্তনে আত্মবোধের কিছুই ঘটে না। গ্রন্থিভেদ না হলে যে কিছুই হবার নয়। গ্রন্থির কথা আগেই বলেছি। সবই দেহের মধ্যেই আছে। দেহের মধ্যেই তাঁর স্বরূপ জানার উপায়ও তিনিই দিয়ে রেখেছেন। সেটা কি ? এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরের মধ্যেই আর একটা শরীর আছে, যেটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাকে লিঙ্গশরীর বলে। যা সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। বস্তবাদীরা কেউই এ শরীরের খবরও রাখেনা। মৃত্যুর পর স্থূল শরীরের সাথে সাথেই তাই এই শরীরেরও শবদাহ হয়ে থাকে। সাধনশীল যোগীর এই শরীরের স্বার্থেই তাঁদের ভূগর্ভে বিশেষতঃ নদীতিরেই সমাধিস্থ করার প্রথা আছে। যাক সে সব অন্য কথা। পঞ্চদশীতে আছে “বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্ম ধিয়া। শরীরং সপ্ত দশাভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥” পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও বুদ্ধিসমেত সপ্তদশ পদার্থে গঠিত শরীরই লিঙ্গশরীর। যোগীরা এ শরীরকে প্রত্যক্ষভাবেই পেয়ে থাকেন। আর সাধারণ মানুষ জড়বাদী ও ইন্দ্রিয়রাম হওয়ায় এ শরীরের খোঁজও রাখেন না। তা না রাখুন ক্ষতি কিছু নেই। “জগৎ আনন্দময়। যে যেমনই আনন্দ পায় তেমনই রয়।” এই লিঙ্গ শরীরের শোধনই হল ভূতশুদ্ধি। যে ভূতশুদ্ধি না হলে কোনও রকম সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজা, এমনকি লৌকিক পূজা অর্চনাদি, দশকর্ম্মাদি কোনও কিছুই হতে পারেনা। জড় যুগের জড় পূজারী পুরোহিত সম্প্রদায় কি এমন কোনও লিঙ্গশরীরের খবর রাখেন ? ভূতশুদ্ধি করে থাকেন ? ভূতশুদ্ধি বিনা কোনও কাজই হয় না। কাজে ফাঁকি দিয়ে দক্ষিণা গ্রহণ তস্করের কাজ। পুরোহিত বলুন “ পৃথিবী তস্করভোগ্যা ”। আমিও তস্কর তাই ক্ষতিটা কি ? ক্ষতি আমারও নয়, যার হয়ে পূজা করে দক্ষিণা নিচ্ছেন সে গৃহস্থেরও ততটা নয় যতটা আপনার নিজের। সেটা নিজেই নিজের দিকে তাকালে, অবশ্য যদি দেখার মত চোখ থাকে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। যাক, আমরা আসল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে এসেছি। কথা হচ্ছিল “দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ” – মানে হল দেবতা হয়ে দেবতার পূজো করতে হয়। ভূতশুদ্ধির দ্বারাই পূজা অর্চনার অধিকার

জন্মে। ভূতশুদ্ধ হলে এ শরীরই দেবশরীরে পরিণত হয়। তখন দেব আরাধনা বা অপর দশকর্ম্মাদি ফলপ্রসূ হয়। রুদ্রযামলে এ বিষয়ে বলা আছে। যোগ বিনা মন্ত্র আর মন্ত্র বিনা যোগ সিদ্ধি হয় না। দুটোই অভ্যাস করতে হয়। যোগীকে তিনটে গ্রন্থিভেদ করতেই হয় ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি। প্রাণাপানের যোগদ্বারায় ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়, পরে বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রারে গমন করেন। এমনভাবে মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী শক্তিকে বার বার সহস্রারে চালনা মানে up down এর ক্রমদ্বারাই মনোলয় হয়ে থাকে। এটাকেই মন্ত্রশিখা বলে। এভাবে মন্ত্রশিখা জানতে পারলেই সকল মন্ত্রশক্তি প্রকাশিত হয়। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই তন্ত্রের কামকলা স্বরূপিনী – "সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলা স্বরূপিনী "। বৈষ্ণব শাস্ত্রের ইনিই রাধা – " রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার " ইনিই আবার গীতাতে " অপরা প্রকৃতি "। তন্ত্রের মহা প্রকৃতি। তাই এই পরমা দেবীর পূজো হলেই সর্ব্ব দেবদেবী পূজিত হন। গুরুপদিষ্ট সাধন দ্বারাই কুণ্ডলিনী আত্মাকারিত হয়ে থাকেন। তখনই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হয়ে যায়। যখন এ অবস্থা থেকে অবতরণ করেন তখন সম অবস্থার সাধকগণ এ অবস্থার কথা আলোচনায় পরমানন্দ ও তৃপ্তি বোধ করেন। এটাই "কথয়ন্তশ্চ" "বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ " কাদের ? যাঁরা "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা" হতে পেরেছেন তাঁদের। তাঁরাই এ অবস্থায় রমণ করে পরিতুষ্ট থাকেন। কেননা তখন তাঁদের চিত্ত সর্ব্বদাই আত্মমুখী আর প্রাণের টান সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখী হয়ে থাকে। পদ্মপাতায় জলের মত বিষয় আর তাঁকে লিপ্ত করতে পারেনা। ফলে অহরহঃ আত্মচর্চ্চায় নিযুক্ত থেকে শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেন ॥ ১০/৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।। ১০

অনুবাদ: সদা আমাতে অর্পিত চিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী, তাঁহাদিগকে আমি এতাদৃশ বুদ্ধিযোগ (জ্ঞান) প্রদান করি যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০/১০

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণ গুরু এবং অর্জুন শিষ্য একেবারে সত্যিই রাজযোটক। এমন গুরুদেবই বলতে পারেন যে আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারীকেই আমি আমার বুদ্ধিরূপ উপায় দিই। সেই বুদ্ধি কি ? যে উপায়ে আমার ভক্তরা আমায় পেয়ে থাকেন সেটাই বুদ্ধিযোগ। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করে বললেন মানুষ যখন নিত্যযুক্ত হয়ে তাঁকে ভজনা করে আর তাতেই হৃদয়ে আনন্দ পেতে শুরু করে তখন সে অপূর্ণ অবস্থাতেই অন্তরের সে ভক্তিভাবকে পূর্ণ বুদ্ধিযোগের দ্বারা দৃঢ় করে দেন, জ্ঞানের আলো জ্বেলে ইন্দ্রিয়বিমূঢ় মনের সংশয় অন্ধকার দূর করেন। ওটাই হল ভক্ত সাধকের অবিকল্প যোগপ্রাপ্তি যার ফলই হল অলৌকিক ঋতাম্ভরা প্রজ্ঞার প্রকাশ ও ভগবৎ লাভ। বুদ্ধিযোগ প্রাপ্তির যোগ্য করে তুলতে হয় নিজেকে, তবে নিজের অন্তরেই বুদ্ধি জন্মে। গুরুদেবে নির্বিকল্প ভক্তি হলেই এ অবিকল্প বুদ্ধিযোগ পাওয়া যায়। মধ্যস্তরীয় সাধনায়, যে সাধনায় সাধকের সাধ্য সারূপ্য প্রকাশ পায়, সেই চৈতন্যময় সাধনায় অধিকার এলেই অন্তরে প্রজ্ঞালোক দীপ্ত হয়ে ওঠে। সে আলোয় বিশ্বাসটা উদয়াস্ত বিহীন সূর্য্যের মত অন্ত রাকাশে উদ্ভাসিত থাকে। অনেক পরে শ্রীগুরুদেব যখন তাঁকে তৃতীয় ক্রিয়া দেন তখন সে অনুভব করে যে এ ব্যাপারটা তার হৃদয়ে পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রথমে সে নিজেকে ভগবানে জাত ও ভগবানে বিধৃত এমন উপলব্ধির সাথে সাথে একটা পৃথক ভাবসংস্কারে নিজের জৈব নিজত্বটাকে জাগিয়ে রাখে, কিন্তু তৃতীয় স্তরীয় ক্রিয়া গুরুর দ্বারা প্রাপ্ত হবার পর প্রজ্ঞালোক আরও প্রকাশবান, হলে তখন সে নিজেকে স্বপ্নের মত অবস্থার মধ্যে অনুভব করে। স্বপ্নদ্রষ্টার মত স্বপ্নে অভিভূত থাকে, স্বপ্নেই সব ভোগ করে, ভোগের পরিবর্তনে তার আর কর্তৃত্ব থাকে না। নিজেকে ভোক্তামাত্র বলে জানে। এর পর আপনা আপনিই ক্রিয়ার অভ্যাস নিজের অজান্তে বেড়ে যেতে থাকে, সাথে সাথে প্রজ্ঞালোকও প্রদীপ্ত হয়। তখন জলের উপর ছায়ার মত নিজেকে ব্রহ্মবক্ষে অনুভব করতে থাকে। জলের ঢেউ এর সাথে এক হয়, টুকরো হয়, বহু হয়, ভগবৎ শক্তির দ্বারা লীলায়মান হয়ে, ভগবৎ ছন্দে ছন্দোময়, ভাবে ভাবময়,গতিতে গতিময়, টুকরো টুকরো হয়েও আনন্দ, স্থূলে থেকেও আনন্দ, প্লাবনের মাঝেও আনন্দ, আবার স্থির আত্মস্থ ভাবেও সেই আনন্দ, সেই তৃপ্তি। যে ক্রিয়ার দ্বারা এত সুন্দর অবস্থা পাওয়া যায় সে ক্রিয়ার মত জিনিষ আর জগতে নেই। ক্রিয়ার প্রতি এমন বিশ্বাস থাকলে তবেই এমন অনন্য ভক্তিলাভ হয় ও বুদ্ধিযোগ প্রাপ্তি ঘটে। সচল বুদ্ধি থেকে পরে অচল বুদ্ধিযোগে পৌঁছালে পরে সে স্বপ্নাবস্থার জাড্য জড়তাটা আর পরে থাকেনা। অভিভূতও হতে হয় না। তখন পূর্ণ জাগ্রত অবস্থার ভোক্তা হয়ে ভগবৎ বিভূতিতে আপ্তকাম। এর পর কি হয় সেটা পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ১০/১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।। ১১

অনুবাদ: তাঁহাদের হিতার্থেই আমি তাঁহাদের বুদ্ধি বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞান জাত অন্ধকার নাশ করি ॥ ১০/১১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বর্ণিত আমাতে অর্পিতচিত্ত ব্যক্তিগণ সতত আত্মধ্যানেই রত থাকেন বলে তাঁদের দেহে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি প্রকাশ পায়, এটাই হল অবিকল্প বুদ্ধিযোগের ফল। বুদ্ধিযোগ প্রধান হলেও বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবান বলছেন যে তিনি সেই বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত হয়ে অবিদ্যাকৃত সংসার নাশ করেন। পাঠক এখানে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন কোথায় থেকে, কোন সাধনের দ্বারা ভগবান অজ্ঞান নাশ করেন ? ভগবান বলছেন তাঁদের আত্মভাবে অবস্থিত আমি তখন পরমাত্মজ্ঞানস্বরূপ ভাস্বর প্রদীপ জ্বেলে দিই, তাঁদের আত্মবোধকে পরমাত্মবোধে পর্য্যবসিত

করি। শঙ্করভাষ্য দেখুন– জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন মদ্ভাবনাভিনিবেশবাতেরিতেন ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্ত্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয় ব্যবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষাকলুষিতনিবাতাপবারকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্রধ্যানজনিত সম্যগ্দর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেন ইত্যর্থঃ" – মানে হল, "অন্তঃকরণাশয়স্থিত হইয়া মিথ্যা জ্ঞানরূপ তমঃ বিনিষ্ট করিয়া থাকি।" তাহলে কিসের দ্বারা নষ্ট করি ? জ্ঞানদীপের দ্বারা। সে জ্ঞানদীপটা আবার কেমন ? "ভক্তিজনিত চিত্তের প্রসাদরূপ তৈলের দ্বারা সেই বিবেকবোধরূপ জ্ঞানদীপ অভিষিক্ত ঈশ্বর ভাবনাভিনিবেশরূপ বায়ুর দ্বারা প্রথমে প্রজ্বলিত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসংস্কার সহ মিলিত প্রজ্ঞাই সেই দীপের বর্ত্তি, বিরক্ত অন্তঃকরণই সেই দীপের আধার, রাগ ও দ্বেষের উদয়ে যাহা কলুষিত হয় না, সেই বিষয় চিন্তাবিহীন চিত্তরূপ যে আবৃত গৃহ, তাহাতেই সেই দীপ নিষ্কম্প ভাবে জ্বলিতে থাকে। সর্ব্বদা বিদ্যমান যে একাগ্রতা ও ধ্যান এবং তজ্জনিত সম্যক দর্শনরূপ প্রভাদ্বারা সেই জ্ঞানদীপ সর্ব্বদা উদ্ভাসিত, এইরূপ দীপ্তিময় জ্ঞানদীপের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকারকে আমি নষ্ট করিয়া থাকি।" (শঙ্করভাষ্যর বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে ব্যাখ্যাত)

যাঁরা নিয়মিত ক্রিয়া করে থাকেন তাঁদের সকল জীবায়তন ভেঙ্গে ছুটে যায় সে ছায়াময় পুরুষ। যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট, বদ্ধ ছিল সীমার মাঝে, আয়তনের মাঝে, ব্যাপ্তি ব্যাপক জ্ঞানের মাঝে, আজ তার ছুটে গেল অন্ধকার, হারিয়ে গেল সে ছায়াময় সত্তাবোধ, ব্রহ্মান্ড প্রবেশ করল তারই আত্মার ভিতর। যার ফল হল সবরকম ভীতিমুক্তি ও চির ব্রহ্মানন্দ। এটাই আমার বিশেষ অনুকম্পা যা জীবের সাধন অধিকারের বাইরে। শঙ্করাচার্য্যের কথার এটাই হল তাৎপর্য্য। জীবশক্তির সীমা এখানেই, জীব সাধনার বলে আত্মবিৎ হয়, ব্রহ্মবিদ হয়, ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তাও হতে পারে কিন্তু জগদ্ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব যেমন থাকেনা তেমনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভেও তার সাধনার প্রত্যক্ষ ফল কিন্তু কিছু নেই। এটাও সেই বিশেষ অনুকম্পা। আমি আমার কর্ম্মজীবনে আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণে বহু যোগীকে জীবন পাত করতে দেখেছি যাঁরা ধুনির ছাইকে অনায়সে চিনি করতে পারেন বা ঝরনার জলকে মধু করতে পারেন কিন্তু ব্রহ্মধারণার অধিকারী হতে পারেন নি। অবার সাধারণ গৃহী যাঁকে কেউই বেশি একটা চেনে না, সে কেমন চুপচাপ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে ব্রহ্মানন্দে মশগুল থাকেন। এর ব্যাখ্যা এটাই। মন দিয়ে ক্রিয়া করলে আর দেহবোধ থাকেনা, বুদ্ধি একাগ্র হয়ে ধ্যাননিশ্চল অবস্থায় সম্যক জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। তখনই সর্ব্বব্যাপক আত্মায় লক্ষ্য হয়। বুদ্ধিবৃত্তি আর বিষয় গ্রহণ করে না, ফলে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ পরাজ্ঞানের প্রকাশ হয়। এমন জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ে যে বুদ্ধিযোগ, তারদ্বারা মানুষ নীচের প্রাকৃত জীবনের দ্বন্দ্ব ও বস্তুজগতের সকল ভোগ, বিবাদ ও অশান্তি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সাক্ষীস্বরূপ আত্মার অক্ষর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর একাদশ অধ্যায়ে

বিশ্বরূপদর্শনযোগ। সেই বিশ্বরূপের যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে গেলে ভগবানের বিভূতি আগে বুঝতে হয় তাই ভগবানের এই বিভূতি বর্ণন ॥ ১০/১১

অর্জুন উবাচ -

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ।। ১২

অনুবাদ: অর্জুন কহিলেন। তুমি পরব্রহ্ম পরমাশ্রয় এবং পরম পবিত্র। জন্মরহিত, নিত্যপুরুষ স্বপ্রকাশ ও আদিদেব ॥ ১০/১২

ব্যাখ্যা: অর্জুনকে এতক্ষণ যে সমস্ত জ্ঞান দেওয়া হল তা সবই অর্জুন নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছেন এবং স্বীকার করছেন যে মানব দেহধারী অবতার শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বাতীত পরমব্রহ্ম এবং জীব এ বিশ্বলীলা থেকে উঠে যে পরমধামে বাস করে তিনিই সেই পরমধাম। এও স্বীকার করলেন যে তিনিই সকলের আত্মা ও দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, জগদব্যাপী বিরাজিত বিভু ও সমগ্র সৃষ্টির পরিচালক। এখানে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করতে হয়। সাধনতত্ত্ব বর্ণনার সময়ে পরোক্ষে গৌণভাবে দেখাচ্ছেন তাঁকে লাভ করা প্রথমে জীবের সাধনা ও শেষে তাঁর কৃপা এই দুই এর যোগে সংঘটিত হয়। ঋষিগণ বেদে যা বলেছেন সে পথেই সাধনা এবং যখন আত্মার মাঝে আত্মরূপে প্রকাশ পেয়ে আপনা আপনিই সে কথা ব্যক্ত করেন তখনই সাধনার শেষ। মানে ঋষিরাও বললেন, তুমি নিজেও বললে। নিজে বললেই বুঝতে হবে যে এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব জীবের উপলব্ধিতে এসেছে। এই কৃপাটা ক্রিয়া করে পেতে হয়। কৃপাটাই সেই অবস্থা যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তাই প্রপঞ্চ ব্যতীত এই অবস্থা পরম পবিত্র। আত্মা জন্মরহিত এবং পবিত্র, তাই আদিদেব, যেহেতু জগৎ প্রপঞ্চ সবই এঁর থেকেই উৎপন্ন হয়, প্রকাশস্বরূপ মানে উৎপন্ন ও অবসান নেই, সর্ব্বদাই আছেন। চঞ্চল মনে এটা বোঝা যাবে না। সাধনদ্বারা মন নিশ্চল হলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে বোধ করতে পারবেন ॥ ১০/১২

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ।। ১৩

অনুবাদ: সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস সকলেই তোমাকে এই প্রকার বলেন। তুমি স্বয়ংও আমাকে এইরূপই কহিতেছ ॥ ১০/১৩

ব্যাখ্যা: ভগবান সম্বন্ধে এমন সমগ্র জ্ঞান (comprehensive knowledge) শুধুই মন বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না। এর জন্য চাই অন্তরতম অধ্যাত্ম উপলব্ধি। এই জ্ঞানসাধনা প্রথমে অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিদের কাছ থেকে শুনতে হয়। তার পর উপযুক্ত পরিমাণ অধ্যাবসায়ের ফলে ভক্তের অন্ত রের মধ্যে ভগবান এটা স্বয়ং প্রকাশ করে দিয়ে থাকেন। এটাই " জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা "। শ্রীগুরুদেবের শারীরিক অসুস্থতার কালে ও তাঁর পার্থিব দেহত্যাগের পরও আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত অনেকেরই দরজায় দরজায় ঘুরেছি দীনার্ত, শরণাগত হয়ে। যাঁদের কৃপাকণা, অধ্যাত্মকথা হয়ত আমার পথকে কিছুটা সহজ করতে পারত কিন্তু তাঁরা আমাকে মধুর ব্যবহারে মধুর ভাষায় তাঁদের একটা সাংগঠনিক প্রতিভা দেখিয়ে দেখিয়ে বিমুখ করেছিলেন। সবই তাঁর ইচ্ছা, মানুষতো উপলক্ষ্য মাত্র। নইলে এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ উপলব্ধিতেই আসতো না। যাই হোক সে সব অন্য কথা। ঋষিগণ ও শাস্ত্রও বলেন ব্রহ্ম নির্ম্মল মহাকাশস্বরূপ। ভগবদনুগ্রহে সাধক নিজেও সেটা দেখে থাকেন। নিজের এমনতর অনুভবটা বোধের বিষয় হয়ে শাস্ত্রের সমর্থন পেলে সাধকের সাধনা বিষয়ে বুদ্ধি আরও দৃঢ় হয়, দৃঢ় বিশ্বাসের সে আনন্দই আলাদা। আত্মরূপে দেখতে দেখতে পরমাত্মস্বরূপের উপলব্ধিই তাঁর বিভুত্ব জীবকে দেখিয়ে দেয়। ভগবানও এটাই বলছেন তাঁকে পাওয়াটা প্রথমে সাধনসাপেক্ষ ও অন্তে তাঁরই কৃপাসাপেক্ষ। তুমি অধ্যাবসায় সহ লেগে থাকো। গুরুনির্দ্দেশে সাধন করে যাও, যতক্ষণ না তাঁর কৃপা হয়। কৃপা হবেই, কৃপাটাই সফলকামত্ব। এটাই অর্জুন একটু গৌণভাবে বললেন তুমি নিজের পরিচয় নিজেই আত্মার ভিতরে দিয়ে থাকো ॥ ১০/১৩

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ।। ১৪

অনুবাদ: হে কেশব, তুমি আমাকে যাহা বলিলে, সে সকল আমি সত্য মনে করি। যেহেতু হে ভগবন্ দেবগণ তোমার আবির্ভাব (কারণ) জানেন না, দানবগণও জানে না ॥ ১০/১৪

ব্যাখ্যা : দেবদুর্লভ ভগবৎতত্ত্ব অর্জুন যখন মনের দ্বারা বুঝলেন তখনই তাঁর সংশয় দুর হল। কিন্তু যতক্ষণ না এর উপলব্ধি অধ্যাত্মভাবে হবে ততক্ষণ এটা সম্পূর্ণ বোধে আসবে না এবং ভগবানের সাথে মিলনও হবে না। সেজন্য যাকে তিনি অনুকম্পাদ্বারা তাঁর এ উভয়লিঙ্গাত্মক বিভূস্বরূপটা দেখিয়ে দেন শুধু সেই সেটা দেখতে পায়। তিনি বিশিষ্ট কৃপাপ্রকাশে দিব্যচক্ষু না দিলে এটা হয় না। ৮ নং থেকে ১১ নং শ্লোক পর্য্যন্ত এটাই বলা হয়েছে। ঋষিরা বা দেবতারা যেভাবে যেটুকু তাঁকে উপলব্ধি করেন তাঁর মহিমা তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। তাই দেবতা বা মুক্তপুরুষ যে যাই হোন তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে সম্যকভাবে জানার উপায় নেই। আত্মাকে আত্মাই জানেন আর কারোরই জানার সাধ্যি নেই। যে জানে সেও সেই আত্মাই হয়ে যায়। দানবচিত্ত ব্যক্তি তপস্বী হলেও ফল ও ঐশ্বর্য্য কামনা হেতু সদা বিমূঢ়চিত্ত অবস্থাই পেয়ে থাকে। সমাধির বিষয় বোঝেও না, সমাধিলাভও হয় না। দানব মানে দনুর অপত্য। মানে যারা পুনঃ পুনঃ জাত হয়, অর্থাৎ জন্মমরণময়। এর উল্টোটাই দেবত্ব মানে জন্মমরণরহিত অবস্থা ॥ ১০/১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ।। ১৫

অনুবাদ: হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন (ভূতোৎপাদক), হে ভূতেশ, হে দেবদেব (আদিত্যাদিরও প্রকাশক), হে জগৎপতে (বিশ্বপালক), তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জানো ॥ ১০/১৫

ব্যাখ্যা : আত্মজ্ঞান সংযোগেই আত্মাকে জানা যায়। যতক্ষণ আমি বা আমিত্ব (অহংজ্ঞান) থাকে ততক্ষণ তোমায় জানা যায় না। অহংরাহিত্যে তোমাতে মিশে, তুমিই হয়ে গিয়ে, তোমারই জ্ঞানরূপ আত্মজ্ঞান প্রভাবে, তোমাকে জানতে পারা যায়। তাই তুমি নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারাই জানতে পারো। এই যে আপনি আপনার দ্বারা আপনাকে জানা এটাই চিৎস্বরূপ পরমতত্ত্বের স্বরূপধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের কখনও অপলাপ হয় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক এবং সংগঠিত ধর্ম্মচর্চ্চাকারীগণের কথায় আত্মা কিছু জানেন না, আপনি আপনাকেও জানেন না, মানে জ্ঞানক্রিয়াটা তাঁতে নেই। তর্কে মোহে এমন চরমপন্থী হলে আর আত্মতত্ত্বই থাকে না, হারিয়ে যায়, পরিবর্ত্তে জড়তত্ত্বই উঠে আসে। আত্মার স্বরূপধর্ম্মে জানারূপ ক্রিয়াটা যেমন নেই সত্যি তেমনই আছে এটাও সত্যি। কারণ বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাত হবার শক্তি অবিনাশী, তার বিপরিলোপ হয় না। সেখানে তাঁর থেকে আলাদা কিছু থাকেনা বলে, সবই তিনি বলেই তাঁর অজানা কিছুই নেই বলেই তাঁর জানারূপ ক্রিয়াটা দেখা যায় না। তিনি নিজেই তো পরম চেতনা বা স্বয়ংপ্রকাশ। এই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা স্বয়ং বলে যখন নিজেকে বিশেষভাবে বিজ্ঞাত হন তখনই জানা ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হয়। আর যখন এ জ্ঞানক্রিয়া না করেন তখনই সে দিকে তিনি আত্মবোধভাবনাশূন্য শান্ত অনির্ব্বচনীয় শিব, মন ও বুদ্ধির অতীত। তাই বললাম যে জ্ঞানক্রিয়াটা নেই সত্যি যেমন, আছেও তেমনই সত্যি। তিনি আসলে নিত্য প্রকাশ কোথাও আত্মানাত্ম বোধময় কোথাও আত্মবোধ প্রকাশে, অনুপ্রবেশে অনুভোক্তা ও অনুজ্ঞাতা। প্রকাশিত বস্তুমাত্রের স্বরূপও তিনি, তিনি না থাকলে কিছু থাকে না তাই তিনি ভূতভাবন। আবার ধ্যানপরায়ণ অবস্থায় চিত্ত পরাব্যোমে মিশে যায় বলেই তিনি দেবদেব, আর চলায়মান বস্তু সকল অনিত্য ও অসত্য হলেও তার সাময়িক প্রকাশটাও তোমারই সত্তাকে অবলম্বন করে থাকে তাই তুমিই জগতের পতি। তাই অর্জুন বলেছেন তুমিই মূলতঃ তোমাকে জানছ। যেই নিজেকে নিজে জানছে বলে ভাবছে সেটাও আসলে তোমারই তোমাকে জানা যেহেতু তুমি ভিন্ন অন্য কেউই বেত্তা নেই। ভগবান সম্বন্ধে এই যে জ্ঞান এটা শুধুমাত্র দার্শনিক তত্ত্বই নয়। হৃদয় ও মন বুদ্ধির অধিগম্য

বটেই। আত্মায় ভগবানের সাথে একত্ব আত্মাদ্বারাই লাভ করা যায়। তাই " আত্মানং আত্মনা " বলা হয়েছে ॥ ১০/১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।। ১৬

অনুবাদ: তুমি যে সকল বিভূতিদ্বারা এই লোকসমুদায় ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সমুদয় আত্মবিভূতি অশেষরূপে বল ॥১০/১৬

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের তাৎপর্য্য ছিল এই যে ভালো করে বুঝে দেখলে সেই আত্মস্বরূপের জানাজানিও কিছু থাকে না কারণ আত্মা কেবল বোধস্বরূপ। সুতরাং আত্মার অভিব্যক্তি যদি আত্মাই জানে তাহলে যে বিভূতিদ্বারা তুমি এমন সর্ব্বব্যপী হয়েছ সে বিভূতি একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউই জানে না তাই সে বিভূতি বলতে একমাত্র তুমিই পার। এ বিভূতিটা সম্পূর্ণভাবে না জানলে জ্ঞানও যে অসম্পূর্ণ থাকে তাই তিনি বিভূতি সমূহ সম্পূর্ণভাবে জানতে চাইছেন। আত্মবিষয়ক জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য বিভূতিসমূহ জানার প্রয়োজনও আছে বটে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করি তা আর কতটুকু ? যাও করি তা ভগবানের কিছু স্থূল বিভূতি মাত্র। সূক্ষ্মবিভূতির সীমা সংখ্যা কিছুই নেই, যা যোগীরা কিছু কিছু জানেন। যেহেতু তাঁদের সাধনপথে এর কিছু কিছু প্রকাশ ঘটে যা আসলে যোগের বিঘ্ন, বিশেষতঃ অবৈরাগ্যবান সাধকের ক্ষেত্রে। এও মহামায়ার এক খেলা বটে। দেহকে ভোলাই যখন লক্ষ্য, তখনই যদি বিভূতি হয় ও দেহাভিমান বাড়তে থাকে তবে তো মায়ারই জয় জয়কার হয়ে গেল। মনের আসক্তি ও বিরক্তি দূও করার জন্যই সাধনা। সাধনার দ্বারা যত বেশি কওে আমিত্ব দেহ থেকে সরানো যায় তত বেশি আত্মার স্বাতন্ত্র্য বোঝা যায়। এমন আত্মভোলা অবস্থাই শাম্ভবী মুদ্রা যখন দৃষ্টি বাইওে হলেও লক্ষ্য থাকে অন্তর্মুখে। এঁাই প্রকৃত বিভূতি দর্শনের অবস্থা। আত্মা বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই আত্মার বিভূতি বোধ করা সম্ভব হয়। জীবের মাঝে আত্মার রহস্য ও আত্মাতে পরমাত্মার রহস্য উপলব্ধিই বিভূতি বোধ, যখন যোগী বলেন " প্রভূ যা কিছু সব তোমারই ইচ্ছা, আমিও কিছু নই, আমারও কিছু নয়, তুমিই সব, তোমারই সব। সবই তুমি হলে আরঙসব' কিছুই থাকেনা। 'ঙসব' বাদে এক অখণ্ড আত্মাই থাকে। ঠিক যেমন আকাশে মেঘ জড়ো হয়ে কত রকম আকৃতি তৈরী হয় কিন্তু সব মেঘ সওে গেলেই আকাশ পরিষ্কার। তেমনই মনের কল্পনা মিটে গেলেই মনও অনন্ত আকাশ হয়ে যায়, যেখানে আর কোনও মূর্ত্তিই থাকে না ॥ ১০/১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ।। ১৭

অনুবাদ: হে যোগিন্ সর্ব্বদা কি রূপে (কিরূপ বিভূতি ভেদ দ্বারা) তোমাকে ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব ? হে ভগবন্ কোন কোন ভাবে আমি তোমাকে চিন্তা করিব ? ১০/১৭

ব্যাখ্যা: অর্জুন এখানে ভগবানকে সম্বোধন করলেন যোগী বলে। বললেন, হেঙযোগিন্'। যোগিন্ কে ? যিনি যোগরূপ মিলন করান তিনিইঙযোগিন্' এবং যোগিন্ অর্থে তপস্বীও বুঝায়। তপস্যা মানে তপোলোকে থাকা। মানে হল আজ্ঞাচক্ররূপ তপোলোকে অবস্থিত রয়েছেন বলে অর্জুন কূটস্থ চৈতন্যকে যোগিন সম্বোধন করছেন এবং বলছেন বিভূতি পরিব্যপ্তলোকে তোমার কোন বিভূতি ভেদ করলে তোমাকে জানা যাবে এবং কোন কোন ভাবে তোমার চিন্তা করতে হবে সেটুকু অন্ততঃ বল। এর থেকে বোঝা যায় যে ভগবান সম্বন্ধে পরমতত্ত্ব শুনে অর্জুনের মনের সংশয় দূর হয়েছে এবং হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়েছে। তাই ভক্তি সহকারে তিনি যাতে ঐ জ্ঞান দৃঢ় হয় ও অধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পরিণত হয় সেজন্য তিনি আরও বিস্তৃতভাবে জানতে চাইছেন যাতে এই জ্ঞানকে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সত্যি করে তুলতে পারেন। ভগবান নিজের যে শক্তিপ্রভাবে বিভূতিময় স্বীয় মূর্ত্তি রচনা করেন ও সংহরণ করেন অথচ এই এত সব কিছু করেও নিজে কিছুই হন না, নিঃসঙ্গই থাকেন, সেই শক্তিরই নাম যোগশক্তি। আত্মা জীবরূপে অনাত্ম বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই শক্তিপ্রভাবেই তাঁতে যুক্ত হন। ঈশ্বররূপে এই শক্তিপ্রভাবেই বিশিষ্টভাবে আপনাকে জেনে বা আত্মসম্বেদনময় হয়ে বিশ্বভূত হন ও নির্লিপ্ত থেকেই তাঁতে যুক্ত থাকেন। আবার এই শক্তিপ্রভাবেই বিশ্ব সংবরণ করে বিশ্বকে সলিলে সলিলের মত যুক্ত করে নিয়ে, স্বাত্মভূত করে অবাধ আত্মাতে যোগবিহার করেন। এজন্য এই শক্তিরই নাম যোগশক্তি। যা মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। সবিকল্প ও অবিকল্প, মানে কল্পনাময় ও কল্পনাশূন্য। নানাবিধকল্পনায় কল্পনাময় হলে সবিকল্প আর কল্পনাশূন্য হলে অবিকল্প। অবিকল্পযোগে আত্মায় আত্মশক্তি নিত্যযুক্ত। স্বরূপধর্ম্মসকল অবিকল্প-যোগযুক্ত ধর্ম্ম, যেমন আগুনের দাহ করার ধর্ম্ম বা জলের ঠান্ডা করার ধর্ম্ম বা মহিমা যাই বল। এই সবিকল্প আর অবিকল্পরূপ দুই মূর্ত্তি হল যোগশক্তিরদ্বারা সমগ্র পরমাত্ম প্রকাশ বা বিভূতি পরমাত্মায় যুক্ত। এই যোগশক্তিকে লক্ষ্য করেই অর্জুন বলছেন কেমন চিন্তাদ্বারা তোমায় জানব ? এবং কোন কোন ভাবে তুমি আমার চিন্ত ্যনীয়? যোগপথে সাধক যেমন এগোতে থাকেন, তার কর্ম্ম ও প্রারব্ধ অনুসারে, কম বেশি, বিভূতি আসতে পারে। এর কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে এমনটা করলে এমনটা হবেই। এরপর ভগবান যা সমস্ত বিভূতির উল্লেখ করবেন সে সবই পাতঞ্জল দর্শনের কথিত বিভূতি ব্যাখারই রূপান্তর মাত্র।

পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে সংস্কার সাক্ষাৎকার থেকে কিভাবে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয় সে সকল সুন্দরভাবে বলা আছে। কপিলাশ্রমীর যোগদর্শন এ ব্যাখ্যাকে সহজতর ও সহজবোধ্য করে বুঝিয়েছে কিভাবে পরাচিত্তের জ্ঞান হয়, ইত্যাদি যা সবই বিভূতি পর্য্যায়ভুক্ত। অমৃত ও মৃত্যু উভয়েই সেই আত্মারই বিভূতি তা সে সবিকল্প বা অবিকল্প, সোপক্রম বা নিরুপক্রম যাই হোক বা যে ভাবেই বলি। এই দ্বিবিধ প্রারব্ধ কর্ম্মে সংযম প্রয়োগ করলেই অপরান্ত জ্ঞানের বিষয় জানা যায়। মানে মৃত্যুর জ্ঞান হয়। "মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহং" মৃত্যু যে তাঁরই বিভূতি সেটাও এ অধ্যায়ে ভগবান উল্লেখ করেছেন। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হচ্ছে এবং ক্ষয় হলেই মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে। দেখা যাক এই গীতা ব্যাখ্যা কর্ম্মটা শেষ করা যায় কি না ! যাই হোক, জীবের তো মৃত্যুভয়ই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু যোগীদের তো মৃত্যুর সাথে পূর্ব্বপরিচয় হয়ে যায়। এ ব্যাখ্যা যত বলা যাবে ততই বেড়ে যাবে কারণ বিভুতির ব্যাখ্যা খুবই interesting, তার চাইতে বরং চিন্ত্যনীয় বিভুতিগুলোকে অর্জ্জুন যে ভাবে জানতে চাইছেন এবং ভগবান কিভাবে সে প্রশ্নের সমন্বয় করছেন সেটা দেখা যাক ॥ ১০/১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ।। ১৮

অনুবাদ: হে জনার্দ্দন, তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তৃতরূপে পুনরায় বল। যেহেতু তোমার অমৃতরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না ॥ ১০/১৮

ব্যাখ্যা: সাধকের সাধনকালে প্রথম অবস্থায় বিনা অবলম্বনে মন কখনও স্থির থাকতে পারেনা। কেবল শূন্য অবলম্বনে মন স্থির থাকতে না পেরে জীবভাব কর্তৃক ব্যক্ত হচ্ছে যে বিভূতিগুলো আমাকে বেশ সবিস্তারে বল। মানে হল আগে অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ভাবে ভাগ করে সংক্ষেপে বিভূতির কথা বলা হলেও এবং মনু প্রভৃতি প্রজাপতিসকল তাঁরই বিভূতি বললেও সে কথায় বিভূতিময় সর্ব্বব্যাপী পুরুষের ধারণা স্পষ্ট হয় না। এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যদি আমি বলি যে আমিই ভৃগু আদি ঋষি, আমিই সাবর্ণাদি প্রজাপতি মনু, শুধুমাত্র সেই কথায় তাঁর সর্ব্বময়ত্ব তোমার হৃদয়ে ফুটবে না। তাই অন্তর্য্যামী আত্মা যতক্ষণ না বলে ওঠেন, "আমিই সব" ততক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বময়ের প্রত্যয়ে আত্মময় হয়েও হবে না এটা বুঝে নিয়েই অর্জ্জুন আবার বিশদভাবে শোনার জন্য প্রার্থনা করলেন। অর্থাৎ প্রাণের আরাম বা বিস্তার পূর্ব্বক আত্মক্রিয়ার দ্বারা সমাধিতে অচল স্থিতির দ্বারা যা কিছু দেখা যায় সে সকল কথা আবার বলুন। এছাড়া অন্য কোনও কিছুই অমৃতের মত তৃপ্তি দেয় না। প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের স্থিতি থেকে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, রাগ দ্বেষ ভাব দূর হয় ও বিষয়ে বৈরাগ্য হয়। এ কারণে যে বিভূতি প্রকাশ হয় তা ভগবানেরই প্রকাশ। ওগুলো ভগবান ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য মন্ত্র ঔষধি দ্বারাও অমন বিভূতির জন্ম হতে দেখা যায়। তাই বিভূতি যে ভাবেই আসুক তাতে সাধকের কোনই লাভ নেই; কারণ তার দ্বারা কৈবল্যলাভ হয় না। বুদ্ধি নির্ম্মল হলেই অনুভবে বোঝা যায় যে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের জন্য বা আশ্চর্য্য করিশ্মার জন্য ব্যর্থ পরিশ্রম করে কোনই লাভ নেই। তাঁকে না পেলে সকলই পণ্ডশ্রম হয়। বিভূতিতে খুশি হলে তাঁকেও পাবে না, পরে ঐ অর্জিত বিভূতিটুকুও পালিয়ে যাবে। কিন্তু কোনও কিছু না হয় নাই চাইলাম, তাতে সাধনার দ্বারা আমার যে অচল স্থিতি হল, সেটা বুঝব কেমন করে ? আমার যে সবকিছু ঠিক ঠিক হচ্ছে সেটা বোঝার উপায় কি ? সে জন্যই অর্জ্জুন বলছেন যে এই অচলস্থিতি লাভের সময় তোমার কি কি যোগৈশ্বর্য্য, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি প্রকাশ হয় সেটা বল তাহলে আর বুঝতে অসুবিধা হবে না। তুমি এ পর্য্যন্ত যা বলেছ সবই আমার খুব ভাল লেগেছে। "অমৃত" কথাটার দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়। বিশ্বলীলার মাঝেই মানুষ দিব্য আনন্দের স্বাদ পেতে পারে। বিশ্বমাঝে ভগবানের শক্তির প্রকাশকেই বিভূতি বলা হয়। ভগবান যে সকলের সাথে এক এবং সকলের মধ্যেই এক তার উপলব্ধিই হল যোগবিভূতি ॥ ১০/১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ।। ১৯

অনুবাদ : শ্রীভগবান কহিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার দিব্য বিভূতিসকল প্রধানতঃ (মোটামুটি) তোমাকে কহিতেছি, যেহেতু আমার বিভূতিবাহুল্যের অন্ত নাই। ১০/১৯

ব্যাখ্যা: ভগবান অনন্ত, সুতরাং তাঁর বিভূতিও অনন্ত। দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই ভগবানের বিভূতি প্রকাশভাব। তাই অর্জ্জুন খুব সহজেই যে শক্তিগুলো দেখতে পাবেন শুধু সেগুলোই ভগবান এখানে বলছেন। এগুলোকে অবলম্বন করে অর্জ্জুন উপলব্ধি করতে পারবেন যে "বাসুদেবং সর্ব্বং" মানে সংসারের সকল কিছুতেই, সকল ঘটনাতেই ভগবানের আত্মপ্রকাশলীলা চলছে। আর "কুরুশ্রেষ্ঠ" বলতে কৌরবপক্ষীয় কিছু নয়। এখানে কুরুশ্রেষ্ঠ বলে অর্জ্জুনকে তাঁর কর্ম্মবীরত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কেননা আজ তত্ত্বজয়রূপ বিপুলকর্ম্ম তার সামনে অপেক্ষা করছে। ভূতমাত্রার তলায় প্রজ্ঞানমাত্রা, প্রজ্ঞানমাত্রার তলায় নিজবোধমাত্রা দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে যে প্রজ্ঞার বিশ্বই সে ভোগ করে, প্রজ্ঞাবিশ্ব তার নিজ বোধের উপরই জাত, স্থিত ও প্রলীন হয়। সে নিজত্ব থাকে অসঙ্গ ও অপরিণামী। প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার বুকে এইভাবে আত্ম - অনাত্ম বোধময় লীলা ছাড়া কেউ কোথাও কিছু জানে না, দেখে না বা ভোগ করে না। এর থেকে সে সিদ্ধান্তে এসেছে যে বাহ্য স্থূল ভৌতিক বিশ্বরূপে যা দেখা যায় তাও নিশ্চয় ঐ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা থেকে জাত ও তাঁতেই প্রলীন থাকে। অধ্যাত্মভূমিতে যা অধিদৈবভূমিতেও তাইই। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এটাও শুধু বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত ধারণা মাত্র যেহেতু এটা এখনও পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি – তাই ব্যবহারিকভাবে

(practically) পাওয়া হয় নি – মানে তত্ত্বজয় হয় নি। তাই এখনও নিজেই জ্ঞানশক্তির অধীন, শক্তি তার অধীন নয়। বাহ্য বিশ্ব যখন যা দেখায় সেটাই মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। এখনও বাহ্য বিশ্বের সাহায্য ছাড়া নিজের ভোগ নিজের জ্ঞানে আনতে পারেনা, কারণ এই (sense) প্রজ্ঞামাত্রাই যে প্রাণ বা শক্তিপ্রবাহরূপে অধ্যাত্মের মত অধিদৈবেও প্রবাহমান এটা জানা গেলেও তত্ত্বতঃ দেখা বা বোঝা হয় নি। কারণ আত্মার মাঝে পরমাত্মার ভূমা প্রকাশের আভাসমাত্র অনুভব করা গেলেও তাতে স্থিতি হয় নি। তাই পরমাত্মার বিভূত্ব নিজের মধ্যে অনুভব হলেও স্থূল জগতে দেখা যায়নি। নিজ আত্মার প্রধান প্রধান বিভূতিগুলো ধারণা করে, তাতে তন্ময় হয়ে, বাহ্য বিভূতিতে নিজের আত্মার বিভূতি দেখলে তবেই পরমাত্মার বিভূতিগুলো ঠিক ঠিক জানা যাবে এবং পরমাত্মার ব্রহ্মত্বে প্রবেশলাভ হবে। নিজের শরীররূপ স্থূল ব্রহ্মাণ্ড অবলম্বনে এর শুরু এবং বাহ্য বিশ্বের বিভূতিময় পরমেশ্বরে উপনীত হবারও এটাই উপায়। ঘরের চারদিকের দেয়ালে বড় বড় আয়না সামনা-সামনিভাবে লাগিয়ে দাও। এবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখ নিজেকেই অসংখ্য বার দেখা হবে। এভাবেই মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে এক আত্মাকেই বহুরূপে দেখা যাচ্ছে, সেটা না জেনে অভ্যাসচৈতন্যে জীব মুগ্ধ হয়ে নিজেকে নিজে বার বার দেখে বার বারই বিস্মিত হচ্ছে। আয়নাগুলো সরিয়ে দাও, মনের কল্পনা থামিয়ে দাও, দেখবে স্থির অব্যক্ত আত্মভাবের মধ্যে অনন্ত চাঞ্চল্যরূপ জগৎপ্রপঞ্চ লয় হয়ে গেছে। সাধনার সময় কূটস্থ মণ্ডলের মধ্য কত শত রূপই না প্রকাশিত হয়, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো ভোলা যায় না সেই প্রধান প্রধান গুলোই এখানে বলা হচ্ছে। নইলে সবটা বলা যাবে না, বললে শেষও হবে না। রোদ্দুর যেমন সূর্য্য থেকে আলাদা নয়, অনন্ত জীবের জন্মও তেমনই তাঁরই প্রকাশ, এর শেষ নেই। নিজের আত্মাকে বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলে যে যতদুর দেখতে পাবে তার আত্মশক্তি ততদূর ঐশী শক্তির ভোক্তা বা অধিকারী হবে। এই যোগসাধন করার কথাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলছেন ॥ ১০/১৯

> অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
> অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ।। ২০

অনুবাদ: হে গুড়াকেশ, ভূতগণের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মা আমি, ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকর্ত্তাও আমি ॥ ১০/২০

ব্যাখ্যা: এবার ভগবান তাঁর বিভূতি বিস্তৃতভাবে বলছেন এবং শুরুতেই সেই মূল তত্ত্বটা বললেন যা এ বিশ্বলীলার ভিত্তিস্বরূপ। বললেন সকল জীব, সকল বস্তুর মধ্যে ভগবান গুপ্তভাবে আছেন এবং সেখানেই তাঁকে আবিস্কার করা যায়। খুব কঠিন কাজ। এ কাজ সেই করতে পারে যে মোহনিদ্রাকে জয় করেছে। তাই আগের শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে "কুরুশ্রেষ্ঠ" বলে সম্বোধন করেছিলেন। এখন এই কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ কে ? যে আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা সবই জয় করেছে। নিদ্রাজয়ী হলেই কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ হয়। গুড়াকা মানে নিদ্রা, ঈশ মানে জয় করা, এখানে জয়কারী, এক কথায় নিদ্রাজয়ী। শংকরাচার্য্যের মতেও – " গুড়াকা নিদ্রা, তস্য ঈশো গুড়াকেশ জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ " অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্ব দ্বারা সাধন সমরে ইন্দ্রিয়গণের সাথে যুদ্ধ করে মোহনিদ্রাকে জয় করা হয় বলে সাধক অর্জ্জুনকে ভগবান গুড়াকেশ বলে সম্বোধন করে তার প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মুক্ত করতে চাইছেন এবং বলছেন আমি সর্ব্বভূতের আশয়ে, কর্ম্মসংস্কারময় অন্তরে আত্মারূপে স্থিত। আমি ভূতসকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। তাদের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ অর্থাৎ জীবত্বের সবটুকুই আমিই। আমিই মূল আত্মা, আবার আমিই জীবত্ব। আমিই জীবের শ্বাসরূপ। সকল ভূতের স্থিতি এতেই – আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যে ভাবেই বল। পুনর্জন্মেও এই শ্বাস থাকেই। তাই শ্বাসই জীবের আয়ু। সূত্ররূপী প্রাণ জন্মেতে, জন্মের আগে পিতার প্রাণে আর জন্মের পর যতদিন বাঁচে শ্বাসই জীবন আবার মৃত্যুর পরও এই শ্বাসই সূত্রাত্মা রূপে বর্ত্তমান থাকে নইলে পরে জন্মাবে কে ? তাই শ্বাসই প্রাণরূপে থাকাতে সমস্ত ভূতাদির প্রকাশ। এই প্রাণ স্থির হয়ে ব্রহ্মে মিশে গেলে সমস্তভূতও ব্রহ্মে মিলিত হয়। এই জ্ঞানের নামই বেদ। প্রকৃতি হচ্ছে পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহংকার। পুরুষ যদি প্রকৃতিতে না থাকতেন, তবে তো কিছুরই অনুভব হত না। সূত্ররূপী শ্বাসের মধ্যে এরা সূক্ষ্মভাবে মিলে মিশে থাকে। মৃত্যুর পর শ্বাসের সাথে এসবই মিশে চলে যায় (অবতারের বেলায় স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে) আবার দেহ ধারণকালে শ্বাসের সাথে শরীরে চলে আসে। এভাবেই শ্বাসরূপী প্রাণ সর্ব্বভূতের আদি মধ্য ও অন্তে অবস্থান করেন ॥ ১০/২০

> আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
> মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ।। ২১

অনুবাদ: আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃসকলের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ১০/২১

ব্যাখ্যা: যদিও বিশ্বের সবকিছুই ভগবদশক্তিরই প্রকাশ বা বিভূতি তবুও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অভিব্যক্তি, শ্রেষ্ঠবস্তু, শ্রেষ্ঠগুণ ও শক্তি ইত্যাদিই বিশেষভাবে ভগবানের বিভূতি। প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সত্তাকে ক্রমশঃ বেশি বেশি করে বিকাশ করেই জীব ভাগবত জীবনের দিকে এগিয়ে চলে। এজন্যই ভগবানকে তাঁর উৎকৃষ্ট বিভূতিতে চিন্তা করতে হয় যাতে সকলেই আপন আপন সত্তার উৎকৃষ্ট বিকাশ করতে পারে। অবশ্য পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও মানুষের উপরে ও নীচে নানাস্তরে যে সমস্ত দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্বাদি যা কিছু সে সবের মধ্যেও আপন আপন শ্রেণীর গুণে যে শ্রেষ্ঠ তাতেই ভগবানের শক্তির বিশেষ প্রকাশ। কোন কোন ভাবে প্রধানতঃ তিনি চিন্তনীয় সেটা বলতে গিয়ে সকল শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই আত্মার বিভূত্ব উপলব্ধি করতে বলেছেন। তাই এখন "আদিত্যানাং" থেকে শুরু করে পুরো

অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বিভূতিগুলোর কথাই বলছেন। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্য আমি বিষ্ণু অর্থাৎ বামন, সমস্ত প্রকাশের মধ্যে আমি রবিরশ্মি, সূর্য্য। মরুৎ নামক দেববিশেষের মধ্যে আমি মরীচি অথবা বায়ুগণের মধ্যে আমি মরুৎ ও নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র, এসকলই সাধনদ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য। বিশেষ বিশেষ অর্থ বলে শুধু পাঠকের কিছু কৌতুহল বৃদ্ধিই সার হবে। তাই এসব শ্লোকের সাধারণ অর্থই গ্রহণীয়, আর স্বতন্ত্র মর্ম্ম প্রকাশের দরকার নেই। শুধু এটুকু বুঝলেই হবে যে যত প্রকাশ আছে তার মধ্যে স্থিতিস্বরূপ প্রকাশই আমি। মানে সূর্য্যের অণুর মধ্যে ব্রহ্মের অণু আছে, তেজের মধ্যে যে সূক্ষ্মবায়ুস্বরূপ আছে – সেই আমার রূপ। ব্রহ্ম অণুসকল অন্তরের মধ্যে, নক্ষত্র যে সকল দেখা যায় তার মধ্যে চন্দ্র বৃহৎ আমার রূপ। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন “যাহারা চক্ষুকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, চিত্তকে সমাহিত করিয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন সম্পন্ন হইয়াছে – তাহাদের কর্তৃক দৃষ্ট হন।” ব্রহ্মাণুসকল অন্তরের মধ্যেই নক্ষত্ররূপে দেখা যায়। এসকল নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রই বড় সেজন্য ওটাই ভগবানের পরম বিভূতি। মরীচি অন্ধকার নাশ করেন বলে তিনিই দিব্যচক্ষু কূটস্থ। শ্বাসরহিত কূটস্থ ব্রহ্মের পুত্রই মরীচি, সূর্য্যের মত যাঁর জ্যোতিঃ। তার পরের অবস্থায় ঠান্ডা চাঁদের আলোর মত যাতে সবই দেখা যায়। মনের রূপ হল এই চন্দ্র। তাই ভগবান বলেছেন নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র। এভাবে সাধন দ্বারা নিজের আত্মার বোধকে অবলম্বন করে সকল বিভূতিকে সত্যরূপে জেনে সত্য প্রতিষ্ঠাদ্বারা তন্ময় হতে হবে। ক্রিয়া করলেই চন্দ্র দর্শন হয়। ভাগবতে আছে “এতৈনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি।” ক্রিয়াদ্বারা চিত্ত এমন প্রশান্ত হলে সেই নিস্তরঙ্গ অবস্থায় চিত্ত সত্ত্বগুণে অবস্থান করে পরমানন্দ ভোগ করে। এভাবেই স্থিরত্বে তন্ময় হয়ে পুরুষোত্তমের সাথে এক হয়ে স্বীয় আত্মার বাহ্য-বিভূতিময় প্রকাশ সাক্ষাৎ হয় ও আত্মার বিভুত্ব উপলব্ধি হয়॥ ১০/২১

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ।।২২

অনুবাদ: আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে চেতনা॥ ১০/২২

ব্যাখ্যা: ভগবান বলছেন চতুর্বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। বেদ কি ? বিনা কথায় যা শোনা যায় তা হল শ্রুতি। আর তা জানার নামই হল 'বেদ' মানে নিঃশব্দেতে যা বোধ হয়। নিবিষ্টভাবে ক্রিয়া করলে যে স্থিরতালাভ হয় সেই অবস্থায় যা উপলব্ধি সেটাই “বোধি ” বা প্রকৃত জ্ঞান। বোধি থেকেই বুদ্ধ বা প্রবুদ্ধ হয়। এখানে ভুল হবার কোনও উপায় নেই, তাই বেদের প্রমাণ অকাট্য। আবার চারি বেদের মধ্যে সামবেদ জানলে তবেই ব্রাহ্মণ হয় কারণ সামবেদেই ওঁ কার শ্রবণ হয়। ক্রিয়া করে পরাবস্থারূপ শূন্যই পরাব্যোম বা দেবরাজ বাসব যা হল 'অহং' এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম অনুভূতি। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি হলাম 'মন', কারন মন আত্মা হতে নির্গত হয় এবং সঙ্কল্পদ্বারা বিষয় গ্রহণে ইচ্ছুক হওয়ায় ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের শক্তি আসলে মনেরই শক্তি। এ জন্যই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনই তাঁর প্রধান ঐশ্বর্য্য। সর্ব্বভূতের মধ্যে যে আশ্চর্য্য ঈশ্বরবিভূতি আছে তা হল 'চেতনা' মানে কূটস্থ বিন্দুই চেতনরূপ। ঐ বিন্দু যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জড় দেহকেও চেতন বলে বোধ হয়। এই চেতনাদ্বারাই প্রাণীগণ নিজেদের এবং বহির্জগৎকে জানতে পারে। মনের দ্বারা বাহ্যবস্তুর স্পর্শ গ্রহণ করে ও তাতে সাড়া দেয়। তাই ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা বা জ্ঞানশক্তি॥ ১০/২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ।।২৩

অনুবাদ: আমি {একাদশ}রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ – রাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু॥ ১০/২৩

ব্যাখ্যা: একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর। একাদশ রুদ্র অর্থে – অজ, একপাৎ, অহির্বুধ্ন , পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। প্রাণই এই একাদশ উপাধি বিশিষ্ট রুদ্র এবং তিনিই স্থির ব্রহ্মরূপে মঙ্গলময় শিব পদবাচ্য। বিত্তেশ কুবের – মানে ধনাধিপতি হলেন আত্মতত্ত্বরূপ ধনের অধিকারী, যক্ষ ও রাক্ষস গণের অধিপতি কৈলাসে (মস্তক) ধনভাণ্ডার যাঁর। বায়ুকে মাথায় চড়িয়ে বসিয়ে দিতে পারলেই এই কুবেরকে জয় করা যায় মানে আত্মতত্ত্বরূপ ধন লাভ হয়। আমি অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি অর্থে অষ্টনাড়ীস্থিত বায়ুগণই অষ্টবসু আর তার ভিতর সুষুম্না নাড়ীই হল অগ্নিস্বরূপ। কারণ ঐ সুষুম্নাস্থিত বায়ুই স্থির প্রাণরূপ আমি। আমি পর্ব্বতগণ মধ্যে সুমেরু অর্থে পর্ব্বত মানে হল (পর্ব্বন্ + ত) যাঁর পর্ব্বে ভাগ আছে। দেহ মধ্যে ছয় চক্র যা ভাগ ভাগ হয়ে আছে এবং ঐ ছয় চক্রের ওপরে যে ব্রহ্মযোনিস্থান ঐ স্থানই হল সুমেরু। ভ্রুদ্বয়ের পিছন দিকে ব্রহ্মযোনির শীর্ষে বেশ উঁচুতে ত্রিকোনাকার যে পর্ব্বতের মত যে ব্রহ্মযোনি ওটাই হল সুমেরু। ঐ সুমেরুস্থানে পূর্ণজ্যোতির কিরণে তিনি জ্যোতির্ম্ময় হয়ে জ্যোতির্ম্ময় রূপে থাকেন। তাই বলছেন আমি পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু॥ ১০/২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যাং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ।।২৪

অনুবাদ: হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর ॥ ১০/২৪

ব্যাখ্যা: এখানে বৃহস্পতি অর্থে প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মই বৃহস্পতি। আর পুরোহিত অর্থে – পুরস = অগ্রে, হিত = ধৃত অথবা সম্মানিত। অর্থাৎ যিনি দেহের উর্দ্ধস্থানরূপ অগ্রভাগে স্থির ব্রহ্মরূপে ধৃত সেই স্থির প্রাণরূপ ব্রহ্মই বৃহস্পতি যিনি, তিনিই আমি। সেনানী মানে সেনাপতিদের ভিতর আমিই কার্তিক বা ষড়ানন। মানে হল ষটচক্র বিশিষ্ট ষড়ানরূপ হয়ে যিনি দেহে বাস করছেন এমন পুরুষোত্তম। প্রধান সেনাপতি রূপে দেহের উর্দ্ধে থেকে প্রাণাপান বায়ুরূপে গমনাগমনরূপ শরযুদ্ধের তীরন্দাজি করে চলেছেন ও তাতে ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চতত্ত্বাদি পরাজিত হয়ে চলেছে। "সরসাং অস্মি সাগরঃ" – যা অবিরত চলে তাই সরস, অর্থাৎ মন। এই মন যখন সূক্ষ্ম হতে হতে একেবারে আত্মাকারা হয় তখনই তা হয়ে ওঠে সাগর অর্থাৎ আত্মা তখন সর্ব্বব্যাপী হয় ॥ ১০/২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ।। ২৫

অনুবাদ: আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্যসকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁ কার। যজ্ঞগণের মধ্যে {অজপারূপ} জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ১০/২৫

ব্যাখ্যা: মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু – কিন্তু, ঋষি কারা ? যাঁরা দেহরূপ ক্ষেত্রকে শ্বাসরূপ হল বা লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করেন তাঁরাই ঋষি। আর যাঁরা ক্রিয়ার ফল উপলব্ধি করেন তাঁরা হলেন মহর্ষি। এমন মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু তাঁর প্রধান বিভূতি। ভৃগু অর্থে ভজন করা। ভাজা বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তেমনিই ব্রহ্মতে থেকে যিনি মৌন হয়েছেন তিনিই ভৃগু। আবার সকল বাক্যের মধ্যে তিনি একাক্ষর প্রণব যা হল ঈশ্বর প্রণিধানের বীজ। যজ্ঞসকলের মধ্যে তিনিই অজপারূপ যজ্ঞ। অজপারূপ যজ্ঞে জীবের ভববন্ধন মোচন হয়। সাধক আত্মায় মিলে যেতে পারেন। কিন্তু অন্যসব যজ্ঞের ফল বন্ধন। এই একটা মাত্র যজ্ঞই জীবকে অভীষ্ট বস্তুতে মিলিয়ে দিতে পারে। তাই যজ্ঞসকলের মধ্যে অজপাই শ্রেষ্ঠ বলছেন। স্থাবর বস্তুর মধ্যে তিনি হিমালয়। স্থাবর স্থিতিশীল যে স্থান (সহস্রার) ওটাই হিমালয় স্বরূপ। স্থাবর অর্থে শ্রেষ্ঠ স্থিতি, যেখান থেকে আর নড়চড় হয় না। মেরুর মধ্যে প্রাণের স্থিতি হলে তা স্থির শান্ত ও শীতল হয়। হিম অর্থে তুষার, আলয় অর্থে বাসস্থান। সহস্রারে যে শীতল বায়ু আছে, সেখানে চিরস্থিতিরূপ বসতি হলে ওটাই হিমালয় ॥ ১০/২৫

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ।। ২৬

অনুবাদ: আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থঃ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ১০/২৬

ব্যাখ্যা: ভগবান এখানে সুগন্ধি চন্দন অথবা সিদ্ধবকুল বৃক্ষাদি কে বাদ দিয়ে অশ্বত্থ গাছকে তাঁর বিভূতিরূপে পছন্দ করে বসলেন কেন ? সর্ব্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কেন ? কূটস্থের মধ্যে উল্টোভাবে, মাথাটা নিচের দিকে করা অশ্বত্থ গাছ দেখা যায় বলে। আবার নারদকেও দেখা যায়। নারদ মানে এরকম নার = জ্ঞান বা মনুষ্যসমূহ, দ = যে দেয় বা উপদেশ দান। অর্থাৎ যিনি উপদেশ দান করেন মনুষ্যকূলকে। এককথায় জ্ঞানদাতা গুরুই নারদ। যদিও "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ"। একমাত্র আত্মাই হচ্ছেন গুরু, তাই তিনিই নারদ। অবশ্য লৌকিক জগতেও দেখি যে ক্রিয়া দিতে দিতে সর্ব্বদা সেই কূটস্থে থাকা আপনা আপনিই হয়ে যায় এমন শরীর হয়ে গেলে তিনিও নারদ পদবাচ্য। তিনি লোক দেখেই বোঝেন কে কেমন লোক বা কাকে ক্রিয়া দেবেন বা কাকে দেবেন না। গন্ধর্ব মধ্যে চিত্ররথ – কূটস্থের মধ্যে যে চিত্র বিচিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাই চিত্ররথ। সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, যাঁকে ভাগবতে অবতার বলে গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদের কূটস্থে দর্শন হয় তাঁদের মধ্যে কপিলই প্রধান। আবার কপিল অর্থে পিঙ্গলবর্ণযুক্তও বোঝায়। কূটস্থে পীতজ্যোতির মধ্যস্থ গোলাকার যে দৃশ্য তাকেও বোঝায় ॥ ১০/২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ।। ২৭

অনুবাদ: অশ্বগণের মধ্যে এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে অমৃতার্থ ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূত উচ্চৈশ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও; নরগণ মধ্যে আমাকে নরাধিপ্ জানিও ॥ ১০/২৭

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকের অর্থভেদ করতে হলে সমুদ্রমন্থন কাহিনীর রহস্যটা একটু বলতে হবে। এতদিন এটা শুধু গল্পের মতই শুনে আসছেন বটে কিন্তু এর একটা আধ্যাত্মিক রহস্য আছে। অনন্ত প্রাণশক্তিই সমুদ্র, পিঠের দিকের মেরুদণ্ডই সুমেরু পর্ব্বত। এ মেরুদণ্ডের গোড়ায় জীবচৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি স্থিত আছেন যিনি অবিরত শ্বাস ছাড়ছেন। এই শ্বাসকেই নাগরাজ বাসুকীরূপে কল্পনা করে মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্নারূপ মন্থনদণ্ডে জড়িয়ে প্রাণসমুদ্র মন্থন করতে পারলেই জ্ঞানরূপ অমৃত উঠে আসে। মানে কুণ্ডলিনী জাগরণ ও উত্থান হয়ে থাকে। তখনই বিভূতি সকলের আবির্ভাব হতে থাকে যেগুলো হল সমুদ্র মন্থনে উত্থিত ঐশ্বর্য্য সকল, রক্তবর্ণ

অশ্ব, শ্বেতবর্ণ হস্তি ইত্যাদি। আর নরাধিপ কথার তাৎপর্য্য হল কূটস্থচৈতন্য, যিনি নরের অধিপতি অর্থাৎ মালিক ॥ ১০/২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ।। ২৮

অনুবাদ: অস্ত্র সকলের মধ্য আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্য আমি কামধেনু, আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের রাজা বাসুকি ॥ ১০/২৮

ব্যাখ্যা: এসকল বিভূতি সাধকগণের নিজ নিজ বোধরূপ। ওঁ কার রূপ চক্রই হচ্ছে বজ্র যারদ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় তাই এ বজ্র হৃদয় বিদারকও বটে। ভগবান সকলের মনস্কামনা পূরণে অভীষ্ট সিদ্ধ করে থাকেন, অতএব তিনিই কামধেনু। ইচ্ছারহিত কামরূপে তিনিই প্রজাগণের উৎপত্তির হেতুরূপ কন্দর্প। শরীরস্থ নাগাদি বায়ুসকল সর্পগণের সাথে তুলনীয় হলে মূলাধার স্থিত স্থির বায়ু হতে পারেন নাগরাজ বাসুকি। তাই শুরুতেই বললাম এ সমস্ত বিভূতি সাধকগণের নিজ নিজ বোধরূপ কারণ কূটস্থের দৃশ্য সকলের সমান হয় না ॥ ১০/২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ।। ২৯

অনুবাদ: আমি নাগগণের মধ্য অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং নিয়মকারীগণের মধ্যে যম ॥ ১০/২৯

ব্যাখ্যা: সাধকভেদে কূটস্থ দর্শনের প্রকারভেদ হয় কিন্তু নীলাকাশ সদৃশ কারণবারি সকলেই দেখে। আর শরীরস্থ নাগাদি বায়ুর মধ্যে আমি অনন্তনাগ মানে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বায়ু। আর জলচরদিগের নিকট বরুণ, অর্থ যে সকল বায়ুর গতিতে শরীরে রস রক্তের চলাচল হয়। পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমা অর্থে প্রাণই পিতা, মানে প্রাণবায়ুর কথা বলা হল। আর সংযমকারীদের আমি যম অর্থাৎ সমাধিতে যে স্থিরাবস্থা সেটাই সংযম আর ঐ স্থির ব্রহ্মই ধর্ম্মরাজ বা যম ॥ ১০/২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ।। ৩০

অনুবাদ: আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীভূতকারীগণের মধ্যে (অথবা সাংখ্যকারীদিগের মধ্যে) আমি কাল, মৃগগণের মধ্যে আমি সিংহ ও পক্ষীগণের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ১০/৩০

ব্যাখ্যা: মনের বৃত্তিনিচয় যদি দৈত্যকূল হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট আনন্দরূপে সে দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ। আর বশীভূতকারী বা সাংখ্যকারীদের মধ্যে আমি ঘটস্থ কাল যা অজপারূপে চলছে। আর যারা বশীভূতকারী তারা সুন্দরভাবে এ কালের গতিকে মাথায় স্থির করে রেখে সর্ব্বদা এই অজপারই সংখ্যা করে চলেছেন। সকল পশুত্বের ভিতরও আমি বিক্রমরূপ সিংহ, মৃগেন্দ্র, আর পাখীর ভিতর গরুড়। পাখী শূন্যে গতির প্রতীক যার অর্থ হল মনের বেগ, আবেগ প্রভৃতি। অতএব গরুড় যদি বিষ্ণুরই বাহন হন, তবে মনোবেগের মধ্যেও ভগবদমুখী মনোবেগই শ্রেষ্ঠ। এমনতর মনোবেগ বা আবেগ যখন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে তখনই তা বিষ্ণুর বাহন হয় ॥ ১০/৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ।। ৩১

অনুবাদ: আমি বেগবান দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারী গণের মধ্যে রাম, মৎস্য গণের মধ্যে মকর এবং স্রোতোমধ্যে জাহ্নবী ॥ ১০/৩১

ব্যাখ্যা: বেগবানদের ভিতর আমি পবন। পবন নামক বায়ুরদ্বারা শরীর শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। শস্ত্রধারীগণের ভিতর আমি রাম। রাম কে ? যিনি সকলের ভিতর রমণ করেন। অর্থাৎ আত্মা বা আত্মারাম। মৎস্যগণের ভিতরে আমি মকর, গঙ্গার বাহন। এখানে গঙ্গা অর্থে প্রাণগঙ্গা, জ্ঞানগঙ্গা। আর প্রাণবায়ুর আগমরূপ যে ক্রিয়া হয়ে চলেছে সেটাই হল স্রোত আর তার ভিতর হৃদিস্থানে যেখানে বায়ুর প্রবাহ সবচেয়ে জোরালো সেইখানেই আমি জাহ্নবীরূপা। জানুকে ভেদ করে মানে কামকে অতিক্রম করে মনের যে শুদ্ধ ও নির্ম্মল প্রবাহ সেটাই হল পবিত্র জ্ঞান গঙ্গা। স্থির প্রাণের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গতির দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ হয় কিন্তু জানুর মধ্যে, যোনি অথবা লিঙ্গে বার বার আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি দিলে কণ্ঠস্থ বায়ু পর্য্যন্ত মগ্ন হয়ে তাতেই সুখ খুঁজে বেড়ায়, তাতেই লীন হয়, যার পরিণামে হয় রোগ শোক। তাই এই জানুকে ভেদ করে প্রবাহিত হলেই মনের নির্ম্মলত্বরূপ প্রবাহ তখন জাহ্নবীরূপ জ্ঞানগঙ্গা। জহ্নুমুনির জানু চিরে গঙ্গা প্রবাহিত করার রূপক রহস্যও এটাই ॥ ১০/৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ।। ৩২

অনুবাদ: হে অর্জ্জুন, আমিই সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত। বিদ্যা সকলের মধ্যে আমিই আত্মবিদ্যা এবং বাদীগণের মধ্যে (বাদ; জল্প ও বিতন্ডা নামক যে তিন প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে তম্মধ্যে) আমি বাদ ॥ ১০/৩২

ব্যাখ্যা: তিনিই সকলের উৎপত্তি, আরম্ভ। তাদের চির পরিবর্তনশীল অবস্থায় তিনিই তাদের ধরে রেখেছেন। তাই তাদের মধ্য। আবার তিনিই তাদের শেষ। সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই বিনষ্ট হয় এবং বিনষ্ট হয়ে তাঁতেই লীন হয়। আবার তিনিই অধ্যাত্মবিদ্যা, মানে আত্মবিদ্যা। আবার বাদ, জল্প ও বিতন্ডা এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে তিনিই হলেন বাদ। এখানে বাদ কথার অর্থ তত্ত্ব নির্নয়। এ তিনের মধ্যে বাদই শ্রেষ্ঠ তাই সেটাও ভগবানেরই বিভূতি ॥ ১০/৩২

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্ব সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ।। ৩৩

অনুবাদ: অক্ষরগণের মধ্যে আমি‘অ’ কার, সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব; আমি প্রবাহরূপ অক্ষয়কাল, এবং বিশ্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল বিধাতা ॥ ১০/৩৩

ব্যাখ্যা: দেহভ্যন্তরে ৪৯ বর্ণ রয়েছে মানে হল ৪৯ বায়ুর কথা। শিক্ষাগুরু শিশুকে বর্ণপরিচয় করিয়ে থাকেন। তেমনিই সদ্গুরু ছাড়া শরীরের এ বর্ণপরিচয় কেউই করাতে পারেন না। উনপঞ্চাশ বায়ুরূপ বর্ণমালার মধ্যে সুষুম্নানাড়ীস্থিত স্থির বায়ুই সেই‘অ’ কার স্বরূপ, ইড়ানাড়ী স্থিত বায়ু হল‘উ’ কার আর পিঙ্গলা নাড়ীর বায়ু হল‘ম’ কার যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা = অ উ ম = ওঁ । আবার সমাসের ভিতর আমি হই দ্বন্দ্ব সমাস। বাংলা ব্যাকরণে সমাস ছয় রকম, তার মধ্যে‘দ্বন্দ্ব’ সমাসই হল দুই বা বহু পদের একপদীকরণ অর্থাৎ দুই ভাগের মিলন বা যোগ বা যুক্ত করা। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন বা যুক্ত হওয়াই দ্বন্দ্ব। কাল অর্থে সময়। এই সময়ের প্রবাহরূপ অক্ষয় কালই আমি। অর্থাৎ অজপারূপ প্রাণের গতিকে স্থির করতে পারলেই কাল অক্ষয় হল। কারণ তখন আর অজপারূপ প্রাণের ক্ষয় হয় না। আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা মানে তিনিই হলেন বিধাতা। শাস্ত্রে আছে “বায়ুর্ধাতা শরীরিনাম্”। প্রাণরূপী আত্মাই বায়ুরূপে সর্ব্বসৃষ্টি ব্যক্ত করেন তাই তিনিই হলেন বিশ্বতোমুখ ধাতা। অন্তর্জগৎ ও বহির্বিশ্বেও বায়ুর সাম্যে সবরকম সমতা বজায় থাকে। নইলে বায়ুর বিকারে শরীরের বিকার ও ব্রহ্মাণ্ডেও বায়ুর একটু অসাম্যভাব হলে ঘূর্ণিবাত্যা থেকে সুনামি প্রভৃতি নানাবিধ বিপর্যয় ঘটে। অতএব বায়ুই এই বিশ্বতোমুখ ধাতা ॥ ১০/৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ।।৩৪

অনুবাদ: আমি সংহারকগণের মধ্যে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ প্রাণীদিগের উদ্ভব, আর নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই সপ্তদেবতারূপা আমিই ॥ ১০/৩৪

ব্যাখ্যা: প্রাণের অস্তিত্বই জীবের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব আর প্রাণ যখন নাভিশ্বাস অবস্থায় হৃদয়ে রুদ্ররূপে চেপে বসেন তখনই মৃত্যুরূপ সংহারভাব। তাই এই প্রাণ রুদ্ররূপী হলেই সর্ব্বসংহারক মৃত্যু। আবার ঐ প্রাণই পুনরায় জীবাত্মারূপে ঘটস্থ হলেই আবার উদ্ভূত হন। আগের অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে এ ব্যাখ্যাটা করা আছে। কিভাবে প্রলয়কালে সর্ব্বভূত আমার আকৃতি পায় আবার সৃষ্টিকালে তাদের উৎপন্ন করে থাকি। তিনিই ভবিষ্যৎ প্রাণীদের উদ্ভব। নারীগণের উত্তমা প্রকৃতিও তিনি অর্থাৎ সপ্তদেবতারূপা কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, সাত রকম অবস্থা যা হল কূটস্থে অবস্থানরূপ অবস্থা। এ অবস্থায় বিনা অবলম্বনে মনের স্থির অবস্থালাভ হয় বলে মেধা মানে ধারণাবতী বুদ্ধি, ধৃতি অর্থে ধৈর্য্য, ক্ষমা মানে সহিষ্ণুতা যথা সুখ ও দুঃখে সমভাব মোটকথা আত্মজ্ঞান উদয় হলে মোহ কেটে যায় ও আত্মবিদ্যারূপ শক্তির উদয় হলে সাত রকম শক্তিই আসে যথা – আত্মবিদ্যারূপ শক্তি, আত্মস্মরনের স্মরণশক্তি, ধারণাবতী বুদ্ধিশক্তি, ধৈর্য্যশক্তি, ও সহিষ্ণুতাশক্তি। তাই বললেন নারীগণ মাঝে আমি এই সপ্তশক্তি। সত্যযুগ থেকে শুরু করে দ্বাপর যুগের প্রায় শেষ সময় পর্য্যন্ত অধিকাংশ নারীগণই এমন সপ্তশ্রীর অধিকারিণী জন্মসূত্রেই হতেন। এজন্য সাধারণ সমাজে নারীর স্থান ছিল অতীব উচ্চে। এ জন্যই পুরুষের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম ও নানাবিধ বিধি বিধান থাকলেও নারীর জন্য ওসব কিছুই ছিল না। পুরুষকে গুরুগৃহে গিয়ে অধ্যাবসায় সহকারে এমন গুণসকল অর্জন করতে হত যা ছিল শাস্ত্রাভ্যাসের অতিরিক্ত। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে এসকল গুণ ছিল সহজাত। শ্রীকৃষ্ণের দেহান্তর্দ্ধানের পরই প্রথম যদুকূলে নারীর ব্যাভিচার শুরু হয়েছিল যা দ্বাপর যুগের অবসান ঘটিয়ে কলির আগমন সূচিত করেছিল ॥ ১০/৩৪

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ।। ৩৫

অনুবাদ: আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, বেদ সকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত ॥ ১০/৩৫

ব্যাখ্যা: আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, মানে হল তার মোক্ষপ্রতিপাদক অংশ যে কথা এই অধ্যায়ের ২২ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় আছে, যে কূটস্থে দৃশ্য ঘনশ্যামবর্ণ গোলাকারই সামবেদস্বরূপ যা বিশেষভাবে বড় হয়ে দেখা যায়, তাই বৃহৎ সাম বলা হয়েছে। ছন্দ সকলের মধ্যে গায়ত্রী যিনি অজপারূপ এবং যাঁর ক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক করতে হয় অর্থাৎ মূলাধারস্থ বায়ুকে বিনা রোধে সহস্রারে স্থির করে বেদমাতার দর্শন করতে হয় ও তৎপরবর্ত্তী কর্ম্মের সন্ধান পেতে হয়। এই বেদমাতাই গায়ত্রী। এখন মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ)। মার্গ মানে সুষুন্মামার্গ আর শীর্ষ মানে তার শীর্ষ সমান্তরালে ভ্রুর উর্দ্ধস্থিত যে স্থান যার অগ্রে হয় অয়ন (অগ্রহায়ণ) মানে সূর্য্য ও চন্দ্র নাড়ীস্থিত কালের স্থিরতা হলে পর অবস্থা মানে সেই স্থিরাবস্থাই আমি মার্গশীর্ষ। এমন সুখই প্রকৃত বসন্ত ঋতু কুসুমাকর। আমিই এই স্থিরাবস্থা তাই আমিই সেই বসন্ত ॥ ১০/৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ।। ৩৬

অনুবাদ: আমি বঞ্চকগণের মধ্যে দ্যূত, তেজস্বীদিগের তেজঃ, জেতৃদিগের জয়, উদ্যমশালীদিগের উদ্যম এবং সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব ॥ ১০/৩৬

ব্যাখ্যা: দ্যূতক্রীড়া মানে হল পাশা খেলা, সাধারণ অর্থে জুয়াখেলা। কিন্তু এখানে দ্যূত এসেছে আকাশ শব্দ হতে। দিব্ মানে হল আকাশ যেখানে ভবের পাশা খেলা হয়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আছে “ আকাশে পাতিয়া ফাঁদ ধরি গগনের চাঁদ” অর্থাৎ কৌশলে ভবের এ পাশা খেলায় জিততে হবে। মন বুদ্ধি অহঙ্কার যে ভাবে পাশায় দান দিচ্ছে তাতে জিততে হলে কৌশল অবশ্যই জানতে হবে নিজ নিজ সদ্গুরুর কাছ থেকে। তারপর কৌশল আয়ত্ত হলেই ইড়া পিঙ্গলাকে যোগের দ্বারা যুগ বেঁধে, সত্ত্বগুণকে দিয়ে হৃদয়াকাশে কূটস্থ নামক ফাঁদে, যোগকৌশলরূপ ছলনাদ্বারা মনকে ধরে বেঁধে ফেলতে পারলে, মনের আর কিছু করার থাকে না, সে তোমার ওপর সব দখল হারিয়ে ফেলে। মন ধরার এই যুদ্ধ বা ব্যবসায় যাই বলি, সেই জয়লাভের উদ্যমও আমিই আর সে ব্যবসার উদ্যমও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে আমিই, আর সবচেয়ে বড় এ যুদ্ধের যে সারথিরূপ সত্ত্বগুণ, সে সত্ত্বগুণও আমিই কেননা সাত্ত্বিক না হলে এসব কিছুই হয় না। সেই সকল সাত্ত্বিকগণের মধ্যেও আমি সত্ত্বগুণরূপে বিরাজ করি ॥ ১০/৩৬

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবি ঃ ।। ৩৭

অনুবাদ: আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব (পুরুষোত্তম), আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনা কবি (শুক্রচার্য্য) ॥ ১০/৩৭

ব্যাখ্যা: বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্য আমি বাসুদেব। “বৃষ্ণি” অর্থ প্রচণ্ড জ্যোতিঃ। অর্থাৎ পূর্ণজ্যোতিঃ সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাই বাসুদেব। পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় মানে যিনি সকল ধনাদি ঐশ্বর্য্য জয় করে আনেন। এর ব্যাখ্যা আগেও বলা হয়েছে। আর এক অর্থে এখানে নাভিস্থিত বায়ুর কথা বলা হয়েছে যা হল মনিপুর চক্রস্থিত তেজস্তত্ত্বঃ। ঐ বায়ুরূপী তেজই আমি ধনঞ্জয়। আবার মুনি সকলের মধ্যে আমিই ব্যাস, মানে বেদ বিভাগকারী বেদব্যাস। তিন তিন গুণের তিন তিন বেদ, সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয়ের উদয় ও অস্তের বিভাগ ও খেলা যিনি খেলান সেই প্রাণরূপী আত্মাই দেহপুরে ব্যাসরূপে আছেন। কবি দিগের মধ্যে আমি ঊশনা বা বশীকরণাদি বিদ্যাবিৎ (সধংঃবৎ) শুক্রচার্য্য যাঁর দ্বারা শব্দাদির রচনা হয়। প্রাণ থেকেই শব্দসকল রচিত হয় এবং ব্যান বায়ুরূপে বাক্যাদি আকারে নিঃসৃত হয় আবার শুক্র অর্থও প্রাণ, আচার্য্য অর্থেও প্রাণ। সুতরাং প্রাণরূপী আত্মাকেই এই অর্থে কবি শুক্রাচার্য্য বলা হয় যেহেতু বশীকার বৈরাগ্যপ্রাপ্ত সাধকই উত্তমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করে, তাঁতে চিত্ত লয় করে, সর্ব্বজ্ঞ হয়ে থাকেন ॥ ১০/৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ । ৩৮

অনুবাদ: আমি দমনকারীগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের নীতি, গুহ্য সকলের মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানীগণের জ্ঞান ॥ ১০/৩৮

ব্যাখ্যা : অসংযমীদের সংযত করা বা দমন করার দণ্ড আমারই বিভূতি। প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হলে অখণ্ড প্রাণসত্তার অনুভব হয়, তাই প্রাণায়ামই সেই দণ্ড। এবার নীতি। এই নীতিও সেই সাধনকৌশল যার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের উপর বিজয়লাভ হয়ে থাকে। যতকিছু গোপনীয় হয়ে থাকে সে সব ক্ষেত্রে আমিই মৌনতা। এজন্য ক্রিয়ায় যত প্রবেশলাভ হয় মানুষ ততই মৌন হতে থাকে। এটা নিজ নিজ বোধরূপ, যেজন্য ক্রিয়ার পর কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের জ্ঞানটুকুই আমি। যাঁরা আত্মতত্ত্ব জেনেছেন তাঁদের সেই জ্ঞানই আমি, কারণ তাঁরা আমাকেই জেনেছেন মাত্র, তাই আমিই সেই জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম যা আমারই বিভূতিমাত্র, আসক্তিনাশক বিভূতি ॥ ১০/৩৮

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ।। ৩৯

অনুবাদ: হে অর্জ্জুন যাহা সর্ব্বভুতের বীজ অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ, তাহা আমি। যেহেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে এরূপ চর বা অচর ভূত নাই (আমি ছাড়া কিছু নাই)। ১০/৩৯

ব্যাখ্যা: বিশ্বপ্রকাশের সর্বত্রই আপনার সংস্থিতি বর্ণনা করে কিভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ভাবে আত্মসংযোগ করতে হবে সেটা বলছেন "ঐ তদাত্মমিদং সর্ব্বং" এমন সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান বিস্তারের অনুশীলন করতে বলছেন। চরাচর ভূতসমূহের উৎপত্তি স্থানই ব্রহ্ম বা আত্মা। আত্মা ছাড়া কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। জগৎ প্রপঞ্চও আত্মা থেকে আলাদা কিছু নয়। তাই আত্মায় যে বীজ আছে সেটাই প্রকৃতিতে বিকশিত হয় মাত্র। প্রতি অণুতে আত্মাই বীজস্বরূপ। যিনি অধ্যাত্মে আমার বীজস্বরূপ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তিনিই অধিদৈবে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই আমার আত্মা, বিশ্বাত্মা, সর্ব্বভূতের বীজ। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের জন্যই এ অধ্যায়ের অবতারণা ॥ ১০/ ৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ।। ৪০

অনুবাদ: হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। এই বিভূতিবাহুল্য আমি সংক্ষেপে কহিলাম ॥ ১০/৪০

ব্যাখ্যা: ভগবান বললেন তাঁর বিভূতির অন্ত নাই। খুব সত্যি কথা। তাঁর প্রকাশ অনন্তই বটে, কিন্তু সেই অনন্তের মূল সেই এক বস্তু যার বীজত্বে অনন্ত বিকাশ, অনন্ত বিস্তার, অনন্ত সংহতি। যেটুকু বলা হল ভেবোনা এটুকু আমার সীমা দেখাবার জন্য, ভেবোনা মাত্র ঐটুকুই আমি। বিভূতিরূপে, স্থুল মূর্ত্তরূপে, সত্যি সত্যিই আমিই প্রকাশ হয়ে রয়েছি। এটা বোঝাতেই আজ তোমাকে আমার এই বিভূতি বর্ণনা। এতে বোধোদয় হলে আরও গভীরভাবে দেখার দৃষ্টি খুলবে। ভূমা আত্মস্বরূপ পরমতত্ত্ব প্রকাশ করছেন অর্জ্জুনকে তাই এই "পরন্তপ" নামে সম্বোধন। অর্জুনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। মহাকালের প্রভাবে আজ তার জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। আর একটু পরেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিব্য চক্ষে ও দিব্য প্রজ্ঞায় যে পরম মূর্ত্তি ধারণ করবেন সেই পরম আবির্ভাবটি এখন পুরুষোত্তমের অন্তরে প্রকাশোন্মুখ। তাই ভক্ত পার্থকে পরন্তপ সম্বোধনে বলছেন – হে তাপসশ্রেষ্ঠ, আমার বিভূতিরও অন্ত নেই, আমারও অন্ত নেই ॥ ১০/৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ।। ৪১

অনুবাদ: ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত অথবা প্রভাব বলাদি গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ যাহা আছে, তুমি সে সমূদয়ই আমার প্রভাবের অংশসম্ভূত জানিও ॥ ১০/৪১

ব্যাখ্যা: সকলই যখন বিভূতিমাত্র তখন আর অন্বেষণ করা বৃথা। শুধু কোথায় কোথায় যোগস্থ হওয়ার জন্য ধারণা করতে হবে সেটা সুস্পষ্ট করতেই এই শ্লোক তৈরী হল। তাই শ্রীভগবান বলছেন বস্তু লক্ষ্য করে বিভূতি বলিনি। বস্তুটাতো প্রভবের নিধন, শেষ তামসিক প্রকাশ। ওটাও যে আমি সেটা বুঝতে হলে ঐ বস্তুর মধ্যস্থ প্রভবটা দেখতে হবে। কেন না প্রভা বা তেজই বস্তুর আকার নিয়ে ব্যক্ত। তাই প্রভবই প্রাণ, প্রজ্ঞা ও আত্মবোধ। সুতরাং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, কাজেই আমিই যে ভূতমূর্ত্তি এটা জানতে হলে ভূতের অন্তরে তাঁর যে প্রভব বা প্রাণময়ত্ব, প্রজ্ঞাময়ত্ব ও আত্মময়ত্বকে জানতে হবে। সেই তত্ত্ব জানার জন্যই এই বিভূতিযোগ বর্ণনা হল। তাই হে পরন্তপ, যেখানেই শ্রী দেখবে, প্রাণবত্তা দেখবে, তাকেই আমার তেজোঅংশ সম্ভূত বলে জানবে ও তাতেই যোগস্থ হতে চেষ্টা করবে। যেসকল যোগীদের দৃষ্টি বাইরে স্থির তাদের মনও অন্তর্লক্ষ্যে স্থাপিত, তাঁরা হলেন শাম্ভবীমুদ্রাসিদ্ধ ও অসীম শক্তিসম্পন্ন। যোগদর্শন সমাধিপাদে যে জ্যোতির্ম্ময়ী বিশোকার কথা বলা আছে তা জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবেরই প্রকাশ। ১০/৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।। ৪২

অনুবাদ: অথবা হে অর্জ্জুন, এইরূপ পৃথকাবিধ বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি ? আমি এই সমুদয় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি। (অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই।) ১০/৪২

ব্যাখ্যা: শ্রেষ্ঠেই ঈশ্বর অধিষ্ঠান কথিত আছে এজন্যই সেগুলো বিভূতি। কিন্তু যতবড় প্রকাশই হোক না কেন সেটা অনন্তেরই ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি মাত্র। সারা বিশ্বটাই তাঁর শক্তির একটুমাত্র অংশের দ্বারা বিধৃত রয়েছে। তাঁর জ্যোতির এক কণামাত্রে আলোকিত হচ্ছে ও তাঁর আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের ক্ষীণমাত্র আভাস দিচ্ছে। তাই ভগবান বলছেন – " আমি আমার একাংশে জগৎ বিধৃত করিয়া অবস্থান করিতেছি।" খণ্ডে খণ্ডে লোকে লোকে ঐ ভাবে যোগস্থ হওয়ার অভ্যাস হলে তারপর ভূমাভাবে যোগস্থ হওয়ার অধিকার পাবে। বিশ্বরূপ প্রকাশের ঠিক আগেই একাংশে জগৎ বিধৃত আছে এটুকু দর্শন

করতে বললেন। স্ফটিকের ভিতর রক্তবর্ণ রঞ্জনার মত জগৎ আমার অন্তরে একাংশে অবস্থান করছে। ক্রিয়া করতে করতে প্রথমে তৃতীয় নেত্র কূটস্থ পেয়ে শিব হয়, পরে সেই কূটস্থ স্থির হলে বিষ্ণু হয়। বিশ্বরূপ দর্শন অর্থে আত্মারই প্রভব বিশ্বাকারে প্রতিভাত হতে দেখা। সবকিছু সহ্য করে ক্রিয়া করে গেলে এ জগৎ তখন আর তামস ও জড়তাময় বলে প্রতিভাত হয় না। চিরজ্যোতির্ম্মণ্ডিত ভাবে উপলব্ধি হয়। মূলাধারে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে অভ্যন্তরস্থ শক্তিময়ী মূর্ত্তি, প্রাণময়ী মূর্ত্তি, দেবতাময়ী মূর্ত্তি প্রকট হয়। ‟পাদোহস্য বিশ্বভূতানি” চিদঘন পরমাত্মার প্রভবময় পাদই এই বিশ্বরূপ। ব্যাপ্ত সৃজনে, নিযুক্তা পালনে ও প্রবুদ্ধা সংহারে এ শক্তিপ্রভবেই মহাকাল বিশ্বরূপ। ভূত ভবিষ্যৎ এরই অঙ্গে মিথুনীকৃত। ভূত ভবিষ্যতের মিথুনই জীবের বর্তমান, বর্তমানের আত্মবিভাগই ভূত ভবিষ্যৎ। তাহলে বিভাগ ও মিথুন – এটাই ভোগ, এটাই ক্রমকাল, বিভাগ মিথুনের অবসান নিধন – এইই ভগ – মহাকাল যা যোনিমুদ্রার বাহ্যরূপ – আনন্দঘন তমঃ করাল, যার বাইরে চর্ব্বণ – ক্রমকালের কলন, ভিতরে গ্রসন – মহাকালের তর্পণ। আত্মচর্ব্বণ, আত্মগ্রসন ও আত্মতর্পণ হল যেনিমুদ্রার ভীমাশোভা। হৃদয়ের মাঝে সকল যজ্ঞের সাক্ষী যা বিভূতিযোগ দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেলল –– প্রকাশ হল শুভ্র শুক্র, প্রশান্ত শাশ্বত শিব স্বয়ম্ভু, তারই অন্তরে যে কাল শোভা। ওখানেই জীবাত্মার ভূত ভবিষ্যৎ লুকানো আছে। চেষ্টা করলে সকলেরই এ অবস্থা উপলব্ধি হতে পারে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সাথে স্থির হয়ে গেলে হবে মুক্তচক্ষু। তখন আর বুদ্ধির নিজ চেষ্টা থাকে না, যদি বিভূতি যোগের করা যায় তীব্র সাধনা। মূল কথাটা হল বিভূতি ও তাতে যুক্ত হওয়া এই দুটো বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে তাই এটা বিভূতিযোগ ॥ ১০/৪২

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদগীতা রূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে বিভূতিযোগো নামক দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার দশম অধ্যায়ের যৌগিক ও অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ :- আগে নবম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সারসংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে। বিভূতি অর্থ আবির্ভূত বা উৎপন্ন হওয়া এবং যোগ অর্থ মিলিত বা লয় হওয়া। নানাবিধ ভাবে, নানাবিধ রূপে, বিশেষরূপ উৎপত্তি ও ঐ উৎপত্তির লয়রূপ ভাব যা কিছু এককথায় ব্রহ্ম হতে সব উৎপত্তি ও ব্রহ্মেতেই লয় এই (ঃংঃবস) ব্যবস্থার বিশেষভাবে উপলব্ধিই বিভূতিযোগ। এ উপলব্ধি অবশ্যই গুরুপদিষ্ট উপায়ে সাধন সাপেক্ষ। মূল কথা হল ভগবান অলক্ষ্যে এই বিশ্বসংসার পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে ছাড়া জগতে কেউ নেই, কিছুই নেই। এ বিভূতি বর্ণনা শুনে অর্জ্জুন

সাক্ষাৎভাবে ভগবানের মহত্ব ও ঐশ্বর্য্য দেখতে চাইলে ভগবান তাঁকে তাঁর সংহার মূর্ত্তি মহাকালরূপে আবির্ভূত বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। দেখুন এ বিশ্বরূপ দর্শনযোগ পরবর্ত্তী একাদশ অধ্যায়ে ॥

শ্রীমদভাগ্বদগীতার ব্যাখ্যা

ওঁ

অথ একাদশোহধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ (১১)

অর্জুন উবাচ -

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগত মম ।। ১

অনুবাদ: অর্জুন কহিলেন, আমাকে অনুগ্রহার্থ পরম গোপনীয় আত্মবিষয়ক যে বাক্য তুমি বলিলে, তাহাতে আমার (আমি হন্তা, ইহারা হত হইতেছে এইরূপ) মোহ দূর হইল ॥ ১১/১

ব্যাখ্যা: যোগী ব্যতীত সাধারণ মানুষের ধারণায় ভগবানের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নেই, আত্মা পরমাত্মার কথাতো বাদই দিলাম। মানুষের ধারণায় ভগবান নামক কোনও ব্যক্তি নীল আকাশের উর্দ্ধে কোথাও স্বর্গলোকে বসে মানুষের কর্ম্মাদির বিচার করেন ও পাপ পুণ্য প্রদান করেন এমন একটা কিছু ব্যাপার আর কি। মানুষ আরও মনে করে জগতের বস্তু সকল নিজেরা নিজেদের জন্যই রয়েছে, নিজেদের শক্তিতেই চলছে ও নিজেদের কাজকর্ম্ম সকল করছে। ইন্দ্রিয় ও মনের এই যে ভীষণ দুরপনেয় ভ্রান্তি এটাই ছিল অর্জুনের মোহ এবং কর্ম্ম পরিত্যাগের মূল কারণ। শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করে অর্জুনের এই ভ্রান্তি ও মোহ দুর হল। তাই এখন পার্থ বিগতমোহ। নারায়ণ স্বয়ং আজ তার গুরু, চক্ষুদাতা। এমন মোহাপসারণের প্রথম লক্ষণই হল দেহাত্মবোধের তিরোধান, পরিবর্তে জ্ঞানবপু আত্মাই হয় সর্বস্ব। তখন বিশ্ব বা দেহ – অধ্যাত্মদেহ – অধ্যাত্মবিশ্ব রূপে উপলব্ধ হয়। আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিতে সমগ্র ভৌতিক সত্তা জ্ঞানময় সত্তারূপে প্রতিভাত হয় এবং যখন জ্ঞানময় তখন আত্মময়। কারণ আত্মবোধশূন্য কোনও জ্ঞানক্রিয়া হয় না। সুতরাং জ্ঞানময় বিশ্বদর্শনের পরিণতি হয় আত্মময় জগৎ দর্শন। ভৌতিক বিশ্বপ্রকাশের অন্তরে এমন জ্ঞানময় বিশ্ব গুহ্যভাবেই অবস্থিত। সুতরাং সেই সংক্রান্ত জ্ঞানও পরমগুহ্য জ্ঞান। এজন্য অর্জুন ভগবদ্‌বাণীকে ‟গুহ্যং” বলে অভিহিত করেছেন। গুপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যাই গুরুবাক্যগম্য। মোহ অপগত হলেই কেউ আর বৃথা কর্তা সেজে অহঙ্কার করে না। পরম দয়াল গুরুদেব আত্মস্থ হয়ে জীবকে যখন এই জ্ঞান দান করেন যে তুমি

কে ? আমি কে ? তোমার আমার সাথে এ জগতের সম্বন্ধ কি ? তখনই সেই গুপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবেই শিষ্যের মোহ নষ্ট হয়। আর কোনও উপায় নেই। ১১/১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ।। ২

অনুবাদ: হে কমলপত্রাক্ষ, তোমার নিকট হইতে আমি ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় এবং অক্ষয় মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ শুনিলাম ॥ ১১/২

ব্যাখ্যা: সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যে শাশ্বত আত্মারূপে যিনি বিরাজিত সমস্ত বিশ্ব তাঁরই যোগ, সবকিছু সমস্ত ঘটনা সে যোগেরই প্রকাশ, সমস্ত প্রকৃতিই এই নিগূঢ় ভাগবতসত্তায় পূর্ণ এবং তাঁকে প্রকট করাই প্রকৃতির সব কাজকর্ম্ম ও সমস্ত চেষ্টার উদ্দেশ্য। এই দর্শন বিজ্ঞান বুঝে নেবার পর অর্জুনের সংকীর্ণ চক্ষু আজ বিশাল, আয়ত ও মুক্তদৃষ্টি লাভে উন্মুখ তাই তিনি ভগবানকে কমলপত্রাক্ষ বলেছেন। সকলেই মনে করেন বুঝি কমলপত্রাক্ষ মানে পদ্মফুল বা পদ্মদলের মত ভগবানের চোখ বা ভগবদ্‌চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝি বা ঐ রকম কিছু। আসলে তা নয়। কমল (কামনা=কম=কামনা+অল=ভূষিত করা) অর্থে ইচ্ছা বা কামনা মন্ডিত, সর্বকামপ্রদ সর্বইচ্ছাপূরণময় তাঁর দৃষ্টিতে দেখতে পেলে জীবের সকল বাসনা সিদ্ধ হয়, সকল প্রাপ্তব্য লাভ হয় এমন অর্থ। তাই তাঁকে অর্জুন বলছেন তুমি পদ্মপাতার মত গোলাকার আঁখিস্বরূপ। মানেটা হল সাধকের সৌভাগ্য উদয় হলে, কূটস্থের মধ্যে জ্যোতির্মণ্ডলে তুমি যে গোলাকার রূপে রয়েছ, ঐ গোলাকারই জীবের জ্ঞানচক্ষুস্বরূপ এই উপলব্ধি জন্মায়। তাই এই কূটস্থচৈতন্যরূপে তুমিই কমলপত্রাক্ষ। তোমার এমন রূপ দেখলে কর্তৃত্বাভিমান চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় সাধক তখন তাঁকে অসঙ্গ ও উদাসীনবৎ বুঝতে পারেন। তাই তিনিও তেমনটা হয়ে যান, তাই "অহং কর্ত্তা" এমন মোহ আর থাকেনা ॥ ১১/২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ।। ৩

অনুবাদ: হে পরমেশ্বর, যেরূপ তুমি আপনার বিষয়ে কহিলে, ইহা এইরূপই বটে, হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ (আত্মরূপ) দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ১১/৩

ব্যাখ্যা: ভগবান নীরব নিষ্ক্রিয় অক্ষর আত্মারূপে সর্বত্র বিরাজ করছেন। অলক্ষ্যে সবকিছুকেই ধরে রয়েছেন। পুরুষোত্তম যখন রূপময়, ঐশ্বর্য্যময় তখনই তিনি ব্যক্ত পরমেশ্বর। সেজন্য ভগবানকে পরমেশ্বর সম্বোধনে বলছেন যে তোমার যেমন রূপ বর্ণনা করলে, হে পুরুষোত্তম, তোমার সেই

ঐশ্বর্য্যময় রূপ দেখতে ইচ্ছ করি। এই বলে পুরুষোত্তমের সেই জাগ্রতরূপ সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে চাইলেন । ইতিপূর্বে যে কথা বলা হয়েছিল যে, পুরুষোত্তম যখন অব্যক্ত তখন অক্ষয় পরমেশ্বর, যখন ব্যক্ত তখন তিনিই বিশ্বরূপময় পরমেশ্বর, এই প্রজ্ঞা এখন অর্জুনের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমে এই দুটো ভাগে যে স্বতন্ত্রতা দেখা যায়, দেহাত্মবোধ হারাবার সাথে সাথে আত্মার বিভুত্ব প্রকাশ হলে সে বিভাগটাও অদৃশ্য হতে থাকে প্রথমদিকে জ্ঞানক্রিয়ার উপলব্ধিটা খুব বেশি থাকলেও পরে যখন আত্মতত্ত্বই অসীমরূপে দেখা দেয় তখন আর আগের সেই শক্তি ও শক্তিমান ভেদটা থাকে না। " জ্ঞানম্ অনন্তং, জ্ঞেয়ম্ অল্পম্" হয়ে আত্ম অনাত্ম বিভাগ আর থাকে না। ভূতে ভূতে প্রজ্ঞান ও প্রজ্ঞানঘন আত্মাকে দর্শনের এটাই ফল। বিভূতিযোগ সাধনার এই পরিণতি অর্জুনের হৃদয়ে প্রকাশে উন্মুখ। গুরুনির্দ্দিষ্ট উপায়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভূতে ভূতে প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞায় আত্মা দেখতে দেখতে বিশ্ব ভরে যায়, হয়ে যায় বিশ্বভরা প্রাণ কিন্তু ব্যক্ত জৈব সংস্কার গেলেও অব্যক্ত জৈব সংস্কার ক্রিয়াশীল এবং তার প্রভাবে প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে জৈব সংকীর্ণতা চেপে থাকে। তাই সবকিছু জেনেও জানা হয়না, দেখেও দেখা হয় না, পেয়েও পাওয়া হয় না। তাই এই অব্যক্ত জৈব সংস্কার মোচন হবে বলেই বোধ করি, অর্জুনের এত আবেগ, নতজানু হয়ে পার্থ আজ প্রার্থী "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম।" মানে হল আত্মার যে রূপ ঈশ্বরের তা দেখতে ইচ্ছা করি তত্ত্বের দ্বারায়। অন্তরের অনুভবসকল তো খুবই চমৎকার। তাতে আর কোনও অবিশ্বাস নেই। এখন একবার তত্ত্বতঃ বুঝতে চাই কি করে তোমার একাংশে এ বিশ্বরূপ থাকতে পারে ? ক্রিয়া করাকালীন ছোটখাট কখনও বা বড় ও অনেক রকম দৃশ্য দেখা যায়। এগুলো সাধকের হৃদয়ে যা কিছু মগ্ন অবস্থায় ছিল তারই প্রকাশ হয় মাত্র একটু একটু করে। কিন্তু এসব কিছু নয়, ক্রিয়া করে কূটস্থে উত্তম পুরুষকে দেখতে হবে যা প্রথমে সুষুম্নামার্গে দীপ কলিকার মত দেখা যাবে। ভ্রূমধ্যস্থ যে বিন্দু দেখা যাবে ওটাই সৃষ্টি স্থিতি লয়াত্মক। ক্রিয়া না করলে ওসব পূজোটুজো করা সব বৃথা। কূটস্থের মধ্যকার ঐ সূচাগ্র পরিমিত বিন্দুর ভিতর এ অনন্ত বিশ্বভরা যার ভিতর অত্যাশ্চর্য্যময় সহস্রদলপদ্মে শিবশক্তি সম্মিলিত জগন্মাতা ও জগৎপিতা এক অঙ্গে মিলিত। সেটাই ব্রহ্মের একাংশ। এই একাংশই বিরাট বিশ্বরূপ যা অর্জুন এখন দেখতে চাইছেন। বলছেন, "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম।" হে পুরুষোত্তম্, আমি তোমার আত্মরূপ দর্শন করতে ইচ্ছা করি ॥ ১১/৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানব্যয়ম্ ।। ৪

অনুবাদ: হে প্রভো, যদি আমি সেই রূপ দেখিতে পারি এরূপ মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, তুমি আমাকে সেই অব্যয় আত্মরূপ দেখাও। ১১/৪

ব্যাখ্যা: যিনি গুরুপদানত হতে পেরেছেন তাঁর আর আত্মাভিমান থাকে না। তাঁর মনে হয় আমি কত ক্ষুদ্র আর গুরুদেব কত অপার ! কখন এমনটা হয় ? যখন নমিত হয় সাধক শক্তিসাধ্যের চরণে। আত্মা হয় সমর্পিত, স্বীকৃত হয় প্রভূত্ব তাঁর সাধ্য সাধক সংগ্রামে। সকল বোঝা, সকল জানা, সমস্ত সাধন প্রচেষ্টা, সবকিছুর মূলে প্রভু তুমি, শুধু তুমি, প্রভু তুমি, নিয়ন্তা তুমি। আমার যা সমস্ত চেষ্টা – সে তোমারই শক্তিধারার দেওয়া আবর্তন। তোমার আলোকই আমায় করে প্রজ্ঞাময়, তোমার প্রীতিই আমায় করে তোমার জন্য ব্যাথাব্যাকুল, তোমাতে আমাতে যোগ সংঘটনের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব তোমার। তোমাতে আমাতে যোগই তোমাকে দেখা, যে যোগের কর্ত্তা তুমিই একমাত্র যোগেশ্বর। যদি মনে কর এ ভৃত্যে দেওয়া হয়েছে যোগ্যতা, হয়েছে তার হৃদয় প্রণত, তবে তোমার অব্যয় আত্মমূর্ত্তি আমায় দেখতে দাও। ভবরোগ কাতর ব্যক্তি যদি ভয়ব্যাকুল হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করেন তবে তাঁকে তিনি অভয় দান করেন। ভগবান যোগেশ্বর। তাঁর অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া তো সাধারণ বিষয় নয়। যোগেশ্বর স্বয়ং পরমাত্মা, সমস্ত শক্তি প্রকাশ তাঁরই, সমস্ত সংঘটনই তাঁর ইচ্ছার পরিপূরণ, সকলশক্তি ক্রিয়াশীল হয় তারই ইচ্ছা মাত্রে, এমন ধারণা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণই দুর্ব্বহ কর্তৃত্ব, যত কর্ম্ম, যত কর্ম্মফল, সব তাঁরই মাথায়, তাঁকেই সবকিছু বইতে হয়। গুরুকৃপা বিধিমত লাভ হলে অন্তরে অতি চমৎকার অনুভূতি হয়। প্রকৃত শিষ্যের তাঁতে কদাচ কোনও অবিশ্বাস হয় না। কিন্তু একবার তত্ত্বতঃ বুঝতে হয় কি করে পরমাত্মার একাংশে এমন বিশ্বরূপ থাকতে পারে। কূটস্থে যে সাধক থাকতে পারেন তিনি তো শিব হয়ে যান। তাঁর চারদিক থেকে যে সব অনুভব এসে থাকে, জানবে সে সমস্ত আগে থেকেই সাধক হৃদয়ে মগ্ন ও সুপ্ত অবস্থায় ছিল, সাধনার বলে সব একটু একটু করে খুলতে থাকে। দশ ইন্দ্রিয় দমন করে ক্রিয়া করলেই এসব খুলে যায়। ছয় চক্রবিশিষ্ট ওঁকাররূপ শরীরই মায়া, ছয় চক্রে ক্রিয়া করলেই সাধকের কুণ্ডলিনী উত্থান হবে, উত্থিত অবস্থা পাকা হলে কূটস্থে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিত কোটিসূর্য্য প্রভা দেখা যাবে। এই একাংশই সেই বিরাট বিশ্বরূপ যা অর্জুন এবার দেখতে চাইছেন। এ রূপ দেখতে হলে সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে হয়। আর এ সমর্পণ যথাসময়ে করতে হলে গুরুরূপী ঈশ্বর উপদেশের ক্রমধারাকে অনুসরণ করতে হয়। শুধুমাত্র গুরুকেই জ্ঞান কর। ক্রমশঃ বুঝবে যে ঐ জ্ঞানই তোমার গুরুমূর্ত্তি যাঁর দর্শন বর্ত্তমানে তোমার একমাত্র লক্ষ্য যদি না তুমি ইতিমধ্যই নাস্তিক হয়ে থাকো। তবেই বিশ্বরূপে প্রকট ভগবানের সহস্র সহস্র মুখ হতে সাধককে সে কাজের আদেশ গ্রহণ করতে হবে ॥ ১১/৪

শ্রীভগবানুবাচ -

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ।। ৫

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে পার্থ, আমার অলৌকিক, নানাবিধ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ ॥ ১১/৫

ব্যাখ্যা: এবার কূটস্থের অনুভব শুরু, যার রূপ শত সহস্র। আজ পার্থের ভাগ্যাকাশে অরুণোদয়। তাই ভগবানও বললেন, পার্থ, আমার অনন্ত মহিমময় মূর্ত্তি দেখ। আয়তনে আয়তনে প্রবিষ্ট হয়ে অমিই হয়েছি জীবভূতা। একই চিতিশক্তিরূপা আমি, অথচ দেখ, আমার বিজ্ঞানবীর্য্যে আমারই উপর রচিত কত শক্তিলীলা। কত তার জ্ঞানায়তন। নানা বর্ণ, নানা আয়তন, রূপও তার নানা রকম। এক হয়েও একই অঙ্গে নানা আয়তনে ও আকৃতিতে, নানা বর্ণের রূপ বিচ্ছুরণে, একই দেহে সহস্রে সহস্রে, আমিই বিভক্ত হয়ে রয়েছি, দেখ। একই আত্মবোধের বুকে ফুটিয়ে রেখেছি সহস্রে সহস্রে কত রূপ, অনন্তে অনন্তে কত না আয়তন। আর সেই আয়তনে আয়তনে প্রবিষ্ট হয়ে আমিই হয়েছি জীবভূতা। আত্মার এই নানাত্ব দর্শন কর। আঁধার ঘরে আলো জ্বলে উঠলেই যেমন ঘরের ভিতর কোথায় কি আছে সমস্ত দেখা যায়, তেমনই ক্রিয়া করলেই আপনা আপনি ভিতরে সব কিছু প্রকাশ হয়। আলোতে পথ দেখার মতই ক্রিয়া দ্বারা সেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায় যিনি সকল কিছুর প্রকাশক, প্রদর্শক হয়ে কূটস্থে বিরাজ করছেন। আমরা বাইরে যে সব আকৃতি দেখি তারই যে কত রকমভাবে বর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে সে সমস্ত এ চোখে দেখা যায় না। কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে সেই দৃষ্টিতে তাঁরা এ সকলই বুঝতে পারেন ও দেখতে পারেন। তাই লোকের কৃতকর্ম্ম ও অভিপ্রায় জানতে ও বুঝতে তাঁদের আর কিছু বাকি থাকে না। তাই শরীরে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম মিলিত হয়েই এ শরীর। পঞ্চতত্ত্ব বিনা এ শরীর হয় না, তাদের সূক্ষ্ম অণুস্বরূপ সকলের ভিন্ন আকারগুলোই যোগীরা দেখেন যাতে হলুদ, সবুজ, লাল, জংলা, ময়ুরকণ্ঠী রংসকলও তার ক্রমপরিবর্ত্তন। আবার এরই দ্বারা বাইরে ভিতরে পরিবর্তন সকল দেখতে পান। পরে সকল তত্ত্বাতীত ব্রহ্মকে দেখে সর্ব্বভূতে প্রবেশের ক্ষমতা হয় ও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। কূটস্থের দ্বারা এমন অনুভবই সেই বরদা দেবীর আবির্ভাব সংঘটন, যার দ্বারা পুরুষোত্তমের এমন দর্শনলাভ পার্থের হৃদয়ে ঘটছে। ১১/৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ।। ৬

অনুবাদ: হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীদ্বয় ও উনপঞ্চাশৎ মরুৎ (আমাতে) দেখ। অনেক অদৃষ্টপূর্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে অবলোকন কর। ১১/৬

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে সব অলৌকিক রূপ দেখাবেন বলে ভগবান বললেন, সেগুলো কি ? সেগুলো ভগবানেরই সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রূপ, একটু ভেবে দেখ, যা তোমার ভেতরেও আছে। কূটস্থের ভিতর কত তেজ দ্বাদশ সূর্য্যসম যার কথা আগের অধ্যায়েও (২১ নং শ্লোকে) বলা হয়েছে। একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসু (আগের অধ্যায়ের ২৩ নং শ্লোকে) অশ্বিনীদ্বয় মানে প্রাণ ও অপানরূপ যুক্ত বায়ু ও শরীরের ভিতরের উনপঞ্চাশ বায়ু (আগের অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে আছে) এবং আরও অনেক কিছু যা সমস্ত কিছু সবই কূটস্থের মধ্যেই দেখতে পাবে। অপান বায়ুর স্থান নাভি থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত। অপান বায়ুর স্থানের ভিতরই জলতত্ত্ব ও ক্ষিতি তত্ত্বের উৎপত্তি এ জন্যই নকুল ও সহদেবকে অশ্বিনীকুমারসুত বলা হয়। তাই প্রাণ ও অপান যুক্ত বায়ুই অশ্বিনীদ্বয়। লোকবিস্ময়কর এমনতর ব্যাপারগুলো সবই এই জীবদেহেই ঘটে থাকে। যোগীরা সকল আশ্চর্য বিষয়ের অনুভব এই কূটস্থেই করে থাকেন। নিজ আকৃতিও এই কূটস্থেই অনুভব হয় ও দেখা যায়। আবার যাঁরা গত হয়েছেন এবং আবার পরে জন্মাবেন, তাঁদেরও যোগীরা কূটস্থের মধ্যেই দেখে থাকেন। এর চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কিই বা থাকতে পারে ? ১১/৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ।। ৭

অনুবাদ: হে গুড়াকেশ, আমার এই শরীরে একত্রস্থিত সমুদয় চরাচর জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা এখনি দেখ ॥ ১১/৭

ব্যাখ্যা: এখন দেখ আমার এ দেহে একসাথে অবস্থিত সমগ্র চরাচর বিশ্বজগৎ, আজ যখন তুমি আর সে নিশাঘোরে নিশামোহে নাই, বিজিতনিদ্র হয়েছ, তাই উদয়াস্তহীন জ্ঞানসূর্য্যরূপে আমি আজ উদিত তোমার হৃদয়ে। তাই যা কিছু দেখতে চাও দেখ সব আমারই অঙ্গে। এই কূটস্থমণ্ডলের ভিতর চর অচর ভেদে সকল জীব ও সব জিনিষই দেখা যায়। তবে ঐসকল জীব ও বস্তু সব কিছুই আত্মারই প্রতিরূপ, অন্য কিছু নয়। আত্মাই সর্বত্র যেহেতু আর দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই চিত্তেরই প্রতিবিম্ব। এ দেহ ব্রহ্মনিরঞ্জনরূপ অঙ্গ। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে ওখানেই সব কিছুর উপলব্ধি হয়ে থাকে, তবে একটু লেগে থাকতে হবে। জীবনের কোনও একটা কাজ, যা বর্তমানে দেখা যায়, প্রথমে তার আদিরূপ কেবল কল্পনায় থাকে। কল্পনারও আগে যা কারণরূপে বর্তমান থাকে এবং ভবিষ্যতে সে কাজটার যে পরিণতি হবে বা আকার নেবে তার সবটাই একসাথে এ কূটস্থের মধ্যে সাজানো আছে। যেহেতু তিনি অখণ্ড মহাকাল তাই এই খণ্ডকাল ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এ সবই তাঁর মধ্যে এক সঙ্গে থাকে। যাঁরা সর্ব্বদা কূটস্থে থাকেন তাঁদের কাছে এটা আর রহস্য থাকে না, ফলে তাঁদের অজানাও কিছু থাকেনা। কিন্তু যোগী না হলে এটা ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানও যায় না, এ রহস্যের সন্ধানও পাওয়া যায় না। যেটা অজানা সেটাই রহস্য হয়ে থাকে। অর্জুন সেই অধিকার প্রাপ্ত যোগী যেহেতু তিনি নিদ্রাশূন্য গুড়াকেশ হতে পেরেছেন। সমাধিনিষ্ঠ না হলে নিদ্রাশূন্য হতে পারা যায় না। আমার দেহরূপ এই নিরঞ্জন স্থানে মন রেখে তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন কর, আরও যা যা কিছু দেখতে চাও, সবই এখন দেখ। অর্জুন এখনও এটা দেখতে পারেননি। ভগবানের কৃপা হলেই শিগগীরই দেখবেন ॥ ১১/৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।। ৮

অনুবাদ: কিন্তু তুমি এই স্বীয় চক্ষুদ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না। অতএব তোমাকে দিব্য (জ্ঞানময়) চক্ষু দিতেছি। আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর ॥ ১১/৮

ব্যাখ্যা: মানুষের চোখ শুধু সবকিছুর বাইরের দিকটাই দেখতে পায় অথবা সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে অনন্ত রহস্যের কেবল কয়েকটা দিকেরই আভাসমাত্র পায় আর তাতেই সে হয়ে ওঠে আবিস্কারক, বিজ্ঞানী এমনই সব নানারকম উপাধিময়। কিন্তু দিব্য যে অন্তর্দৃষ্টি তার দ্বারা ভগবানকে তার যোগে দর্শন করা যায়। আর এমন দর্শন হলেই এক ভগবানের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্রময় নিগূঢ় বিশ্বলীলার নিগূঢ় ঐক্য ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। তাই এখন এ চোখ বন্ধ করে অন্তর্দৃষ্টি সংযোগ কর তবেই সেসব দেখতে পাবে। নইলে জৈব সংস্কারের সংকীর্ণতায় ভগবানে আত্মহারা হয়েও হতে পারবে না। শ্রীগুরুদেব কৃপা করে যে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেন সেটা আকাশের মত, সেই আকাশচক্ষুতে ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু ফুটে ওঠে। সেই আকাশে যাঁরা মন দিতে পারেন তাঁরাই ভগবানের যোগৈশ্বর্য্য কি সেটা বুঝতে পারেন। এমন অলৌকিক জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই এই রূপ দেখা যায়। কিন্তু সমস্যাটা হল জৈব সংস্কারে সর্ব্বদা যে বিষয়গুলো ভোগ করি, শুধুমাত্র সেই সব লৌকিক জ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোনও অলৌকিক জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশই ঘটে না। এটা ক্রমদর্শনরূপ সংকীর্ণতার ফল। ভৌতিক দেহ ও জগৎ ভূলে জ্ঞানময় বিশ্ব ও জ্ঞানময় আপনি এমনটা হয়ে এমনটা দেখার ভিতর সমাহিত থাকতে থাকতে ক্রমজ্ঞান বা কালজ্ঞান সরে যায় ও নিত্য (universal) জ্ঞানের বিভাস উঠে মহাকালের চেতনা দেয়। তখনই হৃদয় প্রদ্যোতনশীল হয় ও ভক্তিজ্যোৎস্নার আলোতে অন্ধকারময় জৈব স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। এই নিত্যজ্ঞানভূমিরূপ মহাকালের প্রকাশে তার আত্মবোধ সমুজ্জ্বল ও প্রতিভাশীল হয় আর আত্মাকাশে প্রকাশিত হয় অলৌকিক লোক। এমন অলৌকিক দর্শনযোগ্যতাই দিব্যচক্ষু। সকল দরজা খোলা থাকলেও আত্মক্রিয়া দ্বারা যিনি নিজেকে বশ করতে পেরেছেন, তিনি অলৌকিক বস্তু দেখতে পাবেন প্রত্যক্ষভাবে। ব্রহ্মবস্তুই আত্মা, তাইই গম্য বস্তু, তাতেই সকলের যাওয়ার কথা। তবে অন্ততঃ

সাময়িক ভাবে হলেও জৈবসংস্কার বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে না গেলে এই চক্ষু প্রকাশ পায় না। প্রাণায়ামরূপ ক্রিয়াই সেই গম্য বস্তুতে নিয়ে যায়। একমাত্র যেমন স্থিরবুদ্ধির দ্বারা তাঁকে পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র ক্রিয়া করেই সে বুদ্ধিকে স্থির করা যায়। নিজ নিজ সদ্গুরুগণ এই চক্ষুদান করে থাকেন। এতে মনঃসংযোগদ্বারা অন্তর্জগতে লক্ষ্য হলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে। সদ্গুরু নিজের সাধনশক্তি দ্বারা শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে যখন কৃপা করেন তখনই শিষ্য কত অপ্রত্যক্ষ জগৎফল নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হয়, আর বলে "গুরুকৃপাহি কেবলম্"। গুরু উপদেশে উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা সমানবায়ুতে স্থিতিলাভ করতে পারলে ভ্রূমধ্যে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের মত এক জ্যোতি দেখা যায়, ওটাই সূক্ষ্ম শরীর। ঐ জ্যোতির প্রভাবে এক জায়গায় বসেই অর্থাৎ ঐ অবস্থায় শরীরটা রেখে সর্ব্বত্র দর্শনের শক্তি হয় এবং সূক্ষ্মশরীরে সর্ব্বত্র যাওয়ার ক্ষমতা জন্মে। এমনই দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে অসাধারণ এই যোগ দেখতে ভগবান সকলকে বলছেন। অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দেবার কথা তোমরাও তো শুনলে এখনও স্থির করে নাও নিজদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত – চিরদিনের জন্য কি জীবত্বই চাও অথবা জীবত্বকে ভুলে গিয়ে আত্মসত্যের প্রতিষ্ঠা, কোনটা চাও ভেবে দেখ। দিব্য যে অর্ন্তদৃষ্টি তা দিয়ে ভগবানকে তাঁর যোগে দর্শন করা যায়। এক ভগবানের মধ্যেই এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্বলীলার নিগূঢ় ঐক্য ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় ॥ ১১/৮

সঞ্জয় উবাচ –

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শমায়াস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ।। ৯

অনুবাদ: সঞ্জয় কহিলেন। হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পরে পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥ ১১/৯

ব্যাখ্যা: এই কথা বলে ভগবান অর্জুনকে নিজের রূপ দেখালেন। সে রূপ দেখে অর্জ্জুনের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা এখানে ছয়টি শ্লোকে সঞ্জয় বলছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে। কে কাকে দেখালেন ঐশ্বররূপ ? মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে দেখালেন। অর্থাৎ পরমাত্মা জীবাত্মাকে দেখালেন। কেমন করে ? মানে অবিদ্যা দূর করে বদ্ধকে দিলেন মুক্তির অধিকার। বিবেক উৎপন্ন হলেই অন্ধেরও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। আগেও বলা হয়েছে আমার আমিত্বের মূলে, জন্মস্থলে প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মাতে উপনীত হবার পথে আত্মবোধ অবলম্বনে এগিয়ে গেলেও সেখানে থাকতে পারিনা। এমনকি নিজের বোধটাকে ভূমা ভাবের আভাসময় করেও ফিরে আসতে হয়। তার কারণ হল জৈব আমিত্বটাকে ছাড়তে পারিনা। আমাদের এই'আমি'টা বেঁচে থাকে তিন গ্রন্থিতে – মনে, প্রাণে, সংস্কারে। এ'আমি' র জ্বালা এমনই জ্বালা! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর থাকার ঘরটীতে কাঠকয়লা দিয়ে লিখে রেখেছিলেন – "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"। যদিওবা মনের তলার "আমি" টা মরল তো প্রাণের তলার "আমি"টা বেঁচে রইল। আবার যদিও প্রাণের তলার "আমি"ও মরল, প্রাণ মন যদিও সেই প্রজ্ঞানঘন পদে নত, নমিত হল, "আমি"র আর কোনও স্বাতন্ত্র্য ব্যক্ত হল না কিন্তু সেই আমিত্বের সংস্কারটা থেকে গেল, ফলে " আমি" অধিভূত ভাবে থেকেও তার কাজ সে করে যেতে থাকল। আসলে এটা হল সমাধিস্থ হবার ঠিক আগে এবং সমাধি ভাঙ্গার ঠিক পরের অবস্থাটা। এ সময়টায় জীব পরমাত্মায় লাগলেও, কাছাকাছি পাশাপাশি হলেও তা থেকে আলাদা থাকে। দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সমাধিস্থ হয়েও আবার ফিরে আসে, সমাধি ভঙ্গ হয়। এটাই জীবাত্মার ধর্ম্ম। মুক্ত হলেও জীবাত্মা জীবত্ব হারায় না। সকল অবিদ্যা নাশের পরও জীব সেই জীবই থাকে। সমাধিস্তরের আগে সত্যবিবেকলাভে মনটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় – একটা বক্তা অপরটা শ্রোতা। দীর্ঘ সাধনার দ্বারা পূর্ণ অনাসক্তি এলে তবেই অবশ্য এমনটা হয়, এটাই জৈব আমিত্বের বিস্মৃতি, অন্ততঃ সাময়িক হলেও। এমন অনাসক্তি থেকেই বিবেক উৎপন্ন হয় ও পরম ঐশ্বররূপ দেখা যায়। কূটস্থের মধ্যে দিব্যজ্ঞান প্রভাব ও মহাযোগেশ্বর ভাব প্রকাশিত হয়। মনের নিম্নগামী বৃত্তিগুলো তিনি হরণ করে নেন বলেই তিনি হরি। তা নইলে এই বিষয়ে মননশীল মন কিছুতেই স্থির হতে পারতো না। আর মন স্থির না হলে বিশুদ্ধ হয় না, বিশুদ্ধ না হলে কেউই ঈশ্বরভাব দেখতে পায় না। জীব নিজের নিজত্বটা বা আত্মত্বটা প্রজ্ঞাঘন পুরুষে হারালেও সেটা সাময়িক। সেই সাময়িক আত্মহারা অবস্থায় প্রবেশের দরজায় মহাকালস্বরূপ অলৌকিক পরমেশ্বররূপ দর্শন হয়। এটাই মুক্ত পুরুষের মুক্তির একপদ (first step)। শুধু সমাধিস্থ বা তুরীয়স্থ হলেই সাধনা হল না। জীবাত্মার পরমাত্মায় স্থিতি ততক্ষণ পূর্ণমাত্রায় সার্থক হয় না যতক্ষণ না ঐশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। সাঙ্খ্যে একেই তত্ত্বজয় বলা হয়েছে। যাই হোক, অর্জ্জুন সেই জীবেশ্বর সঙ্গমে, যোগীর ভাষায় সেই ব্যুত্থানদ্বারে পুরুষোত্তমের কৃপায় যোগচক্ষুলাভ করেছিলেন। দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে ঐ কূটস্থের মধ্যেই দূরদূরান্তের বস্তু ও ঘটনাসকল আমরা যে ভাবে দেখতে পাই সিদ্ধ সাধকেরাও তাঁদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভূত ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ করে থাকেন। যা হোক, এ আলোচনা থেকে অর্জুন কোথায় ও কিভাবে বিশ্বরূপ দেখছিলেন এটা পরিষ্কার ধারণা করা গেল বলে আশা করছি। তবে সবটাই সাধন সাপেক্ষ, কারণ আত্মজ্ঞান ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞান না হলে জীবাত্মা পরমপুরুষার্থতা লাভ করেন না। মানে হল, আসলে জীবাত্মার পরমাত্মায় সংস্থিতি ততক্ষণ পূর্ণ সার্থক হয় না যতক্ষণ না এমন ঐশ্বরতত্ত্বটা দেখা যায় ॥ ১১/৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধুম্ ।। ১০

অনুবাদ: {সেইরূপ} অনেক মুখনেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুতদর্শনবিশিষ্ট, অনেক অলৌকিক আভরণবিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্রবিশিষ্ট ॥ ১১/১০

ব্যাখ্যা: ভগবান অর্জুনকে নিজের পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন। সে রূপটা কেমন ? কিসের মত ? সেটাই বলছেন যে অনেক মুখ ও নয়ন আছে যাতে ঠিক তেমন। এ সবই হল আকাশের মূর্ত্তি যেন কত লোক বসে আছে, কত লোক যেন কূটস্থের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছে। কি চমৎকারসব গয়না, অলংকার ইত্যাদি পরে আছে। আবার অনেক রকম অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যেন উদ্যত হয়ে কত লোকজন সব দাড়িয়ে আছে। এখানে অনেক মুখ চোখ বিশিষ্ট মানে হল যাঁরা খেচরীসিদ্ধ হয়ে আত্মারূপী কূটস্থে স্থিতিলাভ করেছেন তাঁদের মুখ কূটস্থে প্রতিবিম্বিত হতে লাগল এবং সেই ধ্যানেই অর্থাৎ কূটস্থে লক্ষ্য স্থির করা আরো অনেক চোখও দেখা যেতে লাগল। আরও দিব্য আভরণ অর্থে – দিব্ = আকাশ, আকাশের আভরণ = জ্যোতিচ্ছটা ও নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য। দিব্যাস্ত্র অর্থাৎ আকাশের অস্ত্র মানে বজ্র। এমন বজ্রের আকৃতিরূপ অনেক চিহ্নই কূটস্থে দেখা যেতে লাগল ॥ ১১/১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ।। ১১

অনুবাদ: দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রধারী দিব্য গন্ধদ্রব্যে অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রভাময় অনন্ত এবং সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট ॥ ১১/১১

ব্যাখ্যা: আরও বর্ণনা কতরকম ফুলের মালা, সুন্দর বস্ত্রাদি কিন্তু এসবই আকাশ দিয়ে আকাশেই তৈরী। কত দিব্যগন্ধ, কত জ্যোতির ঢেউ খেলছে। অর্থাৎ সবই কেমন আকাশীয় রহস্য যার আদিও নেই, অন্তও নেই। সত্যি বলতে গেলে কূটস্থের রূপই এই সারা বিশ্বসংসার। কূটস্থের মধ্যে এ সবই দেখা যায়। কূটস্থে দৃষ্টি বিনা সিদ্ধ হয় না। তাই সিদ্ধগণকেও কূটস্থে দেখা যায় যাদের অনেকেরই আমরা নাম পর্য্যন্ত জানি না। এই আমি যেমন বাইরে আছি তেমনই আছি কূটস্থের মধ্যেও এবং অসংখ্য জীবদেহের ভিতরেও আমিই বর্ত্তমান আছি। এমনভাবে কোন আমিটা যে আসল আমি সেটা বোঝার উপায় নেই। তাই আত্মারূপী কূটস্থের চার দিকেই সেই ধ্যানপরায়ণ মুখের ছবি, এবং আত্মারূপী কূটস্থ চৈতন্য সকল দেহেই মুখমণ্ডলের উপরে অবস্থান করছেন। এজন্যই সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট। ১১/১১

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।। ১২

অনুবাদ: আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি এককালে উদিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার প্রভাবসদৃশী হইতে পারে ॥ ১১/১২

ব্যাখ্যা: এখানে বিশ্বরূপদীপ্তি যে কি নিরূপম সে কথাই বলা হচ্ছে। যদি আকাশে হাজার সূর্য্য একসাথে ওঠে তবে সেই বিশ্বরূপ ভগবানের দীপ্তির তুলনাই হয় না। ওটাই কূটস্থ ব্রহ্মের বড় আকাশের রূপ। সে জ্যোতির্ম্ময় রূপের তুলনা বা উপমা কিছুই নেই। একমাত্র ভগবান যাঁর প্রতি প্রসন্ন হন তিনিই মহান আত্মার এমন জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখতে পান ও জীবন ধন্য করেন আর অনুভব করেন "গুরুকৃপাহি কেবলম্ "॥ ১১/১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্য দ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ।। ১৩

অনুবাদ: তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা ভাবে অবস্থিত সমুদয় জগৎ একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন করিলেন ॥ ১১/১৩

ব্যাখ্যা: সকল দেবতাদের প্রকাশক যিনি তিনিই দেবদেব। সেই দেবদেবের শরীরে অর্জুন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখলেন। যা দেখে অর্জুনের সকল পশুতা ঘুচে গেল। তিনি পাণ্ডব হলেন। তাঁর এ বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণনায় তিনটি বিষয়ের উল্লেখ প্রধানতঃ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি যা হল সর্ব্বপ্রধান দর্শন। সমূহ বিশ্বমণ্ডল তাঁরই অঙ্গ আর দিব্য গন্ধ মাল্যাম্বর সর্ব্বাভরণময় সহস্রশীর্ষায়ুধ পুরুষ। তাহলে তাঁর এই দীপ্তি তার অঙ্গের এক অংশে সমগ্র সৃষ্টির অবস্থান। আবার অগণন তাঁর অঙ্গ সকল যাতে সৃষ্টির ব্যাপ্তিও অশেষ। তাহলে এই যে বহুত্বের একত্বে সমাবেশ এই ভয়াবহ সব আশ্চর্য্যময় রূপ যে চোখে দেখা যায় সেটাই হল যোগচক্ষু আর এই রূপ হল যোগেশ্বর রূপ। তাহলে এ পর্য্যন্ত চোখ হল তিনটে। ভূতচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু ও যোগচক্ষু। যে চোখে দেহাত্মবোধময় হয়ে ভৌতিক জগৎদর্শন হয় সেটা ভূতচক্ষু, যে চোখে তত্ত্ব উপলব্ধি করতে করতে নিজেকে ও সেইসাথে সমগ্র বিশ্বকেও জ্ঞানময় বোধ হয় সেটাই জ্ঞানচক্ষু, আর যে চোখে তত্ত্ববিজ্ঞান আত্মত্বে ঘনীভূত হয়ে

পরমাত্মার কৃপায় তাঁর ঈক্ষণের সাথে যুক্ত তাঁরই অঙ্গ বলেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সেটাই হল যোগচক্ষু। জ্ঞানচক্ষু আর যোগচক্ষুর মধ্যে তফাৎটা হল সাধনার মধ্য অবস্থায় আপনাকে জ্ঞানশরীরী ও জ্ঞানময়বিশ্ব এই ধারণা দৃঢ় হলে জ্ঞান চক্ষুতে বিশ্বেরই জ্ঞানমূর্ত্তিত্ব লক্ষ্য হয় আর যোগচক্ষুতে এমন জ্ঞানময়ত্ব ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে এমন অসংখ্য বিশ্ব আছে যা এখনও সৃষ্টি হয়নি পরে হবে, এমন যেসব ব্রহ্মাণ্ড গুপ্তভাবে তাঁতে নিহিত আছে, সে সকলও দেখা যায়। এ তৃতীয় চক্ষুর সামান্য প্রকাশেই মহর্ষি বাল্মিকী ও বেদব্যাসের দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতযুগের বহু আগেই সে সমস্ত রচিত হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, এই তৃতীয় চক্ষু যতক্ষণ না ফোটে ততক্ষণ তৃপ্তিও নেই, কোনও আশ্চর্য্যময়তাও নেই, আসলে গ্রন্থিভেদ না হলে নশ্বরে মমত্ব বোধের অবসান হয় না। এই চোখ দিয়েই মহাকালের যোগচক্ষুর দৃষ্টির আকর্ষণ জীবের হৃদয়কে স্তম্ভিত করে আর স্রোতের টানে তৃণের মত টেনে বাঞ্ছিত জায়গাটায় নিয়ে যায় – যাকে বলি দেবলোক, পিতৃলোক, মনুষ্যলোক ইত্যাদি যা নিয়ে এই জগৎ। অর্জুনও কূটস্থের মধ্যে এমনই নদীস্রোতে ভাসমান তৃণের মতই সহস্রার জগৎ ও জীব দেখেছিলেন, যার এত অসংখ্য রূপ যা আসলে কূটস্থেরই রূপ। সব শরীর পঞ্চতত্ত্বময় বা পঞ্চপাণ্ডব। এই অর্থে সকলেই পঞ্চপাণ্ডব কারণ পঞ্চতত্ত্ব সকলের শরীরেই আছে। তাই নিজেকে ভালমত জানলেই এ বিশ্বভুবনকে ভালমত জানা যায়। এই যোগচক্ষুলাভেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও শিব হয়েছেন সংহারকর্তা বা মহাকাল। আর এমন চক্ষু লাভেই মানুষ ভোগ করে ব্রহ্মাত্ব বিষ্ণুত্ব ও শিবসংহারত্ব। ঐ যে বহুত্ব, একত্ব ও তীব্র দীপ্তি ওটা অলৌকিক পরমেশ্বরতত্ত্বের তিনটে বিশেষত্ব, যার অর্থ তিনি অসঙ্গ, মানে একা একা থেকেও বহু, এবং বিস্ময়কর যোগজ্যোতির প্রকাশ। এ সর্ব্বভেদী জ্যোতিও নামতে পারে তোমার চোখে তখন এ তিন ধর্ম্মও প্রকাশ পাবে। শুধু লেগে থাক নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবে ॥ ১১/১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ।। ১৪

অনুবাদ: অনন্তর বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর সেই অর্জ্জুন দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন। ১১/১৪

ব্যাখ্যা: বিশ্বরূপ তো দেখা হল। এখন এমন বিশ্বরূপ দেখে অর্জ্জুন কি করলেন ? শ্লোকের অর্থ অনুযায়ী অর্জ্জুন বিস্ময়ে, ভয়ে, হর্ষে ইত্যাদিতে অভিভূত (রোমাঞ্চিত) হয়ে মস্তকদ্বারা প্রণাম করে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন। যার প্রকৃত অর্থ হল্ঙওঁ' কার ক্রিয়া করে প্রণিপাত করা বা হওয়া। এমন বিশ্বরূপ দর্শনই তো পরম ধন। সেই ধনলাভে অর্জুন আজ কৃতার্থ হয়েছেন। তাই আজ তিনি ধনঞ্জয়। এইটুকু শরীরের মধ্যে অত তেজের প্রকাশ দেখে রোমাঞ্চিত না হয়ে উপায় কি ? সাধক নিজের শরীরে প্রথম কূটস্থ দর্শনে খুবই বিস্মিত হয় কারণ তখনও সে বোঝেনা যে সে "অণুভ্যোহণু চ" মানে অণু অপেক্ষাও ছোট্ট একটা অণু মাত্র। অণুর মধ্যেও আবার ব্রহ্মাণ্ড আছে। যতই আশ্চর্য্য বোধ হয়, ততই রোমাঞ্চ হয়। বিস্ময় ও পুলকে সেই আত্মদেব কূটস্থকে প্রণাম করে হাত জোড় করে বলতে ইচ্ছে হয়, বলতে চায় – কি বলতে চায়, সেটা পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ১১/১৪

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্ ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন। হে দেব, তোমার দেহে সমুদয় দেবগণ ও পৃথক প্রাণীগণ সকল, দিব্য ঋষিগণ, সমুদয় সর্পগণ ও দেবাদির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি ॥ ১১/১৫

ব্যাখ্যা : এখন (দিব্য + আকাশ = দেব - আকাশ) শরীরের তেজের দ্বারা কূটস্থ মধ্যস্থ অনুভব ব্যক্ত হচ্ছে। ফলে অর্জ্জুনের দর্শনে প্রথমেই এক সমস্ত দেবক্ষেত্র, সমস্ত ভূতক্ষেত্রও সেই দেবতার নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মা স্রষ্টা এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিসকল ও দিব্য উরগসকল বহুধা বিসর্পিত শক্তি। ভূতাভিমানী দেবতা, শক্তিভিমানী দেবতা, ভূত, শক্তি, ঋষি ও কেন্দ্রে ব্রহ্মা এটাই প্রথমে অর্জ্জুনের লক্ষ্যে এসেছে, বেদময় ব্রহ্মা ও বেদদ্রষ্টা ঋষি। সৃষ্টির প্রধান প্রধান বিভাগগুলো সহ সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে সেই আদি বিশ্বরূপ দেবতার অঙ্গে অর্জ্জুন প্রথম দেখলেন। সাধক স্বয়ংও আত্মারই রূপ। তবুও তিনি যখন সাধনা করেন তখন তার নিজের মধ্যেই এসকল দৃশ্য দেখতে পান কিন্তু এ জড় পিণ্ডশরীরের মধ্যেই কি এমন দর্শন হয় ? তাই বলছেন এ দর্শন হয় দেবদেহে মানে আকাশের মধ্যে। যে আকাশ নিজের মধ্যেই আছে, সেই আকাশের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপসকল প্রকাশিত হয়। মেরুমধ্যস্থ মূলাধারপদ্মেই ব্রহ্মার আসন। সেই মূলাধার থেকেই সব সৃষ্টি হয়েছে। এই আকাশকে দেখার মত দিব্যদৃষ্টি যার খুলেছে সেই এসমস্ত কিছু দেখতে পায়। শরীরস্থ বায়ুরূপী দেবগণ অর্থে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না মার্গস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তিনিই একমাত্র আধারস্বরূপ হওয়ায় যাবতীয় প্রাণীই, সকলেই ব্রহ্মে অবস্থিত। তত্ত্বাদিরূপ ভূতসমূহও শরীরভ্যন্তরে মানে প্রাণই প্রত্যেক তত্ত্বে তত্ত্বে পৃথক পৃথক ভাবে আছেন। অর্থাৎ আগে ভগবান যা যা বলেছেন এখন বিশ্বরূপ দর্শন যোগে সে সবই নিজ বোধরূপে প্রত্যক্ষ হচ্ছে। অলমতি বিস্তরেণ ॥ ১১/১৫

অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ।। ১৬

অনুবাদঃ হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু {সর্ব্বব্যপিত্ব হেতু} তোমার না অন্ত, না মধ্য, না আদি দেখিতেছি ॥ ১১/১৬

ব্যাখ্যা : সর্ব্বক্ষেত্রেই অনন্তরূপ দর্শন যার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই নেই। অনেক হাত, অনেক উদর, অনেক মুখ, কত চোখ যে দিকেই তাকাও এর আদি, অন্ত ও মধ্য বলে কিছু নেই। বিশ্বেশ্বর কি তবে বিশ্বসংসারে এমনই রূপ ধরে বসে আছেন ? তবে আর আমিই বা কে ? তুমিই বা কে ? এসবই তোমার রূপ। তুমিই বিশ্বরূপ আবার তুমিই মালিক বিশ্বনাথ। এটাই হল অর্জ্জুনের দ্বিতীয় লক্ষ্যের বিষয় অর্থাৎ এই আদি, অন্ত, মধ্যহীন সর্ব্বত্র দৃশ্য অনন্তরূপ। প্রজ্ঞাচক্ষুর প্রকাশেই সব অন্তরস্থ হয়ে যায়। উপলব্ধির সবটাই তো হয় অন্তরেই, অন্যত্র নয়। যখন দৃষ্টিতে অন্তর্বাহ্য লোপ পায় সেই দৃষ্টিই প্রজ্ঞাচক্ষুর ধর্ম্ম। আগে ১৩ নং শ্লোক পর্য্যন্ত প্রজ্ঞাচক্ষু ও যোগচক্ষুর কথা বলা হয়েছে। যোগচক্ষুর দৃষ্টির লক্ষণ হল পৌনঃপৌনিক অনন্ত অবস্থা। যোগচক্ষের দৃষ্টিতে যা উপলব্ধি হয় তার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই থাকে না। অনাদি অনন্তরূপে তার প্রকাশ ঘটে। নিজের অন্তরে নয়, নিজেতেই। আর দৃশ্য বিষয়টা বা বিষয়গুলো স্থির অথবা পর পর ক্রম অনুযায়ী হলেও দৃষ্টিটা কিন্তু হয় অক্রম বা যুগপৎ একই সাথে পুরোটা। যেমন একটা ছোট্ট বটবীজের মধ্যে একটা বিশাল মহীরুহ লুকান থাকে যার হয় অসংখ্য ফল, প্রতি ফলে আবার অসংখ্য বীজ, প্রতি বীজে আবার অসংখ্য বৃক্ষ ইত্যাদি, ঠিক তেমনই। কালক্রম জ্ঞানবর্জিত এই দৃষ্টিই মহাকালপ্রকাশ। যোগচক্ষু লাভের অর্থই যোগেশ্বরের দৃষ্টি লাভ করা। তাঁর চোখে যে ভাবে বিশ্বপ্রকাশ হয়, সাধকও সেরূপ ভাবের দর্শনে অধিকার পান। আর যোগচক্ষের এমন দৃষ্টি বিজ্ঞানব্যাঞ্জিত, যেমন বলা হল। শুধুমাত্র অর্জ্জুনের মুখের স্তুতি বর্ণনা নয়। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশ্বেশ্বরেরই রূপ, তাই বিশ্বেশ্বরই বিশ্বরূপী। " সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ " উপলব্ধি হলে পরে ব্রহ্মাণ্ডময়ই ব্রহ্মের রূপ ॥ ১১/১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণাঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুনিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ।। ১৭

অনুবাদঃ মুকুটবান, গদাবিশিষ্ট, চক্রধারী, সর্ব্বত্রদীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রচণ্ড অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী এবং অপ্রমেয় তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি ॥ ১১/১৭

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে শুধুই কূটস্থ বর্ণনা। মনুষ্যে যা হল যোগজ্যোতি সেটা যোগবলরূপে ঋষিদের অন্তরে সঞ্চিত হয়। ওই দীপ্তি, ওই অপরিমেয় প্রভা, তেজ এটাই বিষ্টম্ভক, অত্যাশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর। প্রজ্ঞা যার সর্ব্বভেদী, ভাস্বর যার দৃষ্টি, সেই তেজ জীবন্ত, জ্ঞানবন্ত, প্রাণবন্ত দীপ্তি। এর তুলনা নেই। অর্জুনের পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি স্তুতিতে আমরা তাঁর বহুধা বিভক্ত আদি, মধ্য ও অন্তহীন, একত্ব ও অপ্রমেয় দ্যুতিময়ত্ব এসকল ধর্ম্মই প্রধানভাবে পাই। বাস্তবিকই পরম সৌভাগ্যের উদয় না হলে কেউই এই পরম জ্যোতিঃ দর্শন করতে পারেনা। সংসারবন্ধন ক্ষীণ হবার এটাই পরম উপায়। ব্রাহ্মণের তপস্যাই যোগাভ্যাস এবং আত্মদর্শনই তার শুভফল। সহস্র সহস্র জন্মের পর যখন পাপরাশি ক্ষীণ হয়, তখনই যোগাভ্যাসদ্বারা সংসার ছেদনকারী এই উত্তম উপায় দৃষ্টিগোচর হয় – সে কালাচাঁদের আলোয় জগৎ আলো হয়। অজ্ঞতা বা মূর্খতার নাশ হলেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হয়ে যায়। কূটস্থের বর্ণনাই হয়ে চলেছে শ্লোকময়। কূটস্থে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন, মানে কূটস্থ গুহার মধ্যে যিনি প্রবেশলাভ করেন, তাঁর অনন্তলোক প্রাপ্তি হয়। কূটস্থের মূল দৃশ্য তেজঃপুঞ্জ, যে তেজের অসীম আলো, সীমারহিত বলে সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী। যদিও আগুনের মত ও সূর্য্যের মত বলা হলেও বলা হয়েছে অপ্রমেয় মানে তার প্রমাণ দেওয়া যায় না। তাই বলছেন তোমার অপ্রমেয় রূপ সর্বত্র দেখছি। ঐ রূপের সীমা দেখতে পাচ্ছি না ॥ ১১/১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ।। ১৮

অনুবাদঃ তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম ; তুমি জ্ঞাতব্য। তুমি এ বিশ্বের প্রধান আশ্রয়। তুমি নিত্য ও সনাতন ধর্ম্মের পালক। তুমি চিরন্তন পুরুষ {ইহা} আমার মত ॥ ১১/১৮

ব্যাখ্যা: ঐশ্বর্য্য তোমার এমনই অচিন্ত্য। তুমিই অক্ষর পুরুষ, তোমার ক্ষরণ নেই। তুমিই কূটস্থ অক্ষর, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য। একমাত্র পরম, নিঃশেষরূপ স্থিতির স্থান। আর যা কিছু আছে সেসব জেনে লাভ নেই। জানলেও সেসব বন্ধনের ফাঁস, বন্ধনগ্রন্থি মাত্র। তুমিই ক্রিয়ারূপ নিত্যধর্ম্মের রক্ষক। তাই তুমি নিত্য, অবিনাশী, শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা মানে ক্রিয়ারূপ যা হল একমাত্র গুরুবাক্য লভ্য। এই ধর্ম্মই প্রাণ, এ না থাকলে জগৎ থাকে না। তাই একমাত্র তোমাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অব্যক্ত ব্রহ্মরূপ তোমাতে অবস্থান করতে পারলে সে স্থিতির আর শেষ নেই। স্থির প্রাণরূপ মহাবিদ্যা জন্মমরণশীল চঞ্চল শ্বাসে পরিণত হয়ে বিষয়ান্তরে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর ভোগ্যরূপে এই পঞ্চতত্ত্বময় জগৎ কল্পনা করেন। কিন্তু অচঞ্চলরূপ তাঁর নিত্য ভাবটা আবার অতি গুপ্ত। একমাত্র গুরুপদেশ দ্বারা সাধন করলে তবেই বোঝা যায়। ঐ গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে পারলে

তবে তোমায় সাধ্যায়ত্ত করা যায়। তুমি এমনই ভাবময় অনাদি সিদ্ধ পুরুষ, চিরন্তন পুরুষ। আমার দৃষ্টিতে তুমি এমনই। তাই আমি তোমায় এভাবেই মানি। শ্রীগুরুদেব সম্পর্কে এমন ভাবই শিষ্যের মনে সদা জাগরুক থাকে ৷৷ **১১/১৮**

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্ অনন্তবাহুং শশিসুর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ।।১৯

অনুবাদ: উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশরহিত, অমিত প্রভাব, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্য নেত্র, দীপ্তাগ্নি মুখ, এবং স্বীয় তেজপ্রভাবে এই সমুদয় বিশ্বের সন্তাপক তোমাকে দেখিতেছি ৷৷ **১১/১৯**

ব্যাখ্যা: আরও দেখছি যে তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশরহিত। অর্থাৎ " আমি আমার " বোধ না থাকলে সবই অব্যক্তাবস্থা হয়ে যায়। আদি, মধ্য, অন্ত কিছুই থাকে না। আত্মসাক্ষাৎকার হলে এমন আদ্যমধ্যান্তশূন্য অবস্থাই অনুভব হয়। অনন্ত বাহু মানে অনন্ত জীবসকল। এ বিশ্বজুড়ে অনন্ত ক্রিয়াশক্তি যেন তাঁরই অনন্ত শক্তির পরিচয়। সাধকের মনে হয় কূটস্থের এ অপার তেজোরাশি বুঝি দেখতে দেখতে সমস্ত সংসারটাকেই প্রতপ্ত করে তুলেছে। সে তাপ যেন এখন অসহ্য। শশি সূর্য্য নেত্র। এখানে নেত্র অর্থে নায়ক ও চালক মানে ইড়া পিঙ্গলারূপ চন্দ্রসূর্য্যকে যিনি চালাচ্ছেন সেই আত্মচৈতন্যই এখানে শশিসূর্য্য নেত্র যেহেতু আত্মা হতেই ঐ চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশ। আজ্ঞাচক্রস্থিত ত্রিচক্ষুস্থলেই ঐ প্রজ্ঞা দেখা যায় ৷৷ **১১/১৯**

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বা।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতংমহাত্মন।।২০

অনুবাদ: হে মহাত্মন্, স্বর্গ ও পৃথিবীর এই অন্তর (অন্তরীক্ষ) এবং সমুদয় দিক্ একমাত্র তোমা কর্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তোমার এই অদ্ভূত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে দেখিতেছি ৷৷ **১১/২০**

ব্যাখ্যা: এখানে মহাত্মন্ বলা হল শরীরস্থ প্রাণকে, কারণ প্রাণই মহৎ। প্রাণই সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত। প্রাণ থাকলে সব থাকে, প্রাণ না থাকলে কিছুই থাকেনা। স্থূলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, অধ্যাত্মে স্থূল শরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর বা লিঙ্গশরীর, এই অধিদৈব ও অধ্যাত্ম লোকসকল তোমার দ্বারাই পরিব্যপ্ত । হে প্রাণরূপ মহাত্মন্, মূলাধার ও সহস্রারের যে অন্তর অর্থাৎ সুষুম্নার ভিতরের ছিদ্ররূপ অন্তরীক্ষ তা তোমার তেজোরূপ আলোকে পরিব্যাপ্ত। দেহের উপর, নীচ,ডানদিক ও বামদিক সকলও একমাত্র

তোমারই আলোয় উজ্জ্বল। তোমার এ অদ্ভূত, পঞ্চভূতের অতীত বৃহৎ ব্রহ্মের উগ্ররূপ, প্রচণ্ড অগ্নিসম ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করে শরীরের উপর, মধ্য ও নিচের তিন অংশই চমকে গিয়ে মনে ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে। চেতন অচেতন সৃষ্ট যা কিছু ত্রিলোকে অবস্থিত সকলের মধ্যেই নিজের অভিব্যক্তি রক্ষা করার চেষ্টা থাকে যার বাহ্য কারণ আনন্দবিলাস আর অজ্ঞাত গুহ্য কারণটা হল মৃত্যুভয়, বিলুপ্তির ভয়। শুধু তোমার আমারই নয়, সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই একই কারণে ভীত ও কর্ম্মময়। ভয় ও আনন্দের বেড়াজাল ঘেরা এ জীবজগৎ। তাই সব যখন এত আলোয় আলো, দুর্নিরীক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা বিশ্ব সমাচ্ছাদিত বলে মনে হয়, তখন এ বিশ্বরূপ অদ্ভূত হলেও একটা ব্যাথা অথবা অস্বস্তি বোধ হয়, মন স্তম্ভিত, মুগ্ধ ও দেহ অবসন্ন হতে থাকে। এ শরীরের মধ্যেই তিন লোক যার কোথাও হুঁস থাকে না। নিজের ক্ষুদ্রত্বের সংস্কার ভীত হয় আপনার চেয়ে আপনার জনের প্রথম আগমনে। নিভে যাবার আগে প্রদীপের জ্বলে ওঠার মত জীবত্ব একবার শেষ চাঞ্চল্য ভীতির আকারে প্রকাশ করে। অনেকটা হিন্দু মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাবার মত আনন্দ ও কান্না একই সাথে হওয়া। তারপর ক্রিয়ার শেষে কিছুই মনে না পড়া আর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাথা বেদনার মত একটা অনুভব হওয়া, সব চেনা হলেও অচেনার অনুভব। এ বড় করুন অরুণোদয়, বড় কঠিন জ্ঞানের উদ্ভাস, যাতে সবই বুঝি যায়! যাওয়াতেই সুখ, তবু যাওয়াতেই ভয়। ত্রিশরীর জ্ঞানে আসতে থাকে রূপান্তর, হৃদয়গ্রন্থির উন্মোচনে, সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধের বন্ধনে হৃদয়স্থ যা কিছু ছিল মমতামায় সে বাঁধনসকল একে একে খুলতে থাকে, তাই এত ভীতি ও বেদনার অভিব্যাক্তি। দেখুন পরের শ্লোকে ৷৷ ১১/২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।২১

অনুবাদ: ঐ দেবসমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি বলিয়া এই উৎকৃষ্ট স্তব সমূহে তোমার স্তুতি করিতেছেন ৷৷ **১১/২১**

ব্যাখ্যা: সাধনারদ্বারা অন্তর্জগতে লক্ষ্য পড়লেই কূটস্থের মধ্যে এ সকলই দেখা যায়। শুধুই যে অতি মাত্রায় ভীত হয়ে অর্জ্জুনের এমন কল্পিত দর্শন বা প্রলাপ (delirium) তা কিন্তু মোটেই নয়। এ সত্যি সত্যিই সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভব। কূটস্থে সিদ্ধর্ষিসকল প্রত্যক্ষ হন। দেবতাবৃন্দ ও সিদ্ধ মহর্ষি শব্দের দ্বারা শুধু অধিদৈব ভুমিস্থ দেবতা ও ঋষিগণই নন, অধ্যাত্ম দেবতা ও অধ্যত্মসিদ্ধপুরুষদের কথাও বলা হয়েছে। কূটস্থ দর্শন সময়ে সাধকের মনের যেমন অবস্থা হয়, কূটস্থের মধ্যে দৃশ্যমান সাধকগণকেও ঐ একই রকমভাবে ভীত, চকিত বা স্তব্ধভাবে দেখা যায়। অর্জুন যেমন ভীত হয়ে অপরকে "স্বস্তি স্বস্তি" বলছেন, একই সময়ে সমকোটির অপর সাধকও কূটস্থে অর্জুনকে এমন ভয়

ব্যাকুলিত অবস্থায়ই দেখতে পাবেন। এখানেও সে কথাই বলা হয়েছে। শরীরস্থ তত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতারা, যোগচক্ষুঃপ্রকাশে জীব যখন মহাকালসঙ্গমে নিজেকে দেখে, তখন সকলে সেই সাধকের সঙ্গে সেই সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হয় ও সিদ্ধর্ষিগণও তখন স্তবময় হন। বায়ুসকল সুষুম্নায় গিয়ে স্থির হয়ে গেলে, বায়ুস্থিরের সাথে সাথে গুণেরও লয় হয়। তখন কর্ম্মের অতীত অবস্থায় শান্তি পেয়ে স্বস্তি, মানে ঠাণ্ডা হও, এই বলে মনে মনে উৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা আরাধনা হয়। যোগকালীন অধ্যাত্মব্যাপারও এতে, (এই স্তবে) বর্ণিত হয়ে থাকে। ১১/২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ।। ২২

অনুবাদ: একাদশ রুদ্র দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যে সকল সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, উষ্মপা (পিতৃগণ) এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধসমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে অবলোকন করিতেছেন ॥ ১১/২২

ব্যাখ্যা: হৃদয়াকাশই অনন্ত বিশ্বের আশ্রয়। এর সীমা নেই। হৃদয়াকাশেই যত দেবদেবতার অধিষ্ঠান। দেবতারা, সিদ্ধলোকেরা, সকলেই কূটস্থের মধ্যে রয়েছেন ও কূটস্থের তেজ দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় হল যে আমি নিজেই দেখছি সেই আমিও নিজেই কূটস্থের মধ্যে রয়েছি। এ এতবড় এমনই আশ্চর্য্য যে সকলেরই ভ্যাবাচ্যাকা খাবার মত অবস্থা। তাই সকলেই স্থির দৃষ্টিতে তোমাতেই তন্ময় হয়ে আছেন ॥ ১১/২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ।।২৩

অনুবাদ: হে মহাবাহো, তোমার বাহু বদন ও নেত্রবিশিষ্ট, বহু বাহু, উরু ও চরণবিশিষ্ট, বহু উদরবিশিষ্ট, বহুদ্রংষ্ট্রাদ্বারা ভয়ঙ্কর মহৎ রূপ দেখিয়া সমুদয় লোক ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥ ১১/২৩

ব্যাখ্যা: কূটস্থদর্শনের ভয়ঙ্করত্বের দিকটাই এখানে শুধু বলা হয়েছে। পরে এর স্নিগ্ধ দিকটাও আছে কিন্তু সেকথা এখানে নেই। কূটস্থের মধ্যে যে রূপ দেখা যায় সেটা কতটা ভয়ঙ্কর যে ঐ করালরূপ দর্শন করলে সকল সাধকেরই মনে ভীষণ ভয় উপস্থিত হয় ও বিচলিত হয়ে পড়ে। অনেককেই আসন ছেড়ে উঠে পালাতে দেখা যায় কিন্তু ভাবতে হয় পালিয়ে সব যাবে কোথায় ? তাহলেই সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যায়। কারণ তোমার তেজঃ কর্তৃকই শ্বাস প্রশ্বাসের বহনক্রিয়া হচ্ছে, তাই তুমিই তোমার মহানরূপ, মানচিত্ররূপ বৃহৎ কূটস্থ যার দর্শনে পুরো ব্রহ্মাণ্ডটারই রূপ দেখা যাচ্ছে, ঐ বিশ্বজগতের রূপে, সমগ্র জগতে বহুজীবরূপে তুমিই যে কত শত রূপে, কত শত হাত পা বিশিষ্ট হয়ে, মহান রূপে অবস্থিত রয়েছ এ তত্ত্বটা এই মহৎ রূপদর্শন যোগেই দেখা যাচ্ছে। এমন ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কূটস্থে দৃশ্যমান লোকসকল ও আমি খুবই ভয়বিহ্বল ও ত্রাসিত হচ্ছি ॥ ১১/২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বাহি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।। ২৪

অনুবাদ: হে বিষ্ণো, অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, অনেকবর্ণ, বিস্তৃতমুখ ও প্রদীপ্ত, বিশাল নেত্র, তোমাকে দেখিয়া অতি ভীতচিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ১১/২৪

ব্যাখ্যা: বেদে আকাশের বর্ণনায় বলা হয়েছে "যচ্চাস্যোহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদাস্মিন্ সমাহিতম্" এ ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, যা কিছু নেই, সে সবই সেই অপ্রাকৃত আকাশে অবস্থিত। সেই জ্ঞানময় আকাশে জ্ঞানময় দেশকাল বিস্তার নিহিত। তাতে বিভিন্ন জ্ঞানময় পদার্থ নিহিত। সুষুম্নাস্থিত স্থির প্রাণরূপ বিষ্ণু, চিদাকাশরূপ বিষ্ণু, মহাকালরূপে, সংহারকরূপে, আবার পালকরূপে এই হরিহরাত্মক প্রজ্ঞাভূমিতে, হৃদয়াকাশে, যাতে প্রবেশদ্বার জীবের দহরাকাশ তাতে নেই এমন কিছুই নেই। অন্ত রীক্ষব্যাপী অর্থাৎ আজ্ঞাচক্ররূপ অন্তরীক্ষে নানা বর্ণের দীপ্তি ব্যাপকরূপে অন্তরীক্ষব্যাপী আছ তুমি জ্যোতির্ম্ময় এবং তেজোময়। তোমার ঐ নানা বর্ণের দীপ্তিবিস্তার করা মুখ ঐ অখণ্ডমণ্ডলাকার ও তার মধ্যে কালো গোল আকৃতিটাই প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র, কারণ তার ভেতর নক্ষত্রের মত বিন্দু মানে চোখের মণি যা দেখে আমি যে শুধুই ভয় পাচ্ছি তাই নয়, তোমার এমন রূপ দেখে প্রব্যথিত চিত্ত আমার ধৈর্য্য ও শান্তি শেষ হয়েছে। অন্তরীক্ষব্যাপী এই আকাশের অনেক স্বর, এক এক স্বরে এক এক রকম কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান, অণুর ভিতর তাতে বহু বিস্তৃতি দেখা যায়, ক্ষণের ভিতর সেখানে যুগ দেখা যায়। তোমরা কখনই ভেবো না যে এ সমস্ত বর্ণনাগুলো সব আধ্যাত্মিক রূপক মাত্র। এ আকাশে সমস্তটাই প্রার্থনা অনুসারে প্রকাশ পায় – আবির্ভূত হয়। কামকল্পতরু সে আকাশ। মনে সংশয় থাকলে হবে না। সংশয় তোমাকে নাশ করবে। অসংশয় হয়ে এসো আমার কাছে। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে নিজেকে সমর্পণ করো আর এই দেহেই প্রত্যক্ষ করে নাও কিভাবে অর্জুনের অন্তঃপ্রবেশ সেই আকাশে হয়ে বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল। যে আকাশের সামান্য বিস্তৃতি জীবের অধ্যাত্ম হৃদয় হতে সহস্রার পর্য্যন্ত। সেই আকাশের যে দিকটা অর্জুনের সংস্কারগ্রন্থির কাছাকাছি অর্জ্জুন এবার ধীরে ধীরে সে দিকটাতেই এগিয়ে যাচ্ছেন তাই তাঁর জৈব সংস্কারের ভয় ও অধৈর্য্য এসে এমন উথাল পাথাল

করে পাঁজর ভাঙ্গছে। এই গ্রন্থি ভেদ না হলে সংস্কার যায় না। শুধুই মনে হয় এসবের কোনও দরকার ছিল না। ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, মনের সমতা নষ্ট হয়, একটা ব্যাথার মত মনের ভিতরে ওঠে। ভয় ব্যাকুল চিত্তে মনে হয় শুধু এরূপ দর্শন বন্ধ হলেই বাঁচি ॥ ১১/২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈ্ব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।। ২৫

অনুবাদ: হে দেবেশ, দন্তদ্বারা ভয়ানক কালাগ্নিতুল্য তোমার মুখসমূহ দেখিয়া আমি দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস, (জগদাধার) তুমি প্রসন্ন হও ॥ ১১/২৫

ব্যাখ্যা: হাতের তীর একবার ছেড়ে দিলে মুশকিল। আগে যাঁকে স্তব করেছিলেন, বলেছিলেন, "ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং" তিনিই এখন বিভীষিকাময় বিশ্বগ্রাসী কালমূর্ত্তিতে তাঁর সামনে। এবার ঠ্যালা সামলাও। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" একে তো যমের মত ভয়ঙ্কর করালরূপ, তার উপর মনে হয় চারদিকে যেন আগুন লেগে জ্বলে পুড়ে গেল। আরও যে সব বর্ণনা! বিশাল, বিবৃত মুখ তার ভিতর লম্বা লম্বা ভীষণ দর্শন সব দাঁত, এ বর্ণনায় আর নাই বা গেলাম। এ সমস্ত দেখে তো আতঙ্কে মন দিশেহারা হয়ে যায়। এতই বিমূঢ় হয় যে প্রার্থনা করে প্রভূ দয়া করে প্রসন্ন হও, এমন রূপ সংবরণ কর, প্রভু! আসলে অর্জুন এখন খুব দ্রুত নেমে চলেছেন চিদাকাশের সেই ভূমিতে, যেদিকে ভগবান প্রলয়ঙ্কর কালস্বরূপ হয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে (ইন্দ্রিয়ে বিষয় সম্বন্ধ জনিত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব) গ্রাস করতে উদ্যত ॥ ১১/২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬

অনুবাদ: ভূপালগণ সহ সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকলেই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ – ১১/২৬

ব্যাখ্যা: এইশ্লোকের অর্থটা ভালভাবে বুঝতে হলে ২৭, ২৮ এবং ২৯ নং শ্লোকও এক সাথে পড়তে হয়। যুদ্ধে জয় পরাজয় ইত্যাদি ফলাফল কি হবে সেটা অর্জুন বিশ্বরূপের ভিতর আগে থেকেই বুঝে নিলেন। প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র ও তার পুত্র দুর্য্যোধন এবং আরও সমস্ত রাজাদের কথা বলা হয়েছে তারা সকলেই আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের সাথে ধাবমান হয়ে তোমার ঐ ভয়ানক মুখমণ্ডলের ভিতর চলে যাচ্ছে। যার অর্থই হল কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের ভবিষ্যৎ অর্জুনের চোখে সেই মহাকাল

পুরুষের অঙ্গেই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এই মহাকাল গগনরূপ চিদাকাশে যেখানে সমস্ত কিছুই আছে তারই দিকপ্রান্ত দেখতে দেখতে সেই দহরে অর্জুন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন লক্ষ্য করলেন। সেখানে কাল যা ঘটবে আজই তা ঘটে রয়েছে দেখা গেল। এরই নাম কূটস্থ গহ্বর বা দহরাকাশ, যেখানে এ ভৌতিক বিশ্বে যা ঘটবে তা আগেভাগেই ঐ আকাশের ভিতর ঘটে যায়। আগেই বলেছিলাম এমন দর্শনে পারদর্শী হয়েই মহর্ষি বাল্মিকী ও ব্যাসদেব এমন সংঘটনের বহু পূর্ব্বেই রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাক সে অন্যকথা। এখানে যা শুধুমাত্র ভূতরূপে দেখা যায়, ঐ আকাশে তার শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত যত শক্তিক্রিয়া সেই ভূতটির অন্তরে ঘটে, সে সমস্ত গতি ও পরিণতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, যেমন তোমার এ শরীরটা যা আপাতদৃষ্টিতে একটি মানব শরীর মাত্র। কিন্তু দহরাকাশে এ মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যত বিভিন্ন শক্তিপ্রবাহ ক্রিয়াশীল, যত বিভিন্ন গতি ও পরিণতিসকল, যথা রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্রসকল, যত অণু, অণুরূপে বিভিন্ন উপাদান রচনা, তারপর যত জীবাণু এ শরীরের আশ্রয়ে রয়েছে তাদের গঠন, প্রকৃতি ও জীবন মরণের ইতিহাস সবই ঐ আকাশে সুপ্রকাশ রয়েছে। যতরকম শক্তি সবই জীবন্ত ও চেতনাময়ী। বাইরে থেকে যা তোমার ছোট্ট শরীর মাত্র অন্তরাকাশে সেটাই এক অনন্ত দেবতাময় বিপুল ব্রহ্মাণ্ড। সব বিষয়েই এমনটাই বুঝবে। এজন্যই সব রকম অশান্তি ও প্রতিকূলতার ভিতরেও তোমাদের নিয়েই চলছে আমার এ পরীক্ষার প্রয়োগশালা। এ আকাশ দেবতাময়। দিনের বেলায় মাথার উপর যে আকাশ দেখ, তাতে কত গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকাপুঞ্জরূপে কতশত ব্রহ্মাণ্ড যে ওতে আছে তার সংখ্যা নেই। তাহলেই বুঝে দেখ এই যে একান্ত শূন্যবৎ আকাশ তাতে কতশক্তি কতভাবেই না ক্রিয়াশীল হয়, যা আমাদের অনুভবেও আসে না। একইভাবে তোমার অন্তরের মধ্য দিয়ে যে দহর ছিদ্র দেখা যায় তার আকাশের বিস্তারে থাকে চিন্ময়ী দেবশক্তির বিপুল রোমহর্ষক লীলায়ন। ভূতমাত্রায় যা শুধু ভূতমাত্র, আকাশমাত্রায় তারই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপে সমগ্র যজ্ঞ সম্পাদিত। আবার ফিরে আসি আগের কথায়। একই ভাবে অর্জ্জুন ভেবেছিলেন ইন্দ্রিয় ও ভোগবাসনা সকল না থাকলে তার জীবনে থাকলটা কি ? আর এদের জয় করে আত্মরাজ্য উদ্ধার করাও সহজ নয়। কিন্তু এত বড় কূটস্থ দর্শনে বুঝতে পারছেন যে তিনি নিমিত্ত মাত্র। ইন্দ্রিয়ের বেগ যেখান থেকে ওঠে সেখানেই আবার ডুবে যায়। ঘুমের মধ্যে বা সুপ্ত অবস্থায় স্বভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়বেগ থাকে না। তেমনই ক্রিয়ার পর অবস্থায় ও বিশাল জ্যোতি দর্শনের সময় সব মনোবেগ অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রকৃতওআমি'র পরিচয় পেলে আর ভোগে আসক্তি থাকে না। আসক্তি নষ্ট হলে ভোগায়তন দেহ, ভোগ্যবস্তু ইত্যাদি ও তার কারণগুলোর প্রতিও লক্ষ্য থাকে না। তাই তারাও থেকে না থাকার মতই হয়। সাধনার শুরুতে যে সব বিচিত্র জ্যোতিঃ ছিল সে সবই সেই বড় জ্যোতিঃতে মিলিয়ে যায় বলে মনে হয়। যারা শত্রু ও যাদের আত্মীয় বলে ভাবতাম, শেষ পর্য্যন্ত কেউই কোথাও থাকে না দেখছি। সুতরাং সকলেই কালের করাল মুখে

পড়ছে ও লয় হচ্ছে। আত্মজ্ঞান না থাকায়ই জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ ও ইন্দ্রিয়তে তাদের বিষয়াদিতে মমত্ব বোধ হয়। এটাই যতরকম ভয় ও ত্রাসের কারণ ॥ ১১/২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।। ২৭

অনুবাদ: যোদ্ধাগণসহ ধাবমান হয়ে তোমার দংষ্ট্রাদ্বারা ভয়ংকর ভয়ানক মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে চূর্ণিতমস্তক বিশিষ্ট কেহ কেহ তোমার দন্তসন্ধিতে লগ্ন রহিয়াছে দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১১/২৭

ব্যাখ্যা: ছোট ছোট সৈনিকই হোক, আর বড় বড় যোদ্ধাই হোক, সকলেই ধাবমান হয়ে তোমার উগ্রদীপ্তিরূপ দাঁতের দ্বারা ভয়ানক মুখসমূহে ঢুকে যাচ্ছে। মানে শরীরস্থ পঞ্চতত্ত্বাদির সাথে ইন্দ্রিয়গণের সকলেই আজ্ঞাচক্রস্থ মুখমণ্ডলে গিয়ে লয় পাচ্ছে। কেউ বা চূর্ণিতমস্তকরূপে দাঁতের জোড়ার মাঝে মানে উগ্রজ্যোতিঃচ্ছটার মাঝে লেগে আছে। এই যে এমন বিশ্বরূপ দর্শন অর্জুনের হচ্ছে তখনও তার বিশ্বের বোধ আছে, তবে সে বিশ্ব ভগবানেরই মধ্যে, বাইরে কিছু নেই। কিন্তু এটাও কিছু নয়। এর আগেও বোঝবার অনেক বিষয় আছে। জীবের ভবিষ্যৎ কি ? সেটা বদ্ধ জীব আমরা জানতে না পারলেও ভগবানের অজানা নয়। বিশ্বরূপ দর্শনের মত জ্ঞান হলেই সাধক দেখতে পান যে সাধনার পরিপন্থী কাম, ক্রোধ,লোভ, মোহ ইত্যাদি সবই সেই প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানাগ্নির মধ্যে পড়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মুক্তিপথের সহায়ক শক্তিগুলোও একে একে তাঁর মধ্যে আসছে ও তার মত হয়েই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। আর তাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকছে না। যেমন খেয়াঘাটে পার হয়ে যাবার পরে আর নৌকার কোনও দরকার থাকে না তেমনটা আর কি। প্রথম প্রথম শমদমাদি অনুষ্ঠান করলেও পরে ওগুলোকে পরিত্যাগ না করলে ওগুলোই আবার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করবে ॥ ১১/২৭

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ।। ২৮

অনুবাদ: যেমন নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোকবীরগণ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমান্ তোমার মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১১/২৮

ব্যাখ্যা : কালের গতিকে রোধ করার ক্ষমতা কারোরই নেই। সমুদ্রাভিমুখ নদীপ্রবাহ যেমন নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, তেমনই এ সকল বীরগণ, তা সে যতবড় বীর বা যোদ্ধাই হন না কেন, তীব্রবেগে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছেন, সে বেগ সম্বরণ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। আলোর প্রতি পতঙ্গের যেমন বেগ তেমনই মহাকালের প্রতি ঘটস্থকালের বেগ হয়। এ বেগকে কেউই রোধ করতে পারেনা। একইভাবে জীবের অন্তঃকরণে শত শত বাসনার বেগ তরঙ্গভঙ্গে উত্থিত হয়ে সুপ্তির প্রলয়গহ্বরে প্রবেশ করছে। সাধক সবই বোঝেন যে কেউই থাকে না, কিছুই থাকে না, তবুও শত শত চিন্তারাশি ও তার ঢেউ প্রবলভাবে উৎক্ষিপ্ত, সেটা সকলেই জানেন। তবুও এই চিন্তা তরঙ্গের বিরাম নেই, বিরাম করাবার প্রযত্নও নেই। যেমন এই মহাকালের করাল বদনে বীরগণ সবেগে প্রবেশ করছে সে দিকে কোনও হুঁশ নেই। স্রোতের মুখে তৃণের মত সব ভেসে চলে যাচ্ছে যেন কারও অদৃশ্য ইঙ্গিতে কালের হাঁ করা মুখের ভিতরে চলে যাচ্ছে। জাগতিক আশা আকাঙ্খা ও সহস্র চিন্তাতরঙ্গ, তরঙ্গরাশির মতই আসবে ও যাবে, ও দিকে ভ্রুক্ষেপ করার দরকার নেই। তুমি আমি কেউই কর্ত্তা নই, আমাদের কারও ইচ্ছাতে কিছুই হয় না, – যা ঘটবার সবই ঘটে বসে আছে, এটুকু বুঝলেই আপাতত আর ভয় নেই। আর এসব দিকে দৃষ্টি যাবে না। ওরা, মানে ওসমস্ত জাগতিক চিন্তাতরঙ্গ, সাময়িক উদ্ব্যস্ত করলেও ও দিকে দৃষ্টি দিও না। এ সমস্ত সাধন পথের বিরোধী হলেও কেউই বেশিক্ষণ থাকে না, স্থায়ী হয় না। ঐ সকল আবেগ, আতিশয্য, সাগরে যেমন নদী প্রবেশ করে সেইরকম ভাবেই, কূটস্থের অনন্ত জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করে ডুবে যাবে নিশ্চয়ই। শুধু চোখ বুজে ক্রিয়ায় লেগে থাক ॥ ১১/২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ।। ২৯

অনুবাদ: যেমন বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে সেরূপ বেগশালী জনগণও মরণের নিমিত্তই তোমার মুখে সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১১/২৯

ব্যাখ্যা: জ্বলন্ত প্রদীপে বা আলোরূপ আগুনে ফড়িং বা পতঙ্গের সবেগে গিয়ে পুড়ে মরার উপমাটা আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়ে গেছে। উপমার লক্ষ্যটা হল ঘটস্থ কালের মহাকালের প্রতি সবেগে গমন। অতএব বেগশালী জনগণ মরবার জন্যই তোমাতে মানে ব্রহ্মে, এখানে তোমার মুখ সমূহে, প্রবেশ করছে। মানেটা হল ইন্দ্রিয়গণ মহা বেগবান। তাই পরিণামে দুর্ম্মতি, দুঃসাহস ইত্যাদিরূপে তারাও তোমাতেই গিয়ে লয় হচ্ছে। মানুষও পতঙ্গের মতই জগতের এই উৎপত্তি নাশশীল দৃশ্যদর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে, আপাতমনোহর প্রাপ্তির আশায় মৃত্যুপথে ছুটে চলেছে। পঞ্চতন্মাত্রে মুগ্ধ জীবকুল তাই তোমার কালরূপ করালগ্রাসে প্রবেশ করছে। কোনও রকম দুর্ম্মতি বা দুঃস্বভাব এসমস্ত কৌরবপক্ষীয় প্রবৃত্তিসকল যত বিকটই হোক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত কিছুই থাকে না, শুধু নিজে এগুলোর পাল্লায় না পড়লেই হল। তাই সাধক গুরুকৃপা পেয়ে পরম নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এসব থেকে দুরে থেকে, কোনও

কিছুর জন্য চিন্তা না করে, কেবল গুরুপদ আশ্রয় করে পড়ে থাকো। বাকিটা যিনি করবার ঠিক করে দেবেন, তোমার কোনও ভয় নেই। শুধু কোনও রকমে গুরুকৃপাটা পেলেই হল। তারপর যতই ঝড়বৃষ্টি আসুক তোমার আর ভয় নেই, তুমি মুক্ত। তোমায় মারে কে ? কোন কিছুর জন্য চিন্তা না করে, শ্রীগুরুদেবের পদে মতি রেখে সাধনা করে চল, ঐ দুর্মতিসকলও একদিন ঠিকই কালবশে বিলুপ্ত হয়ে যাবেই যাবে ॥ ১১/২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।। ৩০

অনুবাদ: জ্বলন্ত বদনসকল দ্বারা লোক সকলকে গ্রাস করিয়া বিলক্ষণরূপে ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো, তোমার উগ্র প্রভাসমূহ তেজঃ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া দগ্ধ করিতেছ ॥ ১১/৩০

ব্যাখ্যা: হ্যাঁ, তার পর কি হল ? কি আর হবে ? সবইতো তোমারই ঐ আগুনজ্বালা মুখের ভিতর গিয়ে পড়ছে আর লোলজিহ্বা দিয়ে সব টেনে নিয়ে খাচ্ছ। বিষ্ণুর কি অপূর্ব্ব ভোগ। এ শুধু লোক সকলের ধ্বংসই নয়, এ তোমার ভোগও বটে। কি ভয়াবহ, কি ভীষণ, এ দৃশ্য ! বিষ্ণুভক্ষ্য অজ্ঞ জীবের পক্ষে, যে জানে না বিষ্ণুর এমন খাওয়ার অর্থই হল তারই পরিপূর্ত হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণের ব্যবস্থা। আবার জ্ঞানীর চক্ষে এ খাওয়াই প্রেমালিঙ্গন। অদ্ভুত এ আকাশের গুণ, যে আকাশে এমন লীলায়ন সংঘটিত হয়, দেখা যায়। যেখানে বৃহৎ কূটস্থের তেজের মধ্যে পড়ে সব বস্তুই তেজোময় হয়ে যাচ্ছে। তার আর পৃথক নাম, রূপ কিছুই থাকছে না। সবই হরণ করে নিচ্ছ, তাই তুমি হরি। কিন্তু এমন রূপ যে জীবাত্মার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছে হে ঠাকুর ! সকল খণ্ডকাল অখণ্ডকালের মধ্যে প্রবেশ করছে তা দেখে যে সাধকের মাথা ঘুরে যায়। আসলে একই ব্যাপার ঐ আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অনুভব করায়। ব্রহ্মের প্রকাশে ইন্দ্রিয় ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিসকল আপনা আপনিই উপশান্ত হয়। এ জন্যই বলা হল যে বিলক্ষণরূপে ভক্ষণ করছ। হে শ্বেতজ্যোতিঃবিশিষ্ট বিষ্ণো, তুমি সত্ত্বগুণময়। তোমার উগ্র জ্যোতিতে দেহাভ্যন্তর তপ্ত ও দগ্ধ হচ্ছে। এই দেহাভ্যন্তরকেই সমগ্র জগৎ বলা হচ্ছে ॥ ১১/৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ।। ৩১

অনুবাদ: উগ্ররূপ তুমি কে ? ইহা আমার বল। তোমাকে নমস্কার, হে দেববর, প্রসন্ন হও; তুমি আদি পুরুষ, তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ কিজন্য তোমার এরূপ চেষ্টা তাহা আমি জানি না। ১১/৩১

ব্যাখ্যা: বৃহৎ কূটস্থময় তুমি কে ? সাধনরত সাধক তো নিজের মধ্যে কূটস্থের স্নিগ্ধ শান্ত অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ মধ্যে শ্যামসুন্দররূপ দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলেন, তার মধ্যে আবার এমন ভীষণ রূপ! এ মূর্ত্তিতে যেন আগুন ঝরতে শুরু করল। অমন সুন্দর, মনোহর রূপ এমন ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করল! এমন কালান্তক প্রলয় অনলসদৃশ রূপ দেখে সাধকের আগের পুলক, শান্তি সবই চকিতে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ভাবলেন প্রলয়কাল উপস্থিত। তাই ভয়ার্তচিত্তে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করছেন ওগো, তুমি কে ? তোমার প্রচণ্ড উগ্ররূপ শান্ত করে প্রসন্ন মূর্ত্তি হও। তুমিই সকলের মূল তাই আদি পুরুষ। আমি তোমায় জানতে চাই। তোমার এই আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য আমার জানা নেই। সত্যিই নবীন সাধকের প্রাণে এমন রূপ দেখে তো ভয় হয়ই। পরমাত্মরূপী মহাকালের এ প্রলয়নৃত্য দেখলে ত্রাস তো হবেই। তবে যাঁরা দীর্ঘদিন সাধন করে কালচক্রের এই গতি দেখতে অভ্যস্ত আছেন তাঁদের আর এমন বিরাট রূপ দেখে ভয় হয় না ॥ ১১/৩১

শ্রীভগবানুবাচ -

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধো লেকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনিকেষু যোধাঃ।। ৩২

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। আমি লোকক্ষয়কর্ত্তা অনন্ত কাল। লোকসকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না ॥ ১১/৩২

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের প্রশ্নটা ছিল – আপনি কে মশাই সেটা বলুন তো ? প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন তেজস্তত্ত্বঃ যিনি নাভি অঞ্চলস্থিত মনিপুরচক্রে অবস্থান করেন। যে কূটস্থে এত জ্বালাময়ী উগ্ররূপ, সেই কূটস্থেই প্রশ্নের উত্তর অনুভব হচ্ছে বেশ স্পষ্টভাবে। এটাই ভগবানের উত্তরদান। আমি সনাতন কাল, প্রকৃত অর্থে কাল অনন্ত কিন্তু ঘটস্থ হলেই সেই কাল সীমিত, অন্তযুক্ত হয়ে যায়। এটাই সাধারণ অর্থে আয়ু যার সংখ্যা এই দেহরূপ ঘটে প্রতি দিন রাত মিলিয়ে ২১৬০০ বার অজপারূপ শ্বাস-প্রশ্বাস হিসাবে। যেহেতু প্রতি দিন রাতে ২১৬০০ বার করে অজপা ফুরিয়ে যায় তাই এই কালই লোকসংহার কর্ত্তা। তাই ভগবান বলছেন তিনি লোকসংহারে নিযুক্ত। সমস্ত লোক আমিই সমাহরণ করব। তুমি ছাড়া আর

কেউ থাকবে না। এর মানে হল "তুমি না মরালেও" "ঋতেহপি ত্বাং" কথার এখানে এটাই অর্থ। সে যাই হোক, অধ্যাত্মভূমি দেখে এ শ্লোকের অর্থ করতে হলে আগের কথাটাই বলতে হয় যে শ্বাসের বহির্গমন রোধ করতে না পারলে কারোরই পরিত্রাণ নেই। একমাত্র যোগীরাই যোগাভ্যাসদ্বারা কালাতীত অবস্থা লাভ করতে পরেন। সমস্ত জীবই শ্বাসপ্রশ্বাসের পুঁজি নিয়ে জন্মায়। সেই পুঁজি ফুরোলেই দেহের পতন বা শেষ হয়। সমাধির সময়টুকু শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরুদ্ধ হওয়ায় ঐসময়টুকু যোগীরা কালকে বঞ্চনা করতে পারেন। এভাবেই প্রাণায়াম অভ্যাসে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হয়। যাঁর যতটুকু সমাধি হয় তাঁর সে সময় টুকুর মধ্যে আয়ুর ক্ষয় হয় না। এ অবস্থা যিনি যতটা বাড়াতে পারেন তিনি ততটা কালজয়ী হন। সমাধি স্থিরাবস্থাই কালের কালস্বরূপ। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বাইরে যা হবার হোক, আমার নিজের ভিতরে যা চলছে তা বন্ধ করতে না পারলে তো নিস্কৃতি নেই। তা ছাড়া এ শ্বাসের বাইরে গতি বন্ধ না হলে তো প্রকৃত জ্ঞানও হয় না। কারণ কালের দ্বারা সব বর্তমানই তো অতীত হয়ে যাচ্ছে। এই ত্রিকালের মধ্যে কত কিছুই ঘটছে, সমস্ত দৃশ্যবর্গই ধ্বংস হচ্ছে। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও পঞ্চতত্ত্ব সবই বিলুপ্ত হচ্ছে। আর থেকে যাচ্ছে শুধু সেই "আমি" টা দ্রষ্টারূপে এক ও অবিনাশী। পঞ্চতত্ত্বের লয় হলেও তেজোময় চৈতন্য বর্ত্তমান থাকে। তাই ভগবান বললেন – তুমি ভিন্ন আর কেউই থাকবে না। এবার অর্থটা গ্রহণযোগ্য হল তো ? পাঠক ভেবে দেখুন। কূটস্থ চৈতন্যই মহাকাল মহেশ্বর। তোমার অন্তরস্থ দেবাসুর সংগ্রামে উভয়পক্ষীয় সমস্তকেই আমি সমাহরণ করব। মাত্র আমার মত অপরিণামী সনাতন তুমি, জীবাত্মা তুমি, অবস্থান করবে। আমি তোমার সমস্ত লোক সংহরণ করে তোমার নিত্য অবিনাশী আত্মস্বরূপ তোমায় দেখাব। তোমার শুদ্ধ, বুদ্ধ, আত্মস্বরূপ সংস্থানে তোমায় নিয়ে যাব। এটাই আমাকে দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল। সুতরাং যে চৈতন্যশক্তি তেজেরই অংশ তার লোপ হয় না। তাই তেজস্তত্ত্ব অর্জুনের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে এত প্রাধান্য। এ জন্যই তিনি নর নারায়ণ। চৈতন্যশক্তি থেকে উত্থিত আত্মজ্ঞানের নাশ হয় না। এই জ্ঞানের উদয়ে অন্য সমস্তই প্রলীন হয়। যোগাভ্যাসদ্বারা মহাকালের স্বরূপ জেনে তাতে প্রবেশ করলে আর জন্ম মরণের খেলায় মাততে হয় না, চিরশান্তি পাওয়া যায়। এটাই সমীচীন অধ্যাত্ম অর্থ এই শ্লোকের ॥ ১১/৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ।। ৩৩

অনুবাদ: অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশোলাভ কর, শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। ইহারা সকলেই পূর্ব্বে আমাকর্তৃক নিহত হইয়াছে। হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও ॥ ১১/৩৩

ব্যাখ্যা: সজীব মানুষের জীবনের দুটো দিক আছে। একটি আধিভৌতিক, অপরটি আধ্যাত্মিক, যার লক্ষ্য হল পরমাত্মসংস্থিতি, পরমাত্ম লাভ, অমৃত লাভ, যেহেতু জীবের আত্মা অমৃত কিন্তু জীবত্বটা মৃত্যুশীল। এমন মরণশীল জীবের অমৃতলাভের পন্থা নির্দ্দেশ করতে বা অমৃতলাভ করিয়ে দিতে তিনিই পারেন যিনি নিজে স্বয়ং অমৃতময় ও অমৃতস্বরূপ। ভগবানই একমাত্র যুগপৎ মৃত্যুস্বরূপ ও মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপ, মৃত্যু ও অমৃতের অধিপতি। আর জীব ? সেতো শুধুমাত্র মৃত্যু ও অমৃতের অনুভোক্তা। তাই একমাত্র ভগবানই পারেন জীবকে তাঁতে উপনীত হবার পন্থা, কৌশল ইত্যাদি দেখাতে যেখানে যেভাবে জীব মৃত্যু হারিয়ে অমৃতলাভ করবে। তাই ভগবদ্গুরু জীবকে তার অন্তরে, অনুভূতি ক্ষেত্রে কোথায় কি বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল, কোথায়, কিভাবে সে জীব কেমন করে পরিচালিত হচ্ছে, কোথায়, কিভাবে তার বাহ্য কর্ম্ম অনুভূতির আকারে ভোগ দিয়ে, তার জন্য শক্তিমূর্ত্তিতে, সংস্কারমূর্ত্তিতে, পিতৃমূর্ত্তিতে, দেবতামূর্ত্তিতে অবস্থিত, প্রকৃতপক্ষে জীব কার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেই সমস্ত তত্ত্বে তাকে দীক্ষা না দিয়ে, শিষ্যকে সত্যি সত্যিই উদ্ধার না করে, তিনি থাকতে পারেন না। সুতরাং অর্জুনের প্রতি এই উপদেশ সকল জীবের অধিভূত, অধিদৈব ও আধ্যাত্মিক মুক্তির উপদেশ। অধিযজ্ঞ পুরুষরূপী পুরুষোত্তম জীবমাত্রেরই হৃদয়াকাশে সমাসীন। যে দেখতে পায়, শরণাপন্ন হয়, তারই অন্তরে মূর্ত্ত হয়ে তাকে জৈব ভাষায় দেন উপদেশ, শক্তি ও পরিত্রাণ। অতএব গীতার শুধুমাত্র আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অর্থ না ধরে আধ্যাত্মিক যোগচক্ষু উন্মীলক যৌগিক অর্থ করতে পারলে সেই অর্থই হবে প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উন্মেষক। শত্রু কে ? কখন শত্রু ? আমার 'আমি' কে ? তার জ্ঞান নেই, সেজন্য দেহে আত্মবুদ্ধির দ্বারা দেহই আমি এমন অভিমান হয়েছে। এই দেহাভিমানবশতঃই জয়ী বা পরাজিত এমনটা বোধ হয়। আমরা সকলেই যে সেই মহাকালের হাতের পুতুল। তাই এখানে নিমিত্ত মাত্র হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই ভগবান অর্জুনকে বললেন "উত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব" কারণ অহঙ্কার যাতে মিটে যায় সেই উপায় বলে দিচ্ছেন। যুদ্ধের জন্য উঠে বস। অর্থাৎ তুমি কর্ত্তাও নও আর এই যে অনন্ত কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা এও কিছু নয়, কেবলই মায়ার খেলা, এসব কিছুই আত্মবোধ না হলে বোঝা যাবে না। এই ব্রহ্মত্ববোধের প্রধান বাধাই হল বাইরে বিচরণশীল প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল। সুতরাং সে সব বাধা সরাতে হবে। কি ভাবে ? তারই উপায় বলছেন " উত্তিষ্ঠ" (উৎ + তিষ্ঠ), ওঠ, কোথায় উঠবে ? উপরে উঠতে হবে, একেবারে সহস্রারে। কেমন করে উঠবে ? প্রাণের বহির্গমনাগমন রোধ করে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমে উৎপন্ন প্রাণ। তাই প্রাণ থেকে সকল ইন্দ্রিয় ও মন উৎপন্ন হয়ে নিজ নিজ কাজ কর্ম্মসকল করতে থাকে। তাই প্রাণকে নিরোধ করলেই আপনা আপনিই সবার নিরোধ হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ধনুতে মন শর যোজনা করে যুদ্ধ শুরু কর। দেখ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীষ্ম, দ্রোণ নামক বৃত্তিগুলো আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। গুরুপদেশে তুমি শুধু ক্রিয়া করে চলো, ফলের কথা কিছু ভেবো না। এটাই শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ও আদেশ। এভাবে এগোলেই

গুরুসেবার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে বুঝতে পারবে যে ওগুলো সমস্তই জীবনশূন্য ছায়াবাজীর ছায়া মাত্র। আত্মার প্রকাশে ইন্দ্রিয়সকল ও তাদের বৃত্তি সমুদয়ও নিজে থেকেই নিষ্ক্রিয় ও শান্ত হয়ে যাবে। অতএব যাতে আত্মবোধ জাগে ও আত্মার প্রকাশটা অব্যাহত গতিতে হয় তেমন ভাবে কাজ করে চল। সূর্য্য উঠলে অন্ধকার আপনিই দুর হয় তেমনই আত্মার অভ্যুদয়ে ইন্দ্রিয়বর্গ ও তাদের বৃত্তিসমূহ কিছুই আর থাকে না। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা না হয়ে শুধু শুধু তাড়িয়ে বেড়ালে কাজের কাজ কিছু হয় না। আত্মকর্ম্মের দ্বারা বায়ু সকলকে স্থির করতে পারলেই আর ইন্দ্রিয়ের তর্জন গর্জন শোনা যাবে না। স্থির প্রাণই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, সেখানে কোনও প্রভুত্ব চলে না। সাধনা শুরু করে যখন সেদিকেই চলেছ, তখন তারা সব মরেই গেছে জানবে। তুমি ব্রহ্মত্বের জন্য ক্রিয়া কর, তোমার প্রাণ স্পন্দনশূন্য হবে। আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্পন্দনতত্ত্বের বিষয়ে জেনেছ, সে ভাবেই চিত্ত সঙ্কল্পশূন্য হয়ে গেলে ইন্দ্রিয়দের সামান্যই পরিস্থিতি থাকবে, তারা আর কোনও অপকারই করতে পারবে না, বিপরীত পথে নেওয়া তো দূরের কথা। এভাবে এগিয়ে যেতে থাকলে যত আত্মভাব আবরণমুক্ত হতে থাকে, ততোই যশোলাভ হয়। যশ মানে বিবেকখ্যাতি যা হল প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় মনের বিষয়স্পৃহা নিবৃত্ত হয় না। অবিদ্যাশক্তিই ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয় সংযোগের শক্তি, তাই এই অবিদ্যা নষ্ট করতে পারলেই কৈবল্য হয়, যাকে যোগদর্শনে “হান” বলা হয়েছে। বিবেকখ্যাতিই সেই “হান” প্রাপ্তির উপায়। কৈবল্যপদ লাভই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। রীতিমত অধ্যাবসায় সহকারে যুদ্ধ না করলে কি কিছু লাভ হয় ? চণ্ডীতেও আছে “যো মে জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে, স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।” যিনি যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিবেন, জগতে যিনি আমার তুল্য বলশালী, তিনি আমার স্বামী হইবেন। এ কথার তাৎপর্য্য হল যিনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হয়ে পর বৈরাগ্য প্রভাবে পরম শিবরূপ হয়ে যাবেন, তিনিই প্রকৃতির স্বামী বা ঈশ্বরতুল্য হয়ে যাবেন। সেইজন্য আজ ভগবান অর্জুনকে “সব্যসাচী” বলেছেন, যার সাধারণ অর্থ হল যিনি দুই হাতেই শর চালনায় দক্ষ। কিন্তু অর্থ আরও একটা আছে “সব্য” মানে পিছন দিক আর “সচ” মানে যুক্ত হওয়া। মানেটা দাঁড়ায় পিঠের দিকের মেরুদণ্ডে ইচ্ছামাত্রেই মনঃসংযোগ করতে পারেন এবং প্রাণকে তার ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন। গীতার শুরুতেই বলেছিলাম যে মেরুদণ্ডই হল সাধকের গাণ্ডীব। এই মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে বিকর্ষণই হল ওঁ কার ক্রিয়া। এই ওঁ কার ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করলেই মূলাধার ও হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়ে শ্বাসজয় হয়ে যায়। মহাভারতেও দেখুন – “উভৌ মে দক্ষিণে পানী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে। তেন দেবমনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ।” মানে হল, তুমি তোমার কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্রে সম্বন্ধ কর। কর্ম্ম ছেড়োনা আবার অজ্ঞানীর মত কর্ম্ম করো না। মানে হল না বুঝে কিছু করো না, যা করবে বুঝে কর। ব্রহ্মজ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্ম কর। কৃতাঞ্জলি মানে বদ্ধাঞ্জলি নয়। কর্ম্মরূপ বাঁ হাত ও জ্ঞানস্বরূপ ডান হাত এক সাথে মেলাও। এই ভূত ও প্রজ্ঞা একত্বে পর্য্যবসিত করে পরমাত্মস্বরূপ আমার সামনে উপস্থিত হওয়াই তোমার কাজ। এটাই কৃতাঞ্জলি হওয়া। দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে থাকলে, উভয়লিঙ্গস্বরূপ, সব বিপরীতের সমাসস্বরূপ আমায় চিনতে পারবে না। আমার অধ্যক্ষতায় এ মহাযজ্ঞে যোগ দিতে পারবে না। এই দুইয়ের সংযোগেই তোমার যোগচক্ষুলাভের অধিকার আসবে। ভূতের তলে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার তলে আমি। আমিই আত্মা, প্রজ্ঞা প্রাণর্ভূত। যোগচক্ষুলাভ করতে হলে আত্মানাত্ম এই দুই ভাবকে যোগ (যুক্ত) করতে হবে। এটাই যুক্তকর হওয়া, হাতজোড় করা, যুক্তচক্ষু হওয়া যার ফল হল আমার সহচর মাত্র হওয়া, আমার কর্ম্মে নিমিত্তমাত্র হওয়া। অতএব আমার উপদেশ – “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত”। ওঠ আমাতে, জাগো আমাতে, বিশ্বরূপদর্শন বরলাভ করে আমাতে বোধময় হও। এভাবেই আমার কাজে জৈবকর্তৃত্ব ভুলে, নিমিত্ত মাত্র হয়ে, আমার কর্ম্মে যুক্ত হয়ে, তোমার জীবন পরিচালনা কর। বিভুতিসকল, শক্তিসকল, সবই আমার। এইভাবে দেখে অভ্যস্ত হলেই অধ্যাত্মে , অধিদৈবে ও অধিভূতে সর্বত্রই আত্মময় হবে – সব চঞ্চলতা, সব ক্রিয়া, সকল অনুভূতি। ধীরে ধীরে তোমার জৈব পুরুষকার আমাতে ন্যাস্ত, সমর্পিত ও পরে আমারই হয়ে গিয়ে, তোমাকে আমিময় করে তুলবে। তুমি মন্মনা হতে পারবে। তখনই তুমি ব্রহ্মসমৃদ্ধির ভোক্তা হবে, ব্রহ্মসাম্রাজ্য তোমার ভোগে আসবে। তাই যতক্ষণ জৈব পুরুষকার থাকে, ততক্ষণ তা তুমি আমার কর্ম্মের নিমিত্তমাত্র রূপে পরিচালনা কর। তুমি যখন এ সাধনায় কুশলী, রীতিমত সব্যসাচী, তখন তুমি নিমিত্তমাত্রই হয়ে থাকো, তাতে যশোলাভ বা শত্রুজয়ের বিষয়ে আর ভাবনা নেই ॥ ১১/৩৩

> দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
> ময়া হতাংস্ত্বাং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান।।৩৪

অনুবাদ: আমা কর্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীর গণকেও তুমি জয় কর; ভয় করিও না শত্রুদিগকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিতে পারিবে। অতএব যুদ্ধ কর ॥ ১১/৩৪

ব্যাখ্যা: অনেক অনেক আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে দেখুন অর্জুন বলেছিলেন, “নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ”। আমরা জয়ী হই কিংবা (ইহারা) আমাদিগকে জয় করুক - এই উভয়ের মধ্যে কোনটা শ্রেয়স্কর (প্রার্থনীয়), তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। এমন যে আশঙ্কা ছিল, বিশ্বরূপ দর্শনের পর সে আশঙ্কা আর দরকার নেই। তাই ভগবান বলছেন, এখন বুঝলে তো ? সবাই যাদের অজেয়, দুর্দমনীয় বলে ভাবে সেই সব বষবসবহঃ জেদ, ভয়, দুর্ম্মতি এরা সকলে তোমার সাধন প্রচেষ্টা দেখে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে, এখন যদি মন দিয়ে ক্রিয়া করে চল তাহলে আর তাদের দমনের জন্য চিন্তা কি ? একটু সংযমের সাথে ক্রিয়া করলে প্রাণাদি বায়ু, তৎসহ মন, ইন্দ্রিয়

সব একসাথে স্থির হয়ে যাবে। প্রকৃতির সাথে মিশে দেহাত্মবোধ সম্পন্ন হয়ে তোমার নিজের প্রকৃতি, মানে স্থির আত্মার কথাই, ভুলে গেছ তাই বিপক্ষের শক্তিতে ভীত হচ্ছ। আত্মক্রিয়া বা আত্মধর্ম্ম পালনে মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত স্থির হয়ে যায়। ক্রিয়া করে মনকে স্থির প্রাণে লয় করতে পারলেই মন উদ্ধার হয়ে যায়। মনকে উদ্ধার করার অর্থই তো নিজেকে উদ্ধার করা। কারণ যত অশান্তি, উপদ্রব ও বিড়ম্বনা সকলই উৎপন্ন হয় মনেই। তাই মনকে এর হাত থেকে ত্রাণ করতে পারলেই সব বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারবে। অতএব সাধন সমরে প্রবৃত্ত হও। সময় বেশী নেই, সময় নষ্ট না করে ক্রিয়া করে এগিয়ে চল ॥ ১১/৩৪

সঞ্জয় উবাচ -

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ।। ৩৫

অনুবাদ: সঞ্জয় কহিলেন। কেশবের এই বাক্য শুনিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক অতি ভীত হইয়া প্রণতি পুরঃসর পুনরায় গদগদ বচনে কহিলেন ॥ ১১/৩৫

ব্যাখ্যা: বিশ্বরূপ দর্শনের প্রভাব থেকে অর্জুন ভগবানের কথা শুনে যা বললেন সেগুলো এই মৃত্যু ও ধ্বংসের (ধ্বংসমূর্ত্তির) আড়ালে যে মহত্তর আশ্বাস ও উৎসাহজনক আনন্দময় সত্যটা আছে তারই সুনির্দ্দেশ্য সংবাদে পরিপূর্ণ, যার প্রকৃত তাৎপর্য্যটা এমন হওয়া উচিত। এবার সঞ্জয় বলছেন মানে সাধন সমরে জয় হলে যে দিব্যদৃষ্টির প্রকাশ হয় সেই দিব্যদৃষ্টি। সেই দিব্যদৃষ্টিতে অন্ধ মনের এমনটা মনে হল। এখানে কেশব শব্দটার অর্থ, যা আগেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কেশব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যিনি কেশী নামক দৈত্যের বিনাশ করেছিলেন। কামনারূপ কংস পিপাসারূপ কেশীর দ্বারা চৈতন্যরূপ কৃষ্ণকে নষ্ট করতে চাইলে বিষয়পিপাসারূপ তৃষ্ণাকে ব্রজধামে পাঠিয়েছিলেন যেখানে ভগবান বাহুদ্বারা মুখ ব্যাদানরত মানে হাঁ করা অশ্বরূপী কেশীর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরোধ করে তার বিনাশ করেছিলেন। কেশীরূপ তৃষ্ণা অশ্বরূপ ধারণ করে হাঁ করে কৃষ্ণকে গিলতে গেলেন কেন ? মানেটা হল অশ্বই বেগবান আর বিষয় বাসনারূপ তৃষ্ণাই অতটা বেগবান হয়। যার বেগ কূটস্থচৈতন্য দ্বারাই নিবারণ হতে পারে। প্রকৃত ঘোড়া হলে তো তাকে অস্ত্রদ্বারাই বিনাশ করা যেত। এখানে কূটস্থ চৈতন্য হলেন স্থিরবায়ু যার দ্বারা পিপাসারূপ তৃষ্ণার বিনাশ হয়েছিল। কণ্ঠে বায়ু স্থির হলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আপনা থেকে কমে স্থির হয়ে যায়। আর কিরীটি কথার অর্থ হল উচ্চকোটির সাধক। এই অর্জুনরূপী সাধক নিম্নভূমিগুলো জয় করলেও উচ্চভূমিতে মানে আজ্ঞাচক্রে বা উচ্চস্থানে থাকার অধিকার পাননি। কিন্তু কূটস্থে যে জ্ঞান প্রকাশ পায় সেটা অনুভব করার মত সাধনা তার আছে। অন্তরস্থ বায়ুর বেগ এখন ধারণ করতে পারেন না। তাই তাঁর ভয় হয় পাছে এ অবস্থাটাও আর না থাকে, তাই তিনি

ভয়ে ভয়ে শ্বাস টানছেন অথচ কূটস্থে লক্ষ্য ঠিক রেখেছেন। এ অবস্থাটাকেই "ভীত ভীত প্রণম্য" বলা হয়েছে যার তাৎপর্য্য বর্ত্তমান কৃষ্ণ অর্থাৎ সাধনকালে নিজের গুরুদেবকে ভাবে ভাবে মনোবেদনা জ্ঞাপন। কি ভাবে মনোবেদনা জ্ঞাপন ? বেপমান ও কৃতাঞ্জলি হয়ে। "কৃতাঞ্জলি" কথাটার ব্যাখ্যা এর আগে ৩৩ নং শ্লোকে বলেছি। এখন এই "বেপমান কৃতাঞ্জলি" কথাটার তাৎপর্য্য হল সাধন সময় শ্রীগুরুদেব তো সর্ব্বদা নিকটে থাকেন না অথচ নিজের ক্রিয়াজনিত অবস্থাটা ঠিক আছে কি না এমন আশঙ্কায় সাধকের ক্রিয়ায় একটু কম্পন হতে পারে। এর কারণ অনেক কিছুই যেমন কিছুটা দ্বিধা থেকেও হয় আবার একটা অজানা সঙ্কোচ থেকে যায় কারণ পুরুষানুক্রমে পরম্পরাচলিত দীক্ষা থেকে আত্মকর্ম্ম কিছুটা আলাদা ধরণের হওয়ায় কখনও কখনও একটা অজানা অস্বস্তিও সাধকের অবচেতন মনে থেকে থাকে অথচ ক্রিয়াকালীন উৎকৃষ্ট প্রাণায়ামের ফলে শুধু একটা কম্পন অনুভব হতে থাকে। এ কম্পনটা বলা যায় সাধনার চার অবস্থার একটা অবস্থা। সাধনার চতুরাবস্থা হল স্বেদ, কম্প, পুলক,অশ্রু। এ দিক থেকে ধরলে এই কম্পন হল সাধনার দ্বিতীয় অবস্থা। এমন একটা বেপমান অবস্থায় কৃতাঞ্জলির অর্থ হল প্রকাশ পাওয়া মানে মনের ভাব জ্ঞাপন বা প্রকাশ অর্থাৎ কূটস্থে জ্যোতির প্রকাশ হওয়ায় কূটস্থেই মনোভাব জ্ঞাপন বা নিবেদন। এখানে এমন প্রকাশের অবস্থা আসার মত সাধন করাই কৃতাঞ্জলি হওয়া ও আত্মারূপী কূটস্থ চৈতন্যে নমস্কার করার অর্থ ওঁ কার ক্রিয়া করা। আর অতি ভীতভাবে গদগদ বচনে বলার অর্থটা হল বিশেষ মনোভাব যা এমন অবস্থায় সাধকের হয়ে থাকে। কি সেই মনোভাব ? সেটা পরের শ্লোকগুলোতে বলেছেন ॥ ১১/৩৫

অর্জুন উবাচ -

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ। ৩৬

অনুবাদ: অর্জুন কহিলেন। হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্যকীর্তনে জগৎ যে অতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং অনুরাগবিশিষ্ট হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, এই সকলই যুক্তিযুক্ত ॥ ১১/৩৬

ব্যাখ্যা: বিশ্বরূপ দর্শনের এমন করাল রূপের আড়ালে এমন কিছু আছে যাতে ভগবানের সান্নিধ্যে জগৎবাসীর সকল রকম তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হয় নইলে করালবদনা মা কালীরূপে পূজিত হন কেন ? মৃত্যুর মাঝে মৃত্যুঞ্জয়কে দেখেই আমাদের সকল ভয় দুর হয়। অমৃতের পুত্রের ভয়ের কোনও দরকার নেই। ভয় তারাই পাবে যাদের ধ্বংস হতে হবে। এরা কারা ? এরা হল অজ্ঞ, অজ্ঞানরূপ রাক্ষসী শক্তিসজ্ঞ। তাই আমাদের এই করাল রুদ্রের গতি ও ক্রিয়া যত কিছু সব কিছুরই লক্ষ্য হল সেই

দিব্য জ্যোতি ও পূর্ণতা। হৃষীকেশ শব্দের অর্থ আগেই বলেছি (হৃষিক+ঈশ) ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর, পরিচালক, নিয়ন্তা, এক কথায় পরমাত্মা। যাঁরদ্বারা এই চক্ষু দর্শন করে, এই মন মনন করে, শ্রবণদ্বারা শোনা যায়, প্রাণ তার প্রাণন ক্রিয়াদি করে থাকে। এ কথা বেদেই আছে – " যেন চক্ষুংষি পশ্যতি, যেনাহুর্ম্মনো মতম্ যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে"। সেই প্রলয়ঙ্কর রূপকে অর্জুন নিজের অন্তরের নিয়ন্তারূপে, নিজের অন্তরের মালিক রূপে, চিনতে পেরেহৃষীকেশ্ব সম্বোধন করলেন। কারণ ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করে নিরোধমুখী না হলে এমন কূটস্থ জ্যোতিঃর প্রকাশই হত না। যার এমন অপূর্ব্বরূপ দেখে সাধকের ভয় হলেও আনন্দ কিছুটা অবশ্যই হয় এবং এই আত্মক্রিয়া ও আত্মজ্যোতিঃর উপর অনুরাগ বেড়ে যায় ও দৃঢ় হয়। এজন্যই সিদ্ধগণ এই ক্রিয়াদ্বারা মনে প্রাণে কূটস্থ লক্ষ্য করেন ও তোমারই দিকে দৃষ্টি স্থাপন করেন। আত্মার অনুভবে ডুবে থাকায় তাঁদের কথা বলতেও ইচ্ছা হয় না, শুধু তোমারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে থাকেন,অর্থাৎ তাঁদের পরমানন্দের কথাটাই পর পর আলোচনা করেন ও নিজ নিজ আপন জনকে বুঝিয়ে থাকেন। আর দুর্বৃত্ত ও রাক্ষস স্বভাবের লোকেরা ও কাম ক্রোধাদি পরায়ণ লোকেরা এ সব আলোচনা শুরু হলেই পালিয়ে বাঁচেন। মনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় তাদের আগের মত আর আকর্ষণ করে না। এসব অনুভব করেই সাধক বলেন – তাইতো আগে যা শুনেছিলাম এখন তো সে সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখছি, মানে বোধ করছি ॥ ১১/৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ।। ৩৭

অনুবাদ: হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর এবং ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা, তোমাকে জগৎ কেন না নমস্কার করিবে ? যেহেতু তুমি সৎ এবং অসৎ এই দুয়ের এবং তাহাদেরও অতীত যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই ॥ ১১/৩৭

ব্যাখ্যা: পরমাত্মা তাঁর অসঙ্খ্য জীবে অনন্তকাল ধরে নিজেকে প্রকট ও অপ্রকট করছেন। তিনি শুধু বাহ্য রূপ নামেরই সংহারক মাত্র, শুধুমাত্র সসীম বস্তুরই ধ্বংসকর্ত্তা মহাকাল। কিন্তু প্রকৃত যে দিব্য সৃষ্টি সেটা কিন্তু শ্বাশ্বত, অসীম, যার প্রকাশ মাত্র হতে পারে সসীমের মধ্যে। তিনি সনাতন, অক্ষর। সৎ বা অসৎ, যা কিছু আছে, যা কিছু নেই, যা ব্যক্ত এবং যা অব্যক্ত এ দুটোই আসলে সেই তিনিই। এসমস্ত কিছুর উর্দ্ধে পরাৎপর পরমপুরুষ। সমস্ত নশ্বর জিনিষকে এক অনন্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে ধরে রয়েছেন যেথায় সবই অনন্ত অসীম রূপে থেকে যায়। এত বড় যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার পেটে আছে সে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভেরও আধার হলেন এই বাসুদেব, তার অন্ত কে পায় ? তাই সৎ অসতের অতীত পরমাত্মভাব ব্যক্তের কারণ অব্যক্ত। এই স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়ে যেওআমি' র বোধ সেটাকে যদি সদ্‌ভাব বলি তবে এর আড়ালে যে কারণরূপ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল – অব্যক্ত প্রকৃতি সেটাই অসৎ কারণ তা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আবার এসমস্তের অতীত যে বাসুদেব ভাব, যাঁকে আশ্রয় করে এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবের প্রকাশ, তিনিই ঈশ্বর বা চিদাকাশ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাঁকে বলা হয়েছে "যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তব্য ঈশ্বরঃ"। যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে পালন করছেন তিনিই অব্যয় ঈশ্বর। এ তিনটে অবস্থাই ব্রহ্মে অন্তর্নিহিত। ভোক্তা = জীব, ভোগ্য = জগৎ এবং নিয়ন্তা = ঈশ্বর। এই দেহে তার প্রভেদ বুঝে নিয়ে সাধনার দ্বারা ব্রহ্মে প্রবেশের দরজাটা চিনে নিতে পারলে সাধক ব্রহ্মে লীন হতে পারেন ও পূনর্জন্মরহিত হন ও সংসার বন্ধন মোচন হয় ॥ ১১/৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানাম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।। ৩৮

অনুবাদ: হে অনন্তরূপ, তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরমধাম (বিষ্ণুপদ) তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ ॥ ১১/৩৮

ব্যাখ্যা: অর্জুন আরও বলছেন যখন কোনও কিছুই ছিল না, মানে কিছুরই প্রকাশ ছিল না, তখনও শুধু তুমিই ছিলে, তাই তুমিই একমাত্র জ্ঞাতা, আদিদেব। সত্যই তো ! তিনিই মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ করে দেন। অতএব সকল জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয় তিনিই। সর্ব্বভূতের উৎপত্তির আদি কারণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন সাধারণতঃ উঠে থাকে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তার উত্তর দেওয়াই আছে। " কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জ্ঞাতাঃ জীবাম কেন ক্ক চ সপ্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥"

(১) কারণস্বরূপ ব্রহ্ম কি রকম ? মানে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণ ?

(২) আমরা কোথা থেকে এসেছি / জন্মেছি ?

(৩) জন্মের পর কিভাবে / কার সাহায্যে বেঁচে থাকি ?

(৪) মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাই/ আমাদের কি হয় ? এবং

(৫) কোন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই সুখ দুঃখ ভোগ করে চলেছি/ সুখ দুঃখ ভোগের নিয়ম মেনে চলেছি ?

ন্তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ । যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্য ধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥" ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বাহ্য উপায়ে কারণ বুঝতে না পেরে ধ্যানে বসলেন। ধ্যানযোগে তাঁরা সেই পরম দেবতার কার্য্যকারিণী শক্তিকেই কারণ বলে বুঝতে পারলেন। এই কার্য্যকারিণী শক্তি বাহ্য উপায়ে আগে বোঝা যায়নি কারণ এটা স্বত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ ও তার কার্য্যরূপ বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারাদির দ্বারা আবৃত থাকে। যে এক অদ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মা কাল হতে আত্মা পর্য্যন্ত সকল কারণসমূহকে পরিচালনা করছেন সেই শক্তিকেই ঋষিগণ দর্শন করেছিলেন। সেই শক্তি অবাঙ্মনসাগোচর মানে বাক্য ও মনের অতীত, জ্ঞান ও ধ্যানগম্য অবিশেষরূপা। প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপভূতা অথচ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতা পরাৎপরা সেই শক্তিকেই তাঁরা কারণরূপে দর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ যে ভাবেই বলা হোক না কেন, দেবতা, আত্মা ও শক্তি সকলই সেই পরব্রহ্মেরই অবস্থাভেদ মাত্র। সেই শক্তিই (২) পুরুষ পুরাণ, (৩) বিশ্বের পরম নিধান, (৪) বেত্তা, (৫) বেদ্য, (৬) পরং ধাম, (৭) অনন্তরূপ। তিনিই সর্ব্বব্রহ্মময়রূপে জগৎব্যাপী আছেন। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রত্যেক নব বিকাশ তাঁরই আংশিক প্রকাশমাত্র। আর আমাদের যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাতেও তিনিই অন্ত রঙ্গভাবে ও সমগ্রভাবে দৃষ্ট ও আবিস্কৃত হন ॥ ১১/৩৮

বায়ুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।। ৩৯

অনুবাদ: তুমি বায়ু, অগ্নি, যম, শশাঙ্ক, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও সহস্রবার নমস্কার ॥ ১১/৩৯

ব্যাখ্যা: অর্জুন ভগবানের স্তব করছেন ও তাঁকে নমস্কার করছেন। কি ভাবে ? স্তব করে বলছেন তুমি সর্ব্বদেবাত্মক ও সর্ব্বনমস্য। এমনভাবে স্তব করে ওঁ কার ক্রিয়া করছেন। তখনই কূটস্থের ভিতরে ও বাইরেও দেখতে পাচ্ছেন বায়ু, অগ্নি, যম, চন্দ্র ইত্যাদি সকলকে। তখন সাধকের এ সমস্ত দেবমূর্ত্তিকেও কূটস্থের রূপ বলেই মনে হয়। আসলে নিম্নতম থেকে উচ্চতম সব দেবতাই তো তিনিই, সেই বিরাট পুরুষ। তাঁকে গুরু, পিতা, মাতা, সখা, ভ্রাতা, পতি বা পুত্র কি বলব কিছুই বোঝা যায় না। আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রিয় বস্তুই যে তিনি। তাঁকে বার বার প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়। গুরুপদিষ্ট ওঁ কার ক্রিয়ার দ্বারা এই প্রণতভাব সাধকের এসে থাকে ও বার বারই সাধকের এ কাজ করতে ইচ্ছা হয়। আর এমন প্রণত ভাব এলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয় ॥ ১১/৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমহস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্য্যমিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ।।৪০

অনুবাদ: হে সর্ব্বাত্মন্, তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার। তোমার সকল দিকেই নমস্কার। হে অনন্তবীর্য্য অমিতবিক্রম তুমি সমুদয় বিশ্ব ব্যপিয়া আছ। অতএব তুমিই সর্ব্বস্বরূপ ॥ ১১/৪০

ব্যাখ্যা : তিনিই যে সর্ব্বের সর্ব্ব এই সত্যটার উপরই বার বার জোর দেওয়া হয়েছে। তিনিই অনন্ত বিশ্বসত্তা ও প্রত্যেক ব্যাষ্টিসত্তা। প্রত্যেক বস্তুই তিনি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এক সত্তা ও শক্তি আছে সেটাই তিনি। বেদের কথাই মনে পড়ে। সেখানে আছে—"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি।" আত্মাই অধেঃ, ঊর্দ্ধে, পশ্চাতে, সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে, আত্মাই সব। অর্জুনও আজ সেটাই দেখলেন কিন্তু আরও যা দেখলেন সেটা হল এক আত্মারই বৈচিত্র্যময় রূপ যা হল – বিশ্বম্ভর আত্মা, প্রলয়ঙ্কর আত্মা, মহাকাল আত্মা, হৃদয়াকাশে মহান দ্যু ভূ আয়তন আত্মা। আরও দেখলেন পরম সখা, পরম আত্মীয়, পরম গুরুরূপে, স্বগতভেদে, দ্বৈতে যে জন্য "তুমিই সব" বলেও "আমিও তুমিই" এটা আর বলতে পারলেন না ঐ দ্বৈতভাব, দ্বৈতবুদ্ধির কারণে। সেজন্যই বুঝি পরমাত্মাও নিমিত্ত মাত্র হওয়ারূপ কর্তৃত্বটা অর্জুনের হাতেই ছেড়ে দিলেন। এমন দ্বৈতভাব ও দ্বৈতবুদ্ধি দূর করার জন্যই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নমস্কার করা প্রয়োজন। সাধনক্ষেত্রে যা হল ওঁ কার ক্রিয়া। বার বার একাজ করতে করতে তবেই গ্রন্থিভেদ হয়। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ না হলে ভেদবুদ্ধি সংশয় কিছুই যায় না। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" তখন সর্ব্বত্রই জীব, সর্ব্বত্রই কূটস্থ। আবার সব কূটস্থ মিলে সেই এক বিরাট কূটস্থ। এই সময়ের স্তবে অর্জুন ভগবদবীর্য্যকে বলছেন অনন্ত এবং বিক্রমকে বলছেন অমিত। কারণ সাধক কূটস্থ দেখতে দেখতে, দেখতে পান সেই ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ মণ্ডলটা বাড়তে বাড়তে বিশ্বব্যপী হয়ে গেল যার আর অন্ত নেই। এজন্যই তিনি হলেন অনন্তবীর্য্য বৈষ্ণবীশক্তি আর তার প্রকাশশক্তি যেহেতু বিক্রম, তাই বিশিষ্টরূপ ক্রমধারায় অপরিমেয় প্রকাশ বলেই তিনি অমিতবিক্রম, তাঁর পরাক্রমও অনন্ত। প্রতি তৃণটার মধ্যে পর্য্যন্ত এই পূর্ণতা, এই অমিতবিক্রম গুপ্তভাবে অবস্থিত। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এই একই লীলা, অনন্ত ও অমিতবিক্রম লুকানো আছে। এটাই ব্রহ্মদৃষ্টি, "তুমিই সর্ব্বব্যপী ও তুমিই সব"। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্বঃ" অনন্ত নির্ব্বিশেষ ভাবজ্ঞাপক। এভাব থেকে যদি কিছু প্রকাশ পায় তাও অনন্তই হবে। অনন্ত থেকে অনন্তই প্রকাশ পায় – "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" অনন্ত ও পূর্ণত্বই হল পরমতত্ত্বের বীর্য্য। এই পরমতত্ত্বই অব্যয় অক্ষয় ॥ ১১/৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণেয়েন বাপি ।। ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ।।৪২

অনুবাদ: তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কারভাবে যা বলিয়াছি (তজ্জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি)।

হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে যখন অনুপস্থিত তোমাকে বা সাক্ষাৎ উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিয়াছি তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমার নিকট তাহার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করি ॥ ১১/৪১-৪২

ব্যাখ্যা : এই পরম বিশ্বপুরুষ মানবমূর্ত্তি নিয়ে মরদেহে অর্জুনের সামনে ছিলেন তাই অর্জুন শুধুমাত্র তার মানবস্বরূপটিই দেখেছিলেন বলে ভগবানের প্রতি কেবল মানুষের মত ব্যবহারই করেছেন। আহা! কি চেনা চিনল আজ অর্জুন, কি দেখাই দেখল, যাতে তার অন্তরের শূন্যস্থান সবটুকুই হয়ে গেল পূর্ণ, পূর্ণের পূণ্য উদয়ে। বাস্তবিকই পাগল না হলে এই দেহটাকে কেউ "আমি" বলে না। কিন্তু আমরা সকলেই পাগল তাই দেহছাড়া আত্মার বোধই আমাদের নেই। প্রাণাধিক কোনও অমূল্য সুহৃদের মুখে যদিও বা এ বিষয়ে কিছু শুনেও থাকি তাতে যেটুকু সামান্য বোধ হয় তাও খুবই অস্পষ্ট আবছা আবছা, মোটেই বোধে আসে না। তাই আমরা জন্ম, মরণে কত হাসি, কত কাঁদি। প্রতিঘটে বিরাজিত যে রাম বা কূটস্থ তাকে না দেখে আমার ছেলে, আমার বাবা, আমার ভাই, আমার বন্ধু এই সব কথা বলি। "ঘট ঘট বিরাজে রাম" অথচ সেই ঘটের মধ্যে রামকে না দেখে এই পচা দেহঘটটাকেই দেখে থাকি আর ক্রমাগত ভুলের পর ভুলই করে চলি। এই দেহঘটের মধ্যে যে বসে খাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করছে, কত ভালমন্দ, সু কাজ, কু কাজ করে চলেছে সেই মহৎ কর্ত্তা ব্যক্তিটি কে ? – আমি ? যদি তাই হই তবে "আমি" কে ? এই দেহ মন বুদ্ধি অহঙ্কার কেউই সেই আমি নয়, অথচ যিনি না থাকলে এরা কেউই থাকে না তিনিই আমার প্রকৃত "আমি"। সেই "আমি"কেই আজ অর্জ্জুন দেখল, আর চিনল হৃদয়মণ্ডলের অধীশ্বর রূপে। চ্যুতিহীন, বিচ্ছেদহীন, চিরস্থিতির চিরসাথী। চির জীবনের চির আশ্রয় তার স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ভগবান্ । অচ্যুত তিনি, সর্ব্বত অচ্যুত, দিকে, কালে, বিষয়ে, চিন্তায়, ভাবে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রাণে, আত্মায়, অচ্যুত! তাই মনে পড়ে গেল সেই সব মুহূর্ত, সেই সব কাহিনী, সেই সব ব্যবহার, যেখানে প্রাণের এই প্রাণকে পরমেশ্বর বলে গ্রহণ করা হয়নি। কি দেখল ? দেখল হায় হায় ! জীবনের কোথাও কখনও তো তোমাকে দেখা হয় নি। দৈনন্দিন কর্ম্মের যে প্রধান চারটি ভাগ আহার, বিহার, শয়ন ও আসন বা উপবেশন, জীবনের এই কর্ম্মবিভাগগুলোতে সর্ব্বদাই তো একাই ছিলাম দেখছি। ভোগে, কর্ম্মে, শয়নে কই তোমার ঈশিত্ব তো দেখা হয়নি। তোমায় সঙ্গে নিয়ে বিচরণ করা তো হয়নি। তোমাতে আমার কর্ম্ম, ভোগ, শয়ন এমন দেখাতো দেখিনি। নিজে খেয়েছি, নিজে দেখেছি, নিজে পড়েছি, নিজের মূর্খতায় বোকামিতে অজ্ঞতার অজ্ঞান আঁধারে নিজের অস্তিত্ব ঢেকেছি, কই তোমায় তো সেথায় খুঁজিনি, দেখিনি, পাইনি। কখনও কখনও যদি তোমার কথা মনে পড়েছে, তোমার কাছে এসেছি; মুখে হয়ত বলেওছি তোমায় যে তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, কিন্তু সে কথা কি সত্যিই হৃদয়ের কথা ছিল ? ছিল না। তোমার সমক্ষে এসেও তোমায় উপেক্ষা, অবজ্ঞাই করেছি শুধু। ভগবৎ ধারণা করতে গিয়েও তোমাকে শুধু কল্পনায় গড়েছি আপন খেয়ালের বশে। আত্মা – সাক্ষী – ঈশ্বর এসব অনেক বলেছি কিন্তু সে বলায় ছিল শুধু মনোযোগ, বুদ্ধিযোগ, বড়জোর হয়ত বা একটু প্রাণযোগ, কিন্তু আত্মযোগ ? সেটা তো ছিল না মোটেই ! বুদ্ধিকে পাঠিয়েছি পূজোর উপকরণ সঙ্গে দিয়ে তোমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে, প্রাণের উপহারও হয়ত বা কদাচিৎ দিয়েছি এক আধ টুকরো, কিন্তু নিজে নিজে এভাবে এসে এমন করে তোমার চরণে তো লুটাই নি। জীবনের সকল সময়ব্যাপী ছিলাম একাকী, যে যে মুহূর্ত্তে ছিলাম তোমায় ভুলে। আবার তোমায় আমার চেতনারূপে জেনেও তোমায় নিয়ে করেছি নিছকই রঙ্গরস, তামাসা, উপহাস! তখনও ছিলাম একাকীই। তখনও দেখা হয় নি যে তুমিই আমায় করাচ্ছ, বলাচ্ছ, ভোগ দিচ্ছ, নিজে উপস্থিত থেকে। এ সমস্তই তো তোমাকে অবহেলা করা, অবহাস করা মাত্র। আবার যখন তোমায় নিয়েই সব করেছি, জীবনযজ্ঞে যুক্ত হয়েছি, তখনও যা কিছু করেছি তাও সমস্তই হয়েছে তোমার অস্তিত্ব দর্শনশূন্য, কেননা তখনও তোমায় আত্মস্বরূপ, একান্ত ঈশ্বর, সর্ব্বতোনিয়ন্তা, সর্ব্বত আমার মূলীভূত কারণরূপে তোমায় দেখা হয়নি। এ সকল ব্যবহারের অর্থই হল তোমার প্রতি উপহাস, অবহাস। এছাড়া আর কি হতে পারে ? এসব অপরাধের জন্য হে আমার ঈশ্বর, আমার অপ্রমেয় দেবতা, আমার সর্ব্বস্বের সত্য সত্য দাতা, আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর। ক্ষমা কর। "ক্ষমস্ব পরমেশ্বরঃ" আমার "দেহোহহং" বুদ্ধি, আমার পিতা, মাতা, পুত্র, শত্রু, মিত্র, আত্মীয় স্বজনরূপে সেই আত্মাকেই পৃথক পৃথক ভাবে দেখা, এ কেবল আমার "দেহোহহং" বুদ্ধিরই ফলমাত্র। তাই আজ সে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র আর পিতা, মাতা, সখা, বন্ধুরূপ পৃথক পৃথক উপাধিদ্বারা সেই আত্মাকে সম্বোধন করে আর অমন জৈব দৌর্ব্বল্যময় ভাব দিয়ে তোমায় অবমাননা, অবহাস করব না। দেহাত্মবুদ্ধিতে পড়ে গিয়ে তোমায় মনে করেছি পরমাত্মীয়ময় সখা, আত্মারূপে রয়েছ অন্তরে। তুমি আমার প্রিয় তাই বাৎসল্যতার মোহে এই সব জৈব দুর্ব্বলতায় দৌর্ব্বল্যময় ভাব দিয়েই করেছি তোমায় অভ্যর্থনা,

তোমার করাটাকে ভূলে গিয়ে, আমার করাটাকেই প্রধান করেছি। আর মোহের ঘোরে বলেছি হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা এসকল ভাষায় করেছি বিজৃম্ভন। তোমার পরিচয় তোমার মহত্ত্বকে না জেনে, না বুঝে, তোমায় নামিয়ে এনেছি আমারই জৈব মলিন আবরণে। এ সমস্তই আমার সাধনকালীন অপরাধ। তুমি আমায় ক্ষমা কর প্রভু, পরমেশ্বর, আমায় ক্ষমা কর। এখন "তুমিই সব" এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। এমনভাবে যথার্থ জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলেই ভবের খেলাও ফুরিয়ে যায় ॥ ১১/৪১-৪২

পিতাসি লোকস্যচরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব। ৪৩

অনুবাদ: হে অতুল্যপ্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, অতএব পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু, ত্রিলোকেও তোমার সমান কেহই নাই; তোমা অপেক্ষা অধিক কোথা ? ১১/৪৩

ব্যাখ্যা: কেন অপরাধ হয়েছে বলা হল ? সমস্ত কিছুই যখন তোমা হতে উৎপন্ন তখন তুমিই চরাচরের পিতা, সর্ব্বলোকের গুরু, শুধুই জ্ঞানচক্ষুদাতা নয়, যোগচক্ষুদাতাও বটে। সুতরাং গুরু অপেক্ষা গৌরবময় তোমাকে তোমার প্রীতির সুবিধাটুকু নিয়ে অমন করে আমার জীবত্বের আবর্জনাময় মলিন আত্মীয়তার ধুলোয় নামিয়ে আনা একি কম অপরাধ, হে দেবতা ? তুমিই মোহান্ধ জীবকে জ্ঞানালোক বিতরণ করে তার পরিত্রাণের উপায় করে দিচ্ছ। তোমাকে পূজো করলে তবে তোমাকে পাওয়া যায় কিন্তু প্রাণ দিয়ে পূজো করতে হয়। প্রাণ দিয়ে পূজো করা কাকে বলে ? মূলাধার থেকে জোর করে প্রাণশক্তিকে উঠিয়ে আজ্ঞাচক্রে রাখতে পারলে প্রকৃত পূজো হয়। সে পূজোর ক্রিয়া, কর্ম্ম, বিধি সবটাই গুরুমুখে জেনে বুঝে নিয়ে শ্রদ্ধাসহকারে বহুকাল অভ্যাস করলে তবে পূজো করার যোগ্যতা লাভ হয়। এ পূজোর সাক্ষাৎ ফলই হল আত্মসাক্ষাৎকার। এমনভাবে, এমনটি করে, তোমার দেশে আজ্ঞাচক্রে গিয়ে স্থিত হয়ে, তোমার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে, আত্মপ্রজ্ঞায় উজ্জ্বল হয়ে, তারপর তোমাতে প্রবিষ্ট হয়ে, হয়ত তোমায় কিছু বললেও বলা যেত, কিন্তু বদ্ধ জীবত্বে থেকে তোমায় ওরকমভাবে সম্ভাষণ করাটা নিঃসন্দেহে অপরাধ ॥ ১১/৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমিশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্। ৪৪

অনুবাদ: হে দেব, অতএব আমি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া স্তুত্য ঈশ্বর তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের অপরাধ, সখা মিত্রের অপরাধ, এবং প্রিয় ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়ব্যক্তির অপরাধ, প্রিয়ার্থ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য কর। ১১/৪৪

ব্যাখ্যা: সাধারণ মনুষ্যজীবনের নীচতা ও অপূর্ণতা ছাড়িয়ে উঠতে হলে ভগবানের অনন্ত বিশ্বব্যপী ও বিশ্বাতীত সত্তার উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র মানব এমন ভাব থেকে বহুদূরে তার ক্ষুদ্রত্ব, হীনত্ব নিয়েই পড়ে থাকে। কোথায় অমুকের ছেলে যদি ইংল্যন্ডে গেল আমার ছেলেকে একবারটি আমেরিকায় পাঠিয়ে কৃতার্থ হলাম। এমন সমস্ত অপরমার্থিক চিন্তা ভাবনা নিয়েই জন্মজন্মান্তর কাটিয়ে দেয়। এত নীচু থেকে অত উঁচুতে অতখানি মহত্তর ভাবে পৌঁছান একবারে সম্ভব নয়। তাই এমন একটা মধ্যবর্ত্তীভাব চাই যাতে মানুষ ভগবানকে অন্তরঙ্গভাবে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়রূপে দেখতে ও গ্রহণ করতে পারে। এজন্যই ভগবানের মানব দেহ গ্রহণ ও অবতারত্ব এত কিছুর অবতারণা। তাঁর অনন্ত সত্ত্বাও সত্যি, আবার মানবীয় রূপটাও সত্যি। ভগবান মানুষের সাথে মানবোচিত সম্বন্ধসকল স্থাপন করেন যাতে সেসকল সম্বন্ধ পূর্ণ ও সার্থক হয় কিন্তু তা সত্তেও তারা ঈশ্বরকে চিনতেও পারে না ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধিও করতে পারেনা। তাই কিছু না বুঝে অনেক কিছু বোঝার মত ভাব করি আর বড় বড় কথা বলে বেড়াই। অবতারের সংজ্ঞা না বুঝে ইচ্ছামত কাউকে কাউকে অবতার বলে প্রকাশ করি অথচ তাঁদের উপদেশগুলোকে নিজের জীবনে পালন করার কথা কল্পনাও করি না। ভাল ভাল মানুষদের, বড় বড় সমাজ সংস্কারকদেরও অবতার বানিয়ে উপভোগ্য পণ্যের মত ব্যবহার করে নিজেরাও প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টা করে থাকি। যদি কোনও সময়ের কোনওরূপ সুকৃতির বশে সম্বিত ফেরে আর অমন বিশ্বরূপ দেখে শ্রীগুরুদেবকে এক আধটু চিনে ফেলা সম্ভব হয় তখন "প্রণিধায় কায়ং" অর্থাৎ ত্রিশরীর একেবারে লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করতে হয়। ভক্ত হয়ে পূজোর আয়োজন করতে হয়। এ পূজোর প্রধান অঙ্গই হল আত্মসমর্পণ, নিজেকে ভগবৎ চরণে নমিত করা, স্ত্রী যেমন স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, পুত্র যেমন পিতাতে আত্মসমর্পণ করে ঠিক তেমনি ভাবেই ভক্ত সাধক নিজেকে পরমাত্মায় উৎসর্গ করছেন। নিজের দৈন্যের জন্য, হীন চিত্তের জন্য ক্ষমা চাইছেন। ভগবানকে প্রসন্ন করছেন, অর্থাৎ আত্মাকেই প্রসন্ন করছেন। ভগবান কখন প্রসন্ন হন ? যখন শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হন। এই শ্রীগুরুই আত্মা। "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ" গুরুর প্রসন্নতা যখন মানসতটে তরঙ্গায়িত হয়, তখন অন্তঃকরণও প্রসন্ন হয়। আর অন্তঃকরণ প্রসন্ন হলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। মনের এই স্থির ভাব বা প্রসন্নতাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাঁরা সুর বা বীর বা দেবতা তাঁরাই এই পরমপদ সাক্ষাৎ করে থাকেন। চেষ্টা করে দেখুন পাঠক, আপনিও করতে পারেন কি না ? তোমার ত্রিশরীর, ভূর্ভুবঃ স্বঃ সবটুকু লুণ্ঠিত কর এই স্তবনীয় আত্মার চরণে। আত্মরূপী চিরসখা তোমায় যে দেখাল হৃদয়াকাশে তাঁর অব্যক্ত, অক্ষর, মহাকালরূপ, ত্রিকাল কর্তৃত্বময় পরমেশ্বর রূপ, যে মূর্ত্তি দেখে সখা বলাটা পর্য্যন্ত অপরাধ মনে হয়েছে, সেই মূর্ত্তির কাছে ত্রিশরীর পেতে দিও, চরণধূলি মাখ। হৃদয়াকাশে যে আত্মায় ভাবে ভাবে তুমি জন্মাচ্ছ, ভাবে ভাবে মারা যাচ্ছ, সেই হৃদয়াকাশের পরম পিতাই, তোমার প্রকৃত পিতা, তুমি তাঁর সেই অমৃতের সন্তান। তবে বাড়িতে যিনি সশরীরে আছেন,

যাঁকে বাল্যাবধি পিতা বলে যেনে এসেছ শ্রীযুক্ত অমুক চন্দ্র তুসুক, তিনি কে ? হ্যাঁ, তিনিও পিতা বটেন, তবে তুমি তাঁর কামজ সন্তান মাত্র। অমৃত সম্পর্কে নও। এই জাগতিক সম্পর্কিত পিতাও সেই একই অমৃতের সন্তান, তুমিও যাঁর অমৃতরূপী সন্তান। অতএব এই অমৃতদীক্ষা যাঁর কাছে পাবে তিনিই পরম পিতা, পরমেশ্বর, পরমাত্মা। তাঁরই স্তব কর, আর ত্রিশরীর লুটিয়ে দাও সেই হৃদয় গগনে। দেবগণ তথা বীর সাধকগণও এই ভাবে প্রণাম করে থাকেন। "প্রণিধায় কায়ং" – "কায়ং প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা দন্ডবৎ ভূমৌ পতিত্বা ইতি যাবৎ " যে শ্বাস নাভিদেশ থেকে সহস্রারে গমন করে অর্থাৎ শ্বাস মাথায় উঠে তালুতে স্থির করে পুরো মেরুদণ্ডটা ও পুরো শরীর সোজা রেখে মুখটা একটু নিচে করে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে চৈতন্যযুক্ত করা। এমনটা হলেই ঐ শক্তিবিন্দুর পরমপদ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে শিবের সাথে যুক্ত হলেই দেহবোধ আলগা হয়ে যায় ও চিৎশক্তি পৃথক হয়ে পড়ে। তখনই পরমশান্তিলাভ হয়। এটাই বন্ধনমুক্ত অবস্থা যা সাধকের নিজ বোধরূপ অনুভব ৷৷ ১১/৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।। ৪৫

অনুবাদ: হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, অথচ ভয়ে ভয়ে আমার মন অস্থির হইতেছে; অতএব তোমার সেই রূপ আমায় দেখাও হে দেব, হে জগন্নিবাস প্রসন্ন হও ৷৷ ১১/৪৫

ব্যাখ্যা: অর্জুন বুঝতে পারছেন যে ভগবান কল্যাণময়, তবু তাঁর এ বিশ্বরূপ তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তিনি বড় ভয় পেয়ে গেছেন, তাই ভগবানকে বলছেন, হে প্রভু, তোমার এমন রূপটা সংবরণ কর। আগে যে রূপটা দেখেছিলাম তোমার সেই হৃদয়, মন অকর্ষণকারী মোহনমুরলীধর রূপটী আবার আমাকে দেখাও। সে রূপটাই দেখতে আমি বড় ভালবাসি, কারণ এতে একই সঙ্গে থাকে আনন্দ ও ভয়ের মিশ্রণ যার ভয়াবহতাই বেশী। কিন্তু ঐ বিশ্বরূপটাই তো তাঁর একমাত্র রূপ নয়। এ ভয়াবহ ভাবরাশিতে অনেক বড় বড় সাধকই সাধন করেছেন তাঁরা সব ছিলেন ভীমভৈরব, বামাচারী সাধক। সাধক বামাক্ষ্যাপা নামে পরিচিত শ্রীযুক্ত বামদেব প্রমুখ সাধকগণ এমন ভয়াল মূর্ত্তিরই সাধক ছিলেন। এমন বিশ্বরূপ দর্শন করেই জীবনের ক্ষুদ্রত্বকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ক্ষুদ্রশক্তি সাধারণ মানুষ চায় সৌম্যদর্শন ঈশ্বরমূর্ত্তির আরাধনা করতে। সাধক অর্জুনও সৌম্যরূপ দর্শনে আগ্রহী হয়েছেন দেখুন পরের শ্লোকে ৷৷ ১১/৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ।। ৪৬

অনুবাদ: আমি তোমাকে পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি, সেই রূপই কিরীটি গদা বিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো, সেই চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হও। ১১/৪৬

ব্যাখ্যা: ভগবানের যে সৌম্যমূর্ত্তি অর্জ্জুন দেখতে ইচ্ছা করেন সে রূপটা কেমন সেটাই বলছেন। কারণ সৌম্য নারায়ণ মূর্ত্তিকেই সবসময় সামনে রেখে অরাধনা করাটা বরং ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের পক্ষে কিছুটা সহজ হয়। ভগবানের সহস্রবাহু সংহারমূর্ত্তি সাধারণ জীবের পক্ষে বা সাধারণ সাধকের পক্ষেও অসহনীয় হয়। বিশ্বরূপের মধ্যে যে ভীতি ও চাঞ্চল্য থাকে পুরুষোত্তমরূপের মধ্যে তেমন কোন উৎকণ্ঠা নেই বরং ভাল লাগে, তৃপ্তি বোধ হয়। অসীমের মধ্যে প্রগাঢ় একটা বিস্ময় এসে সারাটা মন ও চিত্তকে অভিভূত করে, এমন অরূপের রূপই যেন গুণাতীত ব্রহ্মসত্তায় রূপময় সগুণ ব্রহ্মের বিকাশ – এটাই ধারণাযোগ্য হয়ে ওঠে। এতেও বিস্ময় আছে, আনন্দ আছে কিন্তু সেই ভীতি নেই, ভয় বিহ্বলতাও নেই, তাই এমন রূপ আরও আরও দেখতে ইচ্ছা করে। যুগ যুগ ধরে দেখেও আশা মেটে না। অসীমবস্তু যখন সসীমের মধ্যে ধরা দেয় তখনই তার অপরূপ রূপমাধুরীর সন্ধান পাওয়া যায় " The beautiful is the infinite represented in the finite form." শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় যা হল দেহের অভ্যন্তরের হৃদয়াকাশ প্রদেশের চতুর্ভূজা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী পুরুষের ধারণা কঠশ্রুতিতে সেটাই "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষোহন্ত রাত্মা, সদা জনানাাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বদা প্রাণীগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। যোগীরাও নিজ হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ দেখে থাকেন। ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলস্থ যে শ্যামসুন্দরকে তাঁরা হৃদয়াকাশে দেখতে পান, সেটা কূটস্থের মত অত জোরালো তীব্র জ্যোতিঃপুঞ্জ নয়। আবার চতুর্ভূজ মানে ঠিক চার হাতও নয়, চারটি ভুজ মানে অনেকটা ধনুকের আকৃতি গেলাকার বস্তু যাতে চারটি বোঝার বা জানার বিষয় আছে যেগুলো হল (১) শঙ্খধ্বনির ন্যায় নাদ শ্রবণ, যাকে পাঞ্চজন্য বলা হচ্ছে। (২) চক্র – যা কূটস্থের চারিদিকে প্রথমে ঘোরে সেই জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। "অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।" আত্মস্বরূপ হংস ব্রহ্মচক্রে ঘুরিতেছেন। (৩) গদা – পরম নিয়ন্তারূপী কূটস্থ যাঁর শাসনে, কঠোপনিষদে আছে – অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু যথাযথ ভাবে নিজের নিজের কাজ করে চলেন। কূটস্থব্রহ্মই সকলের দেহের মধ্যে থেকে সকলকে নিজের নিজের কর্ম্মফল ভোগ করান। "তুরীয়ং মুর্দ্ধি সংস্থিতম্" মুর্দ্ধায় অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে মন রাখতে পারলেই আত্মার তুরীয় রূপ দেখা যায়। (৪) পদ্ম – যা হল প্রকৃত শান্তি। ক্রিয়ার দ্বারা পর অবস্থা লাভ করলেই এই পরম শান্তি পাওয়া যায়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সাথে থাকায় ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী হয়। বুদ্ধিও বিষয়চিন্তা দ্বারা চঞ্চল হয় না। এ অবস্থায় প্রাপ্তি – অপ্রাপ্তি, জরা – মৃত্যু কোনও কিছুর ভয়, উৎকণ্ঠা কিছুই থাকেনা যা সব সেই পদ্মহস্তের দ্বারাই সূচিত হয়। বিশ্বরূপ দর্শনের পর এমন অবস্থা প্রাপ্তিই সাধকের লক্ষ্য হয়। তাই এমন চার হাত চতুর্ভূজ রূপটাই মানুষেরও এত প্রিয়। ভগবানের সহস্রবাহু সংহারমূর্ত্তি অসহনীয় হলেও এই মূর্ত্তিটার ভিতর দিয়ে কিন্তু ভগবানের অনন্ত

মহিমা উপলব্ধি করে ক্রমশঃ উচ্চতর শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দলাভ করা যায়। এ জন্যই অর্জুনের চতুর্ভূজ রূপ দেখার ইচ্ছা হয়েছে ॥ ১১/৪৬

শ্রীভগবানুবাচ–

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ।। ৪৭

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে অর্জুন, আমি তোমার যোগবল প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ তোমায় দেখাইলাম, যাহা তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। ১১/৪৭

ব্যাখ্যা: শ্রীভগবানের যা কিছু উক্তি গীতায় বর্ণিত আছে তার সবটাই হল কূটস্থে যোগীর অনুভব একথা আগেই বলা হয়েছে। এমন অনুভবের কথায় এমন রূপ দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে ? প্রসন্ন হয়ে স্বীয় যোগপ্রভাবে তোমাকে আজ এই রূপটা দেখান হল। এ হল আমার সেই রূপ যে তেজোময়রূপে অনন্ত বিশ্বই আমার আদ্য – মানে ভক্ষনীয়। এ বিশ্বরূপ দর্শনে লোকগ্রসনই বিশেষভাবে দেখান হয়েছে। বিশ্বকে করাল দংষ্ট্রায় চর্ব্বণ ও গ্রাস করা হচ্ছে এমন বিভীষিকাময় লোমহর্ষণ মূর্ত্তি ও বর্ণনা পৃথিবীর কোনও শাস্ত্র বা দর্শনেও নেই। বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির বর্ণনা আছে অন্যত্র, প্রলয়ঙ্কর ভগবৎ লীলার বর্ণনাও আছে। কিন্তু মূর্ত্ত হয়ে ভক্তকে লোকচর্ব্বণ করার ব্যাপার দেখানো এমন কথা কোথাও নেই। সেজন্যই ভগবানও বললেন এ জিনিস আগে কেউ কখনও দেখে নি। দান্তের ডিভাইন কমেডি অথবা বাইবেলে বর্ণিত মহা প্লাবনের বর্ণনায় মানুষকে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তির দৃশ্য আছে বটে কিন্তু এমন তুলনা পৃথিবীর কোথাও নেই। এখানে আরও একটা বিষয় বোঝার আছে ঐ "আত্মযোগাৎ" শব্দে। আত্মযোগ মানে হল অবতারীয় যোগশক্তি। এই অবতারীয় যোগশক্তির প্রভাবেই অর্জুনকে এমন বিস্ময়কর দৃশ্য দেখানো সম্ভব হয়েছিল। কেননা আগেই অর্জুন এই নরদেহে নারায়ণের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে ছিলেন। তাই রণস্থলের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে সম্পূর্ন গীতার বর্ণনা ও অলৌকিক কালভূমিতে অর্জুনকে অলৌকিকভাবে নিয়ে গিয়ে যোগপ্রভাবেই বিশ্বরূপ দেখানোর কাজটাও ওই অলৌকিক ভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। একটা যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর এত কম সময়ের মধ্যে এমন এক দিব্য তত্ত্বের উদ্ভাবন তারপর সেটাকে বোঝানো, দিব্য চক্ষু উদ্ভাসিত করে দিয়ে বিশ্বরূপ দেখানো সেই অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক যোগপ্রভাব ছাড়া আর কি হতে পারে ? অবতারীয় যোগপ্রভাব ব্যতীত সাধারণ মানুষের হিসাবে ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ব্রহ্মবিভূতি দর্শন, মোটেই এমনটা নয়। আবার বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তপস্যা যে সব কথা এর পরের শ্লোকে বলা হয়েছে সেসব দ্বারাও এমন দর্শনলাভ সম্ভব নয়। একমাত্র অবতারীয় যোগপ্রভাবে এটা দেখা হয়েছিল বলেই অর্জুন আবার গীতাতত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছিল নইলে আত্মপ্রজ্ঞাপ্রসূতভাবে এমন দর্শন হলে আর এভাবে তার বিস্মৃতি ঘটত না। এ থেকে যোগপ্রভাব বিষয়টা পরিষ্কার হল। এটুকু অন্ততঃ বোঝা গেল যে পুরো দর্শনের বিষয়টাই কূটস্থের দৃশ্য ও অনুভবগত ভাষ্য । আত্মযোগ ব্যতীত এ রূপ দেখবার অন্য কোনও উপায় আর কিছু নেই। এ রূপ সকল ভূতের মধ্যেই আছে কিন্তু আত্মযোগ ছাড়া দেখা যায় না। সাধনাদ্বারা মন আত্মার সাথে যোগযুক্ত করতে গেলেই এ অদ্ভূত তেজোময় রূপ সাধকের দৃষ্টিতে এসে উপস্থিত হয়। আত্মার চিরপ্রসন্নতা উপলব্ধির অবস্থাই এটা। দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপ প্রকৃতিই আত্মাকে ঢেকে রাখে। ইন্দ্রিয় ও মন যতটুকু স্থির হবে আত্মার মহিমাও ততটুকুই দেখা যাবে। এটাই নির্ব্বিকার অবস্থা। এ অবস্থা পেলে আত্মাই আত্মাকে নিজের স্বরূপ দেখাতে পারেন। ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে প্রাণ প্রবেশ করলেই দেখা যায়। প্রাণের বর্হিমুখী বৃত্তি প্রাণাপান রুদ্ধ না হলে প্রাণের প্রকাশ অনুভব হয় না। সাধক গুরুকৃপায় সাধন পেলে নিজেই সেটা বুঝতে পারেন। সাধক অর্জুনই হলেন তেজস্তত্ত্ব। সেই তেজ যখন সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় থেকে আকর্ষণ করে একটা বিশেষ কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এমন বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব হয়। আত্মা প্রসন্ন না হলে এমন দর্শন হয় না। আত্মাকে কিভাবে প্রসন্ন করতে হয় আগেই বলা হয়েছে। সেই আত্মযোগের কথাই ভগবান এখানে বলেছেন ॥ ১১/৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ।। ৪৮

অনুবাদঃ হে কুরুপ্রবীর, না বেদের দ্বারা, না যজ্ঞের দ্বারা, না অধ্যয়নের দ্বারা, না দানের দ্বারা, না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা, না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যার দ্বারা, আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন মনুষ্যলোকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১/৪৮

ব্যাখ্যা: এই বিশ্বরূপ ভগবানের নিজের আত্মারই প্রতিচ্ছবি যেভাবে পরাৎপর ভগবান জগৎ সৃষ্টিতে নিজের আত্মাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এমন যে বিশ্বরূপ তা কে দেখতে পায় ? কে দেখতে সমর্থ এমন বিশ্বরূপ ? সেটাই ভগবান বলছেন। যাঁরা পূর্ণযোগে ভগবানের সাথে যুক্ত, তাঁরা এরূপ দেখে শঙ্কিত ও বিমূঢ় হন না। কিন্তু অর্জুন এখনও তৈরী নন। কারণ আজকাল ধর্ম্ম বলতে যা বুঝি তার দ্বারা একাজ হয় না। মানুষ শুধুমাত্র ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলোই করে থাকে। বেদ ইত্যাদি বহুলশাস্ত্রদি অধ্যয়ন করে, উগ্র তপস্যা, দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ আরও কিই না করে থাকে? এসব করে নিজের হয়ত কিছুটা তৃপ্তি হতে পারে এই ভেবে যে'আমি' এই করলাম, যজ্ঞ করলাম, বৈষ্ণব সেবা করলাম, সবই আমিই করলাম ইত্যাদি ভেবে নিছক আমিত্বের পোষণ তথা তৃপ্তিলাভ মাত্র হয়, এর বেশি কিছুই হয় না। একমাত্র গুরুর অহৈতুকী কৃপা দ্বারাই অর্জুনের এমন বিশ্বরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়েছিল। তাই বল

"গুরুকৃপহি কেবলম্" আর "অহং" কে ছাড়, অভিমানটা দূরে রাখ। সেই তাঁর কৃপা পায় যে তাঁর শরণাগত। শরণাগতি কিভাবে আসে ? যখন মনের আর কোনও আশ্রয় না থাকে, কেবল তাঁরই শরণ নিয়ে থাকে তখনই শরণাগত হওয়া যায়। এজন্যই আয়ু, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বাক্য সকলই সেই যজ্ঞপুরুষের জন্য নিয়োজিত করতে হয়। ভজনশীল হয়ে ক্রিয়া করতে করতে মনুষ্য সমাজ অতিক্রম করে দেবত্বলাভ হয়, তখন তিনি অন্তর্দেহে নিজের তেজোময় বপু দর্শন করে কৃতার্থ হন। এজন্য সাধনার তীব্র বেগের দ্বারা প্রাণের স্থিরতার সাথে সাথে মনের লয় করতে হয়। তখন "আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে" এমন অবস্থা হয়। এমন কৃতার্থ সাধক দ্রষ্টার স্বরূপে মহাযোগ সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে কালাতীত অবস্থা লাভ করেন। এজন্য ভগবান অর্জুনকে "কুরুপ্রবীর" অর্থে কুরুপ্রবর (কর্ম্মবীর)বললেন। যাঁরা ক্রিয়া করেন তাঁদের মধ্যে যিনি মহা উগ্র সাধক তিনিই খ্যতিসম্পন্ন বীর। এমন সাধকই এমন বিশ্বরূপ দেখে থাকেন ॥ ১১/৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।। ৪৯

অনুবাদ: আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না হয়, বিমূঢ় ভাবও যেন না হয়, ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই রূপই দেখ ॥ ১১/৪৯

ব্যাখ্যা: ধ্বংসের পশ্চাতেই থাকে সৃষ্টি। বিশ্বরূপের ভয়াবহতার পশ্চাতেও আছে করুণা ও কল্যাণেচ্ছা। কিন্তু এ বোধ সাধকের পূর্ণতা না এলে হয় না। তাই নবীন সাধক অর্জুনের সে ভীষণভাবটাও শান্ত স্থির ভাবে দর্শন করার ক্ষেত্র তৈরী হয়নি বলেই তিনি পুনরায় তাঁর সেই সৌম্য নারায়ণ মূর্ত্তি গ্রহণ করলেন। বৃহৎ কূটস্থ জ্যোতির প্রথম দর্শনে এমন ক্লেশ অনুভবই স্বাভাবিক। এ অবস্থা অতিক্রম না করলে তো অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। এটা তো দর্শন করতেই হয় তবে তার আগে প্রীতমনা হয়ে উপযুক্ত হয়ে নিতে হয়। মানে পরমার্থ লাভের যে সব উপায় আছে তার দ্বারা সংযোজিত মন হতে হবে। তবেই সেই পরমাত্মাকে জানা যাবে। প্রাণই সমস্ত জগৎকারণ, অতএব তোমারও কারণ। তিনি অরূপ অনামি, ও তাপত্রয়শূণ্য। এঁকে এভাবে না জানলেই লক্ষ্য শুধুমাত্র দেহ ও দেহের ভোগের দিকেই থাকে। তাই এত ত্রিতাপজ্বালা যার শেষ হয় না ॥ ১১/৪৯

সঞ্জয় উবাচ -

ইত্যার্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ।। ৫০

অনুবাদ: সঞ্জয় কহিলেন। বাসুদেব এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আবার স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নমূর্ত্তি হইয়া বিশ্বরূপ দর্শনভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন ॥ ১১/৫০

ব্যাখ্যা: আবার সাধকের দিব্যদৃষ্টিতে বাসুদেব সৌম্যমূর্ত্তিতে ফিরে এলেন, যে মূর্ত্তির ব্যাখ্যা আগে ৪৬ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা আছে। বিশুদ্ধসত্ত্ব না হলে কেউই এই বাসুদেবের সন্ধান পেতে পারেন না। পূর্ব্বঅধ্যায়ে ৩৭ নং শ্লোকেও ভগবান বলেছিলেন বৃষ্ণিগণের মধ্যে তিনিই বাসুদেব। বৃষ্ণি অর্থে প্রচণ্ড জ্যোতিঃ। সেই পূর্ণজ্যোতি বিশিষ্ট পুরুষোত্তম রূপই বাসুদেব যাতে সর্ব্বভূতের স্থিতি সেই পরম বস্তুরূপ পরমাত্মাই বাসুদেব। এটাই সেই জ্যোতির অভ্যন্তরভাগের রূপ। যাঁরা গৃহকর্ম্ম করেন সেই নারীগণ অথবা যাঁরা চাকুরী বা ব্যবসা করেন এমন পুরুষগণ অথচ সাধনাও করেন, তাঁরা বাধ্য হয়েই এমন ভাব ধরেন যেন অর্জ্জুনের মত বলেন " দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর," এ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশকে বন্ধ না করলে কংস বা কামনা থাকে কোথায় ? কামনা না থাকলে সংসারপ্রবাহ থাকে কি করে ? তাই আবার সেই দ্বিভূজ মূর্ত্তি যাতে যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ নেই এমন মূর্ত্তিতেই আমরা খুশি থাকি। আর সাধকেন্দ্রগণ মগ্ন থাকেন চতুর্ভূজ মূর্ত্তি – শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মবিশিষ্ট যে ভাব তাতে। চতুর্ব্যূহ সমন্বিত ভাবটা হল আরও উচ্চকোটির সাধকদের জন্য। সাধন প্রভাবে সত্ত্ব বিশুদ্ধ হয়ে গেলে কংস ধ্বংস হয়ে যায়, তখন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মভাবে বিভোর থাকলে বিশ্বরূপ বা কালচক্র আর সাধককে ভয়বিহ্বল করতে পারে না। তাই এখানে কূটস্থ অন্তর্হিত হয়ে আবার সেই সাধারণ পার্থসারথি মূর্ত্তির আবির্ভাব, সৌম্য বপু, মহাত্মা ॥ ১১/৫০

অর্জুন উবাচ -

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ।। ৫১

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন। হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানব মূর্ত্তি দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত এবং স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১১/৫১

ব্যাখ্যা: চতুর্ব্বেদীয় অর্থাৎ চারভাবে জানা বা বেদিত হওয়া। এটাই চতুর্ব্বেদ। যার একটা হল অব্যক্ত, অপর তিনটি ব্যক্ত, পরমাত্মার অরূপ সত্তা একটা আর ব্যক্ত রূপময় সত্তা তিনটে। এর মধ্যে যেটা বিশ্বরূপ সেটা সাধারণের দর্শনীয় নয়। পরীক্ষামূলক ভাবে কোনও কোনও বিশেষ উচ্চকোটির সাধক নবীন কোনও সাধককে দেখাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন। সাধকপ্রবর বামদেব নবীন সাধক নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে এমন দর্শন করাতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যখন নলিনীকান্ত অসার অচেতন হয়েছিলেন। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন ও পরবর্ত্তীকালে বড় সিদ্ধপুরুষ পরমহংস নিগমানন্দ

হয়েছিলেন। তাই বলছিলাম ভাগ্যক্রমে দর্শন পেলেও তা সহ্য করার ক্ষমতা সাধকদের থাকে না। দ্বিতীয়রূপ পুরুষোত্তমরূপ যা বলে বোঝাবার নয় তবে প্রত্যক্ষ দেখলে বোঝা যায় এবং দেখাও কদাচিৎ সম্ভব। দেখার উপায় আগে বারবার বলা হয়েছে যার প্রয়োগকৌশল গুরুমুখে জেনে নেবেন। আর তৃতীয়রূপটাই হল দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দররূপ। আড়ম্বরবিহীন এ রূপ দর্শনে চিত্তের কোনও ব্যাকুলতা থাকেনা, থাকলেও শান্ত হয়ে যায় ও প্রসন্ন হয়, দুর্নিরীক্ষ্যও নয় অথচ জীবমাত্রের অভীষ্টসাধক ইষ্টমূর্ত্তি। এই দ্বিতীয়ভাব পুরুষোত্তমভাব ও রূপ, এখন অর্জ্জুন দর্শন করলেন, যার অর্থ হল আত্মচৈতন্য। শান্ত মনুষ্যমূর্ত্তিই হল আত্মচৈতন্যরূপ। এ আত্মচৈতন্য বোধেই সুস্থতা ফিরে এল। এতক্ষণ মহান্ বিশ্বরূপ দর্শনে বিহ্বল দিশেহারা হয়ে মন যেন চৈতন্যরহিত হয়েছিল, এখন sense ফিরে এল অর্থাৎ চৈতন্যপ্রাপ্তিতে আবার মন স্বাভাবিক অবস্থায় এল, মন মনেতে এল, ফলে আমিও সুস্থবোধ করছি। এটাই অর্থ ॥ ১১/৫১

শ্রীভগবান্ উবাচ -

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।। ৫২

অনুবাদ: শ্রী ভগবান কহিলেন। আমার এই সুদুর্দ্দর্শ যে রূপ (অর্থাৎ যাহা বড় দুঃখে দেখা যায়) দেখিলে, দেবগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ॥ ১১/৫২

ব্যাখ্যা: এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য যে তার জন্য একে দেখা এত কঠিন ? এ রূপ দেখা এত কঠিন এজন্যই যে সাধন করলেও বেশিরভাগ সাধকদেরই এই রূপ দেখার শক্তি জন্মায় না। কারণ দ্বৈত অবস্থায় কূটস্থের মধ্যে অসংখ্য রূপ দর্শন হলেও শেষে সবই একরূপ অর্থাৎ জ্যোতিমাত্রই হয়ে যায়। এটাই অদ্বৈতভাবে পর্য্যবসিত হওয়া। কিন্তু তখনও সেই অপূর্ব্ব অবস্থার দ্রষ্টা থাকে। এই পুরুষোত্তম রূপ পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না হলেও বিশিষ্টাদ্বৈতভাব যাতে অদ্বৈতভাব থেকে একটু দ্বৈতভাবের দিকে নামতে হয়। ঠিক ঠিক ভাবে একটু নামতে পারলে সাধকের এই পুরুষোত্তম নারায়ণরূপ দর্শন হয় কিন্তু সেটা এতই সুদুর্লভ দর্শন যেন মনে হয় স্বয়ং নারায়ণের ইচ্ছা ব্যতীত এটা হবার নয়। ব্যারোমিটারের পারদ যেমন প্রাকৃতিক আবহাওয়ার চাপের ফলে উঠানামা করে, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় নয়। তেমনিই এই অদ্বৈতভাবে উত্তরণ বা সেখান থেকে দ্বৈতভাবে অবতরণ কোনওটাই নিজের ইচ্ছায় হয় না। এ জন্যই অতি উচ্চকোটির সাধকদেরও কূটস্থ দর্শন হলেও এমন রূপ দর্শন হয়ে ওঠে না। কদাচিৎ কারও ভাগ্যে এটা ঘটে থাকে। তাই এই বাসুদেব মূর্ত্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়। তবে অনেকেরই অনুভবে যে কিছুটা আসে এটা ঠিক কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন কারো কারো ভাগ্যে ঘটে। তাই ভগবান বলছেন যে অর্জ্জুন যা দেখলেন এ রূপ দেবতারাও দেখতে পান না। দেবতা হলেন সাধনশীল পুরুষগণ কিন্তু সাধনকালেও সব সাধকের এমন দর্শন হয় না একথা আগেই বলেছি। যাঁরা দেবলোকরূপী আকাশে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি পেয়েছেন তাঁরাও সদা সর্ব্বদা এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষী ॥ ১১/৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।। ৫৩

অনুবাদ: আমাকে যেরূপে দেখিলে, না বেদদ্বারা, না তপস্যাদ্বারা, না দানদ্বারা, না যজ্ঞদ্বারা ঈদৃশ আমাকে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১১/৫৩

ব্যাখ্যা: বইপুস্তক পাঠে বা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে বা ব্যাপক কোনও পূজোপাঠ করে আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা যায় না। এক পরম চৈতন্য আছে, যার ভিতর দিয়ে বিশ্বাতীতের মধ্যে প্রবেশ করা এবং তার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্ব্বভূতকে ধারণ করা সম্ভব হয়, সকলের সাথে এক হয়েও সকলের উর্দ্ধে থাকা যায়। কিন্তু শুধু জানলে বা শুনলে বা আত্মতত্ত্ব জানার মত ক্রিয়াদি সাধন করলেও বা এমনকি কূটস্থে থাকলেও এইরূপ দেখা যায় না। বহু বয়স্ক মানুষকেও বলতে শোনা যায় – এইতো এতবছর ধরে ক্রিয়া করে চলেছি, এসব করে আমার কিই বা হল ? নিরামিষ খেয়ে মরছি মাঝখান থেকে। এসব শুনে দুঃখ হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ? সত্যি কথাটা বলতেও পারিনা, পাছে ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে, মনে দুঃখ পান। এমন দর্শনের যোগ্যতা লাভ করা চাই। সাধনে বিশেষ পরিপক্কতা না এলে এই রূপ দর্শনের সামর্থ্য আসে না। এই আত্মদর্শন বেদ মুখস্ত করলেও হবে না বা কোনও রকম যাগ যজ্ঞের দ্বারাও হয় না। চুপচাপ ক্রিয়া করেই যেতে হবে। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ অন্ততঃ হওয়া চাই। অবিদ্যার সংস্কার নষ্ট হওয়া চাই। অবিদ্যার সংস্কার না গেলে সংশয় কাটে না। কামনা থাকতে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নষ্ট হতেই পারে না। মন ও দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে এটা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। অবশ্য ভগবান পরের শ্লোকেই এর একটা উপায় নির্দ্দেশ করেছেন। পড়ুন পরের শ্লোক ॥ ১১/৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুংঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ।। ৫৪

অনুবাদ: হে পরন্তপ অর্জুন, আমার প্রতি অনন্যভক্তি দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ॥ ১১/৫৪

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মের অপার মহিমা জানতে না পারলে তাঁর অস্তিত্বেই আমাদের অবিশ্বাস জন্মে যায়। এ যুগে যেটা হয়েছে। বিপদগ্রস্ত মানুষ, দুরারোগ্য রোগী এই ধরনের লোক ছাড়া সাধারণভাবে মানুষ

ভগবানকে নিয়ে ভাবার সময়ই পায় না। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই চাই সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন। জানা, দেখা, প্রবেশকরা এটাই সাধনা। মনে জানা মানে বুদ্ধি দিয়ে জানা, হৃদয়ে দেখা ও অনুভব করা, মানে প্রত্যক্ষ করা, এবং আত্মায় প্রবেশ অর্থ আত্মৈকতায় প্রবিষ্ট হওয়া। আমার মানি ব্যাগে টাকা আছে বলেই মানিব্যাগে আসক্তি, তাই ব্যাগটা সাবধানে রাখি যাতে পকেটমারি না হয়। তেমনি নিজের অস্তিত্বে মানে প্রাণে একটা স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ থাকতে বাধ্য। এতদসত্ত্বেও বস্তুবাদী মূর্খগণ আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, অন্ততঃ মুখের কথায় ও ব্যবহারে। অন্তরে করলেও মুখে তার প্রকাশ নিষিদ্ধ। তাই ভগবদ অস্তিত্বে তোমার যদি অনুরাগ না থাকে, তবে বুঝতে হবে তুমি অজ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলছ, নইলে তোমার সে স্বীকৃতি নেই। ভেবে দেখ তোমার থাকাটা তোমার ইচ্ছাধীন নয়, জন্ম, মৃত্যু, কায়িক ও মানসিক অবস্থান্তর কোনওটাই তোমার অধীন নয়, তোমার সমস্ত থাকা না থাকা, পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদির কর্ত্তা তো একজন আছেনই। এইভাবে তোমার অস্তিত্বের মূল যে একজন আছেন এবং তুমিও নিরাশ্রয় নও, এই বোধটাকে দৃঢ় করবে। ক্রমশঃ এই জ্ঞানটাতে সত্যবোধ অভ্যাস করতে করতে তোমার সহেতুক অনুরাগ যত অহেতুক হয়ে উঠবে ততই তুমি ভগবৎ অস্তিত্বটাকে নিজের বুদ্ধিতে প্রাণে ও নিজের বোধে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকটিত করতে পারবে। আগে জ্ঞানের বাহ্যস্তরে, যা মনোগ্রন্থি বা বুদ্ধি নামে পরিচিত তাতে, ভগবৎ ধারণা সুদৃঢ় হলেই নিজের নিজত্ব ভগবানের নিজত্বে অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্মা না মিলিয়ে থাকা যাবে না। ঠিক যেমন স্বামী, স্ত্রী, পুত্রাদিরূপ প্রিয় ও আপনজনের সাথে দেখা না হলে প্রাণ ব্যাকুল হয় তেমনই ভাবে তোমার প্রাণ ব্যাকুল হবে পরমাত্মায় মিলতে। একদিকে এমন আকুলতা বৃদ্ধির সাথে সাথেই ভগবানে ব্রহ্মবুদ্ধির প্রকাশ পায় আর ততই পরস্পর পরস্পরকে বাড়িয়ে চলে ও তোমার প্রতি অঙ্গে ও জগতের প্রতি অঙ্গে পরমাত্মবোধের প্রকাশ ঘনীভূত ও আত্মীভূত হতে থাকলে দেখবে ভক্তিও অনন্যা ও অহৈতুকী হবে যা তোমার জ্ঞানকে করবে সচেতন, দর্শনকে করবে জীবন্ত ও আত্মাকে প্রবেশ করাবে পরমাত্মায়। একথা আগেও বলেছি, বাকিটা গুরুমুখে জেনে নিও। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে যিনি ক্রিয়া করবেন তিনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন। আত্মা যখন মন ইন্দ্রিয়াদির ভাবে ভাবিত হয় তখনই তিনি জীব। আবার যখন ইন্দ্রিয়াদি ও তাদের কর্ত্তা মন আত্মায় লীন হয় এবং আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়, তখন ইন্দ্রিয়েরাও সেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। জীবও সকল বস্তুতে থাকে কিন্তু আসক্তিপূর্ব্বক, আর পরমাত্মাও সব কিছুতেই আছেন কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে, এটাই তফাৎ। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অনুশীলন দ্বারা অনন্য ভক্তির বৃদ্ধি করলেই ক্রিয়া ফলবতী হবে আর তফাৎটাও বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে॥ ১১/৫৪

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ।। ৫৫

অনুবাদ: হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত, (ইন্দ্রিয় বিষয়ে) অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনি আমাকে পান। ১১/৫৫

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন যোগের উপসংহার করেছেন। সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত পরম রহস্যের কথা বলছেন যেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অনুবাদ উদ্ধৃত করলে দাঁড়ায় "এক্ষণে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভূত অর্থ এবং যাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স্ (মোক্ষ) লাভের উপায় তাহার অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ দিতেছেন – "মৎকর্ম্মকৃত" আমার জন্য যে কর্ম্ম তাহার নাম মৎকর্ম্ম; সেই মৎকর্ম্ম যে করে, তাহাকে মৎকর্ম্মকৃৎ বলা যায়। ভৃত্যও প্রভুর জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, আপনার কর্ম্ম করে না কিন্তু তাহা হইলেও সেই প্রভুকে নিজের পরলোকের গতি বা আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করে না। কিন্তু আমার কর্ম্ম করে যে ভক্ত, সে আমাকে ঐহিক ও পরলৌকিক একমাত্র গতি বলিয়া বোধ করে, যে এইরূপ বোধ করে তাহাকেই "মৎপরম" বলা যায়। মদভক্ত যে আমাকেই সর্ব্বপ্রকারে সকলের আত্মা ভাবিয়া ভজন করে, সেই মদ্‌ভক্ত। "সঙ্গবর্জিত"– ধন, পুত্র, মিত্র, বন্ধুবর্গে যাহার সঙ্গ অর্থাৎ প্রীতি বা স্নেহ নাই – তাহাকেই সঙ্গবর্জিত বলা যায়। "নির্ব্বৈর" – সকল প্রাণীতেই অর্থাৎ যদি কেহ তাহার অত্যন্ত অপকার করিতেও প্রবৃত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারও উপরে যাহার শত্রুতাবুদ্ধি হয় না, সেই নির্ব্বৈর। এই প্রকার গুণসম্পন্ন যে ভক্ত সেই আমাকে পাইয়া থাকে, অর্থাৎ আমিই তাহার পরমগতি হই, তাহার অন্য কোনও গতি থাকেনা। হে পাণ্ডব, এই তোমার ইষ্ট উপদেশ আমি করিলাম, ইহাই অর্থ।"

আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমার তত্ত্ব জানতে পারবে, আমার স্বরূপ দর্শন করতে পারবে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হতে পারবে। শারীরিক, মানসিক সকল কাজেই যে ঈশ্বরসম্পর্ক দেখে, সে যেকোনও ভাবেই হোক, ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ হোক, তাঁরই শক্তি কর্ম্ম আকারে প্রকাশ পাচ্ছে এভাবেই হোক, তাঁর বিশ্বযজ্ঞে যোগদান করেছি এভাবেই হোক, যে কোনও প্রকারে ভগবদ্‌যুক্ত কর্ম্ম করলেই ভগবৎকর্ম্মকৃৎ হওয়া হোল। আর ভগবানই শ্রেয়ঃ জগতের একমাত্র পরমাশ্রয়। জীবনের চরম সার্থকতা হল তাঁকে পাওয়া, তাঁরই হয়ে যাওয়া এমনতর জ্ঞানে ধ্রুব সম্বুদ্ধ হওয়াই মৎপরম হওয়া। আর ভগবদ্‌ভক্তি – কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন যাঁতে সম্বুদ্ধিত তাঁর তো সর্ব্বতো ভগবৎসঙ্গই হয়ে থাকে। সুতরাং সে সংসার সঙ্গে থেকেও সঙ্গবর্জিত পুরুষ। এমন পুরুষেই আসে নির্ব্বৈর ভাব। সে জগতে কোথাও দ্বন্দ্ব, কোথাও কোন বিরোধ দেখেনা। তার অনুভবে ও চেতনায় সর্বত্র ভগবানই সাক্ষাৎভাবে কর্ত্তা ও সর্বত্র তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে এটাই হয় তার অন্তরের জীবন্ত ধারণা। এমন ভাবের মানুষ আপাত পরিদৃশ্যমান বিরুদ্ধ ব্যাপারেও সামঞ্জস্য দেখে থাকে। এমনভাবে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তিরদ্বারা পরিচালিত ও সমুচ্চিত যে পুরুষ সেই পুরুষই আমাকে প্রাপ্ত হয়। এটাই ভগবদ্ বাক্য। শঙ্করভাষ্যেরও এটাই তাৎপর্য্য।

স্বর্গ টর্গ কিছু নয়, "আমি" বা আত্মাই একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু এমন স্থির নিশ্চয় যাঁর হয়েছে সেই একমাত্র আমাতে মানে আত্মাতে প্রবেশের চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাকে খুঁজে পাবে কোথায় ? কোনও বাহ্যবস্তু বা মনের কল্পনায় তো আর আমাকে পাবে না। আত্মাকে পাবার সোজা উপায়ই হলো আত্মকর্ম্ম যা গুরুমুখে প্রাপ্তব্য। গুরু উপদেশ মত কাজকর্ম্মগুলো করলেই তাঁতে থাকা যায়, সেটাই "মৎপরম" অবস্থা। এই অবস্থায়ই সঙ্গবর্জিত ও আসক্তিশূন্য অবস্থা হয়। এমন ব্রহ্মভাবে ভাবিত সাধকই নির্ব্বৈর হয়ে থাকেন যা আগেও বলা হয়েছে ॥ ১১/৫৫

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে "বিশ্বরূপদর্শনযোগ" নামক একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ন হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার একাদশ অধ্যায়ের যৌগিক ও অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইল।

একাদশ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ : বিশ্বরূপ দর্শনযোগে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল। যদিও সারসংক্ষেপ আগে নবম অধ্যায়ের শেষেও একেবারে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত করা আছে তবুও প্রথাগত ভাবে বলি যে স্থির ব্রহ্মরূপ কূটস্থের উপর সমুদয় নিখিল জগতের প্রকাশভাবই বিশ্বরূপ এবং ঐ সর্ব্ব ব্রহ্মময় বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁতে তন্ময়ভাবে যুক্ত হওয়াই বিশ্বরূপ দর্শনযোগ। এ পর্য্যন্ত ভগবান অর্জুনকে যা বললেন তা থেকে পাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন যে জ্ঞান যতক্ষণ না তাঁতে অনুরাগ জাগিয়ে তোলে, সেই অনুরাগ জীবনের সকল কিছুতেই তাঁকে যুক্ত করে, সকল কর্ম্মই তাঁকে ঘিরে আবর্ত্তিত হয়, ততক্ষণ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ হয় না।। ব্যক্ত ভৌতিক বিশ্ব হতে অব্যক্ত অক্ষরভূমি পর্য্যন্ত ব্যাপ্তির অনুশাসক পরমাত্মায় সত্য অনুরাগলাভের একমাত্র উপায় সবরকমভাবে সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা বিষয় সম্বন্ধ অনুরাগকে সর্ব্বরাগময় পরমপদে সংযুক্ত করা ও বিশ্বেশ্বরকেই বিশ্বরূপে বুঝতে শেখা। অন্যভাবে বলতে গেলে নিম্নতম প্রকৃতিকে জয় করে সকল জীবের প্রতি একত্ব বোধ, বিশ্বাত্মক ভগবানের সাথে আর ভগবানের বিশ্বাতীত কৈবল্যাত্মক সত্তার সাথে একত্ববোধ, কর্ম্মে ভগবদ ইচ্ছার সাথে ঐক্য, অদ্বিতীয় সেই একের প্রতি, সর্ব্বভূতে অবস্থিত ভগবানের প্রতি নিরতিশয় প্রেমই হল সেই পন্থা যার দ্বারা মানুষ সকল সীমা পেরিয়ে সেই অধ্যাত্মমুক্তি এবং সেই অচিন্ত্য রূপান্ত র লাভ করতে পারে। এই বিশ্বরূপ দর্শন কাহিনী এবং তার আলোচনা শুনে তোমাদের নিজেদের ঘটে ঘটে, বিশ্বে বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের প্রকাশ হোক ॥

ওঁ

অথ দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগ (১২)

অর্জুন উবাচ -

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ।। ১

অনুবাদ: অর্জুন কহিলেন। সদা ত্বদ্গত চিত্ত যে সকল ভক্ত তোমার (তেজোময় অক্ষর রূপের) উপাসনা করেন আর যাঁহারা অব্যক্ত অবিনাশীর (ব্রহ্মস্বরূপ তোমার) উপাসনা করেন, তাহাদের (উভয়বিধ সাধকের) মধ্যে কাহারা অতিশয় যোগবিৎ ॥ ১২/১

ব্যাখ্যা: দ্বাদশ অধ্যায়ের সূচনা হল প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। আগের অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে "মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম" ইত্যাদির দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব আর তার আগে নবম অধ্যায়ে "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি", সপ্তম অধ্যায়ে "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত", চতুর্থ অধ্যায়ে "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব" ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়েছে। তাই অর্জুন সগুণ উপাসনা ও নির্গুণ উপাসনা এই দুয়ের ভিতর কোন ভাবে উপাসনা শ্রেয়ঃ এই প্রশ্ন করেছেন আর এই প্রশ্ন দিয়েই দ্বাদশ অধ্যায়ের শুরু হল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন সর্ব্বজ্ঞ শক্তিমান তোমার বিশ্বরূপের ধ্যানী অথবা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসক এদের মধ্যে কে বেশি যোগবিৎ মানে শ্রেষ্ঠ ? কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব এমনতর ব্যাখ্যার অতীত। চিদ্‌ঘন পরমাত্মা অক্ষর ভূমিতে নির্গুণরূপে খ্যাত এবং ব্যক্তক্ষেত্রে সগুণ ঈশ্বররূপে ব্যক্ত। এখানে পরমাত্মার সেই চেতন স্বরূপতা, যে রূপে তিনি ব্যক্ত অব্যক্ত উভয়েরই নিয়ামক, সুতরাং পুরুষোত্তম পরমেশ্বর, সেই পরমাত্মতত্ত্বের উপাসনার কথাই বলা হয়েছে। অব্যক্তভূমিতে প্রবেশ করে অব্যক্ত শক্তি হয়ে তাঁর উপাসনা শ্রেয়ঃ নাকি ব্যক্ত শক্তিভূমিতে তাঁর উপাসনা শ্রেয়ঃ অথবা সর্ব্বত্যাগের

উপাসনা শ্রেয়ঃ এ প্রশ্ন এখানে অর্জুনের এবং চিরন্তন কাল ধরে এ থেকে বিভিন্ন মতবাদী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। তাই ব্যক্ত ও অব্যক্ত দর্শন এখানেই শেষ নয়। “সততযুক্তাঃ” কারা ? আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন, যাঁরা “নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎ কর্ম্মাদৌ যথোক্তহর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থেঃ।” মানে হল ভগবৎ কর্ম্মাদির জন্য যথাশাস্ত্র যিনি নিরন্তর নিরত থাকেন এবং যিনি অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। এই দ্বিবিধ উপাসকগণের মধ্যে কোন উপাসকেরা উত্তম যোগী ? আচার্য্য রামানুজ “কে যোগবিত্তমাঃ” এর অর্থ করেছেন – “কে স্বসাধ্যং প্রতি শীঘ্রগামিনঃ” অর্থাৎ এই উভয় যোগীর মধ্যে নিজ সাধ্য বস্তুর নিকট শীঘ্র কে পৌঁছায় ? মানেটা দাঁড়ায় – কোন উপায়ে লক্ষ্যবস্তুর কাছে বেশি তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায় ? উপায় দুটো – প্রথমতঃ গুরুপদেশ মত ক্রিয়া করে চলা এবং করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছান বা এমন অবস্থা লাভ করা যায় যার দ্বারা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়ে সাধক ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে যান, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য। এই ক্রিয়াই হল ব্যক্ত অবস্থার সাধনা। যাহোক ঐ অবস্থাটা অধ্যাবসায় ও পুরুষাকার দ্বারা বাড়াতে হয়। কেন ? যেহেতু আত্মাই প্রাণ আকারে প্রকাশিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রশ্নোপনিষদে আছে – “স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপং প্রাণোহগ্নিরুদয়তে” – শঙ্করভাষ্যে এর অর্থ করা হয়েছে – সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর ও বিশ্বরূপ। সর্ব্বাত্মক বলে সেই প্রাণ অগ্নিস্বরূপও বটে। “স ঈক্ষাঞ্চক্রে কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি” অর্থ – সেই ষোড়শকলা পুরুষ চিন্তা করছিলেন যে, কে দেহ হতে উৎক্রান্ত হলে পর‘আমি’ উৎক্রান্ত হব আর কেই বা প্রতিষ্টিত হলে “আমি”ও প্রতিষ্ঠিত হব। এটা হল সৃষ্টির ব্যক্তের দিক। দ্বিতীয় উপায় হল কূটস্থের উপাসনা – অব্যক্তের উপাসনা, যা যোনীমুদ্রার সাহায্যে লাভ হয়। কূটস্থকে অব্যক্ত বলার কারণ হল তিনি সব জীবের মধ্যেই আছেন কিন্তু আচ্ছাদিত হয়ে। বাইরে থেকে প্রাণ বা শ্বাসকে যেমনভাবে উপলব্ধি করা যায় এটা তেমনভাবে উপলব্ধব্য নয়। যা ব্যক্ত নয় অথচ যা না থাকলে কিছুই থাকে না, আবার তাকে ধরা ছোঁয়াও যায় না। মানে যা অতীন্দ্রিয় অথচ বোধগম্য সেটাই হল কূটস্থ ব্রহ্মের রূপ। তাহলে দাঁড়াল প্রাণ ব্যক্ত, কূটস্থ অব্যক্ত। যাঁরা সতত প্রাণকর্ম্মে রত থাকেন ও সেভাবে নিরত থেকে তাঁর সমীপস্থ হতে চান, তাঁতে তন্ময়তা লাভ করে তাঁরা তাইই হয়ে যান। এটাই ব্যক্তের বা প্রাণের উপাসনার ফল। আর অব্যক্ত কূটস্থ রজোদোষ রহিত ও কলাশূন্য ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় পরমকোষে অবস্থিত। তিনি শুদ্ধ, জ্যোতিরও জ্যোতিঃ একমাত্র আত্মবিদ্গণই তাঁকে জানেন। পরমাত্মার এ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেহ আবরণের অভ্যন্তরে সুন্দরভাবে লুকানো আছে। গুরুকৃপায় সাধনার দ্বারা সেই দ্বার খুলে যায় ও কূটস্থের সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখা যায়। অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ হতেই পরমাত্মা চেতন ও অচেতন ভূতসকল প্রকাশ করে বৈরাজ বা ভূতাদি অভিমানী বিরাট বা মহান অধিদেব পুরুষ হয়ে রয়েছেন। যে বিরাট পুরুষে আমাদের মত অসংখ্য জীব জাত। আমাদের এই অস্তিত্বে যে দেহ বা অস্মিতা আদি জনিত অভিমান সেটা ব্যষ্টি ব্যক্ত অভিমান মাত্র। তাই প্রতি জীবের কাছে তার নিজের অস্তিত্বের অভিমানটিই ব্যক্ত। অবশিষ্ট যে সমস্ত জীব ও জগৎ যার কিছুটা সে দেখতে পেলেও এবং তার কাজে লাগলেও তারও অব্যক্ততাই প্রধান। আসলে জীব তার নিজেকেই জানে না। অবশিষ্টের কথাতো ছেড়েই দিলাম। নিজের দেহ, নিজের মন, প্রাণ, নিজের অস্তিত্ব সেটাই সম্পূর্ণ জানে না। এমনকি নিজের দেহ ব্রহ্মাণ্ডটা কেমন করে কিভাবে চলছে, সেটাও খুবই সামান্য মাত্রই বোধ করতে পারে। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের খবর কেউ রাখে না, রাখা সম্ভবও হয় না। প্রকৃতপক্ষে জীবের শুধুমাত্র জীবত্বেই ভোগাধিকার আছে। ঐ বিরাট অব্যক্ত অক্ষর পুরুষের নিয়ন্তৃত্বেই তার শরীর ধারণ ও সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি পরিণামরূপ উপাদান অবস্থিত। সেজন্য তার কাছে প্রকৃত ব্যক্তভূমি বলতে তার হৃদয় বা ভোগস্থানকেই বোঝায়। আর সবটাই, কি অধ্যাত্মে, কি অধিদৈবে, প্রধানতঃ অব্যক্ত। অতএব ব্যক্তভূমিতে সাধনা করা মানেই হৃদয়ভূমি নিয়ে, তার দৈব যজ্ঞভূমি নিয়ে সাধনা করা। অধ্যাত্মে, ইন্দ্রিয়ে, মনে, হৃদয়ে ব্যক্ত শক্তি ও ভাবরাশি নিয়ে ব্যক্তবিশ্বরূপের অসঙ্গ আত্মারূপে অপরোক্ষ অনুভবলব্ধ চিদ্ঘন পুরুষের উপাসনাই ব্যক্তভূমির উপাসনা। আর অব্যক্তের বেলায় কি রকম ? অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্ত হৃদয়ভাব, আধ্যাত্মক্ষেত্রের অব্যক্ত দেশে ও অব্যক্ত বিরাটে অধিরূঢ়, অসঙ্গ চিন্ময়ের উপাসনাই অব্যক্ত উপাসনা। একই চিদ্ঘন অসঙ্গ পরমাত্মাই যে ব্যক্তে ও অব্যক্তে অধিরূঢ় এই জ্ঞানটুকু উভয় উপাসকেরই থাকা চাই। ব্যক্তের উপাসক, ব্যক্ত ইন্দ্রিয়, মন, হৃদয় ব্যবহার অবলম্বনে নিজের ব্যক্ত অন্তর্য্যামীকে দেখে, ভোগ করে। তাঁকে প্রসন্ন করে সেই বিভু বিদ্যা অবিদ্যাময় পরমেশ্বরতত্ত্বে প্রবেশের অধিকার পায়। ব্যক্ত উপাসক বিদ্যা অবিদ্যা অবলম্বনে এগিয়ে চলে ইতি ইতি করে; সবকিছুতে তাঁকে দেখতে দেখতে স্বীকার করতে করতে। অপরদিকে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক ব্যক্ত ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় নিরোধ করেই আব্যক্ত বিভূ আত্মাকে দেখতে চায় বলে বিদ্যা ও অবিদ্যা জনিত সকল প্রকাশকে তুচ্ছ করে। সে সমস্ত বিদ্যা অবিদ্যাকে নেতি নেতি করে নিজের চেষ্টায়, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে, দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলে। এই যে ব্যক্ত বিশ্ব, ব্যক্ত জীব, এর প্রতি ব্যষ্টি ভুতের মূলেই সেই অব্যক্তভূমি আছে। সংক্ষেপে এই হল ব্যক্ত ও অব্যক্ত দর্শন যা চিরন্তন জিজ্ঞাসা, ঈশোপনিষদের সেই প্রার্থনা – “ তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু ” মানে হে পূষন: জগৎ পোষক সে (হিরন্ময় পাত্রের) আবরণ উন্মোচন করে দাও। অর্জুনেরও এখন সেই প্রশ্ন – এই দুটো উপায়ের মধ্যে কোনটা শ্রেয়ঃ ? মানে কোনটা সমধিক সুগম ? সেটা আমাকে বুঝিয়ে দাও। দেখুন উত্তরে শ্রীভগবান কি বলছেন পরের শ্লোকে ॥ ১২/১

শ্রীভগবান উবাচ -

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ।। ২

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। আমাতে মন একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম (প্রধান) যোগী ॥ ১২/২

ব্যাখ্যা: যখন পৃথিবীর সকল স্তরের দার্শনিক এবং পণ্ডিতরা ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা সগুণ ও নির্গুণ অথবা সাকার ও নিরাকারের উপাসনা বিষয়ে জীবনভর শুধু বৃহৎ মাত্রার গণ্ডোগোলই বাধিয়ে চলেছেন তখন শ্রীভগবান কিন্তু একেবারেই স্পষ্ট করেই বললেন যে এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মানে সগুণ উপাসক তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। তাই ব্যক্ত পরমেশ্বরের সাধনাই বিশদ ভাবে বলছেন। এটাও তো সত্যি যে যা অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ তার কোনও উপাসনা হয় না। কারণ কিভাবে কি অবলম্বনে মনে মনে তাঁকে ভাববে ? অসীমই বল, চাই অনন্তই বল, মুখের কথায় তো আর সেই গুণরহিত অবস্থার নাগাল পাওয়া যাবে না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি পর্য্যন্তই যখন আমাদের দৌড়, তখন মুখে যাই বল, যত বড় কথাই বল, মন বুদ্ধির সাধ্য নেই যে তাঁকে নির্দ্দেশ করে। বড় একটা কিছু যেমন আকাশ, সমুদ্র বা পর্ব্বতমালা আংশিক দেখেই বোঝা যায় যে একই সাথে একই সময়ে পুরোটা দেখা সম্ভব নয় কেননা ওটা আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানসীমার বাইরে। তাহলে একটা বিশাল বাস্তবকেই যখন আমরা ধারণা করতে পারি না, তখন অচিন্ত্য বৃহৎ ব্রহ্মবস্তুকে কি ভাবে চিন্তা করব ? তাহলে যেটা ধ্যানের বিষয় নয় তা নিয়ে বা তার বিষয়ে চিন্তা বা ধ্যান সম্ভব নয়। এমন উপদেশ ভগবানও দেননি বা কোনও শাস্ত্র গ্রন্থেও এমন কথা লেখা নেই। অথচ কিছু পেশাদার গুরু বা মঠের মহারাজ বা স্বামিজী বাবাজী গোছের লোকেরাই শিষ্যদের এমনটা করতে বলেন। জানিনা তাঁরা নিজেরাই এমন ধ্যানে সক্ষম কি না। এ থেকেই বোঝা গেল যে জীবের একটা নিত্য সিদ্ধ স্বরূপ আছে, যেটা জীবদেহে আত্মচৈতন্যরূপে ব্যাপক ও প্রকাশিত মানে যাকে দেখা যায়, তবে অবশ্যই এই চোখ দিয়ে নয় এবং একমাত্র যিনি বিবেকী মানে একেবারেই বিষয়াসক্ত নয় এবং যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সর্ব্বদা বিষয় বিনিবৃত্ত সেই দেখতে পায়। এর জন্য একটা দৃষ্টিশোধন প্রক্রিয়া আছে বটে তবে তার বিশদ আলোচনার এখানে দরকার নেই। কারণ এ সমস্ত কথাই বাইরের আলোচনা মাত্র। ব্যক্ত পরমেশ্বর সাধনার প্রথম কথা ব্যক্ত অনুভবরাশির তলে তলে তাঁর অসঙ্গ মূর্ত্তি অবস্থিত দেখে, উভয় প্রকাশকে একত্র নিয়ে এসে তাঁর সাথে নিত্যযুক্ত হওয়া আর অব্যক্ত সাধনার প্রধান কথা হল ব্যক্তজ্ঞান পরিত্যাগ করে অব্যক্ততা ফুটিয়ে অস্মি আদি বোধ থেকেও বিযুক্ত হওয়া। কিন্তু ভগবান বলছেন আত্মরূপ পরা প্রকৃতি ও আত্মেতর সর্ব্ববোধাত্মিকা অপরা প্রকৃতি এ উভয়স্থিত চেতনরূপ পরমাত্মাকে দেখাই ব্যক্ত ভগবানকে দেখা। সোজা কথায় একই অঙ্গে সকল প্রকারের মিলন। মনের আত্মমুখী ভাবই শরণাগতি। কায়দাটা তত্ত্বগতভাবে (Theoritically)বলতে হয় যে মনকে ভগবন্মুখী করে প্রতি জ্ঞানবৃত্তির ভিতরে তাঁতে যুক্ত হতে হবে এবং জ্ঞানে অজ্ঞানে তাঁতেই যুক্ত আছো এমন ধারণা করতে হবে। এটাকেই আবেশিত (induced) হওয়া বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, এর সাথে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা বিষয়ে পরে বলা হবে। এ আবিষ্ট ভাবটা যত দৃঢ় হবে শ্রদ্ধাও ততটাই বাড়বে। যেন সর্বদাই তিনি আমার অন্তরে, আমাতেই আছেন। এমনটাই "উপেত" ভাব। এর দ্বারাই সমস্ত জীবত্ব ও অবিদ্যার মাঝে ভগবানকে দেখতে দেখতে জীব নিজেকে বিদ্যা ও ঈশ্বরের মাঝে দেখে। এই নিত্যযুক্ততা ও এই শ্রদ্ধয়া উপেত' ভাবটা নিজ নিজ সদগুরুর উপদেশে অর্জন করে নিও ও স্মরণে রেখো। ভগবান বলছেন এরাই আমার অনুমত উপাসক। আহার, বিহার, স্বপন, শয়ন, জাগরণে আমাতেই যুক্ত, আমাকেই স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা ধনজনরূপে সাজিয়ে বিষয়রূপে করে উপভোগ। আমিই তাদের প্রাণ, তারাই আমার প্রাণ। আমি চোরের মত লুকিয়ে থাকলেও এ সম্বন্ধটা তারাই আবিষ্কার করে, তারাই ধরে ফেলে তাদের অনুসন্ধিৎসারূপ আমার ফেলে আসা পায়ের চিহ্ন থেকে ॥ ১২/২

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যংচকূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ।। ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ।। ৪

অনুবাদ: সর্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যকরূপে সংযত করিয়া অনির্ব্বচনীয়, রূপাদিবিহীন, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, স্থির, সুতরাং নিত্য অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন সকল ভূতের হিতকারী তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ১২/৩-৪

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভগবান সবরকম বিবাদভঞ্জন করে দিয়েছেন এবং স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে প্রথম শ্রেনীর উপাসকগণ অর্থাৎ সগুণ উপাসকগণই শ্রেষ্ঠ। তাহলে এখন পাঠক প্রশ্ন করুন যে তবে নির্গুণ উপাসকদের বিষয়ে কি বলা উচিত ? তাঁদের অবস্থানটাই বা কি ? তাঁরা কি তবে শ্রেষ্ঠ নন ? এরই উত্তর এই দুটো শ্লোকে ভগবান দিয়েছেন। আগে ব্যক্ত উপাসনার কথা বলে এদুটো শ্লোকে তিনি এবার অব্যক্ত উপাসনার কথা বলছেন। আরও বলছেন যে যাঁরা অনির্দ্দেশ্য উপাসনা করেন, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরাও আমাকেই পেয়ে থাকেন। কারণ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, রোগ বুঝে ওষুধ। সকলের শরীর ও মন একরকম হয় না। শারীরিক ও মানসিক গঠন প্রণালী ও তার পার্থক্য অনুসারে সাধন প্রণালীও কিছু কিছু আলাদা হয়ে থাকে। কারণ বিভিন্ন মানুষের চিত্তে বিভিন্ন রকম

সংস্কার থাকে। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সংস্কার নিয়ে জন্মায়। কেউ হয় ভোগপ্রবণ, কেউ হয় বৈরাগ্যে পূর্ণ, কেউবা বেশ স্থিরমতি, কারও চিত্ত খুবই বিক্ষেপযুক্ত, কেউ সহজেই বিশ্বাস করে, কেউবা হয় সন্দেহপ্রবণ। এ জন্যই সাধ্য বস্তু এক হলেও সাধনপ্রণালীর পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন পূর্ব্বসংস্কার ও সাধন অভ্যাস বশতঃ কেউ যদি কর্ম্মফল ও ভোগে বিরক্তচিত্ত হয় তবে তার পক্ষে জ্ঞানযোগই সর্ব্বোত্তম পন্থা। এভাবেই সব স্থির করতে হয়। প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে ব্যক্ত জ্ঞান, প্রাণ বা শক্তির আড়ালে যে আত্মার উপস্থিতি সেটা দেখাই ব্যক্ত চিন্ময়ের উপাসনা। দেহ বা জগৎ উপলব্ধির অর্থই জ্ঞানময় দেহ, জ্ঞানময় জগতের উপলব্ধি, "শরীর ধারণ হরির কারণ"। তাই আগেই বলেছি জ্ঞানবিলাসের তলায় আত্মবিলাসই অবশ্যম্ভাবী। এমন ব্যক্ত জীবত্ব ও ব্যক্ত বিশ্ব নিয়েই পরমেশ্বরের সাধনা। সর্ব্বজ্ঞানময় পরমাত্মার উপাসনাই ভগবৎ সাধনা। অপরপক্ষে সর্ব্বজ্ঞানাতীত বিভূ আত্মার সাধনাই নির্গুন আত্মসাধনা, সেখানে অব্যক্ত বিশ্ব, অব্যক্ত জীবত্ব। সুতরাং অব্যক্ত পরমেশ্বরত্ব নিয়ে সাধনাই নির্গুণ আত্মসাধনা। অব্যক্ত বিভূ আত্মসাধনায় ঈশ্বরত্ব অব্যক্ত এবং পরমাত্মাই পরমেশ্বর। তাই ভগবান বলছেন সেটাও মুদ্রার অপরপিঠ। কারণ যারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করে অনির্দ্দেশ্য, অচল, ধ্রুব, কূটস্থ আমার অক্ষর স্বরূপের সাধনা করে তারাও যে আমাকেই পাবে তাতে আর সন্দেহ কোথায় ? কেননা ব্যক্ত ক্ষরণময় জগৎ এবং অব্যক্ত অক্ষর জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিয়ন্তা। সেই অক্ষরকে ভগবান বললেন অনির্দ্দেশ্য। যা কিছু ব্যক্ত, নির্দ্দেশ্য তাই যখন সাধনায় অপরিহার্য্য, তখন নিশ্চয়ই অনির্দ্দেশ্য,কারণ নির্দ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হলে তা বিনা সাধনেই লভ্য। ব্যক্ততার দ্বারাই যখন আত্মত্ব প্রতিফলিত হয় তখন অব্যক্তের তলায় অনির্দ্দেশ্য। ব্যক্তসাধনায় ভগবান প্রত্যক্ষাবগম এবং অব্যক্ত সাধনায় অব্যক্ত সর্ব্বত্রগ। যেহেতু ব্যক্ত চিন্ময়ের সমস্ত সাধনায় নিজের সাথে সংশ্লিষ্টতাটাই প্রত্যক্ষ্যাবগমতা। আর অব্যক্ত সাধনায় ব্যক্ত নিজত্বের সাথে অসংশ্লিষ্ট হওয়ায় অব্যক্তসাধনা হয়ে গেল সর্ব্বসাধারণীয় মবহবৎধষ/পড়সসড়হ বিভূ। কূটস্থ অক্ষর ও তাঁর সাধনাটা বোঝা গেল। ব্যবহারিক অংশে (ঢ়ৎধপঃরপধষ ঢ়ধৎঃ) প্রবেশ করলে আরও পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ হবে। ব্যক্তসাধনার মূল নিত্যযুক্ত হওয়া আর অব্যক্ত আত্মসাধনায় নিত্য বিযুক্ত হওয়া, কিসের থেকে ? নিজ নামীয় বোধটা বিযুক্ত করে তত্ত্ব থেকে যেটা আসলে বলার রকমফের মাত্র কেননা ভেবে দেখুন সব বিয়োগ গুলোই আসলে যোগ। শেষে অব্যক্ত সাধকের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন – "সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ" ও "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ", অব্যক্ত সাধনায় বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে বিলয় করে। সেটাই সাম্যাবস্থা বা অন্তঃসন্ন্যাস বা বুদ্ধিকে সাম্যে নিয়ে যাওয়া, সমদর্শন, ব্রহ্মদর্শন, আত্মানাত্ম বিভাগকে একত্রে পর্য্যবসিত করা। সর্ব্বভূত যেখানে অব্যক্ত সেই অব্যক্ততায় তত্ত্বপ্রবিষ্ট হলে তারাই সর্ব্বভূতহিতে রত পুরুষ – ওই অব্যক্ত সাধক। নীরবে সংগোপনে সর্ব্বভূতের হিত করে যায়, কেউ জানতেও পারেনা, প্রচারবিমুখ,

কারও দান নেয় না। ভগবান বললেন "প্রাপ্নুবন্তি" মানে তারা নিজের চেষ্টাতেই আমাতে উপনীত হতে পারে। কিন্তু এর পরে আবার ভগবৎ সাধনা বর্ণনার সময়ে ভগবান বলছেন যে আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাই, যার অর্থ নিজের চেষ্টায় না পারলে তখনও তাদের জন্য আমি আছি। প্রকৃত "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" তাঁরাই যাঁরা সাধন দ্বারা আমাকে পায়, না পেলেও অন্ততঃ বুদ্ধিস্থির হওয়ায় অন্যকেও নিজ আত্মার স্বরূপ বলে বোধ করে এবং যে আত্মক্রিয়ার অভাবে জীব ঘোর বন্ধন দশায় পড়ে থাকে, তাদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তাদের এই ভবরোগের ওষুধরূপ যোগের উপদেশ দিয়ে থাকেন। সর্বত্র সমবুদ্ধি এলে তবেই সর্বভূতের হিত করা সম্ভব হয়। নইলে নিজের স্বার্থে একটা আড়ম্বরসর্বস্ব দল গঠন মাত্র হয়ে থাকে। অব্যক্তে এমন কিছুর স্থান নেই। তাই পৃথিবীর বড় বড় যোগী ও সাধকগণের পরিচয় অজানাই থেকে যায়। অথচ ব্যক্ত সাধকগণ যুগ যুগ ধরে পূজিত হয়। তাদের ছবি ও নাম অনুকরণেও মুনাফা অর্জন হয়ে থাকে পরবর্ত্তী দিনগুলোতে। গীতায় যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেটা সমগ্রজ্ঞান যা হল সকল অবস্থার অতীত পুরুষোত্তমের জ্ঞান। অক্ষর পুরুষের নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করতেই হবে, তবে তার জন্যে প্রথমে একটা সম্বন্ধ, নিবিড়, ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ ভাব যার ভিত্তি হল গুরুশিষ্য সম্পর্ক যা অবলম্বনে অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। নইলে ব্যক্ত অব্যক্ত এসব উপাসনাই এক। এ নিয়ে চিরকালীন গন্ডগোলের অবসানই হয়েছে এই ভক্তিযোগে এসে। প্রথমে গুরুকৃপাটাই হল ব্যক্তভাব পরে যা হবে অব্যক্তে পর্য্যবসিত। আর অন্যকিছু ভাবলে তা হয় অসম্পূর্ণ ও অবোধ্য ॥ ১২/৩-৪

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ।। ৫

অনুবাদ: অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের (সিদ্ধিপ্রাপ্তি বিষয়ে) অধিকতর ক্লেশ হয়। যেহেতু অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা মনুষ্যগণ দুঃখে লাভ করিয়া থাকে। ১২/৫

ব্যাখ্যা: অনির্দ্দেশ্য সত্তা কোনওরকম সম্বন্ধের দ্বারা সাহায্য করেনা। সবটাই করে নিতে হয় কঠোর তপস্যার দ্বারা, একক ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা। অথচ গীতোক্ত পন্থায় উপাসনা কত সহজ। এজন্যই এ সাধনা অন্যান্য পন্থা থেকে এত পৃথক। এজন্যই ভোগাসক্তগণ কূটস্থে চিত্ত লয় করতে পারেনা, সমাধান করতে পারেনা। তাদের চিত্ত ও দেহ, ভোগের দিকেই পড়ে থাকে। তাই তাদের এত প্রশ্ন থাকে অথচ সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েও তাতে তাদের কাজের কাজ কিছুই হয় না। অবশ্য সংশয়শূন্য ও ত্যাগী হতে না পারলে নির্দ্দেশ্য - অনির্দ্দেশ্য, সগুণ - নির্গুণ কোনও দিকেই কিছু হবার নয়। শুধুমাত্র চাপাচাপি করে দীক্ষাগ্রহণ করাই সার হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনসংস্কারবশতঃ চিত্ত একনিষ্ঠ

থাকলে ক্রিয়াটা অল্পতেই বেশ জমে ওঠে ও তাদের যোগলাভ অনেক সহজ হয়। তাই বলা হয় যে ব্যক্ত সাধনা সুখময় ও প্রাপ্তিময়। ভগবৎ শক্তি ও ক্রিয়া তাদের উদ্ধার করে। শুধুমাত্র নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে চলতে হয় না যেহেতু ব্যক্তসাধক যুক্ততম তাই নিত্যপ্রত্যক্ষ নিজেকে ও সমস্ত জ্ঞানজগৎকে নিয়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে করতে সাধনা করা যায়। এই শ্লোকে অব্যক্ত সাধকের কষ্টের কথাটা প্রথমেই বলা হয়েছে। অব্যক্তে আসক্ত পুরুষের সাধনটা কষ্টকর, কারণ দেহাভিমান থাকতে কোন সাধনাই যখন করা যায় না তখন অব্যক্তস্থানে প্রবেশ বহু দুঃখক্লেশসাধ্য ও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। কারণ সেখানে শুধু বিশ্বজ্ঞানই নয় নিজের সত্তাটা পর্য্যন্ত পরিহার করতে করতে অনির্দ্দিষ্ট সাধ্যের দিকে এগোতে হয়। অব্যক্তের পথের সাক্ষী কেউ নেই। যা কিছু সামনে আসে সে সবই অন্তরায় সুতরাং সাধনার পরিপন্থী। তার ওপর আবার আছে সুদৃঢ় সংস্কার। এ জৈব দেহাভিমান যা একেবারেই এগোতে দেয়না, একে নিগ্রহ করতে কত রকম শম, দম, তিতিক্ষার ব্যবস্থা তবু যায় না ভূতাভিমান, এ ভূত ছাড়িয়ে দেবার কেউ থাকে না। যদি কেউ বা সাহায্য করতে এল সেও তো সেই ভূত, মৃত – বিষম অনাত্ম। তাই অব্যক্ত সাধকের কোনও সহায় থাকে না। কিন্তু তাঁদের সেই এক কথা – কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কোথায় ভগবান সহায়, আর কোথায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সহায়! এভাবেই অব্যক্ত সাধক দুঃখকে বরণ করে সাধনায় এগিয়ে চলে। তাই ভগবান বলছেন যে অব্যক্ত সাধনায় ক্লেশই অধিক এতে সময় বেশি লাগে। যাদের দেহাদিতে আসক্তি বেশি অথচ সাধনাও করতে ও আত্মজ্ঞান লাভ করতে চায় তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে না, তবে সে অবস্থা পেতে দেরী হবে। এ জন্যই ভগবান "দেহবদ্ভিঃ" কথাটা বলেছেন। কারণ অধিকাংশ মানুষের চিত্তই দুর্ব্বল এবং বিষয়াসক্ত তাই তারা সহজে প্রত্যাহার দ্বারা চিত্তকে অন্তর্মুখ করতে পারবে না, সুতরাং অব্যক্তে আসক্ত হয়ে নির্গুণ উপাসক সাজলে চলবে না, কেননা অত মনের জোর এখন কোথায় ? তার চাইতে বরং গুরুর নির্দেশমত আগে সগুণের উপাসনা করে তবে নির্গুণ হও। সগুণব্রহ্ম হল প্রাণ, এবং কূটস্থ ব্রহ্মই হল নির্গুণ। তাই সগুণের উপাসনা অর্থাৎ প্রাণের সাধনা করে প্রাণকে স্থির করতে পারলে তখন সেই অব্যক্তে প্রবেশকরে স্বয়ং অব্যক্ত বা ব্রহ্মময় হয়ে যাবে। কূটস্থে স্থিতি হলেই অব্যক্তে প্রবেশ হল। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে সগুণব্রহ্ম প্রাণের উপাসনা কর। শ্রদ্ধার সাথে ভক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া করে প্রাণাপানের গতিকে রুদ্ধ করতে পারলেই হল। তবে অনন্য ভক্তি থাকা চাই। নিজের স্বার্থেই শ্রীগুরুদেবে অনন্য ভক্তি অর্জন কর। মন প্রাণ ঢেলে গুরুসেবা কর। গুরুকে টাকা দিলেই হয় না, মন প্রাণ ঢেলে সেবা করতে পারলেই ভক্তির সঞ্চার হয়। বেদেও আছে – "ভক্তিযোগাৎ মুক্তিঃ" মানে হল ভক্তির সহিত উপাসিত হলেই প্রাণ স্থির হয়ে যাবে। একমাত্র স্থির প্রাণেই ব্রহ্মের পরমানন্দভাব বোঝা যাবে। এমন শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনের ক্রিয়াই এই ভক্তিযোগে বলা হয়েছে। পূর্ব্ব জন্মার্জিত অত্যাধিক সুকৃতি বিনা সরাসরি অব্যক্তের সাধনা করা বা লাফ দিয়ে গাছের মগডালে ওঠা খুবই কঠিন। সিঁড়ি বা

মই ইত্যাদির অবলম্বনে থাকলে তবু ওঠা যাবে নইলে, অধিকাংশের পক্ষে শুধু লাফালাফিই সার হয়। কদাচিৎ কেউ কেউ সফল হয় অথবা অনেক দেরীতে হয়। বহু সাধক প্রথমে দীর্ঘকাল অব্যক্তের সাধনায় ভগ্নমনোরথ হয়ে পরে ব্যক্ত সাধক হয়ে সহজেই অব্যক্তলাভ করেছিলেন, যেমন ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। অব্যক্ত সাধনায় সবিশ্বজ্ঞান নিজ বোধ সত্তাটি পর্য্যন্ত পরিহারের চেষ্টা করতে করতে অনির্দ্দিষ্ট সাধ্যের দিকে এগোতে হয়। অব্যক্ত অনাত্মবোধের সাধক ছিলেন দিলওয়ার হোসেন, লোকমুখে অপভ্রংশ দোলেয়ার। ফকির দোলেয়ার হোসেন জানিয়েছিল কি করে জ্যান্তে মরার সাধনা করতে হয়। একটা ছোট্ট কুঠুরিতে ঢুকে সে একটা বছর কাটিয়েছিল। বাইরের দিনরাত কিছুই দেখেনি। কথাবন্ধ, জীবনরক্ষার্থে খেয়েছে সামান্য ফল, দুধ আর একটু মধু। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি, জ্যান্ত আছি কিন্তু কিছুতে নেই। বেঁচে মরে আছি। তারপর যেদিন সেই কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসা গেল তখন দুনিয়াটা একেবারে পাল্টে গেছে। সবাই আছে কিন্তু কেউই নেই, সব আছে কিন্তু কিছু নেই। তবে এই অবস্থা বেশিদিন রক্ষা করা মুশকিল। জগৎপ্রপঞ্চের ছোঁয়ায় সে ভাব আর থাকেনা। তবে একটা বড় ভরসা জন্মায় যে এই বুকের মধ্যে সে আছে, ফকিরের দিলের মধ্যেই সে আছে ॥ ১২/৫

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ।। ৬

অনুবাদ: কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন ॥ ১২/৬

ব্যাখ্যা : যেহেতু আমিই সেই সগুণ উপাসকের অবলম্বন তাই সিঁড়ি বা মইএর মত আমাকে ধরে রাখতে হবে, মানে আমাতে যুক্ত হতে হবে সেটাই "মৎপরাঃ"। এমন মৎপরায়ণ হতে চাই ভক্তি, চাই অনন্য শরণাগতি – পর পর দুটো শ্লোকে এ কথাই বলা হয়েছে যে আমার ভক্তদের মৎপ্রসাদে অনায়সেই সিদ্ধিলাভ হয়। ভক্তি না হলে গুরুলাভ হয় না। আবার সদ্গুরু লাভ হলেও ভক্তি বিনা সাধনা নিস্ফল হয়। তাই বিনা ভক্তি, বিনা শরণাগতির যদি কোনও বিজ্ঞান থাকে, সেটা অবিজ্ঞান মাত্র। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হল গুরু উপদেশ অবলম্বনে অন্যদিকে মন না দিয়ে ক্রিয়া করা, যাতে সহজেই আত্মস্থ হওয়া যায়। অনন্য ভক্তি থাকলে সহজেই ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়া যায়। আর ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হতে পারলেই আত্মাতে লয় হওয়া যায়। এমন যে সাধকেরা সর্ব্বদাই গুরুর নিকট থাকতে পারেন ও ১৭২৮ বার করে রোজই প্রাণায়াম করতে পারেন তাঁদের চিত্তের একাগ্রতা বাড়তে বাড়তে সংকল্পের বেগ কমে আসে ও নিঃশেষরূপে স্থির হয়ে যায়। তখন আত্মাছাড়া অন্য কোনও

কিছুতে মন যায় না। গুরুতে নিজেকে লয় করাই শিষ্যত্বের ভিত্তিভূমি ও সকল ক্রিয়ার সার্থকতা সেখানেই নিহিত আছে এটাই এই শ্লোক ও পরের শ্লোকের প্রকৃত অর্থ। দুধে শাঁজাল দিলে তবেই সে দুধ জমে দই হয়, দেখুন পরের শ্লোকে – ১২/৬

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ।। ৭

অনুবাদ: হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার সমুদ্র হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিত চিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই ॥ ১২/৭

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটা আগের শ্লোকের কথাটার অংশ বিশেষ মাত্র। আগের শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে যাঁরা তেমনভাবে নিজ নিজ সদ্গুরু আশ্রয়ী হতে পেরেছেন এবং গুরুউপদেশে ১৭২৮ বার করে ব্যক্ত প্রাণের উপাসনা করে চলেছেন তাঁদের প্রাণ বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্থির হয়। প্রাণের এমন স্থিরতাই স্থির ব্রহ্মের উপলব্ধি এনে দেয় যা তরঙ্গবিহীন আদিঅন্তহীন শান্ত সমুদ্রের মত। সমুদ্র ও সমুদ্রের ঢেউ যেমন আলাদা হয়েও একই তেমনি ব্রহ্ম ও নামরূপময় জগৎও একই। ব্রহ্মসমুদ্রে নামরূপময় জগৎ ঢেউ এর মত উঠে উঠে সমুদ্রেই মিশে যায়। অতএব এই প্রাণই ব্রহ্মের মায়া তাই প্রাণ স্পন্দিত হয়েই জগদাদি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণশক্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্যই ঈশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর – দেবাদিদেব বা নারায়ণ। কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্থির না হয় ততক্ষণ কিছুতেই বোঝা যাবে না যে ব্রহ্ম হলেন নিষ্ক্রিয়, তাঁর উৎপত্তি, বিনাশ কিছুই নেই। প্রাণ চঞ্চল হলেই মন চঞ্চল, আর মনের চঞ্চলতা থেকেই নানাত্ব দর্শন। তাই এ অবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জন্মমৃত্যু আসা যাওয়ারূপ তরঙ্গের উত্থান পতন চলতে থাকে। কঠোপনিষদে আছে – " মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" – যে চৈতন্য দেহে সে চৈতন্যই তো ঈশ্বরে। এ চৈতন্যকে যে নানাভাবে দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুই পায়। আত্ম অনাত্মদর্শীরাই নানাদর্শী বা বিষয়দর্শী। এই নানাদর্শীরা মৃত্যুদর্শন অর্থাৎ অনাত্মদর্শন থেকেই মৃত্যুকে পায় বা মৃত্যুগত হয়।

" অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥"

অনাত্মদর্শন মানে আত্মাকে সেখানে না দেখা। যেখানে আত্মাকে না দেখা হয়, সেখানেই আত্মবোধের হত্যা করা হয়। এটাই আত্মহনন। তাই বলি চালাক হও, এতে তোমারই সুবিধা হবে। হয় অনাত্মরূপে আপাত প্রতিভাত জগৎকে বা দেহকে আত্মময় দেখ নতুবা অনাত্মদর্শন পরিহার করে চল। মৃত্যু পরিহার করে অমৃতলাভের উদ্দেশ্যে এই দুই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের ব্যবস্থা করাই আছে। এই হল আসলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই রকমের সাধন প্রণালী বা পন্থা। এই দুরকম সাধন প্রণালী আলোচনা করে ভগবান অর্জুনকে ভগবৎ সাধকের যুক্ততমতা দেখিয়ে আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞানের উপায় বলছেন – ঊর্দ্ধবিন্দু ও অধঃতে যে বিন্দু তার মধ্যে মন রয়েছে। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপক। মন মনেতে থাকলেই ব্রহ্মে লীন হয় ॥ ১২/৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ।। ৮

অনুবাদ: আমাতেই মনস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে ঊর্দ্ধদেশে আমাতেই থাকিবে (ইহাতে) সংশয় নাই ॥ ১২/৮

ব্যাখ্যা: আত্মাতে মন রাখতে পারলে তবেই আত্মায় নিবিষ্ট হওয়া যায়। তাহলেই ঊর্দ্ধে স্থিতি হয় মানে কূটস্থে স্থিতিলাভ করা যায় ও স্থিরভাবে ব্রহ্মে থাকা যায় এটাই ভগবান এখানে বলছেন। মনকে মনেতে রাখতে হবে। মন যে মনের ঘরে বসে না, বসতে চায় না বরং ছুটে চলে ক্রমাগত একটা থেকে আর একটা সংকল্পে ও বিকল্পে। এমন মনকে নিজ নিকেতনে নিয়ে আসাই সাধনা। ব্যক্তভগবৎ স্বরূপে মন স্থির করাই আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট করা। মন স্থির করার অর্থই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে সমাহিত করা। অব্যক্ত সাধনা হতে ব্যক্ত সাধনার শ্রেষ্ঠত্বই এখানে। কারণ এর অবলম্বন আছে। বুদ্ধি নিবিষ্ট করতে হবে কোথায় ? ভগবানে। এটাই ভগবদ বোধে প্রবুদ্ধ হওয়া। ভগবদযুক্ত হওয়া মানেই ভগবদযুক্ত কর্ম্ম করা ও ভগবানে সুদৃঢ়প্রত্যয় হওয়া। এটাই অবলম্বন। এদুটো হলেই আর মর্ত্ত্যে আবর্ত্তন হবে না। তরঙ্গশূন্য সমুদ্র যেমন অতীব প্রশান্তরূপ ধারণ করে মনও তেমনভাবে স্থির হয়ে সূক্ষ্মতর আত্মাকাশে লীন হলে যোগীর তেমন স্থির অবস্থা হয় ও বিশ্বাত্মায় মিলে একেবারে মিশে যায়। এ অবস্থাই ধ্যান। এ অবস্থা যত গভীরতর হয় ততই সমাধির অবস্থা শুরু হয়। এটাই মনকে স্থির করে মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া বলে - "ময্যেব মন আধৎস্ব " তারপর "বুদ্ধিং নিবেশয়" মানে মনের স্থিরভাব বা একাগ্রতাই বুদ্ধি তাও স্থির হয়ে অসীম শূন্যে প্রবেশ করে তাই হয়ে যাবে। এটা লিখেও বোঝান যাবে না, শুনেও বোঝা যাবে না। একমাত্র গুরুপ্রদত্ত ক্রিয়া অভ্যাস করে এ অবস্থার বোধ জন্মাবে, ও অনুভবে প্রকট হবে সাময়িক ভাবে। পরে পরাবস্থার প্রাপ্তিতে যা হয় তাও নিজ বোধরূপ। কিন্তু মনস্থির করা কাজটাও সহজ নয়। এ বিষয়ে পরের শ্লোকে দেখুন ভগবান কি বলেন ॥ ১২/৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ।। ৯

অনুবাদ: হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা অর্থাৎ সদগুরুপদিষ্ট উপায় দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রযত্ন (দৃঢ় চেষ্টা) কর ॥ ১২/৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে ভগবান যেমন বলেছেন তাঁতে মন ও বুদ্ধি নিবেশ করতে, তেমন ভাবে ভগবানে মন ও বুদ্ধি নিবেশ করে দেওয়াটাও সত্যি খুবই শক্ত ব্যাপার। ততটা সামর্থ্য সকলের থাকে না। সূক্ষ্মবিষয়ে মনকে অতক্ষণ স্থির করে দেবার সামর্থ্য বেশিরভাগ লোকেরই থাকেনা। তাই এমন লোকেদের পক্ষে কৌশল অবলম্বনই শ্রেয়। এ কৌশলটাই হল অভ্যাসযোগ। অভ্যাসযোগের কথা ইতিপূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তত্ত্বগতভাবে বিশদভাবেই বলা আছে। যার ব্যবহারিক অংশ বা প্রয়োগকৌশলটা অবশ্যই নিজ নিজ সদ্‌গুরু উপদেশগম্য। এইভাবে গুরু উপদেশে অভ্যাস করাটাই হল যোগের অভ্যাসে রত থেকে ভগবানকে পাওয়া অর্থাৎ আত্মলাভের জন্য প্রযত্ন করা। যখন তুমি সদ্গুরুকৃপায় বিশ্বরূপ দর্শন করতে পেরেছ তখন নিশ্চয়ই আমাতে চিত্ত স্থির রাখতে আসমর্থ হবে না। আর তাতেও যদি নিজেকে অপারগ মনে কর তবে অভ্যাসযোগে রত থাক অভীষ্ট নিশ্চয়ই মিলবে এটাই ভগবৎ বাক্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশদভাবে বলাই আছে। যোগকৌশলে প্রতি ভূতে, প্রতি কর্ম্মে, ভগবানকে দেখার অভ্যাস করাটাই হল অভ্যাসযোগ। আমারা সহজ বুদ্ধিতে ভাবি যে আমরা ভগবানকে পাওয়ার জন্য খুবই আকুল হয়েছি, ভগবৎ কামনা অন্যসব কামনা থেকেও প্রবলতর হয়েছে কিন্তু ভাল করে দেখলেই দেখা যাবে যে আমরা শুধুমাত্র জৈব কল্যাণ কামনাতেই, জৈব অভিমানেই, দৃঢ় সংন্যস্ত, যার সাথে কোনও ভাবেই ভগবৎ চেতনার কোনও যোগ নেই। বহু অভ্যাসে তবে ভগবান জীবের কাম্য হন। ভগবানকে কামনা করা বহু বহু জন্মের সাধনার ফল এবং দেখা যায় সে কামনাও আমার জীবত্বের মুক্তির জন্য চাইছিনা বরং এই জীবত্বেরই ইহকাল পরকালের কল্যাণময় প্রসারের জন্যই লালায়িত। আমি জীবাধিকারই বাড়াতে চাইছি, ভগবদাধিকার নয়। বারবারই বলেছি, এখনও বলছি, ভগবানকে চাইলেই পাওয়া যায়। চাইনা তাই পাই না। এটাই একমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ। জীব যত অধ্যাত্মে প্রবেশ করতে থাকে ততই এই সত্যটা জাজ্জ্বল্যমান হয়ে প্রকাশ পায় যে আমরা ভগবানকে চাই না। সুতরাং আগে অভ্যাসযোগের দ্বারা এই ভগবৎ প্রাপ্তির আকাঙ্খাটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে নিজের ভিতরে, তার পর যোগের দ্বারা সেই ইচ্ছাকে সম্বৃদ্ধ করতে পারলেই ভগবদপ্রাপ্তিটা অতি সহজ হবে। যোগদর্শনের সমাধিপাদে আছে – "স তু দীর্ঘকাল - নৈরন্তর্য্য সৎকারা সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" অভ্যাস দীর্ঘকাল, নিরন্তর ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। অল্পকাল সাধন করে জ্ঞান লাভের কথা বাজে গল্প মাত্র। নইলে ভগবান বলবেন কেন "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" ? বহু জন্মের সাধনা অবশ্যই দরকার। সাধনাই অবলম্বন। যত সুকৃতিই থাকুক অন্ততঃ চারটে জন্মের সাধনা অবশ্য দরকার – "পহলা জনম গুরুভক্তি, দুসরা জনম নাম। তিসরা জনম মুক্তিপদ মিলে তো চৌথা জনম ধাম ॥" ১২/৯

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ।। ১০

অনুবাদ: আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্মে নিরত হও। কেবল আমার জন্য (অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাতে – আত্মাতে লক্ষ্য রাখিয়া) সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে ॥ ১২/১০

ব্যাখ্যা: করুণাঘন ভগবান সকলের জন্যই আছেন। যারা নিয়মিতভাবে সুকৌশলযুক্ত এই যোগের অনুষ্ঠান করতে পারবে না তাদের জন্যও উপায় নির্দ্দিষ্ট করেছেন। শুধুমাত্র যাঁদের আভ্যন্তরীন সাধনসংস্কার অতি প্রবল থাকে তাঁরাই এ জন্মে দৃঢ়তার সাথে অভ্যাস করলেই লক্ষ্যে স্থির হতে পারে । যদিও কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। তাই যাঁদের পূর্ব্বাভ্যাস ততটা প্রবল নয় তাঁদের পক্ষে কি করণীয় সেটাই ভগবান বলছেন। কেননা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে অভ্যাসযোগের কথা বলা হয়েছে সেটা মূলত জ্ঞানপ্রধান। কর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান ও জ্ঞানশক্তিপ্রধান ভগবান দেখার যে অভ্যাস সেটা বিশেষভাবে জ্ঞানশক্তিরই অনুশীলন (exercise)। অভ্যাসযোগের কষ্টকরতাই (hardship) সেখানে। তাই সেটা যাদের পক্ষে খুবই কঠিন বলে বোধ হবে তাদেরই উদ্দেশ্যে বলছেন মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। তাহলেই এখন এই মৎ কর্ম্মটি কি ? প্রাণকর্ম্মই যে মৎকর্ম্ম একথা আগে বহুবার বলা আছে। প্রাণে লক্ষ্য রাখতে পারলেই প্রাণ স্থির হয়ে যায়। এভাবে প্রাণস্থির হলে তাঁরাও কৈবল্য লাভ করতে পারবেন। গুরুপদেশে এভাবে প্রাণে লক্ষ্য রেখে সব কাজকর্ম্ম করতে পারলে তিনিও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। কোনও কোনও লেখক ব্যাখ্যা করেছেন যে "মৎকর্ম্ম" বলতে একাদশীর উপবাস, পূজা, পার্ব্বণ, ব্রতপালন ইত্যাদিকেই বুঝায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বলেছেন এমনটাই। কিন্তু সমস্যা আছে গোড়াতেই। কারণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা অর্চ্চনা দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হতে পারে ঠিকই কিন্তু বিধিমত পূজা অর্চ্চনাও সহজ ব্যাপার নয়। তাতেও ভূতশুদ্ধি, ন্যাস ইত্যাদি করতে হয় যথেষ্ট পরিমাণে, যে সমস্ত ক্রিয়া আয়ত্ত করার জন্য যথোপযুক্ত যোগাভ্যাস দীর্ঘকাল করতে হয়। এ সমস্ত না করলে প্রাণ শুদ্ধ হয় না। পূজোর মধ্যে এ শুদ্ধি না হলে সবই বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। এই অভ্যাসযোগের জন্য স্মৃতিশুদ্ধিও দরকার। নইলে ভগবৎ স্মৃতিও আসেনা। প্রাণ শুদ্ধ না হলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্য ছাড়া জ্ঞানও হয় না। সাধারণ কর্ম্মসকলকে ভগবৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত করতে হলেও সেই প্রাণেরই

উপাসনা করতে হয়। একমাত্র প্রাণের উপাসনার দ্বারাই আহার, বিহার, অর্থোপার্জন বিষয়ভোগ সকল বিষয়েই মদ্ভাব মানে ভগবদ্‌ভাব আনা সম্ভব। তাই এমন যে বোধপ্রদকর্ম্ম সেটাই করে চল। তা থেকেই ক্রমে ক্রমে আমাকে পাবার ইচ্ছা ও অভ্যাসযোগে সিদ্ধিলাভ করবে আর অভ্যাসযোগ হতেই চিত্তসমাধান হবে ॥ ১২/১০

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ।। ১১

অনুবাদ: যদি ইহাও করিতে অসমর্থ হও, তবে মন বুদ্ধি সংযমপূর্ব্বক আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১২/১১

ব্যাখ্যা : ভগবান খুবই সহজভাবে বলে ফেললেন যে যদি এটাও করতে না পারো তবে মন বুদ্ধি সবই আমাতে অর্পণ করে মদ্গতচিত্ত হয়ে যাও, "মদযোগমাশ্রিতঃ" হয়ে পড়ো। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ভগবদার্থে কর্ম্ম করেন তাঁর ভগবৎ চিন্তা বজায় থাকে তাই ভগবানে প্রেম, শ্রদ্ধা সকল কিছুই লাভ হয়। এ জন্যই জপ,ধ্যান ইত্যাদির চেয়ে কর্ম্মফল ত্যাগই সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে কৌশলটাও আগে নিজ নিজ সদগুরুমুখে পেতে হবে নইলে বিষয়বুদ্ধি এসে মন ও বুদ্ধিকে গ্রাস করবে। সমর্পণের জন্য অবশিষ্ট আর কিছুই থাকবে না। কর্ম্মফল ত্যাগ হলে তো সিদ্ধপুরুষই হয়ে গেলাম। কারণ তখন আর নানাত্ব থাকে না শুধু ব্রহ্মবোধটাই মাত্র থাকে। আসলে এ সমস্ত সাধনকল্পগুলোই হল ভগবদযোগ আশ্রয় করে সেই উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু মন সমাহিত করার চেষ্টা বা অভ্যাসের কথা। তাই কামনা ত্যাগরূপ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত বৈরাগ্যের কথা বলার জন্যই এই কর্ম্মফল ত্যাগের কথা বললেন যে আমার ভগবদ্ ভাবে যুক্ত হবার পন্থাস্বরূপ মনকে বা বুদ্ধিকে যে ভাবে নিয়োগ করতে বললাম সে সমস্ত করতে যদি অক্ষম হও মানে আমার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মগুলো না করতে পার তবে অবশিষ্ট আর একটা উপায় যেটা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছি সেই সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ মানে ফল কামনা ত্যাগ কর। কর্ম্মময়, ভাবময় ও হৃদয়ময় পরমাত্মার উপাসনার ক্রম বলতে গিয়ে ভগবান এটা বুঝিয়েছেন। কর্ম্মে জীব নিজেকে কর্ত্তা দেখে তাই আবদ্ধ হয় মানে অনুভূতিরূপ কর্ম্মের অন্তঃসারটাতে প্রবিষ্ট হয়ে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। তারপর সেটা যখন তোমার অনুভূতিতে অন্তর বা বাহ্য ব্যপার অবলম্বনে পুনরাবির্ভূত হয় সেটাই সেই পূর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রকাশ। তাকে ত্যাগ করবে কি করে ? শুধু'ফলের ইচ্ছা রাখব না' এমন চেষ্টায় সেটা মোটেই হয় না। তেমন চেষ্টা করতে গেলে কর্ম্মে বিরতি ও বিরক্তি আসতে পারে ঠিকই কিন্তু কর্ম্মাশয় ও শরীর থাকার জন্যে কর্ম্ম করতেও বাধ্য হবে। এমন একটা অবস্থায় পড়ে জীব সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে দূরে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এমন একটা উৎকট বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে লোকে সন্ন্যাসী সেজে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তুকম্‌লি নেহি ছোড়েগী'। কম্‌লি যে তোমাকে ছাড়বে এমনটা মোটেই ভেবো না। সন্ন্যাসী হওয়ার বিপদ আরও বেশি। তখন ঘরে বাইরে বিপদ। তাই কর্ম্মের মাঝেই থাকতে হবে অথচ ফলাকাঙ্খাও ত্যাগ করতে হবে, মানে ত্যাগের সাহায্যে ভোগের কথা বলা হয়েছে। যেখানে ভোগটাও ত্যাগ, মানে তোমার ত্যাগটাও তুমি ভোগ করছ। ত্যাগটা ভোগকরা তখনই সম্ভব যখন কর্ম্ম কাকে আশ্রয় করে থাকে সে পরিচয়টা পাবে। প্রাণে লক্ষ্য পড়লেই প্রাণ যাতে হয় সে চেষ্টা বাড়ালেই সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করার সাথে সাথে সব কর্ম্মের মূলে যে সত্তা (স্বরূপ) আছে সেদিকে লক্ষ্য যাবে এবং বুঝবে যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন থেকে তুমি আলাদা, তখনই সে ফলে আর তুমি প্রবেশ করবে না। এই ফলে না যাওয়াটা তোমার আয়ত্তে আসবে, ইচ্ছাধীন হবে। অবশ্যই এই গুরুমুখী বিদ্যা আয়ত্ত না করে এটা শুনলে কিছুটা হেঁয়ালীর মত বোধ হবে, ঠিকমত বোঝা যাবে না। পাঠক এখানে প্রশ্ন করুন তবে আর এটা আগের চেয়ে সহজ কাজ কি করে হল ? তা তো মোটেই মনে হয় না। ভগবানের এমন কথা বলার উদ্দেশ্যটাই বা কি ? আসলে এসব কথা উপদেশ তারই জন্য যার বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে গেছে। তাকেই পর পর সাধনক্রম বলা হয়েছে উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভের জন্য। সহজে হবার জন্যে মোটেই নয়। সেটা এর পরের শ্লোক পড়লেই বুঝতে পারবেন ॥ ১২/১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানাং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ।। ১২

অনুবাদ: (সম্যক জ্ঞান রহিত) অভ্যাস হইতে (প্রত্যক্ষ) জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে (প্রত্যক্ষ বিষয়ের) ধ্যান শ্রেষ্ঠ। (উক্তরূপ) ধ্যান হইতে (কথিতরূপ) কর্ম্মফল - ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। (এইরূপ) ত্যাগ হইতে শীঘ্রই শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১২/১২

ব্যাখ্যা: এখানে শক্তি অনুযায়ী সাধনার ক্রমনির্দ্দেশ করা হয়েছে এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। এই নিষ্কাম মানে ফলাসক্তি ত্যাগের কথাটা কেন বলা হল সেটাই বলছেন। ঐ যে অভ্যাসযোগের বিভিন্ন অনুকল্প বলা হল ওসব কিছুরই মূল বা জীবনই হল ভগবৎজ্ঞান। কেন এসমস্ত অনুষ্ঠান করছি সেটাই যদি ঠিকমত জানা বোঝা না থাকে তবে সে অভ্যাসযোগ প্রাণহীন হয়। যাঁদের মনে ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছা উদয় হয়েছে তাঁরা কোন না কোনও একটা সাধন প্রণালী অবলম্বন করেছেনই। খুঁজে খুঁজে একজন যোগীগুরুকে বেশ মনে ধরল, তাঁকে বেশ করে ধরে করে পড়লাম। তিনি হয়ত উপযুক্ত মনে করলেন না তবুও কৃপা করে একটা পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। পথটা সত্য ও সঠিক পথই যেটা তাই আমিও গুরুপদেশমত অভ্যাস করে চললাম। কিন্তু সাধনার অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলো ঠিকভাবে করিনা,

ইচ্ছাও হয় না। কোন প্রকারে নিয়ম রক্ষা করে চলি। তাতে যে কিছুই হয় না তা ঠিক নয়। সময়েতে মনটা স্থির হয়, এক আধটু জ্যোতিঃও দর্শন হয় কিন্তু সেটাই যে সারৎসার বস্তু সেটা কখনও কখনও মনে হলেও তাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয় না। তাই মাঝে মাঝে তীর্থ করতে, বেড়াতে, যাই বটে কিন্তু সেখানেও শান্তি কিছুই পাই না। তবে দশ জনে ঐরকম করছে, পরে হয়ত কিছু ফল হতেও পারে অথবা এ সব না করলে যদি আমার সংসারের কিছু ক্ষতি হয়, এমন আশংকায় মন্দিরে মাথা ঠুকে আসি, বিষয়ের লোভও যায় না আবার ত্যাগের উৎসাহও আসে না। তবে পাড়ায় সব ব্যাপারেই চাঁদা পত্র ঠিকমত দিয়ে থাকি, নানা রকম আড়ম্বরেও রীতিমত আছি – এসমস্তই অভ্যাস হয়ে গেছে তাই করি এবং মুখে সর্বদাই সর্ব্ববিধ প্রগতি ও সমাজ কল্যাণের বুলিও কপচাই। সময়ে সময়ে নিজের অবস্থা যে না বুঝি এমন নয় কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারি না – এই প্রকৃতির উপাসক অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, কারণ কেন করছি ? কি করছি ? সেটা যদি অভ্যাসযোগ সাধনের সময়ে প্রাণে সম্যকভাবে প্রতিভাত না থাকে তবে সে অভ্যাসযোগ প্রাণহীন হয়। সুতরাং অভ্যাসযোগ অপেক্ষা ভগবৎজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে আত্মা কি ? এবং সে আত্মার সাথে মনের সম্বন্ধ এবং মনের সাথে শরীরের সম্বন্ধ তন্ন তন্ন করে বুঝলে তবেই যে আত্ম দর্শনের তীব্র অভিলাষ জাগে ও সেই অনন্ত রহস্যপূর্ণ আত্মবিষয়ক চিন্তায় মন বসিয়ে অভ্যাসযোগ শুরু হয়। আর অভ্যাসযোগ অবলম্বনে তীব্র সাধনার দ্বারাই পরমাত্মজ্ঞান সংশয়শূন্য ও সুদৃঢ় হতে থাকে। ভূতে ভূতে, কর্ম্মে কর্ম্মে, আত্মদর্শন যত পরিবর্দ্ধিত হতে থাকে, ততই ভগবৎপ্রজ্ঞা নিকট থেকে নিকটে আসে ও আবিস্কৃত হয়। আগে ভগবান বলতে যেন একজন আছেন কিন্তু সে থাকা আমার অস্তিত্ব থেকে কত দূরে কোথায়, কোনও শূন্যে এমন একটা ভাবে ছিল। মুখে অন্তর্য্যামী কথাটা বললেও নিজের আত্মার ধারণা না থাকায় তিনি কোন সুদূর আকাশে অবস্থিত এরকমটাই উপলব্ধিতে অনুভব হত। অভ্যাসযোগ যত ঘন ও জ্ঞানসম্পন্ন হয় ততই ঐ ভাবটা কেটে গিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব ফুটে ওঠে নিজের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। এজন্য অভ্যাসযোগ হতে জ্ঞানপ্রকাশই সারস্বরূপ পাওয়া যায়। এই জ্ঞান যত বাধা বিপত্তিশূন্য হয়, বিক্ষেপশূন্য হয়, যত ঘন ও উজ্জ্বলতর হয় ততই একধারায় (unidirectional flow) প্রবাহিত হয়ে নিজ আত্মবোধটা পর্য্যন্ত ভগবদন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অন্তরে বাইরে ভগবৎপ্রকাশ উপলব্ধিকে ভগবম্ময় করে তোলে। জ্ঞানঘন এই বিশিষ্টতাকেই "জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে" বলেছেন ভগবান। এই জন্যও অভ্যাসযোগ হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। জ্ঞানের বাধা বিপত্তিই হল বিষয়াসক্তি, কামনাসকল মুহুর্মুহু চঞ্চল করে ধ্যানবিচ্যুতি ঘটায় ও জ্ঞানকে ধ্যানাকারে ঘন হতে দেয় না। নইলে ফলাসক্তি না থাকলে চিত্তে আসে বীর্য্য, ধ্যানসামর্থ্য ও নিষ্কাম অনুরক্তি। এমন হলেই ধ্যান অপেক্ষা ফলাসক্তি ত্যাগই শ্রেয়ঃ এটা বোঝা যায়। তাই বললেন "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ।" এমন ফলাসক্তি ধ্যান হতেই বিদূরিত হয়। সকল প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল হলে সে বিপুল সুখময় প্রাপ্তির উল্লাসে তার ক্ষুদ্র জৈব কামনাসকল আপনা আপনি অন্তর্হিত হতে থাকে, আসে শান্তি। তাই ভগবান বলছেন অভ্যাস হতে জ্ঞান, জ্ঞান হতে ধ্যান, ধ্যান হতে আসক্তিত্যাগ এবং আসক্তিত্যাগ হতে শান্তি জাত

হয়। অন্যত্র বলছেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অন্ততঃ সেটা ভেবেও ফলাসক্তি ত্যাগে যত্নশীল হও তবেই দেখবে সমস্ত কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্য হবে। এই নৈষ্কর্ম্ম্যই জ্ঞানপূর্ব্বিকা সাধনা যা প্রথমে যে অবস্থার কথা বলা হল তেমন আজ্ঞাসম্পূর্ব্বিকা সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সবটাতেই ক্রিয়াযোগের অপেক্ষা আছে। যোগদর্শনে আছে – "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধাণি ক্রিয়াযোগঃ"। তপঃ ও স্বাধ্যায়ের মধ্য দিয়েই যাতে ঈশ্বর প্রণিধাণসিদ্ধ হতে পারে এমনভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহই ক্রিয়াযোগ। এ পর্য্যন্ত যা বলা হল তা সমস্তই জ্ঞান, এই প্রজ্ঞা সাধকের গুরুপ্রদত্ত সাধনাদ্বারা আপনা আপনিই হয়ে থাকে, যখন সেটা জ্ঞানগম্য হয় তখন শরীর ও মনে যে বৈশিষ্ট্য ও ভাব প্রকটিত হয় সেটাই হল "যোনিমুদ্রা" যেটা আয়ত্ত করতে না পারলে শতকোটি জপ করলেও তার মন্ত্র চৈতন্য লাভ করেনা। "মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ"। এই যোনিমুদ্রাতেই স্বরূপদর্শন হয়। পাঠক প্রশ্ন করবেন স্বরূপ দর্শনে কি লাভ ? এর উত্তর "আত্মবোধ" কাব্য থেকে উল্লেখ করা হল।

"আপনা চিনিলে ভ্রম যাবেক তোমার।
জগৎ দেখিতে পাবে আপন প্রকার।।
আমাতে যে বস্তুরূপে দেহ মাঝে আছে।
সর্ব্বজীবে তদাকারে বস্তু বিহরিছে।।
অক্ষয় অব্যয় বস্তু আছে সর্ব্বঠাঁই।
রামের রমণ ছাড়া কোন প্রাণী নাই।।"

এখানে শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হলে প্রাণাধিক ভক্তবৎসল হয়ে শিষ্যকে সেটা দেখিয়ে দেন – "এ হেন সদ্গুরু যবে হন কৃপাবান। শব্দাতীত পরব্রহ্ম চক্ষুতে দেখান ॥" তখন সাধক "শ্যামরূপে রাম দেখে জগত ভরিয়া ॥" ১২/১২

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ।। ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।। ১৪

অনুবাদ: সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মিত্র ও কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য, ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পনকারী (এরূপ) যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১২/১৩-১৪

ব্যাখ্যা: গীতায় বর্ণিত ভক্তিপথের অনুসরণের ফলে চেতনার ও সত্তার মহত্তর অবস্থাটা কি হবে আটটি শ্লোকে তারই বর্ণনা করা হচ্ছে। অবশ্য এ সমস্তগুলোই হচ্ছে শুধুমাত্র কর্ম্মযোগ সংসিদ্ধ ভক্তের লক্ষণ কারণ ভগবান শুধু তাঁর প্রিয় যোগী ভক্তদের কথাই বলছেন মাত্র। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর বিষয়ে কোথাও কিছুই বলেন নি, তাই তাঁদের কথা এখানে আলোচ্য নয়। কর্ম্মযোগী ভক্তকে যোগবিত্তম বলে তিনি কেমন হবেন তার বিবরণ – সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন, করুণাময়, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমভাবযুক্ত, ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট, আমাতে দৃঢ়নিশ্চয় বোধসম্পন্ন, আত্মসংযত, আমাতে অর্পিত মনোবুদ্ধি। এগুলোই কর্ম্মযোগময় আমার যে ভক্ত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। কর্ম্মত্যাগীর প্রসঙ্গ এখানে নেই। কর্ম্মযোগী যোগের পূর্ণতায় এমন সকলগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। সে তো আর ভূত ত্যাগপরায়ণ সন্ন্যাসী নয়, সুতরাং ভূতে ভূতে তাঁর মৈত্রী আর করুণা প্রবাহিত হয়। তখন সুখ দুঃখ দুইই তার বরণীয় হয়ে ওঠে। স্বয়ং ভগবানই যে সুখ দুঃখ আকারে প্রকাশ পাচ্ছেন। সুতরাং বৈষম্য দর্শনের কোনও উপায়ই ভক্তের আর থাকে না। ভগবৎ ধর্ম্ম নিজেতে প্রতিফলিত হওয়ায় নিজেকে বীর্য্যবান দেখেও অপরের দোষে সর্ব্বদা ক্ষমাপরায়ণ। ফলাসক্তি না থাকায় সদা সন্তুষ্ট, তাই তাঁর অসন্তোষও নেই। ভগবান স্বয়ং অন্তরে আত্মারূপে বিরাজিত এবং এবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়ায় সবই ভগবান থেকেই প্রকাশিত ভাব, বোধ, শব্দ, স্পর্শাদি ভৌতিক জগৎ সকলই সেই ভগবান থেকেই এবং ভগবানেই প্রকাশ পাচ্ছে। মন, বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পিত হয়ে গেলে তবেই এমনতর উপলব্ধি হওয়া সম্ভব হয়। এমন ভক্তই ভগবানের প্রিয়। এটাই ভগবৎ উক্তি। অবিচ্ছিন্ন আত্মরতিরূপ পরাভক্তি ও অপরোক্ষজ্ঞানে বাস্তবিকই কোনও ভিন্নতা নেই। যাঁর আত্মরতি অবিচ্ছিন্ন ধারে ও অপ্রতিহত ভাবে বইতে থাকে তিনি তো সর্ব্বদাই যোগযুক্ত হয়েই থাকেন। এমন ভক্ত ও জ্ঞানীরা সমভাবাপন্নই হন ও তাঁদের বাহ্য ও অন্তর লক্ষণগুলোও সব একই রকম হয়। জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু, একই মুদ্রার দুই পিঠ মাত্র। কেউ একে জ্ঞান বলে, কেউ বা ভক্তি। ভক্তের জ্ঞান নেই বা জ্ঞানীর ভক্তি থাকে না এ সবই বাজে কথা। এখানে এটাকে ভক্তিই বলছি কারণ ভগবান এখানে ভক্ত শব্দটা ব্যবহার করেছেন। ছাপাখানা সহজলভ্য হওয়ায় উল্টোপাল্টা লেখার প্রচারটা বেড়ে গেছে তাই আজকাল গৌণী ভক্তিকেই প্রকৃত ভক্তি বলা হচ্ছে আর পরোক্ষ জ্ঞানলাভ করেই জ্ঞানীর আসন অধিকার করে বসছে, তাই এমন কলহ - বাদের সীমা থাকছেনা। নইলে নেশাখোরদের দ্বেষ, কলহ, মতবাদ এসমস্ত কোথায় ? ভগবদ্ ভজনা অর্থাৎ সাধনক্রিয়ার দ্বারা মন নেশাখোরদের মত হয়ে যায়, তখন কে তাকে গালাগালি দিল, বা অনিষ্ট করল এ সব নিয়ে ভাবেন না। বহির্মুখ লোকেরা ভাবে এ লোকটা পরের ঘাড়ে চেপে খায় এবং কারো কোনও কাজে লাগে না, চুপচাপ বসে অলসভাবে দিন কাটায় আর উপদেশ দেয়। কিন্তু সেই অজ্ঞ লোকেরা জানেনা সে পরম ভাবময় যোগীর যতচিত্তাত্মভাবের প্রভাব কত বিরাট ও বিশ্বব্যাপক। তাঁর শান্ত সমাহিত চিত্তের কিরণ কত শোকতাপদগ্ধ জীবের সন্তাপ হরণ করে তার সীমা নেই, দুর্ব্বল সাধকের চিত্তে বল সঞ্চার করেন, কত পাপহত জীবের পাপ কালিমা মুছিয়ে দেন ও তাকে গন্তব্য পথের সন্ধান দেন। ভবব্যাধিতে কাতর কত আতুরকে ভবরোগের ওষুধ দিয়ে থাকেন। তিনি জানেন যে তাঁকে যারা তিরষ্কার বা গালিগালাজ করে তারা নিজেদের স্বভাব বশেই তা করে অনেকটা দরজায় কব্জার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হওয়ার মত, সে জন্য যোগী এমন গালাগালি ও তিরষ্কারকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না।

যা হোক যে সমস্ত গুণের কথা বলা হল এমন গুণযুক্ত ভক্তই আমার (ভগবানের) প্রিয়। তা সে ভক্তের সাধনপথ যে প্রকারেরই হোক না কেন। এখানে পাঠক প্রশ্ন করবেন তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের অন্তর - বাহ্যে বিদ্যমান তবে আবার তাঁর উপাসনার দরকারটা কি ? উত্তরে বলি যদিও আত্মা বা ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন তবুও বিনা উপাসনায় তাঁর সন্নিহিত হওয়া যায় না, দর্শন তো হয়ই না। গরুর দুধের মধ্যেই ঘি থাকে ঠিকই কিন্তু সেই ঘি গরুর শরীরের ভিতরে থেকেও গরুর শরীরের পুষ্টি বা ক্ষত এসব সারিয়ে তুলতে পারেনা। গরুর বাঁট থেকে দুধ দোহন করে তারপর পরিশ্রম করে তা থেকে মাখন তুলে তবে সে মাখন ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করে ফললাভ করতে হয়। তেমনি ভাবে ভগবান আত্মারূপ পরমেশ্বর দেহীর অন্তরে থাকলেও উপাসনারূপ তপস্যাকর্ম্ম ছাড়া শান্তিরূপ মাখন উঠে আসে না, ভবদুঃখও ঘোচে না। কারণ যার দ্বারা বুঝব সেই মন, বুদ্ধিই ভূতগ্রস্থ। মনের ভূত তাড়াতে না পারলে সে মনে শান্তি আসে না। বিষয়ানুরাগে মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়েই থাকে। এজন্যই উপাসনার দরকার। উপাসনা একরকম অনুশীলন, অভ্যাস, যার দ্বারা মনস্থির হয়। মনস্থির হলেই সমীপস্থ হওয়া যায়।

ঃপ্রাণের স্থিরতা হলে মনঃস্থির তবে।
মনস্থিরে বুদ্ধিস্থির আপনিই হবে ॥
প্রাণস্থিরে মনস্থির হইবে যখন।
দিব্যধাম প্রকাশিত হইবে তখন ॥
মধ্যপথে বহিঃপ্রাণ হইলে নিশ্চল।
চরমে পরমবোধ হবে সুবিমল ॥
প্রাণের বিচেষ্টা যাবে সঙ্কল্প মনের।
ভাতিবে অপূর্ব জ্যোতিঃ জ্ঞান ভাস্করের ॥
প্রাণস্থিরে মনস্থির হইলে তোমার।
বিন্দুস্থির, দেহ স্থির হবে পর পর ॥

প্রাণস্থিরে সকলস্থির হইলে তোমার।
লভিবে অপূর্ব শান্তি অব্যক্ত অপার ॥"

উপাসনার দ্বারাই ময্যার্পিত মনোবুদ্ধি হওয়া যায়। তখন মন বুদ্ধি আর অন্য কোনও বিষয়ে আটকে থাকতে পারেনা। তখন সমস্তই ব্রহ্মার্পণ। অবশ্য এটা জোর করে করা যায় না। গুরুকৃপায় সাধকের এই স্থিতি আপনিই হয়ে থাকে, নিজের অজান্তেই ব্রহ্মার্পণ হয়ে যায় ॥ ১২/১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ।। ১৫

অনুবাদ: যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১২/১৫

ব্যাখ্যা: যোগযুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনায় ভগবান বলছেন যে তিনি সদা আত্মানন্দে তুষ্ট থেকে নিজেও কখনও বিচলিত হন না বা অপরকেও উদ্বেগ বিচলিত করেন না। কারণ তিনি সমদর্শী অতএব জ্ঞানী। আত্মানন্দে তুষ্ট ব্যক্তির দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ না থাকায় অপরের ক্লেশের সম্ভাবনাই নেই বরং আসুর প্রকৃতির জগাই মাধাইও নিজ নিজ স্বভাব ভুলে মহাপ্রভুর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। চরম মদ্যপ ও লম্পট প্রকৃতির নাট্যকার অভিনেতা গিরিশ ঘোষও ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগত হয়ে তাঁকে "বকলমা" দিয়েছিলেন। তাই পরবর্ত্তী ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত যাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে এতাদৃশ যোগীদের হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ইত্যাদি থাকে না। যেমন নেশাখোর নেশাগ্রস্ত লোকেদের মত্ত অবস্থায় কোনও কিছুর বোধ থাকে না তেমনই জীবন্মুক্ত পুরুষ আপনার আনন্দে আপনি বিভোর থাকেন। জাগতিক ব্যাপারে তাঁর কোনও আকর্ষণ থাকেনা। বিশেষদর্শী যোগীদের আত্মভাব ভাবনারও নিবৃত্তি হয়ে থাকে – কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হবে, ছেলেটা কি করে মানুষ হবে, আমাকে লোকে মর্য্যাদা দেবে কি না, থাকবই বা কোথায় ? চলবেই বা কি করে ? এমন কোনও ভাবনাই তাঁর থাকে না। অহং ভাবনা না থাকায় অন্তরে পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের প্রকাশ ঘটে। এমনতর অবস্থাকেই সন্ন্যাস বলা যায় কারণ বাইরে থেকে কিছুই বোঝা না গেলেও ভিতরে ভিতরে হয় প্রকৃত সন্ন্যাস। এটাই হল অন্তঃসন্ন্যাস। সংসারী হয়ে সংসারের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য এমন অনাসক্তির সাথে পালন করাই প্রকৃত সন্ন্যাসের অবস্থা। অবিদ্যা তিরোহিত হলে চিত্তধর্ম্ম যখন আর স্পর্শ করতে পারেনা তখনই আর আত্মভাব ভাবনা থাকে না। তা না হলে চিত্তের প্রতিবিম্বস্বরূপ চিত্ত যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকবে ততক্ষণ যতই জ্ঞানের বাক্‌বিতণ্ডা কর, যতই নাচ আর যতই কাঁদ, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণভক্তি বা পূর্ণ বৈরাগ্য কোনওটাই লাভ করা সম্ভব হবে না। এ কারণে কলির সন্ন্যাসীরা লাল কাপড় বা গেরুয়া পরে মস্তক মুণ্ডন অথবা জটা ধারণ করে মঠ মিশন ভরাট করে থাকলেও সংসারের ওপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং সংসারীর সংসর্গের জন্য তৎপরতাময় হয়ে থাকেন। তারই ফলস্বরূপ তাঁরা লোকসংসারের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগী পুরুষ হতে কেউ উদ্বেগগ্রস্ত হতে পারে না। সে নিজেও কারও দ্বারা উদ্বেগগ্রস্ত হয় না। কেন না লোকে লোকে ভগবদদর্শনই তাঁর সাধনা। লোকে লোকে তাঁরই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা আত্মারূপে পরিদৃষ্ট। বৈষয়িক হর্ষ, বিষাদ, ভয়, উদ্বেগ এ সবে সে আবদ্ধ নয়। ভগবদকর্তৃত্বই তার সকল দুঃখকে অমৃত করে দেয়, ভগবৎসান্নিধ্যের আনন্দ তাঁর বৈষয়িক হর্ষ আনন্দকে দীপ্তিহীন করে দেয়। ভগবান তাঁর ভয়কে অভয়ে এবং উদ্বেগকে ভগবদাবেগে পর্য্যবসিত করছেন। এমন ভগবৎ প্রিয় পুরুষ সকল ভগবন্মুখী ব্যক্তিরই প্রিয় হন ॥ ১২/১৫

অনপেক্ষ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।।১৬

অনুবাদ: সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন (পক্ষপাত শূন্য), চিন্তাশূন্য এবং সংকল্পশূন্য যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১২/১৬

ব্যাখ্যা: ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তের আরও বৈশিষ্ট্যসকল বলছেন যে তথাকথিত দলবদ্ধ সন্ন্যাসীর মত ত্যাগ নয়। কর্ম্মত্যাগী যেমন প্রায়শঃ গৃহস্থাশ্রম মুখাপেক্ষী, কর্ম্মযোগীরা তেমন নয়। তাঁরা স্বতঃ আগত অর্থাদি বিষয়েরও অপেক্ষায় থাকেনা। কোন রকম চাঁদাবাজি, দান, প্রণামী, দক্ষিণা ইত্যাদির পরোয়াও করেন না। সুতরাং শুচি বা নির্মল অন্তঃকরণসম্পন্ন, দক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মকুশলী; কর্ম্মতৎপরতাময় অথচ নির্লিপ্ত ও উদাসীন, গতব্যাথ – কোনও কিছুরই অভাবে ব্যাথাতুর নন। কামনাময় কর্ম্মসংকল্পও তাঁর কিছু থাকে না। শুধুমাত্র কর্তব্যবোধে যেটুকু করণীয় সেটুকুও ভগবৎযুক্ত হয়েই সম্পন্ন করে থাকেন। কর্ম্মী, ভক্ত ও প্রকৃত ত্যাগীর লক্ষণই এটি ॥ ১২/১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ।। ১৭

অনুবাদ: যিনি (প্রিয় বস্তু পাইয়া) হৃষ্ট হন না, (অপ্রিয় বস্তু পাইয়া) দ্বেষ করেন না, (ইষ্ট নাশে) শোক করেন না, (অপ্রাপ্ত অর্থ) আকাঙ্খা করেন না, এবং যিনি শুভাশুভ অর্থাৎ পাপপুণ্য পরিত্যাগী ও মদ্‌ভক্তিমান, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১২/১৭

ব্যাখ্যা: আত্মানন্দে সদাতুষ্ট থাকায় বাহ্য আনন্দদায়ক কোনও কিছু পেলেও সেটাকে তুচ্ছজ্ঞান করে ঐ বস্তুতে হৃষ্ট হন না এবং কোনও অপ্রিয় বস্তুতেও দ্বেষ বা বিরক্তি কিছুই হয় না, মোটকথা জাগতিক বিষয় ব্যাপার তাঁকে হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্খা এ সকলের বশীভূত করতে পারেনা, শুভাশুভ বলে কোনও কিছুর বিশেষত্ব বা গুরুত্ব কোনও বিষয়ে সে দেয় না। শুধু যা কিছু ভগবৎ প্রেরিত, বিষয় নির্ব্বিশেষে সে সকলই তার চোখে মঙ্গলদায়ক। এমন ভক্তিমান যিনি তিনিই ভগবৎ প্রিয় ॥ ১২/১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ।। ১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয় নরঃ ।। ১৯

অনুবাদ: শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে বিকারশূন্য ও আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রসংশায় সমভাবাপন্ন, মৌনী যাহা কিছুতেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানহীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১২/১৮-১৯

ব্যাখ্যা: ভগবান তাঁর ভক্তের বিষয়ে আরও বলছেন যে মহত্তর মুক্তির একমাত্র পূর্ণতম ভিত্তি যে গুণ বৈশিষ্ট্যসকল সেগুলো সবই প্রকাশ পায় তাঁর প্রিয় ভক্তের মধ্যে। “অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং” শ্লোক থেকে শুরু করে এই “তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী” শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান যা বললেন তা প্রধানতঃ কর্ম্মযোগীরই কথা। তবুও কি কর্ম্মযোগী, কি অভ্যাসযোগী বা অভ্যাসযোগে অপারগ কিন্তু ফলকামনাত্যাগী ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যখন শত্রু মিত্রে, মান অপমানে, শীত উষ্ণে, সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, অসঙ্গ, নিন্দা স্তুতিতে সমদ্রষ্টা, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হয় এবং স্থিরবুদ্ধি হয় তবে সে গৃহী হয়েও গৃহী নয়, এমন সাধক মাত্রেই তো ভগবৎ প্রিয় হবেনই কারণ এমন লক্ষণযুক্ত পুরুষমাত্রেই ভগবানের প্রিয়। আগে ১৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আত্মানন্দে মগ্ন অবস্থার সাথে নেশাগ্রস্তের যে উপমা দিয়েছিলাম, এমন নেশাগ্রস্তের নেশা ভাঙলেও নেশার সেই ঝোঁকটা থেকেই যায়। তাই আত্মস্থ ভাবে থাকার দরুণ আত্মার সে দোষগুণরহিত অবস্থার ভাবটাও সাধকের ভিতর স্থায়িত্বলাভ করে। ফলে নিন্দা, প্রশংসা, সুখ দুঃখ কোনকিছুই সাধককে বিচলিত করে না। অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের আজ্ঞায় ব্যথিত, বিরক্ত লক্ষণ যখন দশরথ, কৈকেয়ী, ভরতাদির দোষ দেখছিলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে বলেছিলেন, “সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা, পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা। অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্ম্ম-সূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ।” মানে হল নিজ কর্ম্মসূত্রে সকলেই বাঁধা পড়েছে। সুখ দুঃখ যা পাই তা আপন আপন কর্ম্মের ফল, অন্যের তিলমাত্র দোষ নেই। রামচন্দ্র বলছেন, ভাই, কারও দোষ নেই, কেন তুমি অন্যের উপর রাগ করছ? এমন দৃষ্টি যাঁর তিনিই জ্ঞানী এবং ভক্ত। আত্মাতে লক্ষ্য না থাকলেই অন্যবস্তুকে প্রিয় বলে বোধ করে থাকি বটে, কিন্তু সেটা মনের ভ্রান্তি মাত্র। বোধ ও আত্মা একই পদার্থ। সংসারের প্রিয় বস্তুর বোধও এই আত্মার জন্যই হয়ে থাকে। আত্মা না থাকলে বোধটা হত কার? এ জন্যই যা কিছু বোধ হল, সে বোধের স্বরূপটা জানলেই বোঝা যাবে যে সব কিছুই সেই আত্মারই প্রকাশ। এই বোধটা সকলের হয় না বলেই মোহকূপে পড়ে থাকে। ক্রিয়া অভ্যাসদ্বারা আনন্দময় জগৎপ্রাণ আত্মার দিকে লক্ষ্য পড়লে তখন আত্মাকেই প্রিয় বোধ হয় ॥ ১২/১৮-১৯

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ।।২০

অনুবাদ: যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমার অতি প্রিয় ॥১২/২০

ব্যাখ্যা: এ যাবৎ যেমন যেমন ভাবে ধর্ম্মের আচরণ অনুষ্ঠানের বিষয় বলা হল এবার তার ফল উপসংহারে বলছেন। ব্যক্ত ভগবৎভাবের উপাসক জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চিত যোগীর শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে এই অধ্যায়ের ইতি টানছেন। ১৩শ শ্লোক থেকে ২০তম শ্লোক পর্য্যন্ত যে সমস্ত সদ্‌গুণের কথা বলেছেন সেটাই প্রকৃত ধর্ম্ম বা আত্মার কথা। এর অনুষ্ঠানেই আত্মানুশীলন হয়, যার চরম ফলই হল ইচ্ছারহিত অবস্থা। নইলে নেচে, কেঁদে, হৈ হট্টোগোল করে বা মাইক বাজিয়ে জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে ফুল বেলপাতা সাজিয়ে নৈবেদ্য অর্পণ করে নিছকই বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই হয় না। ধর্ম্মের অর্থই ইচ্ছারহিত অবস্থা হওয়া। রীতিমতো অনুশীলন করে মানে ক্রিয়া করে, তবেই ব্রহ্মানন্দে নিশ্চিত স্থির হওয়া যায়। ভগবদভক্ত যে তার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি অত্যন্ত শুদ্ধ ও সংযত হয়ে যাবে নইলে সতত যোগী, নিস্পৃহ, সমদর্শী, সুখ দুঃখে একরূপ, পরোপকারী এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী হওয়া যায় না। গোরক্ষ সংহিতায় আছে –

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত স যাতি পরমাং গতিম্ ॥”

যদি কেউ ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষণার্দ্ধও মনকে নিশ্চলভাবে রাখতে পারেন, তাহলে সেই সাধক সমস্ত পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করেন। তাই জ্ঞান শুধু মুখের কথা নয়, প্রাণ মধ্যমার্গে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত মুখে জ্ঞানের কথা বলে বেড়ালে তা কেবল মিথ্যা দম্ভ ও প্রলাপবাক্য মাত্রই হয়ে থাকে। অতএব এ অবস্থায় যত শাস্ত্রই পড় আর শাস্ত্রীয় কর্ম্মই কর কোনও লাভ নেই। সত্ত্ব শুদ্ধ হলে পরে তবে তারপর যে নিশ্চলা ভক্তি ও বিশ্বাস হয় তাইই হল প্রকৃত পূজো। তা না হলে মনে যতক্ষণ উল্টোপাল্টা বিজাতীয় চিন্তার প্রবাহ

চলে ততক্ষণ সেই মনের দ্বারা, ভগবৎ স্মরণ, মনন কেন কোনও কাজের কাজই হয় না, শুধুমাত্র অকাজ কুকাজই হওয়া সম্ভব॥ ১২/২০

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদ্বশোহধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদভগবদ্ গীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সংবাদে "ভক্তিযোগ" নামক দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বাদশঅধ্যায়ের সারসংক্ষেপ: যদিও আগে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে তবু বোঝবার সুবিধার জন্য এখানে পুনরালোচনা কিছুটা সংযোজন করছি পাঠকের সহজবোধ্যতার জন্য। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। সগুণের উপাসনাও ব্রহ্মের একাংশ মাত্র। তাও রকম ভেদে অব্যক্তের ও ব্যক্তের উপাসনা। ব্যক্তের উপাসনা অধিকারীভেদে বিবিধ রকমের হতে পারে। বিশ্বের যা মূল সত্ত্বা বা অধিষ্ঠান চৈতন্য, তার প্রকাশ মাত্র – জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ কোনও অবস্থার মধ্যেও পরিবর্ত্তিত হয় না বলেই তাকে "কূটস্থ" বলে। এই কূটস্থ বা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন। যিনি প্রতি জীবের মধ্যে কূটস্থ জ্যোতিঃরূপে রয়েছেন, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, তিনিই আবার বৃহৎ কূটস্থরূপে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। বৃহৎ কূটস্থ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এ জগতের সকল নামরূপময় পদার্থই সেই জ্যোতিঃর মধ্যে প্রবেশ করে জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যায়। এই জ্যোতিঃর অন্তর্গত পুরুষই ধ্যেয়। বিরাট বিশ্বের মধ্যে অজস্র নামরূপ থাকলেও সেগুলো যাঁকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে তাদের আড়ালে সেই যে জ্যোতিঃর্ম্ময় অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে বর্তমান - তিনিই কূটস্থ বা নারায়ণ। ইনিই বিশ্বের প্রাণ, বৃহৎ চৈতন্য যাঁর বিবিধ শক্তিকে লক্ষ্য করে তাঁকে জ্যোতির্ম্ময়ী মহাদেবী, জগদম্বা, গায়ত্রী ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী উপাসনাও এই বিশ্বপ্রাণ জগদম্বারই উপাসনা। ইনিই অব্যক্ত, বেদবিদের ভাষায় অক্ষরব্রহ্ম, উপাস্য ও মোক্ষদাতা। গুরুপদেশমত অন্যদিকে মন না দিয়ে ক্রিয়া করে চলুন যাতে আত্মস্থ হতে পারেন ও মৃত্যুসংসাররূপ এই দেহজ্ঞান না থাকে। কোনও কাজকর্ম্ম করেই যখন অহংকার আসবে না তখন আর সে কর্ম্মজনিত সুখদুঃখের ভাগী হতে হবে না। আত্মা ব্যতীত অন্যদিকে মন দিলে, লাভও নেই কল্যাণও নেই। এমনভাবে ভক্তি বাড়াবার অনুশীলন করলেই সঙ্গবর্জিত হতে পারবেন মানে ইন্দ্রিয়সঙ্গ বর্জন হবে। প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিবেক উৎপন্ন হলে নিজে থেকেই ভজনে দৃঢ়তা আসে ও চিত্ত বিষয়াকৃষ্ট না হয়ে শান্তিলাভ করে। বিক্ষেপশূন্য হলেই চিত্ত পরমপদে প্রবিষ্ট হয়। তখনই সর্ব্বাত্মদৃষ্টিলাভ হয়ে পরমজ্ঞান লাভ হয়। একজন ভক্ত যোগীর ভাষায় মুক্তির ত্রিবিধ উপাদান কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হয় ভক্তিযোগ অবলম্বনেই। তাই তাঁর অনুভবে –

ভোজন আমার অহুতি প্রদান,
শয়ন আমার সষ্টাঙ্গ প্রণাম,
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর,
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গি মুদ্রা বিচরণ,
যে ভাবেই বসি সেই তো আসন,
যে চিন্তাই করি তাঁরই ধ্যান ধরি,
এ জীবন তাঁর যন্ত্র॥

ভক্তি অর্থে প্রেম, যোগ অর্থে মিলন। প্রাণরূপী আত্মাতে ভালবাসারূপ প্রেম দৃঢ়তর হলেই তাতে তন্ময়ভাবরূপে মিশে যাওয়া বা মনের লয় হওয়ারূপ যে অবস্থা সেটাই ভক্তিযোগ। সর্ব্ববিজ্ঞান অপেক্ষা এই প্রিয়ত্ববিজ্ঞানই জীবের কল্যানতম বিজ্ঞান॥

ওঁ

অথ ত্রয়োদশহধ্যায়ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ (১৩)

অর্জুন উবাচ -

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ।। ১

অনুবাদ: অর্জুন কহিলেন। হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় – এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি॥ ১৩/১

ব্যাখ্যা: অর্জুনকে এ জগৎমাঝে ভগবানের ইচ্ছায় যন্ত্ররূপে ভগবৎকর্ম্ম করতে বলা হয়েছে। এজন্য প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে প্রভেদটা জানা প্রয়োজন। সেজন্যই কাজের মানুষ অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করছেন হে কেশব, প্রকৃতি কি ? পুরুষ কি ? ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল কি তা জানতে চেয়ে এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন। যদিও এখানে এটা উল্লেখ

করা উচিত যে প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ, এমন কি শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী প্রমুখ ভাষ্যকারগণও এই শ্লোকটাকে গীতার অর্ন্তগত বলে গ্রহণই করেননি। কিন্তু গীতাকে ৭০০ শ্লোকে সমৃদ্ধ বলেই সপ্তশতী বলা হয়ে থাকে অথচ এ শ্লোকটি বাদ দিলে ৭০০ শ্লোক পূর্ণ হয় না। তাই শ্লোকটিকে গীতার অন্তর্গত ধরতে অসুবিধা কিছুই নেই। কিন্তু প্রাচীন ভাষ্যকারগণ যাই বলুন, সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা থাকলেও অর্জুনের মুখে এ অধ্যায়ের শুরুতে এমন প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক কারণ ভগবান ভক্তদের এই জন্মমরণসঙ্কুল সংসার থেকে উদ্ধার করেন ঠিকই, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বিনা এমন উদ্ধার কি করে সম্ভব হয় ? তাই অর্জুন এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করেছেন এবং প্রকৃতি–পুরুষ, ক্ষেত্র–ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান–জ্ঞেয়র রহস্য জানতে চেয়েছেন ॥ ১৩/১

শ্রীভগবান উবাচ -

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ।।২

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে কৌন্তেয়, (জ্ঞানের প্ররোহ - ভূমি বলিয়া) এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে। যিনি ইহাকে তত্ত্বতঃ জানেন, ক্ষেত্রবিদগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩/২

ব্যাখ্যা: এই সমগ্র জগৎ হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের সৃষ্টি ও কর্ম্মের ক্ষেত্র যেখানে মানুষের শরীরটা ব্যষ্টিগত ক্ষেত্র এবং সমগ্র জগৎ হল সমষ্টিগত ক্ষেত্র বা বিশ্বগত ক্ষেত্র যার ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু একজনই। এই দুইয়েতেই সেই একজনই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজমান। সেই একই আত্মা, পরমাত্মা – পরমেশ্বর –ঈশা বাস্যম্ সর্বম্ যৎ কিঞ্চ"। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই বিশ্বের একায়ন কথিত হয়েছেন। যা কিছু প্রকাশ হয় প্রজ্ঞান–ঘন ব্রহ্মেরই নাম রূপ ক্রিয়াবৈচিত্র্য, অন্য কারও নয়। সেজন্যই কর্ম্মময়জীবের সর্ব্বকর্ম্ম সহ আত্মসমর্পণ তাঁতেই সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু দেহাত্মবোধ নিয়ে বিচরণশীল সাধারণ মানুষের জন্য এমন ব্রহ্মোপদেশ বললে তাদের ধারণায় আসেনা। তাই তাদের ধারণা দেওয়ার জন্যই আত্ম অনাত্ম জ্ঞানটার উপলব্ধি দরকার। কূটস্থের অনুভবেই এই উপলব্ধি সম্ভব। কূটস্থের অনুভব অনুযায়ী পরাভক্তির উদয় ভগবদকৃপাপ্রাপ্তির পক্ষে অপরিহার্য্য কিন্তু আত্মজ্ঞান না হলে আবার পরাভক্তির উদয় হয় না। তাই জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় যথাযথ ভাবে করার জন্য আত্ম অনাত্ম বিভাগটা বিশেষভাবে বলছেন। শঙ্করভাষ্য অনুসারে সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরের দুটো প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। সংসার হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা বিভক্তা যে প্রকৃতি তাইই একটা "অপরা" এবং অন্যটা "পরা" প্রকৃতি– যিনি জীবরূপা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণান্বিতা ঈশ্বররূপা। এই দুটো প্রকৃতির সাহায্যে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হয়ে থাকেন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ থেকে এই দুই

প্রকৃতির তত্ত্ব নিরূপণের দ্বারা সেই দুই প্রকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্যই এই অধ্যায় আরম্ভ করা হয়েছে। এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়। কিন্তু কেন ? প্রথমতঃ এটা ক্ষত থেকে ত্রাণ করে। কি রকম ক্ষত ? বিগত জীবন ও জন্ম গুলোতে যে সকল বড়সড় রকমের সংস্কারকে ভুলপথে চালিত করা জনিত ক্ষতাদি উৎপন্ন হয়ে আছে সেগুলো এই নবকলেবর প্রাপ্তিতে গুরুকৃপারূপ মলমে আরোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই শরীরের ক্ষয় হয়, তৃতীয়তঃ এই দেহকৃত কর্ম্মের ফলভোগ হয়, চতুর্থতঃ সদগুরুরূপ মালিক দ্বারা এ দেহকে কর্ষণ করা যায় মানে লাঙল চাষ দেওয়া যায় উত্তম ফসলের জন্য। এই কয় প্রকার অর্থে শরীরকে শ্রীভগবান ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেছেন। তেজস্তত্ত্বের এবারের প্রশ্ন তাহলে ক্ষেত্রজ্ঞটা আবার কে ? (ক্রিয়া) যোগের সাধক যিনি, এই দেহক্ষেত্রের জ্ঞান যাঁর হয়েছে, নিজের স্বরূপ যিনি জানেন, তিনি অবশ্যই অনুভব করছেন যে এই ক্ষেত্রের প্রকৃত স্বরূপ ফিরে আসে যে চাষ করলে, মানে যে চাষ বা কর্ষণ দ্বারা এ দেহরূপ ক্ষেত্রকে সম্যক জানা যায় সেই চাষ যিনি করেন, মানে ক্রিয়াই হল ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতঅর্থে স্বরূপজ্ঞান লাভের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীগুরুদেবই ক্ষেত্রজ্ঞ। জমিতে চাষ করার জন্য দরকার হয় জমি, লাঙল ও বলদ। তপস্যার জন্যও ক্ষেত্র হল শরীর, লাঙল হল শ্বাস-প্রশ্বাস, আর বলদ দুটো হল মন ও ইন্দ্রিয়। রাজা হয়েও ঋষি মানে ঘোর সংসারী হয়েও বড় যোগী রাজর্ষি জনক নিজের শরীররূপ জমিকে এমনি ভাবে চাষ করে তার ফসলরূপী সীতানাম্নী সাধনলক্ষ্মী ব্রহ্মবিদ্যাকে লাভ করেছিলেন। তাহলে এমন চাষটা করেন কে ? যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বা ক্রিয়াবান সাধক যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়ার কারণে ক্ষেত্রে হল কর্ষণ রূপ আত্মকর্ম্ম করে থাকেন। অবশ্য বদ্ধ জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ কারণ তিনিও দেহটাকে সাজান গোছান অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে। আজকাল যোগব্যায়ামাদি করে শরীরের পুষ্টি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু যিনি সৌষ্ঠব বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজেকে দেহপাশ থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন তিনিই সর্ব্বতাপহর দেহাতীত অবস্থা পেয়ে ধন্য হন। আর যাঁরা সাধন প্রণালী পেয়েও অবহেলা করেন তাঁদের কথা আলাদা, অবশ্য এর জন্য কিছুটা দৈব অনুকম্পাও প্রযোজন। মানে পূর্ব পূর্ব জন্ম থেকেই সাধনা করা থাকলে এ জন্মে সুফলটা পাওয়া যায়। তবুও খুবই সতর্ক হতে হয় নইলে খ্যাতি প্রচার হলে আবার বিপদ হয়, ক্ষেত্রের ভাল ফসল যেমন কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষীতে নষ্ট করে, তেমনি অভিমানরূপ পশু পক্ষীতেই ক্রিয়ার ফসলটুকু নষ্ট করে, অপদেবতার ভোগে লাগায়। আশাকরি বোঝা গেল যে শরীর কর্ষণ করে জীব ফসলভোগ করে তাই শরীর ক্ষেত্র মাত্র, আর শরীরস্থ জীবরূপে আত্মাতে যে অবস্থিতি, যিনি জীব সেজে শরীরসঙ্গী সেই আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু যতক্ষণ শরীরে ও আপনাতে এই বিভাগদুটো বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে দেখতে না পারেন বা না দেখেন ততক্ষণ কেউ ক্ষেত্র–ক্ষেত্রজ্ঞবিৎ নয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এ বিভাগ সুস্পষ্ট দেখতে পেলেই তখন পুরুষ প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিৎ হন। নির্গুণ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান হয় না। এটা তত্ত্ব

(theoretical) বিষয়ে বলা হল মাত্র। ব্যবহারিক (practical) অংশ নিজ নিজ সদগুরুপদেশগম্য ॥ ১৩/২

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ।। ৩

অনুবাদ: হে ভারত, সমুদয় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান (মুক্তির হেতু বলিয়া) আমার অভিমত ॥ ১৩/৩

ব্যাখ্যা: অজ্ঞতাবশতঃ জীব এই দেহ, মন, প্রাণ নিয়ে গঠিত ক্ষেত্রটাকেই মাত্র জানে এবং এটাকেই সমগ্র মনে করে। এত বড় অজ্ঞান নাশ একমাত্র তখনই সম্ভব হয় যখন জীব এই ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রের প্রকৃত সত্তার দিকে তাকায়। তখনই প্রকৃত জ্ঞানের আরম্ভ হয়। এখান থেকে যত অন্তর্মুখী হই ততই আমরা পূর্ণতর জ্ঞানের দিকে এগিয়ে চলি আর বুঝতে পারি ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি নাভিদেশেতে আছেন তিনি আমারই রূপ, গুরুবাক্যের দ্বারা লভ্য, তিনি সব শরীরেই আছেন। যিনি অহংরূপ, মমত্বরূপ, অভিমানযুক্ত হয়ে দেহের সুখদুঃখকে আমার বলে অভিমান করছেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, আর সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি তিনিই ভগবান। "অনশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি" ঈশ্বর অভোক্তা দ্রষ্টা বেদে একথাই আছে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এ সমস্তের তিনিই আত্মা, তিনিই সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মারূপে বিরাজিত। অন্তঃসঙ্গী জীবাত্মা সামান্যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ হলেও অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ কারণ তিনিই সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মারূপে বিরাজিত। পরা প্রকৃতি বা নির্গুণ আত্মবোধরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মার অংশ, তাঁতে ও পরমাত্মাতে স্বরূপতঃ ভেদ নেই। শুধু একে ঈশিত্ব ও অন্যে অসঙ্গত্ব বিশেষভাবে প্রকট। অসঙ্গত্ব তাঁতে ঘটলেই তিনি জীব। আত্মচেতনময় পরাপ্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ হলেও আসলে পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমেশ্বরত্বের জন্যও ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞেরও ক্ষেত্রজ্ঞ (total)। ভগবান বললেন সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকে ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জ্ঞাত হও মানে হল ক্ষেত্রজ্ঞ অবলম্বনে আমাকেই জ্ঞাত হও। তিনটে ভাবেই এর অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানো, আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ এটা জানো এবং আমাকে ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জানো। যার অর্থ হল ক্ষেত্র হতে ও ক্ষেত্রজ্ঞ হতে যে বিভিন্ন জ্ঞানক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেগুলো জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এভাবে নিজেকে নিজে জানতে পারলেই অজ্ঞান কেটে যায়, সব ধাঁধা মিটে যায়। দড়ি কে দড়ি বলে বুঝতে পারলেই আর সেটাকে সাপ মনে করে ভয় পেতে হয় না। দেহ দৃষ্টি হতেই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হয়েছে। ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান মায়ার দ্বারাই জগৎপ্রপঞ্চ রূপে পরিণত হন এবং এই মায়ার জন্যই প্রপঞ্চের বোধ হয়। মায়া নিবৃত্ত হলেই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব থাকে না। ঠিক যেমন স্বপ্নে যা কিছু দেখি স্বপ্নভঙ্গের পর তার আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না তেমনি। আজকাল অনেকেই প্রশ্ন করেন যদি প্রত্যেক জীবই পরমাত্মার অংশ তবে জীবের সংখ্যা ও জনসংখ্যা তো দিন দিন বাড়ছে মানে পরমাত্মাও কমছে বা বাড়ছে কি ? প্রশ্নটাও ঐরকম ভেদবুদ্ধিজাত। জীব দেখতে যদিও অসংখ্য তবুও তাতে পরমাত্মার পূর্ণত্ব ও একত্ব একই রকম থাকে। কারণ আগেই বলেছি যে জীবভাবটাই তো অবিদ্যাকল্পিত, পরমার্থিক সত্য নয়। একই সূর্য্য বা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যত অসংখ্যই হোক তাতে যেমন সূর্য্য বা চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনই জীব যত অসংখ্যই হোক পরমাত্মার তাতে হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। যাই হোক ক্ষেত্রজ্ঞের বোধে থেকে মায়া নিবৃত্ত হলেই এ দৃশ্যমান জগতেরও অস্তিত্ব থাকে না। আগেই বলেছি নাভিস্থলই সমান বায়ুর স্থান তাই ঐখানেই ক্ষেত্রজ্ঞের অবস্থান। তেজরূপে তিনি ঐ ক্ষেত্রকে চালাচ্ছেন। মরার সময় এই তেজ কমে গেলেই শরীরের সব কাজ বন্ধ হতে থাকে। কূটস্থের তেজও নাভির শক্তি থেকেই তাই তো কৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনে দুজনের সখা। সমান বায়ু ঢিলে হলেই আর প্রাণকে দেহে রাখা যাবে না, যত অক্সিজেনই দাও। গুরুবাক্য অনুযায়ী সাধন করে এ রহস্য জেনে নিন ও প্রকৃত অর্থে ক্ষেত্রজ্ঞ হয়ে উঠুন ॥ ১৩/৩

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ।। ৪

অনুবাদ: সেই ক্ষেত্র (স্বরূপতঃ) যাহা, যেরূপ (ইচ্ছাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট); যে যে (ইন্দ্রিয়াদি) বিকার যুক্ত, যাঁহা হইতে (উৎপন্ন) এবং (বিকার সহিত) যেরূপ, আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (স্বরূপতঃ) যাহা এবং যেরূপ (অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগে প্রভাবসম্পন্ন) তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৩/৪

ব্যাখ্যা: ক্ষেত্র বলতে যে শুধু স্থূল দেহটাকে বোঝায় না, এ দেহকে আশ্রয় করে প্রাণ ও মনের যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম চলে সবটা নিয়েই ক্ষেত্র কেবল ব্যষ্টিগত অর্থে, সমষ্টিগত অর্থে রইল বিরাট বিশ্বক্ষেত্র। পরের শ্লোকে এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের জন্য বেদ, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখও করা হয়েছে। এখানে শুধু সাংখ্যমত অনুসারে নিম্নতম প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। সেই প্রকৃতিতেই সকল লোক আবৃত আছে। কারণ শরীরটা হল জড়দৃশ্যস্বভাবযুক্ত, ইচ্ছা ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়ে সব জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে এবং সেজন্যই এই শরীরে বিচিত্র সব কাজকর্ম্ম হয়ে থাকে। সেগুলোকেই ভগবান ভালমত বুঝতে বলেছেন। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি মন নিয়েই এ সংসার। সমস্ত সংসারই সেই স্বরূপ অবস্থার বিকার। কারণ আত্মা না থাকলে এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হতেই পারত না। কিন্তু বহির্মুখ জীব সেকথা ভাবে না, নিজ নিকেতনের কথা ভুলে যায়, সর্বত্র সব কিছুই আসক্তির সাথে দেখে। এটাই বিকৃতির লক্ষণ। সেই বিকারগুলো এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও তার প্রভাব বলবার জন্যই ভগবান এগোচ্ছেন। ক্ষেত্র ও

তার ধর্ম্ম এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও তার ধর্ম্ম, এটা জানাই জ্ঞান। গুরুতেই ভগবান বলেছেন শরীরই ক্ষেত্র এবং সেই শরীরের জ্ঞাতাই ক্ষেত্রজ্ঞ। তারপর বললেন সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞকে ও আমাকে জানো। অব্যক্তাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বই প্রকৃতি, ওটাই ক্ষেত্র, সেজন্য অধ্যাত্মেও শরীরটাই ক্ষেত্র। একেবারে অব্যক্ত তত্ত্ব থেকে শুরু করে ভূতপ্রকাশ পর্য্যন্তই শরীর, নিজ নিকেতন। গুরুকৃপায় নিজ নিকেতনের কথা, নিজের কথা মনে পড়লেই ব্যকুল হয়ে সাধনায় মন দেয় ও নিজেকে জানতে ও চিনতে চেষ্টা করে। আর সে চেষ্টা যারা না করে তারা বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বউ, ছেলে এমন কি ছেলের বউয়ের লাথি ঝাঁটা খেয়ে কুকুরের জীবন যাপন করে চলে তা সে যত বড় ও বিত্তবান মানুষই হোন। আত্মা ছাড়া অন্য কিছুতে আসক্ত হলে যে কি দুর্গতি হয় তা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। এ দেহই প্রকৃতি। প্রকৃতিই জীবকে সংসারে টানে। এ সমস্তই দেহাসক্তি বশতঃ হয়ে থাকে। শ্রীগুরুদেবই নীলকণ্ঠ। এ আসক্তির বিষ তাঁর পায়ে দিয়ে নিজে অমৃতময় হও। তাহলে আর বিকৃত ভাবের মধ্যে এসে পড়তে হবে না। সাধনা করতে করতে ভিতরের দরজা খুলে গেলেই নিজেকে ও নিজের জায়গাকে চিনে নেওয়া যায়। এটাই হল নিজ নিকেতনে হাজির হওয়া। এভাবে আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হলে আর অন্য কিছুতেই আসক্তি হবে না। ১৩/৪

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ।। ৫

অনুবাদ: (যাহা) (বশিষ্ঠাদি) ঋষিগণ কর্তৃক নানা প্রকারে নিরূপিত হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র। (অন্য অর্থে, যাহা দ্বারা ব্রহ্মনিরূপিত হন মেরুদণ্ডস্থিত সেই সূত্র) এবং ব্রহ্মপদ (অর্থাৎ যদ্দারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞান করা যায় সেই ব্রহ্মপদ) এই উভয়দ্বারা ঐ (ঋষিগণ) যাহা নানা রূপে নিরূপণ করিয়াছেন, আর যাহা তাঁহারা যুক্তি বিশিষ্ট বিনিশ্চিত (অসন্দিগ্ধ প্রতিপাদক) অন্য বিবিধ বেদ সকল দ্বারা নানা প্রকারে বলিয়াছেন (তাহা সংক্ষেপে আমি তোমাকে বলিতেছি) ॥ ১৩/৫

ব্যাখ্যা: আগের দশম অধ্যয়ে দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন দেবগণও আমার আবির্ভাব অবগত নন, মহর্ষিগণও নন, যেহেতু আমি সর্ব্বভাবাতীত। এখানেও বলছেন ঋষিগণ নানা রকম ছন্দাদিতে স্থিরীকৃত করেছেন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বহু শাস্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ, বিশ্লেষণ, স্তুতি আদি করেছেন। বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তসূত্র সর্বত্র সিদ্ধান্তবাদীগণের সিদ্ধান্তে এই অতীব সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে সত্যিই, কিন্তু আলোচনায় এ ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। বড়জোর তত্ত্বগত ভাবে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞাদির বিভাগ পরিস্ফুটন ও সেগুলোর সামঞ্জস্য ইত্যাদি করা যেতে পারে মাত্র। প্রকৃত অর্থে ব্রহ্মতত্ত্ব জানতে হলে যাবতীয় আরাম, বিরাম, টেলিভিশন দেখা ইত্যাদি ছাড়তে হবে কেননা এজন্য রীতিমত তপস্যার প্রয়োজন। প্রাণায়ামাদি তপস্যার দ্বারা নাড়ীশুদ্ধ হলে তবে সত্যজ্ঞান প্রকাশ পায়। যদিও ঐ প্রকাশ আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। সাধনা করতে করতে শরীরের মধ্যে যে এক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয় ঐ শক্তিই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী, এঁকে জানতে হলে ত্রয়ীবিদ্যা জানতে হয় মানে প্রাণ, অপান ও ব্যানের ক্রিয়া করে সেই পরমানন্দ অবস্থা পেতে হয়। " ভূ র্ভূবঃ স্বঃ " ই এই ত্রিপদা গায়ত্রী। এই তিন লোক এক হলেই ব্রহ্মপদলাভ হয়। সাধন দ্বারা আগে মনকে অন্তর্মুখ করে নিতে হয় নইলে এ গুরুমুখী ব্যবহারিক অংশের আলোচনা দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠবে ॥ ১৩/৫

মহাভুতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।। ৬

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ।। ৭

অনুবাদ: মহাভূতসকল অর্থাৎ পৃথিবী আদি পঞ্চ (তাহাদের কারণভূত) অহঙ্কার, বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব), মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ)। ইচ্ছা দ্বেষ, সুখদুঃখ, শরীর জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা ও ধৈর্য্য – এই ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল (চতুর্বিংশতি তত্ত্ব) ॥ ১৩/৬-৭

ব্যাখ্যা: পঞ্চ মহাভূত বিশ্বের কারণ ঠিকই কিন্তু সকল ভূতের উৎপত্তির মূল সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্মঅণু থেকেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি। তারপর আবার আছে তাদের কারণ ভূত জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার দশ ইন্দ্রিয় ও তদগোচর পঞ্চতন্মাত্র। এইগুলো নিয়েই আমাদের সাধারণ প্রাকৃত জীবন কিন্তু এরাই আমাদের সত্তার সমগ্র বর্ণনা নয়, এটাই আমাদের বাস্তব জীবন হলেও আমাদের সম্ভাবনার শেষ সীমা নয়, আরও যা জানবার আছে তার জন্য আমাদের অন্তর্মুখী হতে হবে। অব্যক্তাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই সবিকার অপরাপ্রকৃতি। হৃদয়ই যেহেতু জীবের ভোগ ও বীজাশয় তাই হৃদয়ধর্ম্মগুলোও জীবাত্মারই আত্মগুণ কিন্তু প্রকৃতিসংযোগে জাত। হৃদয়ও ক্ষেত্রজ্ঞ থেকে পৃথক। যিনি জানেন ও ভোগ করেন তিনি ¬জ্ঞ" আর যেগুলোকে জানেন বা ভোগ করেন সেগুলো হল জ্ঞেয় বা ক্ষেত্র। অতএব হৃদয় ঘটিত বিষয়গুলোও সেই ¬জ্ঞ" পুরুষের জ্ঞেয়, তাহলে ইচ্ছা দ্বেষ এসকলও ক্ষেত্রের অর্ন্তভূক্ত। আত্মরূপে অবস্থিত প্রজ্ঞানঘন পরমপুরুষের পরাপ্রকৃতি ¬জ্ঞ"। তাঁর প্রভাব দুইভাবে অপরা প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে, – জানা ও বিধারণ করা। নির্গুণ অসঙ্গ ¬জ্ঞ" পুরুষ এই জানা ও

বিধৃতির দ্বারা ক্ষেত্রকে ভোগ করেন বা ক্ষেত্রতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। দর্শন, শ্রবণ ও ভোগাদি করা যেমন আত্মধর্ম্ম, তেমনি সেই বিষয় গুলোকে আত্মময় করে রেখে যে শক্তি ভোগ সংঘটন করে সেটাই প্রাণ বা ধৃতিশক্তি যা পরে ইন্দ্রিয় আকারে বিভক্ত ও প্রাণাদি নামে অভিহিত হয়। সেজন্য ঐ ধৃতি ও চেতনাও ভোগ্যের অন্তর্ভূক্ত ও ক্ষেত্র নামে অভিহিত। এক কথায় স্বয়ং প্রকাশ আত্মতত্ত্বের আত্মত্ব ভিন্ন অন্য যত প্রকার জ্ঞানায়তন, সমস্তই ক্ষেত্র ও নিরীহ চেতনই “জ্ঞ”। জীবাত্মা বা ক্ষেত্রস্থ “জ্ঞ” পুরুষও প্রকৃতি হওয়ায় তিনিও ব্রহ্মরূপ ভূমা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয় বা প্রকৃতি। আত্মতত্ত্বের স্বরূপধর্ম্ম গুলোকেও ভগবান ক্ষেত্রের ভিতরে রেখেছেন। তাই ক্ষেত্র বলতে ক্ষেত্র ও তার চেতন দুটোকেই বোঝায়; সাংখ্যে যা পুরুষ– প্রকৃতি, ব্রহ্মবাদে সেটাই পরা–অপরা প্রকৃতি যা বুঝতে হলে প্রথমে অন্তর্মুখী হতে হয় একথা আগেই বলেছি। ক্ষেত্রের জ্ঞানলাভে ক্ষেত্রজ্ঞ হলে তবেই এই সহজ সরল সত্যটা বোঝা যায় যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব মহাভূত এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মূলপ্রকৃতি ও দশ ইন্দ্রিয় আর মন ও ইন্দ্রিয়ের গুণস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র আর এ সমস্ত মিলে হল চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। এদিকে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও শরীর এবং চেতনা ও ধৃতি এসমস্ত নিয়েই শরীর ও জীবন। সুখেতে ও ইচ্ছাপূরণে জীবন, অপূরণে দ্বেষভাব যা থেকে দুঃখ আবার ঐ দুঃখ বা দ্বেষও তো সুখের জন্যই বৃত্তাকারে ঘটে। তাই সুখ পেতে গিয়ে দুঃখ আর দুঃখেতে হয় মৃত্যু। মৃত্যুর পরে আবার জন্ম, আবার মনোবৃত্তিরূপ চেতনা আর ধৃতি মানে জন্মের পর কিছুদিন থাকা। এইতো হল মোটামুটি ভাবে সহজ করে বিকারযুক্ত ক্ষেত্রের মানে শরীরের বিবরণ যা ভগবান অত সুন্দরভাবে বলেছেন। এটা উপলব্ধিতে এলে তবেই চেতনা একটা উচ্চস্থানে পৌছাবে যেটা হল নিজ নিকেতন। সেখান থেকে দেখবে এই ক্ষেত্র দেহ মন ইন্দ্রিয় সবই কেমন শুকনো কাঠের মতন তলায় পড়ে আছে ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের সব বিকার স্বপ্নে দেখা বিষয়ের মত অলীক হয়ে যাবে। যদিও এই ক্ষেত্রে সবটাই অলীক তবুও এ মিথ্যে প্রপঞ্চ অবলম্বনেই তো সেই নিজ নিকেতনে পৌছতে হবে। তাই এ সাধন পথে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানটা হলেই সংঘাত অর্থাৎ শরীর, চেতনা মানে চিদাভাস এবং ধৃতি, যে উপায়ে স্থিরতালাভ হয়, এ সবগুলোই আত্মজ্ঞান লাভের অবলম্বন হিসাবে কাজে লাগান সম্ভব হয়, যেহেতু “শরীর ধারণ হরির কারণ” ॥ ১৩/৬-৭

অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ।। ৮

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ।। ৯

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।। ১০

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ।। ১১

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ।। ১২

অনুবাদ: আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, পরপীড়া ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্ত র্ব্বহিঃশুচিতা, প্রাণের স্থিরতা এবং আত্মসংযম। ইহলোক পরলোকের সর্ব্বপ্রকার ভোগে অনাসক্তিরূপ বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্মমৃত্যু, জরা-ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের অনুদর্শন, পুত্রদারগৃহাদিতে অনাসক্তি আর তাহাদের সুখ অথবা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ জ্ঞান না করা এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্বদা চিত্তের একরূপত্ব (সমভাব)। আমাতে অনন্যযোগ (অর্থাৎ সর্বত্র আত্মদৃষ্টি) দ্বারা একান্তভক্তি, নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি (পবিত্র স্থানে থাকা) এবং মনুষ্য সমাজে বিরাগ (বিষয়াসক্ত লোকের সংসর্গ ত্যাগ), আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন – এই অমানিত্ব প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান বলে; আর যাহা ইহা হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান ॥ ১৩/৮-১২

ব্যাখ্যা : অষ্টম হতে দ্বাদশ শ্লোকে যে নৈতিক বা সাত্ত্বিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে তা হল জ্ঞানের সাধনদ্বারা সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি ও তার দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বার নিয়ন্ত্রণ। এর পরই আসে পূর্ণতম অনাসক্তি ও সমতার উচ্চতর অবস্থা, তখন ভিতরের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকলে বাইরের কোনও আঘাতই আর সাধককে স্পর্শ করতে পারে না। তখন দৃঢ়তার সাথে অন্তর্মুখী হয়ে যেগুলো সত্যিকার সারবস্তু তাতেই সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট হতে হয়, কারণ আগেই জ্ঞান হয়েছে যে আত্মা ক্ষেত্র হতে ভিন্ন এবং শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মার যে চেতনপ্রকাশ সেই চেতনা ও ধৃতি বা প্রাণশক্তিও ক্ষেত্র। এভাবে সম্যকভাবে ক্ষেত্রজ্ঞান লাভ হলে শেষ পর্য্যন্ত যে শুদ্ধ “জ্ঞ” স্বরূপটা প্রতিভাসিত হয় সেটাই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরাপ্রকৃতি। পরমাত্মা সেই নির্গুণ আত্মারূপে প্রতি ক্ষেত্রে চেতনা ও ধৃতি প্রভাবে অপরাপ্রকৃতিতে, বিভিন্ন জ্ঞানায়তনে থেকে গুণসঙ্গী হয়ে জগৎ ধারণ ও ভোগ করেন। তখন স্বতঃই জাগতিক অভিমান, দম্ভ , অহঙ্কার ইত্যাদিতে বিরতি আসে। শুধু জ্ঞানদাতা পুরুষ শ্রীগুরুদেবের চরণে অহর্নিশ সেবাপরায়ণ থেকে ক্ষেত্রাভিমানময় জীবত্বের দমনে, আত্মস্থৈর্য্য লাভ করতে, শরীরের জন্ম, মৃত্যু,

ব্যাধি আদি দোষ দর্শন করতে, বিষয় সুখে লোভ ত্যাগ করতে, নির্জ্জনে বসবাস করতে, স্ত্রী, পুত্রে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করতে, শুভাশুভ ব্যাপারে অবিচল থাকতে, ভগবৎভক্তি পরায়ণ হয়ে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, তত্ত্ব ও পরমার্থ দর্শনে রত থাকতেই সর্বদা আগ্রহী হয় এবং এ সমস্ত লক্ষণই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান থেকেই প্রকাশ পায়। মোক্ষসূচক এমনতর আচরণসকলই পরমজ্ঞান। ব্রহ্মতত্ত্বের স্থূলতম বিশ্বপ্রকাশ তো নিত্য উপলব্ধ কিন্তু সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম আত্মস্বরূপটাই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় হলেও সর্ব্বভূতের মূল ও সর্ব্বভোগসিদ্ধ। আত্ম ও অনাত্ম এই উভয়বিধ ব্রহ্মপ্রকাশ না বুঝলে, সেই বোধ হৃদয়ের উপর আধিপত্য না করলে, ব্রহ্মবেত্তা হওয়া যায় না। মনে ব্রহ্মবৃত্তি অখণ্ডাকারে প্রবাহিত করা কঠিন কারণ মনের বৃত্তি রোধ করা সহজ নয়। মনের বিষয়বৃত্তি থাকতে ঐকান্তিক ভাবে আত্মায় যোগস্থাপন হয় না। সেজন্য সর্ব্বদা আত্মক্রিয়া ও আত্মমননে সচেষ্ট থাকতে হয় আর এই পাঁচটা শ্লোকে তারই উপায় বলা হয়েছে। তীব্র চেষ্টাশীল ও বৈরাগ্যযুক্ত হওয়ার এটাই উপায়। এটাই মনের অব্যাভিচারী ভাব। আত্মাতেই সর্ব্বদা ক্রিয়া করা যা একমাত্র গুরুবাক্যের দ্বারাই লভ্য আর তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন মানে তত্ত্বজ্ঞানের অর্থই কূটস্থের দ্বারা জানা দেখা। এরই নাম জ্ঞান। এছাড়া আর যা কিছু সবই তো আসক্তিপূর্ব্বক দেখা, তাই এরই নাম অজ্ঞান। অনাত্মজ্ঞান তিরোহিত করার উপায়ই হল ক্রিয়া। এতে নিষ্ঠা না থাকলে অনুভবের জগৎ, বোধের জগৎ, বুদ্ধির জগৎ কিছুই খোলে না। মানুষ চালাকিকে বুদ্ধি মনে করে থাকে কিন্তু তা আসলে নয়। বোধের প্রকাশ ও প্রয়োগই বুদ্ধি যার মূলে আছে বোধশক্তি। প্রচলিত ও বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত ভাবীয় প্রকাশের সম্যকজ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ আচরণময় হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনকে একমাত্র যে "জ্ঞ" এর অভিমুখী হতে হবে সেটাই শ্বাশ্বতব্রহ্ম। সেই বিশুদ্ধ "জ্ঞ" তত্ত্বটা তত্ত্ববিৎকে কেমন স্বভাবসম্পন্ন করে সেটা বলে ভগবান এবার ব্রহ্মতত্ত্ব বলার দিকে এগিয়ে চলেছেন ॥ ১৩/৮-১২

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ।। ১৩

অনুবাদ: যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি, যাহা জানিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়; তিনি অনাদি,পর ব্রহ্ম, সৎও নহেন, অসৎও নহেন ॥ ১৩/১৩

ব্যাখ্যা: অনিত্য বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া বা প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যাবলী ও বিষয় সমূহে অভিভূত হওয়াই তো মৃত্যুকে স্বীকার করা। এসকল থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে এসমস্তের উর্দ্ধে যে নৈর্ব্যক্তিক অজাত সত্তা আছে যেটা আমাদের প্রকৃত সত্তা, নিজ নিকেতন, তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই সমস্ত জন্ম মৃত্যু এসবই সে শ্বাশ্বত সত্তার পক্ষে বাহ্যিক ঘটনা মাত্র। আর তাই ভালমত সমস্ত কিছু সম্যক উপলব্ধি করার পর এ সমস্ত ভোগ করলে সেটাও হয় জীবের অমৃতত্ত্ব। এমনতর উপলব্ধির জন্যই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনকে যে একমাত্র জ্ঞেয়ের অভিমুখী হতে হয় সেটাই হল শ্বাশ্বত ব্রহ্ম। তাঁতে নিবিষ্ট হতে পারলেই জীব তার স্বাভাবিক আদি ও অমৃতচৈতন্য ও লোকোত্তরতা ফিরে পায়। সাধনদ্বারা এই জ্ঞেয় বিষয়টাই ছয়টা শ্লোকে ভগবান বলেছেন এবং "যাঁকে জ্ঞাত হলে অমৃতত্ত্ব লাভ হয়" বলে সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করলেন। ব্রহ্মের পরা ও অপরা উভয় প্রকাশই অনাদি তাই "অনাদিমৎ" এবং সৎ-অসৎ আখ্যারও অতীত যদিও সেগুলোর প্রকাশ সৎ অসৎ হতে পারে কারণ সেগুলো ব্যক্ত ও অব্যক্ত বৈশিষ্ট্যময় কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব সৎ অসৎ এর অতীত কারণ ব্রহ্ম অবিষয়, অস্তি নাস্তির কোনওটিকেই আশ্রয় করে নেই। এই কূটস্থব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু। কূটস্থকে জানলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। দেহটা মরলেও কূটস্থেরতো মৃত্যু নেই তাই কূটস্থকে জানলেই জন্মমৃত্যুর খেলাটা শেষ হয়ে অমরত্ব লাভ হয়। আত্মার পরিচয় পেতে হলে ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিকে অসীম স্থিরতার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রাণের নিরোধ হলেই সেই সাথে মন বুদ্ধিও নিরুদ্ধ হয় তখন সেই স্থিরবুদ্ধির অভ্যন্তরে জ্ঞেয় আত্মাকে বোঝা যায়। এমন উপলব্ধিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার নিত্যচৈতন্য ভাব প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিষয়েন্দ্রিয়াদির অতীত চিন্মাত্ররূপ আত্মার উপলব্ধি করা অবশ্য কর্তব্য ॥ ১৩/১৩

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।। ১৪

অনুবাদ: তিনি(ব্রহ্ম) সর্ব্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবনেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩/১৪

ব্যাখ্যা: সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তি ও হাত পা ও উপাধি দ্বারা সকল ব্যবহারের আস্পদ হয়ে তিনিই একমাত্র সকলের মধ্যে, সবকিছুর ভিতর, বর্তমান। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং" রূপে সকল বস্তুতেই, প্রতি ঘটে ঘটে হাত, পা, চোখ, কান, মুখ, মাথা, ইত্যাদি বিশিষ্ট হয়ে সর্ব্বত্রই তাঁর অবস্থান। বেদবাক্যও তাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই যে তিনি সর্ব্বাত্মক এটাই এই পাঁচটা শ্লোকে ভগবান দেখিয়েছেন। সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ে তাঁরই অধিষ্ঠান। তাঁরই সত্তায় সত্তাবান হয়ে মন ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের অনুভব করে। সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয় তাঁরই শক্তিতে কাজ করে বলেই এমন দেখা, শোনা ইত্যাদি তাঁরই কাজ সকল হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ মনসমন্বিত অহঙ্কারই কর্ত্তা বলে ইন্দ্রিয়গুলো তার করণ। এগুলো থাকলে অহঙ্কার বশতঃই অভিমান আসে। তাই যোগাভ্যাসদ্বারা করণগুলোকে অকরণ করে ফেলতে পারলেই সবই যে আত্মা থেকে পৃথক এটা সুন্দরভাবে বোঝা যায়, যেহেতু দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকলেও আর তার বোধ হয় না। স্থিরপদ লাভ করে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হলে এক জায়গায় বসেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল সংবাদ জানা

যায়। অনেক অনেক দূরে বসে কে কি বলছে বা কোন জিনিষের ভিতর কি গুণ আছে সকলই জানা শোনা যায় কারণ তখন সকল জায়গাই একই স্থান। ভাল ক্রিয়া করতে পারলে এমন “একমেবাদ্বিতীয়ং” ভাবটা হয়। তখনই “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্” – সেই বিষ্ণুর পরমপদ মানে কূটস্থ দেখে থাকেন তাঁরাই যাঁদের সর্ব্বদা ক্রিয়া করায় যোনিমুদ্রার প্রকাশ হয়। ঐ সুরগণই সেই প্রকাশ সর্ব্বদা দেখেন। কাজেই সৃষ্টিপ্রকাশে সেই পরমাত্মাই যে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় হন, এটা উপলব্ধি করাটা কঠিন নয়। যে মহিমা থাকায় ইন্দ্রিয়েরা বিষয়াগ্রহী সেই মহিমাটার অর্থই ইন্দ্রিয়জনক তেজ। আত্মাই অনুভোক্তা সুতরাং অনুভোগশক্তি আত্মারই আর সেই শক্তিই ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব। এজন্যই বেদে “অপানিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ” বলা হয়েছে। আগের শ্লোকে বর্ণিত যে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বপ্রকাশে সর্ব্বত্র পাণিপাদময়, চক্ষুঃশ্রোত্রময়, শিরোমুখময় এটা বোঝাগেল। অনির্ব্বচনীয় প্রজ্ঞানতত্ত্বে আত্মা অনাত্মা এমন জ্ঞানবিভাগ নেই ॥ ১৩/১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ।। ১৫

অনুবাদ: তিনি ইন্দ্রিয়গুণ সমুদয়ের আভাসবিশিষ্ট অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারভূত, সত্ত্বাদি- গুণরহিত অথচ সত্ত্বাদি গুণের পালক ॥ ১৩/১৫

ব্যাখ্যা: প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি সেই বৃত্তি কার্য্যকরী হয় সেই ইন্দ্রিয়ের প্রাণের অস্তিত্বের জন্যই। প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর কার্য্যকারিতা আছে বলেই প্রতি ইন্দ্রিয়ের কাজগুলোও ঠিক ঠিক মত হয়ে চলেছে। তাই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে কোনও ইন্দ্রিয়ই আর কার্য্যকরী হয় না। বায়ুরূপী প্রাণই সকল আভাসবিশিষ্ট অথচ সেই প্রাণব্রহ্ম কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত। ইন্দ্রিয়েরা জ্ঞানের দরজা ঠিকই কিন্তু তারা নিজেরা নিজেরা কিছু বোঝে না, সে শক্তি তাদের নেই। দেহস্থিত আত্মার শক্তিতেই তাদের বিষয়জ্ঞান হয়। আগের শ্লোকে ব্রহ্মের বাহ্য ব্যক্ত বিশ্বরূপ বর্ণনা করে এ শ্লোকে তাঁর আন্তর রূপ বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয়সকল নিজেরা চেতন পদার্থ নয় কিন্তু চৈতন্য বস্তুর আধারস্বরূপ। এক সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানই পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়দ্বারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ রূপে অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়েরা এসমস্ত জ্ঞানকে ফুটিয়ে তুলতে পারত না যদি আত্মা না থাকত। তাই আত্মা গুণবর্জিত হয়েও গুণময়, সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বগুণের আভাসময়, অথচ সকল ইন্দ্রিয়াদিবর্জিত, নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্ববিধায়ক, গুণহীন অথচ গুণভোক্তা। আরও সহজেই এটা দেখা যায় অসঙ্গ আত্মত্বটা লক্ষ্য করলেই। আত্মতত্ত্ব চিন্তার সময় এ লক্ষণকটা মনে রাখতে হয়, আত্মার যথার্থ ব্রহ্মত্ব বুঝতে হলে নিজের অন্তরে লক্ষণকটা মনে রাখতে হয়, আত্মার যথার্থ ব্রহ্মত্ব বুঝতে হলে নিজের অন্তরে আত্মত্বের উপলব্ধির সময় এই ধর্ম্মাভাসগুলো সুপ্রকাশ আছে কিনা দেখবে। আত্মা যদি সকল ইন্দ্রিয় বা গুণের আভাসময় না হতেন তবে ইন্দ্রিয়ে ও গুণে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তেমন তেমন হতে পারতেন না। আগে ষষ্ঠ অধ্যায়েও বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে কিভাবে তিনি সর্ব্বভূতাকারে জ্ঞানপ্রকাশের কর্তা অথচ তা থেকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র। কূটস্থে লক্ষ্য রাখতে রাখতেই এই বোধ জন্মায়। যখন কিছু নেই তখন তিনি মহশূন্য, আবার যখন ব্যক্ত জগৎ তখন তিনি জগন্নাথ, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও সর্ব্বব্যাপক। কূটস্থরূপ চক্ষুকে না দেখলেই অন্ধের মত সব “আমার আমার” ভেবে মুগ্ধ হয়। ক্রিয়ার অভ্যাস করে এই মোহ থেকে মুক্ত হতে হয়। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হলেই ভোজ্য, ভোজন ও ভোক্তা সকলই এক হয় ॥ ১৩/১৫

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মাত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ।।১৬

অনুবাদ: তিনি জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন, স্থাবর জঙ্গমও তিনি, সূক্ষ্মত্ব জন্য অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়, অজ্ঞানীগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানীগনের নিত্য সন্নিহিত ॥ ১৩/১৬

ব্যাখ্যা: আগের দুটো শ্লোকে পরমাত্মার বাহ্য ও অন্তর এ দুটো রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্য প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্ব্বতঃ পাণি, পাদময়, চক্ষু ও শিরোমুখময় হয়ে বাহ্য প্রতিষ্ঠায় এবং নির্গুণ গুণোভোক্তা, ইন্দ্রিয় গুণাভাসময় ইন্দ্রিয়বর্জিত আত্মারূপে অন্তঃ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রথমটিতে ঈশ্বরমূর্ত্তি ও দ্বিতীয়টিতে আত্মমূর্ত্তির কথা বলে তারপর এখন এ শ্লোকে পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। পরমাত্মা অপরা প্রকৃতিরূপে ভূতের বাহ্য ও পরা প্রকৃতিরূপে ভূতের অন্তঃস্বরূপ। অপরাপ্রকৃতি যেখানে চরা – গতিশীলা, পরাপ্রকৃতি বা আত্মা সেখানে অচর ; এভাবেই জীবের অন্তর্বাহ্য চরাচরময়। অপরাপ্রকৃতিরূপে তিনি দূরে কিন্তু আত্মারূপে তিনি অন্তরে। বেদেও আছে –

“তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে অন্তিকে চ তৎ।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥”

এই বাহ্য প্রকৃতি জীবের পক্ষে বাহ্য কিন্তু ব্রহ্মবাহ্য নয়। জলতরঙ্গের জলই যেমন অন্তর ও বাহ্য তেমনই এ চরাচর বিশ্বের ব্রহ্মই অন্তর ও বাহ্য। অতিসূক্ষ্মতাবশতঃ এই ঈশ্বরত্ব সহজে জানা যায় না। যতক্ষণ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান আছে ততক্ষণ দুটো ভাগ থাকবেই। প্রকৃত জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুটো অবস্থাই থাকে। কিন্তু সূক্ষ্ম ও অবিজ্ঞেয় হলেও সেই ঈশ্বরত্ব জ্ঞেয়। কিন্তু কিভাবে জ্ঞেয়, সেটাই পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন ॥ ১৩/১৬

অবিভক্তঞ্চভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ।।১৭

অনুবাদ: জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত(জ্ঞানীর চোখে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চোখে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান) সেই জ্ঞেয় বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু (স্বয়ং নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তিশীল) ॥ ১৩/১৭

ব্যাখ্যা: আত্মরসিক প্রজ্ঞানঘন সেই পরমাত্মা অবিভক্ত হয়েও ভূতসৃজনে (জীবসৃষ্টিতে) নিজেকে নিজের মহিমা থেকে স্বগত ভেদময় করে ধারণ করতে সমর্থ। এটাই তাঁর ঈশিত্ব যা প্রতি বৈচিত্র্যে ভোগময় হবার জন্য অনুপ্রবিষ্ট হতে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞানকে স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করা মাত্র। এই বিভাগ অবলম্বনেই যত সৃষ্টি স্থিতি সংহারময় ঈশ্বরীয় লীলা তাঁর। অর্থাৎ আগে যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে সেই এক ব্রহ্মই সকল বস্তু বা ভূতে বর্তমান তবুও কাজের বেলায় আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যায়। যেমন সমুদ্র আর সমুদ্রের ফেনা দুটো আলাদা না হয়েও ফেনা হয়ে সমুদ্র থেকে আলাদা বলে মনে হয়। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরব্রহ্মে তফাৎ কিছু নেই তবুও ভিন্ন ভিন্ন আকাশের মত ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে হলেও আসলে তা নয়। বিভিন্ন শরীরে অবস্থিতির জন্য বিভিন্ন নাম রূপ ও উপাধিতে থাকেন বলে সেই সমস্ত দেহঘটের উৎপত্তি ও নাশের সাথে সাথে আমরা তাঁরও উৎপত্তি ও নাশ কল্পনা করে থাকি মাত্র। কিন্তু তা না করে সেই যে ব্রহ্ম তিনিই জ্ঞেয়, সৃষ্টিকালে তিনিই প্রভবিষ্ণু মানে নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তি হন, স্থিতিকালে তিনিই পোষক আবার প্রলয়কালে গ্রসনশীল মানে গ্রাসকারী। আত্মার অস্তিত্বেই জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব। "বিদ্যাহবিদ্যে ঈশতে বস্তু সোহন্যঃ" – তিনিই ভূমা আত্মা। সৃষ্টির দিকে শক্তির মধ্যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট, আত্মার ভূমা ক্ষেত্রে আত্মাতে শক্তি অনুপ্রবিষ্ট। এমন দেখেও কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ কল্পনা হয় না কারণ জ্ঞানস্বরূপতা এবং আত্মবোধ অন্তর্গত সর্ব্বজ্ঞান। বোধ যতরকমই হোক সেটা আত্মারই বিলাসমাত্র। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এর বিশদ আলোচনা হবে। সকল ইন্দ্রিয়ই আত্মবোধের অন্তর্গত, সর্ব্বগুণের আভাস ও জ্ঞনশক্তিও সেই আত্মারই। তবুও যতদিন দ্বৈতভাব থাকবে ততদিন এ অজ্ঞানও থাকবে আর দৃশ্যপ্রপঞ্চও বিলীন হবে না। আত্মা একই অখণ্ড সত্তা, অবিদ্যাবশতঃই তাতে নানাত্ব কল্পিত হয় আর বিভিন্ন দৃশ্যভাব দেখা যায় মাত্র, যার কিছুই সত্যি নয়। ব্রহ্মস্বরূপে কালের কল্পনাও নেই, ঘটনাও নেই, তাই ব্রহ্মকে মহাকাল বা মহাকালীও বলা হয়। তাই ব্রহ্ম উৎপন্ন করেন, পালন করেন, গ্রাস করেন এ সমস্তই বলার কায়দা মাত্র। যতদিন আপনাতে আপনি না থাকে ততদিনই ঐরকম বোধ হয়। যোগবাশিষ্ট রামায়ণেও আছে ততদিন পালকরূপে রক্ষা করেন, স্তাবকরূপে স্তব করেন, মৃত্যুরূপে হনন করেন, বিপন্নকে উদ্ধার করেন ইত্যাদি কিন্তু একবার যদি জগৎকে এই অনন্তের সত্তায় ও জ্যোতিঃতে দর্শন করা যায় তা হলেই ইন্দ্রিয় ও মনের সামনে জগৎটা যেমন দেখা যায় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে পড়ে। তখনই বোঝা যায় যে মন প্রাণ কিছুই জড়ের ঘূর্ণাবর্ত্ত নয় বা কোনও অন্ধ শক্তিরও খেলামাত্র নয় বরং যা দেখি তা এই শ্বাশ্বত ব্রহ্ম বিনা আর কিছুই নয় ॥ ১৩/১৭

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ।। ১৮

অনুবাদ: তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক) অজ্ঞান হইতে পর (তাহা কর্তৃক অস্পৃষ্ট) বলিয়া কথিত হন। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য (সাধনদ্বারা প্রাপ্য) এবং সর্ব্বজীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত ॥ ১৩/১৮

ব্যাখ্যা: জীব প্রকৃতির মধ্যে থেকেও সেই পরমাত্মারই অংশ কেননা পরমাত্মাই নিগূঢ় ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই সকলের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে বিরাজিত থেকে তাঁরই অভিব্যক্তি এই জগৎ ও জগতের কর্ম্ম পরিচালনা করছেন। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক ইত্যাদির জ্যোতিঃরও তিনিই প্রকাশক। শ্রুতি প্রমাণও তাই – "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়োমগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥" সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি দীপ্তিশীল নয়, সেই দীপ্তিশীলের দীপ্তি নিয়েই সকলে দীপ্তিমান, তাঁরই জ্যোতিতে সকলে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে রয়েছে 'আমি জ্যোতিঃ' তাঁর এমন প্রজ্ঞাই জ্যোতিঃরূপে প্রতিভাত। তমোময় এই যে বাহ্য অচেতন বিশ্ব, এরই অন্তরে আছে পরম প্রজ্ঞানময় বিশ্বমূর্ত্তি। তাই বলা হল "তমসঃ পরমুচ্যতে"। আবার "অদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" বলে এই অচেতন তমোময় বিশ্বমূর্ত্তির অন্তরে পরমপ্রজ্ঞানময় বিশ্বরূপ মহান পুরুষকে দেখেছেন। এই সহস্রসূর্য্যদীপ্তি স্তিমিতকারী পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতারূপে সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাঁর মত আর জ্যোতিঃ নেই, তাঁরই পর অন্ধকার। শুভ্রজ্যেতির জ্যোতিঃ তাঁকেই আত্মজ্ঞানীরা আত্মা বলে জানেন। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" ব্রহ্ম তিনরূপে মানে সর্ব্বরূপেই সকলের অন্তরে দীপ্তিমান্। যা কিছু জ্ঞেয় বা ভোগ্য বা দৃশ্যাদি তাও প্রজ্ঞান, যা কিছু জ্ঞান বা ভোগ অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্যের সংযোগ, তাও প্রজ্ঞান আর ভোর্ক্তৃত্বাদি প্রকাশে ত্রিবিধ প্রজ্ঞানের অভোক্তা প্রেরকরূপে যে মূলে অবস্থান, যিনি এই জ্ঞান প্রকাশের দ্বারাই গম্য বা প্রাপ্তব্য, তিনিও প্রজ্ঞানঘন। এই প্রজ্ঞানমূর্ত্তিই পরমাত্মা যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সত্তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। গুরুবাক্যগম্য সাধনা জেনে সাধন করতে পারলেই এই পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। জ্ঞেয় ব্রহ্ম স্থিররূপ। এই স্থিরতাকে অনুভব করতে পারলেই সমস্ত কিছুর অনুভব হয়। প্রথমে খুব জ্যোতিঃ তার মধ্যে অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র। তার মধ্যে যে গুহা আছে সেই গুহার মধ্যে বুদ্ধি স্থির হয়ে থাকে, হৃদয়ের বায়ুকে স্থির

করতে পারলেই জীব সেখানে স্থির হয়ে থাকে। ইনিই জ্ঞেয়, ভালোমত প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণ সুষুম্নায় গেলে অগ্নি অপেক্ষাও প্রজ্বলিত জ্যোতিঃস্বরূপ কূটস্থ দেখা যায় যা হল জ্ঞানগম্য গায়ত্রী ছন্দরূপা চতুর্থপাদ ব্রহ্ম। ক্রিয়ার অভ্যাসদ্বারা এখানে পৌঁছালে সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হওয়া যায়। যোনিমুদ্রায় অনেকক্ষণ থাকলে লিঙ্গমূল থেকে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু স্থির হয়ে থাকে। তখন ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা সমস্তই জানা যায় বিশেষতঃ কি ভাবে ঈশ্বর ও অধিপতি সেই ব্রহ্ম সকল ভূতের মধ্যেই আছেন ॥ ১৩/১৮

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ।। ১৯

অনুবাদ: এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হয় ॥ ১৩/১৯

ব্যাখ্যা: আত্মদর্শনই ভগবদ্দর্শন। নিজের মধ্যে এই আত্মনারায়ণের দর্শন পেলে সমগ্র জগৎকেই দেখে অনন্তের মধ্যে একটা তরঙ্গ এবং সবকেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলে, ভগবান বলে দেখে ভগবৎজ্যোতিঃ লাভ করে এবং প্রকৃতির খেলারূপ এ জগতের মধ্যে মুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক ভাবে এটাই মুক্তির রহস্য। অন্ততঃ নিচের প্রকৃতির বশ্যতা থেকে মুক্তি, প্রেম ও অধ্যাত্মজ্ঞান আমাদের মরপ্রকৃতি(mortality) থেকে অমৃতত্বে তুলে দেয় (sublimation to immortality)। এটাই উপসংহারের বক্তব্য। "শরীর ধারণ হরির কারণ"। শরীরই সাধন ক্ষেত্র। তাই শরীরই জানবার বিষয় অথচ এই ক্ষেত্রের জ্ঞান শারীর বিজ্ঞানীদেরও নেই। একমাত্র যিনি বিশেষরূপে ভক্ত, মানে যাঁর গুরুবাক্যে পূর্ণ আস্থা আছে তেমন ভক্তই শুধুমাত্র এটা জানবেন। ভগবদ্ভক্ত শরীর বা অপরাপ্রকৃতি জ্ঞান বা ভগবৎ জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণময় জীবের আচরণ ও জ্ঞেয় বা পরমাত্মার বিষয় জেনে ঈশ্বরীয় ভাবের পুষ্টি সাধন করেন। ভক্তির অবাধ প্রবাহে কোথায় থাকে তম আর কোথায় থাকে অজ্ঞানতা ? কে আর তাকে পারে জীবত্বে নিপীড়িত রাখতে ? প্রতি সংস্কারজাত ভূতদর্শন, ক্রিয়াদর্শন সবই আত্মময় প্রজ্ঞানরসে ভরে যায় । কিন্তু ক্রিয়া না করলে কিছু জানা যায় না আর কিছু না জেনে আপনা আপনি করলে প্রকৃত ভগবৎভক্তি আসে না। যেটুকু আসে সেটুকু শুনে শুনে আসা আবেগমাত্র। ক্রিয়া করবার আধার হল এই শরীর। শরীরে ৭২ হাজার নাড়ী আছে যার ভিতরে প্রাণ প্রবাহিত হয়ে জগৎবোধের সৃষ্টি ও জগৎলীলা অনুভব করায়। শরীরকে বুঝে নিয়ে, শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করে, তাঁরই কৃপায় যোগাভ্যাস করে, প্রাণক্রিয়াকে রুদ্ধ করে ক্রমশ তার গতিকে বিপরীতগামী করতে হয়। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসই সেই সাধনা। পরব্রহ্ম অবিজ্ঞাত বস্তু। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় না হলেও সেটা জ্ঞাতব্য। তাই সেটা জানতে হলে সাধন ও শাস্ত্র আলোচনা দুইই কর অবশ্যই গুরুবাক্য অনুসারে। তবেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, মানে দেহ ক্ষেত্রজ্ঞরূপা পরা প্রকৃতি, মানে জীব সম্বন্ধে জানা যায়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয় লাভ করতে হয়। ক্রিয়া ব্যতীত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয় না। এজন্যই গুরুভক্তি প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে যখন জ্ঞেয় বস্তুকে সাধনার দ্বারাই বুঝতে হবে তখন আবার ভক্তির কি প্রয়োজন ? ভক্তিই সর্ব্বপ্রথম উপাদান। ভক্তি বিনা শিষ্যের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। একমাত্র শ্রদ্ধাভক্তির দ্বারাই সকলচেষ্টা ফলবতী হয়। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহ সাধন প্রচেষ্টাই ভক্তি। পরাভক্তি বিনে সাধন হয় না। সমস্তই নীরস বোধ হয় অথচ ভক্তি রসাপ্লুত হলেই সাধন করা সহজ হয়। এমন ভক্তি সহকারে সাধন করলেই মনে একটা নেশার ভাব আসে যা থেকেই পরাবস্থার উদয় হয়। একেই উন্মনীভাব বলে। তখন শরীর স্নিগ্ধ হয়। সদাতৃপ্ত দৃষ্টি থাকে শূন্যে স্থির। তখন হৃদয়েতে যে ১০০ নাড়ী আছে তারও উপরে যে একটা নাড়ী আছে তার মধ্যে প্রাণ প্রবেশ করায় বিশ্ব সংসারকে ব্রহ্মময় বলে অনুভব হয়। তখন সর্ব্বদা আনন্দে থাকে। সর্ব্বদা নেশার মত মনে হয়, কোনও রকম আকর্ষণই বোধ হয় না। আত্মাতে ভক্তি হওয়ায় কেশ ও লোমসকল উত্থিত হয়। এমন সদাতৃপ্ত যোগীর কোনও সংকল্প থাকে না, যা কিছু করে সবই অনিচ্ছার ইচ্ছায়। নিজের কোনও ইচ্ছাই থাকে না, তাই নিজের ইচ্ছায় কিছুই করে না। ১৩/১৯

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ।। ২০

অনুবাদ: প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে জাত জানিবে ॥ ১৩/২০

ব্যাখ্যা: শাশ্বত ব্রহ্মের দুটো দিক প্রকৃতি ও পুরুষ। এই দ্বৈতভাবের উপরই জগৎলীলা প্রতিষ্ঠিত। তাই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানলাভে এই প্রকৃতি পুরুষের সংসার হেতুত্বটা ভগবান পাঁচটা শ্লোকে বিশদভাবে বলেছেন। যদিও প্রকৃতি পুরুষের এ জগতের এই সব খেলা, গুণসমূহ ও তাদের দ্বারা উৎপন্ন রূপসকল সাধারণ দৃষ্টিতে সদা পরিবর্ত্তনশীল বলে মনে হয়। শুধু তাই নয় পুরুষ ও প্রকৃতিও তাদের সাথে সাথেই পরিবর্তিত হচ্ছে বলে বোধ হয় যদিও আসলে তেমন কিছুই নয়। কেননা দুটোর কোনওটারই কোনও আদি নেই অর্থাৎ যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। এর কোনও গোড়া নেই। দুটোই এক। প্রকৃতি আর তার অধীশ্বর এ দুটো শক্তিই শাশ্বত। প্রকৃতি হলেন শরীর আর কূটস্থই পুরুষ। কূটস্থ না থাকলে শরীর হতে পারে না। ক্ষেত্ররূপা অপরা প্রকৃতিই ঈশ্বরের মায়াশক্তি– সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণরূপা, আর ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই এই ত্রিগুণের খেলাধূলোর জায়গা। আর মূলে রইলেন

সেই এক আত্মা, স্থিরভাবটাই ঈশ্বরভাব, অনাদি অন্তহীন, সুতরাং ঈশ্বরের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্বরূপা দুটো প্রকৃতিই অনাদি। "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" আগেই বলা হয়েছে। এই অনাদি মহিমাতেই তাঁর নিত্য ঈশ্বরত্ব, বহু হবার শক্তি এবং একটা সর্ব্ববিধ জ্ঞানায়তন বোধ করার শক্তি, নিজের ভিতর নিজের আত্মবোধকে বহু আত্মরূপে জ্ঞানক্রিয়ানুপ্রবেশের জন্য বিভাগ করা। সর্ব্ববোধাত্মিকা অনাত্মনামীয়া প্রকৃতিও চিদরূপা আত্মশক্তির আর এক দিক, এও অনাদি। প্রকৃতি পুরুষ এই দুই অনাদি মহিমার নামরূপ ক্রিয়াত্মিকা শক্তিবিলাসই জগৎ ব্যাপার। সেই ক্রিয়ার গুণ ও বিকারসকল ঐ অনাত্ম প্রকৃতি হতেই জন্মে। আর প্রকৃতি বিকৃত হয়েই পঞ্চভূত একাদশ ইন্দ্রিয় মিলে ষোড়শ বিকার উৎপন্ন করে। পাঠক হয়ত বলবেন সর্ব্বদা শুদ্ধ সর্ব্বদোষ বর্জিত আত্মা কি করে দোষযুক্ত শরীর হতে পারেন ? উত্তরে সেই একই কথা বলতে হয় আত্মা (জীবাত্মা) ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, মন কিন্তু চঞ্চল বাসনাময় হয়ে স্থূল ভূতাদি রূপে পরিণত হয়, আসক্তিবশতঃ কামনা দ্বারা কাম্যবস্তু সৃষ্টি করে। জন্মজন্মকৃত ফল অনুসন্ধানে কর্ম্ম ও তার ফলভোগের জন্য বারবার জন্মে ও মরে। আবার এই মন কামনারহিত হলেই ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং যতদিন মনে আসক্তি থাকে ততদিন শরীর মানে প্রকৃতি আর সাথে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কূটস্থ থাকবেনই। সাধনদ্বারা পরাবস্থায় গেলে আর'আমি আমার' থাকে না তাই ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রজ্ঞ কিছুই থাকে না। গুণ এবং বিকার প্রকৃতি হতেই জন্মে। বাঙ্ময়, প্রাণময় ও মনোময় অভিব্যক্তিই সেই গুণত্রয় যাকে সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ বলা হয়। বিকার মানে হল এই ত্রিবৃৎ বা তিন রকম জ্ঞানপ্রকাশবৈচিত্র্য যা থেকে শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চতত্ত্ব অধ্যাত্মে ও অধিদৈবে জাত হয়। সুতরাং সমস্ত বিকারই অনাত্ম প্রকৃতি হতে সম্ভূত আর ভোর্ক্তৃত্বের বিকারগুলো হয় পুরুষে বা ক্ষেত্রজ্ঞে। প্রত্যয়ের ভোর্ক্তৃত্বরূপা প্রত্যয়ানুপ্রবিষ্ঠতা যেটা সেটা ঘটে ঐ পুরুষে। কাজেই সকল প্রকার বিকারই প্রকৃতিসম্ভব। প্রকৃতির বিকারে পুরুষ আচ্ছন্ন থাকে যদিও কূটস্থ পুরুষে কোনও বিকার সম্ভবে না কিন্তু ঐ " অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" অজ্ঞানান্ধ জীব জন্তু হয়ে বসে থাকলে আর কূটস্থজ্ঞান আসবে কোথা থেকে ? যেহেতু সকল ভোগই প্রকৃতি থেকে তাই ভোর্ক্তৃত্বের বিকারে পুরুষত্ব আচ্ছন্ন হতে পারে, অতএব সাধু সাবধান। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হলে এই বিভাগটা দেখা যায়, বোঝা যায় ও অনাত্মজ্ঞানবিলাসের তলে আত্মরূপে পরমাত্মত্ব ও পরমেশ্বরত্বের অসঙ্গ অবস্থানটা লক্ষ্য করা যায় এবং সেই আত্মা থেকেই যে ভোক্তা জীব উৎপন্ন হয়ে তাঁতেই অবস্থান করছে এটা প্রত্যক্ষভাবে জানা ও বোঝা যায়। কিন্তু অস্মিতাদি অনাত্মবিলাসের তলে এ আত্মত্ব বোঝা যায় না, যেমন ঘুমের ভিতর নিজত্বের বোধ থাকেনা। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হলেই বুঝবে যে বিকার ও ভোক্তারূপ অনাদি শক্তিদ্বয় পুরুষ ও প্রকৃতিকে নামরূপ ক্রিয়াত্মক বিশেষভাবে ব্যক্ত করে তাঁরই এই ঐশ্বর প্রকাশ ॥ ১৩/২০

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ।। ২১

অনুবাদ: কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন; আর পুরুষ সুখ দুঃখাদির ভোর্ক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হন ॥ ১৩/২১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে বিকারগুলো সব প্রকৃতিজাত এখন পুরুষের সংসার হেতুটা কিরকম সেটা বলছেন। প্রকৃতি কর্ম্ম করে সৃষ্টি করে আর পুরুষ সেই কর্ম্মের স্বাদ পায়, রস আস্বাদন করে ও ভোগ করেন। এতে প্রকৃতিরও সার্থকতা কিন্তু প্রকৃতির যে নিচের রূপ যা অপরা প্রকৃতির খেলা সেখানে এই দিব্যভোগ বিকৃত হয়ে ক্ষুদ্র সুখে দুঃখে পরিণত হয়। বেদের কথায় "অথ য আত্মা, স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভোদয়।" মানে হল লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, সে জন্য ইনি বিধৃতিস্বরূপ রয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কার্য্য ও কারণের উপাদানকারণ অপরাপ্রকৃতি, ভোর্ক্তৃত্বের উপাদানকারণ পুরুষ। পরমাত্মা একদিকে জ্ঞানশক্তি অপরা প্রকৃতিকে ব্যক্ত করে, অস্মি থেকে পঞ্চভূতাত্মক শরীর সৃষ্টি করে আধাররূপে ("আধারভূতা জগতস্তমেকা"– চণ্ডী) অবস্থান করেন। অন্যদিকে নির্গুণ আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে তার অন্তরে থেকে তা থেকে ভোক্তা জীব সেজে সেই আধার ভোগ করেন। সে জন্যই বেদের কথার প্রকৃত অর্থে এই নির্গুণ স্বরূপটাই জীব ও পরমাত্মার সংযোগ বা সেতুর মত। অর্থাৎ একদিকে প্রকৃতিকে পরিচালনা করে কার্য্য ও কারণের উপাদান কর্তৃত্ব রচনা করেছেন অন্যদিকে আত্মত্বকে পরিচালনা করে সেই প্রকৃতিকে ভোগ করতে নিজেই তাতে অনুপ্রবেশ করেছেন। এ বিশ্ব তাই আত্মময়, আত্মা ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষেত্রকে আমার বলে অভিমান করেন তাই সুখ দুঃখাদি ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। নইলে অসংলিপ্ত নির্ব্বিকার কূটস্থ পুরুষের আবার ভোগ সম্ভব হয় কি ভাবে ? সেটা হয় ঐ অধ্যাসবশতঃ, প্রকৃতির মধ্যে চেতন পুরুষের অধিষ্ঠানবশতঃ, আপনাতে আপনি না থেকে সংসার দৃষ্টিদ্বারা আবদ্ধ হওয়ার কারণে। কূটস্থ চৈতন্য না থাকলে এমন সব সুখ দুঃখ ভোগ সম্ভবই ছিল না। তাই এই কূটস্থ চৈতন্য পুরুষকেই সুখ দুঃখ ভোগের হেতু বলা হয়েছে। পাঠক এখানে প্রশ্ন করবেন পুরুষতো অবিকারী ও জন্মরহিত তবে তা সত্ত্বেও তার ভোর্ক্তৃত্ব কি করে সম্ভব হয় ? এর উত্তর দেখুন পরের শ্লোকে ॥ ১৩/২১

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ।। ২২

অনুবাদ: যেহেতু পুরুষ প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন এই পুরুষের সদ্‌সদ্ যোনিতে যে জন্ম সে বিষয়ে সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিনগুণের সংসর্গই কারণ। ১৩/২২

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন ছিল অবিকারী ও জন্মরহিত পুরুষের ভোর্ক্তৃত্ব কি করে সম্ভব ? তারই উত্তর এই শ্লোকে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ মানে হল প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ। প্রকৃতি ভোগের জন্যই বা নামরূপ প্রকাশের জন্যই তাঁর জীবাত্মারূপে প্রকৃতি অনুপ্রবেশ যার অর্থই হল তদাত্ম্যভাব পাওয়া। তাহলে প্রকৃতির কার্য্যদেহে তদাত্ম্যভাবে অবস্থান করলে প্রকৃতিজাত গুণ মানে দেহজনিত সুখ দুঃখ এ সমস্ততো ভোগ করতেই হয়। তদাত্ম্যভাব পাওয়া মানেই তৎসারূপ্য উপলব্ধি করা, নিজেও যেন তাই এমনি ভাবে থাকাটাই অনুপ্রবেশ। এই ভাবের প্রকৃতিসারূপ্যে অভিনিবেশই তো গুণসাক্ষী হওয়া। এমনভাবে প্রকৃতি গুণমোহিত কর্ম্মহেতুই তার ফলের আশা এবং সেই ফললাভের প্রবৃত্তি থেকেই সৎ অসৎ যোনিতে জন্ম হওয়া। ভোগের বৈচিত্র্য থেকেই বিচিত্রযোনি আর বিচিত্র যোনির অনুরূপ ফলভোগও বিচিত্র। তাহলে এই গুণসঙ্গতার জন্যই সৎ অসৎ যোনিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ যার শেষ নেই, সীমা নেই, বিরাম নেই। কত কত রকম কথা হল, আলোচনা হল, শাস্ত্ররচনা হল, কত যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা আবিস্কৃত হল, কতরকম সব অজ্ঞান ধ্বংসকারী ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হল কিন্তু তবুও এ বদ্ধ জীবত্বের শেষ হল না। এতই কঠিন, এতই দৃঢ় এই গুণসংযোগ। এটাই জীবত্বের ব্যথাতুর জীবনছবি। তবে একটা কথা বলি যে এটা যেমন ঠিকই কিন্তু এর চাইতেও নিগূঢ় আরও একটা তত্ত্ব কিন্তু এরই অন্তরে, এরই ভিতরে আছে। সেটা পাবেন এর পরের শ্লোকে। এখানে যে গুণসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে সেটা একটা বাইরের দিক থেকে উপর উপর সামান্য লীলা বিলাস মাত্র ॥ ১৩/২২

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতিচাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ।। ২৩

অনুবাদ: এই প্রকৃতি-কার্য্যস্বরূপ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি কার্য্য দেহ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তদ্‌গুণে যুক্ত নহেন। যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা(সাক্ষীমাত্র), অনুমন্তা(অনুগ্রাহক), ভর্ত্তা(ভরণকর্ত্তা), ভোক্তা(প্রতিপালক), মহেশ্বর(ব্রহ্মাদিরও অধিপতি) এবং অন্তর্য্যামীস্বরূপ ইহাও উক্ত আছে ॥ ১৩/২৩

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল যে পুরুষই (জীবাত্মারূপে) সুখ দুঃখ সকল ভোগ করে থাকেন। এই শ্লোকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আত্মপ্রজ্ঞারসঘন পরম ব্রহ্ম পুরুষই এই দেহে তিন ভাবে আছেন -- পরমাত্মস্বরূপে, ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বররূপে এবং জীবরূপে যে কথা সকল শাস্ত্রেই বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দশম শ্লোকেও দেখুন তাঁর থেকেই সৃষ্টি তত্ত্ব, তাঁর হুকুমেই জগৎ চালিত, তিনিই ভরণপোষণের কর্ত্তা, জীবত্ব

অপেক্ষা সত্য ও জীবত্বের আশ্রয়স্বরূপ, জীবত্বের মূলে সংস্থিত জীবের স্বরূপটী শুদ্ধদ্রষ্টা। সেই শুদ্ধদ্রষ্টা পুরুষই অনুদ্রষ্টা, অনুমন্তা বা অনুভোক্তা, অনুপ্রবিষ্ট জীব সাজেন। যদিও এটুকুই তাঁর জীবত্ব কারণ তিনিই আবার জীবত্বের ভর্ত্তা ও চরাচর গ্রহণে ভোক্তা মহান ঈশ্বর। দেহে জীবরূপে অবস্থিত হয়েও জীবমাত্রই নন। তিনি পরমাত্মা, ভর্ত্তা মহেশ্বর "পরম" পুরুষ এই দেহপুরীতে শয়ন করে আছেন। তিনি ক্ষেত্র মানে শরীরকে জানেন তাই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই পরমাত্মারই গৌণনাম হল প্রাণ। প্রাণের সাধনা দ্বারা প্রাণস্থির হলেই দেহ হতে স্বতন্ত্র সেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায় যিনি দেহে থাকলেও দেহ হতে স্বতন্ত্র। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেদিত হলেই এই গুণসঙ্গী জীবত্বটা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হয়। ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরের বিষয়ে জানতে পারলেই শরীর মধ্যস্থ কূটস্থর জ্ঞান হয় তখন আর এ জীবত্ব তার ওপর আধিপত্য করতে পারেনা। ফলে বাহ্যবস্তুতে সংসক্তি লুপ্ত হয়ে একটা কেমন যেন শিশুর মত অবস্থা হয়। তখন আর কালের ব্যবধান থাকে না। নৈর্ব্যক্তিক ভাবের দ্বারা ভিতরের অনাদি অজাত আত্মার সাথে এক হয়ে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। কি ভাবে সেটাই পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে ॥ ১৩/২৩

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ।। ২৪

অনুবাদ: যিনি এই প্রকার পুরুষকে জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন তিনি যে কোন প্রকারে অথবা যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মান না অর্থাৎ মুক্ত হন ॥ ১৩/২৪

ব্যাখ্যা: আগে যেমন যেমন বলা হল তেমন প্রকৃতি পুরুষ বিবেকবানই প্রকৃত জ্ঞানী কারণ সে আত্মারূপী পুরুষকেই পরমাত্মা ও পরমেশ্বর বলে জানে, এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকারকেও জানে তাই তার পুনর্জন্ম বা দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না। পুরুষ যেখানে জীবের অব্যক্ত সংস্কারে অধিরূঢ় সেই অক্ষর ভূমিতে তাকে দেখাটাও সেই অব্যক্ত সংস্কাররাশির দর্শন যেটা দেখলেই জীবের ধ্রুবাস্মৃতি উদ্ভাসিত হয়, ফলে সংস্কারগুলো আর তার উপর আধিপত্য করতে পারেনা বরং তাঁরই অধীন জ্ঞানক্রিয়ারূপে উপলব্ধি হয়। অপরপক্ষে পুরুষের ভূমা সত্তা বা আত্মবোধের অভ্যন্তরেই অনাত্ম জ্ঞানাত্মিকা অপরা প্রকৃতি ও অনন্ত জ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতি বা পরা প্রকৃতি সবই অন্তর্হিত হয় এবং পরমাত্মা ও পরমেশ্বরের একত্বটাই ফুটে ওঠে যার ফল হল ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রাহ্মীস্থিতি হলেই পুনর্জন্ম থেকে রেহাই। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন যে অত সহজেই পুনর্জন্ম থেকে রেহাই পাওয়া গেলে প্রারব্ধ কর্ম্মের কি হবে ? তার ফল প্রসব করবে না ? উত্তরে বলি রহস্যটা একবার জানা হয়ে গেলে আর কর্ম্মও থাকে না ফলও থাকে না। "ন স ভূয়োহভিজায়তে"। নতুন করে কর্ম্ম সঞ্চিত হয় না যেমন,

তেমনই দৃষ্টিটা সংস্কারগ্রন্থি পর্য্যন্ত মুক্ত হলে প্রারব্ধও আপনিই ক্ষয় হয়ে যায়। ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান সম্যক হলেই অহৈতুকী ভক্তির প্রকাশ হয়। এবং সেই ভক্তিস্নাত অন্তরে ধ্রুবাস্মৃতি উদ্ভাসিত হয় তখন তার কৃত কর্ম্মগুলো, তা সে যেমন কর্ম্মই হোক, আর পুনরাভিজাত হয় না যেহেতু ভাল মন্দ ইতরবিশেষ নির্ব্বিশেষে সবই ভগবদকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। এর ভিতর আর কোনও রহস্য নেই, এটাই বিজ্ঞান। তবে উপলব্ধিটা যত স্পষ্ট ও ব্যাপক হয় ফলাফলটাও তেমনই হয় কারণ পরমাত্মার সান্নিধ্যও তেমনটাই হয়ে থাকে, এর পরই ভগবান বলছেন যে শুধু শুনেও মানুষ এ অবস্থা থেকে বের হতে পারে। এ থেকেই বোঝা যায় যে উপায় যাই হোক না কেন ফলাফল নির্ভর করে আত্মস্থ হয়ে পরমাত্মসন্নিধানে স্থিতির ও তার উপলব্ধির উপর। বেশি নয়, ১৭২৮ বার প্রাণায়াম কর। বাকিটা নিজেরই উপলব্ধিতে চলে আসবে। বেশি কথায় কাজ কি ? ১৩/২৪

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ।। ২৫

অনুবাদ: কেহ কেহ ধ্যানযোগে দেহেই দিব্যচক্ষুদ্বারা আত্মাকে দেখেন, অন্য কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা, আর কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ॥ ১৩/২৫

ব্যাখ্যা: সাধনায় গভীরতা ও আন্তরিকতা তথা নিষ্ঠার তারতম্যেই ফলের তারতম্য একথা আগেই বলা হল। এখন এ শ্লোকে এমন উপাসনার প্রকারভেদের কথা বলা হয়েছে। শুরুতে অবশ্য সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগাদি অথবা অন্য কোনও যোগ অবলম্বন করা যেতে পারে কিংবা কারও কাছ থেকে শুনে এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই উপদেশমত মনকে তৈরী করে গড়ে নিয়েও এই জ্ঞান লাভ করা যায়। আগেও বলা হয়েছে যে উপায় যাই হোক না কেন উপলব্ধিই প্রধান প্রাপ্তি। তবে কেবলমাত্র মৌখিক বিচার নিয়ে পড়ে থাকলে কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসে স্থিত হয়ে সাধনা করতে করতে তবেই আত্মাদ্বারা আত্মাকে দর্শন করা যায়। এই সাধনা ও অন্যান্য সাধনার ক্রমগুলোর বিষয়ে পরে বলা হবে, আর সবগুলোকেও একই সাথে শুরু করা যেতে পারে তাতে নিরোধ অবস্থাটা আরও সহজ ও তাড়াতাড়ি হবে। জপের সাথে সাথে প্রাণায়াম করলে মনের বহির্বিচরণ কমে যায়, চিত্ত একাগ্র হয়। পরে চিত্ত বিশেষভাবে অন্তর্মুখী হয়ে নিরোধ হলে সেটাই ধ্যানাবস্থা। ধ্যান গভীরতর হয়েই হয় সমাধি। সেটা অনেক পরের কথা। তখন কেবল আত্মক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থিতি লাভ করে ভোঁ হয়ে থাকেন। এটাও প্রাণায়ামেরই ফল। তবে শ্রবণ, মননাদিও অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যেই পড়ে। তাই হরি কথা অর্থাৎ শাস্ত্র আলোচনার শ্রবণ মননও নিঃসন্দেহে দরকার। মাঝে মাঝে যোগসম্মিলনে অংশগ্রহণ করতে হয়। গুরুপদেশে বেশি মাত্রায় প্রাণায়ামের দ্বারা আত্মজ্যোতিঃ নিয়মিতভাবেই দর্শন হয়ে থাকে ॥ ১৩/২৫

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ।। ২৬

অনুবাদ: কিন্তু কেহ কেহ এই প্রকারে অর্থাৎ সাংখ্য যোগাদি দ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া আচার্য্যাদির নিকট আত্ম কর্ম্মের উপদেশ পাইয়া উপাসনা করেন। তাঁহারাও সেই কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ওঁকার ধ্বনি শ্রবণপরায়ণ হইয়া মৃত্যু অতিক্রম করেন ॥ ১৩/২৬

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে যাঁরা বিজ্ঞানপ্রধান সাধনাগুলো, যা আগের শ্লোকে বলা হল, করতে অপারগ তাঁদের নিস্তারের উপায় হিসাবে সাধারণ তত্ত্ববিজ্ঞান নিরপেক্ষ সাধনার কথা ভগবান বলেছেন। নিম্নস্ত রীয় হলেও সেগুলো কিছুটা ফলপ্রদ তো বটেই। যাঁদের জ্ঞানধারণাটা মোটেই নেই আবার তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতেও পারেন না তাঁদের কি হবে ? তাঁরা উপদেষ্টার মুখে শুনে শুনে শ্রুতিপরায়ণ হবেন। গুরু উপদেশে নিষ্ঠা ও সেই নিষ্ঠাজাত আন্তরিকতার সাথে উত্তম ভক্তি সংযুক্ত হলে সদগুরুসত্তা থেকে করুণাসম্ভূত শক্তি জাত হয় যা তাঁর হৃদয় আকাশকে উন্মুক্ত করে। ফলে তার বিনা চেষ্টাতেই অপৌরুষেয় বেদন আবির্ভূত হতে থাকে। যারা কোনও তত্ত্বই জানেন না অথচ পরম ভক্ত তাঁদের ভগবম্মহিমা শ্রবণনিষ্ঠা থেকে সহজ সরল হৃদয়ধর্ম্ম স্বতঃ প্রবাহিত হয়ে সকল দরজা খুলে দেয়। আর সে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের অন্তরস্থ তত্ত্বপুরে প্রবেশ করে বসে। যদিও তখনও সে জানে না যে সে কিছু জেনেছে বা বুঝেছে। কাকে বলে আত্মা, কিই বা পরমাত্মা, কাকে বলে ব্রহ্ম, এ সকল কোনও কিছু না বুঝেই বিনা প্রয়াসে অমৃতপুরের অমৃত লাভ করে। আর অজ্ঞ এবং তত্ত্ব দর্শনে অপারগ হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত সুকৃতির বশে অতি সাহসী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও গুরুউপদেশে বিনা তত্ত্ব দর্শনেই এগিয়ে চলেন তাঁদের তো কথাই নেই তাঁরা গুরুদেবের কথাগুলো শুনে কোনও একটা কিছু মনে স্থির করে এবং কিছু না বুঝেও চোখ কান বুজে একেবারে বিচারবুদ্ধিশূন্য হয়েও বিনা বিচারে বিনা চিন্তা ভাবনায় শুধুই ক্রিয়া করে চলে, তা সে যতই শুকনো মরুভুমির মত হোক, তাতে লাভ এটাই হয় যে ধীরে ধীরে, এক সময় না এক সময়, তাঁদেরও প্রাণ, অপান ও ব্যানের গতি সাম্য হয় ফলে তাঁরাও স্থিরত্বপদ পেয়ে থাকেন। আহা কি ভাগ্য! দেখ মন্দ অধিকারীদের জন্যও কি সুন্দর নিস্তারোপায়। কি করে এমনটা হয় ? অজ্ঞের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন কি করে হয় ? উত্তর একটাই, অসংশয়ের নিঃসংশয় ভাগ্যলাভ। কারণটা তো খুবই সোজা। যখনই কেউ কোনও উপায়দ্বারা সমগ্র চেতনাকে একমুখী করে তখন সেই চেষ্টার ঘনত্ব ও গভীরতায় সেই তত্ত্ববিজ্ঞান না জানলেও দেখা

যায় যে তার সকল চেষ্টা নিজের ভিতর নিজের জ্ঞানেই উদ্বেলিত হচ্ছে এবং তার কাতর অন্বেষণ তাকে আকাশ পাতাল দশ দিক ঘুরিয়ে নিজেরই মূলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর নিষ্ঠাবান শিষ্যের পক্ষে থাকে অতিরিক্ত এক সংযোজন যার নাম গুরুশক্তি বা গুরুবল। তাই তত্ত্ববিজ্ঞাতা পুরুষের মতই তারও দিব্য চোখে তত্ত্ব সকল প্রকাশ পেতে থাকে যার ফললাভও সেই একই – প্রকৃতি ও পুরুষ বিজ্ঞান যা থেকে হয় অপুনরাবর্ত্তনরূপ পরাগতি। সুতরাং যে ভাবেই হোক না কেন, চেষ্টা থাকলেই মৃত্যুময় জীবন থেকে উদ্ধার পেয়ে অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায়। শুধু মন ও মুখ এক করে এ ইচ্ছাকে ফলবতী করতে হয় ॥ ১৩/২৬

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।। ২৭

অনুবাদ: হে ভরতর্ষভ, যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তৎ সমুদয় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই হয় জানিও। ১৩/২৭

ব্যাখ্যা: আগে ১৩শ শ্লোকে "যজ্‌জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে" মানে যা জেনে মোক্ষ লাভ করা যায় সেটা কি ? সেটাই জীব ও পরমেশ্বরে অভেদজ্ঞান। এমনতর জ্ঞানই হল মোক্ষের সাধন। এই সিদ্ধান্তের হেতু কি সেটা দেখাতেই এই শ্লোকের অবতারণা। যা কিছু বস্তু সঞ্জাত মানে উৎপন্ন হয় সবই সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে জাত বা উৎপন্ন হয়। যেখানে যা কিছু চরাচরে অভিব্যক্ত বা অব্যক্ত আছে সে সমস্ত তাঁরই মহিমাদ্বয়, পরা ও অপরারূপ শক্তিপ্রকাশ, দিয়েই এমন স্থাবর জঙ্গম রচিত হয়েছে। আত্ম ও অনাত্ম এই দুরকম প্রকাশই সকল অস্তিত্বের উপাদান।পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেই এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এখানে পাঠক প্রশ্ন করবেন এমন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের তাৎপর্য্য কি ? তাৎপর্য্যটা লক্ষ্য করুন। ক্ষেত্র স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আর ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু অধ্যাসরূপ সম্বন্ধে এসেই ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম ক্ষেত্রে আরোপিত এবং ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয়। তদাত্মক্ষেত্রে এই যে পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্ম্ম পরস্পরে আরোপ বা অধ্যাসই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ আর এটাই সংসারের কারণ। আমরা যেমন নিজেদের ডান ও বাম হাত এক সাথে করি তেমনি ক্ষর ও অক্ষর দুই প্রকৃতি তাঁরই এবং তাই তাঁর থেকে অভিন্ন। পুরুষোত্তম নারায়ণের ইচ্ছায় তাঁর এই ক্ষর ও অক্ষর প্রকৃতির মিলনেই হয় জীব ও জগৎ। সমুদ্রে ঢেউ হলেও ঢেউ সমুদ্র থেকে আলাদা নয় তেমনি এই নামরূপ জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হতে আলাদা নয়, তাঁরই অংশ, কিন্তু বর্হিদৃষ্টি থাকাতে এ ভিন্নতা বোধ যায় না। বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এক আত্মাই বর্ত্তমান আছেন, সমস্ত ক্ষেত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই তন্মধ্যস্থ পুরুষ, সেই পুরুষকে যখন দেখা যায় তখন সব নামরূপময় বোধ, পার্থক্য সবই ডুবে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, থাকে শুধু সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে কেবল "সৎ" স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। হরি ভজন করতে করতে "আমি" টা ঘুচে গেলেই সেই কর্ত্তাকে পাওয়া যায়। অতএব "হরি ভজলে সর্ব্বনাশ"। রাম চরিত মানসের বাল্মিকী চরিত্র বলেন, "জানত তুম্‌হিঁ তুম্‌হিঁ হোই জাই"। মহাত্মা কবীর দাসজীও বলেন, "হরি ভজৈ আপাঁ মিটে তব পাওয়ে করতার।" অতএব "ঘটহি মাহ চৌবতারা ঘটহি মাহ দিবান্"। এই শরীররূপ ঘটের মধ্যেই রাজা ও রাজ সিংহাসন দুইই আছে। বাইরের চৈতন্য ও জড়ের যে ভেদ অনুভব হয় ও সমস্তই আপেক্ষিক ভেদমাত্র। সকল ক্ষেত্রকেই ফুটিয়ে তোলেন ও বিকশিত করে থাকেন তন্মধ্যস্থ পুরুষ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা। তাঁকে না জানাটাই মর্ত্তভূমিতে থাকার কারণ আর অমৃতভূমিতে যেতে হলে তাঁকে জানাটা প্রাথমিক ও আবশ্যিক। আর আমাকে জানাটাও একান্ত সুলভ যদি কেউ আমার দিকে মুখ ফিরায় কেননা আমিই প্রকৃত পক্ষে তার সমস্ত উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, পরমার্থতঃ জীবমুর্ত্তিতে প্রকটিত। মর্ত্তে জাত হওয়ার একমাত্র কারণই আমাকে না জানা। কেন পুরুষ ও গুণের সাথে প্রকৃতিকে জানলে জীবের আর জন্ম হয় না তার কারণটা পরের শ্লোকে স্পষ্ট করে দেওয়া হল ॥ ১৩/২৭

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ২৮

অনুবাদ: সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত এবং ভূতগণের বিনাশেও অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যক দেখেন ॥ ১৩/২৮

ব্যাখ্যা: সর্ব্বত্র পরমাত্মারূপ পরমেশ্বর দর্শনই সমদর্শন। আগে তাঁকে জানলে আর জন্ম হয় না এবং কেন আর জন্ম মৃত্যু থাকে না সে বিজ্ঞানটা বলে এখন সর্ব্বভূতে তাঁর অবস্থিতি দর্শনই যে সমদর্শন সেটাই বোঝাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জন্মমৃত্যুময় হলেও এর প্রতি ভূতেই স্বয়ং পরমেশ্বর সমরূপে বা আত্মরূপে অবস্থিত। এই ব্যাপারটা জানে না বলেই জন্ম মরণের অভিঘাত ভোগ করতে বাধ্য হয়। কারণ প্রকৃতি থেকে আত্মা যে ভিন্ন এই বিষয়ের বোধটা প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে, না হলে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতা আসে না। এক আত্মাই মাত্র প্রকাশস্বরূপ, অংশবিহীন, সঙ্গরহিত, দোষশূন্য, সর্বদা একরূপ, ক্রিয়ারহিত, অখণ্ড আনন্দরূপ, উদাসীন, জ্ঞানরূপ, কেবল এবং নির্গুণ। কিন্তু সমস্যা হল এত যে ব্যক্তরূপ দেখি যা দেখে এক মনে করাই অসম্ভব হয়। সে জন্যই এর প্রতি ভূতে ভূতে আত্মারূপে পরমেশ্বরের অবস্থান লক্ষ্যই করতে পারি না। যোগাভ্যাসের দ্বারাই বহুভাব প্রকৃষ্টভাবে লীন হয় কারণ মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত টান থাকায় মন লীন হওয়ায় আর অন্য দিকে যেতে

পারেনা সেই অবরুদ্ধ অবস্থায়ই সমস্ত রূপ আবার সেই অব্যক্ত রূপের মধ্যে আত্মগোপন করে। সর্বব্যাপক ব্রহ্মতে এই স্থাবর জঙ্গম যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠে উঠে আবার মিলিয়ে যেতে থাকে। প্রতি বিনাশশীল সংস্থিতির তলেই অবিনাশী আত্মারূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত এই ভাবে লক্ষ্য করলেই এবং বুঝতে পারলেই সম্যকদর্শী হয়ে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করা যায়। অবশ্যই যোগপথ অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোনও উপায় এর জন্য নেই, মঠ মিশনের বাবাজীরা যতই বকলমা গ্রহণের তত্ত্ব বলুন না কেন, গুরু কখনও শিষ্যের হয়ে সাধনা করে দিতে পারেন না। ভূতে ভূতে তাঁর আত্মরূপে প্রতিষ্ঠাটা দেখতে পেলেই বোঝা যায় কিভাবে ঐ অসঙ্গ আত্মতত্ত্বটা জগৎ প্রপঞ্চ ও ভূমা পরমাত্মাকে সেতুর আকারে একসাথে জুড়ে ধরে রেখেছে। আত্মাকে না জেনে জগৎ দর্শন অবিদ্যামাত্র। বিনাশময় বিশ্বের মাঝে অবিনাশী আত্মার দর্শনই সম্যক দর্শন যে দর্শনে জন্ম মরণের অভিঘাত রুদ্ধ হয়। সর্বদা প্রাণের ক্রিয়া করে প্রাণকে স্থির করতে পারলেই আর এই এত ব্যক্তরূপ দেখে মুগ্ধ হতে হবে না। আত্মদর্শী হয়ে নিজের ভিতরেই কূটস্থকে দর্শন হলে পরমরূপময় জগৎদর্শনও লাভ হবে। তখন আর বিনাশ হয় না। এটাই যোগপ্রভাব, এই জ্ঞানই ক্ষেত্র–ক্ষেত্রজ্ঞের সম্যক জ্ঞান ॥ ১৩/২৮

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ।। ২৯

অনুবাদ: সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মার দর্শনকারী ব্যক্তি, আপনাকে অবসন্ন (অধঃপতিত) করেন না; তজ্জন্য তিনি শ্রেষ্ঠগতি (মুক্তি) লাভ করেন ॥ ১৩/২৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে সমদর্শন, যাকে সম্যক জ্ঞান বলে বলা হল, কেন সেই সমদর্শন ? কেনই বা সে সম্যক জ্ঞান ? সে কথাটাই এখন ভগবান বলছেন। পরমাত্মাই নির্গুণ অপ্রচ্যুতরূপে, প্রত্যগাত্মরূপে ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত থেকে নামরূপ ক্রিয়াময় জীবত্বকে বিধারণ করে রয়েছেন। জীবতো অবিদ্যাগ্রস্ত বটেই, অবিদ্যাভোগে বদ্ধ আত্মহননশীল। তাই তার নিজত্বের ভিতরে আত্মাকে না দেখে অন্ধকারেই থেকে যায়। দেহাত্মদর্শী হয়ে দেহের বিনাশের সাথে সাথে আত্মাকেও বিনাশ করে। বেদে এমন অবিবেকীকেই আত্মহা বলা হয়েছে। তাঁরা মৃত্যুর পর আলোকহীন অন্ধকারে ঢাকা নরক সকল ভোগ করে। এমন আত্মহনন অজ্ঞানান্ধ জীবের ভিতর সর্ব্বদাই চলছে। আত্মার স্বরূপ জানতে না পারলে এমন ঘোর নরক যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয়। ঈশোপনিষদে আছে–

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥"

আত্মদৃষ্টিহীন অন্ধ জীবত্বই অসূর্য্যালোক। শ্রীমদভাগবতের একাদশ স্কন্ধে আছে –

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
মায়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং পুমান ভবাব্ধিং নভস্বতেরিতং ॥"

ভক্ত প্রহ্লাদও একই অর্থে বলেছেন "দুর্লভং মনুষ্যং জন্ম, তদপ্য ধ্রুবমর্থদম্।" এমন মনুষ্য শরীর দুর্লভ। কর্ম্ম অনুযায়ী শরীর লাভ সহজ হলেও, যে শরীর ঈশ্বর/ আত্মা অনুসন্ধানে লেগে থাকবে তেমন শরীর পাওয়াটা সত্যিই খুব কঠিন। কারণ মানুষের শরীর পেয়েই লোকে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুখ নিয়েই উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং কামিনী কাঞ্চন ভোগে মজে গিয়ে তার ফলে কত রকম অধমাধম জন্ম ও যোনী লাভ করে তার ঠিক ঠিকানা নেই। শঙ্করাচার্য্য এ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলেন – "পীত্বা মোহময়ী প্রমোদমদিরাং উন্মত্তভূতং জগৎ।" আজকাল টেলিভিশনের সামনে বসে সপরিবারে যে সকল বিনোদন চিত্র ও সঙ্গীতাদি লোকে উপভোগ করে তা দেখে চেতনার অস্তিত্ব কোনও স্তরেই ধরা যায় না। তাই ভক্ত প্রহ্লাদের কথায়ই ফিরে আসি। এ ভবসিন্ধু পার হবার জন্য নৌকা হল শরীররূপী এ দেহতরী যার কর্ণধার হলেন শ্রীগুরুদেব স্বয়ং। দেহতরী কর্ণধারের হাতে তুলে দাও। সবরকমে তাঁকে তুষ্ট রাখো তবেই নৌকার পালে বাতাস পেয়ে ঠিকানামত পৌঁছে যাবে। আর এ অপূর্ব দেহতরী পেয়েও কাণ্ডারী না পেলে বা কাণ্ডারী পেয়েও তরী বাইতে না পারলে আত্মদর্শনে বঞ্চিত হয়ে আকুল পাথারে পড়ে আত্মঘাতী হতে হয়। ভয় নেই আদৌ অন্য দিকে না তাকিয়ে গুরুপদেশমত সাধনে রত থাক। সুচতুর সাধকই পরাগতি লাভ করেন। গুরুসেবা করে ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে জ্ঞাত হও তবেই আজ্ঞাচক্রে প্রাণ স্থির হয়ে মনের লয় হবে ও এক আত্মসত্তা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, তখনই খণ্ডিত জীবাত্মাস্থলে ভূমা স্বপ্রকাশ পরমাত্মার প্রকাশ হবে, বার বার এ জন্ম মৃত্যুর খেলাটা বন্ধ হবে ॥ ১৩/২৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ।।৩০

অনুবাদ: প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য করে এবং আত্মা (অনাসক্ত বলিয়া) অকর্ত্তা, ইহা যিনি দর্শন করেন, তিনিই (সম্যক) দেখেন ॥ ১৩/৩০

ব্যাখ্যা: যদিও আত্মা আমাদের শরীরে প্রকৃতির খেলাগুলো উপভোগ করেন তবুও এর মৃতত্বটা তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি কর্ম্মের ভিতর থেকেও নিজে কর্ম্ম করেন না। কর্ম্ম সবই প্রকৃতির কিন্তু তিনি

নিজে «কর্তারমঅপি অকর্তারম।" প্রকৃতির কর্ম্ম সকলের ধারক হয়েও সমস্ত রকম ফল থেকে তিনি মুক্ত। এ অধ্যায়টাই হল প্রকৃতি – পুরুষ বিবেকযোগ যার নামকরণে আছে ক্ষেত্র–ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ। পাঠক প্রশ্ন করবেন গীতায় বর্ণিত পরা ও অপরা প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রকৃতির কথা বলা হচ্ছে ? আসলে এই শ্লোক সর্বার্থসাধক কেননা প্রথমে পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতির বিভাগ দেখান হল তারপর অপরাপ্রকৃতির কথাই বলা হল। পরাপ্রকৃতি হল প্রত্যগাত্মা «জ্ঞ" পুরুষ সকল বিবর্ত্তনেও অপরিণামী স্থির। আর অস্মি আদি প্রকাশের অব্যক্ত আশ্রয়রূপ জ্ঞানশক্তিই অপরাপ্রকৃতি অতএব এখানে প্রকৃতি বলতে অপরাপ্রকৃতিই বোঝায় কারণ প্রকৃতি তো আর কাঠ পাথরের মত জড় পদার্থ নয় তবে নামরূপাত্মক অস্মি আদি জ্ঞানপ্রকাশগুলো প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতি শব্দের অর্থ ভগবানের মায়া। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার তিন রকম কর্ম্ম হয়ে থাকে সব রকমেই প্রকৃতিই সব কাজ করে। আত্মা কোনও কাজেরই কর্ত্তা নয়। তবে ক্ষেত্রজ্ঞও সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জিত। এভাবে প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপদর্শনই পরিণাম দর্শন ও পরমার্থ দর্শন। তবে এ অধ্যায় পড়ার সময় পাঠকের এমন ভাবনা স্বতঃই হবে যে আত্মা অকর্তা ও প্রতি দেহে বিভিন্ন নয় এ কথা তো বই পুস্তকে আছে ও গুরুমুখেও শুনতে পাই ঠিকই কিন্তু বুঝি না কিছুতেই বরং উল্টোভাবই তো মনে আসে কারণ দৃশ্যমান জগতে তেমন বৈষম্যই তো দেখা যায়। আর যদি ভগবান বলেনও যে আত্মা কর্তা নয়, প্রকৃতির দ্বারাই সব কাজ হয়ে থাকে তবে প্রকৃতিই বা এল কোথা থেকে ? আবার যদিও বা আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলে মেনে নাও, তাতেও সকল তো রয়েই গেল। অতএব দৃশ্যমান প্রকৃতিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে প্রকৃতিও যদি তাঁরই শক্তি হয় তবে তিনি, মানে আত্মা বা ভগবান, অকর্ত্তা হন কি করে ? আসলে ভগবানের বিবিধ শক্তিই ঐশ্বর্য্য যা সময় বিশেষে নির্গুণ নিরুপাধিক বা সগুণ সোপাধিক হয়ে থাকে। দুটোই সত্যি। তাই তিনি অকর্ত্তা। কর্ত্তা বা কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা। নির্গুণ সগুণ দুইই। আত্মা নির্গুণ হলেও প্রকৃতিযুক্ত হলেই সগুণ। আবার এ প্রকৃতিটাও ভগবানের নিজ শক্তি বা মহিমা। এটাই ব্রহ্মের অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়া। এ মায়ার শেষ নেই। বড় আশ্চর্য্যভাবে মিলিত এই আত্মা ও প্রকৃতি যেন ঈশ্বর ও ঈশ্বরী, যাঁর বিকাশ নেই, বাসনা নেই অথচ তিনি দুই বা বহু হন কি ভাবে ? নিজের মায়ার প্রকাশে অনিচ্ছার ইচ্ছায় নিজেকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করে থাকেন। এক ও অদ্বিতীয় হয়েও «একোহহং বহুস্যাম"। সংকল্প থেকে নিজেকে এমনভাবে বহুরূপে প্রকাশ করার শক্তি বা সামর্থ্যই তাঁর মায়া। আর মায়ার সৃষ্টি সে সমস্ত জ্যান্ত পুতুলগুলোও আলাদা কিছু নয়, তাঁরই শক্তিমাত্রের প্রকাশ। অবশ্য এ মায়াও তাঁর নিজস্ব শক্তি, যে শক্তির মূল কেন্দ্রকে ঋষিরা «পিতা" বলেছেন ও যা কিছু এ জগতের উৎপত্তির হেতু তাকেই «বিশ্বজননী" বলেন। ঋষিদের এক সম্প্রদায় সগুণভাবটাকেই পূজো করেছেন ও তাঁকেই বিশ্বের আদি জননী বলে তাঁকেই পরমেশ্বরী বলে চিন্তা করেছেন। এটাও বড় সুন্দরভাব। এভাব থেকেই হয়েছে দেবী মাহাত্ম্য, ঋষিদের স্তবের মধ্য দিয়ে

হয়েছে যার প্রকাশ। আত্মা যখন প্রাণরূপে ব্যক্ত হন তখন ঐ প্রাণকেই তাঁর প্রকৃতি বলে। বাষ্প যেমন জল হয়, বরফ হয়, তেমনই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিই মন, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপে ব্যক্ত হয় আর প্রাণরূপা আদ্যাপ্রকৃতির মধ্যে আত্মচৈতন্য সদা ঝলমল করে। এই প্রাণের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা ও প্রাণ যেন আলাদা আলাদা বস্তু হয়ে এমন একটা ভাবের খেলা শুরু হয়। এটাই মায়ার খেলা, ভাবের বা ভবের খেলা যাই বলনা কেন, প্রাণশক্তির সাথে আত্মার নির্গুণভাব স্বতঃই সম্মিলিত। প্রকৃতির কারণ সলিলে কারণার্নবশায়ী বা রাধাবক্ষবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। জড় চেতনময় পুরুষ প্রকৃতির যুগলসংবদ্ধভাবই রাধাকৃষ্ণলীলা। সাধনে এগিয়ে গেলে যুগলভাব লয় হয়ে এক অখণ্ড মহাভাব বর্ত্তমান থাকে। এরই নাম পরাবস্থা বা সমতা যা হল সমাধি ভাবগম্য ॥ ১৩/৩০

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ।।৩১

অনুবাদ: যখন ভূতগণের পৃথক পৃথক ভাবকে একস্থ (একমাত্র ব্রহ্মে অবস্থিত) দর্শন করেন এবং তাহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন ॥ ১৩/৩১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের বিস্তারিত আলোচনায় জানা গেল যে জগতে যত কিছু কাজ হয়ে চলেছে সেই কার্য্যকারণত্ব অপরা প্রকৃতির। স্বয়ং ভগবান সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আছেন এবং সেই আত্মাকেই যদি ঈশ্বররূপে দেখা যায় তবেই পরমগতি লাভ হয়। আর সেই ঈশ্বরত্ব দেখার উপায় হিসাবে প্রথমে অকর্ত্তা, অসঙ্গ আত্মতত্ত্বটি দেখার উপদেশ দেওয়া হল। পরা প্রকৃতিতেই সমস্ত ক্রিয়া ও ধর্ম্মের বোধ এবং পরা প্রকৃতির সংযোগেই ক্রিয়ার উদ্দীপনা হয়, ভূতগণও প্রকৃতি থেকে অভিন্ন। অন্তরে নিজত্ব বোধ অবলম্বন করে যদি আত্মত্বের বোধকে বিক্ষেপশূন্য করা যায় তবে উপলব্ধি হয় সেই আত্মত্বেই সর্ব্বভূতের স্মৃতি বিধৃত আছে। এই অন্তরাত্মা থেকেই বিশ্ব উপলব্ধির বিস্তার, এমন কিছুই নেই যা আত্মাতে নেই। সমস্ত বৈচিত্র্যবোধই এতে জাত ও লীন হচ্ছে। এটা ব্রহ্মত্ব না হলেও ব্রহ্মত্বের উপলব্ধি। ঋগ্বেদের সপ্তম অধ্যায়ে (৮ অষ্টক/১৪শ ঋচা) «অমৃতং যজ্ঞে মধিমার্ত্তেষু" যোগের পর অবস্থায় কূটস্থস্বরূপ ব্রহ্ম মর্ত্তলোকে মধু, মানে অমৃতরূপ, হচ্ছেন। প্রাণই আত্মার প্রকৃতি, আত্মারই বিস্তার প্রাণ। আর প্রাণের বিস্তার মন বা সংকল্প যার বিস্তার থেকে জগৎ উৎপত্তি, মায়ারও বিকাশ। মায়ার প্রধান বিকাশ দেশ ও কাল। এর দ্বারাই এক বস্তু এত অসংখ্য রূপে ও ভাবে দেখা যায়। আত্মচৈতন্যে বুদ্ধির নিরোধ না হওয়া পর্যন্ত এমন বহুত্ব ও নানাত্ব দর্শন ঘোচেনা। মনিমালার মনিগুলো যেমন সূতোদিয়ে গাঁথা থাকে তেমনিভাবেই ব্রহ্মও নির্লিপ্তভাবে সকলের মধ্যেই আছেন। মন প্রাণ হৃদয়ই হল তিন সূত্র যজ্ঞোপবীৎ বা পৈতা যার দ্বারা সকল বাহ্য বস্তু গাঁথা

আছে। কর্ম্মের সংকল্প যেমন প্রথমে হৃদয়ে, তা থেকে প্রাণবায়ুতে, তারপর মনে উদয় হয় ও মনের ইচ্ছায় শেষপর্য্যন্ত কাজটা হয়। এভাবে কার্য্য, কারণ ও কর্তৃত্বের হেতু সকল কাজের মধ্যে একটা ব্রহ্মসূত্র আছে। অভ্যন্তরেও তাই। শুধু গুরুবাক্যে স্থির বিশ্বাস রেখে সেই মত কাজ করে আগে হৃদয়কে স্থির করতে হয় হৃদয়ে ক্রিয়া করে। তারপর প্রাণের ক্রিয়া করে প্রাণকে বৃদ্ধি করে পরাবস্থা পেতে হয়। প্রত্যক্ষলাভ স্থিরত্বে থেকে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি, পরোক্ষলাভ আপনা আপনি ধারণা হওয়া যে ধারণার দ্বারা আগে যে সূত্রের কথা বলা হল সেই সূত্রের (পৈতা) ধারণ করতে হয়। ভগবানও একথাই বলেছেন "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা"। এটাই ব্রহ্মত্বের উপলব্ধি, ব্রহ্মত্ব নয়, তবে চিত্তক্রিয়া ঘনীভূত হয়ে,যে আনন্দঘনস্বরূপ প্রকাশ হয় ইনিই ব্রহ্ম ॥ ১৩/৩১

> অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
> শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ।। ৩২

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব জন্য এই পরমাত্মা অবিকারী, এবং শরীরে অবিকারী থাকিয়াও কিছুই করেন না এবং (কর্ম্মফলে) লিপ্ত হন না। ১৩/৩২

ব্যাখ্যা: আগে ১৩শ শ্লোকেও "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" একই অর্থে বলা হয়েছে। পরমাত্মা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে নিজেকে বিভক্ত করে নিত্য পরমেশ্বররূপে বিরাজিত, জীবের অন্তরঙ্গ হয়েও অসঙ্গ ও অকর্ত্তা। তাহলে সেই পরমাত্মাই মূলতঃ সব হয়েছেন অথচ কেমন করে অসঙ্গ ও নির্লেপ হয়ে আত্মারূপে রয়েছেন সেই রহস্যের উন্মোচন হয়েছে এই শ্লোকে। এই শক্তিবিজ্ঞানটার মূল কথা হল যা থেকে যা কিছু ব্যক্ত হয় সেটা তারই আশ্রিত একটা প্রকাশ, সে আশ্রয় তত্ত্বটা মূলে স্থিরই থাকে। সকল শক্তি প্রকাশেই কেন্দ্ররূপ সে শক্তির স্বরূপটা বিদ্যমান থাকে এবং যা প্রকাশ পায় তা সেই কেন্দ্রেরই আশ্রয়ে বিবর্ত্তিত থাকে এবং কেন্দ্র ও বিস্তার দুটো আলাদা দিক তাতে দেখতে পাওয়া যায়। এ বিজ্ঞানটার ব্যাবহারিক প্রয়োগে দেখা যায় যে প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় প্রবাহিত হলে বহির্বিষয়ে জ্ঞান হয়, দেহাদিও অনুভব হয় এবং পরস্পরের একটা সম্বন্ধ আছে বলেও ধারণা হয়। আবার প্রাণ যখন সুষুম্নাবাহী হয়ে ত্রিগুণাতীত হয়ে যায় তখন প্রকৃতি কোথায় আর তার সাথে সংস্রবই বা কার হয় ? প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধ না থাকলে জন্ম মরণ, ভাব ভালবাসা কোনও বিকারই সম্ভব নয়। আত্মা শরীরস্থ হয়েও শরীর ধর্ম্মের সাথে লিপ্ত হন না। স্থির জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা গেলেও জলে ঢেউ বশতঃ প্রতিচ্ছবি নষ্ট হয়। জলের ঢেউতে প্রতিবিম্বই যেমন আলোড়িত, হিল্লোলিত হয় মাত্র সূর্য্য স্থিরই থাকে, একই ভাবে শারীরিক সুখ ও দুঃখে আত্মাকেও সুখী বা দুঃখী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মার সাথে সুখ দুঃখের সম্পর্ক নেই। ভগবান যখন বলেন যে "আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে"– তখন দেহী তো তিনিই। এ থেকে জীব এবং ভগবান আলাদা এটা পরিষ্কার। তাহলে পাঠক প্রশ্ন করবেন তবে দেহের ভিতরে এবং বাইরের কাজ গুলো সব করায় কে ? তবে কি পরমাত্মার অতিরিক্ত আরও কেউ একজন আছেন যে সব করায় এবং লিপ্ত হয় ? উত্তরে ভগবান বলছেন "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" মানে অবিদ্যাই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মফলে অবিদ্যালিপ্ত জীবের মন লিপ্ত হয়। তুমি আমি কাউকে বলে কিছু পাল্টাতে পারব না। এসবই যার যার নিজ নিজ কর্ম্ম ভোগ মাত্র। তাই "অবিদ্যা সংসৃতের্হেতু বিদ্যা তস্য নিবর্ত্তিকা"– অবিদ্যাই যখন সত্য নয় মিথ্যা তখন অবিদ্যাজনিত ব্যবহারও মিথ্যা। অতএব এ জগৎ বিষয়াদি, কর্ম্ম, কর্ম্মফল সবই স্বপ্নের মত। যা universally সত্যি নয় তা অলীক অসত্যই জানবে। তাহলে পাঠক এখন প্রশ্ন করবেন যদি তাই হয় তবে তো জীবের বন্ধন ও বন্ধন মোচন ব্যাপারগুলোও মিথ্যে ? উত্তরে বলি অবশ্যই মিথ্যে। এ সবই মনের ভ্রান্তিজনিত ব্যাপার মাত্র। আমরা যেসকল সংকল্পের দ্বারা মেতে উঠি সেটাও ভুল, সে কর্ম্মজনিত যে বন্ধন সেটাও ভুল। যোগাভ্যাসদ্বারাই এই বোধ জন্মে। প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবনে সকল ভ্রান্তি নাশ হয় ও বোধশক্তি স্পষ্ট হয়। যাহোক, মূল শ্লোকের কথায় ফিরে আসি। আত্মা অনাদি এবং নির্গুণ সেজন্য কর্ম্মে লিপ্ত হন না, পুরুষ এবং প্রকৃতি দুইই অনাদি। প্রকৃতি হতে সমস্ত জাত হয় অথচ প্রকৃতি অনাদি। সুতরাং'আত্মা ন করোতি ন লিপ্যতে' এর কারণ খুঁজতে আত্মার অনাদিত্ব বুঝতে হয়। আদি আছে মানে অব্যক্ত ব্যক্ত হচ্ছে এটা না দেখার কারণ অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়াটা জাত হওয়া নয়, অভিব্যক্ত হওয়া। যেমন ব্যাঙ্কে টাকা আছে। ব্যাঙ্ক থেকে সেই টাকা তুলে আনার অর্থ টাকার সৃষ্টি বা জন্ম নয়, শুধু প্রকাশিত বা ব্যক্ত হওয়া মাত্র। সুতরাং কর্ম্ম করা মানে কর্ম্মের সৃষ্টি বা জন্ম দেওয়া নয়, কর্ম্মের ব্যক্ত হওয়া মাত্র। কর্তৃত্বাভিমান প্রকৃতিরই, পুরুষ কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা বলে বোধ করে। শরীরস্থ অব্যয়রূপী নির্গুণ আত্মরূপী পরমাত্মা অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ববশতঃ কিছু করেন না বা কিছুতে লিপ্ত হন না ॥ ১৩/৩২

> যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
> সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ।। ৩৩

অনুবাদ: যেমন সর্ব্বগত অর্থাৎ পঙ্কাদিতেও অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্বজন্য (পঙ্কাদিদ্বারা) লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার (উত্তম, মধ্যম বা অধম) দেহে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা গুণ কার্য্যদ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১৩/৩৩

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বলা হল অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বের জন্য আত্মা কর্ম্ম করেন না, সুতরাং তার ফলও ভোগ করেন না। এবার উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে তিনি স্থূল ভৌতিক দেহে বা দেহাত্মবোধেও থাকেন না। অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব সূক্ষ্মতারই পরিচয়। আকাশ যেমন শূন্যরূপে সবকিছুর মধ্যেই

আছে। শূন্যস্থান কোথায় নেই ? সেই শূন্যস্থান কি কোনকিছুর দ্বারা লিপ্ত হয় ? আগুনে পোড়ে না জলে ভেজে ? সুদূর আকাশও মহাশূন্য সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, আবার যখন তখন মেঘে ঢাকা কিন্তু তাতে সুদূর আকাশের কোনও পরিবর্তন নেই কারণ সে যে মহাশূন্য। এটাই চরম উদাহরণ কারণ চেতনতত্ত্বও বাহ্যদৃষ্টিতে আকাশেরই মত। এমনই একটা আকাশ মনুষ্য শরীরেও আছে যা হল চিদাকাশ। যেমন আকাশ প্রতি বস্তুর অণুতে অনুস্যুত থেকেও বস্তুতে লিপ্ত নয়, চিদাকাশও তেমনি সমস্ত জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞানসংস্কারের ভিতরে ভিতরে অনুস্যুত থেকেও তাদের সাথে লিপ্ত নয়, ভূতের সাথে তো নয়ই। যেখানে যত কিছু আয়তন আছে সে জ্ঞানায়তন বা ভৌতিক যাই হোক সমস্তের অন্তরেই এই আত্মারূপী ভগবান নির্লিপ্ত হয়ে বিরাজমান। আত্মার এমনই প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি (technology) ব্যবহারিকভাবে বুঝতে গেলেই গুরুমুখী বিদ্যার অনুশীলন করতে হয়, যদিও বিষয়টা সহজই। বিষয়টা এইভাবে ভাবতে হবে। স্থিতিশীল আত্মা কালের দ্বারাই গতিশীল হন। এ দেহই তাঁর আশ্রয় হয়, তাই সীমাবদ্ধ কালই মায়ার রূপ। এ কালের জন্যই ইহকাল পরকালের কথা, আত্মার গমনাগমনের কথা এসব শুনি ও শৈশব থেকে বার্ধক্য অবধি জন্মমৃত্যুর সব খেলা দেখি। এই প্রাকৃত সম্বন্ধ রহিত হলেই, মানে স্থিতি হলেই নির্লিপ্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মাকে স্থির, নির্বিকার, জরা মরণশূন্য রূপে উপলব্ধি করা যায়। দেহ ব্রহ্মাণ্ডের গতিরোধ করার জন্যেই এই ক্রিয়া গুরুসকাশে বসে অভ্যাস কর। একটু এদিকটা দৃষ্টি রেখে দেখ কেবলই স্রোত বয়ে যাবে তাই বরং একটা খুঁটি ধর যেটা তোমার মধ্যেই আছে, তাহলেই সহস্রদলে তাঁকে নির্বিকাররূপে বুঝতে পারবে। এভাবে অধ্যাবসায় সহ যাঁরা একাজেই লেগে থাকতে পারেন তাঁরাই গুরুকৃপালাভ করে অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং সেই শ্বাশ্বতের পরম অমৃতত্বের মধ্যে উঠে যান ॥ ১৩/৩৩

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ।। ৩৪

অনুবাদ: হে ভারত, যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ পরমাত্মা সমুদয় ক্ষেত্র অর্থাৎ মহাভূতাদি প্রকাশিত করিতেছেন ॥ ১৩/৩৪

ব্যাখ্যা: উদাহরণস্বরূপ এখানে আত্মাকে সূর্য্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূর্য্যের আলোয় যেমন রূপময় জগৎ প্রকাশিত হয় তেমনই আত্মার প্রভবে বা প্রকাশ শক্তিতে জ্ঞানময় বিশ্বের প্রকাশ হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাই সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। কূটস্থ সূর্য্য ভিতরে থেকে এই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে প্রকাশিত করলেও ইন্দ্রিয়াদির অশুদ্ধভাব কিন্তু কূটস্থকে লিপ্ত করতে পারে না, ঠিক যেমন সূর্য্যালোক সম্পাতে জগতে যাতেই রূপতত্ত্ব আছে সকলই দৃষ্টিগোচর হয় এবং সূর্য্য নিজেও দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সূর্য্যকে প্রকৃতির এই ধূলো ধোঁয়া বা জীবাণুসকল লিপ্ত করতে পারে না। তেমনিভাবে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্রাদি, প্রাণ অপানের প্রবাহাদি সমস্ত কিছুরই তাত্ত্বিক পরিচালন ও পরিণমন সকলই আত্মার প্রভব ও সংস্পর্শেই ঘটে মাত্র। ক্ষেত্রই জীবকে এমনভাবে মুগ্ধ করে রেখেছে ঠিকই কিন্তু সেই ক্ষেত্রের প্রকাশকই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞকে না লক্ষ্য করে শুধু ক্ষেত্রকে দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়, ক্ষেত্রের নানাত্বে মোহিত হয়ে বাঁধা পড়তে হয় এমন ভাবে বাহ্য প্রকৃতিতে দৃষ্টি রাখাই অন্ধকারে থাকা। আবার কূটস্থ যখন আদিত্যের মত প্রকাশিত হন তখন আর বাহ্যরূপের আকর্ষণ আমাদের টানতে পারে না। সূর্য্যের দৃষ্টান্ত থেকে প্রকাশ করার দুটো অর্থই বুঝে নাও। ক্ষেত্রকে যিনি আলোকিত করছেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ তুমিই। অতএব তুমি যদি নিজেকে জানতে পারো তবেই আর নিজের খেলায় নিজে মুগ্ধ হয়ে সাহারায় হরিণের মত হারিয়ে যাবে না ॥ ১৩/৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ।।৩৫

অনুবাদ: উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং জীবগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা যাঁহারা জানিতে পারেন তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। ১৩/৩৫

ব্যাখ্যা: এখানে শ্রীভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপসংহার করছেন। আত্মতত্ত্বে পুরোপুরি অধিকার না আসা পর্য্যন্ত জীবের মন বা হৃদয় থেকে কর্ম্মফল সম্বন্ধজনিত সংস্কার পুরোপুরি যায় না। এমনকি ধর্ম্মসংস্কারকদেরও ভিতরে এ আশঙ্কা বহুদুর পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এমনতর আশঙ্কা থেকেই সন্ন্যাসবাদের জন্ম হয়েছিল। এমনকি গীতার অধিকাংশ ভাষ্যকারগণও এই অধ্যায়ের অর্থকে খোলাখুলি বলেন নি। বরং অনেকেই গীতার অর্থকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাবমত পরিবর্তন বা সঙ্কোচন করেছেন। এতে কর্ম্মবিজ্ঞান বলার প্রারম্ভিক জ্ঞানলাভ হতে বঞ্চিত হতে হয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগটা বিশদভাবে না দেখা পর্য্যন্ত আত্মার অসঙ্গ প্রকাশে আস্থা জন্মায় না। আত্মাকে অসঙ্গ অক্ষর সংস্থিতিতে না বোঝা পর্য্যন্ত আত্মা কর্ম্ম প্রবর্ত্তক অথচ কর্ত্তা নয় এ ভাবে দেখা যায় না। এটা জানতে না পারলেই কর্ম্মফলে আবদ্ধ হতে হয়। কারণ কর্ত্তাই ফল লাভ করে। কর্ত্তা হতে নিজেকে আলাদা করতে পারলেই আর কর্ম্ম নিজের উপর আধিপত্য করতে পারে না। আত্মবোধ সমন্বিত এই কর্ম্মযোগ নির্ভয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই কর্ম্মবিজ্ঞান বলতে গিয়েই আগে ভগবান ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে ক্ষেত্রজ্ঞকে দেখতে বললেন। পাঠক প্রশ্ন করবেন– বেশ কথা, আত্মবোধসম্মত কর্ম্ম ফল প্রসব করে না কিন্তু তাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি কিভাবে হবে ? উত্তর হল ভূত প্রকৃতি মুক্তি দিয়ে। প্রকৃতিকে ভূতময় দেখলেই তো সেই অপরা প্রকৃতির সেবা করা হল। আপনাতে আপনি

প্রকাশ হয়ে রয়েছি এই জ্ঞান শক্তিইতো পরাশক্তি। আত্মবোধ ছাড়া যা কিছু জ্ঞান সবই তো অপরাপ্রকৃতিরই প্রকাশ। শুধুমাত্র ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের অভাবেই কত শত বিজ্ঞানী চিকিৎসক সহ সকলেই এই রক্তমাংস অস্থিমজ্জায় ঢাকা দেহ নিয়ে কি নাচানাচিই না করছে। প্রকৃতি পুরুষের মিলিতভাব এ দেহের দিকে চাইলেই কত কি বোঝা যায়। এ জড় দেহের মধ্যে চৈতন্যের অপূর্ব খেলা তাতেই এই সমস্ত জড়ের পরমাণুকে যেন চৈতন্যময় করে তুলেছে। চেতন জড় মিলে যেন এক হয়ে রয়েছে, কারও থেকে কাউকে আলাদা করা যায় না। তাই সদ্‌গুরু কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ না হলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে বোঝা যায় না। সে প্রকৃতি পুরুষের ভাবকেও দেখা যেতে পারে সদ্‌গুরু কৃপায় সাধনদ্বারা জড় পিণ্ডদেহ ভেদ করে এক চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রতি অঙ্গেপ্রত্যঙ্গে ঝলমল করে ওঠে। কূটস্থজ্যোতিঃর অন্তর্গত সেই পুরুষই আমি। সেই আমিকে জানলেই জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ধারণা হয়। তখন সাধক কবি রামপ্রসাদের ভাষায় – "যা ছিলি ভাই তাই হবি"। প্রকৃত বন্ধন বা মোচন বলে কিছু নেই । স্বপ্নে যে ভয় পাই জেগে উঠলে আর সে ভয়টা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবদের একাদশ স্কন্ধেও আছে "বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা শুনতো মে ন বস্তুতঃ"। ব্রহ্ম নিজেই ক্ষেত্র হয়েছেন, সেই ক্ষেত্রের চিরজ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি তাঁর চিরন্তন শক্তি, নিজেকে ক্ষেত্ররূপে পরিণত করছে। ব্রহ্মের অংশ জীব এই মৃত্যুময় প্রকৃতির খেলায় অবতীর্ণ হয়েও আসলে মৃত্যুর অতীত। এ সমস্ত নিয়েই আমাদের জীবনের সমগ্র সত্য। নিজেদের হৃদিস্থিত ব্রহ্মের দিকে ফিরলেই তিনি তাঁর জ্যোতির দ্বারা প্রকৃতির সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে দেন। আমরা বুঝতে পারি, আমাদের দেহ মনের ধর্ম্ম থেকে মুক্তি লাভ করি ও আত্মার পরমা প্রকৃতিকে পাই, লাভ করি শেষ রূপান্তর, দিব্য জন্ম, মর প্রকৃতিকে পরিহার করে অমৃতময় জীবন ॥ ১৩/৩৫

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা রূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ : গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সমস্ত তত্ত্বগুলোর আলোচনা করেছেন। জীব কেমন করে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হবে এটা বলাই গীতার উদ্দেশ্য। গভীর জ্ঞানযুক্তিময় আত্মতত্ত্ব না বুঝলে, আবার বুঝেও সেইমত সাধনা করতে না পারলে জ্ঞানের উদয় হয় না। পরম শ্রদ্ধাবান হয়ে গুরুমুখ হতে শুনতে হবে। শুধুই শোনা নয়, শুনে "মৎপরম" হতে হবে। কেমন করে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হতে হবে এটা বলাই উদ্দেশ্য। আঠারোটা অধ্যায়কে তিন ভাগে ভাগ করে (৩ ৗ ৬=১৮) এক এক ভাগকে এক এক ষটক বলে। তৃতীয় ষটকে মানে শেষ ছয় অধ্যায় গুণ ও কর্ম্মবিজ্ঞান প্রধান। জীব বা প্রত্যাগাত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এ দুটো তত্ত্ব বা এক কথায় জীব কি ও ব্রহ্ম কী এদুটো জানতে হয়। তার পর আসে পাওয়ার উপায় জানা। গীতা অনুসারে কর্ম্মত্যাগ সঠিক উপায় নয়। বরং জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। প্রথম দুই ষটকে জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনা করে জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়জাত পরাভক্তি অবলম্বনে ঈশ্বরানুগ্রহলাভ যা ভগবৎ সাহায্য নিরপেক্ষ, আত্মপ্রচেষ্টা নির্ভরশীল, কর্ম্মফলত্যাগাত্মক কূটস্থ অক্ষর সাধনাদ্বারা আত্মউদ্ধারের উপায়। তাহলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ই যখন সিদ্ধান্ত তখন কর্ম্মবিজ্ঞান বর্ণনা অপরিহার্য্য। পুরুষ-প্রকৃতি বিভাগ না জানলে কর্ম্মবিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়বোধ হয় না, কারণ দেহ ও আত্মার বিভাগ না বুঝলে দেহাত্মবোধই ভগবানের (আত্মার) সাথে মিলনের প্রধান অন্তরায় হয়ে থাকে। দেহাত্মবুদ্ধি হয় কেন ? পাঠকের এমন প্রশ্ন করাই স্বাভাবিক। সত্যিই তো, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কি করে, কি ভাবে এই স্থূল শরীরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ে সেটা জড় বিজ্ঞানের অতীত পরম বিস্ময়। পরম পুরুষের শক্তিরূপ প্রাণ, নাড়ীর মধ্য দিয়ে দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ ঐ প্রাণশক্তিবলে জগদ্বস্তু দর্শন করে। প্রাণই ইন্দ্রিয়গত হয়ে এমন দর্শনকাণ্ড করে থাকে। আবার সেই প্রাণই আত্মার শক্তিবলে প্রাণের সত্তায় অহং জ্ঞান উৎপন্ন করে জাগতিক বস্তুসমূহ দর্শন করতে থাকে। এভাবেই অহংজ্ঞান প্রসূত দেহাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। দেহের সাথে জড়িত এমনতর যে আত্মভাবের বিকাশ সেই আত্মাকেই (১) "ভূতাত্মা " বলা হয়, এমন ভ্রান্ত বোধবুদ্ধির নাশ না হলে ফলের আকাঙ্ক্ষারও নাশ হয় না। পরিণামে ফলত্যাগের চিন্তাই মনে আসে না। অনেকে আবার ফলত্যাগের বদলে পুরো কর্ম্মটাই ত্যাগ করতে বলেন। আরও বেশি ভ্রান্তির কবলে পড়ার ওটাই পন্থা। প্রকৃষ্টপন্থা যোগাভ্যাস দ্বারা বোধবুদ্ধির উদয় ঘটানোই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাতে দেহবোধরূপ অভিমান নাশ হয়। দেহাভিমান নাশ হলেই দেখা যায় দেহের মধ্যে দেহের অতীত আরও কিছু পদার্থ আছে যার প্রভাবে ও দীপ্তিতে এ দেহ চৈতন্যময় হয়ে থাকে। এরপর সাধনায় সামান্য এগিয়ে গেলেই দেখা যায় যে দেহের ভিতরে একটা স্পন্দন আছে যার দ্বারাই দেহে চৈতন্য সঞ্চারিত হয়। এটাই হল সেই স্পন্দন বা (২) "সূত্রাত্মা" যার বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়েও বলা হয়েছে। দেহের প্রাণস্পন্দনও এই সূত্রাত্মারই শক্তিবিশেষ। নাড়ীমধ্যস্থ এই শক্তিই হল প্রাণের শক্তি যে প্রাণ বহুধা বিভক্ত হয়ে শরীরের ভিতরে নাড়ীমুখে প্রবাহিত হয়ে থাকে। নাড়ীমধ্যস্থ শক্তিই হল "প্রাণময় কোষ"। আবার এই প্রাণময় কোষে থেকে যিনি এই দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের কাজকর্ম্ম পরিচালনা করছেন তিনিই হলেন (৩) "জীবাত্মা" বা কূটস্থ, যিনি দেহে বর্তমান থেকেও দেহের অতীত। কিন্তু সমস্যা হল যে দেহ ও প্রাণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে তাঁতে দেহবোধ হয়ে পড়ে। এজন্য প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে

ক্ষেত্র অর্থে পঞ্চতত্ত্বাদিময় শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে এই শরীরের যিনি মালিক তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জানতে হয়। স্থিরপ্রাণরূপ শরীরই ক্ষেত্রজ্ঞ। এবার যতক্ষণ এই ক্ষেত্রজ্ঞে মনের স্থিতি না হয়ে মন তত্ত্বাদি স্থানে প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে থাকে ততক্ষণই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ (আলাদা আলাদা) অবস্থা থাকে। আর যখন প্রকৃতির অতীত হয়ে মানে আজ্ঞাচক্রেরও উপরে উঠে গিয়ে তত্ত্বাতীত পরমাত্মস্থানে মনের লয় হয় তখন আর এমন পার্থক্য বিভাগ থাকে না। তখন একমাত্র ব্রহ্মে অবস্থিতি হওয়ায় তত্ত্বাদির উপরে গিয়ে মনের লয় হলেই একমাত্র ব্রহ্মে মিলে যাওয়া হল মানে আলাদা আলাদা ভাগের বদলে যোগ হয়ে গেল। এটাই ভূত প্রকৃতি থেকে মুক্তিলাভ। এমনতর মুক্তিলাভ হলে এই দৃশ্যমান জীব বা খণ্ড ভাব সেই একে মিলে সবই একাকার হয়ে যায় এবং পরিস্কার বোঝা যায় যে সেই দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলের অগোচর অব্যক্ত পরম একই পুরুষোত্তম বা (৪) "পরমাত্মা" যিনি নির্গুণ, কিন্তু লীলাবশতঃ সগুণ হলেই তাঁকে তখন ঈশ্বর বলা হয়, অন্যথায় তিনিই পরমেশ্বর। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকাশিত কূটস্থ চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ হতে অভিন্ন। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের এই যোগই মানে এমনতর জ্ঞানই সঠিক বোধশক্তির জন্ম দেয়। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান না হলে এমন বোধশক্তি জন্মে না, বোধের বিকাশও হয় না। এমন জ্ঞানাশ্রিত হতে পারলে তবেই শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, নইলে শুধু বহিরাঙ্গিক ভক্তি, লোকদেখানো ভক্তি, নতুবা অনিচ্ছায়, জোর করে ধরে বেঁধে হরিভক্তি মাত্র, স্বতস্ফূর্ত (ঢ়ড়হঃধহবড়ঁং) কিছু নয়। কর্ম্ম থেকেই জ্ঞান, জ্ঞান থেকেই ভক্তি, এটাই হল স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। ক্রিয়া করে জ্ঞানরূপ পর অবস্থার দ্বারাই দেহবোধরূপ অভিমান নাশ হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ " জ্ঞানী আত্মারই স্বরূপ ॥

--০০--

ওঁ

অথ চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ (১৪)

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ -

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ।। ১

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। (তপঃ কর্ম্মাদি বিষয়ক) জ্ঞান সকলের মধ্যে উত্তম পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান পুনরায় বলিব; যাহা জানিয়া মুনিগণ এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১৪/১

ব্যাখ্যা: ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে যে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ করা হয়েছে, বিশেষতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভেদ দেখানো হয়েছে তা হল সংক্ষেপে জীবাত্মা প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করতে গিয়ে বদ্ধ হয় কিন্তু পরমাত্মা সবকিছুতে থেকেও কোনও কিছুতেই নেই মানে সবকিছু ভোগ করেও কিছুতেই বদ্ধ হন না – এটাই সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এভাবেই পরমাত্মাকে জেনে জীবাত্মাও পরমাত্মার স্বরূপ স্বাধর্ম্ম্য লাভ করবে। ভগবান আগের অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো বলেছেন তারই কোন কোনটাকে আরও স্পষ্ট করার জন্যই এই অধ্যায়ের সূচনা। আগের অধ্যায়ে ছিল সাধনজ্ঞান এ অধ্যায়ে আছে সাধ্যজ্ঞান। এই সাধ্যজ্ঞানটাই হল ক্রিয়ার পর অবস্থা যে অবস্থায় আর কিছুই জানার থাকে না, জানার ইচ্ছাও হয় না। পাঠক প্রশ্ন করবেন, ঠিক আছে; এমন ইচ্ছারহিত অবস্থা যদি সৌভাগ্যের বিষয় হয় তবে তাঁদের শরীরযাত্রা চলে কি করে ? তার জন্যও তো কিছু কর্ম্ম অবশ্যই করতে হয়। তাতেও কি তাদের কর্ম্মবন্ধন হয় না ? আগুন যেমন আগুন কে পোড়ায় না তেমনি তাঁরাও আসক্তি বিহীন কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না। এভাবে কর্ম্ম করতে হলে নিজেকে অনাদিমান ভগবানের অংশ বলে দেখতে হবে যার প্রথম সাধনই হবে আত্মদর্শন। আমি তাঁর (পরমাত্মার/ভগবানের) অংশ বলতে গেলেওআমি নিজে' এ বোধটা আগে আসে। অতএব নিজেকে ভগবৎ অংশ বলে জানতে হলে তার প্রথম সাধনই হল আত্মদর্শন, যাতে নিজত্বটাকে ভগবৎ-নিজত্ব'র সাথে এক করতে হলে নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করাই সাধনা। যার ফল হল আদিমান জীবত্ব ও আদিমান কর্ম্মদর্শন থেকে অব্যাহতি পেয়ে অনাদিমান ভগবান ও অনাদিমান কর্ম্মশক্তির সাথে একীভূত হয়ে কর্ম্ম করতে সক্ষম হওয়া, সে জন্যই ভগবান ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ দেখিয়ে আত্মত্বের অনাদি সত্তা ও নির্গুণত্ব দেখিয়ে নিজের অপরাশক্তিটার আলোচনায় আসছেন। আর অপরাপ্রকৃতিরূপ অংশটা কর্তৃত্বাদি বিকারময় হয়ে সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে আত্মত্বের আশ্রয়ে প্রকাশ পেতে থাকে এভাবে গুণত্রয়েই বৈচিত্র্য ও কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। কর্ম্মের মাঝে আত্মাংশটা অবিকারী থাকে কারণ ক্ষর জীবত্ব সৃষ্ট হয়েও পরমার্থতঃ অক্ষরত্ব বিধ্বস্ত হয় না। মন থাকলে বিষয় ভোগ হয়, মন না থাকলে বিষয় থাকলেও যা, না থাকলেও তাই। ঐ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতেও সেই একই অবস্থা। কোনও কিছুর জন্যই তাঁরা কেউই লালায়িত হন না, যেহেতু আসক্তিই নেই ॥ ১৪/১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ।। ২

অনুবাদ: এই জ্ঞানলাভ করিয়া আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালেও প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না ॥ ১৪/২

ব্যাখ্যা: মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকাটাই অমৃতত্ব নয় কারণ সকল জীবাত্মাই এমনই অমর। পুরুষোত্তমও বারবার জন্মগ্রহণ করেন, অসংখ্য রূপ গ্রহণ করেন, তা সত্তেও নিজেকে এসমস্ত নামরূপের ঊর্দ্ধে অনাদি অনন্ত বলে জানেন। যিনি সৃষ্টিময় ও মৃত্যুময় অথচ সৃষ্টি ও মৃত্যু অতিবর্ত্তন করে সৃষ্টি ও মৃত্যুর অতিকারণ রূপে অবস্থিত তাঁর ধর্ম্ম উপলব্ধি করলে আর জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়ে সংঘাত পেতে হয় না। অনাদিমান ভগবান যদি সৃষ্টিসংহারলীলায় নিত্য থেকেও সেই লীলা থেকে নিজেকে নির্গুণ ও অনাদিরূপে দেখেন বলে তিনি গুণক্রিয়া অতিবর্ত্তন করে নিজের নিজত্ব থেকে চ্যুত হন না, নিজের অক্ষরত্বকে পুরোপুরি বজায় রাখেন তবে জীবও যদি সেইভাবে নিজের আত্মত্বে নির্গুণত্ব ও অনাদিত্ব এবং জ্ঞানশক্তিতে গুণময়ত্ব ও অনাদিত্ব দেখে তবে নিজের জীবত্ব ভূলে সে অনাদিমান্ নির্গুণ ৩জ্ঞ” অংশ ও অনাদিময়ী সগুণা জ্ঞানশক্তির অংশ এই উভয়কেই এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বরূপে জেনে এই দুই অনাদিকে এক জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশদ্বয়রূপে উপলব্ধি করে নিজেকে ভগবৎ সারূপ্যে উন্নীত করতে পারে। এমনটা হতে পারলে আর বিনাশ নেই তখন আগুনের মাঝে আগুন হয়ে না পুড়ে জ্বলেও থাকা যায়। এটা শুধু জানা আর বোঝার ব্যাপার। তাই যাইই কর বুঝে কর। না বুঝে করে তত কিছু হয় না। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই আছে ৩তত্ত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ং”– ৩তৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং তত্ত্বং বদন্তি”। যে অদ্বয় জ্ঞান ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত হন, সেই জ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্গণ ৩তত্ত্ব” বলেন। অদ্বয় অর্থে অদ্বিতীয়। কেবল যে চিৎমাত্র বস্তু বিশ্ব পরিব্যপ্ত রয়েছেন সেই জ্ঞানই হল তত্ত্ব বা ব্রহ্মের স্বরূপ। এই জ্ঞানস্বরূপকে জানার যে সাধন আছে সেটাও জ্ঞান, এটাই হল আগুনের মধ্যে আগুন। এই জ্ঞানের সাধন ঠিক ঠিক মত করে মৎস্বরূপতা পাও। এখন যে ব্রহ্ম থেকে নিজেকে আলাদা ভাবছ সহজতম সাধনার দ্বারাই সেই ভেদভাবটা মিটিয়ে ফেললেই এক অদ্বিতীয় ভাবে স্থিতি হবে। এই অচল স্থিতিই ব্রহ্মপদ। যাঁরা এমন স্থিরতা পেয়েছেন তাঁদেরই চিত্ত এমনভাবে লয় হয়েছে যার নাম প্রলয়। ফলে যার মনই নেই তার সৃষ্টিই বা কি লয়ই বা কি, সুখভোগই বা কি আর দুর্ভোগই বা কি ? এটাই তাঁর স্বারূপ্যে অবস্থান, চিরস্থির, চিরনির্ম্মল সুখ দুঃখ জন্ম মরণের অতীতভাব। (সাধনরহস্যও সেই একই, প্রাণের সুষুন্মায় স্থিতি যার ব্যবহারিক প্রয়োগ গুরুমুখী বিষয়) ১৪/২

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ।। ৩

অনুবাদ: হে ভারত, মহদ্ব্রহ্ম আমার যোনি (গর্ভাধানস্থান) এবং তাহাতেই আমি গর্ভ (জগৎ বিস্তারের হেতু স্বরূপ চিদাভাস) ক্ষেপণ করি, তাহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয় ॥ ১৪/৩

ব্যাখ্যা: সমস্ত জগৎই ভগবানের অভিব্যক্তি, আর আমাদের মধ্যে আত্মারূপে যা রয়েছে তাও সেই শ্বাশ্বত আত্মারই সত্তা। এখনই পাঠক প্রশ্ন করবেন যদি তাই হয় তবে আর জীবাত্মা প্রকৃতিতে বদ্ধ হয় কেন ? যদি বল যে বদ্ধ তো সত্যি সত্যিই হয় না, বদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। তাহলেও সেই প্রশ্ন থাকে যে এমনটা মনেই বা হয় কেন ? এটা শুধুই আত্মবিস্মৃতি। জীব নিজেকে প্রকৃতির গুণগুলোর সাথে এক করে দেখে এবং দেহের জন্ম মৃত্যুতে নিজেও জন্মাচ্ছে, মরছে ও দুঃখে দুঃখ পাচ্ছে বলে মনে করছে। নির্গুণ, কূটস্থ, অক্ষর, আত্মা ও অব্যক্ত প্রকৃতি এই উভয় তত্ত্বকে একত্রে গ্রহণ করে মহদব্রহ্মের প্রকাশ। পরমাত্মার নির্গুণ আত্মত্ব ও অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ প্রকাশদ্বয় একত্রে সংযুক্ত হলেই সর্ব্বভূত সম্ভাবনা স্ফূটিত হয়। এই উভয় তত্ত্বের মিলনই সর্ব্বভূত সম্ভবের যোনিস্বরূপ। এ মিলন সংঘটনের নামই গর্ভাধান করা যেটা পরমাত্মার ইচ্ছাধীন। যদিও এ সৃষ্টিক্রম ভগবান এভাবে বললেও এ সৃষ্টিতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম। প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন সাধকগণই এটা সম্যক বোঝেন তবুও শঙ্করভাষ্য সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে বার বার বিভিন্ন ভাবে এটা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। বাহ্যভাবে বুঝতে বা বোঝাতে গেলে বলে শেষ করা যায় না আর পাঠকের ও শ্রোতাদেরও সব প্রশ্নের সঠিক উত্তরও হয় না কারণ যেটা নিজের বোধের ব্যাপার সেটা অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে মোটেই বোঝা যায় না। তবুও শাঙ্কর ভাষ্যের বাংলা অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল। ৩আমার আত্মাস্বরূপা – মদীয়া যে মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দিষ্ট, সেই মায়াই যোনি অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ – অতএব এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান এবং আত্মবিকারস্বরূপ সকল কার্য্যের ভরণ করিয়া থাকে; এই কারণে সেই প্রকৃতিই এই স্থানে৩মহৎ’ ও৩ব্রহ্ম’ এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। সেই মহৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলে গর্ভ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভেরও জন্মহেতু বীজ অথবা সর্বভূতের জন্মকারণস্বরূপ বীজ। সেই বীজকেই আমি সেই প্রকৃতিরূপ যোনিতে আহিত করি। ইহার তাৎপর্য্য – ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই ঈশ্বরের শক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরই অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে স্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভূতগণকে তাহাদের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করেন। এই প্রকার সংযোজনই গর্ভের আধান। সেই গর্ভাধানেরই ফল হইতেছে সর্বপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। এই সর্বভূতগণের উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির পরে হয়।” সহজ করে সংক্ষেপে বলতে হয় স্ত্রীপুরুষ

সহযোগে যেভাবে জীব সৃষ্টি হয় তেমনই মহাকাল সংযোগে আদ্যাশক্তি হতে এ জগৎ সৃষ্টি হয়ে চলেছে ॥ ১৪/৩

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ।।৪

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি যোনি সকলের স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয় , মহদ্‌ব্রহ্ম তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি বীজপ্রদ (গর্ভাধান কর্ত্তা) পিতা ॥ ১৪/৪

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যা বলা হল সর্ব্বত্রই সেই একই সৃষ্টিক্রম প্রযোজ্য। দেব পিতৃ মনুষ্যাদি লোকে জন্ম, জরা, মরণময় যেখানে যা কিছুই জন্মে মহদব্রহ্মই তার যোনি মানে মাতৃস্বরূপা আর আমি তার বীজপ্রদ পিতৃস্বরূপ গর্ভাধান কর্ত্তা। প্রশ্ন হোক মহদব্রহ্মটা কে ? এখানে মহদ্‌ব্রহ্ম মানে হল পরমকারণ। আর আমিটা কে ? আর আমি হচ্ছি সেই অহংরূপী কূটস্থ চৈতন্য। একটু বিশদভাবে বলা যায় কূটস্থ অক্ষর আত্মরূপ গ্রহণ করে, অব্যক্ত প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র দর্শন করে, তারপর এই উভয় প্রকাশের দ্বন্দ্ব রচনা করে, মহদ্‌ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বভূতমাতৃত্ব তিনিই পরিগ্রহণ করেন এবং পরে সেই অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ ভূমিরই গর্ভে সেই কূটস্থ অক্ষর আত্মত্ব হতেই ক্ষর প্রত্যগাত্মরূপ বীজ সকলকে সেই ভূমা ব্রহ্মভূমিতে প্রক্ষিপ্ত করেন। এটাই হল তাঁর বীজপ্রদ পিতৃত্ব। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে– “যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন।” তাহলে প্রকৃতি পুরুষ একেরই ভিন্ন উপাধি মাত্র। সাধনদ্বারা যতক্ষণ গুণসঙ্গরহিত ততক্ষণই নির্গুণ, তখনই তাঁর উপাধি পুরুষ, আর বাহ্য ব্যাপারে যতক্ষণ লিপ্ত থাকেন ততক্ষণ গুণযুক্ত তাই তখন তাঁর উপাধি প্রকৃতি। সুতরাং দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি যোনিতে যতরকম মূর্ত্তি উৎপন্ন হয় মহদ্‌ব্রহ্মই তার যোনি, মানে উৎপত্তির কারণ এবং‘আমি’ কূটস্থ চৈতন্যই তার বীজপ্রদ পিতা। যতরকম যোনি থেকে (genetically) যতরকম সব মূর্ত্তি হচ্ছে সেগুলো সবই একটু একটু আলাদা আলাদা যোনি হলেও সেই বৃহৎ, অবিভক্ত ও মহৎ ব্রহ্মযোনি হতেই জাত। সেজন্যই এমনতর ব্রহ্মাণুজাত উপাদান ব্যতিরেকে কোনওরকম পষড়হরহম ইত্যাদিও সম্ভবে না। যোনি অর্থ সৃষ্টির কারণ আর‘আমি’টি হল বীজ যা ব্রহ্মাণুরূপে সর্ব্বত্র সম্প্রবিষ্ট। অর্থাৎ শক্তিদ্বারা নিজ হতে নিজের মূর্ত্ত্যান্তর গ্রহণ। তাই আত্মজ পুত্রই পিতা, পিতাই পুত্র ॥ ১৪/৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ।। ৫

অনুবাদ: হে মহাবাহো, সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে স্বকার্য্য সুখ দুঃখ মোহাদিদ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ১৪/৫

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর অধীন হয়েই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে সর্ব্বভূতোৎপত্তি বর্ণনার পর এবার প্রকৃতির সংযোগে পুরুষের সংসার অবস্থা চৌদ্দটা শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণই প্রকৃতি হতে সঞ্জাত। এবং এই গুণত্রয়ই অব্যয় জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে রাখে। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নামই হল প্রকৃতি। কূটস্থ আত্মা যেখানে সেই সাম্যাবস্থা দর্শনশীল সেখানেই তাঁর কূটস্থত্ব। এখানে প্রশ্ন একটা হয়ই। দেহী যদি জন্ম, জরা, মরণাদি রহিত হয় তবে এই সব সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ ও তাদের সুখ দুঃখ মোহাদি তাঁকে বদ্ধ করে কি করে ? বদ্ধ এভাবেই করে পরমাত্মপ্রভাবে যখনই ঐ গুণত্রয়ের বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এমনটা হলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈষম্য রচিত ত্রিবৃতের একীকরণ সম্পাদন ও তাতে কূটস্থ আত্মা হতে ক্ষর আত্মাসকল অনুপ্রবিষ্ট হয়। তা না হলে প্রলয়কালে তো সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যবস্থা পেয়েই থাকে। অতএব সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতি ও ত্রিগুণে কোনও ভেদ নেই। কিন্তু প্রকৃতিতে বৈষম্য আরম্ভ হলেই ত্রিগুণ প্রকাশিত হতে থাকে আর জীব জগৎ সব কিছু সৃষ্টি হতে শুরু হয়। এবার এ প্রকৃতিজাত গুণগুলো এই দেহেই থাকে। ব্যাস্ আর যাবে কোথায় ? জীবাত্মা জন্ম মরণ জরার অতীত হলেও এখন আর তা থাকে না। বরং ঐসকল গুণের ধর্ম্ম দেহের দখল নিয়ে নেওয়ায় ত্রিবৃতের বিকারকেই নিজের বিকার বলে জ্ঞান করে ও নিজেকে আদিমান জাত বা জন্মমৃত্যু সংস্কারময় করে ফেলে। অব্যয়ত্ব ও অনাদিত্বময় স্বরূপটা তমোগুণে আবৃত হয়ে অব্যয় আত্মাকে যেন ক্ষরণশীল করে রাখে। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার আশ্রিত যে গুণ তা যেন আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধন করে বলে মনে হয়। মহাবিস্মৃতিতে ঢাকা পড়ে থাকে তার নির্গুণত্বের প্রজ্ঞা। তাই নিত্যবদ্ধরূপে নিজেকে উপলব্ধি করে। আশাকরি বোঝা গেল বিষয়টা। পাঠক বুঝে দেখুন একবার মায়ার কি শক্তি! “মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্” এই মায়াই পরাপ্রকৃতি। গীতাতেই ভগবান বলেছেন– এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় ও প্রেরণায় চরাচর জগৎ সমস্ত সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ না হলে সৃষ্টি হয় না। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হলেই প্রাণচঞ্চল হয়ে সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ রূপে বাহন ইড়া পিঙ্গলায় প্রবাহিত হয়ে পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকারে পরিণত হয়ে সব কিছুতে আত্মবোধ হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞ তাতে আসক্তির দৃষ্টিপাত করেন। ব্যস্ তাতেই নিত্যমুক্ত অবিনাশী কূটস্থ দেহী দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এটাই হল ব্যাপার ॥ ১৪/৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ।। ৬

অনুবাদ: হে অপাপ, সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু (জ্ঞানের) প্রকাশক এবং অনাময় (শান্ত) সত্ত্বগুণ (দেহীকে) সুখ সঙ্গদ্বারা (সুখে আসক্তি দ্বারা) এবং জ্ঞানসঙ্গদ্বারা (জ্ঞানে আসক্তিদ্বারা) বদ্ধ করে ॥ ১৪/৬

ব্যাখ্যা: সত্ত্বগুণের বন্ধন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগেও অনঘ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে অনঘ অর্থে– অন = ন, অঘ =পাপ, অর্থাৎ পাপ নেই যাতে মানে নিষ্পাপ যা এখানে সত্ত্বগুণেরই ইঙ্গিতাবাহ। ত্রিগুণের ভিতর সত্ত্বগুণই স্ফটিকস্বচ্ছ নির্ম্মল ও অনাময় মানে শান্ত কিন্তু আসল কথা হল তাতেও আসক্তি থাকে, শুধু আসক্তিই বা বলি কেন, বন্ধনের সকল শক্তিই অপর দুই গুণের মত সত্ত্বেও আছে এবং ঐ একইরূপে বাসনা ও অহংবোধের দ্বারাই বন্ধন করে। তবে হ্যাঁ; সেই বাসনা ও অহং আদির ভাবটাও সাত্ত্বিক মানে শুদ্ধতর ও মহত্তরই হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে জ্ঞানে আগ্রহ ও তৎজাত জ্ঞান জীবকে সমৃদ্ধ ও সুখী করে যে সুখে পুরুষ সন্তোষ অনুভব করে “সন্তোষম্পরমং সুখম্”। অতএব এমন মনোধর্ম্ম আবার সকলকেই তদ্ভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজনা করে থাকে। তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে কিন্তু সত্ত্বগুণ সেই আবরণকে নষ্ট করে। এই প্রকাশগুণই বস্তুর স্বরূপ বুঝিয়ে দেয় ফলে জ্ঞান জন্মায় বটে কিন্তু সেই জ্ঞানটাও পূর্ণজ্ঞান নয়, রজস্তমের মিশ্রণ মাত্র। অথচ সবজান্তা ভাবের উদ্দীপন করে খণ্ডিত সুখে আবদ্ধ করে ও অজ্ঞ জীবকে সুখ শান্তির রস জোগান দিয়ে থাকে। পাশ্চাত্য প্রবাদ বাক্যেও আছে “Ignorance is a bliss”| বেদে অবশ্য সত্ত্বগুণকে প্রধান বলা হয়েছে, কারণ উপলব্ধি ও তার ফলস্বরূপ সন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে সত্ত্বগুণ। কিন্তু ঐ বেদেই আবার সুখ শব্দের অর্থ ব্রহ্মেরই নামান্তর। আগেও বলেছি‘সু’ মানে সুন্দর ও সুলভ‚‘খ’ মানে আকাশ, আর ব্রহ্মই অন্তরাকাশ, আত্মস্বরূপ অন্তরাকাশ যে বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য সেটাই সত্ত্বঃ অতএব বেদে সত্ত্বগুণকে কেন প্রাণ বলা হয়েছে বোঝা গেল। প্রাণই বিধৃতিশক্তি, প্রাণই রসস্বরূপ। বাহ্যভূতকে আত্মার সাথে দেহরূপে সংযুক্ত রাখা প্রাণেরই ধর্ম্ম। বাহ্য ভূতজ্ঞানকে আত্মস্থ করে রাখাও প্রাণেরই ধর্ম্ম। ফলে এরই দ্বারা আবার আমরা ভূত থেকে সুখ পেতেও সদা লালায়িত থাকি। সুতরাং এর দ্বারাও বহির্বিষয়ে আসক্তি হয় ও জীব বন্ধন দশায় পড়ে। পদার্থ বিজ্ঞানের যে জ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় যে জ্ঞান সত্ত্বগুণজাত জ্ঞানও এমনতর। সেজন্যই জ্ঞান এর সঙ্গ ত্যাগ কম কঠিন নয়। একমাত্র আত্মাতে মনের যে ঐকান্তিক স্থিতি ওটাই হল সত্যজ্ঞান ও সত্যজ্ঞানের প্রকাশক। নইলে যে পরাবিদ্যা বলে আত্মদর্শন হয় ওটাও জ্ঞান নয়। তবুও ত্রিগুণের সেরা হল সত্ত্বগুণ। এই শ্রেষ্ঠগুণকে কাজে লাগিয়েই গুরুকৃপালাভ করতে হবে ও গুণাতীত হতে হবে। সন্ত কবীরদাসের ভাষায় –

“কবীর, সিকলিগর কীজিয়ে, সবদ মস্কলা দেই।
মনকী মৈল ছুড়াইতে চিত দর্পণ করি লেই ॥”

সত্ত্বগুণে স্থিত হও, হয়ে সিকলিগর অর্থাৎ শান দেবার যন্ত্রে মনকে শান দিয়ে ময়লা ছাড়াও মানে চিত্ত স্থির কর যাতে সঠিক প্রতিবিম্ব আসে। তারপরই গুরুকৃপালাভে সচেষ্ট হও কারণ –

“গুরুধোবী, সিখ কাপড়া সাধন সীজনহার,
সুরত সিলাপর ধোইয়ে, নিকলে জ্যোতি অপার ॥”

শ্রীগুরুদেব শরণাগত শিষ্যকে কিভাবে সাহায্য করেন সেটা বলছেন। তিনি ধোপার মত শিষ্যকে সাধনরূপ (সীজনহার মানে সাজিমাটি) বর্ত্তমান সোডা সাবান ইত্যাদি মাখিয়ে আত্মার ধ্যানরূপ পাথরের উপর বার বার আছাড় মারতে শেখান। মানে গুরুপদেশ অনুযায়ী সাধনদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় সেই জ্ঞানদ্বারাই আসক্তি নাশ হয়। প্রকৃতির উর্দ্ধে যে আত্মা আছে তাঁকে দেখে তাঁর সত্তা ও চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েই প্রকৃত গুণাতীত হওয়া, আত্মজয় করা ও মুক্তিলাভ সম্ভব হয় ॥ ১৪/৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ।। ৭

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, রজোগুণকে রাগাত্মক (অনুরাগাত্মক) এবং তৃষ্ণা (অভিলাষ) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে উৎপন্ন জানিও। তাহা দেহীকে কর্ম্মসকলে আসক্তিদ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ১৪/৭

ব্যাখ্যা: এবার রজোগুণের বন্ধন বলা হচ্ছে। রজোগুণ রাগাত্মক মানে হল আসক্তিকারক রঞ্জকবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (super libido) অর্থাৎ রাঙিয়ে দেয়। রঞ্জনা থেকেই রাগ শব্দের উৎপত্তি। কাপড়ে রং করলে কাপড় যেমন রঙে মিশে বা রং যেমন কাপড়ে মিশে গিয়ে কাপড়ের তন্ময়তা পায় মানে সেই রঙেরই হয়ে যায়, সেই রকম রজোগুণ প্রভাবে জীবও অন্য কোনও বস্তু ব্যক্তি বা কোনও কিছুর সাথে তন্ময় হয়ে থাকে। এমন তন্ময়তার প্রবণতার জন্যই এটা তৃষ্ণা ও আসঙ্গ গুণাত্মক। এই তৃষ্ণার প্রভাবেই মানুষও অহর্নিশ কর্ম্মচঞ্চল ও তৎসঙ্গ সুখের জন্য লালায়িত থাকে। অন্যের কাছে মাথাকে নিচু করায়, দাসত্ব স্বীকার করায়, সবই সেই অভিলাষিত বস্তু পাবার জন্য। যত যা কিছু দেখ দেশভক্তি, অন্যের মঙ্গল করার ইচ্ছা সব কিছুর মুলেই এই আসক্তি। সেজন্য যাঁরা অন্যের কল্যাণ করতে সত্যিই চান, তাঁরা মন দিয়ে সাধনা করে আগে নিজে অসক্তিশূন্য হন, তবেই সত্যি করে অন্যের ভাল করতে সক্ষম হবেন ॥ ১৪/৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিতধ্নাতি ভারত ।।৮

অনুবাদ: হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞান-সম্ভূত এ জন্য সকল প্রাণীর ভ্রান্তিজনক জানিও। ইহা অনবধনতা, অনুদ্যম ও চিত্তের অবসন্নতা দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে ॥ ১৪/৮

ব্যাখ্যা: এবার তমোগুণের বন্ধন বিষয়ে বলা হচ্ছে। অজ্ঞান হতেই তমোগুণের জন্ম। অজ্ঞান অর্থে অপরাপ্রকৃতি। অপরাপ্রকৃতি যেমন আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আত্মজ্ঞান সংহরণ প্রধান, এই তমোগুণটাও তেমনি সবরকমের অনাত্ম জ্ঞানপ্রকাশ ও জ্ঞানক্রিয়ার বিরোধী ও সংহরণকারী। তাই অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তিটাই হল রজোগুণ আর সেই অবিদ্যার আবরণ শক্তিটা হল তমোগুণ যা সর্ব্বদাই জীবকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এমনই মোহে ঢেকে ফেলে যে যাতে ভাল হবে সে দিক দিয়েও যাবে না আর যাতে নিজেরই খারাপ হবে তাতেই খুব উৎসাহ পায়। যে যত তমোগুণের বশীভূত হয় তার অজ্ঞানও ততই বাড়ে। বুদ্ধির বিপর্য্যয়ভাব সর্ব্বদাই তমোগুণীকে ধরে রাখে। সন্দেহ বৃদ্ধি হয়, বুদ্ধির বিপর্য্যয়ভাব বাড়ে। সদগুরুর কথা অথবা বকাঝকাকে অযথা চেঁচামেচি বলে বোধ করে, ফলে যেখানে কিছু খাতির ও আপ্যায়ন পায় সেদিকেই ছোটে। সব দিক থেকে বিচার করেই তমোগুণকে অজ্ঞানতা বলা হল। তবে যাঁরা গুরুপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখা অভ্যাস করেন তাঁরাই এসব বিষয়ে সচেতন হন এবং শ্বাসে লক্ষ্য রেখে প্রাণায়াম করে এ সবের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেন ও সত্ত্বগুণের দিকে এগিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকেন ॥ ১৪/৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ।। ৯

অনুবাদ: হে ভারত, সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে, আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদে ও আলস্যাদিতে আবদ্ধ করে ॥ ১৪/৯

ব্যাখ্যা: এবার তিনগুণের তিন রকম শক্তি ও সামর্থ্যের কথা বলা হচ্ছে। গুণশ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম সুখে আবদ্ধ করা, সেটা একটা বড় বন্ধন সন্দেহ নেই। তবু সুখে আবদ্ধ হওয়া তো বরং ভাল যেহেতু তাতে সুখটাতো অন্ততঃ আছে তা সে যেমনই হোক না কেন বন্ধন। সত্ত্বে স্থিতিই উন্নতির পথ।

আর রজোগুণ শুধুই কাজ বাড়িয়ে চলে। কি কাজ ? শুধুই অকাজ, যেমন সাধু হলি ত্যাগের জন্য তা আবার মঠ বানালি কেন ? তাতেও কি রেহাই আছে ? যা কিছু উপেক্ষা করার কথা তা নিয়েই

মাসে বিশবার কোর্ট কাছারিতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, ধনীদের শিষ্য বানাবার ফন্দি ফিকিরে ব্যস্ত, সন্ন্যাসী সেজেও বিষয় ভোগে অসাধারণ আসক্তি ও দক্ষতা। কিছু বলতে গেলে উল্টো জ্ঞান দিয়ে দেয় ও বলে তিনি জনক রাজার মত করে বিষয় ভোগ করে থাকেন। বোঝ অবস্থাটা একবার। চারিদিকে জনক রাজার সংখ্যা যে খুবই বাড়ছে সেটা মঠ মিশনের রমরমা দেখলে বেশ বোঝা যায়। রজোগুণের এমনই খেলা।

তমোগুণ আরও অদ্ভুত। হয়ত কিছুটা পূর্ব্বসুকৃতির বশে অথবা কোনও সৎসঙ্গে পড়ে মনটা বেশ একটু উঠতে লাগল মানে স্থিতিতে আসতে শুরু করল, বেশ একটু বুঝতে লাগল, বিচারবোধও জন্মাতে লাগল। এমন অবস্থায় একটু অপর সঙ্গে অথবা কারো কথায় বুদ্ধির গতি অন্যদিকে মোড় নিল আর অবিদ্যার পিছু নিল, কি বিচিত্র অজুহাত আর অছিলায় এরা সৎসঙ্গ পরিহার করে। এভাবে তমোগুণ কেবলই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে থাকে। অবশেষে একদিন সেই সৎ বন্ধুও মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ভাবে একে আমার ভাবে নিয়ে আসা বা উন্নীত করা বড় সহজ কাজ নয়, এই ভেবে সেও হাল ছেড়ে দেয়। যদিবা কোনও ভাবে সদ্গুরুলাভ হয়েও যায় তবুও কিছু হয় না। অবিদ্যার মাত্রা তমোগুণেই সবচেয়ে বেশী হয়। এজন্য তমোগুণী বিষয়কর্ম্মেই বেশি আকর্ষণ বোধ করে। বাকিটা নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্য, বউ, ছেলে, মেয়ের মোহ ও কামজ আকর্ষণেই কাটিয়ে দেয়। ভাবে আমার বৌই শ্রেষ্ঠা অথবা স্ত্রীরা ভাবেন আমার স্বামিই কন্দর্প, আমার পুত্রই কার্ত্তিকেয়, আমার কন্যাই রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এরাই যে সময়মত মুখে লাথি মারবে সেটা বোধেই আসে না। এমনই মোহ থেকে বার্ধক্যের কান্না ও অন্ধত্বের সৃষ্টি হয় ॥ ১৪/৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ।।১০

অনুবাদ: হে ভারত, কদাচিৎ রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়। কখনও সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ উদ্ভূত হয়, আর কখনও বা সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ উদ্ভূত হয় ॥ ১৪/১০

ব্যাখ্যা: স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে কোনও একটা গুণ যদি বাড়তে সচেষ্ট হয় তবে অন্য দুটো গুণকে অবশ্যই অভিভূত করতে হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই এই বিজ্ঞানটা কার্য্যকর। আকাশে সূর্য্য উঠে গেলে তারারা হারিয়ে যায়। এভাবে কমা বাড়া বা উদয় অস্তের কারণেই অনাদি জ্ঞান–কর্ম্মসংস্কারস্রোত বিবিধ বৈচিত্র্য রচনা করে চলেছে। এখানে ভগবানও বলতে চেয়েছেন জীবের কর্ম্মসকল কিভাবে বিভিন্ন আকারীয় ভাবে ফলপ্রসূ হয়ে চলেছে সেই ক্রমধারার বর্ণনা। এক গুণের উদয়ে অপর গুণদ্বয় নিস্প্রভ হয় বলেই

জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সকল বৈচিত্র্য পেয়ে থাকে। কখনই তিনটে গুণ একসাথে একই গতিতে ও শক্তিতে কাজ করতে পারে না। আবার এ গুণগুলো স্বেচ্ছামত দেহে ভর করে না, কিছুটা পূর্ব্বজন্মসূত্র ধরে দেহীকে বিকল করতে থাকে। তাই সাধারণ মানুষও স্রোতের তাড়া খাওয়া তৃণের মত এমনভাবে গুণকর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে। কোনও অপকর্ম্ম করার সময় রজঃ ও তমোগুণে আবৃত ছিলেন আবার সেই কাজের অনুতাপ করার সময় সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেল। পুনরায় মনে করলেন, বেশ করেছি ঠিক করেছি, তখনই আবার সত্ত্ব থেকে তমোগুণে এলেন। আবার যদি মনে হয় না, না, কাজটা মোটেই ঠিক করিনি, মোটেই ভাল হয়নি কাজটা, তখনই আবার তমো থেকে সত্ত্বগুণে এলেন। এমন গুণকর্ম্মে শ্বাসের ভূমিকা প্রধান, অপর উপাদানগুলোর ভূমিকা অপ্রধান। শরীরে বায়ুর গতি অনুযায়ী তিন গুণের কাজ হয়। পিঙ্গলায় রজঃগুণ, ইড়ায় তমোগুণ আর সুষুন্মায় সত্ত্বগুণ। বায়ুর গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মও সংঘটন হয়ে চলে কিন্তু আমরা বাইরে থেকে শুধুমাত্র কর্ম্মটাকেই লক্ষ্য করি। একমাত্র সাধকগণই গুরুনির্দ্দেশে শ্বাসে লক্ষ্য করে থাকেন ॥ ১৪/১০

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ।। ১১

অনুবাদ: যখন এই দেহে (শ্রোত্রাদি) সর্ব্বদ্বারে জ্ঞানময় প্রকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণকে বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জানিবে ॥ ১৪/১১

ব্যাখ্যা: এবার তিনগুণেরই বাড়বাড়ন্তের লক্ষণগুলো বলা হচ্ছে। এই দেহে যখন যেমন যেমন গুণ বাড়ে লক্ষণগুলোও তেমন তেমনই দেখা যায়। যেমন যদি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তবে আত্মার এই ভোগায়তন দেহে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারাদিতেই সত্ত্বগুণ সমৃদ্ধ প্রকাশ ঘটে। কথাবার্তা ভাবভঙ্গী সব কিছুতেই সাত্ত্বিকতার প্রকাশ হয়। দুই কানে অশব্দের অনাহত শব্দ ও অন্তঃচক্ষুতে অপূর্ব্ব দর্শন, জিহ্বায় অপূর্ব্ব স্বাদ, নাকে সুন্দর সুবাস সর্ব্বোপরি অপূর্ব্ব মনের স্থিরতাজনিত শান্তি বিরাজ করে। সুষুন্মায় প্রাণের প্রবাহে সকল ইন্দ্রিয়েই এত সুন্দর অনুভব হয়। এই অবস্থায় যা জানবে সেটাই জ্ঞান বা বিদ্যা আর সবই অবিদ্যা, অজ্ঞান ॥ ১৪/১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মনামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ।। ১২

অনুবাদ: হে ভরতর্ষভ, লোভ, প্রবৃত্তি (সর্ব্বদা সকাম কর্ম্ম করণেচ্ছা) কর্ম্ম সকলের আরম্ভ (উদ্যম), অশম (অশান্তি) এবং স্পৃহা (বিষয় তৃষ্ণা) এই সকল চিহ্ন রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলেই জন্মে ॥ ১৪/১২

ব্যাখ্যা: সত্ত্বগুণের পর এবার রজোগুণ বৃদ্ধির চিহ্নসকল লক্ষ্য করুন। রজোগুণের বর্দ্ধনে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মোদ্দীপনা, ও কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ প্রবেষ্টিত হবার ইচ্ছা এবং স্পৃহা দুইই জন্মে। সবকিছুতেই প্রবল আসক্তি, তারপর লোভ প্রবৃত্তি প্রবল হয়। টাকা পয়সা যথেষ্ট থাকলেও আরও চাই। মোটামুটি ভাল চাকুরি করা সত্তেও, ভাল আয় থাকা সত্তেও, কোম্পানির দালালি, বাণিজ্যিক সংস্থার উৎপাদিত পণ্যের বিপণণে আত্মনিয়োগ করা এবং এহেন কাজের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করা, ইত্যাদি সবটাই প্রবৃত্তি পক্ষীয় রজঃগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ। এরা কখনই সম্যক প্রকারে ইচ্ছারহিত হতে পারে না, ফলে অশম – মানে মনের শান্তি কিছুতেই পায় না। স্পৃহার কবলে পড়ে যা কিছু দ্রব্য, ভূমি, ধন, স্ত্রী, "সবই আমার" সর্ব্বদাই মনে এমন একটা জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে ॥ ১৪/১২

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ।। ১৩

অনুবাদ: হে কুরুনন্দন, বিবেকভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্যের অনুসন্ধানরাহিত্য ও মিথ্যাভিনিবেশ – এই সকল চিহ্ন তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে উৎপন্ন হয় ॥ ১৪/১৩

ব্যাখ্যা: এবার তমোগুণের বিবৃদ্ধির বিষয়। ভগবান অর্জুনকে আবারও কুরুনন্দন বললেন। কুরু হলেন চন্দ্র বংশীয় রাজা। অর্জুন এই বংশের সন্তান বলেও কুরুনন্দন। এছাড়াও ইড়া নাড়ী মানে চন্দ্রনাড়ীতে প্রাণের গতি হচ্ছে বলে তেজস্তত্ত্ব সেই প্রাণেরই তেজ। অতএব সেই একই বংশজাত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন। এদিকে আবার ইড়া বা চন্দ্র নাড়ীতে গতি হলে তমোগুণও বৃদ্ধি পায় যার লক্ষণসমূহ অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, জ্ঞানবিপর্য্যয়, বিমূঢ়তা ইত্যাদি যা সব তমোগুণের বিবর্দ্ধনাসম্ভূত। সুপ্তি ও মুর্চ্ছাদিতে চতুর্দ্দশকরণের যে নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ পায়, তাই অপ্রকাশ। আর অপ্রবৃত্তি হল জাড্য, অলসতা, এমন সমস্ত উদ্যমহীনতা, প্রমাদই হল জ্ঞানবিপর্য্যয়। কোনও বিষয়ে বা ভাবে অনবছিন্ন মগ্নতার নাম হল মোহ। এসমস্তগুলোই তমোগুণের বিবর্দ্ধন থেকে জন্মে। তাহলে যখন সবই অপ্রকাশ তখন সুবুদ্ধি দিলেও শুনবে কেন ? জ্ঞানের কথা শোনালেও তা মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য এ সমস্ত বৃত্তিগুলো তমোগুণ বৃদ্ধি হলেই হয়। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা না করা, মোহবশতঃ নেশা মানে মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট খাওয়া, এমনকি গুরুবাক্যেও অবহেলা করা ও জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির কথা জেনেও সাধনে প্রবৃত্ত না হওয়া তমোগুণেরই চরম বিবৃদ্ধির লক্ষণ।

মতান্তরে কোনও কোনও যোগী কোথাও কোথাও পিঙ্গলায় শ্বাস বইলে তমোগুণ বৃদ্ধির কথা বলেছেন ॥ ১৪/১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ।। ১৪

অনুবাদ: সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিকালে জীব যদি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তবে তিনি উত্তমবিদগণের (ব্রহ্মবিদগণের) অমল (প্রকাশময়) লোকসকল প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ তাঁর উত্তম গতি হয়) ॥ ১৪/১৪

ব্যাখ্যা: দৈহিক মৃত্যুই সব থেকে বড় প্রলয়। গুণত্রয়ের প্রভাব জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ক্রিয়াশীল থাকে। মরণকালে গুণত্রয়ের বিবৃদ্ধির পরিণাম বর্ণনা হয়েছে এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলোতে। অতএব শুধু ইহকালই নয় পরকালের গতিও এমনগুণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষের গতি বলা হচ্ছে। স্বত্ত্বপ্রধান পুরুষ দেহত্যাগের পর উত্তমবিদ্গণের অমললোকসকল প্রাপ্ত হন। জ্ঞানতত্ত্ববিদ্ পুরুষকে উত্তমবিদ্ বলে। সিদ্ধর্ষিগণ, হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা যাঁরা করেন তাঁরা উত্তমবিদ্। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে মহৎ আদি তত্ত্বগণের কথা বলা হয়েছে, (উত্তমবিদাং = মহদাদিতত্ত্ব-বিদাম্)। সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণের স্থিতি কাল যত বাড়ে ততই চিত্তে সত্ত্বভাবের উদয় হয়। এমন স্থিতিতে মৃত্যু হলে আর চিন্তা কি ? সুষুম্নামার্গে প্রাণপ্রবাহ চললে তো ইড়া পিঙ্গলার অতীত অমল স্থানে থাকাই হল। আর যদি সুষুম্নারও অতীত, মানে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এ তিনেরই অতীত কোনওভাবে হওয়া গেলে সেটাই ব্রহ্মপদ। যুধিষ্ঠিরের এমনটা ঘটেছিল। সাধনার এক পর্য্যয়ে নরক দর্শন হলেও সম্পূর্ণ অহং ত্যাগের দ্বারা অবশেষে স্বর্গে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে উপনীত হতে পেরেছিলেন যার সঙ্গী হয়েছিল কুকুর। কুকুর কেন ? কুকুর অহংবিহীনতার প্রতীক। যা হোক, সুষুম্নায় স্থিতিতে দেহত্যাগ করতে পারলেই কূটস্থ জ্যোতিঃ দর্শন করতে করতে প্রকৃতির পরপারে উপস্থিত হয়। সেটাই নির্ম্মল ব্রহ্মলোক। আর পরাবস্থায় মৃত্যু ? তার তো কথাই নেই, ব্রাহ্মীস্থিতিতে দেহ বিলয় হলে "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" একেবারে সদ্যমুক্ত ॥ ১৪/১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বাকর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫

অনুবাদ: রজোগুণের বিবৃদ্ধির সময়ে মৃত ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪/১৫

ব্যাখ্যা: এবার রজো ও তমোগুণ বৃদ্ধিকালে দেহপাত হলে কি হয় সেটা বলছেন। রাজসিক পুরুষ মনুষ্যলোকে, আর তামসিকগণ পশুতুল্য মানুষ অথবা পশু আদি ইতর প্রাণীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কি সাংঘাতিক পতন! রজোগুণের চিহ্নই কর্ম্মাসক্তি সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রজোগুণে তো লোক ফল লাভের জন্যই কাজ করে। দেহশেষ হলে তো সেই কাজের যন্ত্ররূপ উপায়টাই শুধু গেল কিন্তু মন আর মনের বাসনাটা তো থেকেই গেল। সুতরাং পরবর্ত্তী দেহ প্রকৃতি সেই বাসনা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তাই মনুষ্য দেহই লাভ হয় যেটা একই ক্লাসে ফেল করে পড়ে থাকার মত। কোথায় মনুষ্যত্ব থেকে উন্নীত হওয়ার কথা তা নয় সেই পুনঃমূষিকোভব গোছের অবস্থা হল, আবার সংসারের ঘানিতে জুতে গেল।

আবার দেহান্ত সময় তমোগুণের আতিশয্য থাকলে আরও বিপদ। কারণ তমোগুণের ধর্ম্ম হল বিচারশূন্যতা ও জ্ঞানজাড্য। অন্ধের মত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি অতিমাত্রায় থাকলে সে সমস্ত বৃত্তিগুলো চরিতার্থ করার মত শরীরও তো চাই। সেজন্য ক্রূর বৃত্তির জন্য সাপের শরীর, হিংস্রতার জন্য বাঘের শরীর, লোভের জন্য বিড়াল, কামের জন্য কুকুর, পাঁঠা, ছাগল ইত্যাদির দেহও ধারণ করতে হয়। রজোগুণের উপমা যদি একই ক্লাসে ফেলের উপমা হয় তবে এটা হল আরও অবনমন (demotion)। কারণ তমোগুণ বৃদ্ধিতে বুদ্ধিলোপ পেয়ে একটা গণ্ডমূর্খের মত মনোভাব জন্মে। ফলে সবরকম সরলতা নষ্ট হয়ে ভিতরটা জটিল জিলিপির প্যাঁচ বা তারও অধম কিছু একটা হয়। বস্তুবাদী মনোভাবাপন্নগণের ভিতর এটা সহজেই চোখে পড়ে। কত সহজেই কর্তৃত্ব করতে চায়, এমনকি এর জন্য খুনোখুনি পর্য্যন্ত করে থাকে। খুবই অশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি ? সকলের মধ্যে সেই একই নারায়ণ অথচ গুণভেদে কত বৈষম্য ! যেমন রঙ্গীন চশমা পরলে সব কিছুই সেই রঙেরই দেখা যায় তেমনই নির্ম্মল শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ভিতর দিয়ে দেখলেও তেমনটাই দেখায়। আর একেবারে পরিশুদ্ধ ভাবের যেহেতু কোনও রংই নেই তাই শুদ্ধ চৈতন্যকে বোকা, চোর, লম্পট, মূর্খ বলে মনে হয় যেহেতু তিনি সব জেনেও নির্লিপ্ত, যেন কিছুই জানেন না, অথচ এই সমস্ত প্রকৃতির দাস যাঁরা তাঁরা কিছুই জানেন না তবুও বলে থাকেন সবই জানি। তাই এঁরাই মাঠে ময়দানে সমাবেশ আয়োজন করে মাইক ফুঁকে ভাষণ দিয়ে থাকেন, মানুষকে কত কি বুঝিয়ে থাকেন। কারণ মানুষ তো বোকা, নির্ব্বোধের দল, মূর্খের দল, পশুর দল আর তাঁরাই হলেন প্রজ্ঞাবান, যেহেতু তাঁরা সংগঠিত ও দলবদ্ধ ১০৮ নং মহাপুরুষ, তাই তাঁরাই জ্ঞানদানের অধিকারী, তাঁদের সুবিধামাফিক ফরমায়েস তাঁরাই করেন যাতে সুখের আধিপত্য কায়েম রাখা যায় ॥ ১৪/১৫

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ।। ১৬

অনুবাদ: সুকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্মের সত্ত্বপ্রধান নির্ম্মলতাই ফল, (ইহা পণ্ডিতেরা) কহিয়াছেন। রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়ত্ব ॥ ১৪/১৬

ব্যাখ্যা: এবার ফলাফল আলোচনা। গুণভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মের ফলাফল দেখান হয়েছে। ফলাফল বাহ্যরূপানুবর্ত্তী নয় বরং গুণানুবর্ত্তী। সুকৃতকর্ম্মে সাত্ত্বিক ফললাভ হয়। সুকৃত মানে সোজা সরল সত্য এবং ভগবদাস্তিক্যবুদ্ধি অনুবর্ত্তী। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কোনও আবরণ থাকে না। যে কাজে কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই সেই কর্ম্মের দ্বারাই মনের "অহং মমাকার" আবরণ কেটে যায়। কিন্তু জৈব স্বার্থ কামনাময় অন্তর্গতি নিয়ে সাত্ত্বিকপথে চলা যায় না। ঐরকম প্রচেষ্টা জনিত কর্ম্মসকল স্বার্থতপোময়, দাহজনক, দুঃখশীল, অতএব রাজসকর্ম্ম। ঐ পথে ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা অন্যের সাথে স্বার্থ সংঘর্ষে ক্লিন্ন হয়ে নিজের স্বার্থ পূরণরূপ ছোট্ট, সংকীর্ণ, বাঁকা পথে চলতে হয়। তাই রাজসকর্ম্ম এমন দুস্কৃত কিন্তু সাত্ত্বিক কর্ম্মমাত্রেই সুকৃত। অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ জনিত কর্ম্মসকলই তামসিক কর্ম্ম। তাই এসবের ফলও অজ্ঞানই প্রসব করে থাকে। সাত্ত্বিক কাজের সাথে রাজসিক ও তামসিক কাজের ফলের মূল তফাৎ হল পূর্ণ সাত্ত্বিক কর্ম্মে অহং এর খোসা ভেঙ্গে সত্য প্রকাশ হয় আর রজস্তমের বেলায় উল্টো অভিমানাত্মক অহংকারের উৎপত্তি হয়। সুকৃত/সাত্ত্বিক কর্ম্মের দ্বারা প্রাণ ও মনস্থির হয়। আর রজোগুণে আসক্তির সাথে কর্ম্ম করে ফলের জন্য ধুকপুক করে আর আসক্তিই বেড়ে চলে, আবার তামসিক কাজের ফলে আত্মবিস্মৃতি পুরোপুরি ঘটে। তখন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল ভুলে দলীয় কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। ইন্দ্রিয়ের দলে নাম লিখিয়ে পুরোপুরি সংগঠিত দলের হয়ে কাজ করে নিজের বিবেক বুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান হারিয়ে যায় বা কাজে লাগে না। বৌকে কাঁদিয়ে শালীর মুখে পান তুলে দেয়। সব ভুলে কেবলই প্রবৃত্তির তাড়নায় লিপ্ত হয়। মুখে মিষ্টি কথা অন্তরে বিষ, ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য দ্বৈত ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে পশুর ন্যায় ভোগাসক্ত ও চরম বস্তুবাদী হয়। নিজের ছায়াকেও আর বিশ্বাস করে না। এমন আসক্তি অজ্ঞানেরই ফল, তাই তো তমোগুণ এত দুঃখবহুল। এখানে পাঠক প্রশ্ন করে বসবেন – কেন এমন হয় ? এরই উত্তর পরের শ্লোকে ॥ ১৪/১৬

> সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
> প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ।। ১৭

অনুবাদ: সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, রজ হইতে লোভই জন্মে এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, অবিবেক ও অজ্ঞান জন্মে ॥ ১৪/১৭

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ হয়েছিল প্রশ্ন দিয়ে যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কার্য্য সকলের ফলাফল অমন হয় কেন ? কেন সকল কর্ম্মই ভাল ফল প্রসব করে না ? যদি নাই করে তবে অমন কর্ম্ম করাই বা কেন ? এবার সেই সব প্রশ্নের উত্তর। এক কথায় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বলতে হয় এ সমস্তই গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল মাত্র। কারণ জগতে সাধারণতঃ তিন ধরনের মানুষ দেখা যায়। – জ্ঞানী লোভী ও অজ্ঞানী। যেহেতু জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের আস্তিক্য বোধই সত্ত্বগুণ, সেই জন্য সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান জন্মে এবং যথার্থ জ্ঞানী বলতে এমন সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষকেই বোঝায়। রজোগুণ প্রবৃত্তিময়। নিজের স্বার্থে বিশেষভাবে লক্ষ্যযুক্ত হওয়াই প্রবৃত্তি এবং এরকম নিজের স্বার্থে বিশেষ দৃষ্টিই অন্যের স্বার্থ বিষয়ে আমাদের অন্ধ করে রাখে, এমন অন্ধত্বই হল লোভ। অতএব রাজসিক পুরুষ মাত্রেই লোভী। আর তমোগুণে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে বলেই তামসিক ধর্ম্মী পুরুষ অজ্ঞান। জীব লোভী হয়েই জৈব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, পরে তৎপর হয় এবং লব্ধ বিষয়ে নিজেকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে একেবারে তদ্ধর্ম্মী করে ফেলে। তৎস্বরূপে এমন রূপান্তরের নামই মোহ, এটাই অজ্ঞান, তামসিকতার লক্ষণ ॥ ১৪/১৭

> ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তিসত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
> জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তমসাঃ ।। ১৮

অনুবাদ: স্বত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করেন, রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকে, আর নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তামসেরা (তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা) অধঃপাতে গমন করে ॥ ১৪/১৮

ব্যাখ্যা: কর্ম্মানুসারেই প্রতিষ্ঠাভেদ ঘটে। সৃষ্টিক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ম্ম অনুযায়ী কোন জীব কোথায় প্রতিষ্ঠা পায় সেটাই এখানে উর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য ইত্যাদিভাবে দেখান হয়েছে। উর্দ্ধ বলতে ভগবৎ সান্নিধ্য আর অধঃ বলতে ভগবান থেকে সব চাইতে দুরত্বময় প্রান্তটাকে বোঝান হয়েছে। আস্তিক্য বোধসম্পন্ন পুরুষের ভগবৎসান্নিধ্য সমধিক বলেই এঁদের উর্দ্ধস্থ বলা হয়। মাথাটা তো ঊর্দ্ধ দিকেই থাকে তাই সুষুম্নাপথে প্রাণ যাতায়াত করতে করতেই পরে মাথায় চড়ে স্থির হয়ে যায়, এটাও তো "সত্ত্বস্থা" লোকের "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি" অবস্থা। যাঁরা সত্ত্বপ্রধান তাঁদের আজ্ঞাচক্র বা তার উর্দ্ধে গতি হয়ে পরে সহস্রারে প্রবেশ হয়। যোগের ভূমিতে কণ্ঠ থেকে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উর্দ্ধস্থান বা সত্ত্বগুণের স্থান। আর মধ্যস্থান বলতে বোঝায় রজোগুণের স্থান নাভি থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত। রাজসিক পুরুষ যাঁরা স্বার্থপ্রবণ, বহির্মুখী ও বাহ্যবস্তু সংগ্রহে তৎপর, তাঁদেরই অবস্থান হয় এমন মধ্যপথে। তমোগুণের স্থান হল নাভির নিচে অধঃ প্রান্তে যেটা যোগভূমির সর্ব্বনিম্নস্থান। এটাই ঈশ্বরীয় ভাব বা আস্তিক্যভূমি থেকে সর্ব্বাধিক দূরবর্ত্তী স্থান। হন্ ধাতু থেকে জঘন্য শব্দের উৎপত্তি। কোনও কিছুতে আত্মহারা হওয়া

আত্মহত্যারই নামান্তর। এমনভাবে নিজেকে হারানোটাই জঘন্যকর্ম্ম এজন্যই তমোগুণকে জঘন্য গুণ ও আত্মহারা হয়ে নিজেকে হারানোটা জঘন্যকর্ম্ম এবং এমন অধঃপ্রান্তে, মানে ভগবান থেকে এত দুরে থাকে, তারাই যারা তমপ্রধান তাই তাদের স্থিতিও এমনই অধঃক্ষেত্রে। এটাই হল ত্রিগুণের বৃত্তিশীলের ফলের স্থিতির প্রভেদ। সত্ত্বগুণ বাড়লে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সব দরজা দিয়েই জ্ঞানের প্রকাশ হয়, দূর শ্রবণ, দূর দর্শনাদিও হয়ে থাকে। রজোগুণস্থিত হলে সব সময় পাওনার কড়া গন্ডা নিয়ে হৃদয়ের ধুকপুকুনি সইতে হয়। নিজের দুহাতেই সংসার আগলে রাখতে হয়। মধ্যলোকে স্থান হওয়ায় বারবারই আসা যাওয়া করতে হয়। এরাই প্রকৃত সংসারী জীব। আর তমোগুণের অধম কাজকর্ম্মগুলো সব অধোদেশ থেকেই হয়ে থাকে। কামের বসতি অধোদেশে, নাভির নীচে, নিতম্ব, জঘনাদি প্রদেশে। তামসিকদের মনটাও দেখা যায় নাভির নীচেই যায় তাই কাম ভোগপরায়ণও হয়, গতিও তাই অধোগতি। এ সবদিক বিচার করেই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সংসারকে একটা বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হবে “ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং” বলে, সেখানে এই ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃস্থান সংসারের কোথায়, তার মনোরম বর্ণনা করা হয়েছে ৷৷ ১৪/১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুনেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ।।১৯

অনুবাদ: যখন জ্ঞানী ব্যক্তি গুণব্যতিরিক্ত অন্য কর্ত্তাকে না দেখেন অর্থাৎ গুণসকলই কর্ম্ম করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এই রূপ দেখেন এবং গুণসকল হইতে পর অর্থাৎ তৎসাক্ষী আত্মাকে জানেন, তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমিই হইয়া যান ৷৷ ১৪/১৯

ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়ে এর আগের ১৮ টা শ্লোকের মূল কথাই হল যা কিছু হচ্ছে তার মূল কারণই হল ত্রিগুণের প্রভাব। ত্রিগুণের পূর্ব্ববর্ণিত তিন ভাবই ‘স্ব’ ভাব। তাই বলা হয় “স্বভাব করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার।” সাধক যদি যোগপথ অবলম্বনে এর সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন তবে তো এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করতে পারলেই স্বাধীন ও সুখী হওয়া যায়। প্রকৃতির গুণসঙ্গ থেকেই সংসার প্রপঞ্চ তাই আগে গীতাতেই বলা হয়েছে “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ”। অর্থাৎ প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করে, কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আত্মার নয়। এখানেও সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়ই যে অনাদি কর্ম্মমূর্ত্তি ও ফলমূর্ত্তি গ্রহণ করে আর সংসার প্রকাশেরও কর্তৃত্ব সেই আত্মাশ্রয়ী প্রকৃতি বা গুণগুলোরই এটা বলে কর্ম্মব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জীব কিভাবে ভগবদভাবে অধিরূঢ় হয় সেটাই ভগবান বলছেন। শংকরাচার্য্যের ভাষায় “পুরুষের প্রকৃতিস্থিতা মিথ্যা জ্ঞানের সহিত যে জীবসম্বন্ধ, তাহারাই গুণত্রয়ে আসঙ্গ হয়। সুখ, দুঃখ, মোহাদি এই ত্রিবিধ গুণ হইতে– আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ় – এই প্রকার বোধই গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের সঙ্গ। এই সঙ্গই পুরুষের সংসারের কারণ। সদসৎ জাতির মধ্যে যে জন্ম হয় তাহাই সংসার। এই অবিদ্যামূলক মিথ্যা জ্ঞানই বন্ধনের কারণ, এবং সম্যক দর্শনই মোক্ষের উপায়, সেই জন্য বলিতেছেন যে কার্য্য, কারণ ও বিষয় এই তিনরূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অন্য কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না, যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে, এবং গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও গুণসমূহের সাক্ষীকেও দেখিয়া থাকে, সেই দ্রষ্টা মদভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।” বাস্তবিকই অনাদি কর্ম্মের আকর প্রকৃতি আর প্রকৃতিজাত কর্ম্মচক্রও অনাদি। দেহবুদ্ধি আকারে পরিণত গুণগুলো ছাড়া অন্য কেউই কর্ম্মের কর্ত্তা নয়। এ সমস্ত ঝামেলা থেকে পৃথক স্বতন্ত্র আত্মা যে শুধুই সাক্ষীস্বরূপ এমনতর উপলব্ধি যাঁর সুদৃঢ় হয়েছে তিনিই একমাত্র ভগবদভাব পেয়ে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। প্রকৃতিজাত কর্ম্মচক্রে নিমজ্জমান ক্ষর আত্মা কেমন করে অক্ষরত্বে সমাসীন হবে ও জন্মমৃত্যুময় চক্রের হাত থেকে রেহাই পাবে সেটাই সর্ব্বতোভাবে শেখার এবং সেই শিক্ষালাভ না করতে পারলে এই ক্ষরত্বের অবসান নেই। সেজন্যই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়রূপ কর্ম্মের পথই সহজ পথ বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। পাঠক হয়ত ভাবছেন কোথায় কর্ম্মত্যাগ করতে শিক্ষা দেবেন তা নয়, উলটে কর্ম্মেই সংযুক্ত থাকতে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটনের জন্যই ভগবান এত করে প্রকৃতি পুরুষ বিবিক্ত করে সেই উভয় তত্ত্বের পার্থক্য ও সমন্বয় দেখিয়েছেন। কর্তৃত্বাভিমান যতক্ষণ নিজের বলে দেখা যায় ততক্ষণই ক্ষর আত্মা থাকেন আবদ্ধ। আর কর্তৃত্বটা প্রকৃতির গুণে অবস্থিত বলে যখনই দেখেন অমনি তিনি হন অনাদি অক্ষর। অনাদি ক্রিয়ার মাঝেও অনাদি অক্ষর নির্গুণ। এটা দেখলেই ক্ষরের অক্ষর হওয়া হল। অবশ্য দেখার গভীরতার তারতম্যে এই অক্ষরত্বে থাকা না থাকার তারতম্য ঘটে থাকে। শুধু ওপর ওপর পুঁথিপত্র, বই, পুস্তকের জ্ঞান থাকলেই যে তাঁরা ভগবানের স্বরূপাবস্থায় পৌছাতে পারবেন এমনটা মোটেই নয়। ক্ষর আত্মার প্রকৃতিতে বদ্ধ হওয়াও যেমন স্বাভাবিক, মুক্ত হওয়াও তেমনই সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক। শুধু বদ্ধ থাকবে না মুক্ত হবে, সেটা পরমাত্মতত্ত্বরূপ ঈশ্বরেচ্ছাসাপেক্ষ। সে কথা পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগে ব্যাখ্যা করব। আত্মবোধরূপ চেতনতত্ত্ব সম্বন্ধে এটাই হল প্রকৃত বিজ্ঞান। গুরুপদেশমত প্রাণের সাধনা করতে পারলে গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এ সাধন কৌশল গুরুমুখে জানতে হয়। কর্তৃত্বটা যে গুণেতেই এটা দেখে বুঝে নিয়ে সর্ব্বগুণ প্রকাশের তলায় তলায় নিজেকে দেখে গুণময়ভাব থেকে শ্রেষ্ঠ যে অক্ষরভাব সেই অক্ষরভাব প্রাপ্ত হয়। এমনভাবে অক্ষরভাব পাওয়াটাই হল “মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতা” বা “মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি”৷৷ ১৪/১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহি দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ।। ২০

অনুবাদ: দেহ সমুদ্ভব এই তিনগুণ অতিক্রম করিয়া, দেহী জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ১৪/২০

ব্যাখ্যা: তাহলে দেখা গেল যে (সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ) গুণত্রয়েরই পরিণাম হল এই দেহ, তা থেকেই আমাদের এই সংসার রচনা এবং যত অনর্থ। এই অনর্থের নিবৃত্তি কখন ও কিভাবে হবে ? ক্ষর জীব, মানে দেহী, নিজের অক্ষরভাব বিজ্ঞাত হলে পরেই দেহজ্ঞানসমুদ্ভবকারী গুণসকলকে অতিক্রম করতে পারে। অর্থাৎ নিজেকে আর দেহী বলে অনুভব করে না। ফলে ঐ সমস্ত দেহগত জন্ম, মৃত্যু, জরা জাত যে সব দুঃখগুলো ছিল সে সবে ক্ষরিত না হয়ে নিজেকে অমৃতরূপ বোধ করতে থাকে। আচার্য্য শঙ্করও এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় “বলেছেন মায়ার উপাধিভূত তিনটি গুণকে – জীবিত থাকিতে থাকিতেই অতিক্রম করিয়া দেহী জন্ম-মৃত্যু-জরা নিবন্ধন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক অমৃতপদ লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার হইলেই জীব মদ্ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। এই দেহোৎপত্তির মূল হেতু পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়।” অতএব দেহাতীত অবস্থা লাভ করতে হবে। কি ভাবে ? ঐ একই অনুশীলন দ্বারা যার সাহায্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাবর্জিত অবস্থালাভ করা যায়। ঐ অবস্থা “গুর“ বাক্যেণ লভ্যতে”। ১৪/২০

অর্জুন উবাচ -

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ।। ২১

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন। প্রভো, দেহী কীদৃশ চিহ্নদ্বারা এই তিন গুণের অতীত হন ? তাঁহার আচার কিরূপ ? এবং কি উপায়ে এই তিনগুণ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন ? ১৪/২০

ব্যাখ্যা: আদর্শ শিষ্য অর্জ্জুন আগের শ্লোকের মর্ম্মার্থ ভালোমত বুঝে নিয়ে অর্থাৎ গুণত্রয়কে অতিক্রম করেই অমৃতত্ত্বে পৌঁছোতে হয় এই তত্ত্বটা বুঝে নিয়ে এখন প্রশ্ন করছেন প্রভু, (১) গুণাতীতের লক্ষণগুলো কি ? (২) গুণাতীত ব্যক্তির আচার আচরণ কি রকম হয় ? (৩) কেমন করেই বা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায় ? অর্জ্জুনের এ সকল প্রশ্ন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪ নং শ্লোকে “ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধী কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥?” প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি নয় কি ? যখন জানা গেল যে ঐ ত্রিগুণের জ্বালায়ই জীব ছটফট করে বেড়ায় এবং এই গুণত্রয়ই ভববন্ধনের হেতু। তখন তা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় জানতে চাওয়াটাও তো স্বভাবিক। সেই আকুতি ও আর্ত্তিতেই এমন “প্রভু” সম্ভাষণ শ্রীভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের ॥ ১৪/২১

শ্রীভগবান উবাচ -

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ।। ২২

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে পাণ্ডব, প্রকাশ (সত্ত্বকার্য্য), প্রবৃত্তি (রজঃকার্য্য) এবং মোহ (তমোকার্য্য) এই সকল গুণকার্য্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে, যিনি দ্বেষ না করেন এবং নিবৃত্ত থাকিলে (ঐগুলির) আকাঙ্খা না করেন অর্থাৎ যাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইই নাই , (তিনি) গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন ॥ ১৪/২২

ব্যাখ্যা: পূর্ব্বশ্লোকে অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর। যেহেতু এ প্রশ্নটা পূর্ব্বকৃত ও আলোচিত (দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি বোধ হচ্ছে সে কারণে শ্রীভগবানও সেটাই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই ছয়টা শ্লোকে। এই শ্লোকে শুধু গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণগুলোই অলোচনা করেছেন মাত্র। গুণাতীত বলতে এখানে পরমার্থতঃ গুণের বাইরে থাকার কথা বলা হচ্ছেনা মোটেই। গুণের অতীত আত্মবোধের সংস্থিতিতে যাঁরা নিশ্চিতবুদ্ধি, মানে গুণেরদ্বারা আত্মত্ব সংশ্লিষ্ট হয়েও প্রধানতঃ অসংশ্লিষ্ট থাকে, তাঁরাই গুণাতীত। একমাত্র নিজ অক্ষর আত্মবোধে প্রজ্ঞাবান হলেই দেহ ধারণ করেও গুণাতীত ভাবে সকল কর্ম্ম আবর্তনের মধ্যে অবস্থান করতে পারে। সকল কর্ম্মের মাঝে থেকেও সেই বিষয় এবং সেই বিষয়জাত সুখ দুঃখে আকাঙ্খাময় বা দ্বেষময় হয় না। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ হল এই ত্রিগুণের ফল। এদের সংপ্রবৃত্তিই হল এই গুণজাত ভূত ও তৎ জাত অধ্যাত্মাদি সুখ দুঃখের উদয় যাতে আত্মজ্ঞ পুরুষ কখনও লিপ্ত হন না। সুখদায়ী বলে সেটা চাওয়া বা দুখদায়ী বলে না চাওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। এসমস্ত থাকুক, আসুক বা যাক তাঁর পক্ষে সবই সমান হয়ে থাকে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষায়– “ তামসী বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি মূঢ় হইয়াছি, রাজসী বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি রজোগুণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভ্রংশ হইতেছি – ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, এইরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন করিতেছে এবং আমাকে সুখে আসক্ত করিতেছে – এই প্রকার ভাবনার বশে গুণত্রয়ের কার্য্যাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকাদি গুণত্রয়যুক্ত পুরুষের যেমন আত্মসমক্ষে একবার প্রকটিত হইয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত সত্ত্বাদি গুণের কার্য্যাবলীর প্রতি আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন হয়, গুণাতীত পুরুষ কোনও প্রকার গুণকার্য্যের প্রতি সেরূপ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হন না॥” ১৪/২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ।। ২৩

অনুবাদ: যিনি উদাসীনবৎ অর্থাৎ সাক্ষীরূপে অবস্থিত থাকিয়া সুখ দুঃখাদি গুণকার্য্য কর্তৃক বিচলিত হন না; গুণসকল (কেবল) স্বীয় স্বীয় কার্য্যেই আছে, এইরূপ মনে করিয়া অবস্থান করেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এই রূপ মনে করেন) ও বিচলিত হন না (তাঁহাকে গুণাতীত বলে) ॥ ১৪/২৩

ব্যাখ্যা: এবার অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ভগবান দিচ্ছেন তিনটে শ্লোকে। প্রশ্নটা ছিল – গুণাতীত ব্যক্তির আচার আচরণ কিরূপ ? প্রথম প্রশ্নের অর্থাৎ গুণাতীতের লক্ষণ কি ? আগের শ্লোকে ভগবান তার যে উত্তর দিয়েছেন তাতে লক্ষণগুলো যা বলেছেন সেগুলো কিন্তু সবই একমাত্র স্বসংবেদ্য মানে নিজবোধরূপ। বাইরে থেকে বোঝা যাবেনা। আর এখন যেটা বলছেন সেটা কিন্তু পরসংবেদ্য মানে অপরের বোধগম্য। এবার লক্ষ্য করুণ গুণাতীতের আচার – (১) উদাসীনবৎ – অর্থাৎ উদাসীন – (সাক্ষীরূপে)বৎ থেকে সুখ ও দুঃখজনক গুণকার্য্যের দ্বারা বিচলিত হন না।

(২) গুণকার্য্য যে সুখ দুঃখাদির দ্বারা, তাতে তিনি বিচলিত হন না। মানে হল গুণসকল নিজের নিজের কাজ করছে মাত্র এমন বোধ থেকে সেই সকল গুণের দ্বারা নিজে বিচলিত হয় না।

(৩) আত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকা – অর্থাৎ গুণসকল স্ব স্ব কাজে প্রবৃত্ত রয়েছে – এসবের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই এমন বোধ ও বিবেকজ্ঞান থেকে আত্মায় অচঞ্চল হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

অনাদি কর্ম্মস্রোতরূপ গুণাবর্তন অনন্ত প্রবাহে, অনন্তদিকে প্রবাহিত, সবই আবার আমার নিজত্বের উপর, অথচ আমার নিজত্বটা এক অংশে সেই স্রোতের ধর্ত্তা হয়েও – অনুপ্রবিষ্ট হয়েও, প্রধানতঃ স্থির, অচ্যুত, কূটস্থ অক্ষর ভাবেই থাকে। কর্ম্মের মাঝে উদাসীনের মত কর্ম্মে ব্যাপৃত থেকেও সে পুরুষ এ স্থির আত্মত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। আত্মত্ব থেকে সে বিচলিত হয় না। অক্ষর আত্মত্ব দর্শন করে ক্ষর আত্মত্বকে অক্ষরের অনুকরণে ধরে রাখে বা তাতে লক্ষ্য রেখে ক্ষরণময় বোধের উদয়টাকে চেপে দেয় বা সংযত করে রাখে ॥ ১৪/২৩

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ।। ২৪

অনুবাদ: যাঁহার সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আত্মাতে অবস্থিত, যাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও সুবর্ণ সমজ্ঞান, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্য, যিনি ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন এবং যাঁহার নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য (তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন)॥ ১৪/২৪

ব্যাখ্যা: গুণাতীতের আচার বৈশিষ্ট্যর আরও কতকগুলো বর্ণনা।
(৪) যে ব্যক্তির সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান। আপনাতে আপনি থাকতে পারলেই মানে আত্মাতে মনের অবস্থিতি করাতে পারলেই এমন সর্ব্বদা একই অবস্থার অনুভব জন্মে। তখন আর দুঃখেও কোন উৎকণ্ঠা নেই, সুখেও আনন্দ আহ্লাদ হয় না।

(৫) তখন যিনি স্বস্থ, মানে স্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিত, যার ফলে – (৬) ঢেলা, সোনা, পাথর সবই এক সমান মনে হয়। কোনও কিছুই মূল্যহীন বা মূল্যবান নয়, (৭) সুখ ও দুঃখের হেতুভূত যে প্রিয় ও অপ্রিয় সকল তাতেও সম দর্শন – এক কথায় ভাল মন্দ বলে কিছুই নেই।

(৮) যিনি ধীমান অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি, স্থির ধীশক্তিরও অধিকারী, মানে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নন, বরং ইন্দ্রিয় সকলই তাঁর বশে থাকে এবং

(৯) নিন্দা ও স্তুতি(প্রশংসা)তে যাঁর তুল্যজ্ঞান, মানে সমান বোধ। তিনি নিন্দাতেও রুষ্ট নন, আবার প্রশংসাতেও তুষ্ট বা খুশী হন না। এমন সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিই গুণাতীত হন ॥ ১৭/২৪

মানাপমানায়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ।।২৫

অনুবাদ: যিনি মান ও অপমানে সমভাব, মিত্র ও শত্রুপক্ষে সমান এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্যম ত্যাগী তাঁহাকে গুণাতীত বলে ॥ ১৪/২৫

ব্যাখ্যা: গুণাতীত ব্যক্তির আরও আচার বৈশিষ্ট্যসকল হল (১০) মান ও অপমানে সমান অনুভব – মানে হল কেউ বিশাল সম্মান প্রদর্শন করলেও তাতে মজে যান না, আবার কেউ অপমান করলেও চটে ওঠেন না। (১১) মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষকে সমান জ্ঞান করেন। মানে মিত্রের হিত ও শত্রুর অহিত কামনা করেন না। (১২) সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী মানে দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উদ্যমে ত্যাগশীল, মানে যা হবার তাই হচ্ছে এমন বোধ থেকে কর্ম্মক্ষেত্রেও নিজের যা করণীয় করে চলেন, অর্থাৎ কোনও বিষয়ের

সংকল্পরূপ আরম্ভ যাঁর নেই এক কথায় সবকিছু করেও কোনও কর্তৃত্বাভিমানটুকুও যাঁর নেই এমন পুরুষই গুণাতীত হয়ে থাকেন। গুরুপ্রদত্ত যোগাভ্যাসদ্বারা এমন পরাবস্থা লাভেই পরাশান্তিলাভ হয়। তখন আর ক্ষতিবৃদ্ধির বোধ থাকে না। খেতে দিলে খেলেন এই পর্য্যন্ত, আমিষ খেলেন না নিরামিষ খেলেন, যা মনে এল বলে ফেললেন, তাতে কে কি ভাবল এমনতর ভাবনা তাঁর মাথায় মোটেই আসে না ॥ ১৪/২৫

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।। ২৬

অনুবাদ: এবং যিনি আমাকে একান্ত ভক্তিদ্বারা সেবা করেন, তিনি এইসকল গুণ বিশেষরূপে অতিক্রমকরিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ১৪/২৬

ব্যাখ্যা: অর্জ্জুনের তৃতীয় প্রশ্নটা ছিল “কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে” ? কি উপায়ে এই তিনগুণ অতিক্রম করে অবস্থান করেন ? ভগবান এই প্রশ্নের উত্তরে গুণাতীত হবার উপায় বলছেন। সতী যেমন একমাত্র পতিতেই তন্ময়, পতির প্রতি প্রেমনিযুক্তারূপ ভক্তিযোগদ্বারা তৎসেবায় রত থাকেন তেমন ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা আত্মার সেবা করাই ত্রিগুণকে অতিক্রম করার উপায়। কথাটা কেমন abstract শোনাচ্ছে। একটু স্পষ্টীকরণ দরকার। কর্ম্মময় ভগবদঙ্গস্বরূপ এ বিশ্বে কর্ম্ম না করলেই ব্যভিচারী হতে হয়। পণ্ডিতমহল এমন অর্থে কুপিত হলেও গীতার প্রতি অধ্যায়েরই মর্ম্মকথা কিন্তু এটাই। ভগবানের কোনও কর্ত্তব্য না থাকলেও তিনি কর্ম্মময় হয়েই থাকেন। “ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানাব্যপ্তমব্যাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মানি ॥” কর্ম্ম ত্যাগ করাই ফাঁকিবাজি বা ব্যাভিচার। তাঁর কর্ম্মময় মূর্ত্তি উপেক্ষা করে তাঁতে আকৃষ্ট হবার জন্য যে আসক্তি তা হল ব্যভিচারিনী ভক্তি। আর এর বিপরীত ভাবটাই অব্যভিচারিনী ভাব। খেটে খুটে পরিশ্রমদ্বারা কিছু প্রাপ্তি হল অর্জ্জন করা আর ফাঁকি বা ছল কপটতার সাহায্যে প্রাপ্তিটার অর্থ কিন্তু উল্টো হয়। তেমনই মন যদি ময়লা ঘাঁটে মানে আসক্তিপূর্ব্বক বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয় তবে আর তার সতীত্ব রইল কোথায় ? ত্রিগুণের প্রভাবেই এমনটা হয় তাই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান মানে নিয়মিত ভাবে গুরুপ্রদত্ত আত্মকর্ম্ম করতে হয়, আসক্তিকে নষ্ট করতে হয়। তবেই মনকে ও দৃষ্টিকে আত্মাভিমুখী করা যায়। ক্রিয়াদ্বারা বিনা অবরোধে প্রাণ স্থির হলে প্রাণের সাথে মনও স্পন্দনরহিত হবে। স্পন্দনশূন্য মনের যেহেতু কোনও অবলম্বন থাকে না তাই সেই নিরাবলম্ব চিত্তেই অনন্যভাব ও ভক্তি ফুটে ওঠে। এমন অনন্যভাবই অব্যভিচারিণী হওয়া। নিষ্কাম, আসক্তিশুন্য কর্ম্মের দ্বারা মানে যোগাভ্যাসের দ্বারা এমন অব্যভিচারিনী হতে হয়। প্রাণের স্থিরতা সহ শ্বাস সুষুম্নায় প্রবাহিত হয়ে মাথায় প্রাণবায়ু স্থির হলেই সর্ব্বদা স্থিরভাব। এইভাবে ত্রিগুণাতীত অবস্থা অর্জ্জন করতে হয়। এর জন্য খাটতে হয়, কিছু সময় খরচ করতে হয়। নিজের জন্য নিজে সময় ও পরিশ্রম দিয়ে এমন ত্রিগুণাতীত অবস্থায় গেলেই পরম অভয় পদ পাওয়া যায়। ফাঁকিবাজিই ব্যভিচার। ফাঁকি দিয়ে কোনও মহৎ কাজ হয় না। লোকের মাথায় চাঁটি মেরে, চাঁদা তুলে, প্যাণ্ডেল করে পূজো করা, অষ্টপ্রহর করা, উচ্চৈস্বরে হরিনাম করা বা জ্ঞানের কথা আউড়ে বেড়ান এ সবই চুড়ান্ত ব্যভিচারের নিদর্শন। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকতে প্রকৃত ভক্তি আসতেই পারেনা। তাই কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত পুরুষের কখনই ভক্তিলাভ হয় না। তবে হ্যাঁ, নিরাসক্ত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাঁরা জ্ঞান ভক্তির কথা আলোচনা করেন তাঁদের প্রভূত উপকারই হয়। সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ যে আত্মা, নারায়ণ, বা ঈশ্বর রয়েছেন যিনি আমার “আমি” সেই “আমি”কে ছাড়া অন্য কোনও ভাব বা বিশ্বাস যাঁর মনে আসে না তাঁরই অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা ভগবানের ভজনা করা হয়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় – “ন কদাচিদ্ যো ব্যভিচরতি তেন ভক্তিযোগেন ভজনং” – যে ভক্তিযোগ কোনও সময়েই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তি যোগই অব্যভিচার। এমন অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারাই ভজন করতে হয়। কিন্তু আমাদের অন্তরে বহুবিধ বৃত্তির উদয় হয়ে থাকে ত্রিগুণেরই প্রভাবে। তাই সদ্‌গুরুর শরণ নিয়ে প্রকৃত কর্ম্মযোগ অবলম্বনে ত্রিগুণাতীত হবার চেষ্টাটা অন্ততঃ চালিয়ে যেতে হয় নিষ্ঠা সহকারে। তোমার দুর্লভ মনুষ্যজীবনটা তুমি অর্থ, অনর্থ অথবা পরমার্থ যাকে খুশি, যতটা খুশি, যেমনভাবে খুশি দিতে পারো, কারোর কিছুই বলার বা করার নেই, কারণ পরিণামও একান্ত ভাবে তোমারই। জৈব স্বার্থেই আমরা পরিচালিত হই বটে, কিন্তু ব্রহ্মস্বার্থটা বুঝে নিলে আমার সমগ্র স্বার্থটাই শুধুই যে রক্ষা পায় তা নয়, সমভাবে আলিঙ্গিত হয়, এটাই অব্যভিচারিণী সেবা। ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মরূপ পরিজ্ঞাত হবার পর উপলব্ধি হবে ত্রিগুণও সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই অপর একরূপ প্রকাশ যেমন আত্মতত্ত্বটাও জ্ঞানরূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এটাই অবাধ ব্রহ্মরূপ অদ্বৈতবোধ ॥ ১৪/২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।। ২৭

অনুবাদ: যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (স্থিতি স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি) এবং নিত্য (অমর পদের) অর্থাৎ মোক্ষের এবং সনাতন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখেরও (স্থিতিস্থান) ॥ ১৪/২৭

ব্যাখ্যা: এখন ভগবান অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয় বলে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন। ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অতীত অবস্থায় যে “আমি” ঘনীভূত হয়ে চলেছি সেই “আমি”টা কে ? ইনিই কূটস্থ চৈতন্য। সমস্ত অনুভূতিই অন্যরকম হচ্ছে, রূপান্তর পাচ্ছে। আমিই ব্রহ্মের প্রতিমা, মানে ঘনীভূত ব্রহ্ম। জল যেমন বাষ্পের ঘনীভূত মূর্ত্তি, বরফ যেমন জলের জমে

যাওয়া অবস্থা, তেমনিই নিরবয়ব, নির্লিপ্ত, বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তার ঘনীভূত প্রকাশই এই কূটস্থ চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মন ও বুদ্ধির গোচর কিন্তু ব্রহ্ম মন ও বুদ্ধির অতীত। এটুকুই যা অবস্থার তফাৎ। এই কূটস্থ চৈতন্যই অর্জ্জুনের যাবতীয় জ্ঞানদাতা, বা জ্ঞানের প্রকাশ এঁর থেকেই। ইনিই বলছেন আমার সেবকগণের মধ্যে এমন অবস্থাপ্রাপ্তরাই মদ্ভাবপ্রাপ্ত। তাই এঁরাই একমাত্র ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। এহেন ব্রহ্মত্বেই হয় ঐকান্তিক সুখের স্থিতি। অমৃতস্বরূপ, অব্যয়স্বরূপ, নির্গুণ, অক্ষর আত্মা এবং অব্যক্তা প্রকৃতি; পরমাত্মা এই দুই রকম রূপ প্রকাশ করে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন। সেই ব্রহ্মভাবে গুণ ও কর্ম্ম এবং আত্মত্ব ও প্রকৃতির যে নিত্যতা দেখা যায়, অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মাই যে তার প্রতিষ্ঠা এই কথায় তিনি পরমাত্মস্বরূপ পুরুষোত্তমের বর্ণনার সূচনা করেছেন যেটা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রধানভাবে বলা হবে॥ ১৪/২৭

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ :- অনন্ত ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী নিরাকার, নিরাবয়ব কিন্তু ঘটস্থ হলেই স্থান কাল পাত্রের কবলে পড়ে নাম, রূপ ও উপাধিবিশিষ্ট হয়ে পড়েন।তখন এ দেহঘটে আসক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়ে যান। পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের পাল্লায় পড়ে জীবভাবে মোহিত হয়ে থাকেন। এই মোহ ব্রহ্মকে বন্ধনে ফেলে জীবনচক্রে ঢুকিয়ে দেয়। ব্যস্ " পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"। এবারে সমানে জীবন মৃত্যুর বাঁধা চক্রে চলতে থাকে। আর ত্রিগুণের মধ্যে পড়ে কত ভূমিকাই না পালন করে থাকে। আবার ঐসকল সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমেঃর স্ফুরণের সময় দেহত্যাগ করে ও কতই না কর্ম্মময় ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবন পেয়ে থাকে। কেউ কেউ বা ক্রিয়া করে সত্ত্বগুণ বাড়ায়, কেউ বা বাসনার বশে ক্রিয়া করে আবার মনুষ্য জন্মে ফিরে ফিরে আসে, কেউ কেউ আবার অধোদিকে চলে যায়। আত্মা যেহেতু এসকল ব্যাপারের উর্দ্ধে তাই তিনি ত্রিগুণাতীতই থাকেন এটাই যা রক্ষা। তাই সাধনার দ্বারা যাঁরা সর্ব্বদা আত্মায় দৃষ্টি রাখতে শিখেছেন তাঁরাই গুণকার্য্যে আসক্ত না হয়ে স্থিরভাব পেয়ে থাকেন এবং তাঁদের বুদ্ধি পরাবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে অমৃতপদ লাভ করে। তাঁদের প্রাণ সূক্ষ্ম ব্রহ্মনাড়ীর ভিতর দিয়ে চলাচল করতে করতেই সকল গুণকে অতিক্রম করতে থাকে। কেননা গুণগুলো তো চালিতই হয় প্রাণবায়ু অবলম্বনে। তাই বায়ু স্থির হয়ে গেলেই ভেদবুদ্ধিও নষ্ট হয়ে যায়। তখন সবরকম মান, অপমান, শত্রুত্ব, মিত্রত্ব, সোনা, পাথর, নিন্দে, প্রশংসা সবই সমান হয়ে যায়। এটাই এই জীবন চক্র থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষণ যাকে মহাপুরুষেরা জীবন্মুক্তি বলেছেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান গুণত্রয়ের এমন বিভাগরূপ অবস্থা দেখিয়ে ব্রহ্ম হবার জন্য আত্মায় সমতাদৃষ্টি আর অনন্যা ভক্তির কথায় দুটো আলাদা পন্থারূপে বলে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দুটো পথের সমন্বয় করার দিকে এগিয়ে চলেছেন॥

-oo-

ওঁ

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগঃ (১৫)

শ্রীভগবান উবাচ -

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ।।১

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। উর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত) যাহার মূল এবং অধঃ (আজ্ঞাচক্রের নিম্নে) যাহার শাখা, আর প্রলয়ান্তর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিহেতু (প্রবাহরূপে বিচ্ছেদ ভাব বশতঃ) অব্যয়, এতাদৃশ দেহকে অশ্বত্থ(পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত যাহা থাকিবে না) বলেন। বেদসকল (ত্রৈগুণ্য বিষয় হেতু) যাহার পত্র এতাদৃশ (দেহরূপ) অশ্বত্থকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ॥ ১৫/১

ব্যাখ্যা: চতুর্দ্দশ অধ্যয়ের শেষের শ্লোকটাতে যে অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মার বিষয় সূচনা করেছেন সেই পরমাত্মতত্ত্বটাই এই অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনার জন্য প্রথমেই অনিত্যরূপ এই সংসারকে বৈদান্তিক

রূপকের অলঙ্কারে অশ্বত্থবৃক্ষ রূপে বর্ণনা করে বলছেন যে এমন যে সংসার দেখছ এও পরমাত্মা থেকেই জাত এবং এর অনন্ত বৈচিত্র্যও তাঁরই ভাবছন্দে রচিত কিন্তু এটা অনিত্য। এই অনিত্যতা ও অনিশ্চয়তা (বিনশ্বর) অর্থে "শ্ব" মানে আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত থাকবে না, এমন অনিশ্চিত স্থিতি যার সেই অশ্বত্থ। এ সৃষ্টির পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হয়ে চলেছে সেজন্য অশ্বত্থ গাছের সাথে তুলনা, কারণ এর মূল গভীরে থাকে না ঝড় বাতাসের বেগে সহজেই উপড়ে যায় অথচ সংসারের মতই ডালপালা ছড়িয়ে অশ্বত্থ গাছ কতই না বড় হয়। আগের অধ্যায়ের ২৬ নং শ্লোকে যে অব্যভিচারিনী ভক্তির কথা বলা হয়েছে বৈরাগ্য ব্যতীত সেই একান্ত ভক্তি বা জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয় আর এই ভক্তি ছাড়া চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২৭ নং শ্লোকে বর্ণিত ত্রিগুণাতীত অবস্থার অনুভবও সম্ভব নয়। এজন্যই বৈরাগ্যপূর্ণ জ্ঞানের উপদেশ দেবার জন্যই এমনভাবে অশ্বত্থ গাছের রূপকের রূপকে বিশ্বসংসারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নইলে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত অব্যক্ততাময় এই পরমাত্মশক্তিলীলা তো অব্যয়, অনাদি, নিত্য, অক্ষয় বটের মত চিরন্তন। শুধুমাত্র বদ্ধ ও আদিমৎ জীবের চোখেই এটা ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর ও অনিত্য অশ্বত্থের মত। অনাদি দর্শনে জ্ঞানচক্ষু না খোলা পর্য্যন্ত সবই এমন উল্টো উল্টো দেখায়, তাই অব্যক্ত অবস্থাকে বিপরিলোপ বলে ধারণা করে। বৈচিত্র্য ও নানাত্বের একই মাত্র মূল দেখায় অভ্যস্ত না হলে প্রত্যেক বিষয়কে অনাদি না দেখে আদি ও অন্তযুক্ত দেখতে বাধ্য হয় আর নিজের নিজের অস্তিত্বকে বিপরিলুপ্তির দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখে। সেজন্যই সংসার বৃক্ষকে এমনতর উল্টো অশ্বত্থগাছ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন দর্শন থেকেই নিজ নিজ জৈব স্বার্থগুলোকে আলাদা আলাদা করে নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেখে থাকে বলে সমস্ত প্রচেষ্টাকেই তারা নশ্বরতায় ঢাকা(transitory) দেখে থাকে। অপরের হানি করেও নিজ স্বার্থ পূরণে কুণ্ঠিত হয় না। বলে "পরের ছেলে পরমানন্দ যত ভোগে (গোল্লায়) যায় তত আনন্দ।" তাই এমন অজ্ঞান ও একচোখো সংসারী জীবের কাছে এ বিশ্বরূপ ভগবৎ লীলাময় না হয়ে অশ্বত্থ গাছের মত অনিত্য ও উল্টো উল্টো বোধ হয় নিজেদের বিপরীত বুদ্ধি বিবেচনা বশতঃই। বৈরাগ্যদ্বারা পরিশুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত এমন পরাবুদ্ধি আসে না। এখানে বৈরাগ্য বলতে বিশুদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যের কথাই হচ্ছে। না বুঝে কিছু করাটা নির্ব্বোধের লক্ষণ, বৈরাগ্যের নয়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষায়, "যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষ পরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাধর্ম্ম তদ্ধেতু ফলপ্রকাশানার্থত্বাৎ।" অর্থ হল – যেরূপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার কারণ, সেইরূপ এই বেদত্রয়ও সংসার বৃক্ষের পরিরক্ষক, যেহেতু বেদের দ্বারাই ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের কারণ ও ফল প্রকাশিত হইয়া থাকে। বহুবার বলা হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ডই সংসার আর এই দেহ সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র আয়তন। এই সংসার বৃক্ষের মূল উপরে। শঙ্করাচার্য্যও একে "অবাকশাখঃ" বলেছেন মানে শাখাগুলো অধো দিকে বিস্তৃত। জীবের মূল মস্তিষ্কটা তো উপরেই থাকে আর হাত পা, মানে শাখা প্রশাখার কাজই তো নীচে, এমন গাছই তো অশ্বত্থ বা অস্থায়ী। এমন গাছের পাতা হল বেদসকল মানে গুণত্রয়। এমনতর গাছকে যিনি ভালমত জানতে বুঝতে পেরেছেন, অশ্বত্থের তত্ত্ব মানে দেহতত্ত্ব, যিনি সম্যক জানেন তিনিই বেদবিৎ ॥ ১৫/১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি, কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২

অনুবাদ: তাহার শাখাসকল সত্ত্বাদিগুণরূপ জলসেচনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কামনারূপ পল্লব বিশিষ্ট এবং আজ্ঞাচক্রের অধঃ ও উর্দ্ধদিকে (আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত) বিস্তৃত রহিয়াছে। (যেমন বটবৃক্ষের ঝুরি) ॥ ১৫/২

ব্যাখ্যা: আরও বিশ্বপ্রকাশ, পরমাত্মার বিশ্বরূপের আরও বর্ণনা। একটা বড় গাছের শাখা, প্রশাখা, কোটরাদিতে যে সমস্ত প্রাণীগণ বাস করে তারা কিন্তু সেই বৃক্ষ সম্বন্ধে মোটেই অবহিত থাকে না। তেমনই ইহসংসারস্থিত প্রাণীগণেরও এ সংসারের উর্দ্ধমূলত্ব, ইত্যাদির অবসান, অসীমত্ব, আদিত্ব ইত্যাদি কোনকিছুরই উপলব্ধি হয় না কারণ সংসার অনাদি। বিশ্বপ্রকাশ পরমাত্মারই বিশ্বরূপ। ভগবানরূপে তিনি ব্যক্তাবক্তময় লীলাকৌশলে এ বিশ্ব রচনা করে চলেছেন। এর প্রকাশ উর্দ্ধে ও অধে যা ব্রহ্ম হতে জীব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনগুণ অবলম্বনে বিচিত্র বিষয়পল্লবময় বৃক্ষ। এর অধোদেশে মনুষ্যলোকে ক্ষর আত্মস্বরূপে আপনাকে বিস্তৃত করে কর্ম্মানুবন্ধী হয়ে রয়েছেন। তাই এর স্থিতি মানে সংসার যে কিভাবে আছে সে সবের কোনও বোধই হয় না। বরং অশ্বত্থের ঝুরির মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূলরূপে বিস্তৃত থেকে কর্ম্মের দ্বারা অনুবদ্ধ বিষয়বিমূঢ় ও ক্ষরণের দ্রষ্টা আদি অন্তবান জীবত্বের ভোক্তা ও সেজন্যই নশ্বর। অদ্ভূত এ বিশ্বরচনা, যেন পুরোটাই ম্যাজিক, ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল। সংসারবৃক্ষ বা এই নরদেহের ভিতর শুভ বা অশুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মে আর ঐ কর্ম্ম অনুযায়ী নাড়ী সকলের ভিতর কর্ম্মমুখী স্পন্দন থেকে জীব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয়। উর্দ্ধমুখী স্পন্দনে সত্ত্বগুণ বাড়ে, সুষুম্নার স্পন্দনে কূটস্থ জ্যোতিঃর দর্শনও হয়। বাইরে যেমন বাহ্য বিষয়াদি দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রের ভোগ হয় অন্তরেও তেমনই হয়ে থাকে। কিন্তু অধোমুখী স্পন্দনজাত কর্ম্মবাসনা জীবকে অধোগতি দেয়। যার ফলই বার বার যাতায়াত জন্মলাভ, এমনকি ইতর যোনিতেও জন্ম হতে পারে কারণ বাসনার অনুরূপই জন্মলাভ হয়ে থাকে ॥ ১৫/২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনংসুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।। ৩

অনুবাদ: ইহলোকে এই দেহের রূপ (অর্থাৎ স্বরূপ বা তত্ত্বের) উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ ইহার অন্ত (অবসান) আদি (উৎপত্তি হেতু) এবং স্থিতিও উপলব্ধি হয় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্র (ইন্দ্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মসঙ্গরূপ শস্ত্র) দ্বারা ছেদন করিতে হয় ॥ ১৫/৩

ব্যাখ্যা: বিশ্বেশ্বরের অদ্ভুত এ বিশ্ব রচনা যেন ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। তাই এ সৃষ্টির যথার্থ রূপটা এ মনুষ্যলোকে উপলব্ধিতেই আসে না। অনাদি এ সংসারের আদি, স্থিতি, অবসান কোনও কিছুরই উপলব্ধি হয় না। অথচ বুদ্ধির বিভ্রমে লোকে এ সংসারকে এত জড়িয়ে ধরে কিন্তু তাতে সে কিছুই পায় না, একটুও পায় না। আকাশের মেঘ যেমন ক্ষণে দেখা যায় ক্ষণে মিলিয়ে যায় তেমনই মনের কল্পনায় যা কিছু ভাবি, দেখি, আশা করি, বা কামনা করি, সমস্তটাই তেমনই অলীক। এজন্যই এ সংসার বৃক্ষ এত অনর্থকর ও দুরবচ্ছেদ্য। তাই তো দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা একে ছেদন করে তত্ত্বজ্ঞান লাভে যত্নবান হওয়া দরকার। এজন্যই ভগবান বলছেন "অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা" অসঙ্গ শস্ত্রটা কি ? অসঙ্গ শস্ত্র হল সঙ্গরহিত অবস্থার উপলব্ধি, অর্থাৎ ইচ্ছারহিত হওয়া, যে অবস্থায় "আমি আমার" বোধ থাকে না, দেহান্দ্রিয়াদির সাথে কোনও যোগ থাকে না। যে যত ক্রিয়া করবে এবং মন প্রাণ যত স্থির হবে সে ততই সঙ্গরহিত হবে। এ অবস্থা বাড়তে বাড়তে দীর্ঘস্থায়ী হলেই পরম স্থিরত্ব বা তুর্য্যাবস্থা পাওয়া যায়। এভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারলেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" বোধ হয়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ নয়, কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ জানতে হয়। এটাই গুরুকৃপা। কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে কর্ম্মও যেখানে ব্রহ্মও সেখানে যাবার উপায় স্বরূপ। এই অক্ষর, অসঙ্গ আত্মতত্ত্বটা অবলম্বন করতে হবে, তাহলেই ইন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করে আত্মসঙ্গরূপ শস্ত্র দ্বারা এমনতর অশ্বত্থের মূল ভেদ করা যাবে। এভাবে ছেদন করে উর্দ্ধস্থিত মূলবস্তু মানে ঐ অশ্বত্থবৃক্ষরূপ কলেবরের উর্দ্ধে যে মূল বস্তু আছে, উল্টো পবনের ঠোকর রূপ ক্রিয়া কৌশল অবলম্বনে মূল ভেদের পর সেই উর্দ্ধের দ্বার মোচন অর্থাৎ উপর দিকের যাওয়ার দরজা খুলে ফেল আর আসল জিনিসের সন্ধান কর যা পেলে আর ফিরতে হবে না। সে আলোচনাটা পরের শ্লোকে করা হয়েছে। ১৫/৩

> ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
> তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪

অনুবাদ: তদনন্তর সেই বস্তু অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, যাহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি (চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি) বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদ্য পুরুষকেই স্মরণ লইলাম (এইরূপ গুরুপদিষ্ট সাধনদ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে) ॥ ১৫/৪

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকটাই চলছে। এ শ্লোকটা আগের শ্লোকের বাক্য সমূহের অংশ বিশেষ মাত্র, অর্থাৎ সেই সংসার বৃক্ষের মূল (ব্রহ্ম) অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের প্রণালীটা লক্ষ্য করুন। সংসারের মূলভূত যে "তদপদং" যাকে বৈষ্ণবপদ বলে সেই পদের অনুসন্ধান। "তদপদ" টা কি রকম ? যে পদ পেলে আর সংসারে ফিরতে হয় না। আগেই বলেছি যে সংসার অনিত্য, মায়া এ সমস্ত ভাবলেও বা ভালমত বুঝলেও ইন্দ্রিয়, মন এরা তা মানে না, তারা এই গাছ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে। তাই যা বাস্তবিকই মধুর তার স্বাদ না পেলে এ সংসারতৃষ্ণা যাবে না। এজন্যই ক্রিয়া মানে যোগাভ্যাস করে সঙ্গমুক্ত হয়ে অসঙ্গ হতে হয়। সুবিরূঢ় যে ইন্দ্রজাল বা বিপর্য্যয়দর্শনটা চোখ থেকে মুছে ফেলার জন্যই নিজের অসঙ্গ অক্ষর আত্মার পরিচয় লাভ করতে হয়। ক্রিয়াযোগই সেই সাধনা এ কথা আগেও বলা হয়েছে। অসঙ্গ আত্মার "একাংশেন স্থিতো জগৎ", একাংশেই ক্ষর আত্মা রূপে ভোক্তা জীব, সেই জীবত্বেই এই বিরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত। কিন্তু এটাই পুরোটা নয়, সম্পূর্ণটা নয়। যদি এই বিরূপ মূর্ত্তিটাই সংসারের যথার্থ মূর্ত্তি হত তবে আত্মদর্শন হলেই সাধনা শেষ হত। কিন্তু আত্মদর্শন থেকে সাধনার শুরু। কারণ ভগবৎশূন্য আদি ও অন্তবতী সংসারের যে রাক্ষসী মূর্ত্তি ওটাই প্রকৃত মূর্ত্তি নয়। আগেও বলেছিলাম যে সকল পশু পাখী গাছে বাস করে তারা বাসকরে মাত্র কিন্তু ঐ গাছের প্রকৃত রহস্যাদির খবর রাখে না। তেমনই আমাদের খণ্ডিত চোখে মানে আংশিক দর্শনেই এমন বিপর্য্যয় দর্শন হচ্ছে মাত্র। কিন্তু এর প্রকৃত রূপটা হল ভগবৎরূপ যা আসলে অনাদি, অনন্ত। পরমেশ্বরীর অনন্তমহিম, চিন্ময়ী, কর্ম্মময়ী, অন্নময়ী, প্রাণময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। এখানে দিগদিগন্তে মৃত্যু মৃত্যু নয়, অমৃত, মধু। সেই প্রকৃত রূপ দেখার চোখ পাওয়ার জন্যই "অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্" মানে অসঙ্গত্ব দেখে তারপর সংসারের যিনি আদি অন্ত ও স্থিতি সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মার সন্ধান করতে হবে। অন্য কোনও আশ্রয় নেই, অন্য কোনও তত্ত্ব নেই, কারণ সংসারের প্রতি চাঞ্চল্যেই তুমি, প্রতিটি কর্ম্মচাঞ্চল্য তোমা হতেই জাত, তোমাতেই স্থিত এবং তোমাতেই বিলীন। অন্তে, মধ্যে ও বাহ্যেও সেই তুমিই এ বিশ্বময়। অসঙ্গত্বদর্শী অক্ষরাত্মা হয়ে তারপর এইরকম জ্ঞানে পরমাত্মার উপাসনা করতে হয়। ভগবানের এই শ্লোক থেকে বুঝতে হয় কর্ম্মসকল ও গুণত্রয়ের আশ্রয় একান্তরূপে স্বয়ং পরমাত্মা। তাই অসঙ্গত্বের দ্বারা এবার ঐ মায়া তত্ত্বের কল্পনাকে হটাও, কূটস্থেতে থেকে ক্রিয়া করে চল। আর এ সংসারের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ তোমাকে টানতে পারবে না। এই শ্বাসের ক্রিয়া করলে পরম স্থিরত্বপদ পাওয়া যাবে তখনই বিষ্ণুর পরমপদ মানে বৈষ্ণবপদকে স্পর্শ করবেন। এই পরমস্থান থেকেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত হয়, তখন কোনও ইচ্ছাই না থাকায় কোন কিছু মনে এলেই সেটা পূর্ণ হয়। এটাই সেই রহস্য যা আজ থেকে ১৫ বছর আগে অনেক ভেবেও বোঝা যেত না। এভাবেই সব কিছুর সৃষ্টি সেখানেই হয়ে থাকে। মন প্রাণের এমন স্থিরতায় পরিপূর্ণ দৃশ্যজগৎ শূন্য হয়ে যায় কিন্তু স্থিরতার একটু এদিক ওদিক হলেই

আবার মন ইন্দ্রিয়গত হয়ে যায়। ব্যস্ বহির্ম্মুখ হয়ে জগৎ প্রপঞ্চে ফিরে এসে তাতেই বিচরণ ও রমণ করে থাকে, আপাততঃ এটুকুই ॥ ১৫/৪

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ।। ৫

অনুবাদ: যাঁহাদের মান অর্থাৎ অহংকার এবং মোহ অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ নাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ে আসক্তিরূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবিশিষ্ট, যাঁহাদের কামনা বিশেষরূপে নিবৃত্তি পাইয়াছে, যাঁহারা সুখ দুঃখ নামক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, এতাদৃশ অমূঢ় অর্থাৎ অবিদ্যাবিরহিত সাধুগণ সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৫/৫

ব্যাখ্যা: এবার সেই পরমপদ প্রাপ্তির সাধনোপায়। অক্ষর আত্মদর্শনে অসঙ্গ হয়ে কিভাবে পরমাত্মপদের অন্বেষী হতে হয় সেটা তো আগে বলাই হয়েছে এখন সেই অন্বেষীর লক্ষণগুলো কি ? অন্বেষণকারীকে কেমন স্বভাব, সংস্কারসম্পন্ন হতে হয় সেটাই বলছেন। প্রথমে – নির্ম্মানমোহ হতে হয় – অভিমানাদি মোহের বিলয় মানে মান, অহঙ্কার, মোহ আদি মিথ্যা অভিনিবেশ রহিত। (২) জিতসঙ্গদোষ – অক্ষর আত্মা ক্ষর রূপে যে প্রকৃতিসঙ্গতা লাভ করে সেটাই সঙ্গদোষ। পুত্রাদি সঙ্গরূপ ব্যাকুলতাদোষ এসকলই ইন্দ্রিয় সঙ্গ। এসমস্ত জয় করে সদা আত্মনিষ্ঠ হলে অক্ষরাত্মার সাধক পরিত্রাণ পায়। তার আত্মা আর ক্ষরিত হয় না কেননা সে (৩) অধ্যাত্মনিত্য হয়ে পড়ে, অর্থাৎ আত্মত্ব ভিন্ন আর কোনও প্রকার উপলব্ধি তাঁতে থাকে না। এমন পুরুষই (৪) বিনিবৃত্তকাম হয়।এমন হলে কাম বিশেষরূপে নিবৃত্ত হয়ে নিবৃত্তকাম হওয়ায় সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব ও সংজ্ঞাসকল বিলুপ্ত হয়, মানে এ সমস্ত বোধ থেকে মুক্ত হতে পারলেই তখন সকল অবিদ্যা নিবৃত্ত হয় এবং তাঁরা অব্যয় বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হন। এখানে দ্বন্দ্ব বিমুক্ত হওয়া মানে প্রকৃতি–পুরুষের দ্বন্দ্ব, আত্ম–অনাত্ম জ্ঞানের যে স্বাতন্ত্র্য, এবং সুখদুঃখ সংজ্ঞক সকল দ্বন্দ্ব হতে অমূঢ় হয়ে বেরিয়ে আসা। এমন অবিদ্যারহিত হলেই ঐকান্তিক ভাবে অমূঢ় হয়। এমনভাবে সর্ব্ববিধ বোধ বৈশিষ্ট্য থেকে অব্যহতি পেতে হলে পুত্র, দার ও ধনসম্পদের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রাখলে চলবে না। তাতে পরমার্থচিন্তা আসবেই না। এজন্যই অধ্যাত্মনিত্য হতে হবে। পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা ও আলোচনা করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র কথার সরকার মশাই হলে চলবে না, শুধু বই পুস্তকের সীমিত কথার আলোচনায় থাকলে হবে না, যাতে স্বরূপের বোধ হয় তেমন নেশায় অষ্টপ্রহর মেতে থাকতে হয়। এ বড় কঠিন জিনিষ। পরমাত্মার প্রতি অগাধ প্রীতি না থাকলে এ উৎসাহ বেশি দিন থাকে না। মন দিয়ে অনেক বেশি সময় ধরে ক্রিয়া না করলে এ নেশা হয় না। সন্ত কবীরদাসের কথায়–-"য়হ তো ঘর হ্যায় প্রেমকা মারগ অগম অবাধ। সির কাটে পলড়া ধর লাগে প্রেম সমাধ ॥" এই দেহেই প্রেমের ঘর কিন্তু

রাস্তাটাই বড় কঠিন। মাথা কেটে পাল্লা ঠিক করতে না পারলে, মানে দুদিকের পাল্লা সমান না হলে প্রেম সমাধি লাগবে না। ইড়া পিঙ্গলা স্থির হলে তবেই সুষুম্নায় প্রবেশলাভ হয়ে প্রেমসমাধি হবে। কিন্তু মানুষের অসুবিধাটা কোথায় ?

"ছিন পড়ে ছিন উতরে সো তো প্রেম ন হোয়। আট পহর লাগা রহে প্রেম কহাবে সোয় ॥"

নেশা কিছুটা হল আবার একটু পরেই নেশা কেটে গেল, তেমন হলে প্রেম হয় না। প্রেম জমে উঠবে তখনই যখন অষ্টপ্রহর নেশার ঘোর সমানে লেগে থাকে ॥ ১৫/৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।। ৬

অনুবাদ: যোগীগণ যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সংসারে আবর্তন করেন না তাহাই আমার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ ॥ ১৫/৬

ব্যাখ্যা : আগের আগের শ্লোকগুলোতে যে পরম পদের কথা বলা হয়েছে সেই গন্তব্য পদকে এখানে পরমধাম বলা হয়েছে। তথায় গন্তব্য গতিতে যে অপুনরাবৃত্তি এবং সেই পরমধাম বিষয়ে এই শ্লোকে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। সেই পরমাত্মভূমি কেমন ? যেখানে সূর্য্য, শশাঙ্ক ও পাবকরূপী জ্যোতিগুলো প্রকাশিত বা উদ্ভাসিত হয় না। অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি এরাও যে পরমধাম প্রকাশে অসমর্থ এ এক এমনই আশ্চর্য্যজনক জায়গা যা যোগাভ্যাসকারীদের ভিতর অনেকেই দেখেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ শুনলে পরিহাস করবে তাদের অজ্ঞতার দরুন, না জানার দরুণ, তাই তাদের এ বিষয়ে বলতে নেই। শ্রুতিগত বিজ্ঞান (বেদবাক্য) অনুসারে ব্রহ্ম বাক্ প্রাণ মনরূপ ত্রিবৃৎ হয়ে সংসার রচনা করেন, তাই বাক্ প্রাণ মনরূপ ত্রিবৃতের বিলয়েই পরমাত্মা প্রকাশিত হন। ক্রিয়ার পরাবস্থায় অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ নামরূপময় এই জগৎ ও তাদের সাথে যে সম্বন্ধ এবং তাদের প্রকাশ সকলই রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, পাবক উদ্ভাসিত থাকেনা, মানে বাক্, মন, প্রাণ স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একীভূত হয়, সেই ভূমির এটাই প্রথম লক্ষণ। আর দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ হল –"গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" মানে গিয়ে আর ফেরে না। অর্থাৎ স্বরূপচ্যুতি হয় না। যেখানে গতাগতিই স্বভাবসিদ্ধ, ত্রিবৃৎ প্রকাশে বিশ্বলীলায় আত্মা অনাত্মাতে এবং অনাত্মা আত্মাতে পুনঃপুনঃ গতিশীল হওয়ায় আপন আপন ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনশীল, যেখানে আত্ম অনাত্মময় বিপরীত দন্দ্বযুগে রচিত বিপরীত ধর্ম্মী কেউই কোথাও নিত্য স্থিতিবান্ থাকতে পারে না। কিন্তু যেখানে আত্মরসই একমাত্র রস, যেখানে পরমাত্মা আত্মার দ্বারাই নিজেকে নিজে সর্ব্বদা দেখছেন, দেখাটাই হয়ে যায় সেখানে স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশ, সেখানে কে কোথায় যাবে আর কেইবা কোথা থেকে ফিরবে ? ঘট যেমন মহাকাশকে খণ্ডিত করে ঘটাকাশ হয়ে থাকে, যদিও ঘটাকাশ ও মহাকাশে তফাৎ কিছই নেই, তেমনি

যে আত্মভাবকে এতক্ষণ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও সেই সেই অন্তর্গত বিষয়রূপে দেখা যাচ্ছিল, মনের বিলীন হওয়ায় সে সবই বিলীন হয়ে যায় ও তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। জগৎ স্বপ্নময় ঠিকই কিন্তু সে স্বপ্ন একবার ভেঙ্গে গেলে আর সে স্বপ্ন ফিরে আসে না। ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থায় যোগী তখন সদা জাগ্রত। সেখানে আলোও নেই , অন্ধকারও নেই, সূর্য্য নেই, চাঁদ নেই, কোনও রকম আগুনও নেই অথচ স্বপ্রকাশ। প্রথমে প্রাণায়ামদ্বারা বায়ু স্থির, বায়ুস্থিরে আকাশ স্থির, স্থিরাকাশে সকল স্থির। সুতরাং যাতায়াতের কার্য্যকারণও স্থির হয়। তখন সে স্বস্থ হয়, আত্মকাম হয়, সংসরণময় সর্ব্বকামনা স্বীয় আত্মত্বেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সে ভূমি থেকে প্রত্যাবর্তনের কামরূপ কারণও ঐকান্তিকভাবে তিরোহিত হয়ে যায়। সুতরাং এই দুই লক্ষণই সেই পরমধামের প্রধান লক্ষণ, এটাই ক্রিয়ারহিত অবস্থা। আর তা না হলে ক্রিয়া থাকলেই কারণ হতে কার্য্যে আবার কার্য্য থেকে কারণে, সুমেরু থেকে কুমেরু আবার কুমেরু থেকে সুমেরু, negative থেকে positive এবং positive থেকে negative এ যাতায়াত আর এর বাহ্য প্রকাশই শক্তিপ্রকাশের বা ক্রিয়ার বিজ্ঞান। তাই ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পরঅবস্থায় যেতে পারলেই ক্রিয়ারহিত হওয়া যায়। একমাত্র তখনই সে ভূমি ক্রিয়াহীন আপনার আলোয় সমুদ্ভাসিত, নাহি সূর্য্য, নাহি চন্দ্র, নাহি জ্যোতি, যে পদে বাক্, প্রাণ, মন স্বাতন্ত্র্য হারায়, যে পদে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি অস্তমিত, যে পদ হতে সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নি জাত, যে পদ না পেয়ে আব্রহ্মভূবনে জীবলোক সংসরণশীল। সেই পদই পরমানন্দময়, অন্তর বাহ্যে সদা একরূপ, তাই প্রত্যাবর্ত্তনও নেই ॥ ১৫/৬

মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।। ৭

অনুবাদ: আমারই অংশ এই সনাতন অর্থাৎ মায়াবশতঃ সদা সংসারীরূপে প্রসিদ্ধ জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জীবলোকে সংসারে উপভোগার্থ আকর্ষণ করে। ১৫/৭

ব্যাখ্যা : ভগবান বলছেন যে তিনি বা তাঁরই অংশ ব্রহ্মাণুরূপে সর্ব্বজীবদেহে বর্ত্তমান তাই সব জীবই শিবরূপ। পাঠক প্রশ্ন করবেন যদি সকলেই ব্রহ্মের অংশ, তার উপর তোমার ধামে পৌঁছে আর পুনরাগমনও হলনা, আবার ব্রহ্মে একীভূত হয়েও জানতে পারছে না যে ব্রহ্মে একীভূত হয়েছি অথচ প্রলয়ে সুষুপ্তিতে ব্রহ্মেই লয় হল, তবে আর সংসারী কে রইল ? এমন প্রশ্নের কথা ভেবেই সংসারীর বিষয়ে পাঁচটা শ্লোকে বলছেন – আমি বা আমারই অংশ প্রত্যগাত্মারূপে জীবলোকে অবস্থিত। পরাপ্রকৃতিরূপ আমার অংশেই প্রকৃতি থেকে মন, আমি, সকল ইন্দ্রিয়কে ফলাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ করে তোলে, আগে একথা বলা হলেও শ্রীভগবান পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনায় আবারও কর্ম্মবিজ্ঞান বলার জন্য

জীবভূমি বিষয় উত্থাপন করলেন। বললেন আমারই অংশে হলেও, ব্রহ্মাণুর পরিবর্ত্তন না হলেও, প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন হয়ে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত হয় মন। প্রাণের স্পন্দনই মন এখানেই অবিদ্যা দ্বারা জীবভাব পেয়ে থাকে এই মনের মাধ্যমেই। আর এই মনের যাতায়াতই সংসার–জন্মমৃত্যুর অভিনয়। এসব কথা আগেও বলা হয়েছে। মরলেও মানুষের স্বভাব যায় না, তাই ঘুম ভাঙার পরে মানুষ যেমন তার কাজকর্ম্মগুলো শেষ করতে লেগে পড়ে তেমনি আবার জন্মের সময় প্রকৃতিতে লীনভাবে থাকা ইন্দ্রিয়গুলোকে আকর্ষণ করে এবং সেইরকম ইন্দ্রিয়বর্গই লাভ করে থাকে। অবশ্য শুধুমাত্র কর্ম্ম অনুযায়ী অজ্ঞ জীবেরও এমন অবস্থা হয়। যাঁদের প্রাণমন শুদ্ধ হয়ে মনের উর্দ্ধগতি হয়ে আছে তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা সাগ্রহে অনুসন্ধান করে পরাবিদ্যার চর্চায় লেগে থাকেন ও স্থিরতা লাভে সচেষ্ট হন। ক্রমশঃ বুঝতে পারেন যে এমন একটা স্থির অবস্থা আছে যে অবস্থায় ও তার উর্দ্ধে সেই অগতির গতি, পরমশিব, পুরুষোত্তম, জগন্মাতা যে যেভাবে তাঁকে ভাবে তিনিই আছেন। এটা বোধ করে তাঁরা সেই পরমস্থির পদ লাভে সচেষ্ট হন। এ অবস্থাটাই মায়াতীত অবস্থা চণ্ডীতে এমন জগজ্জননীকেই তুষ্ট করার চেষ্টা আছে। যাঁর আশ্রয়লাভ করতে পারলে তাঁর অনুচরী অবিদ্যা আর তাঁকে ভোগের জন্য সে দিকে টানতে পারে না। শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেনও বলেছেন “মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ?” শ্বাসই হল মায়ের সেই চরণ। চরণকে ঠিক ঠিক মত ধরতে পারলেই মা তাঁকে কোলে তুলে নেন। মায়ের কোলই তো সেই পরমানন্দময় স্থান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর আলোচনা বিশদভাবে করা হয়েছে ॥ ১৫/৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বর।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ।। ৮

অনুবাদ: ঈশ্বর, অর্থাৎ দেহী কর্ম্মবশে যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যে শরীর পরিত্যাগ করেন, প্রাপ্ত শরীরে পূর্ব্ব (পরিত্যক্ত) শরীর হইতে এইসকল ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া যান, যেমন সকল বায়ু আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ ॥ ১৫/৮

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল যে জীব পুনরায় জন্মের সময় প্রকৃতিতে লীনভাবে থাকা ইন্দ্রিয়গুলোকে আকর্ষণ করে এবং সেই রকম ইন্দ্রিয়বর্গই লাভ করে থাকে। এবার তবে প্রশ্ন হবে সেই ইন্দ্রিয়াদি আকর্ষণ করে জীব কি করেন ? তারই উত্তরে শরীর থাকলেই যে ইন্দ্রিয়গ্রহণ হয় সেটাই সুন্দরভাবে বলেছেন। এখানে জানা দরকার যে মানুষের মধ্যে আত্মাকে আমরা মানবাত্মা বলি এবং মানুষ ভাবেই দেখি, কিন্তু মানবত্ব কেবল সাময়িক বাহ্যরূপ। এটা একটা ক্রমবিকাশের ধারা মাত্র, যাতে আগে মানবেতর প্রাণীরূপে আবির্ভাব হয়েছিল, এখন মানবত্ব এবং এই ক্রমবিকাশের ধারায় মানবত্ব অতিক্রম করে অতিমানবত্ব লাভ করবে। পূনর্জন্মও

সেই ক্রমবিকাশের অংশ মাত্র যেখানে এই গুরুপ্রদত্ত আত্মকর্ম্ম দ্রুত, সুষম ও সম্যক ক্রমবিকাশের সহায়ক হয়, যাতে এই কষ্টকর জন্মমৃত্যুচক্র হতে রেহাই পাওয়া যায় সেই চেষ্টায়। জীব দেহত্যাগের সময় সূক্ষ্মদেহ নিয়েই যায়, যেমন বাতাসের সাথে গন্ধ যায়। অনুভব একটু জোরালো হলেই এটা বোঝা যায়। এমনকি মৃত্যুর পর অল্প কয়েকদিন যাবৎ পঞ্চকোষ সমন্বিত সূক্ষ্মদেহকে দেখাও যায়। বর্তমানে অধ্যাত্মচর্চা লুপ্ত হলেও জড়বিজ্ঞানের চর্চায় অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতি ঘটেছে, অবশ্যই পাশ্চ্যাত্যের প্রভাবে। এহেন বিজ্ঞানসাধকগণ একটু অধ্যাত্মমুখী হয়ে আত্মানুসন্ধানে রত হলেই বর্তমানের উন্নত Telescope এবং Microscope ইত্যাদির সমন্বয়ে এমন কোনও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে যার দ্বারা জৈবচক্ষুতেও মনোময় সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব ধরা পড়বে এবং জীবের সংস্কাররাশির পূঞ্জীভূত অবস্থা ও তার ঘনীভবনে কিভাবে ক্রমশঃ জৈবদেহে Cromosome মধ্যস্থ Nucleas এর ভিতর Amino Acid সমূহের বিন্যাস নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে Gene এর গঠনও তদনুসারী হয় যাকিছু জীবের জীবনগতিকে প্রভাবিত করে থাকে। তার ফলে জগৎবাসী জানতে পারবে কিভাবে দেহান্তর গ্রহণের সময়ও দেহী তার পূর্ব্বজন্মার্জিত প্রকৃতির অনুযায়ী দেহ গঠনের জন্য আগের পুরাণো দেহের মতই ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদিকে সাথে নিয়ে আসে। মনোময় সূক্ষ্ম দেহে তো রক্ত মাংসাদি থাকে না, কারণ এটা হল শুধুই ভাবনাময় দেহ। যখন সেই সূক্ষ্মদেহ স্থূল দেহের জন্য স্থূলদেহের অণুগুলোকে টানতে থাকে তখন সেই ভাবনাময় দেহের অনুরূপ স্থূল অণুগুলোই আসতে থাকে। এজন্যই গত জন্মে যে যেমন চিন্ত াভাবনায় রত থাকে পরজন্মের দেহও তেমনটাই হয়। এ জন্যই সদ্গুরু সেবা দ্বারা নিজ নিজ ভাবময় দেহকে পূত রাখতে হয় নইলে বিষম পরিণাম ভোগ করতে হয়। যারা পরমার্থ চিন্তা করে না, আত্মার বিষয় কিছু বোঝে না, তারা শুধুই বস্তুবাদী হয়। ভোগ্যদ্রব্যই তাদের আকর্ষণ করে, কেবল ইন্দ্রিয়ভোগে অনুরক্ত তারাই আত্মঘাতী, তাই তাদের মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়। এই শ্লোকে “ঈশ্বরঃ সংযাতি” এ কথাটার অর্থ হল কর্ম্মবশে এ শরীর যখন আর যোগ্য ভোগার্থে লাগেনা তখন ঐ দেহাদির স্বামী অর্থাৎ ঈশ্বর তার সংগৃহীত মন আদি ইন্দ্রিয়সকল একত্র করে যোগ্য শরীরান্তরে নিয়ে যান। বায়ুতে ফুলের গন্ধের মত আগের জন্মের দেহ মন হতে সেই সুগন্ধ দুর্গন্ধরূপ শুভাশুভ কর্ম্মাসক্তি এ জন্মেও টেনে আনছে, “কমলি নেহি ছোড়তি হ্যায়”। আর আমরা অবশ হয়ে পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ যে প্রকৃতি লাভ করেছি তারই বশবর্ত্তী হয়ে তারই আদেশ পালন করে চলেছি মাত্র। জীব বাহিত হয় ঈশ্বরের দ্বারায় দেহ হতে দেহান্তরে ঠিকই কিন্তু তোমার কর্ম্ম তদনুরূপ না হলে স্বয়ং ঈশ্বরও তোমার জন্য অসহায়। তাই বলা হয়েছে – “কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে। গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥”

এইখানে একটু ভেবে দেখ তুমি কি করবে ? নির্জনে বসে কাঁদ আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। কিছুটা মনোবল অবশ্যই পাবে। সদ্গুরুর অন্বেষণ কর। হৃদয়ের আর্ত্তি একান্ত হলে ঈশ্বরই পাইয়ে দেবেন সদ্গুরু।

তাঁর সেবা কর, স্মরণের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও, প্রাণের প্রবাহ সুষুম্নামুখী হলেই– মহৎ ভয় হতে পরিত্রাণ পাবে–“স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥” এ ভগবানেরই কথা॥ ১৫/৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ।। ৯

অনুবাদ: এই দেহী কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, রসনা ও নাসিকা এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন॥ ১৫/৯

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের সূত্র ধরে দেহ হতে দেহান্তরে সঞ্চারণ সময়ে দেহী সূক্ষ্মদেহে কিজন্য ইন্দ্রিয়গণ সহ গমন করেন সেটা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের নাম উল্লেখকরে ভগবান বলছেন যে বাহ্য ইন্দ্রিয় ও মন কে আশ্রয় করে জীব রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, প্রভৃতি বিষয়সমূহকে ভোগ করে। এখন এই মনই যার নেই তার আবার ভোগটা কিসের ? এ যেন অনেকটা চেতনানাশক ক্লোরোফর্ম বা ইথারাদি প্রয়োগে জ্ঞানশূন্যের মত। এভাবে মনের লয় করতে পারলেই ভোগের অবসানরূপ ভোগাতীতপদে চিরস্থিতি। আর তা না হলেই আগের শ্লোকে যা বলা হল উৎক্রমণকালে ঐ সূক্ষ্মশরীর নিয়ে যাওয়া আর আবার জন্মগ্রহণের সময় ঐ সূক্ষ্মশরীর নিয়ে আসা। সূক্ষ্মশরীরে প্রাণ, মন, বুদ্ধি সবই থাকে সে জন্য পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের সকল সংস্কারই ঐ সূক্ষ্মদেহেই থাকে। সতেরো অবয়বের এ শরীরও দেখা যায় বেশ ভালমতই কিন্তু খুবই সূক্ষ্মতার জন্য একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে, একসাথে দেখা যায় না। সকলে না পারলেও একটু চেষ্টা করলে অনেকেই দেখতে পায় এবং বেশ ভালই দেখতে পায়। যাই হোক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দুরকম শরীরই যে জীবকে কি রকম ভাবে ধোঁকা দেয় সেই রহস্য যোগী ছাড়া অন্যরা বুঝতে পারে না। জীবত্বের ভাবে ভাবিত হয়ে বিষয়ভোগ করেও আশা আকাঙ্ক্ষা মেটা দূরের কথা আরও বেড়েই চলে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘আত্মবিলাপ’ ও নবীনচন্দ্র সেনের ‘আশা’ কবিতার মত অজস্র কবিতা রচিত হয়, লোকে পড়েও, কতবার কত কষ্ট পায়, কতই না শোক তাপে তাপিত হয়, তবুও আসলের সেবা ছেড়ে যতসব আলতু ফালতু বিষয়ের পিছনে সময় নষ্ট করে। সেজন্যই প্রথমে বললাম যে দেহী মনেতে থেকে মনদ্বারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো দেখা, শোনা, ছোঁয়া, শোঁকা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে করে থাকে। দেহের মধ্যে যে ষটচক্র আছে ঐ ষটচক্র দিয়ে তড়িৎবেগে বুদ্ধির স্থান দ্বিদল চক্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয় চলে যায়। তারপর তড়িৎবেগেই সহস্রদলে যায় আর তখনই বিষয় অনুভব হয়। সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শীগণ এটা বুঝলেও সাধারণ জড়বুদ্ধির পক্ষে এ বোঝা অসম্ভব। তাইতো বুদ্ধিমান লোকেরা ইন্দ্রিয় ছেড়ে প্রাণের সেবা করেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, তাঁর সন্নিধানে থেকে, মন দিয়ে এই কাজ করলে ইড়া পিঙ্গলা, প্রাণ–অপান এক হলেই ত্রিভঙ্গিমভাবে ত্রিভঙ্গমুরারী পুরুষোত্তমের চরণে সমর্পণ বা চরণে চরণ (শ্বাস) দেওয়া হয়। সদ্গুরুসেবা বুদ্ধিমান লোকেই করে। এমনি এমনি শুধু শুধুই করে না, “লাভে লোহা বয়”। বিষয়সেবী জীব প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে নিজেকে

ঈক্ষণ কর। এটা না দেখে, না করেই যত কষ্ট, যত মূঢ়তা, শুধুই বিষয়সেবী হয়ে থাকা আর এক ক্লাসে বার বার ফেল করার মত ঘুরে ফিরে একই নরকে পাক খাওয়া। এবার পাঠক প্রশ্ন করে বসবেন যে এমনই যদি সেই অস্তিত্ব বা আত্মা যা দেহ হতে দেহান্তর পেয়ে থাকে তাকে বিষয় সংঘাত বা কার্য্যকারণ সংঘাত থেকে আলাদা করে, মানে ভিন্ন বলে, সবাই দেখে না কেন ? আমাদের মধ্যে তো কতশত বিজ্ঞানী, ডাক্তার, বড় বড় ইঞ্জিনীয়াররা, অফিসাররা আছেন তারা কি কিছু বোঝেন না ? পড়ে দেখুন পরের শ্লোকটা ॥ ১৫/৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ।।১০

অনুবাদ: দেহান্তর গমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয়ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট দেহীকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান ॥ ১৫/১০

ব্যাখ্যা: মানুষ নিজেকে তখনই জানতে পারে যখন সে বাহ্যচৈতন্যের অপূর্ণতাকে ছেড়ে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জ্ঞানবান হয়। তাই পাঠকের প্রশ্ন সঙ্গত হলেও সঠিক উত্তর এটাই। আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে তারই উত্তর। একান্ত প্রত্যক্ষ, একান্ত ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষ, প্রতিষ্ঠিত এই আত্মাকে বিষয়বিমূঢ় পুরুষ কখনই দেখতে পাবে না। অসম্ভব, সে যত বড় বুদ্ধিমান, বিদ্বান, বিচক্ষণ, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অফিসার, মন্ত্রী যেই হোন না কেন। "আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন।" একমাত্র মুক্ত প্রজ্ঞাচক্ষু পুরুষই দেখতে পায়। যেহেতু আগের শ্লোকেই বলা হয়েছে আত্মা ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত সেজন্যই এমন প্রশ্ন উঠেছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সবকিছু দেখা গেলেও যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন বলেই সবকিছু দেখা ও বোঝা যায় তাঁকেই দেখা যায় না। কারণ তাঁকে দেখতে হয় সেই জ্ঞানচক্ষু দিয়ে যে জ্ঞান সাধনা ও অধ্যাবসায় দ্বারা অর্জন করতে পারলেই অর্জুন হওয়া যায়। পুতুল নাচের অপারেটার আড়ালেই থাকেন। তাঁকে বা তাঁর কার্য্য প্রণালী দেখতে পেলে পুতুলনাচ দেখার মজাটাই তো নষ্ট হয় তাই দর্শকরা তাঁকে দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না। বিষয় দর্শনে বিভোর মানুষতো নিজেকে দেখতে মোটেই আগ্রহী নয়। যে দেখতে চায় সে ঠিকই দেখতে পায়, কোনও বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। ইচ্ছা নেই তাই প্রজ্ঞাচক্ষু নেই। আছে শুধু ফলাকাঙ্ক্ষা, তাই সবকিছুই ফলাকাঙ্ক্ষায় করে থাকি আর জ্বলে পুড়ে মরি। গুণেতে থেকে দিনরাত জ্বলে পুড়ে মরি অথচ সদ্গুরু উপদেশে ক্রিয়া করে গুণের ক্ষেত্র থেকে নির্গুণে পৌঁছান যায়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় সেসব ভাবিও না। সেজন্যই যাঁর তেজে এসব শ্রবণ, দর্শন, মননাদি হয়ে চলছে তাঁর কথা মরণকাল পর্য্যন্তও ভেবে দেখার সময় অবধি পাই না। যে যাকে চায় সে সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে। তুমি যদি তাঁকেই চাইতে, তবে বিষয়ে বিষয়ে তাঁকেই খুঁজতে। কাকে খোঁজার কথা হচ্ছে ? নিজেকে। নিজেকে খুঁজতে কি কেউ পরের বাড়ি যায় ? না পরের ভিতর কেউ নিজেকে খোঁজে ? প্রেমিক প্রেমিকার ভিতর, প্রেমিকা প্রেমিকের ভিতর, স্বামী স্ত্রীর ভিতর, স্ত্রী তার স্বামীর ভিতর নিজেকে খুঁজে বেড়ালে যা হবার তাই হচ্ছে। আমরা আমাদের নিজত্বকে অহর্নিশ পরের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে রেখেছি। বেশ তো পরের ভিতরেই নিজেকে খোঁজ। কিন্তু সাবধান! শুধু নিজেকেই, অন্যকে নয়। এটা যেন মনে থাকে। তাহলেই দেখবে তুমি যার ভিতরে নিজেকে খুঁজছ, সেখানে তোমার কিছুই নেই। আর নিছক রোমান্টিক হলে সে অন্য কথা, কবি কল্পনা মাত্র। তাই আগে যেভাবে বলা হল সেইভাবে নিজেকে দেখাই জ্ঞানচক্ষু। জ্ঞানচক্ষু খুললে দেখা যাবে যে বিষয়গুলোই আবার জ্ঞানমূর্ত্তি হয়ে উঠবে। ধীশক্তি আত্মঘন না হলে বোঝা যায় না যে এই আত্মার সত্তাতেই দেহ, ইন্দ্রিয় সকলের সব কাজকর্ম্ম হয়ে চলেছে। এই আত্মাকে দেখতে হলে ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির বাইরে ঘোরা ফেরা আটকাতে হবে। তারা যতদিন না শান্ত হয়ে অন্তর্মুখ হয়, ততদিন আত্মদর্শন সম্ভব নয় ॥ ১৫/১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ।। ১১

অনুবাদ : সংযতচিত্ত যোগীগণ এই দেহীকে দেহে অবস্থিত দেখেন, শাস্ত্রদিপাঠ দ্বারা যত্নশীল হইলেও আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ (অতএব) মন্দমতিগণ ইহাকে দেখিতে পায় না ॥ ১৫/১১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল যে বিষয় বিমূঢ় ব্যক্তিগণই তাঁকে দেখতে পায় না কিন্তু এই শ্লোকে বিশদভাবে দেখার তত্ত্বটা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র "যত্নবান যোগী"গণই দেখতে পান। জ্ঞানচক্ষু পুরুষ হলেই সে যত্নবান যোগী পদবাচ্য হয় কেননা প্রতি জ্ঞানের মূলে মূলে আত্মদর্শন না হলে বিশ্বভূবন জ্ঞানময় বলে দেখতে অভ্যস্ত হওয়া যায় না। যেহেতু চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের একমাত্র উপায় তাই অচেতন রূপদর্শী পুরুষ আত্মবোধের আভাস না পেয়ে অকৃতাত্মাই থাকে। প্রাণায়ামই পরম তপস্যা। তার দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত (withdraw)করে অন্তর্মুখ করতে পারলেই আত্মদর্শন হয়। বিষয় সকলকে জ্ঞানময় দেখেও যদি তার তলায় আত্মদর্শন না থাকে তা হলেও সে জীব অচিদ্রষ্টাই থাকে তা সে যতবড় মঠ বা মিশনের শিষ্যত্বই পেয়ে থাকো, যোগী হতে পারবে না। তাই ভগবান বললেন , "অচেতসঃ অকৃতাত্মানো যতন্তোহপি ন পশ্যন্তি" – অচেতনদর্শী, সুতরাং অকৃতাত্মা পুরুষ যত্নবান হলেও দেখতে পায় না। তোমাকে জ্বলতেও হবে, পুড়তেও হবে, শুধুই বিষয় ভোগ করে কাটালে চলবে না। সে ভোগ কোথায় ফুটছে, কিরকম রূপে ফুটছে, কি মূর্ত্তিতেই বা আছে আর তার স্বরূপই বা কি, এ হিসাবও রাখতে হবে, ঠিক যেমন করে নিজের টাকা কড়ির হিসাব কর তেমনি করেই। মাত্র দু দশ বছরের চেষ্টায় কি হবে ? বহু অভ্যাসে তবে এমন স্থিরতা একটু একটু করে উপলব্ধি হবে। তখনই এমনভাবে

সবকিছুর হিসাব রাখতে পারবে। সেটা যাঁরা এখনও পারছেন না, তাঁরাও আর একটু মনোযোগ দিয়ে আরও দীর্ঘকাল সাধনা করে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হবেন এতে সন্দেহ নেই ॥ ১৫/১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ।। ১২

অনুবাদ : সূর্য্যস্থ যে তেজ, চন্দ্রমাতে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজঃ অখিল জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, সেই তেজঃ আমার জানিও ॥ ১৫/১২

ব্যাখ্যা : এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে যে পরম ধামের বর্ণনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে পরম ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নির প্রকাশে প্রকাশিত করা যায় না, কারণ সেই ধাম ভোগাতীত। এবার কর্ম্ম ও ভোগ সম্পাদনের সহায়রূপে বাহ্যে তিনি কিভাবে আছেন সেটা বলছেন। অন্তরে তিনি বাক্ প্রাণ ও মনোময় কিন্তু বাহ্যে তিনি অগ্নি, শশী ও সূর্য্যময়। অনন্ত শক্তিরূপে সেই পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় রূপ এখন চারটি শ্লোকে নিরূপণ করছেন, বলছেন সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির মধ্যে যে তেজ সে সমস্ত প্রকাশই একান্তভাবেই শুধু তাঁরই। তিনিই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হয়ে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় বস্তুকে জ্যোতিঃ দান করেন। তাঁর জ্যোতিঃ বিনা কোনও কিছুরই প্রকাশ হয় না। শরীরের মধ্যেও তিনি জ্যোতিঃরূপে তিনি আছেন তাই এই শরীরের প্রকাশ। যাবতীয় শরীরী সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের হেতুও সেই কূটস্থ জ্যোতিঃরই জ্যোতিমাত্র। সেই জ্যোতিঃ সূক্ষ্মরূপে আকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সেই কূটস্থজ্যোতিঃ সূত্রাত্মার সাথে যখন এ দেহ ত্যাগ করেন তখন দেহ শ্রীহীন ও মলিন হয়ে যায়। তবেই বুঝে দেখ ক্ষুদ্র একটা ব্রহ্মাণুর প্রকাশ এই জ্যোতিঃ। সেই ব্রহ্মাণুর ভিতর কত ব্রহ্মাণ্ডই না ভরা আছে কিন্তু সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও এই এক ব্রহ্মাণুরই অন্তর্গত হয়ে বহু এক আবার একই বহু হয়ে "একমেবাদ্বিতীয়ং" হয়েছেন। এক সংখ্যাকে যেমন লক্ষবার এক দিয়ে গুণ করলেও সেই এক ই থাকে তেমনি জ্বলন্ত আগুন থেকে লক্ষ স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে গেলেও মূল আগুনও একই থাকে। এই কূটস্থ সেই অক্ষরপুরুষ, প্রত্যগাত্মা, যিনি পরমাত্মার ন্যায়ই নিত্য বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। জীব সেই অক্ষর পুরুষেরই উপাসনা করে তাঁরই সাথে আত্মভাবে মিলিত হয়ে গিয়ে জীবনচক্র থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই সূর্য্য, চন্দ্র ও আগুনের তেজও সেই কূটস্থেরই তেজ যেখান থেকে যোগ বিয়োগ সম্ভবে না। সে জ্যোতিঃই পূর্ণ জ্যোতিঃ। আর তাই "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"১৫/১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ।। ১৩

অনুবাদ: আমি বলদ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত সকল ধারণ করি এবং রসময় চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধি সংবর্দ্ধিত করি ॥ ১৫/১৩

ব্যাখ্যা: শ্রীভগবান বলছেন তিনিই বলদ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করে ভূতসকল ধারণ করে রয়েছেন। পৃথিবী এবং ভূতের অন্তরে মাধ্যাকর্ষণ বা বিধৃতি শক্তিরূপে প্রবিষ্ট থেকে পৃথিবীর বুকে স্থাবর জঙ্গম সব কিছুকে ধরে রেখেছেন। পৃথ্বীতত্ত্ব স্থানে স্থির বায়ু রূপে অধিষ্ঠিত থেকে প্রাণই ভূতসকল ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ মূলাধাররূপ পৃথ্বীতত্ত্বে স্থির প্রাণরূপে থেকে ভূতসকল ধারণ করি। এটাই সূর্য্য বা মনঃশক্তিও বটে। রসময় চন্দ্র হয়ে সমস্ত ওষধি সংবর্দ্ধন করছি। আমার আকর্ষণ সঞ্চাপে কঠিন আধার ভূমি পৃথ্বীক্ষেত্রে ওষধি বা বৃক্ষাদির উদ্ভিদরূপে যে প্রকাশ সেটাও আমারই সোম বা প্রাণনামীয় শক্তির প্রকাশ। এই সোমশক্তিই বীজ সঞ্চালিনীশক্তি – বীজের বীজত্বের প্রাণ। আমিই সেই চন্দ্র স্বরূপ। চন্দ্রমাই উদ্ভিদের প্রাণ এবং পিতৃলোক হতে জীবাত্মা এই সোমরশ্মি অবলম্বনেই পৃথিবীর সমস্ত গাছগাছড়াতে রস রূপে প্রবেশ করে ওষধি সকল পুষ্ট করে থাকে। বৃক্ষের বীজ সকল অঙ্কুরিত হয় এই সোমরস সাহায্যেই, তার বর্দ্ধন ও ফলফুলময় হওয়া সবই সোমশক্তির দ্বারাই হয়, মানুষেরও তাই কোন গুণ কোন সময়ে প্রকট হয়, কোন ওষধির কোন গুণ এসমস্ত যোগীরা নিজেদের কালজ্ঞান থেকে জানতে পারেন। এভাবে জেনে নিয়ে প্রয়োগ করলেই ওষধি সিদ্ধ মন্ত্রের মতই কাজ করে ॥ ১৫/১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ।। ১৪

অনুবাদ: আমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠারাগ্নি হইয়া প্রাণীগণের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অপানে সংযুক্ত হইয়া প্রাণীগণের ভুক্ত, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি ॥ ১৫/১৪

ব্যাখ্যা: এবার শীতল হতে আবার উত্তাপে প্রত্যাবর্তন। আগের শ্লোকে সূর্য্য ও চন্দ্ররূপী মন ও প্রাণের অর্ন্তমুখী রসাত্মক আবর্তনের কথা বলে এবার সেই সোমেরই অগ্নিমুখে প্রত্যাবর্তনের কথা বলছেন। তোমরা ইহলৌকিক মাতৃগর্ভ থেকে এই বৈশ্বানরে আহুতি দেবার জন্যই ক্ষুধাময় হয়ে ভূমিষ্ঠ হও। তাই আহার অন্বেষণই জীবত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দ্যুলোক যার মনের স্থূল আয়তন, ভূ বা আধারলোক যাঁর বাকের স্থূল আয়তন, ভূবঃ বা অন্তরীক্ষলোক যাঁর প্রাণের স্ববিষ্ট আয়তন, সেই দ্যু ভূ আয়তনে স্থিত জীবের অন্তরে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে তিনিই প্রবিষ্ট রয়েছেন। আর সেই ক্ষুধার অন্নরূপেই আসে সোম – শস্যাদিরূপে। তোমাতে প্রবিষ্ট হয়ে তারা অগ্নিকে প্রদ্যোতময় করে, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করে। এটাই হল সোমের অগ্নিতে প্রত্যাবর্ত্তন। বাস্তবিক ভোজন একটা সাধারণ কাজ নয়। ভোজনের

দ্বারাই জীব পুষ্ট হয় ও বল লাভ করে ঠিকই কিন্তু তার পরিপাক কিভাবে হয় ? ভগবানই জঠারাগ্নিরূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে চতুর্ব্বিধ অন্নের পরিপাক করেন। কি ভাবে ? সমস্ত বিশ্বপ্রকাশের মধ্যস্থ সার তেজ একীভূত হয়ে যে আগুন জ্বলনশীল থাকে সেটাই হল বৈশ্বানর অগ্নি। তেজ, জল, অন্নময় বা অগ্নি, সোম সূর্য্যময় বৈশ্বানরের এই শ্বাসক্রিয়াই প্রাণাপান। উর্দ্ধ ও অধঃ প্রবাহী, অন্তর ও বাহ্য প্রবাহী বৈশ্বানরের যে গতি আত্ম অভিমুখে ও বাহ্য অভিমুখে বা উর্দ্ধমুখে ও অধোমুখে এর যে প্রজ্জ্বলন (ignition & combustion) সেটাই এককথায় প্রাণাপান বা প্রাণ ও অপানবায়ু আর এ বৈশ্বানরের ব্যাপ্তিই হল আকাশ। তেজ, জল ও অন্নরূপ তিন দেবতাকে একীকৃত করে তারই মাঝে জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট থেকে তবেই ভগবান তোমার জীবত্বটা রচনা করেছেন। এভাবেই চতুর্ব্বিধ চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়রূপ অন্নের পরিপাক দ্বারা আধিভৌতিক শরীর পুষ্ট হয় এবং যদি সে অন্ন পবিত্র ও দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয় তবে এর সারভাগ আধ্যাত্মিক শরীরকে পুষ্ট করে। কারণ পরম দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত সেই অন্ন গ্রহণ করার জন্য তিনিই সেই বৈশ্বানররূপে জঠরে বসে আছেন। এ কথাটা স্মরণে থাকলে তবে আমরা প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তাঁকেই খাওয়াতে পারি। এভাবে দেবোদ্দেশে অন্নত্যাগ বা প্রয়োগ করতে পারলে সেটাই একটা পবিত্র যজ্ঞে পরিণত হয় এবং "যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু" ও "ইষ্টান্ ভোগান্ হি যো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।" এবং "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।" প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্যগুলোও কার্য্যকরী হয়। বেদেও আছে এই কথা – ভোক্তা বৈশ্বানর অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম – দুইএ মিলে অগ্নিষোম এবং এ জগৎ অগ্নিষোমময়। পরমাত্মরূপী অগ্নিতে রোজই ভোজ্যরূপ আহুতি দেওয়া হয়। আর প্রাণাপানরূপী ঘী (ঘৃত) এই ব্রহ্মাগ্নিতে হবন হচ্ছে। তাই অগ্নি যতক্ষণ শরীরে থাকে আমরা বেঁচে আছি। জীবন গেলেই অগ্নিও গেল, লোকে বলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু সাবধান! বিষয়চিন্তায় ঐ হবি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেলে শুধু ধোঁয়ার অজ্ঞান অন্ধকারই জমে ওঠে মাত্র। আর প্রাণাপানের ঘর্ষণেই সেই আগুন জ্বলে ওঠে ও প্রজ্জ্বলনশীল হয়। তাই ক্রিয়া পেয়েও যদি ক্রিয়ায় মন না বসে, একাগ্রতা না আসে, সাংসারিক কাজকর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম ও বিষয়চিন্তা, ক্রিয়ার মনোযোগ নষ্ট করে তবে সেই আগুন কামাগ্নি, ক্রোধাগ্নিরূপে জ্বলে ওঠে আর এই দেহ, মন, প্রাণ তার ইন্ধনে পরিণত হয়। কি সাংঘাতিক ! সামবেদের প্রথম মন্ত্রে তাই অগ্নিরূপী পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা ব্যক্ত হয়ে ওঠে – " ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি।" হে অগ্নি, তুমি আমাদের জীবন যজ্ঞের আহুতি গ্রহণের জন্য এস। তুমি যজ্ঞেশ্বর, জীবন যজ্ঞের এই প্রাণরূপ হবি তুমি গ্রহণ করলেই তা চিরস্থির পরমানন্দধামে প্রবেশ করতে পারবে ॥ ১৫/১৪

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ।।১৫

অনুবাদ: আমি সমুদয় প্রাণিগণের হৃদয়ে (অন্তর্য্যামীরূপে) প্রবিষ্ট আছি। অতএব আমা হইতেই (পূর্ব্বানুভব জনিত) স্মৃতিঃ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জনিত জ্ঞান এবং ঐ দুয়ের বিলয় সাধিত হয়। সমুদয় বেদদ্বারা আমিই জ্ঞাতব্যরূপে বর্ণিত এবং আমি বেদান্তকৃৎ (জ্ঞানদাতা গুরু) এবং বেদার্থবেত্তা ॥ ১৫/১৫

ব্যাখ্যা: আত্মারূপে সর্ব্ব জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠানহেতুই বিরাট সূর্য্য চন্দ্র অগ্নিমূর্ত্তি হতে ধৃতিশক্তি বা স্থূল সৌরশক্তি, অন্ন বা সোম এবং অনলপোষক বায়ু সংগ্রহ করে প্রাণাপানময় হয়ে জীবের স্থূল শরীর রচনা করে অবস্থান করেন। সেই স্থূল শরীরের মধ্যে আবার স্মৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞান-অপোহনরূপ তিনটে আয়তন রচনা করছেন যার অর্থ হল স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুপ্তিরূপ তিন অবস্থা। অনুভূত বিষয় পুনরায় অনুভব করার নামই স্মৃতি। স্মৃতি অবলম্বনেই জীব ভোগক্ষেত্রে বিচরণ করে। বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত জ্ঞান হয় সেজন্যই "সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।" আবার এই স্মৃতি জ্ঞানের অভাবও সেই একই আত্মারই কারণে। তাই তিনিই "সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।" সুতরাং জ্ঞান শব্দে বিষয় অনুভবময় জাগ্রত অবস্থা আর অপোহন শব্দে সুপ্তিরূপ প্রলীন অবস্থা বুঝায়। আবার এই উভয়ের সন্ধিস্থানই স্মৃতি শব্দ বোধক। এভাবেই আত্মা স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহনরূপে জীবের অন্তরে ভোগায়তনত্রয়রূপে ত্রিবৃৎ হন। জীবের ভোগ ও কর্ম্মক্ষেত্রেরও এটাই রহস্য এবং এটাই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহনের মর্ম্ম। জীবের কর্ম্ম ও ভোগক্ষেত্রের এ রহস্যই হল বেদের কর্ম্মাংশের রহস্য। কর্ম্ম অজ্ঞানজনিত জীবের ভাবমাত্র, আর আত্মাতে অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব, এজন্যই আত্মাতে কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিত বন্ধন বলে কিছুই থাকে না। আত্মার জ্ঞানশক্তিরূপ আয়তনই "দেব" এবং সেই দেবতার অন্তরস্থ বিজ্ঞানই বেদ। আগে যেমন "জীব" ও "বীজ" বিষয়ে বলা হয়েছে "দেব" ও "বেদ" ও তেমনই। আলো বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হেতু মাত্র। অঙ্কুরের সাথে আলোর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই তেমনই কর্ম্মের সাথেও আত্মার সম্বন্ধ নেই। তাই ভগবান বলছেন সমস্ত বেদের দ্বারা আমিই বেদ্য। কি ভাবে ? তত্ত্বগত (Theoretically)ভাবে বলতে গেলে বেদের কর্ম্মময় যজ্ঞাংশ ও উপনিষদের জ্ঞানময় অংশের দ্বারাই আমি বেদ্য। এভাবেই কর্ম্মময় অংশের দ্বারা দেবভাব ও আত্মতত্ত্ব রহস্যের অধ্যয়ন দ্বারা পরমাত্মভাব উপসেবিত হয়। এভাবে জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় সকল কর্ম্মের দ্বারা আত্মভাব ও দেবভাবকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে কর্ম্মকে জ্ঞানে পর্য্যবসিত করেন, মানে বেদকে বেদান্তে পরিণত করেন বলে তিনিই একমাত্র বেদবিৎ, সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেবের বেদ্য এবং সমস্ত জ্ঞানের গুরু। এপর্য্যন্ত তত্ত্বগতভাবে (Theoretically) বলা হল। এবার ব্যবহারিক অংশের আভাসমাত্রে বলা

যায় যে অন্তর্য্যামীরূপে তিনি যে সকলের হৃদয়ে রয়েছেন সেটা জানা যায় একমাত্র গুরুপ্রদত্ত শক্তিস্বরূপ যোনিমুদ্রায়। আর তখনই বোঝা যায় যে বাইরের অস্থি, মাংস, রক্ত, চামড়া ইত্যাদি নির্ম্মিত এ শরীররটা ছাড়া আর কিছুই যখন দেখা যায় না তখন ঐ অবচেতন ইন্দ্রিয়েরা কেন ও কিভাবে বিষয় অনুভব করতে পারে, আর মনই বা কি করে মনন করে ! আমাদের হৃদয়ে যিনি পরম জ্যোতিঃরূপে সন্নিবিষ্ট আছেন তাকে যোগের ব্যবহারিক অংশেই একমাত্র জানা যায়। আত্মসমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেলে তবেই এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তার জ্ঞান জন্মে । নইলে যারা অনবরত জ্ঞান জ্ঞান বলে থাকে তারা মোটেই জানেনা যে এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কতটুকুই জানা বা বোঝা যায় ? ক্রিয়ার পর অবস্থায় ডুবতে পারলে মনে যখন বাহ্য চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরে আসে না – তখন জানা ও বোঝার শক্তি এত বেড়ে যায় এবং ইচ্ছা করলে এতই জানতে পারে ও বুঝতে পারে যে জগতের সকল শাস্ত্র অধ্যয়নেও তত জ্ঞান জন্মে না কিন্তু মজার কথা হল যে সেই সময় কোনও রকম ইচ্ছা না থাকায় কোনওরূপ জানা বা বোঝার প্রতিও কোনও রকম ইচ্ছা বা আগ্রহই হয় না। এটাই সম্পূর্ণ অনিচ্ছার অবস্থা। এমন জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত অবস্থা সাধকের আসতে পারে যদি তিনি বিষয় চিন্তা ছেড়ে, সব ইন্দ্রিয়কে ফিরিয়ে (withdraw) নিয়ে নিজেকে নিজে কৃপা করতে পারেন, তবে সেই অবস্থা অল্প সময়েই পেতে পারেন। তখন আর এত বেদ বেদান্ত পাঠের,কোনই দরকার হবে না। অনাত্মজ্ঞানকে আত্মজ্ঞানে মিলিয়ে তিনিই হবেন প্রকৃত বেদবিৎ। একমাত্র আমিই আমাকে জানি সেজন্য আমিই বেদার্থবেত্তা। "ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্" সমুদয় বেদে আমিই সেই জানার বস্তু ॥ ১৫/১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ।। ১৬

অনুবাদ: ক্ষর এবং অক্ষর নামে এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ। তাহার মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষরপুরুষ, আর কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর পুরুষ বলিয়া উক্ত হন ॥ ১৫/১৬

ব্যাখ্যা: সংসারে আমরা দুটো পুরুষ দেখতে পাই – একজন সামনা সামনি কর্ম্মে আবির্ভূত হচ্ছেন, আর একজন পিছনে সেই শাশ্বত নিশ্চল নীরবতায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন যাঁর থেকে সকল কর্ম্মের উৎপত্তি ও যাঁর মধ্যেই সকল কর্ম্মের নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ হয় – এঁরাই দুজন ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ। আত্মতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষর ও অক্ষর আত্মত্ব কাকে বলে সেটা আগেও বলা হয়েছে। এককথায় সকল ভূতের অন্তর্গত পুরুষই ক্ষর পুরুষ এবং সেই ক্ষর পুরুষরাশির অন্তরস্থ পুরুষই অক্ষরপুরুষ। শঙ্করাচার্য্যের মতে কার্য্যোপাধিযুক্ত ভৌতিক ও বিনশ্বর পদার্থই ক্ষর এবং কারণোপাধিযুক্ত অবিনশ্বর মায়াশক্তিই অক্ষরপুরুষ। শ্রীধরস্বামীর মতে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত যে সমস্ত শরীর, যাকে অবলম্বনে চৈতন্যের প্রকাশ হয় সেই ব্যক্তভাবরূপ শরীর ক্ষরপুরুষ। আর দেহ বিনষ্ট হলেও যিনি বিদ্যমান থাকেন তিনি কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা, অক্ষর পুরুষ। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী – পুরুষ দুই প্রকার। যাদের আসক্তিপূর্ব্বক বিষয়াদিতে দৃষ্টি রয়েছে তারা দেহসম্বন্ধী বদ্ধ জীব, তাদের চৈতন্য ভূতাত্মায় পর্য্যবসিত, তারাই জন্ম মৃত্যুর চরকিতে চড়ে বনবন্ করে ঘুরে মরছে আর যাদের দৃষ্টি কূটস্থে নিবদ্ধ, তাদের মন দেহ সম্বন্ধ হতে উত্থিত হয়ে সেই প্রত্যগাত্মায় নিবদ্ধ রয়েছে, তাদের জীব অর্থাৎ মন প্রত্যাগাত্মার সাথে মিলে পরে পরমাত্মার সাথেও মিলে যাবে – এজন্য তারা অবিনাশী পদ পেয়েছে সুতরাং তারা স্বয়ং অক্ষর স্বরূপ হয়ে গেছে। আর তাদের দেহে আত্মবোধ নেই, তাদের ত্রিকূটীতে পরম স্থিতিলাভ হয়ে গেছে। তারা অভয় ও অমৃতপদ লাভ করেছে।

তোমাদের নিজেদের জ্ঞানক্রিয়ার তলে তলে যে নিজত্বটাকে দেখতে পাও সেটাই বিষয়ের আশ্রয়স্বরূপ অথচ বিষয়ের বহির্ভূত। আত্মত্ব ঘনীভূত হলেই জ্ঞানময় বিশ্বকে বিলুপ্ত করে শুধু ঐ আত্মঘন মূর্ত্তিটি দেখলেই তোমার কূটস্থ আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবে। এই অক্ষর আত্মাই নির্গুণ নির্লেপ। এখানে শুধুই আত্মত্ব ভিন্ন অন্য কিছুরই অনুভব থাকে না।

তাহলে ভোগময় পুরুষের নাম ক্ষরপুরুষ এবং যে নির্গুণ আত্মস্বরূপ হতে এই ক্ষরপুরুষসকল ভোগলিপ্ত হচ্ছে, তিনিই কূটস্থ অক্ষরপুরুষ। পরমাত্মা যে দিকে নিজে পরমেশ্বর ভাবে প্রকটিত সেদিকে তিনি নির্গুণ আত্মত্ব প্রকাশ করে নিজেরই জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপ অপরা প্রকৃতিটাকে আলাদাভাবে যে বোধ করেন এ থেকেই কূটস্থ অক্ষর আত্মার বা পরা প্রকৃতির ও অপরা প্রকৃতির উৎপত্তি। আর এই দুই এ মিলেই বিশ্বরচনা, এই দুয়ের সমাসেই ক্ষর আত্মময় জীবের সৃষ্টি হয়। এই দুয়ের সংমিশ্রণ ও অনুলেপনেই বিশ্বপ্রকাশ এবং দুয়ের স্বতন্ত্রীকরণই প্রলয়। তাহলে এঁদের এসমস্ত সমীকরণ ও স্বতন্ত্রীকরণগুলো সব কি করে হয়ে থাকে ? সে সবটাই পুরুষোত্তম তত্ত্বের অর্ন্তগত। পরের শ্লোকে লক্ষ্য করুন ॥ ১৫/১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।। ১৭

অনুবাদ: এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন, যিনি ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন ॥ ১৫/১৭

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বলা হল ভোগময় জীবত্বটা ক্ষর পুরুষ আর যে নির্গুণ আত্মস্বরূপ হতে এই ক্ষরপুরুষ সকল ভোগলিপ্ত হচ্ছে সেই জীবাত্মাই হল কূটস্থ, অক্ষরপুরুষ। শেষে প্রশ্ন ছিল এই রকম দ্বিবিধ পুরুষত্বের পরিলক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ কি ভাবে হল ? কি ভাবেই বা এমনতর সমীকরণ ও ক্ষর অক্ষর আত্মত্বের স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয় ? তবে কি এর অতিরিক্ত আরও কিছু বা কেউ আছেন ? এই শ্লোকে সে প্রশ্নের সমাধান হয়েছে। এই ক্ষর ও অক্ষর হতে বিলক্ষণ অন্য একটি পুরুষই উত্তমপুরুষ, বেদে যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়েছে এবং যিনি ঈশ্বর রূপে সর্বত্র প্রবিষ্ট থেকে লোকত্রয়কে ধারণ করে রয়েছেন। তিনি আত্মা বলেই, অচেতন ক্ষর হতে বিলক্ষণ, আর পরমত্ব হেতু ভোক্তা অক্ষর পুরুষ হতেও বিলক্ষণ, ঈশনশীল, অব্যয়, নির্ব্বিকার হয়ে লোকত্রয়ের হৃদয়ে আবিষ্ট হয়ে প্রাণীমাত্রকেই পালন করেন। আগেই বলা হয়েছে “স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম” এভাবে আপনার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে থাকার ভিতরে যে স্বাধীন স্বনিয়ন্তৃত্ব ভাব গূঢ় ভাবে রয়েছে সেই নিয়ন্ত্রিত্বশক্তির ভাবটার জন্যই তাঁকে “পুরুষোত্তম” বলা হয়েছে। তাহলে এ পর্য্যন্ত আমরা পেলাম তিনটে পুরুষ– ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। ভূতপ্রকৃতিতে সঞ্চারিত যে চৈতন্য সেটাই ক্ষর পুরুষ যা অনেকটা ঘটস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্বের (reflection) মত। ঘটের বিনাশে সূর্য্যের কিছু না হলেও ঘটমধ্যস্থ প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যে চৈতন্য বিশুদ্ধ চৈতন্য, প্রতিবিম্বিত নয়, ভূত প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত (separate) সেটাই হল অবিনাশী কূটস্থ বা অক্ষর পুরুষ। দেহঘট নষ্ট হলেও সেটা থাকে। সেটা ঘটস্থ হলেও সর্ব্বঘটে একই রূপ। যিনি “মনোমধ্যস্থ” হয়েও “মনোবর্জ্জিতং” এবং “জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ” – পরাপ্রকৃতি, যিনি প্রাণরূপে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণময় করে রেখেছেন। ইনিই অজ, শাশ্বত, অবিনাশী, অক্ষরপুরুষ। এবার পুরুষোত্তম। এই উত্তম পুরুষও অক্ষরপুরুষের সাথে অভিন্ন কিন্তু এর আরও এমন কিছু আছে যা অক্ষর পুরুষে নেই সেটা খুবই রহস্যজনক তত্ত্ব। অতিশয় রহস্যজনক এ তত্ত্ব সবাই জানতে পারে না। শুদ্ধচৈতন্য, জড়সম্পর্ক রহিত, যাঁর কোনও মনোধর্ম্ম নেই এবং জ্যোতিঃমাত্র। এখন সেই জ্যোতিঃর অন্তর্গত পুরুষ যাঁতে কোনও রকম জড়ের ধর্ম্ম নেই, যিনি শুধুচৈতন্যমাত্র হয়েও কর্ত্তা ও ঈশানভাব সমন্বিত, সকলের হৃদয়স্থ হয়েও হৃদয়ভাবদ্বারা অনাবৃত, কর্ম্মরূপ বিধাতা, আমাকে জানেন, আমার কথা শোনেন, আমাকে ভালবাসেন এবং আমার ভালবাসা নিতেও পারেন, ক্ষর অক্ষর সমস্তই যাঁর অর্ন্তগত। ইনিই নররূপী নারায়ণ, পুরুষোত্তম, ভগবান। সবাই আমরা এঁরই ভজনা করি। ইনিই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ, যিনি সাধকের নিকট প্রত্যক্ষ। এখানে এই শ্লোকে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বোঝার সুবিধার জন্য একটু বলে রাখি যে এই পুরুষোত্তম ভাব হল ব্যক্তভাবের পরাকাষ্ঠাভাব। কিন্তু এরও অতীত যে ভাব বা তত্ত্ব আছে তিনিই হলেন পরব্রহ্ম যিনি সমস্ত ব্যক্তভাবের অতীত। তাঁরই একাংশমাত্র এই আদি কারণার্ণবশায়ী আদি পুরুষ, যিনি জগতের পরিপালনে অবতীর্ণ হন। পরব্রহ্মকে জানবার কোনও উপায় আমার জানা নেই, কারণ তিনি সত্তা মাত্র, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অতীত। এই পুরুষোত্তমভাবও তাঁর মধ্যে নিমজ্জিত। সমস্ত নাম, রূপ, উচ্ছ্বাস আদি বিবর্জিত, ক্ষর অক্ষর পুরুষোত্তমেরও যিনি আশ্রয়, যাঁকে কোনও পুরুষ নামেও অভিহিত করা যায় না। সর্ব্বজ্ঞও নন, অজ্ঞও নন, তিনিই সেই ব্রহ্ম। সমগ্র উপনিষদে জ্ঞানীগণ সবকিছুকেই অস্বীকার করে একমাত্র এই সত্তামাত্র পরব্রহ্মকেই স্বীকার করেছেন। “সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম” আদি শ্রুতিসকল এঁরই বিজ্ঞান বাচক। সুতরাং কূটস্থ আত্মা, অনাত্মা ও ঈশ্বরত্ব এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমাও এঁরই মহিমাস্বরূপ এবং তত্ত্বতঃ ইনিই একান্ত একজ্ঞানস্বরূপ। ইনিই সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশ অব্যক্ত করে যেখানে আত্মরূপে উদ্ভাসিত থাকেন, সেখানে সেই আত্মত্বের বা সপ্রকাশত্বের মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশ নিহিত বা অব্যক্ত থাকে এবং আত্মতত্ত্বও সেখানে অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষর নামে অভিহিত হয়। এটাই হল মূল প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা। কেননা এখান থেকেই আবার ঐ দুই প্রকাশ ব্যক্ততা পেয়ে পুরুষ ও পুরসকল রচিত হয়। অক্ষরত্ব, ক্ষরত্ব, আত্মা, অনাত্মা এসবই সেই জ্ঞানস্বরূপ সত্য প্রকাশ তত্ত্বেরই অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং নাম, রূপ, ক্রিয়া প্রকাশমাত্র। আসলে সেই এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ও পরমাত্মা। এঁরই আত্মাকারীয়, স্থির, পরাশক্তিটাকে চরম তত্ত্বরূপে ধরে নিয়ে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁর অনুগামীগণ নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন আবার রামানুজ প্রমুখগণ এঁরই চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বরাদি বৈশিষ্টময়তাকে বিশেষ বিশেষভাবে দেখে সগুণ ঈশ্বরবাদকেই চরম তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আসলে দুটোই সেই একই জ্ঞানস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মা, যে পরমতত্ত্বে মায়া আদি কোনওরকম কষ্ট কল্পনার প্রয়োজনই নেই আর বিশেষ বিশেষ বিভাগ করে দেখারও কোনও দরকার নেই। এমনতর উদ্যম সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা মাত্র। বেদের কথা – “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে বিশ্বস্যধাতা পতিরেক আসীৎ ॥” এই হিরণ্যগর্ভ কূটস্থই সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়। তাঁর থেকেই সমস্ত ভূত জাত, তিনিই সকলের পতি, বিশ্বের ধাতা ও সৃষ্টিকর্তা। এই হিরণ্যগর্ভ কূটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রয়েছেন, কূটস্থ দর্শন করতে করতে তাঁর মধ্যে উত্তম পুরুষকে দেখা যায়। যাঁর রূপ শরীরের মত, অঙ্গুষ্ঠমাত্র, জ্যোতিঃস্বরূপ যা ভ্রূমধ্যে দেখা যায়, আর চুলের এক হাজার ভাগের একভাগ তিনিই জীব সুষুম্নার মধ্যে আসছেন ও যাচ্ছেন এবং অত্যন্তসূক্ষ্ম নক্ষত্রের মত জ্যোতিঃ যেটা দেখা যায়। এই উত্তম পুরুষই ব্রহ্ম, যাঁর থেকে পঞ্চ তত্ত্বের সৃষ্টি ও সকলেরই কারণ তিনিই। তিনিই বিষয় ভোগ করেন ও তিনিই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে থাকেন। যোগাভ্যাসে ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌঁছালে “সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” হয়ে গেলেই এই ব্রহ্মতত্ত্বকে সুন্দরভাবে জানা যায়। গ্রন্থপাঠে এর মীমাংসা হয় না। যজুর্ব্বেদে আছে – “মরুতঃ শিব, মরুতঃ ব্রহ্ম”। মরুতই শিব মরুতই ব্রহ্ম। মরুত স্থির হলেই শিব এবং সেই মরুৎই অন্যদিকে মন দিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। তাই বলি ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রন্থের বিচারে মীমাংসা করার তত্ত্ব নয়। সমস্ত বুদ্ধি বিজ্ঞান সহ আত্মত্বকে তাঁতে ডুবিয়ে দেবার তত্ত্ব।

যতদিন এটা না পারছ ততদিনই কথার কচকচি করে কাটাচ্ছ। স্বরূপ লাভই এর মীমাংসা, অন্য আর কোনও মীমাংসা নেই। গুরুপদেশমত সাধনা করলে বাহ্যবায়ু স্থির হয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে তত্ত্বে তত্ত্বে চলতে থাকলে বাহ্য প্রকৃতি বা দেহকে আর অনুভব করা যায় না। তখন ক্ষর অক্ষরে প্রবেশ করে আর “হংস” বিপরীত ভাবে গিয়ে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করেন। তখন “সোহহং সোহহং” মানে সমস্ত দৃশ্যই আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আত্মা হতে অভিন্ন বলে বোধ হয়। অলমতি বিস্তরেণ। বেশি বলে কাজ নেই। এসব কোনও অলৌকিক বা অসাধ্য কোনও কাজ নয়। এ নিয়ে বেশি গবেষণার দরকার হয় না যদি জ্ঞান বা চেতনা নামক নিজ অন্তরস্থ সত্তাকে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা কর। যা হোক, মাত্র আত্মবোধময় বা জ্ঞানক্রিয়াময় চেতনক্রিয়ায় মগ্ন চেতনাই অক্ষর ও ক্ষর পুরুষ নামে খ্যাত। কিন্তু ইনি নিজেকেই কারণ ও কার্য্যরূপে; আত্ম ও অনাত্মশক্তিরূপে বিজ্ঞাত। তাই ক্ষর অক্ষর হতে অন্য পুরুষরূপে গ্রহণীয়, সেকথাই পরের শ্লোকে বলছেন ॥ ১৫/১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।। ১৮

অনুবাদ: যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম, এই জন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি ॥ ১৫/১৮

ব্যাখ্যা: আত্মতত্ত্বের এই ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তিই পরমাত্মময়ী মূর্ত্তি। ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং উত্তমপুরুষ (পুরুষোত্তম) এই তিনেরই সমন্বয়ে অথচ তিনগুণকেই অতিক্রম করে আমি পুরুষোত্তম। কারণ ক্ষর ও অক্ষর উভয় প্রকার পুরুষেরই উর্দ্ধে আমার স্থান তাই আমি পুরুষোত্তম। বেদের ভাষায় “এই সেই আত্মা, ইনি সর্ব্বলোকের বশীকরণে সমর্থ, সর্ব্বলোকের ঈশান বা ঈশ্বর, এবং তিনি এই সমস্তকে শাসন করেন।” আত্মতত্ত্বের এই ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি না দেখা পর্য্যন্ত জীব ও ঈশ্বর আলাদা থাকে। আর জেনে ফেললে সেই ভেদ ঘুচে যায়। তাই আত্মত্বই শক্তি, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা পরমেশ্বর, এভাবে জানাই পুরুষোত্তমকে জানা। অনন্তকাল ধরে জগৎ অনন্তরূপে এ চিন্ময়কে উপলব্ধি করলেও পুরুষোত্তম তত্ত্বকে অতিক্রম করতে না পারার কারণই হল যে এটাই হল চরম আত্মবিজ্ঞান। সুতরাং বাইরে একে খুঁজলে হবে না। কার্য্যরূপ এই শরীর বা জগৎ, তা থেকে উৎকৃষ্ট হলেন কূটস্থ, তা থেকেও উত্তম যে পুরুষ তিনি কূটস্থে প্রতিবিম্বিত হন। সাধনায় পরিণতি(maturity)এলে সাধকগণ কূটস্থের মধ্যে তাঁকে দেখে থাকেন। আগেও বলা হয়েছে, এখানেও বলা হচ্ছে ক্ষরের অতীত কারণ জড়ের অতীত, কারণ জড়বাদী বা বস্তুবাদী বুদ্ধির অতীত। যাঁরা বস্তুবাদী তাঁরা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়বর্গ নিয়েই থাকেন বলে দেহস্থিত কূটস্থ চৈতন্যের কোনও সন্ধানই পান না। তাঁদের তিনি অনধিগম্য। পাঠক প্রশ্ন করবেন কূটস্থই তো অক্ষর পুরুষ, তবে তিনি অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম কেন ? কারণ গুরুকৃপায় চিৎজ্যোতিঃ কূটস্থকে দেখতে পেলেও সেই শঙ্খচক্রধারী হিরন্ময়বপু পুরুষোত্তম নারায়ণকে কদাচিৎ দেখা যায়। এই পুরুষোত্তম দর্শনের পরই ক্রিয়ার পর-অবস্থাটা সহজে পাওয়া যায়। হেমান্ড কূটস্থ জ্যোতিঃটা পুরুষোত্তমের বাহ্যশরীর বলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং পুরুষোত্তম অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বেদের মূল হল প্রণব। এই দেহই প্রণবরূপ। দেহকে যিনি জেনেছেন তিনি দেহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে অনুভব করেন, তাই তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। নইলে শুধুমাত্র বাহ্য বিচারদ্বারা এই পুরুষোত্তমকে বুঝতে গেলে নানারকম বাদ, মতবাদ, প্রতিবাদ এসে উপস্থিত হয় আর এক একটা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে দেখা যায়। যাঁদের সম্প্রদায় অনুসারে পোষাক, বিভূতি, তিলক, দণ্ড, পতাকা আদি গ্রহণ করে আশ্রম তৈরী করতে বা ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। দশনামী সম্প্রদায়, শতনামী সম্প্রদায় আরও কত কি থাক সে সব অন্য কথা। এই পুরুষোত্তম ভাবই “রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ”। সত্যিই কত বড় রহস্য! যে সূত্রাত্মা প্রাণের কাঁপনে সমস্ত বিষয় বোধগম্য হয়, সে প্রাণশক্তি রহস্যময়। সে প্রাণধারা যে জ্যোতিঃর প্রবাহ মাত্র, সেটা আরও রহস্য। আবার তারও উপরে যে উত্তম পুরুষ, পুরুষোত্তম নারায়ণ, তিনিই উত্তম রহস্য। তাঁর প্রকাশেই বিশ্বপ্রকাশ, ব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ড জানা মানে নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে জানা। “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” কথাটার এটাই তাৎপর্য্য। এরই মর্ম্ম এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব। সেজন্যই ভগবান বলছেন পরের শ্লোকে – ১৫/১৮

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ।। ১৯

অনুবাদ: হে ভারত, এইরূপে নিশ্চিত-মতি হইয়া যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫/১৯

ব্যাখ্যা: আগের আগের শ্লোকগুলোতে যেভাবে বলা হল, সে ভাবে ঈশ্বরকে জানতে হলে সকল মূঢ়তাকে আগে অতিক্রম করতে হবে। “আমি যা বুঝি সেটাই সব” অথবা “আমিই সব বুঝি” এমন ভাবই চরম মূর্খের লক্ষণ ও জড়বাদী চিন্তার পরিণাম। কোনও অতীত সুকৃতির বলে বা কোনও ভাবে যদি এমন মূঢ়তাকে অতিক্রম করে সাধনায় নিমগ্ন হয়ে নিজেকে আরও পরিশুদ্ধ করা সম্ভব হয় তবেই এমনভাবে ঈশ্বরকে জানা সম্ভব হয়। তবে গুরুপদেশমত সাধনা করে যেতে হবে যে সাধনার উদ্দেশ্য কোনও ফলপ্রাপ্তি নয়, শুধু সেই উত্তমপুরুষকে প্রাপ্তি। জগৎভুলে তাঁকে ভিন্ন আর কিছুই মনে না থাকলে এভাবে ভজনা করতে করতেই “সকল মোহ তার হয় বিদুরিত, সকল বাধা তার হয় অন্তর্হিত, সকল বৈচিত্র্য তার হয় পর্য্যবসিত” সেই এক আত্মতত্ত্বে। তখন তাঁকে যে জানতে পারে সেও ব্রহ্মস্বরূপই

হয়ে যায় – "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হলেই সর্ব্ববিৎ হয়। ব্রহ্মবিদ্ ছাড়া কেউই সর্ব্বজ্ঞ হতে পারে না। আর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বভাবে তাঁর পূজো করতে পারেন। চিত্ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হলেই একচিত্ত হওয়া যায় যখন তাতে আর অন্য কোনও বৃত্তির উদয় হয় না তখনই সর্ব্বগত বাসুদেবের ভজনা হয়। এমন "একমেবাদ্বিতীয়ং" মাত্র অবশিষ্ট থাকলে সে ভাব বোঝার মত দ্বিতীয় কেউও থাকে না, সেই ভাবই একমাত্র নিজ বোধরূপ যেখানে আর কোনও সংকল্প বিকল্প নেই, নানাত্ব নেই, কল্পনার মূল মন স্বকেন্দ্রে ফিরে গেলে তার আর কোন প্রকাশই থাকে না। এটাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান। ভগবানের কোনও মায়িক দর্শনই সাধনার ফলও নয় শেষ কথাও নয়, দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই যোগ। আত্মবীজকে উদ্ঘাত করেই ব্রহ্মজ্ঞ হতে হয়। অনন্ত ব্রহ্মক্ষেত্র বুকের ভিতর, বুকের তলায় লুকান আছে, আছে আত্মার অন্তরে অন্তরে প্রকটিত, তাঁকে দর্শনের প্রত্যক্ষ উপায়ই হল যোগাভ্যাস। "নাস্তি যোগাৎ পরং বলং" যোগের তুল্য বল নেই। এই যোগভূমিতে উপনীত হতে হলে আত্মাকে সমাদরে বুকে ধর। ভূতের আদর মানে চামড়ার আদর তো অনেকেই করলে এ যাবৎ। এখন বরং একটু গুরুপদতলে নিজেকে সমর্পণ কর এবং জ্ঞানস্বরূপে স্থিতিলাভে তৎপর হও ॥ ১৫/১৯

> ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ।
> এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ।। ২০

অনুবাদ: হে বাসনাশূন্য ভারত, এই অতি সংক্ষেপে পরম গুহ্য এই শাস্ত্র আমি বলিলাম। যে কেহ ইহা বুঝিয়া সম্যক জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয় ॥ ১৫/২০

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে ভগবান সমগ্র অধ্যায়ে উক্ত অর্থের উপসংহার করছেন। অধ্যায়ের শুরু করেছিলেন যে সংসাররূপ বৃক্ষের বর্ণনা দিয়ে সমগ্র অধ্যায়ে বিভু ভগবান সেই সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদন করে পরমপদ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বলছেন যে এই কুড়িটা শ্লোক এ শুধু অধ্যায়মাত্র নয়, এখানে সংক্ষেপে গুহ্যতম, অতি রহস্যপূর্ণ সম্পূর্ণ শাস্ত্রটাই আমি বলেছি। এই রহস্য জেনে নিশ্চয়ই তুমি বাসনাশূন্য হতে পেরেছ এই অর্থে অর্জুনকে 'অনঘ' সম্বোধন করা হয়েছে আর বলেছেন সকলের মধ্যেই যে এক পুরুষোত্তম রয়েছেন তাঁকে জানলেই যে কেউই সফল হতে পারে, কৃতকৃত্য হতে পারে, শুধু একটু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহ সাধন করতে হবে, অবশ্যই নিষ্ঠা সহকারে। শঙ্করাচার্য্যের মতেও সমগ্র গীতার অর্থটাই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বোঝান হয়েছে। এই মর্ম্মার্থ শুনলেও সকল ভ্রান্তি দূর হয়। ভ্রান্তি দূর হলেই জ্বালা মেটে, পাপ দূর হয়। তাইতো ভগবান অর্জুনকে 'অনঘ' সম্বোধন করেছেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই গভীর জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মের ঐকান্তিক সমন্বয় হয় না। এটাই গুহ্যতম জ্ঞান। কিন্তু মানুষ এমনই নির্ব্বোধ যে সকল কাজ করে কেবল মাত্র জ্বালা যন্ত্রণা ও

তাপ উত্তাপ সইতে হয়, ঘুরে ফিরে কেবলমাত্র সেই সমস্ত কাজই বার বার করে থাকে। চরম বস্তুবাদী ও ভোগবাদী হয়ে এভাবেই জীবন শেষ করে। অথচ যা করলে সব জ্বালা মেটে ও অনন্ত শান্তি পাওয়া যায়, সেই কাজ, সেই সাধনা ভুলেও করবে না। অথচ দেখ কেমন রোগ শোকের জ্বালায় জ্বলে মরছে। তাই যে বুদ্ধিমান সেই ক্রিয়া করে, সমাজে থাকতে হলে ওপর ওপর সকলকেই খুশি রেখেছে আর মনে মনে খুবই সতর্কভাবে ভোগসঙ্গ এড়িয়ে থাকে। মনে মনে বলে "মতে আছি তবে পথেও নেই, সাথেও নেই।" তোমরাও এই জ্ঞান অবলম্বনে তোমাদের কর্ম্মময় ও যজ্ঞময় জীবনযাত্রাকে ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত করে শাশ্বত কল্যাণের পথে, কৃতকৃতার্থতার পথে এগিয়ে চল। সাধনাভ্যাস দ্বারা এই দেহেই কূটস্থ ও তার ভিতর পুরুষোত্তমকে দর্শন করে জীবন সার্থক কর। সেজন্যই ভগবান নিজের শক্তিমূর্ত্তির ত্রিভঙ্গিমা এবং আত্মমূর্ত্তির ত্রিভঙ্গিমা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। সমস্ত শাস্ত্রদ্বারা ব্যাখ্যাত ও প্রতিপাদিত যে পুরুষোত্তম তাঁকে এই সাধন পদ্ধতির দ্বারাই সম্যকভাবে জানতে পারা যায়। তা সে শূদ্র, স্ত্রীলোক বা চণ্ডাল যেই হোন না কেন ॥ ১৫/২০

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্‌ভগদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে পুরুষোত্তম যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার: প্রাণরূপী আত্মা এবং প্রাণের মহতী অবস্থা বা মহাপ্রাণরূপী পরমাত্মার মিলন অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ অবস্থারই নাম পুরুষোত্তম যোগ। এই যোগ রহস্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হয়েছে। বিস্তারিত ভাবে বোঝার জন্য এর ব্যাবহারিক প্রয়োগ আবশ্যক। যেটা একমাত্র নিজ নিজ সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে অতি সন্তর্পনে অতি ধীর স্থির ভাবে অনুষ্ঠান ও অভ্যাস করতে হয়। রূপক আকারে বৃক্ষাকার সংসার দেহধারী জীবকে যেভাবে কর্ম্মসংস্কারে আবদ্ধ করে থাকে সেই বন্ধনদশা থেকে উদ্ধার পাওয়ার রহস্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে দেহের উর্দ্ধে মস্তকে প্রাণের স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্তই বন্ধন দশা ভোগ করতেই হয়। অশ্বত্থরূপ বৃক্ষ মানে যা কাল পর্য্যন্ত থাকবে কিনা সন্দেহ, তার পুষ্টির মূলে আছে বাসনা যার কারণেই বার বার এমন জন্মমৃত্যুর মাঝে এত ঘন ঘন যাতায়াত। সুতরাং বাসনার মূলোচ্ছেদ করতে না পারলে এ থেকে রেহাই নেই। নিজ নিজ সদগুরুপ্রদত্ত আত্মকর্ম্মই হল সংসার বৃক্ষের মূল ছেদনের যন্ত্র। পরমাত্মার কিভাবে জীবভাব হয়, কিভাবে তিনি দেহমধ্যে যাতায়াত করেন সে রহস্য কেউই জানতে বা বুঝতে পারেন না। শুধু যাঁদের ক্রিয়া দ্বারা

আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হওয়ায় বুদ্ধি স্থির হয়েছে তাঁরাই এই সূক্ষ্ম অনুভব করতে পারেন। অকৃতাত্মাগণ এ বিষয়ে ধারণা পর্য্যন্ত করতে পারেনা তাই বুঝতে পারেনা যে কূটস্থ কিরণই এই শরীরকে প্রকাশিত করে রেখেছে। কি ভাবে ? সেটা বোঝাতেই এতসব ক্ষরপুরুষ, অক্ষরপুরুষ, উত্তমপুরুষ ইত্যাদির কথা এসেছে। পুরুষ শব্দের অর্থ – পুর = দেহ, শী = শয়ন করা। দেহপুরে যিনি শয়ন করে আছেন। সেই আত্মাই পুরুষ। তাঁরই ক্ষরত্ব, অক্ষরত্ব ও উত্তমত্ব আদি ব্যাখ্যাত হয়েছে। অষ্টপ্রহর কূটস্থে দৃষ্টি স্থাপন করতে পারলে অক্ষর পুরুষের সাথে একত্ব লাভ হয়, তখন আরও এক যে পুরুষের সাথে সাক্ষাৎলাভ হয় তিনিই উত্তম পুরুষ, পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম। তাঁর পূজোর কৌশলে সফল হলেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে দৃঢ় ভাবে ও সানুরাগে সাধন করলে উত্তম পুরুষকে দেহের ভিতরই পাওয়া যায়। এ অতি গুপ্ত রহস্য। আত্মতত্ত্বের এ জ্ঞান হৃদয়ে উদ্রিক্ত করে না রাখলে জীবন চাঞ্চল্যের সার্থকতা বোঝা যায় না। এ জ্ঞানের সঙ্কোচনে সঙ্কীর্ণতাময় নানা ধর্ম্মমত ও নানা সম্প্রদায় গঠিত হয় মাত্র। কর্ম্মজীবন মৃত্যুময় হয়ে ওঠে আর ভগবৎ উপাসনাও শুধু ক্ষণিকের সান্ত্বনামাত্র হয়ে থাকে। সেজন্যই ভগবান নিজ শক্তিস্ফূর্ত্তির ত্রিভঙ্গিমার কথা বিশদভাবে বলেছেন। মন রূপ শক্তি হল ক্ষরপাদের প্রতীক, প্রাণরূপ শক্তি হল অক্ষরপাদের প্রতীক। তদুর্দ্ধে বাকরূপ অপরাশক্তি হল ঐ পুরুষোত্তমরূপ পরমেশ্বরপাদের প্রতীক। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বে আত্ম অনাত্ম প্রকাশদ্বয়ের এই সামঞ্জস্যটা মনে রেখো। চেতনা আপনিই আপনার প্রকাশশক্তি ও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের অপরাজেয় স্থির ভিত্তি। সকল সাম্প্রদায়িক ভাবের বিচার পরাভূত হয় এখানে। যদিও সহস্র সহস্র বছর ধরে পক্ষে বিপক্ষে অনেক রকম আলোচনা হয়েছে। কিন্তু শুধু বাগাড়ম্বরে না গিয়ে যাঁরা মনুষ্য জীবনে কৃতকৃত্য হতে চান তাঁরা শ্রদ্ধার সাথে সদ্গুরুর নির্দেশ পালন করে চলুন। এ অতি গুপ্ত রহস্য। নির্দেশ মত কাজ করলেই তা বুঝতে পারবেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তের ভূমিতে আপনিই এসে পৌঁছে যাবেন। কাউকে কিছু বলতে হবে না। ব্রহ্মদর্শন হলে তাতেই স্থিতিলাভ করতে পারবেন। আত্মকর্ম্মদ্বারা নিজ বোধগম্য পরমগুহ্য পুরুষোত্তম যোগের এটাই হল সংক্ষিপ্তসার ॥

ওঁ

অথ ষোড়শোহধ্যায়ঃ

দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ (১৬)

শ্রীভগবান উবাচ -

অভয়ংসত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ।। ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভুতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবংহ্রীরচাপলম্ ।।২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ।। ৩

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। হে ভারত, ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি (চিত্তের উপরতি), খলতা-শূন্যতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, অহঙ্কার রাহিত্য, কুকর্ম্মপ্রবৃত্তিতে লজ্জা, চাপল্যশূন্যতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি, হিংসা-রাহিত্য এবং আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া যে অভিমান তাহার অভাব,– এইগুলি যাঁহারা দৈবী সম্পদাভিমুখে জাত তাঁহাদেরই হইয়া থাকে ॥ ১৬/১-৩

ব্যাখ্যা: আগের অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছিলেন, "হে ভারত ! ইহা জানিয়া লোকে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে।" সেজন্য এখন এই রহস্য বুঝবার ও অনুধাবন করার যোগ্যতা কার আছে আর কারই বা নেই সেটা নির্ণয় করার জন্যই এই ষোড়শ অধ্যায়ের শুরু। কোন শ্রেণীর সাধক দৈবী সম্পদের অধিকারী অর্থাৎ দৈবী গুণসম্পন্ন হওয়ায়, প্রবৃত্তি সকলকে মানে আসুরী সম্পদকে সহজেই ত্যাগ করতে পারেন। বেদে আছে – "পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" – পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যদ্বারা পুণ্যময়ী বাসনা হেতু জীব উত্তরোত্তর পুণ্যবান ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে। তাই যাঁরা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে, এখানে তিনটি শ্লোকে যে সমস্ত দৈবী সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তেমন, সমস্ত দৈবী সম্পদের অধিকারী হয়েই জন্মগ্রহণ করেন তাঁদেরই এই তিন শ্লোকে বর্ণিত গুণ সকলও স্বাভাবিক হয়। আসুরী সম্পদ ত্যাগ করে দৈবী সম্পদ আশ্রয়কারী ব্যক্তিরাই সচেষ্ট হলে মুক্তিপথে এগিয়ে যেতে পারেন। সেটা বলার জন্যই এই অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে। কর্ম্মের ফল দুই রকম – বন্ধন ও মোক্ষ, দুই গতিরই সহায়ক কর্ম্ম যা ফলদায়ক হয় অন্তরের অনুভূতি অনুসারে। প্রকৃত কার্য্য অন্তরে, বাহ্যে তার অভিব্যক্তি মাত্র। অন্তরের যে জাতীয় ভাবগুলো কর্ম্মকে মোক্ষদায়ক করে তোলে সেগুলোকে দৈবী সম্পদ এবং যে জাতীয় ভাবগুলো বন্ধনদায়ক করে তোলে সেগুলোকে আসুরীসম্পদ বলা হয়েছে। মানে যাঁরা মুক্তিকামী মুমুক্ষু

তাঁদের যা প্রয়োজনীয় সেগুলোই হল দৈবী সম্পদ। আর যারা সংসারী বিষয়াসক্ত তাঁদের যা দরকার সেগুলোই আসুরী সম্পদ। এখন যখন একেবারে সংসদ ভবন থেকে শুরু করে সুদুর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত অসুরের দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ, তখন আসুরী সম্পদের জন্যই জীব লালায়িত হবে, দৈবী সম্পদের দিকে ফিরেও তাকাবে না, এটাই স্বাভাবিক। যার দ্বারা জীবের কামোপভোগ পরিবর্দ্ধিত হয় সেগুলোই আসুরী সম্পদ। দৈবী সম্পদে সমৃদ্ধ জীবের মোক্ষমার্গের অনুকূল মানসিক বৃত্তির উদয় হয় ও তাকে শান্তি ও সত্যের পথে নিয়ে যায়। ভগবান এখানে সেই সম্পদসকলকে দুইভাগে ভাগ করে দেখাচ্ছেন। প্রথমে দৈবী সম্পদ প্রথম তিনটি শ্লোকে, যার সাধারণ অর্থ ও ধারণা সকলেরই জানা আছে তাই বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম না, শুধু উল্লেখ মাত্র করা হল। অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (ব্রহ্মতত্ত্বদির আলোচনা ও তৎশাস্ত্র অধ্যয়ন), তপ, আর্জব (সরলতা), অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন (পরদোষ দর্শন পরিহার), ভূতে দয়া (পর দুঃখ মোচনে চিত্তের দ্রাবণ), অলোলুপতা,মার্দ্দব (মৃদুতা), লজ্জা, অচাপল্য, তেজ (আন্তর বীর্য্য, মনোবল), ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ (অন্তর্ব্বাহ্য পবিত্র রাখা), অদ্রোহ (অনিষ্ট আচরন রাহিত্য), অনতিমানিতা (অভিমানশূন্যতা), এই ২৬ টা দৈবী সম্পদই অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত। সেজন্য এর বিশদ বা সংক্ষিপ্ত কোন আলোচনাই করা হল না। যোগাভ্যাসকালে নিজ নিজ সদগুরু মুখে এগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য্য ও গূঢ় অর্থসকল কথিত হবে এবং তখনই একমাত্র এই বেদজ্ঞানকে কর্ম্মময় করে তোলা সম্ভব হবে এবং সাধারণ জীবনযাত্রার অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রচেষ্টা সে সকলকেও ভগবৎযুক্ত করে নিতে পারলে সেগুলোও ভগবৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হবে। আর যাঁদের সঞ্চয়ে কোনও দৈবী সম্পদ নেই তাঁরাও এ জীবনে ইচ্ছুক হলে নিজ নিজ সদগুরুতে চিত্ত অর্পণ করে দৃঢ় অধ্যাবসায়ে গুরুপ্রদত্ত যম নিয়মাদি সাধনদ্বারা দৈবী সম্পদ অর্জনে তৎপর হতে পারেন ও কৃতকৃত্য হতে পারেন ॥ ১৬/১-৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪

অনুবাদ: হে পার্থ, দম্ভ অর্থাৎ ধার্ম্মিকতা প্রকাশার্থ কাল্পনিক ধর্ম্মের আড়ম্বর, দর্প অর্থাৎ ধনাদিজন্য চিত্তের গর্ব, নিজের অতিপূজ্যত্বাভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অবিবেক – এই ভাবগুলি আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥ ১৬/৪

ব্যাখ্যা: এবার আসুরী সম্পদের বিবরণ। সংক্ষেপে ছয়টা আসুরী সম্পদের বিষয়ে বলা হয়েছে যেগুলি হল দম্ভ বা নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা। দর্প বা আত্মগরিমাজাত চিত্তের উৎসেক বা অভিমান, অভিমান – নিজের বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের বোধ হতে যে স্ফীতি গরিমার বোধ বা অনুভব। ক্রোধ মানে রেগে ওঠা, ক্রুদ্ধ হওয়া, পারুষ্য – নিষ্ঠুরতা, পরুষভাব, অযথা কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি, অজ্ঞান অবিবেক, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বোধহীন থাকা। প্রধান প্রধান আসুরী সম্পদকটার বিষয়ে বলা হল। এগুলো সবকটাই আসুরী সম্পদ। যারা আসুরী সম্পদ লক্ষ্য করে জন্মেছে তাদেরই এমন সব দম্ভ, দর্পসকল হয়ে থাকে। কারণ তারা ঐ আসুরী সম্পদ সকল ভোগ করার জন্যই জন্মেছে। অথচ মুখে ঐ আসুরবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরা বলেন,"সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি যা করান তাইই তো করি, আমার নিজের কি আর ক্ষমতা ?" ইত্যাদি ধরণের কথা। যদিও সাধন করলে আসুরীসম্পদের বিনাশ হয়ে দৈবী সম্পদাগম হতে পারে তাই তাঁরা সযত্নে সাধনপথ এড়িয়ে চলেন ও সযত্নে আসুরী সম্পদসকল রক্ষা করে চলেন। তাই সাধুজনের উচিত এঁদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা। যদিও বা কেউ কখনও কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে দীক্ষা গ্রহণাদি করেও থাকেন তথাপি সেই কাজ ঠিকমত করেন না। কেননা করলেও আসুরবৃত্তির প্রভাবে সেগুলো ফলপ্রসূ হয়না ঠিকই, কিন্তু সদগুরুচরণ ধরে লেগে বেঁধে সাধন করতে পারলে ধীরে ধীরে অবশ্যই আসুরবৃত্তি বিনষ্ট হয়ে দৈবী শুভবৃত্তি সকলের উদয় হয়। আর ক্রিয়া না করলে এমন আসুরীস্বভাব আপনা আপনিই হতে থাকে। নবম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এর আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে অসুরত্বাভিমুখী গতিশীলদের আসুরসম্পদ লাভ হয়ে থাকে ॥ ১৬/৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।। ৫

অনুবাদ: দৈবীসম্পদ মোক্ষের হেতু, আর আসুরীসম্পদ বন্ধনের হেতু, অতএব হে পাণ্ডব, তুমি শোক করিও না। যেহেতু তুমি দৈবীসম্পদ অভিমুখে জাত হইয়াছ ॥ ১৬/৫

ব্যাখ্যা: প্রথমে কারণ দেখিয়ে পরে উভয় সম্পদের কাজ দেখাচ্ছেন। দৈবী সম্পদ মোক্ষের ও আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ। এবার কাজ – দৈবীসম্পদযুক্ত ব্যক্তিই আমার উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয় আর আসুরী সম্পদযুক্ত ব্যক্তি তো নিত্য সংসারী। সে ঝোঁকে পড়ে বা নিছকই সংস্কারবশতঃ দীক্ষাগ্রহণ করলেও সে সমস্ত বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে। কারণ সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান অনুভব তার হয় না ঐ আসুরী সম্পদ সকলের প্রভাবে। তবে একটা কথা, দৃঢ়ভাবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখে সাধন অভ্যাস করে যেতে হয় তাতে ঘসতে ঘসতে পাথর ক্ষয় হবার মত আসুরী সম্পদ বিনষ্ট হয়ে দৈবী সম্পদের বিকাশ হবেই। রামায়ণের দস্যু রত্নাকরের মহর্ষি বাল্মিকীতে রূপান্তর এর একটা সুন্দর উপমা। এমন অনেকেই আছেন যাঁদের বিষয় প্রকাশ হয়নি। আর যাঁরা দৈবী সম্পদাভিমুখে জন্মেছেন তাঁদের তো ক্ষেত্র অনেকটাই তৈরী থাকে। কেবল যত্নপূর্ব্বক সাধন

করার দরকার হয়। শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধপ্রাণ যোগীর জন্মান্তরের পূণ্য থাকাতেই তিনি শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাই তাঁরা আসুর ও রাক্ষসদের মত চট করে স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না এবং পরমার্থ সাধনেও অমনোযোগী হতে পারেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলেই মানুষ হয় দৈবী, নয় আসুরী, সম্পদ নিয়ে জন্মায়। এমনিতেই কামনাবহুল মানবচিত্ত ক্রমাগত ভোগসুখের খোঁজে লালায়িত হয়, সাধুসঙ্গ বা শাস্ত্রনিষ্ঠার অভাবে প্রবৃত্তি আরও বিষয়মুখী হতে থাকে। আসুরীবৃত্তি জড় প্রকৃতিতে বিশ্বাসী হয়ে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং ধন, জন ও বিষয়ভোগেই সুখ খোঁজে ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়। দৈবীপ্রকৃতি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সেজন্য দেখা যায় কিছু লোকে সাধু গুরুর উপদেশ ছাড়াও নিজে থেকেই বেশ ভগবদ্‌মুখী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনের ফলেই এমনটা হয়। তাই তারা দৈবীসম্পদযুক্ত হয়েই আসেন। শ্রদ্ধা, সংযম ইত্যাদি দৈবীসম্পদযুক্ত না হলে ক্রিয়ার প্রতি অনুরাগই আসে না। আসুরবৃত্তির লোকেরা শ্রদ্ধাহীন, কেননা তাদের মত আর কেউ বোঝে না। এমন ভাব থেকে তারা হয় বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন। শুধু বাইরেটাই দেখে ও বিচার করে। তাই বাইরের বস্তুতেই তার আসক্তি, সেসব জিনিষেই প্রাণ পড়ে থাকে ও চর্ম্মকুণ্ডেই প্রাণ তার বাঁধা পড়ে থাকে। এটাই আসুরী সম্পদের ভোগ ও ভোগফল ॥ ১৬/৫

দ্বৌ ভুতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।। ৬

অনুবাদঃ হে পার্থ, ইহলোকে প্রাণিগণের দৈব এবং অসুর এই দুই প্রকার ভাব আছে। দৈবভাব বিস্তাররূপে বলা হইয়াছে, অসুরভাব আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৬/৬

ব্যাখ্যাঃ জগতে ভূতসৃষ্টি অসংখ্য রকমের হলেও চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী দৈব ও অসুর এ দুটো সাধারণ বিভাগ। জগদ্ব্যাপার যদিও মূলতঃ পরমাত্মারই আত্মপ্রকাশ কিন্তু সৃষ্টি মানেই তো দ্বন্দ্বপ্রকাশ। দ্বন্দ্ব না থাকলে সৃষ্টিও নেই। তাই প্রথমে প্রকৃতি পুরুষরূপ দ্বন্দ্ব বিভাগ। তারপর দেখছি দেবতা – অসুর, ভাল-মন্দ, সজ্জন-দুর্জ্জন, আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্রি আরও কত রকম বিভাগ। মানুষ নিজেও দ্বন্দ্বময়, যোগী ব্যতীত সাধারণ মানুষের নিজের ভিতরেই ভালোমন্দের দুটো শিবির বর্ত্তমান থাকে। বিরাট জগতের দেবতা ও অসুরের মত তারও ভিতরে পুরুষ বা আত্মজ্ঞানরূপ অংশটা দৈব এবং প্রকৃতি বা সর্ব্বজ্ঞানরূপ অংশটাই হল আসুর। প্রথমটা প্রকাশ আর দ্বিতীয়টা অপ্রকাশ। তাই দৈব বা আসুর অথবা প্রকাশ বা অপ্রকাশরূপ দ্বন্দ্বের কোনও না কোনও একটা ভাবের অর্ন্তগত হওয়ায় ভগবান দুইপ্রকার ভূতসর্গের কথা বললেন। এর মধ্যে আত্মজ্ঞান অংশে যাঁরা সম্পন্ন, তাঁদের লক্ষণগুলো প্রথম তিনটে শ্লোকে "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি" ইত্যাদি দৈবী সম্পদ, আর সর্ব্বজ্ঞানাংশে আসক্তজীবের, দম্ভ, দর্প, অভিমান ইত্যাদি সংক্ষেপে চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন। এর আগেও নবম অধ্যায়ে "রাক্ষসীমাসুরীং" ইত্যাদি শ্লোকে ত্রিবিধ প্রকৃতির কথা বলেছেন। এভাবে আসুরবৃত্তির গুণকাহিনীর কথা শুনলে মানুষ সেই ভয়ঙ্কর আসুরভাব ত্যাগে কৃতসংকল্প হতে পারে। মানে আমি কোন প্রকৃতির লোক সেটা মিলিয়ে বুঝে নিয়ে নিজেকে নিজে সংশোধন করতে পারে। ক্রিয়ার ফল তো বলাই হয়েছে, তাই ক্রিয়া না করলে মন কিভাবে বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেটা শুনে নিয়ে ও বুঝতে পেরে আসুর প্রকৃতির লোকেরা যাতে সতর্ক হয় ও রজস্তমের ভাব গুলোকে কমাতে এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয় সেজন্যই ভগবান আসুরীসম্পদ যে সব রকমেই বর্জ্জন করা উচিত এই অর্থে আসুরী সম্পদের কথা বিশদভাবে বলছেন, শুনুন পরের শ্লোকে ॥ ১৬/৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।৭

অনুবাদঃ অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না। এজন্য তাহাদের মধ্যে না শৌচ, না আচার, না সত্য আছে ॥ ১৬/৭

ব্যাখ্যাঃ এখন বারোটা শ্লোকে আসুরীসম্পদের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলছেন। স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় শৌচ, আচার, সত্যবুদ্ধি এসব আসুর স্বভাবের লোকের থাকেনা তাই তাদের ভিতর ধর্ম্মে বা ভালো কাজে প্রবৃত্তি আর অধর্ম্মে বা অশুভ কর্ম্মে নিবৃত্তির ব্যাপারটা থাকে না। খালি নানা রকম ধান্ধার পেছনে ছুটে বেড়ায়। যেহেতু তারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যাপারটাই জানে না। অবশ্য অন্তর্লক্ষ্য না হলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ধারণা জন্মায়ও না, তাই তারা কোনও নিয়মেই থাকে না, সত্য কি সেটাই জানে না, মিথ্যাকেই সত্য মনে করে, তাই মিথ্যা ভিন্ন সত্য বলতেও জানে না। সেজন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতি কিছুটা করলেও, পবিত্রতা ও নিয়ম ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় না। শুধু নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হলেই হল। এরা যদি সাধন গ্রহণ করে এবং গুরুর নিকট করব বলে প্রতিজ্ঞাও করে তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না, উল্টে কত রকম মিথ্যা ছল করে। যদি কখনও বা মনে হয় সাধন করি, কিন্তু এতই ভোগে আসক্ত যে ভোগের বস্তু পেলেই সাধন মাথায় উঠে যায়, সব ইচ্ছে পালিয়ে যায়। আবার অদ্ভূত ও অলৌকিকের প্রতি মোহটাও অত্যধিক হয়। যদি কেউ এসে বলে অমুক জায়গায় অমুক সাধু মন্ত্র দিয়ে সোনা তৈরী করে, অমনি দৌড়ায় সেটা শেখার জন্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলোও দুই ধরণের – প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। কীর্ত্তন, পাঁচালী, তীর্থপর্য্যটন, পূজাপাঠ, দান, ধ্যান, যজ্ঞাদির দ্বারা কিঞ্চিৎ সুকৃতি হয় ঠিকই, কিন্তু নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মদ্বারা জীব মুক্তি পথে

এগিয়ে চলে। যারা সুর নয় অসুর তারা এসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের ধারও ধারে না। কখনও বা রাজসিক ও তামসিক ভাবে কিছু লোক দেখানো অনুষ্ঠান করলেও তা শুধু অপকর্ম্মেই পরিণত হয় ॥ ১৬/৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ।।৮

অনুবাদ: সেই অসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কহে, এই জগৎ অসত্য অর্থাৎ বেদ পুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্যবিহীন, অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাবিহীন (স্বাভাবিক), ঈশ্বরশূন্য এবং অন্যান্য–সম্ভূত অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-মিথুন-জনিত। ইহার আর কিছু কারণ নাই। কেবল স্ত্রী-পুরুষের কামপ্রবাহ জনিত মাত্র ॥ ১৬/৮

ব্যাখ্য: অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা অদ্ভুত ধরণের তর্কে (absurd logic) বিশ্বাসী হয়। ফলে বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির বিষয়ে কিছুমাত্র ধারণা করতে অসমর্থ হয়ে জগৎকে অসত্য বা মিথ্যা বলে স্থির করে। মানে জ্ঞানীরা যে অর্থে বলে, মোটেই সে অর্থে নয়। তারা ভ্রান্তিকেই সত্য বলে ধরে নেয়। তাদের ব্যাখ্যায় জগতে ঈশ্বর বলে কেউই নেই, সবই আপনা অপনিই হয়েছে। কামার্ত স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সমাগমের ফলেই সৃষ্টি হয়, সুতরাং সৃষ্টির হেতু একমাত্র কামবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যদিও তারা জগৎকে মৃত্যুময় উপলব্ধি করে অথচ সত্য বলে তাতে ব্যবহারশীলও থাকে। অধিক মাত্রায় ভোগোপকরণ আহরণেই ব্যস্ত থাকে রীতিমতো, সঞ্চয়ের প্রবণতাও অত্যাধিক। এদের কোনও আশ্রয় নেই। জগতের - সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কর্ত্তা বলেও কেউ নেই। আছে শুধু একমাত্র কামবৃত্তি ভরসা, অন্য কিছুই নেই। হ্যাঁ, আর আছে বেশ্যামন, যেখানে বিবিধ সংকল্প বিকল্প একটার পর একটা, ঠিক বেশ্যার মত, অবিরত একটা ছেড়ে আর একটা ধরছে, তারা বলে সেই মনই ভালো। এমন মন নইলে সুখ কোথায় ? যদি বল এর যে বিক্ষেপ আছে, উত্তরে বলবে সেতো ভালই। নইলে কামভোগ্য বস্তুর ভোগটা কি করে হবে ? বলবে মনকে শান্ত করার চেষ্টা এসব পাগলের কাজ। এমন আসুরভাবের মূলে যে রজস্তমের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ও সত্ত্বের পরিপূর্ণ বিদায় গ্রহণ হয় সে ব্যাপারটার অস্তিত্বই তাঁরা মানেন না যদিও তাঁরা জাগতিক ও লৌকিক বিষয়ে অনেক পটু ও শিক্ষাদীক্ষার যথেষ্ট ডিগ্রি, সম্মান ইত্যাদিতে ভূষিতও হয়ে থাকেন, কিন্তু স্বভাবে ও প্রকৃতিতে অসুর। শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় – "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ! পীত্বা মোহময়ীপ্রমোদমদিরাং উন্মত্তভূতং জগৎ ॥" ১৬/৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ।। ৯

অনুবাদ: এই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া মলিন-চিত্ত ও উগ্রকর্ম্মা এবং অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয় ॥ ১৬/৯

ব্যাখ্যা: এখানে আরও অপ্রিয় সত্য কথাটা হল প্রাচীন চার্ব্বাকপন্থী ও আধুনিক লোকায়তিক জড়বাদী ও বস্তুবাদী দর্শনসমূহকে আশ্রয় করে জীব উদ্‌ভ্রান্ত মলীমসচিত্ত হওয়ায় অবিশ্বাসী অথচ দেহসর্ব্বস্ব হয়ে দেহসুখ ভোগের জন্য সমগ্র জীবনটাই ব্যায় করে এবং এমন অকর্ম্ম নেই যা করে না। অল্পবুদ্ধি হওয়ার কারণে জ্ঞানের বিষয়ও খুব অল্পই হয়, সুতরাং আত্মার মত অতখানি অপরিমেয় জ্ঞানবিষয়ের ধার দিয়েও যায় না, বরং উল্টোপথে চলে, হিংসাপ্রবণ ও উগ্রকর্ম্মা হয়, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে সংকোচের পরিবর্ত্তে উৎসাহিত বোধ করে থাকে। এভাবেই যতটা সম্ভব জগতের ক্ষয় ও অহিত সাধন করে থাকে। এভাবে এ জন্মটা কাটিয়ে দিয়ে পরজন্মেও হিংস্র শ্বাপদ ও সর্পাদিকূলে জন্মে ও লোককে উত্যক্ত করে থাকে। পাঠক এখানে প্রশ্ন করবেন ঈশ্বরের সৃষ্টিতে এমন বিপরীতধর্ম্মী ব্যাপারটা ঘটে কেন ? উত্তরে বলি মস্তিষ্ক শুদ্ধ হয় প্রাণকর্ম্মের দ্বারা। যিনি যে পরিমাণে প্রাণকর্ম্ম করেন তাঁর মাথাও ততটাই পরিষ্কার হয়, যতটা আত্মকর্ম্ম করবেন, দৈবীগুণও ততটাই অর্জন করতে পারবেন। তখন স্বচ্ছভাবে সকল বিষয়ের বোধ জন্মাবে। পূর্ব্বের দুস্কৃত সংস্কার সকল ধুয়ে মুছে যাবে। হ্যাঁ, একটু খাটতে হবে তার জন্যে। বিনা পরিশ্রমে তো কিছু হয় না। প্রাণকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বগুণ বেড়ে গেলে জ্ঞানও সুন্দরভাবে জন্মে। এই জ্ঞানও মস্তিষ্ককে পরিষ্কার করে। মৃত্যুকালে মাথাটা যত সুন্দর পরিষ্কার থাকে, পরজন্মে সেই পরিমাণ পরিষ্কার মাথা নিয়ে জন্ম হয়। নইলে বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত হলে বিকৃত মস্তিষ্ক হতে হয়, তখন পরের বুদ্ধিতে চলতে হয়, অপরে কব্জা করে তাকে দিয়ে যত সব অপকর্ম্মসকল করাতে থাকে। বিপরীত দৃষ্টি আশ্রয় করে তামসিক প্রকৃতি লাভ করে, মলিনচিত্ত হয়ে মুখে এক বলে কাজে অন্য করে জগতের অহিতকারী হয়, লোকেরও ক্ষয় করে নিজেরও ক্ষয়সাধন করে থাকে। কারণ জগতের ক্ষয়ের জন্যই এরা উদ্ভূত হয় ॥ ১৬/৯

কামমাশ্রিত্য দুস্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

অনুবাদ: তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দম্ভ, অভিমান এবং গর্ব্বযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ দুরাগ্রহ (এই মন্ত্রদ্বারা দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি পাইব এইরূপ দুরাশা) স্বীকার করিয়া অশুচিব্রত (মদ্যমাংসাদি সংঘটিত ব্রতাবলম্বী) হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৬/১০

ব্যাখ্যা: বর্ত্তমান ভেষজ শিল্পে শর্করাবৃত (sugar coated) বিভিন্ন তিক্ত, কটু, কষায় স্বাদযুক্ত ঔষধের যেমন প্রচলন হয়েছে, তেমনি সবরকম গণমাধ্যমের দৌলতে অনেক রজস্তমকেও সত্ত্বের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে এবং ক্রমশঃ সেভাবেই ভ্রান্ত সংস্কারও তৈরী হয়ে চলেছে। একটু সজাগ থাকলেই এগুলো বোঝা যায়। যারা মূলতঃ আত্মার অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী সুতরাং ভোগ ব্যতীত সকল অধ্যাত্মেই অবিশ্বাসী, কিন্তু নিজের অপূরণীয় দূরাশা পূরণের জন্য, যেমন অর্থলাভের জন্য, যশলাভের জন্য, পরীক্ষায় পাশের জন্য, ভাল চাকরীর জন্য, কিংবা কোন নায়িকা-সিদ্ধি লাভ করে কামভোগার্থ স্ত্রীরত্ন পাওয়ার জন্য দুরাশায় উদ্‌ভ্রান্তমতি হয়ে কত দেবতার পূজো, তাগা, তাবিজ, মাদুলি, পীরবাবার জলপড়া, মন্ত্রজপ, উপোষ আরও কতকিই না করে থাকে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের বড় অংশই এ জাতীয় বিজ্ঞাপনে দখল করে থাকে। এখন প্রিন্ট মিডিয়া ছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও বিভিন্ন চ্যানেলে কতরকম সিদ্ধ তান্ত্রিক ও কবচাদির বিজ্ঞাপন প্রচার হয়, সময় দিয়ে দেখলেই বুঝবেন, কিভাবে শর্করাবৃত করার প্রতিযোগিতা চলে। এগুলোর কথাই ভগবান বলছেন যে অশুচি, অপবিত্র, বৈষয়িক ব্রতপরায়ণ, দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই সকল লোকেরা মোহবশতঃ অসদাগ্রহে আগ্রহবান হয়ে এই সংসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করে থাকে। এমন ইন্দ্রিয় ভোগার্থে মন যাদের সদাই উদ্যত তারা ঘোর তামসিক প্রবৃত্তির হয় এবং কোনও অপকর্ম্ম করতেই বাকি রাখে না। প্রকৃত হিত কিসে তা বোঝেও না, তাই সে পথে চলেও না। ভোগার্থ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে তাতে সাত্ত্বিকতার প্রলেপ দিতে থাকে। এক গ্রামে মুসলমান যুবকবৃন্দ কতিপয় হিন্দু ও খ্রীষ্টান বালককে সাথে নিয়ে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজো সার্ব্বজনীন ভাবে চাঁদা তুলে করে থাকে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে বেশ মোটা টাকা আদায় হয়। সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে বেশ করে প্রগতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রলেপ দেওয়া এমনতর সংবাদের পরিবেশনও হয়। প্রকৃত তথ্য পেলে দেখবেন, কিছুই না, কোনও দেবভক্তির বা কোনও রকম বিশ্বাস অবিশাসের ব্যাপারই এর মধ্যে নেই, যা আছে তা হল অপরের নিকট হতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহের সুযোগ ও সেই অর্থে অপরিমিত ভোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতা, অবশ্যই সেটা ধর্ম্মের শর্করাবরণে। সেখানে কোনও সুবুদ্ধি লোকের কিছু বলার নেই। কারণ কিছু বলতে গেলেই আপনি সাম্প্রদায়িক আখ্যা লাভ করবেন ও জনমানসে আপনি সঙ্কীর্ণমনা ও হেয় প্রতিপন্ন হবেন। দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়, আর আপনি তো সামান্য মানুষ। অতএব সাধু সাবধান। দুষ্পুর কামনার বশবর্ত্তী হলেই দম্ভ, মান ও মদ এই তিনটির সাথে যুক্ত হতেই হয়। তখন ঐ মৈথুন করাটাকেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলে গণ্য করে তারই দেমাক করে এবং সৎ বা সত্ত্বগুণকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে। আর মদ্য মাংসাদিই উৎকৃষ্ট সেব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং নিজেদের বীরাচারী ইত্যাদি পরিচয় দিতে থাকে। কলিতে সমাজ হয় সংগঠনপ্রবণ আর সেই সংগঠিত অংশেই এরা মান্যতা পেয়ে মাননীয় ও পূজিত হয় ॥ ১৬/১০

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।১১

অনুবাদ: মরণকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয়পূর্ব্বক কামভোগ পরায়ণ হইয়া "এই কামভোগই পরম পুরুষার্থ" এইরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥ ১৬/১১

ব্যাখ্যা: আসুরী প্রকৃতির লোকেদের জীবনদর্শনই হল বস্তুবাদ, জড়বাদ বা ভোগবাদ। বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হলে চিন্তার বিরাম থাকে না, চিত্তের বিরাম হয় না, চিন্তারও সীমা থাকে না। ছোট বড় চিন্তার ঢেউ এমন খেলে বেড়ায়, মনে হয় সর্ব্বদাই যেন মহাপ্রলয়। "বিরামহীন চিত্তের কভূ হয় না বিলয়, ভোজন মৈথুন বিনে ভাল কিছু নয়, ইহাই নিশ্চয়।" আসুরী প্রকৃতির লোকেদের কামিনী কাঞ্চনই যখন পরম পুরুষার্থ তখন তারা সর্ব্বদা কাম উপভোগের চিন্তাতেই যুক্ত থাকে। মরণকাল পর্য্যন্ত এ চিন্তা চলে, কারণ বস্তুবাদে দেহটাই শেষ কথা। চৈতন্যযুক্ত দেহটাই পুরুষ এবং কামভোগেই পুরুষার্থ, দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ। দেহান্তের পর কর্ম্মফল ভোগাদির অস্তিত্ব নেই, অতএব প্রশ্নই নেই। সুতরাং নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করায় কোন বাধাই আর রইল না, কোন অকর্ম্ম কুকর্ম্মই আর বাদ দেওয়ার ব্যাপার নেই। ঈশ্বর স্মরণ অথবা আত্মচিন্তা ইত্যাদি উদ্ভট চিন্তা, নিস্ফল চেষ্টা ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বলে মনে করে ॥ ১৬/১১

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ।।১২

অনুবাদ: শতশত আশারূপ পাশে বদ্ধ ও কামক্রোধপরায়ণ হইয়া তাহারা কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক (চৌর্য্যাদি করিয়াও) অর্থসঞ্চয় অভিলাষ করে ॥ ১৬/১২

ব্যাখ্যা: বিরামহীন চিত্তের ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। শত শত আশা, শত শত সঙ্কল্পের জাল বুনে, তাকেই তাতে আটকে ধরে, বেঁধে ফেলে। তখন সেই সব সঙ্কল্প পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি বা রেহাই থাকে না। এমনতর আশা পূর্ণ করার জন্য নির্ব্বিচারে অর্থসংগ্রহে ব্রতী হয়, তা সে যত নিকৃষ্ট উপায়েই হোক না কেন। ছল, বল, কৌশল দ্বারা, অর্থাৎ তঞ্চকতা, ঘুষ নেওয়া, চুরি, ক্লাব অথবা রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ নিয়ে তারপর বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ঠিকাদার, সংস্থা বা ব্যক্তির কাছ থেকে অবৈধ

অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি আরও কত কি। আর যদি কোনও কারণে আশা পূরণে কোনও বিঘ্ন ঘটে বা কোনও আশা পূর্ণ না হয়, তখন রেগে আগুন হয়, এমনকি আশা ও লোভের বশে মানুষ গুপ্তহত্যা, খুন পর্য্যন্ত করে ফেলে। সর্ব্বোপরি, এমন সমস্ত কুকাজে মনে কোনও দ্বিধা বা সংকোচও উৎপন্ন হয় না। বালক, বালিকা অপহরণ, নারীপাচার, বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণ, ইত্যাদি সকলই আসুরী বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ও বস্তুবাদের অবিসংবাদিত পরিণাম ॥ ১৬/১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ।। ১৩

অনুবাদ: "অদ্য আমার ইহা লাভ হইল," "এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব" "আমার ইহা আছে" "আমার এই ধনও হইবে" ॥ ১৬/১৩

ব্যাখ্যা: ভোগবাদী জীবের মনস্তত্ত্ব। আসুর বৃত্তির প্রভাবে ভোগবাদী মানুষের জীবনদর্শনটা কেমন হয় দেখুন। আজ এত টাকা লাভ হল। স্বাভাবিক উপার্জন বাদে অন্য অসৎ উপায়ে আরও কত এল। আরও কত উপরি পয়সা আসতে পারতো কিন্তু এলোনা, কি হলে, কার মাথা মেরে, আরও বেশি আসবে এবং লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হবে।। আসুর প্রকৃতির লোকেদের ধনতৃষ্ণা এতই প্রবল হয় যে এমনতর ভাবনাই মনকে গ্রাস করে ফেলে। যদিও হয়ত এমনতর লোককে রোজ ভোরে জোরে জোরে গীতাপাঠ করতে শোনা যায় যদিও প্রকৃত অর্থটা বোধকরি বোঝে না। কিছু না করার চাইতে এটুকু করা ভালো হলেও এতে প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না। আসুরবৃত্তিটা ঠিকই বিরাজ করে। ভাবে টাকা মান, টাকায় সম্মান, টাকাই তো সব। মনকে পাথরে পরিণত করতে টাকার মত আর কিছুই নেই। বানিজ্যিক প্রতিনিধিদের এক আলোচনা সভায় (seminar) এক মহিলা প্রতিনিধি বলেছিলেন "টাকায় পুত্রশোক নিবারণ করে " মানুষকে নীচেয় নামাতে টাকার নেশার মত আর কিছুই নেই। টাকার দরকার ঠিকই কিন্তু টাকাটাই সবকিছু নয়। ধনমদে মত্ত হলে মনটা পিশাচ হয়ে যায় তখন আর মনুষ্যত্ব বলে কিছুই থাকে না। এজন্যই মাতৃসমা নারী হয়ে কনিষ্ঠ বিক্রয় প্রতিনিধিদের উদ্দীপিত করতে গিয়ে অর্থাগমের নেশা ধরিয়ে দিতে বলে থাকেন যে "টাকায় পুত্রশোক নিবারণ করে"। এতো গেল আসুরবৃত্তিয় ভোগবাদের প্রথম উপাদান, অর্থ ও ধন প্রাপ্তিতে মনোরথ বা মনোবাসনা পূরণের কথা। ভোগবাদী আসুরী মনস্তত্ত্বের দ্বিতীয় উপাদান হল শক্তি। সে বিষয়ে পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ১৬/১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী।।১৪

অনুবাদ: আমা কর্তৃক এই শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে,'অপর শত্রুসকলও মারিব','আমি ঈশ্বর' (সর্ব্বশক্তিমান) ,'আমি ভোগী','আমি সিদ্ধ,''আমি বলবান্,''আমি সুখী' ॥ ১৬/১৪

ব্যাখ্যা: আসুরী সম্পদের বর্ণনায় এবার শক্তির কথা। আসুরসম্পদ অর্থ বলের দ্বারা অর্থের জন্য সব পারে, একে বলে পথের কাঁটা সরানো। তার অভিপ্রায় সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে সে মানুষকে মেরেও ফেলে। ভাবে, আর target তৈরী করে, পরিকল্পনা করে, সেই মত কায়দা করে তাকে সরিয়ে দেয়। বর্তমান সংগঠন ভিত্তিক সমাজে একই দলের ভিতর থেকেও, সমমতাবলম্বী হলেও, প্রয়োজনে নিজের দলের লোককেও হত্যা পর্য্যন্ত করে থাকে। সর্ব্বস্তরেই এই আসুরবৃত্তির প্রভাব থাকে। অখ্যাত লোকেরা পাড়া গ্রামের দিকে একে অন্যের ভিটেয় ঘুঘু চরায়, শহরে গুপ্তহত্যা করা হয়। বিখ্যাত, অভিজাত, উচ্চবিত্ত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভিতরেও আসুরী বৃত্তির অবস্থান থাকে বলেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত বিখ্যাতদের মৃত্যুগুলোও স্বচ্ছ থাকে না। আধ্যাত্মিকতার ছাপ্পামারা ও সংগঠন তৈরী করা উর্দ্দিপরা সন্ন্যাসীদের কথা আর নাই বা বলা হল কারণ আসুরীসম্পদে এরাও কম বলীয়ান নয়। এঁরা নিজেদের আসুরীবৃত্তির সাথে সাথে গৃহীদেরও আসুরীকতা যুক্ত করে থাকেন। ফলে গৃহীদের আসুরবৃত্তি ও তকমাধারী সন্ন্যাসীদের আসুরবৃত্তি মিলেমিশে বেশ একটা যৌথ অপকর্ষতা তৈরীতে সহায়তা করে, যা অহং বোধের পুষ্টি করে ও এমন মনোভাবের জন্ম দেয় যাতে মনে হয় আমিই সব, সবরকম শক্তির অধিকারী, আমিই ঈশ্বর। অমুক স্বামীজি, অমুক মহারাজ, আমার এত সুখ্যাতি করলেন, আমিই তো সব, আমিই বলবান, আমি একজন সিদ্ধ পুরুষ, আমিই সুখী, যেহেতু আমি উত্তম ভোগী। স্বামীজি মহারাজ তোমার সুখ্যাতি করেন কারণ তুমি ছলের পয়সা এনে দান কর মঠে মিশনে তাই মহারাজ তোমার এত সুখ্যাতি করেন, সেটা বোঝার চেষ্টা কর, তাহলে আর এমনটি বোধ হবে না, একথা আর মনেও হবে না যে অন্যরা আছে শুধু পৃথিবীর ভার/ বোঝা বাড়াবার জন্য, তা ঠিক নয়। কিন্তু আসুর সম্পদের প্রভাবে সে বুদ্ধি চাপা থাকে ॥ ১৬/১৪

আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।১৫

অনুবাদ: আমি ধনবান, জনবান অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত ও সমৃদ্ধ, আমার সমান আর কে আছে ? আমিই যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ ও আমোদ করিব এইরূপ অজ্ঞতার দ্বারা বিমুগ্ধ, বিমেহিত ॥ ১৬/১৫

ব্যাখ্যা: সকল প্রকার আসুরী সম্পদের মূল উপাদানই হল বিমুগ্ধতা (enchantment)| তাই এখন আসুর প্রকৃতি জনিত বিমুগ্ধতার কথা বলা হচ্ছে। আসুরিক প্রবৃত্তি অজ্ঞতাজাত। প্রকৃতিতেই এই অজ্ঞতা নিহিত থাকে আর এটাই সর্ব্ববিষয়ে কৌলিন্যবোধের (superirity complex) জন্ম দেয় যা থেকে এই অজ্ঞান বা প্রকৃতির প্রকাশ অহংকার কর্তৃক কর্তৃত্বাভিমানরূপ এবং বিবিধ মোহপ্রাপ্তি ঘটে। মনে হয় আমিই শ্রেষ্ঠ, ধনে, মানে, কুলে, শীলে আমার তুল্য আর কেউ নেই। আমার ঢের লোক আছে, আত্মীয়স্বজন সব বড় বড় উচ্চপদে আসীন, কত নেতা, মন্ত্রী, সবাই আমাকে জানে ও মানে। বেশ ধূম ধামের সাথে এবার কিছু জমজমাট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শেষে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে, যেখানে লোককে দেখিয়ে বেশ কিছু দান টান করতে হবে যাতে প্রচুর নাম যশ হয়। তারপর বন্ধু বান্ধব নিয়ে পার্টি দেওয়া, আমোদ আহ্লাদ করাটাও দরকার, নইলে আর কি করলাম ! এমনতর চিন্তা ও সংকল্প অজ্ঞতা বিমোহিত আসুরীচিত্তে ঘটে থাকে ॥ ১৬/১৫

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ।। ১৬

অনুবাদ: (এইরূপ অজ্ঞান মোহিত হইয়া) অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত চিত্তদ্বারা বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হয় এবং মোহজালে আবৃত ও কামভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৬/১৬

ব্যাখ্যা: আসুর সম্পদ – বিভ্রান্তি (confusion and chaos) ও মোহজনিত (infatuation) অধোগতির কথা বলা হচ্ছে। বহুবিধ সংকল্পে চিত্ত পরিপূর্ণ হলে যা হয়। মন আর মোটেই স্থির থাকে না। বিক্ষিপ্ত চিত্ত থেকে সত্ত্বগুণ বিদায় নেয়, সেই শূন্যস্থান তমঃ ও রজোঃগুণ এসে দখল করে। ফলে উদর ও লিঙ্গের সেবার চিন্তাটাই সামনে চলে আসে। এমনতর অসৎ চিন্তাতেই সময় যায়। ভ্রান্তি ও মোহ এসে এমনভাবে মনের দখল নেয় যে সব রকম বাজে কাজকেই দরকারী বলে মনে হয় এবং জরুরী কাজগুলোকে মনে হয় যেন পরে হলেও চলবে। কুকর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির চিত্তে যে সমস্ত সংকল্প ওঠে সেগুলো সব নরকের বিষ্ঠা। সেখানে শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন চিন্তাই থাকে আর এর জোগানের জন্য চাই অপরিমিত অর্থ। যে অর্থ জোগাড়ের জন্য সৎ উদ্দেশ্যের শর্করাবরণে যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্তি জন্মে। বিভিন্ন সংস্থা তৈরী হয়েই থাকে তোমার জীবন গঠনের প্রধান সময়টাকেই হরণ করে নিজের মুনাফার কাজে ব্যবহারের জন্য, আর সেজন্যই অনেক আপাতসুন্দর নিয়ম কানুন (Cardinal rules) এর মোড়কে ফেলে তোমাকে ব্যবহার করবে, বিনিময়ে কিছু অর্থ কমিশন, PV, Royalty ইত্যাদি নামে দেবে ঠিকই যা তোমাকে বিভ্রান্তি ও মোহের পথে আরও ঠেলে দেবে। তুমি তাদের বই পুস্তক, সিডি ও ক্যাসেটের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে আরও বেশি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়বে। এমন বিষয়াসক্ত চিত্ত মৃত্যুকালেও ঐ সমস্ত কদর্য্য চিন্তায় ডুবে থাকে, কারণ এ সমস্তর মূল উদ্দেশ্যই হল ভোগ যেখানে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ও তাদের শাখা প্রশাখা সকল যেমন বিলাস ব্যাসন প্রমোদভ্রমণ ইত্যাদি ছাড়া আর কোনও কর্ম্ম নেই। এর থেকে ঘোর ক্লেশময় নরক আর কি হতে পারে ? এমন শিশ্নোদর পরায়ণ হয়ে জীবন কাটিয়ে ঘৃণ্য সংস্কার বশতঃ উচ্চ-সামাজিক অবস্থানে অবস্থিত (চিকিৎসক, মন্ত্রী, আমলা প্রমুখ) ব্যক্তিদেরও অবশেষে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় ॥ ১৬/১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ।। ১৭

অনুবাদ: আপনা অপনি সম্ভাবিত অর্থাৎ পূজ্যতা প্রাপ্ত (নিজেকেই নিজে বড় করে, কোনও ব্রাহ্মণ বা বেদজ্ঞ কর্তৃক নহে), অনম্র (দুর্বিনীত), ধনজনিত অভিমান ও গর্ব্ববিশিষ্ট হইয়া তাহারা দম্ভ সহকারে (বাহাদুরী দেখাইতে) নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকে ॥ ১৬/১৭

ব্যাখ্যা: আসুরীসম্পদ – আত্মসম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা– (Socio career progression) স্তব্ধতা (bad ego) ও তদনুসারী কাজকর্ম্মের বর্ণনা। কোনও কিছুতেই মনস্থির নেই সেজন্য কিছুরই গভীরে যায় না, তাই ভাবে টাকা হলেই সব হয়। এমন লোকেরাই আত্মসম্ভাবিত হয়, নিজেকেই সবকিছু ভেবে একটা "হামবড়া" ভাব নিয়ে থাকে। সকলের সাথে কথা বলে না, কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা প্রকৃত সাধক কেউ তাকে সম্মান না করলেও তাঁরা নিজেরাই নিজে থেকে ফোঁটা তিলক কেটে গলায় মালা পরে বেশ গম্ভীরভাবে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকে। ঘরটা ও জায়গাটা বেশ ভাল করে সাজিয়ে সুন্দর করে নেয়। শাস্ত্র পাঠেও মতি নেই তাই শাস্ত্রবিগর্হিতভাবে চমকদারী কিছু যাগযজ্ঞাদি করে শুধু নাম কেনার জন্যই। এদের কিছু টাকা পয়সা থাকে বলে অবিনয়ী হয় কেননা সেই ধন ও ঐশ্বর্য্যের জন্য গর্ব্ব ও অভিমান পূর্ণমাত্রায়ই থাকে। ফলে আদর যত্নের একটু ত্রুটি হলেই রেগে আগুন হয়। নিজেকে অমুক গুরুর শিষ্য ইত্যাদি বলে পরিচয়

দিয়ে থাকে কিন্তু গুরুর কথামত কাজকর্ম্ম করার ইচ্ছা নেই, শুধুই দলবাজী করার ইচ্ছামাত্র। তাই চাঁদা তোলা, ঋত্বিকবাজীর প্রতিযোগীতা আর একটা করে মন্দির বা মঠ জাতীয় আখড়া তৈরী করে তার প্রধান হয়ে ভোগ দখল করা। কিন্তু যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এই সব ? আত্মযজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আপনাতে আপনি থাকা সেই বোধটাই এদের কোনও কালে হয় না। তাই আসুরী সম্পদে সমৃদ্ধদের নিয়ে কলিযুগে একটা শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা বিভিন্ন নামে, উপনামে মঠ মিশন ও মন্দির মসজিদের সংখ্যা বাড়িয়ে ভোগবাদের বিস্তার করে চলেছেন। মঠ, মিশন, বারোয়ারী পূজো, বারোয়ারী মন্দির, মসজিদ, গীর্জা এ সকলই সংগঠিত উপায়ে সাধারণ মানুষকে ধর্ম্মের নামে শোষণের যন্ত্র মাত্র যেগুলোর পরিচালন কর্তৃত্ব থাকে এমনতর আত্মসম্ভাবিত জনমন্ডলীর হাতে। তাই এমনতর উপায়ে সংসাধিত কর্ম্মও অবিধিপূর্ব্বক হয়ে থাকে ॥ ১৬/১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।। ১৮

অনুবাদ: অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করিয়া (আত্মদেহে ও পরদেহে অবস্থিত) আমাকে হিংসা করিয়া সৎপথবর্ত্তী সাধুদিগের গুণে দোষারোপকারী হইয়া থাকে ॥ ১৬/১৮

ব্যাখ্যা: পূর্ব্বের (১৭শ শ্লোকে) শ্লোকে যে অবিধি পূর্ব্বক যজ্ঞের কথা বলা হল সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল কেন খারাপ ? কারণ তার মূলে থাকে এই সমস্ত অপকর্ষতা যথা অহংকার, বল, দর্প ও কামক্রোধাদি যার বশবর্ত্তী হয়ে নিজেই নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। এমনতর আসুরিক ভাবে ভাবিত হয়ে আত্মার অস্তিত্বে চির অজ্ঞই থেকে যায়। ফলে প্রতি দেহঘটে যে একই আত্মারাম বিরাজ করছেন সেটা বোঝে না, জানে না, মানেও না। তাই সর্ব্বদেহে অবস্থিত, সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী আত্মাকে প্রিয় বোধ করতে পারে না বরং বিদ্বেষ করে। তাই তাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সকলও হয়ে থাকে দম্ভযজ্ঞ, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব হেতু বিবিধ পশু ও প্রাণীকে হত্যা করা হয়। যাতে প্রকৃতপক্ষে নিজকেই বৃথা পীড়া দেওয়া হয় এবং এমন পশুদের প্রতি অবৈধ হিংসায় চৈতন্য-দ্রোহমাত্র ফল হয়। এর ফলে ভগবানের প্রতিও বিদ্বেষ জন্মে। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের বাণী ও ভগবৎ নির্দ্দেশগুলোকে অবজ্ঞা, অবহেলা করে এবং নিজের মদ-মাৎসর্য্যে বিভোর হয়ে ঈশ্বরের শরণাগত সাধকগণকে নিন্দা করে ও সমাজে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আসুরী সম্পদে বলীয়ান হলে উল্টোপথেই হাঁটতে হয়। ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হয়ে সৎপথবর্ত্তী সাধুদের গুণে দোষারোপও করতে হয়, এসব নতুন কিছু নয় ॥ ১৬/১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।। ১৯

অনুবাদ: আমি আমার হিংসাকারী ক্রূর নরাধম অশুভ সেই সকল ব্যক্তিকে সংসারে তির্য্যগ্ যোনিতেই অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৬/১৯

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে যাদের কথা বলা হল তাদের আসুরস্বভাব কখনও দূর হয় না। তাই তাদের পর পর শুধু অধোগতিই হয়ে থাকে, এই দুটো শ্লোকে একথাই বলা হয়েছে। এমন ক্রূর স্বভাবের লোকেদের আসুরী যোনিতেই মানে পশুভাবের যোনিতেই নিক্ষেপ করা হয়, মানে পর পর পশুজন্ম পেয়ে থাকে। এখানে পাঠক প্রশ্ন করবেন অনেক ভাবে, অনেক প্রশ্ন। আত্মাই যদি ভগবান তবে তিনি তো সাক্ষীমাত্র। তিনি কিভাবে আসুরী ব্যক্তিকে তির্য্যগ যোনিতে নিক্ষেপ করবেন ? দশম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন “অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতা শয়াস্থিতঃ” তাহলে এই অহংই যদি কূটস্থচৈতন্য বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হন তবে তো তাঁর কেউ দ্বেষ্য বা প্রিয় নেই। তবে তিনি কেন কাউকে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করবেন ? এমনতর অনেকই প্রশ্ন উঠতে পারে। সেজন্য ব্যাখ্যাটা এভাবে করা যাক যে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করে ঠিকই, কিন্তু অচেতন কর্ম্ম তো ফল দিতে পারে না তাই কর্ম্মের সাথে কর্ম্মফলের সংযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্য চেতন কর্ত্তা একজন চাই যাঁর সত্ত্বাপ্রভাবে কর্ম্মসমূহ ফল উৎপাদন করে এবং জীব সেই কর্ম্মফল ভোগ করে। এখানে ক্ষেত্রজ্ঞই সেই কর্ম্মফল বিধাতা। তাঁর দ্বেষ্য বা প্রিয় কেউ নেই, সর্বত্রই সম অবস্থা বরং আসুর প্রকৃতির লোকেদের চিত্ত আজ্ঞাচক্রের নিচে থাকায় আসক্তির সাথে কর্ম্ম করে আপনা আপনিই অধোগতি পেয়ে থাকে কারণ মৃত্যুকালেও সেই অবস্থায়ই দেহত্যাগ করায় আবার সেই চিত্তের বৃত্তি অনুযায়ীই দেহ লাভ হয়। এসমস্তটাই সেই সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শক্তি যা জীবের কর্ম্মের সাথে অনুরূপ ফল সংযোগ করে দেয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন “সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ”। সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অন্তর্য্যামীরূপে আমি অধিষ্ঠিত, আমা হতেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়জনিত স্মৃতি, এবং বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ সাধন হয়। সুতরাং এটাই সেই পরমেশ্বরী শক্তি, এরই বশবর্ত্তী হয়ে জীবের কর্ম্মই অনুরূপ ফল উৎপাদন করে থাকে। এভাবেই অধম ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে নীচ যোনি পেয়ে থাকে। মন আজ্ঞাচক্রের নিচে থাকলে আসক্তির সাথে দ্বেষ ও ক্রূর বুদ্ধি থেকে অমন অশুভ কর্ম্মই বার বার করে থাকে, তারই ফলে হয় নীচ প্রকৃতির জীবন লাভ, তির্য্যগ যোনিতে জন্ম ও তির্য্যগযোনি লাভ ॥ ১৬/১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।। ২০

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরীযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে না পাইয়া আরও অধমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬/২০

ব্যাখ্যা: মূঢ় ব্যক্তিগণ প্রতি জন্মেই আসুরী প্রকৃতি নিয়ে জন্মায় কারণ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবশতঃ এ জন্মেও ঐ একই রকম দুষ্কর্ম্মে রত হয় ফলে তাদের প্রকৃতিও অতিমাত্রায় দূষিত হয়ে থাকে আর অমন দূষিত প্রকৃতিতে সৎ প্রবৃত্তি থাকে না। ফলে প্রবৃত্তির সংশোধন আর হয় না। চিত্তশুদ্ধির অভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় জানতেও পারেনা। কেউ জানিয়ে দিলেও সে পথে যায় না, বরং উপহাস করে। কারণ তাদের আত্মক্রিয়ায় আস্থা স্থাপন হয় না। এমন পরিস্থিতিতে আসুরী প্রকৃতিতে একের পর এক আসুরী জন্মই পেয়ে থাকে। শেষে চণ্ডাল, ডোম, চামারের ঘরে জন্মায়, তাতেও না শোধরালে শেষে আবার মনুষ্যেতর যোনি লাভ করে থাকে। প্রাজ্ঞজনে প্রশ্ন করবেন ভগবান তো শুধু পর পর অধোগতির কথাই বলছেন। কিভাবে এর থেকে উদ্ধার পাবে সে সম্বন্ধে কোন কথাই তো বললেন না। তবে কি এমনতর জীবগণের কোন কালেই উদ্ধার লাভ হবে না ? এদের উদ্ধারের কি আর কোনও উপায়ই নেই ? না তা ঠিক নয়। এই অধ্যায়ে কর্ম্মের উভয়মুখী সীমা দেখানটাই ভগবানের উদ্দেশ্য। সেজন্যই আসুরী সম্পদ আশ্রয় করে কতদূর পর্য্যন্ত অধোগতি হতে পারে সেটাই এখানে দেখিয়েছেন। কিভাবে এরা উদ্ধার লাভ করবে সেটা অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন। এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য হল যে কেমন বিপজ্জনক অবস্থায় জীবকে পড়তে হয় সেটা বোঝানো। চিকিৎসার প্রয়োজনে শরীরে একটা সামান্য ছোট বা বড় ধরনের অস্ত্রপচারের জন্য কত কষ্ট পেতে হয় আর বার বার গর্ভাবাসের বিষয়টা যে কত কষ্টকর সেটা বুঝতে পারলেই দৈবীসম্পদ লাভের জন্য প্রাণ অবশ্যই ব্যাকুল হয়ে উঠবে এবং আজ্ঞাচক্রে গতি প্রাপ্তির উপায়ও অবশ্যই খুঁজে নেবে ॥ ১৬/২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ।।২১

অনুবাদ: কাম, ক্রোধ এবং লোভ নরকের (অশান্তির) এই ত্রিবিধদ্বার (হেতু) এইগুলি আত্মার (আত্মজ্ঞানের) নাশক। এই জন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৬/২১

ব্যাখ্যা: আসুরী সম্পদের বিষয়ে যা বলা হল তাতে আসুরী সম্পদ অনন্ত কিন্তু সকল আসুর বৃত্তির মূল হল তিনটি প্রধান আসুর সম্পদ কাম, ক্রোধ এবং লোভ। যেহেতু এই তিনটেই হল আত্মজ্ঞান নাশকারী ও নরকের দ্বারস্বরূপ, সুতরাং এই তিনটে ত্যাগ করতে পারলেই বাকি যে সমস্ত মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি যেগুলি আছে সেগুলিকে পরিহার করতে পারা যায়। মনের কাম বা কামনার উদয় হলেই তা পাওয়ার জন্য লোভ হয়, সেই লোভের পথে বাধা এলেই ক্রোধ সঞ্চারিত হয়। ক্রোধ আবার এতবড় অসুর যে সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয়। ফলে হত্যা এবং আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিয়ে দেয়। তাই এই তিনটেকে নিয়ে যারা থাকে তাদের আত্মাতে-থাকা কোনও মতেই হয় না। এ তিন বৃত্তিতে আত্মজ্ঞান ঢাকা পড়ে যায়। এমন আসুরী সম্পদের পাল্লায় পড়লে নীচযোনি প্রাপ্তি হয়। আত্মাতে থাকতে না পারলে মাথায় কোনও জ্যোতিরও প্রকাশ হয় না, মোক্ষপথ অবরুদ্ধই থাকে। সাধকদের এ তিনটে ত্যাগ করতেই হবে। সদ্গুরুর কাছে একটু বেশি সময় ব্যয় করতে হবে ও নিষ্কাম কর্ম্ম আশ্রয় করতে হবে। সদ্গুরুর কৃপা ছাড়া এমন দুর্দ্দান্ত তিন রিপুকে তাড়াবার আর কোনও উপায় নেই। দেহস্থিত বায়ুর গতিবিশেষেই এরা সমুদ্ভূত হয়। প্রাণের অমনতর গতিকে ফিরিয়ে যথাস্থানে স্থির করে রাখতে পারলে তবে যদি এদের কব্জায় রাখা যায়। অকামদ্বারা কামকে দমিত করতে হয়। অকাম অর্থ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে কাম, কামনা বা সৎকাম সেটাই হল অকামের কামনা এই অকাম ভাব দ্বারা কাম পরিহার করা যায়। আপনাকে আপনি অণুবোধ দ্বারা ক্রোধ দমিত হবে, আর সন্তোষের দ্বারা লোভকে দমন করতে হয়। সদ্গুরুসঙ্গ ও সেবা দ্বারা রিপুত্রয় দমিত হয় ॥ ১৬/২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ।। ২২

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, নরকের দ্বার স্বরূপ এই তিনটি (কামাদি রিপুত্রয়) হইতে বিমুক্ত ব্যক্তিই আপনার মঙ্গল আচরণ করেন এবং পরে পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১৬/২২

ব্যাখ্যা: কামমুক্ত পুরুষই শ্রেয়ঃ সাধনে সমর্থ এ কথাই বলা হচ্ছে। মানুষের মন তো সর্ব্বদাই দেহ ও ইন্দ্রিয়দের সাথে মিলে মিশে কাম, লোভের বাসনাকেই চরিতার্থ করে। যারা ভোগবাদী তারা সর্ব্বদা এটাকেই তো উপভোগ করতে চায়, তাই তাদের দৃষ্টি এর সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেনা। মনকেও সর্বদা এরাই দখল করে রাখে। এমনতর ভোগদখলই চিত্তের নাশকারী। এই ত্রিবিধ উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণকে ঠাণ্ডা করতে না পারলে উপায় নেই, কারণ শুধু ভোগেই তো শেষ নয়, ভোগের সাথে থাকে রোগ, শোক, ও ত্রিতাপের জ্বালা, সেগুলোও তো ভোগসঙ্গী। ২৫% যদি ভোগ হয় তো ৭৫% হয় ত্রিতাপের জ্বালা। সুতরাং ১০০% এতে চলে গেলে তোমার বলে আর রইলটা কি ? এই দেহ ইন্দ্রিয়ের কলটা

চালাচ্ছে প্রাণ ও অন্যান্য বায়ুসকল। সদগুরুর উপদেশে প্রাণের গতিকে সুষুম্নায় নিয়ে গিয়ে দেখ আসল মজাটা কি ? তিন রিপুকে আর চেষ্টা করে তাড়াতে হবে না, সুষুম্নায় প্রাণের গতি হলে ও সমস্ত আগুনগুলো নিজে থেকেই নিভে যায় ॥ ১৬/২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ।। ২৩

অনুবাদ: যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, শান্তি ও মোক্ষ পায় না ॥ ১৬/২৩

ব্যাখ্যা: আগের দুটো শ্লোকে যেভাবে রিপুত্রয়কে পরিহার করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে সেটা তত্ত্বজ্ঞান বিনা সম্ভব হয় না। স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হয়ে কাজকর্ম্ম করলে স্বধর্ম্মই নষ্ট হয়ে যায়, তত্ত্বজ্ঞান লাভ তো দুরের কথা। সুখ, শান্তি (উপশম), পরাগতি, মুক্তি এসবের তো প্রশ্নই ওঠে না, অনেক দূরের পথ। জড়বাদী জীব শাস্ত্রবিধি মানেনা, কারণ শাস্ত্রবিধিমত চলতে গেলে ভোগ ষোল আনা হয়না। আবার আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর নাস্তিকতার ঝোঁক বড্ড বেশি। এটা যে শুধুই উগ্র ভোগবাদ উদ্ভূত তা কিন্তু নয়। এর মূল কারণ হল শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অনেক এবং এর ভিতরে কতকগুলো আবার এমনই পরম্পর বিরোধী যে একটা মানতে গেলে অন্যটার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। তাই গ্রন্থপাঠে এর মীমাংসা হয় না, বরং যত বেশি পড়া যায় ততই সন্দেহ বাড়ে। এরই ফলে নাস্তিক হতে হয় অথবা অনেক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। নাস্তিকেরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে নিজের সুখ সুবিধের ব্যবস্থা করে নেয় আর অন্যেরা ভীষণভাবে রক্ষণশীল হয়ে সাধু সন্তের বেশ ধরে ভিন্ন ভিন্ন নামে যথা – দশনামী সম্প্রদায়, শতনামী সম্প্রদায়, গুরুকুল, চতুর্বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পতাকা ও পোষাকে সজ্জিত হয়ে উপলক্ষ্যকে প্রধান করে আসল বস্তুকে অতিক্রম করে থাকে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম না বোঝায় আজকাল ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্য্যয় ঘটে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের এমনতর রোগ নির্ণয়ে শাস্ত্রের আশ্রয় নিতেই হবে। জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্রেও এ কথাই আছে। "মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি। সারস্ত যোগিভিঃ পীতস্তক্রমশ্নন্তি পণ্ডিতাঃ ॥" – চারি বেদ ও শাস্ত্রসকল মন্থন করে নবনীত (ননী) রূপ সার ভাগটা খেয়েছেন যোগীরা আর অবশিষ্ট ঘোলটা, মানে অসার ভাগটা, লৌকিক পণ্ডিতেরা পান করেন। অতএব সদ্গুরুরূপী যোগীর কাছ থেকেই সকল শাস্ত্রের সারাংশটা গ্রহণ করতে হবে। ভগবান আগেই বলে দিয়েছেন – "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।" ১৬/২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ।। ২৪

অনুবাদ: অতএব ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য, এইরূপ ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। (এজন্য কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া) সদ্গুরুর (নিকট) শাস্ত্র বিধানোক্ত (সিদ্ধান্ত) জানিয়া কর্ম্ম কর ॥ ১৬/২৪

ব্যাখ্যা: শাস্ত্রই যে সকল করণীয় ও অকরণীয় কাজের প্রমাণ সেকথা বলছেন। শাস্ত্রীয় আচার বিষয়ে ধারণা থাকলে আর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয় না। তা হলে যতদিন এমন ধারণা তৈরী না হয় ততদিন গুরুর উপদেশমত চলাই কর্ত্তব্য। একারণ পূর্ব্বশ্লোকে যেমন বলা হয়েছে তেমন যোগাভ্যাসকারী সদ্গুরুর নিকট বিধান নিয়ে কর্ম্ম কর। এখানে যোগী অর্থে তিলক মালা বা জটাধারী বা সাধুবেশধারী যোগী নয়, যাঁরা প্রাণের চঞ্চল অবস্থারূপ চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ অর্থাৎ স্থির করতে পেরেছেন, এমন মহাপুরুষগণের কথাই বলা হয়েছে। বেশভূষাধারী যোগীরা শাস্ত্রের অসাররূপী ঘোল পানেই রত মাত্র, তাঁরা নবনীত (ননী) খেতে পারেন না। কারণ পাঠ করলেই যে শাস্ত্রজ্ঞান হবে এমনটাতো নয়, তবে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকা দরকার। শ্রীগুরুদেব তোমাকে শাস্ত্রীয় কর্ম্মেই নিযুক্ত করবেন। সেই কর্ম্মেই হবে তোমার সত্ত্বশুদ্ধি, সম্যক জ্ঞান যা মুক্তিলাভে সহায়ক। প্রশ্নোপনিষদ অনুসারে শাস্ত্রবিধি মানে বায়ুবিধি। শাস্ ধাতু থেকে শাস্ত্র, মানে যিনি শাসন করেন বা আজ্ঞা দেন। বায়ুই এই দেহ ও ইন্দ্রিয়কে শাসন করে (বশে রেখে) নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত করে। অতএব বায়ুগুলোই শাস্ত্র। বিধি= বি পূর্ব্বক ধা ধাতু অর্থ বিশেষরূপে ধারণ করা। তাহলে শাস্ত্রবিধি কথার অর্থই হল বায়ুকে স্থির করে মস্তকে ধারণ করা। এমনতর বিধি বিধান পালনের নিয়ম ও উপায় সকল শ্রীগুরুদেবই বলে দেন। যার যেমন শরীর ও অবস্থা, বাধা ও বিঘ্নসকল থাকে সেই অনুযায়ী দয়াল গুরুদেব বিধি ব্যবস্থা করেন ও বিধান দিয়ে থাকেন যাতে ক্রিয়ার ক্ষেত্র এই শরীরের সদ্ব্যবহার হয় ও জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছানো যায়। এটাই ভগবানের কথার আসল অর্থ ॥ ১৬/২৪

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুর সম্পদ-বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুর সম্পদবিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষোড়ষ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার : কর্ম্মবিজ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান এই অধ্যায়ে সেই কর্ম্মের উভয়মুখী গতিস্বরূপ দৈবী এবং আসুরী এই দুই রকম সম্পদবিভাগ করে দেখিয়েছেন। বলেছেন দৈবীসম্পদ মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায় আর আসুরীসম্পদ শুধু বন্ধনের পর বন্ধনই রচনা করে চলে। কর্ম্মময় এ বিপুল বিশ্বে কর্ম্ম না করে কারোরই থাকার উপায় নেই। সেই কর্ম্ম দৈবী ও আসুর এই দুই ভাবে করা যেতে পারে। কর্ম্মকে জড়জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয়ে জড়বিষয় অভিমুখে প্রবাহিত করলে সেগুলোই হয় আসুরী আর জগৎকে পরমাত্মশরীর বা তাঁর শক্তিস্বরূপ জ্ঞান করে, পরমাত্মকর্ম্মবোধে, পরমাত্মা অভিমুখে পরিচালিত করতে পারলে সেটাই তখন হয় দৈবী। একই কর্ম্মপ্রবাহের দুটো দিক মাত্র। বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই উভয়গতির ফলতারতম্য ভগবান বিশেষভাবে বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যা ইচ্ছে তাই করে কর্ম্ম করলে তা থেকে সুখ, সিদ্ধি বা পরাগতির কোনওটাই লাভ হয় না। শাস্ত্র বলতেও তাই বোঝায় যাতে পরমাত্মলাভ উদ্দেশ্যে কর্ম্মপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণবিধির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বেদই এই কর্ম্মনিয়ন্ত্রণ, বিধির আদি উপদেষ্টা। অন্যান্য গ্রন্থেও সেই বেদকেই মূল সূত্র ধরা হয়। সুতরাং পরমাত্মলাভ উদ্দেশ্যে কর্ম্মনিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক সাধকের পক্ষে বেদের সার উপদেশ – জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়ই অবলম্বন করতে হয়। ঈশ্বরজ্ঞান হতে কর্ম্ম বিযুক্ত হলেই সেই কর্ম্ম বৈষয়িক বা আসুরী হতে বাধ্য এবং ঈশ্বরজ্ঞানের সাথে যুক্ত হলেই সেই কর্ম্মই আবার দৈবীকর্ম্মে পরিণত হয়। সুতরাং জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়, মানে জ্ঞানের সাথে কর্ম্মকে যুক্ত করে কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ হতে পারলেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার ত্রিবিধ রূপ যে সিদ্ধি, সুখ ও পরাগতি সেটা ক্রমশঃ উপলব্ধি হতে থাকে। সুখ অর্থে আত্মতত্ত্ব যেহেতু "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং"। সিদ্ধি সাধারণ অর্থে ঈশ্বরানুগ্রহে পাওয়া কিছু ঐশী শক্তিসম্পন্নতা, সূক্ষ্ম অর্থে আত্মার অসঙ্গ অক্ষরত্বে অধিকার, আর পরাগতি অর্থ ব্রহ্মভূত হওয়া। জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়কারী আত্মতত্ত্বের এই তিনরকম অবস্থা বা ত্রিবিধ রূপের সাক্ষাৎকার পর পর হয়ে থাকে। আর শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মানে কর্ম্মের সাথে ঈশ্বরজ্ঞানকে সংযুক্ত না করে অথবা শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মও ঠিক ঠিক ভাবে না করে যা ইচ্ছে তাই ভাবে করলে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সাথে সে কর্ম্মের কোনও সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো সবই অশাস্ত্রীয় ও আসুরিক কর্ম্মে পরিণত হয়। এমনতর কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত আসুরী সম্পদের মূলীভূত উপাদান– কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো পরিত্যক্ত হয় না, ফলে দৈবী সম্পদদ্বারা লভ্য সিদ্ধি, সুখ ও পরাগতি নামক আত্মার ত্রিবিধ রূপও চির অজানাই থেকে যায়। অতএব এ অবস্থা থেকে ত্রাণ পেতে দৈবী কর্ম্মরূপ সম্পদের স্বরূপজ্ঞান লাভ করতে হবে ভবার্ণবের কাণ্ডারী শ্রীগুরুদেবের নিকট থেকে কারণ তিনি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় সম্যক জানেন ও জানাতে পারেন কিভাবে শরীরের ভিতরে ও বাইরে উভয়তঃই, দৈবী ও আসুরী এই দুই ভাব চলছে, কখনও দেবভাবের উদয় হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই অসুরভাবের। কখনও এটার কম ওটার বেশি, কখনও বা আবার উল্টোভাবে ওটার কম এটার বেশি হয়ে চলেছে। একমাত্র সদ্গুরু প্রভাবেই প্রথমে দৈবীসম্পদে পূর্ণ হতে হয়। দৈবী সম্পদ ব্যতীত গুরুলাভ হলেও তা ঠিক কার্য্যকরী হয় না। তাই দৈবীসম্পদ কিছুটা সুকৃতিলব্ধ ও বাকিটা অধ্যাবসায় দ্বারা অর্জ্জন করার পর আত্মকর্ম্মের দ্বারা যখন আর দেবভাবেরও কোনও প্রকাশ থাকে না অথচ অসুর ভাবেরও উদয় হয় না, এমনতর ভাবরহিত অবস্থাই যোগ। এই বিগত ভাবরূপ অবস্থাতেই দৈবাসুরসম্পদ বিভাগ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ক্রিয়ালব্ধ এমন বিগতভাবরূপ অবস্থাকেই যোগীদের পরাবস্থা বলা হয়। শাস্ত্রের বিধান মেনে ক্রিয়া করে চললে কর্ম্মের সূক্ষ্মরূপ প্রাণ বা ভাব হতে স্থূল বাহ্য বস্তু পর্য্যন্ত যে বিশিষ্ট গুণটি প্রবাহিত স্থূলে ও সূক্ষ্মে সেই গুণের সামঞ্জস্য বিধান আপনা আপনিই হয়ে যায়। শাশ্বততত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ও যথেচ্ছাচারিতা এই দুটো কারণে আজকাল এটা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালেও অন্তরে ও বাহ্যে একগুণিত্ব রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রীয় বিধানগুলোও যথাযথ ভাবে পালন করতে হয়॥

--০০--

ওঁ

অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ (১৭)

অর্জুন উবাচ -

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন। যাহারা শাস্তবিধি লঙ্ঘন করিয়া, পরন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাগযজ্ঞ পূজাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিদৃশী ? সত্ত্বঃ ? কি রজঃ ? অথবা তমঃ ? ১৭/১

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ কিছুই নেই, একটা প্রশ্ন মাত্র, যে প্রশ্নের সাথে সাথে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। প্রশ্নের উত্থাপনের একটা পটভূমি অবশ্যই আছে। গীতায় ব্যক্তিগত বাসনার বশে কর্ম্ম না করে শাস্ত্র অনুসরণে কর্ম্ম করতে বলা হয়েছে। কালের বিবর্ত্তনে যখন সমাজ জীবনে বস্তুবাদ বা জড়বাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন মানুষ প্রচলিত শাস্ত্রে বিশ্বাস হারায়। কিন্তু শাস্ত্রবিধিকে বর্জ্জন করলে কোন জিনিষকে অবলম্বন করে জীবনের পথে এগিয়ে চলবে ? এই প্রশ্ন দিয়ে যে অধ্যায় সূচিত হল তাতেই আলোচিত হয়েছে যে এই সূত্র, এই ভিত্তি পাওয়া যাবে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে।

স্বভাবদুর্ব্বল মানুষ সততই যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় নিতে উন্মুখ। কর্তৃত্বাভিমানই জীবত্ব। আর সেই কর্তৃত্বজ্ঞানই নিজেকে যথেচ্ছভাবে আড়ম্বরময় করে তুলতে জীবকে যথেচ্ছাচারপ্রবণ করে তোলে। ফলে উপলক্ষ্য আসল বস্তুকে অতিক্রম করে যায়। পূজো অপেক্ষা পার্ব্বণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, উপনয়ন অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে উপনয়ন বাদে আর সবকিছুই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেজন্য উপনয়নে নয়ন ফোটে না, জ্ঞানেরও উন্মেষ হয় না, সেই অন্ধকারই থেকে যায়। অজ্ঞান, কর্তৃত্বাভিমানী জীবের সেই দৌর্ব্বল্য স্মরণ করেই অর্জ্জুন এই প্রশ্নটা করেছেন যে শাস্ত্রবিধি না মেনে যদি শ্রদ্ধাময় হয়ে কেউ ভগবদ্ উপাসনা করে, তবে তার নিষ্ঠা কোন শ্রেণীর, কোন গুণীয় ? এখানে কলিযুগের দৌর্ব্বল্যময় ভক্তিবাদটা অর্জ্জুনের প্রশ্নের ভিতর প্রকটিত হয়ে উঠেছে। মূল কথাটা হল শাস্ত্রাদি বুঝিনা, প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকলে তিনি অবশ্যই করুণা করবেন, এমন একটা বোধ থেকেই অনেকে সহজেই চট করে সন্ন্যাস গ্রহণও করে থাকে। দৌর্ব্বল্যপ্রসূত এই ভাবটার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? সেটা বুঝতেই অর্জ্জুন যেন কলির জীবের প্রতিনিধিরূপে এ প্রশ্নটা করেছেন। কর্ম্মবিজ্ঞান বুঝতে হলে শ্রদ্ধার গতি অনুধাবন করতে হয় এবং নিষ্ঠা দেখেই সেটার বিচার করতে হয়। কেননা নিষ্ঠা থেকেই শ্রদ্ধা জন্মে এবং যে যেমন কাজে যুক্ত থাকে তার নিষ্ঠাও সেই জাতীয় হয়ে থাকে। সুতরাং কর্ম্ম দেখে নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠা দেখেই শ্রদ্ধা বিবেচ্য। আগের অধ্যায়ের আলোচনা অনুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যারা শাস্ত্রবিধি জেনেও তাতে অশ্রদ্ধা বশতঃ নিজেদের ইচ্ছামত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তারা হল অসুর সম্প্রদায়। (২) যাঁরা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অনুযায়ী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা দেব সম্প্রদায়। (৩) আরও এক শ্রেণী আছেন যাঁরা আস্তিক্যবুদ্ধিশালী, শ্রদ্ধাবান কিন্তু শাস্ত্রবিধি ও বিধানগুলো ঠিকমত জানেন না অথবা জানার চেষ্টাও করেন না, তাঁদের কর্ম্মসকল ঠিক ঠিকমত সম্পন্ন হল কিনা সেটাও বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও করেন না, তবে পরম্পরা অনুযায়ী যা চলে আসছে সে সবই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করে যান। ক্রিয়াবানদের ভিতর অনেকেরই ক্রিয়ায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্তেও ঠিক যে প্রণালীতে ক্রিয়া করলে বিধি সঙ্গত সাধন হয়, তা তাঁরা জানেন না বা করতে পারেন না। এই শ্রেণীর মানুষ ও সাধকের জন্যই অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন। এরই উত্তরে শ্রীভগবান বিশদভাবে অর্জ্জুনকে শ্রদ্ধাবিজ্ঞান বুঝিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। আগের আগের অধ্যায়ের ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ মনে রেখে এই অধ্যায় বোঝার চেষ্টা করুন ॥ ১৭/১

শ্রীভগবান উবাচ -

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। দেহীদিগের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয়। তাহা স্বভাবজ অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কারজাত। তাহা (আমার নিকট) শ্রবণ কর ॥ ১৭/২

ব্যাখ্যা: শ্রদ্ধা কি ? "শ্রৎ – সত্যং সত্যং বা ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা।" অর্থাৎ "কোন বিষয়ে সত্যবোধ হইলে, সেই বিষয়কে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে চিত্তের যে অংশটি বিজড়িত থাকে, তার যে শ্রী, তাহাই তদবিষয়ক শ্রদ্ধা।" তাহলে সত্য কাকে বলে ? আমার ব্যবহারময় জীবন ও মরণেরও মূল স্বরূপে যাঁকে বরণ করা হয়, তিনিই আমার একান্ত সত্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্মমরণের মূলস্বরূপে যিনি অবস্থিত, সেই পরমাত্মাই পরমসত্য। আমার জীবন ও মরণেরও অতীত এবং আমার জীবন ও মরণেরও মূলরূপে, আদিরূপে যিনি অবস্থিত, তিনিই আমার সত্য, ভগবান্। সেই সত্যাশ্রয়ী সত্ত্বগুণের যে শ্রী, যে ভাবে আমাতে অনুভূত হয় সেটাই শ্রদ্ধা। এটাই হল মুখ্য শ্রদ্ধা যেটা মূলতঃ সাত্ত্বিকী। এছাড়া যে গৌণশ্রদ্ধা আছে সেটা (variable) পরিবর্ত্তনশীল যা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে তিনগুণের অবিরত পরিবর্তন হেতু অনবরত পরিবর্তন হতে থাকে। শ্রদ্ধা মূলতঃ স্বভাবজ। মানে পূর্ব্বজন্মের যে সমস্ত সংস্কার যা মরণকালে অভিব্যক্ত হয় সেটাই আবার বর্ত্তমান দেহে স্বভাবরূপে পাওয়া যায়। এমনতর শ্রদ্ধা শিক্ষাদীক্ষা না পেলেও পূর্ব্বসংস্কার অনুযায়ী হতে বাধ্য। এই শ্রদ্ধাই যে আবার প্রকৃতি অনুসারে ত্রিবিধ হয় সেটাই ভগবান বলেছেন যে মনে অবিরত তিনটি গুণ খেলা করছে। তাই মন যখন যে গুণে অবস্থিতি করে সেই অনুসারে শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী হয়ে থাকে। স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তো পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই হয় কিন্তু সেই শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় উন্নীত করার জন্য রীতিমত সাধন করার দরকার। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সাধন, ভজন, সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র আলোচনাদি দ্বারা তৈরী করে নিতে হয়। পরের দুটো শ্লোকে ভগবান এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কি সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন লক্ষ্য করুন ॥ ১৭/২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩

অনুবাদ: হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা সংস্কার-যুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ। এই (অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত) পুরুষোত্তম শ্রদ্ধাময়, যে যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত, তার পক্ষে তিনি তাদৃশই ॥ ১৭/৩

ব্যাখ্যা: কথায় বলে, "কৃষ্ণ কেমন ? যার মন যেমন।" পুরুষ শ্রদ্ধাময়। শ্রদ্ধা নিয়েই পুরুষ ব্যবহারময় হয়। কি ভগবানে, কি জাগতিক বিষয়ে, যার যাতে শ্রদ্ধা, যেমন শ্রদ্ধা ও যতটা শ্রদ্ধা, সে পুরুষ সেই রকমই। শ্রদ্ধাই কর্ম্মময় পুরুষের পরিচয়। সাত্ত্বিক পুরুষের শ্রদ্ধা সত্ত্বপ্রধান, রাজসিক পুরুষের শ্রদ্ধা

রজোভাব প্রধান এবং তামসিক পুরুষের শ্রদ্ধা তামসী। এজন্যই ভগবান বলেছেন "সত্ত্বানুরূপা শ্রদ্ধা" মানে সকলের শ্রদ্ধাই সংস্কার অনুরূপা। এককথায় শ্রদ্ধা হল অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। কেউই একেবারে শ্রদ্ধাহীন হতে পারে না। যার ভিতর যে গুণই প্রবল থাকুক, সত্ত্বগুণ কিছুটা তো থাকেই সুতরাং শ্রদ্ধাও কিছুটা থাকবেই। এজন্যই পুরুষ শ্রদ্ধাময়। অবশ্য তমঃ ও রজঃ প্রধানদের ভিতরে সত্ত্বগুণটা অত্যন্ত অস্ফুট থাকে বলেই সাত্ত্বিকী বৃত্তির প্রকাশ হয় না। যাই হোক মূল কথাটা হল শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। কেবলমাত্র লোকাচার অনুসরণ করে কাজ করে গেলে শ্রদ্ধার উৎকর্ষ হয় না। শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করতে হলে শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকলে তো আর সাত্ত্বিকী দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধকের দৃঢ় শ্রদ্ধা হতেই সাধন বিষয়ে চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। তাই ভগবানও বলেছেন "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়। জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥" এমন সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার অভাবে গুরু ও বেদান্তবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস আসতেই পারে না। এর কারণই হল চিত্তের অশুদ্ধি। অশুদ্ধ চিত্তে গুরু ও বেদান্তবাক্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্মে। গুরুর কাজের বিচার করতে চায়, বিবিধ ভাবে ছিদ্রান্বেষণ করে। গুরু মিথ্যা বলেন কিনা লক্ষ্য করতে থাকে। বিচক্ষণ গুরুদেবও এতে বেশ মজা পেয়ে থাকেন ও তাদের আরও বেশি করে ভ্রমজালে জড়িয়ে নিক্ষেপ করেন। শিষ্য যদি প্রকৃতই ভক্তিমান হয়ে থাকে তবে তার শ্রদ্ধাভক্তির জোরে একদিন না একদিন ঠিকই সেই ভ্রমজাল কেটে বা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে নইলে উল্টো দিকেই হেঁটে চলে আর ক্রমাগত মত পরিবর্তন করতে করতে একদিন পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে থাকে। তখন আর ইহকালও থাকে না, পরকালও নয়। এজন্যই সকল রকম শ্রদ্ধাকেই দৃঢ়ভাবে অধ্যাবসায় দ্বারা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় উন্নীত করতে হয় চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে। মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে গুরুসেবা করলেও চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। এমন শুদ্ধচিত্তে যিনি যত অধিক পরিমাণ ক্রিয়া করবেন ততই তাঁর সত্ত্বসংশুদ্ধি হবে। সুষুম্নার মধ্যদিয়ে প্রাণধারা প্রবাহিত হলে ব্রহ্মাণুতে স্থিতিলাভ হবে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সাধক ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে যাবেন। সেটাই গুণাতীত অবস্থা। এমন গুণাতীত অবস্থায় যেতে হলে রজঃ ও তমঃ কে ছাড়িয়ে ক্রমশঃ সত্ত্বে উন্নীত হতে হয়। এজন্যই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার এত কদর। তারপর গুরুপ্রদত্ত সাধনদ্বারা গুণাতীত হতে হয়। ত্রিগুণসম্ভূত যে প্রকৃতি সেটা ব্রহ্মেরই বিকার। তাই ক্রিয়া যত বেশি করে করবে ততই গুণ অতিক্রম করে গুণাতীত অবস্থায় পৌছাতে পারবে ॥ ১৭/৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভুতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪

অনুবাদ: সাত্ত্বিক গুণশালী ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করে। রাজসিকগণ যক্ষ ও রাক্ষসদিগের পূজা করে এবং অন্যান্য তামস ব্যক্তিরা প্রেত ও ভূতগণকে পূজা করে ॥ ১৭/৪

ব্যাখ্যা: বৃক্ষের যেরূপ ফলেই পরিচিতি তেমনি গুণভেদেই কার্য্যভেদেরও পরিণতি। সাত্ত্বিকের সত্ত্বপ্রকৃতি তাই তাঁরা দেবতাগণের পূজো করেন, কারণ তাঁরা দেবপ্রিয়, তাঁদের হৃদয় হয় প্রকাশসম্পন্ন, সকল জৈব স্বার্থের উর্দ্ধে। একই সাধনপন্থা সকলকে দেওয়া হলেও, একজন হৃদয় দিয়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে আত্মকর্ম্মদ্বারা স্থিরতার অনুভব পেয়ে থাকেন। আবার যিনি বা যাঁরা রাজসিক, তাঁরা ক্রিয়া করে ফল পেতে চান, অর্থ ও ভোগই তাঁদের কাম্য হওয়ায় অন্ততঃ এক আধটা ছোট খাট সিদ্ধি, সিদ্ধাই কিছু যদি পাওয়া যায় সেই দিকেই লক্ষ্য থাকে। এদের কেউ কেউ আবার ক্রিয়া না করে তার চেয়ে যক্ষ বা কুবেরাদি এবং রাক্ষস অথবা নৈঋতাদির পূজাও করে থাকেন। এতে আরও বেশি মাত্রায় কামজালে জড়িয়ে পড়ে ও মুক্তির পথকে আটকে দেয়। তমোগুণীরা আবার ভূত প্রেতাদির পূজা করে, কিছু বুজরুকি বিদ্যাও এর দ্বারা আয়ত্ব হয়, দুচারটা পৈশাচিক সিদ্ধিও হস্তগত হয় বটে কিন্তু এরদ্বারা আরও অধোগতিই হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার ভূত পঞ্চকের উপাসক হয় ও পঞ্চীকৃত ভূতাদির উপাসনায় সময় নষ্ট করে। জড় ভৌতিক বিষয়ে সংমূঢ়চিত্ত থাকাই ভূতোপাসনা এবং মৃতের উপাসনা হল প্রেতোপাসনা। শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া ব্রহ্মণ্যদেবতাশূন্য হয়ে করা হলে সেটা প্রেতোপাসনা হয়। পিতৃলোক জ্ঞানশূন্য হয়ে মাত্র মৃত ব্যক্তির ছবি বা মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধাদিও প্রেতোপাসনা। এসমস্ত কাজের অনুষ্ঠান তামসিক ব্যক্তিদের দ্বারাই হয়ে থাকে। স্বার্থপর লোকের লক্ষণই এমনটা হয়ে থাকে। তারা মৃত্যুর পর বায়ুময় দেহ ধারণ করে উল্কামুখ কটপূতনাদি নামক প্রেতযোনি পায়। সাত্ত্বিক সাধক কখনও অন্তরে অন্তরে ভগবানকে শ্রদ্ধা করে স্বার্থময় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে পারেন না। যেমন আমরা যে যে কাজে অভিজ্ঞ সেই কাজের অনুষ্ঠানের জন্য সেই সেই লোকের কাছে যাই অর্থাৎ শরীর খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে যাই, আসবাবপত্র তৈরী বা মেরামতের জন্য ছুতারের কাছে যাই, ঠিক তেমনই সাত্ত্বিক পুরুষও সাধন পথের সন্ধানে শাস্ত্রেরই অনুসরণ করে, বেদজ্ঞ যোগাভ্যাসীর সন্ধান করে। কখনও খ্যাতি, বেশভূষা, তিলক, গেরুয়া, মঠ-মিশন, পত্রপত্রিকা বা সাইনবোর্ডে লক্ষ্য করে না, কারণ এসবই তামসিক বা রাজসিক। শ্রদ্ধা সঞ্জাত ও উন্নীত হলেই তখন আর কোনও কিছুই যথেচ্ছভাবে করে না। করতে প্রবৃত্তিও হয় না ॥ ১৭/৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভুতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ।।৬

অনুবাদ: দম্ভ এবং অহঙ্কারযুক্ত, অভিলাষ, আসক্তি ও দুরাগ্রহবিশিষ্ট যে অবিবেকী জনগণ (বৃথা উপবাসাদি দ্বারা) শরীরস্থ পঞ্চভূতকে এবং দেহমধ্যস্থ আমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর (ভূত ভয়ঙ্কর) তপস্যা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অতি ক্রূরকর্ম্মা বলিয়া জানিও ॥ ১৭/৫-৬

ব্যাখ্যা: আগের অধ্যায়ে দম্ভ ও অহঙ্কারাদি যা যা সব লেখা হয়েছে ঐসব দম্ভাহঙ্কার ও অভিলাষ আসক্ত রাজস ও তামসগণের যে সমস্ত বিশেষত্ব আছে সেটা এই দুটো শ্লোকে ভগবান বলছেন এবং এই সাথে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরটাও বেশ স্পষ্ট করেই দিচ্ছেন। অশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম স্বভাবতঃ কাম, রাগ ও অহঙ্কার প্রসূত। কোনও বিষয়ের কামনা জাগলে, তাতে আসক্তি ও অনুরক্তির ফলে মানুষের ধৈর্য্য হারিয়ে যায় আর বিধি বিধান অনুসরণ করার অবসর থাকেনা, আমি যে কিছুরই কর্ত্তা নই এটাও আর মনে থাকে না। অহঙ্কারবৃত্তি প্রবল হয়ে হুটপাট করে, অধীর হয়ে, কিছু একটা করার প্রচেষ্টাময় হয়ে পড়ে। ভগবৎ মুখাপেক্ষিতা অন্তরে উদ্বুদ্ধ না করে, অভিজ্ঞ শাস্ত্র যে প্রণালীতে তাঁতে কর্ম্মময় জীবত্ব, বিহিত কর্ম্মের দ্বারা সমর্পণ করতে ও সেই সমর্পণের দ্বারা তৎমুখাপেক্ষী হতে শিক্ষা দিয়েছেন সেই বিজ্ঞানটা ভুলে গিয়ে অথবা না জেনে, না বুঝে, বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীর ও আত্মাকে কর্শিত (কৃশ করে) করে মাত্র। ক্ষিতি আদি পঞ্চতত্ত্বকে কষ্ট দিয়ে কাজ করে এবং দেহ মধ্যস্থ আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। আমি যে এ দেহেই আছি এটা না বুঝতে পারায় বৃথা উপবাসাদির দ্বারা অন্তরাত্মাকে কষ্টই দিয়ে থাকে মাত্র। এর ফলে শরীর জীর্ণ হয়, অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়, একটা হাহাকার, অতৃপ্তি ও জীবনে একটা অধ্যাত্মদাহ রচিত হয়। এমনতর সাধনা আসুরী নিষ্ঠাজাত। অধ্যায়ের শুরুতে অর্জ্জুনের যে প্রশ্ন ছিল তার উত্তর কত স্পষ্ট ভাবে ভগবান দিয়ে দিলেন। রাজস ও তামস ভাবই আসুরভাব। এখন এই ভাবের সাধনাই তো চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে বেশি বলতে গেলে মার খেতে হবে। কারণ এটা অন্ধকারের যুগ। কলির শেষ অধ্যায়ে চরম জড়বাদ এসে ভোগবাদকে কায়েম করবে। সেখানে এমন বিপরীত মেরুর বিষয়ে আলোচনা বা চর্চ্চা চুপিসাড়ে করা গেলেও প্রকাশ্যে কখনওই নয়। অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর এই সব তপস্যা যাঁরা সব করেন তাঁরা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানেন না। যেহেতু সদ্গুরুভিন্ন অন্যের নিকট শাস্ত্রার্থ জানা যায় না সে জন্যই পঞ্চ-ম-কারের সাধনা প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত না হয়ে সব জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানতে হলে সদ্গুরুর কাছ থেকে আসল কর্ম্মটা ভাল মত জেনে ও বুঝে নিতে হয় নইলে অজ্ঞতা হেতু অবিবেকী জনগণ আত্মার পক্ষে ক্লেশদায়ক অশাস্ত্রবিহিত কাজকর্ম্ম করে থাকে বলে ভগবান তাদের অতি ক্রূরকর্ম্মা বলেছেন। সত্যিকথা বলতে গেলে সবাই রেগে যায় ঠিকই তবু ভালো লোকেদের সতর্ক করার জন্য সংক্ষেপে বলতে হয় যে ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্য উপায়ে অচৈতন্য করে রাখলে আবার অন্য সময়ে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় পাষন্ডের মত ঘোর অত্যাচার করাটা সাধনা হতে পারেনা। অস্বভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়কে ক্ষীণ করে দিলেই সংযম অভ্যাস হয় না। লোকেরা লোভে পড়ে এমনতর সকাম তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে ঠিকই কিন্তু এতে মন বুদ্ধি আরও মলিন হয়ে আত্মদর্শনের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের মধ্যেও যোগাভ্যাসই নিহিত আছে। গূঢ় রহস্য জেনে নিয়ে সাধনা করতে পারলেই আর কোনও গোলমাল নেই। বাহ্য অর্থমাত্র নিয়ে বিচার করলে স্বয়ং বেদও – অশাস্ত্রীয় হয়ে পড়ে ॥ ১৭/৫-৬

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ।।৭

অনুবাদ: সকলের প্রিয় আহারও তিনপ্রকার। সেইরূপ যজ্ঞ, তপ এবং দানও(ত্রিবিধ), তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর॥ ১৭/৭

ব্যাখ্যা: এখন তেরোটি শ্লোকে আহারাদির ভেদ থেকে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ দেখান হয়েছে। সংকল্প বিকল্পময় এ জগৎও ত্রিগুণাত্মক। সকল শক্তিময় কর্ম্মও ত্রিগুণময়। আর এমনতর কর্ম্মের অংশও মূলতঃ তিনটে – তপস্যা, দান ও যজ্ঞ। কর্ম্মের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সামর্থ্য ও ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার নামই তপস্যা বা তপঃ, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানটাই যজ্ঞ আর সে অনুষ্ঠানের জন্য যা কিছু দিতে হয় বা খরচ হয় সেটাই হল দান। যার সবটাই নির্ভর করে আমরা ভিতরে কিভাব ও চৈতন্য নিয়ে এসমস্ত করি তারই উপর। কারণ সমস্ত মানুষই নিজের নিজের প্রকৃতির অনুগত। সেজন্যই তাদের প্রকৃতি অনুসারেই আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ হয়ে থাকে। সত্ত্বনিষ্ঠ লোকের সবই সাত্ত্বিক, তেমনি রজো ও তমোনিষ্ঠ লোকেদের আহারাদি সবকিছুই রাজসিক ও তামসিক হয়ে থাকে। যেহেতু সাত্ত্বিক আহারাদি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সহায়ক সেজন্যই সাধন পথের পথিক যাঁরা তাঁদের রাজস ও তামস আহার পরিবর্জ্জন করতে হবে ও সাত্ত্বিক আহারে অভ্যস্ত হতে হবে। এসকল বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়ার জন্যই ভগবান গুণ অনুসারে আহারাদির ভেদ বিষয়ে বিশদভাবে বলেছেন পরবর্ত্তী শ্লোকগুলোতে। যার তিনটি শ্লোকে প্রথমে আহার বিষয়ে বলছেন–– ১৭/৭

আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।৮

অনুবাদ: আয়ুঃ, সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্ত-প্রসাদকর ও রুচিবর্দ্ধক, রসযুক্ত এবং স্নেহযুক্ত যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী হয় এরূপ এবং চিত্ত-পরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ১৭/৮

ব্যাখ্যা : ভগবান তিনটে শ্লোকে তিন ধরণের আহার বিষয়ে বলেছেন। প্রথমে সাত্ত্বিক আহারের কথা। যে আহার সাত্ত্বিকভাব বাড়িয়ে তোলে, শক্তি ও আরোগ্য মানে রোগ প্রতিরোধ শক্তি, চিত্তের আনন্দ ইত্যাদি বাড়িয়ে তোলে এবং রুচি বৃদ্ধি করে, যা রসাল, ঠান্ডা, স্নেহযুক্ত যেমন দুধ, ঘী, যেসব খাদ্যের সারাংশ শরীরের কাজে লাগে, দেহে স্থায়ী হয় এবং যাতে চিত্তের তৃপ্তি লাভ হয়, এমন খাবার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। যেমন ক্ষীর খেলে আয়ু বৃদ্ধি, ঘৃতে সত্ত্বগুণ, দুধে বল, তিক্ত খাদ্যে রোগ প্রতিরোধ শক্তি, মধুতে সুখ, পায়েসে প্রীতি, ইত্যাদি। সাত্ত্বিক লোকেরা এসব খাদ্য পছন্দ করেন কারণ কিছুটা সংস্কার অনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মসূত্রে পাওয়া যায়। সেভাবে সুকৃতিবশে সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত লোকেদের সাত্ত্বিক আহারই পছন্দ হয়। এরপর যাঁরা যোগাভ্যাস করেন তাঁদের সুষুম্নায় বায়ু চললে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হেতু নিবৃত্তি গুণেরই প্রাধান্য হয়, তখন সাত্ত্বিক আহারেই রুচি হয়। যাঁরা যোগাভ্যাসে রত তাঁদের আহার সাত্ত্বিক না হলে সাধনারও বিঘ্ন হয়। তারপর বহুক্ষণ যাবৎ সাধনা করলে খাদ্যের পরিমাণও হাল্কা হতে থাকে, মানে কমতে থাকে। সংক্ষেপে এই হল সাত্ত্বিক আহার। পরের শ্লোকে ভগবান রাজসিক আহার বিষয়ে বলবেন ॥ ১৭/৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ।। ৯

অনুবাদঃ অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবন, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী, এই সকল দুঃখ, মনস্তাপ, এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার ॥ ১৭/৯

ব্যাখ্যাঃ খুব কষা জিনিষ, খুব টক, খুব নোনতা, জিভ পোড়া গরম, খুব তীক্ষ্ণ মানে ঝাল, রুক্ষ অর্থাৎ স্নেহহীন, শুকনো, চালভাজা, ছোলাভাজা, ইত্যাদি এবং বিদাহী মানে খেলে প্রথমে মুখের ভিতর ও পরে গলা, পেট বুক, জ্বালা জ্বালা করে, যেমন সরষে বাটা ইত্যাদি হল রাজস আহার। এগুলো শরীরের পক্ষে সুষম নয়, সহজপাচ্যও নয়। পরিণামে দুঃখজনক কারণ এ ধরণের খাবার খেলে জটিল ও স্থায়ী রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে। শরীরে রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে রুচিবিকৃতি ঘটে এবং এমন সব আহারে রুচি হয়। আবার এমন মাতা পিতাগণ শিশুদেরও শিশুকাল থেকেই এমন সব আহারে অভ্যস্ত করে দিয়ে থাকেন তখন সেই শিশুও পরবর্ত্তীকালে ঐরকম রাজসিক আহারেই অভ্যস্থ হয়ে থাকে এবং ওটাকেই সঠিক আহার বলে জ্ঞান করে। অথচ এমন আহার দুঃখ, কষ্ট ও মনস্তাপেরই কারণ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় হল এমনতর খাবারগুলোই রাজসিক লোকেদের প্রিয়। পরের শ্লোকে তামসিক আহার বিষয়ে ভগবান বলেছেন ॥ ১৭/৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ।।১০

অনুবাদঃ শৈত্যাবস্থা-প্রাপ্ত,বিরস,দুর্গন্ধ,পূর্ব্বদিনপক্ক,অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য যে আহার, তাহা তামসগণের প্রিয় ॥ ১৭/১০

ব্যাখ্যাঃ প্রহরাতীতকাল আগে প্রস্তুত করা ভোজ্যবস্তু মানে দশ-বারো ঘন্টা আগে রান্নাকরা খাবার,গতরস অর্থাৎ যে খাদ্যের সারাংশ বের করে নেওয়া হয়েছে, পূতি মানে দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত – আগের দিন রাঁধা মানে বাসি, পান্তা, পচা ইত্যাদি, অপরের উচ্ছিষ্ট, অমেধ্য–অভক্ষ্য কলঞ্জাদি–বিষাস্ত্রবিদ্ধ পশুপাখীর মাংস, এসবই হল তামসিক খাদ্য, যা তামস ব্যক্তিদের প্রিয়। গুণভেদে আহারের ভেদ হবেই। সে জন্যই বলা হয় "আপরুচি খানা" সবাই নিজের নিজের রুচিমত আহার করে থাকে। কারোরই কিছু বলার নেই। তামসিক ব্যক্তি তামস আহারেই বরং সুস্থ থাকেন। আবার সাত্ত্বিক ব্যক্তি তামসিক বা রাজসিক আহারের ফলে অসুস্থ হবেনই। তেমনই তামসিক বা রাজসিক ব্যক্তিও সাত্ত্বিক আহারে অস্বস্তি বোধ করবেন ও অসুস্থ হবেন। আর যাঁরা যোগাভ্যাস করেন, প্রাণ যাঁদের সুষুম্নায় চলাচল করে তাঁদের পক্ষে অশুদ্ধ আহার রীতিমত বিপজ্জনক। তাঁদের খাওয়া দাওয়া খুবই সাবধানে করতে হয়। রাজসিক ও তামসিক আহার ত্যাগ করে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির চেষ্টায় খাদ্য পরিবর্ত্তন করতে হলে সেটা খুবই ধীরে ধীরে করতে হয়, সহসা করতে নেই। মহামতি বুদ্ধের মৃত্যুর কারণও ছিল এই তামস আহার, সেটা সকলেরই জানা আছে। তৎকালীন শ্রেষ্ঠীদের চক্রান্তে গৌতম বুদ্ধের ভক্ত চন্ড তাঁকে নিমন্ত্রণ করে শুয়োরের মাংস খেতে দিয়েছিল। করুণাঘন বুদ্ধ সেই মাংস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও তাঁর দেহাবসান হয়। মৃত্যুকালে বুদ্ধের উক্তি, "এই শুকর মাংস চন্ডের প্রিয় আহার, তাহাই সে আমাকে দিয়াছিল, কিন্তু আমার শরীরে উহা সহ্য হইল না" কথিত আছে সিদ্ধ সাধক শঙ্করাচার্য্যকে কোনও মূর্খ চণ্ডাল পরীক্ষা করতে গিয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে তিনি যে "সমস্তই ব্রহ্ম" বলেন সেটা কি সত্যই তাঁর অন্তরের কথা, না শুধুই মুখের কথা? চণ্ডাল শঙ্করাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করে শুয়োরের মাংসের আয়োজন করেছিলেন। শঙ্করাচার্য্য লোকচরিত্র সম্বন্ধেও সিদ্ধ ছিলেন। তিনিও কুকুরের বেশ ধরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। কিন্তু চণ্ডালেরা তাঁকে চিনতে না পেরে তাড়িয়ে দিল। তারপর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পরও তিনি না আসায় তারা আচার্য্য শঙ্করকে গিয়ে বলে – আপনি মিথ্যা কথা বলেন কেন ? আপনি যে আমাদের অন্ন গ্রহণ করবেন না, সেটা আমরাও জানি, সেটা আগে থেকেই বলতে পারতেন, আমরা এত আয়োজন করে আপনার জন্য অপেক্ষা করতাম না। আপনি যে ব্রাহ্মণ – চণ্ডাল, মানুষ–পশু সকলই ব্রহ্মময় বলেন সে সমস্তই যে ভণ্ডামি সেটা আমরা বুঝে ফেলেছি। শঙ্করাচার্য্য বললেন, আমি তো ভোজন করার জন্য তোমাদের ওখানে

গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তোমরা আমাকে ভোজন করতে দিলে কৈ ? চণ্ডালেরা বলল আমরা সকলে মিলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আপনি গেলে আমরা একজনও কি আপনাকে দেখতে পেতাম না ? তখন শঙ্করাচার্য্য বললেন – আমি মনুষ্য বেশে তোমাদের কাছে যাই নাই, কারণ তোমরা আমার জন্য যে অন্ন প্রস্তুত করেছিলে সেটা আমার এই শরীরের পক্ষে অনুকূল নয় অথচ তোমাদের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করেছি তখন তা রক্ষা করতেই হবে, সেজন্য যেমন শরীরে সে আহার পরিপাক হবে তেমনভাবেই কুকুরের বেশে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তোমাদের গৃহে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা খেতে তো দিলেই না বরং লাঠি মেরে তাড়িয়ে দিলে। চণ্ডালেরা এটা শুনে লজ্জিত হল বটে কিন্তু তাদের মনে কোনও অন্যায় বা অপরাধবোধ জাগলো না কারণ ছিলো তাদের অশুদ্ধ ও স্থূল, তামস আহার। "আহার শুদ্ধৌ–সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।" আহার শুদ্ধি থেকে দেহমন শুদ্ধি। দেহমন শুদ্ধ না থাকলে অহঃরহঃ ভগবৎ স্মৃতির উদয় হয় না। সুতরাং দেহমন শুদ্ধির জন্য অন্ন দোষবর্জ্জিত হতে হয়। আচার্য্য রামানুজও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ পরিহার করতে বলা হয়েছে। এর পরের তিনটি শ্লোকে ভগবান ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলেছেন ॥ ১৭/১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১

অনুবাদ: ফলাকাঙ্খা–রহিত ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য এই মনে করিয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়া বিধি-বিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭/১১

ব্যাখ্যা: ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞটা কেমন সেটাই ভগবান এই শ্লোকে বলেছেন। সব যজ্ঞই তো কোনও না কোনও উদ্দেশ্যে করা হয়। অতএব উদ্দেশ্য থাকলেই তো ফলকামনা হল, ফলাকাঙ্খাবিহীন হল কোথায় ? ভগবৎ প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় সেটাও সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা হয় কিন্তু যে যজ্ঞে মোটেই ফল কামনা থাকে না সেটাই হল আসল সাত্ত্বিক যজ্ঞ। এটাই ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মনাড়ীতে প্রাণ প্রবেশ করিয়ে এমন যজ্ঞ করতে হয়। ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে প্রাণ গেলেই বুদ্ধি বিশেষ রকমে স্থির হয় এবং মন ধীরে ধীরে সংস্কারশূন্য হতে থাকে। অতএব এমন ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা মনকে সংস্কারশূন্য করতে পারলেই কামনাশূন্য হওয়া যায়। প্রতিনিয়ত সংকল্প বিকল্পের ঢেউতে প্রাণের ভিতর যে সমস্ত কর্ম্মের সংস্কার বা দাগ ছাপা হয়ে গেছে সেগুলোকে ঐ ফলকামনাশূন্য প্রাণকর্ম্মরূপ সাত্ত্বিক যজ্ঞের দ্বারা মুছে ফেলতে পারলেই প্রাণ শুদ্ধ হয়ে স্থির হয়। প্রাণ স্থির হলেই মনও স্থির হয়। এমন শুদ্ধ মনে আর সংকল্পের ঢেউ ওঠেনা। এমনতর সংকল্পশূন্য অবস্থাতেই সমাধিপ্রজ্ঞার উদয় হয়। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞার জন্য যে ধারণা, ধ্যান, প্রাণায়াম ইত্যাদি পুরুষার্থ সাধন সেগুলোই হল সেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। এই যজ্ঞের কথাই ভগবান বলেছেন। আগুনে ঘী পোড়ানোটা কোনও সাত্ত্বিক যজ্ঞ হতে পারেনা। এমন যে আত্মকর্ম্ম বা ব্রহ্মযজ্ঞ বা সাত্ত্বিক যজ্ঞ সেটা বিধিনির্দ্দিষ্ট ভাবে করতে হয়, গুরুর আদেশ ও উপদেশ মত করতে হয়, তাই একে বিধিদিষ্ট যজ্ঞ বলা হয়েছে, কারণ নিজের খেয়াল খুশিতে এই যজ্ঞ হয় না। অতএব ফলকামনাশূন্য প্রাণকর্ম্মরূপ যে যজ্ঞ পরমাত্মায় মন সমর্পন করে, গুরুপদেশে ও নির্দ্দেশে, বিধিবিহিত ভাবে, নিয়মিত ভাবে করা হয়, সেটাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥ ১৭/১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ।।১২

অনুবাদ: কিন্তু ফলের উদ্দেশ্য করিয়া অথবা কেবলমাত্র নিজের মহত্ব খ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ করা যায়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে। ১৭/১২

ব্যাখ্যা: এবার রাজস যজ্ঞের কথা। যে কোনও যজ্ঞ যদি তা ফলাকাঙ্খার সাথে করা যায় অথবা লোক জানাজানি করে করা হয় তবে অবশ্যই তা রাজসিক যজ্ঞ। কোনও অনুষ্ঠানের বাহ্যাড়াম্বরের অর্থই যজ্ঞকর্ত্তার নিজেকে প্রকাশ করা, প্রচার করা, সুতরাং সেটা রাজস যজ্ঞ। যখন পূজো অর্চনা এসবই ব্যক্তি জীবনের গুপ্ত বিষয় ছিল তখন এসমস্তই ফলবতীও ছিল। আজ যখন এসমস্ত প্রচারের বিষয় হয়ে উঠেছে তখনই ঘরের অভ্যন্তর থেকে বাইরে, পার্কে, রাস্তায়, ক্লাবে এসে বারোয়ারী ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে এবং অর্থহীন, দম্ভপূর্ণ, আড়ম্বরসর্ব্বস্ব রাজসিক অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। পূজো আর পূজো নেই, হয়েছে জনহুল্লোড় ও ব্যবসা মাত্র। এমন কি অনেকেই সাধনা করেন এই উদ্দেশ্যে যে এতে তাঁর রোগ নিরাময় হবে অথবা লোকে তাকে যোগী বলে জানবে। এমনটা হলে কিন্তু তাঁর আর ক্রিয়া হতে চায় না। কারণ সেটাও তখন রাজসিকই হয়ে দাঁড়ায়। রাজস যজ্ঞের সবচেয়ে বড় উদাহরনই হল বারোয়ারী পূজো যার পরিণতি হল জীবনীশক্তির মাত্রাতিরিক্ত অপচয়। ফলাকাঙ্খা ও দম্ভসহিত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানই রাজসিক যজ্ঞ ॥ ১৭/১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩

অনুবাদ: শাস্ত্রোক্ত–বিধিহীন, সৎপাত্রে অন্নদানশূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, ও শ্রদ্ধারহিত (অশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত) যজ্ঞকে তামস বলে ॥ ১৭/১৩

ব্যাখ্যা: এবার তামস যজ্ঞের কথা। যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধির বিপরীতভাগে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই বিধিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, অসৃষ্ট অন্নযুক্ত এবং শ্রদ্ধাশূন্য হয়ে থাকে। এগুলোই হল তামসিক যজ্ঞ। যেমন বেশ্যাবাড়ীর সরস্বতী পূজো। এখনকার বড় বড় প্যাণ্ডেলের পূজোগুলোও শুধুমাত্র রাজসিকই, নয় তামসিকও বটে। এখানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণাও যৎসামান্য ভিক্ষুকের ভিক্ষার সাথে তুলনীয়। ঘটের উপর ডাব ও গামছার মাপ দেখে বোঝা যায় পূজোগুলোর বাইরেটায় রাজসিক ভাব দেখালেও ভিতরটা নেহাতই তামসিক। কারণ এসমস্ত পূজোতে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তির ব্যাপার থাকে না। পূজোটাকে উপলক্ষ্য করে কিছু লোক সংগঠিত হয়ে অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে অর্থলাভের দাঁও মারে, সংগৃহীত অর্থের ছিটেফোঁটায় কিছুলোককে ফুর্ত্তি ও মত্ততা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। রাজস যজ্ঞের খরচ বাদে বাকিটা সংগঠকদের মুনাফা অথবা পারিশ্রমিক হিসাবে গৃহীত হয়। এসমস্তই অপকর্ম্ম যা সর্ব্বথা নিন্দিত, ঘৃণিত, বর্জিত এবং চরম অনুচিত কাজ বলে গণ্য করা উচিত। এসমস্ত তো গেল সাধারণ ভাবে দেখার বিষয়গুলো।

ত্রিবিধ যজ্ঞই অন্তর্বহির্ভেদে দুই রকম। বাহ্য পূজার অনুষ্ঠানসকল বহির্যজ্ঞ আর প্রাণায়ামাদি আত্মকর্ম্মসকল অন্তর্যজ্ঞ। দুইরকম যজ্ঞই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বাহ্য পূজা ইত্যাদিতেও ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম এসমস্ত ঠিক ঠিকমত করার বিধি আছে। এজন্য গৃহীর গোপনে অনুষ্ঠিত পুজোও যিনি পূজাবিধি জানেন এমন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দ্বারাই পূজো করাতে হয়। সব ব্রাহ্মণ এই জন্যই পূজো করেন না। বাহ্য পূজোও অবিধিপূর্ব্বক হলে রাজসিক ও তামসিক হয়ে যায়। এখন অন্তর্যজ্ঞের কথায় আসি। সাধনক্রিয়াদি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে করলেই সাত্ত্বিক হল, কামনার সহিত করলেই রাজসিক হল এবং শ্রদ্ধাশূন্য হয়ে অনিয়মিতভাবে করলেই তামসিক হল। তখন আর সেই স্থির ও আনন্দময় ভাবটা পাওয়া যায় না, ফলে দক্ষিণাহীন যজ্ঞে পরিণত হয়। আসলে যাঁরা শ্রদ্ধা বিরহিত তাঁরা এমন অন্তর্যোগের উপদেশ নেওয়ার সময়েও তাঁদের ভেতরে বেশ কিছু চাপা আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে। পরবর্ত্তীকালে সেসব আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলেই ক্রিয়ায় ততটা শ্রদ্ধা আর থাকে না, ফলে সবই তামসিক হয়ে দাঁড়ায়। আসলে জীব চায় ধন, জন আর সুখ কিন্তু গুরু চান শিষ্যের ইন্দ্রিয় দমন ও সর্ব্বনাশ, মানে ইচ্ছা ও আসক্তির নাশ। ফলে দুটো বিপরীত ইচ্ছার টানা পোড়েনে উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে থাকে। তখন তামসিক স্থিতিটাই বাড়তে থাকে ॥ ১৭/১৩

দেবদ্বিজগুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। ।১৪

অনুবাদ: দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই সকল শারীরিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৭/১৪

ব্যাখ্যা: এখন আবার তিনটি শ্লোকে তিন রকম তপস্যার কথা বলা হয়েছে। যথা– শারীরিক, বাচনিক বা বাঙ্ময় এবং মানসিক বা মানস। এই শ্লোকে শারীর তপস্যার কথা আছে যে তপস্যা শরীর দ্বারাই সম্পাদ্য, শরীর না থাকলে হয় না। শরীর দ্বারা দেব, দ্বিজ, গুরুস্থানীয় তত্ত্ববিদ ও প্রাজ্ঞজনের পূজা ও শৌচাদি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা পালনই শারীর তপস্যা। এই শারীর তপস্যার আবার অন্তর্লক্ষ্যে ও বহির্লক্ষ্যে উভয় দিকেই ভাবতে হয় যেমন – (১) শাস্ত্রবিহিত দেবার্চনা হল বাহ্যপূজা কিন্তু আন্তর পূজা হল কূটস্থের ধ্যান, যেটা সদ্‌গুরুর কাছে শিখতে হয়। (২) বাহ্যদৃষ্টিতে দ্বিজ অর্থে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হলেও অন্ত র্লক্ষ্যে দ্বিজ হলেন যোগী, ক্রিয়াদ্বারা যাঁর কূটস্থদর্শন হয়েছে। দ্বিজ মানে যে দুবার জন্মেছে। প্রথমজন্ম মাতৃগর্ভ হতে, দ্বিতীয় জন্ম গুরুকর্তৃক কূটস্থদর্শনে হয় যাতে আত্মবোধ জন্মে, যার দ্বারা, যে "আমি"কে ভুলেছিলাম তাকে দেখে নিজেকে নতুন করে চিনতে পারা যায় ও নিজের পরিচয় লাভ হয়। (৩) বাহ্যদৃষ্টিতে গুরুপূজা মানে বাবা, মা, শিক্ষক, আচার্য্যগণের পূজা হলেও অন্তর্দৃষ্টিতে কিন্তু যিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর পূজাই প্রকৃত গুরুপূজা। "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ"। (৪) প্রাজ্ঞজনের পূজা মানে বহির্লক্ষ্যের অর্থে ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পূজা কিন্তু অন্তর্লক্ষ্যে যোগীর পূজা। যিনি ক্রিয়ার উচ্চবস্থায় থাকেন ও সুষুম্না যাঁর চৈতন্যযুক্ত হয়েছে। (৫) শৌচ– বাহ্য অর্থে সাবান শ্যম্পুর ব্যবহার হলেও অন্ত র্লক্ষ্যে প্রণায়ামদ্বারা শরীর ও মনের শুদ্ধি বোঝায়। (৬) আর্জ্জবম্ মানে সরলতা যা বাহ্য অর্থে অকপটতা অর্থাৎ মন আর মুখ এক করা, আন্তর তাৎপর্য্যে মন, ইন্দ্রিয় ও বাক সংযম মানে চিত্তের হিসেবী হওয়ার অবস্থা। (৭) ব্রহ্মচর্য্য – বাহ্য অর্থে মৈথুনত্যাগ হলেও অন্তর্লক্ষ্যের অর্থ মনকে ব্রহ্মে নিরত রাখা– এমন ব্যক্তিই "স দেবো ন তু মানুষঃ"। (৮) অহিংসা– যার বাহ্য অর্থে– প্রাণী পীড়ন না করা, কাউকে দুঃখ কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি হলেও অন্তর্লক্ষ্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবে স্থিতি হলেই, সকলই ব্রহ্মবোধ হলে, ব্রহ্মকে আর কে হিংসা করে ? সেটাই প্রকৃত অহিংসা। এভাবেই অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাসই হল শারীর তপস্যা যা শরীরদ্বারা করতে হয়, তবে বাহ্য ও অন্তরে দুভাবেই বুঝে করতে হবে, নইলে শুধুমাত্র ভড়ংএ পরিণত হয়। অষ্টাঙ্গ মৈথুনও শরীরদ্বারাই হয় প্রকৃত অর্থ ধরে নিতে পারলে অষ্টাঙ্গ মৈথুনও অষ্টাঙ্গ যোগ। উভয়দিকে লক্ষ্যরেখে উভয়ভাবেই অনুষ্ঠান করতে পারলেই হল। শুধুমাত্র উপবাস বা ব্রতের অনুষ্ঠান এসমস্ত করলেই কিন্তু বিষয়টা না বুঝে ভড়ং করাই সার হবে ॥ ১৭/১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। ।১৫

অনুবাদ: অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য এবং যাহা প্রিয় এবং পরিণামে হিতকর আর বেদাভ্যাস – এই সকল বাক্যময় তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৭/১৫

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে ভগবান বাঙ্ময় তপস্যা বা বাচিক তপস্যার কথা বলছেন। এই বাচিক তপস্যাও কিন্তু সহজ কিছু নয় কারণ এই তপস্যায় বাক্য হতে হবে অনুদ্বেগকর, প্রিয়, হিতকারী অথচ সত্য। যদি কথাটা সত্য কথা হয় কিন্তু উদ্বেগজনক অথবা অহিত কিংবা অপ্রিয় হয় তবে ঐকথা মোটেই বাঙ্ময় তপের অন্তর্গত নয়। প্রিয় বাক্যও যদি সত্য, হিত ও অনুদ্বেগকর না হয় তবে সেটাও বাচিক তপস্যার মধ্যে পড়ে না। আবার বাক্যসকল যখন প্রিয়, হিত ও অনুদ্বেগকর হল ঠিকই কথাটা যদি সত্য না হয় তবেই আর তপস্যা হল না। এবার স্বাধ্যায় মানে বেদাভ্যাস। সঠিক বেদাভ্যাসে ক্রমশঃ তার ব্যবহারিক অংশের অনুধাবন করে যোগাভ্যাসে রত হলেই যোগের যে পরাবস্থা লাভ হয় তখন যোগী যে সকল কথা বলেন তা কখনও অসত্য হয় না, অপ্রিয়ও হয় না বরং জগতের কল্যাণকরই হয়ে থাকে। বাক্যের মূল হল প্রাণ। এই প্রাণ স্থির হলে আপনা আপনিই বাক সংযম হয়ে যায়। এমনতর বাক সংযমও বাঙ্ময় বা বাচিক তপস্যার বিষয় ॥ ১৭/১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মাবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।। ১৬

অনুবাদ: মনের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ও আন্তরিক ভাব-সংশোধন এই সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৭/১৬

ব্যাখ্যা: এবার মানসিক তপস্যার কথা। মনঃপ্রসাদ অর্থ মনের স্বচ্ছতা। স্বচ্ছ মনেই প্রসন্নতা বিরাজ করে, কোনও উদ্বেগ থাকে না। সৌম্যত্ব হল এমন প্রসন্নতারই চিহ্ন। মনের মনন বা ধ্যানের দ্বারা যখন মনে আর কোনও সংকল্পের ঢেউ থাকে না ও একেবারে স্থির অবস্থায় থাকে তখনই মন আত্মায় লীন হয়ে মৌন হয়ে যায় এবং মনের আর কোনও ক্রিয়াদি থাকে না। ধ্যান শেষ হয়ে গেলেও স্বভাবিক অবস্থাতে আগের সংলীন অবস্থার ঘোরটা কাটে না ফলে সেই স্থির ও মৌন ভাবই থেকে যায়। বাইরের বিবিধ পরিবর্ত্তনেও ভিতরের স্থিরতা ঠিকই বজায় থাকে। এভাবে দীর্ঘস্থায়ী স্থিরতাই আত্মবিনিগ্রহ বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্ত নিরুদ্ধ হলে মনে আর অশুদ্ধি কোথায় ? তখন ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই। কাম ক্রেধাদি নেই, শত্রু, মিত্র, ছল, কপট কোনও কিছুই নেই, ইন্দ্রিয়েরও কোনও প্রভাব নেই। এমনতর শুদ্ধভাবই ভারসংশুদ্ধি। এমনভাবে আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই হল মানস তপস্যা যার উদ্দেশ্যই হল মনকে আটকানো মানে ব্রহ্মে নিবদ্ধ করা ॥ ১৭/১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭

অনুবাদ: ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও আত্মাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলে ॥ ১৭/১৭

ব্যাখ্যা: আগের তিন শ্লোকে যে শারীর, বাঙ্ময় ও মানস তপস্যার কথা বলা হল সেই তপস্যাও যে আবার গুণভেদে তিন রকম অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়ে থাকে সেটাই এখন তিনটে শ্লোকে ভগবান বলেছেন।

প্রথমে সাত্ত্বিক অবস্থার কথা। শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্যাই যখন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে, আত্মাতে স্থিত হয়ে ও শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হয় তখনই ঐ তপস্যা সাত্ত্বিক হয়। ব্যবহারিক দিকের কথায় বলতে হয় যে প্রাণায়ামই এই তপস্যা। কারণ প্রাণায়ামদ্বারাই চিত্তের নিরোধ হয় ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়। প্রাণধারা সুষুম্নায় প্রবেশ করলে বহিঃশ্বাসশূন্য হয়ে যায় ও চিত্ত একাগ্র হতে হতে সম্পূর্ণই নিরুদ্ধ হয়। এটাই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সাত্ত্বিক তপস্যা ॥ ১৭/১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ।।১৮

অনুবাদ: সৎকার, মান ও পূজার্থ এবং দম্ভার্থ যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে অনিত্য ও ক্ষণিক সেই তপস্যা রাজস বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৭/১৮

ব্যাখ্যা: আগে বারো নং শ্লোকে যেভাবে শুধুমাত্র দম্ভ বজায় রাখার জন্যই ভাল কাজকর্ম্ম করা অথবা শুধুই সম্মান লাভের জন্য কিছু সৎকর্ম্মাদি করা এসকলই ক্ষণিক লোক দেখান চঞ্চলকর্ম্ম মাত্র যার ফলও ক্ষণিক ও চঞ্চল মানে অস্থায়ী। যেমন আজ তুমি কিছু লোককে খাওয়ালে কিন্তু কাল তাদের আবার খিদে পাবে। আজ অর্থ দান করলে কাল আবার সে চাইবে। সুতরাং এমনতর চাহিদার পূরণও অস্থায়ী। আর এর মূলে থাকে যশ, খ্যাতির স্পৃহা ও দম্ভ, আবার যে সমস্ত লোক দেখানো তপস্যাদি এখন চলছে, যাতে সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন, ধূমধাম করা অনুষ্ঠান, পোষাক আশাক, তিলক বিভূতির প্রচলন আছে সেগুলো মোটেই ধ্রুব নয়। কারণ এসবের পিছনেই কিছু লাভালাভের চিন্তা থাকে সেজন্য এসবই রাজস ব্যাপার। বিনা সাধনায়, বিনা পরিশ্রমে কোনও তপস্যাই হয় না। সুতরাং এসব

কাজ যারা করে ও করায় তারা নিজেরাও ঠকে ও অন্যকেও ঠকায়। সেজন্য এসকলই রাজসিক, এসব কাজের ফলও রাজসিক ॥ ১৭/১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্।। ১৯

অনুবাদ: অবিবেকবশতঃ পরের বিনাশার্থ বা আত্মপীড়া দ্বারা যে তপস্যা করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৭/১৯

ব্যাখ্যা: এখন তামসিক তপস্যা বিষয়ে বলা হচ্ছে। এর আগে ৬ষ্ঠ শ্লোকেও এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে নেহাৎই সংস্কারদিবশতঃ বা পুণ্যসঞ্চয়ের ধারণা থেকে বা পরজন্মে রাজা হবার বাসনায় না খেয়ে থাকা অর্থে উপবাস বা পঞ্চতপাদি ক্লেশসাধ্য তপস্যা বা চান্দ্রায়ণ ব্রত ইত্যাদি পালন অথবা অপরের ক্ষতি করার জন্য বা কারো সর্ব্বনাশ সাধন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যে ধরণের তান্ত্রিক তপস্যাদিতে মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা হয় এ সবই তামসিক ব্যাপার বা তামসিক তপস্যা। এমন একজন তপস্বী তাঁর কলকাতার নিকট বালিগঞ্জ নিবাসী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাকা যাঁর ছেলেরাও খুবই বিত্তবান ছিলেন, তাঁর উচ্ছেদ সাধনের তপস্যায় গঙ্গাতীরস্থ বিভিন্ন শ্মশানে শ্মশানে অবস্থান করতেন। হালিসহর শ্মশানের নিকট কিছুকাল থাকার সময় আমার সাথে কথাবার্ত্তাও হত। তিনি সারা জীবনে ঐ একটা কাজেই রত ছিলেন এবং অন্য কোনও দিকেই তাঁর কোনও ভ্রুক্ষেপও ছিল না। যাহোক তিনিও শেষ পর্য্যন্ত দেখে যেতে পেরেছিলেন যে তাঁর সেই কাকা সবংশে নির্ব্বংশ হয়েছেন। আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন যে ঐ একটা কাজ করতে গিয়ে জীবনে কোনও দিকেই তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম না। যা হোক এমন মনোবৃত্তি দূষণীয় ও তামসিক, তবে কখনও কখনও ঋষিরা যে অভিশাপ আদি দিতেন সেগুলো তামসিকতা নয় বরং দন্ড বিধান এবং তার দরকারও ছিল ॥ ১৭/১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০

অনুবাদ: "দান করা উচিত" এই বোধে, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে কোনও রকম প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিও ॥ ১৭/২০

ব্যাখ্যা: এবার তিন রকম দানের কথা। প্রথমে সাত্ত্বিক দান। যে দান প্রত্যুপকারের কোনও আশা না রেখে করা হয় সেটাই সাত্ত্বিক দান। তবে আবার এত দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনার কথা ভগবান বললেন কেন ? স্বয়ং ভগবানের কথা যখন, তখন ধীর স্থির ভাবে একটু ভেবে দেখুন চার পাশে কিভাবে বিভিন্ন রকম দান গৃহীত হয়ে চলেছে, রশিদ কেটে বা না কেটে। সব দানই সেবা ও সাহায্যের নামেই চাওয়া বা নেওয়া হয়ে থাকে তা সে কোনও ক্লাব অথবা রাজনৈতিক দলই হোক বা সেবা প্রতিষ্ঠানই হোক কিংবা মঠ-মিশনই হোক। তবে ধর্ম্মের নামে অর্থ সংগ্রহ করে নতুন নতুন ধর্ম্মস্থান (মন্দির,মসজিদ,গির্জ্জা, মঠ ইত্যাদি) তৈরী করা এখন যা চলছে সব নতুন নতুন শোষণযন্ত্র তৈরী হচ্ছে। এখনকার দিনের সব কথার শেষ কথা'বাণিজ্য' হচ্ছে। এসমস্ত মতলবের দানে সামিল হলে নিজেকেও ঐ কর্ম্মের ভাগীদার হতে হয়। এজন্য ভগবান দেশ, কাল, পাত্র বুঝে দান করার কথা বলেছেন। সাত্ত্বিক দান বলতে প্রকৃত তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রোগীকে শুশ্রূষা দান ইত্যাদি নিজ সঙ্গতিতে, মানে কারও সাহায্য না নিয়ে অর্থাৎ চাঁদাতোলার ফক্কিকারিতে না গিয়ে, কোনও রকম প্রত্যুপকারের বা প্রতিদানের আশা ছাড়াই, করাকে বোঝায়। আবার এমন দানেও পরিমিত হওয়া দরকার নতুবা সাত্ত্বিক হবে না। তৃষ্ণা মিটে যাবার পরও বা বিনা তৃষ্ণায় জলদান, মানে যার যেটা প্রয়োজন নাই তাকে সেটা দান বা তেলা মাথায় তেল দেওয়া অবশ্যই বাজে কাজ। দানের উপযুক্ত পাত্রকেই দান করতে হয় এটাই মূল কথা। এসমস্ত অন্নদান, জলদান, রোগীকে শুশ্রূষাদান, পথ্যদান মহৎকাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু এসবের চাইতেও মহত্তর কর্তব্য আছে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ সেদিকেই জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে দানদ্বারা ভূতময় স্থুল শরীর মাত্র রক্ষা হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক নিত্য জীবনের উন্নতিতে সাহায্য করেনা সেগুলোকে তাঁরা মোটেই শ্রেষ্ঠদান বা সাত্ত্বিকদান বলে স্বীকার করেন নি। আজ ক্ষিদে মিটলেও কালই আবার ক্ষিদে পাবে সেটা মিটবে কি করে ? বরং যে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হয়ে জীবের নিত্য নিত্য বিবিধ ক্ষিদের উৎপীড়ন ও বিকার সহ্য করতে হয়, সেই সব বাসনার নিদারুণ ক্ষিদেকে নিবৃত্ত করার উপায় যিনি বাতলে দিতে পারেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, সেই দানই সর্ব্বোচ্চ দান বলে ঋষিরা বিশ্বাস করতেন। এই জন্যই সেই দান কোথায় করবেন, কিভাবেই বা করবেন, কেই বা সেই দানের যোগ্য পাত্র ইত্যাদি সবই গীতা জ্ঞানময়ীতে উল্লিখিত আছে। পাঠক একটা প্রশ্ন হয়ত করতে পারেন যে একমাত্র ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলেছেন কেন ? কারণ ব্রাহ্মণই ব্রহ্মবিদ্যার ভাণ্ডারী, জীবের ভবরোগের জ্বালা মেটাবার অব্যর্থ ওষুধ দিতে সক্ষম অথচ নিজের সব ব্যাপারেই উদাসীন। এজন্যই এমন মহাত্মাদেরই যোগ্যতম পাত্র বলা হয়েছে। অবশ্য এমন ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব এখন আর দেশে পাওয়া যায় না। এখন যা দেখা যায় সবই তো বস্তুবাদী চরিত্রের ভোগসর্ব্বস্ব তপস্যাহীন, অবিদ্বান্ ও কপটাচারী গলায় সূতো ঝোলান নামেমাত্র ব্রাহ্মণ। এমন ব্যক্তিকে দান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সাধু বিদ্বানের প্রাপ্য অন্ন অবিদ্বান ও অতপস্বী লোকের গ্রহণ করাটা তস্করতা এবং যারা তাদের দান করে তারাও সেই দোষে দোষী ও অপকর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা অংশীদার। তাহলে মূল কথা হল ভবনদী পার হবার উপদেশ দানই প্রকৃত দান

ও সাত্ত্বিকদান। সদ্গুরুর এমন উপদেশেই যাবতীয় দুর্গতির নাশ হয় এবং যিনি সদ্গুরু তিনিই প্রকৃত স্থান সময় ও পাত্র বুঝে এমন সাত্ত্বিকদানে সমর্থ হন ॥ ১৭/২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ।।২১

অনুবাদ: কিন্তু যাহা প্রত্যুপকারার্থ বা ফলের উদ্দেশ্যে পরিক্লিষ্টভাবে (কষ্টের সহিত) দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৭/২১

ব্যাখ্যা: এইবার রাজসিক দান বিষয়ে বলছেন যে কোনও রকম প্রতিদান বা প্রত্যুপকারের আশা নিয়ে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অথবা ভবিষ্যতে কোনও ফললাভের আশায় যে দান সে দান অবশ্যই রাজসিক দান। এছাড়াও অনেক সময় না বুঝে কাউকে কিছু দিয়ে যদি অনুতাপ বোধ হয় সেটাও রাজস দান। যেমন কেউ সাহায্যের জন্য এল এবং তাকে কিছু সাহায্য হিসাবে দানও করা হল, পরে দেখা গেল যে লোকটা তেমন কিছু আর্ত্তজন নয়, মিথ্যে বলে সাহায্য প্রার্থী হয়েছিল, তখনই সেই দান রাজস দান হয়েছিল বুঝতে হবে। আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে সদগুরু কর্তৃক সাধন দানই সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠ প্রকৃত দান। কিন্তু সেই দানও অবিবেচনা প্রসূত হলে, যেমন সাধন দেবার মত উপযুক্ত পাত্র নয়, কিন্তু তাকে সাধন দিলে আমাদের দলে একজন অর্থবান/ ধনী লোক হবে যার দ্বারা অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে এমন বিবেচনা থেকে উপদেশ দান অবশ্যই রাজসিক দান হয়। সেটা মোটেই সাত্ত্বিক হওয়া তো দূরের কথা আধ্যাত্মিক ব্যাপারও হয় না। আবার শুরুতে পাত্রত্ব বিচার না করেই উপদেশ দেওয়া হল এবং পরে বুঝতে পেরে তাকে কিছু কিছু সাজা শাস্তি দান করাও গুরুগণের রাজসিক দান। এজন্যই জগতে সদ্গুরু দুর্লভ ॥ ১৭/২১

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।।২২

অনুবাদ: দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া সৎকারশূন্য ও তিরস্কার পূর্ব্বক যে দান করা হয়, তাহা তামস দান বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৭/২২

ব্যাখ্যা: এবার ভগবান তামসিক দান প্রসঙ্গে বলছেন যে দেশ, কাল, পাত্র বিচার না করে দান করার যে ঝুঁকি আছে, সেই ঝুঁকি নেবার মধ্যেই আছে দাতার পৌরুষ বা পুরুষকার। সম্পদ থাকলেই তা বিলিয়ে দেবার মধ্যে মোটেই কোনও পুরুষকার থাকতে পারে না। “অকালে, অস্থানে বা অপাত্রে যে দান, অনাদরে অবজ্ঞায় করো তমোজ্ঞান”। দাতার দেশ, কাল, পাত্র ও কার্য্যকারণাদি বিবেচনাটাই হল আসল কর্ম্ম, আসল পৌরুষ ও প্রকৃত প্রজ্ঞা। ধনী লোকেরা বেশ্যা, বাঈজী, চাটুকার, মোসায়েব এবং বশম্বদদের অবশ্যই কিছু কিছু দান খয়রাত করে থাকেন, কিন্তু সেগুলো কি আদৌ দানকর্ম্মের পর্য্যায় ভূক্ত ? মোটেই নয়। বরং পুরোটাই অপকর্ম্ম। আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা পড়লেই বোঝা যাবে যে ঐগুলোই রাজসিক দান। অমনতর দানে নিজেরই পাপ মানে কর্ম্মবন্ধন দৃঢ় হয়। তামসিক দান এমনই বরং আরও অধোস্তরীয় যেহেতু আরও অবিবেচনা প্রসূত। অপুণ্যদেশে, অকালে অথবা উপযুক্ত দেশে, উপযুক্ত পাত্রকেও যদি বিরক্ত হয়ে অবজ্ঞার সাথে দান করেন তবে সেটাও তামসিক দান। শাস্ত্রেও একথাই আছে – “শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধেয়া অদেয়ম্”। অধ্যাত্মক্ষেত্রেও তামস প্রকৃতির লোকেদের কোথাও কোনও উপদেশ দিতে নেই। ভাল মন্দ কোনও কথাই বলতে নেই। আজে বাজে লোককে সাধন দিলে তার কোনও উপকার তো হয়ই না বরং গুরুত্ব না বুঝে যেখানে সেখানে সে সব কথা প্রকাশ করে ফেলে। গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করার প্রচেষ্টায় সর্ব্বসমক্ষে সাধনাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে; তার অকল্যাণই হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপদেশ দান কর্ম্ম প্রকৃত সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠ দান হওয়া সত্ত্বেও, স্থান, কাল, পাত্রের বিবেচনার অভাবে তামস ব্যক্তিকে দান করায় সে দানও তামসিক দানে পর্য্যবসিত হয়ে যায়। এ জন্যই মূর্খ, তস্কর, বর্ণসঙ্কর, অভিনেতা এদের পার্থিব অপার্থিব কোনও রকম দান করার ঝুঁকিই নিতে নেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বারোয়ারী পূজা বা অন্য অনুষ্ঠানের চাঁদা দান – তামসিক দান, যে বাড়িতে কেবল্ টিভি দেখে অথচ মেয়ের বিয়েতে দান সাহায্য চায় প্রতিবেশীর কাছে তাকে দান করাটাও তামসিক দান। অপরপক্ষে, প্রকৃত আর্ত্তজনকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, রোগে চিকিৎসা ইত্যাদি দান সাত্ত্বিক দান। যে কোনও দানে নিজস্ব বিবেচনাই সেই দানের প্রকৃত মূল্য। তখন সেই দানেও শ্রদ্ধা আসে ও “শ্রদ্ধয়া দেয়ম্” হয়ে থাকে ॥ ১৭/২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩

অনুবাদ: ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার নির্দেশ (নাম) শিষ্টগণ কর্তৃক কথিত হয়। সেই তিনটি দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ পুরাকালে বিহিত হইয়াছে ॥ ১৭/২৩

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকগুলোর যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেভাবে ভেবে দেখলে তো সকল রকম তপস্যা, যজ্ঞ অথবা দান সবই তো রাজসিক বা তামসিক পর্য্যায়ের হয়। তাহলে তো সব রকম প্রচেষ্টাই বৃথা হয় সেজন্য সবকিছু আগে ভাগে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। এমন একটা আশঙ্কার উত্তরেই ভগবান এমনতর যজ্ঞকেও কিভাবে সাত্ত্বিকতায় উন্নীত করা যেতে

পারে সেই উপায় বলছেন। সত্যান্বেষণ কালে অধিকাংশ সময়ে অসত্যকেই সত্য বলে বোধ হয়। জীবের স্বভাবগত অজ্ঞানজনিত দৌর্ব্বল্যই কর্ম্মকে ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত হতে না দিয়ে অজ্ঞানময় ফলবন্ধনযুক্ত কর্ম্মে পর্য্যবসিত করে। জীবনে কর্ম্ম করতেই হবে এবং জৈবস্বভাব অনুসারে সে কর্ম্ম রাজসিক বা তামসিক রূপে পরিণত হবার আশঙ্কাও খুবই প্রবল। জৈব কামনা ও জৈব সংস্কারই তো হৃদয়ে আধিপত্য করে চলেছে এবং সেই কামনা ও সংস্কার বশেই জীব ব্রহ্মকর্ম্ম করতে পারছেনা বরং ঘুরে ফিরে সেই বন্ধনকেই বাড়িয়ে চলেছে। এই ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান। এই অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই ক্ষর ও অক্ষরের ভর্ত্তা। এই তত্ত্বটা বলার জন্যই ভগবান “ওঁ তৎ সৎ” মন্ত্রটার উল্লেখ করলেন। এটাই জৈব কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত করার মন্ত্র। “ওঁ তৎ সৎ” এই তিনটিই পরমাত্মার নাম। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ এই ত্রিবিধ দেহকে বুঝলে তার ভিতরে দেহাতীত ব্রহ্মচৈতন্যকেও বোঝা যায়। এই ত্রিদেহের সমষ্টিই বা ত্রিপুরই হল ওঁকার। এই ত্রিপুর দেহই ওঁকারের রূপ। ওঁ=অ(স্থূল শরীর)+উ (সূক্ষ্মশরীর)+ম(কারণশরীর) এই তিনের বিকাশ নাদ, বিন্দু, কলা ==এই তিনে মিলে হল প্রকৃতিরূপিনী জগন্মাতার রূপ – আদ্যাশক্তি বিষ্ণুরূপা – যা চিদংশ জীবের সংজ্ঞা =“তৎ”। আর কার্য্যকারণের অতীত সত্তাময় ভাব যে ব্রহ্ম তাই হল = “সৎ”। সূক্ষ্মাদি দেহগুলোকে যখন জানলাম তখন ওঁকার কে বোঝা হল। এরপর কূটস্থকে বুঝতে পারলে “তৎ” নামটা বোঝা হল। ঐ “তৎ” কে বুঝলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হল। এরপর আরও উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে সাধক যখন নামরূপময় জগৎ এবং নিজেরও নামরূপ সমস্তই বিস্মৃত হলেন, তখনই তাতে ডুব দিয়ে “অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়” – সব এক হয়ে গেল তখনই সেটা গুণাতীত অবস্থা। এটাই “সৎ” শব্দের প্রকৃত অর্থ। এই তিন ভাব মিলেই ব্রহ্মের লীলা বিলাস হয়। এই পবিত্র নামত্রয়ের দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে পারা যায়। যিনি (ব্রহ্ম) অব্যক্ত ও অবাচ্য হলেও যাঁর একটা ধ্বনি আছে যে অশব্দের শব্দ ঠিক কান দিয়ে না শুনলেও শোনার মত অনুভব হয়। এই ধ্বনিই প্রণবধ্বনি, সাধনদ্বারা যার অনুভব ও বোধ জন্মে। মানুষের হৃদয়ের “ধুক পুক” শব্দ যেমন তার জীবনের চিহ্ন তেমনই এই প্রণবধ্বনিও বিশ্বাত্মার অস্তিত্বের চিহ্ন, যোগীরা যাকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলে থাকেন এবং এই ধ্বনির সাহায্যেই সাধক নিজ হৃদয়কে পরমাত্মহৃদয়ে মিলিয়ে দিতে পারেন। এই মিলনই হল যোগ। প্রণবের তিন মাত্রা –স্থূল সূক্ষ্ম এবং প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা(ঁ) বিশ্বকারণ অনাদ্যা প্রকৃতি, আর তারও উপরে গেলে বিদেহরূপ অবস্থা। শ্রীশ্রীচণ্ডী তে ১ম অধ্যায়ে ৭৪ নং শ্লোকে আছে “সুধা তমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা। অর্দ্ধমত্রা স্থিরা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥”

বিশ্বপ্রাণ ওঁ কার কে বুঝতে পারলেই নিজেকে সর্ব্বভূতস্থ বলে বোধ করা যায়। তখনই এই “ওঁ তৎ সৎ” এর ভাবনায় একাগ্র হলেই “আমি” রূপ কর্তৃত্বভিমান লুপ্ত হয়ে এ বিশ্বচরাচর বাসুদেবময় বলে বোধ হতে থাকে। তিনটে স্থানে ব্রহ্মের পরিচয় হয়। প্রণবের সপ্ত অবয়বের মধ্যে মূলাধার থেকে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্র প্রকৃতি-পুরুষের মিলনস্থান এবং সহস্রার নিরঞ্জন ব্রহ্মের স্থান। এই তিন জায়গায় জ্ঞানপ্রকাশও আলাদা। যেন ভাবগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলাদা হয়েছে তাই এটাকেই ভগবানের ত্রিভঙ্গমুরারী রূপ বলা হয়। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিও একই চৈতন্যের তিনরকম অবস্থা। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে – “ সৎ - তৎ - ওঁ ” সৎ =স্বরূপ ব্রহ্ম, নিচে নিচে নামতে নামতে অথবা প্রকাশিত হতে হতে তৎ = কূটস্থজ্যোতিঃ, আরও নীচেয় এসে বা প্রকাশিত হয়ে ওঁ কার = ত্রিপুর সমন্বিত দেহ বা প্রকৃতি। সুতরাং ব্রহ্মকে জানতে হলে নীচে থেকে উপরে যেতে হবে। এই, দেখা যায় এমন, স্থূল শরীরকে অবলম্বন করেই সাধন করতে হবে। একান্ত শরণাগত হয়ে সাধন করাই নিবিড়ভাবে সাধন বা আত্মসমর্পণ। এটা যত নিবিড় হয় ততই কূটস্থে স্থিতিলাভ হতে থাকে। অধিক স্থিতিশীল ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। এমন ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোতেই ভবরোগমুক্ত হওয়া যায়। সেজন্যই ওঁকার ও ব্রাহ্মণ, তৎ ও বেদ এবং সৎ ও যজ্ঞ এঁদের পরষ্পরের এমন সাদৃশ্য থাকায় ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ যথাক্রমে ওঁ তৎ সৎ। যার দ্বারায় জৈবকর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত হয়, সকল যজ্ঞ দান ও তপস্যাদির সাত্ত্বিকত্ব উপপাদনের উপায়। সাধকগণও এমন যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই প্রথমে ভূতময় প্রকৃতি দেহকে ব্রহ্মে লীন করবেন। এটাই প্রকৃত ভূতশুদ্ধি॥ ১৭/২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।।২৪

অনুবাদ: অতএব ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞ, দান, তপঃ, ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ১৭/২৪

ব্যাখ্যা: এখন শ্রীভগবান ওঁ কার আদি শব্দত্রয়ের (ওঁ তৎ সৎ) প্রশস্তি ও প্রশস্ততার বিষয়ে বলবেন পরের চারটে শ্লোকে। প্রথমে ওঁকার বিষয়ে বলছেন। আগের শ্লোকেই বলা হয়েছে ওঁ কার অর্থে ব্রহ্মের সার্বময়ত্বই বিশেষভাবে লক্ষিত হয় এবং ব্রাহ্মণও ওঁকার শব্দের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা অথবা শারীরিক, বাচিক, মানসিক ক্রিয়াসকল সমস্তই ব্রাহ্মণেরা ওঁ কার স্মরণ করেই করে থাকেন। সকল কর্ম্মেই প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম নাম, রূপ, ক্রিয়া ও আত্মরূপে অনুস্যূত রয়েছেন এই দর্শনই ব্রাহ্মণের চক্ষু – এটাই ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং কর্ম্মের সূচনাতেই ওঁ কার ব্রাহ্মণের দ্বারাই অনুস্যূত হয়ে থাকেন এবং ব্রাহ্মণও স্বতঃসিদ্ধভাবেই ওঁ কার উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু ওঁ কার কি শুধু মুখে বললেই হয় ? এ যে অনুচ্চার্য্য, “যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ”। আগেই বলা হয়েছে যে ওঁকার হল শরীরত্রয়। এ বিষয়ে যে সাধন আছে তার অভ্যাসের ফলেই শরীরের অহং জ্ঞান তিরোহিত

হয় এবং আপনা আপনিই সেই স্থির অবস্থাটা আসে। যেখানে “আমি” ও “আমার” বলে কিছুই আর থাকে না। তখনই সকল কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ হয় ও স্বরূপে অবস্থান হয়। সকল যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি যা কিছু এমন কি ক্রিয়া করা এবং ক্রিয়াদানও এই অবস্থাতেই হয়। এই ওঁ কারের সাধনাই সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণের উপায়। পাঠক যদি প্রশ্ন করেন যে কি করে বা কি ভাবে এই সমর্পণ হয় ? সেটাও অব্যক্ত, অনুচ্চার্য্য, ভাষায় প্রকাশ হয় না। করে দেখতে হয়। কিন্তু শুধুমাত্র মন্ত্র উচ্চারণ ? সে তো অনেকেই করে থাকেন। তাতে প্রকৃত কোনও কাজই হয় না, যজ্ঞ তো অনেক দুরের কথা ॥ ১৭/২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫

অনুবাদ: মোক্ষকাঙ্ক্ষীগণ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ‘তৎ’ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যাক্রিয়া এবং দানক্রিয়া করেন ॥ ১৭/২৫

ব্যাখ্যা: এবার দ্বিতীয় নাম ‘তৎ’ শব্দের প্রশস্তি। ‘তৎ’ শব্দ নির্গুণ অক্ষরবাচক। এর দ্বারা শুদ্ধ আত্মতত্ত্বটাই লক্ষ্য করা হয় যেহেতু আত্মাই সর্ব্ববেদময়। সুতরাং কর্ম্মমাত্রেই আত্মাই সুপ্রতিষ্ঠিত। এজন্যই আত্মকামী বা মোক্ষাভিলাষী পুরুষ ‘তৎ’ শব্দ অবলম্বনে আত্মবেদন্ময় হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কাজের অনুষ্ঠান করে থাকেন। জৈব স্বার্থবোধ সংকীর্ণ হয়ে যায় বলে তাঁরা দানশীল হন। সেজন্য ভগবান এখানে দানের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে তাঁরা কর্ম্ম করেন মাত্র, কখনই কর্ম্মকে এড়িয়ে চলেন না। বরং কর্ম্মের দ্বারা আত্মানুভূতি প্রোজ্জ্বল করে কূটস্থে আত্মার ভূমা মূর্ত্তি দেখার চেষ্টা করেন ও কূটস্থে প্রবেশ করে সত্যিকার ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে যান। যেমন সরষে ও তিলের ভিতরে তেল, দুধের ভিতরে ঘী, কাঠের ভিতরে আগুন থাকে, ঘসাঘসিতে বা কৌশলে সেসব বের হয়, তেমনই ক্রিয়া দ্বারাই আত্মার প্রকাশ অনুভব হয় ॥ ১৭/২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সাদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ।।২৬

অনুবাদ: হে পার্থ, সদ্‌ভাবে এবং সাধুভাবে ‘সৎ’ শব্দ প্রযুক্ত হয়। মাঙ্গলিক কর্ম্মে ‘সৎ’ শব্দ প্রযুক্ত হয় ॥ ১৭/২৬

ব্যাখ্যা: এখন পর পর দুটো শ্লোকে ‘সৎ’ শব্দের প্রশস্তি। ‘সৎ’ শব্দ কি কি বিষয়ে প্রযুক্ত হয়ে থাকে ? (১) সদ্‌ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অর্থে, (২) সাধুভাব মানে সাধুত্ব, (৩) প্রশস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ মাঙ্গলিক বিবাহাদি কর্ম্মেও সৎকর্ম্ম অর্থে ‘সৎ’ শব্দের প্রয়োগ হয়।

(১) ‘সদভাব’ – অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মসত্তায় সত্ত্ববান হওয়া বা ব্রহ্মভাবে থাকা।

(২) ‘সাধুভাব’ – অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মসত্তায় অবস্থানের অনুকূল জ্ঞান। এমন জ্ঞান থেকেই জীব অবিরত সাধনক্রিয়ায় লেগে থাকেন।

(৩) ‘প্রশস্তকর্ম্ম’– ওঁ কার ও তৎপুরুষকে অবলম্বন করে কৃত কর্ম্মই প্রশস্তকর্ম্ম। এ ছাড়া যাবতীয় কর্ম্মই অপ্রশস্তকর্ম্ম। যে কোনও মাঙ্গলিক কর্ম্ম যদি এমন সাধক ছাড়া অপর সাধারণের দ্বারা করা হয় অর্থাৎ ওঁ কার ও তৎপুরুষ অবলম্বনে না হয়, তখন সে কর্ম্ম প্রশস্ত না হয়ে অপ্রশস্ত হয়ে পড়ে, আর মাঙ্গলিকও হয়ে ওঠেনা মোটেই। এককথায় পরম মঙ্গলজনক কর্ম্মই হল ক্রিয়ার পর অবস্থা। এমন পরম মঙ্গলময় অবস্থা পাওয়ার জন্য যিনি সেই ‘সৎ’ কর্ম্মে দিনরাত লেগে থাকেন তিনিই সাধু।

সুতরাং ব্রহ্মসত্তা, তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও কর্ম্ম তিনেতেই ‘সৎ’ শব্দ প্রযুক্ত হয় পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান সেটা আরও ভাল করে বলেছেন ॥ ১৭/২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ।। ২৭

অনুবাদ: যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে অবস্থান করাকেও (লাগিয়া থাকাকেও) ‘সৎ’ বলা হয় এবং তদর্থীয় কর্ম্ম ‘সৎ’ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৭/২৭

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বই যখন ‘সৎ’ নামে অভিহিত এবং পরমার্থতঃ সেই তত্ত্বই আত্ম অনাত্ম সর্ব্ববিধ প্রকাশের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তখন কর্ম্ম মাত্রই পরমার্থতঃ সৎ বা ব্রহ্মযজ্ঞ। কিন্তু জীবের কর্ম্মগুলো তো দুইভাবে করা হয় – এক সাধারণ জৈব স্বার্থে বা প্রকৃতির বশে এবং দুই ভগবৎ উদ্দেশ্যে। এর ভিতর শঙ্করাচার্য্যের মতে যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যে স্থিতি আছে তারই নাম ‘সৎ’ এবং ‘ওঁ তৎ সৎ’ এই তিনটি শব্দের দ্বারা যে পরমেশ্বরকে বোঝায় তাঁর জন্য যে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই সব কর্ম্মই তদর্থীয় কর্ম্ম। এমনতর যে স্থিতি সেটাই ‘সৎ’ ভাব বা ব্রহ্মভাব। এ অবস্থায় বা এমন স্থিতিতে ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব হয় না। নৃত্যপরা নর্ত্তকী মাথায় কলসি রেখে দ্রুতলয়ে নৃতের বিভিন্ন মুদ্রাদি প্রদর্শন করলেও লক্ষস্থির থাকে সেই মাথার উপরের কলসিতেই, সেটা যেন পড়ে না যায়। তেমনি ভাবেই যোগীর ক্রিয়াজনিত স্থিতি বা স্থিরতায় একমাত্র ব্রহ্মেই লক্ষ্য থাকে এবং সকল কর্ম্মই সেই ‘ওঁ তৎ সৎ’ এর প্রতিপাদনেই অনুষ্ঠিত হয়ে তাকে ‘ওঁ তৎসৎ’ এর উচ্চারণ করাটা সত্য ও সাধুভাবের উদ্দীপক ঠিকই কিন্তু শুধু মাত্র উচ্চারণ

করলেই বিশেষ কিছু লাভ নেই। এর প্রকৃত রহস্য ও সাধনা সদগুরুর কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজের নিজের কর্ম্মের বৈগুণ্য সমাধান করতে পারলেই জৈব স্বার্থে বা প্রকৃতির বশে কৃত কর্ম্মও ভগবৎ উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়ে যায়, অজ্ঞানে কৃত বলে অসৎ বা অবিদ্যাময়, ফলপ্রসূ হয় না। ইড়া পিঙ্গলা থেকে শ্বাসের গতিকে সুষুম্নায় প্রবাহিত করতে পারলেই ব্রাহ্মীস্থিতি অনেক সহজেই হয়। তখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত সকল কর্ম্মই ব্রহ্মকর্ম্ম। কর্ম্ম মাত্রেই সৎ, অসৎ বলে কোনও ভাব নেই। সুতরাং কর্ম্মমাত্রেই তদর্থীয় কর্ম্ম বলে সকল কর্ম্মই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মেই সম্পাদিত হচ্ছে। অতএব সকল কর্ম্মই সৎ – ব্রহ্মযজ্ঞ। এটাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৭/২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।২৮

অনুবাদ : অশ্রদ্ধাসহকারে হুত, দত্ত, কৃত তপস্য এবং অন্য যাহা কিছু করা হয় (সে সকলই) অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। হে পার্থ, তাহা না পরলোকে, না ইহলোকে ফলদায়ক ॥ ১৭/২৮

ব্যাখ্যা: অধ্যায়ের শুরুতেই দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রদ্ধার সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে। এখন এ অধ্যায়ের শেষে আবার বলি যে ভাব সত্যবোধের দ্বারা বিধৃত ও পুষ্ট, অন্তরের সেই ভাবকে শ্রদ্ধা বলে। অতএব সৎবোধশূন্য যে সমস্ত ভাব তা সবই অশ্রদ্ধাময় ভাব। তেমন ভাব নিয়ে যা কিছু করা যায় সে সকলও অসৎ। পরম ব্রহ্মতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান না হয়ে যা কিছু করা হয়, এমনকি ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে করা হলেও তা অসৎ। তেমন শ্রদ্ধাহীন কর্ম্মের দ্বারা ইহকালে বা পরকালে কোনরকম কল্যাণই হয় না। আগের শ্লোকে বলা হয়েছে কর্ম্ম কিভাবে তদর্থীয় হয়। কর্ম্ম যদি তদর্থীয় না হয় তবে সেই অসৎ প্রবৃত্তির প্রাবল্যে কর্ম্ম করলে সে কাজে ইহকালেও আনন্দ থাকে না পরকালেও মঙ্গল হয় না। প্রবৃত্তি এমনই জিনিষ, প্রবৃত্তির এমনই চাপ যে জীব নিজের গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সকলই অমান্য করে স্বেচ্ছাচার করতে থাকে এবং সকল কর্ম্মই তামসিক ও রাজস হয়ে পড়ে। তেমন কর্ম্মের দ্বারা সুষুম্নায় প্রাণ প্রত্যাবর্ত্তন করে না। ইড়া-পিঙ্গলায় শ্বাস বইলে জ্ঞান লাভে অধিকারই আসে না। সেই জন্য শ্বাস যাতে সুষুম্নায় প্রবাহিত হয় তেমনভাবে সাধনায় প্রযত্ন করা দরকার। ব্রহ্মে স্থিতিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যতই ওঁ কার ক্রিয়া কর বা কূটস্থে থেকে ক্রিয়াদান কর না কেন, তাতে কিছু বাহ্যিক সিদ্ধি হলেও কামভোগ অতিক্রম হয় না, ফলে প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না। জাগতিক লাভালাভের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, আত্মতত্ত্বে সত্যবোধের উপলব্ধিতে, প্রাণের টানে, নিত্য নিয়মিতভাবে ক্রিয়া করলে তবেই সেই সৎ প্রকাশ বা প্রকৃত শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা হয় ও কর্ম্মও ভগবান প্রীত্যর্থে হয়। এমনতর অর্জ্জিত শ্রদ্ধা সহকারে কর্ম্ম করেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়, প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হয়। এমনভাবে জ্ঞান ভক্তিতে অধিকার লাভের জন্যই ভগবান্‘ওঁ তৎ সৎ’ এই পরম আত্মবিজ্ঞানময় মন্ত্রটার প্রত্যেক শব্দের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করে দেখালেন এবং ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ কেন বার বার এর উচ্চারণ করেন সেটা বুঝিয়েছেন। এভাবেই‘ওঁ তৎ সৎ’ মন্ত্রস্থ বিজ্ঞানের ফলই কর্ম্মমাত্রকে ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত করে। কর্ম্মের অবিদ্যাময় পরিণতিকে দূর করে। পরম সত্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে কর্ম্মের মাঝে প্রতিষ্ঠিত না দেখলে সেটাই অসৎ কর্ম্মে পরিণত হয় ও কর্ম্ম অশ্রদ্ধাময় হয়। এই যে বস্তুবাদীরা গুরুজনদের ও বাবা, মাকে শ্রদ্ধা করে না কারণ তাতে লাভ নেই, এটাই চরম অবিদ্যা। গুরুজনদের শ্রদ্ধা আত্মশ্রদ্ধারই রূপান্তর মাত্র। অশ্রদ্ধাময় কর্ম্মদ্বারা ইহলোক বা পরলোকে আত্মলাভ হয় না। আত্মতত্ত্বে সত্যবোধ ও তৎ জাতীয় শ্রদ্ধাই সৎপ্রকাশ এবং অশ্রদ্ধাই অসৎপ্রকাশ। সেই জন্যই তেমনতর কর্ম্ম বন্ধনজনক মাত্র হয়ে থাকে। তাই ও সমস্ত হোম, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ক্রিয়া যা কিছুই করা হোক শ্রদ্ধা না থাকলে সবই বৃথা, বেকার ॥ ১৭/২৮

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে “শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ” নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের, যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ :- হোম, যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তপস্যা অথবা পঠন, পাঠন, গবেষণাকর্ম্ম ইত্যাদি যতই করনা কেন শ্রদ্ধাসমন্বিত কর্ম্মের ফল এক রকম আর অশ্রদ্ধাজনিত কর্ম্মের ফল অন্য রকম হয়। কাজ তো করতেই হবে, কাজ না করে থাকা যাবে না। সুতরাং শ্রদ্ধার সাথেই লোককে কাজ করতে হয়, সে বৈষয়িক বা আধ্যত্মিক যে কাজই হোক। কিন্তু সকল শ্রদ্ধাই সমান নয় সেজন্যই সব কাজের ফল যথা সাফল্য, ব্যর্থতা ইত্যাদিও সমান হয় না। শ্রদ্ধারও তিনটে বিভাগ আছে। সত্ত্বগুণ যুক্ত শ্রদ্ধা, রজোগুণ যুক্ত শ্রদ্ধা ও তমোগুণ যুক্ত শ্রদ্ধা। এই তিনের বিভাগ অবস্থার নামই শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ। দেহে কখনও সত্ত্বঃ কখনও রজোঃ কখনও বা তমোঃ গুণের কাজ চলে, কম – বেশি পরিমাণে। শরীরে শ্বাস ইড়ায় চললে তমোগুণ, পিঙ্গলায় রজোগুণ ও সুষুম্নায় স্থির হলে সত্ত্বগুণের কাজ হতে থাকে। এই তিনের কর্ম্মগুণে শ্রদ্ধাও তিন রকমের হয়ে থাকে। আর যে অবস্থায় ইড়ার গতিও ফুরিয়েছে, পিঙ্গলার গতিও শুরু হয় নি এবং সুষুম্নাও ইড়া পিঙ্গলার উপরের জায়গাতে মানে বেশি শক্তিশালী হয়েও স্থির হয়ে আছে সেই অবস্থায়ই গুণাতীত শ্রদ্ধা বা বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা বিরাজ করে। এটাই পরম শ্রদ্ধার ভাব। যত রকম পূজা, পাঠ, হোম, যজ্ঞ যা কিছু এমন অবস্থায় থেকেই করতে হয়। কিন্তু এমন প্রকৃত পূজা বা আসল পূজা তো সাধারণ লোকের দ্বারা হয় না বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে। তাই সে সব শাস্ত্রবিহিত পূজোও নয়, পূজোর ভড়ং মাত্র হয়। পুরোহিতদের সাধন দ্বারা শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা দরকার, নিষ্ঠাও অর্জ্জন করা দরকার অন্ততঃ পারিবারিক কূলদেবদেবীর পূজোর ক্ষেত্রে। কিভাবে প্রকৃত শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে হয় সেই বিজ্ঞানটাই হল শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ। শ্রদ্ধান্বিত কর্ম্মই সৎ কর্ম্ম আর অশ্রদ্ধান্বিত কর্ম্মই অসৎকর্ম্ম ॥

-*-

ওঁ

অথ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগ (১৮)

অর্জুন উবাচ -

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন।। ১

অনুবাদ: অর্জ্জুন কহিলেন। হে হৃষীকেশ, মহাবাহো, কেশিনিসূদন, আমি সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৮/১

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবানকে যে সকল নামে সম্বোধন করেছেন সে সকল সম্বোধনের তাৎপর্য্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অর্জ্জুনের মনে সংশয় এসেছিল যে এ যুদ্ধরূপ কর্ম্মের সত্যিই কতটা প্রয়োজন ? ভগবানের কর্ম্মবিজ্ঞান বিশ্লেষণের পর অর্জ্জুনের মনে জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের প্রকৃষ্টতা খুব সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছিল এবং নিজের প্রকৃত সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা থেকেই ভগবানকে গুরু বলে তাঁতেই আত্মসমর্পণ করে নিজেকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করার ভার দিয়েছিল। কর্ম্মের প্রকৃষ্টতা উপলব্ধির পর এখন অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে বলছেন হে ভগবান, কর্ম্ম যে তোমারই প্রকাশ এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা অবলম্বনেই সে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা উচিত সেটা বুঝেছি কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তো শুধুমাত্র তোমাতেই আত্মসমর্পণ করে তোমারই মুখাপেক্ষী করে তোলে এবং শুধু তোমারই অনুসরণে তোমাতেই আসক্ত করে। তবে তুমি যে নৈষ্কর্ম্মের কথা বলেছিলে সেটা কি ? কর্ম্ম হতে সন্ন্যাস ও ত্যাগ কি করে আসবে ? তাহলে আর প্রকৃত ত্যাগ আর প্রকৃত সন্ন্যাসটাই বা কি ? সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করে তাদের পার্থক্যটা একটু বুঝিয়ে দাও। পাঠক প্রশ্ন করবেন যে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাবা ? ভগবান তো শুরু থেকে এ ব্যাপারটাই বলে আসছেন বিশেষভাবে। হ্যাঁ সত্যি ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের “ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং” পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে “সর্ব্বকর্ম্মানি মনসা সন্ন্যাসস্তে সুখংবশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্”, নবম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে “সন্ন্যাস যোগ যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥” ১২শ অধ্যায়ে “সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং” প্রভৃতি শ্লোকে যেভাবে ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলেছেন তাতে শ্লোকোক্ত উপদেশ

আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে। সেজন্যই ভগবান কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মনুষ্ঠান এ দুটো যাতে পরস্পর বিরোধী না হয় সে জন্যই পরের শ্লোক থেকে শুরু করে কয়েকটি শ্লোকে প্রকৃত সন্ন্যাস ও ত্যাগের স্পষ্টীকরণ করেছেন ॥ ১৮/১

শ্রীভগবান উবাচ -

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ।। ২

অনুবাদ: শ্রীভগবান কহিলেন। পণ্ডিতেরা সমুদয় কাম্যকর্ম্মের ন্যাসকে (ত্যাগকে) সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। আত্মজ্ঞানীগণ সমূদয় কর্ম্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন ॥ ১৮/২

ব্যাখ্যা: ভগবান এখানে ‘সন্ন্যাস’ ও ‘ত্যাগ’ এই শব্দ দুটোকে পৃথক পৃথক করে বুঝিয়েছেন ‘সন্ন্যাস’ অর্থে কাম্যকর্ম্মের ন্যাস মানে কাম্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান অর্থাৎ না করা কিন্তু প্রকৃত অর্থে বলতে হয় কর্ম্মের কাম্য ভাবটাকে ব্রহ্মে সংন্যস্ত করা। “ন্যসতি ব্রহ্মণীতি ন্যাসঃ”। এটাই প্রকৃত সন্ন্যাস, কাজকর্ম্ম এড়িয়ে থাকাটা মোটেই সন্ন্যাস নয়, আর গেরুয়া বা জটাজূট ধারণ বা বিবাহাদি না করে থাকাটাও মোটেই সন্ন্যাস নয়। এবার ‘ত্যাগ’ মানে হল ‘ফলত্যাগ’। কর্ম্মের ভিতর কামনাই ফলপ্রসূ। সেই কাম্যভাব পরিত্যাগ করলেই ফলত্যাগ করা হয়। এজন্যই কর্ম্মকে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কাম্য ভাবটা ও ফল ভাবটা অবশ্যই বর্জনীয়। কাম্যভাবটাই হল ইচ্ছা। কাম্যভাব ত্যাগ মানে ইচ্ছারহিত হওয়া। যতক্ষণ ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ ত্যাগ হয় না। হাতে কলমে কাজটা না করলেও মনে মনে ঐ কাজটা চলতেই থাকে। অতএব ইচ্ছাকে রোধ করতে পারলেই ত্যাগ হয়। ত্যাগের ঠিক অবস্থাটা ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ‘নৈষ্কর্ম্ম্য’ বলেছেন যার অর্থই হল নিষ্কাম বা “ইচ্ছারহিত” অবস্থা। নইলে “এটা করব” অথবা “ওটা করব না” এ দুটিতেই ইচ্ছা রয়েছে। প্রথমটায় কাজটা “করার ইচ্ছা” অন্যটায় “না করার ইচ্ছা” দুটোই ইচ্ছা, একটা “হ্যাঁ” বোধক ইচ্ছা, অন্যটা “না” বোধক এইমাত্র। এমনতর “না” বোধক ইচ্ছাকে যিনি ত্যাগ বলেন তাঁকে তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে কপটাচারী বলা হয়েছে। সকল কর্ম্মের বাসনা ত্যাগকেই পণ্ডিতেরা ত্যাগ বললেও আত্মজ্ঞানীদের মতে কর্ম্মের ফলাকাঙ্খা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। “নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি”॥ এর বিশদ আলোচনা এই অধ্যায়ের ৫১ থেকে ৫৫ শ্লোকে ভগবান করেছেন। এমন অবস্থাটা পেকে উঠলে তবেই ত্যাগী হওয়া যায়, পরমহংস অবস্থায় পৌঁছান যায় কারণ সমাধিলাভের পর মন, বুদ্ধি সমস্তই এমন নির্ম্মল হয়ে যায় যে তাতে আর বিষয়ের ছাপ পড়ে না। এমন অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য কোনও রকম লোক

দেখান সন্ন্যাসের ছাপ দরকার হয় না, অন্তরের ন্যাসই যথেষ্ট। পাঠক প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ মশাই, সংসারে থেকে তো কাজের অন্ত নেই। আবার আহার, বিহার, বিষয়ানন্দ ইত্যাদি সুখময় কর্ম্মও তো সংসারে করতে হয় তাহলে আর অন্তরের'ন্যাস' বা সন্ন্যাস কি করে হয় ? তার চাইতে সংসার ত্যাগই শ্রেয় নয় কি ? উত্তরে বলি – বাপু হে, তুমি যেখানেই যাও না কেন, যদি ইচ্ছাটাকেও সাথে করে নিয়ে যাও তবে আর সন্ন্যাস হল কোথায় ? লাল অথবা সাদা কাপড় যাই পর, আর যে ধরনের সঙই সাজো না কেন, তাতে ভিক্ষে, দান বা চাঁদা প্রাপ্তির কিছুটা সুবিধা হলেও ইচ্ছা, কামনা এ সমস্তই বাড়বে বই কমবে না। পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তার চেয়ে একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে যে সংসারে থেকে সকল কর্ম্মই যদি যথাসাধ্য সম্পন্ন করা যায় শুধু একটু সামঞ্জস্য রেখে যাতে বেশি জড়িয়ে পড়তে না হয়; ধারণা করতে না হয় যে এতে আমার কি লাভ হল ? আর সেই সাথে সদ্‌গুরু সেবা করে সংসারে থাকার কৌশলটা বুঝে নিলেই তো কর্ম্মবিজ্ঞানটা সহজ হয়ে যায়। তখন সব কাজকর্ম্ম করেও "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"। এটাই প্রকৃত সন্ন্যাস। কারণ এতে চিত্তশুদ্ধি ও মনোনাশ দুইই হয়ে যায়। কিন্তু ক্রিয়াযোগ ছাড়া তো এমন জ্ঞান হয় না – "কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে" – এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে জ্ঞানলাভ হলেই সন্ন্যাস হবে সংসারে থেকেই – "জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।" এমন নিত্যসন্ন্যাসী সংসারে থেকে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হলেই হওয়া যায়, সঙ সেজে নয়। ১৮/২

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজমিতি চাপরে ।। ৩

অনুবাদ: কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মকে দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলেন; কেহ বা যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম, ত্যাজ্য নয়, ইহা বলেন ॥ ১৮/৩

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের ভগবানের কর্ম্মত্যাগে বা কর্ম্মফলত্যাগে সন্ন্যাসের বিষয়টা নিয়ে নানা মুনির নানা মত থাকাজনিত সন্দেহ নিরসনার্থে এই শ্লোকে তার স্পষ্টীকরণ। কর্ম্মত্যাগটা প্রকৃত ত্যাগ নয়। কর্ম্ম না করলে ফল উৎপন্নই হয় না, সুতরাং ফলের অস্তিত্ব এলে তবে তো সেই ফলত্যাগের প্রশ্ন ওঠে। সেই জন্য কোনও অবস্থায়ই কর্ম্মত্যাগ সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। ক্রিয়া করা, ক্রিয়া দেওয়া এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকা এসমস্তই ক্রিয়ারই ফলমাত্র। সুতরাং এমন কর্ম্ম কি পরিত্যাজ্য হতে পারে ? অপরপক্ষে যিনি চূড়ান্ত পরাবস্থায় পৌঁছে গেছেন মানে পরাবস্থারও পর অবস্থায় পৌঁছেছেন তাঁর জন্য আর কর্ম্ম নেই, তাঁর সর্ব্বকর্ম্মই পরিত্যাগ হয়েছে কারণ তাঁর আর প্রাণক্রিয়াও নেই। একমাত্র তাঁরই নিকট সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হলে তাঁর আর শ্বাস টানা ফেলার দরকার হয় না। সুতরাং বাহ্য কর্ম্মেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধনদ্বারা আত্মবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া ঠিক ঠিক চালিয়ে যেতে হবেই, অসময়ে ক্রিয়া ত্যাগ করলে একুল ওকুল দুই কুলই নষ্ট হয়। এজন্যই ভগবান সকামীদের জন্য কর্ম্মের বিধান দিয়েছেন কর্ম্ম করে জ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য। নদী পার হবার পর আর যেমন নৌকার দরকার হয় না তেমনি যোগারূঢ় হয়ে গেলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। সেই জন্যই অর্থটা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রযোজ্য ॥ ১৮/৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ।।৪

অনুবাদ: হে ভরতশ্রেষ্ঠ, পুরুষপ্রধান, সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিশ্চয় (মত, সিদ্ধান্ত) শ্রবণ কর। ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ১৮/৪

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে মতভেদের কথা বলার পর ভগবান নিজের মত বা সিদ্ধান্তটা বলছেন। বিষয়টাতে ভগবান খুবই গুরুত্ব দিচ্ছেন যেন কোন সাধক এমনটা না ভাবেন যে ত্যাগের বিষয়ে আর কি শুনবো ? ও তো সেই একই কথা, সকলেই জানে। প্রকৃত অর্থে ত্যাগও ত্রিবিধ – সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে ত্যাগের জন্য মনের ওপর কোনও রকম জোর জবরদস্তি করতে হয় না সেটাই হল সাত্ত্বিক ত্যাগ। জ্ঞানলাভ হলেই সাধকের এমনতর ত্যাগ স্বভাবতঃই হয়ে থাকে। এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ। অবশ্য সাধনদ্বারা অর্জিত ত্যাগও সাত্ত্বিক ত্যাগ যদিও এমন ত্যাগের জন্য সাধককে অনেক পরিশ্রম করতে হয় মানে সাধন প্রভাব ও জ্ঞান বিচারের দ্বারা করতে হয়। তাই এমন ত্যাগ নির্গুণ বা গুণাতীত না হলেও অবশ্যই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কিন্তু অশুদ্ধচিত্তে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে ত্যাগ সেটা রাজসিক। রাজ্য প্রাপ্তির জন্য ধ্রুবের গৃহত্যাগ ও তপস্যা এই শ্রেণীর ত্যাগ। আর তামসিক ত্যাগে বিবেক বৈরাগ্যের লেশমাত্রও থাকে না। নেহাতই আলস্য বশতঃ বা কাজে কর্ম্মে অপারগ হয়ে কর্ম্মত্যাগ অথবা উপার্জনে অক্ষম হয়ে বাড়িতে গালাগালি খেয়ে মনের যে অবসাদগ্রস্ত অবস্থা হয়, সে অবস্থায় কেউ কারো নয় ভেবে যে ত্যাগ চিত্তে উৎপন্ন হয় তেমন ত্যাগ। অনেকে আবার এমন মানসিকতা থেকে ঘর সংসার ত্যাগ করে বসেন। এমন ধরনের সমস্ত ত্যাগই তামসিক ত্যাগ। এসব হল নিকৃষ্ট ত্যাগ। একমাত্র যে ত্যাগের মূলে কোনওরকম ইচ্ছা অনিচ্ছা, সংকল্প বিকল্প থাকে না সেটাই প্রকৃত ত্যাগ, সে ত্যাগের কোনও শ্রেণী বিভাগ থাকে না সকলশ্রেণীর উর্দ্ধে নির্গুণ ত্যাগ। বর্ত্তমান – ভবিষ্যতের সবরকম ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাকে খেয়ে হজম করে ফেলতে পারলেই এমন গুণাতীতভাবে ত্যাগী হওয়া যায় ॥ ১৮/৪

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ।।৫

অনুবাদ: যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকীগণের চিত্তশুদ্ধিকর ॥ ১৮/৫

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের সিদ্ধান্তটা এখন দুটো শ্লোকে উপদেশ করছেন। মন শুদ্ধ ও পবিত্র না হলে জ্ঞানলাভ হয় না। মনঃশুদ্ধির জন্য যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম করার বিশেষ দরকার আছে। ক্রিয়া করা, ক্রিয়া দেওয়া এবং ব্রহ্মেতে থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনের পবিত্রতার বিষয়ে আগে অনেক বলা হয়েছে। স্থিরাবস্থাই মনের পবিত্রভাব। ক্রিয়ার দ্বারা মনের এতদূর শুদ্ধি হয় যে মনে আর কোনও ইচ্ছাই হয় না। ক্রিয়া করে চিত্তশুদ্ধি করতে হয়। ক্রিয়াদানও চিত্তশুদ্ধির সহায়ক, সকল রকম দান অপেক্ষা এটাই শ্রেষ্ঠ দান। অন্যের উপকারার্থে এমন দানে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। একমাত্র সত্ত্বশুদ্ধি না হলে ক্রিয়াদানে মন ইচ্ছুকই হবে না। মনে হবে ওসকল বিড়ম্বনায় আমি আর কেন যাই ? আবার ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সামান্য সামান্য মাত্র থাকতে পারলেও চিত্তশুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এমন অমূল্য যোগসাধন, যাতে সরাসরি জ্ঞান লাভ হয়, তা কখনই পরিত্যাজ্য নয়, এমনকি দোষযুক্ত হলেও, "সদোষমপি ন ত্যাজেৎ" ॥ ১৮/৫

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ।।৬

অনুবাদ: হে পার্থ, কিন্তু এই সকল কর্ম্মও আসক্তি এবং ফলত্যাগ করিয়া করা উচিত। ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত ॥ ১৮/৬

ব্যাখ্যা: আগের আগের শ্লোকে উক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ রূপ কর্ম্মসকল (যোগসাধন) যে পরিত্যজ্য নয় এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক সে সমস্তই বলা হল এখন কিভাবে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে হবে সেটাই বলেছেন যে কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে করতে হবে। ক্রিয়াতে আসক্তি থাকাটা ভালই কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা হেতু যে আসক্তি সেটা ঠিক নয়। কেন না ঐ আশায় ক্রিয়া করলে মনস্থির হয় না, চিত্তশুদ্ধি তো দূরের কথা। কখনও দর্শন শ্রবণাদির আশা বা অপর কোনও লাভালাভের কথা ভাবলে হবে না। আবার ফল কিছুই নেই ভেবে অবহেলার ভাব এলেও হবে না। ক্রিয়া করা গুরুর আদেশ সেজন্যই করতে হবে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে করতে হবে। অন্তঃকরণ অন্য বিষয়ে না গিয়ে একনিষ্ঠ হলেই চিত্ত স্থির ও নির্ম্মল হবে। নির্ম্মল চিত্তেই বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয়, সেই জ্ঞান থেকেই হয় জীবের মুক্তি ॥ ১৮/৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।।৭

অনুবাদ: কিন্তু নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস(ত্যাগ) কর্ত্তব্য নহে। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৮/৭

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোক দুটিতে ভগবান বললেন যজ্ঞ, তপস্যা, দান এসমস্ত কর্ম্ম পরিত্যজ্য নয়। তারপর বললেন আসক্তি ও ফলত্যাগ (ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ) করে করা উচিত, এখন এই শ্লোকে আবার বলছেন যে নিত্যকর্ম্মও পরিত্যাজ্য নয়, সেটা ত্যাগ করাটা হল তামসিক। অর্থাৎ ত্যাগও তাহলে ত্রিবিধ। তিনটে শ্লোকে এই তিন রকম ত্যাগের প্রকারভেদ দেখাচ্ছেন। লক্ষ্য করুন। পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ জীব কর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং সেই কর্ম্মের দ্বারা নূতন নূতন ভাবে বন্ধনলাভ হয়। এসমস্তই আগে বলা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল কামনাবশতঃ যে কর্ম্ম করা হয় অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম সেটা পরিত্যাজ্য হলেও মন কিন্তু সেটা করতেই বেশি উৎসুক (interested) থাকে। এর কারণ কি ? কারণ হল অশুদ্ধ চিত্ত। চিত্তশুদ্ধির অভাবেই এমনটা হয়ে থাকে। অপরপক্ষে যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা এই চিত্তশুদ্ধি হয়, সংস্কার রুদ্ধ হয়, প্রবৃত্তির নিরোধ হয়, সেই সকল সাধন, সন্ধ্যা, বন্দনা ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম ত্যাজ্য কখনই নয়, অন্ততঃ যতদিন না প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। সদ্গুরুপদেশে নিত্যকর্ম্মকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা প্রয়োজন যাতে এমন কর্ম্মের দীর্ঘকালব্যপী অনুষ্ঠানে অন্ততঃপক্ষে প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্থির হয় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব হতে থাকে। এই নিত্যকর্ম্মই হল আত্মকর্ম্ম বা সহজকর্ম্ম মানে সহজাত কর্ম্ম অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথে যে কর্ম্ম পেয়েছি ও করে চলেছি কিন্তু তাতে লক্ষ্য করছি না। তাকে লক্ষ্য করাটাই আত্মকর্ম্ম। এছাড়া মনের অভিলাষ থেকে যা সব করে থাকি সেগুলোই কাম্যকর্ম্ম, সেগুলোতে আসক্তিশূন্য হয়ে আত্মকর্ম্ম বা নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান গুরুপদেশে বিধিমত নিত্য নিয়মিতভাবে করতে করতে যখন সকল ইচ্ছার নাশ হয় ও দেহ সম্বন্ধ রহিত হওয়া যায় সেটাই প্রকৃত ত্যগের অবস্থা ও যথার্থ ত্যাগ। এছাড়া জোর জবরদস্তি করে যে সমস্ত ত্যাগ হয় সে সবই তামস ত্যাগ। যেমন রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া অথবা প্রিয় জনের শোকে বিবাগী হয়ে যাওয়া এ সমস্তই সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ যা প্রকৃত পক্ষে মনোবিকলন অথবা বিষাদবায়ু ঘটিত ব্যাপার মাত্র, সেজন্য এগুলো সবই তামসিক ব্যাপার। অপরপক্ষে নিঃশেষরূপে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা স্বতঃই (automatic, spontaneous) ইচ্ছারহিত হওয়াই ত্যাগ বা প্রকৃত সন্ন্যাস। এজন্যই নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস অবৈধ ॥ ১৮/৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ। ।৮

অনুবাদ: যে ব্যক্তি দুঃখবুদ্ধিতে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগফল (শান্তি) কদাচ পায় না ॥ ১৮/৮

ব্যাখ্যা: এবার রাজসিক ত্যাগের কথা। কুবুদ্ধি বশতঃ কাজকর্ম্ম এড়িয়ে চলার নামই রাজসিক ত্যাগ। কেননা সেটা কোনও ত্যাগের পর্য্যায়েই পড়ে না। যেমন একবেলা রেঁধে দুইবেলা খাওয়া। আর একবেলার রান্নার সময়টা আড্ডা দিয়ে, T.V. serial দেখে বা গল্প তামাশা করে কাটানো অথচ মনে ভাবা যে আমি কর্ম্ম ত্যাগ করে ঈশ্বরীয় ভাবে আছি। একই ভাবে পরিশ্রমের ভয়ে কাজে ফাঁকি দেওয়াও একই ধরণের রাজস আচরণ। অনেকের ভিতরেই সাধন কর্ম্মাদির ইচ্ছা থাকে অথচ শীতকালে শীতের ভয়ে আর গরম কালে রাতে ঘুম ঠিকমত না হওয়ায় দেরী করে ঘুম থেকে উঠে আর সাধনার সময় পায় না ফলে নিত্যকর্ম্মের যে ত্যাগ হয় সে সবই রাজস ত্যাগের অন্তর্গত। যদিও এর মূলে কোনও অসদিচ্ছা নেই তবুও এটা যে নিছকই অলসতা বশতঃ একথা তাঁরা স্বীকারই করেন না বরং বলে থাকেন নৈষ্কর্ম সাধনই প্রকৃত ত্যাগ মানে ওঁদের সাধনাদি ত্যাগটাই যথার্থ ত্যাগ এমন অর্থে কথা বলে চালাকি করে থাকেন। স্ত্রী পুত্রাদিসহ সংসার প্রতিপালনে কষ্টের ভয়ে সংসার ত্যাগ অথবা পরিশ্রমের ভয়ে, বা ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য, বিবাহাদি না করা এসবই রাজস ত্যাগ, কারণ মনে মনে ভোগের ইচ্ছা ষোল আনাই থাকে আর বাইরে গেরুয়া ধারণ এ হল রাজস ত্যাগ। এতে মনের অশান্তি আরও বাড়ে। তখন মুখে বলেন, "অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণ পীড়ণম্" মানে অজ্ঞ লোকের নাক টেপাই প্রাণায়াম, প্রকৃত প্রাণায়াম হল ব্রহ্মকায়া বৃত্তির নিশ্চলতা সম্পাদন। এই ধরনের আরও অনেক রকম শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সহ কথা বললেও এ ধরণের চতুর ও মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের ক্রিয়ার ফল কিছু মাত্রই লাভ হয় না। কারণ তাঁরা তিন চার ঘন্টা মেরুদণ্ড সোজা করে বসা অথবা আয়াসসাধ্য প্রাণায়াম বা ধ্যান ধারণাদি সবই কায়ক্লেশের ভয়ে ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বনে সন্ন্যাসী হয়ে বসেছেন। এমনতর ত্যাগকেই রাজসিক ত্যাগ বলে। রাজসিক ত্যাগ মোক্ষের পরিপন্থী সুতরাং নিষিদ্ধ ॥ ১৮/৮

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ। ।৯

অনুবাদ: হে অর্জ্জুন, সঙ্গ (ইন্দ্রিয় সঙ্গ) এবং ফল পরিত্যাগ করিয়া অথবা কর্ত্তব্য মনে করিয়া যে নিত্যকর্ম্ম করা যায়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৮/৯

ব্যাখ্যা: এবার সাত্ত্বিক ত্যাগ। আসক্তি এবং ফলত্যাগ করে "অবশ্য কর্ত্তব্য" অতএব করণীয় এই রকম বোধ থেকে যে বিহিত কর্ম্ম করা যায় এমন ত্যাগকেই সাত্ত্বিক বলা হয়। তাহলে সাত্ত্বিকত্যাগ, কর্ম্মফলত্যাগ বা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য থাকা মাত্র। কর্ম্মত্যাগ মোটেই নয়, কর্ম্মের ক্লেশও ত্যাগ করা নয়, শুধুই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ মাত্র। এখানেই রাজসিক ও তামসিক ত্যাগের সাথে পার্থক্য। রাজসিক ও তামসিক ত্যাগীরা কর্ম্মকেই ত্যাগ করে বসে নানা আছিলায় অথচ কর্ম্মফলে পূর্ণ আসক্তি বর্ত্তমান থাকে। ত্রিগুণের তাড়নাবশতঃই জীব এমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়। অপরপক্ষে ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে নিত্যকর্ম্মাদি করে গেলে এমন ত্রিগুণের তাড়না কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রিত হয় ও প্রবৃত্তির বেগ কমতে থাকে। হৃদয়ে ফলাকাঙ্খা থাকতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। গাছের ফল না খেলেও বা তার ছায়া না চাইলেও যেমন পাওয়া যায় তেমনি নিত্যকর্ম্মাদিরূপ যোগাভ্যাসে সকাম কর্ম্মের মতই কিছু সুফল তো থাকেই। ফল না থাকলেও চিত্তশুদ্ধি, কর্ম্মক্ষয়, পাপক্ষয় ইত্যাদিও তো হয়ে থাকে। কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য না করে, কোনও রকম ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা না করে, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সাত্ত্বিক ত্যাগ বা কর্ম্মানুষ্ঠান ॥ ১৮/৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ।।১০

অনুবাদ: সত্ত্বগুণশালী, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য, ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল (দুঃখজনক) কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না এবং কুশল (সুখকর) কর্ম্মে প্রীতি অনুভব করেন না ॥ ১৮/১০

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ বলেছেন। রজঃস্তম অতিক্রম করে যিনি সত্ত্বগুণে স্থিত হয়েছেন তিনিই প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করে স্থিরবুদ্ধি ও সংশয়শূন্য হতে পারেন। কারণ মনের ধাঁধাঁ ঘুচে গেলেই ঈশ্বরতত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসশীল হওয়া যায়। যাঁর এমনটা হয় তিনিই দুঃখজনক কর্ম্মেও ক্ষুব্ধ হন না বা দ্বেষ করেন না, আবার সুখকর কর্ম্মেও আকর্ষণ বা প্রীতিবোধ করেন না। এমনতর সুখদুঃখ সমতুল্য যিনি জ্ঞান করেন তিনিই ত্যাগী। অবশ্য এজন্য মেধাবী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থাই আসল মেধা। সুতরাং তাতে যাঁর মন সর্ব্বদা আটকানো, দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা কর্ম্ম করলেও সে সমস্ত কর্ম্মের কোনও ছাপ তাঁর চিত্তে পড়তে পারে না, আর ভালো মন্দের ব্যাপারটাও থাকে না। প্রাণায়ামের দ্বারা সমতা লাভ হলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্বন্ধরহিত হয়ে

থাকে। মন দিয়ে বেশিক্ষণ ক্রিয়া করেই এমন সত্ত্বসমাবিষ্ট হয়ে বুদ্ধি স্থির ও মেধাবী হওয়া যায়। আত্মজ্ঞানরূপ এই প্রজ্ঞাই মেধা। এই মেধা যত বাড়ে ততই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয় ও মনের সকল সংশয় দূর হয়। ভালো মন্দের ভেদাভেদ না থাকায় কুশল কর্ম্মে আসক্তি বা অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ ইত্যাদি কোনও কিছুই হয় না ॥ ১৮/১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১

অনুবাদ: দেহী নিঃশেষরূপে সকল কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু যিনি কর্ম্মফল ত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১৮/১১

ব্যাখ্যা: দয়ালু ভগবান খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলছেন দেহ ধারণ করা অবস্থায় কোনও কর্ম্মই না করে থাকা যায় না। অন্ততঃ শরীর রক্ষার জন্য পেটে তো কিছু দিতেই হয়। অতএব কোনও কর্ম্মই ত্যাগ করার উপায় নেই। বাইরে থেকে কাজ না করে বসে থাকলেও মনে মনে কাজ হতে থাকে। এর আগেও তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন – "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥" সুতরাং কেউই একমুহূর্ত্তও কর্ম্ম না করে থাকতে পারে না। অতএব দেহাভিমানীর কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নয়। সেজন্য ফলত্যাগই সুখত্যাগ এবং যাঁরা কর্ম্মও করেন অথচ সেই কর্ম্মের কোনও রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না তাঁরাই প্রকৃত ত্যাগী। কিন্তু সমস্যা হল ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম্ম করব মনে করলেই যে সেটা করা সম্ভব হবে এমন কিন্তু মোটেই নয়। মনের খেয়ালে যে চট করে সব কিছু ত্যাগ করে বসে সে আবার তেমনি চট করেই বিষয় গ্রহণও করে থাকে। সুতরাং কামনা ত্যাগের জন্যই সাধনা করা দরকার। সাধনদ্বারা একবার প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্থির হয়ে গেলেই অভিমান ত্যাগ হয়। কিন্তু সেটা অন্য কোনও কৌশলে হয় না, একমাত্র প্রাণস্থির হলেই হয় ॥ ১৮/১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।।১২

অনুবাদ: ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট মিশ্র – এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল সকাম ব্যক্তিদিগের পরকালে হইয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ সন্ন্যাসীদিগের এই সকল কর্ম্মফল কোথাও ভুগিতে হয় না ॥ ১৮/১২

ব্যাখ্যা: বিবাহাদি না করার অর্থ যেমন ব্রহ্মচর্য্য নয়, তেমনি ঘর সংসার ছেড়ে মঠ মিশনে গিয়ে থাকাটাও মোটেই সন্ন্যাস নয়। কামনাশূন্যতাই যে প্রকৃত সন্ন্যাস একথা আগেই বহুবার বলা হয়েছে। এমন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যাঁরা তাঁদের কোনও কর্ম্মই ভোগ করতে হয় না। কর্ম্ম তিন ধরনের – অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্ট-অনিষ্ট মিশ্রিত। এমন কর্ম্মানুসারে ফলও হয় ত্রিবিধ। তুমি জটাধারী অথবা মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া, সাদা বা বল্কলধারী যাই হও না কেন, ত্যাগের বদলে আসক্তি থাকলেই এই সকল কর্ম্মের ফল মৃত্যুর পর বা জন্মান্তরে ভোগ করতেই হয়। কর্ম্মফলভোগে ভীত হয়ে যাঁরা সংসারগতি হতে মুক্তিলাভ করতে চান তাঁরাই প্রকৃত বিবেকসম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু কর্ম্মবন্ধন কাটাতে চাইলেই যে কাটে তেমন তো নয়। এর জন্য ত্যাগ অভ্যাস (practice) করতে হয় যেটা আবার বৈরাগ্য না থাকলে হয় না। ত্যাগ অভ্যাসকে আয়ত্ত করার জন্য যে উপায় (exercise) সেটাকেই শাস্ত্রে "বিবিদিষা সন্ন্যাস" বলে যাতে আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারগতি রুদ্ধ করতে হয়। আত্মজ্ঞান ব্যতীত সম্যকজ্ঞানী বা ত্যাগী হওয়া যায় না। এইভাবে জ্ঞান লাভে যে স্বতঃ ত্যাগ (spontaneous) সেটাই হল শাস্ত্রানুমোদিত সন্ন্যাস। এ সন্ন্যাস শুধু অন্তঃসন্ন্যাস। সাধক এবং তাঁর সদ্‌গুরুব্যতীত এ সন্ন্যাসের কথা তৃতীয় ব্যক্তির জানার কথাই নয়। দেহেন্দ্রিয় মনের সঙ্গে যত দিন সম্বন্ধ থাকে ততদিন সংসার গেল কি করে? ইচ্ছা, দ্বেষ এ সকল দ্বন্দ্বভাব থেকে যে সকল কর্ম্ম উদ্ভূত হয় তা থেকেই তো আমরা বিষয়ের নিকট বাঁধা পড়ি ও (সেই সব কর্ম্মের ভোগ ও প্রতিবিধানের জন্য) ঘোরতর বস্তুবাদী হয়ে উঠি যার থেকে মুক্তিলাভ এই ত্রিপুর অভিমান থাকতে সম্ভব নয়। এই ত্রিপুর বা প্রকৃতি হতে আত্মা যে ভিন্ন এটা অন্ততঃ বুঝতে হবে। (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহই ত্রিপুর) সেটা বোঝার একমাত্র উপায়ই হল স্থির প্রাণের উদ্বোধন বা পরমার্থ গতি বা ব্রহ্মবিদ্যা(Theosophy)\ ১৮/১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম।।১৩

অনুবাদ:হে মহাবাহো, সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত সাংখ্যে কৃতান্তে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বেদান্ত সিদ্ধান্তে কথিত বক্ষ্যমান পাঁচটি কারণ আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৮/১৩

ব্যাখ্যা: আগে ৯ম শ্লোকে কর্ম্মকে অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করে নিত্য অনুষ্ঠান করতে বলা হল, ১০ম শ্লোকে কুশল ও অকুশল কর্ম্মে সমজ্ঞানের কথাও বলা হল, ১১শ শ্লোকে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নয় বলা হল এবং ১২শ শ্লোকে সকাম ব্যক্তিদের ত্রিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করতে হয় বলা হয়েছে। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে কর্ম্ম যদি করণীয় ও কর্ত্তব্য হয় তবে তা করাই গেল কারণ দেহীকে কর্ম্ম করতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তার কর্ম্মফল ভোগ হবে না কেন ? এরই উত্তরটা সহজবোধ্য করতে ভগবান

কর্ম্মবিজ্ঞানের এই দিকটা কর্ম্মের পাঁচটি কারণ সহ বুঝিয়েছেন যে সঙ্গত্যাগী নিরহঙ্কার ব্যক্তির কর্ম্মলেপ হয় না। সর্ব্ব কর্ম্মের নিষ্পত্তির জন্য বক্ষ্যমান পাঁচটি কারণ পাঁচটি শ্লোকে বিবৃত হয়েছে যেটা সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা বলা হয়েছে। অনাত্মবস্তু মিথ্যা। একমাত্র আত্মবস্তুই সত্য, এক এবং অদ্বিতীয়। যা কিছু এই আত্মজ্ঞানের আবরক সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ যে শাস্ত্রপাঠে হয় সেটাই সাংখ্যশাস্ত্র। এই জ্ঞানলব্ধ কর্ম্ম কৃত হলেই কর্ম্মের অন্ত বা সমাপ্তি হয় সেজন্যই সাংখ্যকে কৃতান্ত বলা হয়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় "ক্রিয়া, কারক এবং ফল অজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাতে আরোপিত হয়, যে অজ্ঞ সে অধিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদক কারণগুলিকেই আত্মা বলিয়া বুঝে তাহার পক্ষে অশেষরূপে কর্ম্মসন্ন্যাস সম্ভব হয় না।" তত্ত্বগতভাবে অনাত্মজ্ঞান যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই কারণগুলোকে জানতে পারলেই আর আত্মবিস্মৃতি ঘটে না। আর ব্যবহারিক ভাবে ওঁ কার ক্রিয়ার সাহায্যে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ না হওয়া অবধি "তৎ" ও "সৎ" এর ধারণা হয় না। "তৎ" ও "সৎ" এর অভেদজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান যার সম্বন্ধে আগেই ভগবান বলেছেন "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ॥ ১৮/১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ।। ১৪

অনুবাদ: শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা (প্রাণাপানাদির ব্যাপার) এবং দৈবই এস্থলে পঞ্চম ॥১৮/১৪

ব্যাখ্যা: কর্ম্মের কারণ পঞ্চক – (১) অধিষ্ঠান: সকল কাজের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ধারক একটি আধারের প্রয়োজন হয় সেই আধার বা অধিষ্ঠানটাই হল এই শরীর। এই আধারকেই আশ্রয় করে সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাঁর জন্য হয় মানে যাঁর প্রয়োজনে হয় তিনিই হলেন (২) কর্ত্তা: যিনিই চিদাভাস বা জীব। যদিও ইনি চিৎ নন কিন্তু আত্মার সাথে অধ্যাসযুক্ত হওয়ায় নিজেকে চেতন বলে মনে করেন মাত্র। এহেন ভ্রান্তিকেই দর্শনশাস্ত্রে অহংকার বলা হয়েছে, ইনিই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা। কর্ত্তার মনে সংকল্প উদয় হলেই বুদ্ধি কর্ত্তব্য স্থির করে দেয় এবং (৩) ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়েই কার্য্য উৎপন্ন করে। ইন্দ্রিয়নামক যন্ত্রগুলি পরিচালনা করেন (৪) প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। এই চতুর্বিধ উপাদান দ্বারা কার্য্য উৎপন্ন হয়ে নিষ্পন্ন হওয়ার পর আসে (৫) দৈবের কথা যিনি হলেন ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর, অনুগ্রাহক দেবতা বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার। অহংকার এমনতর সংস্কারের অনুরূপই হয়ে থাকে। বেদে আছে ব্রহ্মের সংকল্পই "একোহহং বহুস্যাম" এই বিরাট বিশ্বপ্রকাশের মূল কারণ। ভাগবতে ব্রহ্মাও বলেছেন (৫/১/১৫) – "চতুষ্পদাদি জন্তুগণ নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মনুষ্যের জন্য তাহার ইচ্ছামত যেমন কার্য্য করে, আমরাও সেইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করি।" অতএব জীবের প্রথম অদৃষ্ট তৈরী হয়েছে ব্রহ্মের সংকল্পদ্বারা। এটাই তার মহানিয়তি বা দৈব যেটা ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার রূপে প্রাণের স্পন্দনদ্বারা মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই হল দৈব। কিন্তু পুরুষকার ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না। বীজের ভিতর সকল শক্তি থাকা সত্ত্বেও যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র বিনা সে শক্তি প্রকাশ হয় না তেমনি অদৃষ্ট বা দৈব বীজশক্তি হলেও ক্ষেত্রে কর্ষণাদিরূপ পৌরুষ ছাড়া দৈব সফল হয় না। তাহলে আমাদের কাজের কর্ত্তা নিরূপণ করতে হলে দেখা যায় (১) দেহ বা অধিষ্ঠান, (২) ইন্দ্রিয়াদি করণ, (৩) প্রাণাপানাদির চেষ্টা, (৪) কর্ত্তা বা অহংকার এবং (৫) দৈব – বা মহানিয়তির প্রেরণা। এই পাঁচটা কারণ বা উপাদান মিলেই কাজটা হয় ঠিকই কিন্তু আত্মা কোনও কিছুর কারণই নন, শুধুই সাক্ষী বা দ্রষ্টামাত্র। আত্মাই যখন অকর্ত্তা আর পুরুষকারেরও স্থান আছে, দৈব যতই অখণ্ডনীয় হোক না কেন, অতএব সদগুরু উপদেশে পুরুষকারকে সেই মত কাজে লাগিয়ে দৈবকে অতিক্রম করে আরও উন্নততর ও মহত্তম পর্য্যায় লাভও সম্ভব ॥ ১৮/১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫

অনুবাদ: মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই পাঁচটি তাহার হেতু ॥ ১৮/১৫

ব্যাখ্যা : শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায়, ধর্ম্ম–অধর্ম্ম, যে কোনও কর্ম্মই করা হয় তার হেতু সেই আগের শ্লোকের বর্ণিত করণ পঞ্চক। জীবের সঙ্গে এই পাঁচটা কারণের সম্বন্ধ বিচার করলে দেখা যায় যে জীব স্বয়ং চিদংশ। সুতরাং তার কর্ম্ম নেই। প্রকৃতিই কর্ম্মসকল করে কিন্তু মাঝখান থেকে জীব প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান করে সুখ দুঃখাদিতে জড়িত হয় মাত্র। তা নইলে কোনও সুখ, দুঃখে, জড়াতে হয় না। তাহলে পাঠক প্রশ্ন করবেন জীবকে কর্ত্তা না বলে আগের শ্লোকে অহঙ্কারকে কর্ত্তা বলা হল কেন ? উত্তরটা হল এই যে অহঙ্কারটা হল প্রাকৃত বস্তু কিন্তু ব্রহ্মের চৈতন্যে সেও চেতন বলে মনে হয়। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ সত্যিকার চাঁদ নয় তেমনই মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। তাহলে ঐ মায়াটা কি ? ঐ মায়াটাই হল ব্রহ্মার অঘটন-ঘটন পটিয়সী শক্তি যার ব্যাখ্যা আগেও বহুবার করা হয়েছে। এই মায়াশক্তির দ্বারাই বিশ্বলীলা বারবার যুগেযুগে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। তবে কি এ মায়ার হাত থেকে রেহাই নেই ? নিশ্চয়ই আছে। মায়াশক্তি যদিও নিতান্তই দুস্তরা, কিন্তু নিত্যা (universal) নয়। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলেই এই মায়া কেটে যায়। জড়ত্বের দিকে দৃষ্টি থাকলেই নিজেকে বদ্ধ দেখা যায়, আবার চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই সে বাঁধন খসতে শুরু করে ॥ ১৮/১৫

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ।।১৬

অনুবাদ: এরূপ হইলে যে ব্যক্তি (নিঃসঙ্গ) আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে, অপরিমার্জিত বুদ্ধিহেতু সেই দুর্ম্মতি সম্যক্ দেখিতে পায় না ৷৷ ১৮/১৬

ব্যাখ্যা: যেহেতু দেহাদি পাঁচটি করণের দ্বারাই কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, সেই জন্য যিনি শুদ্ধ অকর্ত্তা আত্মাকে অসংস্কৃত বুদ্ধিহেতু অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকরণ দ্বারা ক্রিয়মান কর্ম্মের কর্ত্তা বলে মনে করেন, সেই ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শী নন, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব অবগত নন। আগের দুটো শ্লোক থেকেও বোঝা গেল যে করণপঞ্চক অর্থাৎ শরীর, মন, অহঙ্কার, ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দৈব সংযোগে কর্ম্ম সম্পন্ন হলেও আমরা কিন্তু আত্মাকেই ঐ কর্ম্মের কর্ত্তা বলে মনে করি, এটাই সব চেয়ে বড় ভুল বা'দুর্ম্মতি'। শরীর মন ইত্যাদির দ্বারা ভালোমন্দ সবকিছু করেও বলে থাকি আত্মাই সবকিছু করছেন, আমি আর কে ? এটাই সব থেকে বড় দুর্ম্মতি। কারণ আত্মা না থাকলে ঐ করণ পঞ্চকের কর্ম্ম করার সাধ্য নেই ঠিকই। আত্মার শক্তিতেই ঐ পাঁচজন কাজ করে বটে কিন্তু যেহেতু আত্মা অসঙ্গ, মুক্ত, সকল ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত তাই কর্ম্ম তাঁকে স্পর্শই করতে পারেনা, ঠিক যেমন পদ্মপাতায় জল। মন বুদ্ধির কর্তৃত্বভাব আত্মায় চাপিয়ে দিলে আর আত্মার অকর্তৃত্বভাব বোঝা যাবে কি করে ? ঘরে বিদ্যুৎশক্তির জোগান থাকলেও তা দিয়ে আলো জ্বালালে বা পাখা চালালেও সে সবের কোনওটাই কিন্তু কিদ্যুৎ শক্তির ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হয় না, যদিও বিদ্যুৎ শক্তির অস্তিত্বেই এসব কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। আত্মার এহেন অসঙ্গত্বটা কিন্তু ক্রিয়া না করলে বোঝা যায় না, জানাও যায় না। আত্মার আসক্তি না থাকায় কোনও কর্ম্মেই যে তাঁর অভিমান থাকা সম্ভব নয় এটা বুঝতে না পারাই দুর্ম্মতি। তা নইলে আত্মাই যে সবকিছু এটা মনে করায় দোষের কিছু নেই। "অকৃতবুদ্ধি"–মানে যারা ক্রিয়াকরে স্থিরত্বলাভ করেননি তাঁদের প্রকৃত বুদ্ধি নেই, তাই আত্মা স্বতঃশুদ্ধ হলেও তাঁদের অশুদ্ধভাব (ভ্রান্তি মোহ) ছাড়েনি, তাই বুদ্ধিও স্থির হয়নি, আত্মদর্শনও হয়নি। নিজে যে আসলে কে ? কি তার রূপ ? এটুকুও না জেনে জীবনভর শুধু ছোটাছুটি করে বেড়ালে বা গেরুয়াধারী বা সৌম্যরূপের পিছনে ছুটে বেড়ালে সেও তো মায়াকেই স্বীকার করা হল। এতে জড়ের প্রসারতাই লাভ হয় মাত্র তাতে প্রকৃত চৈতন্যের ক্ষীণতা ঘটে। একমাত্র ক্রিয়া করে পরাবস্থায় পৌঁছাতে পারলেই স্থির ঘরে মানে চৈতন্যে প্রবেশলাভ হয় ও সব কিছুই পরিষ্কার হয়। তখন পরিষ্কার চোখে আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নেই। এটাই প্রকৃত শুদ্ধভাব। প্রকৃত দীক্ষালাভ হলে এমনতর শুদ্ধত্বই লাভ হয়। নইলে অদীক্ষিতের হাতের জল শুদ্ধ নয়, বা পূজার কাজ সে করতে পারবে না এসব কথা প্রকৃত অর্থ না বুঝে শুধু শুনে শুনে চলে আসছে ৷৷ ১৮/১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭

অনুবাদ: যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এইরূপ ভাব নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি (ইষ্টানিষ্ট বোধে) লিপ্ত হয় না, তিনিই এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তাহার জন্য নিবদ্ধ হন না ৷৷ ১৮/১৭

ব্যাখ্যা: দুর্ম্মতির ব্যাখ্যা তো আগের শ্লোকে করা হল। আত্মজ্ঞানের অভাবই এক কথায় দুর্ম্মতি। এমন অর্থে তো সকলেই দুর্ম্মতি, তবে সুমতিটা কে ? এরই উত্তরে ভগবান বলছেন যাঁর কর্ম্মলেপ হয় না সেই সুমতি। কর্ম্মলেপ কার হয় না ? যাঁর "অহং কর্ত্তা" ভাব নেই এবং গুণ বিবর্ত্তনের মধ্যে থেকেও যে নিজেকে একান্ত অসঙ্গ দেখতে সক্ষম তাঁরই কর্ম্মলেপ হয় না। তখন সে হত্যা করেও আমি হত্যা করলাম এমন বুদ্ধিতে লিপ্ত হয় না। কেননা সে আত্মাকে একান্ত অসঙ্গ বলেই উপলব্ধি করে এবং তেমন বুদ্ধি উৎপন্ন না হওয়ায় সেই কর্ম্মের ফলোৎপত্তি ও ফলভোগ তার ঘটে না। এ বিজ্ঞান সহজ বোধগম্য। ফল যখন অনুভূতির তারতম্যে সমুৎপন্ন হয়, তখন যে অসঙ্গ আত্মদ্রষ্টাকে হত্যাক্রিয়ার ফলভোগ করতে হবে না এটাই সুসিদ্ধ। এটা ভালমত বোঝাবার জন্যই আগে কর্ম্মের পঞ্চবিধ করণের উল্লেখ করা হয়েছে নইলে বিষয়টা বুঝতে না পারলেই জড়বাদী ও চিন্তাশক্তিবিহীনগণের নিকট হাস্যকর বলে বোধ হবে কারণ "হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।" কথার অর্থই বোধগম্য হবে না। ভগবানে সমবস্থিত জীবের অদৃষ্ট, সংস্কার, তার কর্তৃত্ববোধময় পুরুষত্ব ও করণময় শরীর একত্বে বিধৃত হয়ে বিবিধ চেষ্টা বা কর্ম্মসম্পাদন করে থাকে। সে সমস্ত কর্ম্মাবর্ত্তনের মধ্যেই নিজ বোধরূপ সেই পুরুষ পরমার্থতঃ অসঙ্গ হলেও ক্ষরণশীল হয়ে কর্ম্ম করতে বাধ্য হয়। আর কর্ম্ম করতে গেলেই অহঙ্কারাদি ভাবের উদয় হয়। সুতরাং কর্ম্মফলও পেতে হয়। অতএব মূল সাধনাটাই হল অসঙ্গ আত্মবোধের সাধনা। অসঙ্গ বুদ্ধি দ্বারাই কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল ভোগ, এই উভয়কেই আপনা হতে পৃথক বলে দেখার সাধনা করতে পারে। পাঠক প্রশ্ন করবেন কিন্তু কর্ম্মফল পেতে হবেনা এটা কি করে সম্ভব ? সুতরাং এ শ্লোকের অর্থ আরও বিশ্লেষণ করতে হবে। "নাহংকৃতো ভাবঃ" শব্দের দ্বারা ভগবৎ কর্তৃত্ব এবং নিজের অকর্তৃত্ব দর্শনের কথাই বলা হয়েছে। আর কর্ম্মের পঞ্চম কারণ হিসাবে যে "দৈব" শব্দটার উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হল ভগবানে সংস্থিত জীবের অদৃষ্ট সংস্কার। অতএব শরীর ধারণ ও কর্ম্ম করা সবটাই ভগবদিচ্ছাধীন এবং ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন জগৎ কর্তৃত্বের ধারণায় অহংবুদ্ধি নাশ হয় ঠিকই কিন্তু তাতেও কর্ম্মের ফল থেকেই যায়। সে জন্য কর্ম্ম ভগবানের দ্বারাই হচ্ছে, আমি তার অসঙ্গ দ্রষ্টা এবং ভোক্তা হয়েও অভোক্তা এমন বুদ্ধি হলে তবেই আর কর্তৃত্বও থাকে না, ফলও প্রসব করে না। কারণ কর্তৃত্ব যার ফলও তারই। পরমেশ্বর আপনিই কর্ম্ম এবং আপনিই ফলরূপে প্রকাশিত হন বলে

তাঁর কোনও ফলাধীনতা নেই। আগুন যেমন আগুনকে পোড়ায় না তেমনি তাঁর কর্ম্মও তাঁকে ফলভোগাচ্ছন্ন করেনা। মনে রাখতে হবে ভগবদবোধশূন্য শুধুমাত্র অসঙ্গত্বের দর্শন কিন্তু শরীরীর কর্ম্মফল ভোগ রোধ করতে পারেনা, সেটা সম্ভবও নয়। ভগবৎকর্তৃত্ব দর্শনযুক্ত যে অসঙ্গবোধ সেটাই কর্ম্মফলভোগকে নিরস্ত করে। কিন্তু সমস্যাটা হল শুধু কথায় তো আর চিড়ে ভেজে না। মুখে অনাসক্তি দেখানো বা সেই ভাবে কর্ম্ম করতে যাওয়া সেও তো অহংকারেরই নামান্তর। আর অহংকাররূপ কর্তৃত্বাভিমান থাকলেই কর্ম্মফলে বুদ্ধি লিপ্ত হয়। সেজন্যই যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বশিষ্টদেব রামকে বলেছেন, "হে রাম, তুমি বাহিরে রাজা সাজিয়া রাজ্য শাসন কর, কিন্তু ভিতরে অকর্ত্তা বলিয়া আপনাকে বুঝিও।" বার বার ক্রিয়ার পরাবস্থায় থেকে থেকে বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ এতই শুদ্ধ ও সুন্দর হয় যে কোন মতেই আর কর্তৃত্বভাব থাকে না, বুদ্ধিও কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, সে জন্যই সকল কর্ম্ম করেও সেই কর্ম্মজনিত ফলে যোগী হৃষ্ট বা তাপিত হন না। কেননা তাঁর বুদ্ধি তখন শরীর ইন্দ্রিয়ের আচারের সাথে মেলে না, ঠিক মাতাল যেমন মদের নেশায় দেহাভিমানশূন্য হয়ে যায়। যোগীরও তেমনি বুদ্ধি অভিমানরহিত হয়ে পুরোপুরি নিরহঙ্কারভাব লাভ করে। তখন হনন বা অহনন কোনও কর্ম্মেই লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। আত্মার শুদ্ধরূপে কোনও অধ্যাস নেই। মান্ডুক্য উপনিষদেও আছে (৭ম মন্ত্র) "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মাঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।" জগদ্বিকাশের নিবৃত্তিরূপ, বিকারশূন্য, মঙ্গলময়, দ্বিতীয়ের অভিনিবেশশূন্য, জাগ্রদাদি পাদত্রয় হতে ভিন্ন যে আত্মা তাকেই জানতে হবে। এটাই আসল জ্ঞান। এই জ্ঞান হলেই আর ক্রিয়াও থাকে না কর্ত্তাও থাকে না। এ অবস্থায় না এলে শুধু মুখে বললে বা মনে মনে ভাবলে "আমি কর্ত্তা" এটা যেমন মনোভাব, "আমি কর্ত্তা নই" সেটাও তেমনই আর একটা মনোভাব। অহংকার বর্জিত আত্মজ্ঞ পুরুষের এমন কোন ভাবই থাকে না'সু','কু' কোনও কর্ম্মই আর থাকে না। কেউ নিষেধও করেনা। ঈশ্বর সকলের বুদ্ধিস্থ হয়ে সব কর্ম্ম করাচ্ছেন। যদি ঈশ্বরই সব কর্ম্ম করান তবে আর আমি ফলভোগ করে মরি কেন ? "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে" পরেই ৬১ নং শ্লোকে আছে "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" কর্ম্মফলবাধকত্বের এমন উৎকর্ষতা কর্ম্মযোগে রয়েছে বলেই অবিজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্ত মায়াবাদকেই সন্ন্যাসবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং কর্ম্মবিজ্ঞান সমুচ্চয়ময় গার্হস্থ্যাশ্রমধর্ম্মেই সাধনার শ্রেষ্ঠতা বলে গীতায় বলা হয়েছে। অপরোক্ষানুভূতি না হলে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করা সম্ভব হয়না। এমনতর অনুভূতির অভাবেই বর্ত্তমানে সন্ন্যাসেও পেশাদারিত্ব লক্ষ্য করা যায় ॥ ১৮/১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ।।১৮

অনুবাদ: জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু। করণ,কর্ম্ম এবং কর্ত্তা এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয় ॥ ১৮/১৮

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকের মর্ম্মার্থ দাঁড়াল কর্ম্মে কর্তৃত্বভিমান না থাকলে বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। সুতরাং বন্ধনত্ব হয় না, ফলে কাউকে বিনাশ করেও বিনাশ করা হয় না, বন্ধনও থাকে না। বিষয়টাকে, মানে কর্ম্ম জিনিষটাকে, আরও পরিস্ফুট করে বোঝবার জন্য কিভাবে কর্ম্মের উদয় ও প্রতিষ্ঠা হয় সেটাই বর্ণনা করছেন। কর্ম্ম উদিত হয় ত্রিমূর্ত্তিতে – জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বুদ্ধির এই ত্রিপুট রচিত হয়ে কর্ম্মের প্রকাশ হয়। এতেই কর্ম্মের জন্ম। কর্ম্ম প্রকাশ হওয়া মানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এ তিন জ্ঞান প্রকাশ তাতে থাকবেই। আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই ত্রিপুটই কর্ম্মের পরিণতি। এভাবেই কর্ম্ম সঞ্চিত হতে থাকে। বুদ্ধির সাত্ত্বিক অংশটা আত্মসংযোগে জ্ঞাতা মূর্ত্তিতে থাকে, রাজস অংশটা জ্ঞানক্রিয়া আকারে, এবং তামস অংশটা জ্ঞেয় আকারে পরিস্ফুট হয়। এটাই আবার বিশিষ্টভাবে ক্রিয়া মূর্ত্তিতে এলে করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই আকারে পরিস্ফুট হয়। তাহলে কর্ম্মের উদয়টা জ্ঞানপ্রধান আর স্থিতিটা ক্রিয়া প্রধান। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনের সংযোগে কর্ম্ম শুরু হয়। এরাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং কর্ত্তা কর্ম্ম ও করণ। এরাই ক্রিয়ার আশ্রয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কেউ যোগতত্ত্বটা জানতে ও যোগাভ্যাস করতে চায়। তাহলে প্রথমেই যোগের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে হবে। নইলে তো যোগের নামে অন্য কিছুরও তো অভ্যাস করতে পারি। অতএব যোগসম্বন্ধীয় আবশ্যকতা বোঝাটাই হল জ্ঞান, যোগ পন্থাটাই হল জ্ঞেয় বস্তু। এই জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে তিনিই আমার পরিজ্ঞাতা এবং আমি যখন এই যোগবিষয়ে উপদেশ পেলাম তখন আমিও সেই যোগের জ্ঞাতা হলাম। এই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাই কর্ম্মের চোদনা, এ থেকেই ক্রিয়ার প্রেরণা আসে। তারপর কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ – এরা হল কর্ম্ম সংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। মানে যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তা যখন স্থির হয়ে গেল তখনই সাধন কার উপর নির্ভর করে সম্পন্ন হবে দেখা যাক–(১) যাদের দ্বারা এই যোগসাধিত হবে সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলো এবং প্রাণ এখানে করণ, (২) গুরুর ইচ্ছায় ও নির্দ্দেশমত প্রাণায়াম আসনাদি যোগক্রিয়াগুলো এখানে কর্ম্ম। (৩) আর যিনি ক্রিয়া করবেন সেই অন্তঃকরণ বা সেই অহং অভিমানী জীবই কর্ত্তা। এ তিনটের উপর ক্রিয়া করা নির্ভর করে বলেই এ তিনটেই হল ক্রিয়ার আশ্রয়। অতএব সংক্ষেপে (১) জ্ঞান অর্থে কূটস্থ ব্রহ্মের জ্ঞান, (২) ক্রিয়াদ্বারাই এই ব্রহ্মবস্তুকে জানা যায়, সেটাই কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু, এবং (৩) পরিজ্ঞাতা, যিনি জানবেন তিনিও ঐ কর্ম্মের দ্বারাই জানবেন। তাহলে করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা তিনটেই ক্রিয়ার আশ্রয় মানে ক্রিয়া করে কূটস্থ ব্রহ্মে যাওয়া। এই ব্রহ্মই প্রকৃত কর্ত্তা যাঁর অপ্রকাশে সকল কর্ম্মই রহিত হয়ে যায় ॥ ১৮/১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।। ১৯

অনুবাদ: জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণভেদবশতঃ ত্রিবিধই কথিত হয়, সে সকলও গুণানুসারে শ্রবণ কর ॥ ১৮/১৯

ব্যাখ্যা: আগেই বলেছিলাম যে উপনিষদপ্রধান অংশদ্বয় দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা শেষ। এখন এই তৃতীয় অংশ বা শেষ ছয় অধ্যায় গুণ ও কর্ম্মবিজ্ঞান প্রধান। কর্ম্মবিজ্ঞান বলাই এই তৃতীয় অংশের উদ্দেশ্য।‘গুণসংখ্যানে’ অর্থ সাংখ্যশাস্ত্রে। সাংখ্যমত অনুসারে একমাত্র আত্মাই নির্গুণ, আর সকলই ত্রিগুণাত্মক। অর্থাৎ আত্মা অকর্ত্তা হলেও গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তারও ত্রিবিধ অবস্থা হয়। সুতরাং এই কর্ত্তা মোটেই গুণাতীত নন বরং ত্রিগুণযুক্ত। বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা, সাধনদ্বারা এই অভ্যাস চৈতন্য যখন শুদ্ধ হয়ে যান তখন তিনিও অকর্ত্তাই হয়ে যান। সাধনদ্বারা চিত্তবৃত্তির সম্যক নিরুদ্ধ অবস্থা হলেই এটা সিদ্ধ হয়, এটাই কৈবল্যাবস্থা। কিন্তু সাধনদ্বারা এমন নিরুদ্ধ অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের স্পন্দন হেতু চিত্তেরও স্পন্দন হতে থাকে ফলে ইন্দ্রিয়যুক্ত চিত্ত বিষয়জ্ঞানের করণ বা দর্শনশক্তি রূপে কাজ করে। আর এমনতর চিত্তের সাথে মিলে মিশেই আত্মারও ভোক্তৃত্বভাব হয়ে থাকে। এই ভোক্তৃত্বভাবই অভিমান থেকে জাত। মানে চিত্তের মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় সেটাও অভিমানেরই রকমফের মাত্র। সে জন্যই বুদ্ধিবৃত্তির সাথে পুরুষ যেন অভিন্নভাবে অবস্থিত বলেই মনে হয়। তাই নিরুদ্ধ অবস্থায় স্বরূপে অবস্থান হলেও, ব্যুত্থিত অবস্থায় আবার সেই বিষয়রূপেই বোধ হয়। সেজন্যই অস্তিত্ব থাকলেই তার কর্তৃত্ব থাকতে দেখা যায়। আত্মার এমন বহুভাবে প্রকাশটাই হল তাঁর মায়া বা লীলা যাই বলা যাক, যে ভাবেই বলা যাক। নইলে ভেবে দেখ দ্রষ্টা ও তুমি একই বস্তু, মাঝখান থেকে মন এসে তিনগুণের প্রভাব খাটিয়ে সব কিছুকেই কেমন দুর্ব্বোধ্য দুর্জ্ঞেয় করে তুলেছে। তাই তো এসব দৃশ্যবস্তুর দর্শনেই আবৃত থাকি, স্বরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়া আর হয়ে ওঠে না। যোগযুক্ত হতে হলে তাই সেই অভয়া-চিতি-শক্তির নিকট আত্মনিবেদন করতে হয়, শরণাগত হতে হয়, তবেই যোগযুক্ত হওয়া যায়। এমনতর শরণাগতি বিনা যোগাভ্যাস হয়না সে কথা **১৭শ** শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। শরণাগতি এলে তবেই এ বাহ্য জগৎ যে তোমার আত্মারই প্রকাশ সেটা বুঝতে পারবে, যে লীলায়‘তুমি’‘আমি’ বাহ্য জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছি। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ ভেদে এই ত্রিগুণের কতরকম খেলা যে হয় সেটা এবার লক্ষ্য করুন, ভগবান দেখাচ্ছেন ॥ ১৮/১৯

সর্বভুতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।।২০

অনুবাদ: যাহা দ্বারা বিভক্তরূপ, সর্ব্বভূতে অবিভক্ত, এক, বিকারহীন ভাব, অবলোকিত হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে ॥ ১৮/২০

ব্যাখ্যা: এখন জ্ঞানের ত্রৈবিধ্য বর্ণনা। তিনটে শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আত্মজ্ঞানের আভাস পেলে এই নানারূপে বিভক্ত জীবক্ষেত্রে প্রতি ভূতের অন্তরে অন্তরে যে নিজত্ব বা আত্মবোধ রয়েছে সেটা যে এক ও অবিভক্ত ভাব এবং শুধু ভাবমাত্রই নয়, এক অবিভক্ত আত্মতত্ত্বই বিভক্তরূপে ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত আছেন এটাই প্রত্যক্ষ হতে থাকে। যে জ্ঞানের দ্বারা এটা প্রত্যক্ষ হয়, তাইই সাত্ত্বিকজ্ঞান। আপাততঃ আমাদের যে জ্ঞান আছে তাতে বস্তু সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে থাকি কিন্তু সেই সব অসংখ্য বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা অখণ্ড, অবিভক্ত চিৎসত্তা (চেতন বস্তু) বর্ত্তমান, যেটা সর্ব্বদাই দ্বৈতবিবর্জিত। একমাত্র সাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারাই এমনতর অদ্বিতীয় বস্তুটাকে উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন স্পন্দনশক্তি বহির্মুখী হয়ে বস্তুগুলোর ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গভাবকে উপলব্ধি করে মাত্র। ইন্দ্রিয় সকলের বিভিন্ন রকম ও বিভিন্নমুখী স্পন্দন (frequency) শক্তিগুলোকে একত্রে এনে সংপিণ্ডিত করে একটা নূতন মধ্যবর্ত্তী স্পন্দনশক্তিতে (intermediate frequency) এনে একমুখী (unidirectional) করতে হবে। এভাবে ইন্দ্রিয়গণের একীকরণ (unification) এবং একমুখীকরণ করতে পারলে (unidirection) ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ বৃত্তি সম্পূর্ণ নিরস্ত না হলেও দর্শনে একটা নতুনত্ব আসতে বাধ্য। দেশ, কাল, বস্তু দ্বারায় বিভিন্ন ভূত সকলের মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে যে সত্তা দৃষ্ট হন তিনি এক অখণ্ড নির্ব্বিকার এমন জ্ঞান জন্মালেই সেটাই হবে সাত্ত্বিকজ্ঞান এবং এমন সাত্ত্বিক জ্ঞান থেকেই পরমাত্মা সত্তা আলোচিত হতে পারে। সেটাই হল সম্যক দর্শন। ইন্দ্রিয়গণের একীকরণের (unification) দ্বারাই এমনতর (universal general existence) যাহা – সত্তা-সামান্য ভাব ফুটে উঠবে। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে চিরস্থির ভাবটাকে ধরতে হলে তরঙ্গভঙ্গকে(waves) যেমন প্রশমিত করতে হয় তেমনই আমাদের মন প্রাণ চঞ্চল বলেই ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ বৃত্তিকে নিরস্ত করা যায় না, তাই বহুজ্ঞান আর বহুত্বদর্শনও ঘোচে না। প্রাণক্রিয়া দ্বারা মনকে বশ করতে পারলেই যে এক অখণ্ড জ্ঞেয় বস্তুটা আপাততঃ বহু বলে মনে হচ্ছে সেটা আসলে বহু নয়, একই, এটা অন্ততঃ বুঝতে পারবে। শুধু তাই নয়, সাধন দ্বারা মনটাকে লয় করতে পারলেই এই জগৎ, জীব, মায়া, ঈশ্বর বা আত্মার সমস্ত রহস্যই বুঝতে পারবে – আর এটাই হল প্রকৃত সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বারাই সকল ভেদভাব লুপ্ত হয়ে অখণ্ড দিব্য চেতনার উন্মেষ হয়। সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে এক পরমাত্মারই পৃথকবিধ ভাবে অবস্থান বলে যদি বোধ হতে থাকে অথবা বিচার সিদ্ধ হয়ে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সেটাই হল সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান ॥ ১৮/২০

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভুতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ।।২১

অনুবাদ: পৃথকরূপে যে জ্ঞানে সর্ব্বভূতে পৃথগবিধ নানা ভাব জানা যায়, সেই জ্ঞান রাজস জানিও। ১৮/২১

ব্যাখ্যা: পৃথক বা অনৈক্যের (sense of disunity) জ্ঞানই রাজস জ্ঞান। আগে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরমাত্মার বাহ্য ও অন্তর দ্বিবিধ রূপের বর্ণনায় ও ব্যাখ্যায় চর-অচর ও পরা-অপরা প্রকৃতির বিষয়ে বলা হয়েছে। রাজস জ্ঞানে এই অতিসূক্ষ্মতা ধরা পড়ে না। রজোগুণটা প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াপ্রধান বলে জীবত্বের নাম রূপ ক্রিয়াময় (সচল) ভাবটাই এই গুণের দ্বারা গৃহীত হয়। নাম রূপ ও ক্রিয়াই পার্থক্যবোধক। সেই জন্য পৃথকত্বের জ্ঞানই রাজস জ্ঞান। ব্যবহার বা কাজের তফাৎই রাজসিক জ্ঞানে বিশেষভাবে গৃহীত ও সমালোচিত হয়। আগের শ্লোকে যে সাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেটা একমাত্র ক্রিয়ার পরাবস্থায়ই বোধ হয়। সেটা হল অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মস্বরূপের জ্ঞান যা ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হলেও এক ও নিরন্তর আকাশের মত। রাজস জ্ঞানে অমন বোধশক্তি না হলেও মনে মনে এমনতর একত্বের বিচারটা থাকে শুনে শুনে, সঙ্গগুণে, অথবা বই পুস্তক পড়ে বা যেভাবেই হোক। ফলে নানা বস্তুকে নানা ভাবে দেখে, আসক্ত হয়, বিরক্তও হয়, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী বলে বোধও করে। জ্ঞানের শুদ্ধতা না থাকায় এক ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ভাব মনে হলেও পৃথক দৃষ্টি নষ্ট হয় না, রজোগুণের চঞ্চলতা ধর্ম্মও নষ্ট হয় না ফলে একত্বের বিচার মনে মনে থাকলেও দ্বৈতভাব থেকেই যায়, ভিন্ন বোধও থেকে যায় আর দেহীকেও পৃথক বলে ধারণা করে। নানাভাববশতঃ অনেক অনেক ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অনুভূত হয়, ফলে কর্ম্ম ও ব্যবহার অংশও পৃথকভাবে দেখে থাকে। এমনতর দর্শন ও পৃথকত্ব অন্বীক্ষণ করাই রাজস জ্ঞানের লক্ষণ। রাজস জ্ঞানে পরমেশ্বর স্বগতভেদময়, বহু বহু, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মাময়, জীব ও পরমাত্মা চিরস্বতন্ত্র, এমন পৃথকত্ববোধক জ্ঞান বা অনুভব বর্ত্তমান থাকে ॥ ১৮/২১

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।। ২২

অনুবাদ: কিন্তু যাহা একমাত্র কার্য্যে পরিপূর্ণবৎ আসক্ত (এই দেহই আত্মা বা এই প্রতিমাই ঈশ্বর, এইরূপ বোধবিশিষ্ট) হেতুশূন্য পরমার্থবলম্বনহীন অতএব অল্প অর্থাৎ তুচ্ছ, তাহা (সেই জ্ঞান) তামস বলিয়া উদাহৃত হয়। ১৮/২২

ব্যাখ্যা: এবার ভগবান তামসজ্ঞান বিষয়ে বলছেন যে জীব সকলের স্থূল দেহাদিতে যে আত্মজ্ঞান সেটাই তামসিক জ্ঞান। হেতু দর্শনহীন, মাত্র কার্য্য বা ভূতের স্থূল ভাবটাতে যে জ্ঞান লিপ্ত থাকে তার মাঝে তত্ত্ব, কারণ ও উদ্দেশ্য কিছুই লক্ষ্য করে না, সেই স্থিতিপ্রধান, কৃৎস্ন, সত্তামাত্র দর্শনময়, সামান্যতম যে সংকীর্ণ জ্ঞানটি সেটাই তামসিক জ্ঞান। এক কথায় দেহসর্ব্বস্ব অবিবেকী জীবের যে জ্ঞান সেটাই তামসিক জ্ঞান যাতে সবটাই যুক্তি বিচার বিহীন মনমানা ধারণা অথচ সেই ধারণায় থাকে অটুট বিশ্বাস। আগের আগের অধ্যায়গুলোতে তমোগুণের এমনতর ক্রিয়ার কথা অনেকবারই বলা হয়েছে (১১শ অধ্যায় ৪৭ তম শ্লোক, ১৫শ অধ্যায় ১০ম শ্লোক ইত্যাদি)। কার্য্য, বস্তু বা ব্যক্তির মূল স্থিতিভাবটা নিয়েই যে বুদ্ধির প্রকাশ, সেটাই তমোগুণাত্মক তামসিক জ্ঞান। এমনতর বুদ্ধিতে দেহই আমি, মূর্ত্তি বা প্রতিমাই হলেন ঈশ্বর, যে কাজে টাকার সব থেকে বেশি আমদানি সেটাই সত্যিকার কর্ম্ম। এই রকম সব অযৌক্তিক পরমার্থ অবলম্বনশূন্য অতএব অল্পবিষয়ক বা অল্প ফলজনক বলে অতি তুচ্ছ যে জ্ঞান সেটাই তামসজ্ঞান বলা হয়েছে। বিনা অবলম্বনে ভগবৎ ধ্যান বা ভক্তি অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে হওয়ায় যোগীরা কূটস্থে প্রত্যক্ষীকৃত রূপের প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করে সাধনার অবলম্বন এনেছিলেন যাতে চৈতন্য সত্তার উপলব্ধি অনুভবগুলো যেন পূর্ণমাত্রায় সহজে হতে পারে। বহু সাধক পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীমূর্ত্তির স্পন্দন অনুভব করেছেন এবং পূর্ণচৈতন্যময় পরম পুরুষের সাড়া পেয়েছেন। এমনভাবে প্রতিমার জ্ঞানে ও ভজনে সত্যজ্ঞান আবৃত হয় না, সে পূজোও তামসিক হয় না। কিন্তু মূর্ত্তিপূজোর কথাও যদি সাধক ছাড়া অপরে জেনে ফেলে, লোক জানাজানি ও আড়ম্বরাদি হলেই সেটা লোকাচারসম্ভূত অনুষ্ঠান মাত্র হয়ে যায়। তখন আর সেই মৃৎ শিলায় কোনও রকম চৈতন্যের সাড়া পাওয়া যায় না, মানুষের অন্তরস্থিত চৈতন্য বা শুদ্ধভাব আর কোনও কিছুকেই জাগিয়ে তুলতে পারেনা, ফলে সেটা চরম তামসিক, অপদার্থ, পাপকর্ম্মে পরিণত হয় মাত্র। যেমন কালীপূজো, ডাকাতের ডাকাতির বা চোরের চুরির অবলম্বন হয়ে ওঠে। সেসব পূজোয় আবার মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যে পশুবলিও দেওয়া হয়। একইভাবে আত্মভাব অবলম্বনে অসমর্থ (জীবের) পুরুষের দর্শনধারী রমনীদেহের প্রতি আসক্তি অথবা কন্দর্পকান্তি পুরুষদেহের প্রতি নারীর আসক্তিও একই রকম স্থূলদেহে আত্মজ্ঞানজনিত তামস দেহবুদ্ধি থেকেই হয়। কর্ম্মের বিষয়েও অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যেই অর্থোপার্জন করতে হয় কিন্তু তাতে মনগড়া গ্ল্যামার বা অতিকথন যোগ করা হলেই সেটা তামসিকই শুধু নয়, রীতিমত পাপকর্ম্মে পরিণত হয়। কেউ দুপয়সা অতিরিক্ত আয়ের জন্য বেশি কাজ করতে পারেন কিন্তু রাজকর্ম্মচারী বা অপর কেউ সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তার জন্য বিশেষ ভাবে কাজ করে দেবার প্রচেষ্টা অবশ্যই অপকর্ম্ম এবং সেই অর্থ হল আসলে উৎকোচ যদিও মুখে মুখে সে কাজের পরোপকার নামক মোড়ক থাকে। এক কথায় জীবিকার্জনের অবলম্বনের অতিরিক্ত পথে আয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে যদি অপরের মঙ্গল অনুসন্ধান করতে হয় সে কর্ম্ম অবশ্যই তামসকর্ম্ম এবং চরম বঞ্চনা ও পাপ। এজন্যই ব্যাধের

জীবহত্যায় কর্ম্মবন্ধন না হলেও উদ্দেশ্য নিয়ে একটা জীব হত্যাতেও পাপস্পর্শ ও বন্ধন ঘটে (ব্যাধগীতা দ্রষ্টব্য)। এক কথায় কোন বিষয়েই স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য মনোমত ব্যাখ্যা দেওয়াটা তামসাধম অপকর্ম্ম। আর ভগবান বলতেও একটা জীববৎ মূর্ত্তি অথবা মনুষ্য অর্থে আয়তন মাত্রে একটা ব্যক্তি, এমন যে জ্ঞান যাতে তত্ত্বাদির জ্ঞান বিন্দুমাত্র প্রকাশিত থাকে না, সেটাই তামসিক জ্ঞান আর উপরের আলোচনাই হল তামসকর্ম্মের উদাহরণ (উদাহৃতম)। দৃষ্টান্তস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের কথা বলেছেন যাঁদের মতে জীব দেহ-পরিমাণ মাত্র এবং ঈশ্বরও কাষ্ঠাদি পরিমাণ মাত্র। এমন জ্ঞান অযৌক্তিক এবং সেটা সত্য প্রকাশ করতে পারে না তাই যারা ঐ রকম মত অনুসরণ করে তাদের পরমার্থের জ্ঞান থাকে না। তামসিকেরা কখনই সত্য বস্তুকে দেখতে পায় না কারণ তমোগুণের ধর্ম্ম জ্ঞানকে আবৃত করে রাখা। সে জন্যই বোধকরি জৈন, বৌদ্ধদের ভিতর বিজ্ঞানী দার্শনিক বড় একটা দেখা যায় না। যা হোক, তিনটে শ্লোকে পরমাত্ম সম্বন্ধে ও গুণানুসারে যে ত্রিবিধ বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিষয় জানলাম তাতে সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে এক পরমাত্মারই পৃথকভাবে অবস্থান বোধ ও বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান, আর পরমেশ্বর স্বগতভেদময়, বহু বহু স্বতন্ত্র আত্মময়, জীব ও পরমাত্মা চিরস্বতন্ত্র, এমন পৃথকত্ব বোধক জ্ঞানই রাজস। আর জীব অথবা ব্যক্তি মানে একটি দেহ বা আয়তন মাত্র, ভগবান মানে কোনও জীববৎ মূর্ত্তি অথবা পাষাণ শিলাদি, এবং কর্ম্মের অর্থই যখন কৃত্রিমতার অবলম্বন অথবা অভিনয়তুল্য কোনও কিছু, এমনতর যে জ্ঞান, যাতে তত্ত্বাদির জ্ঞান কিছুমাত্রও নেই, সেটাই হল তামস জ্ঞান ॥ ১৮/২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে। ।২৩

অনুবাদ: নিষ্কাম ব্যক্তি কর্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তিশূন্য, প্রীতি বা দ্বেষ–বশতঃ কৃত নয় এমন যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৮/২৩

ব্যাখ্যা : ত্রিবিধ জ্ঞান বা বুদ্ধির পর এখন তিনটে শ্লোকে ত্রিবিধ কর্ম্মের বিষয়ে ভগবান বলছেন। প্রথমে সাত্ত্বিক কর্ম্মের কথা। যে কর্ম্ম – (১) নিয়ত অর্থাৎ নিত্য অনুষ্ঠেয়। (২) সঙ্গরহিত মানে অভিনিবেশশূন্য। (৩) অরাগদ্বেষতঃ কৃত অর্থাৎ কারও প্রীতির জন্য বা কারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ কৃত নয়। (৪) অফলপ্রেপ্সু – অফলাকাঙ্ক্ষীর দ্বারা কৃত মানে নিষ্কাম কর্ত্তার দ্বারা কৃত– সেই কর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলে জানবে।

এখানে ইচ্ছারহিত, সঙ্গরহিত, রাগদ্বেষবিহীন, নিষ্কামভাবে নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি হতে পারে ? সাংসারিক কর্ম্ম তো আর অফলাকাঙ্ক্ষী বা নিষ্কাম কর্ত্তার দ্বারা সম্পন্ন হয় না, আবার নিত্য করণীয় উপাসনাদিও তো রাগদ্বেষযুক্ত হয়ে করা সম্ভব নয়। সুতরাং এমত কর্ম্মই হল গুরুপদেশ লভ্য প্রাণকর্ম্ম যা প্রতিনিয়তই ইচ্ছারহিত, সঙ্গরহিত, ফলাকাঙ্খারহিত হয়ে রাগদ্বেষবিহীন ভাবে হয়ে চলে। সাধক পুরুষের ক্রিয়া ব্যতীত কোন কর্ম্মই থাকে না তাই তাঁরা পূর্ণ ফলাকাঙ্খারহিত হয়ে যোগ সমাধি লাভ করেন। এটাই সঙ্গরহিত অবস্থা, এ অবস্থায় যে কর্ম্ম করা হয় তাতে আর কোনও রকম অভিনিবেশ থাকে না, অতএব দ্বেষ বা আসক্তির স্থান কোথায় ? কিন্তু প্রাণকর্ম্ম বহু পরিমাণে না করলে এমন অবস্থালাভ হয় না। তাই একমাত্র দৃঢ়াভ্যাসী সাধকেরই এইকর্ম্ম নিত্য অনুষ্ঠেয় হয়ে থাকে। আর অন্যেরা "কর্ম্মফলপ্রেপ্সু"। কারণ অধিকাংশই তো অমুক কতবেশি ক্রিয়া করে, আমারও করা চাই, অথবা অন্যদের তো বেশ দর্শন হয়, আমার তো কিছুই হয় না, তাহলে বুঝি আমার ক্রিয়াটা ঠিক হচ্ছে না। এমনতর ভাব নিয়ে ক্রিয়া করে চলে। তারা আর অফলপ্রেপ্সু হবে কি করে ? শ্বাসের গতি সুষুম্নামার্গে পরিচালিত হলে মন সহজেই স্থিরভাব ধারণ করে ও পরম শান্তিলাভ হয়, এটাই অফলপ্রেপ্সু অবস্থা যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে যোগীকে পুরোপুরি নিষ্কাম করে তোলে। এমন অবস্থায় কৃত কর্ম্মসকলই হয় সাত্ত্বিক কর্ম্ম ॥ ১৮/২৩

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ । ।২৪

অনুবাদ: ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বহু আয়াসযুক্ত যে কর্ম্ম করা হয় তাহা রাজস বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৮/২৪

ব্যাখ্যা : আগের অধ্যায়ের **১২শ** শ্লোকের ব্যাখ্যায় রাজসযজ্ঞের যে উপলক্ষ্যর (motive) কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বভাব সহকারে প্রচেষ্টাবহুল যে কর্ম্ম সেটাই রাজসকর্ম্ম। কামনা ও প্রবৃত্তি রজোগুণের ধর্ম্ম। আজকাল অধিকাংশ ক্রিয়ান্বিতেরই ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই অথচ এদিকে গুরুভাই বোনের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, প্রতি পূর্ণিমায় সৎসঙ্গ, কীর্ত্তন,গীতা সভার অনুষ্ঠান, ঘন ঘন ভোজ সভার আয়োজন, গুরুভাই বোন সহযোগে চড়ুইভাতি ইত্যাদি পুরো মাত্রায় আছে। আবার একটু কাছে থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ক্রিয়া যতটুকু হচ্ছে তার চেয়ে আড়ম্বর অনেক বেশি – আসন পাতা, স্থান পরিষ্কার, দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা, গলায় মালা, ফুলের থালা সাজানো, চন্দনের তিলক ফোঁটা, জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ এ সমস্তর ধূম দেখে কে ! সকলকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে হ্যাঁ এ বাড়িতে ক্রিয়ান্বিত আছে ও ক্রিয়া হচ্ছে। অথচ ক্রিয়া বিষয়ে কিছু জানতে বা বুঝতে চান, চটপট তৈরী করা উত্তর পাবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ওখানে চলুন সব

হয়ে যাবে, যার অর্থ আখড়ায় চলুন এবং আসর জমিয়ে তুলুন। ওরে বাপু, তার যদি সেটার সুযোগ থাকে তবে আর তোকে বলছে কেন ? বিদ্যার দান আছে ক্ষয় নেই। স্তোকবাক্য তৈরীই থাকে – জানেন তো, আমি এখন এসব বললে নিজে নিজে কর্ত্তা সাজা হয়, ইত্যাদি। অতএব আপনার গুরুভাই বোনেরা উচ্চক্রিয়ান্বিত বা ক্রিয়ান্বিতা হলেও তাতে মূলতঃ আপনার কোনও উপকারই হবার নয়। আড়ম্বর বহুল, প্রচার বহুল ও আয়াস সাধ্য এসব কাজ উপলক্ষ্য প্রসূত মানে ফলাকাঙ্খা সহিত যাতে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীরটা ভাল থাকে ইত্যাদি। এমন সব কর্ম্মই রাজস কর্ম্ম। রাজস কর্ম্মে উপলক্ষ্য সর্ব্বদাই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে থাকে। অধিকাংশ সম্প্রদায়ই সাধনা বিবর্জিত হয়ে ঘন ঘন সম্মিলনী, সৎসঙ্গ, উপাসনা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অনুষ্ঠানের ঘটা করে থাকেন যেগুলো আপাত মনোগ্রাহী হলেও মূলতঃ রজোগুণাধিক্যজনিত রাজস কর্ম্ম, সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য ॥ ১৮/২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে।।২৫

অনুবাদ: পরিণামে কর্ম্মবন্ধন, নাশ, পরহিংসা ও স্বকীয় সামর্থ্য – এই সকল পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৮/২৫

ব্যাখ্যা: এবার তামস কর্ম্মের কথা। আগের অধ্যায়ের **১৩শ** শ্লোকে তামস যজ্ঞের যে আশয়(motive), তামস কর্ম্মেরও সেই একই আশয় হয়ে থাকে। তামস কর্ম্ম মোহ পরিচালিতই হয়ে থাকে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, লাভ ক্ষতি না বুঝে, এতে অন্যের অনিষ্ট হবে কি না, বা কাজটা সম্পূর্ণ করা যাবে কি না এসব বিবেচনা না করে শুধুই মোহবশতঃ কিছু করলে সেটাই হয় তামস কর্ম্ম। মানুষের কর্ম্ম করার মোহ যে যথেষ্ট সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। নইলে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব তৈরী করা, বিভিন্ন দল গঠন সংস্কৃতি বা রাজনীতি ইত্যাদির আবরণে ও মোড়কে সংগঠিত হবার প্রবণতা এ সবই দেখিয়ে দেয় জীবের কর্ম্ম করার মোহ কত গভীর। এমনতর মোহের বশবর্ত্তী হয়ে, ফলাফল উপেক্ষা করে, ভালমন্দ বিচার না করে, আপাত লাভের আশায় অথবা সাময়িক আনন্দের বশে কোনও কিছুতে যোগদান করাই তামস কর্ম্ম। কর্ত্তার আশয় (motive) দেখে কর্ম্মের বিচার করতে হয়। শুদ্ধান্তঃকরণে কোনও কাজ শুরু করলেও বাইরে থেকে সেটা তামসিক বা রাজসিক মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নাও হতে পারে। যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুন যখন বলেন "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ" তখন সেটা আমাদের কাছে সাত্ত্বিক বলে মনে হলেও ভগবান সেটাকে বিচারবিমূঢ়তাপূর্ণ তামসিক কর্ম্ম বলেই গণ্য করেছিলেন। তামস কর্ম্মের দোষ এই যে তাতে একেবারে বিচার থাকেনা। শিশুদের ঘুম পেলে যেমন যেখানে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে তেমনই তামস কর্ম্মেও আগে পিছে জ্ঞান থাকে না। নেহাৎই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে, মোহ পরিচালিত হয়ে, মনের আবেগে করা হয়ে থাকে ॥ ১৮/২৫

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। ২৬

অনুবাদ: আসক্তিশূন্য, অহং এই অভিমানশূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহ যুক্ত, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বিকারশূন্য, কর্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন ॥ ১৮/২৬

ব্যাখ্যা: গুণভেদে ত্রিবিধ গুণানুসারী কর্ম্মের লক্ষণ বর্ণনার পর এখন সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয়ে তিনটি শ্লোকে ভগবান তিন রকম লক্ষণ বলছেন। সাত্ত্বিক যজ্ঞ, সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাত্ত্বিক কর্ম্মের পর এখন কর্ম্মের সাত্ত্বিক কর্ত্তা কে ? সাত্ত্বিক কর্ত্তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা ভগবান বলেছেন। (১) মুক্তসঙ্গ মানে ত্যক্তাভিনিবেশ অর্থাৎ আসক্তি ও ফলসন্ধানশূন্য। (২) অনহংবাদী – অহংবোধ বা গর্ব্বোক্তি রহিত। (৩) ধৈর্য্যবান ও (৪) উৎসাহযুক্ত মানে উদ্যমশীল এবং (৫) আরব্ধ কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার বা হর্ষবিষাদশূন্য। এহেন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্রিয়া সম্পাদক কর্ত্তা অবশ্যই ভগবৎকর্তৃত্বদর্শী। সুতরাং আত্মকর্তৃত্বটি তাঁদের অন্তরে অভিমান আকারে আড়ম্বরময় হয় না। সর্ব্বকর্ম্ম করেও কোনও কর্ম্মেই মোহজনক আসক্তি থাকে না এবং সে কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিরও হিসাব তাঁরা রাখেন না। অথচ পূর্ণ উদ্যমে, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সহযোগেই কর্ম্মসকল সম্পন্ন করে থাকেন। সাত্ত্বিক কর্ত্তার এটি অপূর্ব্ব লক্ষণ। গুরুর আজ্ঞা পালন করে চলেছি শুধুমাত্র এমনটি মনে করেই প্রত্যহ স্থিরভাবে ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত হয়ে ক্রিয়া করে যান। তাতে ক্রিয়া করে কিছু অনুভব হল কি না অথবা মন স্থির হল কি না এসব নিয়ে মোটেই ভাবেন না বা উৎসাহ উদ্যম মোটেই কমে না এমন কর্ত্তাই সাত্ত্বিক কর্ত্তা। আর এমনভাবে যিনি বিশেষ গুরুভক্তি সহযোগে ক্রিয়া করে চলেন তাঁদের ক্রিয়ার পরঅবস্থা বা সমাধি ইত্যাদি গভীরতর ভাবে উদিত না হলেও ক্রিয়ায় স্থিতি কিছু কিছু করে হয়ই এবং ক্রমশঃ ক্রিয়ার নেশাও বেশ জমে আসে, মনটাও যেন কোন অননুভবনীয় বিষয়ে আটকিয়ে যায়, বাইরের বিষয় তেমন মনে পড়ে না। মনটা অনেকক্ষণ বৃত্তিরহিত অবস্থায় স্থির হয়ে থাকে। গুরুর নির্দ্দেশে ক্রমশঃ ক্রিয়া করে গেলে ক্রমে ক্রমে মনটা কূটস্থেতে লেগে যায়। তখন সংসারের অবস্থাচক্রের যে পর্য্যায়ে বা স্তরেই তাঁর স্থান হোক, তিনি সমান ধৈর্য্যশীল, সমান নির্ব্বিকার, সমান আসক্তিবিহীন, অথচ সমান উৎসাহ উদ্যমময়, সমান আনন্দ শান্তিময়, হয়ে অবস্থান করেন এবং সমান প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ থাকে তাঁর সর্ব্বান্তর। তখন তিনি হন আত্মাশ্রয়ী, অন্যাশ্রয়ী নন। স্বয়ং ভগবান তাঁর আত্মা, এর চেয়ে বীর্য্য ও ধৈর্য্যলাভের সংস্কার জীবের আর কোথায় ? সাত্ত্বিক কর্ত্তার বিচারে তিনি আত্মাশ্রয়ী কতটুকু এটাই মূল

বিবেচ্য। আত্মাশ্রয়ী হয়েই সাত্ত্বিক ক্রিয়াবান ভগবান ও সংসারকে একত্রে গ্রথিত করে থাকেন। বহু কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখলেও কূটস্থে লক্ষ্য রাখতে তাঁর কখনও ভুল হয় না। কিন্তু আগেই বলেছি দেশে এখন একটা বিপরীত ভাব চলছে তাই মানুষেরও বিপরীত বুদ্ধিতে মোহ লেগেই থাকে। সদা সর্ব্বদাই মোহজনিত সংঘবদ্ধ হবার প্রবণতা। সে জন্যই দেখি ধর্ম্ম সাধনেও একটা দলবদ্ধ বা দলগত ভাব। এমনকি কীর্ত্তনেরও একটা করে দল হয়। দলবদ্ধ গেরুয়া বসনধারী হয়ে ভগবানের দোহাই দিয়ে মঠ-মিশনের সদস্যপদ নিলেই তাদের আমরা মহা সাত্ত্বিক পুরুষ ভেবে চরণধুলি মাথায় নিতে বিলম্ব করি না। সংসারে আর শান্তি নেই, শুধু ভগবানেই শান্তি আছে – এই জাতীয় সংসার ও ভগবানে ভেদবুদ্ধি সন্দর্শনকারীর বচনেই সুধার আগার দেখি। জানতে থাকি যে সংসার নাকি বিষ, অথচ সেই বিষপানেই তৎপরতা সমধিক। মায়াতে বিজড়িত অথচ বলছে "কে – কার" ? মোহে নিমজ্জিত অথচ মুখে আমি "আসক্তি বিহীন", তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত অথচ বলতে ছাড়েনা "বিষয় তুচ্ছ", এসবই একান্ত তামসিক ভাব, সাত্ত্বিকতার পরিচয় মাত্র আতপচাল খাওয়া অথবা ধর্ম্মধ্বজীভাবে ভীরুতা ও কুণ্ঠায় বিজড়িত "ভাল মানুষের" ভাবটিতে নয়। প্রকৃত সাত্ত্বিকের বীরের মত জীবন যায়, চিন্তাশূন্য হয়ে রণস্থলে বিচরণ করে। ফল কি হবে জানিনা, কর্ত্তা যিনি ফলের হিসাব তাঁর। আমি তাঁর অনুগামী সেনা মাত্র। উৎসাহই আমার জীবন, ধৈর্য্যই আমার সুদৃঢ় শরীর, কর্ম্ম আমার কর্ম্মব্রহ্ম ভগবানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। জীবভাবীয় নিজত্বের স্বার্থ এ কর্ম্মের মাঝে অস্তিত্বহীন – কর্ত্তাকে দেখা ও তাঁর অনুগমন করাই আমার কর্ম্ম, তৃপ্তি ও আনন্দ। এমন শান্ত, ধীর অথচ অসীম উৎসাহে ভরা প্রাণই হল নারায়ণী সেনা, এটাই সাত্ত্বিকের লক্ষণ। কোন ফলের আকাঙ্খা না করে কেবলই গুরুর উপদেশ মত সাধন করে চল, কিছু ফললাভ হোক বা না হোক সাধনায় কোনও দিনই অপ্রবৃত্তি আসে না, এমন প্রমাদ, আলস্যশূন্য সাধকই সাত্ত্বিক ক্রিয়াবান ও সুদক্ষ সংসারী, অতএব সব্যসাচী ॥ ১৮/২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।। ২৭

অনুবাদ: বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্খী, লুব্ধ, হিংস্র, অশুচি, লাভালাভে আনন্দ বিষাদযুক্ত কর্ত্তা রাজস নামে খ্যাত ॥ ১৮/২৭

ব্যাখ্যা: ভগবান এই শ্লোকে রাজস কর্ত্তার লক্ষণ বর্ণনা করছেন। বিষয়ানুরাগে ভরা হৃদয়, সর্ব্বদা ফলাভিসন্ধিময়, সুতরাং লুব্ধ এবং অন্যের স্বার্থ হিংসা করতে কুণ্ঠিত নয়, অপরের স্বার্থ নষ্ট করেও নিজের স্বার্থ পূরণে লালায়িত এবং সুখে দুঃখে সর্ব্বদা বিজড়িত এই সমস্তই হল রাজসিক কর্ত্তার লক্ষণ। এমন কর্ত্তা সম্যক ক্রিয়া সম্পাদক হতেই পারে না। কারণ অত্যাধিক বিষয়প্রীতি, পুত্র কন্যাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং মাত্রাধিক অর্থোপার্জনের আকাঙ্খা অথচ মুখে সেটার অন্যরকম ব্যাখ্যা দেয়, আসলে ফললাভের আকাঙ্খা ছাড়া কিছুই করে না। রাজস কর্ত্তাগণ সিদ্ধগুরুর কাছেও নিয়মিত যাতায়াত করেন, দীক্ষা প্রার্থনাদিও করে থাকেন, কিন্তু তার মূলেও থাকে ফললাভের অপরিমিত আকাঙ্খা। মনে করে এ কাজ করলে শরীর ভাল থাকবে, গুরুর আশীর্ব্বাদে সব কিছুতেই সাফল্য আসবে, বাধা বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে, অর্থ লাভ হবে, যশ লাভ হবে, ইত্যাদি। কিন্তু তাদের কোন কিছুতেই কোনও রকম ত্যাগের ব্যাপারই থাকে না। ধন সম্পদ থাকলেও আরও ধন আহরণে প্রবৃত্তি, মনের স্থিরতা নেই, কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ, খাওয়া দাওয়াতেও অসংযমী, সাফল্যে খুশি, অসাফল্যে শোকার্ত হয়ে থাকে। রাজসকর্ত্তা সঠিক দীক্ষাপ্রার্থী নন, তার দীক্ষা লাভের যোগ্যতা হয়নি। সিদ্ধগুরু নিশ্চয়ই তাকে চট করে দীক্ষা দেবেন না, যোগ্যতা অর্জ্জন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন অবশ্যই। পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরণে এ দেশেও একটা রাজসিক অভ্যুত্থান হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিমাত্রায় ব্যবসা ও অর্থাগমের জন্য খাটিয়ে মানুষ আত্মহিংসক হয়ে ওঠে নিজের অজান্তেই। ভগবৎ কর্তৃত্ব এদের চোখ থেকে হারিয়ে যায়, অহংভরিতা এসে তার দখল নেয়। ধর্ম্ম ও নীতি দৌর্ব্বল্যের আখ্যা পেয়ে থাকে। জীবনবোধ বলে কিছুই থাকে না, জীবন মানে যে অনন্তকালের পথে যে এক একটি দেহ প্রাপ্তি মাত্র, এসব না বুঝে মর্ত্ত্যসুখাভিসন্ধিই তাদের জীবন দর্শন হয়। স্বার্থান্ধতাই রাজসকর্ত্তার প্রাণ এবং জাগতিক সুখ দুঃখের পর্য্যালোচনাই রাজস কর্ত্তার মস্তিষ্ক, অহংভরিতা যার প্রকৃষ্ট লক্ষণ ॥ ১৮/২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে।। ২৮

অনুবাদ: ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হন ॥ ১৮/২৮

ব্যাখ্যা: এবার তামস কর্ত্তার লক্ষণ বলছেন। সাত্ত্বিক বা রাজসিক প্রবৃদ্ধি না থাকলে স্বতঃই এই শ্লোকে কথিত তামসিক লক্ষণগুলোর প্রাদুর্ভাব হয় ভূতানুসেবী জীবের অন্তরে। ভৌতিক জড়তা এসে চিত্তকে এতই সঙ্কুচিত করে ফেলে যে কোন বিষয়েই আর বেশিক্ষণ মন বসাতে পারে না। তাই এদের লক্ষণগুলো এমনতর (অযুক্ত) মনোযোগশূন্য, বিবেকশূন্য, অনম্র এমনকি গুরুর প্রতিও নম্র ব্যবহার নেই, শঠ অর্থাৎ মন আর মুখ এক নয়, পরাপমানকারী, অনুদ্যমশীল, শোকশীল এবং দীর্ঘসূত্রী হয়ে থাকে। ভূতপ্রকৃতির পরবশতায় এরা বুদ্ধির অনুশীলনে তৎপর নয়। রাজস কর্ত্তাও ভূতানুসেবী ঠিকই কিন্তু তারা ভূতকে বিশ্লেষণ করে তাতে প্রবেশের চেষ্টা করে মানে কারণ খোঁজে কিন্তু তামস কর্ত্তা

ভূতানুসেবাতেই বিমূঢ়। বুদ্ধিকে তাতে লাগিয়ে তীক্ষ্ণ ও মার্জিত করা এদের স্বভাবে নেই। তাই এরা প্রাকৃত, অন্যের ক্ষতি করেই আনন্দ পায়। নিজেকে ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। দীর্ঘসূত্রী অলস হওয়ায় কোনও কাজই করে উঠতে পারেনা, অথচ সে কম্পিউটারও কিনে ফেলে, ক্লাসেও ভর্ত্তি হয় শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হয় না। দীক্ষা নেওয়া উচিত কি অনুচিত এমন চিন্তাতেই দশ বিশ বছর কাটিয়ে দেয় তবু নিঃসংশয় হতে পারে না। উপযুক্ত গুরু যদি হন তবে তিনি তাঁকে এমন এক একটা পরীক্ষায় ফেলে দেবেন যে হয় সে সেই ধাক্কায় সঠিক পথে আসবে, নিজেকে সঠিক পথে উৎসর্গ করবে, গুরুর চরণে সমর্পিত হবে, নতুবা সংশয়ের বিপাকে পড়েই থাকবে। তারপর অতর্কিত ভাবে জীবনের কর্ম্মক্ষমতা লোপ পাবে ও জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে। স্থিতিস্থাপকতা শূন্য ও দুর্ব্বিনীত হওয়াই তামস কর্ত্তার লক্ষণ। এতে পুতুলের মত মন যাতে-তাতে আটকে যায় এবং ভ্যাবাচ্যাকা খেতে থাকে আর সংশয় বাড়তেই থাকে। প্রকৃত সদগুরুগণ চট করে নিজেকে প্রকাশ করেন না, তবে হৃদয়ে প্রেম ও বাৎসল্যবোধ থাকায় তাঁরা এদের প্রতি বিরূপ আচরণ করেও পথে আনার চেষ্টা করেন কিন্তু তামস কর্ত্তা হলেই সেখানে অপ্রিয়তা ও দুর্ব্বিনয় প্রকাশ পায়॥ ১৮/২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ।। ২৯

অনুবাদ: হে ধনঞ্জয়, গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ পৃথকভাবে বিশেষরূপে বলা হইতেছে, শ্রবণ কর॥ ১৮/২৯

ব্যাখ্যা: এবার বুদ্ধির ত্রিবিধ ভেদের কথা। এতক্ষণ জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার গুণানুসারে ভেদ বর্ণনার পর এবার বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন রকম প্রভেদ তার স্পষ্টীকরণ করবেন বলে ভগবান আশ্বাস দিচ্ছেন। সত্ত্বাদি গুণভেদে বুদ্ধিও ত্রিবিধ হয় এবং জীব ও আত্মাকে আমরা বুঝি বুদ্ধির ভিতর দিয়েই। বুদ্ধি বিকৃত হলে বোঝাটাও বিকৃতই হয়ে থাকে সেজন্যই বলা হয় যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। (যস্য ভাবনা যদৃশী তাদৃশীর্ভবতি সিদ্ধিঃ) আত্মার কর্ম্মবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাবটা বুদ্ধি আত্মস্থ না হলে বোঝা যাবে না। কিন্তু গুণের মধ্যে পড়ে থাকলে আর বুদ্ধি মার্জিত ও শুদ্ধ হবে কি করে ? বুদ্ধিই জ্ঞানশক্তি এবং ধৃতি হল ধৈর্য্য বা ধারণার শক্তি। সমস্ত কর্ম্মের মূলেই বুদ্ধি থাকে, বুদ্ধি না থাকলে ভাল বা মন্দ কোনও কাজই হয়না। তাই বুদ্ধির সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতার অনুরূপ বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত আত্মাকেও তেমনই সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলে বোধ হয়। অতএব বুদ্ধির বিশুদ্ধতা হলেই সেই বুদ্ধিই তখন আত্মাকারা হয়ে যায়। তখনই আত্মা নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। চৈতন্যময় জ্ঞানই আত্মা। এই আত্মাই যাবতীয় বস্তুকে প্রকাশ করেন। জ্ঞানই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারাই আলাদা বলে মনে হয়। বুদ্ধির শুদ্ধতা হলেই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। অতএব পরের তিনটে শ্লোকে বুদ্ধির ত্রৈবিধ্য দর্শনের চেষ্টা করা যাক॥ ১৮/২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।। ৩০

অনুবাদ: হে পার্থ, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ, মোক্ষ যাহাতে বুঝা যায় সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী॥ ১৮/৩০

ব্যাখ্যা: প্রথমে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির কথা। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কেমন ? যে বুদ্ধির দ্বারা ইষ্টজনক এবং অনিষ্টজনক কর্ম্মের বোধ জন্মে আর সেই সাথে অনিষ্টজনক কর্ম্ম পরিত্যজ্য এবং ইষ্টজনক কর্ম্মই একমাত্র শ্রেয় এমন প্রেরণালাভ হয় সেটাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় – "তত্র জ্ঞানং বুদ্ধেঃ বৃত্তিঃ বুদ্ধিস্ত বৃত্তিমতী" অর্থাৎ জ্ঞানই বুদ্ধির বৃত্তি, জ্ঞানরূপ বৃত্তি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। তাহলে এখন জ্ঞানলাভ হবে কি উপায়ে ? "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি" এক কথায় ক্রিয়া যোগের দ্বারা। ক্রিয়ার দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হলেই সব স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ইষ্টজনক কর্ম্মই কাজ আর অন্য সবই অনিষ্টজনক, অকাজ। যদিও এমন আপাত মনোরম প্রবৃত্তিজনক কাজের দিকেই জীবের স্বাভাবিক টান থাকে যে টানে সদগুরুও পরিত্যজ্য হয়ে যান। মনে হয় "ও বুড়োটা জানে কি ? আমি কত জানি, আমি অমুক মন্ত্রী, তুসুক পাশ, ও বুড়োর এসব বোধ আছে ? ওকে আর বেশি পাত্তা দিয়ে কাজ নেই, জীবনভোর শুধু আমাদের থেকে নিয়েই গেল," ইত্যাদি ইত্যাদি। বিষয়প্রবৃত্ত চিত্তে এমন যে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশাদি পঞ্চক্লেশ উৎপন্ন করে চিত্তকে ক্লেদাক্ত, গ্লানিময় ও মলিন করে রাখে ফলে নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি এবং অকার্য্যই কার্য্য বলে বিবেচিত হতে থাকে। অথচ একটু ধীর চিত্তে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে অকার্য্য ভয়জনক এবং কার্য্য অভয়জনক। যদিও অনেক সময়ই মানুষকে উৎসাহ ও আনন্দের সাথে কর্ম্ম করতে দেখা যায় ঠিকই কিন্তু যদি সে বিবেচনা করে দেখত তবে ঠিকই দেখতে পেত যে সে কাজে ভীতি আছেই আছে। আত্মবিনাশের ভাবই ভীতি। ভগবদবোধশূন্য ভাবে যা করা যায় সেটাই অকাজ আর তাতেই বন্ধনের ভয়, সেটাই আত্মহনন। আর যা কিছু ভগবদবোধযুক্ত হয়ে করা যায় সেটাই প্রকৃত কাজ তাতেই আছে মোক্ষের অভয়। যে বুদ্ধি সর্ব্বদা এমন কার্য্যাকার্য্য বিচারপরায়ণ ও পরমতত্ত্বগ্রাহিণী সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। পাঠকের প্রশ্ন এমনতর সাত্ত্বিকী বুদ্ধি যদি কারও না থাকে তবে তার কি হবে ? সাত্ত্বিকী বুদ্ধি না থাকলেও একটা মাত্র সুস্থ শরীর ও প্রবল সদিচ্ছা সম্বল করে যদি কেউ নিয়মিতরূপে গুরুনির্দ্দেশ পালন করে ও ক্রিয়া করে চলে তবে তার সুষুম্নায় প্রাণের গতি হয় এবং প্রাণ সুষুম্নাবাহী হলেই বুদ্ধি স্থির হয়, তখনই সব মলিনতা ঘুচে গিয়ে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী হয়। এমন সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারাই

বন্ধন মোচন সম্ভব হতে পারে। কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধন মোচনের নামই মোক্ষ। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির দ্বারাই এই মোক্ষের ধারণা পরিস্ফুট হয় ॥ ১৮/৩০

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যাঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।। ৩১

অনুবাদঃ হে পার্থ, যাহাদ্বারা ধর্ম্ম–অধর্ম্ম, কার্য্য–অকার্য্য যথাবৎ পরিজ্ঞাত হয় না, সেই বুদ্ধি রাজসী ॥ ১৮/৩১

ব্যাখ্যা: এবার ভগবান রাজসী বুদ্ধির কথা বলছেন। আগের শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে কাজ ও অকাজ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ইষ্টজনক ও অনিষ্টজনক কর্ম্ম ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, যে বুদ্ধির দ্বারা এই সমস্ত বিষয়ের স্বরূপ বুঝতে পারা যায় না সেটাই রাজসী বুদ্ধি। আগের শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যা কিছু মোক্ষপ্রদ তাই ধর্ম্ম আর যা বন্ধনপ্রদ সেটাই অধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় যে বুদ্ধিতে সম্যকভাবে পরিগৃহীত হয় না সেটাই রাজসী বুদ্ধি। পরিগৃহীত না হওয়ার কারণ কি ? কারণ হল চাঞ্চল্য, কর্ম্মব্যস্ততা, কর্ম্মপ্রবণতার অতিশয্য ইত্যাদি যেগুলো একান্তভাবে রজোগুণেরই ধর্ম্ম। অতএব এমনতর বুদ্ধিই রাজসিক বুদ্ধি। রাজস বুদ্ধিবৃত্তির আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল নিশ্চিতভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্যের স্বরূপ বুঝতে না পারার জন্য একটা সন্দেহ থেকেই যায়। কোনও কিছু ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না ফলে সবই অস্পষ্ট থাকে, কার্য্য ও অকার্য্য বিষয়ে কোন ধারণাই জন্মে না। সুতরাং যে কাজের দ্বারা জীবের পোষণপুষ্টি হয় সেই প্রাণের কর্ম্মই যে কর্ম্ম ও ধর্ম্ম আর ঐ কর্ম্ম না করে ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে রত হওয়াই যে অধর্ম্ম এমনতর সহজ ব্যাপারটাও বোধে আসে না। যে বুদ্ধির দ্বারা এমন সন্দেহ ও অস্পষ্টতা তৈরী করে, যার ফলে ধর্ম্মাধর্ম্মের আসল রহস্যটা মোটেই বোঝা যায় না, সেটাই রাজসীবুদ্ধি। বুদ্ধি স্থির না হলে বিশ্বাসও জন্মোনা, কোনও কিছু ভালও লাগে না তখন বহির্ম্মুখী বৃত্তির দ্বারা নিজের ও সমাজের ক্ষতি করে বেড়ায়। এটাই অতি বৈষয়িক ultra material সাংসারিক বুদ্ধি, রাজনৈতিক বুদ্ধি বা এককথায় রাজসিক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ॥ ১৮/৩১

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ।।৩২

অনুবাদঃ হে পার্থ, যে (বুদ্ধি) অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে এবং সকল অর্থ বিপরীত মনে করে, তমোগুণাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি তামসী ॥ ১৮/৩২

ব্যাখ্যা: এখন তামসীবুদ্ধি কি সেটা শুনুন। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই তামসীবুদ্ধি যার দ্বারা শুধু ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ই নয়, সমস্ত বিষয়েই বিপরীত ভাবের উপলব্ধি হতে থাকে। এটাই তামসী বুদ্ধি।এমন তামসী বিচারের জন্ম হয় মোহ থেকে। বর্ত্তমান সমাজের বৃহত্তর অংশই তামসভাবে নিমজ্জিত এবং তামসভাবই সমাজে প্রশংসিত হয়ে থাকে। কর্ম্মজীবনে আমি একজন নিত্য ট্রেনযাত্রী। প্রধান কার্য্যালয়ে কর্ম্মরত থাকাকালীন যাতায়াতে প্রত্যহ গড়ে পাঁচ ঘন্টা ট্রেন যাত্রা করতে হত। বিভিন্ন ধরণের যাত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বার্ত্তালাপ চলে। এক সহযাত্রী মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। সংসারী লোকের, বিশেষতঃ পুত্র, পরিবার পালকের পক্ষে মদ্যপান অভ্যাস পরিত্যাগই বাঞ্ছনীয় এমন সদুপদেশ দেওয়ায় সে তার উত্তরে মদ্যপানের বিবিধপ্রকার গুণ ও উপকার বর্ণনা শুরু করল এবং অশ্চর্য্যের বিষয় সমস্ত সহযাত্রী মিলেই মদ্যপানের পক্ষে মত প্রকাশ করতে লাগল। সেখানে আমারও কিছু গুণগ্রাহী তথা পৃষ্ঠপোষকগণ ছিলেন যাঁরা সর্ব্বদাই আমার পরামর্শ নিতেন কিন্তু তাঁরাও সকলেই মদ্যপানের স্বপক্ষেই যুক্তিজাল বিস্তার করতে লাগলেন। আমি যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বললাম বেশ তো ! যদি মদ্যপান এত উপকারীই হয় তবে নিজ নিজ পুত্রগণকেও এই সুধা পান করাচ্ছেন না কেন ? উত্তরে সকলেই বলল নিশ্চয়ই, অর্থ উপার্জন করলেই করবে, সময় হলেই খাবে। তামসিক বুদ্ধির এহেন বিস্তার দেখে আমি আশ্চর্য্য বোধ করলাম। এমনতর তামসিক বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলে বোধ হয়, সেজন্যই ঋষি প্রণীত শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে থাকি ও শাস্ত্রকথিত নিয়ম, কর্ম্ম ও আচার বিচারগুলোকে অন্ধ কুসংস্কার বলে উপহাস করি। শ্রেয় ছেড়ে প্রেয় নিয়েই ব্যস্ত থাকি। বর্ত্তমান সমাজে যোগাভ্যাসাদি যে নিন্দনীয় তারও কারণ এই তামস বুদ্ধি। আমার ছাত্রজীবনে আমি ও আমার সহপাঠী বন্ধু একটি আশ্রমে গিয়ে যোগাভ্যাস করতাম। বন্ধুর পিতা শুধুমাত্র তিরস্কার করেই ক্ষান্ত হননি যোগাভ্যাসের বিরুদ্ধে বহু কথাও বলেছিলেন যাতে মনে হয় যোগাভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকর ও কদর্য্য অভ্যাস, অথচ বন্ধুর পিতা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং পেশায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এমনতর সমস্ত বিপরীত ভাবই তামসীবুদ্ধির লক্ষণ এবং কলিযুগে এই তামসীবুদ্ধির প্রভাবই সমধিক। অতএব আত্মাকে জানবার বা বোঝবার চেষ্টা যে নেহাৎই একটা কষ্টদায়ক ভ্রান্ত অপচেষ্টামাত্র এবং জীবনে ভোগেই সাফল্য আসে, সুতরাং অপরিমিত ভোগেই জীবনের ও জন্মের সার্থকতা এমন একটা বিশ্বাস ও ধারণাই প্রচলিত আছে। সেজন্যই দুঃখপ্রদ বস্তুকে সুখপ্রদ এবং অসত্যকেই সত্য ও অনিত্যকেই নিত্য বলে বোধ হয়। ভক্ত সাধক কবি তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানস কাব্যগ্রন্থে কলিযুগের এই মোহ বশতঃ তামসিক বুদ্ধি ও ভাবের যে সুন্দর ছবি এঁকেছেন তা সত্যই উপভোগ্য ও বোধের বিষয়। আশা করি পাঠক সময় সুযোগমত পাঠ করবেন ॥ ১৮/৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩

অনুবাদঃ হে পার্থ, সদ্‌গুরুর উপদেশে বিষয়বস্তুর ধারণা ব্যাতিরেকেও যে ধৃতি কর্তৃক মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াসকল নিয়মিত হয় সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ১৮/৩৩

ব্যাখ্যাঃ এবার ধৃতি বিষয়ে ভগবান বলছেন। ধৃতি কি ? ধৃতি শব্দের অর্থ বিধারণ বা চুম্বিনীশক্তি। জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে দুটো দিক আছে। যার একটা হল সেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি যাকে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি। আর অপর দিকটাই হল ধৃতি বা বিধারিনী শক্তি। বুদ্ধির যেমন ত্রিবিধ ভাবের কথা আগে তিনটে শ্লোকে বলা হল, ধৃতিও সেই রকম গুণানুসারে ত্রিবিধভাবে ক্রিয়াশীল। এখন তিনটে শ্লোকে ভগবান ধৃতির সেই ত্রিবিধতা বলছেন। প্রথমে সাত্ত্বিকী ধৃতির বিষয়ে বলছেন। যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি পরস্পর পরস্পরের সাথে অব্যভিচারে যুক্ত থেকে ক্রিয়া সম্পাদন করে সেটাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। কিন্তু এই ক্রিয়া সম্পাদনে আত্মার সাথে ইন্দ্রিয়সকলের যে সংযোগ আছে, আত্মার যে প্রভাব দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল বিধৃত হয়ে রয়েছে এবং মৃত্যুর পর যে শক্তিবলে আত্মার সাথে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়েরা সকলেই আত্মারই অনুধাবন করে, সেই সংযোগ, প্রভাব এবং শক্তিই এক কথায় সাত্ত্বিকী ধৃতি। সাধকপ্রবর আনন্দগিরির ভাষায় “ধ্রিয়তে অনয়া ইতি ধৃতিঃ ইতি যত্ন বিশেষঃ” মানে যে যত্নবিশেষ দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া নিয়মিত হয়। এই ধারণা যোগধারণা হওয়া চাই। অবশ্য সমাধি না হলে এমন ধারণা হয় না। প্রাণায়াম করতে করতে প্রাণবায়ুর নিরোধ হলেই মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও রুদ্ধ হয়ে যায় তখন আর কোনও দিকেই লক্ষ্য পড়ে না। শুধুই আপনাতে আপনি থাকা। এটাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩২, ৪২, ৪৩ ও ৪৪ শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখুন সদ্‌গুরুর উপদেশে কিভাবে বিষয়ান্তরের ধারণাকে অতিক্রম করে ১৪৪ টা উত্তম প্রাণায়ামের দ্বারা কিভাবে ধারণা হয়। এই ধারণারূপ ধৃতির দ্বারাই মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিয়মিত হয়ে থাকে। এমন ধৃতিদ্বারাই বিনা অবলম্বনে মন স্থির, বিনা অবলম্বনে দৃষ্টিস্থির ও বিনা অবরোধেই বায়ু স্থির হয়ে ইন্দ্রিয়গুলোর ক্রিয়া নিয়মিত হয়ে যায়। এমনতর ধারণাই হল সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ১৮/৩৩

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।। ৩৪

অনুবাদঃ হে পার্থ, হে অর্জুন, যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রধানরূপে ধারণা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাঙ্খী হয়, সেই ধৃতি রাজসী ॥ ১৮/৩৪

ব্যাখ্যাঃ এবার রাজসী ধৃতির কথা। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামগুলো এই ত্রিবর্গ জীবের জীবত্বের সাথে গাঁথা থাকে, তাই জীবের ফলাকাঙ্খাও এই ত্রিবিধ বিষয় অবলম্বনেই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও তার সংশ্লিষ্ট ফলভোগে মানুষ নিত্যাকাঙ্খী। এসব নিয়েই তো জীবের জীবত্ব। সত্যিকথা বলতে ফলাকাঙ্খাই মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। মানুষের প্রাণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পূরণের জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান। এমন যে জোরালো ফলাকাঙ্খা সেটা জীবের সঙ্গে যে শক্তির দ্বারায় নিত্যযুক্ত সেই শক্তিটাই (ধারণাশক্তি) হল রাজসী ধৃতি, এবং জীবের সকল প্রচেষ্টার মূলেই থাকে এই রাজসী ধৃতিশক্তি। ভোগসুখ কিছুমাত্র হোক বা না হোক তার আকাঙ্ক্ষা মাত্রেরই এত শক্তি যে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অদম্য প্রচেষ্টাই দেখিয়ে দেয় যে এগুলো জীবে কত সুদৃঢ়ভাবে বিধৃত। এমনতর ধৃতিশক্তিই হল রাজসিক। রাজসিক ধৃতিতে মন ও ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা শুধুই ভোগসুখের আলোচনা চলে। এমনকি সাধনেও শুধু ফললাভেরই চিন্তা থাকে। যদিও বা গুরুকৃপায় সামান্য মাত্র দর্শনও হয় অথবা কোনও কামনা সাময়িক ভাবেও সিদ্ধ হয় সেটা খুব বুঝে নেয় ও মনে করে রাখে, ভাবে আবার যদি এ অবস্থাটা পাওয়া যায় তখনই কিছু চাইতে হবে। এই রাজসি ধৃতিই মোক্ষপথের প্রতিকূল ও ভীষণ অন্ত রায়। এমন ধৃতি থাকলে যতই সাধন করে চল, চিত্ত কখনওই কামনাবাসনা রহিত হয় না ॥ ১৮/৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ।।৩৫

অনুবাদঃ হে পার্থ, বিবেকহীন ব্যক্তি যাহা দ্বারা নিদ্রা (স্বপ্ন), ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও অহংকার ত্যাগ করে না, সেই ধৃতি তামসী ॥ ১৮/৩৫

ব্যাখ্যাঃ শ্রীভগবান এখন তামসিক ধৃতির বিষয়ে বলছেন যে ধারণা বা বিধারণী শক্তির সাহায্যে দুর্ম্মেধা পুরুষ নিদ্রা, স্বপ্ন, ভয়, বিষাদ, শোক ও অহঙ্কারাদিকে ধরে রাখে এবং অবিবেকবহুলা মেধাবশতঃ এইগুলো ঘুরে ফিরে বারবারই আসতে থাকে এবং জীবও দুর্ম্মেধারূপে তাতেই অবস্থান করে সেই বিধারণী শক্তি বা ধৃতিই হল তামসী ধৃতি। আগেই ৩২শ শ্লোকে তামসিক বুদ্ধি কিভাবে দুর্ম্মেধার সঞ্চার করে ও বিপরীত বোধরূপ উল্টো ধারণায় সাহায্য করে সে কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনের বেশি নিদ্রাও তামসিক বৃত্তি ও ধৃতি। যে নিদ্রায় “প্রজ্ঞা মে বিশারদী করোতি” মানে আমার প্রজ্ঞাকে বেশ শুদ্ধ করছে এমন ভাবের ধারক যে নিদ্রা সেটা সাত্ত্বিক নিদ্রা। আর যে নিদ্রায় আজে বাজে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায় ও মন মেজাজ খারাপ হয় সেটা রাজসিক, আর তামসিক নিদ্রায় অনেক ঘুমিয়েও শরীর বেশ ভার বোধ হয় ও জড়তা যেন কাটতেই চায় না। যোগীরা জিতনিদ্র হয়ে থাকেন। ভগবানও অর্জুনকে‘গুড়াকেশ’ মানে‘জিতনিদ্র’ বলে সম্বোধন করেছেন। ৩৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যায়

জ্ঞানক্রিয়ার দুটো দিকের কথা বলা হয়েছে যথা – বুদ্ধি ও ধৃতি এরা পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশীল হলে সেটা অন্তর্মুখে ও বহির্মুখে দুদিকেই কার্য্যকারী হয়। চেতন ক্রিয়াটাও সেই জ্ঞানক্রিয়ার অনুভূতিরূপে ভিতরে গৃহীত হয় আর বহির্মুখী গতিটা একটা শক্তির আকারে রূপান্তরিত হতে থাকে। তাহলে অন্তর্মুখী গতিটা হল বোধপ্রধান ও বহির্মুখী গতিটা হল শক্তিপ্রধান। শক্তিত্বপ্রধান এই বহির্মুখী গতিটাই হল ধৃতি। কোনও বিষয়ের বোধ যত সুনিশ্চিত ভাবে অন্তরে গৃহীত হতে থাকে, ধৃতিশক্তিও ঠিক সেই পরিমাণে বলবতী হয়। বুদ্ধির সাথে ধৃতির এটাই সম্বন্ধ। বিষয় যত নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয় ততই সুদৃঢ়ভাবে সেটা জ্ঞানে বিধৃত হয়ে থাকে এটাই নিয়ম। আগেই ভগবান কর্ম্মসম্পাদনের পাঁচটা কারণের কথা বলেছেন পঞ্চকরণ – শরীর ও বাহ্যবিশ্ব, কর্ত্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব। কর্ম্ম মানেই তো করণ দ্বারা কৃত চেষ্টা। তাহলে চেষ্টার কথা বলা হয়েছে। তাতে কর্ত্তা ও কর্ম্মের গুণবিভাগ করে দেখিয়েছেন। এখন ধৃতি বিভাগের দ্বারাও শরীরের কথাই পরোক্ষে বলা হল। বুদ্ধি বিভাগ দ্বারাও সংস্কারের কথাই পরোক্ষে বলা হল। ধৃতিই ভাবশরীর বা সূক্ষ্মশরীরের কর্ত্তা আর বুদ্ধি হল সংস্কার বা লিঙ্গশরীরের জনয়িতা। যা যত নিশ্চিতরূপে জানা যায় বা অনুভব করা যায় সেটাই তত জোরালো সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়ে যায়। এভাবেই ভগবান কর্ম্মবিজ্ঞান পুরোটাই যে আসলে গুণবিজ্ঞান সেটাই স্পষ্ট, বেশ স্পষ্ট করে দেখালেন, কেননা ত্রিবিধ গুণ অনুসারেই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সংস্কার, শরীর এই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ধৃতি বিষয়ে এত কথা শুরুতে না বলে ধৃতি বিভাগ শেষে বলা এ জন্যই যে শুরুতে বললে বিষয়টা পরিষ্কার হত না এবং ভালোমত বোঝাও যেত না ॥ ১৮/৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ।।৩৬

অনুবাদ: হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর। যে সুখে নিয়ত অভ্যাসবশতঃ পরমানন্দ লাভ হয় ও দুঃখের অন্ত পাওয়া যায় ॥ ১৮/৩৬

ব্যাখ্যা: এখন ভগবান এই শ্লোকের অর্দ্ধেকে মানে প্রথম ছত্রে (লাইনে) ত্রিবিধ সুখের কথা বলেছেন এবং পরবর্ত্তী অর্দ্ধেক শ্লোকে অর্থাৎ দ্বিতীয় ছত্রে সাত্ত্বিক সুখের বিষয়ে বলেছেন। জন্মের পর থেকেই জীব সদা সর্ব্বদা সুখের জন্যই লালায়িত, বেদেও আছে – " যে বৈ ভূমা তৎ সুখম্" মানে হল ব্রহ্মই সুখ স্বরূপ। কিন্তু সাধারণ জীব তো সুখের সেই ব্রহ্মত্ব দেখে না বরং বিষয়জাত অন্তস্তৃপ্তিকেই সুখ বলে। এমনতর বিষয়সুখেই রমমান থাকাতে অভ্যস্ত। সেই সুখপ্রাপ্তিটার লক্ষণ হল "যেন দুঃখ দুর হয়ে গেল" এমন একটা বোধ। অতএব জীব এমনতর বিষয়সুখেই অহরহ যত্নশীল হয়, তা সে প্রকৃত সুখবোধ হোক বা না হোক। কিন্তু আসল সুখ বলতে সেই ব্রহ্মবোধাত্মক পরম সুখকেই বোঝায়। সেজন্যই এখানে ভগবান বলেছেন যে সুখলিপ্সু জীবের সুখটাও গুণানুসারে তিন রকমের হয়ে থাকে। তার মধ্যে যে সুখ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা পাওয়া যায় এবং সেটাও একমাত্র দুঃখের অবসানেই পাওয়া যায়। চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করার জন্য উৎসাহ নিয়ে বার বার চেষ্টা করে যেতে হয় তবেই ত্রিবিধ ক্লেশের অবসান হয়। আধ্যাত্মিক – মানসিক ক্লেশ, আধিদৈবিক – কর্ম্মফল জনিত বা দৈব প্রতিবন্ধকতা, আধিভৌতিক ক্লেশ হল বায়ু পিত্ত কফের অসাম্যজনিত যে শারীরিক ক্লেশ। অভ্যাসদ্বারা এহেন ক্লেশের অবসান হয়ে সাধক সেই সুখময় স্থানে পৌঁছোয় যেখানে শুধুই সু=সুন্দর + খ = আকাশ, অর্থাৎ পরাব্যোম্। বিষয়াসক্তি যত বেশি এই অকাশ থেকে দুরত্ব ততই বেশি যার নামই দুঃখ, মানে দু = দুরের + খ = আকাশ মানে হল পরাব্যোম্ থেকে দূরে অবস্থিতি। জীব প্রকৃত সাত্ত্বিকীসুখ চায় না বলেই আপাত মনোহর বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে পরম সুখের প্রতি উদাসীন হয়ে সমস্ত জীবনকেই দুঃখময় করে তোলে এবং এভাবে মরিচীকায় পড়ে একদিন জীবনও ফুরিয়ে যায়। যাহোক, সাত্ত্বিকী সুখটা কি রকম হয় সেটা পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ১৮/৩৬

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্ ।।৩৭

অনুবাদ: যাহা সেই (অনির্ব্বচনীয়) প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য ও আত্মবুদ্ধির প্রসাদজনিত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৮/৩৭

ব্যাখ্যা: ভগবান আগের শ্লোকে যে সাত্ত্বিক সুখের কথা বললেন, সে সুখটা কি রকম ? শুনুন, এই সুখের কথা বলতে গিয়ে ভগবান "অগ্রে বিষতুল্য" বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ আগে বিষবৎ একথাটা সাধারণ জীবভাবকে লক্ষ্য করেই বলেছেন। ভৌতিক বা জাগতিক সুখে এটা নিশ্চয়ই বিষবৎ যেহেতু আত্মাভিমুখে চিত্তগতির অর্থই হল বিষয়সুখ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া। বিষয়সুখটা মৃতবৎ হলে তবেই আত্মতৃপ্তির আস্বাদন হয়। প্রথমে জীবের ভৌতিক ভাবটা এমনভাবে বিধ্বস্ত না হলে আত্মবোধই জন্মে না। সেজন্যই এটা আগে বিষবৎ এবং পরিণামে অমৃততুল্য কারণ আত্মবোধই জীবকে ব্রহ্মবোধে উন্নীত করে দেয়। আর আগেই বলেছি যে ব্রহ্মই সুখ, আত্মা হল ব্রহ্মাংশ বা ব্রহ্ম। সুতরাং আত্মবোধ যেখানে যত উজ্জ্বল সুখও সেখানেই তত বেশি। সত্ত্বগুণের বর্ণনায় বলেছিলাম যে আত্মত্বের জ্যোতি সাক্ষাৎভাবে চিত্তের যে অংশে প্রতিফলিত হয়, সে অংশটাই সত্ত্বগুণময় অংশ। সুতরাং আত্মবোধের প্রসন্নতাজাত যে সুখ সেটাই হল সাত্ত্বিক সুখ। বাস্তবিকই সাত্ত্বিক সুখ তো আর ইন্দ্রিয়জনিত সুখ নয়, এর পথটাও খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, আর পেলেও কিন্তু খুব সুগম নয়। বিশেষতঃ প্রথম পাঁচ সাত বছর তো মোটেই ভাল লাগে না। প্রথম প্রথম অনেকেই হয়ত উৎসাহ নিয়ে করে কিন্তু আস্তে আস্তে

শৈথিল্য আসে, ভালও লাগেনা, এমনকি আসনে বসতেও ইচ্ছা করে না ও ভয় হয়। কিন্তু যিনি গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে "যা হয় হবে" মনে করে ক্রিয়ার অভ্যাসে মনকে লাগিয়ে রাখতে পারেন তিনিই শেষ পর্য্যন্ত শান্তিময় হ্রদে স্নান করার সুযোগ পান। তবে হ্যাঁ ফলাফল চিন্তা করতে গেলেই সত্যনাশ। যতটা সম্ভব গুরুসঙ্গ করুন, গুরুসেবা করে চলুন, তাতে অন্ততঃ ক্রিয়ায় লেগে থাকতে পারবেন। অন্যথায় পঞ্চতত্ত্বের রং ঢং দেখে মুগ্ধ হয়ে সে দিকে ছুটে গেলেই ঠকতে হবে। যার পরিণামই দুঃখ। সেটা যাতে না হয় সে জন্যই ভগবান এত করে কর্ম্মতত্ত্বের কথা বললেন, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ত্রিবিধ কর্ত্তা, ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ বুদ্ধি, ত্রিবিধ ধৃতি ইত্যাদি, তবুও যদি চিত্ত বিষয়ের পানে ছুটে যায় তবে সতর্ক হও, গুরুপদতলে স্থান নাও, বিষয় পেলে দুঃখ নষ্ট হয় না। ক্রিয়াদ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের নাশ হলে সুখ আপনি আসে ॥ ১৮/৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ।।৩৮

অনুবাদ: বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে যাহা অমৃততুল্য, পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, সেই সুখ রাজস নামে অভিহিত হয় ॥ ১৮/৩৮

ব্যাখ্যা: এখানে রাজস সুখ কি সেটা ভগবান বলছেন। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয় সেটাই বিষয়াভিমুখী জীবের আপাত সুখ। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের সঙ্গে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সংযোগে যে সুখ সেটা প্রথমদিকে অমৃতের মত মনে হয় বলেই রাজা রাজড়া শ্রেণীর লোকেরা বাঈজী নাচায়, জলসা ঘরের ব্যবস্থা করে, সুরা–সাকী সহযোগে জীবন কাটায় ঠিকই কিন্তু এমনতর সুখের পরিণামে যে বিরসভাব আসে যাতে প্রতি ভোগকাল অন্তেই সেগুলো বিষতুল্য বোধ হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরেই রাজসসুখে সুখী লোকের সংখ্যা প্রচুর যারা বিভিন্ন ক্লাব, পার্টি, রেসকোর্স, ডিসকোথেক, ইত্যাদিতে মজে থাকে। এমনকি দরিদ্রতম মানুষ পর্য্যন্ত একটা খুব ঝাল কাঁচালঙ্কা চিবিয়ে জিভের সুখ করতে গিয়ে মুখ চোখে জ্বালা ধরিয়ে বসে। অথচ এ সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কত অধর্ম্মের আশ্রয় নিতে হয় ও পরিণামে মহাদুঃখ ভোগ করতে হয়। এই তো হল রাজস সুখ যা সাত্ত্বিক সুখের ঠিক বিপরীত। রাজস সুখ প্রথমে অমৃততুল্য হলেও পরিণামে বিষতুল্য আর সাত্ত্বিক সুখ প্রথমে বিষতুল্য হলেও পরিণামে অমৃততুল্য, যেহেতু এটা সাধন সাপেক্ষ। রাজস সুখ বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে জাত। আর সাত্ত্বিক সুখ মন, প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতা হতে জাত, দেহেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় লভ্য, সুতরাং নির্ম্মল, স্বচ্ছ ও স্থায়ী, পরমানন্দস্বরূপ। কিন্তু রাজসিক সুখ ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল, অথচ এমন সুখের পরিণামে বহু দুর্গতি সহ্য করতে হয়। রাজস সুখ আত্মবোধাবরক অথচ সাত্ত্বিক সুখ আত্মবোধ হতেই জন্মে। জীব বিষয়াভিমুখী বলেই মাত্র বিষয়সংস্পর্শজ সুখলাভেই সচেষ্ট থাকে। ঐ বিষয় সংস্পর্শজ সুখই রাজস সুখ ॥ ১৮/৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।।৩৯

অনুবাদ: নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত, অগ্রে ও পরিণামে চিত্তের মোহকর যে সুখ তাহা তামস নামে উক্ত হয় ॥ ১৮/৩৯

ব্যাখ্যা: এবার ভগবান তামস সুখের কথায় বলছেন যে পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত রাজস এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত সাত্ত্বিক সুখ ছাড়াও আরও এক প্রকার সুখ আছে যেটা তামস সুখ বলে কথিত হয়। সেটা সাত্ত্বিক সুখের মত আত্মজ্ঞান থেকে উৎপন্ন নয় আবার রাজস সুখের মত বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগেও উৎপন্ন নয়। এটা শুধু নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ – কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনবধানতা বশতঃ মনোগ্রাহ্য বিষয় সকল হতে উৎপন্ন হয়। আলস্য– জড়তা, নিদ্রা–তন্দ্রা, এবং প্রমাদ মানে নেশা ভাং ইত্যাদির প্রমত্ততা হতে যেমন সুখের উদয় হয় সেটা আগা গোড়াই চিত্তের মোহকর আর্থাৎ নেশার শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত মোহিত করে রাখে, এই ধরণের যে সুখ সেগুলোই হল তামসিক সুখ। বস্তুতন্ত্রতাশূন্য এই তামস সুখ এক রকম বুদ্ধির আচ্ছন্নভাব মাত্র। মাদকদ্রব্য গ্রহণেও এই জাতীয় সুখানুভব হয়ে থাকে, আত্মা যদি স্বয়ং সুখ হয় তবে এই নিদ্রা, আলস্য, ও প্রমাদগুলো হল স্বয়ং মোহ যার আরম্ভও মোহজনক এবং শেষটাও মোহময়। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির জড়তাই এর অনুভূতি। যেহেতু এমনতর জড়তা তেজ বা গতি জনিত শ্রমের বিরোধী সেজন্যই সুখবৎ মনে হয়। এটাই তামস সুখ ॥ ১৮/৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ।। ৪০

অনুবাদ: পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাগণের মধ্যে এমন জীব নাই, যে জীব প্রকৃতি সম্ভূত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত ॥ ১৮/৪০

ব্যাখ্যা: এবার ভগবান তিনগুণ হতে কেউই মুক্ত নয় বলে বিষয়টার উপসংহার করতে চাইছেন। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কর্ম্ম, করণ, প্রচেষ্টা, সংস্কার, বুদ্ধি, ধৃতি এ সমস্তই যে প্রকৃতির তিন গুণের বিবর্তন ও তদনুসারী মাত্র এটাই বিশেষভাবে দেখিয়ে এই শ্লোকে তার উপসংহার করছেন। পৃথিবীর জীবকূল অথবা স্বর্গ বা দেবলোকের দেবতাদের মধ্যেও এমন সত্তা কোথাও নেই যা প্রকৃতিজাত এই

তিনগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত। তিন গুণ যখন আছে তখন গুণ অনুযায়ী কর্ম্মও থাকবে। সেজন্যই এভাবে জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, এবং সুখেরও ত্রৈবিধ্য দেখালেন। যাতে লোকে বুঝতে পারে যে কোনটা করণীয় ও কোনটা পরিত্যজ্য। ভগবান পৃথিবী থেকে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত ত্রিলোকের কথা এই শ্লোকে বলেছেন কারণ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিন লোকই আবর্তনময়। কর্ম্মবদ্ধ জীব এই তিন লোকে যাতায়াত করে। তার উর্দ্ধস্থ যে চতুর্ল্লোক মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক সেখান থেকে আর ফিরে আসা নেই। কর্ম্মবন্ধন ঘুচলে তবেই এমন ঊর্দ্ধলোকস্থ হওয়া যায়। সেখানে মুক্ত প্রকৃতি, বন্ধন বলে কিছু নেই অর্থাৎ পুরুষাধীন প্রকৃতি। এই নীচের তিন লোকেই পুরুষ প্রকৃতির অধীন মানে প্রকৃতিতে আবদ্ধ। উল্টোভাবে চলে প্রকৃতির উপর আধিপত্য যাঁদের এসেছে তাঁরাই প্রকৃতিমুক্ত। ভগবান কর্ম্মবন্ধনময় জীবকে তাই কর্ম্মবিজ্ঞান উপদেশ দিয়ে বলছেন কর্ম্মবন্ধন সংক্রান্ত এই যে তিন লোক এখানে প্রকৃতির গুণত্রয়মুক্ত কেউ নেই। উর্দ্ধতর চারটি লোকেও প্রকৃতি আছে ঠিকই তবে তার অধিবাসীরা সেই ত্রিগুণের অধীন নয়। শুধু এই নিচের ত্রিলোকেই জীবকুল প্রকৃতির তিনগুণের অধীন হওয়ায় এমনতর সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ বা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অধীনে থাকে। অবশ্য কিছু কিছু লোক চঞ্চলা প্রকৃতিকে স্থির করে গুণাতীত অবস্থায় থাকে যেটা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। সমস্ত জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখাদির ত্রৈবিধ্য বর্ণনায় যে কর্ম্মবিজ্ঞান ভগবান উপদেশ করেছেন তারও উদ্দেশ্য গুণজাত কর্ম্ম ও বুদ্ধির প্রভেদ দেখিয়ে জানানো যে আত্মা নির্গুণ। অতএব সেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যাবে না। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণই নির্ম্মল ও প্রকাশধর্ম্মী, তাই সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করতে হবে যাতে আর মুগ্ধ হতে না হয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই হল ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ক্রিয়ার অভ্যাসে প্রাণ সুষুম্নাবাহী হলেই সেই সুষুম্নায় থাকতে থাকতে আপনা আপনিই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হবে। এখানে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে সেটা পরের শ্লোকে আলোচনা হবে ॥ ১৮/৪০

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ।। ৪১

অনুবাদ: হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-জাত গুণদ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত ॥ ১৮/৪১

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে জ্ঞান-জ্ঞেয়, জ্ঞাতা-কর্ত্তা, কর্ম্ম-করণ, প্রচেষ্টা-সংস্কার ও সুখ-সাধনাদির ত্রৈবিধ্য বর্ণনার উপসংহারে পাঠকমনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যদি ক্রিয়া, কারক, ফলাদি ও জীবকূল এসকলই ত্রিগুণাত্মক (নিম্ন জগৎ সৃষ্টি ও নিম্ন জগৎ ধারণের কারণে) হয়, তবে জীবের মুক্তিটা কিভাবে সম্ভব

হতে পারে ? কারণ সব কিছুই তো ত্রিগুণাত্মক। জগৎ, সে নিম্ন জগৎ হলেও তার সৃষ্টি, রক্ষা ও ধারণার্থে জীবকূলের কর্ম্মসকলও প্রকৃতিতেই নির্দ্দিষ্ট করা থাকে, সেই কর্ম্মও ত্রিগুণাত্মক। তাছাড়া নিজের ইচ্ছামতন কর্ম্ম নির্ব্বাচনও তো সম্ভব নয়। এমতবস্থায় জীবের কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্তি কি করে সম্ভব হতে পারে ? দেখুন এর উত্তরে ভগবান কি বলেন।

ভগবান সবিশেষ বর্ণনা করে বলছেন কর্ম্মাদি যাবতীয় ব্যাপার গুণজাত। এখন যে চার রকমের গুণকর্ম্মময় বিভাগ এই কর্ম্মক্ষেত্র মনুষ্যলোকে দেখা যায় সেই চার জাতীয় ক্ষেত্রের স্বভাবের বর্ণনা করবেন। প্রকৃতি যে পুরুষে যেমন তারতম্যময়ভাবে বেষ্টিত থাকে, সেটাই সেই পুরুষের স্বভাব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের কর্ম্মবিভাগ স্বভাবগত গুণের দ্বারাই প্রবিভক্ত। স্বভাব অনুসারেই মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারটে স্বভাব বা বর্ণে বিভক্ত এবং এই স্বভাবগত গুণবশতঃই ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের কর্ম্মসকলও চার রকমের। কর্ম্মই যখন মানুষের বন্ধন ও মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ তখন এই বর্ণবিভাগ উপলব্ধি না করলে মানব জাতির কর্ম্মবিজ্ঞান বোঝাই যায় না। কারণ সংস্কার, জ্ঞান ও কর্ম্ম সমস্তই গুণগত এবং কর্ম্ম ত্রিগুণেরই বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই যদি এই সংসারের কারণ হয় আবার সেই মায়া যদি স্বয়ং ভগবানেরই হয়, তবে তো সেই মায়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আছে এবং থাকবেও। সুতরাং তার নিবৃত্তি কি আদৌ সম্ভব ? চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান বিশদভাবে বলছেন কিভাবে গুণত্রয় এই অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে। সুতরাং গুণত্রয়কে অতিক্রম করতেই হবে ভগবৎ ভক্তি ও অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা যেটা একবারে, একলাফে করা সম্ভব নয়। অসঙ্গ শস্ত্রলাভের জন্য ও ভক্তিলাভের জন্য জীবকে অবশ্যই উপযুক্ত হতে হয়। তা না হলে ত্রিগুণরূপিনী প্রকৃতিরূপা ভগবৎ শক্তিতেই সন্দেহ আসে। মনে হবে যদি সমস্ত কর্ম্মই ভগবানের দ্বারা কৃত, তিনিই যখন সব করাচ্ছেন, তখন জীবকে তার ফলাফল ভোগ করতে হয় কেন ? কর্ম্ম যদি প্রকৃতির দ্বারাই কৃত হয় তবে কর্ম্ম কিভাবে প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করতে সক্ষম হবে ? কেননা কর্ম্ম তো প্রকৃতির অধীন হয়ে গেল, কর্ম্মের অধীন তো আর প্রকৃতি নয় ! গুণসকল যেভাবে কর্ম্ম করাবে কর্ম্মও সেভাবে হবে, তাহলে ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা আর মানুষের কোথায় রইল ? আর কর্ম্মই বা প্রকৃতিকে বদলাবে কি করে ? এগুলো জানলে বুঝলে তবেই কর্ম্মবিজ্ঞানটা যে মানব জাতির প্রাণ এবং জৈব পুরুষকার বলে যে তত্ত্বটা আছে সেটা এবং তার প্রয়োগে নিজ কর্ম্মের দ্বারা জীব কিভাবে নিজের গতির পরিবর্ত্তন করতে পারে এই ব্যাপারগুলো হৃদয়ঙ্গম হয়। এহেন কর্ম্মবিজ্ঞানই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিভূমি ও কল্যাণের পথে এগিয়ে চলার জন্য মানব জাতির একমাত্র পথ। ব্রহ্মবিজ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই একমাত্র কর্ম্মশৃঙ্খলাকে প্রকৃত বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল ও মানবজাতির জীবনকালে তাকে প্রকৃত অর্থেই শান্তি দিতে পেরেছিল যেটা অন্য কোনও

দেশে, কোনও কালে, সভ্য কোনও জাতিই পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। যাক সে কথা। এই কর্ম্মতত্ত্ব বুঝতে হলে বর্ণতত্ত্ব বা স্বভাবতত্ত্বটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে স্বভাব কি ? স্বভাব ও প্রকৃতিতে পার্থক্য কি ? জানতে হবে অনাদি প্রকৃতি এবং অনাদি অক্ষর পুরুষ। অক্ষর কূটস্থ পুরুষ প্রকৃতির গুণপ্রকাশময় গতির সঙ্গে সঙ্গে বহু ক্ষর আত্মারূপে বিভক্ত হয়ে সেই প্রকৃতির গতির অন্তরে বৈচিত্র্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবভাব গ্রহণ করে বলেই জীবাত্মাগুলোতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এমন প্রবহমানা। প্রকৃতির এই গুণপ্রবাহ সেই জীবাত্মাগুলোর উপর দুরকম ক্রিয়া করে – এক হল তাদের গতিময় করে রাখা, দুই হল সেই গতিময় জীবত্বে বৈচিত্র্য এনে তাতে নাম, রূপ ও ক্রিয়া বৈচিত্র্য প্রকাশ করা। তাহলে জীবের দুটো ক্রিয়া হল গতাগতি এবং সেই গতাগতিতে চিরদিন নতুন নতুন বৈচিত্র্য আনা। যার পরিণামে গতিশীল জীবের অনন্ত পরিবর্তন হতে থাকে – আজ সাধু কাল চোর, আজ পাপী কাল পুণ্যবান, আজ মানুষ কাল আবার দেবতা, ইত্যাদি। এমন বৈচিত্র্য সম্পাদন সম্ভবই হয় আগের শ্লোকগুলোতে যে ধৃতি বা চুম্বিনী শক্তির কথা বলা হয়েছে সেই চুম্বিনী শক্তির আণবিক ক্রিয়ার ফলে। এই ধৃতিশক্তির আণবিক ক্রিয়াক্ষেত্রকে ব্রজভূমি ও ধৃতিশক্তিকে ব্রজশক্তি বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, লোহার ভিতর দিয়ে দীর্ঘক্ষণ তড়িৎশক্তি চালনা করলে অথবা স্থায়ী চুম্বকের সাথে লোহাকে দীর্ঘক্ষণ ঘসলেই লোহাটা চুম্বকত্ব পেয়ে থাকে, এইভাবে লোহাটার স্বাধীন চৌম্বকধর্ম্ম প্রাপ্তি হলে সেটাই তখন সেই লোহার স্বাধীন স্বভাব হল। জীবাত্মার গতির উপরেও প্রকৃতির এই ধৃতিশক্তি আণবিক ক্রিয়া ক'রে তাতে একটা স্বাধীন স্বভাব রচনা করে। এটাই জীবের স্বভাব এবং এটা অবলম্বন করেই জীব পুরুষকারময় ভাব নিয়ে স্বাবলম্বী হয়। এটার প্রাপ্তিতেই মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র বোধ করতে পারে। বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক গতির (ভালমন্দ, উত্থান পতন) ছন্দের মাঝে নিজের একটা দায়িত্বময় ও কর্তৃত্বময় ভাব গঠন করতে থাকে। এমনতর ভাব গঠনের আগে পর্য্যন্ত মানুষ আচ্ছন্ন ভাকে। এমত অবস্থায় কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করলে উপরওয়ালা এমনকি সহকর্ম্মীবৃন্দেরও শোষণের শিকার হয়, ব্যবসায়ে মহাজনের শোষণের শিকার হয় এবং সংসারজীবনেও স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির কোনও লোকের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে স্ত্রৈণ অথবা ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষের জীবন যাপন করে চলতে হয়। অপরপক্ষে প্রকৃতি এই যে পুরুষ অবলম্বনে “স্বভাবত্ব” পায় এর আসল অর্থই হল যে সে নিজেকে আত্মাধীন করে। অবশ্য পূর্ণমাত্রায় আত্মত্বে বিধৃত হতে পারলেই এমনটা হয়। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ঘাত প্রতিঘাতে পূর্ণ প্রত্যাবর্তনের জন্য কর্ম্মাবর্তন রচনা করে চলে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই স্বভাবময় জীবাত্মা কর্ম্মকে কি ভাবে পরিচালনা করে নিজের কর্তৃত্বের বোঝা নামাতে পারে সদ্‌গুরুপদেশে সেই জাতীয় বিবিধ জ্ঞানোদয়ে যখন উপলব্ধি হয় যে কর্ম্মগুলো আদতে তারও নয়, স্বভাবেরও নয়, প্রকৃতপক্ষে এগুলো অনাদি পরমেশ্বরের, এবং তখনই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্মলাভ হয়। নৈষ্কর্ম্ম অর্থ কর্ম্মত্যাগ নয়, বন্ধনাদি ফলময় কর্ম্মের অবসান মাত্র। তাহলে বোঝা গেল যে পদ্ধতিতে কর্ম্ম করলে কর্ম্মকে সম্যক ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত করা যায় সেটাই কর্ম্মবিজ্ঞান এবং সেই রকম জ্ঞানশক্তিই মানুষের কল্যাণের একমাত্র পথ। এমনতর জ্ঞানময় স্বভাব যাঁদের তাঁরাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। স্বভাব কর্ম্মের দ্বারাই পরিশুদ্ধ হয় এবং কর্ম্মই যখন স্বভাব শোধনের একমাত্র পথ তখন ব্রহ্মবিজ্ঞান অনুসারী কর্ম্মবিধানই প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে ইচ্ছামত চলা বা স্বেচ্ছাচারের জায়গা নেই। বিধানমত কর্ম্মচক্রের নিয়ন্ত্রণদ্বারা স্বভাবময় মানুষের কর্ম্মচক্রকে স্বাভাবিকভাবে ফুটতে দিয়ে তার দ্বারাই স্বভাবকে ভগবানে প্রযুক্ত করে দেওয়াই বর্ণবিচার ও কর্ম্মবিচারের মূল কথা। সে জন্যই ভগবান বলেছেন “স্বভাব” প্রভবগুণের দ্বারাই কর্ম্মসকল বর্ণগত ভাবে বিভক্ত। এমন বিভাগ হওয়াই প্রকৃতির বিজ্ঞান। স্বভাবজাত গুণ বা ঈশ্বর প্রকৃতিদ্বারা অনুশাসিত হয়ে মানবক্ষেত্রের কর্ম্মসকল বর্ণগত হিসাবে বিভক্ত। জীবকে অসঙ্গ শস্ত্রলাভ ও ভগবৎ ভক্তির অধিকারী করার জন্যই বেদকথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এত প্রয়োজন। সমস্ত জীবই তো আর একবারে ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না। “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং” আগে বলে ‘শূদ্র’ শব্দটা আলাদা করে দেবার উদ্দেশ্য হল যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আগে সকলেই শূদ্র থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রতি জন্মেই মানুষকে চেষ্টা করে যেতে হয়। এমন চেষ্টা ও যত্নের ফলেই বেদমার্গে অধিকার জন্মে। তখন নিজের নিজের সাধন অনুযায়ী কেউ বৈশ্য, কেউ ক্ষত্রিয় কেউবা ব্রাহ্মণও হয়। এই অধিকার লাভের আগে সবাই শূদ্রই থাকে। পাঠক প্রশ্ন করবেন ভগবান যদি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন তবে তিনি এমন পৃথক পৃথক ধর্ম ও বর্ণের সৃষ্টি করলেন কেন ? এমন সংশয় যাতে না আসে সেজন্যই পুরো “স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ” এর ব্যাখ্যা আগেই করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারই স্বভাব এবং সেই অনুযায়ীই জন্ম হয়। কেউ ইচ্ছা করে কাউকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্র রূপে সৃষ্টি করে না। এজন্যই স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে থাকলে গুণের তারতম্য অনুযায়ী সত্ত্বগুণাধিক্যে ব্রাহ্মণ, রজোগুণে ক্ষত্রিয়, তমোমিশ্রিত রজোগুণে বৈশ্য এবং তমোগুণে শূদ্র স্বভাবের সৃষ্টি হয়। স্বভাব থেকে গুণ উৎপন্ন হয়ে স্থাবর জঙ্গম সকল সৃষ্ট পদার্থই চার বর্ণে বিভক্ত হয়েছে। নিজ নিজ স্ববর্ণ বিহিত কর্ম্ম নিষ্ঠা সহকারে করলেই নিজেকে উন্নত (develop)করা যায় ও ক্রমশঃ উচ্চগতি লাভ করে ব্রাহ্মণস্থলে এসে জন্মলাভ করে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করে মুক্তিলাভ করে থাকেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে দেখুন “শূদ্রও সদাচার নিরত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন।” কিন্তু ব্রাহ্মণকূলে জন্মেও যদি সদাচার ভ্রষ্ট হন, সধর্ম্ম ভ্রষ্ট হন তবে এজন্মেই তাঁর পতন অনিবার্য্য। এজন্যই অত্রিসংহিতায় ব্রাহ্মণকে দশভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা :- দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল। সুতরাং ব্রাহ্মণকূলে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালেও ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয়, সাধন তপস্যাদি করতে হয়। তবে সাধনপথে চলাটা অন্য বর্ণের চাইতে সহজসাধ্য হয় যেহেতু তিনি তেমন স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়েই জন্মে থাকেন। অপরদিকে শূদ্র একটা

সাধারণ শব্দ আগে যার অর্থ ছিল যারা বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় কর্ম্মে সামিল হত না। এজন্যই সমাজের বিধান ছিল শূদ্রের দ্বিজ সংসর্গে আসা ও সেবা দ্বারা দ্বিজসমাজের অর্ন্তভূক্ত হয়ে থাকা যাতে দ্বিজ সংসর্গে থেকে তাদের অধ্যাত্মজ্ঞানের আলোচনায় যোগ দিয়ে তারাও স্বেচ্ছাচার কর্ম্মকে ভগবৎ কর্ম্মে পর্য্যবসিত করতে পারে এবং সেই জন্মেই পরাগতি লাভ করতে পারে। শূদ্র সম্বন্ধে আরও দুটো কথা হল এই যে বাংলাদেশে যারা শূদ্র নামে পরিচিত তারা কেউই আসলে শূদ্র নয়। বর্ণগত সংস্কার পরিহার করে কালচক্রে যেমন শূদ্রতুল্য হয়েছে মাত্র, তেমনই আবার অনেক অতি নিম্নস্তরীয় (স্বভাবক্ষেত্রে) শূদ্রও ব্রাহ্মণদের সংসর্গে থেকে শুদ্ধ কর্ম্মসংস্কার পাওয়ার যোগ্যতালাভ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশে “নমঃশূদ্র” নামে একটা সম্প্রদায় দেখা যায় যারা প্রকৃতপক্ষে মোটেই শূদ্র নয়। এঁদের পূর্ব্বপুরুষ সকলেই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণকালে বিশেষতঃ তুর্কীরা যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিল তখন এঁরা গভীর অরণ্যে পলায়ন করেছিলেন এবং শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই ব্যাধবৃত্তি আদি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের সংস্কার উন্নত থাকায় কালক্রমে এঁরা “নমস্য শূদ্র” নামে পরিচিত ছিলেন। এই “নমস্য শূদ্র” শব্দই কাল বিবর্তনে “নমঃশূদ্র” অপভ্রংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য স্বাধীনতা উত্তরকালে আবার সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির কারণে অনেকেই যেন তেন প্রকারে নিজেকে শূদ্র বা নমশূদ্রের অর্ন্তভূক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের বাইরে শূদ্র অর্থে অনার্য্য বোঝান হত। আর একটা বিষয় হল “সেবা”। “দ্বিজ জাতির সেবা করিবে” কথার প্রকৃত অর্থ হল দ্বিজ সমাজের অধ্যাত্মপ্রাপ্তিতে যোগ দেবে। এটাই দ্বিজসেবা বা সাধনকর্ম্মের উপযোগী পরিবেশ তৈরী ও সংরক্ষণে সহায়তা করা। যাই হোক, প্রসঙ্গটা খুবই স্পর্শকাতর বলেই কর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করতে হল এবং একটু ইতিহাসের কথাও বলতে হল নইলে শ্রীভগবানের কথার অপব্যাখার সম্ভাবনা থেকে যায়। এবারে একটু যৌগিক অর্থে ভগবানের কথার অন্তর্লক্ষ্যের বিষয় বলে উপসংহার করতে চাই। পিঙ্গলায় শ্বাস বইলে তমোগুণের প্রভাবে যে কর্ম্ম হয় সেটা হল শূদ্রের কর্ম্ম। ইড়ায় শ্বাস চললে রজোগুণ প্রবল হওয়ায় কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বিষয় বাসনার অন্ত থাকে না বলে তখন সেটা হয় বৈশ্যভাব। এমনকি তখন ধর্ম্ম কর্ম্ম করলে তাতেও লাভালাভের চিন্তা এসে যায়। আবার যখন কিছু সময় সুষুম্নায় ও কিছু সময় অন্য পথেও চলে তখন হয় ক্ষত্রিয় ভাব। কিছুটা সময় হলেও শ্বাস সুষুম্নায় প্রবাহের ফলে রজোগুণের সাথে সত্ত্বগুণও কিছু কিছু মিশ্রিত হয়ে পড়ে ফলে তখন পরের দুঃখ মোচনের প্রবৃত্তি হয় এবং কর্ম্মসকলও ভগবৎ প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়। জীবের ভবরোগ নিবারণের উপায়ও এমনতর ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধকই করে থাকেন সদুপদেশাদি দান করে। আর যাঁদের শ্বাস বেশিরভাগ সময়টাতেই সুষুম্নায় চলে এবং মাঝে মাঝে ইড়া পিঙ্গলার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে যায় তাঁরাই হয়ে থাকেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এঁরা যখন আরও বেশি পরিমাণে সাধন করে গুণাতীত অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন, তখন তাঁদের বাইরের দেহটা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যাই হোক না কেন, তিনিই তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সকল বর্ণের নমস্য। গুণাতীত হতে পারলে সবকিছুরই অতীত হওয়া যায়, বর্ণ ও ধর্ম্মের অতীত তো বটেই। সেজন্যই প্রাচীনকালে যেমন দস্যু রত্নাকর বাল্মিকী মুনি হয়েছিলেন, ক্ষত্রিয়কুমার বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, আধুনিক কালেও তেমনি সাধক কবীর, নানক, ভক্তদাদু, সাধু তুকারাম, যবন হরিদাস প্রমুখ অনেকেই নীচকুলে জন্মেও সাধনগুণে অনেক সদব্রাহ্মণ তাঁদের চরণাশ্রয় করে উদ্ধার হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণত্বলাভ বিনা সাধনে হয়না। তাহলে পণ্ডিতের পুত্র পড়াশুনা না করেই পণ্ডিত হতে পারত। তবে একথাও ঠিক যে সদব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণও অতিশয় সুকৃতিসাপেক্ষ। কারণ ব্রাহ্মণপুত্রের সৎপথ ও সদগুরুলাভটাও সহজেই হয়। তাকে ভুল পথে মঠ মিশন বা তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসী হাতড়ে বেড়াতে হয় না। আর অত্রিসংহিতা বর্ণিত তথাকথিত ব্রাহ্মণকূলে জন্মালে তার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়; কারণ তার জীবন ধান্ধাবাজিতেই কেটে যাবে। এগুলো বিশদভাবে বোঝার জন্য পরের শ্লোকগুলোতে বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণের স্বভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন ॥ ১৮/৪১

> শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
> জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ।।৪২

অনুবাদঃ শম,দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এইসকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ১৮/৪২

ব্যাখ্যাঃ এখানে চতুর্বর্ণের স্বভাব বর্ণনা। প্রথমে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ব্রহ্মকর্ম্মের কথা। আগেই বলা হয়েছে যে স্ব–ভাব মানে স্বাধীন ভাব। সেই স্বভাবজ কর্ম্মগুলোও যে বর্ণানুগত সেটাই ভগবান বলছেন। প্রথমে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক গুণ বা কর্ম্মের কথা। চিত্তের শমতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযমতা, তপঃ অর্থাৎ শারীর সুখ উপেক্ষা করে অন্তবীর্য্য সংগ্রহ, শৌচ অর্থাৎ শরীর বাক্য ও চিত্ত ইত্যাদির শুদ্ধতা সম্পাদন, সরল সত্য পথে থাকা, জ্ঞান মানে শাস্ত্রাধ্যয়নে বুদ্ধি অর্জন, বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম সংগ্রহ এবং আস্তিক্যবোধ – অর্থে বিজ্ঞানময় ভগবানের এবং শাস্ত্রের সার্থকতায় শ্রদ্ধালু হওয়া, এই সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। এমন স্বভাব ও সংস্কারে জাত হলে জ্ঞান হতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হতে আস্তিক্যবোধ জন্মে। প্রকৃতজ্ঞান যোগাভ্যাস ছাড়া হয় না, যোগলব্ধ জ্ঞান হতেই বিজ্ঞানপদে আরূঢ় হতে হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করে পর অবস্থাতে পৌঁছাতে হয়, এটাই আস্তিক্যবুদ্ধি। যেখানে দিন রাত্রি কিছুই নেই, সর্ব্বদাই এক অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ যা দেখে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে কোনও সন্দেহই আসে না। তখন যা করা যায় সেটাই ব্রহ্মকর্ম্ম। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসই সাধকের চরম উপলব্ধি আর এটাই হল আস্তিক্যবুদ্ধি,

যার ব্যাখ্যা ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ অধ্যায়েও আছে। আত্মতত্ত্ব জানাটাই হল জ্ঞান আর পরমতত্ত্ব জানাটাই হল বিজ্ঞান। এটা জানতে পারলে আস্তিক্য অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বে অনুরক্তি আপনিই আসে। "অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।" – "আত্মা আছেন" এমনতর নিশ্চিত উপলব্ধি যাঁর হয় তাঁর বুদ্ধিতেই আত্মার প্রকৃতরূপ ক্রমশ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। আস্তিক্যবুদ্ধি ব্যতিরেকে এটা সম্ভবই নয় ॥ ১৮/৪২

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ।। ৪৩

অনুবাদ: শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন (দৃঢ়প্রতিজ্ঞা), দান, ঈশ্বরভাব – এইগুলি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ১৮/৪৩

ব্যাখ্যা: এবার ক্ষত্রিয়ের স্বভাব ও সেই স্বভাবজাত স্বাভাবিক কর্ম্মের কথা। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবে থাকে পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, কর্ম্মদক্ষতা, যুদ্ধে বা কঠোর কর্ম্মেও অপলায়নপরতা, দানশীলতা, ঈশ্বরভাব। এমনতর স্বভাবজাত কর্ম্মের বৈশিষ্ট্যেও তেমনই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সুচারুরূপে কর্ম্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি ও শাসনক্ষমতা ইত্যাদি স্বভাবজাত ভাবেই থেকে থাকে। এমন বৈশিষ্ট্য স্বভাবে ও চরিত্রে থাকলে সেই হয় প্রকৃত যোদ্ধা এবং যুদ্ধরূপ যে কঠিন কাজ তা থেকে সে মোটেই পিছিয়ে আসে না। যুদ্ধে জয় অথবা মৃত্যুই হয় ক্ষত্রিয়ের পরিণতি। কিন্তু একটা কথা, যুদ্ধই বা কি ? আর ক্ষত্রিয়ই বা কে ? অবশ্য এটা বুঝতে মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ই যথেষ্ট। সেখানেই ৩২শ শ্লোকে দেখুন কোন যুদ্ধ কোন ক্ষত্রিয় কিভাবে লাভ করে থাকে। আর কেনই বা ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করে থাকে ? এটাই সেই যুদ্ধ যে যুদ্ধে জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞানে সংগ্রাম করতে হয় (৩৮ নং শ্লোক) এবং সে যুদ্ধে নিহত হলেও অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়ে থাকে (৩৭ নং শ্লোক)। কি রহস্যময় ক্ষত্রিয়ের এই যুদ্ধ! সাধন সমরের এই যোদ্ধাই হলেন সাধক যিনি প্রকৃত অর্থেই ক্ষত্রিয়, যাঁর স্বাভাবিক কর্ম্মগুলো হল – (১) শৌর্য্য = অষ্টপ্রহর ক্রিয়া করা, (২) তেজ = ক্রিয়ার দীর্ঘ সাধনলব্ধ বিভূতি দর্শন। (৩) ধৃতি – যা লাভ করলে আর সাধনায় ক্লান্তি আসে না। (৪) দক্ষতা – যোগাভ্যাসে পারঙ্গমতা, (৫) অপলায়ন – সাধনপথে প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত না হওয়া। শত বিঘ্ন বিপদেও এমনকি মৃত্যু আসন্ন হলেও সাধনা ছাড়েন না। (৬) দান = ক্রিয়াদানে লোকের ভবক্ষুধা নিবারণে মুক্ত হস্ত। (৭) ঈশ্বরভাব – যোগাভ্যাসে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হলে যে ভাব জন্মে সেটাই ঈশ্বরভাব। পরে ক্রমশঃ পুরুষোত্তম রূপদর্শনে দ্রষ্টাও ঈশ্বর হয়ে ভাব ও ভাবী অভেদ হয়ে যায়। এভাবেই ক্ষত্রিয় নিজ স্বভাবজাত কর্ম্মের দ্বারা আত্মরাজ্য লাভ করে ॥ ১৮/৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ।। ৪৪

অনুবাদ: কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রদিগের স্বভাবজ ॥ ১৮/৪৪

ব্যাখ্যা: কৃষিকর্ম্ম, গোপালন ও বাণিজ্য এগুলো হল বৈশ্য স্বভাবীয় কর্ম্ম এবং সেবা বা সর্ব্বভাবের অনুগমন ও সাহায্য করা এই জাতীয় কর্ম্মগুলো হল শূদ্রস্বভাবীয়। বৈশ্যস্বভাব হল মিশ্র স্বভাবের, অনেকটা জল মেশানো দুধের মত। রজোগুণে তমের মিশ্রনেই বৈশ্যস্বভাব জাত হয়। অতএব তমসংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্যে যে বৈশ্যত্ব প্রাপ্তি তার স্বাভাবিক কর্ম্মই কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঠ সম্যক অধীত হলেই বোঝা যাবে যে এই শ্লোকে উক্ত কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য কথাগুলো দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। এই শরীরই ক্ষেত্র, শরীররূপ ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ষণকার্য্য করা মানে প্রাণকর্ম্ম বা প্রাণায়াম দ্বারা শরীরর কর্ষণ করাই কৃষিকর্ম্ম যেটাকে উপলক্ষ্য করে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন গেয়েছেন "মন রে কৃষি কাজ জান না; এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।" এহেন কৃষিকর্ম্মের জন্যেই গোরক্ষার প্রয়োজন হয়। ইন্দ্রিয়গুলোকে বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করাই গোপালন বা ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি। গোপালনের অভাবে ইন্দ্রিয়ে জড়ত্ব এলে স্বাধীন স্বভাব নষ্ট হয় এবং সর্ব্বভাবে চিন্তা, ভাবনায় পরাধীনতা ও জড়ত্ব আসে। এরপর বাণিজ্য অর্থাৎ ফলাকাঙ্খা। কতটা সময়, ধৈর্য্য ও পরিশ্রম ব্যায় করে ফলপ্রাপ্তি কতটুকু হল এমন ধারণাটাই হল বাণিজ্যিক ধারণা যেটা অধ্যাত্মতত্ত্ব অধ্যয়নের ঘোর বিরোধী কারণ এখানে ফলাকাঙ্খার কোনই স্থান নেই। কিন্তু বৈশ্যভাবে বাণিজ্যটা তো থাকেই সেই জন্য কৃষি ও গোরক্ষার পরিমাণ ও মাত্রা বাড়িয়ে বাণিজ্য প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করতে পারলেই বৈশ্যত্ব থেকে ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হওয়া যায়। কর্ষণের ফলেই প্রবৃত্তির মল নষ্ট হয়। সাধনসমরে ক্ষত্রিয়ই যে যথার্থ যোদ্ধা সে কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা আছে। সুতরাং এই ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ বৈশ্যের সাধনার উদ্দেশ্য। এবার শূদ্র স্বভাবের কথা। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের স্বভাবীয় কর্ম্ম হল পরিচর্য্যা। আর্য্য ব্রাহ্মণের সেবা করে শূদ্রজাতি আত্মন্নোতির জন্য ব্রাহ্মণের নিকট থেকে কৃষিকর্ম্মরূপ গায়ত্রী দীক্ষা পেত। শুধু শূদ্র কেন, এই সেবা-ভাব বা গুরুশুশ্রষা না থাকলে কেউই সাধন পাবার অধিকারী হন না। এই কৃষি বিদ্যাদ্বারাই প্রকৃত পরিচর্য্যা বা সেবার কাজ হয়ে থাকে। শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্মই হল পরিচর্য্যা, কারণ এই পরিচর্য্যা দ্বারাই আত্মন্নোতি লাভ হয় অন্যথায় নীচতায় মগ্ন হয়ে যেতে হয়। আত্মজ্ঞানলাভের ক্রম (ঋবয়ঁবহপব) বা প্রণালী সকলকেই অবলম্বন করতে হয়, এটাই স্বাভাবিক। জন্মান্তরের কর্ম্মরূপ যে সংস্কার চিত্তে সঞ্চিত থাকে সেটার সম্যক অধ্যয়নের দ্বারাই সদগুরুকর্তৃক সাধনবিধি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এজন্যই এক এক জনের এক এক

রকম সাধনপদ্ধতি। শূদ্রকেও সাধনদ্বারা এক একটি স্তর অতিক্রম করতে হয় অন্য সকলের মতই নিজ সদগুরুকে ভবসাগরের কাণ্ডারী করে নিয়ে ॥ ১৮/৪৪

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।। ৪৫

অনুবাদ: স্বস্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, স্বকর্ম্ম নিরত ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শুন ॥ ১৮/৪৫

ব্যাখ্যা: "সংসিদ্ধি" অর্থ সম্যক সিদ্ধি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই চরম সিদ্ধি বা যথার্থ সিদ্ধি। কর্ম্মই এমনতর সিদ্ধিলাভের উপায়, কর্ম্ম ভিন্ন কিছুই হয় না। মনুষ্যক্ষেত্রই সেই কর্ম্মক্ষেত্র। সঠিক কর্ম্মপথে থেকে মনুষ্যজীবনকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করতে হয়। মানুষ ভূতশরীরী যতক্ষণ ততক্ষণ কর্ম্ম তাকে করতেই হবে। দেবক্ষেত্রের কথা আলাদা। মনুষ্যক্ষেত্রে মানুষকে কঠোর মনঃ প্রাণময় তপস্যার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। কল্পনায় আহার করলে যেমন পেট ভরে না অথবা স্বপ্নে রাজ্যলাভ করলে যেমন স্বপ্নভঙ্গে রাজ্য আর থাকে না, মঠ-মিশনের মহারাজ, বাবাজিদের দেওয়া জপ ধ্যানও সেই রকমই ব্যাপার। সেখানে অনেক আদর্শের বুলি ও মোটা মোটা বই পত্রও থাকে কিন্তু কর্ম্মই নেই। যাক সে অন্য কথা। ভগবান বলছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির স্ব স্ব কর্ম্মসকলই জ্ঞানের হেতু। গুণভেদে যে যেমন কর্ম্মের অধিকারী সদগুরু শিষ্যকে সেইমতই কর্ম্মের উপদেশ করবেন এবং শিষ্য যদি গুরুপদেশমত কর্ম্ম করে চলে তবে তার সিদ্ধিলাভ হবেই। সুতরাং কর্ম্মটাই হল ভিত্তিভূমি। কর্ম্মের অবশ্য প্রকারভেদ আছে। সকলকে একইরকম কর্ম্মে নিয়োজিত করা হয় না। কারণ একই কর্ম্ম সকল সাধককে নেশা ধরাতে পারেনা। সাধক অনুযায়ী কর্ম্মের বিভিন্নতা হয়। সিদ্ধিলাভ অর্থ সেই ইচ্ছারহিত অবস্থা যেটা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয়ে থাকে। সেইজন্য ভগবান বলছেন যে স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্মের অনুধাবনই সুকর। স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা সাধারণ, বর্ণগত, জাতিগত, প্রজ্ঞাগত ও দ্রব্যগত সাধারণ সিদ্ধিসকল যে বিজ্ঞানে লাভ হয়, সেই বিজ্ঞানের দ্বারাই স্বকর্ম্ম থেকে সংসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধি বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হতে পারে। এটা বলার জন্যই শ্লোকে "সংসিদ্ধি" ও "সিদ্ধি" আলাদা ভাবে দেখান হয়েছে। বর্ণের বিষয় আগে ২য় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব ৪২, ৪৩ এবং ৪৪শ শ্লোকে চারি বর্ণের যার যা কাজ সেই সেই ভাবে নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান হলেই সিদ্ধিলাভ হয়। না হলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালে অথবা বাহ্য পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত হলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। একমাত্র প্রাণরূপী আত্মার অর্চ্চনা দ্বারাই নিজ নিজ বর্ণে স্থিত নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সিদ্ধিলাভ হয়। কিভাবে হয় ? সেটাই ভগবান বেশ স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, পরের শ্লোকে ॥ ১৮/৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।। ৪৬

অনুবাদ: যাহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্মচেষ্টা হয় এবং যিনি এই সমূদয় বিশ্ব ব্যপিয়া আছেন মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে ॥ ১৮/৪৬

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যেমন বলা হল সেভাবে নিজ নিজ বর্ণগত কর্ম্মের দ্বারা মানুষের সিদ্ধিলাভের বিজ্ঞানটা বলাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ভগবান বলছেন বর্ণগত কর্ম্মবিভাগ অবলম্বন মানুষের নিজ নিজ স্বভাবকে সেই জাতীয় কর্ম্মদক্ষতা এনে দেয় এবং স্ব স্ব কর্ম্ম অনুযায়ী সেই সেই বিষয়ের বুদ্ধির চরম উৎকর্ষতা ও প্রতিভার স্ফুরণ হয়। এজন্যই শাস্ত্রে কুলগুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে। যাক সে প্রসঙ্গে পরে বলা হবে। প্রতিভার কথায় ফিরে আসি। কোন বিষয়ে বিনা চিন্তায় স্বতঃ প্রস্ফুরিত ভাবে মুহুর্ত্তের মধ্যে তার চরম জ্ঞানটার উদ্ভাস, যেটা অনেক চিন্তা করেও মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে লাভ করতে পারে না, সেটাই হল প্রাতিভজ্ঞান বা এককথায় প্রতিভা। এমনতর প্রাতিভজ্ঞান লাভ হয় শুধু বর্ণগত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার ফলে। কিন্তু কালের প্রভাবে বর্ণগত কর্ম্মগুলো সঙ্করতা দোষে দুষ্ট হয়েছে আর কর্ম্মসঙ্করতা থেকে বর্ণসঙ্করতা জন্মেছে। সুতরাং আজকের এই বর্ণসঙ্করতার যুগে বর্ণগত কর্ম্মপ্রতিভা লাভের উপায় বড় বিশেষ একটা নেই, যা আছে খুবই অল্প। তবুও মানুষ চেষ্টা করলে নিজের নিজের স্বভাবোচিত কর্ম্ম ক'রে, সেই কর্ম্ম অবলম্বন করে সেই বিষয়ের প্রাতিভজ্ঞান কিছুটা হলেও লাভ করতে পারে। বর্ণগত কর্ম্ম শুদ্ধভাবে থাকলে ব্রহ্মসংসিদ্ধি খুব সহজেই সর্ব্বজাতীয় কর্ম্ম সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে। এমনকি সঙ্করজাতীয়তার যুগে সঙ্করজাতীয় কর্ম্মও যদি ঠিক ঠিকমত বিজ্ঞান অনুসারে করা হয় তাহলেও ব্রহ্মসংসিদ্ধি পাওয়া যেতে পারে। আসলে প্রতিটি কর্ম্মের অন্তরালে যে উদ্দেশ্য, যে আকাঙ্খার তীব্রতা থাকে সেই অনুসারে কর্ম্মটা প্রকৃতিতে ফলবতী হয়। মানুষ স্বভাব অবলম্বনে কর্ম্ম করে, ভগবানও নিজের স্বভাবরূপা ত্রিগুণা প্রকৃতি নিয়ে বিশ্বকর্ম্মের রচনা করেন। তাই জীবের স্বভাব বা অনুভূতি অনুসারে ভগবৎপ্রকৃতি বা ত্রিগুণাশক্তি ভূত বা সিদ্ধি প্রকাশ করে থাকেন। এটাই বিজ্ঞান। জীব নিজেকে আত্মা বলে দেখতে শিখলে এই ভূতশক্তি বেশ কিছুটা লাভ করতে সমর্থ হয়। সর্ব্বভূত যা থেকে জন্মে ও যাঁতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করে তিনিই ভগবান। মানুষের এমন কোনও কর্ম্মসংসাধন ঘটে না যার মধ্যে আশ্রয়স্বরূপ স্বয়ং ভগবান অবস্থিত নেই। আত্মজ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই কিছুটা ভূতশক্তিসম্পন্ন ও আপ্তকাম। কিন্তু এর দ্বারা তাঁরা দুঃখই লাভ করেন মাত্র। যদিও সর্ব্বদা অন্যের হিতের জন্যই তাঁদের এমন ভূতশক্তি নিঃশেষ হতে হতে তাঁরা ভিতরে ভিতরে দুর্ব্বল ও দেউলিয়া হতে থাকেন। সাধারণ জীব এ বিজ্ঞানটা জানে না তাই কর্ম্ম করার সময় এ ধারণাও তাদের থাকে না। সে জন্য কর্ম্মের অতি

সাধারণ ফলগুলোও বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমে পেতে হয় আর ব্রহ্ম সংসিদ্ধির কথা তো ছেড়েই দিলাম কারণ ওসব বহু জন্মের পর হয়। বস্তুবাদ কর্ম্মসঙ্করতার ও সৎকর্ম্মনাশের মূল। এ থেকেই আত্মিক জড়তা আসে ও বোধশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। বোধশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হলেই ভোগশক্তি তাকে গ্রাস করে। তখন ভোগশক্তির দ্বারা শোষিত হয়ে ভোগবহুল জীবন যাপন করে। এযুগে মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তা, কম্পিউটারের প্রয়োগ ইত্যাদি দেখতে পেলেও প্রকৃত বুদ্ধির নাশ ও চেতনার অবক্ষয় বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠছে, ফলে সাধারণ কথার মর্ম্মার্থও সহজে বুঝতে পারেনা, প্রকৃতি, ভূতপ্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও ধারণা থাকে না। চেতনময় চেতনভঙ্গিমা ভিন্ন, আত্মময়ের আত্মতৃপ্তি ভিন্ন, কর্ম্ম অন্য কিছুই নয়। নিজেকে আত্মা বলে জানলে, বোধ করলে, তবেই এমনতর শুদ্ধচেতনার উন্মেষ হয়, নতুবা যতই পরিশ্রম কর সবই সেই একটা পদ্ধতি বুঝে তার ভিতর গিয়ে শোষিত হতে থাকা, ঘরে বাইরে সর্বত্র, আর মুখে বড় বড় সাম্যের কথা যখন নিজেরই সমতা হারিয়ে গেছে। দুপয়সার ধান্ধা কামাতে ও সামলাতে গিয়ে অন্যকে ঠকিয়ে নিজেও ঠকবে নিশ্চয়। একটু আত্মজ্ঞান হলেই জীব চৈতন্যলাভ করে ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মে বিশিষ্ট সিদ্ধি এবং সর্ব্ব কর্ম্মদ্বারাই ব্রহ্মসংসিদ্ধি অতিদ্রুত লাভ করতে সমর্থ হয়। এটাই সিদ্ধিবিজ্ঞান। জীব সঙ্করস্বভাবীয় হলেও এই বিজ্ঞানে দৃষ্টি রেখে কর্ম্ম করলেই ব্রহ্মসংসিদ্ধি পর্য্যন্ত যেতে পারে। শুদ্ধ চৈতন্যের উন্মেষ একবার হলেই হল। তারপর তুমি ব্যাধ, চণ্ডাল, শূদ্র, নীচ যাই হও না কেন আপন আপন কুলধর্মের অনুশাসনে থেকে কর্ম্ম করে যাও, নিজ নিজ কুলগুরুর নির্দেশে কর্ম্ম করে যাও, অবশ্যই তুমি প্রত্যক্ষ করবে যে তোমার স্বকুল বা স্বর্বর্ণবিহিত সমস্ত কর্ম্মদ্বারা তুমি কেবল তাঁরই (পরমাত্মারই) পুজো করে চলেছো। না, কোনও রকম কল্পনা করলে হবে না, একেবারে প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। পায়খানা পরিষ্কার কর বা দেবপূজা কর, সব একই উদ্দেশ্যে কৃত হলে আর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার থাকে না। বর্ণাশ্রমের অধিকারানুরূপ কর্ম্ম করে সে কর্ম্ম যদি তোমার সুখসুবিধার জন্য না হয়ে ভগবৎ প্রীত্যার্থে হয় তবে সেই কর্ম্মের দ্বারাই তুমি প্রকৃত জ্ঞানলাভের যোগ্যতাপ্রাপ্ত হবে। মন, সংকল্প ত্যাগ করে আপনার মধ্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই বর্ণাশ্রমের অধিকার অনুরূপ কর্ম্ম করা সম্ভব হয় এবং ধৈর্য্যলাভে ধীরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। সেই ধীর পুরুষ তখন আর কোনও কিছুতেই আসক্ত হন না, স্বয়ং মহাদেব হয়ে আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন থাকেন। স্থির প্রাণই হল আত্মা। স্থির প্রাণে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয় সেটাই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হতে হলে স্বকর্ম্মের দ্বারাই তাঁর অর্চ্চনা করতে হয়। বর্ণগত কর্ম্মশৃঙ্খলাময় সমাজে সার্ব্বজনীন ভাবে এ বিজ্ঞানময় কর্ম্ম করার সুযোগই অনেক বেশি। সেজন্যই বর্ণগত কর্ম্ম নিয়ে যথাসাধ্য নিযুক্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। আর যেখানে, যে দেশে বর্ণগত কর্ম্ম ব্যবস্থা নেই বা থাকলেও যারা সেটা অনুসরণ করে না, তারা কর্ম্ম হতে সাধারণ প্রতিভা ও ব্রহ্মপ্রতিভা লাভের সুযোগ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হলেও নিজের নিজের স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেই সেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন যদি এই বিজ্ঞানটা

ভালোমত বুঝে নিয়ে কাজ করেন। এক কথায় আত্মজ্ঞান সিদ্ধির উপায়ই হল স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা করা, অর্থাৎ ৪২, ৪৩ এবং ৪৪শ শ্লোক অনুযায়ী স্বকর্ম্ম (আত্মকর্ম্ম) পালন করা॥ ১৮/৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭

অনুবাদ: বিগুণ (সদোষ) স্বধর্ম্ম, সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৮/৪৭

ব্যাখ্যা : স্বভাবজ কর্ম্মে কোনও পাপই নেই, এমনকি তা দোষযুক্ত হলেও সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ। দত্তকুলোদ্ভব কবি মধুসূদন একথা ভালই বুঝেছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে ইংরাজী কাব্যচর্চ্চা ছেড়ে মাতৃভাষা বন্দনা করেই শান্তি পেয়েছিলেন। সুতরাং সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাল হয়েছে অকাল। সেই জন্য সর্বত্র এমন বিপরীত ভাব দেখা যায়। মঠ-মিশনের প্রচারে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে লোকে নিজ নিজ কুলগুর" পরিত্যাগ করে এবং গৃহী হয়েও সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করছে। গৃহীর ধর্ম্মই হল গৃহধর্ম্ম বা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম্মই হল সন্ন্যাস। গৃহী যদি স্বধর্ম্মে না থেকে সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে তবে তো সে না ঘরকা না ঘাটকা। সন্ন্যাসীরও নিজ ধর্ম্মে মতি রেখে অর্থ লোলুপতা ত্যাগ করা উচিত এবং দীক্ষাপ্রার্থী গৃহীকে সদুপোদেশ সহকারে কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া উচিত। শুধুই আধ্যাত্মিক অর্থেই নয় সর্ব্বক্ষেত্রেই মৌলিকতা রক্ষা করা উচিত। এই মৌলিকতাই স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। স্বভাবগত কর্ম্ম করে কেউ বিশেষ পাপে অনুলিপ্ত হয় না। কৃমিকীট দুর্গন্ধময় স্থানে জন্মে ও তাতেই ভালমত জীবিত থাকে সেটা অন্যের পক্ষে বিষময় হলেও কৃমির জীবনে সেটাই পোষক ও তাতেই তার বাড়বাড়ন্ত হয়। এক জনের পক্ষে যেটা দোষজনক অন্যের জন্য সেটাই পোষক। পাঠক বলবেন যেটা দোষের সেটা সকলের পক্ষেই দোষের, অতএব পরিত্যজ্য। বর্ত্তমান সমাজ এমনতর পশ্নে দু ধরনের মত পোষন করে (১) যাঁরা শাস্ত্রমতাবলম্বী তাঁদের মতে যে যে বর্ণে জন্মেছে সেই বর্ণের নির্দিষ্ট কর্ম্মই তার স্বভাবিক কর্ম্ম। (২) আর একদল বলেন যাতে যার লাভ বেশি সেটাই তার কর্ম্ম হওয়া উচিত, সুতরাং স্বকর্ম্ম পরিত্যাগই বিধান হওয়া উচিত। এসব কারণেই বর্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হয়েছে ফলে মানুষের মনে যে পরম শান্তি বিরাজ করত সেটাও অন্তর্হিত হয়েছে। এখন সব জাতি ও ধর্ম্মের লোকই যন্ত্রণাকাতর, শান্তি কারোরই নেই। কর্ম্মত্যাগ করে কর্ম্মান্তর গ্রহণ করলেই কিন্তু কর্ম্মবীজ ধ্বংস হয় না। যত্র আয় তত্র ব্যয়। লাভের চিন্তায় কর্ম্ম পরিবর্ত্তন কিন্তু কর্ম্মের মূলে ভগবৎ দর্শন করায় না। সেজন্যই ভগবদস্তিত্বে বিশ্বাসী পুরুষেরা কর্ম্মের সংস্করণ ও পরিবর্ত্তন কল্যাণকর বলে দেখেন না।

কর্ম্মের মূলে ভগবৎসংযোগ দর্শনই কর্ম্ম সংশোধনের একমাত্র প্রশস্ত উপায়। স্বভাবগত কর্ম্মের মূলে যদি ভগবৎ সংযোগ দেখতে পাওয়া যায় তবে সে স্বভাবগত কর্ম্ম নিকৃষ্ট হলেও সেটা স্বতঃসিদ্ধভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে আধ্যাত্মাভিমুখী শুদ্ধচিত্তবৃত্তিতে পরিণত হয়। অধিভূত ক্ষেত্র, মানে স্থূল শরীর ও জগৎ, বিষয়ে যথা প্রয়োজন লক্ষ্য রেখে ভগবৎমুখী চিত্তের নির্ম্মাণই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু এমনতর উদ্দেশ্য ভিন্ন শুধুই ইহলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা হলে সে কর্ম্ম অবশ্যই আসুর কর্ম্ম বলে বুঝতে হবে। হ্যাঁ আসুর কর্ম্মদ্বারা আসুরিক উন্নতি লাভ করার উদ্দেশ্য থাকলে বর্ণাশ্রমের গুলি মেরে সুযোগ সুবিধার অনুসরণ করে কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তর গ্রহণ করা যেতে পারে অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে পরধর্ম্মের আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে স্বভাবগত কর্ম্ম মোটেই পরিত্যাগ না করে তার মূলে ভগবদ্দর্শন করে সহজেই তাকে সংশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে। কথায় বলে “বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।” বন্য প্রানীদের ধরে এনে খাঁচায় পুরে রেখে যতই খেতে দাও তাতে তাদের জীবন মোটেই সুখের হয় না। সেই রকম শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। শিশু মায়ের কোলেই সুন্দর ও সুরক্ষিত থাকে। আজ মনুষ্যসমাজ আসুরিক উন্নতির দিকে বদ্ধচক্ষু তাই শিশুকে যতশীঘ্র সম্ভব ক্রেশে (ঈৎবপযব) পাঠায়। অতএব সে চোখে বর্ণ বিচারের কোনও মূল্যই নেই কিন্তু অধ্যাত্মাভিমুখী হতে হলে বর্ণগত কর্ম্মবিচার ভিন্ন সহজে একপাও এগোতে পারা যায় না। এযুগে সেই সকল জীবেরই বেশি করে আবির্ভাব হচ্ছে যাদের পূর্ব্বকর্ম্ম এমন দুষ্ট যুগেরই উপযোগী। তবুও বিচার শক্তি দিয়ে, পুরুষকার প্রভাবে মানুষ নিজের দৈন্য থেকে নিজেকে তুলে আনতে পারে। সকল বর্ণই নিজ নিজ স্থান হতে নিচে নেমে গিয়েছে, তাই সকল বর্ণকেই নিজের নিজের চেষ্টা দ্বারাই স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মে উন্নীত হতে হবে। পতিত ব্রাহ্মণও যেমন সদাচার সম্পন্ন হলে আবার ব্রাহ্মণই হবে, তেমনই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বেলাতেও শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবদভজনা করলেই বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। যিনি যে বর্ণে উৎপন্ন হয়েছেন তাঁর শাস্ত্রসম্মত বর্ণনারূপ ধর্ম্মপালনই কর্ত্তব্য। এমন কর্ত্তব্যপালনে যতটা সচেষ্ট হবেন তাঁর ততটাই গুণের উৎকর্ষ এবং উন্নতি লাভ হবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যদি পূর্ণভাবে স্বধর্ম্মপালনে যত্নবান হন তবে তাঁর নিজের জীবনেই উচ্চভাবের অনুকুল নিজ নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তন দেখতে পাবেন। অবশ্য এ সমস্তটাই শ্লোকের বহির্লক্ষ্যের বিষয় ব্যাখ্যা করা হল। এবার একটু অন্ত র্লক্ষ্যের কথায় আসি, গুরুপদেশে স্ব স্ব কর্ম্মের দ্বারাই যে সিদ্ধিলাভ হয় সেটা কখনই বাহ্য বিচার দ্বারা বোধগম্য হতে পারে না। এখানে স্বধর্ম্ম কথার অর্থ হল আত্মধর্ম্ম। তা হলে স্বধর্ম্মটা কি ? পরমানন্দরূপে স্থিতিলাভই জীবের স্বধর্ম্ম। এমন পরিস্থিতি লাভের যে চেষ্টা সেটাই হল স্বধর্ম্মরক্ষা বা পালন। আত্মার ধর্ম্ম পালন করতে হলে আত্মায় লক্ষ্য রাখা চাই। যতদিন আত্মায় লক্ষ্য না থাকে ততদিন সে ইন্দ্রিয়ে লক্ষ্য রেখে ইন্দ্রিয়ের চাহিদা মিটিয়েই চলে। এহেন ইন্দ্রিয়াসক্তিই হল পরধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়গণকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সুখে থাকা যায়, মনের সুখও হয় সত্যিকথা কিন্তু ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম যে পরধর্ম্ম কারণ ওটা তো মোটেই আত্মার ধর্ম্ম নয়। আত্মার দর্শন বা আত্মজ্ঞানলাভ সহজলভ্য নয় বলেই সেই কর্ম্ম বা ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখে মজে যাওয়াটা হল পরধর্ম্মে সুখলাভ করা। অমন সুখ চাইলে পরধর্ম্মেই থাকা হয়। তার চাইতে আত্মায় মনোনিবেশ করা অর্থাৎ স্বধর্ম্মে ফিরে আসাটাই ভাল নয় কি ? আত্মকর্ম্ম পালন অর্থাৎ যোগাভ্যাস প্রাণায়ামাদি প্রথমেই নতুন শুরু করার সময়ে ঠিক ঠিক মত অনুষ্ঠিত হয় না, তাছাড়া এই প্রাণের সাধনা করতে গিয়ে প্রথমদিকে মনও ঠিকমত বসেনা ও একাগ্র হয় না, কিন্তু তাই বলে সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখে গা ভাসিয়ে দিতে নেই। এই কর্ম্মকে “স্বভাব নিয়ত” মানে স্বাভাবিক করে নিতে হবে, অভ্যাসে পরিণত করা চাই, তাহলেই সকল বৈগুণ্যভাব কেটে যাবে ॥ ১৮/৪৭

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ।। ৪৮

অনুবাদঃ হে কৌন্তেয়, সদোষ হইলেও সহজ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। যেহেতু, ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় (কর্ম্মের) সূচনায় সকল কর্ম্মই দোষে আবৃত ॥ ১৮/৪৮

ব্যাখ্যাঃ“সহজং কর্ম্ম ’ বলতে অনেকেই বংশ অনুযায়ী কর্ম্ম বুঝে থাকেন যেহেতু সহজ কর্ম্মের অর্থ হল সহজাত কর্ম্ম। মানে যে কর্ম্ম নিয়ে আমরা জাত হয়েছি। কিন্তু আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন শুধু বংশেরই গুণ ও প্রকৃতি লাভ করি না, সাথে সাথে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা আমাদের যে আত্মবিকাশ হয়েছে সেই অনুযায়ী গুণ ও প্রকৃতি নিয়েই আমরা জন্মাই। আর পিতা, মাতা, বংশ থেকে যা পাই তাতে কেবল বাহ্যিক লক্ষণগুলো হয়ে থাকে মাত্র, প্রকৃত জিনিস বা প্রধান জিনিস কিছু নয়। তাহলে সহজ কর্ম্ম মানে হল যা আমাদের প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত। কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হয় মানুষের গুণের দ্বারা, কর্ম্ম স্বভাবের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মুচির বংশধর যে চিরকাল জুতো তৈরী করবে অথবা গোয়ালার ছেলে বলেই চিরকাল দুধ বেচতে হবে, নিজের প্রকৃতি স্বভাবজ গুণ ইত্যাদির হিসেব না করেই শুধু পৈতৃক বৃত্তি অনুসারেই পরম সিদ্ধি এমনতর ব্যাখ্যায় গীতার্থ বিকৃত হয়। এজন্যই আগের শ্লোকে সহজ কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম যে পাপযুক্ত হতে পারে না একথা বলা হয়েছে। বর্ণগত কর্ম্ম সদোষ হলেও তা সেই বর্ণীয় পুরুষের পোষক। তাই ভগবান কর্ম্মকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম বা স্বকর্ম্ম ও পরকর্ম্ম। এদুয়ের মধ্যে স্বধর্ম্মের অনুসরণই প্রশস্ত। স্বভাবকর্ম্ম সদোষ হলেও ত্যাজ্য নয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাকার বা ভাষ্যকারগণ “ আরম্ভ” শব্দের অর্থ “কর্ম্ম” বলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেটা সঠিক নয় কারণ তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে “সর্ব্বারম্ভা হি দোষেনাবৃতাঃ”।

মানে "সর্ব্ব কর্ম্মই দোষাবৃত" হলে স্বকর্ম বা পরকর্ম্ম সবই দোষের। সুতরাং কোনওটাই করা উচিত নয় অথবা ইচ্ছামত যেটা খুশি করলেই হয়। অতএব এখানে "আরম্ভ" শব্দের অর্থ "শুরু" বা "সূচনা " রাখাই সঠিক। সব কাজেরই শুরুতে কিছু ভুলভ্রান্তি বা বিশৃঙ্খলা হতেই পারে, সংকল্পময় কর্ম্মসূচনাতেই এমনটা হয়ে থাকে। কিন্তু কর্ম্মের মূলে অনাদিমান ভগবানকে দেখলেই কর্তৃত্বদোষ নষ্ট হয়ে যায়, কর্ম্মও সঠিক পথে চলে। প্রত্যেক জীবের অধ্যাত্মপ্রকৃতিতে এই অন্তর্লক্ষ্যের বিষয়টা থাকে। কারণ জন্মের সাথে সাথে যে কর্ম্মটা শুরু হয় সেটাই সহজ বা সহজাত কর্ম্ম। প্রাণক্রিয়াই মানুষের জন্মের সাথে সাথেই হতে থাকে। অতএব এই প্রাণক্রিয়াই মানুষের সহজাত বা সহজ কর্ম্ম। প্রথম প্রথম এই প্রাণপ্রবাহ অতি ক্ষীণভাবে বহির্মুখ হয়, অন্তঃপ্রবাহেই প্রাণ চলতে থাকে বলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি কিছুটা হলেও থাকে। ক্রমশঃ যত এই প্রাণপ্রবাহ বাইরের গতিতে শুরু হয় ও প্রকৃতির সাথে চলতে শুরু করে, পূর্ব্বস্মৃতিও ততই লুপ্ত হতে থাকে। তখন বাইরেটাই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে আর অন্তর্ভাবটা স্মৃতি হতে সরে যায়। প্রাণের অমন অন্তঃপ্রবাহটাই ছিল সহজাত বা সহজ কর্ম্ম কিন্তু সেটা বহির্মুখ হয়েই দোষযুক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু দোষযুক্ত হলেই তা পরিত্যাগ করতে নেই কারণ পরিত্যাগ করলে সেই পূর্ব্বস্মৃতি বা দিব্যস্মৃতি ফিরে পাওয়া যাবে না, সহজ বা সহজাত জ্ঞানটাও ফিরে পাওয়া যাবে না। সুতরাং প্রাণের এই বহিঃপ্রবাহটাকে আবার অন্তঃপ্রবাহে ফিরিয়ে নেওয়ার কৌশলটা বের করতে হবে বা জানতে হবে। ব্যাপারটা খুব অনায়াস সাধ্যও নয়, সুখেরও নয়। তাই প্রথম প্রথম প্রাণ প্রবাহের গতি উল্টে দেবার সাধনাটা সঠিক হয় না। ফলে অনেকেরই মন, মাথা, মেজাজ সবটাই বিগড়ে যায়, কেউ কেউ আবার ডাক্তারকে গিয়ে বলে ফেলে। ডাক্তার বাবুরাও বিষয়টা সঠিক না জেনে বা না বুঝে তাঁর এহেন মক্কেল বা রোগীর মনে অহেতুক ভীতির সঞ্চার করেন ও ক্রিয়া ত্যাগের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রোগী না বলে মক্কেল বলার অর্থ এ রোগী শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আসেন নি তাঁর কাছে, এসেছেন ভবরোগ নিয়ে পরামর্শের আশায়। অতএব ইনি রোগী নন, মক্কেল। যাই হোক প্রথম প্রথম এমনটা হলেও ক্রিয়া ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ক্রিয়া ব্যতীত প্রাণকে অন্তর্মুখ করে দেবার আর কোনই উপায় নেই। তাই প্রথম প্রথম কাজটা যতই নীরস বোধ হোক না কেন, আত্মকামী ও কল্যাণকামী সাধকের তবুও সেটা করে যাওয়াই উচিত। প্রথম প্রথম সব কাজের চেষ্টাতেই কিছু দোষত্রুটি থেকে থাকে। কিন্তু যিনি কিছু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে একাজে লেগে থাকেন তিনিই পরবর্ত্তীকালে এর আনন্দটা নিজে নিজেই অনুভব করতে পারেন। কোথায় অশান্ত, চঞ্চল, বাসনাতরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশ্বঘোরা মন আর কোথায় স্থির, প্রশান্ত, আত্মস্থ মন। ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র প্রাণের বহির্গতি শুরু হলেই দেহে আত্মবোধ হতে থাকে ফলে দেহজনিত ও দেহের অক্ষমতাজনিত কারণে শিশু কেঁদেই চলে কারণ ভিতরের সম্বোধিটা হারিয়ে যায় আবার বাইরের সঙ্গেও মানিয়ে নিতে পারেনা। এ এক অসহ্য অবস্থা, এটাই শূদ্রভাব। তারপর সময়ের সাথে শিশু কিছুটা বড় হয়ে বালক হয় তখন উপনয়নকালে গুরু তাকে প্রাণক্রিয়া যাতে আবার অন্তর্মুখ হতে পারে সেই মত শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে থাকেন। এটা শৈশবকালে কচি কাঁচা অবস্থায়ই সহজে সম্ভব হয়। এসময়েই গুরু বলপূর্ব্বক শিষ্যের চিত্তকে ক্ষণিকের জন্য হলেও অন্তর্মুখ করে দিয়ে "তৎপদং" দর্শন করিয়ে দেন। প্রাণের বহির্মুখ গতি থেকে বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়। আবার অন্তর্মুখে চালনার অভ্যাসে তেমনই ভিন্নাকারা বৃত্তির উদয় হতে থাকে। এখানেই উপনয়নের উপযোগীতা। উপনয়নদ্বারাই ব্রাহ্মণ হতে হয়। শিশু জন্মকালে শূদ্র, গুরুকর্তৃক উপনয়নের দ্বারা ব্রাহ্মণত্বে জন্মলাভ হয়। এই দ্বিতীয়বার জন্মলাভ হয় বলে শিশু তখন দ্বিজ হয়ে থাকেন এবং এই দ্বিতীয় জন্মের পিতা হলেন শ্রীগুরুদেব স্বয়ং। প্রাণের অন্তর্মুখে চালনার অভ্যাসে রপ্ত হলেই এবং সদা সর্ব্বদা গুরুবাক্য পালনে রত হলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত জ্ঞানে চৈতন্যের প্রভাব কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার হয় এবং এই জীবনেও তার ফলে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি জন্মে। এখানেই উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা ও গোপনীয়তা, উপনয়নের সার্থকতা। কালক্রমে উপনয়ন প্রথা সীমিত হয়ে পড়েছিল এবং উপনয়নলব্ধ নিয়মাদির পালনে রপ্ত হয়ে ব্রহ্মকর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে প্রকৃত জ্ঞানী হতে হত। ক্ষত্রিয় শাসকেরাও ব্রাহ্মণের পরামর্শেই চলতেন। ব্রাহ্মণই ছিলেন বিধানদাতা বিধায়ক তথা সমাজের কর্ত্তা। যাই হোক, আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এহেন যে স্বভাবজ কর্ম্ম তার অনুষ্ঠান করে চলাই ভাল। কিন্ত জীব সেটা না বুঝে ঝাঁ চক্চক্ মনোমুগ্ধকর ও আপাত সুখকর পরধর্ম্মের দিকেই ছুটে চলে। তা না করে যেমন ধোঁয়া থাকলে আগুন আছে নিশ্চয় বোঝা যায় তেমনিই সাধনায় কিছু কষ্ট হলেও রিপু জয়ও অবশ্যই হবে এটা বুঝলে উপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্মণভাব ও প্রাণকর্ম্মের সুন্দর অবস্থাটা নিশ্চয় লাভ হয়। সুতরাং সদোষ হলেও সহজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয় ৷৷ ১৮/৪৮

> অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
> নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।। ৪৯

অনুবাদ: সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা ও নিস্পৃহ ব্যক্তি আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগদ্বারা পরম নৈষ্কর্মসিদ্ধি পাইয়া থাকেন ৷৷ ১৮/৪৯

ব্যাখ্যা: দিব্যগুরুর যা বলার ছিল তা বলা হয়েছে, কেবল চুড়ান্ত ও শেষ কথাটাই শুধু বলতে বাকী আছে। সেটা বলার ঠিক আগে এতক্ষণ যে শিক্ষা দিয়েছেন তারই সারমর্ম্ম পনেরটা শ্লোকে (৪৯-৬৩) সংক্ষেপে বলছেন। তার মধ্যে প্রথম পাঁচটা শ্লোক পড়লে মনে হবে যে গীতা বুঝি সন্ন্যাস মার্গেরই শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে গীতার এই সন্ন্যাসের অর্থ মোটেই বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বা সংসার ত্যাগ নয়, বরং এই সংসারেই স্থিত হয়ে শান্ত থাকা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা করা। এটাই

গীতার মতে প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য। কারণ অক্ষর ব্রহ্মের (ব্রহ্মভূয়) চিরন্তন শান্তিটাই মূল লক্ষ্য নয়, ওটা হল ভাগবত ভাব (মদ্‌ভাব) লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল ভিত্তি মাত্র। যাই হোক এবার মূল শ্লোকের ব্যাখ্যায় ফিরে আসি। আগের শ্লোকে বর্ণিত আগুনের শুরুতে যেমন শুধুই ধোঁয়া তেমনি কর্ম্মের শুরুতেও কিছু সদোষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এখানে পাঠক প্রশ্ন করবেন তাহলে ক্রিয়মান কর্ম্মসকলের দোষাংশ পরিত্যাগে কিভাবে গুণাংশ লাভ করা যায় ? এরই উত্তরে ভগবান এই শ্লোকে আগের শ্লোকের তাৎপর্য্যটাকেই আরও পরিস্ফুট করেছেন। জীবমাত্রেই স্বভাবজাত কর্ম্মচাঞ্চল্যময়। সেই স্বভাব অনুসারেই তারা বর্ণ ও জাতীয়তা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মবৈচিত্র্যময় সংসারে বিচিত্র কর্ম্মে বিচিত্র ফল রচিত হয়, আর অজ্ঞ জীব সেই বাহ্যিক ফলবৈচিত্র্য লক্ষ্য করে একে অপরের কর্ম্মে প্রলুব্ধ হতেই পারে, এটা নতুন কিছুই নয়। কিন্তু কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভগবদ্‌ লাভ এই মূল কথাটা ভুলে গেলেই প্রলুব্ধ জীব যথেচ্ছাচারী হয়ে ইহজাগতিক বাহ্য সম্পর্কের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে অসুরতা পেতে থাকে আর জগৎকেও ধ্বংসের দিকে তীব্র গতিতে টেনে নিতে থাকে। এভাবেই জড়বাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সবরকম জীবনদর্শনকে আমরাই ধ্বংস করতে থাকি। কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখতে পারলে সে কর্ম্মের বাহ্য আকার যাই হোক না কেন সেটার অবলম্বনেই সে উদ্দেশ্য সহজেই পূর্ণ হতে পারে আর কর্ম্মান্তর গ্রহণের দরকার হয় না। কোনও রকম বিপ্লবেরই দরকার হয় না, একবর্ণীয় জীবকে অন্যবর্ণীয় কর্ম্মেও নিযুক্ত হতে হয় না, কর্ম্মবিপ্লব রচনা করে সমাজে সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ করে সমাজকে অধঃপতিত করতেও হয়না, এবং জগতে বর্ণসঙ্করতা সৃষ্টি করে বীজধর্ম্মটা নষ্ট করতে হয় না। কেমন করে স্বধর্ম্মচারী জীব কর্ম্মারম্ভরূপ দোষের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে পরাসিদ্ধি লাভ করে সেই বিজ্ঞানটাই সংক্ষেপে আবার বলছেন। আত্মাতে মন রাখতে রাখতে আর কোনও বাহ্য বিষয়ে আসক্তি আসবে না এজন্য প্রথম প্রথম খুবই যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু এভাবে লেগে বেঁধে থাকলে সকল ইন্দ্রিয় জয় হওয়ায় আর বিষয়ে স্পৃহা থাকে না, কর্ম্মেও আসক্তি থাকে না, ফলেও আকাঙ্খা থাকে না। তখন সবকিছুর কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা এবং ইচ্ছারহিত হলেও কোনও কাজই আটকায় না। এমন ভাবে ইচ্ছারহিত ও ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করাটাই হল নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হলে ধন, জন, গৃহ ও পুত্রদারাদিতে আসক্তি থাকে না, কল্পনার অভাবে মন আত্মাকারে স্থিত হয়। অন্তঃকরণ বশীভূত হওয়ার ফলে বুদ্ধি থাকে সর্ব্বদা স্থির। স্বভাবজাত কর্ম্মচাঞ্চল্য উধাও হয়ে যায়। অষ্টপ্রহর এমন অবস্থা থাকলেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হয়ে যায়। এটাই হল নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির চরম ও পরম অবস্থা ॥ ১৮/৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ।। ৫০

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানের চরম স্থিতি, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৮/৫০

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে কিভাবে কাম্যকর্ম্ম পরিহার হতে নৈষ্কর্ম্ম্যের উদয় হতে পারে সেটা দেখিয়ে এই শ্লোকে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির সাধনক্রম বলার আশ্বাস দিচ্ছেন এবং এমনতর পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যে ব্রহ্মভাব হয় তারই রকমফের দেখাচ্ছেন এই ছয়টা শ্লোকের মধ্যে দিয়ে। সেই প্রকারটাই হল জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি সে কথা ভগবান আগেই বলেছিলেন "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" সে প্রকারটাই সংক্ষেপে বলছেন। জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বের শেষ সংস্থিতিই হল অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্ব, সেই চরম অবস্থাই জীবের নির্ব্বাণ। বেদে ব্রহ্মের যে প্রকাশদ্বয়ের কথা বলেছেন – "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" সেই দুই প্রকাশই আত্ম অনাত্ম উভয়বিধ জ্ঞান ও পরা বা অপরা দ্বিবিধ প্রকৃতি নামে পরিচিত। এই প্রকাশদ্বয় অলিঙ্গ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের লিঙ্গরূপে প্রকাশ পায় এবং ঐ লিঙ্গদ্বয়ের অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে সম্মিলীত হয়ে যাওয়াটাই হল নির্ব্বাণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইন্দ্রিয়গুলোর সাথে মিলেমিশেই কর্ম্ম উৎপন্ন করে। কিভাবে করে সেটা আগে বিশদভাবে বলা হয়েছে। যখন এগুলো আর সেভাবে কর্ম্ম উৎপন্ন করতে পারেনা তখনই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। কেমনতর সাধনায় এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ? জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তিতে। যখন জ্ঞানই জ্ঞেয়াকারে প্রকাশিত হয় তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভেদ। এমন জ্ঞান হলেই ব্রহ্মদর্শন আত্মাকারে স্থিতি হয় আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতিই হল পরমা সিদ্ধি। ব্রহ্মপদ কখনও চিন্তা ভাবনা করে আনা যায় না। কোনও রকম ংবধৎপয বা ৎবংবধৎপয এর বস্তুও নয় কারণ নিশ্চিন্ত অবস্থাই ব্রহ্মপদ। যখন‘হ্যাঁ–না’ কোনওটাই থাকে না। এমনতর নিশ্চিন্ত অবস্থা প্রাপ্তিই যখন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, সেই সাধনার কথা, কিভাবে লব্ধ নৈষ্কর্ম্ম্য ও কাম্য নৈষ্কর্ম্ম্য পুরুষেরা সেই তপস্যায় নিযুক্ত হয়, সেটাই ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন। সেই রকম তপস্যার ফলেই পরাভক্তির উদয় হয়। আর সেই পরাভক্তির বলেই তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। পরমহংস পর্য্যায়ের উন্নীত সাধকেরও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রয়োজন অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভের জন্য। দেখুন পরের শ্লোকে সেই যোগ্যতার সাধন কিভাবে হয় ॥ ১৮/৫০

বুধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।। ৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।। ৫৩

অনুবাদ: বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতিদ্বারা মনকে স্থির করিয়া শব্দাদি বিষয়সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং রাগদ্বেষ অপসারিত করিয়া নির্জ্জনস্থানবাসী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর ও মনঃ সংযমকারী, সর্ব্বদা ধ্যানযোগ পরায়ণ হইয়া বৈরাগ্যকে সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম (মমত্বশূন্য) হইয়া শান্ত (সমগুণ প্রাপ্ত) ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান ॥ ১৮/৫১-৫৩

ব্যাখ্যা: এবার সেই পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠার কথা। যে সমস্ত সাধনদ্বারা পরমহংসনিষ্ঠ পুরুষের নৈষ্কর্ম্যলাভ হয় সেগুলো হল (১) বিশুদ্ধবুদ্ধি, মানে যে বুদ্ধিতে আত্মা ছাড়া আর কিছুই থাকে না কারণ আত্মা সম্বন্ধে আগেই নিঃসংশয় হওয়া গেছে। (২) ধৃতি – নিরুদ্ধচিত্তের বৃত্তি না থাকায় বুদ্ধি আত্মাতে স্থির হয়ে থাকাই ধৃতি। (৩) শব্দাদি বিষয় ত্যাগ– ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখী হওয়ায় বাহ্য শব্দাদি সহ্য হয় না, ভালও লাগে না নিজে শব্দ করা বা কথা বলার ইচ্ছা হওয়াতো দুরের কথা। (৪) রাগদ্বেষ ত্যাগ – মন নিশ্চল হয়ে গেলে অনুরাগ, বিরাগ, সংকল্প, বিকল্পাদি কিছুই না থাকায় রাগ, দ্বেষাদি স্বতঃই ত্যাগ হয়ে থাকে এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত অবস্থা তৈরী হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত অবস্থায় এলে (৫) বিবিক্ত সেবী – মানে নির্জ্জনবাস দরকার হয়, নইলে ধ্যানস্থ হওয়া যায় না। যদিও প্রাণ স্থির হয়ে “আমি আমার” ভাব না থাকলে যে নিঃসঙ্গতা সেটাই আগে দরকার এবং এ অবস্থা তো সাধনদ্বারা আগেই লাভ হয় তারপর নির্জনস্থানে এসে ধ্যানসমাধিতে মগ্ন হতে হয়। (৬) লঘুপাচ্য আহার নইলে আবার ধ্যানে বসে ঘুমিয়ে পড়বে। কবীরদাসের কথায় –

“নীদ নিসানী নীচ কী উঠো কবীরা জাগি।
ঔর রসায়ণ ছোড়কর রাম রসায়ণ লাগি॥”

তমোগুণ নিকৃষ্টগুণ। সেই তমোজাত নিদ্রাও নীচ লোকের চিহ্ন। প্রাণকে উপরে তুলে রাখতে পারলেই আত্মধ্যানে মগ্ন থাকা যায় এটাই রাম রসায়ণ। রাম রসায়ণ পেলে অন্য রসায়ণ নিজেই ছেড়ে যায়। (৭) কায়, মন ও বাক্যের সংযম – যোগীমাত্রেই এই সংযম বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের সময় লাভ করে থাকেন, কবীরদাসের কথায় –

“ কাহে ভরোসা দেহকা, বিনাশী যায় ছিনমাহী।
শ্বাস শ্বাস সুমীরণ করো, আউর উপায় কুছ নাহি ॥”

অতএব দেহেরই যদি এ অবস্থা হয় তবে আর অহংকারের রইল কি ? কায়, মন ও বাক্যের সংযমও স্বতঃই হয়ে থাকে যোগীদের। (৮) সাধন ও যোগাভ্যাস – সাধন ও যোগাভ্যাস তো যোগীর নিত্যকর্ম্ম। অবিরাম প্রাণায়ামেই সাধনকর্ম্ম সঠিকভাবে হয়ে থাকে। ১৭২৮ বার করে প্রাণায়াম করে করে ২১৭৩৬ বার করতে পারলেই পর অবস্থার স্বাদ পাওয়া সম্ভব। (৯) বৈরাগ্য – এমন ভাবে ক্রিয়া করে চললে যে ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুতেই ইচ্ছা হয় না এটাই বৈরাগ্য। এরপর (১০) অহঙ্কার – শঙ্করাচার্য্যের মতে দেহে ও ইন্দ্রিয়ে যে আত্মভাব সেটাই অহংকার, সেটাই ছাড়তে হবে। (১১) বল – শাস্ত্র বিরোধী কর্ম্মে আসক্তি ও অসৎ আগ্রহরূপ যে বল সেটাই পরিত্যজ্য। (১২) দর্প – যোগাভ্যাসের ফল যে লব্ধভূমিত্ব সেটাও যোগীকে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করে। বিভূতি থেকেই মন উন্মার্গগামী হতে থাকে। সুতরাং সাবধানে সকল রকম বিভূতি পরিহার করতে হয়। যোগের দ্বারা পরোপকারাদি করতে গিয়ে যোগভ্রষ্ট হবার ঘটনাই সমধিক। (১৩-১৪) কাম,ক্রোধ – অশুদ্ধচিত্তের লক্ষণ। (১৫) পরিগ্রহ – শরীর ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ লাভের ইচ্ছা থাকলেই যোগপথ পরিত্যাগ করা উচিত। নইলে কোনও দিকই হবে না। অর্থ ও পরমার্থ দুটি বিপরীত মার্গের বিষয়। পুরোপুরিই উল্টো পথ। এমনকি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহও অপরিগ্রহ বিরুদ্ধ ও পাপাচরণ। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহ করার মত পাপকর্ম্ম আর দ্বিতীয়টি নেই কারণ সেই সংগৃহীত অর্থের দ্বারা যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয় তা ধর্ম্মবিরুদ্ধতা ও ধর্ম্মসম্পর্কে অজ্ঞতা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা একটা উৎসব পালন মাত্র, ওটা ধর্ম্মই নয়, অধর্ম্ম মাত্র। (১৬) নির্ম্মম – মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ ‘মম’ মানেই ‘আমার’ ‘আমি আমার’ বোধ থাকলেই চিত্তের ভ্রান্তি ও বিক্ষেপ অনিবার্য্য। (১৭) শান্ত উপরত – এমন স্থিরতা না এলে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মত্বলাভ কোনওটারই যোগ্যতা হয় না। ব্রহ্মলাভের জন্য সাধন তো অনেক পরের কথা।

তবে নিরাশার কিছু নেই। ভগবান বর্ণিত ক্রিয়া করে গেলে সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থায় আসতে খুব একটা দেরী হয় না। বাধা বিঘ্ন তো ভাল কাজে কিছু থাকবেই। কোনও দিকে না তাকিয়ে শুধুই ক্রিয়া করে চল। এগিয়ে চল, বুঝবে ও দেখবে যে প্রতি বিষয়ই অক্ষর আত্মস্বরূপ ভগবানকে দেখিয়ে দেয়, এবং আরও দেখিয়ে দেয় যে, এসকলই ভগবানের বুকে বিরাজিত। বিষয়দর্শন তো জ্ঞানক্রিয়া মাত্র যে কথা আগেও বলেছি। সুতরাং – ব্যক্তাব্যক্তময় সমগ্র বিষয়কে ক্ষর আত্মত্বের সাথে ভগবানের বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখে ভূতে ভূতে ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় চিন্ময় অক্ষর আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করে জিতাত্মা হও এবং এভাবেই তোমাদের ধ্যানাধিকার আসুক, নিজের নিজত্বেই ব্রহ্মবোধের আভাস পেয়ে আত্মধ্যান পরায়ণ হও। ধ্যানযোগের বিধান অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা কর আর তার সাহায্যে সংস্কারগত অহংকার, বল, দর্প, বিষয়াগ্রহ ও মমতা ইত্যাদি থেকে দিনে দিনে নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করতে থাক এবং চিত্তের প্রশান্তি লাভ করো এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মস্বরূপে তদাত্মভাব প্রাপ্ত হও। এভাবেই, এ পথেই “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহা বাক্যে দিনের পর দিন নিজের আত্মায় অধিকার

বিস্তার করে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে আরোহণ কর, জীবনের সময়টুকু কাজে লাগাও। আয়ু শেষ হওয়ার আগেই এই শরীরে যতটুকু এগিয়ে যেতে পারবে ততটুকুই লাভ। সবই নিজের ভিতরেই আছে, বাইরে কিছুই খুঁজতে হবে না, গেরুয়া, জটা, কিছুরই দরকার নেই, শুধু নিজেকে নিজে একটু ভালোবাসো, তবেই সব হবে। যে অবস্থায় আছো সে অবস্থাতেই হবে ॥ ১৮/৫১-৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।। ৫৪

অনুবাদ: ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি (নষ্ট বস্তুর জন্য)শোক করেন না এবং (অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য) আকাঙ্খা করেন না। সর্ব্বভূতে সমান হইয়া অতি শ্রেষ্ঠ মদ্‌ভক্তি লাভ করেন ॥ ১৮/৫৪

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকগুলোতে যে ভাবে বলা হয়েছে ঐভাবে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এমনতর উপলব্ধিতে নিশ্চল অবস্থিতি হলে পরে যা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভূতের যে পরাভক্তি লাভ হয় সেটাই ভগবান বলছেন। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" আমার অন্তরস্থ এই আত্মাই, সর্ব্বভূতস্থ আত্মা, ইনিই সমস্ত, আমিও ইনিই, এমন ভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রজ্ঞাকে যখন আলোকিত করে, তখন আর বিষয় লাভের জন্য আকাঙ্খা ও বিষয় নাশে শোক, এমনতর জৈবভাবটা থাকে না। সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপে পুনঃ পুনঃ মগ্ন হতে থাকে ও পরাভক্তি লাভ হয়। এমন যে পরাভক্তি সেটা কখনও দ্বৈতবুদ্ধি (ফবিষঃ) থাকতে হয়না। পরাভক্তি মানেই হল আত্মতত্ত্বে প্রবল অনুরক্তি অর্থাৎ পরা-প্রকৃতিতে ভক্তি অথবা পরা-প্রকৃতি অবলম্বনে পরমতত্ত্বে স্থিতি অথবা পরমতত্ত্বের ভজন। এখানে "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" কথাটার তলে তলে "সর্ব্বেষু কর্ম্মেসু" অর্থটাও গ্রহণ করতে হবে। পাঠক এখন এপর্য্যন্ত পড়ার পরও যদি এই প্রশ্ন করেন যে যিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন তিনি তো ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে থাকেন তখন তাঁর লক্ষণগুলো কেমন হয় ? এই লক্ষণগুলোর বহিঃপ্রকাশ বিশেষ হয় না তবে বোঝা যায় সদাপ্রসন্ন, আশঙ্কাহীন, আসক্তিবিহীন, সকল শোকদুঃখের অতীত এবং সর্ব্বভূতে কূটস্থ দর্শনের ফলে চর অচর সকলই সমান হয়ে সর্ব্বভূতে সমত্ববুদ্ধি হয়ে থাকে। ব্রহ্মব্যতীত অন্যকিছুতে যাঁর লক্ষ্যই নেই তার আবার অন্য কিছুর জন্য আকাঙ্খা হবে কি করে ? যাঁরা আত্মক্রিয়াদ্বারা আত্মারামের ভজন করেন তাঁরা এটা সহজে বুঝতে পারবেন। চিত্ত নির্ব্যাকুল হলে এক পরমানন্দে সবই যেন ভরে আছে বলে বোধ হয়। কোন কিছুর জন্যই মনের কোনও বেগ থাকেনা। এমন তরঙ্গশূন্য চিত্তেই সমত্বের উপলব্ধি হয়, এটাই পরাভক্তি। এই অবস্থাটাকে দীর্ঘতর যোগাভ্যাসের দ্বারা পাকাতে পাকাতেই উপলব্ধি হয় যে সর্ব্বভূতে এক আত্মাই আছেন এবং এই সব অনন্তভাব সেই আত্মভাবের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয়ে চলেছে। অবশ্য ঐ

অবস্থায় সর্ব্বভূতও থাকে না। কোনও চিন্তা ভাবনা, বিচার, আলোচনা, কিছুই থাকে না। এটা পরের শ্লোকে বলা হয়েছে ॥ ১৮/৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।।৫৫

অনুবাদ: আমি যেরূপ (সর্ব্বব্যপী) এবং যাহা (যেরূপ বাক্য ও মনের অগোচর) পরম ভক্তিদ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে এইরূপ অবগত হন। অনন্তর (ভক্তি পরিপাকে) আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া, পরে আমাতে প্রবেশ করেন (অর্থাৎ আমিই হইয়া যান) ॥ ১৮/৫৫

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে পরাভক্তির কথা বলা হল সেই পরাভক্তির দ্বারা আত্মায় স্বরূপজ্ঞান বা মুক্তির কথা এই শ্লোকে ভগবান বলছেন। পরাভক্তি লাভের পর কি অবস্থা হয় ? সেটা কেমন ? পরাভক্তির উদয়ে তত্ত্বজ্ঞান হয় মানে হল পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা যায়। পাঠক বলবেন তত্ত্বতঃ জানাটা কেমন ? স্বরূপজ্ঞান ও মহিমাজ্ঞান এই দুইরকম জ্ঞান হলে তবেই বিষয়টা তত্ত্বতঃ জানা যায়। চিন্ময় পরমাত্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ কি ? আবার চেতন মহিমাটাই বা কি ? এদুটো জানতে পারাই পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা। যেমন কোন বস্তু বা বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে নিজের চৈতন্যকে সেই স্তরে বা তদাকারীয় না করতে পারলে হয় না, তেমনই পরমাত্মজ্ঞান লাভ করতে হলেও পরমাত্মায় আত্মময়তা প্রাপ্তি ছাড়া উপায় নেই। ঠিক সাঁতার শিখতে হলে যেমন জলে না নামলে বা শরীরকে না ভিজালে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনই অদ্বৈতব্রহ্মবোধে আরূঢ় হয়ে পরাভক্তি লাভ করে তার পর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। আর পরাভক্তি সমুদ্ভাসিত হয় ব্রহ্মে "ঐতদাত্ম্যবোধে" অবস্থান করতে পারলে। এমন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মমহিমা বা সাংখ্যে বর্ণিত পঁচিশ রকম তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পর সেই তত্ত্বজ্ঞানের সাহয্যেই পরমাত্মতত্ত্বে চিরদিনের জন্য প্রবেশলাভ বা নির্ব্বাণলাভ হতে পারে। তবে এমনভাবে তত্ত্বপ্রজ্ঞায় আরূঢ় হয়ে আপ্তকাম অবস্থায় থাকা এবং তারপর তাতে নির্ব্বাণলাভ করা দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা বিষয়। আপ্তকাম হবার পর যদি কেউ ব্রহ্মনির্ব্বাণের সিদ্ধান্তে আসেন তবেই এই অবস্থা থেকে আগে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে ঐ ক্রিয়ার সাহায্যে আপ্তকাম অবস্থা থেকে মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়ে পরবর্ত্তী কল্পে আর স্বতন্ত্র পুরুষরূপে উদ্ভূত হতে হয় না। তখন দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় বোধই চিরদিনের মত নিবৃত্ত হয়ে যায়। যাই হোক স্বরূপজ্ঞান ও মহিমাজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। যোগের ব্যবহারিক প্রয়োগ সাথে সাথে না করলে এ সমস্তই শুকনো তত্ত্বকথা মাত্রে পরিণত হয়। যাঁরা যোগাভ্যাস করেন বা অন্ততঃ একটু হলেও শুরু করেছেন তাঁদের কাছে অবশ্যই পরিষ্কার অর্থবোধ হয়। যাহোক তত্ত্বজ্ঞানের জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা দুইই দরকার যদিও এই দুটোই আবার পরস্পর

বিরুদ্ধ। পাঠক এখন প্রশ্ন করবেন তাহলে ক্রিয়া বা যোগসাধনদ্বারা এমনতর জ্ঞানের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া কি করে সম্ভব ? অতএব যোগসাধনদ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি কল্পনায়ও আনা ঠিক নয় কারণ জ্ঞানটা হল স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার এবং আত্মাই সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যা স্বপ্রকাশস্বরূপ। প্রাণ পরমাত্মার মায়াশক্তি যা থেকে মন উৎপন্ন হয়ে নানা রকম কল্পনা করে আর তারই প্রভাবে সকল অসত্যকে সত্য বলে মনে হয়। এবার বলি কল্পনাগুলো তাহলে কি ? কল্পনাগুলো প্রাণের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়। মনের এত কল্পনারাশি, ইন্দ্রিয়ের এতশত বিষয় গ্রহণের কাজকর্ম্ম এসবের কিছুমাত্রও সম্ভব হতো না আত্মসত্তার অস্তিত্ব না থাকলে। তাহলে এবার বোঝা গেল যে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মসকল আত্মারই অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এখন পাঠক বলবেন যদি তাই হয় তবে তো আত্মা আগে থেকেই আছে এবং বরাবরই থাকবেও। তাহলে আর তাকে পাবার জন্য আর এত তুলকালাম করার কি দরকার আছে ? উত্তরে বলি তার কারণটাই হল এই মনের বিকার যা আত্মজ্ঞানের অভাবেই হয়ে থাকে। এছাড়া আর কিছুই নয়। যে জিনিষ হাতের মধ্যেই ধরা আছে মনের ধাঁধায় পড়ে মনে হয় তা নেই। মনের চাঞ্চল্য ঘুচলেই দেখা যায় যা খুঁজছিলাম এই তো হাতের মধ্যেই আছে। কিভাবে প্রাণ স্পন্দিত হয় এবং সেই স্পন্দন কিভাবে মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদিতে পরিণত হয়ে অনর্থ তৈরী করে সেটা জেনে তা থেকে মনকে সরিয়ে এনে বিপরীত ভাবে ও ভাবনাদ্বারা প্রাণধারাকে বিপরীত মুখে চালাতে পারলেই জীবত্ব ঘুচে শিবত্ব লাভ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠাই চতুর্থী ভক্তি যা ত্রিবিধ ভক্তি থেকে অন্যরকম। এমনতর ভক্তিদ্বারাই যে কর্ম্মনিষ্ঠার সাধন সেটাই হল যোগ। জ্ঞানও ভক্তি, কর্ম্মও ভক্তি এবং শ্রদ্ধাভক্তিও ভক্তি এমন ভক্তিদ্বারাই‘আমি’ যে কি সেটা জানা যায় এবং এই আমি যে সমস্ত কিছু থেকেই অভিন্ন সেটাও জানা যায়। এটাই তত্ত্বতঃ জানা। এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলেই হৃদয় গ্রন্থিভেদ হয় ও সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়ে মুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়

“ভিদ্যতে হৃদগ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ”।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥”

তখন‘আমি’‘আমার’ থাকে না, জীব ও ঈশ্বরে ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়। সাধন করতে করতে সাধক এই স্থূলদেহের অতীত এক জ্যোতির্ম্ময়লিঙ্গ দেবের অনুভব করেন। পরে ঐ জ্যোতির অর্ন্তগত আর একটা শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়। ঐ বিন্দুই আমার‘আমি’ বা জীব। পরে ঐ জীব বিন্দুও অনন্ত অরূপ স্থিরসমুদ্রে প্রবেশকরে নিজের নাম রূপ সবই ভুলে যায়, দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। শুধু এক অদ্বিতীয় আত্মসত্তা মাত্র অবশিষ্ট থাকে যা দেখারও আর কেউই থাকেনা। এটাই হল “বিশতে তদনন্তরম”। এহেন, জ্ঞাননিষ্ঠা, ভক্তি ও দীর্ঘ সাধনার কোনও বিকল্প নেই। এমনতর ভগবদাশ্রিতের মোক্ষ কিরূপে হয় সেটা পরের শ্লোকে দেখুন॥ ১৮/৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ।। ৫৬

অনুবাদ: সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হন॥ ১৮/৫৬

ব্যাখ্যা: কিভাবে সাধকের নিজকৃত সকল কর্ম্মই পরমেশ্বরের আরাধনারূপ মোক্ষকর্ম্মে পরিণত হয় সেই মীমাংসা ভগবান এই শ্লোকে এসে শেষ করলেন। সমস্ত জন্মমৃত্যুর কারণস্বরূপে, চাঞ্চল্যে চাঞ্চল্যে, কর্ম্মে কর্ম্মে ও ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত আত্মরূপ ভগবৎ-তত্ত্ব দর্শন, তারপর তা থেকে অদ্বৈত “তত্ত্বমসি” প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবোধে উন্নীত হয়ে তা থেকে পরাভক্তি, পরাভক্তি থেকে তত্ত্বজ্ঞান এবং শেষে তত্ত্বজ্ঞান হতে চরম নির্ব্বাণরূপ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মত্ব অবধি যে লাভটা হতে পারে সেই বিজ্ঞানটার (System) বিশদ ব্যাখ্যা করে ভগবান দেখালেন যে জীবের পরম কল্যাণের জন্য মুক্তিকামী জীবের পরকর্ম্ম (পরধর্ম্ম) অবলম্বনের কিছুমাত্র দরকার নেই বরং যে সহজাত বা বর্ণগত কর্ম্মস্বভাব নিয়ে জীব জন্মগ্রহণ করে, সেই বর্ণগত কর্ম্ম অবলম্বনেই সে কৃতকৃত্য হতে পারে যদি শুধুমাত্র গুরুকৃপায় তার মূলে ভগবৎ প্রতিষ্ঠাটা দেখতে পায়। তা নইলে শুধু শুধু কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তর গ্রহণ করে বর্নসঙ্করা সৃষ্টি করে বীজশক্তি, আত্মবীর্য্য ও নিষ্ঠা আকারীয় তেজ ধ্বংস করে ক্রমশ সমস্ত জীবকুলকে ধ্বংসের পথে নেবার কোনও দরকার নেই। আগেও বলেছি “কৃ-পা” মানে “করে পাওয়া”। শ্রদ্ধা ভক্তির অবলম্বনে ভিতরটা সম্পূর্ন শুদ্ধ হয়। ভক্তিভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হলেই কর্ম্মসন্ন্যাস হয়, তখন আর বাইরের কাজ বড় একটা করা যায় না কেননা এক আত্মাকারা বৃত্তি ছাড়া আর কোনও বৃত্তিরই উদয় হয় না। এখানে পাঠক এখন একথাই ভাবছেন যাদের অন্তঃকরণ এতটা শুদ্ধ হয়নি অথবা প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যাদের মন এখনও নির্ম্মল হয়নি, তাদের কি আর এমনতর উচ্চ অবস্থা লাভের কোনও আশা এজন্মে আর নেই ? আছে, নিশ্চয়ই আছে। তিনি কিভাবে কর্ম্ম করলে শুদ্ধ চিত্ত হয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পারেন সেই শরণাগতি লাভের কথাই ভগবান এখানে বলছেন। প্রথমেই জড়বাদের বিপরীত ভাব গ্রহণ করতে হবে। জড়বাদীর ইহকালও নেই পরকালও নেই। যদিও বা কারও বুদ্ধি, প্রেরণা, অনুরোধ অথবা নিতান্ত দেখাদেখি হয়ত দীক্ষা গ্রহণাদি করেও, কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথায় মনের ভিতরে থাকে পাটোয়ারী বুদ্ধি। প্রচণ্ড মনোবল দ্বারা জড়বাদে বিশ্বাস প্রত্যাহার করতে হবে। জড়বাদ হল পরধর্ম্ম যার বিপরীত হল আত্মধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মে আস্থা না থাকলে, বিশ্বাস না থাকলে, আত্মতত্ত্বের বোধই হবে না। জড়বাদের ধাক্কায় পড়ে, স্রোতে পড়ে, এই অপূর্ব্ব কর্ম্মবিজ্ঞান হারিয়ে জগৎ আজ ভগবৎশূন্য আসুর রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই কর্ম্মবিজ্ঞান বুঝতে না চেয়ে, এবং বুঝতে না পেরে, আজ জড়বাদ, ভোগবাদ, মিথ্যাবাদ, ভ্রান্তিবাদ তথাকথিত সন্ন্যাসবাদ নামক কর্ম্মত্যাগবাদ ইত্যাদি

বর্ণাশ্রম বিরোধী ভাবসকল সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আজ মানুষের জীবনে এত দুঃখ। যা চায় তা পায় অথচ দুঃখ ঘোচে না। দুঃখ তার সঙ্গের সাথী হয়েই থাকে। কর্ম্মের অমৃতত্ব ও জগতের অমৃতত্ব দর্শন করার ঋষিও তাই আজ আর নেই। যাক সেসব অন্য কথা। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করেও মনটা যদি তাঁর দিকেই পড়ে থাকে তাহলে তিনি অবশ্যই শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশমত প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করতে ভুলবেন না। মনকে সর্ব্বদা চক্রে চক্রে লাগিয়ে রাখতে পারলে মন ক্রমে ক্রমে স্থির, বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন হবে। এটাই “মদ্ব্যপাশ্রয়” বা শরণাগতি। প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ যদি কারও চিত্তশুদ্ধি না হয়ে থাকে, মনের মল এখনও যথেষ্ট থেকে থাকে, শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় নিন কিছুটা কষ্ট হলেও নির্জ্জনে তাঁকে সব খুলে বলুন, দেখবেন তিনি ঠিক কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে দেবেন। যদি প্রতিবিদ্ধ কর্ম্ম কিছু করে ফেলেন, শীগগির গিয়ে বলে ফেলুন, তারপর গুরুপদিষ্ট পথে স্মরণে তৎপর হন। “গুরুকৃপাহি কেবলম্ ”। গুরুকৃপায় ঠিকই পরমগতি লাভ করতে পারবেন। কারণ সর্ব্বদা স্মরণের ভাব থেকেই মন স্থির ও প্রসন্ন হতে থাকে। এটা ভক্তিরই নামান্তর। তাই একান্ত শ্রদ্ধাভক্তি এর অপরিহার্য্য উপাদান। “কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে । গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে ॥” অতএব এমনতর ভগবৎ ভক্তি লাভ হলে বৈরাগ্য মানে অন্য কিছুতে মন না দেওয়া এবং জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মপদে প্রবেশলাভ করে কৃতার্থ হন। তবে সাধক যেন গুরুনির্দ্দেশে ফলাকাঙ্খাদি পরিহার করে কর্ম্ম করে চলেন, বাজে সময় নষ্ট না করে গুরু সকাশে থাকার চেষ্টা করেন। এতেই কাজ হবে, “মৎপরায়ণ ” হওয়া যাবে। নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মলাভের বিষয়ে আরও দেখুন পরের শ্লোকে ॥ ১৮/৫৬

> চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
> বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ।। ৫৭

অনুবাদ: তুমি চিত্তদ্বারা সর্ব্ববিধ কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা (কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও) মচ্চিত্ত হও (আমাতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক অবস্থান কর) ॥ ১৮/৫৭

ব্যাখ্যা: নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ব্রহ্মলাভের কথা ভগবান আগের শ্লোকেই বলেছিলেন। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি অবলম্বন করতে পারলেই হল। কর্ম্ম যদি কর্ম্মফল প্রসব না করে তবে তা কর্ম্ম না করারই তুল্য। কর্ম্মের উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম্ম না করলে অথবা কর্ম্মতে মমত্ব বুদ্ধি না থাকলে সে কর্ম্মের ফলভোগ করতে হয় না। শাস্ত্র ও বিচার অনুযায়ী কাজ করে চললে কর্ম্মবন্ধন নেই। আর যদি শাস্ত্র ও বিচারে অসমর্থ হও তবে গুরু নির্দ্দেশে কর্ম্ম করে চল, বন্ধন হবে না, ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ হবে। চিন্ময় ভগবানই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা। এমন দর্শন, এমনতর ভাবে ভগবানে (গুরুতে) কর্ম্ম সমর্পণ।

ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকর্ম্ম বলে কোনও তারতম্য নেই। যেমন বুদ্ধি অবলম্বনে সকল কর্ম্মই ভগবানে দেখতে হয়, ভূত হতে জ্ঞানতত্ত্বে, জ্ঞান হতে আত্মতত্ত্বে, আত্মা হতে কূটস্থে বা ঈশ্বরতত্ত্বে যে ভাবে দৃষ্টি ন্যস্ত করতে হয় সেকথা আগেই বিশদ ভাবে বোঝান হয়েছে। কর্ম্মবিজ্ঞান বলার পর এখন ভগবান সংশয়চিত্ত অর্জ্জুনকে সেই একইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রেও (সাধনক্ষেত্রে ও সংসাররূপ, কর্ম্মরূপ ক্ষেত্রে) ভগবৎকর্তৃত্ব দেখার উপদেশ দিচ্ছেন। “তোমার চিত্ত” এমন ধারনা করে নিজে কর্ত্তা সেজো না, কারণ ঐ চিত্ত তোমার নয়, ঐ চিত্তও আমারই। যতক্ষণ চিত্ত তোমার ততক্ষণ তুমিও তোমার, সকল কর্ম্মই তোমার, অতএব কর্ম্মফলও তোমার, নাও তুমিই সব ভোগ কর। আমি দ্রষ্টা মাত্র। আর বুদ্ধিদ্বারা নিজের অন্তরে আত্মবোধস্বরূপ চিন্ময় অস্তিত্ব অবলম্বন করে, সর্ব্বকর্ম্ম আমারই এমনতর দর্শন হলে, এমন ভাবকে পাকাতে পারলে ও স্থায়ী করতে পারলে তবেই তোমার চিত্ত যে আমারই এমন ধারণা তৈরী করতে পারবে। শ্লোকের প্রথম শব্দ “চেতসা” প্রয়োগের এটাই তাৎপর্য্য। এভাবে আত্মচৈতন্য অবলম্বনে ভগবদ্দর্শনের যে সূচনা দীক্ষাদানরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা হয়, তৎপরে গুরুপদিষ্ট কর্ম্ম করে সমস্ত কর্ম্ম তাঁতে সংন্যস্ত দেখার চেষ্টার উপদেশই ভগবান দিয়েছেন। এ জন্যই “মৎপর” হতে হবে মানে সর্ব্বদা আমাকে নিয়েই থাকতে হবে বা আমাতেই থাকতে হবে। চিত্ত যদি ঈশ্বরে বা গুরুতে সমর্পণ হয়েই গেল তাহলে তো তুমি তাঁর আজ্ঞাবহ মাত্র। সুতরাং তোমার আর কর্ম্ম কোথায় ? তুমি তো তাঁরই আদেশে তাঁরই কর্ম্ম করে চলেছ। গুরুমুখী মন বুদ্ধি হলে আপনি আপনাতে থাকা যায়, বুদ্ধিও স্থির হয়, ভেদবুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধিতে সমতা আসে আর তখনই “মচ্চিত্ত” হওয়া যায়। এমন মচ্চিত্ত হয়েই গুরুপ্রদত্ত ক্রিয়া করে যেতে হয়। তবেই বুদ্ধি স্থির হয় ও “মৎপর” হওয়া যায়। চিত্ত সমর্পণ এমন নিখুতভাবে না হলে গুরুতে যুক্ত হওয়া যায় না। অযুক্ত বুদ্ধিতে সারা জীবন সাধনকর্ম্ম করে গেলেও বিশেষ কিছুই হয় না। “নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য, নচাযুক্তস্য ভাবনা”। চিত্ত সমর্পণ না হলে সেই বহুমুখী বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মচিন্তা হয় না, হতেই পারে না। সে জন্যই জীবনভোর দৌড়ঝাঁপ করেও, মঠ মিশনের সকল অনুষ্ঠানে খাটাখাটুনি ও ভলান্টিয়ারী করাই সার হয়, শেষে নিজের শারীরিক ও আর্থিক সঙ্গতি যখন শেষ হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে কিছুই হয় নি, এমনকি কোনও গুরুভাই বোনরাও আর তাঁর বিষয়ে কিছু ভাবে না, খোঁজ খবরও করে না। অথচ চিত্তবৃত্তিকে প্রথমে গুরুমুখী ও পরে ব্রহ্মমুখী করতে কিন্তু এত দৌড়ঝাঁপের কোনই দরকার হয় না। আত্মাতে সর্ব্বদা থাকার উপায়ই চিত্ত সমর্পণ করে ক্রিয়া করা ও আসল শরণাগতি লাভ করা। তাহলেই অনিচ্ছার ইচ্ছায় যোগমগ্ন সাধকের সকল কর্ম্মই হয়ে যায়। তখন আর লাভালাভ, জয় পরাজয়, পাশ ফেল ইত্যাদিতে বুদ্ধির বিক্ষেপ বা চিত্তের চাঞ্চল্য কোনওটাই হয় না। বুদ্ধির এমনতর সমতা হলেই সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হয়। তখন আর দেহাত্মবোধ বা আপন পর বোধ থাকে না। এভাবে “মচ্চিত্ত” হতে পারলেই চিত্তে আর অন্য কোনও প্রত্যয় স্থান পায়না ও সাধক একমুখী ও দৃঢ়চেতা হতে পারে এবং কেবল আত্মাকারা বৃত্তিরই

প্রত্যয় হতে থাকে। আত্মার সাথে বুদ্ধিযুক্ত হলেই অনন্যশরণ হওয়া যায়। তখন সবকিছু করলেও কোনও কর্ম্মেই আর বন্ধন থাকে না বরং কর্ম্মদ্বারাই সকল প্রারব্ধ বন্ধনও নষ্ট হয়ে যায়। কিভাবে অহঙ্কারের বিনাশ হলে আত্মনিমগ্ন চিত্তের সকল দুঃখদুর্গতির নাশ হয় সেটা পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ১৮/৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ।।৫৮

অনুবাদ: মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদয় সুদুস্তর সাংসারিক দুঃখ হইতে উত্তীর্ন হইবে। যদি অহঙ্কারবশতঃ তুমি (আমার বাক্য) না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে (অধোগতি পাইবে) ॥ ১৮/৫৮

ব্যাখ্যা: ভগবান বলছেন তারপর যেটা হবে সেটা শোন। আগে যেভাবে বলেছি সেভাবে মদ্গত চিত্ত হতে পারলে আমার প্রসন্নতাবলে সমস্ত দুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করবে আর যদি তুমি তোমার সামাজিক অবস্থান, আর্থিক প্রাচুর্য্য ও উচ্চশিক্ষাদি জনিত অহং কর্তৃত্বের জ্ঞানমোহে আমার এ উপদেশ না শোন তবে যা খুশি কর এবং বিনষ্ট হও মানে পুরুষার্থ হতে ভ্রষ্ট হও। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ ভগবচ্চিত্ত হওয়া যায় না, আবার ভগবচ্চিত্ত হতে পারলে তবেই অহং কর্তৃত্ব বোধের বিনাশ হয়। এ তো বড় সমস্যা হল। তোমাতে চিত্ত না দিলে অহঙ্কার যাবে না এবং অহঙ্কার না গেলে তোমাতে চিত্ত সমর্পিত হবেনা। এ তো ভীষণ জ্বালা। এ সমস্যার সমাধান কোথায় ? পাঠকের মনে এখন এই একটাই প্রশ্ন। এ সমস্যার সমাধান হল আত্মবোধে। এ জন্যই ভগবান কর্ম্মবিজ্ঞান এত বিশদভাবে বুঝিয়েছেন ও কর্ম্মে কর্ম্মে আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেখতে শিখিয়েছেন। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে এই একটা অপূর্ব্ব সেতু রয়েছে। ঐ তদাত্ম্যজ্ঞানোদয়ে উভয় সমস্যারই একযোগে সমাধান হয়ে যায়। এই সেতু অবলম্বনে বন্ধন বা মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায়। বেদের কথায়– "অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভোদায়।" ঐ সেতু অবলম্বনেই ব্রহ্ম জীব ও ঈশ্বর সাজেন। সুতরাং যদি আত্মচেতনতা লক্ষ্য কর তাহলে তাঁর ঈশ্বরত্বে সহজেই তোমার দৃষ্টি পড়বে আর তুমিও ঈশ্বরময় চিত্ত হয়ে অহংকর্তৃত্বের হাত থেকে রেহাই পাবে। আসলে বাহ্য "আমি"র বেষ্টনীর মধ্যে এলেই মনে অহংভাব আসে এবং নিজেকেই কর্ত্তা বলে মনে হয়। প্রকৃত "আমি"তে ডুব দিতে পারলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয় আর সব ফাঁদ পেরিয়ে আসা যায়। ষড় রিপুর দল চার দিকেই ফাঁদ পেতে বসে আছে মনকে বাঁধার জন্য, তাই নিজেকে একেবারে নিরালম্ব করতে হয়, যেন মনের কোনও আশ্রয় বা অবলম্বন না থাকে। নিজের চিত্তকে তাঁর চিত্তের ভিতর ডুবিয়ে দিতে হবে, তাঁর রঙে রাঙিয়ে নিতে হবে। কবীরদাসের ভাষায় – "এয়সা রং দে কি রং নাহি ছুটে"। এমন আত্মভাবই স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মে

নিজের মতিকে বাঁধতে না পারলে সেই ধর্ম্মহীন ব্যক্তি কখনও তাঁর কৃপালাভ করতে পারেনা। প্রাণ বর্হির্মুখী থাকলে প্রাণের স্পন্দনের সাথে সাথে চিত্তেও স্পন্দন ওঠে ও তাতে কেবল রাশি রাশি বিষয়াসক্তির ফেনা ভর্ত্তি থাকে। সুতরাং চিত্তও সেই বিষয়াকারিত হয়ে শুধু বিষয় খুঁজেই বেড়ায়। প্রিয় জনের মৃত্যুকালীন শোকমগ্ন হয়েও বলে ওঠে, আলোগুলো সব শুধু শুধু জ্বলছে, নিভিয়ে দে, এমন বিষয়মগ্ন চিত্ত আর আত্মমগ্ন হবে কি করে ? সুতরাং শরণাগতির জন্যও কিছু পুরুষকার দরকার। পুরুষের প্রযত্ন ও চেষ্টাই সেই পৌরুষ। যে চেষ্টা করবে, লেগে থাকবে, তারই হবে। আর তা না করে অহংকার বিমূঢ় চিত্ত হয়ে থাকলে বিনাশ হবে। "সর্ব্বদুর্গাণি" কথার সাধারণ অর্থ হল সর্ব্বসঙ্কট। আর অধ্যাত্মতত্ত্বে দুর্গ বলতে সংস্কারগ্রন্থিকে বোঝায়। এমন সংস্কারগ্রন্থিই হল জীবত্বের আশ্রয়, জীবত্বের দুর্গ। রিপুদলের ফাঁদ পাতার শক্তি এবং নিজকৃত পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার মিলে যে ভীষণ দুর্গ তৈরী হয়েছে তা ভেদ করে বের হওয়াটা যেন অসম্ভব বলেই মনে হয়। এহেন সংস্কাররূপ দুর্গকে ভেঙ্গে বিধ্বস্ত করে তছনছ করতে না পারলে জীবের ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি কোনওটাই হয় না। তাই ভগবতী যখন জীবকে উর্দ্ধে তুলে নিতে ইচ্ছুক হন তখন ঐ দুর্গ বিধ্বস্ত করে তুলে নেন, তাই তিনি দুর্গা আর এটাই সেই পুরাণে বর্ণিত দুর্গাসুর বধ "সর্ব্বদুর্গানি" অর্থ হল সর্ব্ববিধ সংস্কার যা থেকে অভিমান জন্মে ও নিজের চেয়ে নিজের স্ট্যাটাস বড় হয়ে ওঠে। ভূলেও মনে হয়না যে নিজের চেয়ে নিজের ছায়া যখন দীর্ঘতর হয়ে যায় তখনই বুঝতে হবে যে জীবনের বেলা শেষ, জীবনসূর্য্য পশ্চিমে এসে ডুবতে চলেছে। কিন্তু অহং আবৃত জীবের এমন বোধ জন্মায়ই না কারণ তাকে স্ট্যাটাস রক্ষা করে তালে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলগুরু হলেও তার স্ট্যাটাস নেই তাই সে আজ মর্য্যাদাবিহীন ও অচ্ছুৎ যেহেতু সে হয়ত অনাহারে পীড়িত, ও কুৎসিৎদর্শন, তাই তাকে গুরু বলে মানাই সম্ভব হয় না। অপরদিকে আভিজাত্যের প্রতীক যে সমস্ত সংস্থায় মন্ত্রী, যন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি পর্য্যায়ের ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সেসব জায়গায় শিষ্যত্ব গ্রহণে এমন সংস্কারের দুর্গ আরও বেশী মজবুত হয়ে ওঠে তখন আর বিশাল দুর্গা প্রতিমা আলোকসজ্জা সহকারে পূজিত হলেও সে দুর্গ অক্ষতভাবেই বিরাজ করে। সে জন্যই ভগবান অর্জ্জুনের ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সমগ্র কর্ম্মবিজ্ঞানটা ব্যক্ত করেও তারপর আবার তার স্বাধীন ইচ্ছায় চলার অধিকারটা মনে করেই এই শ্লোকটা বললেন। জীবনে কর্ম্মচাঞ্চল্যময় সংসারের বারবার আবর্ত্তনেও এ স্থিতিশীলতাটা হারায় না তার কারণটা ও রহস্যটাই হল এই দুর্গ, যে কথা বলা হল আর যে ভগবৎ শক্তির দ্বারা এর ধ্বংসসাধন হয় সেই শক্তিরূপিনী ভগবতীই হলেন দুর্গা – দুর্গতিনাশিনী। বিশুদ্ধ প্রেমময় পরমাত্মার আত্মত্বের টুকরো হলাম আমরা। তাই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের তিনি কোথাও নিতে চান না, এমনকি নিজেতেও নয়। মা যেমন শিশুকে শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে খেলা ছাড়িয়ে তুলে নেন না, ঠিক তেমনই। আত্মতত্ত্ব দেখতে পেলে নিজে থেকেই আমরা সব খেলাধুলা ছেড়ে দেব। এই আত্মতত্ত্ব

দেখা বা না দেখার উপরই সবটা নির্ভর করে। সেজন্যই ভগবান কর্ম্মবিজ্ঞানের মূলে যে আত্মবিজ্ঞান সেটা বিশদভাবে দেখিয়ে তবে ব্রহ্মতত্ত্বকথা সম্পূর্ণ করেছেন। প্রথমভাগে ক্ষর ও অক্ষর আত্মার বিষয়, মধ্যম ভাগে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তত্ত্বের কথা বলার পর যদি এই কর্ম্মবিজ্ঞানটার ব্যাখ্যা এভাবে না করতেন তবে গীতা অসম্পূর্ণই থেকে যেত ॥ ১৮/৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯

অনুবাদ: অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া " আমি যুদ্ধ করিব না " এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার এই সঙ্কল্প নিশ্চয়ই মিথ্যা। (কারণ) প্রকৃতি তোমাকে (যুদ্ধে) প্রবৃত্ত করিবেই ॥ ১৮/৫৯

ব্যাখ্যা: জীবের প্রকৃতি পরতন্ত্রতাই তাকে প্রকৃতির দাস করে রেখেছে। সুতরাং অর্জ্জুন যতই আত্মীয় বন্ধুবর্গের সাথে যুদ্ধে অনিচ্ছুক হোক না কেন তার ক্ষত্রিয় প্রকৃতিই তাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে কারণ জীব মাত্রেই প্রকৃতির দাস। একইভাবে তোমরাও মুখে যতই বল যে কাজ নেই বাপু আমার ও সমস্ত আত্মদর্শনের হাঙ্গামায় তার চাইতে বরং যাগযজ্ঞ ও ব্রত নিয়মাদি পালন করে স্বর্গলাভ করতে চাই ইত্যাদি, কিন্তু তোমার প্রকৃতিই তোমাকে বার বার জন্মমৃত্যুর দুঃখ শোক দেখিয়ে সংসারের যাবতীয় তাপ উত্তাপের ভিতর দিয়ে দগ্ধ করে আত্মানুসন্ধানের জন্য একদিন না একদিন বাধ্য করবেই। এ ছাড়া জন্মজন্মান্তরের সংস্কারজাত যেটুকু সত্ত্বগুণ অথবা রজমিশ্রিত সত্ত্বগুণ লাভ করেছ সেই সত্ত্বপ্রকৃতিই তোমায় আত্মানুসন্ধানে ব্যাকুল করে তুলবে। তুমি যোগাভ্যাস করছ, ক্রিয়া করছ, ঠিকই কিন্তু শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখবে যেন ক্রিয়াতে কখনও ফলাকাঙ্খা না থাকে, তাহলেই তুমি কৌশলে প্রকৃতিকে বশ করতে পারবে। এখন যেটা অসম্ভব, অসাধ্য মনে হচ্ছে সেটা একদিন অনায়াসেই হয়ে যাবে, শুধু লেগে বেঁধে থাকতে হবে। তুমি যে ক্ষত্রিয়স্বভাবাপন্ন তাই ব্রাহ্মণের মত স্থির ও ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে পারবে না, আবার যোগাভ্যাসরূপ যুদ্ধ ছেড়ে চাইলেও চলে যেতে পারবে না, তোমার মন ক্রিয়া করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে। তোমার ক্রিয়া করতেও কষ্টবোধ হবে কিন্তু উপায় নেই, ক্রিয়া ছাড়া এ কষ্টের শেষ হবে না। সুতরাং ক্রিয়া করাই ভাল। আর যদি একান্তই গোঁয়ার্তুমি করে ক্রিয়া না কর তবে জন্মমৃত্যুর কষ্ট বার বার ভোগ করতে করতে আবার সেই নিজেকেই এসে শ্রীগুরুদেবের চরণতলে আছড়ে পড়তে হবে। কবীর দাসজীর ভাষায় " আউর উপায় কুছ নাহি "॥ ১৮/৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ।।৬০

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, মোহ বশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা কর না, পূর্ব্বসংস্কারজাত স্বীয় কর্ম্মে নিবদ্ধ তুমি অবশ হইয়াও তাহা করিবে ॥ ১৮/৬০

ব্যাখ্যা: প্রকৃতির কত শক্তি, কি নিয়ম, যে নিয়মে স্বীয় কর্ম্মদ্বারা নিজেই নিজে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে জীবত্ব সেখানেই পরাধীনতা, মানে প্রকৃতির অধীনতা। সাধারণ জীব তাহলে ভাবতেই পারে যে পরধর্ম্মও গ্রহণ করব না আবার স্বভাবজাত কর্ম্মও করব না। কারণ কর্ম্ম করতে গেলেই আত্মজ্ঞানের বাইরে গিয়ে বিষয়ে যুক্ত হতে হয়। সুতরাং সেসব কিছুই না করে শুধু আত্মবোধ যুক্ত হয়েই থাকব। এরই উত্তর ভগবান আগে বললেও আবার বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে সেটা তোমার দ্বারা হবার নয়। কারণ পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মে তুমি বাঁধা পড়ে আছ। এখনও তোমার কর্তৃত্ববোধ রয়ে গেছে, এখনও তুমি বীজশক্তিময়, তোমার কর্ম্মবীজ ধ্বংস হয়নি। অতএব তোমার স্বভাবই তোমায় কর্ম্মে নিযুক্ত হতে বাধ্য করবে। জীবভাব থাকতে মোটেই জীবের স্বাধীনতা নেই। সুতরাং জীবের জীবত্ব মোচনের উপায় অনুসন্ধানই বরং কর্তব্য হওয়া উচিত। প্রকৃতি তো নিজের কর্ম্ম করবেই। কিন্তু সে অবস্থায় আত্মা যে তাতে লিপ্ত হয় না এই উপলব্ধিতেই জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়। সুতরাং এখন থেকেই যদি যোগাভ্যাসে মন দাও, গুরুপদতলে আশ্রয় নাও, তবেই তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। যা পরে করতেই হবে সেটার অনুষ্ঠান এখনই কর, আগেভাগেই শুরু করে দাও, তাতেই পরম কল্যাণ লাভ হবে। অতএব শুভস্য শীঘ্রম্ ॥ ১৮/৬০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।। ৬১

অনুবাদ: হে অর্জুন, ঈশ্বর মায়াদ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূত সকলকে (সূত্রধারের ন্যায়) তত্তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৮/৬১

ব্যাখ্যা: অবিদ্যাদ্বারা শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সর্ব্বভূতকে নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম্মে পরিচালনা করতে করতে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে ঈশ্বরই অবস্থিত আছেন। আগে সাংখ্য এবং অন্যান্য মতেও জীবের যে প্রকৃতিপরতন্ত্রতা (অধীনতা), স্বভাবপরতন্ত্রতা ও কর্ম্মপরতন্ত্রতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে তারই রহস্যভেদ করতে গিয়ে ভগবান খুবই সোজাসুজিভাবে একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন যে ভগবানই সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়বৎ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে পরিচালনা করছেন। "দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে। ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্ত সোহন্যঃ ॥" কূটস্থ অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপে অক্ষরত্ব ও ক্ষরত্বপ্রকাশী বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই নিহিত আছে। এই বিদ্যা অবিদ্যা বা অক্ষরত্ব বা ক্ষরত্বকে যিনি পরিচালনা করেন, তিনি অন্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে আছে– "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো যময়তি, যম্ আত্মা ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরম্, এষ তে অন্তর্যাম্যাবৃতঃ" যার অর্থ – "যিনি আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াও বুদ্ধির অন্তর এবং বুদ্ধিকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন (তবুও) বুদ্ধি যাঁহাকে জানিতে পারেনা, এবং বুদ্ধিই যাঁহার শরীর অর্থাৎ উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী এবং অমৃত।" ক্ষর জীব, প্রকৃতি ও অক্ষর সমস্তের নিয়ন্তা ঈশান তিনিই। সর্ব্বভূতে, চেতনে, অচেতনে, সর্ব্বহৃদয়ে তিনি সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্তই তাঁরই দ্বারা যন্ত্রিত। অতএব মূল কথাই হল জীবের স্বাধীনতা নেই, জীব মূলতঃ পরাধীন – প্রকৃতিপরতন্ত্র, স্বভাবপরতন্ত্র এবং কর্ম্মপরতন্ত্র। প্রকৃতির প্রেরণাতেই অহঃরহঃ কর্ম্মচক্রে ঘুরতে হয় আবার যেহেতু স্বভাব ও কর্ম্মসংস্কারের বাইরে যেতে পারে না তাই সেই মত স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম করে নানা যোনিতে জন্মগ্রহন করে। আর ঐ সমস্ত কাণ্ডের ও রহস্যের আসল চাবিকাঠি হাতে নিয়ে যিনি পরিচালনা করে চলেছেন আমরা তাঁরই ইচ্ছামত নেচে চলেছি, আমাদের স্বাধীনতা বা মুক্তি নেই। সত্যিই কি এথেকে মুক্তি নেই ? না, তা নয়, মুক্তি নিশ্চয়ই আছে। জীব মুক্তিলাভ করে ও মুক্তিলাভ করেই স্বাধীন হয় ও প্রকৃতি পরতন্ত্রতা ঘুচে যায়, অবশ্য যদি সে নিজে এর জন্য সচেষ্ট হয়। একটা সহজ বিষয় বুঝতে হবে যে ভগবান বা পরমাত্মা সকল অবস্থাতেই প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন নন আর জীবও তো সেই পরমাত্মারই অংশ কিন্তু জীব যতকাল নিজেকে পরমাত্মা থেকে স্বতন্ত্ররূপে দেখে ততকাল যাবৎ তাকে প্রকৃতির অধীন হয়েই থাকতে হয়। জ্ঞানলাভ করে স্বরূপ জানতে পারলেই প্রকৃতি পরতন্ত্রতার শেষ হয়। কিভাবে যে এমন চেতনাসম্পন্ন জীব মায়ার বশীভূত হয় সেটাই এক অদ্ভূত রহস্য। শাস্ত্রমতে চিত্তই হল মায়ার নাভিদেশ, চিত্ত-চক্রের অবরোধ হলেই মায়ার খেলা বন্ধ হয়। এই মায়াকেই শাস্ত্রে বিষ্ণুশক্তি বা ভগবানের সংসার উৎপাদিকাশক্তি বলা হয়। তাই বিষ্ণুশক্তি ও বিষ্ণুমায়া একই কথা। মায়ামিশ্রিত এই চৈতন্যই নারায়ণ বা নারায়ণী। তন্ত্রে যাকে মহামায়া বলা হয়, বেদে যাকে মুখ্য প্রাণ ও যোগে স্থিরপ্রাণ বলা হয়। মায়ার কাজ এই দেহ, দেহকে অবলম্বন করেই জীবের যাতায়াত বা জন্মমৃত্যু চক্র। তাই মনুষ্য দেহটা (প্রকৃতি) যেভাবে নির্ম্মিত হয়েছে এবং জীব ঐ দেহের মধ্যে ঢুকে যেভাবে আটকে আছে, সেই দেহটাকে যথাযথ ভাবে জানতে পারলেই হল। বিভিন্ন নাড়ীমুখে প্রাণের গতি হলে কিভাবে মন উন্মত্তের মত সংসার চক্রে ছুটে বেড়ায় সেগুলো ব্যবহারিক অংশের বিষয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দেখুন এর বিশদ বর্ণনা আছে– "মনুষ্য দিগের দেহে বাতাদি বাহিনী দশটি নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণদ্বারা পরিচালিত হয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। যোগক্রিয়া অভ্যাসের ফলে বাহ্য সঙ্কল্পাদি রুদ্ধ হলেই হৃদয়ে এক রকমের যে স্থিতিবোধ হয়, সেটাই ঈশনশীলতা বা ঈশ্বরভাব। এই অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীরাই বুঝতে পারেন যে জগতের নিয়ন্তা কে ? কার শক্তিতেই বা জগৎ চলছে ? অধ্যাত্মরামায়ণের কথানুযায়ী – "জগত্ত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ। ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে ॥"

তাহলে দেহমধ্যস্থিত সেই ঈশ্বরকে বোঝা যায় কি ভাবে ? গুরুপদেশে মূলাধারাদি ভেদ করে সুষুম্নায় গিয়ে পঞ্চতত্ত্বের দখল নিতে পারলেই এমনতর শরীর মধ্যস্থ ঈশ্বরের হৃদ্দেশে স্থিতিটা প্রত্যক্ষ করা যায়। বোঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়, কিভাবে তাঁরই শাসনে পঞ্চতত্ত্ব, মন ও ইন্দ্রিয়সকল ভূতনিচয় স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত রয়েছে। তিনি না থাকলে কিছুতেই এভাবে পঞ্চতত্ত্ব কর্ম্মক্ষম থাকতে পারত না। সুতরাং দেহটাই জীবের যন্ত্র, স্বস্থানচ্যুত হলেই মায়া তাকে আক্রমণ করে বসে আর দেহাভিমান হয়। এভাবে দেহকে আমি বা আমার বলে স্বীকার করাই হল যন্ত্রারূঢ় হওয়া। তাহলে যেমনতর মায়ার দ্বারায় এমনভাবে যন্ত্রারূঢ় হতে হয়, তেমন মায়ার হাত হতে পরিত্রাণের উপায় যে শরণাগতি বা শরণাগত ভাব সে বিষয়ে পরের শ্লোকে ভগবান বলবেন ॥ ১৮/৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ।।৬২

অনুবাদ : হে ভারত সর্ব্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক আর মন্দই হউক) তাঁহারই শরণ লও, তাঁর প্রসাদে পরম শান্তি (চিত্ত প্রসন্নতা) এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮/৬২

ব্যাখ্যা: যিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিতি করছেন দেহ, মন, প্রাণ, বাক্য ও বুদ্ধি দিয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁরই শরণ নিতে হবে ও তাঁরই অনুগ্রহে পরম শান্তিলাভ করতে হবে। কারণ সাংখ্য এবং অন্যান্য মতেও অক্ষর আত্মতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রকৃতিই সমস্ত কাজ করে। জীবস্বভাবও প্রকৃতির অর্ন্তগত। তাই জীব ও প্রকৃতিও অক্ষরাত্মা সংযোগেই পরিচালিত। আগেও বার বারই বলা হয়েছে যে এই অক্ষরতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে অকর্ত্তা অথচ কর্ত্তা, অভোক্তা অথচ ভোক্তা। এহেন অক্ষরতত্ত্ব অবলম্বনে পরাভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বিষয়ে বিশদভাবে বলে সর্ব্বভাবে তাঁকে দেখার কথা বলেছেন। সর্ব্বভাবে অর্থে'জ্ঞ' ও'অন' মানে আত্মা ও অনাত্মা এই দ্বিবিধ ব্রহ্মপ্রকাশকেই এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানস্বরূপে দর্শন। এটাই হল পরাভক্তির ফল যে পরাভক্তি হল দেহাত্মবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত একথা আগেই বলা হয়েছে। একমাত্র পরাভক্তির প্রভাবেই যেখানে যা কিছু সমস্তই অবাধে ভগবান বলে গ্রহণের সামর্থ্য জন্মে। এমনটা হলে তবেই তো তাঁর অনুগ্রহে পরমা শন্তিলাভ করা যায়। বোঝা যায় যে শুভ বা অশুভ যে সমস্ত কাজে জীবগণ প্রবৃত্ত হয় তার মূলে ঈশ্বরের শক্তিই বিদ্যমান থাকে। কার্য্যকারণ বিজ্ঞান সম্যকরূপে উপলব্ধি করে তবেই জীব এমনতর উপলব্ধি পেয়ে থাকে। তখন আর এটা অচেতন বা ওটা মিথ্যে, এটা আত্মা বা ওটা অনাত্মা এমনতর প্রজ্ঞার উদ্ভাসন জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বে থাকেনা। দর্শন তখন শুধুমাত্র একটাই – "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" এমনতর ভাবটাতেই সমারূঢ় হবার জন্য ভগবান অর্জুনকে এই শ্লোকে বললেন। তাই সর্ব্বভাব তাঁতেই অর্পণ করতে হবে,

সমস্ত ভাবময় সংকল্প যে প্রাণ হতে জেগে উঠছে সেই প্রাণকেই তাঁতে ঢেলে দিলে আর এ ব্যক্ত জগতের কোনও স্ফূরণেই লক্ষ্য পড়বে না। তখন সমস্তই অব্যক্তের ভিতর আত্মগোপন করে সেই অব্যক্তই হয়ে যাবে ॥ ১৮/৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।। ৬৩

অনুবাদ:এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। ইহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিও (অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার মোহ নিবৃত্ত হইবে) ॥ ১৮/৬৩

ব্যাখ্যা: আগে ৫৮তম শ্লোক এবং পূর্ব্ববর্তী ও পরবর্তী শ্লোকগুলোতেও যেমনতর স্বাধীনতার ইঙ্গিত ভগবান দিয়েছেন, এখানেও সে কথাই বলেছেন আরও স্পষ্টভাবে। স্পষ্টতরভাষায় বললেন – তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কর। বিন্দুমাত্র বাধ্যবাধকতার আরোপ করেন নি। শুধু বলেছেন এই যে অনির্ব্বচনীয় পরমতত্ত্ব এটা সত্যই গোপন হতে গোপনতর, গোপনতম। এ জ্ঞানভূমিতে বিচার নেই, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নেই, দ্বিধা সংকোচ নেই, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণাদিও নেই আছে শুধুই ভগবদ্ বোধের প্লাবন, শুধুই হ্লাদিনী শক্তির উচ্ছাস যাতে মোহ অন্ধকার নষ্ট হয় ও জ্ঞানদীপ জ্বলে ওঠে। এহেন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যা যা দরকার সবই বলেছি, এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর, বলে জ্ঞানতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তটা করে, কর্তৃত্বটা অর্জুনের হাতেই ফিরিয়ে দিলেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ হতে পারলে এমন স্বাধীনতালাভে সর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভগবানে সমর্পণ করে। আর এমনতর সমর্পণের যে স্বাধীন শক্তি সেটাই হল সেই গুহ্যতম প্রজ্ঞালোক, যে আলোকে আলোকিত হতে পারলে নিরাকাঙ্খী যোগীর/যোগিনীর মনে আর কোনও বৃত্তিরই উদয় হয় না, ফলে তখন এই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে সুদৃঢ় ব্যবধান ছিল, সম্পূর্ণ সমর্পণের মধ্য দিয়ে, শরণাগতির মধ্য দিয়ে, সকল দূরত্ব, সকল বাধা বিলীন হয়ে যায়। তাতেই হয় প্রকৃত শিষ্যত্বের সূচনা। এর আগে পর্য্যন্ত শিষ্যের সকল প্রচেষ্টাই থাকে শুধুমাত্র তত্ত্বকথায় সীমাবদ্ধ। পরাভক্তির উদয়েই প্রকৃত শিষ্যত্ব লাভ হয়। এজন্যই কথায় বলে "ভক্তিতেই মুক্তি", এ ভক্তি সেই প্রচলিত অর্থে নয়, হাত তুলে নমস্কার অথবা মন্দিরে গিয়ে যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, সে সমস্ত কিছুই নয়, এ ভক্তিই হল পরাভক্তি যা প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হলে তবেই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এই পরাভক্তি বিনা জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা এ সবই বৃথা হয়ে যায়। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন – হ্যাঁ মশাই, আমিও তো শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষিত। আজ ষাট বছর যাবৎ ক্রিয়া করে চলেছি একান্ত নিষ্ঠা সহকারে, গুরুদেবও আমাকে মান্য করেন, আমার উপরেই এখন সব দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। ওনার শিষ্যদের ভিতর আমিই তো এখন এক নম্বর, অথচ আমার তো এখনও কিছুই হলো না, এমন কি কাম ক্রোধাদির বেগও তো সেই আগের মতই আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু ভালোমত লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সবকিছু করেও পরাভক্তির অভাবে শুধুমাত্র বালি দিয়েই নির্ম্মান কাজ হয়ে চলেছে, সিমেন্টের ছিটেফোঁটাও তাতে নেই। কোনও কাজই না বুঝে করতে নেই। প্রেমময় গুরুদেব শিষ্যত্ব প্রদানে কুণ্ঠিত নন, বরং শিষ্যকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে থাকেন। আগে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ কর, বিষয়টা ভাল মত বোঝ, তারপর শিষ্যত্ব গ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। এক কথায় এই গীতাশাস্ত্রের পরিপূর্ণ পর্য্যালোচনা করে তারপর যা ইচ্ছে হয় তাই কর। সংক্ষেপে জীবের মধ্যে তিনটে ভাব আছে (১) দেহাত্মভাব বা অজ্ঞতা, (২) জন্মমরণের দারুণ কষ্ট ছাড়াও জীবদ্দশাতে যে নিদারুণ সুখদুঃখের সমস্ত রকম ঘাত প্রতিঘাত যার প্রতিকারের কোন কর্তৃত্বই জীবের হাতে নেই এটা বুঝতে পারা ও তারপর (৩) অনন্য শরণাগতি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তপস্যা দ্বারা তাঁতে আত্মসমর্পণ করার স্বাধীনতা লাভ করা। আত্মার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই হল ভক্তিযোগ আর ভক্তিতেই মুক্তিলাভ হয়। এমনতর অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই ক্রমশঃ মোহনিবৃত্তি হয় ও স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভটাও নিজের আয়ত্বের মধ্যে আসে ॥ ১৮/৬৩

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।। ৬৪

অনুবাদ : সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার চরম কথা আবার শোন, তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্য তোমার হিত কহিতেছি ॥ ১৮/৬৪

ব্যাখ্যা : শ্রদ্ধাহীনকে উপদেশ দেওয়া নিস্ফল কিন্তু শ্রদ্ধাবানকে উপদেশ প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি অন্যান্য সকল দিক ঠিক থাকে ও অনন্যশরণাগতিতে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এটাই সেই গুহ্যতম রহস্য কথা যা তত্ত্ববস্তুকে জানতে হলে করা দরকার ও ঠিক যেমনটা হওয়া আবশ্যক সেই সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্ব আবারও অর্জুনকে বলছেন। আত্মতত্ত্ব জানার রহস্যময় সাধনার কথা তো আগেও অনেকবার ভগবান অর্জুনকে বলেছেন তবে আবার কেন অর্জুনকে এত আগ্রহ করে বলছেন ? কারণ সেই কথা যে তিনি ভগবানে দৃঢ়শ্রদ্ধ। শ্রদ্ধালু না হলে গুরু শিষ্যকে কখনও রহস্য কথা বলতে পারেন না। এজন্যই শিষ্যত্ব প্রদানের আগে ও পরে শিষ্যকে সদা সর্ব্বদা কতই না পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয় যেহেতু শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য সর্ব্বত্রে প্রকাশ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভাগবতে তাই ঋষিরা সুত কে বলেছেন – "ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত"। মানে হল শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য সর্ব্বত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হইলেও যে সকল শিষ্য স্নিগ্ধ অর্থাৎ গুরুভক্তি পরায়ণ, তাহাদিগকে গুহ্য, গভীর তত্ত্বসকল গুরু বলিয়া থাকেন। এখানেও অর্জুন ভগবানের নিতান্ত প্রিয় বলেই এই বক্ষ্যমান বিষয়টি দৃঢ় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণ যুক্ত বলে নিশ্চয় করে তাকে বলছেন। অবশ্য অনেক

জায়গায়ই গীতা পাঠকালে “দৃঢ়মিতি” র বদলে “দৃঢ়মতি” বলে পাঠ করতে শোনা যায়। একমাত্র ইষ্টসাধনায় যে দৃঢ়, ভগবানের কথা সেই বুঝতে পারে। দৃঢ়সাধন ও ভজনশীল সাধকের নিকটই পরম রহস্য প্রকাশিত হয়। অদ্বৈত ব্রহ্মবোধ হতেই পরাভক্তির উদয় হয়। পাঠক প্রশ্ন করবেন অদ্বৈতবোধে আবার ভক্তির জায়গাটা কোথায় ? যদি অদ্বৈত বোধই হল তবে আর কে কাকে ভক্তি করবে। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়। এমন বোধ রাতারাতি ঘটে না। অদ্বৈত অনুভূতি থেকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত যেতে চিত্তের সমস্ত সংস্কার মালিন্য দূর করতে হয় যেটা বহুকাল সাপেক্ষ। সংস্কারের ঐকান্তিক শুদ্ধি না হলে ব্রহ্মবিষয়ে নির্ম্মলচিত্ত হওয়া যায় না যেটা একান্ত প্রয়োজন। এখানেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদের আবশ্যকতা। শিষ্য গুরুদেবের অন্তরে তেমনতর আস্থা স্থাপন করতে পারলে, সদগুরু-প্রেম-ভক্তি সত্তায় তেমনভাবে স্বত্ববান হতে পারলে তবেই তেমন কৃপা লাভ সম্ভব হয় ও গুহ্যতম রহস্যজ্ঞান জন্মে, নইলে সাধনদ্বারা সাময়িক ঐ তদাত্ম্যবোধ পরমতত্ত্বে সনাতন স্থিতিলাভের সোপান মাত্র। সমগ্র কার্য্যকারণ বোধ প্রলীন না হলে তত্ত্বে চিরপ্রবিষ্ট থাকা যায় না। জলের ঢেউয়ের তরঙ্গত্ব ছেড়ে শুধু জল মাত্র হয়ে থাকতে চাইলে যেমন তার ঢেউ তরঙ্গক্রিয়াময় চঞ্চলতা জলেই মিলিয়ে যাওয়া দরকার হয় তেমনই ক্ষর আত্মারও সমস্ত চাঞ্চল্য পরমাত্মায় মিশে যাওয়া দরকার হয়। এটাই পরাভক্তির আশ্রয়। পরাভক্তি না হলে এমনটা সম্ভব হয় না। অদ্বৈত অনুভব থেকেই নির্ভয় নিশ্চিন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত নির্ভাবনা বা স্থিরচিত্ততা জন্মে ঠিক যেমন শিশু তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অদ্বৈততত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বটা কিন্তু মোটেই আলাদা কিছু নয়। পরাভক্তি হতে আত্মজ্ঞানসম্বুদ্ধ হবার উপায়স্বরূপ ঐকান্তিক আত্মসমর্পণেই সেই গুহ্যতম জ্ঞানের সূচনা। মিলনের যে ভাবটাকে তোমরা প্রেম নামে জেনে ও বুঝে থাকো তার মধ্যে যেটুকু একাত্মবোধ থাকে মাত্র সেটুকুই হল প্রকৃত প্রেম আর বাকিটা হল নিজের স্বাতন্ত্র্যে সেই প্রেমের আভাসমাত্র। এই মিলন হল চেতনে চেতন, জলে জল বা জলে চন্দন, আতর ইত্যাদি মেশানোর মতন কোনও রকম ভৌতিক (Physical) বিষয় নয়। এ মিলনের প্রতিটা কম্পন (Vibration) চেতনাময়। স্বঅনুভূতিময় সমস্ত রকম প্রাপ্তির চেয়ে অনেক, অনেক সহস্রগুণ বেশি আনন্দময়। সুতরাং আত্মসমর্পণ মানেই পরমাত্মলাভ, পরম চিন্ময়ের বুকে ক্ষরত্ব ও অক্ষরত্বরূপ সম্পদের আদান প্রদান যাতে ক্ষর যায় অক্ষরে এবং অক্ষর আসেন ক্ষরভূমে। তারই ফলে এমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দঘনত্বের প্রকাশ। এটাই হল গুহ্যতম। নইলে প্রকৃতিই যে কর্ত্তা সেটাতো প্রথমেই বলা হয়েছে। প্রকৃতির এমনতর কর্তৃত্ব না থাকলে সাধারণ মানুষও ইচ্ছামতই প্রেমভক্তি লাভ করে অসাধারণ হতে পারত। এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তও আছে। একজন চেষ্টা শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে রান্না করে দুপুরের খাবার পাঠিয়েছিল, তার ভিতর নিমপাতা ও বেগুনভাজাও ছিল। সমস্ত খাওয়া শেষ করে দেখা গেল সেটা একটা আলাদা কৌটায় আছে আর সব শেষে সেটা খেয়েও বেশ মিষ্টি অনুভব হল, কি ভাবে ? একজন অপরজনকে কলা বাদ দিয়ে খোসা দিয়েই গেল আর একজন একভাবে খোসা খেয়ে গেল যতক্ষণ না অপর আর একজন এসে সম্বিত ফেরাল। এটা সম্ভবই হয়েছিল এমনতর চেতনে চেতন মিশ্রণের ফলে।

চেতনপ্রকৃতির সত্ত্বগুণে অবস্থানকালীন অবস্থায় যে মিশ্রণ ঘটে তা থেকেই যে সম্বোধি হয় সেটাকে ধরে রাখায় প্রকৃতিই হয় প্রধান বাধা আর সেটা পারিপার্শিকতার প্রভাবে বিপথগামী হলে তা অকালেই শেষ হয়। তারপর ঈশ্বররূপে জীবকুলকে কিভাবে স্ব স্ব কর্ম্মপথে নিয়ন্ত্রণ করেন সেটা বলে তারপর ঈশ্বরেরও ঈশ্বররূপ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে আশ্রয় গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে অর্জুনকে বেশ বিচারবুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং এটাই যে গুহ্যতর জ্ঞান সে কথা বলেছেন। তারপর “গুহ্যতম জ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর” বলে পরাভক্তি হতে তত্ত্বজ্ঞানসম্বুদ্ধ হবার উপায় স্বরূপ ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের কথা বলতে উদ্যত হলেন। অতি গম্ভীর এই গীতশাস্ত্র এমন অশেষরূপে পর্য্যালোচনা করতে অসমর্থ অথচ উত্তম ভক্তির অধিকারী শ্রদ্ধাশীল অর্জুনকে অহৈতুকী কৃপা করে স্বয়ং ভগবান গীতার সার সংগ্রহ করে তিনটে শ্লোকে এখন বলছেন, লক্ষ্য করুন। ১৮/৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামৈবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে। ।৬৫

অনুবাদ : তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমারই উপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর, (তাহা হইলে) আমাকেই পাইবে। ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যেহেতু তুমি আমার প্রিয় ॥ ১৮/৬৫

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে ভগবান যে অতি গোপনীয় চরম কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, সেই সর্ব্বসার উপদেশ সেটা কি ? সেটাই প্রতিজ্ঞা করে বলছেন। কে বলছেন ? অক্ষর বলছেন। কাকে বলছেন ? ক্ষরকে। কি বলছেন ? বলছেন – (১) “মন্মনা ভব” – মচ্চিত্ত হও তোমার মন আমাকে দিয়ে দাও। (২) “মদভক্তো ভব” – আমাকে প্রাণ দাও, পরাভক্তির সাথে আমার ভজনা কর। (৩) “মদযাজী ভব” – তোমার কর্ম্মসকল আমায় দিয়ে সর্ব্বকর্ম্মদ্বারা শুধু আমারই পূজা অর্চ্চনায় মন দাও। (৪) “মাং নমস্কুরু” – আমাকে নমস্কার কর, তোমার মন, প্রাণ, কর্ম্ম নিয়ে আমাতে নমিত হও। (৫) “সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে” – প্রতিজ্ঞা করে বলছি সত্যই তুমি আমার প্রিয়, প্রিয়ের (আত্মার) সাথে চির প্রিয়ের (পরমাত্মার) মিলনের জন্য কি ব্যাকুল আবেদন অবশ্যই উপদেশ আকারে, বাধ্যবাধকতা বিহীনভাবে। (৬) “মামেবৈষ্যসি” – আমাকে পাবে, আমি তোমারই হব, কি আত্মহারা আত্মদান! কিন্তু কিভাবে তুমি আমার প্রিয় হবে ? সেই একই উত্তর – “নমস্কুরু” – নমিত হও, কর্ম্মের সাথে, সংজ্ঞার সাথে, প্রাণের সাথে – “নমস্কুরু” – নমিত হও, অহংকারময় ক্ষরত্বকে, আমাকে প্রিয় জেনে আমাতে কর নমিত! “নমস্কুরু” – সত্যিই আমি তোমারই, আমাকেই তুমি পাবে, শুধু মন্নামে নামময় হও, মৎকর্ম্মে কর্ম্মময় হও, ভোলো তোমার ধর্ম্ম, ভোলো আমার ধর্ম্ম, আমিই তোমার ধর্ম্ম। শুধু নমিত কর, নমিত হও, দেখতে শেখ যে তুমি আমি এক, তোমার ও আমার সেই একত্বরূপ আশ্রয়ে চলে এসো।

আর শোকময় জীবত্বের ভূমে, জীবত্বের দুনিয়ায় থেকো না। “নমস্কুরু” – সমর্পণ করা, বকলমা দেওয়া – খুবই কঠিন কাজ। বকলমা দেবার লোক এখন আর কোথায় ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে এমনতর বকলমা দেবার কথাই বলেছিলেন। পরাভক্তি অর্জন করতে না পারলে বকলমা দেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে মন্মনা হওয়া বা মচ্চিত্ত হওয়া, মদভক্ত হওয়া, মদযাজী হওয়া ও নমস্কার করা – সকলই সেই একই বিষয় যা হল “আত্মসমর্পণ” এবং পুরোপুরি আত্মসমর্পণ। ব্রহ্মে চিত্ত বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেউই “মন্মনা” হতে পারেনা। ভগবানে মনটা সমর্পণ করতে পারলেই আর মনটা তোমার থাকবে না, ভগবানের হয়ে যাবে। আমরাও শান্তি পাই। কিন্তু আমরা সেটা পারিনা কেন ? ঐ যে আগেই বলেছি, চিত্ত সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়ে চলেছে, তাই আমরা সব বুঝেও চিত্ত অর্পণ করতে পারিনা। সুতরাং প্রথমেই চিত্তের এমন নিরন্তর স্পন্দনটা থামাতে হবে। প্রথমে নিরন্তর অভ্যাসে মনকে একমুখী করতে হয়। তারপর গুরুপ্রদত্ত যোগাভ্যাসে কৌশলে মনকে স্থির করতে পারলে ধীরে ধীরে চিত্ত স্থির হয়। তারপর গভীরতর সাধনদ্বারা চিত্তকে নিরুদ্ধ করতে পারলেই মন্মনা হওয়া যায়। মন্মনা হলেই মদযাজী হওয়াটা সহজ হয়। “তখনই মাং নমস্কুরু” মানে ওঁকারের ক্রিয়া করতে হয় যেটা ঐ যোগাভ্যাসেরই অঙ্গ। সমস্ত ঋষিগণ ও দেবতাগণ এমনতর পূজোই করে চলেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও এভাবেই নিজেকে নিজে পূজো করে থাকেন। এমন আত্মপূজার অধিকার লাভে কৃতকৃতার্থ হও, অন্ততঃ অধিকার লাভের জন্য নিজেকে যোগাভ্যাসে এখন থেকেই নিযুক্ত কর। দেখবে তুমি নিজেকে ভুলে যাবে, তোমার আমিটা আর নেই, সেটা আমাতে মিশে এক হয়ে গেলেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এটাই যে যোগাভ্যাসের ফল সে কথাটাই শ্রীগুরুদেব প্রতিজ্ঞাদ্বারা নিশ্চয় করে শিষ্যকে বলছেন। সুতরাং তার আর অন্যথা হবার নয়। যোগবাশিষ্ট রামায়ণেও দেখুন – “সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংরম্ভরংহসা। স এব শরণং দেবো গতিরন্তীহ নান্যথা ॥” যার অর্থ হল সমস্ত মনটি দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে সকল কার্য্য চেষ্টা দ্বারা তাঁর শরণ গ্রহণ করতে হবে। সেই পরমদেব ছাড়া জীবের আর কোনও উপায় নেই। ভগবান জীবকে পূর্ণ স্বধীনতা দিয়ে রেখেছেন যতদিন খুশি এমন বারবার জন্ম মৃত্যুর খেলা খেল। জোর করে কাউকে টেনে নেবো না, যদি ইচ্ছা হয় স্বেচ্ছায় এসো হৃদয়ে। এটাই সেই আকর্ষণের মর্ম্মবাণী, অণুর তলে মহানের যে আত্মলুণ্ঠন সেটাই উপদেশাকারে, ভাষার মধ্যে দিয়ে, অর্জুনের অন্তরে প্রজ্ঞার আলো জ্বালিয়েছেন। গীতায় ভগবান কত সাধনারই উপদেশ দিলেন এবং অবশেষে নিজেই তার সংকলন করে দিচ্ছেন দেখুন সেটা পরের শ্লোকে আত্মনিবেদনের আরও গুহ্য অভয়বাণী – মন্নামে নামময় হতে হলে কি ভাবে নিজের ধর্ম্মটা পর্য্যন্ত ভুলে যেতে হয় ॥ ১৮/৬৫

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। ৬৬

অনুবাদ: সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় কর। আমি তোমায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না ॥ ১৮/৬৬

ব্যাখ্যা : সর্ব্বপাপ মানে সব ধরণের কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্ত হবার এ কৌশল, এ তত্ত্ব অধিকতম গুহ্যতম। সকল ধর্ম্ম অর্থে সবরকমের বিধি নিয়মের দাসত্ব পরিত্যাগ করে একমাত্র অনন্য শরণাগতির দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হওয়া যায়। তাতে কর্ম্মত্যাগ করা হল বলে পাপ আশ্রয় করবে এমন দুশ্চিন্তা পরিহার করাই উচিত। শরণাগতি হলে কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্তি তো হয়েই গেল, তখন সকল পাপ পুণ্যের অতীত। এমনটা হতে পারলে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম চুলোয় গেলেই বা ক্ষতি কি ? “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে – অর্থ ভোলো তোমার ধর্ম্ম, ভোলো তোমার গুণের ধর্ম্ম, দুইই, অর্থাৎ তোমার ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম ও গুণধর্ম্ম অর্থে সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ আদি ত্রিগুণের ধর্ম্ম, ওসব ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে আমার কাছে এস। তুমি আর আমি এক। তোমার ও আমার সেই একরূপত্ব ও একত্বরূপের আশ্রয়ে চলে এস “মা শুচঃ” – শোকময় এ জীবত্বের ভূমে আর থেকো না, শোকের অতীত হও। “অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি” – তোমার সকল অজ্ঞানতারূপ পাপ দূর করে দেবো। শুধুমাত্র তুমি পরাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। ব্রহ্মরন্ধ্রে মন স্থাপন করে যদি কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে তাহলেই সে সকল রকম পাপ হতে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করে। যোগীর কোনও দিকে তাকালে চলে না। এমন কি বেদবিধি শাস্ত্রও যোগাভ্যাসের অনুকূল নয়। কেবলমাত্র গুরুবাক্যের উপর নির্ভর করে তাঁর আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশ পালন করাই ক্রিয়া করা। কেন করছি, কতদিন করতে হবে বা করে কি হবে ? এসব প্রশ্ন মনে যেন না আসে। গুরুদেব বলেছেন তাই করছি, কি হবে না হবে তা তিনিই জানেন। এমনভাবে দৃঢ়চিত্ত হয়ে গুরুতে আত্মসমর্পণ করে ক্রিয়া করে চল। আর কোনও রকম ভড়ং এর দরকার নেই। “সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ কর।” – এটাই গীতার্থের সার কথা। অতএব ওসব পুঁথিপত্র ছাড়ো। তোমার সবরকম ধর্ম্মাধর্ম্ম ছেড়ে একমাত্র আমাকেই জড়িয়ে ধরো। পাঠক এখানে প্রশ্ন করুন – তাহলে বেদের কথা “ধর্ম্মং চর” – ধর্ম্ম আচরণ কর, উপনিষদের কথা, এমনকি গীতায় বর্ণিত জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি সকল বিষয় পাঠের পর এখন এই শেষ অধ্যায়ে এসে সব ধর্ম্মকর্ম্ম ছেড়ে দাও এ কথা বলার তাৎপর্য্যটা কি ? উত্তরে বলি এ কথার অর্থ একটাই ভগবানকে ভাল না বাসলে সবরকম ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই বৃথা। কারণ ভগবানকে বাদ দিয়ে কর্ম্ম করলে তাতে শুধুমাত্র আত্মবিনাশই হয়। আত্মাই ভগবান বা ঈশ্বর আর পরমাত্মাই হলেন পরমেশ্বর একথা আগেই বলা হয়েছে। আর এও বলা হয়েছে যে আত্মকর্ম্মই কর্ম্ম আর সবই অকর্ম্ম। কর্ম্ম,জ্ঞান

ও ভক্তির সমন্বয় ব্যতীত পরাবস্থা প্রাপ্তি হয় না। পরঅবস্থায়ই প্রকৃত পরাকর্ম্ম, পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি লাভ হয়। এহেন পরাবস্থা ক্রিয়া করেই পেতে হয় যা একমাত্র গুরুকৃপাদ্বারাই লভ্য। এ কারণেই সব ছেড়েছুড়ে গুরুকেই জড়িয়ে ধরার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম্ম বলতে অনেকে অনেক রকম বোঝেন গৃহধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম ইত্যাদি কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় – “ধর্ম্ম শব্দেনাত্র অধর্ম্মোহপি গৃহ্যতে, সর্ব্বধর্ম্মান সর্ব্বকর্ম্মানি ইত্যেতৎ” – মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম যতদিন থাকবে ততদিন দেহসম্বন্ধ নষ্ট হবে না, বারবার যাতায়াতও ঘুচবে না, এজন্যই সাধককে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত অবস্থা লাভ করতে হবে। প্রাণ দিয়ে, প্রাণপণে ক্রিয়া করলেই তাঁর শরণ নেওয়া হবে। ক্রিয়া করলে পরঅবস্থা আসবেই। যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পাপপুণ্য যাই ঘটে থাক তিনি শরণাগত সাধককে মুক্তি দান করবেনই। অতএব “নাত্মানং অবসাদয়েৎ” – মনকে অবসন্ন হতে দিও না, বেগে সাধন করে চল। যিনি আত্মচিন্তায় নিযুক্ত হয়ে সর্ব্বপ্রকারে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তিনিই জীবন্মুক্ত, তাঁর আর কোন কিছুতেই দৃষ্টি যায় না। সুতরাং তাঁর আর শোক করার মত কিছু রইল না। যাঁর চিত্ত ব্রহ্মলীন হয় তিনিই পুরুষোত্তম, সবরকম ভোগের পর তিনি আমাতেই বিলীন হয়ে যান। এটাই “মামেকং শরণং ব্রজ” – অদ্বিতীয় যে এক শক্তি সহস্রারে আছে তাঁরই আশ্রয় নিতে হবে। ওটাই তাঁর পরমধাম ও পরমপদ ॥ ১৮/৬৬

ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন।
ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি।। ৬৭

অনুবাদ: এই গীতার্থ-তত্ত্ব তুমি ধর্ম্মহীন, ভক্তিহীন, গুরুসেবাহীন এবং আমার অসূয়াকারীকে কদাচ বলিও না ॥ ১৮/৬৭

ব্যাখ্যা: গীতাগ্রন্থ ব্যাখ্যার সূচনাতেই যে কথা বলেছিলাম যে দেশে এখন একটা বিপরীত ভাব চলেছে যেখানে জড়বাদেরই প্রাধান্য। মানুষ হয়ে পড়েছে ভোগবাদী, সুতরাং পরাভক্তির বিষয় আলোচনা বা ব্যাখ্যা এখানে অচল বরং প্রকৃতির এমনতর বিরুদ্ধাচরণের কথা বললে বা আলোচনা করলেও মার খাবার সম্ভাবনা আছে। এমন বিবেচনা থেকেই ভগবানও বলেছেন সেই কথা। কেমন লোককে গীতার্থ তত্ত্ব বলবে, আর কেমন লোককে বলবে না সে বিষয়টা বেশ স্পষ্টভাবে সুনির্দ্দিষ্ট করেছেন যেহেতু তত্ত্বটা গোপনীয় হতেও গোপনীয় অর্থাৎ একান্তই গুরুমুখী বিদ্যা, যার ব্যবহারিক অংশটা গুরুকৃপালভ্য। অনধিকারীকে অমৃতবিদ্যা প্রদানের ফল নিশ্চিতভাবেই বিষময়। আগে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬তম শ্লোকেও এমনই ইঙ্গিত করা আছে। আসক্তি ও অজ্ঞান থাকতে জ্ঞান জন্মায় না, সেই জন্যই অর্জ্জুনের প্রতি এমন সাবধানবাণী যে এই তত্ত্ব তুমি আত্মধর্ম্মহীনকে, ভক্তিহীনকে ও গুরুসেবাহীনকে এবং আত্মনিন্দুক অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উৎসুক তো নয়ই উল্টো যাঁরা আত্মজ্ঞানলাভে তৎপর তাঁদের প্রতি উপহাস ও অবজ্ঞা করে এমন লোকের নিকট সর্ব্বদা অপ্রকাশ্য। আবার অনেক মুণ্ডিত মস্তক অথবা জটাজুটধারী থাকেন যাঁদের চেনা যায় না। সামাজিক জীবও এমন আছেন যাঁরা বহিঃসাম্যে বিশ্বাসী। এমনতর বহিঃসাম্যে ও বহিঃসন্ন্যাসে বিশ্বাসীগণ অন্তঃসাম্য, অন্ত সন্ন্যাসরূপ বিপরীত পথে চলার অধিকারী নন। কারণ গীতা হল সম্পূর্ণ যোগশাস্ত্র, একান্তভাবে গুরুমুখী বিদ্যা, যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যোগবিষয়ক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। স্ববর্ণে ও স্বধর্ম্মে আস্থাহীন জীবকে ব্রহ্মবিদ্যা দানে উল্টো ফল ফলে যেহেতু তাদের পথ এ পথের বিপরীত। প্রকৃতভাবে পরীক্ষা না করে ব্রহ্মবিদ্যা দানে বিপর্য্যয় ঘটে এবং ঐ জীবও নিশ্চিতভাবেই গুরুবিদ্বেষী হয়ে উঠবেন। এটাই প্রকৃতির লীলা ও রহস্য। সুতরাং নিতান্ত প্রকৃতিগত কারণেই তোমার আমার (আত্মা ও পরমাত্মার) এ গুপ্ত মিলনের, এ গুপ্ত ভূমির সন্ধান তাদের দিও না যাদের চোখে এ প্রেম হল পরকীয়া প্রেম, যারা উল্টো পথের পথিক, যাদের প্রাণে নেই আমার প্রতি আকর্ষণ, যাদের কর্ম্মে নেই আবাসের অন্বেষণ, যারা অভিলাসী নয় আমার কথা জানতে, যাদের সকল সেবা অহংকারেরই পদসেবা করে, যারা ভূতে ভূতে ভূত দেখেও আমাকে করে দ্বেষ, বহিঃসন্ন্যাস ও বহিঃসাম্যে বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান ও ভোগী, সে সব যাত্রীকে এ গুপ্ত বৃন্দাবনের সন্ধান তুমি দিও না। থাকুক তারা বহিঃ সংগঠনে ব্যস্ত হয়ে বহিঃসন্ন্যাস, বহিঃসাম্য, বহিঃপূজা ও বিবিধ বাহ্য আড়ম্বর নিয়ে। প্রতি ভোগে ভোগে যারা দেখেনা আমার সেবা, তারাই অশুশ্রূষু। ভূতে ভূতে যারা দেখে না আমাকে তারা আমার দ্বেষ্টা। কর্ম্মে কর্ম্মে আমাতে যারা চক্ষুহীন তারাই অতপস্ক। হৃদয়ে যাদের নেই আমার মিলন তারাই অভক্ত। সুতরাং তাদের কাছে আমার এই সর্ব্বভেদাভেদাতীত আত্মদর্শনের কথা বিশেষভাবে গোপন রাখবে। বর্হিদৃষ্টিতে যেটা গুরুদেবের সেবা অর্ন্তদৃষ্টিতে তা নিজেরই পরিচর্য্যা, যেহেতু আত্মাই গুরু, তার সেবা অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম যে না করে সেই হয় অসূয়াকারী বা আত্মনিন্দুক, সকল উপনিষদেরও এই একই উপদেশ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখুন –

“যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥”

যার নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি পরমভক্তি এবং গুরুদেবেও সেই একই ভক্তি থাকে সেই মহাত্মার নিকটেই পূর্ব্বকথিত উপনিষদ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়। আবার মুক্তিকোপনিষদে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে দেখুন –

“বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণ মা জগাম গোপায় শেবধিষ্টেহহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেহবতায় মা মা ব্রুয়াদ্বীর্য্যবতী তথা স্যাম ॥”

যার অর্থ হল – ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগনের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে গোপনে রাখিও তাহা হইলে তোমরা ইষ্ট অর্থাৎ ভোগ ও মুক্তি উভয়ই লাভ করিবে। কিন্তু (যদি সকলের নিকট গোপন নাও রাখিতে পার) অসূয়াযুক্ত, সরলতাশূন্য ও অসংযমী বা অতপস্বীদিগকে কদাপি বলিবে না, বলিলে বিদ্যার শক্তি থাকিবে না।"

সুতরাং এখন সহজেই বুঝতে পারছেন যে অপাত্রে দিলে ব্রহ্মবিদ্যা ফলবতী তো হয়ই না, বরং বিপরীত ফল প্রদান করে। সময়ের প্রভাবে প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয় সদগুরুতে অশ্রদ্ধা তো বটেই এমনকি অনেক স্থানেই তাঁদের নিগ্রহও করা হয়। অতএব সাধু সাবধান। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখুন প্রকৃত ভগবদভক্তের নিকট গীতার্থ তত্ত্বব্যাখ্যার ফল ভগবান বলছেন ॥ ১৮/৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্ভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ।। ৬৮

অনুবাদ : এই পরম (সর্ব্বোত্তম) গীতাশাস্ত্র আমার ভক্ত সকলকে যিনি বলিবেন (বুঝাইয়া দিবেন) তিনি আমাতে পরমা ভক্তি করায় সংশয়শূন্য হইয়া আমাকে পাইবেন। ১৮/৬৮

ব্যাখ্যা : আগেই বলা হয়েছিল যে "ভক্তিতেই মুক্তি"। অভক্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যা যেমন বিড়ম্বনা মাত্র তেমনই ভগবদ্‌ভক্তের নিকটই সেটা নিঃসংশয়ে প্রকাশ্য। মানে হল ভক্তের ভক্তি বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে তার পরই সেই ব্যাখ্যা প্রকাশ্য। সুতরাং তুমি যদি প্রার্থীর ভক্তি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মাদি অনুযায়ী তার যোগ্যতা বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারো তবে অবশ্যই তাঁর নিকট গীতারহস্য ব্যাখ্যা করবে আর তাতে তোমারও লাভই হবে। যেহেতু সমস্ত ক্রিয়া রহস্যই এই গীতায় আছে তাই যে এই গীতা পড়ে প্রকৃত ভক্তকে শোনায়, তার রহস্যগুলো বুঝিয়ে দেয়, সেও নিশ্চয়ই একদিন আত্মবিৎ হয়ে যায়, এতে সন্দেহ নেই। তবে বুঝতে হবে যে পরাভক্তি লাভেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন যে পরাভক্তির – উদয়েই যখন তাঁর সাথে মিলন সম্ভবপর, তখন আবার ভক্তের কাছে গীতা ব্যাখ্যা করে তাঁকে লাভ করতে হবে কথাটার তাৎপর্য্যটা কি ? সেজন্যই ভগবান বললেন যে পরাভক্তি লাভেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞানলাভ আর গীতার ব্যাখ্যান একই কথা। সর্ব্বতত্ত্বের সার এতে ব্যাখ্যাত থাকায় গীতা আলোচনা করলে পরাভক্তি সম্পন্ন পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান প্রদীপ্ত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। তাই যারা আমার একাত্মপ্রেমে প্রেমিক হয়েছে, যাদের বুকে ঐতদাত্ম্যের প্রীতির রস সঞ্চারিত হয়েছে, যারা মিলেছে আমার সাথে গুপ্ত বৃন্দাবনের বনভূমিতে, তারা যদি আমাতে অনুরাগীজনকে এই গুহ্য একাত্মবিজ্ঞানের উপদেশ দেয় তবে তারাও নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করবে এতে সন্দেহ নেই। আত্মক্রিয়াশীল পুরুষ আত্মাকেই লাভ করবেন। এটাই স্বাভাবিক, এতে কোনও সন্দেহ নেই, কোনও ভুল নেই। গীতার এহেন ব্যাখ্যাকর্ত্তা যে স্বয়ং ভগবানের কতটা প্রিয় হন সেটা পরের শ্লোকে দেখুন ॥ ১৮/৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।। ৬৯

অনুবাদ : মনুষ্যমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়কারী নাই এবং কোন কালে তাঁহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় পৃথিবীতে আর কেহ হইবেও না ॥ ১৮/৬৯

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের সূত্র ধরেই ভগবান বলে চলেছেন গীতার্থ তত্ত্বাদি ব্যাখ্যাকারের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির কথা। বলছেন এমন পরাভক্তি সম্পন্ন গীতাব্যাখ্যাকারী পুরুষের চেয়ে প্রিয় কার্য্যকারী আর আমার কেউ নেই এবং এমন মানুষের চাইতে প্রিয়তর আর কখনও, কোনওদিন, কেউ হবেও না। যে পুরুষ আত্মভক্তিমানগণকে আমার পরমতত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে পারেন তিনি তো আমারই হয়ে আমারই কর্ম্ম করে চলেছেন। তাঁর চেয়ে প্রিয় আমার আর আছেই বা কি ? সাধকগণ শুধু নিজের সিদ্ধিলাভের পিছনেই সময় ব্যয় করেন। অপরের প্রতি প্রেম তাঁদের কোথায় ? আর যাঁরা গেরুয়া রং এ সাজগোজ করে, বিভূতি, তিলক পরে বিচরণ করছেন তাঁরাও তো অর্থী। অর্থলাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত অমনতর ভাঁড়ামির প্রয়োজনটা কি ? আত্মতত্ত্বের আসল তত্ত্বীরূপ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ হয়ে ভগবানের যেমন প্রিয় হওয়া যায়, জাগতিক সেবাদি উদ্দেশ্যে সংগঠন বাড়িয়ে অথবা অন্য কোনও বাহ্য তত্ত্বের তত্ত্বী হয়ে তেমন ভগবদপ্রিয় হওয়া যায় না, কেননা আত্মতত্ত্বের তত্ত্বী ভগবানের নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ করে পরমানন্দময় অতি প্রিয় যে অবস্থা সেই অবস্থাতে স্থিত হলেই তিনি অপরকে সেই উপদেশই দিতে অগ্রহী হন। যিনি ভাল রাঁধুনি তিনি অপরকে তাঁর রান্না না খাইয়ে যেমন তৃপ্তি পান না তেমনই আত্মতত্ত্বের তত্ত্বীও গীতা তত্ত্বের ব্যাখ্যা না করে থাকতে পারেন না কারণ গীতামৃতও সেই একই আত্মতত্ত্ব। এজন্যই এমন তত্ত্বের ব্যাখ্যাকার অপেক্ষা অধিক প্রিয়কারী তাঁর আর কেউ নেই এবং কখনও তাঁর অপেক্ষা ভগবানের অধিক প্রিয় এ জগতে আর কেউ হবেও না ॥ ১৮/৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।। ৭০

অনুবাদ : যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ পাঠ করেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করেন। এইরূপ আমার মত ॥ ১৮/৭০

ব্যাখ্যা : ব্যাখ্যাকর্ত্তার বিষয়ে বলার পর ভগবান এখন শ্রোতা বা পাঠকের বিষয় বলছেন যে ৫০ তম শ্লোক হতে শুরু করে এপর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা গোপনতম চরম কথা বলতে শুরু করে পর পর যা কিছু সব বললাম আমাদের এই যে আত্মতত্ত্বের যে সকল কথা বা এক কথায় ধর্ম্মসংবাদ বললাম এ সমস্ত যিনি শ্রবণ অথবা পাঠ করবেন তাঁরই ভাল হবে। কেন ? কারণ হল যে বিদ্যার সাধনে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় সেই সাধনের প্রেরণা পাওয়া যাবে এই ধর্ম্মসংবাদ পাঠ করলে। জ্ঞানযোগই যদি ভগবান অর্চ্চনার শ্রেষ্ঠ উপায় হয় তবে গীতাপাঠে সেই জ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রবল হবে। সুতরাং জ্ঞানরূপ শ্রীকৃষ্ণও যে স্বয়ং এমন গীতা অধ্যয়নের দ্বারা অর্চ্চিত হবেন, সংপূজিত হবেন, আরাধিত হবেন এতে আর সন্দেহ কি ? তাই ভগবান বলছেন যিনি আমাদের এই আত্মতত্ত্ব বিষয় পাঠ করেন তিনি জ্ঞানলাভ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করেন এরূপই আমার মত। অতএব এই জ্ঞানলাভের মহাফল হল পরমপদ লাভ। কেননা গীতা পাঠে জীবের বুদ্ধি শুভ হবে আর শুভবুদ্ধি হলেই, শুভবুদ্ধির ফল যে মোক্ষ তাইই লাভ হবে। গীতার অর্থ হয়ত সকলে বোঝে না, যেমন রাম কে ? সেটা জানে না এমন কেউ ক্রমাগত রামকে ডাকতে থাকলে যেমন রাম নামক কোনও ব্যক্তি তার কাছে চলে আসে তেমনি পরম দেবতা রামও অদৃশ্যতঃ অথবা দৃশ্যতঃ স্থিতি অনুযায়ী একটাবার তাঁর দিকে নজর ফেরাবেন। ঋষি অজামিল, ভক্ত ধ্রুব এঁরা কোনওমতে নামটা উচ্চারণ মাত্রেই ভগবান যেমন এঁদের উপর প্রসন্ন হয়েছিলেন তেমনই অর্থ জ্ঞানহীন গীতাপাঠকারীর বা শ্রোতার প্রতিও ঈশ্বর প্রসন্ন হন কারণ ক্রমাগত লেগে বেঁধে পাঠ করতে করতে বা শুনতে শুনতে ক্রমশঃ অর্থবোধ আপনা অপনিই হতে থাকে। এটাই তাৎপর্য্য। এটাই ঈশ্বর কৃপা কেননা অর্থবোধ হতেই জ্ঞান জন্মে যা থেকে চেতনার উন্মেষ হয় এবং মোক্ষ পথে পা পড়ে। এভাবেই গীতা পাঠক বা শ্রোতা ক্রম মুক্তির পথে অগ্রসর হন। পরের শ্লোকে দেখুন গীতা পাঠ করা অথবা শোনার ফল কেমন হয় ॥ ১৮/৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্।।৭১

অনুবাদ : শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াবিহীন হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকারীগণের পবিত্র লোকসকল প্রাপ্ত হন ॥ ১৮/৭১

ব্যাখ্যা : গীতাপাঠ অথবা শ্রবণের পর সেই গীতাপাঠ অথবা শ্রবণের ফল কি সেটা ভগবান বলছেন। স্বয়ং ভগবানই যে শ্রীকৃষ্ণরূপে এই গীতার বক্তা এবং জগৎ যে ভগবানেরই প্রত্যক্ষ বিশ্বরূপ এমনতর জ্ঞানে দৃঢ় বিশ্বাস না হওয়া পর্য্যন্ত গীতাপাঠ অথবা শ্রবণ কোনওটাই করতে নেই। এজন্যই ভগবান "শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ" কথাটা বলেছেন। গীতাপাঠ বা শ্রবণের অধিকার একমাত্র অদোষদর্শীর। এজন্যই "অসূয়াশূন্য" কথাটা এই শ্লোকে বিশেষভাবে মূল্যবান। শ্রীকৃষ্ণকে যদি দেখ উচ্চস্তরীয় কোন মনুষ্যরূপে অথবা ঐ ধরণের কেউ একজন এমনটা ভেবে, তাহলে জগৎকেও দেখবে মাত্র অচেতন ভূতরূপে এবং ফলস্বরূপ গীতার প্রাণ নষ্ট হবে আর গীতাও শুধুই শুক্‌নো দর্শন শাস্ত্র বা ইতিহাস মাত্রে পরিণত হবে। সুতরাং স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করানোটা যাঁর শিক্ষাদানের প্রধান অঙ্গ তাঁর উপদেশ পঠন এবং শ্রবণের অধিকারও তাঁদেরই যাঁদের চিত্তে অমনতর অসূয়াদ্বয় নেই এবং দৃঢ় অবস্থা বা অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মত মনোবল অর্জ্জন করেছেন। তা না হয়ে কেউ যদি খুব জোরে জোরে অবিশ্রান্ত ভাবে গীতাপাঠ করে চলে তখন অবিশ্বাসী বা শিক্ষাভিমানী সবজান্তা বাবুর মনে ভাবনা আসে যে ঐ ব্যাটা কি পড়ছে ? আর কেনই বা অমন জোরে জোরে পড়ছে ? এমনতর ভাবনা হবে এবং অসূয়াসঞ্চয় হতে থাকেবে। এজন্যই ভগবান শ্রদ্ধাবিষয়ে আগেই বিস্তারিত বলেছেন। সম্যক শ্রদ্ধা ছাড়া বিশ্বাস জন্মে না। অন্ধবিশ্বাস ব্যতীত রসজ্ঞ হওয়া যায় না। "যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু পদে পদে" রসজ্ঞ ভক্তেরা ভগবৎ কথা যত শোনেন ততই তাঁদের আরও ভালো লাগতে থাকে। কিন্তু ঐ অন্ধবিশ্বাস ব্যতীত টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকলে আর রসজ্ঞান হবে কোথেকে ? ভাগবতী কথায় শ্রদ্ধা জন্মালে রসজ্ঞান হতে পারে। ভবব্যাধির তাড়নায়, ছেলে, মেয়ে, বউ, স্বামী এদের চিন্তায়, বিষয় আশয়ের চিন্তায় এমন যে উৎকৃষ্ট হরিকথা তাও অনেক সময়েই ভাল লাগেনা। শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্য এ রোগের নিদান একটু হলেও দেওয়া আছে –

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধাধানস্য বাসুদেব কথা রুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ – নিষেবণাৎ ॥"

যার অর্থটা হল এমন-"হে বিপ্রগণ ! পুণ্যতীর্থ গঙ্গাদি স্নান অথবা গুরুপদকমলরূপ মহাতীর্থে স্নান করিলে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় এবং ভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন হয়।" ভগবৎকথা প্রাণ এবং তার ক্রমাগত অনুধ্যানের ফলে ভগবৎশক্তির প্রভাবে কামক্রোধের প্রবল উত্তেজনা কমতে থাকে, আর এমনতর ক্ষোভ বা আবেগে বুক ফেটে যায় না। জ্ঞানের স্ফূরণ হতে থাকলে ও ভগবৎ তত্ত্বের অনুভূতি হলে বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্য আপনা থেকেই আসে এবং হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সব কিছুর প্রতি আসক্তি নষ্ট হয়। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হলেই অন্ধ বিশ্বাস জন্মে। বিশ্বাস যত অন্ধ হয় ততই নিশ্ছিদ্র হয়। এমনতর বিশ্বাস নিয়ে এগোতে পারলেই জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মসকল নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবানের কথায় শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হওয়াই প্রাথমিক প্রয়োজন ও অবশ্য প্রয়োজন (must) নচেৎ গীতাশ্রবণ বা গীতাপাঠ উভয়ই নিছক বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ১৮/৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেন চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।। ৭২

অনুবাদ : হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিলে তো ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ প্রনষ্ট হইল তো ? ১৮/৭২

ব্যাখ্যা : দীর্ঘ পরিশ্রমে দীর্ঘ গোপনীয় হতেও পরম গোপনীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পর ভগবান এখন অর্জুন কে জিজ্ঞাসা করছেন। "কচ্চিৎ" শব্দটা প্রশ্ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তুমি ব্যাপারটা বুঝেছ তো ? বিষয়ের সম্যক বোধ না জন্মে থাকলে আবার বুঝিয়ে দেব, আবারও উপদেশ দেব এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করছেন। তাই বলছেন – তুমি এক মনে, একাগ্রচিত্তে আমার কথাগুলো শুনেছ তো ? এতে তোমার অজ্ঞানমোহ নষ্ট হয়েছে তো ? অজ্ঞানসংমোহ অর্থ হল তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে বিপরীত বুদ্ধি। এমনতর বিপরীতবুদ্ধি নিরীক্ষণ করতে গিয়ে ভক্তজনের বাড়িতে রাত দুটো পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, সাধন সময় ব্যয় করে। সত্যই অজ্ঞানসংমোহ কি ভয়াবহ! নিজের ভাবনা চিন্তা সেখানে এত বেশি প্রাধান্য পায় যে কাউকে শ্রেষ্ঠতর মেনে নেওয়া সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছার প্রাধান্যই প্রবলতর হয়ে থাকে। যাক সে সব অন্য কথা, বরং পাঠক এখানে প্রশ্ন করুন সর্ব্বমোহ নাশন সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপী ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁর উপদেষ্টা তাঁর আবার কি মোহ থাকতে পারে ? গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখে আবার এমনতর প্রশ্ন কিসের জন্য ? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য একটাই সেটা হল গীতা শ্রবণের ফলেই যে অজ্ঞান মোহের নাশ হয় যেটা অর্জ্জুনের হয়েছে সেটা অর্জুন নিজের মুখে বলে জগৎবাসীকে শুনিয়ে দিন যাতে জগৎবাসীর কল্যাণ হয় এটাই উদ্দেশ্য। গুরুর উপদেশ দান ও শিষ্যের উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যই হল যাতে গুরুর উপদেশ মত সাধন করে সাধকের স্বরূপ জ্ঞানলাভ হয় ও নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। এখন শিষ্য প্রাণের দ্বারা সে উপদেশ ধরে রাখতে পারলেন কি না এটা জানাই অভিপ্রায়। যদি উপদেশ গ্রহণ ও ধারণ করতে শিষ্য না পারেন তবে গুরুদেবকে শিষ্যের বোধের জন্য অন্য উপায় বের করতে হয়। অজ্ঞানতা বশতঃই জীবের সকল ভ্রান্তি এবং একমাত্র শ্রীগুরুকৃপায় শিষ্যের সেই ভ্রান্তি নাশ হয়, অন্য কোনও উপায় নেই। অর্জ্জুনের সেটা কতটা কি হল সেটা পরের শ্লোকে দেখা যাক ॥ ১৮/৭২

অর্জুন উবাচ –

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।। ৭৩

অনুবাদ : অর্জ্জুন কহিলেন। হে অচ্যুত, আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতিলাভ করিলাম, তোমার শাসনে স্থিত হইলাম, সংশয়শূন্য হইয়াছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করিব ॥ ১৮/৭৩

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকোক্ত শ্রীভগবানের প্রশ্নের উত্তর অর্জ্জুন এই শ্লোকে দিলেন। কৃতকৃতার্থ অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে অচ্যুত(continuous)বলে সম্ভাষণ করে বলছেন, আত্মতত্ত্ব দর্শনে তিনি লব্ধধ্রুবাস্মৃতি হয়েছেন, মানে স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। এখন তাঁর স্মৃতি আরও বেশ জোরাল হয়েছে, মোহ দূর হওয়ায় এখন তিনি আত্মস্থ হতে পেরেছেন। এমনতর উপলব্ধি থেকেই "স্থিতোহস্মি" বলেছেন। মানে আত্মস্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। মোহনাশ হলেই এটা সম্ভব হয়। দেহাত্মজ্ঞানরূপ মোহ তাঁকে কাতর করেছিল বলেই তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে পরধর্ম্মে আসক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের উপদেশে আবার সেই আত্মবুদ্ধি ফিরে এল। স্মৃতি দৃঢ় হল তিনি দেহ নন, তিনি আত্মা, যে আত্মবিস্মৃতি থেকে জীব কতবার এ ভবে আসে যায়, কত কর্তৃত্বাভিমান করে, কত রকম সাজ সাজে, কতরকম বেশ ধারণ করে, কত নামে, কতরূপে থাকা, ঘুম ভেঙ্গে যেমন স্বপ্নও টুটে যায় তেমনই অজ্ঞানসংমোহ আমার জ্ঞানদৃষ্টি থেকে সরে গেল। যে স্মৃতি লাভ হলে "সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিমোক্ষঃ" সমস্ত গ্রন্থির মোচন হয়, সেই হৃদয় গ্রন্থির ভেদ হল। কিন্তু এমন আত্মবিজ্ঞানারূঢ় পুরুষ ভগবানকে কি বললেন ? বললেন, "করিষ্যে বচনং তব" – মানে তোমার আদেশই প্রতিপালন করব। কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার ইচ্ছে কিন্তু একবারও হল না। সংসার অনিত্য, সুতরাং আর কিসেরই বা কর্ম্ম, কেনই বা কর্ম্ম এমন কোনও কথা অথবা ভ্রান্তিময় এ জগতে আর কোনও সারবত্তাই দেখি না একথাও বললেন না। বরং বললেন, – হত্যাময় যুদ্ধই করব। জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়ময় গীতার এটাই উপসংহার। চিৎ-জড়ের যে অভেদজ্ঞান সেই অনর্থ ঐক্যজ্ঞান বিলুপ্ত হলেই মায়ার কৌশলটা ধরা পড়ে যায়। তখন আর অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে না। দেহবোধের ধারণা ততদিনই থাকে যতদিন আত্মবোধ না হয়। বিষয় সুখ বড় মনে করে একদিন যে সাধনাকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলাম, সাধন সমরের সাজ গাণ্ডীবকে অবনত করে পাগলের মত শুধু হাহুতাশ করে নির্লজ্জের মত যুদ্ধ করব না বলছিলাম, এখন তোমার প্রসাদে সে সব দুর্ব্বুদ্ধি নির্ম্মূল হয়ে গেছে। স্বরূপে স্থিতি লাভ করে প্রকৃত অবস্থার, প্রকৃত সুখের পরিচয় আজ পেলাম। তাই দেখ "স্থিতোহস্মি" আবার যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়ালাম, মেরুদণ্ড সোজা হয়েছে তার ভিতর একটা টান অনুভব হচ্ছে। "করিষ্যে বচনং তব" যেমন করেই হোক গুরুবাক্য পালন করবই। তুচ্ছ প্রাণ যায় যাক। নাভিচক্রের তেজস্তত্ত্ব, জীবশক্তি, যখন এভাবে কোমর বেঁধে সাধন সমরে আত্মোৎসর্গের জন্য সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে বসে তখন আর আত্মজ্ঞানলাভে দেরী হয় না। নিজ নিজ সদ্‌গুরু সত্তায় সত্ত্ববান হও, নির্দ্দেশ মত কাজ

করে যাও, জগদ্‌গুরু আত্মদেব কূটস্থ ঠিকই নিজ মাধুরী তোমায় আস্বাদন করিয়ে দিবেন। এভাবে দেহে আত্মবুদ্ধির নাশ হলেই সংসার লীলার অবসান হবে। এমনতর কর্ম্মের কৌশলই সমগ্র গীতাশাস্ত্রে বলা হল। সুতরাং গীতার ভিতর দিয়ে যাঁরা কর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সকলকে দূর থেকেই নমস্কার জানাই। পাঠকও তাদের দূর থেকেই নমস্কার করে নঙর্থক দিকটা (Negative attitude) বিসর্জ্জন দিন এবং অর্থব্যঞ্জক দিকটাকেই (Possitive attitude) প্রকট (develop) করতে প্রয়াসী হন। অজ্ঞান মোহ দূর হলে এটা অবশ্যই হবে। এ জগৎকে সত্যদেবতা পরমেশ্বরের বা পরমাত্মার সত্য বিশ্বরূপ বুঝে নিয়ে, অপৌরুষেয় বেদের ঋষি প্রদর্শিত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় সিদ্ধান্ত অবলম্বনে আবার জীবনকে অমৃতময় করে তুলুন, ঋষি হন, তত্ত্বজ্ঞ হন, পরাভক্তিসম্পন্ন হন। এই ঘোর কলিযুগের অন্ধকারের মধ্যেও আর্য্যজীবনকে ফিরিয়ে আনুন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন ॥ ১৮/৭৩

সঞ্জয় উবাচ -

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ।।৭৪

অনুবাদ : সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই রোমহর্ষণ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৮/৭৪

ব্যাখ্যা : সূচনাতেই বলা হয়েছে যে সাধনসমরে সম্যকরূপে জয় হলে যাঁর প্রকাশ হয় তিনিই দিব্যদৃষ্টিরূপী সঞ্জয়। আর মন হল ধৃতরাষ্ট্র, যিনি অন্ধ, অর্থাৎ মন হল অন্ধ। অন্ধ মনের কোনও বিচার শক্তি নেই যা ইচ্ছে হয় তাই চায়। এহেন অন্ধ মন সমীপে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা প্রকাশিত হল এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ অর্থাৎ গূঢ় সাধন রহস্য ব্যাখ্যান ও তদনুসারী অনুভবসকলের বিষয় যার কিছু কিছু মাত্র প্রত্যক্ষ হলেও বিষ্ময়ের সীমা থাকে না। এই অস্থি, মজ্জা, মেদ পরিপূর্ণ দেহের প্রাণের সঞ্চার, মন বুদ্ধির খেলা, তাতে কতরকম জানা অজানার অনুভব, তার মধ্যে এমনতর সব দর্শন বৈচিত্র্যে শরীর তো রোমাঞ্চিত হবারই কথা। দিব্যদৃষ্টি থেকেই এই সব অদ্ভুত সংবাদ(কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ), অদ্ভুত অনুভবগুলো তো অন্তঃকরণেই ঘটে থাকে। সদগুরুকৃপায় সাধন সাহায্যে সাময়িকভাবে হলেও এমন দিব্যদৃষ্টি লাভে প্রবুদ্ধ হলেই আত্মবিস্মৃত ভাবটা পালিয়ে যায়। তখনই যা ছিল অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সেসব বিষয়গুলো জ্ঞানগোচর হয়ে সাধককে যেমন করে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান এনে দেয় সেটা যেমন রোমাঞ্চকর, এই সব বিষয়ের যিনি স্রোতা তাঁর পক্ষেও সেটা তেমনই বিষ্ময়কর হয়ে ওঠে। বাসুদেব সর্ব্বব্যাপি এবং আত্মাও সেই বাসুদেবেরই অংশ অথচ তাঁতে দেহসম্বন্ধ ভেবে নিয়ে জীবের যে প্রচণ্ড ভ্রান্তি এমনতর পরম গোপনীয় যে তত্ত্ব এর ব্যবহারিক ভাবে প্রযত্ন ও অভ্যাসই হল যোগতত্ত্ব যা হল গুহ্যতম, যা আছে সকল বিষ্ময় ও সকল রোমাঞ্চের মূলে ॥ ১৮/৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।। ৭৫

অনুবাদ : ব্যাসের প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য যোগ সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৮/৭৫

ব্যাখ্যা : এই শ্লোক এবং উপরিকৃত তার যে অনুবাদ তাতে পাঠক কিছুটা স্ববিরোধিতা (self-contradiction) এবং ভ্রান্তিমূলক বিষয় (confusing elements) নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন এবং প্রশ্নটাও করেছেন যে সঞ্জয়ই স্বয়ং যদি দিব্যদৃষ্টি হয়, আর তারই দ্বারা যদি অন্ধজন সমীপে পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে তিনি ব্যাসের প্রসাদে, মানে অনুগ্রহে, সাক্ষাৎ যোগবক্তা স্বয়ং যোগেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) মুখ থেকে কিভাবে যোগতত্ত্ব শুনলেন ? ব্যাসদেবকে যদি শুধুমাত্র মহাভারতের রচয়িতা মহাকবি বলে ভাবি, তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। কারণ সঞ্জয়রূপী দিব্যচক্ষু যা জানতে পেরেছেন তা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনই জানা বা বোঝা যায় না। এটা শোনা বা জানা যায় ব্যাসদেবের প্রসাদে বা অনুগ্রহে। তাহলে এখানে এই ব্যাসদেব কে ? কি তার প্রকৃত পরিচয় ? উত্তর শ্রীকৃষ্ণও যা ইনিও তাই। তাহলে পাঠকের প্রশ্ন ব্যাসে ও শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য কি ? শ্রীকৃষ্ণ "তৎস্বরূপ" অর্থাৎ আপনাতে আপনি। তাঁর কথা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, কানেও শোনা যায় না। তাই কূটস্থ চৈতন্যই যখন একটু বহ্যেন্দ্রিয়ে মিশে গিয়ে ব্যক্ত হন, তখন যেরকম জ্ঞান আমাদের মনে উদয় হয় সেটাই হল ব্যাসের প্রসাদ বা দিব্যজ্ঞান, যাই বলি। এহেন জ্ঞানে কিন্তু কিছু ভেদজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি থেকেই যায়। সেখানে জ্ঞানের পূর্ণতার মধ্যেও কিছুমাত্র হলেও ভেদজ্ঞান থেকেই যায় আর তেমন জায়গা থেকেই এই সংবাদ শোনা যায় বলে ব্যাসও ভগবানের অংশাবতার। ব্যাসে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভেদ এভাবে বললেও পাঠকের বোধ ততটা সূক্ষ্ম না হলে কিন্তু প্রশ্নের ধাঁধাটা থেকেই যাবে। সেজন্যই বলা হচ্ছে যে প্রাণরূপী আত্মাই হচ্ছেন ব্যাস এবং আত্মপ্রসন্নতাই হল ব্যাসের প্রসাদ। এই প্রসঙ্গে আগের দশম অধ্যায়ের ৩৭তম শ্লোকের ব্যাখ্যাটা পড়ে নিলে পাঠকের প্রশ্নের উত্তর আরও সহজ হবে। তাহলে এমনতর ব্যাসের প্রসাদেই শোনা গেল এই যোগ। এখানেও পাঠকের একটা প্রশ্ন আছে তা হল এই সংবাদ পরম গোপনীয় কেন ? উত্তরটা আগেই বলেছি যেহেতু এটা বিনা সাধনায়, বিনা পরিশ্রমে শুধুমাত্র বাহ্য ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বোঝা যায় না। বেদবিভাগ কর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদেই

এমনতর দিব্য সম্যক দৃষ্টি (চোখ) ও শ্রবণ (কান) শক্তি লাভ হয়েছিল তাই তিনি এমন পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শুনেছিলেন। অন্ধ তোমরাও। তাই এহেন ব্যাস প্রসাদে যদি তোমাদের সঞ্জয়ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করে, তবে তোমরাও তোমাদের সেই পরমাত্মীয়ের মুখে, তোমাদের অন্তরের ভিতরেই, এই অপূর্ব্ব গীতা কাহিনী শুনতে পাবে ও সকল রহস্য ভেদ হবে। তোমরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র হলেও তোমাদের এই অন্ধ প্রবৃত্তির তলায় আছে নির্ম্মল চিত্ত, সঞ্জয় চিত্ত, সম্যক জয়কারী চিত্ত, যা সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ। এটা না থাকলে আজ এহেন গুরুকৃপা তোমরা কখনই লাভ করতে পারতে না। মহাভারতের সঞ্জয় যদি ব্যাসের কৃপায় দিব্য চোখ, কান পেয়ে থাকে তবে তোমরাও তোমাদের অন্তরে ক্ষর আত্মাকে অক্ষর আত্মার বিশ্বরূপে দর্শন ও পরমতত্ত্ব জ্ঞানময় গীতারূপ মহাসঙ্গীত অবশ্যই শুনতে পাবে। বেদবিভাগ কর্ত্তা ব্যাসের মতই অধ্যাত্মেও বেদবিভাগ কর্ত্তা জীবে জীবে রয়েছেন। কোনও গোলকের (বৃত্তের/Circle) কেন্দ্রমধ্য দিয়ে তার পরিধিতে দুটো বিপরীত মেরু রচনা করে যে সরলরেখা টানা হয় সেটা সেই বৃত্তের ব্যাস। এই সৃষ্টিও অণ্ডময় তাই একে ব্রহ্মাণ্ড বলে। ব্রহ্মতেজ বা চেতনার এক একটা বাক্ প্রকাশও এক একটা গোলক। জীব শরীরও যে গোলক মাত্র সেটা লিঙ্গশরীরে প্রত্যক্ষীভূত হয়। বিশ্বরূপে যা কিছু দেখি সে সমস্তগুলোই এক একটা গোলক বা বৃত্ত। এই গোলক বা লিঙ্গশরীর যখন স্থূল শরীর পরিগ্রহণ করে তখন সেই গোলকের ব্যাস স্থূলশরীরের মেরুদণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। বর্ণময় লিঙ্গশরীর বা গোলকের ব্যাসের উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু রূপে ভগবান ও জীব যথাক্রমে অবস্থান করেন। চেতনা বেদনময়। সেই বেদনের বিভাগগুলো স্তরে স্তরে এই মেরুদণ্ড অবলম্বনে বিন্যস্ত। অধ্যাত্মে তারই নাম বেদবিভাগ। এহেন বেদন বা বেদবিভাগ গুলোর যিনি মঙ্গলময় কর্ত্তা বা দ্রষ্টা হন তিনি বেদব্যাস যার পিতা হলেন অক্ষোভ্য পরাশর। অক্ষর আত্মস্বরূপটা যেখানে কূটস্থ অক্ষরে সংন্যস্ত, সেই অংশের নাম অক্ষোভ্য পরাশর যিনি তন্ত্রে দ্বিতীয় সিদ্ধবিদ্যা তারা অর্থাৎ তারক ব্রহ্মের ললাটে অর্থাৎ মনে অবস্থিত বলে বর্ণিত। ইনি উভয়লিঙ্গ – একদিকে অক্ষোভ্য, – অন্যদিকে পরা শ্রী বা শক্তিসম্পন্ন পরাশর। জীবের দ্বিতীয় স্বরূপ বেদব্যাস – ঐ বেদনবিভাগময় দেহ ব্রহ্মাণ্ডে যে তত্ত্বময় বা দেবতাময় স্থিতি তার দ্রষ্টা, পরিজ্ঞাতা। বেদনবিভাগগুলো মেরুদণ্ড অবলম্বনে পদ্মরূপে কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। এগুলো বোধস্বরূপ সুষুম্নাধারার গ্রন্থিরূপে বিন্যস্ত। বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত সবারই জানা আছে। পরাশর দ্বারা মৎস্যগন্ধার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম। পরাশর মৎস্যগন্ধাকে পদ্মগন্ধা করে নিয়ে তার সাথে মিলিত হয়েছিলেন। যার তাৎপর্য্য হল আক্ষোভ্য পরাশর হতে বেদবিদ্যার স্রষ্টা ও সংকলন কর্ত্তারূপ জীবের দ্বিতীয় অবস্থার প্রকাশ। ইনিই বেদব্যাসরূপে পদ্মময় মেরুদণ্ডে বেদজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত। পুলিনে মানে বোধশক্তি বা দেবতাময় চেতনবিশ্বের ও ভূতবিশ্বের সঙ্গমস্থলে বা জীবশরীরস্থ মূলাধারে বেদব্যাসের জন্ম। এমন মেরুদণ্ডস্থ বোধপ্রবাহ ভূতে এসে মিলিত থাকে মূলাধারে। জীবের একান্ত ভূতবিমূঢ় সাধারণ জীবভাবটা ব্যাস, বেদব্যাস নয়, যেটা মৎস্যগন্ধার স্বভাবিক ভৌতিক ধর্ম্মযুক্ত আঁশটে গন্ধেভরা অর্থাৎ দেহাত্মবোধময়। এখানে "মৎস্য" দ্ব্যর্থবঞ্জক। মাছ ছাড়াও অর্থ "মম সঃ" এমন মমত্ব বেধের নামই "মৎস্য"। এমন ক্রমধারায় অক্ষরের একটা অংশ স্থূল ভৌতিক জীবভাব পেয়ে থাকে। মেরুদণ্ডের ভিতর ক্ষিতি আদি পঞ্চতত্ত্ব, তদভিমানিনি দেবী, বাঙ্ময়ী আদ্যা ব্রহ্মশক্তি ও তদঙ্গস্বরূপ অনন্ত দেববর্গ অবস্থিত – স্তরে স্তরে বিভাগে বিভাগে প্রতিষ্ঠিত। যদি স্থূল ভূতবিমূঢ় ভাব পরিত্যাগ করে নির্ম্মলচিত্ত হয়ে দৃষ্টি ফেরাও তবে তোমার ঐ বস্তি প্রদেশের ব্যস্ত বা বহুধাবিচ্ছিন্ন, বহুধাবিভক্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যাসভাব হতে বেদব্যাসত্বে উত্থিত (elevated) হবে। বেদব্যাসের দেখা পেয়ে তার প্রসাদে বেদদ্রষ্টা হবে। তারপর বেদব্যাসত্ব থেকে অক্ষোভ্য অক্ষরত্বে সমারূঢ় হবে। হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে রণকোলাহল ও রণদুন্দুভির মধ্যে, রবাহুত ভূমির সেনাকোলাহলের মধ্যেও নীরব অনাহত চক্রে তোমার ক্ষর আত্মার অক্ষর স্বরূপে মিলন দেখতে পাবে। আত্মার মাঝে আত্মায় পার্থ ও পার্থসারথির বিভক্ত মূর্ত্তি দেখতে পাবে। দেখতে পাবে সারথির, তোমার, বিশ্বরূপ তোমারই শরীর ব্রহ্মাণ্ডে। অপৌরুষেয় গীতারূপিনী মহাগীতির ঝঙ্কার (নাদ, অনুনাদ সকল অনাহত ধ্বনি) শুনতে শুনতে তোমার ক্ষরণশীল আত্মচেতনা অক্ষরের অনুশাসনে সমর্পণ করে সমস্ত ক্ষরত্ব ভূলছে, সেই সাথে "ব্যস্ত" বা বহু বিভক্তভাব ছেড়ে সমস্ত বা একত্বভাবে সম্বুদ্ধ হয়ে চলেছে। এরই ফলে জীব ক্ষরত্ব ছেড়ে জন্ম জন্মান্তর ধরে ক্রমশঃ মুক্তির দিকেই চলেছে। আত্মার এমনতর ক্ষর অক্ষর মিলন লক্ষ্য করেই বোধহয় "ব্যস্ত সমস্ত হোম" নামক যজ্ঞের প্রচলন হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণদের হোম করতে দেখা যায় আর "ব্যস্তসমস্ত হোমে বিনিয়োগঃ" বলে মন্ত্র পড়তে শোনা যায়। কিন্তু এতে অন্ধমন ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব ঘোচেনা। অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি। সে ব্যস্ত সমস্ত হোমের তত্ত্ব বুঝবে কি করে ? তাই হে ধৃতরাষ্ট্র, একথা ভূলোনা যে আজ্ঞাচক্রে তুমি অক্ষোভ্য পরাশর, মূলাধার অবধি মেরুদণ্ডে তুমি বেদব্যাস এবং মূলাধারের বাহ্যভৌতিক ভূমিতে তুমি ব্যাস। নিজে সঞ্জয় হতে পারলেই এটা দেখতে পাবে। ব্রহ্মভাবের নিম্ন অবস্থাই ঈশ্বরভাব। পরমাত্মা নির্গুণ তাই সেখানে মাত্র একটাই ভাব। পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন করে দেওয়াই এই সংবাদের উদ্দেশ্য। যোগাভ্যাসের ফলে যোগের পরঅবস্থায় জীব সাময়িকভাবে হলেও যখন পরমাত্মার সাথে এক হয়ে জীবন্মুক্তি ভোগ করে তখন সে বুঝতে পারে যে এর কি প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি! সে শক্তির টানে পড়লে ধন, জন, ঘর, বাড়ী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবই বিস্বাদ বলে মনে হয়। তখন ডাক্তার যতই বলুক যে হার্টের অবস্থা খারাপ, কমপক্ষে ১০/১২ ঘন্টা ঘুমের দরকার সে কথায় কান যায় কি করে ? নেশার চোটে মন সে দিকে আর ফিরতেই চায় না। কৃষ্ণদর্শনের আনন্দে গোপীগণের হৃদরোগ (কামানুবন্ধন) নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মনোরথ শেষ হলে আর মনের মননধর্ম্মও থাকে না। বেদে এটাই সাধনার শেষ কথা। তার পরের অবস্থার কথা আর বেদে নেই। "নেতি নেতি" (ন + ইতি) করেই শেষ হয়েছে। পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার

মিলনকালে যা শোনা যায় সেটাই হল আত্মবাণী। তাই এর নাম শ্রুতি। এটাই হল ভগবানের নিজের মুখের কথা। এসমস্ত লোকপরম্পরায় শোনা কথা নয়, নিজের অনুভবের বিষয়, যদিও বাল্যকালে বইতে পড়েছিলাম যে লোকপরম্পরায় শুনে শুনে মনে রাখতে হত বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। তা মোটেই নয়, অন্ততঃ অধ্যাত্মঅর্থে তো নয়ই ॥ ১৮/৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্যসংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।। ৭৬

অনুবাদ : হে রাজন, কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্ম্মুহু হৃষ্ট হইতেছি ॥ ১৮/৭৬

ব্যাখ্যা : জীবের মনই হল তার দেহরূপ সাম্রাজ্যের অধিপতিস্বরূপ রাজা তা সে ভালমন্দ বোধবিহীনই হোক, আর যাই হোক, রাজা তো রাজাই, তাই সঞ্জয়রূপী দিব্যদৃষ্টি মনরূপী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন। পাঠক প্রশ্ন করবেন যোগতত্ত্বের এতটা গভীরে এসেও কি ধৃতরাষ্ট এখনও অন্ধই থাকবেন ? জিতচিত্ত হলেই কি আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্থূল সংস্কারান্ধতা দূর হয় ? মোটেই নয়। তখনও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বেঁচে থাকে। যখনই কোনও উচ্চ আদর্শের কথা মনে পড়ে তখনই তোমার অন্তরস্থ সঞ্জয় তোমাকে সেই আদর্শে উন্নীত করার কত চেষ্টা করে, কত উপদেশই দেয়। কিন্তু তুমি তো উঠতে পারো না, তুমি সেই অন্ধকারেই থাকো। আবার যখনই কোনও কুকর্ম্মে, নিন্দনীয় কর্ম্মে এগিয়ে যাও, বেদনস্পর্শী শুদ্ধচিত্ত তোমায় তাতে নিষেধ করে কিন্তু তুমি অন্ধ হয়ে তাতেই নেমে পড়। তোমাদের অধ্যাত্মক্ষেত্রে এটাতো দৈনন্দিন ঘটনা। সম্যকভাবে নির্ম্মলচিত্ত যেখানে সঞ্জয় রূপে অবস্থিত অথবা বেদন বা অনুভূতি গ্রহণে সক্ষম, সেই নির্ম্মলচিত্ত বেদবিভাগ কর্ত্তার প্রসাদে ক্ষরাক্ষরের মাঝে দীক্ষাক্রিয়া সম্পন্ন হতে দেখে। তখন সেই দর্শনের মহিমা সেই নির্ম্মলচিত্তকে স্পন্দিত করতে থাকে পুনঃ পুনঃ, বারবার হর্ষ পুলকে চিত্তকে পূর্ণ করতে থাকে। ক্ষর অক্ষরের মাঝে যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধস্থাপন, ক্ষরের অক্ষরে আত্মনিবেদন চিত্তকে বার বার আবেগে আকুল করে তুলতে থাকে। সেই কর্ম্মস্পন্দনময় দর্শন ও স্মৃতির প্রতিধ্বনিই শুদ্ধচিত্ত করতে থাকে অন্ধ প্রবৃত্তিময় জীবচিত্তের অন্তরে, বিষয়মগ্ন মনটা বিষয়ক্লেদ হতে উত্তীর্ণ হয়ে বেশ মুক্তির আরাম অনুভব করে। শুদ্ধচিত্তের এতে যত আনন্দ হয়, অন্য আর কোন কিছুতেই তা হয় না, যদিও সংসারে পাপপুণ্য বলে কিছু নেই তবুও সাংসারিক কথায়, ভোগের কথায়, আমাদের চিত্তকে ভোগাসক্তই করে থাকে ফলে আবদ্ধ করে, তাই এটা পাপ। আর কেশবার্জ্জুনের এই কথায় আমাদের চিত্ত নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হয়। অর্জ্জুন হল ত্বেজস্তত্ত্ব, তার দ্বারাই

জগদ্ব্যাপার চলছে, সেই তেজঃ যখন ঈশ্বরমুখী বা আত্মমুখী হয় তখনই তা ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয়ে ওঠে ॥ ১৮/৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭

অনুবাদ : হে রাজন্, হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমার মহান বিস্ময় জন্মিতেছে, আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্টও হইতেছি ॥ ১৮/৭৭

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে সঞ্জয় কৃষ্ণ অর্জ্জুন কথোপকথনরূপ সংবাদ বা স্বীয় গীতা শ্রবণের কথাটাই বলেছেন। এখন এই শ্লোকে সেই একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিশ্বরূপ দর্শনের স্মৃতিকথার উল্লেখ করলেন। ভগবানের সগুণ রূপই হল বিশ্বরূপ যেটা অর্জ্জুনের ধ্যানসৌকর্য্যহেতু দেখান গিয়েছিল। সেই অতি অদ্ভুত রূপ দেখে ও সেই দর্শনের কথা মনে করে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের আর আনন্দের সীমা নেই। এহেন আনন্দের কারণই হল এই জগৎব্যাপারের মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়গুলো সাময়িকভাবে তৃপ্ত হলেও জীবের প্রকৃত তৃপ্তি হয় না। বহুভাবের মধ্যে ঐক্যভাবকে দেখতে না পেলে জীব শান্ত হয় না। নানাত্ব দর্শনে জীব কখনই সন্তাপমুক্ত হতে পারেনা। ক্ষর আত্মাকে অক্ষর আত্মায় সংযুক্ত করে দেওয়া অথবা অক্ষরে আপনাকে সংস্থিত দেখে কৃতার্থ হওয়াই দীক্ষা। এই অক্ষরে ক্ষরের আত্মসমর্পণ হলেই ধ্রুবাস্মৃতি উদ্‌বুদ্ধ হয় ও আত্মার বিশ্বরূপ সপ্রকাশ হয়ে ক্ষরের ক্ষরত্বকে অপসারণ করতে থাকে। অক্ষর আত্মার সেই বিশ্বরূপ ও আত্মত্বের বাণীময় বেদন সম্বুদ্ধ থাকার নামই সংস্মৃতি বা ধ্রুবাস্মৃতি। সঞ্জয়রূপ শুদ্ধচিত্তেই হয় তার পুনঃ পুনঃ হর্ষণ। দীক্ষার এটাই হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকাহিনী স্মরণই হল এর অন্যতম পরবর্ত্তী ফল। গীতাই হল অর্জ্জুনের দীক্ষার কাহিনী এবং সেই সাথে চির অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চিরমৃত্যুর সূচনা। সে কাহিনীর স্মরণ যত হতে থাকে ততই চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় ॥ ১৮/৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।। ৭৮

অনুবাদ : যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই শ্রী, বিজয়, অচলা সম্পদ এবং স্থিরা নীতি আছে, এই আমার ধারণা ॥ ১৮/৭৮

ব্যাখ্যা : যে ঘটে রাম আছে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে প্রাণকৃষ্ণের প্রকাশ আছে সে ক্ষেত্রে জীব চৈতন্যের প্রকাশও আছে, তাই মানুষ যতই দেহভাবে ও দেহসুখে মত্ত থাকুক, একদিন না একদিন কূটস্থ চৈতন্যের প্রতি ঠিকই নজর পড়বে। তুমি যদি "ধনুর্দ্ধর" অর্থে প্রকৃত কর্ম্মযজ্ঞময় হও, যদি কর্ম্মে কর্ম্মে, ভূতে ভূতে, তাদের মূলে মূলে যেভাবে আত্মদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেভাবে তার অনুধাবনময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, যদি ভূতের তলে প্রজ্ঞা আর প্রজ্ঞার তলে আত্মবোধ, আত্মবোধের তলে কূটস্থ অক্ষরাত্মরূপী পরমেশ্বরকে দেখ, যদি কর্ম্মকে এবং গৃহস্থাশ্রমকে ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে, জগৎকে বিষ দৃষ্টিতে না দেখ, ভ্রান্তিময় বলে ধারণা না কর, বরং যদি নিজ শ্রীগুরুদেবের আদেশে ও উপদেশে ,একে মধুময়, আত্মময় ও ব্রহ্মময় ভাবে দেখতে অভ্যস্ত হও, জীবন কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত করার চেষ্টা কর, কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে না বেড়িয়ে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মধ্বজী না হয়ে, সহজ ও সাধারণভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে যদি তাকে গীতানুসারী ভাবে উদ্ধার করে নাও তবে তোমারই আত্মা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বিশ্বরূপ তোমারই অন্তরে দেখাবেন, গীতার সমগ্র শিক্ষা অন্তরেই দেবেন। অন্তর্য্যামী স্বয়ং গুরু হয়ে তোমার ক্ষরত্বকে নিজের শান্ত, স্থির, শিবস্বরূপে মিলিয়ে নেবেন। যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ (প্রাণরূপী কৃষ্ণ) আছেন এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থরূপী জীবের প্রকাশ আছে, মানে যে ক্ষেত্রেতে তেজস্তত্ত্বরূপী জীবচৈতন্য অর্জ্জুনের প্রকাশ আছে, সাধন সমররূপ সেই স্থানকেই " শ্রী " অর্থাৎ লক্ষ্মীর প্রকাশ অবস্থা অর্থে সাধন কালীন চক্ষুতে বায়ু স্থির হলে যে স্থির সৌন্দর্য্যময় অবস্থা হয় তেমন অবস্থা, " বিজয় " অর্থে সর্ব্বজয়ী অবস্থা, "অচলা সম্পদ" অর্থে পরমৈশ্বর্য্যরূপ চিরস্থায়ী আত্মসম্পদ এবং "স্থিরা নীতি" মানে নিয়ম পালনে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা (Sincerity) আছে। আমার এটাই ধারণা। তাই কৃষ্ণও যেদিকে জয়ও সে দিকেই, মানে কূটস্থেরই জয়। যে সকল যোগসাধকগণ রজো ও তমোগুণকে ক্ষীণ করতে করতে সত্ত্বগুণকে বাড়িয়ে চলেছেন তাঁরা একদিন ঠিকই গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবেন। অতএব হে সাধক, তোমার শ্রী, বিজয় সিদ্ধি, সম্পদ মোক্ষ তোমাতেই অধিভূত হবে। ধ্রুবানীতি বা চিন্ময় ব্রহ্ম হতে জাত এ জগৎ যে তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এটা দেখে ও বুঝে তদনুসারী নীতি তোমার উপর আধিপত্য করুক। যিনি এমন গীতার আকারে অন্তরে প্রজ্ঞার প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে অক্ষর গুরুরূপে বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন ও অন্ধবিশ্বকে আলোকমালায় সাজিয়ে ধরেছেন দৃষ্টিতে, মহাকালের অঙ্গীভূত করে, তিনি আমায় তাঁর চরণে প্রণামময় করে রাখুন। যে সকল মহাপুরুষগণ এই পরমানন্দ সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার করে জগৎ ও জীবকুলের পরমকল্যাণ সাধন করছেন সেই যোগেশ্বর পুরুষের জয় হোক। শেষ কথাটা হল যতই শ্রীমদ্ভগবদগীতা আলোড়ন করে তত্ত্বলাভের চেষ্টা কর গুরুকৃপারূপ অমৃতদৃষ্টি ব্যতীত গীতান্তর্গত তত্ত্বলাভ অসম্ভব। শ্রীধরস্বামীর সুবোধিনী টীকা অনুসারে সম্যকভাবে গুরুকৃপা না পেলে গীতাতত্ত্ব মোটেই জানা যায় না।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎসৎ শ্রীমদভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সংবাদে "মোক্ষ যোগ" নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ন হইল ॥ ওঁ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১৮/৭৮

অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ : অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র গীতারই সারসংক্ষেপ। এর আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। মোক্ষ = খং স্বরূপ ব্রহ্মে মনের স্থিতিলাভ রূপ অবস্থা, যোগ = মিলন। খং স্বরূপ ব্রহ্মে মনের স্থিতি হলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হয়ে যে অবস্থা হয় সেই অবস্থার নামই মোক্ষ যোগ। কি করে এটা লাভ হয় সেটা ৫০তম শ্লোক হতে ৫৪তম শ্লোকে বেশ স্পষ্ট ভাবে বলা আছে। তারপর ৫৫ তম শ্লোকে বলা আছে ব্রহ্মভূত যোগীর কি কি লক্ষণ ফুটে ওঠে। স্বকর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বর আরাধনায় রত হলে ভগবদকৃপায় সাধকের সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হয়। অবশ্য তার জন্য সাধককে করতে হয় (১) কায়মনোবাক্যে সংযম, (২) লঘু আহার (৩) নির্জনস্থানে বাস বা জনসঙ্গ ত্যাগ (৪) দর্প, ক্রোধ ও পরপীড়া বর্জন এবং নিরহঙ্কার হয়ে সর্ব্বদা যোগের অভ্যাসে লেগে থাকা। তাহলেই চিত্ত মমতারহিত হয়ে শান্ত হবে। চিত্তরূপ যন্ত্রে আমাদের যে ভাবনাময় কর্ম্মবীজ রয়েছে তারই স্ফূরণ হচ্ছে, ঈশ্বরেচ্ছায় এটা জানতে পারলেই জীবের কর্ম্ম নষ্ট হয়। যতদিন আমি কর্ম্ম করছি এমন ধারণা থাকে ততদিন শুভাশুভ কর্ম্মের ফল আমাকেই ভোগ করতে হয়, আর যখনই বুঝতে পারলাম যে আমার কর্ম্মই নেই তখনই কর্ম্মের নাশ হয়ে গেল, কর্ম্ম আর আমাকে জড়াতে পারেনা। ৫৭তম শ্লোকে দেখুন – "চেতসা সর্ব্বকর্ম্মানি ময়ি সংনস্য মৎপরঃ। বুদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥" মৎপর হয়ে সর্ব্বদা আত্মাতে থাকলে মনে হবে সকল কর্ম্মই ব্রহ্ম করছেন আর বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করলে স্থিরচিত্ত যোগী আপনাতেই আপনি থাকেন অথচ সকল কর্ম্মই হয়ে যায়। "মচ্চিত্ত" হতে পারলেই সে চিত্তে আর সংসার বীজ থাকে না, সুতরাং জন্ম, যাতায়াত বা বারবার দেহ ধারণ করার যে অশেষ দুর্গতি তার শেষ হয় ॥

অথ শ্রী শ্রী গীতামাহত্ম্যম্ ॥

গীতামাহাত্ম্য বর্ণনার অতীত। একমাত্র শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কেউই শ্রীমদভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনে সমর্থ নন। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে গীতার যে মাহাত্ম্য গীতামাহাত্ম্য, গীতাপ্রশস্তি, গীতাসার ইত্যাদি নামে বর্ণিত আছে সে সকলই স্বয়ং ভগবানের দ্বারাই কথিত। এমন বহুবিধ রচনার মধ্যে শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার, অষ্টাবক্র সংহিতা, গরুঢ় পুরাণ ও বরাহ পুরাণাদিতে শ্রীমদভগবদ্গীতার যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ংবোধ্য। সে সকল নতুন করে ব্যাখ্যা করার সাধ বা সাধ্য কোনও মতেই সমীচিন নয়। কারণ গীতামাহাত্ম্য হল উপলব্ধির বিষয়। এমনতর উপলব্ধি যোগীদেরই হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপী গুরু শিষ্য সংবাদ পাঠে বোঝা গেল যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হলে বিষয় বাসনা ত্যাগ করে অনুক্ষণ গুরুদত্ত সাধনক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। এইভাবে একবার স্বভাবের যোগপথে পড়তে পারলে আর কোনও চিন্তা থাকে না। স্রোতের বেগে ভেসে যাবার মত করে গুরুশক্তিই সাধককে পরম বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছে দেয়। হ্যাঁ, চাই শুধু গুরুর উপর একান্ত নির্ভরতা ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভুলেও গুরুর কাছে বিষয় অথবা বস্তুজগতের কোনও কিছু চাইতে নেই, তাহলেই চিত্তির। কারণ‘অর্থ’ এবং‘পরমার্থ’ সর্ব্বদাই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

অর্থলাভ কখনও মনুষ্যজীবনের একমাত্র কাম্য হতে পারে না। কেবলমাত্র বিশুদ্ধজ্ঞান অর্জনই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত– “সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”। প্রকৃত শিষ্যের প্রার্থনা হয় কেবলমাত্র বিশুদ্ধজ্ঞান। সে জানতে চায় দেহে প্রাণের সঞ্চার হল কিভাবে ? “কুতঃ এষ প্রাণ আয়াতি অস্মিন শরীরে ?” সদ্গুরু উত্তর দেন, “সূর্য্য হতে। সূর্য্যই প্রাণের উৎস।” উপনিষদের ভাষায় – “আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ” ঋগ্বেদের ভাষায় – “প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ”। সূর্য্য হতেই প্রাণের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়। “অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্ দক্ষিণাং যদ্ প্রতীচীং যদ্ উদীচীং যদ্ অধো যদ্ উর্দ্ধং যদন্তরোদিশো, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে।” অর্থাৎ সূর্য্য হতে বিচ্ছুরিত ঐ প্রাণ আমরা প্লীহার (spleen) সাহায্যে সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করি ও স্বকীয় (absorb) করে নিই। এভাবেই সমষ্টি সৌর প্রাণ ব্যষ্টি জৈব প্রাণে রূপান্তরিত হয়। “Prana from the Sun is absorbed by the spleen – centre, which is the vital receiving and transmitting station of the body.” (Science of Seership) প্লীহার দ্বারা ঐ ভাবে স্বীকরণের (absorption) পর ঐ জৈব প্রাণ, স্নায়ু প্রণালী বাহিত হয়ে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। আমাদের এই স্থূল ভাণ্ডদেহের ইথারীয় প্রতিকৃতি (etheric double) আছে যাকে পিণ্ডদেহ বলা হয় এবং ঐ পিণ্ডদেহই জৈব প্রাণের বাহন। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষমাত্রেই অমনতর পিণ্ডদেহে প্রাণের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ সহজেই প্রত্যক্ষ করে থাকেন। জীব শরীরে

এই প্রাণের প্রবাহ মন্থর হলে বা সাময়িক ভাবে স্তিমিত বা বিঘ্নিত হলেও স্বাস্থ্যহানি সুনিশ্চিত। এই পিণ্ডদেহে স্থূল ভাণ্ডদেহের বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গের সংসৃষ্ট ছয়টা শক্তিকেন্দ্র আছে – যোগের ভাষায় যাদের ষটচক্র বলা হয়। চক্র বলতে ঘূর্ণ্যমান শক্তিকেন্দ্রকেই বোঝায়। বিজ্ঞানী ঐড়ফংড়হ এর ভাষায় : They are the force-centres in the human body and are so called, because to clairvoyant sight they have the appearance of spinning vortices. They are six plexuses.” এই ষটচক্রের নামগুলো হল যথাক্রমে – মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ্য বা বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। সদ্গুরু শিষ্যকে শরীরমধ্যে চক্রসমূহের অবস্থান বিষয়ে অবহিত করেন।

মূলাধারের স্থান মেরুদণ্ডের অধস্থলে (Pireneum). “ধঃ ঃযব নধংব ড়ভ ঃযব ংঢ়রহব এই চক্র হতে প্রাণ প্রসৃত হয়ে জননযন্ত্র (Generative System) কে অনুপ্রাণিত করে। এই চক্রের অভ্যন্ত রেই কুণ্ডলিনীশক্তি (ঝবৎঢ়বহঃ ঢ়ড়বিৎ) ত্রিবলি আকারে প্রসুপ্ত থাকে। বিজ্ঞানী ঐড়ফংড়হ এর কথায় “In the heart of this chakram, lies the ‘Serpent fire’, Kundalini and there it sleeps throughout the ages until the time is ripe for it to be aroused.”

এর পর স্বাধিষ্ঠানচক্র যা প্লীহার একেবারে কাছেই অবস্থিত। এই চক্রই সমষ্টি সৌরপ্রাণকে আত্মসাৎ করে বিশিষ্ট জৈব প্রাণে পরিণত করে। আগেই বলেছি এই চক্রের ক্রিয়া স্তি মিত হলে প্রাণের স্বচ্ছন্দ গতি স্তম্ভিত হয় ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতার প্রকাশ ঘটে।

স্বাধিষ্ঠানের কিছু উর্দ্ধেই নাভিদেশে মণিপুর চক্রের (Solar plexus) স্থান। মণিপুর চক্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ঐড়ফংড়হ বলেছেন “ it is the receiving station for all sub-conscious emotional vibrations, which are conveyed by it to the physical nerve ganglion of the same name etc.”

মণিপুরের উপরেই অনাহত চক্র (Cardiac plexus) যার স্থান হল হৃদয়ে। “হৃৎপদ্মকোষে বিলসৎ তড়িৎপ্রভম্”। শঙ্করাচার্য্যের মতে সাধারণ মানুষের হৃদয়মধ্যে এই পদ্ম অধোমুখে নিমীলিত অবস্থায় থাকে, একমাত্র সাধনবলেই ঐ পদ্ম উর্দ্ধমুখে বিকশিত হয়। খৃষ্টীয় মতে যাকে Mystic Rose বলা হয়েছে, “ The petals of which open only after the Christ child has been born in the heart.” চৈনিক যোগীগণ একেই “আইচিন” (কনক কমল; golden lotus) বলেছেন। “The golden flower which is the light of heaven.”- যোগদীপ্তিতে যার বিকাশ ঘটে।

অনাহত চক্রের উপরে কণ্ঠস্থলে বিশুদ্ধাক্ষ্য বা বিশুদ্ধ চক্রের স্থান। থাইরয়েড গ্রন্থির যাকিছু ক্রিয়াকলাপ সকলই এই চক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই চক্রের সঙ্গে আবার মূলাধারের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। "It is not unusual to find that disturbances of the creative organs and functions produce corresponding disorders of the throat which is the higher creative centre".

বিশুদ্ধাখ্যের উপর ভ্রূমধ্যস্থলে আজ্ঞাচক্রের (um) স্থান। এই চক্র দ্বিদল (bi-petal) যার একটি হল pineal gland বা "ইন্দ্রযোনি" এবং অপরটি Pituitary body (শিবসতী) বা শৈবাগম তন্ত্রের ভাষায় "তারা যন্ত্র"। এবহবৎধষ চযরংরড়ষড়মু তে এই দুটো গ্ল্যান্ডকে "two insignificant excrescences in man's cranial cavity" বলা হয়। অধ্যাপক বিচেও (Professor Bichat) ঐ দুটোকে "two horny warts covered with grey sand acervulus cerebri" বলে অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু যোগিনী ম্যাডাম ব্ল্যাভস্কি তাঁর ‘সিক্রেট ডকট্রিন’ গ্রন্থে ঐ বালুকাকে লক্ষ্য করে বলেছেন This sand is very mysterious and baffles the enquiry of every materialist. In the cavity on the anterior surface of this gland (Conarium), is found a yellowish substance semi-transparent, brilliant and hard, the diameter of which does not exceed half a line (one line is equal to one – twelth part of an inch). Such is the accrvulus cerebri". গীতাতেও শ্রীভগবান "ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক" বলতে এই স্থানকেই বুঝিয়েছেন।

এই আজ্ঞাচক্রের উপরে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার, এ জায়গাটাকে মস্তিষ্কের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখলে এই পদ্মের হাজার দল দেখতে পাওয়া যায়। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে ষটচক্র ভেদপূর্ব্বক মস্তিষ্কের এই সহস্রারে উপনীত হলে দেহস্থিত প্রাণশক্তি সতেজ হয়, দীপ্ত হয়, স্ফূর্ত হয়। কুণ্ডলিনীর রহস্য হল প্রজ্ঞানসম্মত দেহবিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা যতদিন না এই কুন্ডলিনীর ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন ততদিন আয়ুর্বিজ্ঞানের গবেষণা অপূর্ণ থেকে যাবে। অল্প কিছুদিন হল তাঁরা ductless glands বা অন্তর্মুখী গ্রন্থির বিষয়ে জেনেছেন। যেমন Thyroid, Pitutary, Pinial, Thymus ইত্যাদি আর তার ফলেই তাঁরা কতই না অভিনব তত্ত্বসকল আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানকে এই ষটচক্র ভেদের বিষয়টাও জানতে হবে। উপযুক্ত শিষ্য নিজ সদ্‌গুরুকে প্রশ্ন করবেন, কুণ্ডলিনী কি ? সদ্‌গুরু তখন শিষ্যকে কুণ্ডলিনী রহস্য ব্যবহারিকভাবে বুঝিয়ে দেবেন। কুণ্ডলিনী হল বিশ্বতাড়িত শক্তি, (The cosmic electricity) প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক যোগী স্বামী রামতীর্থের ভাষায় – " Kundalini is called the serpentine or annular power, on account of its spiral like working or progress in the body of the ascetic, developing the power in himself. It is an electric fiery occult or fohatic power, the great pristine force which underlies all organic and inorganic matter." আলোর গতি সেকেন্ডে ১৮৫০০০ মাইল কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তির গতি সেকেন্ডে ৩৪৫০০০ মাইল। এখানে পাঠকের মনে সন্দেহ হতে পারে কুণ্ডলিনী যখন বিশ্বতাড়িত শক্তি, তখন ঐ মূলাধার চক্র কিভাবে ঐ অতবড় শক্তির উৎপত্তিস্থল হতে পারে ? সাধারণ অবস্থায় কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সুষুপ্ত থাকেন। বিশেষ বিশেষ যোগক্রিয়ার পন্থায় ঐ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হয়। এই শক্তিই হল উপনিষদের সেই "নাচিকেত অগ্নি" যে অগ্নির উপদেশ যম ঋষিবালক নচিকেতাকে দিয়েছিলেন। ঐ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেই জীব অমরত্বের অধিকারী হয়, কারণ ঐ অগ্নির সংস্পর্শে শোধিত হয়ে যোগীর যোগাগ্নিময় শরীর হয়।

" ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥" (শ্বেতাঃ উপনিষদ)

অর্থাৎ তিনি জরা, রোগ ও মৃত্যুর অতীত হন। যৌগিক উপায়ে মূলাধার বিকশিত হলে ঐ চক্র বিশ্ববাহী সমষ্টি কুণ্ডলিনী শক্তি আত্মসাৎ করার ক্ষমতা লাভ করে – যেমন জলস্তম্ভে জল জলধিকে absorb করে আত্মসাৎ করে, এও ঠিক সেই ধরণের ব্যাপার। এইভাবে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে মেরুদণ্ডের সুষি সুষুম্নামার্গে উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হয়। চন্দ্রনাড়ী (ইড়া) ও সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা)র ক্রিয়ায় মুক্ত সুষুম্নাপথে উত্থিত হয়ে কুণ্ডলিনীশক্তি পরপর মূলাধার, স্বধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞাচক্রকে উজ্জ্বলিত ও অনুপ্রাণিত করে অবশেষে সহস্রারে সদাশিবের সঙ্গে সঙ্গতা হন।

কুন্ডলিনী শক্তি উদ্দীপনে ষটচক্র অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ে (Super physical sense organs) পরিণত হয়। মূলাধার উজ্জ্বলিত হলে যেমন বিশ্বতাড়িত কুণ্ডলিনীকে সংগ্রহ করার যোগ্যতা লাভ করে, তেমনি স্বাধিষ্ঠান চক্র উজ্জ্বলিত হলে মানুষ সূক্ষ্মতর লোকে স্বচ্ছন্দ বিহারের ক্ষমতা পায়। মণিপুর উজ্জ্বলনে আত্মরক্ষার ক্ষমতা বেড়ে যায়। অনাহত চক্রের উজ্জ্বলনে মানুষের ভিতরে বুদ্ধিরও উপরে যে বোধি (intuition) আছে তার উন্মেষ ঘটে। বিশুদ্ধ চক্রের উজ্জ্বলনে দিব্যশ্রুতির (clair audience) ক্ষমতা বিকশিত হয়। জাগরিত কুণ্ডলিনীর সবিশেষ কার্য্যকারিতা উপলব্ধ হয় আজ্ঞাচক্রের সঙ্গতা লাভে। বিকশিত আজ্ঞাচক্রই হল শিবনেত্র। শিবনেত্রের উন্মীলনে জীব ‘ত্রি-অম্বক’ হয়ে ‘ত্রি অম্বকং সংযমিনং দদর্শ"। এই আজ্ঞাচক্রই দিব্যদৃষ্টির যন্ত্র, এরই সাহায্যে অণিমাদি যোগসিদ্ধি ঘটে। আজ্ঞাচক্রকে উজ্জ্বলিত করে কুণ্ডলিনী সহস্রে উপনীত হলেই হয় সাধনার চরম অবস্থা। সদাশিবের সঙ্গতালাভে সাধক শুধু ব্রহ্মানন্দেই বিভোর থাকে না, তখন তাঁর সর্বত্র ত্রিলোক বিহারের পূর্ণ ক্ষমতা জন্মে যাকে উপনিষদে ‘কামচার’ বলা হয়েছে – ‘তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"। পাতঞ্জল যোগদর্শনের ৩/৫৪ সূত্রে যে সর্বজ্ঞতা সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, সেই সর্বজ্ঞতা সিদ্ধিও সাধকের লাভ হয়ে থাকে– ‘তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়ম্ অক্রমঞ্চ ইতি বিবেকজজ্ঞানম্॥"

সামান্য ভাবেও যোগমার্গের অনুশীলনে জানা যায় যে কিভাবে মানবদেহে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপে প্রাণবায়ু দিনরাত চব্বিশ ঘন্টায় ২১৬০০ বার সঞ্চরণ করে থাকে। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর দ্বারা প্রবহমান। ইড়া বামে ও পিঙ্গলা ডান দিকে থাকে। এদের চন্দ্র ও সূর্যনাড়ীও বলা হয়। এই উভয় নাড়ীর মধ্যে যে অতি সূক্ষ্মনাড়ী আছে তারই নাম সুষুম্না। মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথে ঠিক মধ্যস্থ দিয়ে

অতি সূক্ষ্ম এই সুষুম্না নাড়ী মূলাধার চক্র হতে মস্তিষ্ক কোষের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সংযুক্ত। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুরও নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস একই সঙ্গে সমান তালে চলতে থাকে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই শ্লেষ্মার দ্বারা এই সুষুম্না মার্গটি রুদ্ধ হয়ে যায়। একেই যোগমতে বলা হয় কুণ্ডলিনী, মহাভুজঙ্গিনীর সুষুম্নার দ্বারে মুখ গুঁজে মহানিদ্রায় শায়িত থাকা। এই সুষুম্না পথে প্রাণবায়ুর সুষ্ঠুভাবে গমনাগমন না হলে এই কুণ্ডলিনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা আসে না। এই পথটা খোলবার নিজ নিজ সদ্‌গুরুনির্দ্দিষ্ট অনেক রকম উপায় আছে। তত্ত্ববিদ্ যোগীগুরু শিষ্যের যোগ্যতা ও আধার বিবেচনা করে বিভিন্ন রকম প্রণালীর উপদেশ দিয়ে থাকেন। যেমন তীব্র ঈশ্বর চিন্তা, অজপা প্রভৃতি জপের দ্বারা, প্রাণায়ামের কৌশলদ্বারা অথবা নাদানুসন্ধানের দ্বারা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে সুষুম্নামার্গ উন্মিলীত হয়ে থাকে। তবে একটা কথা সদা সর্ব্বদা মনে রাখতে হয় যে এই পথে শতকরা ৯৫ ভাগই চাই গুরু ভক্তি, ২½ ভাগ দৈব এবং বাকি ২½ ভাগ হল পুরুষকার। এই তিনের যথার্থ সমন্বয়েই যুক্তাবস্থা লাভ সম্ভব হয়, অবশ্য এই সাথে জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির পুঁজিও সাধন সিদ্ধিকে অতিদ্রুত গতি ও লয় প্রদান করে থাকে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় হলেও প্রকৃতি কিন্তু ক্রিয়াশীলা এবং ত্রিগুণাত্মিকা, আর এই ত্রিগুণের বৈষম্য হতেই সৃষ্টি, অথচ এই তিনের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হলে এই তিন গুণের মধ্যে কিছুটা তারতম্য ঘটে যায়, তখনই প্রাণ অপানের কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রতি জীবদেহেই প্রাণ ও অপান দুটি বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত শক্তির প্রকাশ ঘটে। এটাকে যোগের ভাষায় শিব-শক্তি / পুরুষ-প্রকৃতি ইত্যাদি নামে বলায় সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা হেঁয়ালীর মত শোনায়। এই প্রাণ ও অপান উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে আবার সাথে সাথে একে অপরকে বিকর্ষণও করে থাকে। আসলে উভয়ে মিলে এক হতে চায় কিন্তু এক হতে পারে না। কারণ প্রাণ যে অনুপাতে জেগে ওঠে সেই অনুপাতেই আবার অপান সুপ্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অপানের জাগরণের (activation) অনুপাতে প্রাণ নিষ্ক্রিয় বা নিদ্রিত (inactive) হয়ে যায়। সুতরাং এই উভয় শক্তি সমজাগ্রত (equal activation) না থাকায় পরস্পর মিলতে পারে না। প্রাণ ও অপানকে জাগিয়ে (active করে) যদি যথাক্রমে প্রাণ ও অপানকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মেলান যায় তবে একটা সমতা হতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ সেটা হয় না। নিঃশ্বাসের ও প্রশ্বাসের গতির দ্বারা প্রাণ যখন নাসারন্ধ্র দিয়ে নাভিতে পৌঁছায়, অপান তখনই নাভি থেকে মূলাধারে (perenium) নেমে যায়। আবার অপান যখন মূলাধার থেকে নাভিতে উঠে আসে প্রাণ তখনই নাভি থেকে উঠে এসে নাসিকা পথে বেরিয়ে যায়। এভাবেই অষ্টপ্রহর জীবদেহে প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া হয়ে চলেছে। প্রাণ ও অপান কখনও মিলিত হতে পারে না। যদি অপানকে মূলাধার হতে নাভিতে উঠিয়ে কোনও কৌশলে স্থির রেখে, প্রাণকে, একই সঙ্গে, নাভিতে নামিয়ে আনা যায়, তাহলে অবশ্য উভয়ে মিলতে পারে। অপরপক্ষে, যদি প্রাণকে নাভিতে নামিয়ে এনে কৌশলে স্থির রেখে যদি অপানকে মূলাধার থেকে নাভিতে তুলে আনা যায় তাহলেও উভয়ের মিলন হতে পারে। মিলন স্থান নাভিদেশে না হয়ে কণ্ঠে বা ভ্রূমধ্যস্থলেও হতে পারে। কিন্তু এই উভয় বায়ু মিলিত না হলে সাম্যাবস্থা আসে না। যতক্ষণ

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে ততক্ষণই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী (route) ক্রিয়াশীল থাকে। তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলন না ঘটলে সাম্যাবস্থা হয় না আর সাম্যাবস্থা না হলে সুষুম্নামার্গ / নাড়ী (route) খোলে না। পাঠক প্রশ্ন করবেন গীতার মাহাত্ম্যে বর্ণনায় আবার সেই ধান ভানতে শিবের গীত, মানে যোগরহস্য বর্ণনা, শুরু হল কেন ? কারণ হল সেই উপলব্ধির কথা। যে উপলব্ধিটাই হল প্রকৃতপক্ষে গীতার মাহাত্ম্য। যোগপথের পথিকগণ মাতৃগর্ভে বাসকালীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের বহু ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করে থাকেন। সে সময় একটা অতি সূক্ষ্মশক্তি তার মেরুদণ্ড পথে মূলাধার থেকে শুরু করে স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ্য ও আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রার পর্য্যন্ত একটানা প্রবাহিত হতে থাকে। এই অবিচ্ছিন্ন শক্তিপ্রভাবে জীবের প্রকৃত বিবেক, বৈরাগ্য ও বিচারের উদয় ঘটে। সেই ঊর্দ্ধপদ ও হেঁটমুণ্ড অবস্থায় সে তখন ভগবানের কাছে অতি কাতর প্রার্থনা জানায় “গর্ভবাসে মহৎ কষ্টং ত্রাহি মাং মধুসূদন”! হে প্রভু, ত্রাণ কর, তোমার দয়ায় যদি এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন মাতৃগর্ভরূপ কারাগার থেকে একবার বের হতে পারি, তাহলে প্রতিজ্ঞা করছি এমন কুকাজ আর করব না যাতে ফের মাতৃগর্ভে আসতে হয়। হে দয়াল, এখন থেকে সর্ব্বতোভাবে আমি তোমারই ভজনা করব। গর্ভস্থ শিশুর এহেন কাতর প্রার্থনায় বোধকরি কোনও রহস্যবলে মাতৃগর্ভস্থ ‘প্রসূতি’ নামক বায়ু ধাক্কা দিয়ে গর্ভস্থ শিশুকে বাইরে বের করে আনে। প্রভুর কি দয়া ‘প্রসূতি’ বায়ুর ধাক্কার ফলে সেই একটানা যে সূক্ষ্মশক্তি মূলাধার হতে সহস্রার পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল, সেটা তিন জায়গায় ছিঁড়ে যায়। প্রথমেই ছেঁড়ে নাভিতে, তারপর কণ্ঠে এবং শেষে ভ্রূমধ্যে। এভাবে তিন জায়গায় ছেঁড়ার ফলে সেই অখণ্ড শক্তি প্রবাহটা চার টুকরো হয়ে যায়। এমনতর ভাবে খণ্ডিত হওয়ার ফলে গর্ভস্থ জীবের সেই কাতর প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা এবং সেই বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অলৌকিক স্মৃতিশক্তি সবই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেজন্যই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তবে যদি কেউ সাধনার দ্বারা ঐ চারটে ছেঁড়া অংশকে আবার জুড়ে দিয়ে এক করতে পারে তাহলেই তার ভিতর পূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ ও নানা রকম অলৌকিক যোগ শক্তির প্রকাশ ঘটে। এভাবেই যোগশক্তি ও অলৌকিক বিভূতি সঞ্জাত হয় যার ব্যাখ্যা জড়বাদী বুদ্ধিতে করার চেষ্টা অবশ্যই বিড়ম্বনা মাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাসকে আমাদের প্রাণ চেতনার বাহ্য বিকাশ বলা যেতে পারে। তাই সাধারণ ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নাসাপথে বাইরে উৎক্ষেপ করাকে রেচক, ভিতরে টেনে নেওয়াকে পূরক এবং রুদ্ধ করে রাখাকে কুম্ভক বলা হয় কিন্তু – বৈদান্তিক দৃষ্টিতে যে যে বস্তুতে যখন যখন দৃষ্টি পড়ে সেই বস্তুতেই তখন তখন ব্রহ্মের প্রকাশ, বিকাশ বলে অনুভব করলে রেচক, আন্তঃ রাজ্যে দ্বিদল হতে সহস্রার পথে ধ্যানের বলে সেই আলোকসামান্য আলোকপুরুষের অনুভূতি লাভ হলে পূরক এবং চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে দ্বৈতবোধ লয় প্রাপ্ত হলেই কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সাধনাটা শুধুমাত্র শ্বাসের খেলা নয়, চিত্তেরও বটে। চিত্তে একটা জ্ঞানবৃত্তি ভেসে উঠে বিলীন হবার পর অপর একটা জ্ঞানবৃত্তি জেগে ওঠার আগে, ঠিক সেই মধ্যক্ষণটিতে চিত্ত নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হয়। প্রাণের বেলায় যেমন স্বভাবিক রেচক পূরকের মধ্যে স্বভাবিকভাবে অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও কুম্ভক হয় ঠিক তেমনই

চিত্তের বেলায়ও জগৎ সৃষ্টি অর্থাৎ জগৎ ভোগরূপ পূরক এবং জগৎ সংহার অর্থাৎ জগৎ ত্যাগরূপ রেচকের পর পুনরায় সৃষ্টির আগের সেই মধ্যক্ষণটিতে কুম্ভকরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়ে থাকে। এই সমাধি বিবেকজ্ঞানে সাধক কৃতকৃত্য হয়ে থাকেন। এমনতর সমাধি জীবের অজ্ঞাতসারে নিত্যই সংঘটিত হচ্ছে। জীবের যদি নিত্যই অজ্ঞাতসারে এই রকম তত্ত্বতঃ সমাধি না হত, তবে জীব জ্ঞাতসারে কখনই সমাধির আনন্দলাভ করতে পারত না। জগৎ গ্রহণের অর্থ হল আত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ না করে জগৎরূপে গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞেয় জ্ঞান, দৃশ্য দর্শন, এক কথায় জগৎ ভোগ। আর জগৎ বর্জ্জনের অর্থ হল আত্মাকে অন্যরূপে অর্থাৎ জগৎরূপে গ্রহণ না করা, অর্থাৎ জ্ঞেয় বর্জ্জন, দৃশ্য বর্জ্জন, এক কথায় ভোগত্যাগ। মনে মনে দৃঢ়নিশ্চয় হতে হয় যে জগৎ গ্রহণ ও জগৎ বর্জ্জন এই দুই বৃত্তির বিকাশ সঙ্কোচকাল পর্য্যন্তই জীবত্ব। এক সঙ্কোচ বিকাশ ও অপর সঙ্কোচ বিকাশের মধ্যবর্ত্তী ক্ষণটাই সমাধিক্ষণ বা নির্ব্বিকল্প স্থিতি অর্থাৎ স্বাভাবিক আত্মস্থিতি। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে জগৎ বর্জ্জনও একটা বৃত্তিজ্ঞান মাত্র। নির্ব্বিকল্প সাধনার অভ্যাসে দৃঢ়মূল হয়ে গেলেই বিবেকী পুরুষের দৃশ্য দর্শন, দৃশ্য বর্জ্জন সকলই মিথ্যায় পরিণত হয়ে যে নিত্য-নির্ব্বিকল্পাত্ম স্বরূপে স্থিত হয়, অনুভব করে সে চেতন এবং যা অনুভূত হয় সেটা অচেতন। জীবের সঙ্গে জগতের, চেতনের সাথে অচেতনের সম্বন্ধই জীবন। চেতন আর অচেতনের দার্শনিক পরিভাষায় চেতন আমি = বিষয়ী আমি = জ্ঞাত আমি = দ্রষ্টা আমি = বোদ্ধা আমি = অহং = হং। আর অচেতন তুমি = তুমি+সে = বিষয় = জ্ঞেয় = দৃশ্য = জ্ঞেয় জগৎ + ঈশ্বর = সঃ। সংক্ষেপে বলা হয় বিন্দু ও বিসর্গ। হং এর বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার এবং সঃ এর বিসর্গ । পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয় স্বরূপ। হং = পুরুষ। সঃ = প্রকৃতি। হং = বিষয়ী। সঃ = বিষয় = বিশ্বরূপ ঈশ্বর। এই ‘হংস’ মন্ত্রের নামই অজপা। জীব জগৎ বর্জ্জন ও জগৎ গ্রহণ রূপে নিত্যই এর আরাধনা করে চলেছে। বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভব জগৎ গ্রহণ। বৃত্তিজ্ঞানের বিলয় জগৎ বর্জন। যখন প্রকৃতি পুরুষকে আপনার নিত্য আশ্রয় মনে করে নিজের অস্তিত্ব লোপ করে বিষয়ীর বা পুরুষের স্বরূপে লীন হয়, তখনই ‘হংস’ ও ‘সোহহম্’ রূপে পরিণত হয়। বিষয়ী ও বিষয়ের বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব উপাধিদ্বয়ের অবসানে, অর্থাৎ জীব ও বিশ্বরূপ ঈশ্বরের জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উপাধির অবসানে, উভয়ের শুদ্ধ চৈতন্য স্ফূর্ত হয়। হংসঃ অর্থাৎ অহং সঃ ব্যতিহার ক্রমে সোহহম্ (সোহম্) হয়ে পূর্ণ ঐক্য প্রাপ্ত হয়। সোহহং এর হ কার ও স কার লোপ পেয়ে ওঁ কার মাত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা মাত্র ‘ওম’ হয়ে থাকেন। এমনভাবে তত্ত্বে স্থিত হলে প্রাণক্রিয়ার উপর হতে দৃষ্টি চলে যায়। তখন জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানবৃত্তির উপরই দৃষ্টি থাকে। এই স্তর, মনোময় + বিজ্ঞানময় + আনন্দময় কোষের স্তর, যাকে পশ্যন্তিস্তর বা জ্যোতিঃস্তর বা কারণস্তর বলা হয়। বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী জীবের ধারণায় মনে হয় সে যেন বাইরের জগৎ থেকে সুখ আহরণ করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ‘বাহির’ বলে কিছু নেই। আত্মবিস্মৃতি হেতু সে নিজেকেই দ্বিধা বিভক্ত করে, ভিতর বাহির কল্পনা করে বাইরে বিষয় সৃষ্টি করছে এবং তার সঙ্গে নিজের ভোগ প্রবণাত্মক সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেই বিষয়ী সেজে বসেছে। এহেন বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব দুই রকম উপাধি সে নিজেই নিজের উপর আরোপ করে এই বিরাট সংসার নাট্যের অভিনয় করে চলেছে মাত্র। এমনতর যে আত্মবিস্মৃতি, এমনতর না জানারই অপর নাম অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া ইত্যাদি। এহেন যে অবিদ্যা তাও অনির্ব্বচনীয়া সদসদ্‌বিলক্ষণা। অজ্ঞানের আবরণে সমাহিত হয়ে এই যে বিষয়ানন্দ ভোগ হয় সেটাও কিন্তু ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব বা লেশমাত্র। সুষুপ্তিতেও জীবের আনন্দানুভূতি হয় ও থাকে যদিও সেখানে বিষয় থাকে না মানে জগৎ বর্জন ঘটে। কিন্তু সুষুপ্তিতে চিত্তবৃত্তি অজ্ঞান বা অজ্ঞান কারণে লীন থাকে বলে ব্রহ্মানন্দ চিত্তে প্রতিবিম্বিত না হয়ে অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হয়, সেজন্য জীব তাকে ব্রহ্মানন্দ বলে জানে না। আবার শান্ত চিত্তেও বিষয় উপভোগের স্মৃতির রেশ থাকায় শান্তচিত্তে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মানন্দকেও সেই বিষয়ানন্দ অর্থাৎ জগৎ হতে অনুকূল বিষয় আহরণ ও উপভোগ জনিত আনন্দ বলে মনে করে থাকে। এই দুটোই অজ্ঞানী জীবের ভ্রান্তি। বিবেকী জীবের কিন্তু এমনতর ভ্রান্তি হয় না। পাঠক এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, এই যে বিষয়ী ও বিষয় –– ভাবাতীত তত্ত্ব – কেন বিষয়ী ও বিষয় সেজে সংসার রচনা করল ? বাস্তবে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। অনেক দার্শনিক, যোগী প্রমুখ লেখক সমাজ অনেকভাবে অনেক কথাই বলেছেন বা লিখেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁরা বাচালতাই করেছেন মাত্র। সংসারাভিনয়ের আত্যন্তিক বিনাশেই মুক্তি। মৃত্যুতে আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। বরং নতুন উদ্যমে নতুন পরিবেশে সংসারাভিনয়ের পুনরারম্ভ হয় মাত্র। একমাত্র জ্ঞানে বধিত হলেই আত্যন্তিক বিনাশ হয়। দেহ নষ্ট হলে বা সৃষ্টি প্রলয় হলেই যদি রেহাই পাওয়া যেত, তবে আর এহেন মুক্তি প্রচেষ্টা বা মুক্তি সাধনার দরকার হত না আর শ্রীভগবানও অর্জ্জুনকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী যোগবিজ্ঞান বর্ণনার কষ্ট স্বীকার করতেন না। অতএব ধর্ম্মময়ী গীতাকেই আশ্রয় করতে হবে, যেহেতু গীতাই সর্ব্বজ্ঞান প্রদায়িনী, ও সকল শাস্ত্রের সারভূতা। তাই একমাত্র গীতাপাঠেই অন্তঃকরণ বিধৌতপাপ হয়ে স্বচ্ছ স্ফটিকের মত শুদ্ধ হয়ে থাকে। শ্রীভগবান বলেছেন, হে পার্থ, গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার সার সর্ব্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয় জ্ঞানরূপ। গীতাই আমার পরম উত্তমস্থান, পরমপদ, পরমগুহ্য বস্তু, পরমগুরু এবং গীতাজ্ঞান আশ্রয় করেই আমি ত্রিলোক পালন করে থাকি। গীতার গুহ্য নামসকল হল – গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। গীতা পাঠান্তে গীতামাহাত্ম্য বিশদভাবে পাঠ করা কর্ত্তব্য। গীতা মাহাত্ম্য পাঠ অথবা শ্রবণে পাঠক বা শ্রোতার যেমনতর উপকার বা ফললাভ হয় তাও বর্ণনার অতীত। তাই আমার বিনীত নিবেদন এই যে পাঠক যেন গীতামাহাত্ম্য ও গীতাসার অবশ্যই পাঠ করেন ও যথাসম্ভব প্রয়াসী হন অন্যদেরও তা শোনাতে ॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রীশ্রী গীতামাহাত্ম্যম্ ব্যাখ্যা সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ : ওঁ তৎসৎ শ্রীমদভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্‌ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সংবাদে শ্রীশ্রী গীতামাহাত্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রদীপিকা নামক গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রী গীতামাহাত্মের যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

ওঁ শুভমস্তু বক্তারম্‌, কল্যাণস্তু শ্রোতারম্‌ ॥ ওঁ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা ॥
ওঁ ॥ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
" ওঁ শান্তি ওঁ "

" শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যং।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥"

" পহেলা জনম মেঁ গুরুভক্তি কর,
দুসরা জনম মেঁ নাম।
তেসরা জনম মেঁ নিজ ঘর বাসা
চৌথা নিজ ধাম।"

- সহায়ক গ্রন্থাবলী –

১ । আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশনের গীতা – শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
২ । অবিনাশী কবীর গীতা – যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী।
৩ । শ্রীমদ্ভগবদগীতা শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামীকৃত টিকা, ও গীতার্থ সন্দীপনী ব্যাখ্যা।
সম্পাদনা : শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী, হরিমন্দির ট্রাষ্ট, গুপ্তিপাড়া।
৪ । শ্রীমদ্ভগবদগীতা – – শ্রীমদ বলদেব বিদ্যাভূষণ।
৫ । শ্রীমদ্ভগবদগীতা – (সংস্কৃত) শঙ্করভাষ্য, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।
৬ । শ্রীমদ্ভগবদগীতা – (বাংলা) শঙ্করভাষ্য, লোটাস লাইব্রেরী।
৭ । গীতার্থ সন্দীপনী –
৮ । শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগ সমীক্ষা – বিশ্বপ্রণব অত্যাশ্রম।
৯ । শ্রীমদ্ভগবদগীতা – শ্রী অরবিন্দ ঘোষ।
১০। শ্রীমদ্ভগবদগীতা – স্বামী বিবেকানন্দ।
১১। গীতাগুরু প্রবেশিকা – রঘুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১২। শিব গীতা –
১৩। জীবন্মুক্তি গীতা –
১৪। ভগবতী গীতা –
১৫। অবধূত গীতা –
১৬। অন্যমনস্ক গীতা –
১৭। উত্তর গীতা –
১৮। রামগীতা –
১৯। কামগীতা –
২০। ব্যাধগীতা –
২১। গুরুগীতা –
২২। অণুগীতা –
২৩। পদ্যগীতা – (বাংলা)
২৪। Indian Philosophy - Dr. S. Radhakrishnan.
25| - do - - Hiriyanna.
২৬| Outlines of Indian Philosophy – M. Hiriyanna.
২৭| Indian Philosophy - Dr. Surendra nath Dasgupta.

২৮| Sanskrit Literature. – Macdonell.

২৯। সৎ সাহিত্য গ্রন্থাবলী – বসুমতী সাহিত্য মন্দির

৩০| History of Ancient Sanskrit Literature - Max Muller.

৩১। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার – নবপত্র প্রকাশন

৩২। A History of Indian Literature. -– Winternitz.

৩৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (২২ খন্ড) – সম্পাদনা শ্রী রাধাবিনোদ গোস্বামী

৩৪। মধুময়ী চণ্ডী - শ্রী কুমার নাথ মুখোপাধ্যায়।

৩৫। বেদ সমগ্র।

৩৬। সংহিতা সমগ্র।

৩৭। উপনিষদ সমগ্র।

৩৮। সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সংগ্রহম (সংস্কৃত) –

৩৯। বিবেকচূড়ামণি –

৪০। বিজ্ঞানভিক্ষু –

৪১। অপরোক্ষানুভূতি –

৪২। শারীরকসূত্রের ভাষ্য –

৪৩। যোগশাস্ত্রের টীকা –

৪৪। মণিরত্নমালা –

৪৫। উপদেশসহস্রী –

(৩৮–৪৫) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

৪৬। বেদান্ত দর্শন – শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

৪৭। যোগসিদ্ধি (সংস্কৃত)

৪৮। যোগদর্শন সমগ্র। (পাতঞ্জল সহ)

৪৯। যোগশাস্ত্র – (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)।

৫০। সুভাষিত (সংস্কৃত)

৫১। ব্রহ্মসূত্রম্ (সংস্কৃত) – মহর্ষি বেদব্যাস।

৫২। যোগসূত্রম্ (ব্যাসভাষ্য)

৫৩। তত্ত্ব প্রকাশিকা – জয়তীর্থ মুনি।

৫৪। সর্ব্বেশ্বর তন্ত্র – শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দ

৫৫। কুলার্ণব তন্ত্র ও তন্ত্র সমগ্র –

৫৬। মাধ্ব ভাষ্যম্ – শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ।

৫৭। জ্ঞান সঙ্কলনীতন্ত্রম্ – শ্রীমৎ সদানন্দ তীর্থনাথ

৫৮। পুরাণ সমগ্র।

৫৯। হঠযোগ প্রদীপিকা – আত্মারাম আদিনাথ।

৬০। পবন বিজয় স্বরোদয়ঃ – প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন সংকলিত।

৬১। যোগ স্বরোদয় –

৬২। বহিরঙ্গ যোগ (হিন্দি) – স্বামী ব্যাসদেবজী

৬৩। যোগসার (হিন্দি) – শিবানন্দ সরস্বতী।

৬৪। আত্মবোধ – শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

৬৫। প্রপঞ্চসার (সংস্কৃত) – শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

৬৬। ভক্তিযোগ – অশ্বিনী কুমার দত্ত।

৬৭। শ্রী সারদা তিলক – শ্রী লক্ষণ দেশীকেন্দ্র

৬৮। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত(সারানুবাদ) – রাজশেখর বসু।

৬৯। মহাভারতম্ (সংস্কৃত) – মহর্ষি ব্যাসদেব।

৭০। মহাভারত (বাংলা) – কাশীরাম দাস।

৭১। মহাভারত (বাংলা) – কালীপ্রসন্ন সিংহ।

৭২। সার্ব্বভৌম মহাভারতম্ – মহর্ষি পতঞ্জলি।

৭৩। মহাভারত মীমাংসা – চিন্তামনি বিনায়ক বৈদ্য।

৭৪। ভারত মীমাংসা (হিন্দি) – পণ্ডিত শ্রী মাধব রাও সপ্রে।

৭৫। বাল্মিকী রামায়ণ (অনুবাদ) – হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৭৬। রামায়ণম্ (সংস্কৃত) – মহর্ষি বাল্মিকী।

৭৭। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ – সম্পাদনা ৺তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

৭৮। রামায়ণ কা গূঢ় রহস্য (হিন্দি) – সন্তদাস মাহেশ্বরী।

৭৯। শ্রী রামচরিত মানস (হিন্দি) – শ্রীমৎ স্বামী গোস্বামী তুলসীদাস।

৮০। Economic History of India – Dr. R.C.Dutt.

৮১। রামায়ণ কা গূঢ় রহস্য (হিন্দি) – সন্তদাস মাহেশ্বরী

৮২। অধ্যাত্ম রামায়ণ।

৮৩। রামায়ণ (বাংলা) – কৃত্তীবাস ওঝা।

৮৪| The Esoteric Meaning of the Ramayana – Sant Das Ji

৮৫। পঞ্চদশী – – বিদ্যারত্ন মুনীশ্বর।

৮৬। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্ – অনুবাদ শ্রী জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৮৭। শিববাক্যম্ – অনুবাদ শ্রী জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৮৮। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিচার – অধ্যাপক ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ গ.অ. উ.খরঃঃ.
৮৯। কবীরের দোঁহাবলী (বাংলা)।
৯০। কবীর সাহেব কা শব্দাবলী (হিন্দি) – Published by Belvedere Printing Works Publication Allahabad.
৯১। চৈতন্য চরিতামৃত – কৃষ্ণদাস কবিরাজ
৯২। The Bible (Authorised King James Version) - Cambridge University Press.
৯৩। The Imitation of Christ – Thomas A Kempis
৯৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস – নীহার রঞ্জন রায়।
৯৫। লোকায়ত দর্শন – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বুদ্ধকথা – ডঃ অমূল্য চন্দ্র সেন।
৯৭। আত্মবিজ্ঞান (হিন্দি) – স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী।
৯৮। ব্রহ্মবিজ্ঞান (হিন্দি) – স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী।
৯৯। শ্রীশ্রী সদ্ গুরুসঙ্গ – শ্রী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
১০০। হিমালয় কা যোগী (হিন্দি) – স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী।
১০১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সমগ্র খণ্ড) – উদ্বোধন কার্য্যালয়।
১০২। জীবনী সংগ্রহ – গণেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১০৩। জ্ঞানগঞ্জ – ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ।
১০৪। জগৎ ও আমি – শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
১০৫। প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য – সুকুমারী ভট্টাচার্য্য।
১০৬। প্রাচীন ভারত শূদ্র – রামশরণ শর্ম্মা।
১০৭। শাম্ব – কালকূট।
১০৮। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
১০৯। ভারত জনের কথা – বিনয় ঘোষ।
১১০। Our Oriental Heritage – Will Durant.
১১১। Ancient Indian History. – Dr. R.C. Mazumdar.
১১২। Oxford History of Ancient India. – Dr. Vincent Smith.
১১৩। ভারতের অধঃপতন – টি. এন. শেষণ, সহযোগী - সঞ্জয় হাজারিকা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
114| A study of Religion - Swami Vivekananda.
115| Science of Seership. - Godfrey Hodson.
116| Complete Works. - Charles Darwin.
117| Complete Works - Sigmund Freud.
১১৮। সিগমুন্ড ফ্রয়েড : মনঃ সমীক্ষণের রূপরেখা – পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র। নিউ সেন্ট্রাল এজেন্সি।
১১৯| Response in the living and Non living. - Sir Jagadish Ch. Bose.
120| Thoughts For Today – Robert Bert. Published by Prajapita Brahma Kumari – Ishwriya Viswa Vidyalaya, Mount Abu.
121| Rating of Man. – Sir Oliver Lodge.
122| Dharana Darshan – Swami Niranjanananda Swaraswati.
123| The Expanding Universe. – Professor Edington.
124| As You Think. – James Allen.
125| Secret Doctrin. – Madam Blatvosky.
126| Enchanted Soul. – Dr. Roman Rolland.
127| Mysterious Universe. – Sir James Jins.
128| Topics & Opinions. – M/s. Macmillan.
129| God – vs – Science. – David Van Biema.
130| Human Physiology. – Dr. Chandi Charan Chatterjee.
131| Essence of Yoga. – Rajani Mohan Chakroborty.
১৩২। শারীর বিজ্ঞান – যোগেন দেবনাথ – হিন্দুস্থান পাবলিশিং কনসার্ন।
133| Review of Medical Physiology - Willium F. Ganong.
134| Text Book of Medical Physiology. - Arthur C. Guyton & Jhon Hall.
135| Samson Wright's Applied Physiology -Cyril A Keel & Eric Neil (OUP)
136| Gene Cloning – an introduction – T.A. Brown.
১৩৭। রবীন্দ্র রচনাবলী।
১৩৮। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ – প্রধান সম্পাদক গোপাল হালদার, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি।
১৩৯।মাইকেল রচনা সম্ভার।
১৪০। বঙ্কিম রচনাবলী – সাহিত্য সংসদ।
১৪১। বাংলা কাব্য সংগ্রহ – সুকুমার সেন সম্পাদিত।
(ক) বিদ্যাসুন্দর(খ) চর্য্যাগীতি পদাবলী
১৪২। স্মৃতিকথা – মীরাদেবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।